

সংখ্যা-১-৮, ১০

ভারতী

~~সংখ্যা-১-৮, ১০~~

বছর-৪২

সভিক্রম মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৪ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০] ভারতী কার্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৭/০
২২, হুজিরা ট্রাট, কলিকাতা ।

ভারতীয় বর্ণনাত্মক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অবি (গল্প)	ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	৩৫৩
অনৌতিক	ঐপ্রহ্লাদকুমার সরকার	২৩৬
আমাদের সম্পদ	ঐপ্রবোধেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ	২৪৭
আমাদের নিজস্ব সম্পদ কোথায়	ঐনরেন্দ্রনাথ রায়	৩৪৩
আলোয়ার আলো (উপগ্রাস)	ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়	২০, ১১৭, ২১১, ৩২৭, ৪৩৮, ৪৪৭
আধুনিক সাহিত্যের একটা লক্ষণ	ঐঅজিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ	৪৭
আধুনিক নাট্যসাহিত্য	ঐঅজিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ	২৫৪
আর্টে প্রেম (গতিত)	ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়	৬০
আর্টের দেকাল-একাল (সচিত্র)	ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৭১
‘আবারে-আলোকে’	ঐনতী প্রিয়দর্শা দেবী বি-এ,	৫১৭
টউলফের প্রতি ফুলখা (কবিতা)	ঐকালিদাস রায় বি-এ	১১৬
ইচ্ছার মুক্তি এবং আত্মার মুক্তি	ঐবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর	৩
একতারা (সমালোচনা)	ঐঅজিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ	৪৫৩
কর্তার ইচ্ছার কর্ণ	ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৬০
কবিতা	ঐনতী প্রিয়দর্শা দেবী বি-এ	৩২৩
কবি ও সমালোচক (কবিতা)	ঐকালিদাস রায় বি-এ	৩৫২
খ্যাতি (গল্প)	ঐশ্রীমদ্রায় আতর্ষী	৫৬৯
গান	ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৯
গান	... ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৭৯
গুরুদ্বী (গল্প)	ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	১০২
ছোট্টো	ঐঅনিতকুমার হাঙ্গার	২২৫
টুপি (গল্প)	ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	৪১১
তোড়া (কবিতা)	ঐদীপ্তপ্রদাণ ভট্টাচার্য	২০২
ভেলুগু গান (কবিতা)	ঐসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮২
দণ্ডনীতির প্রথম ইতিহাস	ঐনিত্যেন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ	৪০৭
দাস্তার বাখা (গল্প)	ঐনতী রেণুনার	৮৫
দোশালা (গল্প)	ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	৫৩৩
দায়ীর অবস্থা	ঐদ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নীলপাখী (নাটক)	ঐক্যবিনীকান্ত সোম	৪২৩, ৪১৬
পরম ক্ষণ (কবিতা)	ঐক্যগাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১
শঙ্করের পঞ্চক (গল্প)	ঐমতী ত্রেপু রায়	২৮৭
শিতা-পুত্র (সচিত্র)	ঐক্যগাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	২৪০
পুরাতন পুরান সাজ (সচিত্র)	ঐক্যগাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	৩৭৪
পূর্ণতা (কবিতা)	ঐমতী প্রিয়দর্শনা দেবী বি-এ	২০৭
পূজা (কবিতা)	ঐমতী প্রিয়দর্শনা দেবী বি-এ	৬০৭
প্রভাষণ (গল্প)	ঐপ্রমোদর আতর্ষী	৩১৮
কলিপাইনে শিক্ষাবিত্তার	রায়বাহাদুর মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৭২
বসন্তসেনা	ঐশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এম-এ	১০
বংশাঙ্কুরের গোড়ার কথা	ঐ প্রমুদকুমার সরকার	৬০৩
বাঙ্গাল গল্প (গল্প)	ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়	৫৬৭
বাঙ্গালীর রসবোধ	ঐমতী বর্ণকুমারী দেবী	২২২
বাঙ্গালী সেপাইয়ের হোল-নামচা	হাবিলদার ঐধীরেন্দ্রনাথ সেন	২২৩
বিচার-বিবেচনা	ঐমতী প্রিয়দর্শনা দেবী বি-এ	২২৭
বিবেকানন্দ-সঙ্গমে	ঐগুরুদাস সরকার এম-এ	৬৩৮
বিরূপবস্ত্র সমালোচনা (সচিত্র)	ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৮১
ব্যায়োগ	ঐশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এম-এ	৪০৫
ভারতীয় পরিবার মণ্ডলীর উপর		
দুর্যোগীয় সভ্যতার প্রভাব	ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভারত-রমণীর অবস্থার উপর		
দুর্যোগীয় সভ্যতার প্রভাব	ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভাষার কথা	ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভাবধর্ম (সচিত্র)	ঐঅনিতকুমার হালদার	
মহাবি দেবেন্দ্রনাথের সমালোচক	ঐসত্যজিত পর্দা	
মাসকাব্যী—	ঐঅজিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ	
আমাদের শিক্ষা		১০৩
আর্টের আদর্শ		৪২৯
আর্টের ভাব		৫২০
উত্তর-প্রত্যুত্তর		৩২৬
কর্মপ্রেরণা		১০০
চিত্তরঞ্জনের “বাঙ্গালার কথা”		১৭৫
জন্মের দ্বার		২৬

মাসকাবারি—

শ্রীঅমিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ,

আপানের কথা		৩২৭
জাতীয়তার আদর্শ		৪৮৫
নবীন সাহিত্য সম্বন্ধে অজিযোগ		৩০৪
"বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রেক্ষিতি"		৪১৩
বাঙ্গলার কথা		২২৮
বৈষ্ণব-কবিতা ও "রূপান্তর"-বাদ		৩০
রাষ্ট্র ও ব্যক্তি	...	৪২৫
শক্তির ধর্ম ও আনন্দের ধর্ম		৫৮২
সাহিত্যে সত্যতার আদর্শ		২২৮
"সাহিত্যে সত্যতা"		৩২১
আমী বিবেকানন্দ		২৩
মাতৃ (গল্প)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	৫
মিশরের আর্ট (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮৮
মিশরবালোর পূর্বপুরুষ (সচিত্র)	শ্রীশ্রেমাদুর্গ আতর্থা	৩৮৯
মূলমাল-সমাল	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৯
মল্লুট (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫২
রূপসী (নাটিকা)	শ্রীসৌদামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ৩৯, ১৫৪, ২৫৯, ৩৭৯	
শরতানের হাত (গল্প)	শ্রীমতী রেণু রায়	২০২
শেখুরী (গল্প)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	২৩০
সমালোচনা	শ্রীমতাব্রত শর্মা	১০৬, ২০৮, ৫২১
সামাজিক পরিবর্তন	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৫২১
সাহিত্যের গোড়ার কথা	শ্রীঅমিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ	১৪১
সাহিত্যের গওগোল	শ্রীশ্রেমাদুর্গ আতর্থা	৪৪১
সার্কজনীন কল্যাণ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৪১৫
"স্বপ্নিতে কিম্বদা এল আগমন"(কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়দর্শনা দেবী বি-এ	৮৮
সুন্দরের বরণ (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	৩৬৬
সেকালের গৃহস্থালী	শ্রী গুরুদাস সরকার এম-এ	৭৩, ১৩০
স্বদলিপি	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৪
স্বপ্ন-সুন্দরী (গল্প)	... • শ্রীমতী রেণু রায়	৪৫৫
হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬
হিন্দু, মুসলমান ও পার্শ্বীয় রমণী	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪১৯
হিন্দোল-বিলাস (কবিতা)	শ্রীদত্তেন্দ্রনাথ বসু	৪১৯

চিত্র সূচী

চিত্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা
আলেকজান্ডারের মৃত্যু (বহুবর্ণ) ...	১০৮	শিতা-পুত্র (বহুবর্ণ)	২৫৩
ইউকেটানের ধ্বংসাবশেষের একাংশ	৪২১	এগরী	৬২
ইউকেটানে প্রাপ্ত একটি মূখ	৪২৩	প্রাচীন গ্রীসের একটি পাত্র	২৭২
একটি মূর্তির মূখ	১২৩	প্রেরের উদ্দেশ্যে	৬৬
এলিকেক্টোর ত্রিমূর্তি ...	৫৭০	প্রেরালাপ	৬১
Aphrodite-এর আর একটি মূখ ...	২৭৬	গ্র্যান্ডিটিল্‌সের গড়া মূর্তির নমুনা	২৭৫
ওডারথামের মন্দির	২৮৫	গ্র্যান্ডিটিল্‌সের গড়া Aphrodite-এর	
কপিল	৫৭৬	একটি নকল-প্রতিমূর্তির মূখ ...	২৭৫
কপূরদান—সমুখ	৩৭৫	প্রাচীরের মূখ ...	১২৩, ১২৪
কপূরদান—পার্শ্ব	৩৭৬	প্রাচীরের মূখ ও মন্দির ভাঙা	১২৪
কেহাশী	১২	“বহুদীন কবিতার ভরনাক” হুঁড়ি ;	
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঐয়ুক্ত অসিত কুমার		হুঁড়িতে আগল কাব্য ছ’পদ ছ’বুড়ি ?”	
হালদায় অঙ্কিত	৪৮৩	ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৩৫২
গান-পেয়ে ...	৬৪	বাঙালী ...	১২২
গ্রীক ভাস্কর্যের একটি রমণী মূর্তির মূখ	২৭৭	“বিজয়িনী তেনাস”	২৭৬
চ্যামিট মূখ	২০০	বাস (বহুবর্ণ)	
চুখন	৭১	ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৩১০
ছায়ে শিবের মূখ—ওডারথাম	২৮৬	ব্যঙ্গোক্তি (?)	
ওজ্রাভিকৃত (বহুবর্ণ)		ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২১০
ঐয়ুক্ত রানেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত ...	৫০৪	ভগ্নমূর্তির মূখ	১২৪
ভাস্কর্য	৩৭৭	ভালোবালো ? ...	৬৩
ধিবসের মন্দির	১০৫	“ভেমাল অক দি ক্যাপিটল” ...	২৭৬
দাক্ষিণাত্যের নটরাজ	৫৭৪	মেক্সিকোর আর-একটি প্রাচীন মূর্তি	৪২৪
দ্বিতীয় রোমেলিসের মন্দির	৪২০	রমণী-মূর্তি	১২১
দুটি হাঁস	১২৭	রাজা খাক্সা	১২২
মোলনার	৭০	রিসের গির্জা	২৮৩
নব-মন্দির	৬৮	রোমের পাহাড়ে ...	২৮৪
নগরাস্থ	১২১	সমাদি-ভবনের সৈকতালের অঙ্কিত	
নিমন্ত্রণ বাড়ী	২০০	ছবি ও চিত্রাকর	১২৮
পার্বতিনের একাংশ	২৮০	পার্বতীর বুদ্ধ	৫৭৭
পানিশথ	৩৭৮	সিংহলের কোন তাবিল সাধু	৫৭৫
পানিশথের আধার	৩৭৮	সিংহলের বুদ্ধমূর্তি ...	৫৭৮
পূজারিণী (বহুবর্ণ)		হাউই কহিল যের কি সাধন তাই (বহুবর্ণ)	
ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৪০০



ପୂଜାରିଣୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଗନ୍ଧେନାଥାବତୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

ভারতী

৪১শ বর্ষ]

বৈশাখ, ১৩২৪

[১ম সংখ্যা]

ইচ্ছার মুক্তি এবং আত্মার মুক্তি

খ্রীষ্ট ধর্মের অর্থ যদি হয় ঈশা-মহাত্মার
স্বাভিপ্রেরিত ধর্ম, তবে :সেই এ-দেশীয়
ধর্মের ভাগবত ধর্ম ঈশা-মহাত্মার মর্ত্য
জীবনের অবসান-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অবসান
প্রাপ্ত হইয়া “আচ্ছহু” বলিয়া উঠিয়াছে !
এ খ্রীষ্টধর্ম—অর্থাৎ ভাগবত খ্রীষ্টধর্ম—পাশ্চাত্য
ভূগোল-বণ্ডে ভুল-ক্রমেও একটিবার চরণ-গুলি
গ্রহণ করেও নাই, আর, কখন কালেও
করিবে-বে তাহার কোনোও লক্ষণ ঘুণাকরেও
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বোম্ব-ও-

প্রতাপ খ্রীষ্ট-ধর্ম এ-বাহা আমাদের চক্ষের
সম্মুখে আজগামান, ইহার সম্বন্ধ ঈশা-
মহাত্মাকে জড়াইলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত
নাই। অধুনাতন কালের না-পারে-এমন-
কাজ-নাই-গোচরে খ্রীষ্টধর্ম স্বয়ং প্রথমে
ছিল পাব ও-চূড়ামনি Constantine-সম্রাটের
হস্তধর্ম * ; তাহার পরে তাহা হইয়াছিল
মহা-প্রতাপশালী পোপদিগের একাধিপত্য-
ধর্ম ; এক্ষণে তাহা হইয়া উঠিয়াছে
বিষম একটা বিটুকাল ধর্ম—সারা পৃথিবীর

* বলিয়া “পাব ও চূড়ামনি”। এই বিটুকাল বিশেষণটিকে কেহ যদি মনে করেন—লেখকের একটা
মুঃশ্রমে বিতীর্ণিকা, তবে, বর্তমান শতাব্দীর একজন হুঁদাদান পুরাতত্ত্ব-সমালোচক কী বলিতেছেন জ্ঞান
করুন :—

“The church claims Constantine as the first Christian Emperor.....Just about
the time when the first Church-Council met at Nicara, he put to death his eldest
son, Crispus, on a mere suspicion of treason ; and on his own death bed, immediately
after his baptism by Eusebius, he dictated an order to another son to execute
six members of his family whom he suspected of a conspiracy to poison him.

Barclay Lewis Day
(Author of “Our heritage of Thought”)

“সামান্ সামান্” ধ্বনি উত্থাপন-কারী সভ্যতাভিমান-ধর্ম! এই সভ্যতাভিমান-ধর্মের প্রধান পুরুষার্হ হচ্ছে Freedom of will। এ দেশের তবিনবীহিণের প্রবর্তিত ধর্মের প্রধান পুরুষার্হ = Freedom of আত্মা। কিনা আত্মার মুক্তি। ইহা বলা বাহুল্য যে, আত্মা = মস্তক; Will = হস্তপদ। হস্তপদ যদি মস্তকের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করে, তবে তাহা হস্তপদের freedom পূর্বই—কিন্তু মস্তকের তাহা সর্জনশ! Will-এর Freedom = আত্মার সর্জনশ। পক্ষান্তরে হস্তপদ যদি মস্তকের অধীনে পরিচালিত হয়, তাহাতে মস্তকেরও freedom হয়, আর সেই সঙ্গে হস্তপদের দ্বারা freedomও বজায় থাকে। তবেই হইতেছে যে, Will-এর সংঘম = আত্মার Freedom। কঠোপনিক্বে বলা হইয়াছেও তাই; বলা হইয়াছে—“বিজ্ঞান-সারসি বিন্দু মনঃপ্রসং-বায়রঃ সোহংগনঃ পারমাত্মোতি তথিকোঃ পরমং পং।” বিজ্ঞান বাহার সারসি এবং মনোরঞ্ (অর্থাৎ ইচ্ছা) বাহার বিনীকৃত তিনি সংসারের পার-বরূপ বিহুর পরম ধাম প্রাপ্ত হ’ন। তবেই হইতেছে যে, ইচ্ছার সংঘম = আত্মার মুক্তি; আর, তাহা হইতেই আনিতেছে যে, ইচ্ছার মুক্তি (freedom) = আত্মার বন্ধন।

আত্মার freedom কাহাকে বলে তাহার নতুন যদি দেখিতে গও, তবে পূর্কালেই

আমি বলিয়া থাকাস হইতেছি যে, তাহার নতুন দেখানো আনার সাধের অতীত। সাধাতিত তাহা আমার এইমন্ত—যেহেতু দেশীয় ধাঁচার সাধু মহাআদিগের সংখ্যা এক্ষণে অভ্যস্ত বিরল। দেশীয় প্রকৃতির সাধু পুরুষ আমি যে একেবারেই চক্ষে দেখি নাই তাহা বলা আমার অভিপ্রায় নহে; আমি কেবল বলিতে চাই এই যে, দেশীয়-ধাঁচার সাধু-মহাআ চমক-একজন বাহাদিগকে আমি দেখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রের ছবি আঁকিয়া দেখাইতে আমি নিতান্তই অপারগ; তা ছাড়া—অনেক কষ্টে যদি তাহার একটা অক্ষুট আলোখা আমি আঁকিয়া দেখাইও বা, তবে তাহা এক্ষণকার কালের বিদ্যাতী-চন্দ্রাবার্তী দিশী সমুদ্রমার-দিগের পছন্দ না হইবারই কথা!

Freedom of Will কাহাকে বলে তাহার যদি নতুন দেখিতে চাও তবে অতি সহজে তাহা দেখানো বাইতে পারে, কিন্তু তাহা দেখানো নিতান্তই একটা বাহুল্য কাণ্ড; কেননা তাহা কলেন পরিচীতে! ইচ্ছাকে জ্ঞানধর্মের বশীকৃত করিলে তাহার ফল হয় যেমন আত্মার মুক্তি; তেত্রি, জ্ঞানধর্মের বন্ধন হইতে ইচ্ছাকে মুক্তি প্রদান করিলে (freedom দিলে) তাহার ফল হয় বেচ্ছাচার। বেচ্ছাচারের নতুন দেখাইতে গেলে ঠক বাহিতে গী উল্লাড় হইয়া বাইবে, অন্তএব তাহাতে কাজ নাই—এইখানেই ইতি করা দা’ক্।

ঐবিক্রেনাথ ঠাকুর।

মাতৃ

আজকের সকালটা একেবারে কুয়াশায় ঢাকা,—এমন কুয়াশা এদিকে একদিনও হয়নি ;—জলধল-আকাশ হুধে-গোলা আলোর মধ্যে ভূবে রয়েছে ; যেদিকে দেখি, মনে হচ্ছে যেন নাকের সামনে প্রকাণ্ড একখানা ঘসা কাঁচ ঝুলছে। জাহাজের সব বেকিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে,—কোথাও একটু বন্দ্যার স্থান নেই। সাতটা-পকাত্রে জাহাজ ছাড়বার কথা, আটটা-পঁচিশ হয়ে পেল তবু আজ সহযাত্রী কারুর সেখা নেই। জাহাজের সায়েং কান-ঢাকা টুপি, পশমের পাঁচ-রঙা গলাবন্ধ আর লক্ষ্যে ছিটের বরলা একখানা বালাপোশ জড়িয়ে একটা মেছুরির কুড়ি থেকে বেছে-বেছে ভালো মাছগুলি লাগরঙের একটা বালতিতে নিজের অঙ্গে তুলছে। জাহাজ আজ যুগ্ম হাঁস ;—যেন ডানার ভিতরে মুখগুঁজে জলের ধারটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওতার-কোটের কলারটা দুই কানের উপরে বেশ-করে টেনে দিখে বসে রয়েছি। বাবলার দিনে কুলের খালি বেকখানার বসে যেমন, ঠিক তেমন আজ মনে হচ্ছে—গাড়ি পাই তো বাড়ি পালাই। এমন সময় সামনে কুয়াশায় ভিতর থেকে গুনলুম কচি-গলার কে ডাকলে—‘ম’ !

বড়বাজারের এই বাটটা—বেখানে হর্যো-ধরের আগে থেকে হুজুগের অনেক গরুও কর্ককোলাহলের বিভ্রাম নেই, সেখানে আজ সব জাহাজগুলো ভেঁশু ধামিরে কুয়াশায় ভিতরে চূপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে

কি-প্রথম নিরুন্ম ভা বুকতেই পারছো। এর মধ্যে কচি-গলার সেই ‘ম’ শব্দ—সে যে আমার অন্তরের অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল, তা কি আর বলতে হবে ! আমি যেন দূর থেকে চমকে উঠে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম—ঠিক আমাদের কাঠকানোর ডেকের দিকে মুখ-করে জুখানা বড়-বড় মোতাল্লা জাহাজ দুটো প্রকাণ্ড গোল বারাতা নিয়ে কুয়াশা ঠেলে আখখানা বার হয়েছে ; একটা বারাতার নীচে বড়-বড় ইংরিজি কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে—‘মাতৃ’ আর একটায়—‘কুড়িগুন’। শেষের জাহাজখানার লোক দেখলেম না ; কিন্তু ‘মাতৃ’ বলে যে জাহাজ তার ওই বারাতার নীচে, যেখানে জাহাজের রায়বর, সেখানে দেখছি, কতকগুলো তামার ডেকটির কাছে বসে নীল পাল্লাখ-পর্য একটা ছোকরা-খালসি হুং-করা একটা পাবীর খাঁচা বেশ-করে জল দিখে-দিখে ধুচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের ছিটে বস্তাবার পড়ছে, ততবারই খাঁচার পাবী সে মা মা বলে চীৎকার করে উঠছে ; আর সেই ছোকরা খালসি তাকে কথা এবং অকথা ভাষার গাল পেড়ে চলছে।

পাবী-পোষবার লখ আমার চিরদিনই আছে—তার উপর পড়া-পাবী—আমি একেবারে আমাদের ডেকের নাকের ডগার গিয়ে দাঁড়িয়ে বাহুরের আর পাবীর রক্তটা বেখে নিচ্ছি, এমন সময় শিহন থেকে অবিন আন্তে আন্তে আমার কাছে এসে কয়—‘পাবীটা

ভালো-করে দেখবে আমার সঙ্গে এসো।”

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে অরিন আমাকে আবার বলে—“এই ঠাণ্ডা কেন হচ্ছে কষ্ট পাচ্ছ? আমাদের এ জাহাজ সাড়ে-নটার আগে বাট ছেড়ে নড়ছে না। চল, ওই জাহাজখানার বুড়ো মালেকের সঙ্গে বেশ আলাপ আছে, সেখানে বসে বেশ আরাধ্যে তামাক খাওয়া বাবে আর গল্পগজবও হবে। মীরসাহেব লোক বেশ, আলাপ করে খুশি হবে, আর ঐ ‘মাতু’ জাহাজখানার মতো অমন ঝাঁকালো জাহাজ আর নেই,—আগাগোড়া গিঁটে আর আরনা দিয়ে মোড়া। ওর ক্যাবিনগুলো দেখবার জিনিষ।”

আমি অরিনের সঙ্গে আর-একটা প্রকাণ্ড ভোট আর পাটের সোডাউন পেরিয়ে মাতু জাহাজে গিয়ে উঠলুম। জাহাজ ভো নর বেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জলে ভাসছে! এক-একটা ডেক বেন এক-একটা কনস্ট্রাকশনের প্যাঞ্চাল—এদিক থেকে ওদিকে নজর চলে যা। শিল্পের চাবর আর রবার-সিট দিয়ে মোড়া মোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আবার মৈড়াপুরীর মাতমহলের মতো সোনা আর কটিকে মোড়া সেই জাহাজের ক্যাবিনগুলো একে-একে দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক খালাসি এসে বলে—“মীর সাহেব আপনাদের হেলান দিয়েছেন।”

আমি অরিনের সঙ্গে মীর-সাহেবের খাস-কাষরার দিয়ে দেখাশো—এক বুড়ো নাখোদা মেজহাের এক খাটরার বসে তামাক টানছেন; পাশে এক জঁবা পানের খিলি। তাঁর শিহনে

খোলা জানলার কাচের ভিতর দিয়ে পাটের সোডাউনের টিনের ছাদের একটা আবছায়া দেখা যাচ্ছে। দস্তরমস্ত আধর-আপ্যাহনের পর মীর-সাহেব অরিনের দিকে চেয়ে হেসে বলেন—“এবার অনেক দিন পরে এ অকালে এলুম;—সেই দুবছর পূর্বে আপনার সঙ্গে দেখা, আর আজ এই!”

অরিন আমাকে দেখিয়ে বলে—“এই বন্ধুটিকে আপনার কাছে নিয়ে এলুম; এঁর বড় পানীয় সখ; এর সঙ্গে সিঁগাপুর থেকে এবার একটা কাকাতুরা এনে নিতে হবে। বাহো! এবার আপনার সফরের গছটা বসুন।”—বলেই অরিন থপ্‌করে মীর-সাহেবের বিনা অহুমতিতে ডাবা থেকে এক-খাবা পান তুলে নিয়ে দুটো নিম্নের গালে, আর গোটো-চারেক আমার হাতে ভাজে দিয়ে চোখ বুজে সোজা-হয়ে বেশ জমিয়ে বসল। আমি পান কটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করছি দেখে মীর-সাহেব বলেন—“পান খান, না হলে গল্প জমবে না”—বলেই মীর-সাহেব ছুক করেন—“এদিকে সিঁগাপুর, হংকং—ওদিকে সেকেন্সা আর কুন্তনুনিয়া এইটুকুর মধ্যে কত বাটেই না আমার জাহাজ ভিড়লো! দিনে-রাত্রে দুদিনে-দুদিনে আলাপে-অঙ্কারে এই পঁচাত্তর বৎসর কত নবীতেই না পাড়ি দিলুম, কত পরিরাই না পার হলুম! কিন্তু এই ভাগীরথী—এ আমার মনকে কেমন বে টানে তা আমি বোঝাতে পারবো না। এই গঙ্গাভীরেই আমার জন্ম, আর এই বাংলার মাটিতেই আমি ভূমিষ্ট হয়েছি। আমার কবর এই মাটিতে, কি পরিত্যক্ত অঙ্গাঙ্গ জলের নীচে, খোদাতালা ঠিক

করেছেন তা তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু আমার মন চায় যে এই নদীর ধারে যেন আমার শেষ-যাত্রার জাহাজখানা এসে ভেড়ে। কাল-বোশেখির ঝড়ের আগে-আগে তুফান ঢেলে বধনি বেধানে আমি জাহাজ চালিয়েছি তখনি এই নদীতীরের ছবি—একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলার সবুজ শেওলায়-ছাওয়া, আমার নিষেধ কবরের ছবিটি আমার মনে বেগেছে। ঘরের ছবিটি আমার বাংলাদেশের সঙ্গে গাঁথা নেই। এখানেই আমাদের ঘর-বাড়ি ছিল কিন্তু সে কেমন ছিল, নদীর এপারে ছিল কি ওপারে, তা আমার কিছু মনে পড়েনা। ঘরে আমার কেইবা ছিল—তাই-বোন ঝাউকে মনে নেই। কেবল মনে আছে মাকে। অন্ধকারের মধ্যে জ্বল জ্বল করছে তাঁর রূপ—আর কিছু না। এইটুকু আমার গুব্ব ছেলেবেলার স্মৃতি, বোধ হয় যখন মায়ের কোলে মাথুব্ব হচ্ছিলেম তখনকার।

এরপর থেকে ঘটনাগুলো অনেকটা স্পষ্ট করে আমি সেখতে গাই। তখন আমার বয়স কত বলতে পারিনে, গঙ্গার উপরে কতকগুলো কালো-কালো ডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তীরের উপরে বসে মা মা বলে চীৎকার করে কাদছি। পরণে আমার একটুকুরো কাপড় নেই; হুতোর মধ্যে আমার দুটো টাকা। টাকা দুটো রেলের টিকিট কেনবার জন্যে—এটুকু আমার বেশ মনে আছে। তার পর এক সন্ন্যাসী—তার মাথার জটা, গায়ে ছাই, কটা-কটা দাড়িগোপ—কে আমাকে এসে বসে—বেটা রোতা কাছে? আমি তাকে কেঁপে বল্লম—আমাকে মায়ের,

কাছে দিবে এস, আমি দিল্লী বাবী সন্ন্যাসী একটু হেসে আমার কাছে টাকা আছে কিনা শুধোলেন। আমি তাঁর হাতে আমার টাকা-দুটো দিখে দিলেম, আর তাঁর হাত-ধরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলেম। তারপর কি হল মনে পড়েনা। আমার জীবনের ঘটনাগুলোর মধ্যে আর-কোথাও ফাঁক নেই—এইটুকু ছাড়া।

এর পরে একদিন নতুন কাপড় পোছে, দিল্লী বাব বলে, লোটা-কবল পোটলা-পুঁটলি বেঁধে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা টিনের ডাবের নীচে কাঠগড়া দেওয়া একটা জাহাজ দাড়িয়ে রয়েছে। আমার চারিদিকে দ্রীপুরুষ, ছেলেবুড়ো, আরো কত লোক;—কেউ বসে, কেউ আগা-গোড়া চাদর বুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরখানার দুটো লোহার ধামের মাক দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ষ্টিক এমনি-একখানা বড় জাহাজ এসে সেই ঘরখানার গায়েই লাগলো। সেটা এত বড় যে মনে হলনা সে জলে আছে। একটা সাহেব এসে আমাদের সবায় হাত-পা, বুক-পিট টিপে-টুপে দেখে বড়-একখানা কাগজে কি লিখে দিয়ে গেল, আর অমনি কাঠগড়ার দরজা দিয়ে ছড় ছড় করে লোক গোঁকর পালের মতো জাহাজে গিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী আমার পিঠ-চাপড়ে বলল—বা বেটা দিল্লী! বলেই আমার হাত ধরে জাহাজে উঠিয়ে দিলে। আমি জাহাজে উঠেই দ্বিধে দেখলেম সন্ন্যাসী ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেছে। দিল্লী বাবের উৎসাহে আমার মন এতক্ষণ

আনন্দে 'হুঁসছিল, সন্ন্যাসীকে লুক্কতে দেখে
হঠাৎ যেন আমার ভিতরটা একবার শুক
হয়ে ঝড়াল। কতক্ষণ এমন ছিলেম বলতে
পারিব, হঠাৎ একসময় জলের হস্ হস্
শব্দ শুনে চমকে দেখি জাহাজ চলেছে;—
আলো-অন্ধকারে জলের উপরটা যেন বোতা
সাপের পিঠের মত দেখাচ্ছে। একটা
সাদা টুপি, খয়েরী কোটপট্টা কালো
সাহেব এসে আমাকে জাহাজের একদিকে
টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে। সেখানে
একজন মেয়েমানুষ আমাকে দেখে হঠাৎ
চীৎকার করে বুক-চাপড়ে—কেউ বেটার
নাম কোরে, কেউ বাপ বোলে, কেউ ভাইরে
বোলে কান্ডে লাগল। সাহেব তাদের এক
ধমক দিয়ে চলে গেল। সেই সব সহযাত্রীর
কথার-বার্তার আনলুম এখান। কুলীর জাহাজ।
কিন্তু তখন আমি এত ছোট যে কুলী কাকে
বলে বুঝতেন না। সেই নদীর জল,
আকাশের আলো, দূরে দূরে তীরের বন,
বাণির চড়ার উপরে স্বর্ষ্যের উদয়-অস্ত দেখতে
দেখতে কদিন আমার আনন্দে কেটে গেল।

তারপর চা-বাগানের ইতিহাস। সেখানে
মানুষের বেকশপে মানুষ হয়ে কেমন-করে
যে তিলে-তিলে সূচড়ে তাকে তা দেখেছি,
মানুষের উত্তপ্ত রক্ত চাপুকের চোটে ক্রমে
ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে কি-কোরে যে মানুষ তার-
বাহী জীবের মতো মাটির দিকে খুঁকে-পোড়ে
পরের বোকা টানতে-টানতে শেষ-একদিন
তপ্ত বাণির উপরে মুখ-ভুজড়ে বুক-ফেটে
মরে—তাও দেখেছি; কিন্তু তবু ঘর মনে
হলে এই চা-বাগানের ছবিটাই আমার
মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এখানে গুণ্ডণ্ড

অনেক, সুখও অপেক্ষ। মাঠের সজ্জনে
এখানে এসে, শিশুকালে মাকে না দেখে
আমার কি যে কান্না প্রাণের ভিতরে
গম্ভীরে উঠেছিল তা বোঝানো যায় না।
জাহাজ যেদিন এক-এক-জন ছেলেছাত্রা মা
জানারসের কাটাগাছের বেড়ার আড়ালে
তাদের কান-মাথা রোগা হাতে আমাকে
বুকে জড়িয়ে ধোরে হুপুয়ের তোম-পোড়া
মাটির উপরে চোখের জল ফেলতো, যখন
কোনো-কোনো দিন রাত্তি, গালাঘর চুড়ি-
পরা ছোট এক-একটা কালো মেয়ে চায়ের
পাতা ছেঁড়বার সময় হঠাৎ আমার পিঠে
জঁপিয়ে পড়ে জাই-বোলে আমার গলা
জড়িয়ে ধরতো, তখনকার সুখ—সে তো
বর্ণনা করা যায় না! তার পর বসন্তকালে
যখন কুলে-কলে, পাখীর গানে, সোনার
রোদে, সবুজ পাতার বাগানের চারিদিকের
বন ডরে উঠেছে, তখন কাজের অবসরে
যখন এক-একবার চোরে দেখেছি শুনি যে
আমার মাকে না দেখে আমি থাকতে
পারিনি। বাট-বছরের মধ্যে আমার শরীর-
মন একদিনের মধ্যে অবসর হতে দিইনি।
এ-শক্তি আমার নিজের মধ্যে ছিল না,
কিন্তু আমার না যিনি, তিনিই আমাকে
দিয়েছিলেন। এইজন্তে বাগানের সাহেব
মালিক আমার ভালোবেসেছিল আর মরবার
সময় আমাকে তার চা-বাগানখানা লিখে
দিয়ে গেল। তার আর-কেউ ছিল না। সে
ভালোবাসবার মধ্যে একমাত্র বাগানের
কাজকে এবং সেই কার চালাতে সম্পূর্ণ
উপযুক্ত আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু
সাহেব ভুল শ্রুতি ছিল। আমি বাগানখানাকে

ভালোবেসেছিলেম—তার কেরারীকরা সাধনো চায়ের গাছগুলোর জন্তে নয়—ওই কাঁটা গাছের বেড়ার ধারে-ধারে যে ঘেঁষে, ভালো বাসার লতাগুলো জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছিল তারি জন্ত। ওই বনের গাছ যেখানে কুঁকে পোড়ে মায়ের মতো পথের ধুলোকে চুষন দিত, সেই ছুরান্ধতল বন-পথগুলির জন্ত আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা পুষেছিলাম—ঘাট বছর ধরে। চা-বাগানের ঠিক মাঝে, বাগানের যিনি মালিক, তিনি নিজের কবর নিয়েই বানিয়ে গিয়েছিলেন—কালো পাথরের ছুঁচোলা একটা পালিস-করা ধাম, তার গারে দোনার অঙ্করে বড়-বড়-করে তাঁর নাম আর অঙ্কের তারিখ। তারি গারে তাঁর মরণের তারিখ লিখে আমি আমার বাগানের কাজ বন্ধ করুম।

শেষকুলীর দল বাদোল বাজাতে-বাজাতে বন্ধরের দিকে বেশের জাহাজ—ঘরমুখো জাহাজ ধরতে চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলার চাঁদ নীরব বাগান, নিস্কুম বনের গারে চমৎকার আলো কেলছে। আমি ঘরে আলো নিভিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় মাঝার উপরে কচিগলার ফে ডেকে গেল—মা, মা, মা! তার পর ছায়ায় মতো একটা ফে আমার ঘরের দরজা দিয়ে বনের দিকে ছুটে গেল,—মনে হল একটা ছোট ছেলে। আমি লাঠি-হাতে বেরিয়ে পড়লুম। বনের ধারে যেখানে একটা গুহা—বেখানে অন্ধকার সুখ বেগিয়ে রকেছে—সেইখানে সেই ছোকরার দেখা পেলাম। সে একজন কুলী। আমি তাকে গুথোলুম—সবাই গেল তুই যে এখানে? সে বলল—মা পালিরেছে, তাকে

ছেড়ে আমি বাই কেমন করে? আমি এদিক-ওদিক চেরে দেখছি কোথায় তার মা, এমন সময় ছেলেটা চৌচিরে বসে—বীর-সাহেব, ওই যে মা! অন্ধকারে একটা কুলের ডাল গুহার মুখে ঝেঁপে পড়েছে দেখলেম,—আর কিছু না। ছেলেটা অকথা ভাষার তার মাকে উদ্দেশ্য-করে গাল-পাড়ছে শুনে আমি যখন মবাক হয়ে রয়েছি, সেই সময় একটা কালো পানী উড়ে এসে তার কাঁধে বসল—

বীরসাহেবের গল্পে বাধা দিয়ে আমি বল্লম—“গোল-বারাণ্ডার নীচে সকাল-বেলায় আপনার এই জাহাজে ঠিক তেমনি একটা ছেলেকে আমি দেখছি।”

বীরসাহেব হেসে বল্লম—“সে আমারি সঙ্গে আছে বটে। ছেলেটা সেই কালো পানীটাকে দুই মৃত্তার ভিতরে নিয়ে তাকে কেবলি চুষ খাচ্ছে আর গাল প্যাড়ছে; আর পানীটাও বলছে—মা, মা মা! এমন সময় বন্ধর থেকে শুনেলুম কুলীর জাহাজ বাঁধে বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে বল্লম—জাহাজ তো বেরিয়ে গেল, তুই এখন কেমন করে বেশে বাবি? ছেলেটা বানিক আমার দিকে কাল কাল করে চেয়ে থেকে বসে—বেশ তো আমার নেই।

—তবে জাহাজে চড়ে কোথায় বাজিলি?

—বেখানে সবাই চলেছে।

আমি ছেলেটাকে আমার সঙ্গেই রাখলেম। বীর-সাহেব, আপনার বেশ কোথায়—এই প্রশ্ন করলে আমি ছেলেটাকে বলি, প্রশ্ন নেই। সে

এখনো জানে এই জাহাজে করে সে আর আমি আমাদের বেশ খুঁজতে বেরিয়েছি।”

আমি মীর-সাহেবকে বল্লাম—“ছেলেটা পাখীকে এমন অকথা ভাবার গালাগালি দেয়, আপনি ওর কাছ থেকে পাখীটা কেড়ে নিয়ে ধম্কে দেন না কেন? আহা পাখী যে এমন সুন্দর না বলে ডাকে এ আমার কখনো শোনা ছিল না।”

মীর-সাহেব বল্লেন—“বাবুদী, ওই ছেলেটারই কচি গলার ‘মা’ মূর, পাখীটা সেই চা-বাগানের বড়তুংখের কান্নার মাঝ থেকে শিখে নিয়েছে,—ছেলেটার সবটাই গালাগালিতে ভরা নয়।”

এমন সময় সেই ছেলেটা নীল কোর্ডা পোয়ে ছুটে এসে আমাদের বল্লে—“আপ-

নাদের জাহাজ এখন ছাড়বে, দীর্ঘ ধান্—কৃষ্ণাণা কেটে এখন রোদ উঠেছে।”

‘মাতু’ জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেল। সেখানম মীর-সাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখীর বকের পালকের মতো হাঙ্কা সাধা ধোঁয়া আকাশে উঠে। ফিরে এসে যখন আমার আমাদের জাহাজ ঘাটে লাগল তখন মীর-সাহেবের জাহাজ বেখানে ছিল সেখানে মত্ত-একটা ফাঁক দেখলুম। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কুলীর দল প্যাটের বোঝা বয়ে পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে মাগধান্যর দিকে চলেছে; আর একটা সোণার টুপি-মাথায় সাহেব ছড়ি-হাতে তদারক করে বেড়াচ্ছে।

ঐশ্বরীসুনাথ ঠাকুর।

বসন্তসেনা

“অধস্তিপুংগাঃ বিজয়ার্হবাহে।

বৃথা বয়িঃ কিল চাক্ষুসঃ।

গুণাসুরক্কা গণিকা চ যত

বসন্তসেনো যঃ বসন্তসেনা।”

উজ্জয়িনী নগরীর বদিক চাক্ষুস ও তাঁহার গুণাসুরক্কা বসন্তলক্ষীর জায় রূপ-শালিনী বসন্তসেনার কথা সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠকের অবদিত নাই। “মৃচ্ছকটিক” হইতেই প্রথমে বসন্তসেনার কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যজগতের নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে। তাহার পর ভাস্কর “চাক্ষুস” নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি

গ্রন্থ ভিন্ন চাক্ষুস ও বসন্তসেনার উপাখ্যান যে জৈন-সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া স্থানলাভ করিয়াছে এ কথা বোধ হয় অতি অল্প-লোকেই বিদিত আছেন। জৈনসাহিত্যে প্রচলিত বহু উপাখ্যানই রূপান্তরিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীন, মহাত্ম্যরত বর্ণিত কাহিনীগুলি পরিবর্তিত হইয়া জৈন-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদকরূপে জৈনসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। সীতাদেবীর জন্মপরীক্ষা, অশোকবনে ভ্রাবণ ও সীতা প্রকৃতি চিত্রসংলিত জৈন পুঁথিগুলির পৃষ্ঠা উন্টাইয়া গেলে এমন বোধ হয় না যে আমরা

প্রচলিত রামায়ণের কাহিনী ভিন্ন অল্প কোমল কাহিনী-সম্বলিত পুঁথি অবলোকন করিতেছি। পুঁথি পাঠ করিলেও এই সাদৃশ্য এত অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হয়, যে ইহাকে পৃথক কাহিনী বলিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। তবে জৈন লেখকগণ সকল উপাখ্যানের মধ্য দিয়াই ধর্ম ও নীতি প্রচারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির মধ্যে জৈনরচিত মহাকাব্যও আছে। সেগুলির মধ্যেও একটি না একটি সর্গে জৈনধর্মের সারভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুরাণের মত জৈনদেরও বহু পুরাণ আছে। তাহাতেও সুপরিচিত পৌরাণিক বহু উপাখ্যান স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই জৈনধর্মের প্রেঁততা প্রতি-পাদনকল্পে যেকোন প্রয়োজন সেইরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জৈনলেখক-রচিত চারুভদ্র ও বঙ্গভাসেনার উপাখ্যানেও এইরূপ জৈনধর্মের প্রেঁততা বোঝিত হইয়াছে।

জিনসেনাচার্য্য রচিত হরিবংশ-পুরাণ নামক সংস্কৃত ছন্দে লিখিত একখানি স্মৃতি-পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের একবিংশতিতম সর্গে চারুভদ্রের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। “হরিবংশপুরাণের” সহিত মহাভারতের অন্তর্গত “খিল হরিবংশের” নাম-সাদৃশ্য অনেকই লক্ষ্য করিবেন। এই হরিবংশপুরাণের সহিত খিল হরিবংশের কাহিনীরও অনেক সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণ-বলদেবের কাহিনী, যজ্ঞ-বংশধ্বংস প্রভৃতি বহু কাহিনী উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জৈনগ্রন্থে কাহিনীগুলি কিছু ভিন্নপ্রকারের। এই

সকল কাহিনী ভিন্ন অস্ত্রান্ত বহু উপাখ্যান জৈন হরিবংশপুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে। উল্লিখিত কতকগুলি কেবল জৈনধর্মসম্বন্ধীয়, কতক-গুলি ‘কিষকী’মূলক প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। চারুভদ্র ও বঙ্গভাসেনার উপাখ্যান এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভারতীয় জৈনসিদ্ধান্ত-প্রকাসিনী সংস্থা জৈনহরিবংশ-পুরাণ মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মুদ্রণের অল্প তাহারা তিন-খানি পুঁথি ‘মিলাইয়া’ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একখানি এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে, অপরখানি দোলাপুর হইতে প্রাপ্ত ও শেষোক্তটি তালপত্রের কর্ণাট-দেশীয় লিপিতে লিখিত। এই তিনখানি পুঁথি মিলাইয়া যে পাঠ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি গৃহীত হইল। এ দ্বারা এ অংশগুলি কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্গবর শ্রীপারাগলাল বাকলী বালকী পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রদান করিতে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল। সেইজন্য এই অবসরে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিঙ্গী রাখা ভাল যে, চারুভদ্র-চরিত্র নামক বস্ত্র জৈন গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত লিখিত ঐ বিষয়ক একখানি মুদ্রিত পুস্তক পারাগলালজীর নিকট আছে। কিন্তু এই গ্রন্থের উপাখ্যান জৈনহরিবংশপুরাণ হইতেই গৃহীত। সুতরাং হরিবংশপুরাণের উপাখ্যানের আলোচনা করিলেই জৈনসাহিত্যে রূপা-

তত্ত্বিত বসন্তসেনার কাহিনী আমরা অবগত হইতে পারিব।

হরিবংশপুরাণের হিন্দী অমৃত্যু প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে ছই এক 'মূলে তাহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইবে।

"জানীৎ কলিঙ্গসেনাঃ পদিকা পদাধিক।

ব্রতা বসন্তসেনাঃ পদিকা পদাধিক।"

[হরিবংশপুরাণ। ২১ সর্গ ৪১ শ্লোক]

কলিঙ্গসেনার হস্তি বসন্তসেনা। মুচ্ছ-
কটিকে শূদ্রক "বসন্তশোভেব বসন্তসেনা"
বলিয়া বসন্তশোভার সহিত বসন্তসেনার
রূপের তুলনা করিয়াছেন। জিনসেনও
বসন্তসেনার রূপবর্ণনে সেই উপমাই ব্যবহার
করিয়াছেন।

এই বসন্তসেনা নৃত্যঙ্গীতাধি বিবিধ
কলায় পারদর্শিনী ছিলেন। নববৌবন-
সম্বিতা হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। (১)

মুচ্ছকটিকে চারুদত্ত উচ্ছিন্নীর অধি-
বাসী, কিন্তু জিনসেন চারুদত্তকে চম্পার

অধিবাসী করিয়াছেন। জিনসেনের
কাহিনীতে বৈশ্রবংশীর মহা ধনধানী তাম্রদত্ত
চারুদত্তের পিতা ও হুভদ্রা চারুদত্তের মাতা।
যৌবনাগমে বাতুল সর্বার্থের ঔরলে স্মিত্যার
গর্ভে জাতা মিঃবতীর সহিত চারুদত্তের
বিবাহ হয়। কিন্তু শাস্ত্রচর্চার চারুদত্ত এত
নিমগ্ন ছিলেন যে নিজ পত্নীর প্রতিও তাহার
আসক্তি অস্তিতে পড়েন নাই। শাস্ত্রে
অমৃত্যুগ অস্ত্র বিধে সর্গপ্রকার-আসক্তির
প্রতিরোধক। চারুদত্তের পিতৃবা ক্রমশঃ
বহু বাসনে আসক্ত ও কামুক ব্যবহারে
সুপরিচ্ছাদ ছিলেন। চারুদত্তের এই অবস্থা
দেখিয়া তাহার মাতা তাহাকে ক্রমশঃ
হস্তে সমর্পণ করিলেন। (২)

ক্রমশঃ চারুদত্তকে বসন্তসেনার প্রতি
অমৃত্যু করিতে প্রয়াস পাইলেন।

এই অভিপ্রায়ে ক্রমশঃ একদিন সভা-
জনপূর্ণ নৃত্যমত্রে চারুদত্তকে লইয়া
গেলেন, সেখানে বসন্তসেনার নৃত্য কদম্বার
কথা ছিল। (৩)

(১) "কন্তাসৌ নৃত্যঙ্গীতাবিকলাকৌশলশালিনী।

দৌরপত্র পত্রা কোটিবৌবনস্ত্র যথোচিতঃ ৪" (হ—পু ২১।৪২)

"জানীৎ চৈব বৈশ্রবংশীঃ সন্দর্ভাঃ সন্দর্ভাঃ ৫"

তাম্রদত্ত ইতি ব্যাক্তঃ হুভদ্রা তন্ত্রা তাম্বিনী ৬...

উক্ত চ যৌবনসেনায়াঃ সন্দর্ভাঃ ৭

সবর্ধিত স্মিত্যার বাতুলস্ত্র তন্ত্রা ৮

শাস্ত্রবাসনিনো য়েহ তাম্বিনীবিদ্যেহি ৯

শাস্ত্রবাসনিনো য়েহ বাসনাঃ হি বাসক ১০

ক্রমশঃ পিতৃব্যো য়ে বর্তমানসদর্ভাঃ ১১

সদর্ভাঃ যৌবিনো য়েহ কামুকবৌবনবিদ্যে ১২" (হ—পু ২১।৪৩, ৪৪—৪৫)

(২) "নৃত্যাক্ষতঃ জ্ঞা তন্ত্রা ক্রমশঃ সন্দর্ভাঃ ১৩

সদর্ভাঃ যৌবিনো য়েহ কামুকবৌবনবিদ্যে ১৪" (হ—পু ২১।৪৬)

বসন্তসেনা হুটী নৃত্য (৪) আরম্ভ করিলেন।

এই নৃত্য-সময়ে চারুদত্তের সহিত বসন্ত-সেনার প্রথম পরিচয় হইল। উভয়েই সর্ববিধ কলাবিদ্যার হুচতুর। নৃত্য-গীত-ভঙ্গীর দ্বারাই উভয়ে আপন-আপন কলা-বিদ্যার অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বসন্তসেনা অঙ্গুলি দ্বারা বিকাশের পূর্জাবহার জাতি-কুহুম-মূহুরের অভিনয় করিলেন। তাহাতে কয়েকজন সভ্য সাধুবাদ দিলে চারুদত্ত বিকাশ-কালজ্ঞ মালাকরের ইঙ্গিত করিলেন। বসন্তসেনা অকূট অভিনয় করিলে চারুদত্ত নথরজনকারী নাপিতের ইঙ্গিত করিলেন। সুবিজ্ঞ সভ্য-গণ তাহাতে প্রশংসাবাদ করিলেন। পরে বসন্তসেনা কৃকিদেশের ভঙ্গীক্রমে গো ও

মক্ষিকার অভিনয় করিলে সভ্যগণ সাধুবাদ দিলেন। তাহাতে চারুদত্ত গো-পালের ইঙ্গিত করিলেন। তখন বসন্তসেনা ঐত্যা হইয়া হাবভাব দ্বারা মনোপত অভিশ্রাব প্রকাশ করিয়া নিষেধ অঙ্গুলি-শব্দ দ্বারা চারুদত্তকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। তাহার পর বসন্তসেনা সমগ্র লোকের সম্মুখে অহুহাগ-বশে চারুদত্তের সম্মুখে আনিয়া মনোহর নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৫)

জিনসেন চারুদত্তকে সজ্জিত ও জৈন-ধর্মাবলম্বী করিয়াছেন। চারুদত্তের উপা-ধ্যানের মধ্য দিয়া জৈনধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন তাহার উদ্দেশ্য। কাজেই তিনি যখন চারুদত্তের চরিত্র অঙ্কিত করিলেন তখন প্রথম হইতেই চারুদত্ত শাস্ত্রাহুয়াগী ও স্ত্রীবিবধে পরাচ্ছূণ ছিলেন ইহাই দেখাইলেন।

(৪) "হরিবংশপুঙ্খাণে"র দ্বিতীয় অধ্যায়ের নৃত্য নৃত্যের অর্থ করা হইয়াছে "হু"তের উপর নাচ"। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। হুটী একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীর নৃত্য। তরতরুত মাটাশায়ে উহার এইরূপ লক্ষণ দৃষ্টি হইয়াছে :—

"কুচিতং পাদমুংকিপ্য ভাস্করঃ অসারয়েৎ।

পাতয়েচ্ছাত্রাংযোগেন সা হুটী পরিকর্ষিতা।"

(নাট্যশাস্ত্রম্ । ১০ম অধ্যায়ঃ । শ্লোকঃ ৩২—৩৩)

(৫) "হুটিনাটকমুদ্রাং সা জাতিমূহুরাঙ্গলিম্।

যাক্ষিতং প্রদিকাপাং আক্ এণ্ডেগ্ মূহুরেগ্ ৬।

মহুৎকারে অমুৎকারে তা কৈশিং সাহিত্যবর্ণিতঃ।

যথা বিকাশকালজ মালাকারত যোজিৎ ৩।

তত্তা বন্তে হুৎগুপ্তিগ্রন্থেই তিবন্তে কুতে।

• নাপিতস্ত যথা বন্তে নথমণ্ডলশোভিতঃ।

কৃক্বের্গেমিকাকারাত হুৎগাসাভিনয়ে কুতে।

পূর্ববৎ তৈঃ কুতে আত্মগোপালত যথা পুনঃ।

হাবভাববিবেকত যাক্ষিকাসা ৫ সম্ভ্রতি।

মহুৎকারমণ্যং ঐত্যা যাক্ষলিকোটাকারিনা।

ততঃ সর্বত্র লোকস্ত পজ্ঞতে। যম সমুপম্।

দনাত নাটকং হারিসাধুগণবণা ৮ সা। (হ—পু। ১১। ৪৪—৪৫)

অস্তের কোমলে তাঁহার মতিভ্রংশ হইল, মোহে পড়িলেন এই বৃত্তান্তই সন্নিবিষ্ট জিনসেন ইহাই একটিত করিতে হইয়াছে।

যুদ্ধকটিকে কিন্তু সে ভাব নাই। যুদ্ধকটিকে যে যুগের চিত্র বিস্তরমান তাহাতে নাগরিকগণের বারাদনার সহিত প্রথম দ্বন্দ্বীয় ছিল না। থাকিলে বসন্তসেনা আসিয়া চাকরদের গৃহে রাজি বাপন করিতে পারিতেন না। নাটকশেষে চাকরদত্ত-পত্নী ভূতা বসন্তসেনাকে ‘ভগিনী’ সোধোন করিতেন না। রাজ্য আর্ধ্যক ও বসন্ত-সেনাকে ‘বধু’ আখ্যা দিতে পারিতেন না।

কাজেই শূদ্রক বিনা সঙ্কোচে চাকরদত্ত ও বসন্তসেনার অহুরাগ-চিত্র আঁকিত করিয়া গিয়াছেন। এ অহুরাগ যে সামাজিক হিসাবে নিম্ননীর বা নৈতিক হিসাবে চুট ভাংগ কিছুমাত্র আভাস নাটকের কোনস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভ্রাক্ষণ মন্দের দূত হইয়া বসন্তসেনার গৃহে বাইতেছে। সেখানে পানাহার করিতে কেহ তাহাকে অহুরোধ করে নাই বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে। একান্তেই চাকরদত্ত ও বসন্তসেনা পরস্পরের প্রতি অহুরাগের পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু জিনসেন যে সময় হরিবংশপূরণ রচনা করিলেন তখন সামাজিক অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। বারাদনা-গৃহে পমন, বারাদনার সহিত প্রথম সর্ব্বদা নিম্ননীর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই জিনসেনের কাহিনীতে চাকরদত্ত সতর্কিত হইয়াও দাতুল রত্নদত্তের কোমলে বসন্তসেনার

এতদ্বির একরূপ বর্ণনার আরও একটি কারণ আছে। জৈনধর্মে ব্রহ্মচর্যের মহিমা বিশেষরূপে কীর্ণিত। নিম্নপত্নী বাতীত অত্র রমণীতে অহুরাগ ত বর্ণিত বলিয়া কীর্ণিত হইয়াছেই, অধিকন্তু নিম্নপত্নী বিষয়েও অত্যাসক্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। জিনসেন জৈনধর্ম্মতত্ত্বের একটনকল্পেই হরিবংশপূরণ রচনা করিয়াছেন। তাই বসন্তসেনার প্রতি চাকরদত্তের অহুরাগ তিনি অহুরোধন করিতে পারেন নাই। উভয়ের অহুরাগোৎপত্তি, ও পরস্পরের সহিত বক্ষ্যমাণ ব্যবহারও জিনসেন এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

নৃত্যাবগানে বসন্তসেনা অগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও তথার কাতরভাবে যাতার নিকট এইরূপে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন :—“না ! এ জীবনে চাকরদত্ত ভিন্ন অত্র কাহাকেও আমি প্রার্থনা করি না। তুমি চাকরদত্তের সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও।”

তাহার মাতা কস্তার অভিপ্রায় অবগত হইয়া চাকরদত্তের সহিত তাহার মিলন ঘটাইবার জন্য দান-মানাদি দ্বারা ভূট করিয়া রত্নদত্তকে নিযুক্ত করিলেন। রত্নদত্ত একদিন এক কোণশ করিলেন। চাকরদত্তকে লইয়া গৃহে বাইতে বাইতে সমুখে ও পশ্চাতে দুইটি হস্তী উত্তেজিত করিয়া তাহাদের পীড়নাশঙ্কাতেই যেন ব্যস্ত হইয়া চাকরদত্তকে লইয়া বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্বে হইতেই কলিঙ্গসেনাকে

সঙ্কেত করা ছিল। তিনি উত্তরকে দ্বাগত
বাক্যে আহ্বান করিয়া আসনদান প্রভৃতি
অভ্যর্থনা করিলেন। (৬)

তথায় রক্তদত্ত কলিঙ্গসেনার সহিত
দ্যুতক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীড়ায় রক্তদত্ত নিজ উত্তরীর পণ
প্রাধিকার্য্য ছিলেন। কলিঙ্গসেনা সেই উত্তরীর
জিত্তিয়া লইলেন। তখন চারুদত্ত রক্ত-
দত্তকে সরাইয়া নিজে কলিঙ্গসেনার সহিত
দ্যুতক্রীড়া করিতে উদ্যত হইলেন। তখন
দ্যুতক্রীড়ানিপুণ বসন্তসেনা নিজ মাতাকে
সরাইয়া চারুদত্তের সহিত দ্যুতক্রীড়া করিতে
লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে
চারুদত্ত অত্যন্ত পিপাসিত হইলেন।

তখন বাহাতে মতিভ্রংশ হয় এইরূপ ভ্রূগন্ধি
শীতল শলিল চারুদত্তকে পান করিতে দেওয়া
হইল। অতি বনিত্ত আলাপে বসন্তসেনার
প্রতি চারুদত্তের অহুসার উৎপন্ন হইলে
কলিঙ্গসেনা চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার
পানিগ্রহণ করাইলেন। (৭)

প্রাচীনকালে এইরূপ প্রথা ছিল।
বাংলাদর্শন-রচিত কামহুত্রে ইহার উল্লেখ
পাওয়া যায়। ইহা একরূপ চুক্তিবদ্ধ
মিলন। একটা নির্দিষ্ট কালের অন্ত
বারাঙ্গনাদের এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল।

এই অহুসারোগোৎপত্তির বর্ণনাতেও চারু-
দত্তকে কোষলে পানীয় পান করাইয়া
মোহিত করা হইল এই কথায় বর্ণিত
হইরাছে। এ অহুসার যে কেবল মোহমাত্র,

(৬) "উপলব্ধতত্ত্বাঃ ১ নিম্নমাস্যবর্জিনী।

বমাক্রেহ কথংবদ্যধমিতি সা কত্ৰকাতুরা।

ইহ লক্ষ্যমি যে মাত-চারুদত্তাৎ পরত ব।

সকলন্তেন তেনাঃ মাং যোগদিত্তুর্ঘর্ষনি।

মাতা জায়া মতচিত্তঃ চারুদত্তত যোগদে।

দানবানাদিনাত্যর্জ্য কত্ৰহতমযোগদে।

তেন চাহুসারেন পুষ্ঠিতস্তাত্তঃ পথি।

পলৌ এবোজ্য তবোক্তবেদ্য জাতু এবেশিতঃ।

কৃতদত্তেতয়া পূর্বে কৃতঃ কলিঙ্গসেনা।

বাগতাসদ্যমাদৈকরূপচারোহ জ চাংগোঃ। (২-পু।২১।২০-২০)

(৭) "দ্যুতে তস্মোত্তরীরক কৌরবজঃ জিতঃ তয়া।

ততোহ হুত্বভোতঃ রক্তদত্তস্যার্থ্য্য জমোতয়া।

বসন্তসেনা দ্যুতাবপলার্থ্য্য যথাভরত।

কৃত্য চুরোবরকীড়া ময়া সহ বিদ্যত।

আদরুত চিত্রঃ তত্র পারিতোহ তিপিপাসিতঃ।

মতিমোহনুবোধেন বাসিতঃ নিশিরোরমস্ব।

অতিবিসভজতস্তানদুরাসে সমোদ্যতে।

কর মুহুৎবেততা মমতা কারিতোহ শ্রাহম্। (২-পু।২১। ২৫-২৬)

তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জিনসেন এ স্থলেও সতর্কতা অবলম্বনে অববহিত নহেন।

গজতাজনা মুচ্ছকটিকেও আছে। তবে সেখানে ব্যাপারটা অল্পরূপ। বসন্তসেনার ভ্রাতা কর্ণপুরক একটি উদ্ভূত গজের আক্রমণ হইতে একজন পরিব্রাজককে রক্ষা করাতে চাকরন্ত তাহাকে নিজ উত্তরীর পুরস্কার দেন। এই উত্তরীর একবার বসন্তসেনাকে দাসী ভাবিয়া চাকরন্ত ধরিতে দিরাছিলেন। কর্ণপুরককে পুরস্কৃত করিয়া বসন্তসেনা চাকরন্ত-প্রদত্ত উত্তরীর তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করেন।

জিনসেনও একটি উত্তরীরের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তবে এ প্রসঙ্গ অল্পরূপ।

দ্যুতক্রীড়া মুচ্ছকটিকেও আছে। তবে ক্রীড়ক সেখানে অল্প লোক। কিন্তু চাকরন্ত যে দ্যুতক্রীড়া করিতেন তাহার উল্লেখ মুচ্ছকটিকেও পাওয়া যায়। বসন্তসেনার অলঙ্কার অপভ্রুত হইলে চাকরন্ত মিথ্যা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি দ্যুতক্রীড়ার সেগুলি পণ করিয়া হারিয়াছেন। 'একজন বসন্তসেনা পরে রত করিয়া চাকরন্তকে 'কুয়ারী' বলিয়াছিলেন। দ্যুতক্রীড়া প্রাচীনকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। জিনসেন কিন্তু এ ক্রীড়ার সমর্থন করিতে পারেন না। তাই তিনি অনিষ্টকর দ্যুতক্রীড়ার রত হওয়াতে চাকরন্তের মতিভ্রংশ হইল এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

তাহার পর দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া চাকরন্ত বসন্তসেনার গৃহে বাস করিলেন। পিতা, মাতা, পত্নী মিত্রবতী সকলকে তুলিয়া গেলেন; অল্প কার্যের ত কথাই নাই। চুর্জন কর্তৃক সজ্জন বেদন আচ্ছন্ন হন পূজনীয় ব্যক্তিগণের দেবদ্বারা চাকরন্তের যে সকল গুণাশি বর্ধিত হইয়াছিল, রমণী-সেবার উপজিত দোষ দ্বারা সে সকল সেইরূপই আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কলিঙ্গসেনার গৃহে চাকরন্তের বোড়শ কোটি বর্ষ প্রতি হইল। শেষে চাকরন্ত-পরী মিত্রবতীর অলঙ্কারও তথায় গেল। তাহা দেখিয়া মন্ত্রনিপুণ্য কলিঙ্গসেনা একান্তে বসন্তসেনাকে বলিলেন, "বাছা! তোমার ভালর অল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে গুহর বাক্যামৃতরূপ মন্ত্র সবা অত্যাগ করে, সে কখন অনর্থ পড়ে না। তুমি জান, আমাদের জীবিকা কি ভ্রমর। যে অর্থশালী, সেই আমাদের প্রিয়। অর্থহীন ব্যক্তি রসহীন ইক্ষু বা অলঙ্কারের জ্ঞান আমাদের রূপ। চাকরন্তের পরী নিজেই অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি করুণাবশে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি। হুতরাঃ এই গৃহীতসার চাকরন্তকে পরিত্যাগ কর। রসপূর্ণ নব ইক্ষুর জ্ঞান ধনবান অল্প পুরুষের ভজন্য কর। (৮)

বসন্তসেনার কর্ণে যেন শেলাঘাত হইল। তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া মাতাকে

(৮) "বসন্তা ভক্ত-ব্যাধি ময়া দ্বাদশ বিম্বতো।

পিতরৌ মিত্রবত্যো কাথোৎকল্লীকা কথা।

কুন্ডসেবাবিবুধা যে গুণাতরপিসেবয়া।

দোষেরপতিতশ্চক্ষুঃ শজ্জা ইব চক্ষুঃ।

বলিলেন, “মা! তুমি কি বলিলে? আমি অচুশীলনকারী, দ্বাতা সেই চাকরদত্তকে আমি বহুদিনসেবিত কৌমার-পতি চাকরদত্তকে কিরূপে ত্যাগ করিব?” (৯)

পরিচ্যোগ করিয়া কুবেরকেও চাহি না। মুচ্ছকটিকে চাকরদত্ত বসন্তসেনার প্রতি অস্ত্রের ত কথাই নাই। নাথ চাকরদত্তের অহুহুত বটে কিন্তু সে অহুহুত তাঁহার বিহনে প্রাণবিরোগ হইবে। না! যদি আমার জীবন তোমার প্রিয় হয়, তাহা পত্রীকে ভুলাইতে পারে নাই। মুচ্ছকটিকে চাকরদত্তের সহিত যখন বসন্তসেনার সাক্ষাৎ, তখন চাকরদত্ত দ্বিতীয়। স্মৃতরাং ঐ অবস্থায় চাকরদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অহুহুত চাকরদত্তের স্তবধনতঃই উৎপন্ন হইয়াছিল বলিতে হইবে। বিনসেনের উপাখ্যানে বসন্তসেনার গৃহে চাকরদত্তের সঞ্চিত সমস্ত বিভার পারদাম্বী, অতিশয় রূপবান, সঙ্কল্পের অর্থ আগত হইল। পত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত

স্বর্ণযোড়পকোটিসু-প্রবিষ্টাঃ নিম্নঃ পৃহন্ ।

পুটী কাসিনসেনাভ্যে বিজ্ঞবত্যাঃ বিকৃষন্ ।

অগৌ বসন্তসেনাঃ ভাবনাক্ষেত্রে ময় কোথিলা ।

দ্রুতিভর্জিতভাব্যে কর্ণে স্বচনঃ কুল ।

তত্বাভ্যাসুতঃ ময়ঃ সত্যভ্যাসুতি যো জনঃ ।

তদনর্থ পুহাদুঃ কৌকণ্ডে ন কথ্যচন ।

অন্যাত্তেঃ অত্যাঃ নো বৃত্তিবিভিন্য়ান্ শ্রিয়ঃ ।

হেতঃ পুণিতদারঃ স্তাবিকুলকতবহঃ ।

তদুল্লসনভারঃ চাকরদত্ত ভাব্যতা ।

শ্রেণিতঃ শ্রেণাকান্ত্যাদ্ যামল্গমহঃ পুনঃ ।

তদন্ত পিতৃদত্ত কুল তাবধিবোক্তনন্ ।

সাহবহঃ ময়ঃ কস্তঃ নবকুমিঃ কস্তঃ (৪—পূ-১৩১৫২—৬৬)

(৯) “পত্নীবেদ ততঃ কর্ণে ভাঙিতা সাঃ ত্রিপিঙিতা ।

অগৌ মাতরঃ মাতঃ কিনিং পদিতঃ বত্ ।

কৌমারঃ পতিমুচ্ছবি। চাকরদত্তঃ চিরোদিতঃ ।

কুবেরপাণি যো কাণঃ নেথরেন পয়েন কিত্ ।

শ্রোণৈরপি হি মে মাপ্যাক্ষরতো বিবোজ্যৈঃ ।

বৈবঃ বেতঃ পুনর্মার্তণি মে জীবিতঃ শ্রিয়ন্ ।

পুণিতঃ কোটিনো দ্বায়ৈপৃথঃ তে তদ্বপুহাণতঃ ।

তথাপি তদ্বিহালাভূবকৃত্য হি বোধিতঃ ।

কলাপায়মিত্যাক রূপাভিনয়যোগিণঃ ।

সদ্বর্ধনিনো মেঃ স্ত ভাভ্যাপজ্যাদিনঃ কৃতঃ (৪—পূ-১৩১৫১—১১)

পেবে আসিয়াছিল। ইহা হইতে বসন্তসেনার জননীৰ ধনশোভা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তবে চারুদত্ত-পত্নীর অলঙ্কার প্রত্যর্পণে কলিঙ্গসেনার কিছু উদারতা প্রকটিত।

নির্ধন চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অমূরাগ জিনসেনের কাহিনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। এই অমূরাগই বসন্তসেনার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। মুচ্ছকটিকে রাজসভালক সংস্থানক দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার প্রেরণ করিয়া শকট পাঠাইলে বসন্তসেনার মাতা বসন্তসেনাকে সংস্থানকের নিকট বাইতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে বসন্তসেনা মাতাকে জানাইয়া ছিলেন “যদি আমাকে জীবিত দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে আর কখনও এতদূর আজ্ঞা করিবেন না।” (১০) জিনসেনের উপাখ্যানেও বসন্তসেনার ঠিক এইরূপ উক্তি বিদ্যমান। বারাসনা হইলেও প্রণয়ীর প্রতি গাঢ় অমূরাগ, অর্ধের প্রতি নিম্নহতা উভয়ই সমানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা যখন চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিতে সন্মত হইলেন না, তখন কলিঙ্গ

সেনা বুঝিলেন যে বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হইয়াছে। হস্তান্তর তাহার মতেই মত দিয়া উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপবেশন, শয়ন, ঘান, ভোজন সকল সময়েই উভয়কে একত্র দেখিয়া একদিন যোগ দ্বারা উভয়কে নিম্নিত করা ইহা রাতিকালে চারুদত্তকে গুহ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (১১)

চারুদত্ত তাহার পর গৃহে কিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা নাই। তাঁহার মাতা ও পত্নী তাঁহাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন চারুদত্ত অর্ধোপাধ্বন অভিলাবে পত্নীকে অলঙ্কার মূল্যদান করিয়া বাগিন্ধ্য বাপদেশে উদ্যোগবর্ত্ত দেশে গমন করিলেন। (১২)

ইহার পর চারুদত্তের বহুবর্ষখাপী ক্রেশ, অর্থনাশ, মনস্তাপ প্রভৃতির কাহিনী জিনসেন কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বাগিন্ধ্য প্রাপ্ত চারুদত্ত যে সকল অদ্ভুত বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার সহিত আরো উপজ্ঞান বর্ণিত সিদ্ধবান নাথিকের বিপদ উপমিত হইতে পারে। চারুদত্তের দুই একটি বিপদের

(১০) “জই যঃ স্ত্রী স্ত্রীঃ ইহুসি, তা একং ৭ পুণ্যে স্ত্রীয়া আরাবিধিকা।” (মুচ্ছকটিক, চতুর্থোঃ)

(১১) “অত্যাসক্তাবিত্তি স্ত্রীয়া কৃৎ তৎস্ববর্তনং।

চিহ্নরঞ্জী দ্বিতোপারম্যবয়োঃ সা দিবোজনেঃ।

আসনে লগনে মানে ভোজনে চাপি দ্ব্যকোঃ।

যোগেননাযুক্ত্যৌ নিত্ৰামহং যাতৌ বহিষ্কৃতঃ।” (৪—পূ। ১২। ৭২—৭৩)

(১২) “নিত্ৰাপানে গৃহ্য পত্নী তর্জুনিক্রান্তঃ পিত্রীং।

অপক্ক মাতঃ স্ত্রীং তর্জুনী কৃত্তরোহনীং।

ভতঃ কৃত্তরোহনীং প্রিয়ারস্বতীং হতঃ।

উদ্যোগবর্ত্তন্যাত্যো মাতুলেন বহিষ্কৃতঃ।” (৪—পূ। ১২। ৭৪—৭৫)

কাহিনী সিদ্ধবানের দুই একটি কাহিনীর সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থে কেবল বসন্তসেনা চরিত্রের আলোচনা মিলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গে বিরত হইলাম।

কিন্তু চারুদত্ত যখন বহুবর্ষ পরে প্রভূত ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন তখন যে দৃষ্ট দেখিলেন তাহাতে তিনি বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। দেখিলেন—বসন্তসেনা তাহার গৃহে। শুনিলেন যে তাহার বিশেষ গমনের পর হইতেই বসন্তসেনা আসিয়া তাহার মাতার সেবা করিতেছে। জিনসেন দুইটি পংক্তিতে মাত্র এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (১০) বসন্তসেনা চারুদত্তবিরহে তাহার অতুল প্রেমা ও অনুভূতি পরিচায়ক করিয়া আসিয়া যে চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইলেও একমনে নিজের জীবন এই সেবাত্তেই উৎসর্গ করিয়াছে, এ কথা এই দুই পংক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। জিনসেন শেষটা বসন্তসেনার প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। জিনসেন যেরূপভাবে কলিঙ্গসেনার বারাসদাশ্রয় অর্থপ্ররিতা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বসন্তসেনার উপরও আশাবাদের দৃষ্ট সন্দেহ হইতে পারিত যে, সে-ও যুগ্ম প্রথমে অর্থলোভেই চারুদত্তের অহুসাগিনী হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু জিনসেন দেখাইয়াছেন যে নৃত্যকালে চারুদত্তের কলাশাস্ত্রে অস্তিত্বতাই বসন্তসেনার অহুসাগো-দীপন করিয়াছিল, অর্থলোভের সহিত এই

অহুসাগের কিছুমাত্র সংযোগ নাই। নির্ধন চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অবিচল আসক্তি হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে প্রণয়ীর প্রবাসে, বহুবর্ষ-ব্যাপী অদর্শনে, প্রেমীর আঁকিত আঁখি না তাহাও যখন সম্মোহের স্থল, তখন তরুণ যৌবনে সুধৈর্য্য ছাড়িয়া, রূপতে একমাত্র আপনায় বলিয়া পরিচিত মাতাকে পরিচায়ক করিয়া প্রণয়ীর গৃহে পরিচর্য্যাসুতি অবলম্বন করিতে বসন্তসেনার চরিত্র জিনসেনের তুলিকাতেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষে এই অহুসাগ-প্রাবল্যে, নিচাবাহুল্যে মোহিত হইয়া জিনসেন লিখিয়া গিয়াছেন, চারুদত্ত প্রীত হইয়া বসন্তসেনাকে গ্রহণ করিলেন। বসন্তসেনা নিশ্চয়ই তখন চারুদত্তের পরিবারভূক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মুগ্ধকটিকে ও জিনসেনের উপাখ্যানে দুইটি বিষয় অবিকল একই দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তসেনার গাড় অহুসাগ ও আসক্তি ও শেষে চারুদত্ত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া তাহার পরিবার মধ্যে স্থান-লাভ ইহা উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে। তবে মুগ্ধকটিকে অতি নিপুণ তুলিকার বসন্তসেনার অহুসাগের পরিচয় এদিক হইয়াছে। চারুদত্তের চিত্র-দর্শন ও উত্তরীর-স্পর্শে সন্তোষ, চারুদত্তের কৃত্যের প্রতি স্নেহ, চারুদত্তের পুত্রকে আপনায় করিতে নিজের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন প্রকৃতি সুসু-ব্রহ্ম কত ঘটনার দ্বারা মুগ্ধক বসন্তসেনার অহুসাগ হুটাইয়া

হুলিয়াছেন। কিন্তু জিনসেন সে প্রয়াস পান নাই। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য অস্ত-
রূপ। বসন্তসেনার প্রশংসা-কাহিনী মুছেকটিক
নাটকের প্রধান বস্তু। কাজেই এই বস্তুকে
জীবন্তভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে উপ-
স্থাপিত করিবার জন্য চরিত্রগুলির যেরূপ
উদ্বেগ প্রয়োজন তাহাতে শূন্যক বিশেষ
কৃতকার্য হইয়াছেন। জিনসেন নিজ উপা-
খ্যানে এ অংশ বিশদভাবে দেখাইতে অভিলাষী
ছিলেন না। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়
জৈনধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা, তাহা চারুভক্তের
ক্লেশবহুল বিদেশে স্থাপিত জীবনের ঘটনা-
গুলি দ্বারা সাধিত হইয়াছে। চারুভক্তের
বিদেশ-গমনের ছেতু উল্লেখ করিবার জন্যই
বসন্তসেনার কাহিনী আরম্ভে সংযোজিত
হইয়াছে। কিন্তু যে অল্পপরিণয়ে জিনসেন
বসন্তসেনার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,
তাঁহার মতোই বসন্ত সত্ত্ব তিনি বসন্ত-
সেনার পাণ্ড অস্তুরাশের পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট
হইয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে বারম্বার চরিত্রে
সদৃশ্যের উল্লেখ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া
যায়। এতাদৃশ চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি
অতি অল্পই আছে। প্রাচীন কিম্বদন্তীতে
বোধ হয় বসন্তসেনা চরিত্রের এই বিশেষত্ব
প্রচলিত ছিল—গম্ভীর আত্মল কার্যনিক না
হইতেও পারে। এই কিম্বদন্তী অবলম্বন
করিয়া পরে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে
গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। সুখের বিষয়
তাঁহাদের সকলেরই সহানুভূতি বসন্তসেনার
দিকে। শূন্যক মুছেকটিকে বসন্তসেনার যে
অল্পম আলেখ্য বিস্তার করিয়াছেন, জিনসেন
হরিবংশ-পুরাণ মধ্যে ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত
কাহিনী সরিষিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও
সে চিত্রে কলরবেশা পাত করিতে উদ্বৃত্ত
হন নাই। জিনসেনের জ্ঞান জৈনাচার্যের
পক্ষে ইহা কম উদারতার পরিচায়ক
নহে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

আলোর আলো

সূত্রপাত

এক

বাহলার ভিত্তে, সাতাশেতে দিন। সন্ধ্যার
সুখে বৃষ্টি ধরিয়া আকাশটা একটু পরিষ্কার
হইয়াছে। এই সুযোগে বাহনলাল আর
হয়েন্দ্রনাথ বিকালের বেড়ানো শেষ করিয়া
বাড়ী ফিরিতেছে।

বাহন আর হয়েন, দুজনে সমবয়সী ও

অস্তরঙ্গ বন্ধু। বাহনকে দেখিতে বেশ
সুখী, তাহার গুং করসা, দুখলোখ মানানসই,
একহাতা ছিপছিপে চেহারা, কোমল কণ্ঠ,
বিনীত ভাব-ভঙ্গী। কিন্তু হয়েনের চেহারা
ঠিক তাহার বিপরীত। শরীর সে ছয়ফুট,
মস্ত চওড়া তাহার বেহ, চ্যাটালো বুক,
পায়ের পেঙ্গিঙলা খেন লোহা-ধরা বাধানো।

সে পা কেসে জোরে-জোরে, কথা কর জোরে-জোরে, হঠাৎ হাসিলে কাছের লোক চম্কাইয়া উঠে।

মোহন ধর্মীর সন্তান; তাহার পিতা কলিকাতার একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, সেও ডাক্তারী পড়িতেছে। চরেন তাহার সহপাঠী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে।...

রাত্তার চটুটে কাষায় জুতা বসিয়া বাইতেছিল; মোহন বিরক্ত হইয়া বলিল, “বেধ-বিকিন চরেন, এ না-ভল না-হুল,—জলচর কি স্থলচর কোনপ্রকার জীবের পক্ষেই রাত্তার এই অবস্থাটা—”

“—আরামপ্রদ নয়। কিন্তু গাড়ী-চর জীব, ঈরা গরিবকে দশহাত তফাতে রাখতে চান, তাঁদের সুবিধের ভুলেই অগতে কর্দমের সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার কর্দমাজ পথে যখন বর্ষা-রবে তাঁদের মোটরের স্রবর্ণ-চক্র ঘুরতে থাকে, তখন কাষা ছিটকোবার আগেই বিশ্রী গরিব-বেচারীরা মানে-মানে আপনা থেকেই তফাতে ছিটকে পড়ে! আরে মলো, কি আপন! মোহন, সর—সর—!”

বলিতে-বলিতেই একখানা গাড়ী তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু অল্পদূর গিয়াই থামিয়া পড়িল।

গাড়ীর চাকার কাষা ছিটকাইয়া দুইবছর জামাকাপড় চিমিচিমি করিয়া গিল। মোহন নীরবে গা-হইতে কাষায় ছোপ বতটা সম্ভব কাড়িয়া কেলিতে লাগিল; হরেন কিছু-মহা কান্না হইয়া গাড়ী এবং তাহার চালক ও আরোহীর উদ্দেশে অনেকগুলি শব্দ অভিশাপ বর্ষণ না-করিয়া ধামিকত পারিল না।

হঠাৎ কে ডাকিল, “ও মশাই, তমছেন! বলি, ও মশাই!”

চমকেনেই মাথা তুলিয়া দেখিল, গাড়ীর ভিত্তর হইতে দুখ বাড়াইয়া এক বেড়কেশ বৃদ্ধ হাত-নাড়িয়া তাহারিগকেই ডাকিতেছেন।

মোহন বলিল, “কি যে, আবারের ডাকে যে!”

হরেন চটিকা বলিল, “চুলোর বাক সে!”

মোহন বলিল, “আজ্ঞা, কুহি পাড়াও, আমি এগিরে বেধে আসি ব্যাপারটা কি!”

মোহন গাড়ীর কাছে গিয়া পাড়াইয়া-মাত্র ভিত্তর হইতে বড়ালোকটি বাহিরে নামিয়া আসিলেন; বলিলেন, “মশাই, ভারি মুকিলে পড়ে গেছি! গাড়ীখানা ভীষের মত কোথা দিয়ে যে কোথায় এসে পড়ল, কিছু তাঁহর করতে পারছি না!”

লোকটির রকম-সকম দেখিয়া মোহন মুগ্ধল, ইনি কলিকাতার বাসিন্দা নন। সে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কি ধরকার?”

বৃদ্ধ বলিলেন, “এখানে পরগুদিন এসে একখানা বাড়ী ভাড়া করে গিয়েছিলুম, আর আজকে সে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছি না। হুতরাং—বৃদ্ধেই পারছেন?”

মোহন বলিল, “রাত্তার নাম আপনার মনে আছে?”

বৃদ্ধ বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য, তা আর মনে নেই? হরিবাবুর গলি।”

মোহন বলিল, “ও! বুকেছি।”—সে বৃদ্ধকে কৌনদিক-দিয়া বাইতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিল।

বৃদ্ধ বাড়ি বাড়িয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য,

কিছু নবলুন না। সুতরাং—বৃহত্তেট পারছেন?”

মোহন, বৃদ্ধের কথা কহিবার ধরণ দেখিয়া, একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “কি?”

—“অর্থাৎ, আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। আপনি গাড়ীর উপরে বসিয়া করে উঠে বসুন।”

মোহন একটু ইতস্তত করিতেছিল, হঠাৎ গাড়ীর ভিতরে তাহার চোখ পড়িল। অন্ধকারের মধ্য হইতে মৌন মিনতি-ভরা হুখানি উজ্জ্বল নবনের মধুর দৃষ্টি তাহার পানে স্থির হইয়া আছে।

মোহন বলিল, “হরেন, তুমি এগিয়ে যাও—এঁদের পৌঁছে দিবে আমি বাছি।”

হরেন তাহার গা-টিপিয়া চুপিচুপি বলিল, “নিভান্দ্রির স্বপ্নোপ পোলে ছেড়ো না দে।”

—মোহন চোখ রাঙ্গাইয়া বৃদ্ধ কানিয়া বলিল,—“চুপ।”

বৃদ্ধকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া মোহন গাড়ীর চাল হইতে নামিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! এ ত খুব সোজা পথ দেখিচি! অবশ্য আমি কিছুতেই চিনতে পারছিলাম না।”

মোহন বলিল, “আপনি বৃদ্ধি কলকাতা? থাকেন না?”

—“না। আমরা পাড়ারগেয়ে কোক।”

—“আপনার দেশ?”

—“আমাদের দেশ হচ্ছে—”

গাড়ীর ভিতর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে বিরক্ত স্বরে কে বলিল, “বাবা—”

বৃদ্ধ পথমত খাইয়া থামিয়া গেলেন— দেশের নাম বলিতে-বলিতে আর বলিলেন না।

মোহন দুটি কথা বুঝিল। প্রথম, গাড়ীর ভিতরে যিনি আছেন, তিনি বৃদ্ধের কস্তা। দ্বিতীয়, দেশের নাম বলিতে এঁদের যখন আপত্তি, তখন ভিতরে কিছু রহস্য আছে।

গাড়ী হইতে বৃদ্ধের কস্তা নামিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। আসবাব-পত্র নামানো হইতেছে, এমনসময় সুপসুপ করিয়া বৃষ্টি আসিল।

মোহন বলিল, “আচ্ছা মশাই, নমস্কার!” —বলিয়া সে ভাড়াভাড়ি বাড়ীমুখো হইল।

বৃদ্ধ থণ্ করিয়া তাহার একখানি হাত চালিয়া ধরিয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! ছাতা নেই—এ বৃষ্টিতে যাবেন কি করে?”

মোহন বলিল, “এখানে ঝাড়িয়ে থাকুলেও ত ভিজতে হবে।”

বৃদ্ধ বলিলেন, “বাঃ, ভিজবেন কেন, আমার বাড়ীর ভিতরে আশ্রয় না! আমাদের ক্ষেত্রেই ত আপনি এই বিপদে পড়লেন! সুতরাং—”

তখন সস্তার অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। মোহনকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গিয়া বৃদ্ধ ডাকিলেন, “ওমা সরমা, এবিকে একটা লর্ডন দিবে যা ত!”

একটি হারিকেন ল্যাম্প হাতে করিয়া বৃদ্ধের কস্তা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে-আসিতে বলিল, “বাবা, সে অপ্রলোভন চলে গেছেন।—ওমা—”

সিঁতার লগ্নে মোহনকে বাড়ীর ভিতরে

দেখিয়া আলোটা মাটির উপরে উদ্‌-করিয়া
বলিয়া দিয়া সরমা একছুটে দেখান হইতে
পলাইয়া গেল।

কিন্তু মোহনের সাবধানী চোখ, চকিতের
মধ্যেই সরমাকে ডালো করিয়া দেখিয়া
লইল। তাহার চোখ যেন ধাঁধা গেল—
এ যে উদ্‌গীর্ণ চপলা! এমন রূপ ত সহজে
চোখে পড়ে না!

বুড়, মোহনের কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য
না করিয়াই বলিলেন, “এখানে খাবারের
খোকান কোথায় আছে বলতে পারেন?
আজ ত আর রান্না চড়বে না, কিনে খেতে
হবে; হুতরাং—”

উপকার করিবার এমন সুযোগ হাতে
পাইয়া মোহন ভাড়াভাড়ি বলিল,
“আপনাদের একটা ছাতা আমাকে দিন
না—আমি খাবার-দাবার সব এনে দিচ্ছি।”

বুড় কুণ্ঠিতভাবে আরো-দুচারখার না না
করিয়া শেষে একটা ছাতা আনিয়া দিলেন।

মোহন ছাতা লইয়া চলিয়া গেল।

সরমা বাহিরে আসিয়া বলিল, “বাবা,
ভ্রমলোকের উপরে যে অভ্যাচার হচ্ছে!
এই বুড়ি মাথাগ কর্তে আমাদের ক্ষেত্রে উনি
খাবার আনতে গেলেন!”

--“কি করব মা, উনি যে গুনলেন না!”

—“পরশা দিয়েছেন ত?”

—“ওই যাঃ।—কি আশ্চর্য্য!”—মুখখানি
কাঁচুকাচু করিয়া অত্যন্ত অপরাধীর মত
বুড় মাথা চুলকাইতে শুরু করিলেন।

সরমা হাসিয়া বলিল, “দিন-কে-দিন
তুনি যেন কী হচ্ছে! তোমার ছেলেমাছুষী
আর গেল না। বাহোক, উন্নি ফিরে এলে

হিসেব করে পরশা চলো দিবে-দিও?”—তার
পর একটুখানি কি-ভাষিয়া আবার বলিল,
“আজ্ঞা বাবা, আনাধের ত একটা কীরের
ধরকর হবে, ঠকে বললে হয় না? উনি
আনাধের এ উপকারটুকুও করে দেবেন
বোধ হয়।”

—“আজ্ঞা মা, বলে দেখব।”

এমনি-সব কথাবার্তা হইতেছে, এমন
সময় খাবারের চাপারি হাতে করিয়া মোহন
আসিয়া হাজির হইল।

হুই

ভোরবেলা। বৈঠকখানার জানলার
কাছে বসিয়া মোহন, বর্ষাকাল নীল-নির্মল
আকাশের দিকে আনমনে চাহিয়াছিল।
পৃথিবীতে আমাদের চোখের সুখ দিয়া
নিভানুতন লোকের সুখ চলিয়া যায়;
তাহারই মধ্যে আকস্মিক বিশ্বের মত
মাঝে-মাঝে এমন এক-একটি সুখের
আমাদের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে যে,
সেই সুখেরই দেখা আমরা আর সহজে
কুলিতে পারি না। মোহনও কাল পথের
মাঝে এমনি একখানি সুখ দেখিয়াছে, সে
সুখের মোহিনী-যজ্ঞিতে এখনো সে অতিষ্ঠ
হইয়া আছে!

এমনসময়ে হরেন বাহির হইতে ডাকিল,
“মোহন আছ হে!”

—“আছি। ভিতরে এস।”

হরেন হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,
“তারপর!”

—“তারপর মানে?”

—“এও ব্যাখ্যা করতে হবে? তারপর
—অর্থাৎ, কালকের ব্যাপারটা।”

মোহন একটু হাসিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

হরেন নৃসিংহান্না চালে মোহনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, “বাহাদুর, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তত্ত্বলোকের নাম তেনেহ ?”

—“মুরারি-বাবু।”

—“জাতি ?”

—“আমাদেরই।”

—“মুসংবান ! অতঃপর প্রাণপণে সূক্ষ্মরীর চুবর-চূর্ণ অবরোধ কর—আত্ম-সমর্পণ না করলে কিছুতেই ছাড়বে না।”

মোহন কোন জবাব দিল না। একটা সিগারেট ধরাইয়া আন্তে-আন্তে টামিতে লাগিল।

হরেন বলিল, “বেশ ভাল করে দেখে এসেছ ত, নারিকার কপালে সিঁচুর নেই ? ঐ এককোঁটা সিঁচুরের উপরেই কিন্তু সমস্ত নির্ভর করছে !”

—“না, সে আমি দেখেছি।”

—“মোহন, ওঠ—আগ ! জীবনে সুযোগ ছ-বার আসে-না। অনুচা তরুণীর চুবরটা হচ্ছে শিরোনামা-ধীন প্রেমপত্রের মন্তন। একটু চেষ্টা করলেই এ পত্রের শিরোনামার তোমার নাম বসে যেতে পারে !”

—“কিন্তু তুমি যে এখন থেকেই কাল-নেতির লগ্নভাগ হ্রস্ব করে দিলে যে ! কোথাও কিছু নেই, একেবারে বিবাহ ! আর, আমি যে বিবাহ করব, তাই বা তোমাকে কে বললে ?”

—“আরে রাখ, রাখ ! বরস বখন চম্ভিল, প্রাণ তখন শুধুনো খড়ের

গাধার মতন। কাছে আশ্রম আনলে আর কি বাঁচোরা আছে ? খোবনলাভ করে মাহুকের জ্ঞান-চক্ষু ছুটলেই সে সব-চেয়ে যে অজ্ঞানের কাজ করে, তার নাম হচ্ছে, বিবাহ !”

—“সবজাতেরই তোমার হাসি-তামাসা ?”

—“হ্যাঁ। বহু, মাতৃগর্ভ ত্যাগ করেই আমরা যে কান্না শুরু করি, সে কান্না মরণের আগে আর থাকে না। এর মধ্যে যখন অবকাশ পাবে, প্রাণপণে হেসে নেবে। হাসি হচ্ছে জীবনের সার, মাহুকের প্রাণ !”

—“হাসি-তামাসা বরং সওয়া বার—কিন্তু অসময়ে দার্শনিকতার লেকচার—এ একেবারে অসহ ! তুমি থাম।”

—“আমি থামলে, তোমাকে হ্রস্ব করতে হয় যে। একবারে হুন্নে চুপচাপ বসে থাক, দার্শনিকের লেকচারের চেয়েও আরো-বেশী অসহ।”

—“বসে থাকবারই বা সময় কৈ ! কীকে বলে দিয়েছি, সে এখন একটা লোক নিয়ে আসবে, তাকে সঙ্গে করে আমাকে মুরারিবাবুর বাড়ী বেতে হবে।”

—“সেবেত্রে, আমার পক্ষে চটপট উঠে পড়াই হচ্ছে উচিত কার্য।

—“তা কেন, তুমিও চলনা—মুরারি-বাবুর সঙ্গে আশ্রাপ করে আসবে।”

—“এখানে আলাপ মানে বিলাপ।”

• —“কেন ?”

“বহু, একটিমাত্র রসগোলা ছুটি বালকের হাতে দিলে কাড়াকাড়ি হয় ; একটিমাত্র শ্রমশীল ছুটি যুবকের ভাগে পড়লে

কাড়াকাড়ি, আড়াআড়ি এবং ছাড়াছাড়ি
অনিবার্য। অতএব, বিদায়!”

মোহন যখন মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়া
হাজির হইল, তখন তিনি বাহিরের ঘরে
বসিয়া আপনমনে এশ্রাজ্জ বাজাইতেছিলেন।

মোহনের গলা পাইয়া তিনি তখন
বাজনা থামাইলেন। তারপর অত্যন্ত স্নেহভরে
আলুত ভাবে এশ্রাজ্জটিকে শুকনোপেথের
উপরে শোয়াইয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং
তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিলেন, “আহ্নন,
আহ্নন, আমি আপনারই অপেক্ষার ছিলাম।”

মোহন সন্দের দাসীকে দেখাইয়া বলিল,
“এই ত্রীলোকটি আপনার বাড়ীতে কাজ
করবে, একে সব বুঝিয়ে দিন।”

—“কি আশ্চর্য! আপনি একেবারে
সঙ্গে করেই লোক নিয়ে এসেছেন? ভগবান
আপনাকে জুটবে দিয়েছেন, নৈলে আমাদের
কি মুকিলেই যে পড়তে হোত!”

মোহনকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া, মুরারি-
বাবু দাসীকে লইয়া ভিতরে গেলেন।

মোহন দেখিল, ঘরের ভিতরে একটি
এশ্রাজ্জ, একখানি বেহালা ও একটি পাখোয়াজ
রহিয়াছে। যন্ত্রগুলি যে প্রায়ই ব্যবহার করা
হয়, তাহাদের চাকটিকা দেখিলে সেটা
বুঝিতে বেশি হয় না। মোহন আনিত্তে
পারিল, মুরারিবাবুর গান-বাজনার বেশ সব
আছে। ইহাতে তাহারও মন তারি খুশী
হইয়া উঠিল; কারণ সেও ছেলেবেলা
হইতে গান-বাজনা ভালবাসে—আপনার
আত্মবিক মুকুটকে চর্চার দ্বারা সে দারও
মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

মুরারিবাবু ঘরে আসিয়া ঢুকিলে,
মোহন যন্ত্রগুলির দিকে অস্থানিন্দেয় করিয়া
বলিল, “আপনার দেখছি বাজনা-টোজনাও
আপো!”

মুরারিবাবু বলিয়া চলিতে-চলিতে
বলিলেন, “সামাজ্য। গনিয়ার হের-কেরে
মনটা যখন দমে যায়, তখন ঐ এশ্রাজ্জের
সঙ্গে আমি আমার প্রাণের কথা কই—
ও হুধু আমার চুখের পোসর নয়,—হুখের
সমরও ও আমার একমাত্র প্রাণের
সখা!”

মোহন বলিল, “আপনি কি এখানে
একলা থাকবেন, না আর কেউ আসবেন?”

মুরারিবাবু জাননা দিয়া পথের দিকে
তাকাইয়া একটু তারি গলায় বলিলেন,
“কে আর আসবে, কে আর আমার আছে?
আপন বলতে যারা ছিল, তাদের সবাইকে
একে একে চিতার তুলে দিয়েছি, এখন
আছে হুধু ঐ মেয়েটি—তা ও অভাগীর
পাকা না পাকা দুই সমান!”

—“কেন?”

—“সরমা বিধবা।”

মোহন অনেক কষ্টে আপনাকে
সামান্যদারী লইল; এতক্ষণ সে মনে মনে যে
রাগিন ভাব থাকিত্তেছিল, কেঁ যেন তাহার
উপরে হঠাৎ এক-খাবড়া কালি ঢালিয়া
বিল। অত্যন্ত দমিরা গিয়া হেঁটুমাথার সে
চুপ-করিয়া বসিয়া রহিল।

মুরারিবাবুও শুদ্ধভাবে বসিয়া-বসিয়া
আপনার দীর্ঘ দাড়ীর মধ্যে অস্থলি সকালন
করিতে লাগিলেন।

ধানিক পরে মোহন কথা কহিল।

ভাষিতভাবে বলিল, “আহা, এত অল্পবয়সে বিধবা!”

তাহার সমবেদনায় গলিয়া গিয়া সুরারি-বাবু বলিলেন, “বাবা, এ বুড়ার বুক ভেঙ্গে গেছে। আজ যদি আমি বাই, কাল ওর দশা কি হবে,—আমি তাই ভাবি। আমার সরমাকে কে দেখবে? সমাজ হুঁচু খাতি দিতেই জানে, দয়া করা তার ধর্ম নয়!”

মোহন বলিল, “কেন, আপনায় বেধের ষড়ঋত্বাড়াতে কি কেউ নেই?”

—“দে না-পাকারই মধ্যে। জামাইয়ের চাই তাই আছেন, কিন্তু জামাই এখন বর্তমান ছিলেন, তখন-ই তারে তারে সত্তাব ছিল না, স্ত্রীমাং—” সুরারিবাবু হঠাৎ কি-ভাবিয়া ধামরা পেলেন,—মোহন পেটা বুরিমাও কোন কথা কহিল না।

ধানিক পরে একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরারিবাবু অন্তরনতভাবে এম্মাজটি কোলের উপরে তুলিয়া লইলেন। ছড়ির দু-একটি টানে এম্মাজের তারে-তারে যে করুণ সুরের রিকিনী ফুটিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়াই স্নেহজ মোহন বুলিল, বামনায় এঁর অসাধারণ হাত!

এম্মাজ বেন কথা কহিতেছে,—সুরের কান্নার সঙ্গে বাদকের প্রাণের আবেগও বেন ধীরে-ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে! হঠাৎ বামনা ধামাইয়া সুরারিবাবু বলিলেন, “গলাই, বুড়ার বন্ধুবান্ধিতে কিছু মনে করবেন না। মনের দুঃখ হাসি-খুসিতে ঢেপে রাখতে চাই, কিন্তু পারি না—দুঃখ ঠেলে আপনি বেরিয়ে পড়ে।”

—“সুরারিবাবু, আপনায় ভাষে আমি

বাগ্‌বিকই ভাষিত। এতে আমার বিরক্ত হবার কি আছে? এজের দুঃখে যে বিরক্ত হয়, তাকে মাথুব বগে মনে করা চলে না;—মাথুব, মাথুবের কাছ থেকে যদি একটু সমবেদনাও না পার, তাহলে সংসারে আর অরণো তফাৎ কি?”

“আপনায় মত প্রাণ ত সকলের নয় মোহনবাবু! আমার বাথার বাথী হওয়া দুঃখের কথা, অনেকেরই আমার কাটা বায়ে মনের ছিটে বিতে ক্রটি করে-নি”—বলিতে-বলিতে আবার হঠাৎ ধামিরা পড়িয়া সুরারিবাবু কহিলেন, “কি আশ্চর্য! আবার আমি নিজের কথাই পাচকান করছি! ছোঁকরায়া এইজতাই বুড়োদের দুঃখ থেকে নমস্তার করে!”

মোহন স্মৃতিতে পারিতেছিল যে, সুরারিবাবু তাহার কাছ হইতে কোন-একটা কথা গোপিয়া রাখিতে চাহিতেছেন। প্রথম সাক্ষাতের সময় সুরারিবাবু এখন তাহার বেশের নাম বলিতে বাইতেছিলেন, তখনও তাহার কন্ডা গাছাকে সাবধান করিয়া দিগ্‌জিলেন! এইসব নানাকারণে সুরারিবাবুর কথা জানিবার ক্ষমতা মোহনের মনে কেমন-একটা কৌতূহল হইতেছিল। কিন্তু এ অন্তর কৌতূহলকে দমন করিয়া সে বলিল, “আমি কিন্তু আপনাকে কাছ থেকেই নমস্কার করে আজকের মতন বিদায় হচ্ছি।”

নমস্তার করিয়া মোহন উঠিতে বাইতে-ছিল, কিন্তু সুরারিবাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—“কি আশ্চর্য! বড় ভুলে গেছি মোহনবাবু! বড় ভুলে গেছি!”

—“কি ?”

—“আপনার বিদায়ী নমস্কার ত এখনি নেওয়া হতে পারে না মশাই !”

—“কেন ?”

—“সরমা বলে দিয়েছে, আপনাকে সামান্য-কিছু জলযোগ করতে !”

—“জলযোগ ? এসব গোলযোগ কেন মুরারিবাবু ?”

—“কাল আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আজ যদি আমাদের কষ্ট দিয়ে আপনি তার শোধ তুলতে চান, তাহলে যেতে পারেন।”

মোহন একটু হাসিয়া আবার বলিল। মুরারিবাবু খুব খুশী হইয়া বলিলেন, “সরমা একগাটি খাবার তৈরি করছে; একটু বেরি হতে পারে। এটুকু সময় চুপ করে বলে থেকে কি হবে ? হুতরাং—!” বলিয়া, তিনি এগ্রাঞ্জের ভায়ে আবার ছড়ির টান লাগাইয়া দিলেন; হরের মুর্ছনা, তান ও সিটকিরির তিতর বিয়া সিটুটেরবীর মধুর আলাপ মোহনের প্রাপটকে একেবারে মাহু করিয়া তুলিল।

তিন

সেদিন মুরারিবাবুর বাড়িতে জলযোগ করিতে বসিয়া, মোহনের মনে যে চুখ-মিশ্রিত আনন্দের ভাব আগিয়া উঠিয়াছিল, আজও সে তা ভুলে নাই। ঘোমটার মূখ ঢাকিয়া সরমা তাহাকে পরিবেশন করিয়াছিল বটে, কিন্তু পিছনে এলানো কালো কেনের রাশি, টাপাল্লের মতনী গানের কুটু-কুটে রং, মত নেত্রের শাও দৃষ্টির

আভাস—কাপড়ের আবরণে এ-সব কিছুই ঢাকা পড়ে নাই! আর, সেই যে গুথানি ছোট ছোট মনীর মত নরম হাত—যে হাতটুকি খাবারের থালা আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়াছিল, সে হাত-গুথানিও কি সুডৌল, কি সুখী! সেই নখর হাতের ফুলের পাপড়ির মত হুগু-পড়া আবুলগুলি, আবুলের ধরে-ধারে গোলাপী রঙের নখগুলি, এ সবই মোহনের মনে একেবারে ছবির মত গাথিয়া গিয়াছে। সামনে ডাক্তারী বই খোলা রহিয়াছে, ছাপার হরফ আড়ালে করিয়া সেদিনকার ছবি মোহনের চোখের উপর ডাঙ্গিয়া উঠিয়া তাহাকে তন্দ্রা করিয়া তুলিয়াছে! ইহার মধ্যে হরেন আগিয়া কখন যে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—মোহন তালা একটুও টের পাও নাট। হরেন কোতুকভরে থানিকক্ষণ তাহার বিকে চাহিয়া থাকিয়া, হু-করিয়া বলিল—

‘কে যোগেশ্বর, যোগাসনে,

দুগুণ দুঃখনয়নে,—

কাহারে খেরাও ?’

“হ্যাঁ হে মোহন,—ওনতে পাছ কি ? না, তোমার তপোভক্তের মন্তে আবার মদনের সন্ধানে যাত্রা করতে হবে ?”

সচকিতে কিরিয়া মোহন বেপিল, হরেন। হাসিয়া বলিল, “এই যে, তোমার আমি দেখতেই পাই-নি।”

—“বেশতে যে পাবেনা, এ ত থরা কথা !”

—“কেন, কেন ?”

—“কারণ, কিউপিড যে অন্ধ! তুবি এখন ঠারই মনশিখ কি না !”

—“ভাই, ভগবান বে চোখ দিয়েছেন, তা হুহু ছাড়া পিছনদিকে ব্যবহার করা অসম্ভব। তুমি আছ পিছনদিকে, কাজেই তোমাকে বেধতে না পাওয়া আমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব হয়নি।”

—“তোমার মুক্তি অকটা। বাক্ সে কথা। বলত, এ ক-দিন তোমাকে বেধিনি কেন? কলোতেও বাওনি, বাপার কি?”

—“পরীয়াটা তেমন ভাল ছিলনা।”

—“তারপর, ওদিককার খবর কি? আশাভঙ্গক?”

মোহন তিক্তস্বরে বলিল, “ভাই, ও-সব কথা আর ভেবে কাজ নেই।”

—“কেন?”

—“গরমা বিধবা।” মোহন সমস্ত খুলিয়া বলিল।

হরেন শুদ্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বলিয়া রহিল। তারপর বলিল, “বাক্গে, কি আর হবে! বিবাহের আগে মাহু, মাহুই থাকে; কিন্তু বিবাহের পরে সে কেবলমাত্র ‘স্ত্রীস্বামী’তে পরিণত হয়। এ দুর্ভাগা থেকে তুমি বেঁচে গেছ হে!”

মোহন নিরুত্তর হইয়া অন্তমনস্ক ভাবে ভাস্করী বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ধানিক পরে কি ভাবিয়া হরেন বলিল, “আজ্ঞা, মুরারিবাবু কোন্ প্রেস্তার লোক বলতে পার?”

—“তোমার কথার মানে?”

—“তিনি গোড়া হিন্দু, না নবাতন্ত্রের লোক?”

—“সেটা আমি ঠিক করে বলতে পারব না। তবে, এই অন্ন আলাপেই তাঁর মের

আমার সামনে বেরিয়েছিলেন—অবশ্য, বোমটার দৃশ্য ঢেকে।”

—“এতে কিছুই বোঝা গেল না। এমন অনেক লোক আছেন, যারা স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতাকে বোমটার ঢাকনোতেই অক্ষুর রেখে নিশ্চিন্ত থাকেন। বেশ মোহন, তুমি মুরারিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও। দেখা বাক্, তিনি কোন্ মতের লোক।”

—“তাতে লাভ?”

—“মুরারিবাবু নবাতন্ত্রের লোক হলে এখনো তুমি আশা করতে পার।”

—“কি-রকম?”

—“হিন্দুসমাজে এখন বিধবা-বিবাহ অচল নয়।”

—“সে কি?”

—“হ্যাঁ। তোমার মাথার উপর তোমাকে বাধা দেয়, এমন কেউ নেই। অনেকের পক্ষে বা অসম্ভব, তোমার পক্ষে তা খুবই সম্ভব।”

মোহন আনমনে ভাবিতে লাগিল—কিছুই বলিল না।

হরেন বলিল,—“মুরারিবাবু যদি একেলে মতের লোক নাও হন, তাহলেও তুমি তাঁর অঙ্ক পিতৃমোহের উপর নির্ভর করতে পার। তাঁর অবর্তমানে তাঁর মেরের কি হবে, সে ভাবনা তাঁর পক্ষে বড়টা গুরুতর, বিধবা-বিবাহের ভাবনা ততটা নয়।”

—“কিন্তু—কিন্তু, বিধবা-বিবাহের কল কি ভাল হবে?”

—“কেন হবে না?”

এমনি . কথাবার্তা হইতেছে, হঠাৎ

বাহির হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে কে ডাকিল, “বাবু ঘরে আছেন?”

মোচন বলিল, “কে?”

—“আমি মুরারিবাবুদের স্বী।”

মোহন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “ভিতরে এস।”

একটু স্ত্রীলোক উষ্মমুখে বাস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে আসিল। মোচন চিনিল— সেই-ই ইহাকে সঙ্গে করিয়া মুরারিবাবুর বাড়ীতে কাজ করিতে লইয়া গিয়াছিল।

মোহন জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে স্বী?”

—“কি-জানি বাবু, কে একটা লোক মন খেয়ে এসেছে, তার সঙ্গে আর-একটা জ্ঞাত মত লোক, বাবু তাদের যেতে বললেও মজুত না। তাই নিম্নমনি আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন।” সে একখানা কাগজ বাহির করিয়া মোহনের হাতে দিল।

মোহন তাড়াতাড়ি কাগজখানা তাহার হাত হইতে গ্রহণ করিল। পরিষ্কার, ছোট ছোট অক্ষরে সুধু লেখা আছে—

“বড় বিপদ। দয়া করে আসুন।”

মোহন বিস্মিতভাবে হরেনের সুখের দিকে চাহিল।

হরেন তখনই জুতা পরিতে-পরিতে বলিল, “হাঁ-করে চেয়ে দেখছ তি! চল, চল, আমিও সঙ্গে যাব।”

মোহন তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাইবার সময় হরেন ঘরের কোন্ হইতে একগাছা মোটা লাঠি লইয়া গেল।

চার

ওই বন্ধুতে যখন মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়া- হাজির হইল, তখন সন্ধ্যা। মুরারিবাবুর বৈঠকখানার ভিতরে অচেনা গলায় কে বলিতেছিল, “আপনি আমার কথায় কেন যে রাজি হচ্ছেন না, তা ত বুঝতে পারচি না।”

—“কি আশ্চর্য্য! বাপ কখনও এমন কথায় রাজি হতে পারে?”—এ মুরারি-বাবুর গলা।

—“আজ্ঞা, আপনি শু বুড়ে! হয়েচেন, কখন আছেন কখন নেই, আপনি যখন থাকবেন না তখন আপনার ঘেরেকে ত ঘর ছেড়ে পথেই পাড়াতে হবে?”

—“তখন ভগবান আছেন।”

ভগবানের নামে ঘরের ভিতর হইতে আর-একজন কে বাস্তম্ভবে কর্ণশব্দে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহন ও হরেন আর পাড়াইল না—একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। একদিকে মুরারি-বাবু শান্তমুখে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, —আর-একদিকে আর-জন লোক। একজনের চেহারা সৌখীন গুস্ত্রলোকের মত; আর-একজন যেন সাফাং সরতান।

আচম্ভক্য মোহন ও হরেনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহারা দুজনেই পাড়াইয়া উঠিল। ভদ্রবেশী লোকটি বিস্মিত ও বিরক্ত ভাবে বলিল, “কে আপনারা?”

হরেন হাতের লাঠিগাছটা ঠক্-ঠক্ নড়ে ঘরের উপর ঠুকিতে-ঠুকিতে আগাইয়া গেল; আর-গলায় পরিষ্কার করে বলিল,

“আপনারাও না, আমরাও তাই। অর্থাৎ
—এককথা বলতে গেলে, মহাশয়!”

—“এখানে কেন?”

—“তাতে কি মহাশয়ের আপত্তি
আছে?”—বলিতে-বলিতে হরেন একেবারে
তাহার সামনে বুক দুলাইয়া মুখোমুখি
হইয়া পড়িয়াছিল।

হরেনের সেই ছয়ফুট বিশাল দেহ
ও সঙ্গতিত ভঙ্গা দেখিয়া লোকটা খণ্ডমত
বাইয়া ছুপা শিহাইয়া গেল।

হরেন ফিরিয়া সুমারিবাবুকে বলিল,
“আপনারই নাম বোম্বের সুমারিবাবু?”

সুমারিবাবু হতভম্বের মত ঘাড় নাড়িয়া
সার দিলেন। তাহার ভাব দেখিয়া মনে
হয়, তিনি যেন অত্যন্ত উদ্ভট একটা ব্যক্তি
বেধিতেছেন!

—“এরা কি আপনার চেলা লোক?”

সুমারিবাবু ভয়েভয়ে তাহারের দিকে
চাহিয়া বলিলেন, “এরা জোর করে আমার
বাড়ীতে ঢুকেছেন।”

—“সেক্ষেত্রে আমাদেরও উচিত চক্ষে
এদের আবার জোর করেই বাইরে ধার
করে দেওয়া।”

গুণ্ডার বড় লোকটা এতক্ষণ সামনের
দিকে জম্জি খাইয়া, বাঘের মত চোখ
পাকাইয়া বসিয়াছিল। হরেনের কথা
শুনিবামাত্র সে তড়াক করিয়া একলাফে
দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “কী, জোর করে
বার করে দেবে?”

হরেন হির নরে বলিল, “বাবাজী, আগে
আমার কথা শোন, তার পর গত-খুসী
লাকসালি, কোরো। প্রথমত, আমি আজ

আট বৎসর রোজ নিরমমত কুতী লড়ে
আসছি। দ্বিতীয়ত, আমি দুহাতে দু-মণ
করে চারমণ জিনিষ অনায়াসে তুলতে
পারি। আমার কথা সত্যি কি মিথ্যা,
তুমি কি তা পরখ করতে চাও?”—বলিয়া
হরেন, শাস্ত্র ভাবে অথচ তাচ্ছীলোর সহিত
জামার আত্মীন গুটাইতে লাগিল।

লোকটা বোঁৎ-বোঁৎ করিতে-করিতে
সন্ধিৎ দুটিতে হরেনের হাতের ক্ষীত ও লুট
মাংসপেশী দিকে চাহিয়া রহিল। হরেন
বলিল, “মোহন, লাঠিগাছটা তুমি নিয়ে
বেশ করে বাগিরে ধর ত! আমি এদের
দুজনকে চুহাতে ধরে বেয়ালের সঙ্গে চেপে
রাখব, আর তুমি লাঠিগাছটা এদের দেহের
উপর আছা-করে চুকে দেখবে, লাঠিটা
আগে ভাঙ্গে, না এদের হাড়গোড়গুলো আগে
গুড়ো হয়,”—তারপর আগন্তুকদের দিকে
চাহিয়া আবার বলিল, “মহাশয়গণ, আমার
বক্তব্য আপনাদের কর্ণগোচর হয়েছে, আশা
করি। এখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার
আগে আর-একবার আপনাদের সবিনয়ে
জিজ্ঞাসা করছি—আপনারা থাকতে চান,
না যেতে চান?”

হরেনের কথাবার্তা কহিবার ধরণ-ধারণ
দেখিয়া লোকটাই দস্তুরমত ভড়কাইয়া
গেল। তারপর দু-একবার এ-উহার মূখের
পানে চাওয়া-চাওয়ি করিয়া তাহার আন্তে-
আন্তে গুরুমুখে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল।

একটু পরেই স্তম্ভা হইতে নোনা গেল,
“আচ্ছা বাবা, এক পোষে শীত পালায় না
—আমরাও ছাড়ব না, সেখে নেব!”

হরেনও জনিলায় মুখ বাড়াইয়া তাহারদের

শুধাইরা বলিল, “তোমরা ছাড় না ছাড়, এটা ঠিক কোনো যে কের এ-মুখো হলে আমরাই আর তোমাদের ছাড়ব না, চুটি ধরে পুলিশে পাঠাব। এ মপের মুদ্রক নয়, এ কলকাতা!”

বাহির হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মুরারিবাবু এতক্ষণ অবাক হইয়া বলিয়া ছিলেন। এখন উঠিয়া উজ্জ্বলিত ঘরে বলিলেন, “শুধাইরা, আপনাদের আর কি বলব—আপনাদের জন্তেই আজ আমি মানে-মানে বেঁচে গেলুম!”

মোহন বলিল, “এরা কে মুরারিবাবু?”

—“এরা সয়তান, এসেছে জন্তেই আজ আমি বেশছাড়া। কিন্তু এখানেও এরা আমাকে খুঁজে বার করেছে।”

—“মুরারিবাবু, আপনি আমাদের কাছে কিছু লুকোবেন না, আমাদের দ্বিধা আপনার কোন অপকার হবে না। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এরা কেন আপনার পিছনে লেগেছে, আর কেনই-না আপনি বেশ ছেড়েছেন?”

মুরারিবাবু খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিলেন, “আপনাদের কাছে আমি শ্বশী—আপনারা যে আমার বন্ধু, তাও আমি জানি। আমি আর কিছুই লুকোবো না, সমস্তই বলব। কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্য ধ্যকবে কি?”

—“নিশ্চয়। আপনি বলুন।”

পাঁচ

মুরারিবাবু বাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই :—

“আমার বেশ শাস্তিপুরে।

সরমা বখন চার-বছরের, তখন আমার দ্বীপ মুক্তা হয়। সে আজ বোলবছরের কথা।

সরমা আমার বৃদ্ধবয়সের সন্তান—তাঁই বড় আশ্বরের। বিশেষ, সে ছাড়া আমার আর কোন সন্তানও হয়-নি।

এই না-হারা মেয়েটিকে আমি একলা সারা গ্রাম ঘিরে মাদুর করে তুলেছি। পৈত্রিক সামান্য ষা-কিছু পেয়েছি, তাইতেই বেমন তেমন করে আমার সংসার চালিয়ে এসেছি। বড়মাত্রায় করতে পারি না বটে, কিন্তু না-থেরে মরবার ভয়ও নেই।

সরমা আমার রূপে-গুণে লক্ষীর মত। আমি তাকে লেখাপড়া শেখাতেও ত্রুটি করি-নি। ব্রতকরণার কাজ সে নিজে-নিজেই সমস্ত শিখেছে; রাগার তার এখনি হাত বে, শ্রৌণদীর সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে।

আমার এই একমাত্র সন্তান যাতে সং-যরে, সংপাতে পড়ে সে চেষ্টা করতেও আমি কিছু কহুর করি-নি। অনেক বেখে-ওনে, আমার অর্ধেক সম্পত্তি বার করে, সরমাকে আমি এক বনেদী ঘরের পাশ-করা ছেলের হাতে ‘সংপে’ দি। আমার জামাইয়ের নাম স্বরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

কিন্তু বিবাহের কিছু দিন পরেই জানা গেল, স্বরেন্দ্র লম্পট, মাভাল,—আর সব-চেয়ে বা খাড়াপ—সে আমার সোনার প্রতিমা সরমার উপর অভ্যাতার করে।

বিবাহের বছর-ডুই পরেই সরমার স্বপ্নের মারা যান। তাঁর শ্রাদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই

বিষয় নিয়ে সুরেন আর তার ভায়েদের মধ্যে কগড়াখাঁট ও মোকদ্দমা হুক হোল। মোকদ্দমার অনেক টাকা নষ্ট হয়, বাকী যা থাকে, সুরেনের বন্ধুগোষ্ঠীতে তাও উড়ে যায়।

বিবাহের পর সরমা মোটে বছরখানেক স্বস্তির মধ্যে ছিল। তারপর থেকে সে আমার কাছেই আছে। সুরেন বর্তমানে বেঁচেছিল, তাকে নিয়ে যাবার নাম করেনি। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করে ব্যরকতক টাকা চেষ্টা সে আমাকে চিঠি লিখেছিল—কিন্তু, আমি কোন জবাব দিইনি। কেননা, তার খাঁই মেটাতে পারি, এমন সঙ্গতি আমার ছিল না।

এর পর কিছুদিন সুরেনের আর কোন খোঁজখবর পাইনি। শ্রীহরপুরের বাস্তব-ভিত্তি বিক্রী করে সে কলকাতায় চলে যায়। কোথায় থাকত, কেউ জানত না। খোঁজ করেও তার সন্ধান পাইনি। স্বামীকে চেনবার সুযোগ সরমার ভাগ্যে ঘটে-নি, স্বামীর স্বভাব তার পক্ষে সুখস্বস্তি ছিল না। আমি তার অনেক সন্তান রাখবার জন্যে তাকে এসেজ ও বেহালা বাজাতে শিখাতুম। বরকরার কাজ, রান্নাবান্না, লেখাপড়া আর বাজনা নিয়েই এক-বছর সে কাটিয়েছে।

বছরখানেক আগে হঠাৎ কান্দীধাম থেকে এক পত্র পাই। সুরেনের এক দুঃ-সম্পর্কের আত্মীয় কান্দীতে থাকতেন। চিঠি লিখেছিলেন তিনিই। সেই চিঠি পড়ে জানলুম, সুরেন মাতাল অবস্থায় গঙ্গার পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। সরমার স্বামীর নাম মাত্র ছিল—সেদিন থেকে তাও মুলে।

এর মধ্যে আর-এক হালান্না বাধল। আমার পাড়ার এক ধনী জমিদারের কুদৃষ্টি সরমার উপর পড়ল। সেই পাখণ্ডই তার এক সঙ্গীর সঙ্গে আজ এখানে এসেছিল। এই নির্দয় লোকটা আমার—আমি বাপ—আমার কাছেই সরমার সংকে কুপ্রভাব করে—এত বড় তার বৃকের পাটা! প্রথম-প্রথম সে কাকুতিমিনতি করত, তারপর ক্রমেই আমার উপর অত্যাচার হুক হোল। আমি গরীব, সে ধনী। কি করি, পাড়া-পড়শীর আশ্রয় নিলুম। কিন্তু পাড়া-পড়শীরা লোককে একঘরে করতে জানে, বিপদে কেলতে জানে—বিপদে সাহায্য করতে জানে না। ধনীর সাতধুন মাণ! ছুঃখের কথা বলব-কি,—বে গরীব, সেও ছুই ধনীর পক্ষেই পাড়ার আর-এক গরীবকে পারে খেঁচাতে! শেষে আমার উপরে অত্যাচার এমন বাড়ল যে, আমার পক্ষে দেশে ভিষ্ঠান দায় হয়ে উঠল। কাজেই বাধ্য হয়ে একদিন চুপি-চুপি দেশ ছেড়ে চলে এলুম। কিন্তু বেশত্যাগী হয়েও শান্তি নেই, এখানেও আমার পিছনে দেখছি, ছায়ার মত খনি লেগে আছে।

জানিনা ভগবানের কি ইচ্ছা, এ-বরসে আমাকে তিনি আরো কত শান্তি দিতে চান!”

হুয়

মুন্সারিবাবু তাঁহার কাহিনী বলিয়া চিত্তিত হুখে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিলেন। মোহন আর হরেনও কিছু বলিল না।

কিন্তু বৌদীক্ষণ এমন দুঃখবদ্ধ করিয়া বসিয়া

খাকা হরেনের খাতে কিছুতেই বরদাস্ত হইত না। সন্ধ্যার আগে সেই-ই মৌন ভঙ্গ করিল। তক্তাপোষের উপরে ঘোরে খুঁচি মারিয়া সে বলিয়া উঠিল, “ওঃ! রাকেলহুটোকে হাতে-পেয়েও অমনি-অমনি ছেড়ে দিলু? একটু শিকা দেওয়া দরকার ছিল যে!”

মুন্সিরাবু চম্ভিত্তর এমনি বিস্তার চাইয়া গিয়াছিলেন যে, এতক্ষণ হরেনের প্রতি তাঁর লক্ষ্যই হয় নাই। এখন হরেন কথা কওঁরাত হঠাৎ তাঁহার হৃৎ হইল। তিনি লজ্জিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য! আপনি অবাচিত ভাবে আমাদের এতবড় উপকারটা করলেন, আর এতক্ষণও আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি-নি! হুতরাং—”

—“হুতরাং, নিজের চাক আমি নিজেই বাগাব। আমি হাজি শ্রীহরেন্দ্রনাথ বহু বি এ, মেডিকেল কলেজের টেডেন্ট, শ্রীযুক্ত মোহন-লাল মজুমদার বি-এ আমার বন্ধু। আর-কিছু জানতে চান?”

—“হরেনবাবু, আপনার কৃতজ্ঞতার স্বপ্ন আমি কখনো শোধ করতে পারব না।”

—“কেন পারবেন না— আলবৎ পারবেন! ঐ যে বলেন, রক্তনে আপনার কত্ৰা দ্রোণদীর মত, তার পরিচয় আমি যেদিন পাব, সেইদিনই কৃতজ্ঞতার স্বপ্ন থেকে আপনাকে মুক্তি দেব!”

মুন্সিরাবু হাসিয়া বলিলেন, “এত লজ্জা যদি ধারশোধ হয়, তাহলে এখনি আমি সে বন্দোবস্ত করছি!” তিনি আন্তে-আন্তে উষ্ণতা বাড়ীর ভিতরে পেলেন।

বোহন মুখতার করিয়া বলিল, “অসত্য! পেটুক! এসব কথার আর যেন সময় পেলেন না!”

হরেন চুটামির হাসি হাসিয়া চুপিচুপি বলিল, “তোমার মুখে শুনেছি, দ্রোণদী বহুত্রে পরিবেষণ করেন। আমি তাঁকে বচকে দেখতে চাই! আমার লক্ষ্য তাঁর প্রতি—তোজনটা উপলক্ষ্য! বুঝলে বুঝ?”

মুন্সিরাবু কিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “পরমা আপনার কথা ও-ঘর থেকে শুনেতে পেরেছিল হরেনবাবু! হুতরাং—”

—“হুতরাং আপনি প্রস্তাব দাখিল করবার আগেই প্রস্তাব অস্বীকারিত হয়ে গেছে— কেমন, এইত? শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।”

প্রথম আলাপেই পরিচয় জমাইয়া তুলিতে হরেন একেবারে অস্বীকারী। স্রু তাই নয়, আসর জনকাইবার ক্ষমতাও তাহার অদ্বুত ছিল—গভীর ও তরল যে কোন বিষয়ের আলোচনাই হউক না কেন—সমানভাবে সে সব-তাতেই বেগ দিতে পারিত। এইজন্য যে তাহার সহিত একদিন ভাল-করিয়া মিশিত, তাহারই স্বঘরের মধ্যে হরেন একটি চিরদিনের আসন স্থাপন করিয়া লইত।

আমিও সে মুন্সিরাবুর সঙ্গে নানা প্রশ্ন করি। তাহার মতলোব ছিল, মুন্সিরাবু কোন্ মতের লোক, কোনরকমে সেটা জানিয়া লওয়া। সে এমন কৌশলে নানা কথা মধ্য দিয়া আপন উদ্দেশ্যে গিয়া পৌঁছিল যে, সরলস্রাণ মুন্সিরাবু কিছুই সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

কথার-কথার হরেন বলিল,—“আমাদের সমাজের বিধবাদের কথা আপনি ভেবে

মেখেছেন কি ? আমরা তাঁদের নাম বিয়েছি, দেবী। তাই মনে করি ঐ পাষণ-প্রতিমা দেবীর মত তাঁরাও বৃষ্টি পাষণে তৈরি। তাঁরা যে মানুষ, তাঁদের যে-রক্ত-মাংসের শরীর—পৃথিবীর এই আলো-বাতাস যে তাঁদের বেহ ননের উপর লাড়া জাগার, এখানকার হর্ষ-শোকে তৃকান যে তাঁদের প্রাণকে ও বোলা দেয়, এ-কথা আমরা বীকার করতেই চাই না। দেবী বলে একটা আদর্শ আমরা মনের মধ্যে ঝাড়া রেখেছি। অথচ ঐ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যে বিরোধ, তাকে ত মানতে চাই না ! আদর্শের ঠাট্টুকু বজায় রাখবার ক্ষেত্রে থাকে আদর্শের আসনে বসিয়ে বলি, তাঁর পূজা করছি, তখন তাকে ত পূজা করা হয় না—তাঁর প্রতি যে অত্যাচার করা হয় ! দেবীকে আমার স্রষ্টা আছে, কিন্তু মানবকে দেবী বলে কপট ভক্তি প্রকাশ করতে আমি রাজি নই।”

মুরারিবাবু বাধো-বাধো করে মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, “কিন্তু—সমাজ—সমাজ—”

হরেন বখার্জি আন্তরিকতার সহিত দৃষ্ট করে বলিয়া উঠিল, “সমাজ ! সমাজ অমায়িককে শাসন করতে পারে, কিন্তু নির্দোষকে সে পারে খেঁচাতে পারে না, মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে সে বঞ্চিত রাখেতে পারে না ! বিধবারা সমাজের কাছে কি দোষে দেবী ?”

—“হিন্দুস্তা বলে, পূর্বজন্মের কর্মফল।”

—“তাদের ঘরে চুরি করবেন না মুরারিবাবু ! হুজির কুলি এখন রিক্ত হয়ে বার, নির্দোষকে হাকি থেবার ক্ষেত্রে

বিধি-সংহিতা তখন বলে—‘এ কর্মফল !’ বিধবারা সমাজে কোন দোষে দেবী নয়। কিন্তু, তারা যে অবলা রমণী, তারা যে পুরুষের জীভদ্রাসী—কাজেই বেচ্ছাচারী পুরুষের অত্যাচার তাদের মাথা পেতে লহ করতে হবেই-হবে ! পুরুষ হলে সেও একশোটি বিবাহ করতে পারত, শত বাড়িচারেও তাকে পাণ স্পর্শ করতে পারত না। এ ত হিন্দু নয়,—অদ্বৈত সমাজকে এখানে শুধু নিখণ্ডীর মত হ্রুখে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার পিছনে লুকানো আছে—পুরুষের বেচ্ছাচার ! এ বেচ্ছাচারি ধিনি মাথা পেতে নেবেন, এই লক্ষ লক্ষ অফাল-বিধবার তত্ত্ব দীর্ঘকাল দ্রবীভূত অগ্নির মত তাকে ধ্বংস করুক ! মুরারিবাবু, আপনি মনকে খালি জোখ ঠেরে বোকাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তা কি পারবেন ?—আপনি যে পিতা !”

মুরারিবাবু আর আশ্চর্যগোপন করিতে পারিলেন না ; আবেগের সঞ্চিত বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ, আমি যে পিতা ! কিন্তু যে দেহ আমাকে ঢকল করে তুলেছে, সমাজের নুক ত সে দেহ নেই হরেনবাবু ! আমার ঢকলতাকে সমাজ ত ক্ষমা করবে না !”

হরেন উত্তেজিত ভাবে কহিল, “সমাজ ত ক্ষমা করবে না জানিই। সেইজন্মেই ত আমাদের—নবীনদের নৃতন-করে সমাজ গড়তে হবে। প্রাচীনতার গোলাঘরী করে আমরা চিরদিন কেবল প্রাচীন হয়েই থাকব না। আমরা যে নবীন, তার পরিচয় দিতে হবে আমাদের নবীন সমাজ তৈরি করে।

নবীনতা যদি আমাদের না থাকে, তাহলে ত বলতে হয় আমরা মরেছি। কিন্তু আমরা মরব না। মুরারিবাবু, আমরা মরব না—মরব না!”

হরেন যে শ্রুতি নিষেধ বন্ধুর হুঁধিয়ার মন্তাই এতখানি বাক্যব্যয় করিল, তা নয়; সে বাহা বলিল, সেটা তাহার খাটি প্রাণের কথা। তাই তাহার সেই আবেগ ও উত্তেজনা মুরারিবাবুর দ্বারের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, দেখানো একটা সাদা আগাইয়া তুলিল। হরেনের প্রতি কথার মধ্যেই তিনি যেন আপন নিষ্ঠুর প্রাণেরই কাতর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন,—সে যেন কি-এক মন্ত্রমুগ্ধতা উহারই কৃত্রিম মনের ভিতরকার গোপনতাকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!

মুরারিবাবু এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি একটিও কথা কহিতে পারিলেন না—হেঁটমুখে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিলেন। ...

অনেকক্ষণ পরে তিনি মাথা তুলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস কেলিলেন; তাহার পর উঠিয়া, হরেনকে সামনে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য! এই বছরে আপনি এমন জ্ঞানীর মত চমৎকার কথা কহিতে শিখলেন কি করে?”

স্বাধাতি বা অধ্যাতি, হরেন কিছুতেই অপ্রস্তুত হইবার পাত্র ছিল না; সেও অধম হাসিয়া পান্টা দ্বাব দিল, “জামি যে বান্দানো, মুরারিবাবু, কাজে আমাদের অপটুতা আছে বলই বাক্যপটু হুর আমরা সেটুকু পুরিয়ে নি!”

মুরারিবাবু বলিলেন, “আপনস্রা মাঝে মাঝে এখানে এলে আমরা সুখী হব।”

—“হ্যাঁ, আমাকে আর মোহনকে মাঝে-মাঝে আপনাদের খবরাখবর নিতে হবে বৈকি! নইলে আপনার বেশের তত্ত্ব-লোক-গুটি আপনাকে একলা দেখলে আবার উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেন।”

মুরারিবাবুর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। মোহন এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া ছিল। এখন সময় বুকিয়া সে বলিল, “মুরারিবাবু, আমার বাড়ীর পাশে আমার একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া আছে। আপনি যদি সেখানে উঠে যান, তাহলে আর কোন ভয় থাকে না।”

মুরারিবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য! এতক্ষণ বলতে হয়! সে ত খুব ভাল কথা মোহনবাবু! আমার মত অসহায় লোকের পক্ষে আপনার মত প্রতিবাসী পাওয়াত ভাগ্যের কথা! বিশেষ, তারা যখন এ বাড়ী চিনে গেছে, তখন আবার কখন যে এসে পড়বে তার ত কিছু ঠিক নেই!”

মুখানা খুব গভীর করিয়া হরেন বলিল, “কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে আগে থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছি মশাই। মাঝে-মাঝে আমরা শ্রোণী-ঠাকরুরের হৈসেলে গিরে উৎপাত করতে পারি!”

মুরারিবাবু উচ্চহাসে উজ্জ্বলিত হইয়া বলিলেন, “তথ্য!”

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্ত্রকুমার রায়।

হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

চিরাগত প্রথা-অনুসারে ব্রাহ্মণ উপবাস-ব্রত পালন করেন, ধর্মোৎসব-সমূহের অনুষ্ঠান করেন। পুরাকালের ৪০টি সংস্কারের মধ্যে, এক্ষণে কতকগুলি সংস্কারমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুত্রের নামকরণ। জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইলে পর, তাহার একটা নাম দেওয়া হয়;—প্রায়ই কোন দেবতার নামানুসারে নাম রাখা হয়। বিবাহের বাসুধান। উপবীত গ্রহণ। ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্রদিগের স্ত্রীর আশ্বকাল বেনিরা ও কারহেড়া—এখন-কি কোন কোন অশুভ জাতের লোকও উপবীত ধারণ করে।

সংস্কারগুলির মধ্যে বিবাহই সর্বপ্রধান। কি ধনবান, কি দরিদ্র সকলকেই সম্মানের বিবাহ উপলক্ষে উৎসবদির অনুষ্ঠান করিতে হয়—নচেৎ মান থাকে না।

কোন ধনশালী ব্রাহ্মণের উত্তান—বসন্ত-কালের কোন এক উজ্জল নিশা। গাছে গাছে কাগজের লঠন মালায় মতো সুগান হইয়াছে। বাড়ীর সকল মুখ-ভাগের উপরেই রত্নিন সেলাসের ‘ল্যাম্প’। বিচিত্র রঙের আলোক-প্রতিবিম্বের মধ্য দিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া জনতা চলিয়াছে : পাচালো পাগড়ী; তর, পীত, লাল রঙের পরিচ্ছদ; রক্ত ও হস্তপদ্মাদি নয়, গায়ের রং ঘোর বা উজ্জল স্রামবর্ণ। বৃহৎ ঝালান, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মাস্তুরের উপর মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট। মধ্যস্থলে দুইতিনটি নর্তকী :—উহার

চঙড়া-ভাঁজওয়াল লম্বা পেশোয়াজ, দৃষ্টি-আকর্ষক ফ্যাটফেটে রং—বিশেষতঃ লাল। মুখে রং, চোখে স্তম্ভা, কাণে বড় বড় কাণবালা, নাকে নথ। অতি দীর্ঘপতিতে পম্বক্ষেপ করিতে করিতে, একঘেঁরে স্তরে গারিতে গারিতে, উহার রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অভিনয় করিতেছে।

তাহার পর, মন্ডালের আলোর, জনতার স্তাস্তা দিয়া, বোড়-সওয়ার, কীটেন গাড়ি, পাকী-গাড়ী, হুসর পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট শত সহস্র নরনারীর সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা চলিয়াছে, বহুমুখা সাজে সজ্জিত একটি অধের উপর উপবিষ্ট—বর (বরস দশ বৎসর হয় কিনা সন্দেহ, কখন-কখন তাহারও কম) :—অগ্নির পরিচ্ছদ, রত্নখচিত মুহুট; হীরক প্রভৃতি বহুমুখা প্রস্তরের রত্নহার। বরের বাহুর দ্বারা পরিধৃত—একটি ছোট ‘কনে’, পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু, অবগুষ্ঠিত; হলদে কিম্বা লাল রঙের একটা বড় শাল দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত। উহারের মাথার উপর একটা বেগুনী রঙের ছত্র; রৌপ্যনির্মিত বাজন দ্বারা উহারিগকে বাতাস করা হইতেছে। এই বর-বাজার দশ, কতক গইয়া কস্তার শওরবাড়ীতে উপনীত হইল। ইহার পূর্বে পিতৃগৃহে বিবাহের অনুষ্ঠানাদি হইয়া গিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বহু-সংখ্যক ও অতীব জটিল। একজন ব্রাহ্মণ একঘণ্ড কাপড় দিয়া বর-কনের পরিচ্ছদ

বাঁধিয়া দেয়; কাপড়ের নীচে, বর-কনে পরস্পরের সহিত হাতে হাত মিলায়। উহাদের মুখ লাগ ধাগে চিহ্নিত করা হয়। উহাদের গলায় কুণের মালা বেওয়া হয়। একজন ব্রাহ্মণ, তাহাদের ঐবাসেনে একটা দড়ি রাখিয়া দেয়। বর, কুণের ভিতর হাত ডুবাঁইয়া হাত ভিঙ্গায়। অল্প অনুষ্ঠান মন্ত্রপাঠের সহিত সম্পাদিত হয়। তথাপি উহার কোনটাতেই সাংস্কারিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। আরো বিলম্বে, বাড়ীর সম্মানার্থে বরের গৃহে একটা গুরুতর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বিবাহ হইয়া গেলে, অন্নবস্ত্র বর আবার লেখা-পড়ার প্রবৃত্ত হয়। কস্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্রপুর্বে প্রতিপালিত হয়। যোগ্য বরস হইলে, উহাদিগকে একত্র সম্মিলিত করা হয়। উহাদের নিত্য-নিয়মিত দৈনন্দিন কাৰ্য সমান চলিতে থাকে—কোন পরিবর্তন হয় না। বিষ্ণুগণের অধিকাংশ ছাত্র, ছাত্রদশাতেই ‘ছেলের বাপ’।

সন্তানের বিবাহে, পিতামাতা সর্বস্বান্ত এবং সন্তানেরা পিতামাতার ব্রাহ্মে, সর্বস্বান্ত হয়। কোন কোন ব্রাহ্মে কয়েক লক্ষ, এমন-কি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, শুনা যায়।

মৃত্যুর পরে মাতৃবৈর অবস্থা সবচেয়ে হিন্দুর বিশ্বাস এইরূপ :—শরীর মৃত হয়, কিন্তু আত্মা জীবিত থাকে; অসুষ্ঠ প্রমাণ একটি হস্তশরীর দ্বারা আত্মা সমাচ্ছাদিত। সন্তান-প্রদত্ত পিতৃবৈর দ্বারা, পরিপুষ্ট হইয়া এই হস্তশরীর বাড়িতে থাকে, এবং ক্রমে একটি মধ্যবর্তী শরীরে পরিণত

হয়; পুনর্জন্ম পর্যন্ত আত্মা এই শরীর ধারণ করে। এই মধ্যবর্তী শরীরের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া, আত্মা অনেক বর্গলোকে গিয়া গুণ্যের পূরকার লাভ করে, পাণ্ডী হইলে, তাহাকে সেই সব নরকে টানিয়া লইয়া যায়—বেখানে নির্দিষ্ট বয়সাকার রাজত্ব। পাণ্ডীর ভ্রমণ-পথটা বড়ই জীবন। কখন-বা সৌরদণ্ড মরুভূমি, কখন-বা কণ্টকাকীর্ণ হিংস্র জন্তু ও বিধাক্ত সর্প-সমাকুল বন-জঙ্গল। অসিরূপ শাখা-সমন্বিত মহারণ্য। খাড়া পর্বতের ধার। শূল ও কুর-সমাজের বাত্ম-পথ। ষটিকামর আকাশ; ভীষণাকার শকুনী-গৃধিনীরা উড়িয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের কৃষ্ণ পক্ষচ্ছায়ায় আকাশ আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; আকাশের নিম্নে শতশত যোজন বিস্তৃত এক নদী গর্জন করিতে করিতে, কলকল শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে। একটা রক্তের নদী। শব্দে ও তদ্রূপে জ্বলিতে পরিপূর্ণ। নর, মকর, হান্সর, কুস্তীর-সমাকীর্ণ। উহার ভটবেশে, হাজার-হাজার নারকী,—কেটেরে-চোকা চোখ, বাঁকা মোড়ান বাহ। তৃষ্ণার দগ্ধ হইয়া, অবনত হইয়া উহারা অগ্নি অগ্নি রক্ত পান করিতেছে; আবার ঐ রক্তই উহাদিগের শরীর কর করিতেছে, কুরিয়া কুরিয়া ঐশ করিতেছে; তখন হতাশ হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিতেছে; হনীল তরঙ্গরাঙ্গি,—নরক-উৎকীর্ণ জ্বলিতের দ্বারা উহাদিগকে গুটাইয়া লইয়া বাইতেছে।

এই শাস্তিগুলি আত্মার উদ্ধারের একমাত্র উপায় :—ব্রাহ্মদিগকে জীবিত আত্মীয়দিগের

অর্থহীন। এমন-কি দৈত্য-দানবেরা রাঙ্গণের মন্ত্রকে আদেশরূপে মানিয়া থাকে। ইহারই দক্ষণ অস্ত্রোষ্টি ক্রিষ্ণকলাপের এত অটলতা ও মৃতদিগের উদ্দেশে পিঙ্গবান ও উৎসর্গক্রিয়া—অর্থৎ প্রাজ্ঞাহুষ্ঠান। (১)

কোন ব্যক্তির মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে অমনি তাহার আত্মীয়েরা গদা বা কোন পবিত্র নদীর তীরে তাহাকে স্থাপন করে। মৃত্যু হইলে, তাহার সেহকে দান করার, তাহাকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেয়, পুষ্পমালা ভূষিত করে, চন্দন-কাঠের আগুনে দগ্ধ করে। স্বজাতের শোকেরা শবকে বহন করিয়া দাহ-স্থানে লইয়া যায়। তুলসীপত্র চন্দন ও পলাশ-কাঠে চিতা রচিত হয়। শবের বকের উপর চারিটা চাউলের পিষ্টক রাখিয়া শবকে একটা মকের উপর প্রসারিত

করা হয়। অগ্নিশিখা উঠে উৎপিত হয়। বাহকের দল বলিয়া উঠে :—“পুণ্য, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যেন স্নানার্থ পথ দিরা, তোমাকে তোমার পিতৃপুরুষদিগের নিকট লইয়া যান” (গণেশ X, ১৭, ৩)। শব অর্দ্ধদগ্ধ হইলে পর, বাহাতে আত্মাপুরুষ সহজে বাহির হইতে পারে, মুক্তির পথে ব্যাঘাত না হয় এইরূপ মাথার খুলিটা ভাষিয়া দেওয়া হয়। শবদাহের চারিদিন পরে, মৃতের আত্মীয়েরা অগ্নিগুলি জড়ো করিয়া একটা ঘরের মধ্যে স্থাপন করে ও সেই ঘটকে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখে। আবার চারি দিন পরে, সেই ঘটকে মাটির ভিতর হইতে বাহির করা হয়; তন্ন ও দেহাবশেষগুলি কোন নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞাহুষ্ঠান, ক্রিষ্ণকলাপের বর্ণাবৎ

(১) সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বেবলোককে “বর্গ” বলে। বিষ্ণুর বেব-লোককে “বৈকুণ্ঠ”, কৃষ্ণের বেব-লোককে “সোলোক”, শিবের বেব-লোককে “কৈলাস” বলে। এই সকল বর্গলোক দুর্গম পর্বত-শিখরে অবস্থিত। বোকের চারি বাণ বলা :—বেবতার নিজ আবাসস্থানে বাস করাকে “সোলোক”; বেবতার অবনতিত নৈকটা লাভ করাকে “সানীশ্য”, বেবতার বস্ত্রপকে নিজ আত্মার মধ্যে আত্মসাৎ করাকে “সাকল্য” এবং বেবতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হওয়ারকে “সাবুবা” বলে।

২১ টা বরক। প্রত্যেক বরকে পৃথক পৃথক শাস্তি; কোন শাস্তিই অনন্ত নহে; আত্মা বিশোধিত হইলেই আবার তাহার পুনর্জন্মের পালা আরম্ভ হয়। যে শাস্তির গ্রহে বরকের সম্পূর্ণ বিবরণ আছে তাহার নাম “শকড়-শুভাণ”।

পুণ্যবানদিগের আত্মা ব্রহ্ম-রক্তমিষা এবং পাপিণিদের আত্মা পাকস্থলীর রক্ত মিশ্রা বাহির হয়।

ভীষণ বন-দূত-বৃক্ষ। “বন-দূত”। বরকের শাস্তি :—“শাতন”; যদের লিপি-পুস্তকে, প্রত্যেক ব্যক্তির পাণ-পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। “চিত্তশুদ্ধ” (কোন কোন ব্রহ্মচারের মতে, বরকের লিপিকরের নাম)।

সাগুণিদের শব দাহ করা হয় না, সমাধি করা হয়। তাহাদের আত্মা ব্রহ্মের লীন হইয়া যথ্য বলিয়া, তাহাদের কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কোন নগরের সহিত নগরের সমীচিকার যে পার্থক্য, একজন তাপসের দেহের সহিত অন্ত যোনের সেইরূপ পার্থক্য।

মৃতের উদ্দেশে গীতব্রাহ্মণদিগের অহুষ্ঠানের স্রাব,—ঐতিহ্যবিশেষ কল্যাণ-সাধনই লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপে, “বৃদ্ধি-প্রাচ” সৌভাগ্যবান করে, “পুষ্টি-অর্থ” দ্বারা দান করে, “বার্হা” দ্বারা আদান করে, ইত্যাদি।

অহুমরণ—ইহাই প্রাচীনতরী ত্রাক্ষণের জীবন-
যাত্রা-প্রণালী। কিন্তু অধুনা খুব উচ্চশ্রেণীর
ত্রাক্ষণেরাও এই সকল নিরম কতটা মানিধা
চলে ?

বিবিধ ব্যবসায়-অবলম্বী ত্রাক্ষণেরা
ব্রাহ্মপুত্রেরা, বেনিরারা—ইহাদের মধ্যে কেহ
এ-প্রথা, কেহ ও-প্রথা অহুমরণ করিয়া
থাকে। কিন্তু মদ্রপাঠ করা, ধ্যান-ধারণা
করা—তাহারা এ-সব করিবার সময় পায়
না। কাজ-কর্মে, আনন্দ-আল্লাসে, সংসার-

চিত্তায় তাহারা নিমগ্ন। ইংরাজের দৃষ্টান্ত,
মূল, মুদ্রাবত্ত, পুস্তক, ইংরাজ-শাসন—এই সমস্ত
প্রাচীন দেবতাদিগের সম্বন্ধে সংশয় উৎপাদন
করিবার বহুপূর্বেই, এবং প্রাচীন রীতিনীতি-
গুলি যে অত্যন্ত হান্তজনক এইরূপ ধারণা
জন্মাইবার বহুপূর্বেই—হিন্দু-সভ্যতার অধঃ-
পতন, মুসলমান-সভ্যতার প্রভাব, সমাজের
পরিবর্তন এই সমস্ত হিন্দুদের অনেক
ধারণা ও অভ্যাসকে পরিবর্তিত করিয়াছিল।
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রূপসী

নাটিকা

পাত্র ও পাত্রী

নিরঞ্জন	মান্নার দুর্গাদিগিতি
রূপসী	নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী
আর্য্যধন ...	নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা
দেবল	} নিরঞ্জনের অধীনস্থ সৈন্তাধ্যক্ষ
কল্লন	
বরাট	যোগল-সেনাপতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিরঞ্জনের প্রাসাদ-কক্ষ

[নিরঞ্জন, দেবল ও কল্লন স্তব্ধ বাতায়ন-
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে—সূর্য বাতায়নের
বাহিরে মান্নার গ্রামের অনেকখানি দেখা
গাইতেছে।]

নিরঞ্জন

না, আর কোন আশা দেখছি না।
চারিধারে শত্রুসৈন্য! আমাদের সাহায্য
করবার লজ্জা বুঁদেলা থেকে যে সৈন্য
এল, তারা শত্রুর বৃহ ভেদ করে গ্রামে
পৌঁছতে পারলে না! বুঁদেলার সেনা
মান্নারের ওধারে অলস হয়ে বসে
আছে। উপায় নেই! নীলপাহাড়ের ধার
বেয়ে যে শীর্ণ পথ পড়ে আছে, সেখানেও
শত্রুরা সমাগ পাহারা দিচ্ছে; আমাদের
আর কোন আশা নেই! পরিত্যক্ত উপার-
হীন আমরা—খেরালী শত্রুর হাতে বন্দী
হওয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখছি না।
আর এই শত্রু এখন তার প্রতিহিংসা
চরিতার্থ করবার লজ্জা সব-চেয়ে কঠিন
তীব্র অভিসন্ধি আঁটছে—নিশ্চয়, তাতে

কোন 'সন্দেশ' নেই! খুঁজেলা শুধু সৈন্ত
পাঠিয়ে নিশ্চিত আছে—এ কথা বুঝে না
বে, আহা! না পেয়ে মান্যতার এত বড়
বাহিনী শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করবে!
অথচ এরা কি বিপুল বিক্রমে এতদিন যুদ্ধ
করে এসেছে—তিনমাসের অবিশ্রাম যুদ্ধে
শত্রু তাদের একতিলও হঠাতে পারেনি!
ধৈর্য্য তাদের অসীম, বীর্য্যের তুলনা নেই,
স্বার্থভ্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কেউ
কখনো পৃথিবীতে দেখিয়েছে কি না, আমি
না! কিন্তু আজ আর অগ্র নেই—শত্রু
এমন ব্যূহ রচনা করেছে যে নিরস্ত্র উপবাসী
সৈন্ত তাদের হাঠিরে আজ আর অগ্রচেষ্টার
বেকতে পারছে না—এমন অবস্থার ক'দিন
লড়া বার? মান্যতার কোন আশা নেই!
ভিতরের এ খবর শত্রু যদি একবার জানতে
পারে তাহলে মান্যতার প্রাচীর আপনা-হতে
তাদের গতির সমুখে মাথা হেঁট করে ছুরে
ধাক্কাবে, গড়ের দ্বার তাদের উন্নত পদাঘাতের
আশঙ্কায় আপনাকে হস্ত করে দেবে—

সেবল

আমার তুণ আজ শূন্য! একটিও তীর
নেই—একটা বস্ত্রপত্র এসে আক্রমণ করলে
তাকে হঠাৎবারুও লাগা নেই!

কহলন

আমার সৈন্তেরা আহা!-অভাবে খুঁজার
উপর লুটিয়ে পড়েছে—তার উপর একটুকরো
বাক্স অবধি পড়ে নেই—

সেবল

ওদিকে বরাটের কামান এখনো লখন
গর্জন করছে। অস্ত্র নেই, আহা! নেই—
কিন্তু বড় শত্রুকে আর হাঠিরে রাখা বার?

কহলন

অথচ সক্তির আশা—

সেবল

সক্তি! ও নাম যুগে উচ্চারণ করলে বরাট
উচ্চ হাস্য করে উঠবে! তার প্রতিহিংসা-
বৃত্তি বাজের চেয়েও ভীষণ! তার নিষ্ঠুরতা
সীমা মানে না!

নিরঞ্জন

তবু অগ্রহীন মান্যতার যুগ চেয়ে, অপমান
জেনেও আমি আমার যুদ্ধ পিতাকে বরাটের
কাছে পাঠিয়েছি, আমাদের অবস্থার পরিচরও
তাকে প্রকাশ করে বলতে থলেছি।
এখনো ত তিনি কিরলেন না—

সেবল

এক সপ্তাহ আমাদের কামান শুক
রয়েছে—ধনু থেকে তীর ছোটেনি—দুর্গের
স্থানে স্থানে রক্ত হরেছে—তবুও বরাট
এসে দুর্গ অধিকার করেছে না! দক্ষিণ হত্যার
আদেশ দিচ্ছে না! এতে আমার বিষম বোধ
হচ্ছে—সে কি সাহস হারিয়েছে, না, সে
এ তরুতাকে আসন্ন প্রলয়ের সূচনা মনে
করে দ্বিধা হয়ে আছে?

কহলন

হরত সন্ন্যাসের আদেশ পারনি বলে
বরাট দ্বিধা হয়ে বসে আছে। দিল্লীর
মোগল-শক্তিকে এতখানি মেনে চলে বরাট!
সন্ন্যাসের আদেশের লজ্জা এতখানি সপ্রতিভ
সে—অথচ শিশু বা, নারীকে তোপে ওড়াতে
এতটুকু চাকলা নেই! অসুত-চরিত্র এই
বরাট—একটা হেয়ালির ঝপাঙ্কর বলেই
আমার মনে চর!

দেবল

এই বরাটের জন্ম, গুনেছি, অতি ছোট
একটা বংশে। শুধু বৈহিক শক্তি আর
ছাঃসাহসের জোরেই সে আজ মোগল
বাহিনীর অধ্যক্ষ, মোগল সম্রাটের ডান
হাত। গুনেছি, তার চরিত্র অতি বদ—
সে অভ্যস্ত নিষ্ঠুর, খেতালী —

নিরঞ্জন

কিছু নিমকহারাম নয়। সে মোগলের
নিমক বেয়েছে এবং সে নিমকের মর্যাদা
রাখেতে জানেন তোরাফা মোটেই রাখে না।

কহলন

হতভাগা মান্দার! আজ এ অবস্থার তার
হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া উপায়
নেই—!

নিরঞ্জন

তবুও সবুজ কর। সকলেই আমরা এমন
কাপুরুষ নই যে, তুচ্ছ ছুটি অয়ের জন্য শত্রুর
জাছে মাথা ঘুরে থাকাই—! সেইজন্যই বলি,
একবার প্রচেষ্টা কর, যারা জানেন মায়া
করে না, অয়ের জন্য নীচতাকে প্রসন্ন হিতে
রাজী নর—তারা একবার আমাদের সঙ্গে
মিলে জলোচ্ছ্বাসের মত ঐ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে
পড়ুক, এদে—একবার আমাদের শেব
শক্তি নিয়ে ঘুরে দেখি—সমস্ত দেশের অর লুটে
আনি — না পারি ত, শত্রুর তপ্ত নিখালে উবে
যাই! প্রাণ একবার বাবর—সে বাবেই, তা
শত্রুর হুগাহ-বেগুনা হু মুঠো অয়ের জোরে এ
প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা না করে বরং
একবার কুখে উঠে দেখি, এদ—যদি মরি,
শত্রুর ঈর্ষাকুল বিম্বিত পুষ্টির সমুখে গৌরবের
মুঠো মাথায় দিয়ে মরব—

[আর্ধ্যধনের প্রবেশ]

এই যে পিতা! খবর কি? আপনি
অশ্রুত বেছে ফিরে এসেছেন! মোগল কৃত্যের
অস্বচ্ছন্দ আপনাদের গায়ে বেঁধেচি না যে!
তারা আপনাকে বন্দী করলে না? আপনি
ফিরে এলেন? তারা ছেড়ে দিলে—কোন
অত্যাচার করলে না?

আর্ধ্যধন

না, পুত্র, কোন অত্যাচার করেনি তারা।
দেখলুম, তারা বর্ষর নয়, তারাও মাহুষ।
আমার যথেষ্ট সম্মান করেছে, তারা। বরাট
নতমাত্র হয়ে প্রণাম করলে...আনো পুত্র,
বরাটের শিবিরে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল?

নিরঞ্জন

মোগল সম্রাটের—

আর্ধ্যধন

না। পণ্ডিত মাধবাচার্য্য। এত-বড়
দার্শনিক ভারতে এ কলিযুগে জন্মগ্রহণ
করেছেন কি না, সম্ভব। দর্শনের স্বগভীর
জটিল তর্ক এমন সহজ কথায় অল্পমতের
মধ্যে ব্যুৎপন্ন হিলেন যে গুনে সামান্য একটা
প্রহরী অবধি মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি
বোঝাছিলেন, আত্মার কথা—অর্থাৎ,

নিরঞ্জন

থাক পিতা—দর্শনের কথা শোনবার
এখন অবসর নেই আমাদের। এত-বড় সৈন্তের
দল একটু আহ্বারের জন্য অধীর উদ্ভূত হয়ে
আছে—তাদের আহ্বারের কোন উপায় হল
কি না, তারা তাই জানতে পেলেন মুগ্ধ হয়ে
যাবে—আত্মার সংবাদ তারা চায় না—

আর্ধ্যধন

কিন্তু এই আত্মা অবিনশ্বর—

নিরঞ্জন

সে অধিনবরত মর্শনের পাতার আঁটা খাচ্‌ক! এখানে ত্রিশহাজার লোক অন্নভাবে মরতে বসেছে—অধিনবরত আম্মা তাঁদের নবর দেখে এতটুকু ভরসা দিতে পারবে না—মুহুর্ত্ত বিলম্ব তাঁদের সহ্য হচ্ছে না! অরের কি সংস্থান হল, আপনি তাই বলুন। বরাট কি চরে? আমাদের শির—না, হিন্দু নারীর নারীক? বলুন—ঐ গুহন, নীচে বুকু মৈস্তের উন্নত চীৎকার—চেরে দেখুন, তারা ঐ কঠিন কর্কশ শিলা-লগ্ন তৃণগুচ্ছ খাবার অন্ত পরম্পরের সঙ্গে বিবাহ করছে—

আর্যাদন

আমি কুলে গেছলুম, পুত্র—বসন্তের এই দিগ্‌ভ্রম সৌন্দর্য্য, পানীর এই কলগান, ঐ নির্মল-নীল আকাশ—এসবের মধ্যে আমি কুলে গেছলুম, যে প্রকাণ্ড একটা যুদ্ধ চলছে—মাহুকের সঙ্গে মাহুকের প্রাণের যে বীধন, তা কেটে ছিঁড়ে ফেলবার অন্ত দু'মিকে চ'ল মৈস্ত শুধু হিংসার কূ'লছে আর অন্ন শানচ্ছে! মাহুকের বুক যে অমল গুল-আনন্দ পতনলের মত কুটে উঠেছে, তাকে রক্তে রাঙা করে দেবার অন্ত তোমরা সকলে মিলে শুধু অবসর খুঁজছ! না, ঠিক বলেছ—সুধার্ত্ত মৈস্তের ঐ অর্ন্ত চীৎকার... শোনো তবে...আমার যে অন্ত পাঠিয়েছিলে—তার কি করে এসেছি, শোনো—ত্রিশ হাজার প্রকার অন্ত আমি জীবনের আশাস বয়ে এনেছি। কিন্তু—না, সে ত তুচ্ছ একজন—একজনের হৃৎক! ত্রিশহাজারের স্রবের সামনে—কিছুই নয় সে! একদিকে ত্রিশহাজার অর্ন্ত নর-নারীর প্রাণ—আর একদিকে

একজনের বুক-ভান্ডা দাঁতনা—শোনো পুত্র কিন্তু সে কথা শুনেল তুমি উদ্বাহ হয়ে যাবে—হরত এক-নিমেষে প্রাণহীন পাবাণ-স্বপ্নে পরিণত হবে—বুকে দেখ, পুত্র—শুনতে পারবে? সে শক্তি তোমার—কিন্তু মনে রেখো, এদিকে ত্রিশহাজার অর্ন্ত নর-নারীর অমূল্য প্রাণ—

নিরঞ্জন

(বিরক্ত চিত্তে) দেবল, কল্লন, তোমরা অন্তরালে যাও—

আর্যাদন

না, না, থাকো—তুমি, আমি, দেবল, কল্লন, সকলেই ত এই ত্রিশ হাজার নর-নারীর অন্তর্গত। তবে! সমস্ত নগর এসে এখানে সমবেত হোক—বেখানে রাজ্যের যত সুধার্ত্ত জীবন-ভিখারী হতভাগা আছে, সকলকে ভেঙে এনে এখানে দাঁড় করাত—সকলের স্রুখে চীৎকার করে আমি বলি, ওরে দুর্ভাগা, জীবন-কামীরা হল, আমি তোমের জীবন দান করব—প্রকাণ্ড আশ্বাস বয়ে এনেছি—

নিরঞ্জন

আমরা তিন জন এই ত্রিশ হাজারেরই প্রতিনিধি—বলুন, পিতা, কি সংবাদ, বত কঠিন হোক, আমরা অকল্মিত চিত্তে তা শুনব, ভীত হব না।

আর্যাদন

তবে তাই হোক! বরাটকে দেখলুম—তার যে ছবি এখানে বসে তোমরা এঁকেছো, তা ঠিক নয়—তার বিপরীতই দেখলুম! তোমাদের আঁকা ছবি থেকে আমি ভেবেছিলাম, গিরে বরাটকে দেখব, একটা

উদ্ধ্বল, বর্জর, রক্তশিখার দানব—হৃদয়ের
জন্ত উদ্ভত সে, উদ্ভত তার কোন ধার ধারে
না—শ্রদ্ধা, শ্রীতি, মায়ার, মমতাহীন এক
চবুত—

নিরঞ্জন

সে যোগলের দাস —

আর্ধ্যধন

কিন্তু ভয় ; নিমকহারান নয়—নিমকের
সে মর্যাদা রাখে ! শাস্ত, গভীর, বিনীত মূর্তি !
—আমার গুল শির দেখে নতমাত্র হয়ে
সে প্রণাম করলে—আতিথ্যে এতটুকু ক্রটি
রাখেনি—তবু আমি তার শত্রু—

নিরঞ্জন

বৃদ্ধ বয়সে আপনার মতিভ্রম হয়েছে—
তাই এ সতীন সময়েও শত্রুর স্বত্তি করতে
ইতস্তত করছেন না ! ওদিকে ত্রিশ হাজার
নয়-নারী ক্ষুধার্ত ; বিপন্ন—

আর্ধ্যধন

তবে শোনো পুত্র—মান্নার ধরস
করাই যোগলের উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য-
সাধনের ভায় বরাটের উপর। বরাট বীর
—সে চার বৃদ্ধ করে মান্নার দখল করতে
—কিন্তু যোগল চায়, কোণলে ! তাই বরাটের
অহুপস্থিতিতে যোগল সৈন্তাধ্যক্ষ মূলতব বীর
কোণলে মান্নার অন্তর্কিত্তে অবরুদ্ধ। তিন
মাস মূলতবের লোক শুধু নজর রেখে এসেছে
—বাহির থেকে এতটুকু খাবার কি রসদ যেন
মান্নারে না আসে ! তাই তোমরা মান্নার
থেকে বধন হাজার জোগ দেগেছ—যোগল
তখন শুধু পাঁচটা লবাব দিয়েছে—তোমরা
তখন যোগলের উদ্দেশ্য বোঝনি। তার পর
তোমাদের বধন সোলাঙল ছুরি দিয়ে গেছে,

আহার-অভাবে তোমরা বিপন্ন - নির্ধার,
তখনই মূলতব খাঁ তোমাদের গড় দখলের
জন্ত উদ্ভত হয়েছিল, কিন্তু বরাট এসব
জানতে পেরে তা করতে দেয়নি ! মূলতব
খাঁ তাই দিল্লীখরের আবেশ প্রার্থনা করেছে,
বরাটও মূলতবের নামে নালিশ করেছে
যে, তার অধীনস্থ মূলতব খাঁ বরাটের মর্যাদা
রাখেনি, বোরখের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ করেছে !
বরাট চার, মান্নারকে দুই জর করে—
খাভাতাবে শীর্ণ মৃত শব মাড়িয়ে সে মান্নারে
প্রবেশ করতে চায় না।

নিরঞ্জন

উদার অহুগ্রেহ তার ! কিন্তু এতে তার
উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

দেবল

থাকতে পারে কি ! উদ্দেশ্য আছেই—

কল্লন

খুব গভীর মতলব আছে - না হলে
বিধবীর দাস হবে কেন সে ?

আর্ধ্যধন

তোমাদের জন্ত আমার দুঃখ হচ্ছে !
মহব্বকে সন্দেহ করলে নিজের অধঃপতনেরই
পরিচয় দেওয়া হয় !

নিরঞ্জন

যাক—তার পর

—আর্ধ্যধন

আমার মুখে মান্নারের সংবাদ শুনে বরাট
বিস্মিত হল—অস্ত্র-শস্ত্র আর প্রচুর আহার
এখন সে পাঠাতে প্রস্তুত—সন্ত্রাটের
আদেশেরও অপেক্ষা করবে না সে।

নিরঞ্জন

ইস—এত বহৎ ! নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে—

বেবল

গভীর উদ্বেগ ! বাদশার আদেশ নেবে
না ? তাহলে তার নিজের মর্যাদা থাকে কৈ ?

আর্ধ্যধন

উপায় নেই ! বাদশার কাছ থেকে
সে আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে
পেলে, এখানে এ চতুর্ভাগা কুখ্যতির প্রাণ
থাকবে না বে ! বাদশার কাছে তার জন্ত
কৈফিয়ত দিতে সে প্রস্তুত ! আপাততঃ
তিনশ' পাকী তবে আচার আর অংশদ সে
পাঠাতে চায়—

নিরঞ্জন

আশ্চর্য !

আর্ধ্যধন

কিন্তু—

নিরঞ্জন

কিন্তু কেন ?

আর্ধ্যধন

এইবার প্রস্তুত হও পুত্র,—খুব কঠিন
কথা শুনতে হবে ! এই উপকার সে
করবে, কিন্তু তার মূল্য চায়—

নিরঞ্জন

তাই বলুন পিতা, মূল্য চায় ! এখানে
তার মহাব আত্ম উদ্বারতার রহস্যটুকু বোঝা
পেল ! বলুন, কত মূল্য, কি মূল্য চায় সে ?

আর্ধ্যধন

সে চায়, কিশোরী রূপসী তার শিবিরে
সিঁরে আজ রাজি বাপন করে—

নিরঞ্জন

কিশোরী রূপসী !

আর্ধ্যধন

আমার পুত্রবধু—

নিরঞ্জন

পিতা—(অল্প ক্লান্তিতে উত্তর)

আর্ধ্যধন

পুত্র—

নিরঞ্জন

আপনি পিতা—

আর্ধ্যধন

হা, বল, আমি তোমার পিতা, পুত্রের
গর্বে গর্জিত পিতা আমি ! আর তুমি
আমার পুত্র, একমাত্র পুত্র, আমার মাকুহারা
পুত্র—বড় আশ্রয়ের ধন !

নিরঞ্জন

এ কি কথা ! মান্নারে সহস্র রূপসী
নারী আছে—

আর্ধ্যধন

তাদের সে চায় না ! বিচিত্র খেয়াল
তার ! কিন্তু মনে রেখো পুত্র, মান্নারের
স্বাধীনতা, মনে রেখো ত্রিশ হাজার আর্ন্ত
নর-নারীর অমূল্য প্রাণ—

নিরঞ্জন

বাক, মান্নার রাসতলে বাক ! ত্রিশ হাজার
নর-নারীর প্রাণও ভস্মীকৃত হোক—! রূপসী,
আমার স্ত্রী, আমার সহধর্মিণী—

আর্ধ্যধন

তুমি ত প্রাণ দিয়েও আমারকে রক্ষা
করতে চাও—

নিরঞ্জন

তাই রূপসীকেও তার মান, আর
নারীক বিনশ্চন দিতে হবে ?

আর্ধ্যধন

রূপসী তোমার সহধর্মিণী—

নিরঞ্জন

আমি তার স্বামী! কিন্তু মান্দার
আমার কে? আমি মান্দার চাই না।

আর্যাদান

কিন্তু এই সঙিন মুহুর্তে মান্দারকে তুমি
ত্যাগ করবে? এখন মান্দার আজ—

নিরঞ্জন

নিজের প্রাণ দিয়েও যদি মান্দারকে রাখতে
পারতুম, রাখতুম, কিন্তু ধর্ম—

আর্যাদান

মান্দার তোমার সেশ! এই মান্দারকে
তুমি হোপলের পারে ফেলে রেবে পুত্র!
যে মান্দার তোমার মাথার গোরবেই মুকুট
পরিরেছে—

নিরঞ্জন

না, মান্দার আমার কেউ নয়—মান্দার
লড় মাটি কিন্তু রূপসী আমার—

আর্যাদান

তবু এই লড় মান্দার আজ তোমারই
মুখ ঢেকে আছে, পুত্র—

নিরঞ্জন

তবে কি মান্দার চায়, তার লজ্জা আমার
ধর্ম, আমার পরম্পর মান, সঙ্গ, মর্যাদা,
নারীষ সব আমি বিসর্জন দেব! বসুন,
মান্দার তাতে স্বীকৃত হবে? মান্দার মুখ কুটে
তবু বলবে—হাঁ, দাও, তোমার ধর্ম,
তোমার পরম্পর ধর্ম, সব দিয়ে আমার রক্ষা
কর—

আর্যাদান

যদি সে বলে, একধিকে একজনের ধর্ম,
মান, সঙ্গ, আর-এক বিকে ত্রিশহাজার আর্জ
নর-নারীর প্রাণ? তেবে দেখে পুত্র—

নিরঞ্জন

অসম্ভব! ডের ভেবেছি! না, তা হতে
পারে না, মান্দার যদি এত নীচ হয়, এমনি
হের উপায়ে আপনাকে সে রক্ষা করতে
চায় ত আমি তাকে এতটুকু সাহায্য
করতে প্রস্তুত নই! তছাড়া আমার
নিজের উপরই নিজের অধিকার-জ্ঞাচ্ছে;
রূপসীকে আমি কোন্ মুখে বলব, দাও,
আমার সাধের মান্দারের লজ্জা তুমি তোমার
নারীষকে বলি দাও! দিয়ে পতির কীর্তি
উজ্জল কর, সতী!

আর্যাদান

আর যদি রূপসী বলে, আমি মান্দারকে
রক্ষা করব!

নিরঞ্জন

রূপসী বলবে! ঐ পণে? পিতা,
আপনি বাতুল হয়েছেন! রূপসীকে আমি
জানি না? রূপসী আমার স্ত্রী—তার মন—

আর্যাদান

রূপসী আমার মা! আমিও তাকে
জানি, পুত্র। জানি, কত উচ্চ, কত মহৎ
তার প্রাণ—

নিরঞ্জন

একে মহাব বলো না, পিতা, এ কাপুরুষতা
—দারুণ ক্রোধের নামান্তর—

আর্যাদান

আর রূপসী যদি বলে, ত্রিশহাজার নর-
নারীর প্রাণের লজ্জা, মান্দারকে রক্ষা করবার
লজ্জা এ সূতা সে দিতে প্রস্তুত—

নিরঞ্জন

(উচ্চ স্বরে) পিতা, আমি বোকা হলেও
মাহুদ; আমারও সহ্য করার, একটা সীমা

আছে, পিতৃ-হত্যার অপরাধে অপরাধী
করবেন না—

আর্য্যধন

একবার রাজা রামচন্দ্রের কথা মনে কর,
পুত্র,—প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি আপনার
প্রাণ-অংশ ছিন্ন করেছিলেন, লক্ষ্মীরূপিনী
সীতাকে বীকেণ্ড বর্জন করেছিলেন—

নিরঞ্জন

রামচন্দ্রের মহাব রামচন্দ্রেরই থাক, পিতা !
আমি সার্বজন্য মাহু, অত উচ্চ আদর্শ সহ
করতে পারব না।

আর্য্যধন

প্রকৃতিস্থ হও, পুত্র ! রূপসী এ মূল্য
দিতে চায়—

নিরঞ্জন

চায় ?

আর্য্যধন

হাঁ, চায়।

নিরঞ্জন

সে তবে সব শুনেছে ? কে তাকে এ
কথা বললে ?

আর্য্যধন

আমি বলেছি।

নিরঞ্জন

আপনি !...নাঃ... থাক ! তুনে সে কি
বললে ? সে বললে, সে বরাটের শিবিরে
যাবে ?

আর্য্যধন

না—

নিরঞ্জন

তবে—তবে ?

আর্য্যধন

মুখে সে কোন কথা বলেনি। এ কথা
তুনে মুখ তার পাত্ত হরে গেল— সমস্ত অবয়বে
বেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এল ! সে নীরবে
সে স্থান ত্যাগ করলে—

নিরঞ্জন

সরলা—বালিকা! রূপসী ! কিন্তু ওহন
পিতা, এ মূল্য দিবে মান্দারকে রক্ষা করা
হবে না—মান্দার যদি তবুও তাই চায়, তবে
তার সে স্পর্ধার শাস্তিও আমি দিতে জানি,
এ কথা মনে রাখবেন ! এই নীচ মান্দারকে
তাহলে নিজের হাতে আমি ধ্বংস করব !
বে মান্দারকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছি,
নিজের হাতে এমন করে বে মান্দারকে
শাস্তিরে তুলেছি—সেই মান্দারকে শুড়িরে
চূর্ণ করে দেব। দেবল, কল্লন, আমার এই
বাতুল পিতাকে বন্দী কর ! সতর্ক থেকে—
ক্ষিপ্ত মান্দার যেন তাঁকে না দেখে, এ
প্রত্যাব মান্দারের কানে না ওঠে !

আর্য্যধন

মান্দার সব শুনেছে, পুত্র। মান্দার স্থগায়
মুখ ফিরিয়ে বলেছে, সতীর সত্যের মূল্য
সে প্রাণ কিনতে চায় না—রূপসীকেও
তারা সে কথা বলেছে—

নিরঞ্জন

এই ত আমার মান্দারের গোপ্য কথা !
কিন্তু আমার অসাক্ষাতে এতখানি গোপন
বড়যন্ত্র, গোপন পরামর্শ চলছে, আশ্চর্য্য !
অকৃতজ্ঞ মান্দার আমার অসাক্ষাতে এসবের
আলোচনা শেব করে কেলোছে—। অথচ এই
মান্দারের মনলই আমি চিরদিন করে এসেছি,
কখনো ষ্ট্রেন অসিষ্ট করিনি—আমার কাছে

কি তার অস্ত্র মান্যারের এতটুকুও স্বপ্ন নেই ?
প্রাণটা কি এতই বড়—সেটা কি এতই
রাখবার বোগা যে, এই অস্বস্ত- (বাহিরে
কোণাহল) ও কিসের কোণাহল ?

দেবল

ক্ষুধার্ত মান্যারের তীক্ষ্ণকার—

নিরঞ্জন

সব আলোচনা শেষ করেও মান্যার
আবার ও কি চায় ?

আর্য্যধন

তারি আমার মার কাছে ধরবার করতে
এসেছে—নির্জীব মান্যার আমার মার পায়ে
তারের ভক্তি জানাতে এসেছে—

নিরঞ্জন

কি স্পর্ধা ! নারীতে আর বুড়েতে মিলে
মান্যারকে চালাচ্ছে ! কেন, আমি কি মরেছি ?
অকৃতজ্ঞ মান্যার, এমনি হীন কোন্সে
স্বামীর কাছে থেকে স্ত্রীকে তুই আজ ছিনিয়ে
নিতে চাস ? বুঝছি, এ বড়বুড়—চারিধারে
ভীষণ বড়বুড়—বেড়াপাকে আমার ঘিরতে
চায় !...দেবল, বন্ধু, আমার পিতাকে বন্দী
কর—এ বড়বুড়ের স্ত্রী করেছে এই বাতুল
বুড়—তাকে বন্দী কর ! তারপর অকৃতজ্ঞ
মান্যারকে আমি একবার বেধতে চাই !

[উদ্ঘাতভাবে বাহির হইয়া গেল]

(ক্রমশ)

ঈশ্বরীশ্রীমোহন সুখোপাধ্যায় ।

আধুনিক সাহিত্যের একটা লক্ষণ

আধুনিক সাহিত্যের একটা বড় লক্ষণ
এই যে, সমাজের নানা লক্ষণ মিলাইয়া
তাহার কোণী তৈরির চেষ্টা এদেশের ও
বিদেশের লেখকবল্লের একটা পেশা ও নেশা
হইয়া পাড়াইয়াছে । হবহাউস, বোসাংকোরে
এচ, জি, ওয়েল্ড, ওয়েব, বেলক, ডিকিন্সন
প্রভৃতি ইংরেজ লেখক ; রবীন্দ্র, রামেন্দ্র,
বিজয়চন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, প্রভৃতি বাঙালী
লেখক এই কাজ বড়ো পরিমাণে
করিতেছেন । ইহা প্রমাণের জন্য আধুনিক
ইংরেজি বা বাংলা সাহিত্যের রকমারী-
পরিমাণের চেষ্টা যদি করা যায়, তবে
socialistic literature অর্থাৎ সামাজিক
এবং, উপন্যাস, গল্প, নাট্যাধি সাহিত্যের

পরিমাণ আর আর সব শ্রেণীর সাহিত্যের
পরিমাণকে ছাপাইয়া উঠে ।

কেন ? অবশ্য ইহার সোলা উত্তর
সমাজ জিনিসটা মানুষকে তাবাইয়া
তুলিয়াছে । কিন্তু সে উত্তরও “এহ বাচ্
আগে কহ আর” । পূর্বকালেই সমাজ
মানুষের মনকে এমন নাড়া দেয় নাই
কেন, আর এখনই বা সমাজ জিনিসটা
মানুষের কাছে সবার বাক্য হইয়া উঠিল
কেন ?

আমরা বাহাকে আধুনিক যুগ বলিয়া থাকি,
ইউরোপে তাহা বড়োমার চারি শত বৎসরের
যুগ, ; আর এদেশে তাহা একশত বৎসরের
বা তারও কিছু কম সময়ের যুগ । ইউরোপে

এই চারিশত বৎসরের আগে সমাজ ও রাষ্ট্রের
বিগ্রহের কাঠগড়, রূপ ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার
মন্ত্র বাহা ছিল তাহা অনেক কালের
বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
কেহই তাহার অমল বদল আশঙ্কা করে
নাই। বিশেষতঃ ইউরোপীয় মধ্যযুগের সেই
পুরোহিত তন্ত্র—Holy Mother Church—
কোন কালেই এই সনাতন বিগ্রহের
জারপায় যে নতুন শেখতার আমদানি হইবে
তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যে
heretic বা পাবও সে রকমের হুঃস্বপ্ন
কিছু দেখিয়া সে কথা মুখে উচ্চারণ
করিয়াছে, তাহার মাথা মুড়াইয়া বোল
চালিয়া তাহাকে শুধু গ্রামছাড়া বা বেশ-
ছাড়া নয়, একেবারে ইহলোক-ছাড়া
করিবার জন্য চর্কের অহুতানের ত্রুটি কিছু-
মাত্রই ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ বিজ্ঞানের
আবিষ্কার হইয়া এবং যন্ত্র-তন্ত্র কতকগুলি
উদ্ভাবিত হইয়া প্রায় রাতারাতি সমাজ ও
রাষ্ট্র, একেবারে গলোট্‌পালোট্‌ হইয়া
পেল। সেই সঙ্গে ধর্মেরও সনাতন ব্যবহার
প্রাণশূন্য অবস্থা হইয়া উঠিল। ইউরোপে
এই পরিবর্তনটা একেবারেই আকস্মিক।
মিডিত্যাল বা মধ্যযুগীয় ইউরোপ এবং মডার্ন
বা আধুনিক ইউরোপ এক গোত্রের নয়—
পরস্পরের মধ্যে কোলিক যোগ খুঁজিয়া
পাওয়া শক্ত। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের
বোল শুধু নয়, নলচে পর্যন্ত এমন বদল
হইয়াছে যে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক দুই
ইউরোপীয় সমাজ—একত্রই উত্তর সংস্করণ যে
অন্তটা—এ কথা বলার উপায় নাই। সুতরাং
এই আকস্মিক পরিবর্তনটা ইউরোপ সাম্রাজ্য

উদ্ভিঙে পারে নাই; কারণ ক্রমাগত পরিবর্তনের
পর পরিবর্তনের ঢেউ খাইতেছে বলিয়া
তাহার ব্যবস্থা সব খুলাইয়া বাইতেছে।
এই কারণেই যোধ হয় তাহার সাহিত্যের
মধ্যেও তাহার সমাজের রূপটাই বড় হইয়া
উঠিতেছে। এ শুধু ইংলণ্ডে নয়, সমগ্র
ইউরোপে। নরওয়ে সুইডেনে ইব্‌সেন,
ট্রাইন্‌ডবার্গ; জার্মানিতে হাউপটম্যান,
সুডারমান; ফ্রান্সে ভিয়ে, মৌটারলিক;
ইতালীতে ডানান্‌ব্রিও; রাশিয়াতে শেকফ,
এন্‌ড্রিড; ইংলণ্ডে বার্নার্ড শ, পল্‌দুওয়ার্ডি,
সামাজিক নাট্য রচিরা ইউরোপে বিখ্যাত
হইয়াছেন। এমনি এক ধরনের নাট্য-
এপিডেমিক সমস্ত ইউরোপে ছাইরা-বাওয়ার
মত দৃশ্য এ যুগের পুঙ্কে আর কোন যুগেই
হয় নাই—তা সে সব যুগে শেক্সপীয়ার, বা
গ্যারটে জন্মান্‌ না কেন।

কিন্তু বাংলাদেশেও হঠাৎ এই সামাজিক
সাহিত্যের চাব শ্রব হইল কেন? তার
কারণ, আমাদেরও এই এক শতাব্দীর
মধ্যে সমাজে ডাঙা-চোরা ত বড় কম হয়
নাই। :ইংরেজ-শাসন ও শিক্ষা, আসিয়া
এই সমাজকে প্রথম একটোট ভাঙিয়াছে।
ইংরেজের এই নব শিক্ষার গ্রাম্য সভ্যতাকে
নাগরিক সভ্যতার পরিণত করিয়া গ্রাম-
গুলিকে উৎসর ও সহরগুলিকে এসর
করিয়াছে। তার ফলে আমাদের তত্ত্ব
শিক্ষিত সাধারণের বেশের সঙ্গে নাকীর
যে, যোগটুক ছিল সেটা কাটিয়া গেছে
এবং এই সংকীর্ণ শিক্ষিত হল আর বিস্তীর্ণ
অশিক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে বিচ্ছেদের
একটা পাক্তা প্রাচীর গড়াইয়া গেছে।

রাষ্ট্রতন্ত্রের বদলই চাই আর সমাজতন্ত্রেরই বদলই চাই—এই গণতন্ত্রকে বাধ দিয়া কোন তন্ত্রেরই আবাদ সম্ভব চাইবে না। “এমন মানব জমীন্ রইল পতিত আবাদ করলে কলুত সোণা!” কিন্তু কেমন করিয়া যে আবাদ করা যার তাহাইতো সমস্ত। রবীন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন—বঙ্গের সমাজ প্রতিষ্ঠিত কর, পরী সংস্কার করিতে হুহু কর। সে জন্ত বেচ্ছা-সেবকদলের তলব পড়িয়াছিল—কিন্তু এমন বেচ্ছাসেবক ক’জন পাওয়া যায়? তারপর এই রকম বিদ্যু বিদ্যু জলসংগ্রহে কি আর কঠিন ক’ই চাষ করা চলে? বাই হোক এ সমস্তা এখনও মত্ত বড় সমস্তা হইয়া আছে। ইহারি অচল পাহাড়ে ঠেকিয়া সমাজসংস্কারের সলল চোটা চুরমার হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে যে সমাজ সংস্কৃত সমাজ বলিয়া গর্ব করে, এই অগণ্য প্রাকৃত অসংস্কৃত সংস্কার সঙ্গে তার যোগ হয় নাই বলিয়া তাহা আজ জীর্ণপ্রায়, শীর্ণগতি, মূমূ প্রায়। যে যুগে নাড়াবুনের কাণ্ডে ভাঙিয়া কয়তাল তৈরি করিয়া কীৰ্ত্তনে হইয়াছিল, এ যুগের ভক্ত সমাজের বিস্তৃত ধর্ম তাহাদিগকে ত ধরিল না। এ যুগের শিক্ষাও ধরিল না, এ যুগের সাহিত্যও ধরিল না। তার কারণ, নীচ হইতে উপরের দিকে। এ সমস্তের উৎপত্তি ও গতিটা নহ, গতিটা—উপর হইতে নীচের দিকে। এইবার দ্বায়ন্ত শাসনের কলতরীও এই পাহাড়ের পারেই চুরমার হইতে পারে, একথাও আমাদের সন্দেহ নাই হলে যথার্থ প্রয়োজন।

তারপর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে “আমাদের মধ্যে” বিস্তারিত সংস্কারের বদল চাইয়া গিয়াছে। রামমোহন রায় হইতে বিবেকানন্দের কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারাটাকে একবার অগ্রদ্বারন করিলে একথা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি পরবর্তী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের আদর্শ ও প্রশাসনগত প্রভেদ যেমনি থাকুক, এই হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা রকমের পরিবর্তন উপস্থিত করার ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে অভেদ। সেই এক একটা পরিবর্তনের অভিযাত সমাজের চিত্তে ও চেতনার এক এক রকমের প্রতিধাত জাগাইয়াছে। লক্ষ্যাবতী লতার সাড়ার লিপি আচার্য্য জগদীশের হয়ে যেমন খরা পড়ে, তেমনি সমাজের সেই সব সাড়ার লিপি সাহিত্যে নিবদ্ধ হইয়া আছে। যেমন দেবেন্দ্রনাথের কালে অক্ষর মত্ত বিজ্ঞানগত ও রাইকেলের tradition-ভাঙা rationalism-এর, বুদ্ধিবাদের সাহিত্য। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কালে বচিম, চন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্রের nationalism-এর সাহিত্য, traditionalism-এর তিরিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তার সাহিত্য। Reason এবং tradition এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির থাকার সাড়া সাহিত্যে দুই প্রকারে দেখা দিয়াছে। এখন আবার রবীন্দ্র বলেন tradition ভাঙিয়া বাহির হইতে রামেন্দ্র প্রভৃতি বলেন tradition ও reason এর সমন্বয় সাধন করিতে।

অঞ্চল, আচরণ। এই যে, সেই জাতীয়তার মুগ্ধেই বস্তু যে রোমান্টিক ছাওয়াটা বাংলার বহাইয়াছিলেন, যে সব রোমান্টিক চরিত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা 'ট্রাডিশন্'-রক্ষক অক্ষর সরকার মহাশয় বা চন্দ্রনাথ বসুর মনঃপূত হয় নাই। কারণ, সমাজকে তাহাও যা দিয়াছিল এবং যা দিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছিল। স্মৃত্তাঃ সমাজই যে সব সময়ে সাহিত্যকে জাগায় তাহা নয়, সাহিত্যও সমাজের মধ্যে নব নব আন্দোলনের স্বরূপাত করিয়া দেয়। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে। একের ক্রিয়া অন্তে প্রতিক্রিয়া জাগায়। সাহিত্যের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সমাজে বেধি; জীবনের সমাজের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে বেধি। মনে করুন, বস্তুই যে রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টি না করিতেন, তবে বাংলা সাহিত্যের পরিসর কতটুকু থাকিত? তিনি তাঁহার অপূর্ণ কল্পনা-শক্তির দ্বারা যে সব নতুন আদর্শ (types) ও যে সব নতুন প্রকৃতি (temperaments) গড়িয়াছেন, সেগুলি এখন সমাজের বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এখন তাই রোমান্টিক পুরু সম্পূর্ণ শব্দ না হইলেও 'রিয়ালিস্টিক' বা বাস্তব সাহিত্য-পরের আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্বর্গের পর অন্ধ এলিয়টের মত, ভগ্নের পরে বাস্তবিকের মত, বস্তুদের পরে রবীন্দ্রনাথগ্রন্থ প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকগণ দেখা দিয়াছেন। তবে স্বর্গ ও ভগ্নে যেমন চিরকাল নতুন, বস্তুদের নতুনও মোহও তেমনি দুটিবার নয়।

তার পর রামকৃষ্ণ, বিষ্ণুরক্তক, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের মত ধর্মসংস্কারক নহেন বটে, কিন্তু রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের চেয়েও তাঁহার ধর্মের সংস্কারকে বেশি বই কম যা মেনে নাই। গুটানের চর্কেও তাঁহারের ব্রহ্মসূত্র হইয়াছে, মুসলমানের মসজিদেও হইয়াছে। কোন ধর্মমত, কোন ধর্মসাধনাই তাঁহারের অনাদরনীয় হয় নাই। নিরাকার ঈশ্বর যেমন তাঁদের সম্বন্ধনীয়, চিৎকার ঈশ্বরও তেমনিই। বিষ্ণুরক্তক কুলগুরু ত্যাগ করাইলেন; তাঁহার মন্ত্রগ্রাহী শিষ্যদের মণ্ডলীতে পণ্ডিতোজ্ঞান থাকিলনা; জগদ্রাধনামের মত তাঁহার আশ্রমে ছত্রিশ জাতকে তিনি এক মিলনস্থলে বাবিলেন। এ গুলিও ধর্মসংস্কার। বিবেকানন্দ 'ছুত-মার্গের' প্রতিবাদ করিলেন; 'অপুত' জাতির লোককে নাস্তরায় বলিলেন ও সেই নর-নারায়ণের পূজার দেশকে উদ্বোধিত করিলেন। ইহাও ধর্মসংস্কার নয় কি?

ধর্মের এই উদ্বোধন হিন্দুর চিরকালের বিশেষত্ব বলিলে চলিবে না। এ কালে ইহা বিশেষভাবে আমাদের সমাজকে নাড়া দিয়াছে ও এখনও ভিতরে ভিতরে দিতেছে। বস্তুদের রোমান্টিক সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের সীতিকাব্যও সমাজকে আর এক দিক হইতে নাড়া দিতেছে। স্মৃত্তাঃ পূর্বে কালের সমাজে আর এ কালের সমাজে বিস্তর প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। এক দিকে কালের পরিবর্তন, জীবন পরিবর্তন, পারি-পার্শ্বিকের পরিবর্তন; অন্য দিকে তাবের পরিবর্তন, আদর্শের পরিবর্তন, পরিপ্রেক্ষণ-ত্বের (perspective) পরিবর্তন। আর

এই পরিবর্তনও এখনি আকস্মিক যে সেই আকস্মিকতার অন্তর্গতই বাংলাদেশে সামাজিক সাহিত্যের পরিমাণ অত্যন্ত স্বেচ্ছায় সাহিত্যকে হীনমান করিয়া দিয়াছে। বাংলার চিরকালে গার্হস্থ্য উপভোগ এখন সামাজিক উপভোগ হইয়া উঠিতেছে।—রবীন্দ্র-নাথের গোরা, ধের-বাইরে; প্রভাত-কুমারের নবীন সন্ধ্যা; শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের

চরিত্রহীন, বড় দিদি, প্রভৃতি; চারু.বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্রোতের ফুল—উদাহরণ। ছোট গল্পও প্রভাত, শরৎ, চারু, মণিলাল, প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলিকেই গল্পের মধ্যে ফলাইয়া তুলিতেছেন। সামাজিক নাট্য জিনিসটা বাংলার এখনো আপো নাই—তবু ‘অচলারতন’ ও ‘বেবোতর’ দুইটি মাত্র এই স্বেচ্ছায় নাট্য দেখিয়াছি।

ঐ অমিতকুমার চক্রবর্তী।

পরম ক্ষণ

আজ বেহুড়া একতারাতে তার জুড়িহ বুক ছিঁড়ে,
মন-নবীতে প্রতিফলিত ছড় টানিহ শেষ বোড়ে।
স্বপ্ন ছিল, ধ্যান ছিল বা, রূপ ধরে তা ঘের দেখা—
একলা পথের বাতী তবু, আজ তো আমি নই একা!
ময় পড়ে অরুণ আলো আকাশ-ভাষার ইন্ডিতে—
নবীন গ্রহের আঘাত পেয়ে, মন উতলা কোন্ গীতে!

নবীর বালি, বনের আলি, গিরির অটার সূর্য্যোদয়,
অমর ধরীর নির্জনতা গোরবে গায় আলোর অর।
হাওয়ার গানের চাইতে মধুর গান গেয়ে কে যায় চলে?।
বন-লভিকার ফুল-মেঘলা এলিরে পড়ে তার কোলে।
দূর জনমের লক্ষ যুগের মিশন-ভরা আবছায়া,
আবেক-গাওয়া গানের কলি, তুলিয়ে নিল সব মায়া।
ঠেরবে কে কুমার বন্দী হ'য়ে এই গ্রহেরি পিঙ্করে?
কুহু আমার মানস-শব্দ সাগর-হরে বার ভরে!।
অদৃষ্ট আজ বিশ্বাসিহু, নিত্য এব সত্য দে,
ময় হ'ল সম্মেহ সুব আনন্দেরি প্রেম-রসে।

ঐ কল্পানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৭-ছুট

স্বামী আমার ভালোবাসেননা এ-কথা বলে আমি জানি কেউ বিশ্বাস করবেনা। সবাই বলে আমি ভাগ্যমানী—এমন রূপবান, গুণবান স্বামী কল্পনের হয়! সত্যি, তিনি গুণবানও বটে, রূপবানও বটে—এ কথা তাঁর শত্রুও স্বীকার করবে,—আমি তাতে না বলিনা। আমি শুধু বলি—বলি কেন বলচি?—এ পর্যন্ত ত মুখ-ছুটে বলিনি—আমি মনে-মনে জানি তিনি আমার ভালোবাসেননা। এ-কথা নিয়ে তর্ক করতে গেলে আমি ছেঁরে যাবো। কারণ তিনি যে আমার ভালোবাসেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পদে-পদে দিচ্ছেন। সেই সব দৃষ্টান্ত ধরে দিলে আমার কিছু বলবার আর মুখ থাকবে না। সচরাচর অভাব বলতে আমরা বা বৃদ্ধি তেমন কোনো অভাব ত তিনি আমার রাখেন নি;—রাখির ঐশ্বর্য আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। লোকে বলে এসবই ত ভালোবাসার চিহ্ন! তা হতে পারে। কিন্তু তবু আমার মন স্বীকার করেনা যে তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি। তবে কি পেলে ভালোবাসা 'পাওয়া হয়? তার উত্তরও আমি জানিনা—আমি শুধু জানি তাঁর ভালোবাসা আমি পাইনি!

সই সেদিন দুঃখ-করে বলছিল যে সে বড় অভাগিনী। কারণ তার স্বামী তারি পরীব। গারে ছু-খানা গরনা পরা, ভালো ছুটি খাওয়া, পারের উপর পা দিয়ে বসে থাকার সাধ

এজয়ে তার মিটলনা। শুনে আমার ইচ্ছে হতে লাগল আমার এই গরনার লোহার নিন্দুকটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমি একটু নিখাল কেলে বাঁচি! সত্যি বলতে কি, ঐ গরনাগুলো দিন-দিন যেন পাখরের মতন ভারি হয়ে আমার বুকে চেপে বসছে। ওর ত ক্ষয় নেই, বরং বেড়েই চলেছে;—উপলক্ষ্যে, বিনা-উপলক্ষ্যে স্বামীর উপহার পেয়েই চলেছি। এক-এক-সময় তাবি তিনি এত উপহার আমার কেন দিচ্ছেন? দিয়ে যে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে এমন ত কিছু মনে হয় না—বেওয়ার ভিতর যে একটা আবেগ আছে তাও ত দেখতে পাইনা। এ যেন বেওয়ার একটা প্রথকে শুধু মনে চলা মাত্র। এ-বাড়ির বৌদের গরনার তালিকা একেবারে ডাকসাইটে। শুনেছি আমার শাওড়ি এবং তাঁর শাওড়ির গরনা এখনো বা মালখানার জমা আছে তাতে হীরে-অহরত ও সোনারূপোর ছোট-খাটো মন্থমেন্ট তৈরি হতে পারে। আমি কোনো-দিন স্বামীর কাছে গরনা চাইনি—আর চাইবার ফাঁকই বা কোথায়! কিন্তু আমার মনে হয় তিনি যদি ঐ চাইবার অবকাশটুকু দিতেন, আশি পুসি হতুম।

আমার সইয়ের হাতে ছগাছি থেলোয়ারি ঝাঁচের চুড়ি। আমি জানি এক-মোড়া সোনার বালায় অস্ত্রে সে প্রতিদিন তার স্বামীকে উতাস্ত করে;—এক-এক-দিন কুতল ঝণড়াও হয়। হয় ত ঐ সোনার

বালা কোনো দিনই সে পাবেনা—চির দিন তার মনে খেদ থেকে যাবে ঐ টুকুর জন্তে। কেন-আনিনা আমার কিন্তু পোনা ছেড়ে ঐ খেদটুকুরই উপর তারি লোভ হয়।

স্বামীর সঙ্গে বগড়া করে এসে সই আমার কাছে কান্ডিতে থাকে। আমি তাকে কখনো প্রবোধ দিইনা। সে হয় ত মনে ভাবে আমি পাষাণী! নয় ত ঠাউরে নেয় আমার অভাব নেই বলে আমি অভাবের দ্বংধ বুলি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তার ঐ চোখের জলে আমি তারি একটি আনন্দ পাই। মনে হয় ঐ কান্নার জল পেয়ে তাদের প্রেম-সত্যিকারি বাক্ত হই উঠছে,—নিশ্চয় এমন দিন আসবে যখন সেটি গুল্প-পল্লবে নিবিড় হয়ে তাদের মূল-মূলিক্কে কুন্দের মত ঘিরে থাকবে! বেচারী জানেনা ঐ কান্নার জল ঘিরে সে কাকে সিঞ্চন করচে। আমি অমন কাঁদতে গেলে বর্ডে যেতুম। অবস্ত আমিও কাদি—কিন্তু আমার চারিদিকে যে মরুভূমি! আমার চোখের জল গড়িয়ে তার উপরেই পড়চে!

সইয়ের দ্বংধ কিসের? সে তার স্বামীর পেয়েছে। সুখে না বলে বেড়ালেও, তার সমস্তটা ভা জানান দেয়,—তার কান্নার, তার রাগে, তার অভিমান, তার আনন্দে আর ত কিছু নেই—আছে কেবল তার স্বামী। তবু সে বলে তার সুখ নেই। আমি ত তার সুখের অভ্যাস দেখতে পাইনা। আমি আনি আমার ভাগ্যকে সে হিংসা করে; কিন্তু আমি যে তার সৌভাগ্যের হিংসা করে থাকি সে ভা জানেনা!

আমি একদিন সইকে বলুম, সই, গদনার জন্তে তুমি এত দ্বংধ কর কেন? এই ত আমার এত গদনা—সুখ আমার কৈ!

সই কপালের দিকে চোখ তুলে বলে, ওমা বোশোনা! তোমার আবার সুখের অভাব বোনা! তুমি হলে রাজরাণী!

আনি বলুম, রাজরাণী হলে কি দ্বংধ থাকেনা?

সে বলে, সে হচ্ছে সৌখীন দ্বংধ। বেশি মিলিতে সুখ নেয় যেহ না?—ভেমান আর কি!

আমার যে দ্বংধ আছে সইকে তা বোঝাতে পারলুম না। তবু সই কেন, এ-জগতে কাউকে বোঝাতে পারব কি-না সম্ভব। কারণ বাইরে সুখের সকল ঠাটাই যে আমার বজায় আছে। আমার মনের দ্বংধ আমার অন্তর্ভাগীই জানেন। আনি তারই পারে আমার সকল দ্বংধ নিবেদন করে জানাই—কাউকে কিছু বলি।

আমার স্বামীকে লোকে বলে ব্রৈণ। তিনি আমার রান-রান উপহার এনে দেন বলেই বোধ হয় এই কথাটা উঠেছে। হারয়ে আমার কপাল!

আমার স্বামী ব্রৈণ—একথা সত্যিও নয়, মিথ্যাও নয়। সত্যি নয় এই জন্তে যে তিনি কোনো দিন আমার কথা-মতো চলেননি, কারণ আমি তাঁকে কখনো কোনো আদেশ করিনি; মিথ্যা নয় এই জন্তে যে তিনি কখনো আমার অবাধ্য হননি, কারণ তাঁকে আমি বাধ্য করার চেষ্টাই করিনি। তিনি যদি কোনোদিন আমার শাসন করতেন,

তাইলে দানন কাকে বলে তাঁকে টের পাইয়ে দিচ্ছ। তিনি যদি আমার বাধা করবার চেষ্টা করতেন তাহলে মনের আশ-মিটিয়ে তাঁকে আমার বাধা করে নিতুম— ছাড়তুম না! কিন্তু তা ত হলনা। ছেলে-বেলার পুঁতুল নিয়ে বা-খুসি-তাই করেছি— মেরেছি ধরেছি আদর করেছি, কোনো বাধা পাইনি, তাইতে অপ্রতিহত খেলার সখ একেবারে মিটে গেছে, এখন বোধ হয় তাই দাত-প্রতিদাতের খেলা খেলতে না পেয়ে কুণ্ঠি হচ্ছেনা। মনে-মনে ভাবি চিরকালটা কি সেই পুঁতুল-খেলাই খেলতে হবে! তোমরা আমার অপরাধ নিয়োনো— সত্যি বলতে কি, এক-একসময়ে স্বামীকে আমার একটি প্রকাণ্ড পুঁতুল ছাড়া আর-কিছু মনে হয় না। একথা বহুদূর বলে মনে কোরোনা স্বামীর প্রতি আমার অডম্বিত আছে। স্বামীকে আমি দেবতার মতন ভক্তি করি। আমার বাপের বাড়ির ঠাকুর-ঘরে সেই প্রকাণ্ড বিগ্রহের সামনে পাঁড়িয়ে আমার মাথা আপনি যেমন হুয়ে আসত, স্বামীকে সেখেন ঠিক তেমনি হয়। স্বামী যখন আমার কাছে এসে ঝাঁকান, তখন আমায়ের সেই পাখরের ঠাকুরটিকে আমার মনে পড়ে। ছেলেবেলার ঠাকুরের কাছে বেতে বুক ছম-ছম করত—দূর থেকে প্রশম করে পালাতুম; আমার স্বামী-দেবতাটিকেও তেমনি দূর থেকে মনে-মনে প্রশম করি—তার কাছটিতে বাওয়া ঘটল না। দেবতার স্বর্গে থাকেন, মাহুয়ের সঙ্গে তাঁদের অনেক তফাৎ। স্বামী আমার মনের মন্দিরে সেই দেবতা হয়েই রয়েছেন—

তাঁকে নিয়ে খেলা করা আমার হলনা। স্বামীকে দেবতার আসন থেকে নামিয়ে মর্ত্যালোকের মাহুয় করে কোরে তাঁকে অপমান করা হয় কি-না জানিনা, কিন্তু স্বামীকে মাহুয়-রূপে পাবার ক্ষেত্রে প্রাণের বে একটা কান্না আছে, তার স্বর ভিতর থেকে অনবরত শুনি। ওগো আমার দেবতা, আমার অপরাধ নিয়োনো। তোমাকে ভক্তিতরে অর্চনা শু করছি; তাতে হয় ত পরকালে আমার অক্ষর স্বর্গ-লোকের ব্যবস্থা হবে; কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে আমার ইহকালের মর্ত্যালোকের দিন কাটে কেমন করে! অক্ষর স্বর্গ আমি চাই না, তুমি আমার এই মর্ত্যটিকে অপিকের ক্ষেত্রে স্বর্গ কোরে তোলো! শুধু আমার পূজা নয়—আমাকেও হাত ধরে নাও।

সই তার স্বামীকে ভক্তি করে। কিন্তু শুধু তার সঙ্গে বগড়া করতে, তাকে গালাগাল দিতে, অপমান করতে ছাড়ে না। তার স্বামী নিশ্চয় তাকে উদ্বে দেয়, নইলে সে যখন সহজ-অবস্থার থাকে স্বামীর নিম্মা তার মুখে কখনো তিনিনি; বরং আর-কেউ নিম্মা করলে সে কোঁস-করে ওঠে—অসহ্য হলে উঠে চলে যায়। স্বামীকে অপমান-করা, গালাগাল-দেওয়া বে মত বাহাদুরী তা আমি বলছি না, কিন্তু স্বামী যেখানে মাহুয়ের রূপ-ধরে খেলা করেন এবং খেলান সে হয় ত বড় খেঁউল নয়, নষ্টমন্দির মাত্র, কিন্তু তারও চূড়া স্বর্গের দিকেই ঝুঁলে উঠেছে।

আমার স্বামী এমন কেন? তার ত

কোনো ঘোষ নেই, তবে কেন তিনি এমন ? আমার মনে হয়, তাঁর কনক-দেউলে ভালোবাসার প্রদীপটি স্থান পায়নি। সমস্তটা অন্ধকার থেকে গেছে। সেখানে দীপদান—আমি অভাগীও পারিনি—পারিনি ! সে দুর্ভাগ্য আমার স্বীকার করি কিন্তু আমি ভাবি আগে থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কেমন আছেন ? আমার হাতে দীপ জ্বলেনি বলে আমার অসহ্য দুঃখ আছে মানি, কিন্তু এ পরিপূর্ণ অন্ধকার সে আরো ভয়ঙ্কর। যদি অস্ত পুষ্কারিণীর হাতের দীপ সেখানে জ্বলে, সে যে এর চেয়ে শতগুণে ভালো।

তোমরা আমার ঘোষ দেবে—আমি কেন সে যদিপ্রদীপ জ্বালতে পারিনি। কিন্তু কেমন করে পারব ? আমি যে সে-দেউলে প্রবেশের পথই পেলুম না। সেখানে যে গায়ের দোরে বাওয়া যায় না—তার খোলবার কোনো মন্ত্রও নেই। বার দেউল সে নিজে না খুলে দিলে তার সকল আট-ঘাট একেবারে নিরেট হয়ে থাকে। নিতান্তই আমার অসুখ ! তাই হতভাগী আমি কাউকে কিছু বলতে পারিনি। স্বামী যদি আমার বঞ্চিত করতেন, সে বক্রনার দুঃখও ত আমি পেতুম—কিন্তু এ যে কিছুই পেলুম না।

অথচ স্বামী আমার কপূর্ণ, নিষ্ঠুর নন। তাঁর শরীরে ধরাযারা আছে এবং সব-চেয়ে বেশি করে আছে তাঁর কর্তব্যবোধ। এই ক্ষেত্রেই লোকের কাছে তাঁর এত স্খাতি। কর্তব্যের খাতার লম্বাখরচের হিসেবটি তিনি এমন পরিষ্কার করে রেখে চলেন যে কোথাও

ভুলত্রুটি ঘটতে পার না। আমার পাওনা তিনি হিসাব-মতো কড়ান-পড়ায় চুকিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর হাতের এই দাতবাটা আমার সব-চেয়ে বৃক্ষে বাজে। আমার মনে হয় কর্তব্য বেন একটা রাক্ষস ! সে আমার দামীকে মায়া-পাশে জড়োয় করে রেখে আমার মন-ভোলাবার ক্ষেত্রে নানা রকম ফাঁদ পাতেছে—আমাকে তার প্রেমসী করে নেবে। ওগো, আমি তার মোহে ভুলতে পারব না,—এই রূপা কুশটারুতি আমার স্বাভা হবেনা—ঐ রাক্ষসের দান গ্রহণ করে আমার অন্তরের সত্য-সাথীকে কলঙ্কিত করতে পারব না। ওগো আমার স্বামী, তুমি কোথায় ? তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসের হাত থেকে আমার বাঁচাও—আমার সত্যের রক্ষা কর।

স্বামীর এই কর্তব্যের দান গ্রহণ করতে আমার মন বিমূঢ় হয়ে ওঠে—আমি মনে-মনে প্রতিবার প্রাত্যাহান করি—এ কি তিনি দেখতে পান না ! তা যদি দেখতেন, তাতে তাঁর মনে যদি দুঃখ হত, রাগ হত, অভিমান হত—সেও যে আমার বাবার মণি হয়ে থাকত !

সই'সে দিন কাঁধতে-কাঁধতে এসে বলে যে তার স্বামী তাকে ঘেরছে। কপালে তার রক্তের দাগ। দেখে আমার মন যে কী খুসি হল বলতে পারিনি। আমি হেঁসলুম তার কপালের সেই দাগ তার বাবার সিঁহুর একেবারে দান করে দিয়েছে। কে বেন একশানা প্রকাণ্ড চুনি-বলানো শিঁতি আদর করে তার কপাল রেঁপে পরিবে দিয়েছে। আমি বলুম, সই'সে পয়নার

হুঃখ কর, আর তুমি বে-পরৱা পেয়েছ আমার রাশত্যাগীর তাগীর উদ্ধার করে কেনেও অমন-একখানি পাবেনা। সেই অবাধ হয়ে আমার সুখের দিকে চৈরে রইল। হঠাৎ ডাবলে আমি পাগল হয়েছি। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার সেই অপক্লপ অলঙ্কারের দিকে লুচ্চ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম।

পরনার উপরে লোতের অস্ত্র মনে-মনে সইকে কত বৃণা করেছে—তার হয়ে লজ্জা বোধ করেছে; কিন্তু একদিন দেখি তার এই লোভ হঠাৎ এক ঘূর্ণির হাওয়ার উড়ে গেল—তার অস্ত্রে কিছুমাত্র ক্ষোভ করলে না। আমি আশ্চর্য্য হলুম। তার চার-পাছি বাত্ সোনার চুড়ি ছিল। সেগুলি সে অতি-যত্নে আঁকড়ে রেখেছিল। সর্বদাই বান্ধ-বন্ধ থাকত—কোনো বিশেষ উপলক্ষ্য না হলে তারা হাতে উঠতে পেরে না। তারপর স্বামীর অস্থব্ধ হতে যখন ডাক্তার ডাকবার পরলো নেই, তখন সই হাসিমুখে চুড়ি চারপাছা বার করে দিলে—হুঃখের কথা মনেই এল না—বরং সেগুলোকে বিসর্জন দিয়ে কৃতার্থ বোধ করলে। সইয়ের চারপাছি বাত্ চুড়ি ছিল তাও 'গেল'—আর আমার পরনার শেষ নেই! সিন্দুক খুলে বসে আমি অবাধ হয়ে জাতি—এ ত পরৱা নয়—এ বেন অগতের খত বার্থতার লজ্জাল আমার সিন্দুকে এসে ঠাণা হয়ে কমেছে। সইয়ের সামান্য চুড়ি চারপাছি বিক্রিয়ে গিয়েও অমূল্য হয়ে রইল—আর আমার এই অমূল্য হীরা-মহরতগুলোর কোনো দামই উঠল না।

আমি শুনেছি আমার এই পরৱা দেখে অনেক মা কামনা করেন যে তাঁদের মেয়ে যেন আমার মতম সৌভাগ্যবতী হয়। শুনে আমার গা শিউরে উঠে! আমি দুখ-ফুটে কিছু বলতে পারিনা—মনে-মনে বলে উঠি, হে ভগবান আমার এই সৌভাগ্য থেকে এই অভাগিনীদের রক্ষা কর।

আমার মনে পড়ে স্বামীর সঙ্গে বেদিন আমার গাট-ছড়া বাঁধা হয়। সেদিন সে কত উল্লু-ধ্বনি—কত শব্দ-ধ্বনি! সেই শব্দে আমার বুকের কপাটখানা খর-খর করে খাঁপছিল। দেখলুম গায়ে শাল গেলির জোড়, গলায় সাধা ফুলের গোড়ে, মাথায় সাধা অরির টোপর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্বামী! এই আশ্চর্য্য সুস্থির দিকে ছেলেমাছুব আমি অবাধ হয়ে চেয়ে ছিলুম। তাঁকে আমার তখন ঠিক মাহুব বলে মনে হচ্ছিল না—বেন কায় হাতে-গড়া একটা প্রতিমূর্তি—বেন চিত্রপটের ছবি। আমি কৌতূহলী হয়ে বাত্-বার সেই ছবির দিকে চেয়েছি—কেবলই বিম্বর হয়েছে। ছবি আমার দেখি, ছবি আমারের দেখছে কি-না, এ প্রশ্ন যেমন মনেই ওঠে না, তেমনি তিনি আমাকে দেখছেন কিনা, কেমন-করে দেখছেন এ কথা তখন একবারও মনে হয়নি। এখন কিন্তু জানবার তারি ইচ্ছে হয়।

স্বামী যখন প্রথম আমার ঘরে এলেন, আমার তখন বাগের বাড়ীর অস্ত্রে মন-কেনন করছিল। তিনি এসে আমার চোখ-মুছিরে দিলেন, আমার সঙ্গে খেলা করতে

বসে গেলেন। তার পরেও যখন কেঁদেছি, আমার চোখ-মুছিয়ে দিয়েছেন, নানা-রকম খেলনা এসে আমার মন তুলিয়েছেন। সে আমার বেশ লাগত। তারপর ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন-বাড়ী আমার কাছে যেমন সহজ হয়ে আসতে লাগল, চোখের মল যেমন দিনে-দিনে শুকিয়ে এল, আমার চোখের উপরে তাঁর হাতের সেই স্পর্শটিও ধীরে ধীরে খসে যেতে লাগল। এ যেন ঠিক পোষ-মানানো। পোষ-মানানো শেষ হয়ে গেলে পোষ-মানাবার মস্তের আর ধরকার রইল না—তখন শুধু যা বরাদ্দ, যা বাঁধা-খোরাক তাই রইল।

বিয়ের পর ঐ কটা দিন আমার স্বপ্নের মতো কেটেছে। তার পর কেমন-করে ধীরে ধীরে সেই স্বপ্নরাশা থেকে এই দিবালোকের প্রথম রৌদ্রের মতো এসে পৌঁছলুম তার হৃৎ হৃৎ আমি খুঁজে পাই না ;—সে স্বপ্নরাশা থেকে যে বাইরে ঠিকরে পড়েছি শুধু তাই আমি। হঠাৎ একদিন চমকে উঠে দেখলুম এই বাড়ির আসবাব-জুলোর মতোই আমি এক-কোণে পড়ে আছি। গাঙোজনের সাথী, ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করবার একটা সম্মান আসবাব—আর কিছু নয়।

কিন্তু কেন এমন হল? স্বামীকে আমার দোষ দেব কোথা থেকে আমি খুঁজে পাই না—তিনি ত অস্তায় কিছু করেন নি। নতুন জিনিষ পুরানো হয়ে এল তার উপর থেকে টান আপুনিই কমে আসে—আমার ভাগ্যও ঠিক তাই হয়েছে। তিনি অবরুদ্ধ করে ত কিছু করেন নি।

আমি যে তাঁর চোখে পুরানো হয়ে গেলুম! আমার রূপ নব-নব উষার যে আলোতে সৌন্দর্য্যের একটি-একটি মল মেলে দেবে, সে আলো আমার ভাগ্যে এসে পৌঁছবার আগেই আমি করে পড়লুম। তবে দোষ দেব কার?

একই সময়ে আমি আর সেই স্বপ্ন-ঘর করতে আসি। একই হাওয়ার আমরা তখন ছই-সখীতে হেলছিলুম, তুলছিলুম। আমরা দুজনে বসে চুপি-চুপি কেবল স্বামীর কথাই কইতুম—গানের গুণনের মতন। সেই গানের স্বর ক্রমে ক্রমে আমার গলায় ক্ষীণ হয়ে হঠাৎ একদিন একেবারে ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সেইরকম দেখি সেই স্বরের ভিতর দিন-দিন নব-নব বেগ ও বিচিত্র নীলা খেলে উঠছে। তার গানে এখনো ক্রান্তি আসেনি, আর আমার স্বর কবে হারিয়ে গেছে! আমি মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনি, সে তত্বর হয়ে গেছে যার, আমার স্বর যে বন্ধ হয়ে গেছে তা ধরবারও তার অবসর নেই।

সই তার স্বামীর ছোট বরট একেবারে জুড়ে বসতে গেলে, আর এত বড় বাড়ীতে আমি কোণার হারিয়ে রইলুম। সই আমার বলে, কি ভাগি তোমার! তারে-তারে তোমার পারে পূজার উপহার আসছে, —তুমি রান্নাভোজ্যের আসনে বসে আছ! শুনে আমি মনে-মনে হাসি। হায় রে, এ উপহার কি আমার? এ তারই স্নেহ যে এ-বাড়ির বড়-বৌ নাম পেয়েছে। এ বাড়ির বড়-বৌয়ের যে মণীষা এ সব

উপহার উপঢৌকন তারই রত্নবেদীর সামনে
তুল্পীকৃত হচ্ছে। আমার সঙ্গে ঐ বড়-
বোয়ের যে প্রভেদ তা আমি বোঝায়ে
কেনন করে? ওগো, আমি তোমাদের বড়-
বোই হতে চাই না। তোমরা এই সিংহাসনে
আর-কাউকে বসিয়ে সকাল-সন্ধ্যা তার আরাতি
কর, আমার তাতে ক্ষোভ নেই—আমাকে
তবু আমার স্বামীর স্নেহ-নন্দিরে দাসী করে
রেখে দাও!

সইয়ের কথা শুনে-শুনে এক-এক-সময়
তাবি, সন্তা আমার মতন ভাগিয়ামানী কে?
এমন রাজার মত স্বামী আমার, এমন
স্নেহময়ী শাওড়ি আমার! সন্তা, শাওড়ি
কোনোদিন আমার শাওড়ি হবেন—চিরদিন
আমার মা। সেই প্রথম-দিন বরণ করে
ঘরে তুলে তিনি আমার মুখে-চোখে হাত
বুলিয়ে দিচ্ছেলেন—সে স্পর্শ আমি এখনো
কুলতে পারিনি। নিজের পেটের ঘরের
চেয়েও যেন তিনি আমার বেশি-করে
বেশলেন। তাঁর রাজার ঘরের বড়-বোই
আমি—আমি কি তাঁর কম আদরের!
তিনি আমার এত বেহা করেন যে মনে
হয় একটু উঠে-নড়তে আমার কষ্ট হবে
ভেবে তাঁরও কষ্ট হয়। তিনি আমাকে
নিজের ঘরের মতন দেখেন বটে কিন্তু
তিনিও কি ভুলতে পেরেছেন যে আমি
এ বাড়ির বড়বোই মাতা? তিনি নিজে এ
বাড়ির বোই হয়ে এসে যে-সব ধনসম্পদ
লাভ করেছিলেন, পাছে তার একটা থেকেও
ভুলক্রমে আমি বঞ্চিত হয়ে যাই এর
জন্তে সর্বদাই সাবধান হয়ে আছেন।

কড়াক-গড়াক আমি সব মিলিয়ে পাচ্ছি
কিনা তা হিসেব করে দেখবার জন্তে
তিনি মধ্যে-মধ্যে দল্লরখানা থেকে পুরোনো
হিসেবের খাতা তুলব করে পাঠান। এ বাড়ির
বোয়ের প্রাণের বর্ধ একেবারে বাঁধা হয়ে
গেছে। মা আমার নিশ্চিন্ত আছেন যে
আমার সেই বাঁধা-বরাদ্দের কোথাও ফাঁক
পড়ছে না,—কিন্তু যে-জিনিসের হিসেব হয়
না—যার অর্থ এ পর্যন্ত অগতের কোনো
খাতার পড়েনি, তার কোনো গরমিল হচ্ছে
কিনা সে খবর কি রাখেন?

আমাকে যখন সাধ-বেবার সময় এল,
বাগের বাড়ি থেকে মা জিজ্ঞাসা করে
পাঠালেন আমার কি কি জিনিষ চাই।
স্বামীর ঘরে আমার কোনো জিনিসেরই
অভাব নেই বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত
জিনিষ ঠাসা হয়ে আছে, তবু মায়ের ঐ
চিঠিখানি পেয়ে মনে হল আমার বিস্তর
জিনিসের দরকার—আমি একটা প্রকাণ্ড
ফর্দ লিখে ফেললাম। এখানে কিন্তু আমাকে
জিজ্ঞাসা করবার কোনো দরকারই হল না।
শাওড়ি তাঁর সাধের সময় যে-সব সামগ্রী পেয়ে-
ছিলেন তার ফর্দ মিলিয়ে আমার জন্তে জিনিসের
ফরমাল দিলেন। কি একটা জিনিষ তখন
ছাপা বসে সংগ্রহ হল না; তার জন্তে
শাওড়ি ক্ষোভ রাখবার আর জায়গা পেলেন না।
তাঁর সে আপশোসের কথা তিনি এখনও
কুলতে পারেননি। আমি সেই ছাপা জিনিষ
লা পেয়ে কোনো খেদ, কলুষ না দেখে তিনি
আমার সুখ্যাতি করতে লাগলেন, বলেন—
কী লক্ষী বোই আমার! তারপর আমার
স্বামীকে জেক বয়েন—ঐ দামের চেয়ে বেশি

দায়ের কোনো ভিন্দি দিয়ে আমার কতি বেন
পূরণ করে দেওয়া হয়। দায়ের আচ্ছা
প্রতিপালন করে স্বামী আমার হাতে এক
বহুবলী উপহার এনে দিলেন। আমার
সাথ দেওয়া শেষ হল।—দায়ের আমার
সাথ!

মাগো, তুমি আমার অপরাধ নিরো না।
তোমার মেহের দানও আমি মন-খুলে নিতে
পারি না। তুমি থাকে এসব দিক সে
আমি নই—আমি নই! সে তোমার ছেলের
প্রেরণী! যেদিন সে সৌভাগ্য হবে, সেদিন
তোমার এই দান আমি মাথায় করে
নেব—এখন ওসব তোলা থাক!

খুশী বোধ হয় আমার মনের হৃৎ
বোঝে। আমি যখন একলা চুপ-করে বসে
থাকি, সে কোথা-থেকে ছুটে এসে আমার
উপর কাঁপিয়ে-পোড়ে আমার গলা-ঘরে এমন
দায়র করতে থাকে যে আমার সব হৃৎ
খুলিয়ে যায়। সে কেমন-এক-রকম-করে চার
ঘাতে আমার বোধ হয় আমার মনের সমস্ত
অলিগলির ভিতর তার চোখের আলো গিরে
পড়েছে—যেন তার ঐ কটি নরম হাত
আমার বেদনার উপর ঘীরে ঘীরে খুলিয়ে
বাচ্ছে। ও কটি ঘের আমার মনের হৃৎ
টের পেলে কেমন করে? এক-এক-সময়
সে আমার বুকের উপর কান পেতে চুপটি
করে পড়ে থাকে—যেন হয় বেন কি শুনেছে!
নিশ্চয় ও বাহুদয় শিখেছে, নইলে থেকে-
থেকে আমার চোখের উপর থেকে পৃথিবীর
রং কি-করে এমন বদলে দেয়!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা একা চুপটি করে

বসেছিলাম, যেন হাঙ্কিল আমার। বুকের
ভিতরকার অন্ধকারের ছায়া আকাশে ছড়িয়ে
পড়ে আন্ধকের সন্ধ্যাকে ঘনীভূত করে
‘তুলছে’। সমস্ত পৃথিবীটা অগ্নে অগ্নে বাপসা
হয়ে আমার চোখের উপর থেকে মুছে
আসছিল—চারিদিকে কেবল অন্ধকারের
বিরাট শূন্যতা মেগে উঠছিল। আমি ক্রমে ক্রমে
সেই শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে বাচ্ছিলাম। হঠাৎ
খুশী তার বাপকে এনে ঘরে হাঙ্কির করলে।
তিনি বলেন—“তুমি আমার ডাকছিলে?”
আমি চমকে বলে কেমন—“হ্যাঁ।” কিন্তু কৈ
আমি ত ডাকে ডেকে পাঠাইনি—তবে কেন
বল্লব হ্যাঁ। আমি হস্ততঃ হয়ে রইলাম।
তিনি বলেন—“আমার বাইরে বাবার দরকার
ছিল, খুশী কিছুতেই ছাড়লেনা, বলে
আসতেই হবে। কি দরকার বলত?”
দরকার? কৈ দরকার ত কিছুই নেই!
আমি কি উত্তর দেব জানিনা, খুশী আমার
রক্ষা করলে। সে আমার জবাবের সময়
না দিয়েই বলে উঠল—“বাবা, তুমি সেই
গল্পটা মাকে বল!” “ছুটু মেয়ে!”—বলে
একবার চোখ-রাড়িয়ে তিনি বসলেন।
সন্ধ্যাবেলা তিনি কখনো ঘরে আসেন না,
আন্ধ অনৈকজ্ঞপ্ত রইলেন। খুশী এমনি-করে
মাঝে-মাঝে তার বাপকে আমার কাছে
ডেকে নিয়ে আসে, তিনি দেখি মনের
খুসিতেই আসেন—সে আমার বেশ লাগে।
কিন্তু আমি ভাবি তিনি কার টানে আসেন?

খুশীর দরমে শুধু আমার কাছে কেন, বাড়ীর
সকলের কাছেই আমার আবার নতুন-করে
আধর বেড়েছে। খুশীকে যখন কোলে
পেলুম তখন আমার ব্যবহার দেখে আমার

একবার -মনে হয়েছিল তাঁর সেই ছদ্ম-
খেতলে বেন একটু আলোর আভা দেখা
দিয়েছে। কিন্তু সে আমার তুল-সে-
অন্ধকার তেমনি কণ্টিনে আউট আছে। 'অঃ'মি
খুকী'র মা হয়েছি বলে আমার একটা
বেশী আদর পাওনা হয়েছে মাত্র। ওগো
এ সংসারে শুধু কি এমনি-করে দেনা-
পাওনার হিসেবই চলবে ?

খুকী এসে তার মা ও বাপকে নিয়ে
নতুন এক খেলা খেলছে। সে খেলার
প্রধান হচ্ছে সে নিজে—আমরা ছদ্ম খেলার
খুঁটিমাত্র। খেলার খোঁকে দুই খুঁটি
যেমন একএকবার এক-বরে এসে বসে,
তেমনিধারা মধ্যে মনো আমাদের ছদ্মনের
মিলন ঘটে, কিন্তু তারপর আবার যে বার
নিজের কোটে প্রবেশ করি।

ঐমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আর্টে প্রেম

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' !—সুতরাং
শিল্পীদের পক্ষেও এ অগংঝোড়া ফাঁদ
এড়াইয়া চলা শক্ত কথা। পৃথিবীর সকল
জাতির ললিত কলাই তাই প্রেমের পেলব
সম্পর্কে কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাগৈতিক শিল্পে দুটি বিষয়ের প্রাধান্য
দেখা যায় ;—ধর্ম আর প্রেমের ছবি।
আগেককার শিল্পীরা ধর্মকেই একান্ত ভাবে
অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাইকেল এঞ্জিলো,
রায়কেল, লিওনার্ডো ডা ভিন্সি, টিসিয়ান,
গোনাতেলো, বোটিশেলী প্রভৃতি শিল্পীরা
ধর্মের নত নত চিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।
বাইবেলের একই বিষয় লইয়া তখনকার
ছোট-বড় অসংখ্য শিল্পী এতটা মাতিয়া
উঠিয়াছিলেন যে, দেখিলে অবাক মানিতে
হয় ; আর্টের এতটা ধর্মপ্রাণতার 'আসল
কারণ হইতেছে এই যে, সে যুগের পৃষ্টির
চার্জগুলিই, প্রধানত শিল্পীদের পালন-ভার

গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্মের নিরাপন্ন ছায়ায়
ঠাই না পাইলে লোকলের আঁট কখনো
টিকিয়া থাকিতে পারিত না। রোমের
পোপদের নেক-নজর পাইয়াছিলেন বলিয়াই
রায়কেল ও মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি
অনেক গুস্তাফ-শিল্পী এত-বেশী নাম করিয়া
গিয়াছেন। এই-সব সুবিধার জন্ত শিল্পীরা
প্রথম হইতেই তখন আর্টের সঙ্গে ধর্মের
সম্পর্ক পাতাইতে চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু, অনেকসময়ে এই সম্পর্কটা যে
জোর-করিয়া পাতানো হইত, তাহারও
চের প্রমাণ আছে। শিল্পের মধ্যে নিছক
ধর্মের প্রকাশ ক্রমে একটা বাঁধা গৎ
হইয়া পাড়ানোতে আর্টের অস্বকৃতি ও সর্কারী
হইয়া আসিয়াছিল। তাহারদের অনেকেই
প্রাণের টানে আর ধর্মের ছবি আঁকিতেন
না ; 'আঁকিতেন, দস্তুর বলিয়া। ফলে
আর্টের স্বাধীনতা, বিচিত্রতা ও ভাবুকতা



প্রমাণাপ

(Boucherএর আঁকা ছবি হইতে)

কমিরা আসিয়াছিল। অমন্ যে বিখ্যাত চিত্রকর চিসিয়ান, পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনিসে যাহার ছোড়া মিলিত না, চলতি সৌতির নিগড়ে বাধা পড়িয়া তিনিও কলালক্ষ্যের মান রাখিতে পারেন নাই। তাহার চিত্রের পাত্র-পাত্রীরা দার্শনিক বটে; কিন্তু সমালোচকের মতে তাহার প্রাণহীন। (He painted many "Assumptions," but although so much of his work devoted to sacred subjects it is curiously lacking in soul, even when perfect in detail of colour and workmanship.) বিখ্যাত কবাসী চিত্রকর Boucherও প্রথম জীবনে অন্তরে

দেখাযেখি ধর্মকে চিত্রবস্তুর করিতে গিয়াছিলেন। সে-সময়ে তিনি যে ছ-চারখানি ধর্মমূলক ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার নিজস্ব বিশেষত্ব বা ভাবের ছাপ কিছুই ছিল না। তিনি নিজের প্রাণে ধর্মকে অনুভব করেন নাই,—লোকে যেমনটি চায়, বাজারে যে ধরণের ধর্মের ছবি বেশী বিক্রী হয়, তিনি সব্ব ঠিক সেই রকমেরই ছবি, দস্তুর বজার রাখিয়া আঁকিয়াছিলেন। সুতরাং সে অনুভবের কি . আট, আর কি ধর্ম—এ-দুয়ের কোনটিই বিকাশ লাভ করে নাই। কিন্তু ভিতরে প্রতিভার প্রবীণ থাকিলে পথ চিনিতে দেহি লাগে না। প্রতিভাবান



প্রণয়ী

(মার্কাস টোনের আঁকা ছবি হইতে)

Boucher শীঘ্রই আপনার ভ্রম বুঝিয়া
 ধর্মমূলক ছবি-আঁকা ছাড়িয়া—বেগিকে তাঁহার
 প্রাণের টান, সেই—প্রেমকে অবলম্বন
 করিলেন। ফলে অল্পদিনের ভিতরেই
 দেশ-বিদেশে তাঁহার নাম রটিয়া গেল।

একজন প্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক
 বলিয়াছেন, man's the
 revelation his soul's appetites,

the confession of what he has felt
 most intensely, set his heart upon
 most keenly.* এই কথাগুলি না বুঝার
 দরুণই শিল্পকগণে আমরা আজ এত ভাব-
 জীন ও প্রণয়ন ম্যাডোনার স্ততি দেখিতে
 পাই। এসব ছবি দেখিয়া না-চর স্তম্ভিত
 না-চর চাপ :—এরা শুধু মৌন ভাষায়
 শিল্পীদের কলক বোষণা করে!

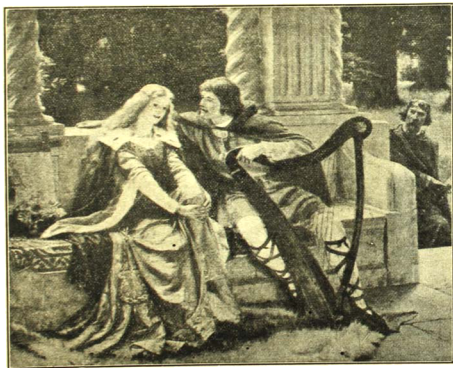


ভালোবাসো ?

(নি, হেপ-উডের আঁকা ছবি হইতে)

“All the world loves a lover”—
 তাই প্রেমের ছবি দেখিতে আমরা এত
 ভালবাসি। জগতে প্রেমের মত পুরাণো
 ও শতবার আন্দোলিত এবং নিত্য-অমূল্য
 বিষয় আর নাই; কিন্তু পুরাণো হইলেও এই
 “পুরাতন প্রেম নিতানূতন সাজে” সাহিত্য ও
 শিল্পের অঙ্গর দাঁড়িয়া আছে। গীতারা ভারিকে
 মেঘাকের কোক, সাহিত্য ও শিল্পে প্রেমকে
 মেঘলেট ভাচার চটিয়া অস্তির চন;
 গিয়া বলেন, ‘এ যে ছেলেমানুষী

খেলা’! কিন্তু চারের মাহুষের চপল মন!
 সুখের কথার সে ত বোঝ মানেন না,
 মাথার চুল পাকিলেও সে ত এ খেলা
 তুলিতে পারে না! বসন্তের একটু বাতাসে,
 নরনের একটু ঠাণ্ডে-ঠাণ্ডে, আঁচলের একটু
 স্পর্শে জ্বা-নত দেহের তলে-তলেও তাই
 অগ্নির প্রাণ সকল শাসন ঠেলিয়া জাগিয়া
 উঠিতে চায়! প্রেমের দেবতা বেশ ভাল-
 বকমেই বোঝেন, মাহুষের এ মানা সুখের
 মানা—এ জগতের বিজ্ঞান নহে; তাই



গান-শেষে
 (ই, স্নেহের সেটনের আঁকা ছবি হইতে)

তাহার শীলা আদিপ্রভাত হইতে আধ-পর্যন্ত সমানই চলিয়াছে। আর, যতদিন যাহ্নবের জীবনে এই প্রেমের সাড়া পাওয়া যাইবে, ততদিন গল্পীরের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শিল্পী গড়িবেন প্রেমের প্রতিমা এবং কবি রচিবেন প্রেমের পূজা-মন্ত্র! জীবনের সঙ্গে বাহার চিরসম্পর্ক, কবি ও শিল্পী কি তাহাকে প্রাণ থাকিতে ত্যাগ করিতে পারেন! তাই কবি চণ্ডীদাস একেবারে কবুল-জবাব দিয়া বসিয়াছেন—

“পিত্রীতি বেরাধি, ছাড়িলে না ছাড়ি!”

তাহার রাধাও স্পষ্টাঙ্গটি বলিয়াছেন—

“সই! পিত্রীতি না ছানে দারা।

এ তিন ভবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানরে তারা!”

প্রেম কি? ছুটি আখ্যায় পরস্পরের সহিত মিলন-আকাঙ্ক্ষা। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে বুঝা যায়, সৌন্দর্য-প্রিয়তা এই আকাঙ্ক্ষার উৎস। আমাদের প্রাচীন কবি বলিয়াছেন, “মন কি কান্তো রূপে ভোলে?” কিন্তু, মন যে রূপেই ভোলে এবং ভুপই যে প্রেমের প্রথম ধাপ, এ সভ্যত আমরা নিতাই জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি! দুনিয়ার পনেরোআনা লোকই বাহিরের রূপের মধ্যে প্রেমের প্রথম সাড়া পায়, বাকি একআনা লোকের প্রেমের সঙ্গে যদি বাহিরের রূপের সম্পর্ক নাই-বা থাকে, তবে মানস-সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব দেখুনে আছেই আছে। দেহের রূপ বা মনের রূপ—যেদিক দিগ্ভাই দেখি, প্রেমের ঘূষ ভাঙ্গার রূপের সোনার কাঠি। যৌবন হৃন্দর

বলিয়াই প্রেমের মধুরসের ভিড়ান হয় যৌবনবয়সে।

শিল্পী রূপের পূজারী। প্রেমের সন্তোষে রূপের সাপেক্ষতা, শিল্পী তাই প্রেমের ছবি লইয়া এমন মান্তিয়া উঠেন। তিনি যে প্রেমের সৃষ্টি আঁকেন বা গড়েন, তাহার মধ্যে আমরা শিল্পীর সন্তোষলিপ্সা দেখি না, তাহার সৌন্দর্য্যপূজার পরিচয়ই আক্ষর্য্যমান দেখিতে পাই। এই যে সব হৃন্দর পুরুষ ও হৃন্দরী কামিনী প্রেমালোকে বিভোর হইয়া আছে, ইহাদের যৌবনপূর্ণিত দেখে দেখে, ইহাদের বোহন সামান্যস্বাস, মধুর ভাবে-ভঙ্গীতে, ইহাদের আবেগভরা মিলনোচ্ছ্বাসে আমরা দেখি, শিল্পীর আদর্শ-সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস! সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রকাশ নানা ভাবে দেখানো যায়। এমন-কি, আর্টে যে কুৎসিতকেও ত্যাগ করেন না, তাহার হাতে পড়িয়া কুঞ্জিও যে আর্টের ভূপে সৃষ্টি হইয়া উঠে, একথাও ত সবাই জানেন! কিন্তু সৌন্দর্য্য এখন যৌবরাজ্যের প্রেমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন তাহার বর্থাৎ মহিমা বুঝাইবার অল্প শিল্প-সমালোচকের টিপ্পনীর কোন প্রকার করে না; অল্প-কোন ভাবের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইলে, জনসাধারণ তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শিল্পীকে গালাগালি দেয়; কিন্তু প্রেম-ভাবে এখন সৌন্দর্য্যের আশ্রয়প্রকাশ, তখন কাহারও তাহা বুঝিতে শেরি হয় না এবং শিল্পীর গুণপনা তখন সহজেই সকলকে মোহিত করে। কেননা, প্রাসাদে, কুটারে, হাটেনাট্টেবাটো—সমস্তই প্রেমের আবাসগতি। এমন অনেক ভাব আছে পণ্ডিত ও মূর্খ

সন্মানভারে বাগানের বৃক্ষিতে পারে না। ভিতরেই অনায়াসে ঢুকিতে পারে। কল্প-
কিঙ্ক প্রেমে এ বালাই নাই, সে যে ছাড়পত্র বেশী পরিমাণে সকল প্রেমীর সকল মানুষই
পাইয়াছে, তার ক্ষেত্রে সে সকল প্রাণের প্রেমের স্বোরাধ পাঠিয়াছে, তাই চিত্তার্শিত



প্রেমভাবে সকল ক্ষমতাই
সাদা পড়িয়া যায়;—
প্রণয়ীর ঐ চোখ-মুখ,
ঐ হাসি-লজ্জা, ঐ মান-
অভিমান, ঐ চুশন-
আলিঙ্গন—এসবের স্বার্থ
অর্থবোধে কাহারও অণ-
বিলম্ব হয় না! এইমন্ত
যে-সকল শিল্পী প্রেম
লইয়া বেশী কারবার
করিয়াছেন, তাহারা
আর-সকলের চাইতে
অধিক জনপ্রিয় হইয়া
উঠিয়াছেন।

অগতঃ যদি প্রেম না
থাকত, তাহা-হইলে
বৈধের ভাগ কাঁব ও
শিল্পা নিশ্চয়ই হাতে মারা
বাহতেন! ভাগ্যে প্রেমের
রেওয়াজ উঠিয়া যায় নাই,
শিল্পী ও কবিরা তাই
বাঁচিয়া আছেন। বিখ্যাত
প্রেমের চিত্রকর মাফাস্
টোন বলিয়াছেন, প্রেম
আছে তাই আমি
বৈকালের দলে গিয়ে
পড়িনি; নইলে আমাকে
একটি পরসার জেত

প্রিয়ার উদ্দেশে

('অ্যাবি অ্যান্টেলনের আঁকা ছবি হইতে)

লোকের ঘোরে ঘোরে হাও পেতে বুঝে
মরতে হোত !

হেগ-উড নামে আর-একজন নামজাদা
পটুয়া বলিতেছেন, আমি ভালবাসি প্রেমমূলক
ছবি; লোকে যখন ঘোঁসারহারা ও বয়সে-
বুড়ো হয়, সে-সব ছবি তখন কালো জীবনে
আলোর রেখাপাত করে।

দৌরাসিক ও ঐতিহাসিক প্রণয়-কাহিনী
অবলম্বনে যে-সব ছবি আঁকা হইয়াছে,
প্রেমসম্পর্কীয় সমস্ত চিত্র-ভাণ্ডারের মধ্যে
গুরুত্বের তাহাই সব-চেয়ে বেশী। তারপর
কবি ও ঔপন্যাসিকদের কাব্য এবং কথাগ্রন্থ
অবলম্বনেও অনেক পট আঁকা হইয়াছে।
সেক্সপিয়রের অমর প্রেমিক-প্রেমিকা
রোমিও এবং জুলিয়েটের মধুর প্রেম-কথা
যে কত চিত্রকরকে ছবি আঁকিতে প্রবৃত্ত
করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা হয় না।
তারতীর চিত্রকরেরাও কৃষ্ণ-রাধার প্রেম-লীলা
লইয়া এমনি মাতিয়া আছেন।

ভারতের প্রাচীন চিত্রে প্রেমকে যে কত
জাবে ও কত রূপে দেখিয়াছি, তার আর
হিসাব হয় না। বিরহের ছবি, মিলনের
ছবি, মানের ছবি! প্রেম হচ্ছে হৃন্দের
বোবনের হৃন্দেরত্তর স্বপ্ন,—সে-সব ছবিও তাই
স্বপ্নের মতই মধুর লাগণো সমুজ্জল!
তাহাদের মধ্যে রূপোদ্ভাস আছে, রসালস
আছে, অস্বাভাবিক, বিরাগ ও সন্তোষ
প্রভৃতি প্রেমবৈচিত্র্যও আছে। প্রথমবৎসরের
“প্রাচ্য চিত্রকলা-প্রদর্শনী”তে অভিসারের
একখানি প্রাচীন পট দেখিরাছিলাম,
তাহার অপূর্ণতা আজও কপিতে পারি
নাই।

“অমর তরি নব নীরব কাঁপ।

কতলত কোটি শব্দ, জীউ কাঁপ।”—

ইচ্ছাই মধ্যে গভীর রাত্রে আঁধার পথে
একাভিনৌ অভিনায়িকা কান্দুদর্শনে চলিয়াছে।
বনের পাছে গাছে অন্ধিরূপিনী সাপিনীর
মত চঞ্চলা চপলার লীলা,—আর তাহারই
কণিক প্রভার ভয়ঙ্কর কামিনী, চারদিকে
অন্ধকারের চেয়েও তরলিক, নানা বিকীর্ণিকার
মিথ্যা সৃষ্টি দেখিরা শিহরিয়া উঠিতেছে!
ইহাই সেই ছবিখানির বিষয়। আর-কোন
চিত্রকরের পটে, অভিনায়কের এমন নিপুণ
ভাবে আভাস আমরা দেখি নাই—এ
ছবিখানি প্রাচীন ভারতীয় কলার একটি
masterpiece! শুধু ছবিতে নয়, এদেশে
সেকালের ভাবধর্মের নমুনা দেখানো-বোঝানো
বিজ্ঞমান, দেখানোই মিলা-পটে প্রেমের দৃষ্ট
উৎকর্ষ হইয়াছে। আমাদের সেকালকার
শিল্প একান্ত ভাবে ধর্মের দ্বারে আত্মোৎসর্গ
করিয়াছে; এমন-কি, সেখানর ছাড়া শিল্পীদের
আর-কোন কলা-ভবন ছিল না বলিলেও
অত্যাধিক হয় না। বরং চিত্রকরেরা স্বাধীন
ছিলেন, কিন্তু ভাবধর্মের হাত সেবতার তুষ্টি-
সাধনের জন্ত একেবারে বোঁড়া ছিল।—
হাওয়ার হোন্ট শিল্পীরা ত মাহু বটে! তাই
গভীর সেবতার পাতা-নেত্রের কঠিন সৃষ্টিও
শিল্পীদের তরল চিত্তের চপলতা নিবারণ
করিতে পারিত না। জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর
ও কপারক প্রভৃতি দেবমন্দিরের দেওয়ালে
দেওয়ালে ভারতীয় ভাবধর্মের মাহুবা চপলতার
এমন শত-শত নিদর্শন বর্তমান। তাগ ও
বৈরাগ্যের নিকেতনে চুপন ও আলস্যের
এত ছড়াছড়ি দেখিলে বেশ বুঝা যায়,



নব-দাম্পত্যী •
(লর্ড লেটেনের আঁকা ছবি হইতে)

শিল্পীরা দেবতার ডাক্ তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনাদের প্রাণের ডাকেও তাহারা সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই!

যুরোপের আধুনিক প্রেম-শিল্পীদের চিত্র-মালায় একটি বিশেষত্ব বিশেষ-করিয়া আমাদের চোখে পড়ে। অনেক চিত্রকর তাহাদের চিত্রলিখিত পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে প্রাচীন কালের চিত্রা পোষাক দিয়াছেন। তাহারা প্রাচীন পোষাকের ভক্ত নন, তাহারাও একেবারে একেলে কাপড়ের উপরে হাড়-হাড় চোটে। বাস্তবিক, পাশ্চাত্য দেশের একালকার কাপড়-চোপড়ে এমন একটা কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা আছে যে, তাহার ভিতরে পড়িলে পেলব প্রেমের সরস কাব্য বেন একেবারে নিরস গন্ধে পরিণত হইয়া যায়; সে পোষাকের চাপে যৌবনের মধুরতা ও বেহের সৌন্দর্য্যও যেন আড়ষ্ট হইয়া হাঁপাইয়া উঠে! এইজন্যই বোধহয় একালের জামা-কাপড় শিল্পীদের গটে স্থানলাভ করে নাই।

এ সংসারে প্রেম, আপনাতঃ স্তম্ভ একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব রচনা করিয়া লইয়াছে। সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখের বাহিরে প্রেমিকের মনোজগতে প্রেমজনিত সুখ-দুঃখ এবং আশা-নিরাশার নীলা বেথিতে পাওয়া যায়। প্রেমের মান-অভিমান এবং বিরহ-দিলন প্রভৃতি প্রেমিকের প্রাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ঢেউ বহাইয়া দেয়; প্রেমে যেমন “ক্ষণেক হাতে দড়ী, ক্ষণেক চাঁদ”, এই হাসি এই কান্না, এই আলো এই ছায়া,—তেমন বিপরীত ভাবের খেলা সাধারণ জীবনে ঘটতে দেখি হয়। এইজন্যই মানুষের

একধেরে জীবনে যখন প্রেমের বাঁধি বাধিয়া উঠে, তখন কিছুদিনের তরে সে সব-কুলিয়া একেবারে মাতিয়া যায়। কিন্তু সংসারের দস্তুরমত, প্রেমের উপর হইতেও ক্রমে নবীনতার আবরণ খসিয়া পড়ে। তবে, এর মধ্যেই যৌবনের নবীন প্রেম আমাদের স্বতির পরতে-পরতে যে ছবি খুঁদিয়া রাখিয়া যায়, তাহার মধুরতা আমরা সারা জীবনের মধ্যে আর কুলিতে পারি না। তাই নূতন প্রেমিকের আবেগ ও উপভোগ-স্বাদ খোঁচাইয়া প্রাচীন বহনেও আমরা যখন কোন ভাল আট্টের আঁক প্রেমের আলো দেখি, তখন তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের প্রগর-স্বতির শিখা আবার নূতন-করিয়া উকাইয়া দেয়,—তখন আমরা আবার প্রেমের স্বতন্ত্র বিশেষ দিগা পড়ি। এই চুল্লি শক্তি আছে বলিয়াই প্রেমের কাব্য এবং প্রেমের চিত্র আমাদের সমগ্র জীবনে পুরাণো হইলেও “নিতাই নব” হইয়া থাকে!

কিন্তু অন্তিমিকে, প্রেমের ভাবটা খুব সাধারণ বলিয়াই চিত্রকরদের কাজ শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্য সাধারণ, সকলেই বাহ্য অনেকবার দেখিয়াছে, তাহার সমস্ত রস সকলেই ভোগ করিয়াছে, তাহাকে নূতন রূপে, নূতন রসে অপূর্ণ করিয়া নূতন ভাবে দেখানো বড় যে-সে শিল্পীর কাজ নয়! শিল্পজগতে প্রেম-চিত্রের যে বিশাল ভাণ্ডার আছে, তাহার মধ্যে খেল দেখা যাইবে, এ ভাণ্ডারে রাখি আছে সুড়ী সুড়ী! কেবল যে শিল্পেই এই ব্যাপার, তাও নয়; সাহিত্যেও আমরা নিত্য যে



দোলনায়
(পি, এ, কটের আঁকা ছবি হইতে)



চূষন

রোদীর গড়া মুষ্টি হইতে)

অশুভ প্রেমের 'কাবি' এবং গল্প পড়িয়া তাহাকে লইয়াই জীবিত ভাবনার অবধি
মরিতেছি, তাহাদের ভিতরেও আসলে করটি থাকে না। হালুকা প্রাণে যে প্রেমের
পড়িবার যোগ্য ? ছবি আঁকিতে বসে, সে মনে করে, যুবক

কথা হইতেছে কি,—যাহা সাধারণ, তাহাকে আটের মধ্যে স্টাইলিং তোলা
একপক্ষে যেমন সহজ, অল্পপক্ষে তেমনি গুৰুত্বী, আলিঙ্গন আর চূষন দেখাইতে
কঠিন। আনাড়ি ব্যাহাকে সৌন্দর্য্য ভাবে, পারিলেই বৃষ্টি প্রেমের ছবি আঁকা হইয়া
গেল ! এইজন্যই অধিকাংশ প্রেমের ছবি
হয় কুৎসিত কাম-চিত্র হইয়া পড়ায়, মর

তাহা এতটা বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দিকে আর কিরিয়া তাকাইতে সাধ যায় না। কিন্তু তাহার পাকা পট্টয়া, তাহার এই বহু-বাবস্তব প্রেমকে, - পাত্র-পাত্রীর চোখ মুখের ভিতর দিয়া এমন নূতন আকারে ছুটাইয়া তুলেন যে, পুরাতনকে তখন আর পুরাতন বলিছাই মনে হইবে না।—নূতন ভাব ও নূতন ভঙ্গীর ইন্ধিতে তাহার সাধারণত্ব তখন অসাধারণত্বে পরিণত হইয়া যাইবে। ‘প্রেমের ছবি আঁকিবই’ বলিয়া পণ করিয়া, বা সাধারণে প্রেমের ছবি ভালবাসে বলিয়া তাহাদের মন যোগাইবার জন্ত, আঁকিতে বসিলে ত চলিবে না। আঁট্টের মনের বীণার প্রেমের যে মরম সুরটি বাজে, ছবির রঙ-রঙে তাহাকে সেই সুর সেই রসিনীর আসল মাধুরীটুকু ফলাইয়া তুলিতে হইবে, আপনাতঃ প্রাণ-সারথের রসবন্ধন করিয়া তাহাকে চিত্রের রস যোগাইতে হইবে। আমরা যখন কোন ভাল ছবি দেখিয়া তারিফ করিয়া বলি ‘বাঃ, এ ছবিখানির প্রাণ আছে!’—তখন বুঝিতে হইবে, এখানে যে প্রাণের কথা হইতেছে, তাহা ছবির প্রাণ নয়—তাহা চিত্রকরের প্রাণ! সকল চিত্রই তুচ্ছ হইয়া থাকিবে—চিত্রকরের আত্মপ্রাণের আভাসে যদি-না তাহার জীবন্ত হইয়া উঠে! হেটো শিল্পীরা সে বাহু-মস্তকটিকে জানে না—বাহার গুণে অঙ্কিত বিধরের সঙ্গে অভিনবকারীর প্রাণের যোগসাধন হইয়া যায়; কারণ, তাহাদের মধ্যে ত সে অহুত্ব নাই!

প্রেম-চিত্রে অনেক যে অক্ষম, এই অহুত্বের অভাবও তাহার আর-একটি কারণ।

ম্যালোগেকে বলেন, “Any momentary action is apt to be tiresome to the onlooker when passed into endless perpetuity.” এখন, ছবিতে সচরাচর চুখন, আলিঙ্গন, হাসি ও অশ্রু প্রভৃতির দ্বারা প্রেম-ভাব প্রকাশ করা হয়; অথচ এগুলি হচ্ছে ‘momentary action’ বা ‘ক্ষণিক ক্রিয়া’। সুতরাং বাস্তব জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াগুলি শিল্পকলার যদি চিরস্থায়ী হইয়া পড়ায়, তবে দু-চারদিন পরেই তাহার আমানের চক্ষুকে পীড়া দিতে শুরু করিবে। দীর্ঘ কাল দেখিতেছি, অথচ চিত্রশিল্পিত চুখন ও আলিঙ্গন প্রভৃতিতে অকতি ধরিয়া যায় নাই, এমন ছবি খুব কমই আছে; দু-চারজন ভাল শিল্পী ছাড়া বেশীরভাগ লোকই এদিকে ক্লান্তকর্মী হন নাই। অনেক চকুর শিল্পী এসব ক্যাসাদ এড়াইয়া চলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন,—তাহারা পাত্র-পাত্রীর ভাব-ভঙ্গীর দ্বারা প্রেমের আভাস দিয়াছেন। এই-সব নানান কারণের জন্তই বিশেষজ্ঞেরা বলেন, শিল্পিত কলার প্রেমের ছবিই বেশী দেখা যায় বটে, কিন্তু এই বাহুল্যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না; প্রেমের ভাল ছবি গুণ-ভিত্তিতে বড়ই অল্প—কেননা, তেমন ছবি আঁকিতে হইলে বর্ষাব্য প্রতিভা ও সৃষ্টিশীল প্রয়োজন।

ঐহেন্দ্রকুমার রায়।

সেকানের গৃহস্থালী

গৃহস্থালীর কথা বলিতে গেলে গৃহ ও গৃহীণী দুইয়েরই উল্লেখ প্রয়োজন। তবে গৃহের প্রয়োজন সর্বত্রই বলিয়া গৃহ হইতেই কথা আরম্ভ করা ভাল। ইহাতে প্রবন্ধের বনিয়াদ পাক। হউক না হউক, গৃহস্থগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভালরূপ বৃদ্ধিবার সম্ভাবনা থাকে।

গৃহাদি

সকড় পুরাণে দেখিতে পাই (বঙ্গবাসী-সংস্করণ, অধ্যায় ৪৬; শ্লোক ১৩-১৭) বাস্তব সমুখে দেবালয়, অধিকোণে পাকশালা, পূর্ষদিকে প্রবেশ-নির্গম-পথ, ঈশান কোণে পট্টবস্ত্র-যুক্ত গন্ধ-পুশালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডার, বায়ুকোণে গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈঋত কোণে সমিধ কুশ কাষ্ঠাদির গৃহ ও অস্ত্রশালা এবং দক্ষিণে মনোরম অতিথিশালা থাকিবে, এইরূপই ছিল গৃহের ব্যবস্থা। এই শেখোক্ত গৃহে শয্যা, আসন, পাটকা, অগ্নি, দীপ ও বোগ্য ভূতা রাখা হইত। গৃহগুলির আশে পাশে যে ফাঁকা জায়গা পড়িয়া থাকিত, তাহা সমল কবলী বৃক্ষ (মজলৈ: কবলী-গৃহৈ:) ও পল্লবর্ণ কুল্লম দ্বারা অশোভিত করা হইত। বৃহৎ সংহিতা ও

অগ্নিপুরাণে এই সকল গৃহের সংস্থান একই দিকে দেখানো হয় নাই। পশ্চিমপ্রবর ভাঃ গনানাথ বা এ সম্বন্ধে অচুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দেখিতে পাই (House Building & Sanitation in Ancient India—Journal of B & O Research Society, Vol II. Pt II. P. 145) পাকশালা দক্ষিণ-পূর্ষ এবং শয়নঘর—দক্ষিণদিকে। অগ্নিপুরাণের মতে (১) অস্ত্রশালা (২) এবং বৃহৎ সংহিতার মতে তৈজসাদি রন্ধার ঘর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ভোজন-শালা পশ্চিমে, শয্যাগার—উত্তর-পশ্চিমে, খনাগার—উত্তর দিকে, শেখ-গৃহ—উত্তর-পূর্ষে এবং শ্রীগৃহ বা উত্তম-রূপে সজ্জিত বৈঠকখানা পূর্ষদিকে অবস্থিত থাকিত। ভাণ্ডার গনানাথ ব্যতীত তালিকার গোশালা, কাষ্ঠাদি-রন্ধার গৃহ, জলাগার প্রভৃতি কয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় গৃহের উল্লেখ নাই, তবে ঘোড়ার উপর শেখা বাইতেছে যে একজন অবস্থাপন আৰ্য্য গৃহস্থের আট-দশ-খনি ধনের আবশ্যক হইত। বাস্তবুনি কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা গোতিল গৃহ দ্বয়ে বর্ণিত আছে। ৪ প্রপাঠক; ৭ কাণ্ডিকা।

(১) বিশিষ্ট প্রণের সম্বন্ধে গৃহপাদিত্র উল্লেখ আছে। Vincent Smith মহোদয়ের মতে এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টাব্দ ৩০০ অব্দে রচিত। গৃহপাদি তৎপূর্ষে রচিত বলিয়াই বোধ হয়।

(২) অস্ত্রশালায় কি কি অস্ত্র সাধারণতঃ রক্ষিত হইত, তাহা অৰ্ঘ্যপত্র হইতে জানা যায়; যথা—কুঠার, কুদাল, চক্র, ত্রিশূল, বর্ষা, মূলার, মূলম বস্ত্র প্রভৃতি ও আবাদিগণের সেই সমস্ত অস্ত্র-যন্ত্র। তল ভোদর প্রভৃতি অস্ত্রের নামও ঐরাণী বর্ণনায় বর্ণিত পাওয়া যায়।

বাস্তবশিল্প

গৃহ-নির্মাণের অল্প ব্যবহৃত ভূমি সমতল ও ভূগাছাবিহীন হওয়া আবশ্যিক। . একশ উপর হইবে যে বর্ষার জলপ্রাচুর্যে কণাচ ভূমিমা না ধায়। বাস্তব অবস্থান একশ হইবে যে জল পূর্ণ বা উত্তরদিক দিয়া বহির্গত হইয়া বাহিতে পারে। বাস্তবজগতের উপর কঠক গুরু, এবং যেত রসজীবী বা কই আশ্রয়স্থল কোনও বৃক্ষাদি থাকিবে না। নিকটে বাণেশ্বর বহুভূমি বা জলাভূমি থাকা উচিত নয়। মৃত্তিকা একবর্ণ, ঘন-সংকট (compact) এবং অনতিশক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথাক্রমে যেত, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা-বৃত্ত স্থানে গৃহাদি নির্মাণ করিবেন। বাহারা মেহে পবিত্রতার ধোঁপ কামনা করে, তাহারা দত্ত-সংযুক্ত স্থানে বাস করিবে; বাহারা শক্তি কামনা করে তাহারা বাণেশ্বর অল্প দীর্ঘ তৃণযুক্ত স্থান নির্মাণ করিবে, এবং বাহারা গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রার্থনা করে, তাহারা কোমল তৃণ-সংযুক্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ করিবে। গৃহের আকৃতি ইষ্টকের স্তার চতুর্ভুজ বা ষোণের স্তার বৃত্তাকার হইবে।

বাহারা শ্রুণ: কামনা করে তাহারা পূর্বদিকে গৃহঘর নির্মাণ করিবে। বাহারা পুত্র-কন্যা ও স্রবাদি প্রার্থনা করে, তাহাদের গৃহ উত্তর-দ্বারী হইবে এবং বাহারা সকল প্রকার কামা বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহারা দক্ষিণদ্বারী গৃহ নির্মাণ করিবে। পশ্চিম দিকে গৃহঘর নির্মাণ সেকালে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এ সম্বন্ধে

একটা প্রবাদ একালেও চলিত দেখা যায় ;—

“দক্ষিণদ্বারে ঘরের রাজা।

পূর্বদিক তার প্রাণা।

পশ্চিম-দ্বারে মূখে ছাই

উত্তর-দ্বারে খাটনা নাই।”

গৃহের নিকট বৃক্ষাদি থাকা যে অস্বাস্থ্যজনক তাহা প্রাচীন কালেও অবিকিত ছিল না। গৃহের পূর্বে অশ্বখ, দক্ষিণে পল্লব, (পাছ), পশ্চিমে জগ্গোথ এবং উত্তরে উজ্জ্বর (জুমুর) বৃক্ষাদি রাখা অবিশেষে বলিয়া বিবেচিত হইত।

প্রবেশ-নির্গমন-পথ

গুরু পুরাণের পূর্বোক্তিত অধ্যায়ে আরও দেখিতে পাই যে বাস্তবজগতের চতুর্দিকে প্রাকার নির্মিত হইত। এই প্রাকার উর্দ্ধে প্রায় পাঁচ হাত পরিমিত হওয়া উচিত এইরূপ নির্দেশ আছে। সাধারণতঃ গৃহের দুইটি করিয়া প্রবেশ-দ্বার থাকিত। সম্বন্ধে গমনাগমনের পথ পূর্বদিকে ও খিড়কির পথ দক্ষিণ দিকে। এই খিড়কির রাস্তা দিয়াই সকল প্রকার আবর্জনা বাহিরে ফেলা হইত। ঘরের দক্ষিণ দ্বারের বেক্রপ ভীষণ কল্লনা এখনও লোক-সমাজে প্রচলিত দেখি, তাহা যে সেকালের গৃহের দক্ষিণ দ্বারের অবস্থা-দৃষ্টে উদ্বৃত্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

কাঠ-চোলাই ও অনাবশ্যক জ্রবাদি রাস্তার অল্প খিড়কির সমিহিত স্থানই ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক গৃহের সারিখোদে কুপ বা জলাশয়-ঘননের ব্যবস্থা

ছিল। কামহুত্রে লিখিত বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই বৃদ্ধিতে পারা যায়। পূর্বে যে বাস্তবগুলের বর্ণনা করিয়াছি, তাহা অবস্থাপন বিভ্রান্তিগণের বস্তুবস্তুর আদর্শ চিত্র (model plan) বলিয়াই মনে হয়। বিভিন্ন জাতি বা পেশা অঙ্গুলারে আবাস-গৃহের আয়তনেরও তারতম্য লক্ষিত হইত। বৃহৎসংখ্যতার দেখা যায় যে পাঁচখানি ঘর ও মধ্যে উঠান থাকিলেই চলিয়া যাইত।

প্রমোদ বা বিরাম-গৃহ

নাগরক (young gallants) এবং সৌধীন ও ধনী ব্যক্তিগণের আবাস-গৃহ অবশ্য বিভিন্ন-প্রকারে নির্মিত হইত। এইরূপ প্রমোদ বা বিরাম-গৃহের বর্ণনাও আমরা বাস্তবায়ন হইতে অবগত হই। ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর ত থাকিতই তা ছাড়া দুইটি শয়নঘর থাকিত। শয়ন-ঘরের সজ্জাদিরও বর্ণনা আছে। (৩) পালকের উপর খোপদোস্ত চাবর পাতা;

দুইটি বালিশ, একটি পায়ের, অপরটি মাথার দিকে। মাথার নিকটে টেবিলের ক্রয় কাঠ-নির্মিত একটি সামগ্রী থাকিত; তাহার উপর পুস্তক (৪), গন্ধ-দ্রব্য, পূজা-দ্রব্যাদি এবং একটি সৌগন্ধিক পুটিকার সম্ভবতঃ লোহচূর্ণাদি অন্তঃভাগের উপকরণ রক্ষিত হইত। পতনগ্রহ বা শিকদানীরও ব্যবহার ছিল; তাহা ছাড়া বসিবার টুল, চেয়ার প্রভৃতির ক্রয় কাঠামনেরও যে ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহাও বৃদ্ধিতে পারা যায়। রানারণের স্তম্ভেও এইরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ "পীঠ" সুবর্ণ হস্তিদ্বাদিতে গঠিত হইয়া ব্যবহৃত হইত। (৪) মালকুমার বহুর রানারণ-কাঠিনী; পৃ ২০০) গৃহের দেওয়ালে বাস্তবদ্বারা (৫) টাকানো থাকিত। চিত্রকলক ও চিত্রকর্মাদির উপযোগী তুলিকা রঙেরও ব্যবস্থা থাকিত। অন্তঃপুরিকাগণও যে চিত্রশিল্পের অঙ্কন করিতেন তাহা মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে জানা যায়। জিনিষ-পত্র খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

(৫) যাহে চ বাদগুহে স্তম্ভকবুতগোপদানঃ যথো বিনঃ শুভোত্তরজয়ঃ শয়নায় স্তানঃ। প্রতি লক্ষ্যকঃ। তত শ্রিয়াক্ষণে স্তম্ভস্থানং বৈদিকঃ। তত রাত্রিনেঘমহুলেপনঃ মাল্যঃ সিদ্ধ কঠকঃ (মোদের ঘায়া বিবৃত) সৌগন্ধিক-পুটিকা। মালকুমারবচনাদি ৬ হ্রাঃ। সুমৌ পতনগ্রহঃ। মালকুমার-সস্তা বীণা। চিত্রকলক বক্তিকাসমূলকঃ (চিত্রকর্ণোপযোগী তুলিকা ৬৬ প্রভৃতি) যঃ কলিতপুস্তকঃ ...সুমৌ বৃত্তান্তঃ সমস্তকঃ (বসিবার চেয়ার প্রভৃতির ক্রয় কাঠামন) স্ত্রীড়ানহুপিগতরাণি (স্ত্রীড়ান পক্ষীর পিত্তরাণি...স্বাক্ষরী দেখা যোগা বুদ্ধবাক্যকাঃ সস্ত্রজ্ঞায়া।

—কামপুত্র—মহেন্দ্রচন্দ্র পালের সংস্করণ।

(৬) অগ্নিপুরাণে পুস্তক-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে যথেষ্ট হয় যে ধর্মনিষ্ঠ ও যৌক্তিক কামী ব্যক্তিগণ অনেকই পুস্তকাদি লেখাইয়া শাস্ত্রমতে ভাব্য প্রতিষ্ঠা করাইয়া তবে বা হস্তি-পুটে নগর-অবধি করাইতেন। এই সকল পুস্তক সেখানেই বা প্রাক্ষণ পঠিতব্যপক্ষে দান করা হইত। সুপ্রসিদ্ধ অর্থব্রতমানে লিখিত ব্যক্তিগণের পুস্তকাদির অভাব এইরূপেই ঘোষণা করার ব্যবস্থা ছিল। পুস্তকাদি লিখন-সময়ে স্বর্ণবর্মী লেখনী ও যৌগ্য সস্তাধারের উল্লেখ দেখা যায়।

(৭) সস্তায় পর স্ত্রীতৎপাদ্য-স্রস্কের কথা কামহুত্রেই লিখিত আছে

রাধা হইত। বিছানার চারদিক তিন দিন
অন্তর বদলাইবার নিয়ম ছিল। পূজোক্ত
বস্ত্রান্তর হইতে স্পষ্টই দেখা বাইতেছে যে
চিত্রশিল্পের সরঞ্জামটুকু বাধ দিলে আধুনিক
কালের পল্লী-নিবাসী সৌখীন লোকের
বৈঠকখানা হইতে সেকালের বৈঠকখানার
বড়-বিশেষ তফাত ছিল না; কেবল বহিঃস্থিত
রজ্জু-বিলম্বিত বোলনার উল্লেখ মনে পড়ে
যে আধুনিক রূপের সাহসিকাগণ আর
বোলনার বোল খাওয়া অভ্যাস করেন না।
তবে পল্লী-গ্রামের ইতর শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ-
দ্বিপক্ষে এখনও বেলা প্রভৃতি উপলক্ষে নাগর-
বোলার চড়িয়া আমোদ করিতে দেখা
যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহ

সেকালের গৃহ বলিলেই যে পর্ণশালা
বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। অবস্থা
ও প্রয়োজন-ভেদে গৃহাদি প্রস্তর, ইটক,
অথবা ইটক, কাঠ, বাঁশ ও বস্ত্র প্রভৃতিতে
নির্মিত হইত। প্রস্তর-নির্মিত গৃহ “মন্দির,”
ইটক-নির্মিত গৃহ “বাস্ত” ও বস্ত্র-গৃহ “বিম্বর”
প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। (J.
B. O. R. S. Vol. II. Pt II. P. 140)

শৌচাদির ব্যবস্থা

বাণির গৃহ হইতে (৬) দেখা যায় যে

আত্মকুর্দ্ ও পাইখানাতেও “বলি” (৭)
(Bali-offerings) বেওয়ার নিয়ম ছিল।
(Khadira Grihya Sutra—Sacred
Books of the East Series P. ৩৪.)
সুতরাং বাড়ীর নিকটে বা কিছুদূরে
পাইখানাও যে থাকিত তাহাতে সন্দেহ
নাই। সম্ভবতঃ গোশী, বৃদ্ধ বা চর্যল ব্যক্তি-
গণের অন্তর্গত ইহার ব্যবহার নির্দিষ্ট ছিল।
ধন্যশাস্ত্রে বশীক, শ্মশান, কবিত ক্ষেত্র
এবং গোচারণ মাঠে শৌচাদি ক্রিয়া
সম্পাদন-সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ
দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে মনে হয়
লোকালয়ের সরিহিত অঙ্গল প্রভৃতিই এই
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত।

প্রতিঃকৃত্য

গৃহস্থ উষাকালে শয্যাভ্যাগ করিতেন;—
যখন পূর্বাঙ্ক সবে দ্বাদশিগা উঠিতেছে।
ব্রাহ্মদুর্ভেদে গায়োথান নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অবস্ত্র
কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সন্ধ্যা-
আত্মিকাদির সময় ও নিয়ম পূর্ণ হইতে
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না;
সুতরাং এ সম্বন্ধে উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন।
মহাসংহিতায় দেখা যায় যে শৌচাদি, হান,
দন্তমার্জন, চক্ষু অঞ্জন-প্রলেপ ও পূজাদি
হর্যোবয়ের পূর্বেই সাধিত হইতে হইত।

(৬) পাকতাত্ত্বিকত্বের মধ্যে পূজাদি পূঃ পূঃ হইতে হই পূজাদি মধ্যে যুক্ত
হইয়াছিল।

(৭) “বলি” বেওয়ার অর্থ এখন আর বড় প্রচলিত নাই; কিন্তু নবাবের সময় অতাপি হায়ে হায়ে
কাককে বয়স হুটাইয়া “কাক বলি” বেওয়ার নিয়ম আছে। এ বলিও সেইরূপ ছিল। সেকালে বর্ষ, অর্ধ ও
দুয়ার উৎসবে বলিপূজা হারের চৌকাটের নিকট বেওয়া হইত। বরুণের উৎসবে বলি মলপূর্ণ
পাত্র বা কপাল নিকট (উপবাস) বেওয়া হইত। এমন কি রূপের উপর বিক্রয়কারী শ্রোতাব্যায়ও বার
পড়িত না। (বিশ্বকোষ ৩৭ অধ্যায়)

বিষ্ণুসংহিতার মতে পূর্বদিকে যখন উদার রক্তিম ছটা সূচিত হয়, সেই সময়েই দানাদি সারিরা লওয়া কর্তব্য (বিষ্ণু ৫০, ২)।

মানের অল্প প্রোতস্থিনী নদীর জলই সর্বাঙ্গেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পর নিরুত্তরের জল, তদভাবে পুষ্করিণী বা কুপের বহু জল। (বিষ্ণুসংহিতা ৫৪ অধ্যায় ১০—১৭)। “গর্ভ” বা আট মাইলের কম লম্বা কোন স্বাভাবিক হ্রদে দানও অবিধের বলিয়া বিবেচিত হইত না।

করজ, বলির, কদম্ব, কুরব, সপ্তপদী, বিঘ, অপার্বাণ উল্লুহর, মালতী প্রভৃতির কোমল শাখা দত্তকাঠের অল্প ব্যবহৃত হইত। পাতন এক বিঘতের অধিক লম্বা হইত না। পূর্ণিমা, প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে পাতন ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। (হার্যীত সংহিতা শ্লোক ৫, ৬) পূর্ব বা উত্তরমুখে বলিয়া পাতন করিতে হইত। (বিষ্ণু সংহিতা chap. lxi)

প্রসাধন ও ক্ষৌরকর্ম

বাস্তবস্থা সূত্ৰিতে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান, কেশাদি-মার্জনা, শ্রঙ্গ ও নখ সংস্কার সম্বন্ধে উপদেশ দেখিতে পাই (chap. I, 13)। হিরণ্যকেশীর গৃহস্থের পাঠ-সমাপনান্তে ছাত্রের দান-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে অবগাহনের পূর্বে মানের অল্প ব্যবহার্য্য চূর্ণ সঙ্গে মর্দন করিবে এবং উল্লুহরের দত্ত কাঠের দ্বারা দত্ত মার্জনা করিবে। স্নাতরাং তৈলের পরিবর্তে Shampooing powder শ্রেণীর কোনও চূর্ণ যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত

হইত তাহা বুঝা যায়। কামহৃত্যে নিত্যান্নান, সুবাসিত তৈলমর্দন, কেশক বা তরল সাবানের দ্বারা কোনও দ্রব্যের দ্বারা প্রতি দ্বিতীয় দিনে আঙ্গের সন্ধিস্থল প্রকৃতি পরিষ্কার করা এবং সাত দিন অন্তর নখ কেলা ক্ষৌরী হওয়া প্রভৃতি নিরনের উল্লেখ আছে। হার্যীত সংহিতার কিন্তু দেখিতে পাই, মাত্র যুক্তিকার অঙ্গমার্জনা করিয়া মানের ব্যবস্থা। বোধ হয় শেষোক্ত ব্যবস্থা নিষ্ঠাবান শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের অঙ্গ; এবং পূর্বোক্ত ব্যবস্থা নাগরক শ্রেণীর যুবকগণের অঙ্গ (৮)। এইসঙ্গে এ কথা মনে রাখা উচিত যে সংহিতাদি ধর্মশাস্ত্র ও কামহৃত্যে কিছু একই সময়ে রচিত হয় নাই, স্নতরাং বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার যে যথার্থ মিলিয়া বাইবে এমন ভরসা করা যায় না। হিরণ্যকেশীর গৃহস্থের দেখা যায়, ক্ষৌরকর্মের অল্প উল্লুহর কাঠের ক্ষুর ব্যবহার করা হইত। এই গ্রন্থে ক্ষুর কুটারের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম প্রশ্ন ও ৩য় পটলে মাথা মুড়াইবার ও মাড়ি কাবাইবার সময় নাপিতের প্রতি যে উক্তিটি দেখা যায় তাহা বড়ই কৌতুক-প্রসংগ—“হে ক্ষৌরকর্মরত নরহৃদয়, তুমি আমার কেশ ও শ্রঙ্গ তোমার কতজনক সুগঠিত অস্ত্রের দ্বারা কামাইয়া ফেল—দেখিও তাহাতে যেন আমার মুখের স্বেচ্ছাতি ও সৌন্দর্য্য বর্ধিত হয়, কিন্তু প্রাণের হানি না ঘটে।” আনাড়ি ক্ষৌরকারকে এক্রপ অহুত্যাগ আশঙ্কালকার দিনেও যে মধ্যে মধ্যে না করিতে হয়

(৮) সংহিতাদি গ্রন্থে বর্ণিত গার্হস্থ্য তিথে যে বৃত্তীয় চতুর্থ দশকীয় পরবর্তী হইতে পারে না, এ কথা পাক্যাদ্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এমন নহে। প্রথমে ধাড়ি পরে বগল কামানো হইত। তাহার পর মস্তক স্তূপন করিয়া সর্কণেবে নথ কেনা হইত। সেকালে কোঁরকর্ণের বোধ হয় এইরূপই বিধি ছিল। (Grihya-Sutra of Hiranyakesin Ed. MaxM. P 164)

পরিচ্ছন্নতা

ভারতবর্ষের লোকেরা আধিক্যল হইতেই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। হারীত সংহিতায় লিখিত আছে যে স্নানের পর অপরিচ্ছন্ন বা হর্গন্ধ বস্ত্র কণাচ ধারণ করিবে না। কুর্শ্মপুরাণে দেখিতে পাই অপরিষ্কার বস্ত্র-পরিহিতা (মলদ্বন্দ্বাসা) স্ত্রীলোকের হস্তে অগ্ন্যগ্রহণ নিষিদ্ধ। নিত্যব্যবহার্য ব্রতাদি ইচ্ছামত অপর কেহ গ্রহণ করিলে যে নানারূপ সংক্রামক পীড়াদি জন্মিতে পারে তাহাও প্রাচীন কালে মনোবীপণের অবস্থিত ছিল না। যজ্ঞবল্ক্যে রেশম ও পশম নির্দিষ্ট বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে। (অধ্যায় ১ শ্লোক ১৮০) পশমী বা রেশমী কাপড়—কলার ক্ষার, স্নিক্তিকা, গোমুত্র ও জল দিয়া কাচিয়া লওয়া হইত। অংগ পট্ট বিধকল-সহযোগে এবং কয়লাদি—

গোমুত্র ও জল দিয়া পরিষ্কৃত করিবার নিয়ম ছিল। যজ্ঞসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ২০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে মালিকের অহুমতি-বাতিরেকে বিদ্বান্না-তোষক বানাদি এমন কি পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। অপরের জুতা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। গঙ্গাজলের antithesis স্বরূপ কূপজল (কুবজল) এখনও পল্লীগ্রামে অত্যন্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। (২)

বেশভূষা

স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্র, শুভ উত্তরীয়া গ্রহণ করিয়া মস্তকে উকীষ ধারণ করিবার নিয়ম ছিল। স্ত্রীলোকেরা পরিধেয় বস্ত্র বাতীত একখানি উত্তরীয়া বা ওড়না ব্যবহার করিতেন। তুলা (১০), রেশম, পশম প্রভৃতি ছাড়া তুণ ও বহুল দ্বারাও পরিধেয় রচিত হইত। আশ্রম ও সম্প্রদায়-ভেদে অভিনেয়ও ব্যবহার ছিল।

চিত্র-হরিণ, কুকসার এবং ছাগ এই তিন প্রকার পশুচৰ্ম ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। দীক্ষাগ্রহণ-কালে বর্ণাশ্রম্যে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট ছিল। গোভিল গৃহ সূত্রে দেখা যায় (২ প্রপাঠক ১০ কাণ্ডিকা)

(২) ব্যক্তিমত পরিচ্ছন্নতা ছাড়া সাধারণ ব্যাধ্যক্ষার দিকেও সেকালে বিশেষ দৃষ্টি ছিল যেহেতু পাই জলাশয়ের নিচিবন-ত্যাগ এবং কূপ, নদীয়া প্রভৃতি সন্নিবেশিত শাস্ত্রগ্রন্থে নিষেধ দেখা যায় (কুর্শ্মপুরাণ ১৭ অধ্যায়, যজ্ঞবল্ক্য-সংস্করণ)। রাজসূত্র, শত-ক্রায়ল ক্ষেত্র ও চতুর্দশ বা চৌমাখার মনত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল উপবাসবিহিতা (১৪ অধ্যায়)। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই পথে অর্জুন্যায়ু্য কেলিলে এক পণের অষ্টমাসে জরিসান হইত। কণা বা মাল্য জল জমাইয়া রাখিলে পণের চতুর্দশ এবং রাজসূত্রে এইরূপ করিয়া গমনাগমনের যাতায়াত জমাইলে ইহার বিত্তপ জরিসান দিতে হইত। জলাশয়ে তীর্থস্থানে বা রাজকীয় পুষ্করিণীতে মলত্যাগ করিলে এক পণ বা চতুর্দশ জরিসান হওয়ার বিধান ছিল। তবে ঔষধ-ব্যবহার নিষেধক বা হোপদ্রব্যও একত্র থষ্টিলে কোনও শাস্তি হইত না।*

(১০) পরাম্পর সংহিতায় রেশম-বস্ত্রাদির উল্লেখ আছে। পাট, পশম, রেশম ও কার্পাস-নির্দিষ্ট বস্ত্রাদি মাল্য দুইলেই শুদ্ধ হইত।

ব্রাহ্মণ-স্বাম্যরূপ কার্পাস বস্ত্র, কুকলার চর্ম, মৃত্তক তৃণের কটিবন্ধ এবং পূর্ণ কাঠের দণ্ড বা বস্তু ব্যবহার করিতেন; ক্ষত্রিয়-বিগকে “চিভাঙ্গ” হরিণের চর্ম, শূন্য-নির্মিত বস্ত্র, কাশ-নির্মিত কটিবন্ধ এবং বিষ কাঠের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। বৈশ্যগণ বখা-ক্রমে ছাগচর্ম, পশুনির্মিত বস্ত্র, তাহলের কটিবন্ধ এবং অশ্বখের বস্তু ব্যবহার করিতেন। ইহা ছাড়া আর্য্যদিগের মধ্যে চর্ম এবং তৃণ (কুণ) নির্মিত পাড়কার বস্ত্রেই রেওয়াজ ছিল। রামচন্দ্র ভরতকে কুশ-নির্মিত পাড়কা দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রামকুমার বস্ত্র মহাশয়ের রামায়ণ-কাহিনীতে (পৃ: ৮২২) কাচ-পাড়কার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বিলাতি উপকথা-বর্ণিত Cinderella’র “মাস সিপারে’র কথাই আবার মনে পড়ে। (১১) নীল বা গাঢ় নীলবস্ত্র কাব্য-গ্রন্থাদিতে অভিনায়িকগণের প্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইলেও ধর্মশাস্ত্র-মতে স্নানের পর ব্যবহার করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল;

তবে ত্রি-বাসের অন্তর্বিষেবতঃ-ত্রীলোক-দিগের পক্ষে এইরূপ নীল বস্ত্র ব্যবহার করা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রকারগণ নীলের উপর কেন এত বিরূপ ছিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আপত্তি সংহিতার ব্যবস্থা দেখিতে পাই (৬ অধ্যায় শ্লোক ১—১০) ব্রাহ্মণ জাতি নীল রঙের বস্ত্র ধারণ করিলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইবে। এমন কি অজ্ঞাতসারে নীল ক্ষেতের উপর দিয়া যাওয়াও করিলেও এইরূপ উপবাস করিবার বিধি আছে। পরায়ণ সংহিতায় নীল ক্ষেত্রে উপর তক্তুলের অথবা বিলাতির ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১২)

বিশেষে বা প্রোমাক্ষরে ঘাইতে হইলে কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বস্তি বা বংশদণ্ড এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করার বিধি ছিল। (১৩) বাজবল্য সংহিতায় (১৪) এই উক্তি হইতে মনে হয় যে তখনও বোধ হয় পিতল

(১১) Arian (আরিয়ান) বলিয়াছেন ভারতবর্ষে বেতচর্মনির্মিত বিনামার ব্যবহার ছিল। উদ্ধিঘায় একশ সূতা অন্তর্গত নির্দিষ্ট হয়—Sarkar’s Positive Back-ground of Hindu Sociology (p 26)

(১২) পুরাকালে “নীল মাসুয়ার” অত্যাচার ছিল কি না জানি না; কিন্তু শাস্ত্রকারগণের নির্দেশে দেখিতে পাই যে ক্ষেত্রে নীল বস্ত্র করিলে বারো বৎসর সে ক্ষেত্রে লগ্ন হইতে পারে। নীল আবাদে ভূমি বড়ই নিপেক্ষ হইয়া পড়ে; এই কারণে কিবা পাছে নীলের আবাদ অধিক লাভজনক বলিয়া লোকে শাস্ত্রের আবাদে অস্থির হয়ে, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিধি গঠিত হইয়াছিল কি না তাহা বলা বড়ই কঠিন।

(১৩) পণ্ডিতের ভ্রাম্য শাস্ত্রী কয়েকটি প্রাচীন পন্থার অর্থের ভারতীয় লক্ষ্য করিয়া বাজবল্য-সংহিতা অপেক্ষের কালের পরবর্তী বলিয়া বিবেচনা করেন।

(১৪) কুণ্ডল হিন্দু কবিবেদ-সংস্কৃত-জ্ঞানপত্র বলে চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু একশ পদ ও অংকুর পরিচায়ক অলঙ্কার, ভিন্ন স্থানে খাটবার সময় ব্যবহার করার এখাট এক হিসাবে ভাল ছিল বলিয়াই মনে হয়। দেবালয়ে অপরিচিত স্থানে পশম করা বড় নিরাপত্তা ছিল না। এখন সবেমাত্র ভাবে প্রচাতি লইয়া গেলে বা পুঙ্খানুপুঙ্খ খাতিয়ার চেষ্টা করিলে অজ্ঞাতকুলঙ্গল ব্যক্তিকে কলিকাতা

গোষ্ঠীর প্রচলন হয় নাই। অধীতবুদ্ধবিভ্রা
কতক্কার কিত্তণ বেশ-ভূষা করিত তাহা
উত্তরায়চরিত হইতে জানা যায়—

শুভস্তুতাম পথিত লাহনমুরো।

ধন্তে বচং দৌরবীঃ

মৌব্যা মেথলয়া নিরহিততনধোবাসন্

মজ্জিকম্

পাণো কাম্ কামকস্হ্যে বলয়ং নগুং

তথা পৈয়লম্

(চতুর্থ অঙ্ক—স্রোক ২০)

তৃণীয় হইট চলিছে পৃষ্ঠে, লম্বিত শিখাগুলি ।
করিছে পরশ শায়কগুলির কতপাতার পুঞ্জ ।
পুত লাহনে চিত্রিত রূপি বার্ণের তনুপুঞ্জ ।
করুর চম্ব স্বন্ধে ধরিছে আশ্রমবনকুঞ্জ ।
মৌবী-মেথলা পৃথিবীতে রাঙা অধোবাসনও ।
করে পরাসন অক্ষমালিকা আর শিল্পলবণও ॥

(ঐবুদ্ধ কালিহাস রায়-কৃত অহুবাধ)

বিবস্ত্র হইয়া মান করা বা দুমানো (১৫)

নিবিদ্ধ ছিল, এবং সৌভম সংহিতার আরও
সেখিতে পাই (chap IX) যে, দিবসে
মত্তক আবৃত করিয়া বাহিরে যাওয়া উচিত
নহে এবং রাত্রে অনাবৃত মত্তকে বহির্ভ্রমণ
নিবিদ্ধ । দিবসে খালি মাথার থাকিয়া

“লক্ষা শির” বাল্যলী যে রীতিমত শাহের
অলুশাসন মানিয়া চলিতেছে, এ কথা মনে
করিলে আশ্বাসের আর চুৎখ-লক্ষ্য করিবার
কারণ থাকে না ।

সামারনে সীতার বিবাহকালীন পরি-
চ্ছাদি-বর্ণনায় রেশম ও পশম-নির্মিত
বস্ত্রের এবং সলোম চন্দ্রাদির (Furs)
উল্লেখ আছে । (Sarkar's Positive
Background of Hindu Sociology.
Page 260) প্রাচীনকালে পুরুষেও
যথেষ্ট অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতেন ; কর্ণে
কুণ্ডল, গলায় হার, বাহুতে কেবুর্ন, যদিও
বলয় । পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের মধ্যে কুণ্ডল
বৌরবোলীর এখনও চলন আছে, হারের
বদলে নিক বা মুদ্রার মালার ব্যবহার
এখনও চলিতেছে এবং বাড়োয়াগীর্ণ
বাণ-বুঝ-নির্জিগ্মেয়ে অনেকেই হাতে
সোনার “ভাগা” ধারণ করিয়া থাকেন ।
গৃহস্থেরে কজীর স্তায় আর একটি জিনিষের
চলন দেখিতে পাই,—বদরী বা চন্দন
কাঠের ক্ষুদ্র বর্জুল ছিদ্র করিয়া ছিদ্রদ্বয়ে
সুবর্ণ সংবদ্ধ করিয়া পলদেশে ধারণ করা ।
(Grihya Sutra—Hiranyakeshi P.

পুলিশ আইনের ৪০-ক বায়া বা কাণবিধি আইনের ১০২ বায়া অগুসারে loitering charge-এ
বৃত্ত করা হইয়া থাকে; সেখানেও সেইজন্য অজ্ঞাত-দুন্দীল, আত্মবোশ-সচেট, সংহারক-প্রসবিত পথপ্রদে
অতিশ্রান্ত বা অতি-বিস্রাম্ যাকিনে শুধু মদ্যরক্ষী নহে—বে-কেহ সন্দেশ হইলেই রেপার করিতে
পারিত (অর্থপত্র ৩০ অধ্যায় ১৪৪) ; আরও দেখা যায় যা ও পূর্বপ্রচারী কত-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে
রাজপথে দেখিলে তাহাদিগকেও আটক করার নিয়ম ছিল । ইহাও কলিকাতা পুলিশ আইনের অপর
একটি ব্যায়র কতকটা অগুতাপ । (Sec 70. Act IV of 1866)

(১০) ইউরোপগতে এতল বিধি-নিষেধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না । Charles Reade—ইউ-
রোপের মধ্যযুগের চিত্রে Cloister and the Hearth গ্রন্থের নাকের মুখে ‘naked bed’ পরম আশ্চর্য
জিনিষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।

166. Ed. Maxmuller) শুক্রনীতিতে অপরের গুণগুণাবলি ব্যবহার “ছল” বা সামাজিক অপরাধ বলিয়া বর্ণিত আছে।

অঙ্গরাগ ও অঙ্গকি দ্রব্য

হুগর নামক অঙ্গকি দ্রব্যের চূর্ণ (গোভিল ও প্রণা ২ কা), চন্দনকাঠের চূর্ণমিশ্রিত প্রলেপ এবং কুচুমানি ব্যবহারের প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও একোদিকে প্রাক প্রকৃতি অঙ্গুষ্ঠানে অঙ্গে কুচুমানি চূর্ণ মর্দন করা হইত। (মহু ৪র্থ অধ্যায় ১১শ্লোক) অঙ্গকি দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও নিবেদন দেখা যায় না। মহুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায় ২৫০ শ্লোকে লিখিত আছে, অঘাতিকভাবে কেহ শয্যাস্রবা, গৃহ, কূপ, অঙ্গকি দ্রব্য, জল ও মূল প্রকৃতি ধান করিলে কদাচ তাহা অপ্রাণ্যমান করিবে না। লোমচূর্ণ বোধ হয় অনেকটা Face Powder-এর কাছ করিত। “কেনক” ও মামের পূর্বে ব্যবহার্য চূর্ণের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চক্ষু অঙ্গনের স্রাব ব্যবহারের মন্ত গৃহ-যজ্ঞে হিমাগর হইতে আনীত ত্রিকুণ্ডলক প্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (আপত্যন্ত Ed. Max. M. I. 108)। ধূপ, সর্ষপ (ধূনা) প্রকৃতির ব্যবহার ছিল। কেশবাসের মন্তও অঙ্গুর ধূপ ব্যবহৃত হইত।

তৈজসাদি

ধর্মশাস্ত্রে অতচ্চিৎসেন-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই (পরশুর-সংহিতা ৪র্থ অধ্যায় শ্লোক ২৪ ২০) যে কাংস্ত, যোগা, লৌহ, সীসক

ও প্রস্তর-নির্মিত পাত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মহুসংহিতার খাতব পাত্রের উল্লেখ নাই বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত সংহিতাদির মধ্যে ঐ গ্রন্থকেই প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন। অবি, মৃগ ও মন্ত (হস্তিমন্ত?) নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যবহার ছিল এবং বংশ-নির্মিত (চোটেই প্রকৃতি) দ্রব্য এবং মৃগ বা ঝিড়েও (pitcher seats made of rush) ব্যবহৃত হইত। লৌহ-পাত্র একস্থান হইতে আর একস্থানে সরাইয়া রাখিলেই শুদ্ধ হইত। সীসক, স্বর্ণ, যোগা, মন্ত, ও অবি-নির্মিত দ্রব্যাদি ও মণিরূপ প্রকৃতি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইত। প্রস্তরময় পাত্রাদির সম্বন্ধেও এইরূপ বিধি ছিল। কাংস্ত পাত্র কখনও বা ছাই দিয়া মাখিয়া কখনও বা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কখনও বা কিছুদিন সূতিকার পুঁতির দ্বারা রাখিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইত। মোড়া চোটেই প্রকৃতি অগ্নিতে হইলে জলে ধুইয়া লওয়া হইত। মৃগপাত্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইত। পীঠী, বৃত্তাকার, সমস্তক প্রকৃতি কাষ্ঠাসনের ব্যবহার পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরশুর সংহিতার খাটের উল্লেখ দেখা যায়। মন-নির্মিত বাগিস ব্যবহার করা হইত। (১৭) কদল প্রস্তুত করার মন্ত শুভ্রাটের আভিধিগের বিলক্ষণ ব্যাতি ছিল। স্তম্ভাং কদল ও শ্যাদির মন্ত ব্যবহৃত হইত। বিছানা রোঙ্গে দিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইত। দোহিত বা পীত বর্ণ আভরণাদি বোধ হয় রঙ উষ্ণিয়া বাইবে বলিয়া “কাজ” হইত না, কেবল রোঙ্গে দেওয়া

হইত। আমায়ণে চম্ভারত বহনীরেরও পরিচয় পাওয়া যায়। (১৭) অপরায়ণ গৃহস্থালীর প্রবোহ মধো চমস (milking vessel) কুণা, কুড়ি, চালন, সমাঙ্কনী, কুটক বয়, (টেকি ? উদ্বল, বয়ট বা বোচনী (জাঁতা) ও অন্ত্রে শাণ বিহার লজ ব্যবহৃত ব্রহ্মদিয় উল্লেখ দেখা যায়। অর্পণায় কোষ্ঠাগার-বর্ণনা প্রসঙ্গে বাক্য প্রকৃতির এবং রামায়ণে "কা" বা ছাগচর্চ্ছাবৃত পেটকের উল্লেখ আছে। (১৮) ধর্মশাস্ত্রে বজ্রীয় পাত্যাদির মধ্যে ক্রক, ক্রব, ক্ষা, চমস, চক্রহালী অজাখালী, মেক্ষ প্রকৃতির উল্লেখ দেখা যায়। ক্রক = খদির বা পলাপাদি কাঠে নির্মিত হাতার স্তায় ব্রহ্ম; বজ্রায়িত হবি চালিবার লজ ব্যবহৃত হইত। ক্রবও একপ্রকার বজ্রীয় হাতা-বিশেষ। ক্ষা একপ্রকার বজ্রীয় পাত্য; উহা বস্ত্রনামেও অভিহিত হইত। (Jajnavalkya chap. I. P. 31 Ed. M. N. Dutta), মেক্ষ = বৃত্ত রাখিবার পাত্য বিশেষ।

খাত্তাদি ও পানীয়

মহাসংহিতা (৪ম অধ্যায়), যজ্ঞবল্ক্য ও কুর্শপুরাণ প্রকৃতি গ্রন্থে খাত্তাখাত্ত বিষয়ে বিধি-নিবেধানির উল্লেখ আছে। মন্ত্তের মধো পানীয় অর্থাৎ বোয়ালি, রাজীব, সিংহাস্ত (১২) শকুল (শোল) এবং বৃহৎ শকুল মন্ত্তের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কোটিল্যের সময়ে যে শুক মন্ত্তাদিও উল্লেখ করা হইত তাহা অর্থশাস্ত্রে হইতে জানা যায়। সজাক, অর্পণোদিকা, গণ্ডার, কচ্ছপ এবং ধরগোশের মাংস গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল না। উক্তের মাংস মুসলমানগণের নিকট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। মহাসংহিতাতেও ইহা অখাত্ত বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। গৃহপালিত দুরগী, হংসাদির স্তায় বৃক্শদাবিশিষ্ট পক্ষী এবং কপোত পারাবত টিট্টিত প্রকৃতি ভোজন করা নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু ময়ূর তিস্তির কপিঞ্জল (চাতক) প্রকৃতির মাংস দূষ্য আহার বলিয়া বিবেচিত হইত না (কুর্শ পুরাণ ১৭ অধ্যায়)। শাক-সবজীর মধ্যে

(১৭) রাম উৎকৃষ্ট-চর্ম্মরূপ পথ্যগ্রহণ ব্যবহার করিতেন ("অর্জুনোত্তর সংকীর্ণে বরাহব্রহ্মব্রহ্ম")।

অন্যোধ্যা—৮—৪

রামের বিলাস-দুখে রাম অবিধ-চর্ম্মে আবৃত মনোহর পথ্য ধর্ষণ করিয়াছিলেন।

(পরবর্ত্তরগাভীরাবিকারিত সংস্কৃত)

মুদ্রক—১০—৩

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বোম্বাইতে রচিত প্রবন্ধ, সাহিত্য—বৈশাখ ১৩২০। মহাত্মারও ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ আছে। এই লক্ষ্য চর্ম্ম দ্বিভিত্তিক উপহার নেওড়ার লজ বিভিন্ন দেশের রামজবর্ন কর্তৃক আনীত হইয়াছিল।

(১৮) বোম্বাইতে মহানর অন্যান্যাকাও ১০১৭ স্নোক বর্ণিত "কট্টন কলে"র যে অর্থ করিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে ০ উহা আধুনিক ছোট suit-caseএর মত কিছু হওয়াই সম্ভব। কারণ Hand-bagএর পার্শ্ববেগ সাধারণতঃ বম্বাই (Ghinble) দেখা যায়।

(১৯) কেহ কেহ বলেন শকুল ও সিংহাস্ত একই জাতীয় বস্ত্র। আগন্তব্দগৃহস্থ (Patila Sec. 3 Ed. Maxm.)

বার্ভাফু, কবনী, লাউ (অলাবু), কুবড়া, শিম, ওল, কাঁহর, পালাং শাক, ধমনক (মোনা-*artemisia Indica*), আগুচ, মুলক, রাবরাব (বর্গট), পিওমুল (গর্জর), ততুগীর (মটোনাক), কালপাক, বরংগুণা (কছু) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। ড্রাক্সা, দাড়িম, কশেকক (কেতর), শৃঙ্গাটক (পানিকম) প্রভৃতি সুখাত্ত ফল-মূল প্রাচ্যাদি উপলক্ষে বান করা হইত। বাতুলু (বাতাবিলেবু), পিরাঙ্গ, লভন, শালগম, পাতালকোড় (mushroom or truffles) প্রভৃতির আবাদের সময় বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া এগুলি নিবিড় খাত্তের পর্যায়-ভুক্ত ছিল। (২০) ধর্ম্মশাস্ত্রে গল্পা চিংড়ি বিজ্ঞাতির ব্যবহারের উপযোগী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। (যাক্সবক্য Chap. I. Ed. M. N. Dutta) মৃগ, মেঘ ও ছাগ মাংস বোধ হয় কোন কালেই নিবিড় ছিল না। বাচ্চুগল বা সাবা বুড়া খালীর মাংসেও (২১) সেকালের লোকের বিশেষ আপত্তি ছিল না। গৃহ যজ্ঞের বৃগে বিবাহাদি সময়ে গোমাংস আহ্বারেরও উল্লেখ দেখা যায়। (আপলুখ গৃহসূত্র Patala I, Sec. 3, Ed. Max M.) অস্তান্ত খাত্ত ভ্রবোর

মধ্যে লাভা (খই) শকু (ছাতু) শকুলী (২২) কুসর (তিল ও তুলু প্রস্তুত অন্ন) পুরোডান (কটির ভ্রাব বজীর খাত্ত) সংখাব (গোদুস চূর্ণ, গুড়, হুড় ও দ্রুত-সহযোগে প্রস্তুত খাত্ত) পায়সার পুরিক, অগুণ (বড়ার ভ্রাব খাত্ত) পিষ্টক এবং তিলচূর্ণ ও শর্করা মিশ্রিত যোগদাদির উল্লেখ দেখা যায়। ভজিত যব দধির সহিত গ্রহণ করা হইত। (Gobhila Ed. Max M. P. 78) (২৩) দধি ত্রিভাতক বা ত্রিহুগকির সহিত ব্যবহার করা হইত। যবমণ্ড বা যবাণ্ড ও তক্র (যোল) প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। মুচ্ছকটক অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রহণ কবি ভাস প্রণীত চারুপত্ন নাটকের প্রারম্ভে বোধিতে পাই “কি প্রাতঃরাশ আছে?” এই প্রশ্নের উত্তরে দ্রুত দদি ততুল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছে। (খিলং গুলং দহিং ততুলা অ অধি) সম্ভবতঃ এই সকল ভ্রব্যাদির সহযোগে সে সময়ে “প্রাতঃরাশ” প্রস্তুত হইত। আমলক বেক্রপ গায় মাখার নিয়ম ছিল সেইরূপ অন্নমণ্ড প্রভৃতির সহিতও গ্রহণ করা হইত, কি কি ভ্রব্য ত্রিকা স্বরূপ প্রস্তুত হইত (২৪) রক্তাণ্ড পুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহারও পরিচয় পাই।

(২০) মহাবং পুস্তক ১৫৮ পলাতু কবকানিচ (বহু, অখায় ৬, লোক ৫)

(২১) ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মহাবংহিতা যুঃ পুঃ সমুদ্র হইতে জরোথন পত্নাখীর মধ্যে রচিত; Schlegelএর মতে যুঃ পুঃ ১০০৫ অব্দে এবং Sir Wm. Jones এর মতে যুঃ পুঃ ১২৮০ অব্দে রচিত। Wilson কিন্তু ইহা বের ৪৫ গ্রহণ না করিয়া মহাবং ধর্ম্মশাস্ত্রের ৩৮০-কাল যুঃ পুঃ বিভীত পত্নাখী বলিয়া মনে করেন।

(২২) শকুলী—ভিত্তিই পুঃ-বেওজা কচুতী প্রভৃতির ভ্রাব-খাত্তরূপ।

(২৩) যবেলাপত্রকৈশোরগ্রন্থকি জিহাতকম্। যাকপনরঃহুঃ চতুর্ভাতকম্ভ্যতে ৪

(২৪) সূত্রের সহিতও আমলক ব্যবহার করার বাখ্য্য ছিল। আধুর্বেণ্ড গ্রন্থের “নমুলসারামলক-দিনা” প্রভৃতি বচনে ইহাই অস্বাভাবিক হইতেছে।

ভৈক্ষ্যঃ স্ববাণ্ড, তক্রঃ পরঃ বা বাবকমেবঃ
কলমূলং বিপকঃ বা পিণাকঃ (২৫)

শক্তিভোহপি বাঃ
(শ্লোক; ১৬)

একপ্রস্থ পরিমাণ অন্ন একচতুর্ধ প্রস্থ
স্থপ এবং স্থপের একচতুর্ধ পরিমাণ তৈল
ও দ্রুত অর্থাৎ পুষ্কবর্ণের আহারের পক্ষে
যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। [এক
কুচুখের চারিগুণ এক প্রস্থ, আর এক
প্রস্থের চারিগুণ এক আঢ়ক। এক আঢ়ক
প্রায় ২৫ পাইট বা আন্দাল ২২২ আউন্স
(Avoirdupois) হইবে। J. R. A. S.
April 1915 p. 227]

পুষ্কোক্ত প্রব্যাদির একচতুর্থাংশ ভক্ষন
করিয়া গইলেই ত্রীলোকদিগের পক্ষে পর্যাপ্ত
আহার বলিয়া অনুমান হইত। ত্রীলোক-
দিগের আহারের অর্ধাংশ বালক বাণিক-
দিগের ভক্ষন নির্দিষ্ট ছিল। “অবর” বা নিম্ন-
জাতীয় পুষ্কবর্ণের ভক্ষ অর্থাৎ পুষ্কবর্ণের
স্ত্রীর সমপরিমাণ স্থপ এবং স্থপের অর্ধ
পরিমাণ তৈলমাত্র নির্ধারিত ছিল। বিপ
পল পরিমাণ মাংস পাক করিতে হইলে
অর্ধ কুচুখ তৈল, একপল লবণ, একপল
লবঙ্গ, অর্ধপ্রস্থ ঘি এবং দুই ধারণ খাল-
মশলাদি ব্যবহার করা হইত। (২৬)
শাকাদি (শাকসজ্জী ও শুক মন্ত) একত্রে

পাক করিতে হইলে ইহার দেড়গুণ এবং
তদুপ শুক মন্ত পাক করিতে হইলে ইহার
দুইগুণ তৈল-মশলা ব্যবহার করার ব্যবস্থা
ছিল। অর্ধশাস্ত্রে মন্ত-পানাদি বিশেষভাবে
নিষিদ্ধ থাকিলেও কোটিল্যের যুগে—যুঃ পুঃ
৩র্থ শতাব্দীতে—(২৭) যে উহা প্রচলিত
ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্ধশাস্ত্রে
(২৪ অধ্যায়, ২৫, ২৬; এবং চতুর্থ
অধ্যায় ১৩) রাক্ষণদিগের মধ্যেও স্ত্রীপান
ও মাংসাহারের উল্লেখ আছে। সম্বর্ত
মহিষ্ঠার পৌড়ী পৈঙ্গী ও মাঙ্গী এই তিন
প্রকার স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাই। এই
তিনেরই ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। (শ্লোক, ১১৫)
নিষিদ্ধ স্ত্রী পান করিলে উত্তপ্ত স্ত্রী পান
করিয়া তাহার প্রাণশক্তি করিতে হইত।
সামান্যে বৈয়ের স্ত্রীর উল্লেখ আছে। (২৮)
কোটিল্য বৈয়ের বাজীত, মেদক, প্রসন্ন,
আসব ও মধু প্রভৃতি স্ত্রীর তালিকা
দিয়াছেন। খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় তাঁহার “পাষাণের কথা” গ্রন্থে
পুরাকালে নাগরিকগণের ‘কাষ’-প্রীতির
বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষ চরিতে কাষ
স্ত্রীর উল্লেখ আছে। অর্ধশাস্ত্রের ২৫
অধ্যায়ে লিখিত আছে যে কোনও
বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম-উপলক্ষে (কৃত্যবু)
বাস্তিবিষেব বা কোনও পরিবার বা

(২৫) দিপাক—তিলক

(২৬) Shama Sastry's ArthaSastra p. 116, 117.

(২৭) অর্ধশাস্ত্র শ্রেণীতে নৌদেয়, রামায়ণে লিখিত। সহ ও পরাদয় এ উভয়েরই অর্ধশাস্ত্রের
উল্লেখ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২৮) মধু—স্রাব্য হইতে এবং আসব কপিথ (কংকল) ও লবঙ্গ-সম্বন্ধে প্রস্তুত হইত। বৈয়ের
স্ত্রীর শুক, ত্রিকলা ও মেদ-সজ্জী প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহৃত হইত। (অর্ধশাস্ত্র ২৫ অধ্যায়)

গোষ্ঠীকে খেত সুরা প্রস্তুত করিবার অহুমতি দেওয়া হইত। বায়াম-পীড়ার অস্ত্র অরিষ্ট বা কবিরাজী আসবাধি প্রস্তুত করা সম্বন্ধে তাত্‌কালীন আবকারী বিভাগের কোনও নিষেধ ছিল বলিয়া দেখা যায় না। বেলা (সমাল) ও পর্জোপলক্ষে চার দিনের অস্ত্র মন্ত প্রস্তুত করিবার অহুমতি দেওয়া হইত। সুরাপান অস্বাভাবিক প্রচলিত থাকিলেও আবাদিগের স্ত্রায় ঐদ্যপ্রধান বেশে জলই যে সাধারণতঃ পান করা হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কলস

প্রভৃতি পাত্রের মুখে বস্ত্র দিয়া তদ্বধ্যে জল উঠাইয়া সেই জল পান করা হইত (“বস্ত্রপুতঃ জলং পিবৎ” ত্রিষাণ্ডপুরাণ ch. xv st 6)। উৎপল, পাটলি প্রভৃতি ফুলের দ্বারা পানীয় জল সুবাসিত করা হইত। আধুনিক কালেও কেতকী (কেরা) ও কনকচাঁপা বা মুচকুন্দ ফুল (Pterospermum acerifolium) প্রভৃতির দ্বারা পানীয় জল সুগন্ধি করিয়া লওয়া হয়।

। আগামী সংখ্যার সমাপ্য

ঐত্তমস সরকার।

দাঁতের বাথা

(রুশ-লেখক আন্তন শেখভ হইতে)

দাঁতের বাথায় কর্তা বেজার কাবু এবং কাছিল হইয়া পড়িয়াছেন! দাঁতের গোড়ায় তিনি চুকটের ছাই শুঁজিয়াছেন, আকিমের তেত রস মাখাইয়াছেন, এমন-কি টার্পেনটাইন ও কেরোসিন তেল ঢালিতেও কিছুমাত্র কস্বর করেন নাই; কিন্তু হা হতোহ্মি! এ-সব চিকিৎসায় তাঁর উপকার ত হইতেছেই না—বরং অপকার হইতেছে বেশী! গিন্নী হইতে স্বক করিয়া আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে ও চাকর-বাকর যে যেখানে ছিল, সবাই একটা-না-একটা ‘অব্যর্থ’ টাটকা-টোটকার ব্যবস্থা দিয়াছে—কিন্তু দাঁতের গোড়া যে-কে সেই! কর্তার মুখ ক্রমেই দুলিয়া ঢোল হইবার গতিক আরম্ভ।

শেবটা কর্তার পেরায়ের চাকর হরি আলিয়া বোড়হাতে বলিল, “হজুর! আমার সম্বন্ধে একটি শুণী লোক আছে, দাঁতের বাথা সারাতে সে ওস্তাদ। আপনার সামনে দাড়িধেঁ সে খালি একটু থুথু ফেলবে আর আপনার বাথা বিলকূল সেরে যাবে!”

—“কোথায় থাকে সে?”

—“আমার দেশের কাছে। দাঁতের চিকিৎসে করেই তারা সাতপুরুষ পারের ওপর পা ধিরে বসে-বসে ধেরে আসচে! দূরদেশ থেকে যে-সব রোগী ভাকে ভাকে, বাড়ীতে বসে-বসেই সে তাদের রোগ আতাম করে দেয়!”

—“বাড়ীতে বসে-বসেই?”

—“হ্যাঁ হজুর, বাড়ীতে

চিঠিতে সে অব্যর্থ হৃদয় খাড়ে কিনা !
আপনি তাকেই চিঠি লিখুন !”

—“তার মাথা আর সুখ ! যেটা
গাঙ্গাধার !”

—“হজুর, পেতার না হয় একবার
পরখ করেই দেখুন না কেন ! এ যে-সে মস্ত
নয়—একেবারে অব্যর্থ হৃদয় !”

‘অব্যর্থ হৃদয়’ের কথা শুনিয়া গিটী
গলিয়া গিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, একবার দেখতে
সোদটা কি ? কিসে কী হয়, কে বলতে পারে !”

পাতের গোড়াটা আবার কটুকটু করিয়া
উঠিল। সেই কটুকটানি মুক্ হইবামাত্র
কর্তার বত আপত্তি, বত অবিশ্বাস, সমস্তই
কর্ণের মত উবিয়া গেল ! দারে-পড়িয়া বাগ্
মানিয়া কর্তা বলিলেন, “আচ্ছা, রাজি !
নিরে আর কাগজ—নিরে আর কলম ! উঃ !
গেলুম যে—আর পারিনা ! ভূত-শ্রেস্ত দানা-
মৈত্যা—কে তার বেশে আছে ? বল তার
নাম ! তাকেই আমি চিঠি লিখব !”
—কর্তা কাগজের উপরে একেবারে কলম
বাগাইয়া বলিলেন।

হরি আগাইয়া আসিয়া বলিল, “তার
নাম কাক-পক্ষী কে না জানে ? তার
নাম—তার নাম—”

—“তার নাম কি ?”

—“তার নাম—তার নাম—ঐহুক বাবু
—তার নাম ! কি মুড়িল ! নামটা মনে
আসচে না যে ! একটু সব্ব করুন—
এখনি বলি !” হরি শিবনেত্র হইয়া কড়ি-
কাঠের দিকে তাকাইয়া নাম ভাবিতে
লাগিল ; কর্তা আর গিটী হাঁ-করিয়া
বাহ্যভাবে ভাষার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—“কি রে, মনে হোল ? ভাল করে
ভাব !”

“একটু সব্ব করুন ! তার নাম—
তার নাম, কি মুড়িল ! মনে পড়চে না যে !
বনমালী ? উহ ! বনমালী নয় ! কেদার ?
না কেদারও নয় !”

—“তবে ?”

—“একটু সব্ব করুন। তার নাম—
ওর-নাম-কি—তার নাম—হঁ, হয়েচে,
হয়েচে !”

—“কি, কি, বলে ক্যান্ বাবা, বলে
ক্যান্ !”

—“কি জানেন হজুর, তার নামের
সঙ্গে ঘোড়ার মতন একটা নামও আছে !”

—“ঘোড়ার মতন নাম—অখিনী খুঁজ ?”

—“উহ, গর্দভ মানে কি কর্তা !”

—“গর্দভ মানে তুই ! বেটা মুখ !

কোথার ঘোড়া আর কোথার গাধা !—শোন,
অখিনীহুমার নয় ত !”

—“উহ !”

—“অবশেন, অবশেষ, অবতুষণ ?”

—“উহ !”

—“তবে কি ?”

—“একটু সব্ব করুন ! ঘোড়া—
ঘোড়া—ঘোড়া, হঁ, তার নামে ঘোড়ার
মতন নাম আছে !

—“অব্যর্থামা ?”

—“উহ !”

—“তবে আমি চিঠি লিখব কাকে ?
ভাল করে ভাব—ভাল করে ভাব !”

—“একটু সব্ব করুন। ঘোড়া—ঘোড়া
—ওর-নাম-কি—ঘোড়া—”

গিন্নী বলিলেন,

—“উহু!”

গিন্নী গালে হাত দিয়া আঠো-ঝানিক ভাবিয়া বলিলেন, “অশগন্ধা নয় ত!”

—“উহু! নামটা আমি ভুলে গেছি!”

কর্তা চট্টরা লাল হইয়া বলিলেন, “নামই যখন জানিস্ না, তখন চালাকি করতে এসেচিস্ কেন? বেয়ো এখান থেকে!”

হরি ভাবিতে-ভাবিতে আন্তে-আন্তে বাহির হইয়া গেল।

কর্তা ফুলো গালে ফেটি বাধিয়া চারি দিকে ক্যাপা ঘোড়ার মত দৌড়োদৌড়ি করিতে লাগিলেন;—“ওঃ! ওঃ! বাপ্‌রে বাপ্‌! চোখে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না গিন্নী, কিছু দেখতে পাচ্ছি না!”

হরি বাগানে বসিয়া আকাশ-পানে মুখ তুলিয়া নাম ভাবিতেছিল, এমনসময় কর্তা আবার তাহাকে তলব করিলেন। হরি বাইবামাত্র কর্তা কাত্‌রাইতে-কাত্‌রাইতে বলিলেন, “ওরে বাবা হরিনাথ, নামটা মনে পড়ল কি রে বাবা?”

—“একটু সবুজ করুন কর্তা!”

—“তার নাম কি অশতর? অশথ? তাও নয়? অশপাল?”

—“উহু!”

কর্তা আরো-বেশী দমিয়া গিয়া গালের উপর আর এক ফেরতা ফুলেল ঝড়াইলেন।

বাড়ীর সবাই মিলিয়া নাম ভাবিতে লাগিয়া গেল। গালে হাত ব্লাইতে-ব্লাইতে কর্তা, তাঁর পাশে বসিয়া গিন্নী, পান সাজিতে-সাজিতে দ্বাদী, রাধিতে-রাধিতে বামুনঠাকুর, ফুলগাছে জল

দিতে-দিতে মানী,—সকলেই ভাবিতেছে ঘোড়ার নাম! কর্তা বলিয়াছিলেন, যে আসল নামটি বলিতে পারিবে সে মশ টাকা, বখশীস্ পাইবে!

খোকাবাবুর বড় সাধ একটি কাঠের ঘোড়া ও ঘুড়ি-লাটাই কেনেন; এই সুযোগে বধি সেগুলি কেনা হইয়া যায়, তাই ভাবিয়া তিনিও হরির কাছে গিয়া বলিলেন, “তার নাম কি ঘোড়সওয়ার? অশ্বারোহী? ঘোড়ার গাড়ী?”... ..

সন্ধ্যা হইল। কিন্তু আসল নাম কাহারও মনে পড়িল না—সুতরাং চিঠিও পাঠানো হইল না। কর্তা বিছানার পড়িয়া কাটা পাঠার মত ছট্‌কট্‌ করিতে-করিতেই সারারাত কাটাইয়া দিলেন,—ঘুম ঘেন সে তল্লাট ছাড়িয়া চম্পট দিয়াছে! সকাল হইতে-না-হইতে তিনি চাকরদের ঘরে গিয়া হাজির হইয়া বলিলেন, “ওরে হরে! তার নাম কি তুরগ?—নয়? তুরঙ্গ—তুরঙ্গম—হয়—টাটু—পক্ষীরাজ? তাও নয়?”

—“উহু!”—বলিয়া কাঁচুমাচু মুখে হরি কোঁপ-করিয়া একটা অশ্বত্তির নিবাস ফেলিল।

—“তবে বোধ হয় ঘোড়ার নামের সঙ্গে এ নামের কোন সম্পর্ক নেই!”

—“আছে কর্তা, আছে! আমার বেশ মনে পড়চে তার নামে ঘোড়ার নামের মত একটা কিছু আছেই-আছে! সেইটে মনে পড়লেই তার নামটাও মনে পড়বে!”

—“বাবা হরি, ভাব্‌ রে বাবা, ভাল করে ভাব্‌! বাপ্‌রে বাপ্‌—প্রাণ যে ধার!”... ..

পরদিন প্রভাতেও যখন নাম বাহির হইল না, কর্তা তখন বে-কারনার পড়িয়া মরিয়া হইয়া বলিলেন, “বা থাকে কপালে, এ দাত আমি তুলিয়ে ফেলব। দাত বাঁচাতে গিয়ে শেবা কি প্রাণটা খুইয়ে বসে? দূর হোক, কাজ নেই এমন হতচ্ছাড়া দাতে!”

তখন ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি সাঁড়াশি দিয়া অগ্নিবর্ণনে পট্-পট্ করিয়া ছ-ছটা দাত গোড়ানুড় উপড়াইয়া কেলিলেন। দাত তুলিয়া কর্তাও কিছু ঠাণ্ডা হইলেন।

ডাক্তার ভিজিট লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

সবর ধরজা বুড়িয়া দাড়াইয়া হরি আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া বলিতেছিল—“ঘোড়া—ঘোড়া—ওর-নাম-কি, ঘোড়ার মতন নাম—”

শিঘ্র হইতে ডাক্তার হরিকে চোচাবার ডাকিলেন, কিন্তু ভাবনাবিভোর হরি সাড়াশক কিছুই দিল না।

আন্তে-আন্তে তাহাকে একটা খাতা

মারিয়া বিরক্ত স্বরে ডাক্তার বলিলেন, “কে হে বাপু তুমি? ঘটোৎকটের মত পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সরে দাঁড়াও!”

হরি বিছাতের মত ফিরিয়া দাড়াইয়া বলিল, “কি বল্লেন—কি বল্লেন—ঘটোৎকট? ঘট—ঘট—ঘোটক—ওর-নাম-কি ঘটক! অ্যা!—হয়েচে, হয়েচে!” বলিতে-বলিতে সে প্রাণপণে বাড়ীর ভিতরে ছুটিল।

অবাক ডাক্তার একবারে থ!

কর্তার সম্মুখে গিয়া হরি হাঁপাহাড়ে-হাঁপাইতে আক্সান্দে-আটখানা হইয়া বলিল, “হয়েচে হজুর, তার নাম মনে হয়েচে! ঘনরাম ঘটক—তার নাম ঘনরাম ঘটক!”

কর্তা বুলি পাকাইয়া, চোখ রাগাইয়া গজ্জাইয়া উঠিলেন, “বেটা চোঁকি-অবতায়! তোর ঘোড়ার মত নামের নিষ্কৃতি করেছে! সে নাম আমি জানতে চাইনা—আমার সামনে থেকে তুই দূর হ পাড়ার্গেরে কৃত, দূর হ!”

ঐমতী রেগু রায়।

“স্বপ্নিতে ফিরিয়া এল জাগরণ”

আজ আকাশের চোখে পড়িল পলক,
সহসা নিভিল তাই প্রথর আলোক!
নয়ন পরব ছায়া ছেয়ে দিল বীরে,
যন নীল নীলিমার প্রায় ধরবীরে!
চির জাগ্রতের এল তত্ত্বার আবেশ,
পবন নিম্পন্দ হর, কাকলি নিঃশেষ,
অরণ্যে তত্ত্বিত তরু, নিঃশব্দে স্বরার
আধারের যবনিকা নামিল ধরার!

অকস্মাৎ বিভ্রাতের চেতনা স্ফার,
আকাশ চমকি আঁধি খুলিল আবার
উদীপ্ত প্রভার দিল নিগন্ত কলসি;
আধারের যবনিকা পড়ে গেল ধসি!
উর্জ্বাস পবনের নিশাস-আবেগে
অরণ্য উত্তত শাখা ক্রত ওঠে বেগে,
“তরু নীড় ফেল পাল্লী চলিল উড়িয়া
দূর দ্রষ্টাশর গানে কুবন ভরিয়া।

ঐন্দ্রিয়ধন্দা দেবী।

গান

(বাড়িলের হৃদ)

এই ত ভালো লেগেছিল
 আলোর নাচন পাতার পাতায় ।
 শালের বনে ফাঁপা চাওয়া—
 এই ত আমার মনকে মাতায় ।
 রাজা মাটির রাস্তা বেয়ে
 চাটের পখিক চলে ধেরে,
 ছোট বেয়ে খুলায় বসে
 খেলার ডালি একলা সাধার ।
 সামনে চেয়ে এই বা দেখি
 চোখে আমার বীণা বাজায় ।

দূরে বাবার খেরাল হলে
 সবাই ঘোরে ঘিরে ধামায় ।
 গায়ের আকাশ, সজ্জনে কুলের
 চাঁদ-ছানিতে ডাকে আমার ।
 কুরায় নি ভাই কাছের লুখা
 লাগল না ভাই দূরের কুখা,
 এই বে এ সব ছোটোখাটো
 পাইনি এদের কুল কিনারা,
 তুচ্ছ দিনের গানের পালা
 আত্মা আমার হয় নি সারা ।

আমায় এ বে বাঁশের বাঁশি,
 মাত্রের হৃদে আমার সাধন ।
 মনকে আমার বেঁধেছে রে
 এই ধরপীর মাটির বাঁধন ।
 নীল আকাশের আলোর ধার
 পান করেছে নুতন ধারা
 সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া
 নিয়েছি মোর হুঁ চোখ পুরে ।
 আমার বীণায় হৃদ বেঁধেছি
 ওদের কচি গলার হুরে ।

“লাগলো ভালো মন ভুলালো”
 এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই,
 দিনে রাতে সন্ধ্যা কোণা
 কাজের কথা ভাই ত এড়াই ।
 মজেছে মন, মগ্ন আঁধি,
 মিথ্যা আমার ডাকাডাকি,
 ওদের কাছে অনেক আশা
 কল্পক ওরা অনেক জড়,
 আমি বেন গেয়ে বেড়াই,
 চাইনে হতে আরো বড় ।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

নামকাবারী

বৈষ্ণব কবিতা ও “রূপান্তর”-বাদ

কবি শ্রীকৃষ্ণ চিত্তরঞ্জন দাস বৈষ্ণব-কবিতার রসবাসুধা তাঁহার ‘বাংলার গীতি কবিতা’ শীর্ষক অভিভাষণ প্রবন্ধে যেভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, জুড়া কাব্য-রসজ্ঞমাত্রেয়ই উপভোগ্য হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার মৰ্মগত লীলাতর ও তাহার রচনার বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথই তাঁহার “আলোচনা” ও “সন্যাসোচনা” প্রকৃতি পুস্তকে যথেষ্ট পঙ্খীয় ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব কবিতার বহুল প্রচারের ক্ষত্ৰ তিনি ও তাঁহার বহু ৮শ্রীশ্রেষ্ট মহত্মদার ‘পদ্মরত্নাবলী’ নাম দিয়া এক চরন-পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। এ কথার এইজন্য অবতারণা করিতেছি যে, রবীন্দ্রনাথের সেই সকল আলোচনার সহিত কবি চিত্তরঞ্জনের এই রসপূর্ণ আলোচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। বিভাগপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে, বিভাগপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রাধিক। সম্বন্ধে যে সকল তুলনামূলক আলোচনা রবিবাবু করিয়াছিলেন, চিত্তবাবুও তাঁহার নিজের ভাবে ও ভাষায় তদনুরূপ আলোচনাই উপস্থিত করিয়াছেন। চিত্তবাবু সম্ভবতঃ রবিবাবুর সেই বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত আলোচনাগুলি পড়েন নাই, কারণ তাঁর লেখার যে আবেগ, যে রস-তন্ময়তা প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু

তিনি যদি পাঠ করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারি হৃদয়ের প্রতিধ্বনি অন্তর দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব রসলীলাতনের অনেক রকমের ব্যাখ্যা আছে; চিত্তবাবুর ‘রূপান্তর’-বাদের ব্যাখ্যা তাঁহার স্বকীয় হইলেও তাহাকে ঐটি বৈষ্ণব ব্যাখ্যা বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবু এ ব্যাখ্যা নূতন বলিয়াই ইহাকে গ্রহণে কোন বাধা নাই; কারণ বৈষ্ণব কবিতা যদি রূপক হয়, তবে যিনি যেভাবে খুলি তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু ঐ রূপক বলিয়াই বৈষ্ণব কবিতাকে গীতি কবিতার শ্রেষ্ঠরূপ বলিতে আপত্তি হয়। প্রাণ এবং গানের মাধ্যমানে রূপকের আবরণটি একটা মজ বাবধানের মত দাঁড়ায়। অবশ্য চণ্ডীদাসের কাছে সে ব্যবধান অতি হৃদয় মলিনের তিরস্করণীয় মত থাকিলেও তাঁহার প্রাণে গানে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তবু বৈষ্ণবদের conventional পূর্বরাগ, বিরহ, মাধুর্য, খণ্ডিতা, মান ইত্যাদি কোটা-গুলির কোটরে তাঁর গানগুলি পড়ায় সেই গানের দ্বিতর হইতে চণ্ডীদাসের vision বা কবি-মানস এবং তাঁহার কবিজীবনের evolution বা বিবর্ত-বিশাস সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্রভাবে দেখিবার উপায় নাই। শেলিকে বা ব্রাউনিংকে যেমন তরে তরে অথচ সমগ্রভাবে দেখা যায়, চণ্ডীদাস, বিভাগপতি, গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাস, কোন পদকর্তাকেই সেভাবে দেখা যায় না।

তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের আভাস টুকরা টুকরা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; কিন্তু সে ভটর লক্ষণের মত পাওয়া; ব্যক্তিত্বের স্বরূপ লক্ষণ পাওয়া শক্ত।

রূপক কাব্য এই অল্প কোথাও ব্যক্তিত্বের কাব্য হয় নাই। মহাভূগের ইউরোপে গুটান-গর্গের রূপক আশ্রয় করিয়া বহু মরমী কবি গান বাঁধিয়াছিলেন; পারস্য দেশে হুতা দণ্ডের রূপক আশ্রয় করিয়াও বহু কবির রচনা আছে। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে সে সকল রচনা কোন কোন অংশে তুলনীয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ঐ রূপকের অস্ত্রই গানের উৎস সরাসরি ব্যক্তিত্বের প্রাণ হইতে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে নাই—একটা ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে।

এই যে ব্যাখ্যা করিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের প্রশংসা। বহু প্রাণ হইতে গানে স্বতোচ্ছ্বসিত, তাহা আপনিই আপনার ব্যাখ্যাতা। কিন্তু রূপকাশ্রয়ী যে গান, রূপকের ব্যাখ্যাত্বসারে তাঁহাদের ব্যাখ্যা।

এইবার ব্যাখ্যা করাই বলি। বৈষ্ণব তবে বলে যে, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; বিশ্ব-লীলার তাঁহার ক্লামিনী শক্তি শ্রীরাধিকা এবং অনাখ্যা গোপী প্রকৃতি তাঁহারি সেই লীলার অঙ্গ, তাঁহারি সৃষ্টি-রাসমণ্ডলের অন্তর্গত। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব এই লীলাকাণ্ডটিকে নিতের “ঈশ্বরের অহুত্বিত্ব” সঙ্গে একে-বারেই মিলাইয়া দেখিতে পারেন না। রাধিকা বা গোপীর অহুত্বিত্ব যে তাঁহারি অহুত্বিত্বের রূপান্তর, এমন ভাব তাঁহার মনের ত্রিসীমার আনাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এ সমস্তই transcendent রাসের

বাসায়া; তত্ক্ষণে তাঁহার মর্শ্ব মাত্র। বড়জোর তিনি গোপীর মত হইবার কামনা করিতে পারেন। তত্ক্ষণে এ ব্যাখ্যায় “ওধু বৈষ্ণবের ভরে বৈষ্ণবের গান”। রূপে রূপে বিলাসের পর প্রতি রূপেই এক অথও অনন্ত রূপের পতিরূপ দেখার যে তব চিত্তবাবু আবেগ লুপ্তকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ব্যাখ্যা। এ তবকে রবিবাবুর কাব্যের তব বলিলে ক্ষতি হয় না; বরং স্বচ্ছন্দে তাহা বলা বাইতে পারে। এবং রবিবাবু স্বয়ং সে কথা বহু স্থানে বলিয়াছেন তাহা বারম্বার পরিহার করিয়া দেখানো বাইতেও পারে। “ভাব হ’তে রূপে অবিস্ময় বাওয়া আসা”—রূপের সেই অসীম রূপান্তরের দিক্টি তাঁর কাব্যেই মর্শ্বগত দিক্। দৃষ্টান্ত—‘মানসহুন্দরী’; ‘অনন্ত প্রেম’। একটিতে দোন্দণ্ডের রূপান্তর, অস্ত্রটিতে প্রেমের রূপান্তর পাই। চিত্তবাবু একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। সংপ্রসিদ্ধ ‘রবীন্দ্রনাথ’ পুস্তকে আমি ইহা সাধ্যমত দেখাইয়াছি। “রূপে রূপে বিলাস করিতে করিতে” যে “আলস রূপ বলিয়া উঠে” সেই পরম রূপের কবিক স্বপ্নানো (flash) রবিবাবুর অধ্যাত্ম গীতের সাধনার ধন; বৈষ্ণবের নয়। কারণ বৈষ্ণবের আসল রূপ শাস্ত গোষ্ঠাকথামের বৈষ্ণববিহারী। তিনি অবিস্ময়সমুৎ সৃষ্টি। “ঈশ্বরের রসাহুত্বিত্বের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়”, এ কথা আধুনিক ঈশ্বরবন্দ্য বলিবে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদী বলিবে কি? বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে বরং বলা

যায় যে, তাহাতে ইঞ্জিরের রূপান্তর (transfiguration) হইয়াছে অতীন্দ্রিয়তায়। বৈকব কবিতার খোসাটা erotic বা ইঞ্জিরলাশসাপূর্ণ, শাঁসটা Spiritual বা অতীন্দ্রিয় রসপূর্ণ। এ রূপান্তরের কথা চিন্তাবানু অতি হৃদয় কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ ছাড়া অল্প রূপান্তর-রূপের অন্তর রূপে রূপান্তর—বৈকব কবিতায় নাই।

ফুলের মধ্যে যে “লক্ষ্মণস্নানরের কাহিনী” লুপ্তায়িত, “ফুল ত শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের যে মহাপ্রাণ তাহারি প্রাণ-কবিকা”—এ যেন রূপান্তরের কথা কি বৈকব কবির? বরং Tennysonএর Flower in the crannied wall, Blakeএর To see a world in a grain of sand, রবীন্দ্রনাথের “তার অল্প নাই গো যে আনন্দে গড়া আবার অঙ্গ” প্রকৃতি কবিতার এই সাত্ত্বের নগ্নে অনন্তের বার্তা প্রচারিত। ‘সাত্ত্বের মধ্যে অনন্ত’—এ তবের সঙ্গেই বৈকব কবিতার রসতবের সম্বন্ধ বিরল। কারণ, অনন্ত সে তবে সত্য। তিনি গোপাল, গোপীভরত। সেই সাত্ত্বের অপৰ্য্যাপ্ত মাদুর্য্যরস বৈকব কবির অল্প-ব্রজধামে সঞ্চিত। তপস্বান বেখানে আপন ঈশ্বর্য্যে ঈশ্বর বৈকব সেখানে তাঁহাকে চায় নাই, বেখানে তিনি ছোট, বেখানে তিনি সগা, পতি, বৎস, সেইখানেই তাঁহাকে কামনা করিয়াছে। সেইখানেই তাঁহার নিত্য হাস-হস্তল, তাঁহার নিত্য হাসলীলা। বৃন্দাবন-লীলার তাই ভগবানকে প্রভু বলিয়া কোথাও সোধোন নাই; এমনকি তাঁহাকে লিতা

বলিয়াও পূজা করা নাই। সেইরকমই বাংলা ও কৈশোর লীলার ঈতৃকের বৃন্দাবনলীলাকে সাদৃশ্যে হইয়াছে। বৃন্দাবনে তিনি কাহারও বড় নন, তিনি সকলের ছোট। তিনি ছোট অর্থে তিনিই ধরা দিবার অল্প ব্যাকুল। মা বশোনার কাছে ‘আদর কাড়িবার অল্প ব্যাকুল; সখা রাখাণ্ডের সঙ্গে দেখে চড়াইবার অল্প ব্যাকুল; গোপীতের সঙ্গে রস করিবার অল্প ব্যাকুল; রাধিকার পারে ধরিয়া মান ডাঙাইবার অল্প ব্যাকুল।

সৌন্দর্য্যের রূপান্তর বা প্রেমের রূপান্তর সম্বন্ধে চিন্তাবানু যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা একেবারেই রবিবাবুর কাব্যের কথা। তবে প্রেমের যে ব্যাকুলতা বলে ‘লাথ লাথ ফুল হিরে হিরে রাখত তবু হিয়া জুড়ান না গেল’ বা ‘নিমিষে নতেক ফুল মানি’ তাহাতে এ রূপান্তরবাদের সমর্থন হয় না। সেই ব্যাকুলতাই প্রেমের ধর্ম—তাহাতেই প্রেমের তৃপ্তির মধ্যেও চির অতৃপ্তি, অতৃপ্তিতেও চির তৃপ্তি। বিরহে মিলন, মিলনে বিরহ। ‘ত’হ কোরে হ’ছ কাঁদে বিচ্ছেদ তাবির’।

আসল কথা, বৈকব কবিতাটা আপেকার জিনিষ, তাহার তব ও ব্যাখ্যা পরস্পরী কালের জিনিষ। চতীদাস বা বিভাগতি যদি কোন তব বা ব্যাখ্যা মনে রাখিয়া কাব্য রচনা করিতেন, তবে তাহা অমন সহজ, সরল, আপোষী হইতেই পারিত না। তাহা আড়ষ্ট কবিতা হইত। তবু বৃন্দাবনলীলার যে কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাঁহাবিরকে আশ্চর্য্যপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের ক্রিষ্ণবাদের আশ্রয় কথা ঐ কাহিনীর

বিতৃষ্ণিতে পুরা-কুটীতে পারে নাই। এক-মাত্র ওঁতদাসে তবু কতকটা পূর্ণমাত্রায় কুটীরাছে, বিস্তারিতভাৱে আংশিক ভাবে কুটীরাছে। তাহার পর হইতে ক্রমাগত ঐ formটাকে পদকর্তার ব্যবহার করিয়া করিয়া তাহাকে বধন প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনই পদরচনার প্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। কারণ, শেষোপেখি তাহা আর প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে না হইয়া প্রাণ হইতেই কেবলি পুনরাবৃত্ত হইতেছিল।

বৈক্য কবিতার কিরিয়া বাওরা আর সম্ভব কি?—কালের, আদর্শের, সমালোচ, জীবনের, সকল দিকেই নানা পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দৃষ্টি একটি বাৎসল্য বা মধুর স্বপ্নের খেলায় সমস্ত জীবনের পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। বর্তমান জীবনের রস আরও বিচিত্র, আরও গভীর। ‘মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আশ্বাস আশ্বাস যে রমণ’ তাহা নিত্যকাল সরল জিনিষ নয়। কারণ বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যেরও অস্ত্র পাই না, মানব-প্রকৃতির রহস্যেরও অস্ত্র পাই না। উয়ের যোগও বিচিত্র যোগ, সেই যোগের ক্ষুধাও বিচিত্র উপায়েই হইতে পারে। এ কথা চিন্তাবানই স্থল্য করিয়া বলিয়াছেন। স্মৃতরাং ‘সমগ্র জীবনের অস্থিত’ বলিতে বস্তুখানি বুঝায়, তাহা বৈক্য কাব্যের রূপান্তর ঘটাইলেও ঐ বিষ্ হইতে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে ‘রূপান্তর’-তবু চিত্ত বাবু অত্যন্ত গুণগ্রাহী কবিরাজোচিত ভাষায় ঐক্য করিয়াছেন, তাহাও ‘ধারকরা’ এইরকম বলি যে, আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত না হইলে এ রচনা তাহার

কলম দিয়া বাহির হইত না। কোন অশিক্ষিত ভক্ত বৈক্য ভাষায় এ সকল কথা মর্মগ্রহণ করিতেই পারিবেন না। তবে ‘পাশ্চাত্য শিক্ষার’ পরে এত কটাক কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

কান্তনের “নারায়ণে” ঐহিক গিরিজাপঙ্কর দ্বার চৌদুহী মহাপর “স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ভক্তির সহিত স্বামীজির “চরিতামৃত” পরিবেশন করিয়াছেন; ভক্তির সহিত তাহার চরিত ও কার্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করেন নাই। অত্যন্ত মহাশ্রদ্ধা-গণ সম্বন্ধে গিরিজাবাবু যদি এই প্রশ্নটা অবলম্বন করিতেন, তবে তিনি যে একজন স্বভাবভক্ত ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে প্রশ্নের অভাব ঘটত না। কিন্তু ইংরেজীতে একটা প্রশ্ন-বচন আছে যে, কোন জাতি-বিশেষকে গায়ে আঁচড় কাটিলেই তাহার স্তির জাতীয়ত্ব ধরা পড়িয়া যায়। গিরিজা বাবুর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ বাদে অন্য কোন মহাপুরুষের চরিতের আঁচড় লাগিলেই তাহার ভক্তির মাধুর্য্য ভক্তির চাতুর্য্যে পরিণত হইয়া পড়ে। “চৈতন্যের নারায়ণে প্রকাশিত তাহার “মহাবিবেকানন্দ ঠাকুর” প্রবন্ধ তার সাক্ষী।

“স্বামী বিবেকানন্দ”র চরিত্রালোচনার গিরিজাবাবু গোড়াতেই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত মানিয়া লইয়াছেন যে, লক্ষ্যসার্থ্য বা বাহ্য স্বাভাব্যতা দ্বারা যেমন এক এক দুঃ-

সঙ্কল্পে আবির্ভূত হইয়া সুখ-সমভাগ্যের
মীমাংসা করিয়াছিলেন ও নুতন যুগের
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দও
টিক তাহাই করিয়াছেন। অবশ্য সকল
ভক্তই নিজ নিজ ভক্তিতাজন স্বত্বে এই
সকল দাবী করিয়া থাকে। অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই অযোগ্য দাবীর সেরা প্রমাণ তাহার
জানে থাকেই জোর। যুক্তিপন্থী গিরিজা
বাবু অবশ্য সে প্রমাণ আদ্র করিবেন না
বলিয়া আপা করি, কারণ তাহা হইলে
তাঁহার সহিত পারিয়া উঠা শক্ত হইবে।

যাহাই হোক গিরিজাবাবু বিবেকানন্দের
আবির্ভাব সময়ে হিন্দু জাতির ও পান্ডাভা
জাতির অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা
যে-কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত আদ্র
করিবার মত উপযুক্ত উপক্রমিকা হইয়াছে
বটে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে
তাঁহার ভাব্য, “যখন আমরা সংস্কারের
আবর্তে পড়িয়া কোন্ পথে হাইব বুদ্ধি
উত্তিতে পারি নাই...সমগ্র জাতির বধন প্রার
বিপ্লব হইবার উপক্রম” তখন বিবেকান-
ন্দ “আবির্ভূত” হইয়া কি করিলেন?
গিরিজাবাবু বলেন, তিনি “সংস্কার-যুগের
প্রতিবাদ” করিয়া ও তাহার নানা দোষ
সেখাইয়া “প্রতিক্রিয়ামূলক এক সময় যুগের
(!) হুচনা” করিয়া গেলেন। সেই সময়-
গুলি কি কি তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়া-
ছেন। “সময়” শব্দের আধুনিক অর্থ
‘অবিরোধ’; অর্থাৎ অভিধানকার বলিতে
চান যে সম্ পূর্নক অর্থ বলিতে কেহ বেন
বিষম্ পূর্নক অর্থ না বুকেন, এক কথায়
খিটুড়ি না ক্রুদ্ধন। গিরিজাবাবুর দাবী

অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দ অশেষভাবে
সঙ্গে প্রতিমা-পূজার ‘সময়’ করিয়াছেন;
এটাকে আমরা ‘বিষময়’ বলি, কারণ
শাস্ত্রকারদের মত-হিসাবেই সিঁড়ির সর্ব নিয়
ধাপের সঙ্গে সিঁড়ির সর্ব উচ্চ ধাপের ঠিক
সময় বা অবিরোধ হয়, এটা বলা যায় না।
তারপর, বিবেকানন্দ স্বামী বেদের অশোক-
মত বীকারের সঙ্গে ধর্মের সাক্ষাৎ অহু-
ত্বিতর সময় সাধন করিয়াছেন, এই তাঁর
দ্বিতীয় সময়। তিনি সাক্ষাৎ অহুত্বিতর
উপর গাঁড়ান, তিনি শাস্ত্রের অস্বাভাব্য কেনন
করিয়া সব্ব মানিতে পারেন তাহা আমরা
ভাল বৃত্তিতে পারি না। শাস্ত্রের সব্বই
অস্বাভাব্য বা সব্বই ভ্রান্ত, এই দুই মতের
কোন মতই গ্রহণ্য নয়। শাস্ত্রের মধ্যে
যেখানে যেখানে ‘অপরোক্ষাহুত্বিতর’ বাক্য
আছে তাহাই তাহার নিত্য অংশ; কিন্তু
যে মহাত্মার নিজের ‘সাক্ষাৎ অহুত্বিতর’ হয়
নাই, তিনি সেই নিত্য অংশগুলি আবিষ্কারই
বা করিবেন কি উপায়ে, তাহার বিচারই
বা করিবেন কি করিয়া? স্তব্ধতা সাক্ষাৎ
অহুত্বিতর শাস্ত্রবিচারের কষ্টপাথর হইলে
শাস্ত্রের অস্বাভাব্য মানিবার কোন প্রয়োজন
থাকে কি?

গিরিজাবাবু বলেন যে, সামাজিক ব্যাপারে
স্বাধীন পণ্ডিত ও অন্তর্জ জাতিকে উদ্ধার
করিবার প্রস্তাব করিলেও জাতিভেদের
সমর্থন ও অসমর্থ বিবাহের অসমর্থন করিয়া-
ছেন। অন্তর্গত যে জাতিভেদ প্রথা আমাদের
দেশে গাঁড়িয়া গেছে, তাহাতে যে যেখানে
স্থান পাইয়াছে তাহার সেই স্থানই যে কার্যে।
যে নীচে পড়িয়াছে, সে নীচেই থাকিবে;

যে অব্যাহত অস্পৃক্ত সে চিরকাল তাহাই থাকিবে। সুতরাং যে ভিত্তির উপর এই উচ্চ-নীচের ব্যবধান ভিনিষটা প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তি সমানই থাকিবে অথচ ব্যবধানটা দূর হইবে—ইহা কেবল আরবা উপস্থানের রাস্তাই সম্ভব হইতে পারে। গিরিজাবাবুর উক্তি অহুসারে জাতিভেদের সমর্থনের সঙ্গে পতিত জাতির উদ্ধারের সমর্থন যদি বিবেকানন্দ করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এক ঘিটুড়ি হইয়াছে।

আমরা ভরসা করি বিবেকানন্দের তত্ত্বমূল এই সকল উদ্ভট দাবী করিতে পিয়া থাকি থাকিবার ইচ্ছা মোটেই করেন না। কারণ ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ব ও বিশেষত্ব সঙ্কে কোন সত্য ধারণার পৌছান অসম্ভব হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষত্ব কোথায় ছিল, সে সঙ্কে দুটো চারটে কথা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সংস্কার যুগের পরই প্রতি-ক্রিয়ার যুগ সর্বত্রই স্বভাবতই দেখা দেয়। ইউরোপের ইতিহাসে Reformation যুগের সঙ্গে সঙ্গেই Counter-Reformation যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। উন্নতিশীল ও রক্ষণ-শীল—এই দুই দিক, মানব সমাজে হয় যুগপৎ একই সময়ে একই অবস্থার, নয় এক যুগ অন্তে অল্প যুগে অল্প অবস্থার দেখা দিবেই। বাংলা দেশের ইতিহাসেও কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সংস্কারের যুগের পর দ্বন্দ্ব দিশু সমাজের ভিতর হইতেই প্রতি-ক্রিয়ার চেষ্টা প্রবল ভাবে দেখা দিল, তখনই

বিবেকানন্দ সেই যুগের যুগসারথি হইয়া দাঁড়াইলেন।

অতএব, দেশের নিকট তাঁহার প্রধান নান—গিরিজাবাবু-কথিত তাঁহার সমর্থন নয়; তাঁহার অপূর্ণ অগ্রিমের বেশপ্রীতি। তিনি কিছুই সমর্থন করেন নাই; তিনি সমস্তই সমর্থন করিয়াছেন। দেশের কিছুই বর্জন করিতে তাঁহার মন চাহে নাই, দেশের সমস্তই স্বীকার করিবার অল্প তাঁর মন একান্ত উৎসুক ছিল। দেশকে এমন একান্ত ভাবে এমন নিবিড় ভাবে এমন সত্যভাবে তাঁহার মত এ যুগে আর কেহই ভাল-বাসিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। আমরা মনে হয়, আমাদের বেশপ্রীতির তিনিই ভগীর্থ—এই নূতন ভাবগম্যার ধারা তিনিই প্রবাহিত করিয়াছেন।

সেইজন্য তিনি তাঁহার সমর্থন সাধনের জন্য নয়, তাঁহার “পরিত্র নাগরক-সেবা”র জন্যই আগ্রহ দেশের মধ্যে একটি অজ্ঞেয় শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ভারত-বর্ষের ছয় কোটি অস্পৃক্ত “নাগরক”ের সেবার জন্য বোধনের জন্য, তিনি সমস্ত দেশের পৌরুষ ও মহত্বকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। সেই তাঁহার “উদ্বোধন”—সেই ও তাঁহার “প্রবৃত্ত ভারতের” কল্পনা।

বৃহৎ প্রতিভার মধ্যে কোথাও না কোথাও স্ববিরোধ থাকে—কারণ অনেক সময় এই বড় ব্রহ্মের স্ববিরোধেই বড় প্রতিভার পরিচয় হয়। অল্প লোকে ইহা বুকে না। এই জন্য মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন—“self-consistency the

hobgoblin of little minds"। কবি হুইটম্যানের একটি ছন্দে আছে—"I am large therefore I carry contra-dictions"। এই জীবনের মতো, পদে পদেই বক্তাবিরোধ রহিয়াছে—কোন বিষয়ে পত্নীয়তার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গেলে এসরতার দিকে ততটা পরিমাণ দৃষ্টি পড়ে না; আবার বৈচিত্র্যের দিকে বেশি অগ্রসর হইলে ঐক্যের দিকে সে পরিমাণে মনোযোগ যায় না। বেশবোধ ও বিষবোধ এ দুয়ের মধ্যে যে এক কারাগার একটা বিরোধ আছে, সেটার তাকাতাড়ি রক্ষা উত্তরাই করিতে উদ্ভত হুইটম্যানের এ দুয়ের কোন বোধই হয় নাই। বিবেকানন্দের মধ্যে এই দুই বোধই ছিল অম্লত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল না। তাঁহার ভিতরকার বিশ্ব-মাত্রাটী তাঁহাকে দয়িত্ব-ব্যয়ন-সেবার প্রবৃত্তি করিয়াছিল; তাঁহার ভিতরকার স্বাদেশিক মাত্রাটী তাঁহাকে জাতিভেদ সমর্থন করাইয়াছিল। জাতিভেদের দোষ কেহ দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন—মাত্রবের কোন institutionটা perfect? জাতিভেদের বদলে আমাকে 'better substitute' দাও। তখন তাঁহার মনেও হয় নাই যে ছয় কোটি অশ্লুত 'নারায়ণ' উদ্ধৃদ্ধ হইয়া যদি সমাধে কোন দিন উচ্চতর অধিকারের দাবী করে, তবে এ উদ্ভরে তাহারা সবটুকু থাকিতে পারিবে না। অবশ্য তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সন্ন্যাসে জাতিধর্ম নাই। কিন্তু ছয় কোটি অশ্লুত লোক ত সকলেই গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া দণ্ডী হইতে পারেনা?

জন্মের হার

"জন্মের হার" সম্বন্ধে আনুমানিক এডিনবরা প্রতিউত্তে ডিন অব সেন্টপল্‌স্‌, ইন্‌জ্‌ সাহেব, এক বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমস্ত দেশের ইতিবৃত্ত খাটিয়া প্রত্যেক দেশে জন্মের হার কি কি কারণে বাড়ি কমে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের পাত্রকর্মের কাছে এ আলোচনার বিশেষ মূল্য আছে; কারণ আমাদের বাংলাদেশে জন্মের হার কমিতেছে, মৃত্যুরাং আমরা dying race মরণযুগে পতিত জাতি—বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে।

ইন্‌জ্‌ বলেন, প্রাচীন কালের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রথমতঃ যে সব শিকারী জাত ধর বাঁধিয়া বসতি করে নাই তাহারা জন্মশঃ লোপ পাইয়াছে। কারণ ছেলে কাঁখে করিয়া মেয়েরা স্বামীঘের পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়াইলে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়েনা, তাদের রক্ষাও হয় না। মধ্য এশিয়ার তৃণ-ভূমিতে nomad-শ্রেণীর জাতের মধ্যে বরং জন্মের হার খুব বেশি ছিল। এইজন্য পূর্বকালে বাকম্‌ আবিস্কৃত হইবার পূর্বে মাঝে মাঝে এই সব অসভ্য জাতির আক্রমণে পৃথিবীর সুসভ্য দেশগুলি অনেকবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তারপর, বড় বড় নদীতীরে যে সব কৃষি-প্রধান সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল, যেমন হাঁসপুটে বা কাবিলোনিয়ার, সেখানে জন্মের হারও যেমন বেশি, মৃত্যুর হারও তেমনি বেশি। লোকসংখ্যা সেখানে

সমরমিত পরিমাণে বাড়িয়া, উঠিয়াছিল ;
এতটা বাড়ির অস্ত্রই এতটা ছাড় দাঁড়াইয়া
গিয়াছিল ।

প্রাচীন গ্রীসে কোন কালেই লোক-
সংখ্যা খুব বেশি ছিলনা ; তবে রসদের
অভাবে বলতের বলের অস্ত্র গ্রীকরা
উপনিবেশ বিস্তারে মন দিয়াছিল । সেও
বটে প্ৰত্যক্ষী পৰ্য্যন্ত ; তারপর আর নয় ।
তারপরে গ্রীক নাগরিক স্টেটগুলির মধ্যে ঐ
ছোটখাট আয়তনের ভিতরেই পূর্ণতা লাভ
করিবার একটা আদর্শ আসে, 'self-
sufficient life'-এর আদর্শ আসে ।
গ্রীকরা মনে করিয়াছিল যে, একটা নাগরিক
স্টেটে বড় মোর বিশ কি ছিল হাজার নাগরিক
থাকিবে, তাহাদের দ্বারা কিছু অভাব তাহা
তাহারা ই মিটাইয়া লইবে । (রবিবাবুর
পল্লীসভার আদর্শের সঙ্গে ইহার
সাদৃশ্য নাই কি?) অতবড় জানী যে
স্টেটো, তিনিও তাহার 'Laws' গ্রন্থে
লিখিয়াছেন যে, গ্রীক নগর সমুদ্রের খুব কাছে
না হওয়াই ভাল, কারণ সমুদ্রের নিকটবর্তী
হইলেই বহু রাজ্যের বিদেশী বণিক ও
সোকানবার জুটিয়া নাগরিকদের বেণে-
সভাবিনিষ্ট করিয়া তুলিবে । কেবল এদেশীর
রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের মধ্যে শেরা রাষ্ট্রনৈতিক
ইসোক্রেটিস্ এই রকমের ছোটখাট নাগরিক
স্টেটে সঠক থাকিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
করিয়াছিলেন । তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাজ্য-
বিস্তার করিয়া স্টেটগুলো ক্রমশঃ আরও
বলশালী ও সমৃদ্ধিশালী হয় । অবশ্য গ্রীক-
দের মধ্যে দীর্ঘায়ু ও বৃদ্ধ সর্বল সন্তুষ্ট বহু
বেশি পরিমাণে দেখা যাইত, এমন আর

প্রাচীনকালে অস্ত্র কোন বেশে দেখা যায়
নাই । প্রাচীন রোমানদের সম্বন্ধেও সেই
কথা বলা যায় । তবু এক সময়ে গ্রীক ও
রোমান জাতি যে একেবারেই পৃথিবী হইতে
বিলোপ পাইল, তাহার কারণ কি ! ইচ্ছা
ইহাদের মধ্যে অস্ত্রের হার কমিয়া গেল কেন ?
গ্রীকদের মধ্যে শিত্তহত্যা বধেই পরিমাণে
ছিল ; বিকলাশ শিত্তপুত্রকে তাহার মারিয়া
কেনিত, শিত্তকন্তাকেও তাহার পালন করিতে
নারাজ ছিল । তারপর বৃদ্ধবগ্রহ সদাই
বিদ্রোহমান ছিল, এও আর একটা কারণ বটে ।
তবে এ সকল কারণ এত প্রবল নয়, তাহার
অস্ত্র গ্রীক ও রোমান জাতির একেবারে
ধ্বংস হইতে পারে । অবশ্য ধ্বংসের আর
একটা বড় কারণ, দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসার ।
দাসদের দ্বারা সকল শ্রমসাধ্য কৰ্ম করাইব
এবং নিজেরা তাহার ফলভোগ করিব—এ
ব্যবস্থার একটা জাতির শক্তিকে ক্রমশঃ
হীন ও দুর্বল করিয়া আনে । কিন্তু ইন্দু-
সাহেব বলেন যে, এ সকল কারণের চেহেও
গ্রীক ও রোমান জাতির ধ্বংসের অস্ত্র বড়
কারণ ছিল । তিনি বলেন, একটা জাতির
যদি তথিবাৎ সম্বন্ধে কোন আশা না থাকে,
তবে বস্ত্রহীন জীবন সম্বন্ধেও তার উদ্ভব-
উৎসাহ বহুতাই কমিয়া আসে । জীবন-
সংগ্রামে সে আর কোমর বাঁধিয়া লগেনা,
সে অদৃষ্টবাদী হইয়া দাঁড়ায়—অদৃষ্টে যা
আছে তাই হইবে বলিয়া সকল বিষয়েই
সে একেবারে গা ছাড়িয়া দেয় । তখন যুঁহু
সবল সন্তান রাখিয়া বাইবার ইচ্ছাও তাহার
থাকে না ; সন্তান জিনিসটাই তাহার কাছে
তার ও দায়বদ্ধ হইয়া উঠে । রোমান

সান্নাঙ্কোর ধর্মের পূর্বে রোমানদের মধ্যে
এটরপ একটা নৈবাত্ত ও অবসাদ দেখা
দিত। সেই নৈবাত্ত ও অবসাদটী গ্রীক
ও রোমান জাতির মুক্তার কারণ।

গ্রীক ও রোমান জাতির মুক্তার কারণ
সবকে টেন্ড বাগ বলিতেছেন তাইই বহি
সত্তা ৩৪, তবে আমাদের এ সবকে যথেষ্ট
ভাবিবার কথা আছে। নৈবাত্ত, অবসাদ,
অদৃষ্টবাদ, সন্ন্যাসের আদর্শ—আমাদের
মধ্যেও পুরা মাত্রার প্রবল। রোমানদের
মধ্যে সন্ন্যাস, eremitism প্রভৃতি শেব-
ন্যায় বেজার দেখা দিয়াছিল। বাংলাদেশেও
সন্ন্যাসী-আমী-সম্প্রদায় বাংলাদেশের একচেটে
আমী হইয়া বসিয়াছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ
সবকে আমাদের নবের মধ্যে আশা ও উৎসাহ
প্রবল, না নৈবাত্ত ও নিরুৎসাহ প্রবল?—
ভাবিয়া দেখা উচিত।

গ্রীক ও রোমানের মত পরবর্তী যুগে
শ্পেন আর একটা উদাহরণ। শ্পেনের
যেমন ছুছু করিয়া উন্নতি হইয়াছিল,
তেনমই দ্রুতবেগে অবনতি দেখা দিল।
কারণ তাহার উন্নতিটা ছিল শুধু কেবল ব্যবসা
বাণিজ্য এবং পরজাতির শাসন ও শোষণে—
মুক্তরায় তাহার পরমাত্মা বেশি দিনের মত
হইল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতিদের
মধ্যে জন্মের হার ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি
বাড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় ভগবতের ইচ্ছা-
হাসের কোথাও কোন যুগেই হয় নাই।
বহুতন্ত্রের আবিষ্কারে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে,
যে দেশে দেশে বাণিজ্যের প্রসারে দেখিতে
দেখিতে এক শতাব্দীর মধ্যে লোকসংখ্যা

আশ্চর্যরূপে বাড়িয়া গেল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের জনসংখ্যা ছিল ৪,৮০০,
০০০—১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ৮৮০, ৩,০০০,০০০।
১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৮৮০, ৩,০০০,০০০।

কিন্তু এখন বাহারা ইউরোপীয় জাতিদের
জন্মের হার সবকে আলোচনা করিতে যান,
ঊহাধা দেখিতে পান যে, পূর্ব উন্নত জাতিদের
চেহে অপেক্ষাকৃত অধিকতর জাতিদের মধ্যেই
জন্মের হার অধিক। অবশ্য উন্নত জাতিদের
মধ্যেও জন্মের হার সবকে অল্পপাতের মধ্যেই
তারতম্য আছে। তাইপরি জন্মের হার ও
মৃত্যুর হার সবকে তুলনা করিয়া ঊহা
দেখেন যে, যে-দেশের মৃত্যুর হার কম আর
যে-দেশের জন্মের হার বেশি তাহাদের মধ্যে
আসলে তফাৎ পূর্ব কম।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের দুই বুক হইতে একটা
তালিকা লেখক উদ্ধার করিয়াছেন এইরূপ :—

	জন্ম	মৃত্যু	মোটবৃদ্ধি
সুইডেন	২৩.২	১৩.৮	১০.১
অষ্ট্রেলিয়া	২০.৭	১১.২	৯.৫
অস্ট্রিয়া	৩১.৩	২০.৫	১০.৮
বেলজিয়াম	২২.২	১৩.৫	৮.৫
ফ্রান্স	১৯.০	১৭.৫	১.৫
জার্মানি	২৮.৬	১৭.৩	১১.৩
ইটালী	৩২.৪	১৮.২	১৪.২
নিউজিল্যান্ড	২৬.৫	৮.২	১৭.৩
নরওয়ে	২৫.৪	১৫.৪	১০.০
রাশিয়া	৪৪.০	২৮.২	১৫.১

রাশিয়ার জন্মের হার সব চেয়ে বেশি
অথচ অল্পপাতে মৃত্যুর হারও কম নয়;
এবং অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের জন্মের হার
কম হইলেও মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম বলিয়া

আগলে মোট বৃদ্ধির হার তাহাণেরি বেশি। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার হার লেখক দেখে নাই; কিন্তু আমরা জানি যে ভারতবর্ষের মৃত্যুর হার কশের চেয়েও বেশি। 'চানেও তাই।

ইংলণ্ড সংক্ষেপ লেখক লিখিতেছেন যে, সবচেয়ে বেশি অশ্বের হার খনির মজুর ও slum-বাসীদের মধ্যে। বাবসারী প্রলোক-দের মধ্যে অশ্বের হার অত্যন্ত কম। তদ্রূপে বর্ণিত শ্রেণীর মধ্যে অশ্বের হার অত্যন্ত কম—কারণ তাহারা অনেকই বিবাহ করিতে চায় না। এই সব কারণে বিখ্যাত Havelock Ellis তাহার "The Task of social Hygiene" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সব নিম্ন শ্রেণীর লোকের উন্নতি, অশিক্ষিত কৃষিকৃষি লোকদের বংশবৃদ্ধি হওয়া ও ভদ্রবংশীয়দের বংশক্ষয় হওয়া কোন জাতির পক্ষে একটা দুর্লক্ষ্য। জর্মানীতেও এই অবস্থা। আমেরিকায় নিগ্রোদের সংখ্যা বেক্সপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আমেরিকানদের বিশেষ ভীতির কারণ হইয়াছে। বাংলা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি? মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষিত ও সভ্য তো নয়?।

দক্ষিণ আমেরিকায় সুড় ও ইতালীয়ান-দের মধ্যে বংশবৃদ্ধি ব্রিটিশ-আমেরিকান-দের চেয়ে অধিক। অর্থাৎ সুলভ্য হইলেই সে যে টিকিয়া থাকিবে তাহার কোন মানে নাই। জীবন-সংগ্রামে জীবনমাত্রার সুর-লতার ও নৃতনতার আদর্শকে বজায় রাখিয়া যে সব জাতি চলিতে পারে, হয় ত তাহারাষ্ট বোধ্যাতম বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন কাকির

সামান্য আয়ে বড়লোকের মত থাকিতে পারে, কিন্তু বিলাসী ইংরেজের পক্ষে ২০০ পাউন্ড আরও অত্যন্ত অল্প বলিয়া মনে হয়। আমরা- দরিদ্রজাতি বলিয়া মনে করি আমাদের জীবনমাত্রার আদর্শ সরল, কিন্তু আমাদের হিন্দুদের আয়ের চেয়ে বাহ বেশি। আধুনিক সভ্যতা আমাদের মত পাইয়া বলিয়াছে, এমন মুসলমানদের নয়।

ভারত মানে, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন-পরতা, স্বচ্ছন্দ-প্রিয়তা, বিলাস এবং পাপ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সভ্যতার উপরের চিকণ-চাকণ মতই মনোরম হউক না কেন, ভিতরে মৃত্যুর গুণ ধরিয়া তাহাকে অগ্নে অগ্নে জীর্ণ করিতে থাকে। বর্তমান সুলভ্য ইউরোপীয় দেশসমূহে তাহাই লক্ষ্য করা যায়। ধনের সঙ্গে ধারিত্যের অসাম-বৃত্ত অল্প কোন দেশেই এত বেশি নয়। সুতরাং ক্যানিটারের সঙ্গে শ্রমের বিবাদ সে দেশে ঘরাও বিবাদের মত নিত্য লাগিয়াই আছে। যেরূপা পর্যন্ত জীবন-সংগ্রামে পুরুষের স্থান গ্রহণ করিতে সিয়াছে বলিয়া তাহাদের গৃহধর্ম, তাহাদের সন্তান-পালন একবারে নষ্ট হইতে বলিয়াছে। গর্ভপাতের তালিকা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যুক্ত-রাজ্য ২,০০০,০০০ শিশুসমূহ বহু করা হয়। জর্মানীতে সংখ্যা ৪০০,০০০।

ইন্ডা সাহেব মনে করেন যে, দুই উপায়ে এই লক্ষ্য নিবারণের চেষ্টা হইতে পারে :—(১) শ্রমের আদর্শ অসুচারী নিজের মধ্যে নিজে সংহত-সংযত হইয়া কোন জাতি নিজের সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হইতে পারে।

তিনি বলেন ফ্রান্স এই আদর্শের দিকে
মনোযোগ দিচ্ছিল। কিন্তু তারার বিশদ
হইতেছে এই যে, যুদ্ধ বাধিলে তখন
এইরূপ ছোটখাট আয়োজনে অধী হইবার
সম্ভাবনা বিরল হইয়া পড়ে। সুতরাং
(২) দ্বিতীয় উপায় এই যে, নানা উপনিবেশ
স্থাপন করিয়া আশ্চর্য্যবশতের দ্বারা সেই সেই
স্থানে বরাবর একটা নৃতন ও সমীচীন
রক্ষা করিবার চেষ্টা করা। যেমন ক্যানাডা-
অষ্ট্রেলিয়াতে বঙ্গের বঙ্গের যে সব অধিবাসী
যায়, যদি সেই সব বাঙালীরা যোগ্য
কি অযোগ্য তাহা নির্ধারণ ও নিরূপণের
চেষ্টা করা যায় ও সুযোগ্য লোকদিগকেই
সেখানে পাঠাইয়া সেখানকার সমাজকে
সকল দিক্ হইতে প্রব্র সবল ও কল্যাণ-
প্রদ করিয়া তোলা যায়, তবে যে পরিমাণে
এই কাজে কৃতকার্য হওয়া যাইবে সেই
পরিমাণে ব্রিটেনের ক্ষয় নিবারিত হইবে।
সেখানে যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ যথার্থ পরিমাণে
যায়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু
এ উপায় যেন ইংলণ্ড-মর্দানী সম্বন্ধে সম্ভব
হইল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ উপায় কি খাটে?
অন্যত্র উপনিবেশ করিব কোথায়?
আমাদের পক্ষে এখন প্রথমোক্ত ব্যবস্থাই
বোধহয় সমীচীন। তবে দুই ব্যবস্থাই
পাশাপাশি কাজ না করিলে লোকসংখ্যা কোন
জাতিই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেনা।

আমাদের এই ম্যালেরিয়া-প্রসিদ্ধিত
দেশে জাতিকে বাচিতে হইলে দ্বিতীয় ব্যবস্থা
চাই। হয় সংহত ভাবে পট্টনসমাজ স্থাপন
করিতে হইবে, নয় ব্যাপক ভাবে উপনিবেশ
গড়িতে হইবে।

কর্মপ্রবণতা

“সবুজপত্র”, “মানসী” ও “প্রবাসী” এই
তিনটি কাগজে “লোকশিক্ষা”, “কর্মযোগ”
ও “দেশের সেবা” এই তিনটি প্রবন্ধের
আলোচনা-নীতি ভিন্ন হইলেও, আলোচ্য
নীতি একই। তিনটি প্রবন্ধেরই বক্তব্য
হচ্ছে, কর্মপ্রবৃত্তিকে আমাদের দেশে জাগ্রানে
প্রয়োজন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের
দেশের মন যে আর নিশ্চিন্ত নহ, এটা
একটা মূলক্ষণ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।

“সবুজপত্রে” বরদাবাবু “লোকশিক্ষা”
সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম আলোচনা উপস্থিত
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাক্য-চাতুরী ও
লিপি-কারিকুরী দেখান্ নাই; একেবারে
সরাসরি বিষয়ের মর্মস্থানে তীরের মত সোলা
গিয়া যা বিদ্যাছেন। তিনি স্পষ্ট দেখাইয়াছেন
যে, “লোকসমাজ” জিনিসটা আমাদের মধ্যে নাই,
কারণ লোকসাধারণ থাকিলে তবে ত লোকসমাজ
পাকিবে? তিনি তাই লিখিয়াছেন,—

“মুসলিমের শিক্ষিত লোকের ভিতরে দু একটর
বুদ্ধির বতই ধার থাক্ না কেন—জনসংখ্যার লব্ধ-
বৃত্তির তার তার পেছনে না থাকিলে, তাতে
যেটেই কিছু কাটছে না। জনসাধারণকে যাহ ঘিরে
জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের প্রয়াস, আকাশে
হাঙ্গুলী নির্ভানের চেষ্টার মালিন।”

কিন্তু এখানে জনসাধারণ আগে নাই
কেন? তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

“সমাজের বড় বড় ধারিদিকগো যদি নিঃশেষে
ত্রাস্ত আর করিবার অর্থ তত না থাকে; আর
তাঁরা যদি হৃদয়কাল ধরে তাঁদের এই বেতনভার
বহন করিবার প্রয়াস না করেন; তাহলে আমাদের
জনসাধারণের এমনধারা লুপ্তভাব এবং হস্তিনার
হবার অবসর যোগ হয় জুট না।”

প্রবন্ধের শেষে বরদাবাবু দেখাইয়াছেন যে, জনসাধারণের হাতে কোন শক্তি ছিল না যায় ছিল না বলিয়া কণ্ঠে তাহার সাড়া দেয় নাই; ভুক্তিতে, ধর্মে সাড়া গিয়াছে। তার সাক্ষী ঐতিহ্যের সময়ে বাংলাদেশের ভক্তির আন্দোলন। বরদাবাবু সেই ধর্মপ্রবণতার সঙ্গে কৰ্ম-প্রবৃত্তি জড়িতা দিলে জনসাধারণকে জনসংঘ করিয়া তুলিতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্বাস করেন।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টা। যে সব ধর্ম religions of law, বিধিবিধান-মূলক, তাহার বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া কণ্ঠের জালে মানুষকে অহর্নিশি ঘিরিয়া রাখে। সেমিটিক্ ধর্মে ইহার পরিচয় আমরা খণ্টে পাইরাছি। কিন্তু যে সব ধর্ম religions of redemption, ভক্তি-মূলক, সেখানে কৰ্মটাই বন্ধন; সেখানে শুধু যেন কল্প পূর্ণক মুছাবির ব্যাপার, নানা রকম mystical experiences, নানা রূপের সন্মুখে ভগবানের সারিধা উপলব্ধি। এইরূপ বোধধর্ম মানুষকে কণ্ঠে লইয়া গিয়া ছিল, বৈকবধর্ম মানুষকে কণ্ঠবিমুখ করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম যে অংশে ইচ্ছার সে অংশে তাহা বিধিবিধানমূলক; যে অংশে শুধুই খৃষ্টীয় ও অন্ত্যস্ত জাতির সাধনার সঙ্গে অধিত, সে অংশে তাহা ভক্তিমূলক। খৃষ্টানধর্মে তাই ভক্তি ও কণ্ঠের যে সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে তাহা অত কোন ভক্তিধর্মে দেখা যায় নাই। চৈতন্তের ধর্মে ভক্তি-প্রবণতার সঙ্গে কৰ্মপ্রবৃত্তির সংযোজন কেমন করিয়া হয়, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

আমাদের দেশে আমরা বহুকাল ধরিয়া

abstraction লইয়া কারবার করিয়াছি। জ্ঞানের চরম abstractionএ আমরা গিয়াছি বোনাতে; ভক্তির চরম abstractionএ আমরা গিয়াছি বৈকব ধর্মে। এখন চাই জীবনের কারবার।

অর্থাৎ আমরা এখনো মধ্যযুগে আছি; বর্তমান যুগে পৌছিতে আমাদের অনেক দেরী। আমাদের শিক্ষিত সাধারণ এখন ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া ধর্মব্যাখ্যা লইয়া পড়িয়াছেন—ইহাতেই প্রমাণ যে ধর্ম তাহাবিগকে আর ধরিতা নাই। আর অশিক্ষিত সাধারণ ধর্মের চরে ধর্মের খোলস লইয়াই বেশি আছে; সেটা ছাড়াইতে গেলে তার বলগে তাহাবিগকে আর কোন সত্যবস্ত দেওয়া দরকার। অবশ্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুয়ের মধ্যে কোন কোন মানুষ দেখা যেন ষায়া বাড়ল ধরনের লোক—তাঁরা গৃহছাড়া, লক্ষীছাড়া, ভবঘুরে মানুষ। চিরকালই সব দেশে এই শ্রেণীর মানুষ থাকিবেন। ইহারাই seers। তবে আমাদের দেশে তাঁরা সম্প্রদায় পাকাইয়া তোলেন, এই হয় অনিষ্ট। একরকম লোক কাককৰ্ম ছাড়িয়া-ছুড়িয়া তাঁদের তন্নী বর; তাঁরা রূপের স্বাদ পায় না, ধান্দ লইয়াই মাতামাতি করে।

দেশপূজা শ্রীযুক্ত অম্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁর “কর্মযোগ” গ্রন্থে এই কথা-গুলি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। “ভক্তিযোগের” গ্রন্থকার বলিয়া তিনি ব্যাত; তাঁরই পক্ষে তাই “কর্মযোগ” লিখিতে আরম্ভ করা ঠিক উপযুক্তই হইয়াছে। “ভারতের পতনের হুজ” তিনি দেখাইয়াছেন এইরূপ :—

“এই ভারতবর্ষে যখন আত্মপন কল্পনারা দৌরভের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন, এবং সেখানে যে এই ‘হুজুলা হুফা’ ভূমিতে এতল পদ্যান্ত অরসংহানের বাহ্যিক রহিত্যে যে তাঁহাদিগের জীবিকা-নির্বাহের জট কর্ণের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তখন কর্ণের প্রতি সহজে তাৎক্ষিণ্য উপস্থিত হইল। শরীর-বাহ্য্য এই বেশে আত্মাঙ্গসাম্য বলিষ্ঠ তাহা আনন্দের বিষয় হইল; এবং শরীরবাহ্য্য নির্যাহের সহিত মৈত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরণ সঞ্চিত তাহা দৃষ্টির বহিস্কৃত হইল। জীবিকাবিহারা বহিস্কৃত কল্প নিত্যবই অকিঞ্চিৎকর বলিষ্ঠ অতীতমান হইল; কিন্তু তাহাই অকল্পিত করিয়া দইলে বাহিরের মঙ্গল বেশে সঙ্গীত হই, অন্তরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলও তেমনি লাভিত হইল। থাকে—ইহা ধারণার বিষয় রহিল না। দৃষ্টান্ত অগ্রসরণ কর্তৃক অবলোকা করিয়া, মাত্র জ্ঞান ও তল্লিক জীবনের পরমসাধ্য নির্ধারণ করিলেন, এবং নিরন্তর ব্যক্তিগণ কর্তৃক ব্যাধি নির্মিত না হওয়ার উচ্ছ্বল হইয়া পড়িল। ইহাই ভারতের পতনের নহ। বাহ্য্য মঙ্গল জ্ঞান করিয়া তপস্বী করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সাধু মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন; এবং বাহ্য্য মঙ্গলী রহিলেন, অগতের মঙ্গলের সহিত তাঁহাদিগের বকীর মঙ্গল কিরণ খনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। তাহা তুলিগ, যোর বিবর্তী ও বার্ষণ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই দলই মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।”

ডাক্তার শ্রীব্রজ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত “প্রবাসী”তে “দেশের সেবা” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে দেশটুকুর মধ্যে মানুষের প্রীতি বদ্ধ না হইলেও, বিশ্বমানবে তাহা ব্যাপ্ত হইলেও, সেবার ক্ষেত্র দেশেই আবদ্ধ থাকে। তবে সেবার আদর্শ ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে। এ কথাটির মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে। অসমীয়াবৃত্ত তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সেই কথাই বলিয়াছেন :—

“আমি অগতের সীমাব—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর,

দক্ষিণ—ভাঙিত রাজ্যবহ, বাণীর ঘান এবং চিন্তা, ভাব ও জিহবার বিনিময় ব্যাধি আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ।”

নরেশবাবুও লিখিতেছেন,—

“সমুদ্র নামক জাতি যে এক মহাশেষ ও মহাসমাজ হইয়া পড়িয়া উঠিলে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেশান্তরবোধ অতিক্রম করিয়া ভগবানের অনুরক্ত বিধানে আমাদের সেই মহাসমাজে আত্মবোধ প্রাপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে।”

দেশাত্মবোধের দিনে, বিশ্ববোধের প্রতি-ক্রিয়ায় দিনে, এ সকল কথা আমাদের মনে হঠাৎ চমক উপস্থিত করে। কথাগুলো পুরাণো হইলেও এ কালের হিসাবে নূতন। কিন্তু দেশ-প্রেমের আদর্শ যেমনি বলাক্ না কেন, দেশের সেবার ক্ষেত্রের মঙ্গল হরনা নরেশবাবু ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চান। দেশের সেবার সঙ্গে মানব-সমাজের একত্ববোধের প্রকৃত কোনও বিরোধ নাই।

সেবা বলিতে তিনি শুধু জনহিত-সাধন বুঝেন নাই। কারণ তিনি লিখিয়াছেন : “আত্মোন্নতিও দেশের সেবার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।” অর্থাৎ তাঁর মতে সমাজ-বোধে পূর্ণ হইয়া সেই বোধের প্রকাশস্বরূপ যাহা কিছু করা যায় তাহাই সমাজের সেবা হইয়া দাঁড়ায়। দেশের মধ্যে এই সমাজ-বোধ (social consciousness) জিনিসটা জাগাইতে পারিলেই “লোকশিক্ষা”র সমস্তাঙ্গও সমাধান হয়, ধর্মের সঙ্গে কর্ণের বিরোধও হুঁচুয়া যায় এবং দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধও সম্বন্ধ থাকেনা। কারণ সমাজবোধের পরিণতিই বিশ্ববোধে; হুঁচুয়া তাহার গতিই সেই দিকে।

আমাদের শিক্ষা।

ফাস্টনের সর্বপ্রথমে “আমাদের শিক্ষা” নাম দিয়া সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সকলেরি ঔদাসীন্য ও বিমূর্তির একেবারে তলার নিমজ্জিত সব চেয়ে বড় সমস্যাটির কুঁটি ধরিয়া তাহাকে পাঠকের চোতনার কূলে তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সুতরাং শিক্ষার ফল সমাজে কেমন করিয়া ফলানো যাইতে পারে, তাহাই যে শিক্ষার সব চেয়ে বড় সমস্যা—এই সহজ কথাটা অধিকাংশ লোকেরই মনে থাকেনা। মনে না থাকিবার কারণ সত্ত্বেও তিনি আলোচনা করেন নাই। দুটি মাত্র কথা তিনি বলিয়াছেন :—(১) শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই ; কিন্তু সেই সত্ত্বেই তিনি বলিয়াছেন যে, সে সত্ত্বেও কোন জাতিই সন্তুষ্ট হইতে পারেনা, কারণ শিক্ষা জিনিসটাই experiment মাত্র। তবু (২) অসন্তোষের বড় কারণটাও তিনি ধরিয়াছেন :—“আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের নব শিক্ষা আঙ্গু সঙ্গু খাপ খায়নি।” এই দ্বিতীয় কথাটাই আসল কথা। অসন্তোষের মূল এইখানেই। আমাদের শিক্ষার উপর আমাদের সমাজের কোন দাবী নাই—আমাদের শিক্ষার চাষি সমাজের কোন কুলুপেই লাগেনা। ইউরোপে লক্ষ লক্ষ দেশেই, বীরেই হোক আর দ্রুত-বেগেই হোক, শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গঠিত রূপিত ও পরিবর্তিত

হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে তা মোটেই হয় নাই !

কিন্তু কেন আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার বিনিবনাও হইতেছেন, এ প্রশ্ন সত্ত্বেও সম্পাদক যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাহার শিক্ষা-সমস্যার পূর্ব-সীমান্সার পর ঠিক উত্তর-সীমান্সা হয় নাই। তিনি প্রশ্নটাকে যথেষ্ট ঘাঁটান নাই, তাই তাহাকে মিটানও নাই।

একথা তিনি পরিষ্কার স্বীকার করিয়াছেন যে,—

“এ কালের মূল কালের দেশের মাটিতে গজার মি, আকাশ থেকে গড়ছে।”

তবু তার পরেই তিনি বলিতেছেন,

এই শিক্ষা দেশের মাটিতে দিকড় লাড়বে কিনা সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে। কেননা তা মূলত বিদেশী। এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, যে শিক্ষার বলে নব ইউরোপের বৃদ্ধি ও চরিত্র গড়ে উঠেছে তা আমিতে সম্পূর্ণ বিদেশী ছিল।..... মনোভাষাতে যে জাতি একত্রে সে জাতি গঠিত।”

এসব কথা কেহ অস্বীকার করে বলিয়াও গুনি নাই। ইংরাণী শিক্ষা আমরা পাইতেছি বলিয়াই যে কোথাও কোথাও ঐক্য সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, তাহা মোটেই সত্য নয়। বিশ্বসত্যতার সকল শিক্ষাই আমাদের পক্ষে দরকার, কোন শিক্ষাই বাধ দিবার নয়—এ বিবরে কাহারও মতবৈধ নাই। কিন্তু কোন বিশেষী শিক্ষাকে দেশীর আধারের ভিত্তর দিয়া ছাড়া আঙ্গুসাং করা যায় কি? বাংলার জন্মিয়া বাংলায়—ভারতবর্ষের—সত্ত্বেও বিশেষ “কিছুই জানিমা ও নিখিনি, অথচ ইংলণ্ডের

সব জ্ঞাতব্য কথা সুধু করি' একজামিন পাস করিতেছি, এমনতর শিক্ষার বৃত্তিবৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি, ও চন্দ্রবৃত্তি সবই ক্রমশ তঁোতা হইতে থাকে, কারণ নান্দুটাই যে তোতা হইয়া বসে। শিক্ষার এ হেন অভিনব পদ্ধতি আর কোন সভ্যদেশে কখনো চলিয়াছিল কি? আমাদের বাঙালী তথাকথিত-শিক্ষিত-সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে যে আশ ও খেটে পরিমাণে আশ-প্রকাশ করিতে পারিতেছেননা, তাঁদের বাংলা লেখার অনভ্যাসই তার প্রধান কারণ নয়; প্রধান কারণ বরং এই যে তাঁরা বাংলার নিজস্ব culture সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। বাংলার ভাষা, সাহিত্য, ধর্মবৈচিত্র্য, সমাজ-ঐতিহ্য, বাংলার নৃত্য, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, বাংলার জনসাধারণ ও তাহাদের সুখদুঃখ ভাব-অভাব—ইহার কোনটাই তাঁদের জানা নাই। সুতরাং তাঁরা যা কিছু লেখেন তার বারোজানাই শেখাবুলি এবং বাকী চার জানা বিভূষণ চৌধুরী, অর্থাৎ নিরর্থক কলহ।

অন্ততঃ বাংলাভাষার ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষাটা দিবার চেষ্টা হইলে ইহার চেয়ে ঢের ভাল ফল হইত। তখন বাংলার নিজস্ব কালচারটা কি, হস্ততাহার তলব পড়িত। অন্ততপক্ষে বাঙালী ছাত্রের মন ও কল্পনা শৈশব হইতে উপবাসী থাকিত না, কিছু খোরাক পাইত। তোতাবৃত্তি এমনতর বৃত্তি পাইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানিরপেক হইয়া বাঙালী যেমন তাহার অপূর্ণ ছোট গল্প ও উপজ্ঞাস প্রকৃতি রচিয়াছে, তেমন সাহিত্যের অজ্ঞান নানা-

দিক-দর্শন, বিজ্ঞান প্রকৃতি তখন বাংলা ভাষার পড়িয়া উঠিত ও তাহার দ্বারা বহু-সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইত, সন্দেহ নাই। বাঙালী যে সাহিত্যটুকু রচিয়াছে তাহা আজ দেশ-বিদেশে আগর পাইতেছে, শুধু বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়েই তাহার মূল কেন স্থান নাই বলিলেই হয়। ছাত্রেরা শেলী, কীটস্, টেনিসন পড়িলে মঞ্চ তাহাদের চেয়ে ঢের বড় কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িবেনা। ষ্টট পড়িলে, বর্ডম পড়িবেনা। প্রমথবাবু এ সকল কথা ভালরূপেই জানেন, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি বড় বেশি দেখিতে পাই—কারণ তিনি এ সব কথা পটাপট না বলিয়া লিখিয়াছেন—

“এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও সেদিন হয়েছে :—সুতরাং আমরা যে এই নবশিক্ষাক একে-বারে আপনায় ক’রে নিতে পারি নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।”

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে সভ্যতার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিষ্ঠাই হয় নাই—আমেরিকার ফ্রেম-গাথিয়া-ভোলা বাড়ীর মত একেবারে গোটা গুণজ-খিলান-সম্মত সুপ করিয়া রাতারাতি আমাদের মাতাতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বসানো হইয়াছে। তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আবার সেই সব চলিহা বাড়ীর মত অগ্ন্যস্ত্র সরাইয়া দেওয়া যায়। শিক্ষা ভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমশ উপরে ওঠে—গোড়াকার শিক্ষা পাকা হইলে পর তবে ত উচ্চশিক্ষার পত্তন হইতে পারে। আমাদের মনের হাঁড়িতে চাঁপ, মল সবই ভেঁরি আছে কিন্তু নীচে শিক্ষার আগুন না দিয়া উপর হইতে ক্রমাগত তাপ দিবার প্রবল

চেটা মুক্ হইল; সে আশ্রয় খরিবে কেমন করিয়া? দেশের জনসাধারণ পাইবে না প্রাথমিক শিক্ষা, শুধু উপরের শ্রেণীর শতকরা ৩০ জন লোক সর্বোচ্চ শিক্ষা পাইয়া সভ্যতার মহোচ্চ শিখরে উঠিবে—এসব দিব্যদ্রব্যের কোন মূল্য আছে কি? এ অশ্বটন-খটনে মারা বা বাত্ববিগ্ৰাও পটীরলী নয়। স্ততঃ প্রমথ বাবু যে লিখিয়াছেন,

“আমাদের শিক্ষার উপর এককল ইংরাজ এই কারণে নারাজ যে তার কলে আমরা এদেশের প্রচলিত রীতিবস্ত্রের বদল চাই আর আমাদের শুকনবদের মধ্যে এককল এই কারণে নারাজ যে, আমরা এদেশের প্রচলিত সমাজতন্ত্রের বদল চাই।”

সে সব অদল-বদলের দাবী যদিবা উপস্থিত মূলত্ববী থাকে, তবে তা খুবই সঙ্কট বলিয়া মনে হয়। কারণ, জনকরের রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসন এবং জনকরের দ্বারা সমাজের ভিত্তির ন্যায়ন খুব সুবিধার ব্যাপার নয়। স্বায়ত্ত-শাসনের পরীক্ষাটা ভাগ্যক্রমে হয় নাই, অত্র পরীক্ষা হইয়া গেছে। তাহাতে সমস্ত সমাজের বন্ধ-গণ্য ত বুচেই নাই বরং তাহার কবন্ধ বন্দা হইয়াছে। তার মত বিভীষিকা আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রমথ বাবু শিক্ষা সম্বন্ধে public opinion এর সৃষ্টি করিতে চান, কিন্তু তার বিশ্বাস যে শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে পাবলিকের “কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই।” কোন পাবলিকেরই কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকেনা—তবে

পাবলিকের পাল কোনদিকের বাতালে নড়ে তাহা বেশ লক্ষ্য করা যায়। কি উচ্চ শিক্ষা, কি নিম্ন শিক্ষা কোন শিক্ষাই আমাদের পূর্যাবস্তর হইতেছে না—এই দাওয়াতেই এখন এদেশের পাবলিকের পাল ঢকল। শিক্ষা সম্বন্ধে ‘অভিমান’ দূরে থাকুক, শিক্ষা যে আমরা ঠিকমত পাইতেছিলা—এই বোধটাই ও তজ্জন্ত জোখটাই শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বিনদিনই প্রবলতর হইতেছে। প্রমথ বাবু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে কেউ কেউ চান “বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিণত করিতে”। অথচ তিনিই লিখিতেছেন “সমাজ চায় যে সামাজিক মানব একাধারে জ্ঞানী ও কর্মী হইবে।” আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানুশ্বের শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে আছে অথচ একই সঙ্গে টেকনিকেল শিক্ষার কোন আয়োজনই নাই এটা যে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা তাহা প্রমথ বাবুর দ্বিতীয় উক্তির কোটেশান হইতেই বুঝা যাইতেছে। স্ততঃ তাহার ঠাট্টাটা ঠিক লাগসই রকমের হয় নাই। শুধু বৈজ্ঞানিকের ত কেহ চায় না; তবে বৈজ্ঞানিকের দরকার পনেরোঘানা লোকেরই আছে, কারণ ব্রাহ্মণবৃত্তির স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষাত্রবৃত্তির স্থান সম্প্রতি বাঙালী পণ্টন তৈরির ব্যাপারে যদি কিছু হয়। অবশ্য শূদ্রবৃত্তির দ্রষ্ট কাহাকেও জাবিতে হয় না—সমস্ত জাতটাই তাহাতে দীক্ষিত হইয়া আছে।

ঐ অজিতকুমার চক্রবর্তী।

সমালোচনা

মুহূর্ত্ত। শ্রীমুখ চৌধুরী সুযোগাযোগ
এইত। কলিকাতা লীলা প্রিন্ট: ওয়ার্কসে মুদ্রিত
ও প্রকাশ্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।
এখানি নামে 'কবিতা-গ্রন্থ', কিন্তু তাই ও নীল-
তবে ইহার বিশেষত্ব এইটুকু যে, ইহার পলটে অশ্লের
সুখিকা নাই।

হিন্দু জীবন-সন্ধ্যা। শ্রীমুখ বোম্বেন
প্রকাশ্য বি. এ. এইত। দ্বিতীয় টাকা। হিন্দু
হইতে প্রকাশ্য কর্তৃক প্রকাশিত। টাকা, আলোক-
জাল্লা দ্বিতীয় বেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা।
এখানি কাব্য—একাংশ সর্গে রচিত। লেখক বীর
সুখিকার বিস্তারিত পদ্যবর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দু
কেন অশ্লপতিত হইলেন? মূলমতান কেন এসে
আসিলেন? আসা কি আকস্মিক হইয়াছে, অথবা
কোন পর্বত কারণে ঘটয়াছে? ইত্যাদি প্রশ্ন বহুই
বসোয়তে উত্থিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের সমা-
ধানের বশেষে কবি করিয়াছেন। কাব্যখানিতে আমরা
কোন বিশেষত্ব বা কবিত্ব দেখিবার না।

পুঙ্খ কথ। বনীয়া চাকরালার মেবী ও
বিবিয়া লিখিত। ময়মনসিংহ, জামালপুর শ্রীমুখ
এসিটর প্রকাশ্য সেন ও প্রকাশ্য কর্তৃক প্রকাশিত। টাকা,
আলোকজাল্লা দ্বিতীয় বেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য
এক টাকা। পুঙ্খ—সেখিকা বনীয়া চাকরালার লিখিত
পুঙ্খ; এখানি সেখিকা লিখিত সন্ধ্যা যে-সব
কথা আত্মীয়-বন্ধনকে চিত্রিত লিখিয়াছেন—সেই সকল
চিত্র হইতেই এই 'পুঙ্খ কথ'র স্রষ্টা। উনিশ বৎসর
বয়সে সেখিকা পুঙ্খকে লিখিয়া পললোক গমন করেন।
সেখিকার আত্মীয়-বন্ধনের কাছে এ প্রথম মূল্য আছে,
বীকায় কবি; কিন্তু সাহিত্যের সহিত ইহার কোন
সম্পর্ক নাই।

তাপসী। শ্রীমুখ অমৃতলাল ও প্রকাশ্য।
কলিকাতা, ২২, হার এক মল কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য কাগজের পলট এক টাকা, কাগজের খাইতি
পাঁচ টাকা। এই গ্রন্থে—মৌর্যবাহী, নবোদিতা, রামোদা,
সেট টেরোদা, সেট এলিজাবেথ, সেট কলোনিয়, মাদান
পেরো, সুমাত্রী কথ, রানী পরমেশ্বরী ও বৌ অমোহ-
কামিনী—বহুদেশের ও বিশেষত্ব এই বহুদেশ বহুদেশ
নারীর জীবন-চরিত্র সাংগৃহীত হইয়াছে। ধারাবাহিকতা
দর্শন বলায় বা থাকিলেও রচনা চলন-নই; এক
এ জীবন-আখ্যায়িকাগুলি বালক-বালিকাবিশেষ
পড়িতে বিশেষ তাৎপার্য উপদেশ ও আনন্দ লাভ
করিলে।

বীরভূম-বিবরণ। প্রথম খণ্ড। মহারাজ
সুবার শ্রীমুখ মহামানির প্রকাশ্য কর্তৃক সম্পাদিত।
"বীরভূম-অমৃতলাল-সমিতি" হইতে প্রকাশিত ও
কলিকাতা বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা।
এই গ্রন্থে শ্রীমুখ মহারাজের বহু প্রাচীনত্বসম্পর্ক
বহুমান সুখিকা লিখিয়াছেন,—সুখিকাটি বহু প্রাচীনত্ব
তথ্যে পূর্ণ। তবে প্রকাশ্য মহারাজ লিখিয়াছেন, এ
প্রশ্ন ইতিহাস নহে; "বীরভূমের কয়েকটি পল্লী ও
তীর্থক্ষেত্রের কাহিনীমাত্র।" ইহাতে হেতুসমূহ,
কল্পসমূহ, প্রসঙ্গ, আত্মীয়, বহুদেশ, ললললি
লোকলাই, কেন্দ্রবিশ্ব ও জামালপুর পল্লী (ত্রিষ্ট,
পদ বা ভেদ) কাহিনী সাংগৃহীত হইয়াছে।
কাহিনীগুলি বহুদেশের এক অংশের প্রাচীন কীর্তি-
কথা; ইতিহাসিকের কাছে সেগুলি মূল্য অর্থাৎ
আছে—আছে বহু, কিন্তু প্রাচীন হইয়াছে—হাপা, কাগজ,
বীকায় জাল।

ইসত্যন্ত পদ্য।

কলিকাতা ২২, বীকায় ট্রিট, আত্মিক প্রেসে শ্রীমুখের বহু প্রকাশ্য মুদ্রিত ও ০, পলি পার্ক, পলিপ্রকাশ্য হইতে
শ্রীমুখের সুযোগাযোগ প্রকাশ্য।



ভারতী

৪১শ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

[২য় সংখ্যা]

গুরুজী

আজ অবিনের গুরুর কাছে সে আমাকে নিয়ে যাবে। তুনেছি তিনি মচা সাধুগুরু এবং জ্ঞাতিস্বর। আমি সেদিন আমার গেকুর। মলিনার ওভার-কোটটার উপরে আঙ্গ-কালের স্বামীজীর ধরণে পাগড়িটা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লুম। নাকে সোনার চশমা এবং হাতে রূপো-বাঁধা তরোলের দাতের ছড়ি আর পায়ে ক্লানেলের পেন্টা-লুনের নীচে ব্রাউন-লেদার বুটটার আমাকে ফকির কি কিকিরবাজ পুলিশের সি-আই-ডি অথবা আর-কিছু দেখাছিল তা আমি ঠিক বলতে পারিনে; তবে আমার মনের ভিতর সেদিন যে একটু গেকুর আর ভাড়া পড়েছিল এবং আমি গান বাজনা না করে শুধু গল্পের হয়ে বসে থাকার জাহাজে তাবৎ যাত্রী আমার দিকেই যে থেকে-থেকে কটাক্ষপাত করছে এটা আমি বেশ বুঝেছিলাম।

বুড়ো গোশোকবাবু সেদিন খবরের কাগজটা চশমার অতটা কাছে নিয়ে কেন যে অমন ননঃসংযোগ দিয়ে জুটের বাহার-বরের কলমটা আগাগোড়া মুখ কবুজিয়েলেন সেটা জানতে আমার অধিক কষ্ট পেতে হয়নি।

বাই হোক অন্তর্দ্বিনের মতো সেদিনও নিরমিত উত্তরপাড়ার এসে জাহাজ ভিড়লো। অবিনে-আমাতে সেখানে নেমে পড়ে বার্ড এবং কোথ এই দুই ক্লাসের মাঝামাঝি গড়নের ছকড় গাড়িতে ধুলা এবং ঝাঁকানি খেতে-খেতে আধক্রোশ-টাক্ষ গিয়ে রাবাবের একটা বাগান-বাড়ির কটকের সামনে গাড়ি, বোড়া, মাষ পাড়োয়ান আমরা দুজনে খানার ভিতরে উন্টে পড়লুম। একখানা মোটরগাড়ি একরাস ধুলা আর খানিক পেট্রোলের বিকট গন্ধ আমাদের নাক-চোখের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে গাঁ করে বেরিয়ে গেল। অবিন সেই পলায়িত মোটরের

চলন্ত ধূলোর মধ্যে আরো গোটা-কতক ইংরিজি গালাগাল মিশিয়ে দিয়ে আমাদের চাকা-ভাঙা গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে রাস্তার দাঁড় করিয়ে দিলে। আনার চশমার একখানা কাঁচ গেছে ভেঙে, পাগড়িটা গেছে খুলে, এবং শুয়োরের দাঁড়াটা খসে গিয়ে আমার লাঠিটা হয়ে পড়েছে ফোগলা। অবিন আমার চেহারা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। আমি গায়ের ধূলা বধাসস্তব ঝেড়ে-ঝুড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম সে যেমন কিটু-কাটু হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তেমনই আছে;—তার কালো কোটের একটু ভাঁজও এমিক-ওমিক হয়নি এবং তার বৃক্কর মাঝে কুটন গোলাপ-ফুলট থেকে একটি পাপড়িও স্বরে পড়েনি। অবিন লম্বা চওড়ার আমার চেয়ে বেশী বই কম হবে না, অথচ ঐ ছকড় গাড়িটার খাঁচা-কল থেকে কি-করে এমন সাক্ষ্য বেরিয়ে গেল তা জানিনে; কিন্তু তাকে দেখে আমার হিংসে হয়েছিল সত্যি বলছি। ধূলা-মাথা গেরুয়া পাগড়ি ঝেড়ে-ঝুড়ে সামলে নিলেম বটে কিন্তু বাড়িতে আয়না দেখে যেমন চোস্ত করে সেটাকে বেঁধেছিলেম তেমনটা আর হল না;—ব্রহ্মভেলোর মাঝখান থেকে কাপড়ের সুঁপিটা সাপের ফনার মতো আর উদ্ভত হয়ে রইল না—বা-কানের উপরে লটকে পড়ল; এবং এই আকস্মিক দশা-বিপর্যয়ে দেহটা অনেকখানি ধূলা যেখে নিলেও, মন তার নিজেই গেরুয়া রংটুকু আর বজ্রের রাখতে পারলে না। অবিনের সঙ্গে সেই রাস্তার বাড়িতে সাধু-দর্শনে প্রবেশ কল্লের ঘন ঘন আমার সম্পূর্ণ অসাধু এবং অধীর।

রং-ওঠা গোছার শিক-দেওয়া একটা কটকের মাঝ দিয়ে ইটের খাবরী-করা চওড়া একটা রাস্তা খানিক সোজা গিয়ে বেড়ির মতো ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে টালি-বসানো একটা বারান্ডার চার ধাপ সিঁড়ির নীচে গিয়ে দেব হয়েছে, রাস্তাটার এককালে লাল স্তরকি ঢালা ছিল, এখন সেগুলো উড়ে গিয়ে জাহগাঝ জাহগাঝ সবুজ শেওলার ছোপ খরছে। রাস্তার ধারে ধারে পুরোনো মোটোকতক পাটা-ঝাঁই এবং এখানে-ওখানে মাটির পরী রাখবার গোটা দুচার ইটের পিলে। পরীগুলোর মাটির দেহ বারো-আনা করে গিয়ে ভিতরের শিকগুলো বেরিয়ে পড়েছে। বাগানটা বাড়ীর পিছন পর্যন্ত ঘুরে গিয়ে, একটা টানা রেলিঙের ভিতর দিয়ে যেখানে গলা দেখা যাচ্ছে সেইখানে একসার শুকনো গাধা ফুলের গাছে গিয়ে শেষ হয়েছ। সিঁড়ির দুধারে সিঁহি বসবার দুটো বড় চাতাল। একটার উপর থেকে সিঁহি অনেক কাল পালিয়েছে—সেখানে একটা ছেঁড়া মাদুর যোনে শুকছে; আর-একটা চাতালে পোড়ামাটির মুখ-খিঁচিরে এখনো এক পঙ্করাজ ভোবলদাস তার খসে-পড়া লাজের সন্ন শিকটা আকাশের দিকে খাড়া করে থাবাহীন এক পা শূন্য উচিয়ে বসে আছে—।

আমরা সিঁড়ির কটা ধাপ পেরিয়ে মোটামোটা তিনটে ধান-দেওয়া বারান্ডা পেরিয়ে এক বড় ঘরে ঢুকলেম। ঘরটা খুব লম্বা, মাঝে বাথ-খাবা পুরোনো মেহগি কাঠের মস্ত একটা গোল টেবিল, অনেকখানি ধূলা আর পুঁব জম্বকালো একটা টিনে-মাটির হুলদান নিয়ে দাঁড়িয়ে



আছে। ফুলদানটার একটা দাঁতাল আর বানিকটা কানা ভাঙা; আর তার গায়ে বড়-বড় গোলাপ-ফুল প্রজাপতি আঁকা। ঘরের কাড় ক'টা বয়লা গোলাপ দিয়ে মোড়া—আগে লাগ, এখন কালো সালুমোড়া শিকে ঝুলছে। ঘরের সবুজ খড়খড়ি ছিল; এখন ফিকে হতে-হতে ধাড়িয়েছে প্রায় গঙ্গাসুতিকার রং। ঘরের পাশের দেওয়ালগুলোতে একটা-করে আয়না, একটা-করে মেমের ছবি,—ছবির কোনটার কাপড়-পরা, কোনটা নয়। দাকের দুই বড় দেওয়ালে একদিকে একটা বড় ঘড়ি, আর-একদিকে চওড়া পিস্তির ফ্রেমে বাঁধা জরীর তাজ-মাথার এক হুপুকের চেহারা,—মনে হচ্ছে যেন সামনের দেওয়ালে সেই অনেক দিনের বন্ধ-হয়ে-বাওয়া ঘড়ির কাঁটা-ছটোর দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

অবিন ঘরে ঢুকেই বাকা-পায়া গোল-পিট পাচ-রঙা ফুল-কাটা ছিট-মোড়া একখানা চৌকিতে থপাস করে বসে পড়ল। দ্বজনে প্রায় এক কোয়ার্টার বসে আছি; অবিনের সুখে কথাই নেই। আমরা কেন যে এখানে এসেছি সেটা যেন অবিন ভুলেই গেছে। আমি বেগতিক দেখে—একটা উড়ে ঘরের একটোরে, বেখানে খানিক রোদ এসে পড়েছে, একটা সিগারেটের মরচে থরা টিনের কোটো থেকে দোকতার পাতা একটা একটা বার করে দোবে বেঁজিয়ে দিচ্ছিল সেইখানে আস্তে আস্তে গিরে বহুম—সামু কোথায় রে? উড়েটা খাড় না উঠিয়েই, সামু এই লক্ষট মাত্র উজারণ করেই আবাস নিজেই কাজে মন দিলে। আমি আবাস বহুম—

ওরে সামু কোথায়? তাকে একবার খবর দে না!

দাসো একবার পানের বাগধরা লাগ ছোট ছোট কুঁচুক বলে—সামু? আমিই তো সামু!

আমার আর রাগ বরদাস্ত হলনা; আমি আনার ভাঙা ছড়িগাছটার বাকি অংশটা তার পিঠেই আদ্র ভেঙে বাব বলে উঠিয়েছি আর অবিন ডাকলে—ওহে এদিকে। ফিরে দেখি থাকে দেখবার মতো আলা তিনি ধাড়িয়ে। চোখা-চোখি হবাবাত্র তিনি একটু-খানি হেসে কবীরের এই পরখটা দূর করে আউড়ে নিলেন—

মন ন রঙ্গারে রঙ্গারে বোদী কপড়া।

আমার পকেটে কবীরের পুঁথি, এটা ইনি নিশ্চয় জেনেছেন; আর কথাগুলো আমাকেই বলা হল এই ভেবে আমি একটু বিম্বিত একটু ভীত আর একটু লজ্জিত হয়েই তার পায়ে প্রণাম করুম। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেন—ওহে অবিন, তোমার বন্ধু যবনের পায়ের ধূলা নিয়ে ফেলেন, এটাতো ভালো হল না!

ইনি-যবন! বিশ্বদে আমি যেন অভিকৃত হয়ে অবিনের দিকে চাইলেম। মনে একটু যে দুগার উপর না হয়েছিল তা নয়। অবিনটা তার পাতলা ছোট খুব চেপে এবং বড়-বড় চোখে প্রকাণ্ড একটা কৌতূহলের মিশ্র হাসি নিয়ে আমার সুখে চেয়ে রইল। আমার তার উপর ভারি রাগ হচ্ছিল; সে যদি আগে বলতো তো যবনের পদধূলি—কথাটা মনে আসবামাত্রই সামু একেবারে গলা ছেড়ে

গেয়ে উঠলেন—

কোই রহীম কোই রাম বখাটেন, কোই কহে
আদেশ
নাানা ভেদ বনায়ে সবে মিল চুর ফিরে ঠেক
দেশ।

আমার বেশটার উপরে এই তেল—সেটা
খিনি করেন তিনিও যে ডেকখারী কেউ নন
এটা তাঁর সাদা সিকের পাল্লাবীর উপরে
কান্দীরি শাল এবং তার নীচে লুন্টা ফালানে
পর্য নুতন খোরা ধান ধুতি বেধে কিছুতেই
আমি ভাবতে পারলেন না। এমন সাধু
আমি অনেক দেখেছি এবং সময়ে-সময়ে
তাদের পাল্লাব পড়ে অনেক ঠেকেও শিখেছি।
আমি একটু চোঁচিয়েই অবিনকে বল্লেন—
চল হে আহাভ আবার না ছেড়ে দেব। সাধু-
দর্শন হল; চল এখন গঙ্গানান করে বাড়ি
যাই।

অবিনের যিনি গুরু, তিনি এককণ্ঠে এসে
আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন—এই এক-
কণ্ঠে আপনি আমার বখার্ব চিনেছেন। আহুন
একটু চা আর সেটা-ছই মুরগীর ডিম না
খাইয়ে আপনাদের ছাড়া হচ্ছে না।

বলা বাহুল্য যবনের পদধুলিতে স্পর্শ
থাকলেও, যবনপালিত পক্ষীজাতির উপরে
আমার কোন আকোশ ছিল না। জেলের জল
শাস্ত্র-মতে অগ্রাহ্য বলে জেলের মাছও যে বাপ
ধেব এমন মূর্খ আমি ছিলাম না, বা জেল-
খানার ছত্রিশ-জাতের গায়ের বাতাস মত্তর
মতে নিবিড় হলেও জেলের তেল অথবা সেই
তেলে ভাজা সহরের ছত্রিশ-জাতের পদধুলি
নাখানো পরম হুঙ্গুরি যে অনাযত্নে সায়গী
এটা শীকার করতে আমি একবারেই
নারাজ ছিলাম। তার পর সড় ধোপ-দেওলা

সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলে যখন আমি
বিশুদ্ধ আমার কোশা কমণ্ডলু তান্ত্রকুণ্ডে
টাটকা-পাড়া মুরগীর সাদা ডিম এবং তার
চেরেও পবিকার এবং সাদা পাউরুটি, ঘরের
গোকর হুথ, লিপটনের চা-পানি—কলের
জলের, গঙ্গা জলের নয়—এসে উপস্থিত, তখন
অবিনের গুরুকে সাধুবাদ দিতে একটুও
আমার ইতস্তত করতে হল না।

ককিরটির ভিতরে কক্যেরি কোথাও
ছিল না। দেখলেন তাঁর হাতের চিনটের
তিনি তিনটে পাবীর খাঁটা খুলিয়েছেন এবং
তাঁর গেকরা বসনটা টুকরো টুকরো করে
কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা এবং
পৈতের স্তোত্র তিনি বানিয়েছেন বুদ্ধি
ওড়াবার সুর লক; লক্ষ্যের ঘটটা উল্টে
তিনি স্তব্ধতার বীণার ত্রুটি বানিয়ে
নিয়েছেন। বৈরেগীদেব ঘা-কছু ভগাবি, ও
সোঁড়ামির বত-কিছু আসবাব, সবগুলোকে
তিনি এমন-এক-একটা অদ্ভুত কাজে লাগিয়ে-
ছেন যে সেগুলোর দুর্দশা দেখে হুঃখ না
হয়ে হাসি পাবেই পাবে। মহাসংহিতার, বাই-
বেলে, কোরাণে যেগুলো শুদ্ধ, সেগুলো বিকৃত
কাজে খাটিয়ে তিনি আপনার চারিদিকে
এমন-একটা হাস্যরসের এবং অদ্ভুত রসের
অবতারণী করে রেখেছেন যে মন সেখানে
এসে হুঃসাহসে ভরে না উঠে যায় না। আমার
মনে হল যেন বাইরের একটা পরিষ্কার বাতাস
ঝোর করে আমার বুকের কপাটদুহানা
খুলে দিয়ে গেল। এর পর যখন সেই সাধু
গুরুদেব দিকে চাইলেন তখন তাঁকে গুরু
এবং বুদ্ধ এই ছই ছাড়া আমি আরকিছু
মনে করতে পারুম না। আমি গুণগুণ

করে গাইতে লাগলুম—“আঁরে ইন্ চহ
রাহ না পান্নে, হিন্‌ছকো হিংহে বাস্তি দেবী,
তুৰ্ণকী তুৰ্ণকাস্তি।

হঠাৎ হাতের কাছ থেকে বীণাটা
তুলে নিয়ে বহু আমার, গুরু আমার, তিনি
গানের শেষ-চরণ দুটো পূর্ণ করে দিলেন—
“কট্টই কবীর :সুনো ভাই সাধো কোন
রাহ হইব বাস্তি”। তার পর তাঁর সঙ্গে
কবির লড়াই চলো,—আমি পাই, তিনি
জবাব দেন। কিন্তু আমার তেমন স্মরণও
ছিল না, আর বীণা বাজাতে তেমন দক্ষতা
অল্পপ্রাপ্তেরও লাভ করব কি না তাও
জানিনে।

সে-বেলায় সীমার অনেকক্ষণ বাট
পেরিয়ে আপনার ঠিকানায় যাত্রী নিয়ে পৌঁছে
গেছে—তখন তিনি বীণা রেখে বলেন—চল
এখন স্বান করে কিছু খাওয়া যাক্‌। আমি
গম্বার দিকে চাইতেই তিনি বলেন—না
ওখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।

এইটে তাঁর স্নানের ঘর। সাধা
পাথরে মোড়া বেন একটা চাঁদের আলোর
গম্বরে এসে ঢুকলেম। মাঝে দাঁড়িয়ে
চেয়ে পরিকার গোলাপ-অলের ফোয়ারা! কি
বিপুল গুরুতার ঘাটে এই মহাপুরুষের সঙ্গে
দানে নামলেম! এখন আমি এই কথা ভাবছি
তখন একটা দাসী—তেমন স্মরণী আমি
কখনো দেখিনি—সোনার একটা পাখীর খাঁচা
এনে বহুর হাতে দিয়ে গেল। “পাখীর পা-টা
বড়িলেবর নততালি কাঁথাখানার মতো নানা
রঙে বিচিত্র। পাখীটা খাঁচার তলার বসে
ধুকছে। আর তার রোগা পালক-ভঙা গলাটা
থেকে গোপীকবীর শব্দের মতো গুব্‌গুব্‌

একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। বহু সেই সুনুর্
পাখীটাকে খাঁচা থেকে টেনে-ইঁচড়ে বার
করে আছাকরে গোলাপ-অলের ফোয়ারার
চুবিরে দাসীর হাতে একখানা সাধা রুমালের
উপরে বসিয়ে দিলেন। পাখীর ডানা-ছানা
সেই সাধা রুমাল ঢেকে পাঁচমিশিলা বধ রং-
মাথানো বিস্ত্রী দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে রইল।
নিজস্ব পাখীটার হলধে দুটো চোয়াল বেয়ে
শোহার কসের মতো পাতলা গেক্‌গারক
সেই রুমালখানার সাধা রং মলিন করে
দিয়ে আর স্তম্ভমস্ত নিদ্রুতার মতো আমাদের
বহু দুটো অঙ্গর চক্ষু নিয়ে সেই দিকে চেয়ে
আছেন—এ দৃষ্টতা আমার কল্পনারও অতীত।
আমার অন্তর বাহির একটা বীতংস বিশ্বয়ে
এই লোকটার সঙ্গে আরো বেশী-করে বনিষ্ঠ
হয়ে ওঠবার উৎকট আকাঙ্ক্ষার টলমল করে
উঠল। এই দেখলেম একে মহাপুরুষ, আবার
এই দেখছি যোর নৃশংস, মৃত্যুর মতো নিশ্চয়।
এ রহস্যের ব্যাভেদ একমাত্র অবিনই করতে
পারবে মেনে আমি তার শরণাপন্ন হলেম।
কিন্তু সে আম অত্যন্ত নিদ্রু হয়ে বলে—আমি
পারবো না, ইচ্ছা হয় তুমি ঠকে তথোও!

আমার আর ভোজনে স্নান হল না, শরনে
শান্তি এল না। মহাপুরুষ উপদেশ রকমেই
আমাদের পান ভোজন ও শরনের ব্যবস্থা
করেছিলেন। অবিনটা দিকি সেগুলো উপ-
ভোগ করে এবং বেলা চারটের সময় ক্ষিতি
সীমার ধরার অনো ঠিক সময়ে প্রস্তুত হয়ে
ধাড়ালো। কিন্তু আমার এতদূর থেকে
কিছুতেই নড়তে ইচ্ছা ছিল না। এবার আমি
অবিনের ঠিক পান্টা জবাব দিলেম—আমি
• বাবো তুনা; তোমার ইচ্ছা হয় মি বাও! কত

আশ্চর্য্য বাণীর চোখের উপরে ঘটে গেল, তাতে অবিনের কৌতূহল জাগেনি কিন্তু ওই যে বলেছি যাবো না, অমনি তার মনে একটু 'কেন' জাগল এবং বেথতে-বেথতে, সেটা একটা বিরাট কৌতূহলে পরিণত হল। সে ছড়িগাছটা আর ওড়ারকোটটা খুলে রেখে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে শুধোলো—নিমন্ত্রণ পেয়েছি নাকি ! আমি গভীর হয়ে বললাম—“হু”। অবিনের কৌতূহলের আবেগ দেখে হাসি পাচ্ছিল ; সে একেবারে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল—এই-খানে তুমি রাত কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছো ? একি সম্ভব !—অসম্ভব কেনই বা হবে ?—অবিন বোধ হয় আমার মুখ দেখে কতকটা এঁচে ছিল আমি তাকে ভোগাছি। সে এবার জোরের সঙ্গে বলল—অসম্ভব ; কেননা আমার পক্ষে সেটা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি !—বলেই অবিন ওড়ারকোট পিঠে কেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি সেই মহাপুরুষ ঘরে এসে বললেন—বা এতদিন অসম্ভব ছিল আজ তা সম্ভব হোক ; কি বলেন ?

আমাদের আর হবার করে অহরোধ করতে হল না। আমি ক্লান্ততার সঙ্গে যখন তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম তখন তাঁর হাতে হস্তির দাঁড়ের রং একটা পাখী দেখেলাম। সেটা পাররা কি ঘুঘু কিছু বোকা গেল না ; আর তাঁর পাশে যেন পাখির গড়া একটা স্থলর ছেলে।

আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশের নীলের উপরে সাদা আলোর একটা জাল বিস্তার করে দেখা দিয়েছেন। এমন পরিষ্কার ধবধবে রাত আমি দেখিনি। তার মাঝে একটা খেত-পাখরের

মন্দিরে আমরা এসে বসেছি। অবিনের পরণে তার সেই নেত্রি চান্নাকাটি, আমার সেই গেকরা অলটর, আর তাঁর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সাদা সাদা। তাঁর বাথর চুল বে এত সাদা তা পূর্বে আমার চোখে পড়ে নি। যেন সাদা কেশার মতো তাঁর স্থলর মুখ যেত পদ্মের মত দেখা যাচ্ছে। আজ কি সাদার মতোই এসে আমরা ডুব দিলাম। মেঘ যখন তার সমস্ত জল ঝরিঝে দিয়ে হাফা হয়ে উঠেছে এ তেমনি সাদা। হিমালয় পর্ব্বতের শিখরের তুষার যখন তার সমস্ত তরলতা সমাহার করে শুভ্র কঠিন হয়ে উঠেছে এ তেমনি সাদা। এরি মাঝে তিনি আশে আশে তাঁর ইতিহাস স্মৃতি করেন—পূর্ব্বজন্মে বাগ-বজ্র দানসাগর প্রাচ্য ব্রাহ্মণভোজন ও কুমারী দানে সর্ব্বত্র লুটিয়ে দেবার গুণো আমি তিন ত্রিশে নব্বই লক্ষ বৎসর বিলুপ্তলোক ব্রহ্মলোক আর নিবলোকে বাস করে শেষে অমরা-বতীতে ইন্দ্রতপস্বী দখল করে বসেলাম। সে বারো হাজার বৎসর নন্দনবনে চিরদোষন নিয়ে কি আনন্দ, কি বিলাসের মতোই যে বাস করিয়েছিলাম তা বর্ণনাতীত। তোমরা এখানে যোগল বাদসাহের বাবুগিরির যে-সব গল্প পড়ে অবাক হয়ে বাও সেখানকার তুলনার সেগুলো কি তুচ্ছ ! সেখানে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, প্রাণ্তি নেই, অবসাদ নেই ;—মনের বাগানে চিরবসন্তের ফুলগুলো সৌন্দর্য্যের স্নেহের লালসার মত্ততার অক্লান্ত পেয়ালার মতো রসে চিরদিন ডরপুর রয়েছে। অকৃপিত শিখা সেখানে আলোদিনের আশ্রয় প্রদীপের মতো দিনরাত জ্বলছে। স্বর্গের সেই ক'টা দিন আমার ভোগের অনলে উর্দ্ধশী রক্তা

ত্রিশোত্তমাকে আছতি দিবে প্রায় স্বর্গবাস শেষ করে এনেছি সেই সময়ে ইজ্রানীর উপরে আমার লোমুশ দৃষ্টি পড়ল। আমার কাছে অপ্রাণ্য তখন কিছুই ছিল না। আমার শেষ পুণ্যকল একটা বিরাট অঙ্গগরের মতো উত্তপ্ত নিখাসে আকর্ষণ করে শেষে একদিন ইজ্রের ইজ্রানীকে আমার হুই বাছুর মধ্যে এনে উপস্থিত করে। সেই রাত্রি—সেই স্নানল আকাশের বায়ব-ঘরে প্রমোদের বীণার স্বভায়ে নারীর ক্রন্দন, সতীর নিখাসের ককণ সুর ডুবে গেল—অশ্রুত রইল! সেই আমার স্বর্গবাসের শেষ-প্রমোদ-রজনী, আমার চির বৌবনের উত্তেজনার মদিরা পূর্ণমাত্রায় আমি পান করলম। আর সেই রাত্রিপ্রভাতে ইজ্র-দেবের অভিষাপের সঙ্গে সঙ্গে বায়ো হাছার বঙ্গরের প্রান্তি আর অবসান প্রথম এসে আমাকে আক্রমণ করলে। ইজ্রের উত্তত বস্ত্র থেকে আপনাকে রক্ষা করবার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি গিয়ে বিছুর পরণাপর হলম। তিনি আমাকে একগাছা हरिनামের মালা দিয়ে বল্লেন,—ভূমি নিজের কর্মফলেই স্বর্গে এসেছিলে এবং তারি ফলে আবার পৃথিবীতে চলেছ; हरिनাম কর আবার এখানে তোমার স্থান হবে। স্বর্গ যে কি ভয়ঙ্কর স্থান তা আমার জ্ঞানতে বাকি ছিল না। স্বদর অকুপ্তিতে আমার আর লোভ ছিল না। আমি বিছুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার কাছে এলম। তিনি তাঁর মানসপুত্রদের লেখা থান-কতক সংহিতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, এতে যেমন বিধান লেখা হয়েছে সেই মতো যথাবিধানে পৃথিবীতে গিয়ে ভূমি প্রীরক্ষিত কর, স্বর্গ আবার তোমার করতলে আসবে।

আমি সেখান থেকেও হতাপ হয়ে বেবাধি-বেবের ধারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত নিবেদন করলম। তিনি বল্লেন ভূমি কারো কথা শুনো না, স্বর্গগাতের সহজ উপায় আমার হাতে আছে। এই এক টিপ সিদ্ধি বুঝে ফেলে দাও, তোমাকে আর স্বর্গের কটক পেরিয়ে বেশী দূর যেতে হবে না; আমার দূতেরা খুঁটি ধরে এখানে তোমার কিরিয়ে আনবে। আমি তখন লগ্ন-জননীর পা জড়িয়ে ধল্লম। না আমাকে কৃপা করে িন রঙের তিনটি কপোত দেখিয়ে বল্লেন—পৃথিবীতে এই তিন জন তোমার বহু থাকবে এদের চিনে নিও, তবেই জীবন তোমার শান্তিতে কাটবে, না হলে আবার এই স্বর্গবাস আর এই স্বর্গবাসের লাছনা তোমার অদৃষ্টে ঘটবে নিশ্চয়। আমি বিছুর অপমালা, ব্রহ্মার ঘেরওসংহিতা আর শিবের সিদ্ধির পুটুলি টেনে ফেলে সেই কপোততিনটিকে বুকে জড়িয়ে ধল্লম। একটি নীল, একটি গেকুয়া, একটি সাধা। দেখতে দেখতে লগ্নস্বর্গ রাম-ধনুকের রঙের মতো আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমি এইখানে নেমে এলম। সেই তিনটি কপোতী হচ্ছেন—

অবিন অমনি কস্ক-করে বল্যে উঠলো—বস্ গুরুদ্বী, আর না, গল্পের ভিতর মোরাগিটি ও নীতি-কথা এসে মিশছে, রক্ষে করুন! এই নীলকোট আমি—আপনার বৌবনের ইয়ার—আমিই হাছি সেই নীল কপোত; মাঝে দ্রবণের মতো এই গেকুয়া কপোত আমার বহু,—এ আপনার *দাঁড়ে বসে ছোলা খেলে এবং আপনার

গোলাপজলের কোয়ারার পিচ্ছিকিরিতে এর ভিতরের ও বাইরের বৈরাগ্য পেরে। রক্ত বমন করে স্বর্ণলাভও করে; তবে এখন আপনার পাশে শিতবেশে যে সাদা কপোত দেখা দিয়েছেন ঠিক নিরেই আপনি শান্তিতে থাকুন, আমাদের আর নীতিকথা বলে দরবেশ না।

শান্তি ছোয়ার উপরে আলো পড়লে যেমন হয় মহাপুরুষের চোখগুলো অবিনের এই গুটতার অন্ধ অন্ধ করে মলে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে পাড়িয়ে উঠে কোমর থেকে শাপের মতো বাক। একখানা ছোরা বার করে অবিনের দিকে এগিয়ে চলেন। আমি চাঁৎকার করে অবিনকে সাবধান করতে বাব কিন্তু কথা সরলনা;—সেই ছেগেটা এসে আমার গলা এমন ভাবে ভড়িয়ে ধরেছে, সেই সাদা পাখীটা কট-

পট করে ডানা কাপটে মাথার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অবিন তার হুই ঘুলো-বাগিরে সেই মহাপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেবলি বলছে—গমে নীতিকথা অসহ্য!—তার পর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলো আর লম্বের মাঝে মহাপুরুষ অপ্রদর্শন করেন। আমি চমকে উঠে কাল কাল করে চেয়ে দেখলেম জাহাজের ডেকে রয়ে আছি; অবিন আমার মুখে কেবলি জলের ঝাপটা দিচ্ছে; আমি যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছি। মাথার হাত দিয়ে বেঁধি একটা ভিজে পট লাগানো। এই সময় আমাদের এক উকিল সহবাত্রী অবিনকে প্রণয় করলেন—গাড়িটা যে-মটোরের ধাক্কা উঠে গেল আপনি তার নখরটা নিলেম না কেন? এঁর মাথার যে-রকম চোটে লেগেছে তাতে নালিশ চলতো।

ঐশ্বর্যবানীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউনুকের প্রতি জ্বলনা

(আমি হইতে)

বিধাতা তোমার মেছেন, যেবতা,
 গুল-ভাতি বাহা কপোলে কুটে।
 নিখিল পাপল তব মহিয়ার
 জীতবাস হয়ে চরণে লুটে।
 তোমার লগাটে যে জ্যোতি উজলে
 চন্দ্রা তাহে হয়েছো রান,
 তোমার আশির ক্রুপ হেরিরা
 মদন তাহেছে ধরুর্দীপ।

উপাসনারত বরান তোমার
 দেবতা তাহাতে করিছে বাস,
 তব্ধে বাধিতে তোমার শীর্ষে
 কুচিত কালা কেশের ফাঁস।
 তোমার পিধানে বসন ভূষণে
 তব আশের রশ্মি লাগে,
 তব্ধে লোহিত কুম্বের রশ্মি
 কুটে তাহে যেন ত্রিবিধ-বাগে।

তোমার অধরে মধুর হাসিটি
চাক কোরকের বিকাশ সম,
রাঙা গোলাপের করার মতন
তব পরক্ষেপ রম্যতর ।
তুমি আছ বলি সর্বসংসার
সব গুরুভার বহিতে পারে,
তোমার বিরহে এ ধরঙ্গি বৃষ্টি
অতলে জুবিবে ভূধর-ভারে ।
তুলে ধর মোরে কৃপা কর প্রিয়
কবরবন্ধ করুণা কত,
সকল জড়তা সব বন্ধন
সব ব্যাধাসহ নিরাশা চর,
দীর্ঘ স্বপ্নানে জনম শোষণে
ব্যাকুল শোষণে—অক্ষ দার

অশনি-আহত বৃক্ষের মত
জনম আমার বিগরি দার ।
জনম কতের সিঁধ্য প্রলেপে
জুড়াও আমার জনম জালা
হুলাও বন্ধ—হুলাও কণ্ঠে
তোমার বাহুর বতন-মালা ।
মৃগমৃগ বোর জনম ধরেছে
জনম হরেছে সাহায্য বেন,
খোস-বাগানের পুস্প তোমার
তার মাঝে তুমি বহালে কেন ?
বহাইলে ববি কলসিত জবি—
—কুটুপে ঢাল' ভীবন-ভ্রাণ
চির অনশন শোষণ পুরিষ্ণা
মিটাও বন্ধ জনম-জুখা ।
শ্রীকালিদাস রায় ।

আলোর আলো

সাত

সরমার কথা

নতুন বাড়ীতে গিয়ে নামতেই দেখি,
দরজার কাছে হাদিসুখে মোহনবাবু ঝাড়িয়ে ।
তিনি বাবাকে নমস্কার করে আমাকে
পথ ছেড়ে দিয়ে, একপাশে সরে গেলেন ।
...বাবা আর তিনি গাড়ী থেকে
জিনিষপত্র নামাতে লাগলেন, আমি আশে
আশে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে চুকলাম ।
ছোটখাটো দিবি বাড়ীখানি । উপরে
চারটি, নীচে চারটি ঘর । আমরা আগে
বে বাড়ীখানিতে ছিলুম, সেখানি কিন্তু এর

চেরেও ছোট আয় পুরাণো । অথচ, এর
ভাড়া বেশ টাকা আর তার ছিল কুড়ি ।
একটু স্পান্সিও হলাম । তাই ত, ভাড়ার এত
তকাত হর কি ? আমাদের সঙ্গে মোহন
বাবু নিশ্চয় তাঁর বাড়ীর ভাড়া কম-করে
ধরেছেন ! আমাদের উপর তাঁর এতটা দরদ
কেন ?... ..কে-জানে !

দক্ষিণবুখো ঘরভাণি আমার ভারি
পছন্দ হোল । এর একখানিতে থাকবেন
বাবা, আর-একখানিতে আমি । ভাড়াভাড়িতে
বতটা-পায়লুম, ঘর-ভাণা শুছিরে-গাছিরে
নিলাম ।

আমার ঘরের সাধনেই বারান্দা ।

বারান্দার গিরে দেখলুম, আমাদের বাড়ীর গা-বেঁধেই মোহনবাবুর বাড়ী। তার পিছনে একটি ছোট বাগান, তার মাঝখানে একটি পুকুর, সেটিও ছোট। ঝিরঝিরে হাওয়ার ফুলের তুতুতুরে গন্ধ ভেসে আসছিল,—বেশ ছেড়ে পর্যন্ত এমন মিঠে ফুলের গন্ধ একদিনও পাইনি, এমন তাছাড়া সবুজ রং একদিনও চোখে পড়ে-নি—আজ বেনে প্রাণে একটু শান্তি এল। ফুলের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে আপনাপ্রাণের বেশের ছবি মেলে উঠল :—আমাদের সেই অগোছালো, কিন্তু ফল-ফুলে পাখীর ডাকে ভরা, আমালকোটার বাতাকে ঘেরা, বাতালে চকল সবুজ বাগানখানি; তার একদিকে গন্ধ চরাবার বাগান—সেখানে রোজ দুপুরে বটতলার বসে, তরল রোমে ধোয়া ধূ ধূ মার্ভের পানে তাকিয়ে, রাখালের ছেলে গুবুর কাঁহনীর সঙ্গে বাঁশের বাঁশিতে অলস রাগিণী ধরত; আর এক দিকে সারি সারি কচুঝেঁপ ও স্যাওড়াগাছের পরে, আইরি ক্ষেতের পরে গঙ্গার তীরের মত ধারাটি চরে চরে হাত বুলিয়ে আননা এঁকে বনের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে গেছে!... ..বেশের ভিড়ে মাটির সেই সোঁদা গন্ধটুকু পর্যন্ত আমি ভুলিনি-মো, ভুলতে পারি-নি।

মাপো, এই ধূলোভরা কাফোভরা ধোঁরা-ভরা কলকাতার বেণের ঘর-ঘোর ছেড়ে লোকে যে কি হুখে এসে থাকে, তা লোকেই জানে! কলকাতার নামে লকল-কার বুধ-মিরে বেন লাল পড়ে! আমি কিন্তু কলকাতার পারে গড় করছি—এই

ক-দিনেই গ্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে; বনে হচ্ছে, ছেড়ে যে যা কেঁপে বাঁচি!

বারান্দার পাড়িরে পাড়িরে এমন সব খা-তা নানানখানা ভাবছি, এমন সময় বাবা উপরে এলেন। বললেন, “সরো, কেমন বাড়ী?”

—“হ্যাঁ, দিবা বাড়ী বাবা!”

—“অথচ, তাড়া এত কম!”

—“জাখ বাবা, আমার বোধহয় মোহনবাবু আমাদের কাছ থেকে কম তাড়া নিচ্ছেন।”

—“হ্যাঁ সরো, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মোহন ছেলটি বেশ—না?”

—“হ্যাঁ, তিনি খুব জম্বলোক। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের ঐ-রকম পদে-পদে নষ্ট হওয়াটা ত ভাল নয় বাবা!”

কিন্তু, কেবা মোহন কার কথা! হঠাৎ মোহনবাবুরের বাগানখানি দেখতে পেরে বাবার আনন্দ আর ধরে না! তাড়াতাড়ি বারান্দার ছুটে গিরে বাড় নাড়তে-নাড়তে তারিফ করে বললেন, “কি আশ্চর্য! এই ইন্টার কোর্সের বাগান—গোবরে গোলাপফুল! আঃ, চোখ বেন জড়িয়ে গেল! জাখ সরো, জাখ, কেমন সব ফুল ফুটেছে, কেমন চমৎকার গন্ধ আসছে! সুতরাং—”

বাবার এই “সুতরাং” কখন, কোথায় কোন্ অর্থে বসে, আমার আর তা জানতে বাকি ছিল না। বুঝলুম, এখন তিনি এখানেই অন্তত ঘণ্টাছয়েকের মধ্যে আস্তানা পাড়বেন। কাছেকান্নেই বাবাকে সেখানে একলা বসিরে রেখে আমি পেরদ্বারীর কাছে সেলুম।

সন্ধ্যার পরে কালকন্ধ্য চুকিয়ে আমার ঘরে ঢুকলুম।

আজকে ভারি গুমোট, ঘরে ঢুকে দম বেন আঁটকে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি জানলা-দরজাগুলো খুলে দিলাম। মোহন-বাবুদের বাড়ীর দিকে যে জানলাটা ছিল, সেটা খুলতেই একটা আলোর ঢেউ এসে আমার চোখ-মুখের উপর কাঁপিয়ে পড়ল।

জানলা দিয়ে মোহনবাবুদের বাড়ীর একটি ঘর দেখা গেল। সে ঘরে বিজলীর আলো জ্বলছে। একদিকে চক্-চকে বই-এ-ভরা দুটি আলমারী; তার হুন্ডেই একটি সবুজ বনাত-মোড়া টেবিল। মোহনবাবু সেই টেবিলের সামনে একখানা বইএর উপর একমনে কুঁকে রয়েছেন। বিজলীর আলো তাঁর মুখে পড়তে তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মোহনবাবু স্বভাবটি বেশন নম্র ও শান্ত, তাঁর মুখ-খানিও তেমনি সুস্থি! চাপর চোখ, টানা নাক, মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো।...

মোহনবাবু পড়তে-পড়তে একবার মুখ তুললেন। পাছে দেখে ফেলেন—সেই তরে তাড়াতাড়ি সরে পেলুম।...

মোহনবাবুকে ভাললোক বলে মনে হয়... ...কিন্তু না, পুরুষদের এত-শীঘ্র বোকা তায়। জীবনে বেশী পুরুষের সংস্রবে আছি-নি বটে, কিন্তু বাঘের ভাল করে চিনতে পেরেছি, তাদের ধানব বলতে পারি—ধেবতা নয়!

আমার স্বামী,—বাইরে-থেকে দেখলে তাঁর ভিতরে কেউ কোন মূর্ত্ত বায়

করতে পারত না; তিনি সুস্থী, বিদ্বান, ভাল ঘরে তাঁর জন্ম; কিন্তু তাঁর মনের ভিতরটা! বলতে নেই—আজ তিনি পরলোক, কিন্তু এখনো তাঁকে ডাবলে প্রাণ আমার আঁতকে ওঠে! রমণীর পক্ষে বানীনন্দা মহাপাপ—কিন্তু অভ্যাচারকে যে অভ্যাগীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে-না, কবিতা তাদের জন্তে কি ব্যবস্থা করে গেছেন? এই-যে আমার কপালে স্বামীর নির্দয় পদচিহ্ন চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, একত কি নারীর সৌরভের নিশানা? একত ক্ষতে হাত দিয়ে কি আমাকে বলতে হবে, 'স্বামী, তোমার এ স্বতিচিহ্নকে আমি পূজা করি!'—এ স্মৃতি কি পবিত্র?

... ...তোমার রাতে তাঁর আশার পথ-চেয়ে ভেগে থাকতুম। কিন্তু তাঁর এলমেল টুলমলে পদশব্দ শুনলেই আমার বুকাটা গুড়-গুড় করে উঠত! হুগার পাঁচ-ছ দিন তিনি ত বাইরে-বাইরেই রাত কাটাতেন; যেদিন অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরতেন, সেদিনও তাঁকে সহজ মাহুকের মত আমার গ্রোণের কাছটিতে পেতুম না। স্বপ্ন দেখে বাড়ীতে এসে অকারণে কোনদিন আমার পাশ দিতেন, কোন দিন চুলের-মুঠি ধরে মারতেন। কোন দিন বা এসেই বেছাঁস হয়ে পড়তেন;—সারারাত শিররে বসে আমি তাঁকে পাখার বাতাস করতুম, মাথার জলের কাপটা দিতুম; আর নিজের মনের ভিতরে গুমুরে-গুমুরে কাঁদতুম।

এমনি করে স্বপ্নরবাড়ীতে আমার দিন কাটিছিল।

ছেলেবেলার 'স্বামী-মুখ' বলে যে কথাটি

ওনতুম, যার জন্তে রোজ সকালে মাটির শিবের মাথায় বেলপাতা দিয়ে গম্বাঝল চালতুম, এই কি সেই 'স্বামীমুখ' ?—
পাড়ার সমবয়সীরা এখন আমাকে 'স্বামীর কথা' শিখালা করত, তখন মুখ কুটে আমি তাঁর নিন্দা করতে পারতুম না ; তাদের 'স্বামীর কথা' শিখালা করলেও তারা বোধ হয় প্রাণের কথা ধুলে বলত না ; কারণ, তাদের কাকুর কাকুর মুখ দেখেই বুকতুম যে, পতিনিন্দা করে তারাও আপনাদের সতীত্ব-গৌরব খর্ব্ব করতে চায় না। বাঙ্গলা দেশের চির-সহিষ্ণু সতীরা শত্রুকে পথে পথে মেনে চলে কিনা, তাই ত তারা এমন অটল মৌনব্রত গ্রহণ করেছে ! আমাদের বলা হয় 'অবলা'—কিন্তু আমরা কি অবলা ? পুরুষের মুখ চেয়ে যে রমণীরা রূপের বিদ্রোহকে এমন করে দমন করতে পারে, তারা কি অবলা ?

কিন্তু আ আমার পোড়কপাল, এ 'মৌনব্রত' আমার ধাতে ত সইল না ! শাস্ত্রের নিষেধ, ধর্মের শাসন, মরকের ভয়, এ সবই আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে—আমি যে পাশিষ্ঠা, আমি যে ব্রত ভঙ্গ করেছি !... ..সে রাত আমি কখনো ভুলব না। সেদিনও অনেক রাতে তিনি মধু খেয়ে এগেছিলেন। ঘরে ঢুকেই চুলের বুটী ধরে তিনি আমাকে বিছানা থেকে টেনে নামালেন—ঘুচ্ছিলুম, এই আমার অপরাধ ! চুল ধরে টানতে আমি 'উহ' বলে কঁপে উঠলুম ; আমার কান্ড শুনে তাঁর আরো রাগ 'হোল'। বললেন, "কী, আবার ছিঁচকান্না ?"—বলেই তিনি আমার পেটে জোরে এক লাথি

মারলেন। হু-ধাতে পেট চেপে যাতনাত্তরে আমি ভূঁয়ে বসে পড়লুম।

তিনি বললেন, "ওঠ ! আলমারি থেকে একটা গেলাস বার করে দে !"

আনি না, সেদিন আমার মন কেন বঁকে গাঁড়াল ! একালের নভেলের আদর্শ সতীর মত স্বামীর পারের ধূলো আমি সেদিন মাথা পেতে নিতে পারলুম না ! গোঁ-ধরে স্পষ্ট জবাব দিলুম, "উঠব না !"

তিনি গর্জে বললেন, "কী ! উঠবি-নে ?"

—“না, কি করতে পার, কর !”—সে দিন যে মরতে অত ভরসা আমার কি-করে হয়েছিল, আজও তা ভালরকমে বৃষ্টি-নি।

আবার কথার রেগে তিনি পাগলের মত হয়ে উঠলেন। “তবে রে”—বলে খুব কুৎসিত ভাষার আহার খাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে তিনি ফের আমাকে লাথি মারলেন।

সে নির্ভর পদাবত আমার প্রাণের মধ্যে সেই হুগু নারীত্বকে জাগিয়ে তুললে, যে নারীত্ব অন্তর অভ্যাচারকে স্তব্ধ হয়ে সহ করতে পারে না ! স্বামী আবার পা তুললেন,—কিন্তু সে পা আমাকে স্পর্শ করার আগেই আমি বিদ্রোহের মত উঠে গাঁড়ালুম ! তারপর আঙুলিছঁ কিছু না ভেবেই, টেবিলের উপর থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে বললুম, “ফের যদি তুমি আমার গায়ে হাত তোল, তবে এই আলো দিয়ে—” বলেই রাগে কাঁপতে-কাঁপতে আমি সেই কাঁচের বড় 'ল্যাম্পটা' মাথার উপর তুললুম।

তিনি ভয়ে-ভয়ে আমার পানে অবাক হয়ে

তাকাতো তাকাতো এক-পা এক-পা করে
পিছন হটে বর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেইভাবে সেইখানে অনেকক্ষণ আছরের
মত গাড়িয়ে রইলুম।... ক্রমেই আমার
সর্কাস অসাড় হয়ে এল। ল্যাম্পটা হাত
থেকে খসে মাটির উপর পড়ে স্ববন্ধনিয়ে
চুম্বার হয়ে গেল।

খাটের ধারে ছুটে গিয়ে বালিসে মুখ
ভাঁড় কঁধতে লাগলুম—একদিন সেই
ঘরে সেই বিছানাতেই গুয়ে, হুলস্থলার
ফুলের স্বপনে আমি বিভোর হয়ে
গিয়েছিলাম।

সে ক্রমের রাত আমার কঁধতে কঁধতে
পুইয়ে গেল। স্বপ্নবাড়ীতে সেই আমার
শেষ রাত, স্বামী র বিছানার গুয়ে সেই
আমার শেষ কারা!

পরদিন স্বামীর হুকুমে আমি বাপের
বাড়ী কিয়ে এলুম। বাবা আমাকে একটিও
কটু কথা বললেন না, বরং আদর করে
কোলে টেনে নিলেন। সমস্ত গুনে বেহুড়ের
আমার মাথার একখানি হাত রেখে বললেন,
“বেশ করেছে মা! পুরুষ যদি সবল বলে
দুর্বল নারীর উপর অত্যাচার করে, নারী
তাহলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে না কেন?
বে পূজার অযোগ্য, তাকে পূজা করলে
মহুঘাঘের মর্গ্যাদা থাকবে না।”

স্বামীকে আর-কখনো দেখি-নি, আর-
কখনো দেখবও না। স্বামী-মহুঘটির কথা
ভাবলে এখনো মনে ভরের স্মৃতি ছাড়া
আর কিছু আসে না* বটে, কিন্তু তবু,
তবু... ...স্বামী-নামটি কি মিটি!...

এখন মনে হয়, আমার বিবাহের জীবন

একটি অনেক দিন আগে-দেখা স্বপ্নের নতুন
আবছায়া। এই এতবড় পৃথিবীটা, এই
বিচিত্র সংসার, এই ‘আশা-আকাঙ্ক্ষার
চেউ’—এ সমস্তই আমার জীবনে বার্ষ হয়ে
গেছে, আমি তা মনে করতেও পারি-না
—মনে করলে বাঁচব কেনন করে? থেকে-
থেকে আমি ভাবি, অতীতের দ্বন্দ্বপ্র নিয়ে
বর্তমান যেখানে ভবিষ্যতের পলকনে দাঁড়াব,
আমার মস্তে সেখানে নবজীবনের আনন্দ-
সায়র নতুন প্রত্যাতের সর্বোৎসাহে উথলে
উথলে উঠছে!

আট

মোহনের কথা

সুসারিবাবু আমার বাগান দেখে ভার
খুশী হয়েছেন।

বাড়ীর পিছনদিকে ঘানিকটা বোলা ঘনি
বুনো ঘাস আর বিছুটির অঙ্গলে ভরে অমনি-
অমনি পড়ে নষ্ট হচ্ছিল; মাঝখানে বে
পুরাণো পান-ভরুটি পুকুরটা ছিল, অব্যবহারে
তারও এমনি হাল হয়েছিল যে, দুর্গন্ধে তার
ত্রিসীমানার তিষ্ঠার, কার সাধ্য!

অমিটা পরিষ্কার আর পুকুরটার
সংস্কার করে আমি এই বাগানখানি মনের
মত করে গড়েছি। ভাল ডাল স্বামী হুল-
গাছ, ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়, পুরাণো গ্রীক
আর্টের নকল-মূর্তি প্রভৃতির সঙ্গে আমার
খরচ চর-নি বড় কম। কিন্তু খরচ করতে
দরম করি-নি বলেই আমার এ সাধের
বাগানখানি ছোট হলেও ঐ-হাড়ে অনেক
নামজাদা প্রকাণ্ড বাগানের তুলনায় নেহাৎ
খাটো হবে না। আর, হুখু খরচ

করলেই ত হর না—সেই সঙ্গে কচিও চাই। এই উদ্ভান-রচনা নিয়ে আমার আর হরেনের অনেক সময় করনার-অরনার কেটে গেছে; কোথার কোনটি রাখলে যেখানে মানান-সৈ বা বেখান্না হয়, তা-নিয়ে ভজনে অনেক মাথা খাটিয়েছি, অনেক তর্ক করেছি।

ঘরের ভিনিষকে ভাল বললে মনে আনন্দ হয়। মুরারিবাবুর মুখে আমার বাগানের স্খ্যাতি শুনে আমি পুলকিত হয়ে বললাম, “আপনি ইচ্ছা করলে, যখন-খুসী আমার বাগানে আসতে পারেন। আপনার বাড়ী থেকে আমার বাগানে আসবার পথও আছে, সেটা আমি খুলিয়ে দেব এখন।”

মুরারিবাবু বাগানের মত আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, “দেবেন? সত্যি?”

—“কেন দেব না? এ বাগান আপনারই মনে করবেন—কুল তুলতে ইচ্ছে হয় কুল তুলবেন—কোন সঙ্কোচ করবেন না।”

—“কি আশ্চর্য! কুল তুললে আপনি চটে যাবেন না?”

—“কেন? বাগানে এত কুল কোটে, আপনি দু-হাত ভরে নিলেও আমার ক্ষতি হবে না।”

আমার কথা শুনে মুরারিবাবুর কুর্জি দেখে কে! এই সন্ধানন্দ খোলা-প্রাণ হৃদয়ের ভাবে-ভোলা মনটি যতই দেখছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। যে বরষে লোকে স্বার্থভরা সংসারের হাড়হন্দ বুকে নেয়, পদেপদে ঠেক দুঃখ-শোকে ভুগে সাবধানী ও কঠিন হয়ে ওঠে, সে বরষেও গানের প্রাণ এমন দিগুর মতন সাদা থাকে, তারাই ত স্বার্থ খাঁটি মানুষ!

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন বাগানের দিক থেকে কার তৈরবীতে-বাঁধা বেহাগার তবল রাগিণী, ভোরের আলোর সঙ্গে আমার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। বৃক্সুম, এ আর কাকর নয়, মুরারিবাবুর বেহালা! গুয়ে-গুয়ে একমনে অনেকক্ষণ ধরে শুনলুম, হৃয়ের গীতায় হৃয়ের জোয়ারে প্রাণ যেন কানার-কানার ভরে উঠল!

স্বাভাভাগ করে হাত-মুখ ধুয়ে যখন বাগানের ভিতরে গেলুম, মুরারিবাবুর বেহালা তখনো :তালে তালে বাজছে। পুঙ্করের ধারে মার্কেলের বেদীতে বেহালাখানা ঝাঁকিয়ে ধরে রক্ত আগুনপিড়ি হয়ে বসে আছেন, তাঁর কর্পূরের মত সাধা, দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে ডেউ খেলিয়ে ধরধরিয়ে উঠছে, গুঁর হৃয়ে-বিতোর মুখখানি বুকের পরে হৃয়ে পড়েছে,—তিনি যেন তখন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীকে ভুলে গেছেন। যতক্ষণ না বাজনা থামল, আমি তফাতে ঝাড়িয়ে প্রভাতী রাগিণীর সেই বিচিত্র উল্লাস প্রাণ-ভরে কাণ-ভরে পান করতে লাগলুম।

একটি নিঃশ্বাস কেলে মুরারিবাবু বাজনা থামালেন। আমি এগিরে গিরে তাঁকে নমস্কার করলুম।

মুরারিবাবু শিভমুখে বললেন, “আমার বাজনার আপনি বিরক্ত হন-নি ত?”

—“বিরক্ত! আপনার বাজনা আমার আনন্দের ভোরবেলাটিকে সার্থক করে তুলেছে।”

—“চ্যুত কোন কাজ ছিল না, তাই

কি আর করি, বেহালাখানা কাঁধে করে
বাঁহিরে বেরিয়ে পড়েছি।”—বলে, মুরারিবা-
বেহালায় তর্রীগুলির উপরে একবার
আতুল চালিয়ে মিলেন,—তারার একসঙ্গে
বিচিত্র কোমল রিজিনীতে আর্কনাম করে
উঠল,—সে বেন হরের বিদ্রাং।

আমি বললুম, “মুরারিবা-ব, আপনার
কাছে আমার একটি আর্জি আছে।”

মুরারিবা-ব বাস্তব হরে বললেন, “কি
আশ্চর্য! আমার কাছে আপনার আর্জি?
বলুন, বলুন।”

—“আপনি যদি কিছু মনে না করেন,
তাহলে বলতে পারি।”

—“কি আশ্চর্য! বলুন, বলুন।”

—“আমি আপনার কাছে এক্সাজ শিখতে
চাই, এতে আপনার কোন কষ্ট হবে-না ত?”

মুরারিবা-ব ত হো-হো করে হেসেই
আতুল! অনেক কষ্টে হাসি খামিরে তিনি
বললেন, “রকে পাই! এই আপনার
আর্জি? এতে আবার কষ্ট—আঃ!—
এতে আবার কষ্ট কি, এ ত আনন্দের
কথা।”

এমন সময় হরেন এসে হাজির।

মুরারিবা-ব খুব খুসী হয়ে বলে উঠলেন,
“আরে আহ্নন, আহ্নন হরেনবা-ব!”

হরেন ধূপ করে হাত-পা ছড়িয়ে
খাসের উপর বসে পড়ল। তারপর
পাঞ্জাবীর বোতামগুলো খুলতে খুলতে
জিহ্বাসা করলে, “আনন্দের কথা কি হজিল
মুরারিবা-ব? সে আনন্দে কি আমিও ভাগ
বলতে পারব না?”

মুরারিবা-ব উৎসাহিত হয়ে বললেন,

“অবস্ত, অবস্ত! আনন্দের কথাটা, কি
জানেন, আমাদের মোহনবা-ব সাধ হয়েছে
উনি এক্সাজ শিখবেন। আপনিও কি
শিখতে চান?”

হরেন চুই চোখ বিস্ফারিত করে সম্বরে
বলে উঠল, “ওরে বাস! রে, সন্নীত-চর্চ্চা! এ
জন্মে ত নই, আগতে জন্মে পারি ত দ্যাখা
যাবে।”

মুরারিবা-ব বেন আকাশ থেকে পড়লেন!
মাহুব যে সন্নীত-চর্চ্চার তর পেতে পারে,
এটা বেন তাঁর ধারণার অতীত ছিল!
তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, “কি আশ্চর্য
সন্নীতের মত বিদ্যা কি আর আছে?
হুতরাং—”

হরেন প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়ে
বললে, “এর মধ্যে হুতরাং হুতরাং কিছু নেই
মুরারিবা-ব! ছেলেবেলার একবার আমার
ওস্তাদ রেখে পান শেষবার চুবুঁজি হয়েছিল।
কিন্তু কাঁড়া একবৎসর ধরে সা-রে-গা-না সেখেও
যখন বড়ল রেখাব ও গান্ধার প্রকৃতির
মধ্যে তকাং কোথায় সেটা ধরতে পারলুম
না, আমার ওস্তাদজী তখন মাইনে নিয়েও
আর আনাকে গান শেখাতে রাগি হলেন
না। কাজে-কাজেই দেইবিন থেকে আমি
পান-বাছনা গুনতে ভালবাসি, কিন্তু
গাইতে বা বাজাতে চাই না। আমি তিনি
থেকে চাই, কির তিনি পুতুল হোতে চাই
না।”

আমি বললুম, “আপনি হরেনকে এখনো
চেনেন-নি মুরারিবা-ব, ও মহা বড়মার্কো!
ও চায় গানের জোরে বীণাপানিকে বন্দীভূত
করতে! ধরুন, আপনি শুকে বেহালায়

স্বয়ং বাধতে দিলেন। কিন্তু ও রকম স্বয়ং বাধতে যেন বেহালায় সমস্ত কাণ্ডগুলো এক সঙ্গে চোপে ধরে চড়চড় করে এমনি ঝোচড় লাগিয়ে দেবে যে, সে বেহালায় মধ্যে আর কোন পদার্থ থাকবে না!”

—“মোহন আমাকে বর্ধারূপে চিনেছে সুস্মারিবাবু, সুতরাং ওর কথার প্রতিবাদ করতে চাইনা। অক্ষয় ঔপন্যাসিক যেমন ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়ায়, গায়ক হোতে না পেরে আমিও তেমনি পালোয়ান হয়ে পড়েছি! বুকেছেন সুস্মারিবাবু, ও গান-বাজনা আমার কৰ্ম নয়। মোহন গাইতে জানে, বাজনাটাও যদি আপনার দৌলতে নিবে নিতে পারে, শিখুক।”

—“বটে, বটে! মোহনবাবু গাইতে জানেন?—সুতরাং—” সুস্মারিবাবু মহা-উৎসাহে আমার দিকে ফিরে একেবারে বেহালা বাগিয়ে বসলেন।

আমি অনেক আপত্তি করলুম, কিন্তু সে সব আপত্তি বৃদ্ধের প্রবল উৎসাহের মুখে খড়-কুটোর মত উড়ে গেল! অগত্যা আমি বাধ্য হয়ে একটি গান ধরলুম; সুস্মারিবাবু সঙ্গে সঙ্গে ঢলে ঢলে বাজাতে লাগলেন।

গান শেষ হলে, সুস্মারিবাবু উজ্জলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, “কি আশ্চর্য! এমন সুন্দর গান থেকে আশনি আমাকে বঞ্চিত রাখছিলেন? যা সরোকে গিয়ে বসতে হবে ত, সে যে গান শুনেতে বড় ভালবাসে!”

এই সুরমিক বৃদ্ধকে নিয়ে আজ প্রভাতটি যে কোথা দিয়ে চমৎকার কেটে গেল, তা বুকেই পারলুম না।

সে পূর্ণিমার রাত।

ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিলুম, হাসনা-হানার গন্ধ মেখে দখিনা বাতাস এসে লাগা ঘর মাং করে দিলে।

চোরখানা জানলার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে যেন পড়লুম,—এমন সুন্দর টাখনী রাত! এ রাত্রি উপভোগ করবার—ঘুমিয়ে কাটাবার নয়! জ্যোৎস্না এখন নিঃশব্দ পদসঙ্কারে শিরেরে কাছটিতে এসে সত্য-স্বপনের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তাকে খানিকটা না দেখে যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, সে হয় অজ্ঞ নয় গওবুধ!

আমার নিত্রিবিলি বাগানখানিকে দেখেছে, ঠিক যেন ছবির মত—দখিনার টুলমলে পাছের পাতার কলমলে আলো, তলার ঘুমন্ত ছায়া; পুকুরের ধ্বংসের জলে, মার্কেলের ধ্বংসে ঘাটের কোলে-কোলে ডেউয়ের আশা-বাওয়া আর ছল্‌ছলানি কাণাকাণির সঙ্গে আলো-ছায়ার ছিনিমিনি খেলা চলেছে!

ঘাসে-ভরা একটুখানি খোলা অমির মাঝখানে তেনাসের একটি মর্মর প্রতিমা বসিয়ে দিয়েছি। এ তেনাস হচ্ছেন গ্রীকধর্মের রতিময়ী, আলো-আঁধারে আজকে রাতে তাঁর শুভ্র মর্মর-ঐষ্ট্রুকুও যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে!

এ পাষাণি প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে, ও কে? ভাল করে দ্যাখবার জন্যে সামনে আরো কুঁকে পড়লুম,—এ যে রমণী! সুস্মারিবাবুর মেয়ে, সরমা!

সরমার মুখের একদিকে তাঁদের আলো এসে পড়েছে, তার মাথার চুলগুলি খোঁপার বীধন থেকে ছাড়া গেছে একে-বঁকে-বঁকে কক-

পিঠ-কাঁধের উপর এলিরে পড়েছে, তার নরম দেহখানিকে জড়িয়ে কাপড়খানি তাঁকে-তাঁকে ছড়িয়ে পারের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। হাতে তার আঁচল, আঁচলে একরাশ ফুল—গুটিকত ফুল আঁচল উপরে মাটিতে ঝরে পড়েছে। হঠাৎ বেথলে ঘনে হর, এই কোৎখা-প্রোচ্ছল শুক রাত্রে যেন কঠিন পাখাণ ভেঁষ করে তেনাসের পেলব আত্মা নৃষ্টি ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ; —আর তারই চুবানি নখর চরণের মধুর স্পর্শ পেয়ে পুলকাকিত ধরনী আজ ফুলে ফুলে মুগ্ধরিত হয়ে উঠেছে !

সরমা তেনাসের নৃষ্টিটিকে অবাক মুখে বেথতে লাগল ; তারপর সেই নৃষ্টিটির গায়ে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।... দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে আঁচল থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে একবার সেনাকের কাছে ধরলে... তারপর, তার সেই চুবানিস্পর্শ ওষ্ঠাধর মত করে ফুলের পাণ্ডুর উপর একটি আধরের চুবন ধান করলে !... ফুলটি তার হাত থেকে ঝলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল—সেই সোহাগ-মাথা এক চুবনেই কি তার পুশ-জীবনের সার্পক অবসান ?... আরও কিছুক্ষণ সেই-খানে দাঁড়িয়ে থেকে, সরমা আস্তে আস্তে নিজের বাড়ীর পথে চলে গেল,—বেথান দিয়ে গেল সেখানটি আলো করে, বেথান থেকে গেল সেখানটি আঁধার করে ! তাকে হারিয়ে বাগানভরা কোৎসার দীপ্তি যেন পরিদ্রাণ হয়ে পড়ল।

সে রাতে আনার ধরখানাকে মনে হোল যেন, বিজন বন। আনার একাকী

এমন গভীর ভাবে আর কোনদিন ত অনুভব করিনি !

উপন্যাসে 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' হোতে দেখলে-সমালোচকরা ষৎপরোনাস্তি চমকে ওঠেন। আমার বিশ্বাস, এই সমালোচকদের প্রথম দৃষ্টি এমন একটা-কিছুর উপর পড়েছিল, যা অঙ্গকাল বেথলেই চিরকাল চক্ষু বুঁজে থাকতে ইচ্ছে করে। সমালোচকরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখতে পাবেন, তার পথে পথে ছত্রে ছত্রে নায়ক-নারিকার প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়ে চিন্তাধ্রুপের অন্তর্গত কাহিনী !

প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে প্রেম না হোক, লোকে মুগ্ধ আর লুগ্ন হয়ে ওঠে বৈকি ! সেই মোহ, সেই লোভই হচ্ছে প্রেমের প্রথম ধাপ এবং এই প্রথম ধাপ বে না উঠতে পারে প্রেম হচ্ছে তার কাছে, বামনের চাঁদ !

সরমা প্রথম দিন থেকেই আমাকে আকর্ষণ করছে, অথচ আমার জীবন-পথে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত অতিথি ! আগে থাকে ভেবেছিলাম মূলত, এখন তাকে চুলভ জেনেও আমার এ ব্যাধা মনকে ত সোজা করতে পারছি না ; এ মন-এখন জাপা ঘোড়ার মতন, এর বন্ধাকে আঁধা করা এখন আমার সাধের বাইরে !... সরমা একদিনেই আমার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে।

কিন্তু, জানিনা এ পরিবর্তনের পরিণাম কোথায় ? আগুণ ত ডাকে না, পোকা-মাকড় যে বেচে এলে গুড়ে মরে। পতঙ্গ আসে,

রথ কুঠে' সহ চার—কিন্তু অগ্নি বে নির্জিকার! তার জপের তাপে পিরানীর বৃক পুড়ে থাক্ হরে ধার—আগুণের শিখা একটু কাঁপে, কিন্তু নেবে না।

সরমা কি আগুণ, আমি কি পতঙ্গ? না, সে হবে নদী আর আমি হব, সাগর? সেইখানে বসে-বসে অনেক ভাবলুম, কিন্তু সে ভাবনা! প্রৌপদীর সাজীর মত—তার মারজ্ঞ আছে, প্রাণ নাই; যত নাড়াচাড়া করি, তত বেড়ে যায়।

বোনের মন্তব্য! হচ্ছে বসন্তের ফুলের মতন; নিদাঘ এলেই থর রোদের কাঁখে সে বেরঙা হয়ে নেতিয়ে পড়ে। আমার এই মাধকতাও কি স্তেমনি ক্লিক? একি হুহু চোখের নেলা,—প্রাণের তৃষা নর? ...

ক্রমে মাথাটা ভারি হয়ে উঠল, কাতরভাবে বিছানার গিরে আশ্রয় নিলুম। ...

বুনিদে-বুনিদে স্বপ্নেও দেখলুম, সরমাকে।

নর

সুরাস্রিবাবুর কথা

কি আশ্চর্য! এই বোহন-হেলোটিকে ভাল করে হতই দেখি, ততই অবাক হয়ে থাকি; এর মধ্যে সত্যই পর্যাপ্ত আছে।

বোহনের ইচ্ছা, আমি তাকে এলাজ শিখাই, আর তার কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু শুকনাক্ষিপা নি।

আমি আপত্তি করতে সে বললে, "সুরাস্রিবাবু, এতে আপনাত লজ্জিত হবার কিছু ত নেই! আপনি মিছিমিছি আমার কানে কেন সময় নষ্ট করবেন?"

আমার কোন আপত্তি টিকল না। দেখটা এই ঠিক হোল যে, আমি তার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেব-না বটে, তবে যে বাড়ীতে আছি, সে বাড়ীর ভাড়াও তাকে একশরসা দেব না। বহিষ্ঠ হাতে-করে টাকা। নেবার চকুলজ্জা থেকে নিগতি পেলুম, তবুও হরে-হরে সেই হাঁটু-জলই রয়ে গেল! থাক্, এ বন্দোবস্তটা তবু নন্দের ভাল!

বোহন আর-একটা রুকা করে নিলে, এখন থেকে সে যখন আমার শিখাই হোল, তখন আমার পক্ষে তাকে 'বাবু' বা 'আপনি' বলে ডাকাটা অসম্ভব হবে। সুতরাং—

আজকাল দিনগুলি কাটছে বেশ। রোজ বিকালে হরেনবাবু এসে যখন আমার জাঁকিয়ে বসেন, তখন সময় বেন হাওয়ার আগে কোথা গিয়ে উড়ে যায়। হরেনবাবু ঠিক একটা মূর্তিমন্ত আনন্দের ফড়ির মতন; বেখান গিরে বান, হুং-তাপ বেন তাঁর হাশির তোড়ে শুক পাতার মত উড়ে যায়!

হরেনবাবুকেও আমার খুব মনে ধরেছে। এই বুবাটির ভিতরে প্রাণ আছে, মজ্জাও আছে। বাইরের চেহারার মত এঁর ভিতরের মনটাও মজ্জা ডাগর। প্রথম দিনেই ইনি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর সেদিনকার মর্ম্মশর্না কথাগুলি আজ পর্যন্তও তুলতে পারি-নি। বিধবার হুং-নিরে বাস্তবিকই তিনি অনেক ভেবেছেন।

কিন্তু বিবাহ দিনেই যে হুং-হুং, তাও ত নয়! সখা হোক, বিধবা হোক, কু-বিবাহ, কি ভয়ানক! তার চেয়ে চির-

কুমারী থাকা ভাল—তার চেয়ে চির-বিধবা থাকাও ভাল! সরদারও ত বিবাহ হয়েছিল, নথবা থাকলে আজ হয়ত সে বেঁচেই থাকত না! তাই মারে মারে মনে হয়, এ বৈধবা ত তার পক্ষে শাপে বর!

মেনে আজকাল বিধবা-বিবাহ নিয়ে নতুন করে আন্দোলন ভোগে উঠেছে। আসল যুক্তি-তর্কের দিক থেকে মহুয্যেবের দিক থেকে ঘাটাই করে দেখলে বলতে হয় যে, প্রাচীন ও নবীনের এই বিরোধে নবীনেজাই জয়লাভ করেছেন। তবে যে বিধবা-বিবাহ বেশবাপী হতে পারছে না, এর আশ্রিত কারণ হচ্ছে, অনভ্যাগ। শত শত বৎসর ধরে আমরা যে আদর্শ নকল করতে অভ্যস্ত হয়েছি, দু-দশ বৎসরের আন্দোলনে সে অভ্যাস ছাড়তে পারা শক্ত কথা। মাহুয্যেব যে অভ্যাসের গোলায়! শরীরের অনিষ্ট হচ্ছে মেনেও, মরণের ভয় আছে মেনেও নেশাখোর যেমন নেশা ছাড়তে পারে না, এও তেমনি। ব্যক্তি-বিশেষের এই দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষেও খাটে; কেননা সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি বলে ব্যক্তির সাধারণ গুণ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে।

হরেনবাবুর সঙ্গে সেদিন এই কথাই হচ্ছিল।

হরেনবাবু বললেন, “এর মধ্যে আরো-একটা কথা আছে সুয়ারিবাবু! বিধবাদের দ্বারা অভিভাবক, উচ্চ আদর্শের মোহে তাঁরা অন্ধ। সংসারের লোভ, ভোগ ও পানে অটল থেকে বিধবায়া ত্রুটিচর্চা ব্রত লাগল করবেন, এ-বড় উচ্চ আদর্শ।”

আমি বলি যারা বেচ্ছার ভেতনে-গুনে আদর্শ-জীবন লাভ করে’ নারীকে দৈবীবে তুলতে পারেন, তাঁরা দেবী হোন—সে ত ভাল কথা। কিন্তু অনেক বিধবাই,—যে বয়সে তাঁদের ভোগের স্পৃহা যেটে-নি, যখন তাঁরা জীবনকে ভাল করে’ চেয়ে-নি—তখনই স্বামীকে হারিয়েছেন। নারীকে লাভ করবার আগে যে সব অভ্যাস অভ্যাগা বালিকা স্বামীহারা হয়, তাদের ঘাড় মাকালফলের সুড়ীর মত ফাঁকা ত্রুটিচর্চায় বোকা চাপিয়ে কী লাভ? ত্রুটিচর্চায় গুরুত্ব তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে, না বুকেই গ্রহণ করে। কলে তাদের দেবীত্ব অর্জন করা ত হয়ই না, উঠে অনেক সময় নারীত্বও বর্জন করতে হয়। সমাজের বাইরে ঐ যে অগণ্য পতিতা পড়ে রয়েছে, খোঁজ করলে জানবেন, ওদের পতনের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিচারের প্রবৃত্তি নয়—হয় স্বামীর অত্যাচার, নয় ত বৈধব্যের বয়স।”

কথাগুলি খুব খাঁটি। তর্ক করে’ এ সভাকে মুখে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি বটে, কিন্তু মনে-মনে ত অস্বীকার করতে পারি না। আমি চূপ করে ভাবতে লাগলুম।

হরেনবাবু এই বলে তাঁর কথা শেষ করলেন, “জানবেন, আদর্শ জিনিষটা বড় বিষয়। মাহুয্যেব অপূর্ণতার সূচাধার হচ্ছে, বস্ত-সব কর্তিত আদর্শ। কারণ, যা সাধারণ জা-নিরে ত আদর্শ পড়া হয় না, আদর্শ তখন উচ্চ হয় যখন সে অসাধারণ। উচ্চ আদর্শ হচ্ছে হিমালয়ের ‘পৌরীশকরে’র

মতি, তকাত থেকে দেখতে লাগে ভাল—কিন্তু তার কাছে বেঁগা সামান্য মানুষের সাধ্যাতীত। আর দুনিয়ার সাড়ে তিন ভাগ মানুষই যখন ‘সামান্তের’ ধলে, তখন থাকি অর্দ্ধভাগ ‘অসামান্য’ লোকের মুখ চেয়ে ত আর-সকলকে জ্বাই করা চলে না!”

কি আশ্চর্য্য! এই গুরুত্ব বুঝার জ্ঞান ও কথা কইবার চমৎকার তন্ত্রী যে অনেক পঙ্কজেশ মহামহোপাধ্যায়কে লজ্জা দিতে পারে! এ-সব সত্য ত তাঁদের মাথায় চোকে না! তাঁরা শাস্ত্রের বাঁধা বুলি ছাড়া এক পাও নড়েন না, অথচ তাঁদের বেশেই প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতরা বলে গেছেন, ‘যুক্তির সাহায্য না নিয়ে কেবল শাস্ত্রের বিধান-অনুসারে কখনো কর্তব্য-নির্ণয় করবে না,—তাতে ধর্মান্ধ হব’।

হরেনবাবু বৈদিক মিরে কথাটা ভুলেছেন, সেদিক থেকে আমার কিছুই আপত্তি করবার ছিল না। কিন্তু আমার মনে খটকা লেগে আছে অন্য কারণে। আমি বললুম, “হরেনবাবু, বিবাহ হলেই যে বিধবার জীবন সফল হয়ে উঠবে, তাও ত নয়! সন্ন্যাস বিবাহের কি কল হইছিল, গুনেছেন ত? হুতরাং—”

—“গুনেছি। কিন্তু আপনি গোড়াতেই একটা ভুল করছেন। অমঙ্গলই বিবাহের স্বাভাবিক পরিণাম নয়—সংসারে মঙ্গল আনাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। আপনি যদি ভাল করে বেঁজ-খবর নিয়ে আপনার মেরের বিবাহ দিচ্ছেন, তাহলে হয়ত তিনি অমন সুচারু স্বামীর হাতে পড়বেন না।”

—“প্রথম বারে যা পারি-নি, এবারেও হয়ত তা পারব-না। তাই ইচ্ছে থাকলেও সন্ন্যাস আবার বিয়ে দিতে আমি ভয় পাই।”

—“তবু পেনে ত লেবে-না সুরারিবাবু! আপনার কর্তব্য আপনি করে যান। মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে—ভবিষ্যৎ দেখে নয়; ভবিষ্যৎকে দেখা গেলে বিশ্বের ধারা বদলে যেত। আপনি ভবিষ্যৎ চোখে দেখতে না গেলেও ভেবে দেখতে ত পারেন!”

—“ভবিষ্যৎ ভেবে যা দেখছি হরেনবাবু, তাতে আমার হাত-পা পেটের ভেতরে সঁদিয়ে যাচ্ছে। আমি যদি আজ চোখ বুঁজি, তাহলে সন্ন্যাস কাল কোথায় থাকবে? সে বিধবা, সে সংসারকে চেনে না, সে একাকী; তার বয়স অল্প—আর এই পৃথিবী প্রলোভনে ভরা! ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার!”

—“এ-কেন্দ্রে আপনার থেকেই আপনি কি ব্রহ্মচর্য্য গ্রন্থ-পালন করতে চান?”

—“কি আশ্চর্য্য! সে যে অসম্ভব!”

—“তবে?”

—“মনের মত পাত্র পাওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে তার আবার বিবাহ দিতে চাই।”

—“তাহলে এইবেলা থেকে পাত্র সন্ধান করুন।”

—“কিন্তু সুপাত্র কোথায় পাব?”

—“সেইটেই ত দেখা দরকার! ধরুন, আমাদের মোহন। এইরকম একটি পাত্র দেখুন। আপনার বেয়ে সুখে থাকবেন।”—এই বলে হরেনবাবু হঠাৎ কথা বন্ধ করে, বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মোহনের মত পাত্র! কি আশ্চর্য্য!

• বিজয়, চরিত্রে, ধনে-মানে এমনধারা সুপাত্র

আর কোথায় আছে, যে সমাজের ভর না রেখে, বিধবাবিবাহ করবে? হঠাৎনবাবু যা বললেন, সেটা যে কত-বড় অসম্ভব ব্যাপার, তা বোধহয় তিনি ভেবে-চিন্তে দেখেন-নি।

কিন্তু, আর দেরি করলেও ত চলবে না। দিনে দিনে দিন চলে যাচ্ছে, দৃষ্টি ক্রীণ হয়ে আসছে, দেহ হয়ে পড়ছে—হঠাৎ কবে পরকালের ডাক আসতে পারে, কে জানে? আজও সময় আছে, আজ না বুঝলে হয়ত কাল অসময় এসে পড়বে। ঐ নির্মল কুলের মত পবিত্র সরমা, আজও সে সেবপূজার উপযুক্ত, —কিন্তু কাল? ...আজ যা সেবতার যোগা, কাল হয়ত তা মানবের ভোগ্য হবে! ... আজ আলো, কাল অন্ধকার!

...তবে, হ্যা—একটা কথা! আমি নিজে ত এত ভাবছি, কিন্তু সরমার দিক থেকে কিছু ভেবেছি কি? তার মন কোন্‌দিকে? সে কী চায়? একটা আদর্শের সূত্রতা তার সমস্ত জীবন পূর্ণ করে তুলতে পারবে ...কি পারবে না?

ঐশ্বর্য বিবাহের সময় তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার দরকার হয়-নি, তখন সে বালিকামাত্র—নিজের ভাল-মন্দ কিছুই বুঝত না। কিন্তু এখন সে বালিকাও নয়, নাবালিকাও নয়। এখন সে আপনাকে চিনতে পেরেছে, আপনার চরিত্র বুঝেছে, আপনার ভবিষ্যৎ বুঝেছে। এখন সকলের আগে তার মত নেওড়া দরকার। সে যদি বলে ‘না’—আমিও তাহলে হোঁর করে ত বলতে পারব না, ‘হাঁ’।

অকুল-পাখার ভাবছি, এমন সময়ে পিছন থেকে দ্রুপানি নরম হাতে তৈ আমার গলা ধরিয়ে ধরলে। এ আর কেউ নয়—আমার প্রাণপুতলী সরো-রাশি!

সরমা আদর করে আমার মাথার উপর তার দ্রুপানি কাত্ করে রেখে বললে, “হ্যা বাবা, এমন করে বসে-বসে কি ভাবছ বল দেখি!”

আমি চু-হাতে তার দ্রুপানি ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে আনলুম। বললুম, “কি ভাবছি, গুনবি মা?”

সরমা আশ্চর্য হয়ে তার বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল—কিছু বললে না।

হাররে কপাল, এই ডাগর-ডাগর চলচলে চোখদুটিতে এখনো যে শিশুদের ভাব মাখানো! ...

এই সরল চোখে আমার সরমা কি কুটিল সুস্বাদের অন্ধকার দেখতে পেরেছে? তা কি সম্ভব?

সংসারের আনন্দ যে সুখের মত পান করছে, তাকে আমি পিতা হয়ে কোন্-প্রাণে বলব যে, এ সুখ নয়—এ বিষ! তার বেটুকু সুখ আছে, সেটুকুও দুচিরে যেব কেমন করে?

সরমা বললে, “চুপ করে রইলে কেন? কি ভাবছ, কৈ বললে না ত বাবা!”

ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, “তোমার কথাই ভাবছিলাম না!”

সরমার মুখের ভাব অমনি বদলে গেল, তার চোখের আলো নিবে গেল—তার প্রাণের ভিতরে ভবিষ্যতের যে আধা

দিনে দিনে যবে উঠুচে, তারই আভাসে
যেন তাঁর আলো-করা মুখখানি কাণো হরে
গেল! ধতবত খেরে খেমে-খেমে সে বললে,
“আমার—আমার কথা!”

—“না-না—আমি কিছু ভাবি-নি না,

কিছু ভাবি-নি”—বলতে বলতে সেখান থেকে
উঠে আনি তাড়াতাড়ি পাগিয়ে গেলুম! হা
ভগবান, একথা কি মুখ ফুটে তাকে বলা
যায়!

(ক্রমশঃ)

ঐহেমেন্ত্রকুমার রায়।

সেকালের গৃহস্থালী

(পূর্বস্মৃতি)

আহারের সময় ও ভোজন-বিধি

সেকালের গৃহস্থেরা অনেকই পর্ণশালার
বাস করিতেন বলিয়া অগ্নি-সম্বন্ধে বিশেষ
সতর্ক থাকিতেন। (১) ঐশ্বর্যকালে তখন
দিবাতাগকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া লওন
হইত। ইহার মধ্য-দুই-অংশে রন্ধনাদি মিষিক্ত
ছিল। বেলা ১১.০ ঘটিকার মধ্যেই রন্ধনাদি
সেব হইত বলিয়া মনে হয়। যে ব্যক্তি এই
নিয়মের ব্যতিক্রম করিত, তাহাকে এক পণের
অষ্টমাংশ জরিমানা দিতে হইত—কোটিলোর
অর্থশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। অবশ্য

বিশেষ প্রয়োজন হইলে গৃহস্থানী বিশ্রহরেও
বাটীর বাহিরে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে
পারিতেন। তবে কামস্বত্রে দেখা যায় “মহানস
(রন্ধন-শালা) স্নগুপ্ত হইবে”, স্নতরাঃ বাটীর
বাহিরে বিশেষ কারণ ব্যতীত রন্ধনাদির
ব্যবস্থা ছিল না।

অতিথি-আগন্তকের অন্ন গো-দোহন-কাল
পূর্বাং অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। শিশু,
শিশুগৃহবাসিনী বিবাহিতা নারী (২) বৃদ্ধ,
গভিনী, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কুমারী (৩) অতিথি
ও ভূতাগণকে অগ্রে ভোজন করা হইয়া তাহার
পর স্বামী, স্ত্রী,—গৃহের কর্তা ও কর্ত্রী—

(১) সেকালে কিছু বহুজালিত দ্রুতগামী ঘনকলের ব্যবস্থা ছিল না; দতরাঃ অত্যন্ত গৃহস্থকেই অধিবাস
নিবারণের জন্য পূর্ব হইতে সাবধান থাকিতে হইত। পঁচটী মলপূর্ণ পাত্র (পল-ঘটাসন্) এক একটী
বৃদ্ধ যোগ (দ্রব্যং কাষ্ঠদ্বয় মল্যায়) চিহ্নটা ও চর্পণলি (বন্দক) এক একখানি করিয়া বই, ঘণ
(কুলা) ও বাতুম্ব খাঁকড়া সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে গৃহস্থকে অর্ধ পণ করিয়া জরিমানা দিতে হইত।

(২) সেকালে আর্ঘ্যপণের সহবরতার অভাব ছিল না। বৃদ্ধ ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের প্রতি বিশেষ
সহায়ত্ব দিবে দেখা যায়। স্বামী, স্নাতক ব্রাহ্মণ বা বর (bride-groom) প্রভৃতিকে দেবন পথ ছাড়িয়া
দিতে হইত, সেইরূপ, বৃদ্ধ, ভারবাহী, স্ত্রীলোক বা ব্রহ্ম ব্যক্তিকেও পথ ছাড়িয়া কেওয়ার নিয়ম ছিল।
(খাজুর ১৫ অণার ১১৭)

(৩) অতিথি-সেবাও সেকালের গৃহস্থের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অতিথি আসিলে
প্রতি-নির্দিষ্টপথে তাহাকে সাগনত খাওয়া দিতে হইত। কোন্‌ সময়েই অতিথি স্নাতকালে আসিয়া উপস্থিত

ইহারা ভোজন করিতেন (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় শ্লোক ১০৫)। বিশ্বদেবের পূজা হইবার পূর্বেও ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীগণকে অন্ন-বাঞ্ছন দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল না। মহুসংহিতায় আছে যে অতিথি, বৃদ্ধ, শিশু এবং দুর্বল ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে সত্বে রাখিলে গৃহস্থানীর পারলৌকিক মঙ্গল হয়। স্বামী-পরিভাষ্য। পিতৃগৃহবাসিনী নারীগণকে সর্বোচ্চে ভোজন করাইবার নিয়মটি বড় সুন্দর বলিয়া মনে হয়। ইহা অস্বস্ত হইলে এই সকল মনভাগিনী আশ্রিতাগণের আত্মমর্যাদার আঘাত লাগে না এবং গৃহে অশান্তি ঘটবার আশঙ্কাও কম থাকে। স্ত্রীর সহিত একত্রে বা উচ্চাসনে বসিয়া বা বহু লোকের সম্মুখে আহার নিষিদ্ধ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য একবস্ত্রে আহার, বা বস্ত্রাচ্ছাদন হইয়া আহার সম্বন্ধেও নিবেদন দেখা যায় (৪) বহুজন বেখানে অন্নদান করে, সেখানে অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ, এইরূপ একটি শ্লোক কুর্খ পুরাণেও দেখিতে পাই (বিংশ অধ্যায় বহুদাসী সংস্করণ)। স্বামীর সহিত একত্রে বা তাঁহার সম্মুখে স্ত্রীলোকেরা এখনও আহার করেন না; তবে স্বামীর আহারের সময় নিকটে বসিয়া ব্যঙ্গনাচি করা এখন

আর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। স্ত্রীর সম্মুখে আহার করাও যে নিষিদ্ধ, তাহা বর্ণ্য শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৩১)। প্রাচীন ইহুদি শাস্ত্রেও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে বসিয়া আহার সম্বন্ধে নিবেদন দেখা যায়; (৫) কিন্তু সাধারণতঃ ইহার যে কারণ নির্দেশ করা হয়, (que les hommes et les femmes soient séparés dans les festins à cause de la chaleur du sang et de l'animation du bon vin) তাহা আমাদের দেশে খাটে বলিয়া মনে হয় না। খাদ্যের গৃহ হুয়ে বর্ণিত আছে, বন্ধনাদি সমাপ্ত হইবার পর স্ত্রী পূর্বাচু ও সার্যচু আহারের জন্য স্বামীকে “ইহা প্রস্তুত” বলিয়া আহ্বান করিবেন এবং স্বামী প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর নিয়মের “কোন অনটন না ঘটে” এই কথা বলিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলি-পূজাদির ব্যবস্থা করিবেন। সাহেবদের মত ছুতা পায়ে দিয়া বা মুসলমানের মত বিছানার বসিয়া আহার ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। (পরশুর, ৬ অধ্যায়)। কেহ কেহ বলেন, আধুনিক জৈন মাড়োয়াসী-বিগের তায় ত্রিপিটকের উপর খালা

হইলেও তাহাকে মল, তু, তুণ ও দিষ্ট কথায় ঘরা সত্বে করিতে হইত (মহুসংহিতা)। অতিথির সম্ভোগ-বিধানের জন্য পৃথক উপায় প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইত। অতিথি সত্বে হইলে পৃথী ইচ্ছা লোকে পয়ন করে, মহুসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এমন কি অতিথির অস্বস্তি-ব্যক্তিকে বেদপাঠে নিষিদ্ধ ছিল।

(৪) ইহার অর্থ “হোটেল” প্রভৃতিতে খাওমা নিবেদন, এইরূপ বস্তুসমূহ সম্বন্ধে।

(৫) That the men and the women be seated separate in the feast because of the heat of the blood and the animation due to good wine. Erckmann charrian তাঁহার Le Blocus নামক গ্রন্থে বৃদ্ধ বিধবী মর্যেজের দুখ দিয়া এইরূপ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

সন্ধ্যা খাওয়া আচার-বিস্ক ছিল না। আমার অনেক প্রচাভাজন বন্ধু “হরিভক্তি-বিশ্বাসে” একত্র ত্রিপদিক বা low tripod standএর উল্লেখ পাইয়াছেন। উক্ত অন্ন বাতীত ঠাণ্ডা বা বাসি ত্রব্য ভোজন শাস্ত্রানুমোদিত নহে; বিশেষতঃ স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহা একবারেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অগহিত ভোজ্য এবং যজ্ঞাবশেষ খাদ্য ত্রব্যাদি পূর্বাঙ্গিত হইলেও তিক্তিৎ হবি সংস্কৃত করিয়া আহার করা চলিত। যব বা গোমুখ চূর্ণ হইতে প্রস্তুত খাদ্য ত্রব্যাদি এবং সকল প্রকার চণ্ডভাত ত্রব্যাদি বাসি হইলেও খাওয়া নিষেধ ছিল না (মহাসংহিতা ৫ম অধ্যায়—২৪, ২৫)। পূর্বে দিনে প্রস্তুত বাসি মিষ্টান্ন টকিলা গেলে আর তাহা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল না। কাক প্রভৃতি পক্ষী চক্ষু স্পর্শ করিলে বা কুকুরে মুখ দিলে সে ভাত আর খাওয়া হইত না; তবে বিভালের বা ভেকের স্পর্শে কোন ঘোষ ঘটত না। স্পর্শ-বোধ-সম্বন্ধে এতখানি সতর্ক থাকিলেও সেকালের গৃহস্থেরা বুধা অন্ন অপব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রোণ বা আচক পরিমাণ অল্পে কুকুরে বা কাকে মুখ দিলে বা গবাদিতে খ্রাণ লইলে তাহার সমস্তই পরিত্যক্ত হইত না, কেবল যেখানে মুখ দিয়াছে সেই স্থানের চারিটি ভাত কেদিয়া দিলেই চলিত। অবশিষ্ট অন্নের উপর অল্পমলে সোনা খুইয়া সেই অল্প ছিটাইয়া গরম করিয়া লইলেই পুনরায় তাহা গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল না। (পরাশর সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৭, ৬৯, ৭০)। অন্নের সঙ্কিত মাছি বা কোন পতঙ্গ পাওয়া গেলে

সে অন্নও বর্জিত হইত না। মলে খুইয়া ভক্ষণ করাইয়া পুনরায় তাহা আহার করা চলিত (ঐ, ৬২)।

ধূমপান

ভাক্তার গঙ্গানাথ বা চরক সংহিতা (হৃদ হান অধ্যায় ৫) হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন (J. B. O. R. S. Vol. II. Part, p. 147) যে দিবসে হুইবার ধূমপান করার নিয়ম ছিল। কুমার্য তন্ময়ে তান্ত্রকূট, অহিফেন, ধূসর প্রভৃতি অষ্ট শিক্তি ত্রব্যের অন্ততম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রচিত কামদ্বয়ী গ্রন্থে রাজ্যার ধূমপান-প্রসঙ্গে যে পরিণীত ধূমবস্তির উল্লেখ দেখা যায়, ভাক্তার গঙ্গানাথের মতে তাহা চরক-সংহিতোক্ত উপকরণেই প্রস্তুত হইত। ইহাতে বহির্ভূত একরকম তৃপ্তি ত্রব্য ব্যবহৃত হইত কিন্তু তান্ত্রকূট বা অহিফেনাদির কোনরূপ সংশ্লষ থাকিত না। ধূমবস্তি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তুল হইত; আকৃতিতে অনেকটা “সিগার”-এর মত। একপ্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিয়া অপর প্রান্ত মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া ঠিক আধুনিক উপায়েই ধূমপান করা হইত। চূর্ণল ও ক্লান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল।

গৃহস্থালী ও গৃহিণীর কর্তব্য

গৃধু গৃহ অথবা তৈজসাদি এবং বেশভূষা ও আহার-পানের কথা বলিলেই ‘গৃহস্থালীর কথা’ শেব হয় না। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীর কর্তব্য-সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকিলে সেকালের সংসার-যাত্রার প্রণালী

সম্বন্ধে একটা মাপকাঠি ধারণা করাও কঠিন হইয়া উঠে। বাজবহা সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (শ্লোক ৮৩-৮৪) যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে গ্রন্থটির কর্তব্য সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা জানিতে পারা যায়। ত্রীলোকেরা সংসারের জিনিষপত্র শুধাইয়া রাখিবে, গ্রন্থালীর সকল কর্ণে নিপুণ হইবে, খরচ-পত্র সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হইবে, স্বত্তর-শাওড়ায় চরণ বন্দনা করিবে এবং তীর্থে তৎপর হইবে; স্বামীর অঙ্গুপহৃতিতে ক্রীড়াবি, শরীর-সংহার, সমাজোৎসব-দর্শন (witnessing of social festivities) হস্ত-পরিহাস ও পরপূজে পমন প্রভৃতি পরিচয় করিবে। পতি-শ্রীর-হিতে-বুদ্ধি, রমণী ইহ লোকের কীর্ত্তি এবং পরলোকে অঙ্গুপহ, সুখ লাভ করেন, এ কথাও পরবর্তী একটি শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল উপদেশ কামহত্যেও বিস্তারিতভাবে আধ্যাত্মিকরূপে অব্যাহত বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বাক্যকালে তাহার আলোচনা করিব।

প্রাচীন সাহিত্যে গ্রন্থালীর চিত্র

গ্রন্থালীর ভার, বোধ হয়, অগতির আদি কাল হইতেই মহিলাগণের উপর স্তম্ভ। যথেষ্ট অতি প্রাচীন গ্রন্থ। কাহারও কাহারও মতে উহা অনুন ৪০০০ বৎসর পূর্বে লিখিত। (৬) আরকাল পাশ্চাত্য বেশে গার্হস্থ্য নীতি বা রন্ধন-বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ

করিলে মহিলা বিভাগের হইতে বৈজ্ঞানিক ডিমোনা, পদক (medal) প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, সেকালে সেজন্য কোন ব্যবস্থা বা থাকিলেও গ্রন্থালী-কর্ণে নিপুণ রমণীর সুখ্যাতির অভাব ছিল না। যথেষ্টের একজন নারী (৭) নিজের পরিচয় দিবার সময় বলিয়াছেন, “আমি স্তোতা, আমার পুত্র চিকিৎসক এবং আমার কন্যা প্রকৃতির উপর বব তর্জ্জন করেন।” (১১২ হ ৩ শ্লোক)। সাংসারিক কার্যে কন্যাটি বিশেষ গুণাবিতা না হইলে চিকিৎসক ভ্রাতার সহিত একত্রে তাহার উল্লেখ হইত কি না সন্দেহ! যথেষ্টের তুলনায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৮) রচিত মল-কুমার চরিত আধুনিক হইলেও নিত্যন্ত আশ্চর্য-কালিকার গ্রন্থ নয়। এই কথা-গ্রন্থে গোমিনী-উপাখ্যান নামক গল্পে প্রাচীন গ্রন্থালীর একটি স্বন্দর চিত্র পাওয়া যায়। আজ কাল এই পৃথিবী-বাসী হৃদয়ের রূপায় আমরা সংরক্ষণ-নীতি বা অনাবশ্যক ব্যয়-সঙ্কোচ সম্বন্ধে বাহা শিক্ষা করিতেছি, আর্থা ললনাগণের দৃষ্টি সেদিকে বহু পূর্বেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। উপাখ্যানটির সারাংশ এইরূপ। দ্রাবিড় বেশে কাকী (বর্তমান কাকীভেরম) নগরবাসী মুক্তিকুমার নামক এক বণিক-পুত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ করিবার জন্য এক গুণবর্তী কন্যার অঙ্গুসন্ধান করিতে থাকেন। নির্মোচিতা কন্যার গ্রন্থালী-কার্যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ

(৬) “মৌখিকগ্রন্থ” প্রবন্ধে ডব্লিউ হের্মান্ন Hermann Jacobi'র এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৭) সৌমধ্যাত্ম্য।

(৮) Weber Ed. 1812. p. 213 footnote. A. A. Macdonell Sanskrit Literature.

হইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্ত তিনি একটি হুম্মর পরীক্ষা-বিধি স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র এক গ্রেহ বা আটকের চতুর্থাংশ পরিমাণ খালি-ধাতু দিবেন, কত্নাকে জাহাতেই পর্যাপ্ত ভোজন করাইতে হইবে। তিনি আর কিছু দিবেন না, কত্নাও আর কিছু লইতে পারিবেন না। অনেক সন্ধানের পর লক্তিকুমার “ন হুবা নাতি দীর্ঘা নাতিকুম্ভা” কাকন-বিরল-কৃষ্ণা মহুদেতা এক কত্নার বর্ণন লাভ করিলেন। এই কুমারী যে বয়সে নিভান্ত বালিকা ছিলেন না, তাহা গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কত্না কিরূপে মাণী-পুটে মুক্ত সংঘটনের দ্বারা তৎপল বাহির করিয়াছিলেন এবং পরে উহা মূৰ্প শোধিত ও প্রকালিত করিয়া কিরূপে সেই ধাতুর তুম্বা-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ইকন, হালী (মুংপাত্র) ও সরাবাদি (‘সরা’ প্রভৃতি) ধাতী-সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া রক্তনাদি হুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অনাবশ্রক-বোধে তুম্ব-কুঁড়া প্রভৃতি যে সকল (byc-products) প্রবা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহা বধাকার্য্যে নিয়োজিত হইলে যে গৃহস্থের বিশেষ ‘সাশ্রয়’ হওয়া সম্ভব, গল্পটিতে এই নীতিই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তুম্বাদির পরিবর্তে ইকন এবং সেই ইকন হইতে প্রাপ্ত অন্নারের পরিবর্তে শাক, সূত তৈল, দধি, আমলক, চিকাকল (তেঁতুল) প্রভৃতি সংগ্রহ করা এই মহার্য্যতার দিনে সম্ভব নয় বটে কিন্তু তের-চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেও যে কতকংশে সম্ভব ছিল না, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আমরা এই উপাখ্যান-পাঠে আরও জানিতে পারি যে

গৃহস্থগণ নিজ-নিজ আভিমাংস ছই-এক বাড় করানী বৃক্ষ রোপণ করিতেন এবং করানী পড়েই বোধ হয় অনেক সময় খালা বাসন প্রভৃতির কাজ সারিয়া লইতেন। সম্ভবতঃ প্রত্যবে বা ভোর রাত্রেই পাতা কাটিয়া রাখার নিয়ম ছিল। রক্তনের পূর্বে চুন্নী পূজা করিতে হইত। পন্নীগ্রামে বোধকপণ এখনও মিষ্টার প্রভৃতি তৈয়ার করিবার সময় গ্রন্থমে খোলার সামান্য-কিছু ভাঙ্গিয়া লইয়া চুন্নী মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাঁতের কেন বা অন্নমণ্ডও পরিত্যক্ত হইত। তাহা “সলবণ সন্তার মন্তাকার ধূপবাসন্ত সম্পাদ্য... উৎপলগন্ধী কুখা” মৃৎসরাবে বা মাটির সরার পরিবেষণ করা হইত। এইরূপ অন্নমণ্ডপানে “রন প্রদুষ্টে” “সকল গাত্ৰ সংক্রিন্ন” এবং “অল্প রূম” বা পথপ্রান্তি নিষারিত হয়, এ কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। শুনিতে পাই, মাস্ত্রাজ অকলে এইরূপ অন্নমণ্ড পান করার প্রথা স্থানে স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। অন্ন “দর্বা” বা হাতার সাহায্যে পরিবেষণ করা হইত। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু শিল্পীর সংরক্ষণনীলতা-গুণে এই দর্বা অন্নপূর্ণা দেবীর হস্তে এখনও বিদ্রাজ করিতেছে। অন্তরুর ধূপ যে কেবল বোধিবৃক্ষের কেশবাসের জন্তই ব্যবহৃত হইত, তাহা মহে; পানীর প্রভৃতি স্রগন্ধি করার জন্ত “অভিনব পাটলা কুম্ব” (Bignonia Suaveolens) বা উৎকলোৎপলের স্তায় ইহারও ব্যবহার ছিল দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বৌদ্ধ-জাতক কাহিনীতে বর্ণিত সূত সুবিক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ-ব্যবসারে প্রয়োগ করিয়া ধনী হওয়ার

ভাষ্য এই গল্পটিও অর্থ-সকর বা সাংসারিক ব্যয়-সকোচের এক উৎকট দৃষ্টান্ত মাত্র। এ শ্রেণীর কোন প্রাচীন কাহিনীই যে বিশেষ বাস্তব ঘটনা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিবেন না এবং প্রাচীন কথা-গ্রন্থাদিতেও অভিশ্রোতির বিশেষ অভাব নাই, কিন্তু তাই বলিয়া বিপরীত ভ্রমে পতিত হওনাও উচিত নয়। তখন এক টাকা মণের মৃদঙ্গার বা অক্ষের আলানি কাঠের ব্যবহার ছিল না বলিয়া যে লোকে পোড়া করিয়া কুড়াইয়া রাখিত না, তাহাই বা কিরূপে বলা হইতে পারে? ধাতু মূলত হইলেই কি পল্লীগ্রামের লোক ‘কুব কুড়া’ কেলিয়া দিয়া থাকে? দেবালের গৃহস্থালীগণ এ সকল প্রব্যাদির অপচর-নিবারণ সম্বন্ধে যে রীতিমত উপদেশ পাইতেন, তাহা আমরা বাস্তবায়ন হইতে জানিতে পারি।

বাংলায়নের কাল

বাংলায়নের কামহুত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অধ্যাপক ডাক্তার ঐযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি হইতে “বাংলায়ন, মল্লাখ কুটল-কনকাখমঃ” প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোটীলা, চাপকা ও বাংলায়ন একই ব্যক্তি (১)। পণ্ডিত হরিন্দেব শাস্ত্রী কোটীল্যের “আর্য্যিকী স্থাপনা” (2nd. chap.) এবং বাংলায়নের ভাষ্যভাষ্য হইতে

দুইটি বিশেষ সাপ্ত-যুক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (মাহিত্য, মাঘ ১৩২৩, পৃ: ৩৭২, ৩৭৩) চন্দ্র গুপ্ত, পৃ: পৃ: ৩২২ অশ্ব সিংহাসনে অধিরোধণ করেন এবং পৃ: পৃ: ২২৭ অশ্ব মেহত্যাগ করেন। অর্থশাস্ত্র-প্রাপ্ত্যে কোটীলা চন্দ্র গুপ্তের রাজত্ব-কালে সম্ভবতঃ পৃ: পৃ: ৩২১ হইতে ৩০০ অব্দের মধ্যে (১০) বর্তমান ছিলেন; সুতরাং পুরোক্ত মত গ্রহণ করিলে কামহুত্রের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। হেমচন্দ্রের অভিধান সম্ভবতঃ ১০৮—১১৭২ পৃ: অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং উহা চন্দ্র গুপ্তের রাজত্ব-কালের অনেক পরবর্তী কেহ কেহ শ্লোকটিকে সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। ভ্রামশাস্ত্রী কামহুত্র হইতে অর্থশাস্ত্রের কতকগুলি তুল্যাপ (Parallel passages) সংকলন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বাংলায়ন ঐ পদগুলি অর্থশাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এমন গ্রন্থকারেরও অভাব নাই যাহারা নিম্নের লেখা নিম্নেরাই উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। সুতরাং বাংলায়ন ও কোটীলা যে একইই অভিন্ন নহেন, তাহা শুধু এই প্রমাণ হইতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু কোটীলা ও বাংলায়নের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি আছে যাহা এখনও খণ্ডিত হয় নাই। কামহুত্রে অঙ্ক

(১) See his Introductory essay to Kumar 'N. N. Law's Studies in Ancient Hindu Polity p. XI.

(১০) Shama Shastri's, Artha-sastra—Introduction p. VI

রাজ কুন্তল শাকবনির উল্লেখ আছে। (১১) কুন্তল শাকবনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। Vincent Smith তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের এই অংশ প্রাক্কণ্ড বলিয়া প্রমাণিত না হইলে বাৎসর্যন, ও খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর গ্রন্থকার কোটিল্য যে একই ব্যক্তি ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। জর্মান ভাষার কামহুজের ব্যাখ্যাকার R. Schmidt এ সম্বন্ধে নিজ গ্রন্থে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই, কেবল এ পুস্তক কালিদাসের ও পঞ্চতন্ত্রেরও পূর্ববর্তী এই কথামাত্র বলিয়াছেন। কালিদাসের কথা ছাড়িয়া দিই; কারণ আধুনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন (vide M. M. H. P. Shastri's article, J. B. O. R. S. part I. vol. II)। দণ্ডী—অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞগণের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিজ্ঞগণ কোটিল্য বা চাণক্যেরই অপর নাম। পঞ্চতন্ত্রে শালিবাহুরের সহিত বাৎসর্যন ও কোটিল্যের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ বষ্ট শতাব্দীতে খৃস্ট আনানির ওয়ানের রাজত্বকালে সেলেভী (প্রাচীন পারসিক) ভাষার অনুবাদিত হইয়াছিল।

হুতরাং ঐ শতাব্দীতে রচিত মশকুয়ার চরিত্রের যে ইহা বহুপুস্তকবর্তী গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কামহুজের গৃহস্থালীর উপদেশ

কামহুজের ভাষ্যাধিকরণে গৃহস্থালী ও সংসার-ধর্মসম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তাহা কিছুকাল পূর্বেও হিন্দুকুলবধুগণ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেন। পতির শয্যা-ভাগ করিবার পূর্বেই প্রাতঃস্নাতাদি সম্পন্ন করিয়া সাংসারিক কার্যে মনোনিবেশ—যেহ হই কিছু দিনের মধ্যেই বাতিল হইয়া পড়িবে। এই একটি অধ্যায়ে গৃহিণীর কর্তব্য কর্মের যে কর্দ পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সামান্ত নহে। সূলে ও বশোথের অরমঙ্গল চীকার—বাহা বিবৃত আছে, নিয়ে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

পরিত্যক্ত বা উৎবৃত্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার

গৃহিণীর কর্তব্য-ভালিকার মধ্যে প্রথমেরই সূতা কাটা, শিকা তৈয়ারী, পাশ বকল সংগ্রহ (বৃক্ষ বা উদ্ভিদজাত তন্তু হইতে পশু বন্ধনের জন্ত হাড়ি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা) আচাম মণ্ড, ভূষকণা, কুটি ও অঙ্গার প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই; হুতরাং দেখা গাইতেছে, ভূষকণা, কুটি, অঙ্গার কিছুই পরিত্যক্ত হইত না (১২)। ক্ষুদ্র তথুলকণা প্রভৃতিও

(১১) কর্তব্য কুন্তল: শাকবনি: শাকবাহনো বহা দেবী: লবহারবতী: ২৭। সম্ভোগ্যাদিকরণ—কামহুজ (Ed. Mahesh Ghandra Pal.)

(১২) মনুসংহিতায় তুলার বীজ ও তুষের উপর দণ্ডারমাক হওয়া নির্দিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে (Manu IV—78) এ বিবেচ্যক্তি অপচর-বিবাহুণ-উদ্দেশ্যেই প্রচাৰিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক কালে তুলার বীজ হইতে তৈল ও খইল প্রস্তুত করার ক্রান্তি সেকালে উহার কোনও ব্যবহারিক

কুছুটাতির অল্প ব্যবহার হইত। (কুছুটাতিয়ু—বস্তু কুছুট কি না, টীকাকার তাহা বলেন নাই)। অঙ্গার প্রভৃতি শোধ ভাওকরণাদির অল্প ব্যবহার হইত স্তত্রাং কৃষা নষ্ট না হইয়া উহা কর্তৃকার লাগাতেই পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়। আচাম মণ্ড প্রভৃতিতে বোধ হয় কীলী আমানির স্তায় কোনরূপ পানীয় প্রস্তুত করিয়া দানী-দিগের-পানের অল্প গ্রাণ্য হইত। কোটিলোর অর্ধশাল্লো ও লিখিত আছে, অঙ্গার ও তুঘদি শোধ গলাইবার অল্প ও “ভিত্তিলিণ্য” বা চুপের ভাটার অল্প (for iron smelting and lime-kiln) ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং কৃষি ও কণিকা—দাস, মজুর ও পাচকদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। (Ed. Sharm Sastry Chap XV. 97) কীর্ণ বস্ত্রও পরিত্যক্ত হইত না; শুষ্ক ও রঞ্জিত করিয়া ভূতাদিগকে প্রদত্ত হইত।

গ্রহস্থালীর উপকরণাদি-সংগ্রহ

লবণ, মেহ (মূত্রাদি), গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দ্রবীভ বলিয়া সুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। মৃৎপাত্র কাঠ ও চর্ম তাত্ত (১৩) প্রভৃতি গ্রহণীকে বধাশয়নে উপযুক্ত স্থলো সংগ্রহ করিতে হইত। সকল সময়ে বোধ হয় সকল জাতীয় তৈজস সহজে

মিলিত না, স্তত্রাং কখন কোনটি স্থলতে পাওয়া যাইবে সেদিকে দৃষ্টি রাখা গ্রহ-স্থানিনীর প্রধান কর্তব্য ছিল। এখনও পল্লীবাসীগণ ভিন্ন-স্থান হইত আনীত উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এ-ছাড়া সেকালের গ্রহণীকে আরও কতকগুলি কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইত।

ফুল ও সব্জী বাগান

গ্রহ-প্রাঙ্গণে আঙ্গুরাদি ‘হরিত’ ও পাণ্ডুরাদি শাক অল্প-বিস্তার আবাদ করা হইত। এ ছাড়া ক্ষীরক (ক্ষীরা), শর্ষপ (খরিয়া) প্রভৃতি মসলার এবং বোধ হয় বাটীর বালক-বালিকাদিগের ব্যবহারের অল্প ইক্ষু লাগাইবারও ব্যবস্থা ছিল। মূলক (মুলা) আলুক (বোধ হয় চুপড়ি আলু) পাণ্ডী (পাণ্ড শাক) দমনক (দোনাশাক) আত্রাতক (আমরুল), বার্তাকু, কুয়াণ্ড, অলাবু, স্ত্রপ (১৪) (ওল) অমংগুয়া (কচু প্রভৃতি) এবং শুকনাসা (দীষ) ও পলাতু প্রভৃতি ঔষধির বধাকালে বীজগ্রহণ ও বীজ বপন করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহর বাতীত অনেক স্থানেই এই সকল শাক-সব্জী গ্রহ-প্রাঙ্গণে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। পাণ্ডাশাক

প্রয়োগ ছিল কি না জানা যায় না তবে বীজগুলি পয়দলিত হইলে পায়ে বপনের অযোগ্য হয় ইহাও এ নিম্নেবের অল্পভঙ্গ ভাঙ্গন হইতে পারে।

(১৩) পূর্বে বৈদিক যুগেই চর্ম পাত্রাদি বৃত্তি (মসক) চর্মপুট ও চর্মকরও বানো অভিহিত হইত। ইন্দ্র-কিয়র ব্যাধি বৃত্তির ভাঙি-বিধান হইত। সেকালে চর্মকরও বা চর্মপুট-বৃত্তি ভল শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। সাহিত্য, বৈদ্য ১০২৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বেদান্তর্ষ মহাশয় লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫২০

(১৪) হিন্দুস্থানীরা জলকে এখনও “স্ত্রপ” বলে।

আধা, ওল কুমড়া, লাউ, সৌম প্রভৃতি তরকারীর আধা পল্লীসৌমত্বিনীগণ অনেকস্থলে নিজেস্বয়ী করিয়া থাকেন। বপন-কালে বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট সব্জীর বীজ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হইয়া থাকে। যে দেশের ধর্মগ্রন্থে দেবী শ্রমঃ “শাকস্তরী” বলিয়া, প্রকীর্ণিতা (‘শাকস্তরীতি বিখ্যাতিঃ তদা বাস্তামাহং তুবি’—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১১, ৪৬-৪৭) সে দেশের শক্তি-স্বরূপিনী রমণীগণ শাক হরিতাদি উৎপাদনে যে বস্ত্রবতী হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? কেবল শাক-সব্জী বলিয়া নহে, মরিচা, জাতি, নবমরিচা, টপর, জবা, উবির প্রভৃতির ক্ষেত্র নিষ্কাশন করিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা হইত। স্ততরাং দেখা যাইতেছে সেকালেও শুধু বস্ত্রভূষণের উপর ভর দিয়া সৌন্দর্য্য ভ্রমের অবদান করা হইত না।

স্বয়াকৃষ্ণী

এখন যেদ্রপ প্রভীচা দেশে অনেক মধ্যবিত্ত ও ধনী গৃহস্থ নিজগৃহে cellar বা পাভাল-ঘরের ভিতর বস্ত্র রাখিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও স্ত্রী বা আসব কুড়ী বোধ হয় এইরূপ “শ্রদ্ধ” ভাবেই রক্ষিত হইত। প্রবন্ধের পূর্বাংশে প্রাচীন-কালে প্রচলিত মধু, সীধু বা কাদম্বর এবং দৈয়ের প্রকৃতি স্ত্রীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুমি ও গো-সেবা

গো-সেবা অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু পুরস্কীর প্রধান কর্তব্য বলিয়া

পরিগণিত ছিল। কামহুত্রে এই অধ্যায়ে পীতাবশেষ হৃদ্য হইতে যত প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে। এখনও অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে পর্যাপ্ত পরিমাণ হৃদ্য হইয়া থাকে। কোন কারণে সমস্ত হৃদ্য ব্যবহারে না আসিলে অজ্ঞাপিও অন্তঃপুরিকাগণ দধি ও ঘৃতাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কুমি ও পশুপালনের ভারও ভাষ্যার উপরই কতকটা স্ত্রী থাকিত। কর্ণ-বগনাদি শ্রমঃ পর্বাংকণ না করিতে পারিলে অজ্ঞাপিও অনেক উগ্রবংশীর চাবী গৃহস্থের স্ত্রী-কস্তা কৃষ্ণা মাহিন্দারদিগের দ্বারা এ সকল বিষয়ের রীতিমত সংবাদ লইয়া থাকেন।

পশুশালা

সেকালের অনেক গৃহস্থই বোধ হয় সখ করিয়া গো-মহিষ বাতীত অস্ত্রান্ত বস্ত্র ও গৃহ-পালিত পশু এবং নানা জাতীয় পক্ষী নিজ নিজ গৃহে বা পশ্চালরে রাখিতে ভাল বাসিতেন। এ প্রসঙ্গে কামহুত্রে মেঘ, কুকুট, লাব শুক, শাবিকা, পরভূত (কোকিল) বানর মৃগ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এখনও অনেক ধনী-গৃহে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই সকল ‘কৃষ্ণে’ জীবের বধোপযুক্ত রক্ষণ-ব্যবস্থা সঙ্ঘে গৃহীলেকই তত্তাবধান করিতে হইত। (১৫) দৈনিক আর-বামের “শিখী-করণ” বা মবলক করার ভার গৃহস্থামিনীর উপরই অর্পিত ছিল, স্ততরাং তিনিই প্রাণ

(১৫) সাহিত্যোক্ত প্রাচীন-বিধি-বিধি অনুযায়ী মনে হয়, পশুপক্ষীগুলি সবাইই রক্ষিত হইত। হলে, স্নানকাল, মধু, লাবক, কপিল প্রভৃতি দিনে করিলে দিন-রাত্রি তপস্বী হইত। শুক ও পাখিও

নিজ হাতে সব শ্রম-পত্র করিতেন বলিয়া বোধ হয়। যে economic independence বা অর্থব্যয়-স্বতন্ত্র স্বাধীনতার অঙ্গ সেদিন পর্য্যন্ত Suffragette বলতুম্‌ জীলোকেরা গোলযোগ বাধাইয়াছে তাহা পুরাকাল হইতেই ভারতীয় জীর্ণগণের কতক পরিমাণে নিঃশব্দ ছিল বলিয়াই মনে হয়।

দাস-দাসী

ভূতগণের সহিত প্রভু ও তাঁহার পরি-
বারস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধটি বেশ মধুর ছিল
বলিয়াই মনে হয়। আজকাল অনেক
শিক্ষিত নর-নারী করুণ-রসাত্মক নভেল, গল্প
প্রভৃতি লিখিয়া দীন-দুঃখীগণের প্রতি মনো-
মত্ততা লিখা দিয়া থাকেন, কিন্তু নিঃশব্দের
আহারের সুব্যবস্থা হইলে চাকর-বাকর কি
খাইল না খাইল তাহার বড় খোজ রাখেন
না। প্রাচীন ইংলণ্ডে যেমন লেডি
Hlaf-dige বা অন্নদাত্তী (giver of the

bread) ছিলেন, সেইরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষে
ভূতাদিগের ভরণ-পোষণ এবং বেতন প্রভৃতির
তার গৃহিণীগণের উপরই অর্পিত ছিল।
মহুসংহিতার উক্ত হইয়াছে, দাসগণকে নিঃশব্দ
ছায়ায় মত্ত দেখিবে। (“ছায়াযো দাস
বর্ণক” Manu Ed. M. N. Dutta. Chap
IV—185)। মেহের পাণে স্পর্শ-
গোষাদি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধও অটুট থাকিতে
পারে নাই, তাই মহু সংহিতার বেধিতে
পাই যে সুত্রগণের মধ্যে “কুলমিঞের,”—যে
তাঁহার জমি আবাদ করে—এরূপ ব্যক্তির,
দাসের, গো-রক্ষকের ও নাপিতের অন্ন গ্রাহ্য
অন্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ
ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থালী-সংক্রান্ত কার্যাদির
পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে স্বতাবতঃই মনে
হইতে পারে যে মধুর চক্রবর্তির দ্বারা এই
সকল বিরক্তিকর কর্তব্যের একত্রে
পরিবর্তন গ্রহণ বধুগণের পক্ষে নিশ্চরই
কেন্দ্রকর ত্রুটি। তাহার সহজে যে

মারিগে সারা দিন উপবাস করার নিয়ম ছিল। কোকিল মারিগে দিবসে উপবাস করিয়া রাতে আহারের
বিধি ছিল। শারিকা মারিগা কেলিগে সকালে সজাও জলে ঝাঁড়াইয়া প্রাণাশ্রম করিতে হইত। বিভ্রাল,
বেলী প্রভৃতি মারিগে ব্রাহ্মণকে “কুপন” তক্ষণ করাইয়া দৌহ গষ্ট হান করিতে হইত এবং শব কঙ্কণ
প্রভৃতি মারিগে এক দিন শুধু বেতন খাইয়া কাটাইতে হইত। রূপ সুপহত্যা করিলে ক্ষেত্রে অশুপহত্যা (যে
হয় শীঘ্র প্রভৃতি) শত্রু খাইয়া দিব-মারি অতিব্যাহত করিতে হইত। পরামর্শ সাহিত্য অধ্যায় ৬)
অর্থশাস্ত্রের শব্দগণ অধ্যায়ে (Ed. Shama Sastry p. 117) পত্নশালার বক্তিত বস্ত্র ও গৃহ-পালিত পশু-পক্ষী-
গণকে কি পরিমাণ আহার দেওয়া হইত তাহা বর্ণিত আছে। বলীবর্ধ প্রভৃতির জন্য এক সোণ পরিমাণ
দায়কলাই অত্যন্ত খাড়াবির সহিত মিশ্রিত করিয়া বেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত ১০ আঢ়ক পরিমাণ ছুবি বা
সহস্র শব্দ বইন বেওয়ায় নিয়ম ছিল। উষ্ট্র ও মহিষাদির মস্ত ইহার দুইগুণ পরিমাণ খাত্তের ব্যবস্থা করিতে
হইত। পর্দত ও জুত জাতীয় হরিণের মস্ত অর্ধ আঢ়ক এবং বৃহৎকার হরিণাদির মস্ত এক আঢ়ক খাত্ত নির্দিষ্ট
ছিল। ভাগ, মেঘ ও বহাৎ প্রভৃতির মস্ত এক আঢ়ক বা অর্ধ আঢ়ক পরিমাণ শত্রু ও ছুবি প্রভৃতি বেওয়া
হইত। কুহুরের মস্ত এক গ্রহ জর এবং হংস, হোক ও মদু প্রভৃতির মস্ত অর্ধ গ্রহ জরের
ব্যবস্থা ছিল।

গৃহস্থালীর সকল কার্যাই সম্পাদন করিতেন, তাহা নহে। অবস্থা-ভেদে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী দাস-দাসী নিযুক্ত থাকিত। আধুনিক কালে ইংলণ্ডের সমাজে ধনী ও ভদ্র বংশীরা মহিলাগণের মধ্যে বেতন Lady's maid রাখার প্রথা আছে সে কালেও সেইরূপ রূপদাসী (tirc-women) প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা ছিল। অবসর সময়ে ইহারা ধাতব বা কাঠ, হস্তিবস্ত্র, মহিষ বা সুগন্ধ্য বিনির্মিত প্রসাধনী (চিকম্বী) এবং ধাতুনির্মিত ও “রসাতা” (পারদ সংযুক্ত) ধর্পণ প্রভৃতির সাহায্যে (“বৃত্তিকল্পতরু”) কেশাদি সংস্কার এবং অঙ্গে লোহ, কুন্দু, বস্ত্রমধু যথ তত্ত্ব প্রভৃতি একত্র পেষণপাক্ত কাস্তিবর্জক অলেপ (Vide Garura Purana chap c c Ed. M. N. Dutta p. 63 for the receipt of this cosmetique) মর্দন ও অক্লান্ত অঙ্গর্যাপাদি প্রয়োগ করিয়া গৃহ-স্থানিনীর বেশ-ভূষা সম্পাদন করিয়া দিত।

(১৬) দ্বায়ী গৃহে অল্পপরিমাণে থাকিলে বধূগণ “বিবাহে-আগাছে” উৎসবে, সমাজে, সেবাগর প্রভৃতি স্থানে গুরুজনের অহমতি লইয়া আত্মীয়-অত্মীয়গণের সহিত যাতায়াত করিতে পারিতেন। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, রূপকীবাগণ রাজ গৃহান্তে গমন করিয়া নৃত্য-গীতাদির দ্বারা অস্ত্রঃপুরবাসিনীদিগকে তুষ্ট করিত। মধ্য-বিত্ত সংসারে একরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না তাহা জানা যায় না; তবে যতদূর দেখা যায়, ইলেকট্রিক বাতি, জলের কল, গ্যাস প্রভৃতি না থাকিলেও সেকালের নর-নারী ঘর-বাড়ী ও গৃহস্থালী লইয়া নিত্যান্ত অস্থখে কাল কাটাইতেন না! এই সকল ঘরকন্নার তুচ্ছ ব্যাপারেও প্রাচীন কালের মনোযোগের নিকট হইতে যে এখনও আমাদের শিখিবার অনেক আছে ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার “ধার-করা পালক” পরিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই!

শ্রী গুরুদাস সরকার।

(১৭) বৃত্তিকল্পতরু গ্রন্থে এসাদনী ও ধর্পণ নয়টি রাসোপকরণের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোল-কোষ ও গ্রন্থ-লক্ষ্যাদির ধনা-কোষে, বিভিন্ন গ্রন্থে নির্দিষ্ট “এসাদনী” ব্যবহার করা হইত। ধর্পণ যৈবী, মাসুহ ও রাকস এই তিন প্রকারের ছিল। ইহার মধ্যে মাসুহ ধর্পণ বিলাসোপকরণ-রূপে, যৈবী ধর্পণ পক্ষাধি উত্তমকে এবং রাকস ধর্পণ দুঃকক্ষেবে ব্যবহার করা হইত। এই সকল ধর্পণ ধর্প. রোশা, দৌর, সৌসক, জইবাছু প্রভৃতি বিভিন্ন বাসুতোনির্মিত হইত। পত কান্দন মাসের সাহিত্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিলীপচন্দ্র বেদান্তভট্ট মহাশয় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বাসুদের সমান উত্তমপণকে পৌরব ধর্পণ বলা হইত। চারি অনুলি প্রমাণ লম্বা ও ঐ পরিমাণ চৌকো “বিজয়”ধর্পণ সকলের মধ্যে সুব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সাহিত্যের গোড়ার কথা*

পৃথিবীতে এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের নানাদিকে বৈষম্য আছে। কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে বৈষম্য আছে, যেমন আর্যের সঙ্গে সেমিটিক বা মঙ্গোলিয়ান জাতের বৈষম্য, তা নয়—একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যেও নানা বৈষম্য দেখা যায়, যেমন পশ্চিম যেশ্বর আৰ্য্যজাতির মধ্যে অ্যাংলোসাক্সনের সঙ্গে কেল্ট বা সুভের পার্শ্বক্য নানাদিকেই রহিয়াছে। ভৌগোলিক সংস্থানের বৈচিত্র্যের জন্য প্রথম বিস্তর পার্শ্বক্য দেখা দেয় এবং সেই বৈচিত্র্যের দরুন ও অন্ততঃ নানা কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গঠন ও রীতি নীতির পার্শ্বক্যও পাড়ায়; ক্রমে পার্শ্বক্যগুলি জমিতে জমিতে এক একটা জাতের আকৃতি-প্রকৃতি এমন দানা বাঁধিয়া বসে যে হয়ত অন্তর্জাতের সঙ্গে তার মূলতঃ কোন বৈষম্য না থাকিলেও ফলতঃ এত বৈষম্য হয় যে দুটো জাতকে এক জাত বলিয়া প্রমাণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

জাতিগত এই সকল বৈষম্য সাহিত্যের মধ্যেও ভেদ রচনা করে কিনা, সেইটেই প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু তা যে করে না তার প্রধান প্রমাণ এই যে, যেকোন জাতের সাহিত্যের রস সকল জাতের লোকেরাই আনন্দন করিয়া আনন্দ লাভ করে। সাহিত্যের যত্নে জাতবিচার নাই, এ যত্নে বিশ্বের নিমন্ত্রণ। ইংরাজ বা ফরাসী বা রুশ সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যা চীন বা

জাপানের লোকের উপভোগ্য নয়, অথবা চীন বা জাপানের সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যা ফরাসী বা রুশের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। সাহিত্য এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ভেদের চেয়ে অভেদের কথাটাই বেশি করিয়া প্রকাশ পায়, যেখানে মানুষ আপনার মধ্যে বিশ্বমানুষের অহুত্বকে অহুত্ব করিয়া বিশ্বমানুষের অন্তর্ভুক্তই সেই আশ্চর্য্য অহুত্বকে কতই ছলাকলার সাহায্যে সূক্ষ্ম করিয়া প্রকাশ করে।

অথচ সাহিত্যকে একটা সার্বজাতিক বস্তু বলিলে জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার যেন কোন রকমের সংঘর্ষ নাই, এমন কথা মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। সব রকমের জাতীয়-বিশেষ-বুদ্ধি-কোলা সার্বজাতিক ভাষা বা শিল্প বা ধর্ম বা সাহিত্য যে কেমন-তর অদ্রুত বস্তু হয় তাহা অস্বাভাবিক শব্দ নয়। তার না থাকে কোন রং, না থাকে কোন রস; তাহা রক্তমাংসহীন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট-পদার্থ হইয়া পাড়ায়। যেমন সার্বজাতিক ‘এসপেরান্টো’ ভাষার হয়ত ব্যবসাবানিজ্যের কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সে ভাষার সাহিত্যের ফল কখনই ফুটিবে না। তেমনি সার্বজাতিক ধর্ম, ধর্মের সাধন ও অনুষ্ঠানাদি বর্জিত হইয়া,—সুতরাং ধর্মের আসল রূপবর্জিত হইয়া,—এমন একটা শুকনো জিনিষ হইয়া পাড়ায় যে তাতে কোন সাধকের কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না। তেমনি সার্বজাতিক শিল্প বা সঙ্গীত-

সবদেশের বিশিষ্ট মানস রূপলোকটিকে ও তার নানা ফুট-অফুট চেতন-অর্ধচেতন সঙ্গতি-বন্ধনকে বুঝিয়া ফেলিয়া এমন একটা আকাশ-কুসুম-জাতীয় পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, যার না আছে রূপ, না আছে গন্ধ। সার্বজাতিক সাহিত্যেরও সেই একই মন।

এতো আমরা সকলেই দেখিয়াছি যে, হিন্দুর ছেলে ইংরাজের গ্রেমের নভেল পড়িয়া রস পায়, ইংরাজের ছেলে হিন্দুর ঘরের লক্ষ্মীশীলা অকুপ্তিকার কথা পড়িয়া রস পায়। কিন্তু সার্বজাতিক সাহিত্য তৈরি করার স্বরমাস হইলে এমন একটা সার্বজাতিক সমাজের কথা ভাবিতে হয়, যেখানে এসব বৈষম্য নাই। তার মানে, কেবল মায়ের-ছেলের বা বন্ধুর-বন্ধুর নিত্য সাধারণ মেহপ্রীতির কথা ছাড়া অন্য কোন বিশিষ্ট সমাজের কথা পাড়াই সে ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়; কেননা ঐ সব মেহপ্রীতির ধরণধারণ সব দেশেই মোটের উপর প্রায় সমান। অথচ দেশে দেশে ঐ সব সমাজেরই ভিতরে যে সকল বৈচিত্র্য আছে, সার্বজাতিক সাহিত্য রচনার পাত্রে তাহা ভুলিতে হয়, এবং ঐ সকল সমাজের কেবলমাত্র অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাধীন অবিশিষ্ট দিকটিকেই প্রকাশ করিতে হয়। স্মরণ্য যে প্রকাশ করাও বা, না করাও তা। সাহিত্য চায় নব নব বিষয়, চিত্র-পর্যচিত্তেরই মধ্যে অপরিচিতের, চিত্র-রহস্যের সন্ধান। সেই অন্ত বিশেষ লইয়াই তার কারবার, নির্বিশেষ লইয়া নয়। বিশেষের মধ্যেই সে বিশ্বকে দেখে। বিশেষ ছাড়িয়া বিশ্বের কোন অস্তিত্বকে সে মানে না।

এই সার্বজাতিক সাহিত্যের উন্টানিকে, এক এক জাত যে নিজের বিশেষ বিশেষ মূল আশ্রয় করিয়া বিশ্বমানবের ভাবের আকাশে সাহিত্যের মূল ধরাইবে, তাও সাহিত্য চায় না। সাহিত্য আরও বিশেষের দিকে ধায়। জাত জিনিষটা অনেকগুলো ব্যক্তিকে ভাল পাকাইয়া একটা সমষ্টি। নানা অহুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া এই সমষ্টি গড়ার কাজ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলে, তারপর একরকম দাঁড়াইয়া যায়। জাত কেন, প্রত্যেক জাতের আধার বা অবলম্বন সমাজ জিনিষটাও এই ভাবেই গড়িয়া উঠে। তাও এক জাত বা মশ জাত লইয়া তৈরি হইতে পারে। জাত বলিতেও এমন কিছু বোঝার না যে তাকে স্বতন্ত্র একটি জাতই হইতে হইবে। অনেক জাতের সম্মিশ্রণেও জাত তৈরি হয়। ইংরাজ, হিন্দু, আমেরিকান, চীন—এ সব জাতই নানা জাতের মিশ্রণে উৎপন্ন। কিন্তু প্রত্যেক জাতের সমাজের কাজ বা রাষ্ট্রের কাজ ঐ সমষ্টি-বোধটাকে গড়া, ব্যক্তিকে ঐ সমষ্টির মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের কাজ ঠিক এর উন্টা। সাহিত্য ঐ সমষ্টির জট হইতে ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া তার অনন্ত বিশেষত্বকে বুঝিয়া খুলিয়া দেখায়। তার কাছে এক একটা মানুষই যেন এক একটা বিশ্ব। সাহিত্যে সমাজের ঐ শ্রেণীবোধ বা group-consciousness কাজে লাগে না; ব্যক্তি-বোধই তার সন্ধান ও আবিষ্কারের বিষয়। কোন ছুটা মানুষকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া দেখা চলে না; ছুটা মানুষের মধ্যে ক্রমীম বৈচিত্র্য। এর অগতের সঙ্গে ওর

অগতের অনন্ত পার্থক্য। সেই পার্থক্য সেই বৈচিত্র্যের আবিষ্কারেই সাহিত্যের আনন্দ। সাহিত্যে তাই যে বস্তু বৈচিত্র্যকে আবিষ্কার করিতে পারে, সে ততই মানুষের জীবলোক ও আনন্দলোকের পরিধিকে বিস্তারিত করিয়া দেয়।

অথচ শুধু বিশেষ লইয়া যদি সাহিত্যের কারবার হয়, তবেই এক দেশের সাহিত্য বা এক জাতের সাহিত্য অল্প দেশের অল্প জাতের লোকের কাছে ছুঁকোঁধ ও চুরখি-গয়া হইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি যে তাহা হয় না। কেননা, সাহিত্য বিশেষকেই বিশ্ব করিয়া দেখায়, সেই কারণেই সাহিত্যক্ষেত্রে বিশ্বের নিমগ্ন হয়। সাহিত্যে "Truth is beauty, beauty truth"। যে-বিশেষের সৌন্দর্যকে সে উন্মোচন করে, সে সৌন্দর্যকে সে একটি অমর অক্ষর সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবে। বিজ্ঞানে নিউটন যেমন দেখিয়াছিলেন যে, যে আকর্ষণের নিয়মে আপেল ফল মাটিতে পড়ে, সেই আকর্ষণের নিয়মেই সূর্য্য গ্রহকে আকর্ষণ করে, সে নিয়ম বিশ্বনিয়ম—তেমনি সাহিত্যে সাহিত্যশ্রষ্টা যাকেই মানুষের মধ্যে যখন কোন বিশেষ রহস্যকে আবিষ্কার করেন, তখন অহুসব করেন এবং অহুসব করান যে, সেই বিশেষ রহস্ত বিশ্বমানব-প্রকৃতিরই ভিতরকার রহস্ত, কোন বিশিষ্ট জাতের মানুষের প্রকৃতির রহস্ত যাত্র নহে। তা যদি না হইত, তবে ত সাহিত্য পড়িয়া সকল কালের সকল দেশের লোক এমন আনন্দ পাইতেনই পারিত না।

সমষ্টি-বোধ অনিশ্চয় তাই যে "সাহিত্যে কোথাও প্রকাশ পায় নাই বা পাইতে পারে"

না? সমাজ বা রাষ্ট্র বা বিশ্বমানব কষ্ট কালের ইতিহাসের "পতন-মন্বন-বন্ধুর পহার" ভিতর দিয়া কত আশ্চর্য্য অভিনব লীলার বিচিত্র ও বিপুলারতন হইয়া চলিয়াছে, ইহার যে একটা বিশাল অঙ্কুহুতি, সাহিত্যে কি তাহা প্রকাশ খুঁজিবে না? নিশ্চয়ই খুঁজিবে। কারণ ব্যক্তিবোধের মধ্যেই ত এই বড় বোধটি রহিয়াছে। কিন্তু এই বোধ কোন সংকীর্ণ জাতীয়তার বোধ নহে, তা যদি হয় তবেই তাহা সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায় না। দূরত্বস্বরূপে রডিয়াড্‌ কিপ্লিং ও ওয়াশ্‌ট্‌ হুইটম্যান এই দুই জনের নাম করা বাইতে পারে। কিপ্লিং তাঁর কাব্যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতাভিমান, স্যামুয়েল হুইটম্যানের নাম করা বাইতে পারে। কিপ্লিং তাঁর কাব্যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতাভিমান, স্যামুয়েল হুইটম্যানের নাম করা বাইতে পারে। কিপ্লিং তাঁর কাব্যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতাভিমান, স্যামুয়েল হুইটম্যানের নাম করা বাইতে পারে।

"One's self I sing, a simple
separate person
Yet utter the word Democratic,
the word En masse."

সমাজ বা স্বাধীনতা-বোধকে সজ্ঞান ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টার যে জাতীয় সাহিত্য গড়ে, তা ছাড়া সকল দেশেই সকল জাতের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে লোকসাহিত্য বলিয়া একটা বস্তু গড়িয়া ওঠে। legends, folk-lore, chronicles, sagas, fables, প্রভৃতি বিস্তর সাহিত্য এই পর্যায়-ভুক্ত। এ সাহিত্য ঠিক বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পায় না, অথচ এর যে একটা বৃত্ত ও রস আছে, তাও অবহেলার মিনিস নয়। ইউরোপে মধ্যযুগে troubadour সাহিত্য এই শ্রেণীর সাহিত্য ছিল। gaelic বা celtic সাহিত্যও এই শ্রেণীর সাহিত্য। আমাদের দেশেও কবিওয়ালাদের গান, পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে।

কালিদাসের কালে 'উদ্বলন-কথা' সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে চল ছিল, মেঘদূত গড়িয়া তাহা জানা যায়। পৃথিবীতে এ শ্রেণীর সাহিত্য পরিমাণে বড় কম নয়। এ সাহিত্য খুবই ঘোরা রকমের। সেটজন্য যদি কোন সাহিত্যকে ঠিক 'জাতীয় সাহিত্য' নাম দিতে হয়, তবে এই ধরনের সাহিত্যই সেই নাম পাইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রাদেশিক ব্যক্তি এই সাহিত্যের উচ্চার সাধনের অল্প অনেক সময় খুবই চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেইজন্য তিনি যখন এই সব লোকসাহিত্যকে উচ্চার করিতে চান বিশ্বলোকে, তখন অজ্ঞাতসারে সাহিত্যের লৌকিক অংশগুলি তাঁর হাতে অলৌকিকবে 'রূপান্তর' পায়। বৈষ্ণব সাহিত্য এক সময়ে এসেছে এমন করিয়াই রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগে

এরিয়টো প্রভৃতি যে বড় কবি হইয়াছিলেন সেও এমনভর প্রণালীতে। বর্তমান celtic revival এর কবিতা এমন করিয়াই পুরানো কৈটিক কবিতার মতের বোতলে নতুন ভাবময়ী ঢালিতেছেন—পুরানোকে নতুন রূপান্তরিত করিয়া লইতেছেন। gaelic legendগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া Fiona Macleod ছদ্ম নাম দিয়া আধুনিক কবি Dream Tales, Spiritual Tales প্রভৃতি যে সকল অপূর্ণ গল্পকাব্য রচিয়াছেন, তাও তাদের মেলিকত্ব বিসর্জন দিয়া বিশ্বত প্রাপ্ত হইয়াছে। বাংলা দেশে কবি চিত্তরঞ্জন দাস বৈষ্ণব কবিতা ও কবিওয়ালাদের গানকে এমনি করিয়া রূপান্তরিত করিতে চান। এ বিষয়ে পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

তবু যেমন করিয়াই রূপান্তরিত করা যাক, এ ধরনের ঘোরা লোকসাহিত্য কোন দিনই বড় সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হয় না। গায়টের "কাউন্ট" মধ্যযুগীয় legend বা লৌকিক কথা আশ্রয়ে লিখিত বটে, কিন্তু তার ভিতরে মানব প্রকৃতির যে দিকটি গায়টে আবিষ্কার করিয়া উন্মোচিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা চিরন্তন মানব-প্রকৃতির একটা সত্য বিষ্ণু। সেই কারণে কাউন্টের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গায়টের পূর্বে অনেক নাট্যকার নাট্য তৈরি করিলেও গায়টের নাট্য তাহাদিগকে আশ্বস্যাৎ করিয়া লইয়াছে। 'শেক্সপীরের তাঁর নাট্যাবলীতে সেইরূপ চিরন্তন মানবপ্রকৃতির নানা বিভিন্ন দিককে অপূর্ণ প্রতিভাবলে উন্মোচিত করিয়া দেখাইয়াছেন। হ্যামলেট কোন এক কালের হৃদয় নয়—তার সংসার-বিধা, তার

ভিতরকার বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতাবৃত্তির সঙ্গে ইচ্ছাবৃত্তির প্রবল বিরোধ ও বিচ্ছেদ এবং সেই বিচ্ছেদজনিত তার মানসিক অশান্তি, তার জীবনের অগভীর ট্রাজেডি, ইহা চিরকাল সব মানুষেরই মধ্যে বিচিত্র আকারে দেখা দিয়া থাকে। আমাদের জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে আমরা হাম্লেট বা ফাউস্টের অবস্থার ভিতর দিয়া বাই। আমরা যখন কোন বড় আদর্শকে বুঝি অথচ তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না, দুর্বল ইচ্ছা বারবার যখন আমাদের দিক্‌ভ্রান্ত করে, তখন জীবনের মধ্যে যে ট্রাজেডি ঘনায়, তাহা হাম্লেটেরই ট্রাজেডি। আমাদের ভিতরকার নানা প্রবৃত্তিকে, যখন ক্ষুধিত ও অপরিবৃত্ত রাখিয়া আমরা কেবল মাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যে জীবনটাকে গাড় করাইবার চেষ্টা করি, তখন সেই সব suppressed instincts, সেই সব কড় অন্ধ প্রবৃত্তি কোথা হইতে জীবনের ভিত্তি-মূলে ছিঁদ্র করিয়া এতদিনকার সমস্ত নির্মাণটাকে একেবারে ধূলার শয়ান করিয়া দেয়। সেই যে পাপের মধ্যে কড় প্রকৃতির উচ্ছ্বলিত দুর্বীর মুক্তি, সেই যে জীবনের যোরতর ট্রাজেডি—তাহাই ফাউস্টের ট্রাজেডি এবং তাহাতেই ফাউস্টের মুক্তি। এ সমস্তই চিরকালের মানুষের জিনিস, মানুষের বৃহৎ জীবনের ভিতরকার জিনিস। দাঁতে, গায়টে, শেক্সপীয়ার, ভাউনিং—এইকত কোন বিশেষ বেশে বা বিশেষ কারণে আবদ্ধ হন নাই। সর্বকালের সর্বমানুষের তাঁরা। *লোক-সাহিত্যকে রূপান্তরিত করিলেও তাহা এমনতর

সর্বকালের জিনিস হয় না। জীবনের কতটুকু অংশকে তাহা প্রকাশ করে? তার রূপ অন্ত্যস্ত সংকীর্ণ বলিয়া তার রূপকও অন্ত্যস্ত সংকীর্ণ। আর বড় সাহিত্যের রূপ বড় বলিয়া, তাহা সমগ্র জীবনের রূপ বলিয়া তার রূপক চিরকালের রূপক। প্রতি মানুষ নিজের নিজের জীবনে সেই রূপকের মোড়ক খোলে, সেই রূপকের ব্যাখ্যা করে। শেক্সপীয়ার, দাঁতে, গায়টে, ভাউনিংয়ের সব বড় বড় রচনাই এছেন রূপক—জীবনে জীবনে তার তবব্যাখ্যা, জীবনে জীবনে তার মর্শ্বোন্মাতন।

তাই যদি হয়, যদি জীবনের ভিতর হইতেই বড় সাহিত্যকে পড়িতে হয়, তবে সমাজভেদে যে সাহিত্যভেদ হয়, তার কি করিবে? ইউরোপীয় প্রণয় কবিতা তবে হিন্দু ছেলে জীবনের ভিতর হইতে কেমন করিয়া পড়িবে? কেন, গ্রেম জিনিসটা কি ইউরোপীয়েরই একচেটিয়া, হিন্দু কোটশিপ করিয়া বিবাহ করে না বলিয়া তার কি গ্রেম হইতে পারে না? একথা অবশ্যই মানি যে, আমাদের দেশে সমাজব্যবস্থার ত্রা পুরুষের মধ্যে স্বাধীন ভাবে গ্রেমের বিনিময় হইতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ ত্রা পুরুষের। গ্রেমসম্বন্ধে পরম্পরের স্বাধীন নির্বাচন নাই বলিয়া গ্রেমের ক্ষেত্র এ দেশে অন্ত্যস্ত সংকীর্ণ। সেইজন্য খাঁটি গ্রেমের কবিতাও এদেশে বিরল। পুরাকালে গাভর্ক বিবাহ জিনিসটা প্রচলিত না থাকিলে কালিদাসের “শকুন্তলা” লেখা সম্ভবই হইত না। তবু, সংস্কৃত সাহিত্যে মানব গ্রেমের প্রকাশ কতটুকু

হইয়াছে? কামের বর্ণনার পরিমাণ প্রেমের বর্ণনার পরিমাণের চেয়ে চেয়ে বড়। নারীর রূপ লইয়া সংস্কৃত কবি যতটা বাস্তব, নারীর মন লইয়া ততটা নয়। নারী শুধু রূপের অস্ত্র পুরুষের উপভোগ্য, এই ভাবটাই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবল। তার পর সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রেমের কাব্য আছে, তাতেও এই লালসার দিক্ই প্রবল। সুস্থভাবে দেখানেই প্রেমের মত এত বড় একটা মানব বৃত্তির চরিতার্থতা হয় না, চরিতার্থতার বাধা হয়, সেখানে তাহা অসুস্থ বিকারে প্রকাশ পাইতে বাধা। বাঙালীর “বিদ্রাহস্বর” সেই অসুস্থ বিকারের কাব্য। বৈকব কাব্যের মধ্যেও সেই বিকারের দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি মেলে, এবং তার কারণও ঐ একই। তবে বৈকব কাব্যকে আধ্যাত্মিক করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাকে লৌকিক দিক্ হইতে বড় একটা দেখি না। কিন্তু পোড়াতে তাহা যে একেবারেই সুস্থ আধ্যাত্মিক ছিল এমন আমার ত মনে হয় না। বিদ্রাহপতির মধ্যে যে সব লালসার লক্ষণে বর্ণনা পাই, তাহা তিনি আধ্যাত্মিক অর্থে মোটেই দেখেন নাই। একমাত্র চণ্ডীদাস ও কতক পরিমাণে বলরাম দাস ভিন্ন আর কোন কবিই “love's rare universe” প্রেমের অপূর্ণ জগতের খবর পান নাই। “পিরীতি-নগর”র স্বপ্ন সেই মহাকবিই দেখিয়াছিলেন—যে পিরীতিতে, “কামদগ্ধ নাহি”। বাংলা দেশে এখনও পর্য্যন্ত, এই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের

প্রভাবের যুগে আমাদের গল্প উপভোগ্য কাব্যে প্রেমের ছড়াছড়ি হইলেও তার বাংলা জানাই যে “বসন্তরহীন” তার একমাত্র কারণ, প্রেমবস্তুর সাক্ষাৎকারই আমাদের চর নাহি। ইউরোপীয় সাহিত্যের নকল করিয়া আমরা অধিকাংশ প্রেমের কবিতা লিখি, প্রেমের নভেল লিখি। গোবিন্দলাল-রোহিণী, নগেন্দ্র-কুন্দনান্দিনী, মহেন্দ্র-বিনোদিনী, প্রভৃতি যে সকল প্রেমের চিত্র বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন তার নারিকারা সবই বিধবা; কেননা সমাজে ঐ এক জায়গার স্বাধীন প্রেমের একটু খানি সামান্য স্রবোগ আছে বলিয়া ঐ চিত্রটাই সাহিত্যে এত বড় করিয়া এবং এত বারেবারে দেখা দিয়াছে। তার কারণ, যৌন প্রবৃত্তির ক্রমাগত নিরোধ, sex-suppression, আমাদের চিরকালে শিক্ষা ও অভ্যাস বলিয়া অসুস্থ ইন্দ্রিয়বিকার (abnormal sexuality) আমাদের সাহিত্যে ক্রমাগতই নানা আকারে দেখা দিয়াছে ও দিবে। বাঙালীর অস্থিরজাগত দুর্বল ভাবাভি-লম্বার (sentimentality) একটা মত কারণই তাই—তার প্রেমের সুস্থভাবে ক্ষুণ্ণসাধন হইবার কোন স্রবোগ নাই। সেইজন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সেই ভাবাভিলাষ ‘দশা’ পাইতে থাকে, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা কল্পনার ভিতর হইতে নানা বিকারের সৃষ্টি করিতে থাকে।

তবে কি ইউরোপীয় সমাজের সুস্থ নকল করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই? নকল করার কথা জুলিয়ার প্রয়োজন নাই; কারণ এক দেশের সমাজের রীতি-

নীতি উৎপাদন করিয়া অস্ত্রদেহের মাটিতে কখনই তাকে বসানো যায় না। আমাদের দেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ও বনিবনাও করিয়া জ্ঞান যে সামাজিক গঠনটি পাড়াইয়া গেছে, যে সব নীতি নীতি আচার বাবংবার পাড়াইয়া গেছে, তাহাদের উপযোগী ও অনুযায়ী করিয়া ধীরে ধীরে নূতন সংস্কার প্রবর্তন ভিন্ন সমাজসংস্কারের অস্ত্র কোন প্রশস্ত উপায় হইতে পারে না। প্রেম সহজে দ্রোণ-পুরুষের পরম্পরের স্বাধীন নির্বাচন আমাদের দেশে কোন কালে যে ছিল না, একথা তো বলা চলে না। ছিল—ইহা যদি সত্য হয় তবে বর্তমান কালেই বা না থাকিবে কেন? অবরোধ-প্রথা ভারতবর্ষের চিরকালের প্রথা নয়, যে বিবাহ-রীতিপদ্ধতি এখন প্রচলিত তাও ভারতবর্ষের চিরকালের বিবাহ-রীতিপদ্ধতি নয়। অতএব, অবরোধ প্রথা যদি তিরোহিত হয়, স্বাধীন নির্বাচনের প্রথা যদি প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলেই যে ইউরোপীয় সমাজের মকল ভিন্ন আমাদের পরিচয় নাই এমন কথা মনে করিবার কোন ছেতুই আমি দেখিতে পাইতেছি না।

একথা জানিতে ও মানিতে হইবে যে, সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্যের ক্রিয়া সমাজে বেধা বেধ, সমাজের ক্রিয়া সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। যে কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহা আমরা বেশ বৃদ্ধিতে পাই। ইংলণ্ডে যে ব্যক্তিস্বাভা বা individual liberty উপর তার বর্তমান সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিস্বাভা তার সমাজে নিঃ রাষ্ট্রে

বরাবর ছিল কি? যে আকারে এখন তাহা দেখা দিয়াছে তার জন্ত ইংলণ্ডের সমাজ ও রাষ্ট্র কি ইংলণ্ডের সাহিত্যের কাছে কিছুমাত্র দায়ী নয়? socialism বা labour emancipation—প্রভৃতি আন্দোলনের মূলেও তার সাহিত্য রহিয়াছে। কার্ল মার্ক্স, রাবিন প্রভৃতির সাহিত্যই তার প্রমাণ। অত বড় যে ফরাসী বিপ্লব, তার মূলেও ছিল ভল্টেয়ার, রুশো প্রভৃতির সাহিত্য। সেইজন্য আইরিশ কবি ওলেনেসি যে ঘোর করিয়া কবিত্বের সহজে বলিয়াছেন যে “we are the movers and shakers of the world forever it seems” আমরা চিরকাল মগৎকে নাড়া দিয়া থাকি—তা খুবই সত্য। সাহিত্যের জন্তই সমাজে নানা আন্দোলন বেধা যায়, নানা পরিবর্তন ঘটে, আবার সমাজের জন্তও সাহিত্যের প্রকাশ কখনো বা সংকীর্ণ ও বিকৃত হয়, কখনো বা ব্যাপ্ত ও প্রবল হয়।

বাংলা দেশে এই কল কালের মধ্যেই ত দেখিতে পাইতেছি যে, যদি বহিঃমস্ত্র তাঁর উপজালে রোমাটিক চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টি না করিতেন, তবে বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে যে সকল চিত্র ও চরিত্র কোন কালেই বাস্তব আকার লাভ করিত না। বহিঃমস্ত্র পূর্বে মাইকেল যদি পরারের বেড়ি ‘তাঁতার মত তাঁর কাব্যে convention-এর বেড়িগুলি না খুলিয়া কেলিতেন, তবে তাঁরই কালে বহিঃমস্ত্রের রোমাটিক উপজাগগুলিই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। বহিঃমস্ত্র ভ্রমর, সূর্যাসুখী, কন্দনন্দিনী, গোবিন্দলাল, এ সব একসময়ে-অবাস্তব রোমাটিক চরিত্র এখন এদেশে আধুনিক সময়ে বাস্তব হইয়া গেছে।

এগুলি, আর ত কাল্পনিক চরিত্র নয়। এমন করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভিত্তর দিয়া নূতন types নূতন প্রকৃতি আমাদের সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ প্রাণবান হইয়া উঠিতেছে। এই পরিবর্তন শনৈঃ শনৈঃ—অথচ গোপনে, অলক্ষিত ভাবে—ঘটিতেছে বলিয়াই সমাজ-রক্ষকের দল সময়ে সময়ে এই অভিনব সাহিত্যকে খেলাইবার অস্ত্র নানা ‘বোহেমুগার’ উদ্ভাটন করেন, তবুত মোহ ছুটে না। এমন প্রস্তাবও কখনও কখনও কোন কোন মাসিক পত্রে দেখা যায় যে, এই সকল আধুনিক উপভাস নাট্য হিন্দু মেয়েদের অপাঠ্য। অতএব তাহাদিগকে এ সকল পড়িতে না দিয়া শুধু সীতা সাবিত্রীর কথা পড়িতে দেওয়া হোক্। প্রতাবকারীদের ডর এই যে, এই সকল আধুনিক উপভাস পড়িলে মেয়েদের প্রকৃতির যে বদল হইবে তাতে সমাজব্যবহার ওলোটপালোট হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে মেয়েদের সাহিত্য পড়ানো বন্ধ করার প্রস্তাবই তাঁদের করা উচিত। কেননা, মহাভারত পড়িলেও মেয়েদের মন ঠিক হিন্দু আধুনিক সমাজ-ব্যবহার হাঁচে না গড়িতেও পারে। সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাহিত্য সন্দেহও সেই কথা। তার পর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এক কবিকল্প চণ্ডী ও কুন্তিবাসী রামায়ণ আর চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিরক্ষর চ্চারিধানি বই ছাড়া মেয়েদের পাঠ্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব কাব্য পড়িলে বা ভারত-চন্দ্র পড়িলে তাদের বত অনিষ্ট হইতে পারে আধুনিক নাটক নভেল পড়িলে কি তত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যাঁরা এ সব কথা লইয়া আলোচনা করেন, তাঁরা ভাবেন না যে, জীবনের গতিকে রোধ করিবার সাধা কোন সমাজব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থাকারের হাতে নাই। যে জীবনের শ্রোতের তোড়ে এই নূতন সাহিত্য এদেশে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সমাজের অনেক বাধনকে ভাঙিবেই, অনেক বাধা কুলকে ভাসাইবেই। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা তার কাজ অনেক বেশি-দূরগামী ও গভীরগামী। তাকে রোধ করিবার প্রস্তাব থায়া করেন, তাঁরা জানেন না যে তাঁরা অসম্ভবের বিরুদ্ধেই লড়িবার প্রস্তাব করেন।

সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের কোন-খানে যোগ আছে আর কোন-খানে যোগ নাই, তাহা আলোচনা করা গেল। সাহিত্য জাতীয়তাকে মুছিয়া সার্বজনাতিক হয় না, আবার কেবল মাত্র জাতীয়তা-বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াও প্রকাশ পায় না। সাহিত্য কেবলি বিশেষকে আবিষ্কার করে এবং সেই বিশেষের মধ্যেই বিশ্বকে দর্শন করে। সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ-বোধ ও বিশ্ববোধ চরিত্র সমাবেশ। সেই হিসাবেই সাহিত্য সার্বজনাতিক বস্তু হয়। সেই বিশেষ-বোধের অস্ত্র সাহিত্য সমাজেও নব নব আন্দোলন উপস্থিত করে। সাহিত্যের প্রভাব সমাজের উপর পড়ে; আবার সমাজের প্রভাবও সাহিত্যের উপর পড়ে। সমাজ সংকীর্ণ হইলে বা বিকৃত হইলে সেই সংকীর্ণতা বা বিকার সাহিত্যকেও আক্রমণ করে; সমাজ স্বাধীন ও স্বাধ হইলে তার সেই স্বাধীনতার স্বাভাৱ সাহিত্যকে নব নব সৃষ্টির উত্তম পূর্ণ করিয়া রাখে।

ঐঅশ্বিনকুমার চক্রবর্তী।

মুসলমান সমাজ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

হিন্দু পরিবারের পাশাপাশি মুসলমান-পরিবার। হিন্দু আইনের বিরুদ্ধ মুসলমান আইন। মুসলমানের মধ্যে মুসলমান-আইন, প্রাচীন আরব-আইনই রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় ও মূল্যবোধের সঙ্কে, আরব-জাতি ব্যবস্থা-প্রণয়নে যে বিশেষ-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে তাহা হিন্দুজাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহার পর, উহার ইচ্ছা ত্রিভুজের দ্বারা পরিচালিত হয়; প্রাচীন গ্রীষ্ম, পারস্য, রোম, বৈজ্ঞানিক এবং যুরোপীয় নবীন জাতি সমুহের প্রভাবের বশবর্তী হয়। কিন্তু একটি অপরিবর্তনীয় ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আইন হিন্দুদের জায়, প্রতিষ্ঠা নীতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশ লাভ করে নাই; উদ্দেশ্যে আইন কতকটা আরবীয় ও কতকটা যুরোপীয়, কারণেই ভারতীয় মুসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। তাহার উৎপত্তি-মূলে হিন্দু—তাহার ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবের পরেও হিন্দু রহিয়া গেল। তুর্ক, মোগল, আফগান প্রভৃতি অল্প মুসলমানেরা শীঘ্রই অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক দেশীয় লোকের দৃষ্টান্ত ও আব-হাওয়ার বশীভূত হইয়া পড়িল। আইন ও লোকপ্রকৃতির বিরোধ বশতঃ উহা হইতে দুইটি “পরিণাম-ফল

উৎপন্ন হইল : আইন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবহার এবং মুসলমান-সমাজের অবনতি।

মুসলমান-আইনের মূল রেখাগুলি নিয়ে যেওয়া যাইতেছে :—আরবদিগের পিতৃ-ভ্রাতৃ-পরিবার-পদ্ধতির স্বীতি প্রায় কিছুই রহিল না।

সাবালকবয়স্ক বয়স যৌন বয়সের নির্ধারিত হইল। নাবালকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পিতার উপর, উপরিজন পিতৃ-বংশীর উপর অথবা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিদের উপর স্তম্ভ হইল। কেবল পূর্কোক্ত ব্যক্তি-দিগের অধিকারই, মাতা এবং উপরিজন মাতৃ-বংশের লোকেরা উক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার পায়। কিন্তু মাতা পুনর্বিবাহিতা না হইলে, স্বীয় নাবালক পুত্রের শিক্ষার তাহাবধান করেন এবং বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় কস্তার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন। (১)

হিন্দু-আইনের জায় মুসলমান-আইন, অবিভক্ত পারিবারিক স্বাধিকার স্বীকার করে না। এইরূপে দেখা যায়, মুসল-মানেরা সভ্যতার আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে। মুসলমান-আইন দানপত্র-বর্জিত ও দানপত্র-সম্বন্ধিত উত্তরাধিকার উত্তরাধিকারই স্বীকার করে। তবে কিমা, দানপত্র-

(১) বালক “গার্বি” নামে এবং নাবালক যুবক “ব্রাহ্মিক” নামে অভিহিত হয়। ১০ হইতে ৩০ বয়সের বয়স পর্যন্ত মুসলমানদের পদবী “শাব”, ৩০ হইতে ৫০ পর্যন্ত “কোহল”, তাহার পর মুসলমান, “শেখ” উপাধিতে অভিহিত হয়। তা ছাড়াও মুসলমানদের বীক্ষিত অনেক হিন্দু-জাত এই “শেখ” পদবী গ্রহণ করে। ১১১১ অব্দের আদম-শুমারে ২৭, ১১৪, ১১৬ “শেখ” পদবীভুক্ত হইয়াছে।

পুত্রে কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইলে, দানপত্র-বিবাহিত উত্তরাধিকারী, সম্পত্তির এক তৃতীর অংশ মাত্র প্রাপ্ত হয়। মুসলমানের আইনে জোষ্ঠাধিকারের নিয়ম নাই। কস্তা-মিগের অংশ, পুত্রমিগের অংশের অর্ধেক। কোন মৃত পুত্রের সন্তানেরা স্বীয় পিতৃবা-মিসের অধিকার-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। মৃত পুত্রের নিকট-আত্মীয়েরা, সন্তানেরা, পত্নী—ইহারা পরবর্তী ভাবী উত্তরাধিকারী।

হিন্দু-আইনের বিপরীতে মুসলমান আইনে, বোগ্য বয়সের পুঙ্খ বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহসম্বন্ধীয় চুক্তির সিদ্ধতার পক্ষে, পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছার স্বাধীনতা ও মানসিক স্বাভাৱ অঙ্গুর থাকি চাই। প্রাপ্তবয়স্কা নৃবতী কস্তা, স্বাধীনভাবে স্বীয় পতি নির্বাচন করে; অপ্রাপ্ত-বয়স্কা নৃবতী কস্তা স্বীয় পিতা অথবা গুরুর সম্মতি গ্রহণ করে; পিতা, অল্প বয়সেই কস্তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন; কস্তা যোগ্য বয়সে উপনীত হইবার পুঙ্খ এই বাগদান হইলে তবেই তাহা সিদ্ধ হয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা, মুসলমান-আইনকে হিন্দু-আইন অপেক্ষা উচ্চতর জাতিগত স্থাপন করিয়াছে। এবং হিন্দু-আইনে “অন্ত-বিবাহের” যে নিয়ম আছে, মুসলমান-আইন সে সকল নিয়মও স্বীকার করে না!

কেবল মুসলমান-আইনে,—মাতার সহিত, মাতামহীর সহিত, ভ্রাতৃত্বের সহিত, পুত্রবধূর সহিত, মোহিতীর সহিত, সহোদর ভগিনীর সহিত, পুত্রীর সহিত, স্বীয় পাত্রীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। মুসলমান কোন বিধবাকে

বিবাহ করিতে পারে—যদি সেই বিধবী ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয় (ভারতবর্ষে, মুসলমানেরা হিন্দুধর্মকে ও বিবাহ করে)। ইসলামধর্ম মুসলমানকে চারটা ধর্মপত্নী ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক উপপত্নী গ্রহণ করিতে সম্মতি দেয়। বিবাহ-ভঙ্গে কোন বাধা নাই। কিন্তু যে পত্নীকে স্বীয় পতি তিন বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাকে সেই পতি পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে না—যদি তৃতীয় বারের প্রত্যাখ্যানের পর সে আর কাহারও পত্নী না হইয়া থাকে। হিন্দুধর্মের স্ত্রায় মুসলমানেরা অহুষ্ঠানগ্রহণ নহে; তাহাদের মতে, বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র; সেই চুক্তির দ্বারা উত্তর-বংশীয়দের বৈধতা সম্পাদিত হয়। মৃতমিগকে বিনা-আড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়। একটি সাধাসিধা প্রস্তর-খণ্ডই মৃতের সমাধি-স্মারক। কিন্তু হিন্দুদের দৃষ্টান্তে অনেক মুসলমানই আশ কাশ বিবাহ ও অত্যাচারের অহুষ্ঠানে আড়ম্বরপ্রিয় ও অতিব্যয়শীল হইয়া উঠিয়াছে।

• •

ভারতীয় মুসলমানমিগের জীবন-যাত্রা নির্বাহ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা :—সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণকে যেমন আমি হিন্দুর মূল-আদর্শ রূপে ধরিয়াছি, সেইরূপ বহু শতাব্দী হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত আরব পরিবারের বা মোগল পরিবারের কোন সম্ভ্রান্ত সামন্ত শ্রেণীর ব্যক্তিকে মুসলমান জাতির মূল-আদর্শ রূপে গ্রহণ করিব। দৃষ্টান্ত যথা :—হেবরাবাবের নবাব। উক্ত ধনশালী, পরাক্রান্ত নবাব প্রাঙ্গণে বাস করেন। প্রাসাদটি

প্রকার-পরিবেষ্টিত এবং বৃহৎ বেটনীর মধ্যে বহুসংখ্যক মণ্ডপ-গৃহ অধিষ্ঠিত। বৃহৎ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দুয়ের মিশ্রণই মুসলমান প্রাঙ্গণের পরিচায়ক লক্ষণ। সামন্তরাজ-শুলভ অমৃতবর্গ :—অধীন আরগীরদার, সৈন্য, ভূতা, বাজপানী-রক্ষক, কুকুর ও শিকারী চিতার তত্ত্বাবধায়ক। কতকগুলি হাতী। কয়েক শত ঘোড়া। বিভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদধারী সৈনিক ও ভূতা :— হিন্দু, আরব, মোগল, যুরোপীয়। আরবেরা আড়ম্বরময় আতিথ্যের অমুরাগী। বড় বড় দালান-ঘরে, অতিজ্ঞাতবর্গ, সাধারণ জনসমূহ, ডিক্কুর দল, মাছরের উপর অথবা উচ্চ গদির উপর, পা-ভ্রমড়াইয়া বসিয়া আছে, তাহাদিগকে নানা প্রকার খাদ্য দেওয়া হইতেছে; কাকি দেওয়া হইতেছে, ছক দেওয়া হইতেছে। গৃহকর্তা আসিলেন। সকলে উত্তীর্ণা পাড়াইল। ইনি প্রায় অশ্রুহীন কোন মুক, অথবা ধীর-গুত্র-অশ্রুধারী কোন শেখ। প্রকৃত মুসলমান-শুলভ প্রশান্ত ভাব ও গাভীরা তাঁহাতে আছে। গোলাকার পাগড়ী, শত্রুপমণ্ডিত শিকরের পরিচ্ছদ। বীরে বীরে কথা কহেন, ইহার আদব-কারদা সন্তোষজনক। এই গর্জিত ধরণের আদব-কারদা সকল মুসলমানই আরবদের নিকট হইতে শিখিয়াছে।

ইহারা বখানিরম সমাজ করে;—কিন্তু প্রকৃত ধর্মভাব উহাদের গৃহই কর্ম। উহারা শাস্ত্রবিহিত উপবাসের নিয়ম পালন করে;

বিবাহাগে হুতাপান করিতে বিরত হই, কিন্তু রাত্রিকালে স্বেচ্ছাপ্রথমে হুতাপান করে (২)। অলস-মহলে বহু রমণী; কিন্তু তথায় পার্শ্বাধীন আদৌ নাই :—বিবাহিত পুত্রেরা পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কাজ-কর্ম :—কোন স্বাধীন রাজার অধীনস্থ কোন কর্মচারী হইলে এই সম্রাট ব্যক্তি রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন কাজ করে, অধীন আইগীরদার-দিগকে অভিযুক্ত করে। মোটের উপর, ইহারা অলস, নৈকর্মা-ক্রান্ত, আড়ম্বরময় জীবন যাপন করে।

অল্প মুসলমানই ধনবান ও প্রভাবশালী; মুসলমানের না-আছে মনের নমনীয়তা, না-আছে নূতন-সভ্যতার সহিত আপনাকে উপযোগী করিবার ইচ্ছা। তাহার অন্তরাশ্রাট। সৈনিকের অন্তরাশ্রা; শাস্তির বেনে সে কি করিবে তাবিয়া পায় না; সেনানায়কের কাজে সে অভ্যস্ত; যে বেনে কোন বিপরী সেনা-নায়ক, সে বেনকে সে হুঁচকে দেখিতে পারে না।

মালাবারী নামক একজন পার্শ্বী, গুজরাটস্থ মুসলমান আমীর-ওমরাও-দিগের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—মুসলমানেরা হুতাপানের এবং নানাদিক পরিমাণে সমস্ত গুজরাটের প্রভু ছিল। কিন্তু এক্ষণে, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, শ্রেণীর হিলাবে সম্ভবতঃ তাহারা বার-পত্র-নাই দখিত। উহাদের অভিজ্ঞাতবর্গ লক্ষ্যশূন্য উচ্চাভিলাষ-বিরহিত জীবন-যাপন করে। এই সব লোক স্বকীয়

(২) এই হলে, হুতাপানের মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধেই কথা হইয়াছে। যিনিই সমালোচক মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে এই একমত বাধা বলিয়াছেন সাধারণ ভারতীয় মুসলমান-সমাজের সম্বন্ধে তাহা সর্বোপায়ে সত্য বলিয়া মনে হয় না।

কুল-গর্বের চাপেই নিম্নেবিত ; এবং উহার অমাহারে মরিবে, তবু ভিক্ষা করিবে না। উহার "সৌভাগ্যের আঁচল ধরিবার" জন্ত সততই প্রস্তুত। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাহাদের নিকট কখনই আসে না। স্তম্ভগর্ভ ভোগস্থ ও অলস ক্রিয়া-কর্ম লইয়াই তাহাদের নৈতিক জীবন গঠিত এবং তাহাদের বাহ্য-কিছু ধন-সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা "রাজা-রাজা" খেলাতেই নিঃশেষিত হয়। সেই "পুরাতন স্ত্রের মিনের" জন্ত তাহারা ক্রমাগত আক্ষেপ করে, এবং তাহারা হতাশ হইয়াও তবু আশা ছাড়িতে চাহে না, এবং স্ত্রীনের জন্ত আশা করিয়া-করিয়া আশ্চর্য্য বৈধব্য-সহকারে জীবন কাটাওয়া দেয়। সময় কাটে না দেখিয়া অনেকে ইন্দ্রিয়-স্ত্রের হাতে আপনাদিগকে একেবারে সমর্পণ করে। এইরূপ "নির্কোষের স্বর্গে" থাকিয়া উহার নাচে, গানে, পানাহারে সময় অতিবাহিত করে। ভাল কাজের কথা উহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বেচারা! বন্ধুর হিসাবে দেখিয়াছি উহার খাঁটি বদ্ধ। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই হীন দারিদ্র্যাপেক্ষে নিমজ্জিত ; এবং বাহিরে একটা মান-সম্মতের ভড়ং রাখিবার জন্য (বাহ্য উহাদের গ্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়) গৃহকর্তার অতীব মমতাদায়ী পত্নী ও ভক্তিমতী ছুঁহিতা বাধ্য হইয়া গৃহকর্তার জন্ত যে আত্মত্যাগ স্বীকার করে গৃহকর্তা তাহাতে অসুযোগ করেন। কোন কাজকে কর্তব্য বলিয়া এইরূপ ভুল করিলে অবজ্ঞা মার্জনা করা যাইতে পারে—(এইরূপ আচরণ 'খুবই সীমাবদ্ধ') ; এইরূপ ভ্রান্ত আচরণ রমণীর পক্ষে

প্রকৃত আত্মবিসর্জন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এই আচরণে পতি কিংবা পিতার যে অংশ আছে তাহা না রূপা করিয়া থাকে যায় না। তাহারা হাড়পাকা বহুবিবাহ-ভক্ত, স্ত্রত্যাগ এ বিষয়টা তাহাদের চক্ষে আদৌ গুরুতর বলিয়াই চৈকে না।" (৩)

এই চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদনার্থ, ত্রিভুজ মালাবারি, একজন হিন্দু কার্যাদেশের স্মৃতি-কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন :—একজন আদর্শ-ভ্রাতা—তাহার প্রভু আমীর-ওমরাও-দিগের এত ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল যে দেশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি তাহার নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রভু ছইলেন :—এক যুবক "মীর," আর এক রূপলাবণ্যবতী বুদ্ধিমতী রমণী। পিতার সহিত মনান্তর হওয়ার, মীর সর্বদাই পিতার মৃত্যুর কামনা করিতে লাগিল ; মনে করিল, উত্তরাধিকারস্বত্বে পিতার ধন-সম্পত্তি পাইলে, মীর স্বকীয় ভগ্ন পরিশোধ করিবে ; কিন্তু পিতার মৃত্যু হইল না, সে সুস্থিলে পড়িল। কষ্টের সীমা চূড়ান্ত নাভার উঠিল, উত্তরাধিকারী পুত্র নিজেই পীড়িত হইয়া পড়িল। মুসলমান হাকিম তাহার রোগশয্যার পাশে বসিয়া দিবারাত্রি চিকিৎসা ও সেবা-সুপ্রভা করিতে লাগিল। এবং মোমাও অষ্টগ্রহর তাহার আরোগ্যের জন্ত আন্নার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার বাপ-মা ব্যতিব্যস্ত ও সংশয়াকুল চিন্তে তাহার চারিপাশে বোরাবুড়ি করিতে লাগিল। মাতা তাহার শব্দ-অঙ্গুরীটি—তাহার পামীর বিবাহ-যোত্বকের অঙ্গুরীটি

পর্বাঙ্ক আমাকে বিজ্ঞার্থ দিলেন। কিন্তু কোন পার্থিব শক্তিই পুত্রটিকে রক্ষা করিতে পারিল না—পুত্রের মৃত্যু হইল।

এই নিদারুণ সময়ে, গৃহিণী কান্না হইতে বাহির হইয়া দরজার কাছে আসিলেন (আমরা বত কন্ঠস্বরী দরজার বাহিরে জড়ো হইয়াছিলাম)।

তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই সর্বপ্রথম তাঁহাকে আমি দেখিলাম। তিনি তখন নিস্তার পরিত্যক্ত পরিত্যক্ত ছিলেন; তাঁহার রূপলাবণ্য ব্যস্তবিকই ধোঁষোপম। এবং সম্প্রতি তিনি যে কষ্ট-বরণা ভোগ করিয়াছিলেন সেই-সব কষ্ট-বরণা তাঁহার শ্রী-সৌন্দর্যকে এমন এক প্রশস্ত পবিত্র গাভীরোর দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিল যে অতি-বড় উচ্চত লোকও তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি অবনত মস্তকে তাঁহাকে সেলাম করিলাম। মানাপ্রকার ভাবনা-চিন্তার আকুলচিত্ত হইয়া আমি তখন কাঁপিতে ছিলাম। তিনি গর্জনের আমার পানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এবং বিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাকে কিছু অর্থ দিতে পারি কি না। আমি আমার অসামর্থ্য নিবেদন করিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিব বলিষ্ঠাও অঙ্গীকার করিলাম। তখন তিনি আমাকে সহৃদয়ে বলিলেন;—“দেখ, নরানচাঁদ, তোমাকে তোমার মনিবের দান ষাঁচাতে হবে, তাই বলিষ্ঠা তুমি ওর বাপের বাড়ী যেও না। তুমি ভদ্র-রকমে আমার ছেলের গোর দিবার ব্যবস্থা কর, এমন কোন জিনিষ কি অবশিষ্ট নেই। যা তুমি

বিক্রী করতে পার? কিছুই কি নেই? কিছুই কি নেই?” আমার নিকট হইতে উত্তর পাইবার পূর্বেই তিনি দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি টাকা আনিবার জন্য বাহির হইলাম। আমার হাতে টাকা ছিল না, টাকা ধারও পাইলাম না। এক যদি মীরের নিকট হইতে পাওয়া যায়, সেই একমাত্র সম্ভাবনা। আমি মীরের নিকট গেলাম, তাঁহাকে পৌত্রের মৃত্যুসংবাদ দিলাম। তিনি তখন নিজেই রোগশয্যায় যুযুঁ। কিন্তু তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন না করিয়াই একশো টাকা আমাকে দিবার জন্য তৃত্যবর্ণকে হুকুম করিলেন।...তাঁহার পর, উক্তাধিকার-সূত্রে বৃদ্ধদিগের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবার জন্য তাঁহার উপর কিরূপ ভার দেওয়া হইয়াছিল, সেই কথা ঐ হিন্দু কার্য্যাধ্যক্ষ আমার বলিতে লাগিলেন :—সেই ভৃত্যের এমনি সন্ততা যে, প্রকৃত ধনসম্পত্তির মধ্যে তাঁহার মনিবেরা ৪০০০ টাকা মাত্র পাইয়াছিল। এখন তাঁহার পূর্ববর্তের নিকট হইতে বৎসামাত্র পেনসান্ পাইয়া ঈর্ষিকা নির্বাহ করে। আর ঐ ভৃত্য এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসারে ব্যাপৃত; এখন সে ধনশালা, মালগণ্য সজ্জি; এখন পাছে, যান খোঁরাইতে হয় এই ভয়ে মনিবদিগকে সে একটা সেলামও করে না। শ্রীযুক্ত মালাবারি আরও এই কথা বলেন :—

“শাধারণ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বাক্যব্যর না করাই ভাল। উহার কথা গর্বে পূর্ণ, উহাদের জাঁক-জমক ও জারীজ্বীর অস্ত্র নাই। সত্য কথা উহাদের গলায় বেন আটকাইয়া যায়। সম্রাট মুসলমানদিগের

তার উহারও কাজ-করাটা হের বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহাদের বিপরীতে, সাধারণ মুসলমানেরা ভিক্ষা করে, টাকা ধার করে, চুরী করে—এমন-কি আনন্দের সহিত এই সব কাজ করিয়া থাকে। উহাদের জীবনের একমাত্র কাজ :—মর্দরা ও প্রেমণ। অনেকেই দিনে নিত্ৰা বার ও রাতে হুত্থাপানে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল দুর্বাসন সত্ত্বেও, অনেক মুসলমানের কতকগুলি সদ্বৃত্তও আছে। এমন বহু, এমন ভৃত্তা আর কোথাও মেলে না। যদি উহাদের সহিত তুমি সঘর ব্যবহার কর,—তোমার অন্ত উহার প্রাণ পর্যন্ত বিলক্ষন করিবে।” (৪)

অতএব দেখা যায়, একদিকে যেমন হিন্দুসমাজ বহুশতাব্দীকালসংস্কারে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে, তেমনি সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উচ্চে অধিষ্ঠিত হইলেও মুসলমান-সমাজ ক্রিষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু কোন সমাজের উন্নতির গতিরোধ হইলেই তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। মুসলমান-সমাজের উচ্ছেদেই ইরোপীয় সভ্যতার প্রসারে সুবিধা হইল।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রূপসী

পাত্র ও পাত্রী

নিরঞ্জন	মান্য-দুর্গাদিগতি
আর্ঘ্যধন	নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা
রূপসী	নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী
বরাদ	মোগল-সেনাপতি
মহম্মদ	বাদশাহ-পুত্র
ভাষ্ক	বরাদের বিশ্বস্ত অহুতর

* প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মান্যর দুর্গের উপরিতলস্থ চব্বর;
নিরে মান্যরের দুর্গ প্রান্তর।
সুধর্ত নর-নারীর আর্ন্ত কোলাহল
শুনা দাইতেছে।

নিরঞ্জন ও আর্ঘ্যধন

নিরঞ্জন

মান্যরের মার্ত-পথ পঙ্গপালের মত মাহুবে
ছেবে গেছে।

আর্ঘ্যধন

সুধার জ্বালায় সব মাটি আঁকড়ে পড়ে
প্রাণ দিচ্ছে। মা কোল থেকে ছেলেকে
ছুঁড়ে ফেলছে, স্বামী স্ত্রীর চুঁটি টিপে ধরছে!
অসহ দৃষ্ট!

নিরঞ্জন

তুচ্ছ প্রাণের অন্ত মায়া-মমতা, বেহ-
দয়া অকাতরে সব বিলক্ষন দিচ্ছে! একবার
ভাবছে—না—

আর্যাবধন

ভাববার অবসর নেই, পুত্র। মৃত্যুর বানী
বেজে উঠেছে—সে বানীর সুরে মানুষ
পাগল হয়ে যায়, তার কোন জ্ঞান থাকে না !

নিরঞ্জন

এই উদ্‌যাদ প্রাণির দলকে ঠেকিয়ে রাখা
শক্ত, দেখছি—

আর্যাবধন

ঐ যে একদল লোক চূর্ণের দিকে এগিয়ে
আসছে ।

নিরঞ্জন

চালাও তোপ । দেবল—

আর্যাবধন

হির হও, পুত্র। ভূমিও উদ্‌যাদ হয়ে না ।
কি বলে, শোনো ।

নিরঞ্জন

বাতুলের প্রশ্ন গুনতে হবে ?

আর্যাবধন

ঐ শোনো অভাগাদের আর্ন্তনাদ ।

[একদল লোক চৌৎকার করিয়া উঠিল—
“এক টুকরো রুটি দাও—” “চাই না দেখ—”
“ভাতো, কেল্লা”, “প্রাণ গেল—”, “খাবার দাও
গো, খাবার”, “বাঁচাও মা”]

নিরঞ্জন

এদের স্পর্ধা দেখে আমি বিম্মিত হচ্ছি !
কিন্তু হয়ে এরা যে এই চূর্ণের বিকে ছুটে
আসছে, এ স্পর্ধা এদের প্রাণে আপনাই
জাগিয়েছেন, পিতা ! এর জন্ত কমা করা—

আর্যাবধন

কমা করো না, পুত্র ! আমার বন্দী
কর, হত্যা কর ! তুমি যদি আজ আমি
হতে পূত্র !... পুত্রের হাতে-গড়া এই পোনার

বেশ, পুত্রের প্রাণ-দিয়ে-জাগিয়ে-তোলা এই
অসংখ্য নর-নারী—নিরঞ্জন, গর্বে আমার
বুক ফুলে উঠছে !

[নিরে চৌৎকার—“হায় কাছে আমার
দরবার করতে এসেছি । ভূমিই শুধু
আমাদের বাঁচাতে পারো, মা—জননী গো,
বাঁচাও, অর দিয়ে বাঁচাও, আমাদের ।”]

গুনছ ? এক উপায়, শুধু এক উপায়
আছে, পুত্র !

নিরঞ্জন

কাপুরুষ, বৃদ্ধ, ভূমি আমার পিতা ! শত্রু
বলে, পিতাকে, ভক্তি কর, ভালবাস ! সে এই
পিতা ! পুত্রের জীবনের সমস্ত আলো
বিজয়ের সূত্রে যে নিবিধি দিতে চায়,
পুত্রের পুণ্যময় গুণ জীবনে কলঙ্কের কালি যে
লেপে দিতে চায়, সেই পিতা ! ওঃ, অদৃষ্টের
নিষ্ঠুর পরিহাস ! এর চেয়ে রাক্ষসকে ভ্রাতা করা
সহজ, নির্ধন ঘাতককেও বোধ হয় ভালবাসতে
পারি !... আশ্চর্য্য ! এই পিতাকে বেবতার
মত এতদিন ভক্তি করে এসেছি, ঐরই
আবশ্যে নিজে গড়বার চেষ্টা করেছি !

আর্যাবধন

ভুল করেছ, পুত্র। কিন্তু শোনো, আমি বৃদ্ধ
হয়েছি, অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। মারা,
মনতা, ভালবাসা, স্বপ্ন, ছঃ্ণ, তোমার চোখে
যে মৃষ্টিতে ধরা বিচ্ছেদ, আমার বহুকালের জর্ণ
ক্ষীণ মৃষ্টিতে আমি আজ তাবের অস্ত্র মৃষ্টি
দেখছি। আমার মনের মধ্যে এখন কি
স্রোত বে বয়ে চলেছে—কত বিখ্যা সংস্কার,
মাঝার জঞ্জাল, সে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আর
তার জায়গায় কি আলো, কি সত্য জীবন্ত হয়ে
ঝেগে উঠছে, তা যদি তুমি দেখতে, পুত্র—

নিরঞ্জন

চূর্ণ!—রূপসী এদিকে আসছে!

আর্ধ্যধন

আমার না। এসো না—

(রূপসীর প্রবেশ)

রূপসী

পিতা, এ অর্ন্ত চীৎকার আর আমার সহ্য হয় না। আমি দাব। দাবার অন্তই প্রস্তুত হয়ে এসেছি আমি। আপনি আশীর্বাদ করুন—বৃদ্ধ দ্বীটি নিজেই অস্থি দান করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন, আমি সামান্ত নারী,—আমার কোন শক্তি নেই—বড় দুর্বল আমি—

আর্ধ্যধন

তুমি শক্তিদ্বী সতী, অন্নপূর্ণা, এই দ্ব্যর্থবোধের মধ্যে অন্ন তুলে দাও। আমি আশীর্বাদ করছি, না, কীর্তিমান স্বামীর কীর্তি তুমি উজ্জল কর! আমারও জীবন সার্থক হোক!

নিরঞ্জন

রূপসী, এ কি বলছ তুমি? কোথায় দাবে?—কিদের অন্ত প্রস্তুত হয়ে এসেছ তুমি?...আমি তোমার চোখের পানে চেয়ে আছি—কি দেখছি, জানো? এই চোখে তোমার কি নির্মল সুরল দৃষ্টি—শান্ত, উজ্জল, বিভা!... নির্দোষ হৃদের ধল—মাতীর কীট এরা, মাতীতে বিশিষ্টে দেওয়াই এদের যোগ্য শাস্তি। মিথ্যা বোলে ভুলে এই মাতীর কীটগুলোকে আমি মাহুষ করব ভেবেছিলাম! আমার এই তরুণ জীবনের অলস উৎসাহ দিয়ে আমি আকাশে প্রাসাদ গড়তে উত্তম হয়েছিলাম! স্বপ্ন,

কেবলই স্বপ্ন ভেসে বেড়িয়েছি...আর না, এবার জেগেছি—আর মিথ্যা নয়, বোহ নয়, এবার কঠিন সত্যকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরেছি! এই সব অকৃতজ্ঞ পশু...এদের মুখের অন্ত নিজেই আমার, বিলাস, সব ভোগ করেছিলুম! অন্তর করেছিলুম! সেই অন্তরের আজ প্রাণান্তিত করব—এই সব অধম পশুগুলোকে পৃথিবীতে ছেড়ে রাখলে মহুগন্ধ এখানে গোপ পাবে—পশুদ্বী প্রবল হয়ে উঠবে! তার অবসর দেওয়া হবে না! তোপের মুখে আজই এদের উড়িয়ে দেব। একটি তোপ—রূপসী, শুধু একটি তোপের ওয়াতা!

রূপসী

এ কি বলছ তুমি? নাট চলে বেড়াত এরা—মহুগন্ধ, বীর্ঘ, মহাব, কিছুই জানত না; আজ এদের প্রাণে মহুগন্ধের আকাঙ্ক্ষা লাগিয়ে তুলে—এই মরু-প্রান্তরে এমন সোনার দেশের প্রতিষ্ঠা করে, আজ—

নিরঞ্জন

একটি কুংকারেই উড়িয়ে দেব! ভুল, ভুল করেছিলাম! আর নয়, নীচতাকে বাড়তে দিতে পারি না!

আর্ধ্যধন

না, তোমার অন্ধ স্বামীকে দৃষ্টি দান কর—আশীর্বাদ করি, তার দেশের মুখ উজ্জল কর! (প্রস্থান)

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

কি বলছিলে, রূপসী? এখন বল, এ-না শুনছিলাম এতক্ষণ, এই অম্পষ্ট আভাষ—এ

সত্য নয়—বল,—তুমি একটা দুঃস্বপ্ন এ ?
বল—

রূপসী

অসুস্থতি দাও, নাথ ।

নিরঞ্জন

অসুস্থতি ! কিসের অসুস্থতি চাচ্ছ,
রূপসী ?...তুমি বুঝতে পেরেছ ? বল, স্পষ্ট
করে বল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না—
আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে—মনে
হচ্ছে, যেন কিসের একটা ঝড় বয়ে চলেছে,
উদ্ভাস ঝড় ।

রূপসী

আজ রাতে আমি বরাটের শিবিরে
যাব ।

নিরঞ্জন ।

তুমি তাকে হত্যা করতে চাও ? তাই ত,
এ কথা আমার মনে হয় নি—রূপসী !
কিন্তু...তখন যে ভয়ঙ্কর গোল হবে !...
তুমি কি করে ফিরে আসবে ? কিন্তু পতর
নল—মান্বারের সে শক্তি কৈ ? সে পতর
গ্রাস থেকে তোমার উদ্ধার করবে, তেমন
লোক-বল মান্বারের যেখনি না ত ! তবে— ?
...বিদ্যুৎ ? হ্যাঁ, কিন্তু তেমন বিদ্যুৎ—পেরেছ কি ?
পূর্ব তাঁর মালামার বিদ্যুৎ—নীরবে ঘা—

রূপসী

কিন্তু এ হত্যার তোমার মান্বার ত রক্ষা
পাবে না, নাথ ! মান্বারের অস্ত্র চার, তাকে
অস্ত্র বোপাতে হবে ।

নিরঞ্জন

পানিষ্ঠা, সত্যই তবে তুমি আঁড়িমাঝের
ঘেতে চাও ?

রূপসী

তিরিক্তার করুছ ! কর,—কিন্তু অসুস্থতি

দাও—

নিরঞ্জন

রূপসী—

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

তুমি বরাটকে ভালবাস ?

রূপসী

আমি তাকে চোখেও দেখিনি কখনো—

নিরঞ্জন

তার শৌর্যের কাহিনী শুনে তবে মুগ্ধ
হয়েছ ?

রূপসী

বিবাস কর, নাথ, রূপসী চিরদিন
তোমারই শৌর্য-কাহিনী শুনে এসেছে ।

নিরঞ্জন

তবে শোন, বরাট তরুণ যুবা—সুপুরুষ !
শৌর্যেও তার অসীম—বিধবী হরেও
সে যোগলের ডান হাত !

রূপসী

ও-সব শোনবার প্রয়োজন দেখি না,
নাথ—

নিরঞ্জন

রূপসী,—না, ও-সব ব্যতুলের মগ্ন
তুলে বাও, তুমি । এস, আমার পালিয়ে
যাই চলে ! যেখানে হোক, লোকালয়
ছেড়ে সূত্র বনে চলে যাই, চল । বাহ্য
বড় নীচ, বড় হিংস্র, বড় পাবাণ—পরের
ব্রুথ সে সহ্য করতে পারে না—তার
ঈর্ষ্যা হয় ! কাজ নেই আমাদের এমন

লোকালয়ে থেকে। চল, গাছের ছায়ায়-ঘেরা
 ক্রান্তল কুঞ্জে বসে দুজনে প্রেমালোচন করব,
 দুজনে দুজনের কাণে প্রাণের গান অজস্র
 শুনিবে বাব!...এতদিন তোমার পানে ফিরে
 চাইনি,—রগোদ্রাদনার তোমার এই নব-
 বিকশিত যৌবনকে উপেক্ষা করে এসেছি।
 তার অস্ত অভ্যস্তান করো না, প্রিয়ে। এখনও
 সময় আছে; বেশী বিলম্ব হয় নি! যৌবন
 এখনো পাগিয়ে যায়নি—চল, সে সমস্ত
 অবহেলা-ক্রটি প্রাণ দিয়ে শোধ করব। এখানে
 বাহিরের তুচ্ছ কোলাহল অনেক শুনেছি,
 মানুষ অনেক বেখেছি। আর নহ—বড় শান্ত
 হয়েছি, রূপসী—চল! এখানে কি স্থখ? স্থখ
 পাইনি! স্থখ নেই! শুধু নেশার মেতেছিলুম!
 এখানে নিত্য স্বপ্ন—নিত্য হিংসার গর্জন—
 নিত্যই অহঙ্কারের আফালন!...চলে এসো,
 অভিমান করে পাড়িয়ে থেকে না।

রূপসী

অভিমান! কিসের অভিমান নাথ? কোনদিনই ত অভিমান করিনি, আমি! তুমি কতালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছিলে, আমি গৃহের কোণে বসে বৃদ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখেছিলাম! গর্বে আমার ছোট মনটুকু ভরে উঠছিল। তাই ত আমি আজ-এমন করে বেরিয়ে আসতে পেরেছি! মনে আমার আজ কোন বিধা, কোন সঙ্কোচ নেই! তোমার সাথে মন্দার—সেই মন্দারের কোন কাজ যদি করতে পারি—

নিরঞ্জন

না, রূপসী, কিছু করতে হবে না। আর কাজ নেই কিছু করে! এস আমার সঙ্গে, চল, দুজনে চলে যাই।

রূপসী

কিন্তু এখন যে বাবার উপায় নেই—
 কর্তব্যকে এমনভাবে তুমি বলি দেবে?

নিরঞ্জন

কর্তব্য! কিসের কর্তব্য, কার উপর কর্তব্য, রূপসী?

রূপসী

তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, নাথ। সময় বার। ঐ দেখ, সন্ধ্যা হয়ে আসছে—এতগুলো নর-নারীর প্রাণ তোমার একটা ইচ্ছিতের অপেক্ষায় রয়েছে শুধু—তাদের রক্ষা কর!

নিরঞ্জন

রূপসী, তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার? এ-সব কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না—?

রূপসী

বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, নাথ। আমি বড় দুর্বল, তুমি আমার শক্তি দাও। এ বড় কঠিন কাজ নাথ, জানি, কিন্তু তবু এ যে করতেই হবে। দাও, অহুমতি দাও—

নিরঞ্জন

অহুমতি! অহুমতি বেওয়া এতই সহজ ভাবো, নারী? তুমি বুঝ না? এত দিন আমার বৃকের মধ্যে থেকে, আমার সকল চিন্তা, সকল স্বপ্ন, সকল আশা ভয় ভয় করে বেখে বুকে আমার দিকে চেয়ে অগ্নান বদনে তুমি বহু, অহুমতি দাও!... আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে—তোমারও যাচ্ছে, বলছ—এ যদি সত্য হয়, তবে কেন আর এ নিষ্ঠুর আঘাত করছ, রূপসী?

[নিরে কোলাহল—“মাগো, বাঁড়াও—ধরা কর মা,—”]

রূপসী

ঐ, ঐ শোনো অভাগাদের করুণ কাতর
আর্তনাদ! না, আমার সহ্য হচ্ছে না।
দাও, অহুমতি দাও, এ-ছাড়া যে আর কোন
উপায় নেই!

নিরঞ্জন

কোন উপায় নেই—তাই এই বর্ষের
কুৎসিত প্রস্তাবকে মাথায় তুলে নিতে হবে? এত
বড় অধর্মকে আশ্রয় করে নীচ কতক-
গুলো পুত্র প্রাণ বাঁচাতে হবে? ওঃ,
ভগবান—না, ভগবান নেই, না হলে এ
কুৎসিত কথা সে দুর্ভাগ্যের মুখ থেকে
বেকুশার আগে তার মাথার বাজ পড়েনি?
এত বড় অধর্ম বিম্বর-গর্জে নিঃসর কাম
হাসিল করে বাবে?... না, কখনো না।
আমি থাকতে কখনো তা হতে দেব না।
ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পুণ্য, সব আজ সমূলে
ধ্বংস করব! এই সব হতভাগ্য কাপুরুষের
দল—পা দিয়ে চেপে এদের মেরে ফেলব।
কল্লন, বহু, দাগো তোপ—

রূপসী

হির হও—(হাত ধরিল)

নিরঞ্জন

(সবলে হাত ছাড়াইয়া) না, ছেড়ে দাও,
রূপসী—বিখ্যা এ অভিনয়ের প্রয়োজন
নেই!...আর এই সব বর্ষের দল—এদের
কাগো কি ধরে নারী নেই? স্ত্রী নেই, স্তম্ভী
নেই, না নেই—যে, নারীর নারীত্বের মূল্যে সব
জীবন কিনতে অনায়াসে উদ্যত হয়েছে? এদের
তুমি বাঁচাতে বল, রূপসী—? এদের নিষাদে
বাতাস কলুষিত হয়, মহুঘাঘ পুড়ে ছাই হয়ে
যায়—...ঐ দেখ, তোমার নিঃস্রব পানে

একবার চেয়ে দেখ, এদের নিষাদে তুমি পাশাণ
হয়ে গেছ! তোমার দৃষ্টি অকম্পিত, চোখে
এক কোঁটা জল নেই!... উঃ, এই কি
পৃথিবী? আমার চারিদিকে শুধু ভীষণ
মরু ধূ-ধূ করছে—মায়া নেই, মমতা নেই,
কিছুই নেই, শুধু হিংসার জলন্ত ক্ষুধা—প্রাণেও
বিষ-গ্রাসী ক্ষুধা... (সহসা ছুইহাতে রূপসীর
হাত চাপিয়া ধরিয়া) রূপসী, একদিন ত তুমি
আমার স্বর্ণ-স্রুং নিরেয়েছিলে—তবে, আজ—

রূপসী

নাথ (হাত ধরিল)

নিরঞ্জন

(হাত ছাড়াইয়া) না, আর নয়, ঐ কোমল
হাতের স্পর্শে আর আমি তুলছি না।
পিতার কথাই ঠিক। তিনিই তোমার
ঠিক চিনেছিলেন! পাবালী তুমি! আমি
যৌবন-মন্দের নেশার বিহ্বল হয়ে ছিলাম—
তোমার তিনিনি, জানিনি!... থাক, আর
কেন? তুমি যেতে পারো—তোমার-
আমার কোন সম্পর্ক নেই। বিখ্যা আর
অহুমতির মোহাই দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা
কেন করছ? তুমি যাও—

রূপসী

না, মুখ কিরিয়ে না। চেয়ে দেখ নাথ,
আমার মনের মধ্যে একবাচ্চ চেয়ে দেখ!
তুল বুঝো না—তোমার মান্দার—প্রাণের
মান্দার—আমার সে যে কি—কতখানি সে
আমার বুকে—(অশ্রু-মার্জনা করিল)

নিরঞ্জন

আর মায়া নয়, রূপসী। আমি হর্ষল
নই, উগ্রাম হইনি—বেশ হির হয়ে আছি!
চোখের জলে এখন আর গলব না—

‘তোমার কোন ভয় নেই, তুমি যাও। ভেবে না, নারী, নিকোথের মত নিজেকে আমি হত্যা করব! তেমন মতিভ্রম হয়নি আমার। কেন? একটা নারী—তার লাবণ্য-ভরা প্রলোভন-দেয়া দেহের জন্ত? হাঁ, দেহ শুধু! মন—? কোথায় মন—নারীর আবার মন? কবির কল্পনা সে!... শুধু নিজের উপর যুগা হচ্ছে—এতদিন এই তুচ্ছ খেলনা নিয়ে খেলা করেছে। যাও, যাও রূপসী—অভিশারিকা নারী, অভিশারে যাও—

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

বৃথা চেষ্টা, রূপসী। নদীর বে স্রোত চলে যায়, তাকে আর কেরানো যায় না। যা গেল, তা আর ফিরবে না! জ-বিলাসে নিরঞ্জন আর ভুলচে না—

রূপসী

বড় তুল বুঝছ তুমি! কি করব? আমার যেতেই হবে। ফিরে এসে তোমার বোকাব, নাথ—[স্বর বাম্পরুদ্ধ হইল]

নিরঞ্জন

ফিরে এসে!... ঐ মুখ নিয়ে আবার তুমি ফিরবে? সে সাধ আছে? বেশ, ফিরো... সে এক চমৎকার দৃষ্ট হবে। আমিও বোগা বেশে সজ্জিত থাকব,—তখন আর এক নূতন অঙ্কের অভিনয় শুরু হবে—দেখবার কৌতুহল হয় বটে!

রূপসী

আসি নাথ। আদীর্বাদ কর—না, কোন প্রার্থনা নিয়ে বাবনা, শুধু ঐ পারের ধূলা!

(নিরঞ্জনের পদগুলি লইতে গেল; নিরঞ্জন পা সরাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল)

বড় তুল বুঝলে নাথ! যদি আমার মনের মধ্যে একবার চেয়ে দেখতে!

(দ্বারে দীর্ঘে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মোগল-শিবিরের সমুখস্থ প্রাস্তর।

বরাট ও তাহ।

তাহ

দিল্লী থেকে এই পত্র এসেছে। বাদশা-জাদাও এসেছেন; আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

বরাট

(পত্র-গ্রহণান্তে, বড় জঙ্করি খবর আছে, বল।

তাহ

বাদশাআদা শিবিরে অপেক্ষা করছেন।

বরাট

অপেক্ষা করছেন! এ যে খোদ বাদশার পাঞ্জায় ছাপ দেখছি। হাতের লেখা—বাদশাজাদা নিজের হাতে লিখেছেন। মহানদেরই কাজ সব। (পত্র-পাঠান্তে) আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। মোগল মূলভব দাঁ মাম্মার গথল করতে চেয়েছিল, হিন্দু আমি তাকে বাধা দিছি; পরিশ্রান্ত সজ্জেকে বল-সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ দিয়ে আমি জলস হয়ে বসে আছি; তাই আদেশ হয়েছে, কোলের তার বাদশাজাদার হাতে দিয়ে আমার দিল্লী ফিরে গিয়ে আমার আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।...এ গভীর মড়ক

ভাঙ্গ, অতি নীচ চক্রান্ত!... ভেবেছে, তরে কম্পিত হরে নতশিরে গিরে আম শেখানে ঠাড়াব,—একটা হীন অপরাধীর মত!... ভুল বুঝেছে! এতদিনেও মোগল আমার চেনেনি, দেখচি।

ভাঙ্গ

বাধশাখাদা দেখা করতে চান—

বরাট

ও! মহম্মদ নিজেকে এলোছে! আর কারো হাতে চিঠি পাঠাতে ভরসা পারিনি! ভেবেছে, মুখোমুখি ঠাড়িয়ে আমার চমকে দেবে! গর্দভ! তা বেশ! এই মুখোমুখি দেখার অনেক অজ্ঞান সাক্ষর হয়ে যাবে, মোগল আমার সঠিক পরিচয় পাবে! এই কাপুরুষ মহম্মদ—

ভাঙ্গ

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—

বরাট

ভাইত! আর্থারও এখানে ফেরেনি—না? তাহলে আমার প্রত্নাবে ওরা সম্মত! নাহলে বুদ্ধি করে আসত!... সীমানার আমাদের বিশ্বস্ত প্রহরী খাড়া আছে ত? তাকে বলে রেখেছ, এক নারী আমার শিবিরে আসতে চাইলে, কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়, সম্মানে যেন এখানে নিয়ে আসে?

ভাঙ্গ

লালসিং আর গুজারি সীমানার প্রান্তে পাহারা দিচ্ছে। আপনার আদেশ তাবের জানিয়েছি।

বরাট

লালসিং আর গুজারি! তারা আমার কত জান দিতে পারে, জান, তবু তুমিও

যাও ভাঙ্গ, অলক্ষ্য থেকে এই নারীকে সঙ্গে নিয়ে এসো। আর রসদের গাড়ী তৈরী আছে—যা-যা বলিছে? সে নারী শিবিরে পা দেখামাত্র যেন ঐ সব গাড়ী নান্দারে দাও—খুব হুঁসিয়ার প্রহরী সঙ্গে দিও। তারা যেন কোন রকম অন্তরতা দেখানে না করে। অত্যাচার হলেও নীরবে সব সহ্য করবে, এমন লোক সঙ্গে দিও।... ঐ যে দূরে নান্দার দুর্গের উপর নক্ষত্রের মত একটা আলোর বিন্দু কুটে উঠেছে, না? সন্ধ্যার অন্ধকারে তারার মতই ঐ জল জল করছে? হাঁ, ঠিক। সন্ধ্যার সন্ধ্যা!... এই লক্ষ্যকৃত্তর অস্ত্র কত দিন থেকে যে প্রতীক্ষা করে আছি! আমার কৈশোরের স্বপ্ন সকল হবে,—এ কি সম্ভব! উচ্ছ্বল হাব তার অবলম্বন পাবে?... ভাঙ্গ, তুমি যাও, মহম্মদকে আমার সেলাম দাও গে—আর বলবীরকে আমার শিবিরের বাহিরেই সতর্ক থাকতে বলে দিও—

(ভাঙ্গর প্রস্থান)

মোগল ভেবেছে, চোখ রাঙিয়ে বরাটের সব সকল ভেঙে দেবে! বড় বুद्धিমান মোগল, আর বরাটকে সে ভেবেছে, একটা নির্দোষ ঝালক!

(মহম্মদের প্রবেশ)

আহুন শাহজাদা, সেলাম!

মহম্মদ

সেলাম!

বরাট

আসতে আপনার কোন কষ্ট হয়নি,

শাহজাদা?

মহম্মদ

না। সেনাপতি, ঐ দূরে মালার গুর্ণের উপর একটা আলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের কৌশল ও আলো দেখে চকল হয়েছে। আপনি জানেন, হঠাৎ ও আলো কেন দেখা যাচ্ছে?

বরাট

আপনার কি মনে হয়, ও কোন্‌ সড়ক?

মহম্মদ

নিশ্চয়! আরও বিশ্বাস হচ্ছে, ও আলোর সঙ্গে মোগল সেনাপতিরও কোন সম্পর্ক আছে! সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।

বরাট

বলুন, আমিও শোনবার জন্য প্রস্তুত।

মহম্মদ

বরাট—

বরাট

‘সেনাপতি’ বলবেন, শাহজাদা। এ রণক্ষেত্র, শাহজাদার মজলিস নয়। এ সব আদব-কায়দা যেনে চলবে, শাহজাদা।

মহম্মদ

সেনাপতি বরাট, আপনি বাঘশার পত্র পড়েছেন? তাঁর আদেশ জানেন?

বরাট

হ্যাঁ, আমার এতটা নিরীক্ষা হাওরাচ্ছেন কেন, শাহজাদা! আমি লেখা-পড়া জানি এবং আমার নামের পত্র আমি নিজেই পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারি। এ পত্র আমি পড়েছি, এবং পড়ে বুঝেছি, এ একটা অত্যন্ত স্থগণ চক্রান্ত চলেছে আমার বিরুদ্ধে। আরও বুঝেছি, সে চক্রান্তের মূলে আছেন, আপনি।

মহম্মদ

আমি?

হ্যাঁ, আপনি।

মহম্মদ

কিন্তু মূলতঃ আপনি গিরে বাঘশার দরবারে, গুরুতর অভিযোগ জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, ক্ষুদ্র মালার যখন, যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তার গোলা-বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে, খাত্তর অভাবে মালার একেবারে নিষ্কর্তৃক, তখনই ত মালার-অধিকারের স্বত্ব স্বযোগ—আপনি যে স্বযোগ উপেক্ষা করে দিবা অলস হয়ে বসে আছেন! এই কি মোগল-সেনাপতির যোগ্য কাজ? নিম্নকেন—

বরাট

সাধন হরে কথা বলবেন, শাহজাদা। বালকের চাপল্যেরও একটা সীমা আছে! এ যুদ্ধে সেনাপতি আমি, মূলতঃ নয়, আপনিও নন। আর আমার উপর সে বিশ্বাস না থাকলে এত বড় মোগল-বাহিনীর তার বাধনা আমার উপর দিয়ে নিশ্চিত হতেন না! আমার আরগার মূলতঃকেই তিনি সেনাপতি করে পাঠাতেন।

মহম্মদ

বাধনা ভুল করেছিলেন, তখন আপনাকে চিনতে পারেন নি—এখন চিনেছেন। আপনি যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক—

বরাট

বাসনা সংঘত করো, বালক। আমারও রক্ত-মাংসের শরীর। আমি বৃদ্ধ নছি, রক্ত আমার সহজেই গরম হয়ে ওঠে—

মহম্মদ

চৌধী-রাওয়ানিতে ভর করি না, সেনাপতি। মনে রাখবেন, আমি ভারী মোগল-সম্রাট।

বরাট

আর আপনিও মনে রাখবেন যে মোগল সাম্রাজ্য আমার একটা বৃহৎ নিশাংসেই আমি উড়িয়ে দিতে পারি।

মহম্মদ
এ উত্তর, মোগল
বরাট

বাহক, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার লজ্জা হচ্ছে! কিন্তু শোন, তুমি ভুলি নির্যোধ, তাই মুলতবের কথার এতখানি নৃত্য করে উঠেছ! মুলতবের সঙ্গে তোমার যে চিঠিপত্র চলেছে, জেনো, সে সব আমার হাতে পড়েছে। মোগল আমার ঈর্ষ্যা করে! আমার সাহস, আমার বীর্যে সে ভীত, তাই সে আমার বাধা দিতে চায়। মোগলের ভয় হর, কি জানি, আমার এ সাহস পাছে কোনদিন দিল্লীর বাদশাহী-তখতের দিকে আমার চালিত করে!

চমকে উঠবেন না, শাহজাদা—
—আমি মোগলকে চিনি। সে একজন বিধর্মীকে বড় হতে দিতে চায় না,—এ আমি জানি! কিন্তু মনে রাখবেন, শাহজাদা, মোগল বরাটকে বড় করেনি, বরাটই মোগলকে প্রকাণ্ড বিস্তৃত করে দিয়েছে। দিল্লীর তখতের দিকে কোনদিন যদি বরাটের লক্ষ্য থাকত, তাহলে বালক মহম্মদ আম আমার সামনে বাধা তুলে ধাড়ার হযোগ পেত না, জানবেন, সে আমার পাঙ্ক। সাক করতে পেলোই নিজেকে ধস্তাধরিত!

মহম্মদ

এত ম্পর্দা! (সহসা তরবার টানিয়া বরাটকে আঘাত করিল; বরাট চকিতে

সে আক্রমণ হঠাইতে পেলো তাহার চোখের নিচে একটা চোট লাগিল ও রক্ত-ধারা বহিল)

বরাট

(সবলে মহম্মদের তরবারি ছাড়িয়া লইয়া) এ আঘাতের লজ্জা প্রসূত ছিলুম না, আমি। বীর মোগল—(মহম্মদকে ভুনে নিক্ষেপ করিয়া, তরবারি উঠাইল) এখন—?

মহম্মদ

আমার মেরে ফেল বরাট, আমি এ স্বাধীন জীবন নিয়ে আর একদণ্ড বাঁচতে চাই না।

বরাট

বরাট বীর—কাপুরুষ নয়। সে হিন্দু, মোগল নয়। করতল-গত শত্রুকে সে হানি-মুখে মাপ করতে পারে! (মহম্মদকে ছাড়িয়া) উঠে ধাঁড়াও, মহম্মদ। যদি আমার সঙ্গে হুঙ্ক করার সাধ থাকে, তাহলে সমরাস্তরে সাক্ষাৎ করো। তোমার মনস্তাননা পূর্ণ করব। কিন্তু শোনো মহম্মদ,—যদি বাদশাহী করার বাসনা থাকে, তবে মনকে বড় কর—নীচ, হীন, লজ্জিত বড়দয়ে বোগ দিয়ে না; থল, হিংস্র পরিভ্রমের চাটুবাগে আত্ম-বিশ্রুত হও না। বাদশাহী মন নিয়ে বাদশাহীর কামনা করো। শোন মহম্মদ, বরাট নিম্নের মর্যাদা রাখে—সে বিশ্বাস-ঘাতক নয়। আমি যদি আক্রমণ অবসর পেয়ে হাম্মার অবিকার না করে থাকি ত জেনো, তার মধ্যে আমার গভীর উদ্দেশ্য আছে—জেনে রেখো, বরাট সুখে যে কথা দেয়, কাজেও তা করে! কোন প্রলোভনে কথার খেলাপ করে না সে। সেই সঙ্গে

আঁরো মনে রেখো, বরাট প্রকাণ্ড হঃসাহসী
যোদ্ধা হ'লেও সে মাহুব !

মহম্মদ

আবার হেরালির আল বুন চলেছ !

বরাট

সময়ে সব বুঝতে পারবে—একটু দৈর্ঘ্য
রেখো শুধু।

মহম্মদ

তাহলে বাদশার কাছে যে কৈফিয়ৎ
তলব হয়েছে—

বরাট

সে কৈফিয়ৎ বরাট দেবে ! তুমি
নিশ্চিত থাকো—বালক। আর সেই সঙ্গে
এই কাটা দাগও অনেক কথা বলবে।
(মহম্মদ গমনোদ্ভূত)... যেহেঁ না, দাঁড়াও।
তোমার ঐচ্ছ্যতোর দণ্ড নিতে হবে, শাহজাদা।
আপাততঃ যুদ্ধ-শেষ না হওয়া অবধি আপনি
আমার বন্দী। কৃকব—(অটনৈক প্রবেশ)
তুমি আর অহর শাহজাদার অন্ত
দায়ী। শাহজাদা আমার বন্দী—আমার
আদেশ-ছাড়া তিনি বন্দীশালা ত্যাগ করতে
পাবেন না। বুঝলে—? এই আমার
আদেশ।

মহম্মদ

এতদূর !

বরাট

এ অতি লব্ধবণ, শাহজাদা ! আপনি
বালক, তাই আপাততঃ এইটুকুই যথেষ্ট
হবে, মনে করি।

(মহম্মদ ও কৃকবের প্রস্থান)

উদ্ধত বালক ! এই ঐচ্ছ্যতাই যোগল
সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে ! এই সবেই যোগলকে

টিকে থাকতে দেবে না, এ আমি স্পষ্ট
বোঝতে পাচ্ছি। এই নীচতা, এই হীন
চক্রান্ত—

(ভাহুর প্রবেশ)

ভাহু

আপনি শাহজাদাকে বন্দী করেছেন ?

বরাট

হঁ। বালকের ঐচ্ছ্যতাকে একটু সিধা
করতে চাই।

ভাহু

কিন্তু এতে বিপদ ডেকে আনচেন যে—

বরাট

বিপদ !...ভাহু, বিপদকে যদি বরাট ভয়
করত, তাহলে আজ পৃথিবীতে বরাটের
চিহ্নও থাকত না। যাক—আজ এখন
আর অন্য কথা নয়—ওদিককার খপর কি,
ভাহু ? সে আসছে ?...সারা জীবন ধরে এই
ক্ষণটুকুর সঙ্গে বিভোর হয়ে আছি।
কখনো ভাবিনি, এ ক্ষণটুকু সত্য হয়ে
ছুটেবে !...ভাহু—(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ)
ও কি—বন্দুকের আগওয়াল কেন ? বাও,
যাও, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না ?

ভাহু

না, ও আমাদের বন্দুক ! এ কি—
আপনার চোখের নীচে রক্ত বে !

বরাট

মহম্মদ আঘাত করেছে !

ভাহু

বরাট

হাঁ, অতর্কিত আঘাত ! তাকে কমা
করেছি—তাহলে বাদশা এতক্ষণে পূত্রহীন

হতেন।...ঐ যে আলো দেখা যায়—কাছেই। তাকে আমার শিবিরে নিয়ে এসো।
 তানু, সে এসেছে— দেখো, দেন কোন রকম অমর্যাদা না
 তানু হয়!
 এক নারীর সম্পূর্ণ ছায়া দেখতে পাচ্ছি। (তানুর প্রস্থান; বরাটের শিবিরান্তান্তরে
 বরাট প্রবেশ) ক্রমশ
 সে এসেছে। তানু বাও, মনস্থানে ঐসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভাষার কথা

পদ্মার বনন পুল হয় নাই তখন এ-পারে ছিল চওড়া রেলপথ, ও-পারে ছিল সড়। মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেলপথের এই বিধা আমাদের সহিষ্ণু ছিল। এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবহার কার্পণ্যে যখন অর্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে ঘোষ না বিদ্যা থাকিতে পারি না।

ও ত গেল মাছুষ এবং ভাল চলাচলের পথ, কিন্তু ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা। কিছুকাল হইতে বাংলা দেশে এই ভাষার দুই বহরের পথ চলিত আছে। একটা যুগের বুলির পথ, আর একটা পুঁথির বুলির পথ। দুই-একজন সাহসিক বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, পথ এক-মাপের হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অগতঃ ইহাতে বিস্তার লোকের সম্মত। এমন কি তাঁরা এতই বিচলিত যে, সাধু-ভাষার পক্ষে তাঁহারা যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা-ভাষার আর বাই হোক, সাধুভার চর্চা হইতেছে না।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ্য দিই নাই

তবু আমার নাম উঠিয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমার যে কি মত তাহা আমি ছাড়া আমার দেশের পন্থেরা জানা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন, এবং ঐরাও যেন আছে বলিতে কসুর করেন নাই। ভাবিগা-ছিলাম চারিদিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা প্যাড়িয়া দেখিব। কিন্তু বুঝিয়াছি যে আমার জীবিত কালের মধ্যে ঘটবার আশা নাই। অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটবেলা হইতেই সাহিত্য রচনার লাগিয়াছি। বোধ করি সেই সন্তাই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে আমার ম্পষ্ট কোনো মত ছিল না। বে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথাই সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্য-ভাষার পথটা যে এই সড় বহরের পথ, তাহা যে প্রকৃত বাংলা-ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা বিচার মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার বেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাকে

আমি নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেমন স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশী। অভ্যাসের মের্ত্তো পথ দিগা গাড়ির গোরু আপনিই চলে, পাড়ারান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহঙ্কারের বোগ আছে। যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্তথা হইতে পারে এমন কথা শুনিতে রাগ হয়। মতের ঐক্যে; রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহঙ্কার। মনে আছে বহুকাল পূর্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালীর শিক্ষা বাংলা-ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালী আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয়, তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের ঐক্য কোম্পানী মণ্ডলির মতো পড়ে না। আসল কথা, ঠাৱা ইংরাজি শিক্ষা মানুষ হইয়াছেন তাঁরা বাংলা শিক্ষা মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিতেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূল তাহার অহঙ্কার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথাটা এইখানেই কবুল করি। পূর্বেই ত বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিত্রিত্ব পুঁথি লিখিয়া হাত-পাকাইলাম; এ লইয়া এ-পক্ষে বা ও পক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই। কিন্তু সবুজপত্র-সম্পাদকের বুদ্ধি না কি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকির থাকিয়া অনেক দিন চাইতেই বাংলা-মাহিত্যের ভাবসম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভালো লাগে নাই। এমন কি, রাগ করিয়া-ছিলাম। নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহঙ্কার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে, কিন্তু অহঙ্কারটা যে পুরাতন সংস্কারের পক্ষেই প্রবল এ কথা ব্রূতিতে সম্বল লাগে। অতএব, প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পংক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে সব যুক্তি শোনা বাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আকৃতি করিয়াছি।

এক বারগার আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত। পত্র-রচনার আমি প্রচলিত আইন-কানুন কোনোধিন মানি নাই। মানিতাম কবিতার ভাষা ও ছন্দের একটা বীধন আছে বটে, কিন্তু সে-বীধন নৃপুত্রের মত, তাহা বেড়ির মত নয়। এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোধিন ভয় পাই নাই।

“কপিকা”র আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা-ভাষা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া ব্রূতি। মেথিলার এ-ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাটুঘোড়ার মত কেবলমাত্র গ্রামা-ভাঁবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশী।

বলা বাহুল্য “কপিকা”র আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত বেঁধে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন,

কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভিযানের টান এবং কোন্ দিকে অহুসারগের, সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে।

যাই হোক এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে-এই :—বাংলা গল্প-সাহিত্যের স্বত্বপাত হইল বিদেশীর করমাসে, এবং তার স্বত্বধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা-ভাষার সঙ্গে ধানের ভান্নর-ভান্নবোরের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে বোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত-বাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিম্নের হাতে এমন-একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্কাসন দিয়া বজ্র-কর্তার করমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের ভাগিদে বাংলা গল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়া-পেটা ভাষা দিয়া তাহার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ার তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিম্নে তাহার বীধন অঁটি হইয়া উঠিত। প্রাকৃত-বাংলা বাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে প্রয়োজন-মত সংস্কৃত-ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গল্প-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ার দেখি তাহা সংস্কৃত-ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে ঢালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশান কল্প হইয়াছে।

এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রভাবনা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ঈংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গল্পের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্যন্ত ধরা পড়িত না। কিন্তু এই গল্প বতই বাঙালীর ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনের গতি কোন্ দিকে? প্রাকৃত বাংলায় দিকে। আজ পর্যন্ত বাংলা-গদ্য, সংস্কৃত-ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিম্নের বথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুক্তি আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মূল্যের সঙ্গে-সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যবসা মূলধন লইয়া শুরু হয় নাই, মন্ত একটা পেনা লইয়া তার শুরু। সেই পেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তাহার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটতে এত বাধা কেন, তাহার কারণ আছে। যে-গদ্যে বাঙালী কথাবার্তা, কথ, সে-গল্প বাঙালীর মনো-বিকাশের সঙ্গে ভাল স্মৃতিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণত বাঙালী যে-বিষয় ও যে-ভাব লইয়া সর্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গল্প সেই মাপেরই। জলের পরিমাণ বতটা, নদীপথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অহুসারেই হইয়া থাকে। যথং ভগ্নরথও আগে লম্বা-চওড়া পথ কাটিয়া তাহার পরে গম্বাকে নামাইয়া আনেন নাই।

বাঙালী যে ইতিপূর্বে কেবলি চাব্বাস এবং বরকরার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্বে তার চেয়ে বড়-কথা থায়া চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্ভ্রমারে বন্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যবসা, ছইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা-ভাষার মনন করা বা মতপ্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গল্প উচ্চ-চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দৃশ্য চলিয়া আসিয়াছে। থায়া ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত বে-সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেওলা বাংলা-ভাষার ব্যবহার করা হুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা-ভাষা সম্বন্ধে অন্বরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

এমন সময় থায়া শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল খটাইতে বলিলেন বাংলার চলিত গল্প লইয়া কাজ-চলানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সব-চেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত-বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলার তদ্বিতপ্রভাবের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। “প্রার্থনা” সংস্কৃত শব্দ, তার বাঁটি বাংলা-প্রতিশব্দ “চাওয়া”।

“প্রার্থিত” ও “প্রার্থনীয়” শব্দের ভাবটা যদি ঐ বাঁটি বাংলার ব্যবহার করিতে হইত তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্যন্ত কোনো হুঃসাধনিক “চারিত” “চাওনীয়” বাংলায় চলাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক আয়গার সংস্কৃত বিশেষা-পদকে বাংলার ধাতুক্রমের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার এপর্যন্ত তাহা আপন আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পন্নরূপে গণ্য হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার তদ্বিত-প্রভাব পর্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। স্ততঃই ছই নৌকার পা মিঝামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সামলাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করিতে হয়। তার পর হইতে এ-তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তবিকতার মাঝ-ধানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটি-গাড়ি হয়, আবার অপর-পক্ষের উপর যখন তার পড়ে তখন তাঁরা বাংলার সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিভাগে একেবারে দক্ষদত্ত বাধাইয়া দেন।

কিন্তু মুন্সিপের বিষয় এই যে, বে-ভাষার মল্লবিজ্ঞার সাহায্য ছাড়া এক পা চলিবার জো নেই সেখানে। সাধারণের পক্ষে পদে-পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে-পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশী। পথটাই যেখানে

দুর্গম সেখানে হয় মনুষ্যের চলিবার তাগিদ থাকে না, নয় চলিতে হইলে পথ অপথ ছোটোকেই হুবিধা-অনুসারে আশ্রয় করিতে হয়। ঘাটে মাল নামাইতে হইলে বে-বেশে মাড়লের দ্বারে দেউলে চাওয়ার কথা, সে-বেশে আখাটার মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং যোগদেব চৌখ-টিপিয়া ইসারা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে ককি মড়; যোগদেবের চোলায় বেখানে ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষার বাংলা-সাহিত্যের ব্যবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।

জাপানীঘের ঠিক এই বিপদ। চীন ভাষার শাসন জাপানী ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ প্রাকৃত-জাপানী প্রাকৃত বাংলার মত; নূতন প্রয়োজনের করমাস ধোলাইবার শক্তি তার নাই। সে-শক্তি প্রাচীন চীন ভাষার আছে। এই চীন ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানী ভাষাকে চলিতে হয়। কউন্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিষম পালায়ানীর দ্বারে জাপানী-সাহিত্যের বড়ই ক্ষতি করিতেছে। কারণ এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটা একটা কুস্তিগিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে মাটি কড়া, সেখানে ফসলের চুড়িন। যেখানে শক্তির নিত্যবীৰিতা অসম্ভব শক্তির সম্ভারও সেখানে অসম্ভব। যদি পণ্ডিত-মশায়দের এই গীয়েই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষার মহামহোপাধ্যায় না" হইলে বাংলা ভাষার কলম ধরা ধুঁতা, তবে

বাংদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত-বাংলার ভয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।

ইহার পূর্বেও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতির মত বই বিদ্রোহের শাপ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই। এখনি যে আসিল একথা বলিবার হেতু কি? হেতু আছে। তাহা বলিবার চেষ্টা করি।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য ঘটে নাই। রামমোহন রায় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত ক্রমাগতই নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদের ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন আনরা ধরে-ধরে মুখে-মুখে যে-সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পচিশ বছর পূর্বে করিলে ছুঁটনা ঘটত। এখন আমাদের ভাষা-বিজ্ঞানের উপর সাঁড়া ত্রিঙ্ক বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্বে সাধুভাষার যাদের জল-চল ছিল না। সেই জন্তই পুঁথির ভাষার ও মুখের ভাষার সমান বহরের রেল পাতিলার যে প্রস্তাব উঠিয়াছে, অভ্যাসের আরামে ও অহঙ্কারে যা লাগিলেই সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

আসল কথা সংস্কৃত ভাষা কে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে

লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহারকে ভাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের পুর বলিয়াই যদি মানিতে চাই তবে সেই সঙ্গে একথাও মানা চাই যে তার বোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু বতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা, চলিত ভাষার ঠাট্টা না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য-সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্ণির বল আমাদের লেখকদের ত্রুণ করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত-বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই ভুলত্রুটির নিম্নে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু-আধটু ফাঁক পার সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে, তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্য-ভাষা সংস্কৃতের পরাধীন ভিতর দিয়া, চলিত ভাষার দিকে মাঝে-মাঝে সুখ-বাড়াইতে সুরু করিয়াছিল। তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিম্মা সহিতে হয় নাই। এই জন্তই বহুমুখের ক্ষত্বের দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে। তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটুকথার হাওয়াটাই বসন্তের ধ্বনি হাওয়া। ইহা কল্পনাকে নাড়া দিয়া তাক দিয়া অস্থির করিয়া দেয় কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্তন-পালার প্রথম বোলের চাঁটি।

পুঁথির বাংলার যে-অংশটা লইয়া বিশেষ

ভাবে তর্ক প্রবল, তাহা জিয়ায় তপ। “হইবে”র জায়গায় “হবে”, “হইতেছে”র জায়গায় “হছে” ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনেরা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্কতাকে তারা মানের খর্কতা বলিয়া মনে করিত। আজ বেই তাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তারা হাঁক ছাড়িয়া বলিতেছে আপদ গেছে। এক-সময়ে ছাপার বহিতে “হয়েন” লেখা চলিত, এখন “হন” লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। “হইবা” “করিবা”র আকার গেল, “হইবেক” “করিবেক”-এর ক খসিল, “করহ” “চলহ”র হ কোথায়? এখন “নহে”র জায়গায় “নয়” লিখিলে কেহ বড় লজাই করে না। এখন যেমন আমরা “কেহ” লিখি, তেমনি একসময়ে ছাপার বইয়ের “তিনি”র বদলে “ঐহ” লিখিত। একসময়ে “আমারদ্বিগুণ” লক্ষ্যটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন “আমাদের” লিখিতে কারো হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখিতাম “সেহ” এখন সেখানে লিখি “সেও” অথচ পণ্ডিতের ভয়ে “কেহকে” “কেত” অথবা “কেউ” লিখিতে পারি না। ভবিষ্যৎবাচক “করিহ” লক্ষ্যটাকে “করিরো” লিখিতে সফোচ করি না, কিন্তু তার বেশী আর-একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না।

এই ত আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন নাই। বাংলা পুস্তক-পুঁথিতে যখন তাঁরা “বাইয়াছি” “বাইল” কথা চালাইয়া দিলেন

তখন তাঁরা স্বপ্নকালের জন্তও চিন্তা করেন নাই যে, এই ক্রিয়াপদটি একেবারে বাংলাই নয়। “যা” শব্দ বাংলায় কেবলমাত্র বর্তমান কালেই চলে, যথা, যাই, যাও, যার। আর, “বাইতে” শব্দের যোগে যে সকল ক্রিয়াপদ নিম্নরূপ হয় তাহাতেও চলে যেমন, “বাড়ি” “বাড়িল” ইত্যাদি। কিন্তু “বেগ” “যেয়েছি” “যেয়েছিলুম” পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না। এ স্থলে আমরা বলি “গেগ” “গিয়েছি” “গিয়েছিলুম”। তার পরে পণ্ডিতেরা “এবং” বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার কাছে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত-বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দব্যবহারের যে মিল আছে তাও ত দেখি না। বহুতল সংস্কৃত “অপর” শব্দের আশ্রয় যে “আর” শব্দ, সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসঙ্গত। বাংলার “ও” বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপরি শব্দের বাংলা রূপ। ইহা ইংরেজি “and” শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আদিও যাব ভূমিও যাবে—কিন্তু কখনও বলি না “আমি ও ভূমি যাব।” সংস্কৃতের স্তায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্বসমাস ব্যবহার করি। আমরা বলি “বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো।” যদি ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের এসঙ্গ্য করিতে হয় তবে বলি “বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো।” এর মধ্যে “এবং” কিম্বা “ও” কোথাও স্থান পায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা-ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। আমি

এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মূল্য এই যে, পণ্ডিতমশার যদি সংস্কৃতরীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলা-রীতির উপর ভর দিয়া বখানুখানে সংস্কৃত-রীতিকে লক্ষ্যন করিতে সফোচ করি? “মনোসাধে” আনাদের লক্ষ্যন কিসের? “শাবধানী” বলিয়া তখনি জিব কাটিতে বাই কেন? এবং “আশ্চর্য্য হইলাম” বলিলে পণ্ডিতমশার “আশ্চর্য্যাবিত হইলেন” কি কারণে?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই—যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম-অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবল সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথার লেখার সামঞ্জস্য ঘটয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্য দশার আসিয়াছে। আমাদের ভাষার এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে-ভিতরে আরোজন করিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ আইনকর্তার প্রাণতর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছে ইহার বেশী আর তাহার নড়িবার স্থান নাই।

সবুজপত্র-সম্পাদক বলেন যেসারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কামিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালি-বদল করিবার অন্ত। শুকজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কোলিকের নির্ধম শাসন ভেদ করিবেন

এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন—কারণ কথা আছে শুভ শীঘ্রঃ।

যারা প্রতিবাদী তারা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলার চণিত ভাষা নানা জিলার নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর বল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টার আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে-বেমন খুশি আপন প্রাদেশিক ভাষার পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষার লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুশিরও একটা কারণ থাক্য চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষার আপন বই লিখিবে এমন খুশিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো-একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গার তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জন্মিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভ্রাশ্য আছে বাহ্যতে “সেহু” “করুহু” প্রভৃতি জিরাপদ ব্যবহার হয় এবং “ভেরের বে” (ভাইয়ের ঘিরে) “চেলের দাম” (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বল—তবে এই ভাষাকে কে হ্রস্বীকৃতি করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ শক্তি হইতেই বাংলার এই সর্বজনীন ভাষা

বাহির করিবেন। যাহা নিজে প্রতিভা-বলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্বদেশের সর্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ চলিতেছে। বক্তৃতির কাল হইতে এপর্যন্ত বাংলার গল্প-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাচুর্য্য ঘটতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মিশ্রিত একটি ভাষা। সকল ভিন্ন ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলণ্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিগেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন? আর এ-কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? বন্ধন বন্ধবিভাগের বিভীষিকা আমাদের গায়ে ঝাঁটা, দিয়াছিল তখন আমাদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা রাজ-নৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব পশ্চিমে একটা চিত্তের ভাগ হইবে। সমস্ত বাংলা

দেশের একমাত্র রাজধানী থাকতে সেইখানে সমস্ত বাংলা দেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি আশ্রয় উঠিতেছিল। তাহা করমাসে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকঘরে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকঘরের রক্ত বলিয়া নির্দেশ করা চলে না তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিমিসটা স্বভাবতই দেশের পাকঘর। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ক্রোধ করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকঘর বহন করুক তবে আমাদের হাত পা বুক পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকঘর চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপন খোলস ভাঙিয়া যে ছাঁদে ক্রমশঃ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতে কলিকাতার আগিয়া অর্থাৎ হইতেছে*। তাহাদের সহস্রের সম্মিলনে যে এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অল্প বেশে যেমন ঘটয়াছে, তেমনি এখানেও

একটি বিশেষ ভাষা বাংলা দেশের সমস্ত ভদ্রবরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষার। এইটুকু মন্ত্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সঘিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতোই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোক-ভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার গভন হইত এবং তা হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঙ্গনের মন্ত্র অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলা দেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অব্যাহত নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্বোপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই, যিনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষার ভাব প্রকাশ করিবেন তখনই ইহা পরিব্যস্ত হইয়া উঠিবে, সেটাকে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে-তর্ক আছে সেটা একটু তাবির্য দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংঘম থাকে না। আবার শক্তি ঘানের জন্য অসংঘম তাদেরই বেশী। অতএব আমাদের যে চেষ্টা তাবাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া ঢালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব কাহনা এখনো পাড়াইয়া যায় নাই

অন্তএব এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বেঙ্কাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্তমানে এই চল্টি ভাষার লেখা, পুথির ভাষার লেখার চেয়ে অনেক মজ। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই এই অন্ত ভঙ্গতা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই অস্বস্ত প্রথাগত ভঙ্গতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুণ্ডী হইয়া ওঠে। সুবৃক্ষপত্র-সম্পাদকের শাসনে আমকের দিনে বাংলা দেশের সকল লেখকই যদি চল্টি ভাষার সাহিত্য রচনা শুরু করিয়া দেয় তবে সর্ব-প্রথমে তাঁহাকেই কানে হাত দিয়া বেশ ছাড়া হঠাতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অন্তএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই চর্যাপের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে বাহারা বহন করিয়া আনে তাহারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে বাহারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তাহারও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু বতরিন তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে ?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা পাড়াইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিয়া চিত্রা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদের পক্ষে পড়ায় করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরল করিয়া প্রকাশ করিতে

হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত নিত্যতার ক্ষেত্র। অন্তএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাহিতে সামাইতে এবং বামাইতে হয়। এই মজ বস্তুতই সাহিত্যের ভাষা সুখের ভাষার চেয়ে বিশীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খামে আমাদের জীবনস্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্যে আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে বত দূর পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চিরপ্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে একদিকে সাধারণ, আর একদিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তাহার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তাহার বিলাসিতা তাহার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধাদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে অবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে বৌক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায় ? সাধারণের ভাষার মধ্যে, সেখানে বিষের প্রাণ আপনাকে সুহৃৎ সুহৃৎ প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা ল্যাটিন এবং রাজতাবা করাসীর একটা কোলীত খিচুড়ি ছিল, তার পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আসার লইল তখন সে জব হইল। কিন্তু তাহার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে হুকিরাছে, আবার তাকে প্রাণান্তিত করিয়া সাধারণের জ্বাতে উঠিতে হইয়াছে।

এমন কি, বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পক্ষে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে পাই। বার্নার্ড শ, ওয়েল্‌স্‌, বেনেট, চেস্টারটন, বেগক প্রভৃতি আধুনিক লেখক-গণি হাল্কা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে ভাষাবিশিষ্টতার দ্বর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হঠতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য সবুজ পত্র সম্পাদক কোমর বাধিয়াছেন।

তার মত এই যে সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ টি আকারে সাধারণ এবং প্রচারে বিশিষ্ট— এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুধর্মোক্তে একটা কথা আছে “পরলা সামান্যনা মুক্তিল হার” অর্থ বিধাতাও মাহুব গড়িবার গোড়ার বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদমি সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।*

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসকাবারি

চিন্তরঞ্জনর “বাংলার কথা”

ঐযুক্ত চিন্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ সম্ভ্রুতি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সেই অভিভাষণের নাম দিয়াছেন “বাংলার কথা”; কারণ অভিভাষণে তিনি বাংলার আভিষেক বিশিষ্ট রূপ, বিশ্বজাতির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ, বাংলার পঞ্জীর প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, বাংলার কৃষি-বাণিজ্য এবং শিক্ষানীকার সাবেক ও হাল ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা এবং বাংলার সামাজিক জীবনকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিলে তাহার উন্নতি হইতে পারে, এতগুলি বিষয়ের অবতারণা ও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। স্তূর্তরাং তাঁর পুস্তিকার নামটি বেশ সঙ্গত নামই হইয়াছে; বঙ্কত বাংলার সমস্ত কথায় এই পুস্তিকাটিতে আলোচিত হইয়াছে বটে।

আমাদের দেশে কনগ্রেস কন্ফারেন্স প্রভৃতি রাষ্ট্রসভা “রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন” হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে এবং সেই আন্দোলনকে জাগাইয়া রাখাই তাহাদের মুখ্য কাজ। প্রজার স্বত্ব ও স্বাধীনতার দাবী রাখার কাছে স্বেচ্ছাসিদ্ধ উপায়ে জানাইবার জন্তই প্রধানত এই সকল রাষ্ট্র-সভার আয়োজন। ইহাদের পিছনে রাজ্য-চালনার কোন দায়িত্ব নাই; এই সকল সভার সহিত দেশের অশিক্ষিত সাধারণের কোন যোগ নাই, যোগ স্থাপনের জন্ত কোন উদ্যোগ বা উদেষণ নাই। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতী রাজনীতি অহুসারে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার চাহিয়া থাকেন; তাঁদের সেই চাওয়াটিকে তারতর্যে পাওয়াই কনগ্রেস কন্ফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব এই উদ্দেশ্যের প্রতি যে ব্যক্তির সহায়ত্ব আছে, তাঁরই পক্ষে এই

সকল, রাষ্ট্রসভার কাজে যোগদান করা স্বাভাবিক ; যার সহায়ত্ব নাই এ সব সভার কাজে তাঁর যোগ দিবার কোন প্রয়োজনও নাই ।

চিত্তরঞ্জনবাবু কনফারেন্সের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস কনফারেন্সের উদ্দেশ্যের প্রতি যে প্রত্যাবান্ নন, তাঁর অভি-
ভাষণে তাহা পরিষ্কার ভাষায় জানিতে
দিয়াছেন । যথা :—

“আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন ।

তাই এই অব্যবহৃত আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের
প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হরত অনেক বীকার
করিবেন না । কিন্তু বীকার না করিলেই কি কথাটা
মিথ্যা হইয়া যাইবে?.....আমাদের কোন কবিত্তিতে
কোন সন্নিহিতে ঢাকা সত্য ত্রৈলোক্যকৃত?”

“আমি যে আন্দোলন Industrialism Industrial-
ism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, কংগ্রেস কন্-
ফারেন্স জাতিগত একটা বড় রকমের ধার করা
Indian Nation তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া
উঠিয়াছি—এই সব চেটা যে আবোধগম্যকে কোন
পথে কোন দিকে লইয়া যাইতেছে তাহা কি আমরা
চাখিয়া দেখিয়াছি।”

প্রতিনিয়ন্ত্রাল কনফারেন্সের সভাপতির
রূপে প্রতিনিয়ন্ত্রাল কনফারেন্স সম্বন্ধে এই
ব্যঙ্গোক্তি নিতান্তই অশোভন হইয়াছে ।

কংগ্রেস কনফারেন্সের রাজনৈতিক
আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বাবু
যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা
কিছুমান নূতন নয় । স্বদেশী আন্দোলনের
সময়ে এ সকল কথার বশেষ্ট আবৃত্তি হইয়া
গেছে, কংগ্রেসের নীতিকে তখন ভিক্ষকের
নীতি (mendicant policy) বলিয়া
একদল স্বদেশিক প্রচুর অবজ্ঞা করিয়া-

ছিলেন । স্বদেশী আন্দোলনেরও বিশ বছর
পূর্বে রবিবাবু তাঁর লেখার ও গানে এই
কথাই বলিয়াছিলেন :—

“সিহ,

কথার বাঁধনি কাঁহনির পালা
চোখে নাই কারো মীর
আবেদন আর নিবেদনের খালা
ব'হে ব'হে নত শির ।
কাঁহিরে সোহাগ হি হি একি লায়
জগতের মাঝে তিখারীর সাম
আগনি করিলে আগনার কাজ
গরের 'পরে অভিমান ,”

এবং স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল
পূর্বে হইতে “স্বদেশী সমাজ” প্রভৃতি বক্তৃতায়
এই “ধার-করা নেশন” তৈরির বিপদ
সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া
সমাজের সমস্ত কল্যাণভার দেশবাসীদের
স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চিরন্তন ব্যবস্থাকে
আশ্রয় করিতে হইবে—এই কথাই রবিবাবু
পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন ।

তবু, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনের
সভাপতির পদে নির্বাচিত হইয়া রবিবাবু
তাঁর অভিভাষণে কংগ্রেস কনফারেন্স সম্বন্ধে
কোন অশোভন বা অসঙ্গত উক্তি প্রকাশ
করেন নাই । সেই বক্তৃতায় তাঁর একটি
উক্তিতে তিনি কংগ্রেসের স্বভাব সম্বন্ধে
যেমন প্রজ্ঞা নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার
অভাব সম্বন্ধেও তেমনই সুনিপুণভাবে ইঙ্গিত
করিয়াছিলেন । সেই উক্তিটি এই :—
“কেবলমাত্র একদা হইয়া দেশের শিক্ষিত
সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার
জন্য এই সভাকে বহন করিতেছেন । এই
উপায় দেশের ইচ্ছা ক্রমশঃ পরিণত আকার

ধারণ করিয়া বলপাতি করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্ণশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আন্দোলনাত্মক সভ্য করিয়া তুলিবে, এই আশার লক্ষ্য।" অথচ দেশের ইচ্ছাশক্তিকে কর্ণশক্তিতে পরিণত করিবার লক্ষ্যটাকে এই সকল রাষ্ট্রসভা যে চোখের সামনে রাখেন নাই, তাহা রবিবাবু বেশ জানিতেন। তবু সেই লক্ষ্যের দিকেই এই সকল সভার স্বাভাবিক অস্তিত্বক্ৰিা ঘটতে পারে, এই ভরসাটুকুকে ধোলাসা করিয়া বলার ক্ষমতা তিনি এই সকল সভার ধারিত্বকে খুব বড় করিয়া ধরিবার একটা স্রোযোগ পাইয়াছিলেন।

চিন্তরঞ্জন বাবু প্রায়শিক সম্মিলনের সভাপতি হইয়া শুধু যে সেই সম্মিলনের প্রতিই অবজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তা নয়, সম্মিলনের ভূতপূর্ব সভাপতি এবং স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোধিত ও নেতা রবীন্দ্রনাথ সঙ্কেও অথবা নিন্দাবাদ করিয়া সভাপতির পদের অবমাননা করিয়াছেন। অথচ মজা এই যে, তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটির গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভাব ও স্থানে স্থানে ভাবাও তিনি রবিবাবুর প্রবন্ধটি হইতে, জ্ঞাতসারে হোক বা কতকটা অজ্ঞাতসারে হোক, গ্রহণ করিয়াছেন। কতকটা অজ্ঞাতসারে বলিলাম এইজন্য যে, আধুনিক অনেক লেখকেরই মত চিন্তরঞ্জন বাবুও রবীন্দ্রনাথের নিকট সর্ববিধেই স্বপ্নী, তাহা তাঁহার ষ্ঠে-কোন রচনা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। সুতরাং লিখিবার বেলায় তিনি যে রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ

সচেতন না হইতেও পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন না হইলেও একেবারে অচেতন হইবার কোন কারণ পাই না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের অশেষ ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা ও কাজের প্রস্তাবগুলি কালের হিসাবে এখনও এতটা পুরাতনো হইয়া দাঁড়ায় নাই যে তাহাকে সভ্যসভাই পুরাণের মত বা traditionএর মত যে পুসি সেই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী এখন এ দেশে নানালোকের মুখে মুখে চলিয়া গেল, তখন কালক্রমে তাঁহাদের কথার উনিশ বিশ করিয়া বাংলা দেশে বিস্তার পদকর্তা দেখা দিয়াছিলেন। কোন বড় ভিনিষ একবার চলিয়া গেলে তখন লোকে এমনিতর অজ্ঞাতসারেই তাহার নকল করিয়া থাকে বা তাহার আয়ত্তি করিয়া থাকে—সেটা অনেক সময়ে তার অপব্যবহার হইলেও তার একরকমের বাবহার ত বটে এবং তাতেই তার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। আর পশ্চিম কি পকাশ বছর পরে চিন্তরঞ্জন বাবুর মত যদি প্রতিভাশালী কন্-কারেলের কোন ভারী সভাপতি রবিবাবুর উক্তির পুনরুক্তি করিতেন, তবে পুনরুক্তির অভিযোগ-হইতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া বাইতে পারিত, কেননা এটা তখন বেশ বৃদ্ধা বাইত যে দেশের হাড়ে হাড়ে এই উক্তিগুলার ভাব ঢুকিয়া গেছে। সুতরাং কবির সেই কথাটা তখন সভ্য হইত যে—

"হলেছি যে কথা করেছি যে কাহ
আবার সে নয় সবার সে আদ"।

কিন্তু এত শীঘ্র শীঘ্র এই করেক বছরের মধ্যে বাংলা দেশের এত লোকের স্ততিবাদ

ও অপবাদের স্রোতের মধ্যে রবিবাবুর স্বদেশ সঁখকীর কথাগুলো যে পুরাণ-কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং যে কেহ আজ সে গুলিকে নিজের মত ব্যবহার করিতে পারিবে—এটা কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রবিবাবুর কোন কথাই এবং কোন আলোচনাই দেশ বিলা-প্রতিবাদে গ্রহণ করে নাই। বিশেষতঃ, দেশ সম্বন্ধে তিনি বা কিছু কাজের কথা বলিয়াছেন, কবি হওয়ার দরুণ সবটাই লোকে তাঁরই জল্পনা-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের দেশে কল্পনার সঙ্গে কাজের কোন কালে বিশেষ শ্রণয় নাই বলিয়া তাহের মধ্যে পরিণয় ঘটানোর যে উদ্ভোগ রবিবাবু করিয়াছিলেন, তাতে লোকের পরিহাসটাই আগিয়াছে। সুতরাং এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরই কথাগুলো চিত্তরঞ্জনবাবু কতকটা অজ্ঞাতসারে লইলেও, খুব বড় কৌশিলির কৌশলের জোরেও পুনরাবৃত্তি-বোম তঁথৈব “নকল পাণ্ডিত্যের” দোষ হইতে তাঁকে মুক্ত করিবার কোন উপায় দেখিনা।

রবীন্দ্রনাথের কণিকার আছে :—

“অমিটরে অভিক্ষণি সবা ব্যঙ্গ করে

অধি কাছে হুগি সে বে পাছে ধরা গুড়।”

চিত্ত বাবুর ঐই অভিভাষণ সম্বন্ধে সেই কথাটাই দিবা ষাটে দেখিতেছি। কেননা, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত রবিবাবুর সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ধামধা অপ্রয়োজনে এবং “অকারণ পুলকে” তিনি তাঁর “মহা-সভার সভাপতির আসন” হইতে এক-জায়গায় রবিবাবুর আমেরিকার এক বক্তৃতাকে লক্ষ্য করিয়া এমন একটা বিজ্ঞপের -

খাপ ছুঁড়িলেন যেটা লক্ষ্যের কাছ দিয়াও গেলনা, উল্টা কিরিয়া আসিয়া তাঁর সেই আসনটাকেই লক্ষ্যের মত বিদ্ধ করিয়া রহিয়া গেল। তাঁর লক্ষ্য—রবিবাবুর আমেরিকার কোন বক্তৃতা—কোন বক্তৃতা তাহা বোধহয় তিনিও জানেননা। কারণ, তিনি নাম করেন নাই। আমাদের বোধ হয় তিনি, ‘The Cult of Nationalism, বক্তৃতাটির কথাই বলিয়াছেন। তার পর তিনি কবুল করিয়াছেন সে বক্তৃতা তিনি পড়েন নাই এবং “হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি।” তিনি পড়িয়াছেন সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকান কাগজের হুঁকটা টুকরা ধাধা ‘মহার্ণ রিভিউ’তে প্রকাশিত হইয়াছিল। টুকরাগুলিতে সেই বক্তৃতার বিবরণ ছিল এবং এক আধটা অংশও উদ্ধৃত ছিল। সেই অংশগুলি হইতে পুরা বক্তৃতাটা সম্বন্ধে কোন লোকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না, কষ্টকরিত ধারণা হইতে পারে বটে। আমেরিকান কাগজগুলিই একবাক্যে সকলে স্বীকার করিয়াছে যে, Cult of Nationalism বক্তৃতাটির সার কথা উদ্ধার করা তাহের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তারা যে বা বুঝিয়াছে, সেই অহুসায়ে কাগজে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন কাগজে একেবারেই ভুল বুঝিয়া বসিয়াছে দেখা যায়। বক্তৃতা মিলেন একজন, সেই বক্তৃতা গুলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন আর মনজন, তাহের বিচিত্র মন্তব্যের আবার টুকরাগুলি এখনকার কাগজে উদ্ধৃত দেখিয়া সেই নানা পত্রবাহুজিত টুকরাগুলার

আলোড়নে বঙ্গীয় প্রতিনিধাল কনফারেন্সের নূতন সভাপতির আসন হইতে এমনি ঢোল হইয়া উঠিল যে, সেই বক্তৃতার প্রতিবিম্ব এবং তত্ত্ব প্রতিবিম্বের ছায়ার বিরুদ্ধে অনেক খানি মসীলেপনের কীর্ষি-অর্জনের মন্ত তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! আমেরিকার রবিবাবু বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা আগে ছাপাই হোক, তার পর তার সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিলে বলা যাইতে পারিত। ইতিমধ্যে মহাসভা এবং সভাপতির আসন পুরামস্তর বজার থাকিত, কোনটাই স্মরণ হইবার আশঙ্কা ছিল না। রবিবাবুর সেই বক্তৃতার সঙ্গে প্রতিনিধাল কনফারেন্সের কার্যতালিকার কিবা চিত্তবাবুর কাজের কথাই এমন কিছু যোগ ছিল না যে বক্তৃতাটা না পড়িয়াই তাহার প্রতিবাদ করা অন্ততঃ জরুরি দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার ফলে হইয়াছে এই যে, সেই বক্তৃতার রবিবাবু বাহা বলেন নাই তাহাই তাহার বক্তব্য বলিয়া অবাধে চালানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার nationalism সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা “স্তার রবীন্দ্রনাথ” হইবার বহু পূর্বেও যমেশী আমোলানের সময় তিনি ক্রমাগতই বলিয়াছিলেন, সেটা বোধহয় চিত্তরঞ্জন বাবু জানেন না। আমেরিকার বক্তৃতার তিনি আসলে নূতন কোন কথাই বলেন নাই, তবে খুব জোরের সহিত নূতন ও বড় দিক্ হইতে সেই পুরাণো কথাই বলিয়াছেন বটে। আর চিত্তরঞ্জন বাবুও সেই পুরাণো কথাই “অবিকল রবিবাবুরই ভাবে ও ভাষায়, পুনরাবৃত্তি

করিতে গিয়া রবিবাবুরই অন্তরে রবিবাবুরকৈ আঘাত করিবার মন্ত বিস্তর অনন্ততন্ত্রতার ঘটা ও আত্মগরিমার ছটা প্রকাশ করিয়াছেন।

সভাপতির অভিভাষণে তিনি লিখিতেন :—

“ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত হির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব ইংরেজিতে বাহাকে “Nation Idea” বলে ইহা নাকি একেবারেই স্বাভাবিক, কোন মস্তর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা মস্তর মূল নাই। (?) অতএব জাতির মস্তর মধ্যে অস্ত্রাত্মক জাতির মস্ত মিশ্রিত আছে। আচার, ব্যবহার, শিক্ষার, নীতির, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান গ্রহণ চলিয়াছে এবং আদান গ্রহণের মধ্যে বাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে মঃজাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও মঃমঃ মানবজাতির অবস্থার কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটা অনেককিছু-কিছু, কিন্তু বর্তমান মুহুরের সঙ্গে সঙ্গেই আদান নূতন করিয়া অটোরিত হইতেছে, কালেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা খরিয়া বলিয়াছেন, এবং এই মস্তর জোরেই আমাদের এই নব জাতীয় জাতীয় ধীবনাকাম্যকে হাদিগা উড়াইয়া দিবার মন্ত চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মস্ত ইউরোপে অনেক বড়-বড় পণ্ডিত অনেকবার শব্দন করিয়াছেন; আমি শুধুসা করি এতদন্ত করিবেন। তাহাদের সমস্তা তাহারাও পূরণ করিবেন। কিন্তু দুখের জেয়ে বালির তাপ বেঈ, আমাদের দেশে এই সব বকল পণ্ডিতদের পাতিত। এত বেঈ যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই শব্দন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই যমেশী আমোলানের “সময় বাহুল্যের নষ্ট বাহুল্যের জালকে সভা করিবার কায়দার ভগবাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্তার রবীন্দ্রনাথ—

এবার আমেরিকায় এই মতটি নাকি খুব জোরে
সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা
কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। হস্তগত পড়িতে
পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন
অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত
না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা
করিয়াছি কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেই মতের
এই ক্ষেত্রে বাস্তবী ভাষিত এই মতাদর্শের সভাপতির
অন্যন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের চাফার
উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য
আত্মতা বঙ্গাইতে হইলে তৈর ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে
বিস্তারিত করিতে হইবে। তাঁহার পক্ষে এই আত্মতা
অসম্ভব কল্পনা মাত্র। জাতি ভুলিয়া দিলে বিশ্বমানব
ধাঁড়াইবে কোথায়?”

“এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ”—এই “এখন”
কথাটার উপর ঠেস দেওয়ার ভিতরে বেশ
একটা নীচতার আরোপ (insinuation)
রহিয়াছে, যেটা ভ্রমোচিত নয় বলিয়া তাহার
জবাব দেওয়াও ভ্রমোচিত হয় না। রবি-
বাবুকে সরকার নাইট করার পর হইতে
তাঁহার জাতীয়তা হঠাৎ রাতারাতি বিশ্বজাত-
প্রেমে পরিণত হইল, সুতরাং তিনি
জাতীয়তাকে গালমন্দ দিয়া পশ্চিমের কাছে
বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন, “নকল
পাণ্ডিত্য” দেখাইতেছেন, এই সব ধোঁয়াশোঁপের
যে কোন .ভিত্তি নাই তাঁর প্রমাণ
ঐ বক্তৃতাটিই,—“The Cult of National-
ism”ই। চিন্তারজনবাবু কি একবার
খোঁজ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে কোন ঐ
বক্তৃতাটি এদেশের কোন কাগজে কোথাও
প্রকাশিত হইল না? অথচ আমেরিকার
সহরে সহরে ঐ বক্তৃতাটি লইয়া একটা
ফুল ফুল ফুল পড়িয়া গিয়াছিল কেন? ঐ

বক্তৃতার রবিবাবু যে অসামান্য ভেৎসবিতা
ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে
কোন দেশের লোকের পক্ষে স্বগ্রন্থ—
বিশেষতঃ কোন পরাধীন দেশের লোকের
পক্ষে। তাঁর সেই বক্তৃতাটি কোথাও
সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া দিতে পারিতেছি না,
ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আক্ষেপের
বিষয়। তবে তাহার মোট কথাটা রবিবাবু
১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শনেই “প্রাচ্য ও পশ্চাত্য
সত্যতা” শীর্ষক এক প্রবন্ধে অতি সুস্ব-
রূপে বলিয়াছিলেন; সেই প্রবন্ধের কতক
অংশ এবং cult of nationalism প্রবন্ধের
কতকংশ এখানে উদ্ধার করিয়া দেওয়া
বাইতে পারে। “কোন বিশিষ্টজাতির নাকি
কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই” এ সকল
কথা তিনি যে কোন কালেই বলেন
নাই এবং এখনও বলিতেছেন না, তাহা হই
প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বুঝা
বাইবে :—

প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সত্যতা (১৩০৮ সাল)
“রুমোণীয় সত্যতাকে বেশে বেশে লত খণ্ড করিয়া
বেশিলে, অল্প সকল বিষয়েই তাহার স্বাভাব্য ও
বৈচিত্র্য বোঝা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার
ঐক্য বেশিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

“ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই
জনসাধারণের মধ্যে মত বিখণ্ডের প্রভেদ থাকিতে
পারে, কিন্তু য য রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আশ্রয় লক্ষ্য ও শোষণ
করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে
তাঁহার ঐক্য, তাঁহার প্রবল, তাঁহার নিষ্ঠুর, সেই
খানে আবার ল্যাগিজেই সমস্ত দেশ একমুখি হারণ
করিয়া দখলদার হয়। জাতিতত্ত্ব আশ্রয়ের যেমন
একটা সত্যের সংস্কারের মত হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয়
স্বার্থের। রুমোণের সর্বসাধারণের তেমনই একটি
অভিনিহিত সত্যের।

* * *

“ঐতিহ্য জাতির বেঘন একটি ঐতিহ্যবাহী আছে, তেমনি ঐতিহ্যের স্রোত একটি প্রেত বর্ষ আছে, তাহা মানব সাধারণের। আবারের বেশে বর্ণিত-বর্ণিত বহন সেই উচ্চতর বর্ণিত ভাষাত করিল, তখন বর্ণিত ভাষাকে আঘাত করিল—

বর্ণিত এই হতো হতি বর্ণিত রকতি রকিতঃ।

“ইউরোপীয় সভ্যতার বৃদ্ধি রাত্রির বর্ণিত বর্ণিত এত অধিক কীতি লাভ করে যে, বর্ণিত রীতিনীতি অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিন্যাসের দ্বিত বর্ণিত বর্ণিত এবং সেই পথে বর্ণিত প্রবেশ করিলে।”

“বার্ণের প্রকৃতিই বিরোধ। ইউরোপীয় সভ্যতার রীতিনীতি সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কটকটিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া টেনাটেনি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্ণ হুচনা দেখা যাইতেছে।”

“বিশ্ব সভ্যতা রাষ্ট্রীয় উৎসাহের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আনন্দের বার্ষিক হই বা পরাধীন থাকি, বিশ্ব সভ্যতাকে সমস্তের ভিতর হইতে পুনরায় সম্বোধিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা তাগণ করিবার নহে।

“নেপন শব্দ আবারের ভাষায় নাই, আমাদের বেশে ছিল না। সমস্ত ইউরোপীয় শিক্ষাগণে জ্ঞানভাণ্ডার বহুকে আমরা অত্যধিক আঘাত দিতে নিবিড়। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অত্যধিকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের বর্ণিত, আমাদের সমাজ, আমাদের বৃহৎ কিছুই নেপন পঠনের প্রাধান্য বীকার করে না। ইউরোপ আধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আমরা বার্ষিকতা ছাড়া অস্ত্র বার্ষিকতার নাহান্য আদর্শ মানি না।...একদম এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সর্বাধিক নাই বলিয়াই আমরা ইউরোপকে-ঈর্ষা করিতেছি। ঈর্ষাকে যদি বর্ণিত বর্ণিত সম্বোধিত করিতে পারি, তবে বর্ণিত বর্ণিত ও বর্ণিত বর্ণিতের সাহায্যে বর্ণিত হইতে হইবে না; তবে আমরা বর্ণিত বার্ষিক হইব।”

চিত্তরঞ্জন বাবু কি জানেন না যে, “নৈবেদ্যের”—“শতাব্দীর স্বর্গ আর্জি” রক্ত মেঘমাঝে অস্ত্র গেল,” প্রকৃতি স্বপ্নে সজীব কবিতায় এবং “প্রাচীন” “সমাজভেদ” “ভারতবর্ষের ইতিহাস”, “চীনেমানের চিঠি”, “স্বদেশী সমাজ”, “সকলতার সহপাঠ”, “সনাতন”, “ততঃ কিম্”, প্রকৃতি নানা প্রবন্ধে রবিবাবু এই কথাই পুনঃপুনঃ নানা দিক হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর ইউরোপীয় জাতিবৈষয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমাদের জাতিবৈষয় প্রতিষ্ঠা সে আরণ্য স্বপ্ননই হইবে না? জাতি তুলিয়া দিতে তখনও তিনি বলেন নাই, এখনও বলিতেছেন না। জাতি নাজকেই যে “নেপন”—রূপ ধারণ করিতেই হইবে, ইহাতেই তাহার আশ্রয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আর এক নাম যদি “নেপন” হয়, তবে তাহাকে এমন উগ্র ও প্রবল হইয়া উঠিতে দেওয়া উচিত নয়, বাহ্যতে তাহা জাতির ভিতরকার বহু ও কল্যাণপ্রব স্বজনীয়কগুলিকে (creative impulses) চাপা দিয়া মানুষ-গুলিকে বহুের সামিল করিয়া তুলিতে পারে। ইউরোপীয় people's nation-রূপ খুব বেশীদিন ধারণ করে নাই—এই রূপ ধারণ করার জন্য তাহাদের প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি কি অবনতি হইতেছে তাহাই বিবেচ্য।

The cult of Nationalism এর মোট কথার সঙ্গে আর রবিবাবুর বহুপুর্বে লিখিত প্রবন্ধ “প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সভ্যতার” মোট কথার সঙ্গে যে বিশেষ পার্থক্য নাই তাহা দেখাইবার জন্য The “cult of Nationalism” হইতেও ঐ রাষ্ট্র

ও সমাজের পার্থক্য বিচার সম্বন্ধে হ'একটা
অংশ উদ্ধার করা কর্তব্য মনে করিতেছি।
তিনি বলিতেছেন :—

"The nation is a whole people organized for a mechanical purpose. Society has no such purpose—it is an end in itself; it is the natural human relationship which enables men to develop toward their aspirations. But the political side is narrower—it is for self-preservation only; it trades upon the greed and fear of men."

"When this selfish force becomes all powerful at the cost of the higher social life, then it is an evil day for humanity. When the father becomes a gambler and loses his regard for his family, then he becomes an automaton and not a man. When society turns into an organization for greed and power there are few crimes it cannot commit, for power is the end of a machine and a machine has no morals."

অন্তএব সেথা যাইতেছে যে, চিত্তরঞ্জন বাবু
nationalism সম্বন্ধে রবিবাবু কি বলিয়াছেন
তাহা না জানিয়াই কতগুলি কামনিক আপত্তি
খাড়া করিয়া তাহার পোষণার্থে এবং
রবিবাবুকে দূত্বার্থে বিস্তার উপপত্তি রবিবাবুর
লেখ্য হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁর সমস্ত
লেখ্যের সব আইডিয়াগুলায় অস্ত্র তিনি
যে রবিবাবুর কাছে কি পরিমাণে ধণী
তাহা তিনি স্বীকার না করিলেও
বঙ্গীয় পাঠকবর্গের তাহা জানা উচিত।
সেই অস্ত্র তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে
রবিবাবুর কথা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

পর পর দুইনের লেখার উদ্ধৃতিংশ পড়িলে
“নকশ পণ্ডিত” যে কে তাহা বুঝিতে
পাঠকবর্গের ভিলার্ডও বিলম্ব হইবে না।
রবির চেয়ে “বাশির তাপ” যে বেশি তাহাও
মধ্যে মধ্যে বুঝা যাইবে।

চিত্তরঞ্জন—“মনে করি, রাজনৈতিক
আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার
ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া বক্তৃতা
করিয়া জিতিয়া বাইব।... শুধু বাহ্য আবস্তক
তাহা করি না; দেশের প্রতি মূখ ভুলিয়া
চাই না,” ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ—“মনে করি আমাদের পোলি-
টিক্যাল কর্তব্যক্ষেত্র যেন মূল বালকের ডিবেটিং
ক্লাব—গবর্নেন্ট যেন আমাদের সহপাঠী
প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই
আমাদের জিত হইল।... দেশের কুবি সম্বন্ধে
বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব
বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ
করি না।” “সকলতার গুরুপাথ”—“সমূহ”।

চিত্তরঞ্জন—“সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য
ব্রাহ্মত্বের আপাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি-
সমূহকে বিকশিত করিতে হইবে।...
জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও
সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।”

রবীন্দ্রনাথ—“ইহা নিশ্চয় জানা চাই,
প্রত্যেক জাতি বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্ব-
মানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার কি
সামগ্রী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সহস্র
দিগা প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা-লাভ করে।—”
“বদেয়ী সবার”—“সমূহ”।

চিত্তরঞ্জন—“আমরাও... নিজের দক্ষ-কর্ষ
সকলই অবলৌল্যক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নিজের

শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের সাহিত্যকে
ভুজ্ঞ ভুজিলা করিয়া আমাদের জাতীয়
ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা
করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস,
ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত
অসংযতভাবে কৃকিয়া পড়িয়াছিলেন।...
তিনি (রামমোহন রায়) যে আমাদের
সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের
পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা এক-
বারও মনে করি নাই।”

রবীন্দ্রনাথ—“আমরা একদিন হৃদভাবে
জড়ভাবে যুরোপের কাছে তিক্তবৃত্তি অবলম্বন
করিয়াছিলাম; আমাদের বিচারবুদ্ধি একে-
বারে অস্তিত্ব হইয়া গিয়াছিল।...রামমোহন
রায় নিজের প্রতিক্রিয়ার উপর দাঁড়াইয়া
বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন।
ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার
অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব
করিয়া লইয়াছিলেন।” “পূর্ব ও পশ্চিম”—
“সবায়”।

চিত্তরঞ্জন—“যখন জাগ্রিয়াম, মা আমার
আপন গৌরবে তাঁহার বিবরণ দেখাইয়া
দিলেন।”

“ও আমার দেশের মাটি

তোমার পরে ঠেকাই মাথা

তোমাতে বিশ্বমতীর বিশ্বাসের আঁচল পাতা।”

“হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি

দেখা দিলে আজি কি বেশে!

দেখিছ তোমারে পূর্ব গগনে

দেখিছ তোমারে বদশে!”—

গান্ধী ও কাব্যগ্রন্থ।

চিত্তরঞ্জন—“প্রাণের যে বজ্র সে ত
অকস্মাত্ বানে না।”—

রবীন্দ্রনাথ—“মহুয়া সমাজ সাধারণতঃ
হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক এক সময়ে
সেখানে যেন ডেবী লাগিয়া যায় তখন আর
হিসাবে মেলে না। অল্প সময় চুরে চুরে
চায় হয়, সহসা একদিন চুরে চুরে পাঁচ
হটয়া যায়।” “চৈত্র পত্র”—“সবায়।”

চিত্তরঞ্জন—“ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধন
...এমন করিয়া ছড়ছড় করিয়া আমাদের
ঘাড়ের উপর না পড়িলে হস্ত এত সহজে
এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য
হইত না।”

রবীন্দ্রনাথ—“বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন
দূরে ছিলাম, বাহির তেমন ছড়ছড় করিয়া
একেবারে ঘাড়ের উপর আগিয়া পড়িয়াছে
... এই উৎপাতে ... আমাদের কি আশ্চর্য
শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল।” “বদশে
সবায়”—“সমূহ”।

চিত্তরঞ্জন—“আমাদের ও ইংরাজের
মিলনের মর্ম বহি এই হয় যে আমরা
ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই
ছাঁচে গড়িয়া উঠিব, ...তাহা হইলে আমি
বলি এ মিলন একেবারে অসম্ভব।...
কেহ কেহ বলেন যে এই মিলনের অর্থ
এই যে, ইংরাজের বাহা কিছু ভাল আমরা
লইব, আমাদের বাহা কিছু ভাল তাহা
ইংরাজ লইবে...। খাটি ভালটুকু ছিঁড়িয়া
লইবে কি করিয়া?...কোন জাতির সংস্কার
অন্য জাতির আদর্শে সত্ত্ব হয় না।”

রবীন্দ্রনাথ—“সকল জাতির স্বভাবগত
আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া কোন্ করিব

প্রয়োজন দেখি না... বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই—“নববর্ষ।”—“বশেষ।”
 “বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেবিত্তে নিজস্ব ও নিজস্ব হয়, কারণ তাহার পশ্চাতে স্থিতির কালের ইতিহাস নাই—তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, শিকড় ছিন্ন—“নববর্ষ।”—“বশেষ।”

“সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সার্থক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাকে।..... এইটুকু বোঝা বরংকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর ভায়—আবৃত্তক হইলেও, ইহার কোন এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীর-তত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।—“সমাজ কেবল,” “বশেষ।”

“ব্রিটিশ রাষ্ট্রে আমরা যেটুকু অগ্রগতি হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের কৃত-কার্ধ্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনরক্ষণ বিধি ব্যবস্থা বড় ভালই হোক না কেন, তাহা ত বস্তুত আমাদের নহে।... ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্যের দ্বারা সজল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা বর্ষা উৎসব লাভের আশা করিতে পারিব।... অতএব যুরোপীয় সভ্যতা নিকটই বলিয়া বর্জন করিতে হইবে, একথা আমার বক্তব্য নহে—তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই অসাধা বলিগাই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে। “দেশের রাজা” “বশেষ।”

চিন্তরঞ্জন—“জাতির মরেনা—তধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একদ আছে তাহাই জাগিয়া উঠে।”

রবীন্দ্রনাথ—“বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে,—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সচন্দ্রতা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে আদর্শ অল্প আদর্শের প্রতি বিবেচনাপ্রাপ্ত, তাহা আদর্শই নহে।”—“সমাজ কেবল”—“বশেষ।”

চিন্তরঞ্জন—“পল্লী-সমাজ বাণেশ্বর সভ্যতা সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিহীন হইয়া তাহার সম্ভাবনামূলক হারায়ে গেলে তাহার বলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষয় ও নিরোজন হইয়া পড়ে।... স্বাধীনতার উন্নতি করিতে হইলে চাষাধিপত্যকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নতুন সুফরিদী খনন করিতে হইবে, পুরাতন সুফরিদী সংস্কার করিতে হইবে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, এবং চাষার বাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম-মুদ্রে তাহার আবৃত্তকীয় টাকা ধার দিবার ক্ষমতা গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।”

রবীন্দ্রনাথ—“সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোক ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাণ্ড পাইবে সেই মাটি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে গ্রামসমাজ জাতির জগৎভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন

বিভিন্ন চেষ্টা পিরাচ্ছে।... গ্রামগুলিকে বাবদ্বাধক কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নতুন চেষ্টা প্রবর্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান বাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং বাহাতে তাহারা নিজেদের সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর।... “নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মশালা, সমবেত পণ্যভান্ডার ও ব্যাক স্থাপনের জন্ত ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহদান করিতে হইবে।”
পাশ্চাত্য আবেশিক সমাজতন্ত্রের সভ্যতার অভিভাবক।

চিন্তারঞ্জন—“আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ অনিত যে বিলাতের ভোগ তাহাকে সবলে ছুই হাতে ছিঁড়িয়া কেঁপে উঠেছে। জীবনকে সহজ সবল করিতে হইবে।... Industrialism যাহা আমাদের দেশে কখনও ছিলনা ও আমাদের স্বভাব ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্যেই পায়েরা... আজ যে আমরা Industrialism Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি... কংগ্রেস কনফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধারকরা Indian Nation তৈয়ারি করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—এই সব চেষ্টা যে আমাদেরকে কোন্ পথে কোন্‌দিকে লইয়া যাইতেছে তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? কেহ কি আমরা বলিয়া দিতে পার আজ ছইশত বৎসরের ভিতর কয়টা নতুন পুরুষগণ ধন হইয়াছে, কয়টা নতুন পেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নতুন অর্থহীন খোলা হইয়াছে...? সে কালে ধন গ্রামে গ্রামে ছপেঁচুসব হইত,

পল্লিতে পল্লিতে বারমাসে তের পার্কিং ছিল, তখন সকল গৃহস্থ সকল গ্রাম কেমন এক পরিবার হইয়া উঠিত, স্বপ্ৰভা, আনন্দ-উল্লাস, উৎসব এক সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই!”

রবীন্দ্রনাথ—“এই ভোগ এবং আড়ম্বরের টেউ (বিলাতের) আমাদের দেশেও যে উদ্ভাল উঠিয়াছে সে কথা কাহারো অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আরের পথ বিলাতের অপেক্ষা সর্কারী... আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্য্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদলায় নাই। এ সমাজ বহু সঙ্কটবিশিষ্ট।... অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম বৃদ্ধ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাশঙ্কক।... প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন... দেশের ভোগবিলাতের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি কাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল নানপানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি অন্ধলৈ ভরিয়া উঠিয়াছে এবং যে দেশ বাংলাদেশে তেতো পার্কিং মুখরিত হইয়া থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ নিস্তর হইয়া গেছে।” —“বিলাতের ক'াস”, “সবায়”।

চিন্তারঞ্জন—“আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন তাহা এই মিল ক্যান্টরীতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।”

রবীন্দ্রনাথ—“সহরে ধনী

কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের
মহাযাত্রা কিরণ নষ্ট হয় সকলেই জানেন।—
পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণ—“সুহৃৎ”

চিত্তরঞ্জন—“সমাজের যে স্থানে অর্থশক্তি
বদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানই শক্তিসম্পন্ন হয়
কিন্তু অজ্ঞাত স্থানে অবসান অন্ধকার।”

রবীন্দ্রনাথ—“যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র
অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে,
সেই ধন সংকোপ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে
ঐশ্বর্যের দ্বারা স্বজন করিতেছে তাহা বিশ্বাস-
যোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রভাবিত
করিয়া কেবল মুখেই বহিঃ স্তম্ভ সজ্জার হয়,
তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।—
“বিশ্বাসের ক’ল”—“সমাজ।”

চিত্তরঞ্জন—“আমরা এখন যে উচ্চশিক্ষা
পাই তাহা একটা ধার করা জিনিস, তাহার
সঙ্গে সেই কারণে আমাদের দেশের স্বভাব-
ধর্মের যোগ দেখিতে পাই না।... এই
ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের
কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ
প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে
না...আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে
অঙ্ক কসিতাম।...এখন স্কুলের নিয়ন্ত্রণী
হইতে কলকর্য্য ভাল কাগজের সাধন খাতা
না হইলে না কি লেখা পড়া হয় না।”

রবীন্দ্রনাথ—“হুরোপের বিদ্যালয়ের
অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে
সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে।...
বাহ্য বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া
দেওয়া তাহা শুদ্ধ তাহা নিষ্কোণ।...যতদিন
ঘেঁষতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি
ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের

ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে স্রেফ
‘পেন্সিলের প্রচুর্য্য হইয়াছে কিন্তু পাঠশালা
হওয়াই মুশিল।—“শিক্ষাসমাজ”—“শিক্ষা।”

চিত্তরঞ্জন—“এই শিক্ষার কলে...আমরা
মাহু হই নাই, একটু বেশী ঢালাক হইয়াছি
মাত্র। বক্তৃতার সময় সেই সুখর করা
কথাগুলো ততোত্তর মত আওড়াইয়া যাই।”

রবীন্দ্রনাথ—“বাহ্য কিছু পড়িয়াছি, তাহা
আমাদিগকে ভুতের মত পাইয়া বসিয়াছে,
সেই পড়া বিভ্রা আমাদের মূখ দিয়া কথা
বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে,
যেন আমাদেরই কথা বলিতেছি।—“স্বাভাব
বিভ্রাণ”—“শিক্ষা।”

চিত্তরঞ্জন—“আমি আজ বাঙ্গালীর মহা-
সভার সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই
শিক্ষা বীকার প্রণালী সমূলে পরিবর্তিত না
করিলে, ইহার মূখ ফিরাইয়া দিতে না
পারিলে, ইহাকে আমাদের দেশের যে
স্বভাব ধর্ম, আমাদের দেশের যে সভ্যতা
সাধনা, তাহার সহিত যোগ করিয়া না দিতে
পারিলে...আমাদের ঘোর বিপদের কথা।

রবীন্দ্রনাথ—“ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে
পারি আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের
দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি
অপূর্ণ অভিপ্রায় নিহিত আছে।...আমরা
বাহ্য পৃথিবীকে দিব, তাহা আমাদের নিজের
দান হইবে, তাহা অন্তের উজ্জ্বল হইবে
না।...এতদিন আমরা ইচ্ছল কলোকে যে
শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহা আমাদের
পর্য্যন্ত করিয়াছে...মাহু বহিঃ এমন করিয়া
শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে
কোন মুতেই মগল বলিতে পারি না।...

বেমন করিয়াই হউক নিকার বার আমরা পূর্ণ পরিণত আমরাই হইব।—“রাত্তির বিজ্ঞান” “নিকা”

চিত্তরঞ্জন—“পন্নী বা গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।”—(এখানে পন্নী-সমাজের সমস্ত আইডিগ্ৰাটি বাহা চিত্তরঞ্জন ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাবনা প্রাদেশিক সন্থিলনীর অভিভাবে সম্পূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন; বাস্তব-তরে উদ্ধার করিলাম না—বাহার ইচ্ছা হয়, মিলাইয়া পড়িবেন।)

চিত্তরঞ্জন—“আমাদের দেশে রাজ্যের কর্ণক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজ্য কর লইতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবন বাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।”

রবীন্দ্রনাথ—“আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত শাখীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্য দ্বারা আবদ্ধ।... জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন।—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকেরই উপরে আকর্ষণরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।”—“যশস্বী সমাজ”—“সমূহ”

চিত্তরঞ্জন—“সমস্ত জেলাকে একটা বড় পন্নীসমাজ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত পন্নীসমাজগুলি এই কেন্দ্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যিক।”

রবীন্দ্রনাথ—“কতকগুলি পন্নী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে।... এমনকি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভর-

শীল ও স্বাবলব্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে।” পাবনা প্রাদেশিক সন্থিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

চিত্তরঞ্জন বাবু দেশের এতি প্রতিষ্ঠিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশের সেবার সকল প্রকার “অভিমান” ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :—“অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ!... আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক!” ইত্যাদি। অন্তর্কে মাথা নোয়াইবার উপদেশ দিবার আগে যার কাছে তিনি এত বিশ্বাসে এত স্থণী তাঁর কাছে নিজের মাথাটা নত করিতে হয়, আততায়ীকে হাতের ছুরি জন্মের মত ফেলিয়া দিবার উপদেশ দিবার আগে নিজের হাতের ছুরিটা ফেলা আবশ্যক হয়—তখন এই কথাটুকু চিত্তরঞ্জন বাবুকে স্মরণ করিতে বালি। তাঁর দেশভক্তি যে অকৃত্রিম তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; তাঁহার মত উদারহৃদয় মাননীয়া সকল-স্বত্বকাব্যো-উৎসাহী ব্যক্তি আজ বাংলা দেশে দুর্লভ। হিন্দু যুগে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বা হিন্দু-মূলমানেয় ভেদটা তোলা যত কঠিন, তাঁর চেয়ে ব্যক্তিগত সামান্য বিটিমিটি ও বিরুদ্ধ ভাবগুলো তোলা চের সহজ। চিত্তরঞ্জন বাবুর দেশভক্তি দেশের যিনি স্রেষ্ঠ সম্ভান ও গৌরবের বস্তু, তাঁকে তাঁর যোগ্য সম্মানের দিতে কৃতিত্ব হয় কেন?

ঐঅজিতকুমার চক্রবর্তী।

মিশরের আর্ট

কোন দেশের আর্টকে ভাল-করিয়া বৃদ্ধিতে হইলে আগে দেখা দরকার, সে দেশের প্রকৃতি ও মতি-গতি কিরূপ। এক দেশের আর্টে যদি অন্তর্দেশীয় আদর্শ ও প্রকাশ-স্বরূপ নকল দেখা যায়, তবে সেটা স্ফুটতির না হইয়া নিম্নার কথাই হইয়া থাকিবে। কেননা এক-এক দেশের আর্ট এক-একরূপ নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও বিশিষ্ট মাধুর্য্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠে; ঐ নিজস্ব ও বিশিষ্টতাই নকল বা খাটি আর্ট চিনিবার ধার্মা নিকষ। ভারতবাসী যদি যুরোপীয় আর্টকে ভালরকম নকল করিতেও পারে, তবে তাহাতে ভারতের প্রাণের সাড়াও পাওয়া যাইবে না, যুরোপের ভাবের ছাপও পড়িবে না; কারণ, নকলে আসলের রস কোটানো যায়। ফলে এ-ধরণের নকলিয়ার এ-কূল ও-কূল হুকূলই ঘটি হইয়া যায়। কোকিলের ডাক ক্রমাগত শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে লাগিলেও কেউ ত নতুনভাৱ খাতিরে তাহাকে বলে না, 'কোকিল, তুমি কুলকুলি মত শব্দ দাও!' বরং বা বাতাবিক রূপ, তাতেই, তাকে মানায় ভাল।*

এইজন্যই এক দেশের আর্টকে বাহ্যিক অল্প কোন দেশের তুলনার খাটো করিতে উদ্বৃত্ত হয়, আনাড়ি ভিন্ন আর-কোন নামে তাহাদের ডাকা যায় না। যুরোপীয় নিসর্গ-চিত্রে যেমন ভারতের ভালীকুল বেখালা দেখায়, কোন ভারতীয় পটেও তেমনি যুরোপের কোন-কিছু মানানসৈ হইবে না। যুরোপের আর্ট যুরোপের মতন, ভারতের আর্ট ভারতের মতন, আপানের আর্ট আপানের মতন। এদের একের সঙ্গে অপরের তুলনা চলে না। ঐ দেশগুলিতে আর্টের এক-একটি দিক ভাল করিয়া কুটিয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং মিশরীয় আর্টের যে-সকল লক্ষণ আমরা দেখাইব, সেগুলির সঙ্গে কেউ যেন অল্প কোনদেশীয় আর্টের তুলনার কথা না তুলেন।

মিশরীয় আর্ট সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে তাহার মধ্যে দুটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইবে। প্রথম :—শিল্পনৈপুণ্য। মিশর বখন সভ্যতার আর-সকলকার অগ্রণী ছিল, তখন কার্যকরিতে অল্প কোন আর্তি তাহার

* The only bad art is that which is mechanical, where the impulse to give expression has decayed, and it is reduced to mere copying of styles and motives which do not belong to its actual condition. An age of copying is the only despicable age. It is but a confusion of thought, therefore, to try to pit the art of one country against that of another. * * * To understand any art we must first begin by grasping its conditions, and feeling the contrasts, the necessities, the atmosphere, which underlie the whole terms of expression.—The Arts and Crafts of Ancient Egypt. By W. M. Flinders Petrie.

শিল্পীদের সম্বন্ধ হইতে পারে নাই।
 দ্বিতীয়:—আর্টের মধ্যে স্বাধীনতার অভাব।
 মিশরীয় শিল্পীরা চ্চুতি স্ত্রীতির বেড়ীতে
 এমনি বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল যে,
 তাঁহাদের কারুকার্যের মধ্যে স্বাধীনতার
 সীমা একরকম ছিল না বলিলেই হয়।
 এই স্বাধীনতার অভাবের দরুন মিশরীয়
 শিল্পীরা উচ্চতর সৌন্দর্য্যলোকে উঠিতে
 পারেন নাই। মিশরীয় লিপিত কলায়
 সৌন্দর্য্যের বোহন বিকাশ আছে বটে,—কিন্তু
 সে বিকাশ পূর্ণবিকাশ নহ—তাঁহা অসম্পূর্ণ।

মিশরবাসীরা আপনাদের বাসগৃহগুলিকে
 একটু আলাদা চোখে দেখিতেন। জীবিত-
 কালে তাঁহারা যে-সব ঘর-বাড়ীতে থাকিতেন
 সেগুলিকে তাঁহারা ঠিক ঘর বলিয়া ধরিতেন না
 —অনেকটা পথ বলিয়া ভাবিতেন; তাঁহাদের
 ধারণা ছিল, অনন্ত আত্মার চিরকালের
 বাসভবন হইতেছে সমাধি-মন্দির। মিশর-
 বাসীদের প্রাণে প্রাণে ঐ ধারণা এতটা শিকড়
 গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছিল যে, মিশরীয় শিল্পের
 যে-সকল নমুনা দেখা যায়, তাহার
 অধিকাংশই সমাধি-গৃহ হইতে সংগৃহীত।
 বাথ-ভাণ্ডারের মৃতদেহকে শিকারীরা যেমন
 নষ্ট হইতে দেয় না, মানুষের মৃতদেহকেও
 মিশরবাসীরা তেমনি ধ্বংস হইতে দিত
 না; কোশলে প্রবাক্তণে তাহার নবদেহ
 চিরস্থায়ী করিয়া, পাথরের পুতুলের মত
 কঙ্কনের মধ্যে সাজাইয়া রাখিত। এবং
 মৃতের তৃপ্তিবিধানের জন্ত সমাধিগৃহের
 মধ্যে ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি পুনিয়া বাইত,
 পট্টা আসিয়া ছবি আঁকিয়া বাইত।
 মিশরের সমাধি-মন্দিরের দেবতা হুছেন মৃত

মানব,—তাঁহাদের আত্মা সেখানে অনন্তকাল
 ধরিয়া বিরাম-পুলক উপভোগ করে।

ঐতিহাসিক কালের পূর্ক হইতেই
 (৮০০০—৫০০০ খৃঃপূঃ) মিশরবাসীরা
 মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্ত্তি গড়িয়াছেন; কিন্তু
 সে সব মূর্ত্তি দেখিলে অনেক সময় চেনাই
 দার যে, সেগুলি শিব কি বানর! তাছাড়া
 তখনকার চাতের কাছে আর্টের সম্পর্কও
 ছিল বড় অল্প। মিশরীয় শিল্পীর সামনে
 তখন কোন আদর্শ না থাকার দরুন, শিল্পের
 মধ্যে উন্নতি বা অবনতির লক্ষণও বড়-
 একটা পাওয়া বাইত না।

মিশরীয় আর্টে আগরণের প্রথম সাজা
 পাওয়া যায় খৃঃপূঃ ৫৫০০ বৎসরে।
 আর্টের মধ্যে তখন এমন-একটা পরিবর্তনের
 স্রোত বহিল যে, তাহার পুরাতনো
 রূপের খোলস একেবারে খসিয়া পড়িল।
 দেশের রাজাদের আশ্রয়ে মিশরের আর্ট
 নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নব-
 ত্বয়ের শিল্পীরা নূতন ভাষে, নূতন রূপে
 ও নূতন জীবনে পুরাতন প্রাণহীন আর্টকে
 জীবন্ত ও পুরুষ করিয়া তুলিলেন। মিশরের
 সর্ব্বত্র যে বিখ্যাত চিত্রাঙ্কর (Hieroglyphic
 writing) দেখা যায়, এই নবযুগেই
 তাহার স্বরূপ। চিত্রাঙ্করের সঙ্গে সঙ্গেই
 মিশরে ইতিহাসের সৃষ্টি।

নবযুগের শিল্পীরা যে সত্য-সঙ্গানো ছিলেন,
 শরীর-বিজ্ঞানে (Anatomy) অভিজ্ঞতার
 পরিচয় দিয়া সেটা তাঁহারা ভালরকমেই
 প্রদর্শিত করিয়াছেন। প্রকৃতিকে তাঁহারা
 অগ্রাহ করিতেন না, গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ
 করিতেন এবং সরলতা ছিল তাঁহাদের

কার্যেই যুগযুগ। বাস্তবিক, সেই প্রাচীন যুগের নবজাগ্রত ললিত কলার মধ্যে খতটা সত্য ও বর্থাভা ছিল, মিশরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের শিরেও আর-কখনো খতটা খী-ছাঁদ দেখা যায় নাই।

আর্টিষ্ট যখন প্রকৃতির অন্তরমহলে ঢুকিতে পারেন, প্রকৃতির সকল গোপন কথা যখন বুঝিতে পারেন, তখন তিনি স্বধু আর্টের জন্তই আর্টের চর্চা করেন, তখন তিনি স্বধু রূপের রসেই বিস্তার হইয়া পাকেন, সৌন্দর্যের অপূর্ণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দেখানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না। আর্টিষ্টের প্রাণ যখন এই অবস্থার গিয়া উঠিতে পারে তখনই প্রথম শিক্ষা তখনই সম্পূর্ণ হয়। মিশরের পিন্নারাও সৌন্দর্যভক্ত হইয়া শিল্প-জগতে সার সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিল। এর আগে মিশরের পিন্নারা নানান উদ্দেশ্যে শিল্পচর্চা করিত, সৌন্দর্যেই যে আর্টের চরম সার্থকতা, সেটা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত না,—মিশরের আর্ট ও তাই নগণ্য এবং প্রাণশূন্য হইয়া সৌন্দর্য-লোকের বহুদূরারের বাহিরে পড়িয়াছিল।

পিন্নারিড-যুগে (খৃঃপূঃ ৪৭০০—৪০০০) মিশর-শিল্পে সব নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়। মিশর আজও বেজন্ত বিখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে এই যুগেই সেই অতুল্য পিন্নারিড-শিল্পের স্বরূপাত। স্বধু স্থাপত্য বলিয়া নয়, মিশরীয় তারুণ্যের যে-সকল চমৎকার নমুনা আজ-পর্যন্ত টিকিয়া আছে, তাহার বেশীর ভাগই এই সময়ে তৈয়ারি হয়। তা-ছাড়া এ-যুগের চিত্রকলাও অনেকটা

নিপুণ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই পিন্নারিড-যুগে মিশরের ভাস্কররা রাজা-রাজকুমারী ও রাজকীয় পদবী কন্দকারীত্বের যে মূর্তিগুলি গড়িয়াছিল, তার চেয়ে ভাল প্রতিমূর্তি মিশরের পরবর্তী যুগেও আর গঠিত নাই। পরযুগের শিল্প হরত এ-যুগের চেয়ে হৃদয়, শ্রীমৎ ও প্রাণরসক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তেজ, ক্ষুদ্রীতে ও ভাব-ভঙ্গীতে এই পিন্নারিড-যুগের আর্ট অগ্রগণ্য।

এর পরে মিশর-শিল্পে এমন নাহেত্মকণ আর-কখনো আসে নাই।

মিশরের ভাস্কররা ধাতু, পাথর, কাঠ, হাতীর দাঁত ও মাটি প্রভৃতি নানা জিনিষ দিয়া বিবিধ মূর্তি গঠন করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সমস্ত মূর্তিই বৃষ্টি একছাঁচে ঢালা। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই তাগানের ভিতরকার তফাৎটা ধর' পড়িয়া



১ম চিত্র—কোরিন্থ

বার। প্রাচীন সম্রাটদের আমলে যে-সকল মূর্তি গড়া হইত, সেগুলি অনেকটা সাতাষিক, খর্ষ ও দৃঢ়তাব্যাক্ত। এই সময়কার “কেরাণ্ডী”র যে মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে, মানবদেহ গঠনে তাহার নিখাতার যে

৩৩টা নিপুণতা ততো বেশিলাই বুঝা যায়। কোন পদস্থ কর্মচারীর আবেশে কৈরালী প্রতিলিখন লিখিতে বসিয়াছে, মূর্তির এ ভঙ্গীটি শিল্পী বেশ দৃষ্টাইয়া তুলিয়াছেন। মূর্তিটির মুখে শিল্পী যদি প্রাণের ছাপ আর-একটু বেশি



২য় চিত্র—নগরাধ্যক্ষ

৩য় চিত্র—রমণী-মূর্তি

করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে এটি শিল্পের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নিদর্শন বলিয়া ধরা বাইত।

এই প্রাচীন যুগের আরো-কয়েকটি বিখ্যাত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। (বিত্তর, তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্র) “নগরাধ্যক্ষ”র মূর্তিটি কান্টের তৈয়ারি। ইহার চোঁট ও চিবুক বেশ স্বভাবসন্মত; চোখের আঁকারও ভাল, কিন্তু তামার উপরে কাঁচ ও পাঁথরের তারা বসাইয়া চোখের স্বাভাবিকতা নষ্ট করা হইয়াছে। তৃতীয় চিত্রে যে রমণী-মূর্তিটি দেখা বাইতেছে, তাহার ভয়দশারি মধ্য হইতেও রূপের আশো ছাই-চাপা আঙনের

মত অগ্রকাশ। ইহার হৃদয়ল মুখের কোর ও দেহের নখর ভঙ্গিটি অতি চমৎকার। একালের কোন শিল্পীও যদি এ মূর্তিটি গড়িতেন, তবে তাহার খাতির নিশ্চয়ই বাড়িয়া বাইত! রাঙ্গা খাকরার প্রতিমূর্তি নিপনের আঁটের একটি অলঙ্কারনিদর্শন। এ মূর্তিতে রাঙোচিত্তি বহন। এতটা স্পষ্ট যে, তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্রাজ্যের মধ্যযুগে শিল্পীরা একটু বেশী লম্বাটে মূর্তি গড়িত; মূর্তির গড়নে আর তেমন দৃঢ়তার, ভাব থাকিত না। শিল্পীরা তখন একটা ভয়ল সৌন্দর্যকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।



খৰ্চ চিত্ৰ - ৰাজা পাম্‌হুৱা

নব সাম্ৰাজ্যে এই তৰল সৌন্দৰ্য্যেৰ
ভাবটা আৰো-বেশী নুভিগা উঠিগৈছিল। এট
সময়ে মিশৰ দেশে এক নবতন্ত্ৰেৰ শিল্পী আত্ম-
প্ৰকাশ কৰিলেন; তাহাৰা গভৰুগৈ চল্‌তি
শীতি ছাড়িয়া এক-পা নড়িতেন না;
কাৰিকৰিতে তাহাদেৰ হাত বেমন পাক

ছিল, তাৰ জাতিৰ কৰিতে তাহাৰা ছিলেন
তেমনি কাচ।

Saite যুগে (Sais-ৰ ফ্যারোহাদেৰ
ৰাজত্বে), ৭২০—৫২৫ খৃঃপূঃ বংসৰে মিশৰ-
শিল্পে আবার প্ৰাচীন যুগেৰ প্ৰভাৱ আনিয়া
পড়ে। মিশৰ-শিল্পে ইহা বেনেচীসেৰ

মুখ। এ-সময়ে মিশরবাসীরা আপনাদের জাতীয় শিল্পে চাইতে সকলরকম বিজ্ঞাতীয় প্রভাব দূর করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। Saite যুগের মিশরীয় আর্টের অংশ



এম চিত্র—একটি মূর্তির মুখ

কিরূপ ছিল, প্রথম চিত্রের মূর্তি দেখিলেই তাহা জানা যাইবে।

নানাদুগের নানা আদর্শের কলাবিশ্ব মিশরের ললিত কলার ছাঁচ ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছিল। সে-সমস্ত কথা এখানে সবিস্তারে বলা চলিবে না। তবে মিশরের ভাস্কর্যের শিক্ষা-দীক্ষার কথা এখানে কিছু-কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রতিমূর্তি গড়িবার সময়ে যখন নির্ভূত বাস্তবতার দরকার, মিশরীয় কলাবিদরা তখন আপনাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ও শিক্ত হস্তের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছেন। মিশরের সমাদ্বিষ্মন্ধিরে একসময়ে শব্দধারের উপরে মৃত ব্যক্তির প্রাণীর প্রতিকৃতি রাখা হইত। বট, সপ্তম ও অষ্টম চিত্রে এই প্রেমের কয়েকটি মুখ দেওয়া হইল। বট চিত্রে একজন সতর্ক ও গভীর লোকের মুখ। সপ্তম



৬ষ্ঠ চিত্র—প্রাণীর মুখ

চিত্রের মুখটি যেমন মোহনীর তেজ-ভরা, তাহার ওষ্ঠাধরের মৃতমুখ হাসির লীলা ও কপোলের রেখাগুলিও তেমনি চমৎকার; —এ মুখখানিতে মৃতের ব্যক্তিগত যত্ন দৃষ্টব্য, কুটিয়াছে। শব্দধারের মধ্যে রক্ষিত মৃতদেহের মুখাকৃতির সঙ্গে এই মৃত্যুনিশ্চিত মুখগুলির সাদৃশ্য যে কতটা ছিল, সপ্তম চিত্রে দেখিলে তাহা স্পষ্টাঙ্গটি বুঝা যাইবে। শিন্নী যে মানুষটিকে দেখিয়া প্রতিমূর্তি গড়িয়াছিলেন, সেই বহুদুগপুর্বে মৃত লোকটির মাংসটান স্ক্রোট (Skull) শব্দধার হইতে ব্যতির করিয়া, শিন্নীর গঠিত। মৃতের সামনে রাখিয়া যে ফটো তোলা হইয়াছে, অষ্টম চিত্রে তাহারই প্রতিলিপি। ছবিতে ব্রহ্মের যে বহিঃরেখা (Outline) দেখা যাইতেছে, সেইটিই শিন্নীর গড়া মুখ; মথোর গাঢ়তর রেখাটি হইতেছে মড়ার মাথার। আসল মুখ ও নকল প্রতিকৃতিতে যে কতটা সাদৃশ্য আছে, একটু ভাল করিয়া দেখিলেই



৭ম চিত্র—প্রাচীরের মুখ

তাহা ধরা পড়িবে। হাজার হাজার বছর আগে শিল্পী যখন এই মুখটি গড়িয়াছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, অসুখ ভবিষ্যতের কোতূহলী সমালোচক আলগের সঙ্গে নকলকে এমন ভাবে মিলাইয়া তাহার শক্তির পরখ করিবে।

মিশরীর ভাষ্যার্থ্য সময়-বিশেষে কতটা স্বভাবের অনুগমন করিত, নবম চিত্রে আমরা তাহার আর-একটি প্রমাণ দিলাম। এই ভয় প্রস্তুত-মুষ্টির মুখটি দেখিলে আমরা বুঝি যে, সেই অতীত যুগের প্রাতিভাবান ভাষ্যরের নিপুণ হাতে গড়িয়া অমন শক্ত পাথরও ভিজে মাটির মত নরম হইয়া উঠিয়াছিল! কেমন সহজে তিনি এই মুষ্টিটি গড়িয়াছিলেন! বিজয়গর্ভিত ভাষ্যরের প্রাণের আনন্দই যেন এই অত্যন্ত-জীবন্ত প্রতিমার মুখের রেখার রেখার স্তুটিয়া উঠিয়াছে।

মিশরীর ভাষ্যার্থ্যের অধিকাংশ মুষ্টি—মাহুয়ের প্রতি যেন লহাশূভ্রিত দেখাইতে পারেন! সাধারণ মাহুয়ের মুখে স্বর্ধ-

৮ম চিত্র—প্রাচীরের মুখ ও মড়ার মাথা

প্রাণের, হাসি-অশ্রু যে বিভিন্ন আলোক-ছায়ায় লীলা দেখা যায়, মিশরের শিল্পী আর্টে তাহার প্রকাশ খুব কমই দেখাইয়াছে।



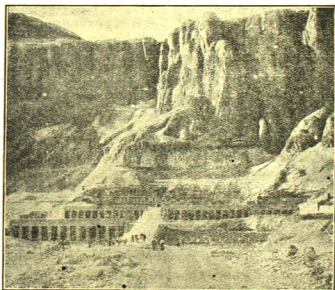
৯ম চিত্র—ভয়মুষ্টির মুখ

শিল্পীর মুষ্টি কখনো কথা কহে না বটে; কিন্তু তবু, অস্বাভাবিক দৈশের ভাষ্যার্থ্যে, প্রতিমার মুখে তাহার নীরবতার মধ্য হইতেই বাণীর যে আভাস স্তুটিয়া উঠে, মিশরীর ভাষ্যার্থ্যে তাহা

বড়-একটা গোথে পড়ে না। মিশরীর ভক্তের
বে-সকল মূর্তি গড়িয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
তাহারা যেন পৃথিবীতে পাকিয়াও পৃথিবীর
কেহই নহে! চারিদিকে অত্যন্ত-গভীর একটা
রহস্যের লুকোচুরী লইয়া, তাহারাও যেন এক-
একটি মূর্তিমত্ত রহস্যের মত বিরাজ করিতেছে!
রহস্য-লোকের এ-সকল গভীর মূর্তি দেবতার
মতই নিষ্ঠুর ও নির্দয়! বর্তমানের সঙ্গে
তাহাদের যেন কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই!
মিশরীর ভক্তবর্ষের এই প্রধান ও সাধারণ
লক্ষণটি, চতুর্থ চিত্রে রাজা থামসের মূর্তিতে
বিসেবক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহারা যেন
অনাদি অতীতের অমর মূর্তি—পৃথিবীর কত
ভাবের ঢেউ ইহাদের পাম্বাণ পদতলে প্রহত

হইয়া দিরিয়া গিয়াছে, ইহাদের শিলা-নেত্রের
দ্বিগুণটির উপর দিয়াই কত মহামানব, কত
মহাসাম্রাজ্য অনন্ত জীবন-সাগরে কেনার
মত বিলীন হইয়া গিয়াছে, তবু ইহারা
একটুও চপল হয় নাই, একটিও কথা কহে
নাই! বর্তমানের তটে গাঁড়াইয়া নব্বর
মানব আনরা,—আমাদের তাই বলিতে ইচ্ছা
হয়—

“দুগ্ধবাস্ত্র ঢালে তার কথা
তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত দাড়া এসে
মিশর তোমার জলে!
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাব নীরব তাহার,—



তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন !

তুমি ভারে কোণা লও !

হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও !”

মিশরীয় আটের প্রধান ধর্ম হইতেছে, স্বাধীনতা। মিশরের প্রকৃতির মধ্যেও সর্বত্র এই স্বাধীনতার ভাব দেখা যায়। এখানকার স্থকটিন গ্রেনাইট প্রস্তর যেমন চিরস্থায়ী, অতি-দুর্ভল গাছ-গাছড়াগুলিও তেমনি ক্ষতুর তৃদতার ভ্রত সহজে নষ্ট হয় না। এমন দ্বিতীল প্রকৃতির কোলে মানুষ হইয়া, মিশরবাসীর অস্ত্র-প্রকৃতিও ক্ষণিক কোন-কিছুর ধারণা করিতে পারিত না। তাহাদের হাতের গড়া পিরামিড ও গ্রেনাইট প্রস্তরের সমাধি-মন্দিরগুলি (দশম চিত্র দেখুন) তাই দৃঢ়তার কালজয়ী, প্রকাণ্ড তত্ত্ববিশিষ্ট বিরাট দেবালয় দুগ-দুগ ধরিয়া সমানভাবে তাই আকাশের নৃত্যতার অনেকখানি পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মানুষ মরিলে তাহার প্রাণহীন বেহকে সংসার হইতে মুছিয়া ফেলিতে আমরা শব্দবাক্ত হইয়া উঠি; কিন্তু মিশরবাসীরা সে বেহকে চিরস্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করিত। কাল-সাগরের ক্ষণভঙ্গুর বালুকা-বেলার দাঁড়াইয়া, জগতের আর কোন জাতি নশ্বরতার বিরুদ্ধে এমন প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই—লব্ধকর্তার তর্জনী-শাসনকে জ্বলন ভাবে উড়াইয়া দিতে পারে নাই !

মিশরের ভাঙ্গুরতা চলতি রীতির মায়ী এড়াইতে পারিতেন না, একথা আগেই বলা হইয়াছে। এই সকল রীতির ভিতরে অনেকগুলি এত সাধারণ যে, দর্শকের

উপভোগে তাহারা বাধা দেয়। প্রথমঃ—চলন্ত বা অচল, বস বা দাঁড়ানো—সকল মূর্তিই সামনের দিকে ফিরিয়া থাকে। তাহারা সকলেই সরল ভঙ্গীতে আছে—কেউ ডাইনে বা বায়ে একটু হেলো না গলো না। দ্বিতীয়ঃ—সচল-অচল সকল মূর্তি একেবারে পাঠের চেটোর উপর ভর দিয়া থাকে; এমন মূর্তি দুর্ভল, বাহার এক পা সম্পূর্ণভাবে মাটির উপরে, আর এক পা আঙ্গোছে মাটিকে ছুঁইয়া আছে। পুরুষমূর্তিগুলি মচরাচর সচল এবং তাহাদের বা পা-খানিই আগে আগানো; কিন্তু স্ত্রীমূর্তিগুলি গ্রোই অচল, তাহাদের পা-চুটি এ-ওর সঙ্গে হুঁইয়া মিলিয়া থাকে।

মিশরের আর্টিষ্ট এই-সব বাঁধা গতের এতটা ভয় ছিল যে, শেষোশেষি যখন তাহারা গ্রীক ও রোমান প্রভাবে অভিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনো আপনাদের মূল্যদোষ ছাড়িতে পারে নাই। তাহাদের হাতের ভৈর্যারি,—বেহের গড়ন-হিসাবে বস্তাবসনত—অনেক মূর্তিও ঐ-সব উদ্ভটতার ভ্রত অঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। মিশরের মত দেশের আটো পুরাকালের কতকগুলি অসম্পূর্ণতা শেষ-বস্তাবর থাকিয়া গিয়াছিল। সভ্যতা বহু উন্নত হয় মানুষের চিত্তও তত দীক্ষিত ও অস্তিত্ব হইয়া উঠে। মিশর-শিল্পের ঐতিহাসিক কালেও পৌরাণিক এবং প্রাথমিক যুগের অপূর্ণতা থাকিত না—সেখানকার শিল্পীরা বর্গ পুরাতনের সংকীর্ণতা বর্জন করিয়া নৃতনের স্বাধীনতাকে গ্রহণ করিত। কিন্তু, মিশরদেশে তা হয় নাই। তাই ঐতিহাসিক কালের প্রথম যুগে সেখানে

ললিত কলার বস্তুটা উন্নতি হইয়াছিল, সেদৃশ্যে আর ততটা হইল না;—বেঙ্গীর ভাগ, নব-যুগের ‘সাত নকলে’ প্রাচীন যুগের ‘আলপ ও খাণ্ডা’ হইয়া পড়িল।

ভাস্কর্য্য অপেক্ষা স্থাপত্য-কার্য্যেই শিল্প-বাসীরা দক্ষতা দেখাইয়াছিল বেশী। প্রাচীন শিল্পের পিরামিড, মন্দির ও স্তম্ভ দেখিয়া পৃথিবীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সকল সভ্য জাতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান। শিল্পের স্থাপত্য-শিল্প এতটা প্রসিদ্ধ ও সকলকার এতটা পরিচিত যে, এখানে তাহার আলোচনা দরকার মনে করি না।

শিল্পে চিত্র-শিল্পেরও চর্চ্কা হইয়াছিল। কিন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মত চিত্র-শিল্প বেশীদিন স্থায়ী হয় না বলিয়া, শিল্পীর চিত্রের অধিক সৌন্দর্য্য দেখিবার সুযোগ এখন আর নাই। তবে, শিল্পের স্থাপত্য—এমন-কি ভাস্কর্য্যের আদর্শও, বস্তুটা উন্নত হইয়াছিল, তাহার চিত্রশিল্প যে ততটা উন্নত উন্নতিতে পাবে নাই, নষ্টাবশিষ্ট চিত্রশিল্পের নমুনা দেখিয়া এটুকু অনায়াসে করণা করা যায়। শিল্পের ভাস্কর্য্যে তবু কতকটা স্বাধীনতা

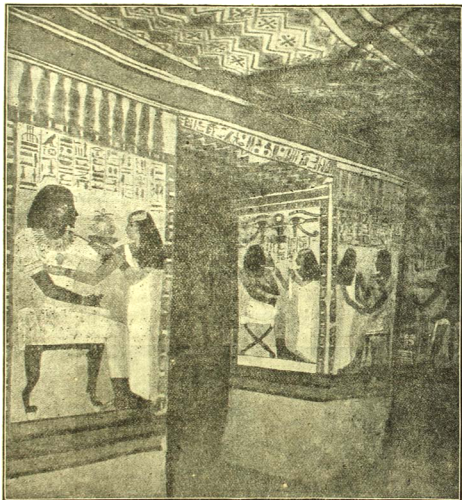
ছিল, কিন্তু চিত্রের মধ্যে সেটুকুও বেঁধা যায় না। শিল্প-বাসীরা ছবিকে দেখা বলিয়া ভাবিত মাত্র; (Egyptian paintings must in fact, be looked upon as picture-writing, and the pictures are nothing more than enlarged hieroglyphics.) দেখার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই সে-সব ছবির আর বড়-বেড়ী সার্থকতা থাকিত না; হয়ত এই ক্ষত্রেই শিল্পের চিত্র-শিল্পের পরিণতি আশাব্যূহকর হয় নাই। গ্রীসী ও শিল্পমহালোচক পর্য্যটক তাহার Classic and Italian Painting নামক পুস্তকে তাই বলিয়াছেন:—“The art of Egypt was in many respects so primitive, and so tram-melled by its peculiar formalism, that belongs rather to the domain of archæology than of æsthetics.”

শিল্পের চিত্রশিল্প যে তাহার ভাস্কর্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন, একথা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের পূর্বে শিল্পের পট্টমাত্র



বাবহারের পাত্রাদির উপরে যে-সকল ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার কতক-কতক এখনো টিকিয়া আছে। সে-সব ছবি উচুঘরের নয় বটে, তবু, সেগুলি দেখিলে পুরাকালের মিশরীয় চিত্রকলার কিছু-কিছু আন্দাজ পাওয়া

যায়। পিরামিড-সঙ্গে মিশরীয় চিত্রশিল্প যে বেশ উন্নত হইয়াছিল, একাদশ চিত্রে তাহার একখানি প্রতিলিপি দেখিলে সে-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। এই ছবিখানি Medium এর বিখ্যাত ভিত্তি-দৃষ্ট হইতে



১২শ চিত্র—সম্রাট-তবনের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি ও চিত্রাঙ্কর।

সংগৃহীত। চিত্রশিল্পিত হীসগুটির সঙ্কল্প ভঙ্গী খুব প্রবল; ইহাদের ভিতরে গতির আভাসও আছে। মধ্যযুগে মিশরের চিত্রমালা কেমন ধারা ছিল, তাহার কোনরকম নমুনা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজবংশের আমলে মিশরের চিত্রকলায় চর্কা হইয়াছিল যথেষ্ট। এই সময়ে সমাধি-গৃহ ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত করিবার প্রথা উঠিয়া যায়; ভাস্কর্য্যের বদলে সমাধিগৃহের দেওয়ালে ছবি-আঁকা প্রথার চলন হইল। (যাযদ চিত্র দেখুন) আধুনিক রাজবংশের সময়ে Akhenaten-এর রাজত্বকালে মিশর-দেশে চিত্রকলায় অধিকতর উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল। এতদিন মিশরীয় চিত্রকররা বেশ-ব মুষ্টি আঁকিত, তাহাদের ভাব-ভঙ্গী ধরা-বাঁধা, একছাঁদের ও এক-ঘেরে হইত। কিন্তু Akhenaten-এর সময়ে দু-একজন চিত্রকারী প্রথার বান্ধন কাটরা স্বাধীনতার সন্মুখীন করেন; তাহারা ছবির মুষ্টিগুলিতে

যে ভঙ্গিমা দিলেন, নির্দোষ না হইলেও মিশরীয় চিত্রকলায় তাহা একেবারে নূতন। (অগ্নোদয় চিত্র) আগেই বলিয়াছি, মিশরের ভাস্কর্য্যেই হোক আর চিত্রেই হোক, সকল মূর্তিরই দেহ ফিরানো থাকিত সুস্থ দিকে। নূতনবলের চিত্রকররা এরূপ খোসখেয়ালা উদ্ভটতা পরিহার করিলেন। কিন্তু চর্ভাগাত্মকে মিশর-দেশে এই নূতন বলের প্রভাব ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল।

মিশরের চিত্রকরদের রেখা-চিত্রে দক্ষতা ছিল অপূর্ণ। চিত্রকলার এ-দিকটি তাহাদের হাতে বেরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা আশাতীত। (চতুর্দশ চিত্র দেখুন) তুলিকার এক-একটি নিপুণ আঘাতে তাহারা মূর্তির এক-একটি অংশ একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিত; সময়ে-সময়ে একটানে তাহারা একটি সমগ্র মূর্তিও আঁকিয়া তুলিতে পারিত। রেখার এমন কারিকরি দেখিলে একালের অনেক আর্টিষ্টকেও লজ্জায় আধোবদন

হইতে হইবে। সুধু তাই নয়, সে রেখাগুলি এতটা অব্যাহ, জোরালো অথচ পেলব ও চন্দনমধুর হইত যে, দেখিলেই . প্রাচীন যুগের সুগঠিত শিল্পীরা নিপুণ আঙ্গুলগুলিকে ধস্ত ধস্ত করিতে হয়! চতুর্দশ চিত্রে চারি-আঙুর লোকের চারিটি মুখের রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মুখ লিবিয়ান লাতার, দ্বিতীয়টি আবিদিনিয়ান, তৃতীয় শিরিয়ান ও চতুর্থ নিগো। চারিটি মুখেই চারি



১৩৭ চিত্র—বাবী



১৪শ চিত্র—চারিটি মুখ

আতির বিশেষত্ব চমৎকার রূপে ছুটিয়া উঠিয়াছে।

মিশরদেশে চিত্রে ও ভাস্কর্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধাতুনির্মিত শিল্পকাৰ্য্য রক্ষিত হইত না বটে, কিন্তু পাথর-গড়া বেশীর ভাগ মূর্তির উপরেই রং লেপিয়া দেওয়া হইত। এমন-কি কেহ কেহ বলেন যে, খ্রিস্ট প্রভৃতি দৈত্যের মত মস্ত মস্ত মূর্তির উপরেও পটুয়ায়া তুলিতে করিয়া রং বুলাইত। প্রাচীন মিশরবাসীরা রং চং ভারি পছন্দ করিত। তাহাদের বাসগৃহের, কবরের ও দেবালয়ের ভিতরে-বাহিরে যেখানে-সেখানে ছবি ও ছবির হরফ দেখা যায়। তাহাদের ব্যবহারের ঘরসামান্যো জিনিষগুলি পর্য্যন্ত

চিত্রিত না হইলে সম্পূর্ণ হইত না। মিশরের যেদিকেই চাওয়া যায় সেইখানেই রঙ্গের নীল।

মিশরীয় চিত্রশিল্পের কতকগুলি বিশেষত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই বিশেষত্বগুলি অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণতা এবং অনভিজ্ঞতার নামান্তর। ছবির প্রধান মূর্তি-গুলির আকার প্রায়ই ডাগর হইত, তাহাদের পাশাপাশি অস্ত্রাত্ত মূর্তিগুলিকে প্রধান মূর্তির তুলনায় অত্যন্ত ছোটো করিয়া আঁকা হইত। (১৫শ চিত্র দেখুন) ছবিতে আলোক-ছায়া বা পারিপ্ৰেক্ষিত,—এ সব কিছুই থাকিত না। ‘পারস্পেক্টিভ’ না-থাকার দরুন মিশরীয় চিত্রপট দেখিতে হইত ঠিক মানচিত্রের মতন। পাশাপাশি দুটি লোক থাকিলে একটি লোকের উপরে আর-একটি লোককে আঁকা হইত; মাঝে যেমন নামাদেশের নাম চারিদিকে ছড়ানো থাকে, বৃদ্ধ-দুহে সৈন্তসামন্তদের মূর্তিগুলিও তেমন ছাড়া-ছাড়া ভাবে এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া থাকিত।

মিশরীয় চিত্রকররা যখন জীবজন্তুর মূর্তি আঁকিত, তখন কিন্তু তাহারা এতটা



১৫শ চিত্র—নিমন্ত্রণ-ছাড়া

উদ্ভট অস্বাভাবিকতার পরিচয় দিত না। আর্টের প্রথম অবস্থা হইতেই মিশরে জীব-জন্তুর মূর্তিগুলি হইত জীবনে, ক্ষুণ্ণিত, তেজে ও সঙ্গতভাবে পরিপূর্ণ। জীবজন্তুর মূর্তি দ্বাংারা এমন নিপুণ হাতে আঁকিয়াছে, মাহুয আঁকিতে বসিয়া তাহারা এত ছেল-খেলা করিয়াছে কেন? ইহার উত্তরে একজন সমালোচক বলেন, “মিশরীয় চিত্র-কররা যদি নরমূর্তি আঁকিবার সময়ে চলিত নিয়মের দ্বারা স্খলিত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর্টকে হয়ত তাঁহারা নির্দোষ এবং পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিতেন।” চিত্রকরদের পরাধীনতার বোধ হয় আর-একটা কারণও আছে। মিশরের শক্তিশালী পুরোহিত-সম্প্রদায় হয়ত চিত্রকে লিখন-কার্যের গভীর মধ্যেই বন্ধ রাখিতে চাহিতেন; ছাড়া পাইলে সৌন্দর্যভক্ত চিত্রকররা পাছে তুলিকে আর কলম বলিয়া মানিতে না চায়, সেই ভরে তাঁহারা শক্ত নিয়মের বাঁধনে পট্টদাসের হাত-পা আচ্ছা-করিয়া রাখিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ ধারণার কারণ এই যে, শিল্পীদের শক্তির অভাবই মিশরীয় চিত্রকলার সংকীর্ণতার হেতু নহে; কেননা, শিল্পীরা যে শক্তিদ্বারা ছিল তাহার চেয়ে প্রমাণ আছে। স্মৃত্যায় একটা বড় প্রভাব যে শিল্পক্ষেত্রের বাহির হইতে তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিশরের চিত্রকররা যে-সব রং ব্যবহার করিত, তাহা খুব স্ফুটাসিধে বটে; কিন্তু দেখিতে এমন স্থল্লর যে চোখ-মন মোহিত হইয়া যায়। সাদা বা হলুদেটে

অমির উপরেই সচরাচর ছবি হইত।

প্রাচীন মিশরে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে বীজ মুকলিত হইয়াছিল, তাহা সর্কাসসম্পূর্ণ না হইলেও সর্কাগ্রগণ্য; কেননা, উন্নত ললিত কলার অন্ত আধুনিক রূপে প্রাচীন মিশর-ভূমির নিকটে সকল দিকেই জগী। গ্রীসের প্রাথমিক ললিত কলার উপরে মিশরের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। মিশরের আর্ট না থাকিলে গ্রীসের আর্ট, সামনে কোন-রকম আদর্শ দেখিতে পাইত না। আর্টের যে মুকল মিশরভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, গ্রীস দেশে তাহাই বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইয়া বিশ্বের মনোহরণ করিয়াছিল। মিশরবাসীরা গৃহের ছাদ ও ভিত্তিতে যে চিত্রিত অলংকারের নমুনা রাখিয়া গিয়াছে, আজ এত সহস্র বৎসর পরেও রূপের আধুনিক শিল্পীরা তাহার অবিকৃত অনুকরণ করিতেছে। কলিকাতার ধনীরা জানেন না, অথচ তাহাদেরও অনেকের গৃহভিত্তি বা গৃহছাদ ঐক্যবিকৃত মিশরীয় আদর্শেই অলঙ্কৃত হয়। তাই Apollon লেখক S. Reinach বলিয়াছেন, “After monumental architecture, of which they set the example, the greatest gift of the Egyptians to art was their system of decoration.”

এমনি নানা গুণে গুণী বলিয়াই, প্রাচীন মিশরের কলাবিধরা শিল্পজগতে অমর হইয়া আছে। তাহাদের খুঁৎ আছে ত্রয়,—অপূর্ণতা আছে বখেট; কিন্তু এই ঘোষ-জটির অন্ত মিশরের আর্টকে অবহেলা করিলে

পৃথিবীর ললিতকলা আজ অনেকদিকে দরিদ্র সমালোচক তাই বলেন, If they made
চইয়া থাকিত। দোষ-গুণে মিশরের আট্টে a mistake, they at least 'sinned
অতুল্য এবং বস্ত্রগা; তাহাদের সবক্ষে splendidly.'

ঐহেমেন্ত্রকুমার রায়।

তোড়

সহর

সবাই ছোট, মাইনে মোটা,
পাশের বাড়ী, অক্ষণ ওঠা ;
সভার জোটা, কবার চোটা,
মোটর-পাড়ী, আমোদ লোটা।

পন্নী

গোকর ঘর, পাটের ঘর,
কুঙ্গবন, চুতের ডর ;
'মরবি মর,' 'ছ'স্নে মর'
কুঙ্গ মন, বেজায় অর !

বৌ

সিঁথায় সিঁদূর, হস্তে শাঁখ,
শান্ত মধুর, আন্তে ডাফা।

শান্তডী

বৌকে তাড়া, মেজাজ কড়া,
সবার-বাড়া, গল্প-গড়া !

মেসের ছেলে
সাম-গোছ, কৈ কৈ !
সন্নীত, হৈ-চৈ !

হিম্মু

মন্দির, পেরগাম,
আখিন, ধুমধাম !

বামুন-পণ্ডিত

বেলপাতা, দক্ষিণা,
খান-ধুতি, উন্-পিনা,
বকপাখী, জাত-মান,
খুঁংখুঁং, নিক্সাণ !

ঐতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

শরতানের হাত

(গী দে মোপাসাঁ)

মাস-আষ্টেক আগেকার কথা। এক
বছর বৈঠকখানায় আমরা ক-জন বসে-
ছিলুম। ভ্রমসন্ধ্যা; সিগারেটের ধোঁয়ায়
ঘর আচ্ছন্ন; মাঝে মাঝে মদও চলছিল।
আমরা সবাই সাহিত্য আর আর্ট নিয়ে
ভর্কে মেতে উঠেছিলুম।

হঠাৎ আমার এক প্রাণের বন্ধু হুড়ু-
হুড়ু করে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে এসে
চুকে পড়ল।

চুকেই সে বলে উঠল, “বল দেখি,
আমি কোথা থেকে আসছি ?”

আমাদের ঘর যা মনে হোল, বলে দিলুম।

“হুগো, তোমরা কেউ আত্মহীন করতে পারলে না! আমি গিয়েছিলুম দেশে— সেখানে সপ্তাহখানেক থেকে এই মাত্র ফিরে আসছি। আসবার সময়ে আমি সঙ্গে করে কি এনেছি জান? শরতাবতার হাত!” —এই বলে বন্ধু তার কাপড়ের ভিতর থেকে মালুয়ের একখানা কাটা হাত বার করলে! হাতখানার কোন-রকম রাসায়নিক ঔষধ মাখানো হয়েছে—তাই তাতে পচ- ধরেনি। কিন্তু দেখতে সেটা কী ভরানক!— কালো, শুকনো, লম্বাটে, কুঁচকে-পড়া! পেশীগুলো কুণ্ডো-কুণ্ডো, শক্ত;—তার উপরে পার্চমেন্ট কাগজের মতন একখানা পাতলা, ক্যাকাশে চামড়া; সুরু-সুরু হলুদে নখ-গুলো এখনো আগুনের ডগার সেগে রয়েছে; দেখলেই মনে হয় এ হস্তের বে অধিকারী ছিল, সে একজন নরকুণী শরতাবতার!

বন্ধু বলতে লাগল, “আমাদের দেশে এক বুড়ো বাহুর ছিল, সম্প্রতি সে পটল তুলছে। এবার গিয়ে দেখি, তার জিনিষ-পত্রগুলো নিশান হচ্ছে। সেই নিশানে আমি এই হাতখানা কিনেছি। এ হাতটাকে বাহুর পুঁজ সাবধানে, পুঁজ তোরাই রাখত। এ না-কি একটা পুঁজের হাত—কাঁসীতে সে রয়েছে। উপর-উপরি জু-বার নিজের ত্রীকে বধ করে বেশ ছেড়ে পালিয়ে সে ভবমূরে হয়। তারপর—কাঁসী ঘাটার আগে সে যে কত মাছ খেয়েছে, কত ঘর-দোর আলিয়ে দিয়েছে, কত সতীর সর্বনাশ করেছে, তার আর হিসাব হয় না।”

আমরা সবাই একসঙ্গে বিজ্ঞান করলুম,

“কিন্তু এই বিস্কুটে জিনিষটা নিজে কী করতে চাও তুমি?”

—“ওহো! এটা আমি সদর-দরবারে ফুলিতে রাখব! পাওনার বেটারা টাকা-টাকা করে জরি আলাপ—এটা দেখলে ভয়ে তারা আর আমার কাছে খেঁসবে না!”

নেশার চুরচুরে হয়ে আমার আর-এক বন্ধু অত্যন্ত গভীরভাবে বলে উঠল, “হঁ-হঁ, এ তাবাসা নয়! পীরের, ভাল চাও ত মানে-মানে এ হাতখানাকে এইবেলা কবর দিয়ে এস—নইলে, কোনদিন দেখবে ঘর এ হাত, সে নিজে এখানাকে আমার দখল করতে এসেছে। জান ত, কথার বলে ‘যে একবার খুন করেছে সে আবার খুন করবে’!”

—“আর, যে একবার মদ খেয়েছে সে আবার মদ খাবে!”—এই বলে একজন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভয়িত এক গেলান “পাক” দেই গভীর মাটালটির হাতের কাছে এগিয়ে ধিলে। সে ঢুক করে এক চুমুকেই গেলানটি সাবাড় করে ফেললে; তারপর মাটিতে পড়ে মার্কেলের মত ঘরময় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

পীরেরও এক গেলান মদ ঢেলে পুঁজের দেই হাতখানাকে সোধোদন করে বললে, “ওহে, আমি তোমার মনিবকে নেমন্তর করলুম,—সে মহাপ্রভুকে আমার কাছে আসতে বোলে!”

তারপর, আমরা অল্প কথা তুললুম।

পরদিন বাড়ী ফেরবার মুখে একবার পীরেরের বাড়ীটা হয়ে এলুম। মুখে একটা

সিগায়েট শুঁজে, বসে বসে সে বই পড়ছিল।

—“কি হে, কেমন?”

—“উত্তম!”

—“সে হাতখানার খবর কি?”

—“আসবার সময় বেখেঁচ ত, হাতখানা আমি দরজার কড়া খরে ক্রমাপত নেড়েছে! কিন্তু আশ্চর্য্য! এই যে, হাতটাকে আনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে!”

—“কি-রকম—কি-রকম?”

“কাল রাত ঘন বারোটা, তখন কে আনার দরজার কড়া খরে ক্রমাপত নেড়েছে! হুঁচারবার নাড়তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি ‘কে—কে’ বলে বারকতক সাড়া দিলুম, কিন্তু জবাব পেলুম না। বোধহয় পাড়ার কোন ছটু ছেলে—কি বল?”

এমন সময় বাড়ীওয়ালা এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই সে মহা খাঞ্চা হয়ে আমার বন্ধুকে বললে, “মশাই, দরজার কড়া থেকে হয় আপনি ঐ পচা হাতখানা সরিয়ে ফেলুন, নয় এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যান! এ কি অনাস্থি কাণ্ড!”

পীরের ভাবিকে হয়ে জবাব দিলে, “মশাই, আপনি ও হাতখানাকে অনর্থক অপমান করবেন না। মনে রাখবেন, যার ও হাত, তিনি একজন খাটি সন্ত্রলোক! অপমান করলে তিনি চটে আপনাকে ধোঁয়া দিলেও দিতে পারেন। স্ত্রীরা—সাবধান!”

বাড়ীওয়ালা এ ঠাট্টাটা বোধহয় মোটেই গৃহস্থ করলে না; কারণ সে আর উচ্চ-বাচ্য না করে সেখান থেকে সিঁথে সরে পড়ল।

পীরেরও তার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে গিয়ে হাতখানা সদর-দরজা থেকে খুলে নিয়ে এল। বিছানার পাশে, টেবিলের উপরে চাকরদের ডাকবার একটা ঘণ্টা ছিল। হাতখানা সেইখানে রেখে পীরের বললে, “গোলমাগে কাজ নেই, হাতটা এখানেই থাক। রোজ ঘুমোবার আগে এটাকে দেখলেই আমার মনে পড়বে—‘জন্মিলে মরিতে হবে’!—এ একটা মস্ত উপদেশ!”

আমি বিনাম নিয়ে চলে এলুম।

সে রাতে আমার ভাল করে ঘুম হোল না; থাকি থাকি, চমকে উঠি; একবার মনে হোল, আমার ঘরে যেন কেউ এসে ঢুকে পড়েছে! তাড়াতাড়ি উঠে আমি খাটের তলাটা দেখে নিলুম—কেউ সেখানে ঘুপটি মেরে লুকিয়ে আছে কি না! ভোরের মুখে তদ্রাস্তা একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে—হঠাৎ দরজাটা বাইরে থেকে হুমহুম করে কে ঠেসতে লাগল! এক-লাফে নেমে দরজাটা খুলতেই দেখি, বন্ধু পীরেরের চাকর সেখানে ঘাড়েরে রয়েছে; তার মুখ ফ্যাকাশে, শুকনো; গা খুবখিরে কাপছে!

আমাকে দেখেই কাদার সুরে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে সে বলে উঠল, “মশাই গো, আমার মনিবকে কে খুন করে গেছে!”

খুন!... ..চটপট আমা-কাপড় পরে আমি উঠতে-পড়তে বন্ধুর বাড়ীতে ছুটলুম।

সেখানে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য! সকলেরই মুখে ঐ এক কথা! মহা চৈ-চৈ! অনেক কটে, পুলিশের কাছে নিম্নের পরিচয়

দিয়ে তবে আমি পৌরের শ্রমগৃহে গিয়ে ঢুকতে পারলুম।

পৌরের দাড়া দার নি বটে, কিন্তু তার অসাড় দেহটাকে বেধে আমার জ্বংখল উপস্থিত হোল।

তার চোখদুটো অত্যন্ত বিস্ফারিত ;—
চোখের তারাগুলো ঘন ভীষণ ও অজ্ঞাত কোন-একটা বাপার বেধে স্তম্ভিত হয়ে আছে ; হাতদুটো সবলে মূঠো করা !
পৌরের পা থেকে চিবুক পর্যন্ত একখানা মিশ্-কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল ;—সেখানা একই সরিয়ে আমি দেখলুম, তার গলার পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ মাংসের মধ্যে গভীর হয়ে গেছে বসে গেছে ; আমার উপরে ক-কোটা রক্তের ছোপও লেগে রয়েছে। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল। বিছানার পাশে টেবিলটার নিকে আমি কিরে দেখলুম,—খুনের হা গুণানা সেখানে নেই ! সে ভয়ানক হাতটা দেখলে লোক পাছে ভয় পায়, হয়ত সেইজন্তে কেউ সেখানাকে চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলেছে।

সকালের খবরের কাগজে এই বাপারটার যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, এখানে আমি সেইকু তুলে দিচ্ছি :—

“গত কল্য রায়ে শ্রীমুক্ত পৌরের বি—, নামে একজন আইনশিকারী ছাত্রকে হত্যা করিবার জন্ত কে বা কাহারো চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ যুবক ছাত্রটি কল্য রাত্রি দশটার সময় বাড়ী কিরিয়া শ্রমকক্ষে প্রবেশ করেন। মধ্যরায়ে হঠাৎ তাহার শ্রমগৃহ হইতে ঘন ঘন বণ্টাধ্বনি হওয়াতে বাড়ীর

চাকরের নিদ্রাভঙ্গ হয়। চাকরটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভীতভাবে প্রাণীপ আসে ; বণ্টাটা মাথে একবার ধামিয়া পুনর্বার এত জোরে বাধিয়া উঠে যে, সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দারবানকে আগাইয়া যায়। শ্রীমুক্ত পৌরের দর ভিতর হইতে বহু ছিল। অনেক তৈলাঠেলিতেও ঘরের দরজা বন্ধ থলি না, তখন বানার ধবর বেওয়া হয় এবং পুলিশ আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে।

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সকলে এক শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পায়। জিনিসপত্তর চারিদিকে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া আছে,—
আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর ভিতরে যে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি হইয়াছিল—ঘরের সর্বত্রই তাহার পরিচয় জাহ্নমান। বেথের মাঝখানে হতভাগ্য যুবকটির দেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে ; তাহার যুগ মড়ার মত—চোখ ঘন ভয়ে আড়ষ্ট। তাহার গলার উপরে কাহার হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ। ভক্তনের মতে যুবককে যে ছুরাখা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার শরীরের শক্তি অমাহুতিক ; তাহার হাতের আঙ্গুলগুলো ও অস্বাভাবিকরূপে শিরাবহুল ও নীর্ণবিশীর্ণ,—
কারণ, যুবকের কর্ণের ভিতরে আঙ্গুলের চাপে পাচটি গর্ত হইয়া গিয়াছে। অপরাধীর উদ্দেশ্য কি, এবং কাহার দ্বারা বা এমন কার্ণা সাধিত হইয়াছে, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।”

পৌরের-বেচারি এ দাড়া প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধপাগল হয়ে গেল। উপর-উপরি সাতমান ধরে গারদে

তার সঙ্গে আমি বেধা করতে গিয়েছিলুম, সে কিন্তু সহজ জ্ঞান আর কিরিয়ে পেল না। এলাপের সময়ে সে হরেক-রকমের উদ্ভট কথা বলত। পাগলদের যেমন হয়ে থাকে, সেও তেমনি একটা নির্দিষ্ট ভাবনার বিভোর হয়ে থাকত; সর্বদাই মনে করত যে, তার ঘাড়ের একটা প্রেত চেপেছে।

একদিন গিয়ে দেখি, তার গতিক বড়ই খারাপ। আমার সামনে বসেছে সে শুষ্ক ও স্থির হয়ে পড়ে রইল; তারপর হঠাৎ লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে পড়ল এবং ভয়ে আত্মহারা হয়ে দু-হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—“এটাকে সরিয়ে ফেল! এটাকে সরিয়ে ফেল! ওঃ! ওঃ! এ যে গলা টিপে আমার মেরে ফেললে! বাঁচাও—বাঁচাও!”

ঘরের চারিদিকে চেঁচাতে চেঁচাতে ব্যর্থত্বের মৌড়োমৌড়ি করে মাটির উপরে মুখ-খুবড়ে সে পড়ে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু!

পীরেরের বাপ-মা আত্মীয়-বন্ধন কেউ ছিল না; কাজেই সংস্কারের জন্তে সব নিয়ে আমিই তার সেশে গেলুম। এই দেশ থেকেই পীরের সেই অলঙ্কৃণে শয়তানের হাতখানা নিয়ে গিয়েছিল।...

আজ পীরেরের কবরের দিন।

আকাশ পরিষ্কার নীল। বাতাসে বনে বনে মর্মরোৎসব ভেগে উঠেছে, আলোকে চারিদিক ভরে গিয়েছে; গাছে গাছে পানীরা হুধুর স্বরে পুরাণো-দিনের স্মৃতি-গান গাইছে। মনে পড়ল, ছেলে-বেলার এইখানে পীরের আর আমি কত

খেলাই খেলেছি, এই মাঠে হজনে কত ছুটোছুটি করেছি, ঐ বনের তলায় গিয়ে কত ফল কুড়িয়ে খেয়েছি!

আজকেও সেখান, মাটির উপরে একটা পাকা ফল পড়ে রয়েছে। আনমনে সেই ফলটি কুড়িয়ে নিয়ে সুখের কাছে ধরলুম...

পুরোহিত মহা পড়ছেন,—জনকতক লোক পীরেরের কবর খুঁড়ছে। হঠাৎ তাদের কোদাল শব্দ কি-একটার উপরে পড়ে সশব্দে বেজে উঠল।

খানিক পরে লোকগুলো ব্যস্তমস্ত হয়ে আমাদের ডাকতে লাগল। আমি আর পুরুত ব্যাপার কি দেখতে এগিয়ে গেলুম।

গোরস্থান খুঁড়তে খুঁড়তে তারা একটা পুরাণো কবর আবিষ্কার করেছে। এক জন কুড়ুলের দ্বারা মারতেই কবিনের ডালটা গেল খুলে—সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা দেখতে পেলুম, তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত দীর্ঘাকার কঙ্কাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সেই মাংসহীন কঙ্কালটা তখনো বেন চকুহীন অন্ধিকোটর মেলে, মৃত অথচ স্থগাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে ছিল! আমার মনটা কেমন বদমে গেল; কেন জানি না, কি-একটা অজানা ভয়ে আমার হৃকর ভিতরটা বেন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

একজন বলে উঠল, “এ কি! দ্যাখ, দ্যাখ, লোকটার একখানা হাত নেই! এই যে, হাতখানাও যে এর সঙ্গেই রয়েছে!” —বলে, সে কবরটির পাশ থেকে একখানা দীর্ঘ, শুষ্ক ও পেশীহীন কাটা হাত তুলে নিয়ে আমাদের সকলকে দেখালে!...

মেখেই আমার মনে হোল, শয়তানের সেই
হাতখানার কথা !..... পীরেরের ঘর থেকে
সে হাতখানা হারিয়ে গিয়েছে !...

আর-একজন ঠাট্টা করে বললে,
“মেখেছ! তুমি ওর হাত কেড়ে নিয়েছ
বলে ও বেন জাকিরে উঠে তোমার চুঁটি
কামড়ে ধরবার উদ্ভোগ করছে !”

পূক্ত বললেন, “ভাই সব, যে মরেছে

তাকে শাস্তিতে ঘুরতে দাও ! আর-একটা
জারগা বেখে মিঃ পীরেরের জন্যে ‘কবর
খোঁড়ো !”

পীরেরের শেষ কাজ শেষ হোল ; সহরে
ফেরবার আগে পুস্তকের হাতে আনি ‘গুটি-
কর টাকা দিয়ে এলুম,—অকালে যে নিমিত্ত
আম্বার স্তুতিভঙ্গ করেছি, তার বাতে শাস্তি
হয়, সেইজন্যে স্তুতারনের বন্দোবস্ত করতে !

শ্রীমতী বেণু রায়

পূর্ণতা

(Rupert Brooke)

ভাল, মন্দ দুই লেখা লিখিয়া লগাটে,
অক্ষ ভরি অন্তর গভীরে,
বিহার লয়েছি পোহে ধীরে অতি ধীরে !
নিঃশব্দে থলিয়া আঁধার নিরুদ্ধ কপাটে
সারাক্ষর প্রচ্ছন্ন তিমিরে,
বিগ্রহ-বিহীন স্তম্ভ নিকৃত মন্দিরে
আবাহন করিতেছে, উড়ে আশা চিত্তা শত শত,
বন্ধ ছিন্ন নাহি করে তীক্ষ্ণকৃৎ বিহঙ্গের মত,
যারা আলোকের প্রায়, নীরবে ঘুমায়ে
পূর্ণ করি রজনীর আঁধার কুলায় !

হায় মন, স্তম্ভ তোরে রাখি গল ভয়,
সে শক্তি নাহিক আমার,
তাই ভাবি সেই প্রেম গ্রন্থে গাথা বার
পুলক অপার, বেথা সে চির-অমর !
পূজবতী নারীর সীবন,
প্রবোধের শাস্তি-ভরা বিরাট-ভবন,

পরিপূর্ণ প্রাণ-বান অব্যাহত প্রান্তর স্ত্রামল,
নিশ্চিত শস্ত্রের আশে বন্ধ বার সিকনে কোমল,
শিশুর কল্যাণ মূখ, আলোকে উন্মূখ
বর্ষণবিরত স্বচ্ছ আকাশের বৃক !

নীরব প্রশান্ত স্তম্ভতা দ্বাধার
ঘরে-ফেরা বিহঙ্গের ধল,
আনন্দে তাড়িতা বেহু করি কোলাহল !
সঙ্গীতের সন্ধানল, যে পুণ্য সস্তার
মরণ-অতীত অবিরল,
উদার হৃদয় শাস্ত উজ্জল নির্মল !
ধীরে ধীরে, একে একে, বার বার নিরত স্মরণ
অসুত্তের অভিষেক লব মোর অন্তর ভরিয়া !
আজ সাধা নাহি আর, কখনে আমার
স্তুতারা এক তিল দিতে অধিকার !
শ্রীপ্রিয়দর্শিনী দেবী ।

সমালোচনা

নটিকেত্রা। শ্রীহৃত্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এখান। প্রকাশক, আদি ব্রাহ্ম সমাজ কলিকাতা
আদি ব্রাহ্ম সমাজ দপ্তর মুদ্রিত। মূল্য ষাটো আনা।
পণ্ডিত শ্রীহৃত্ত প্রবন্ধনাথ তর্কভূষণ মহাপাত্র এই গ্রন্থের
ভূমিকা লিখিয়াছেন—ভূমিকার তিনি উপনিষদের কথা
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভাল;
তবে বহুখা কোথাও পত্রিকুট ছয় নাই, আঙ্গায়েড়া
ধোঁয়াটে রহিয়া গিয়াছে। এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ
করিলে সাধারণ পাঠক যে 'আলো পাইবেন', এমন
সম্ভাবনা ত খেলিলাম না।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ
জমিদার। বিত্তীয় বণ্ড। হুসর রাজবংশ।
হুমার শ্রীহৃত্ত পৌরীভাষ্যের দ্বারা চৌদুরী প্রস্তুত।
রাখাগোপালপুর রাজবাটী হইতে প্রত্নতার কতক
প্রকাশিত ও কলিকাতা ঢেউ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য
লেখা নাই। এই গ্রন্থের প্রথম বণ্ডে পত্রগণা নয়-
মনসিংহের প্রাচীন জনিবার-বংশের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত
হইয়াছিল—এই বণ্ডে হুসর রাজবংশের ধারাবাহিক
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী
হইতে এই বংশের ইতিবাস আরম্ভ হইয়াছে—
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাকতুল্য সোমেশ্বর পাঠক নামে
এক সমুদ্রযাত্রী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন—তিনি ১৮৭
সালে (১২৮০ খৃঃাব্দে) কামরূপ ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি
ভীষণ দর্পন করিবার মানসে কয়েকজন অনুচরকে সহিত
বঙ্গদেশে আসেন ও হ্রদে গাভী পাখাড়ের নিকট
বাস-স্থাপন করেন; বহিরা গারোর অত্যাচারে
সে প্রদেশ তখন প্রস্তুত—বিত্তর সাধু-সন্ন্যাসী ও
গৌর অধিবাসীরা সাহায্যে সোমেশ্বর বাইনা গারোকে
হঠাৎই রাজ্য প্রদীপ্ত করেন এবং সাধুর পরামর্শে

ও সংপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের সহায়তায় এই রাজ্য
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। ইহার নাম হয় 'হুসর'। এই
সময় হইতেই হুসরের খ্রী ও সমুদ্রের প্রত্যাপ।
এ প্রদেশ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ
করিয়া বর্তমান কাল অবধি রাজবংশের কথা
ধারাবাহিক বিবৃত্ত হইয়াছে; কোথাও অব্যক্ত কথা
বা কঁকালো উজ্জ্বলের কোন চিহ্ন নাই—হুসর
কোনরূপ আভ্যন্তর নাই বিচিত্র ঘটনার সমুদায় বেষ
কৌতুহল জাগিয়া উঠে।

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা।

প্রথম বঙ্গাব্দ, ১৩২০, ১১ই পৌষ। শ্রীহৃত্ত
যৌক্তিকনাথ সমাদার দি, এ, ও শ্রীহৃত্ত রাখাগোপাল
সাহায্যে, এ সম্পাদিত। কলিকাতা, কুতলীন প্রেসে
মুদ্রিত। এখানিকে বাঙালী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের
'ডিরেক্টরী' গ্রন্থ বলা হইতে পারে। ইহাতে বহু
খবর আছে এবং প্রত্নতার পরিচয়, মালিক ও সংবাদ
পত্রাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের
সহিত বলিতে হইতেছে যে ভুল বিবরণ আছে। এ
ধরনের পুস্তক বঙ্গদেশে সচল হওয়া বরকার
—নহিলে ইহার কোন মূল্য থাকে না। তবে
এই প্রথম ভেট। বলিয়া এবার করা যায় হইতে
পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে স্বতন্ত্রকর এ বিষয়ে বিশেষ
সতর্ক হওয়া চাই। বইখানি বাংলা সাহিত্য-
বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ণ বলিয়া অনেকের
অনেক উপকারে লাগিবার সম্ভাবনা। নানা বিভাগে
নানা বিষয় সংযোজিত হওয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক
হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাধারণের কাছে বঙ্গসাহিত্য-
সেবীদের পরিচয় দানে এবং তাহার প্রত্ন-প্রচারাৎ
সহায়তা করিবে।

কলিকাতা ২২, দক্ষিণ প্রান্ত, কলিকাতা প্রেসে প্রিন্ট করা হইয়াছে
০, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে

শ্রীমতীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ব্যঙ্গোক্তি (১)
 শ্রীগুরু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারতী

৪১শ বর্ষ]

আষাঢ়, ১৩২৪

[৩য় সংখ্যা

আলোর আলো

দশ

হরেন্দের কথা

মুরারিবাবু একটি বয়স শিশু; অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধও বটেন, শিশুও বটেন! বার্ষিকের অভিজ্ঞতা আর শিশুর সরলতা, তাঁর চরিত্রের মধ্যে এ দুয়েরই হরি-হর মিলন হয়েছে।

আর, তাঁর প্রাণটি ত দয়ামায়ার একেবারে কানায় কানায় ভরা! সেদিন একটি সামান্ত ব্যাপারে তাঁর চরিত্রের এই কোমল দিকটি দেখতে পেরেছি। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বসে বসে কথাবার্তা কইছি, হঠাৎ আমার পিছন থেকে 'কেঁউ-কেঁউ' করে কি-একটা জানোয়ার ডেকে উঠল। কিন্তু পিছন ফিরে কিছুই দেখতে পেলুম না। খানিক পরে আবার সেই 'কেঁউ-কেঁউ' আর্ন্তনাদ,—ঠিক আমার পিছনে! আবার পিছনপানে চাইলুম—কিন্তু কিছুই নেই। আমাকে আশ্চর্য্য হোতে "দেখে মুরারিবাবু কোতুকমাথা চোখে বললেন, "কি দেখছেন?"

—“ঘরের ভিতরে কি ডাকে ও?”

—“কুকুর-ছানা।”

—“কুকুর-ছানা! কৈ, দেখতে পাচ্ছি না ত!”

—“তাকে দেখতে চান ত ঐ জান্নার জেবের দিকে তাকান!”

তাইত! আনন্দের প্রকাশে একটা 'ওভার-কোট' খুলছিল, তারই এক পকেটের ভিতর থেকে একটা কুকুর-ছানার ছোট্ট নাকের ডগা আর পুটপুটে দুটি চোখ জ্বালা ধাচ্ছে! পকেটের কাগাগারে বন্দী থাকতে নারাজ হয়ে সে ক্রমাগত ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, কিন্তু কিছুতেই বেরুতে পারছিল না!

—“অ্যা, জান্নার পকেটে কুকুর-ছানা! এ কি ব্যাপার!”

মুরারিবাবু হালতে হাসতে উঠে জেব থেকে তাকে টেনে বার করলেন। এটি দেশী কুকুরের বাচ্চা, বয়স মাসখানেক হবে, গা-মর ধুলো-কাদা মাখা।

মুরারিবাবু করুণ নেত্রে সেই অস্থিগার বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে, তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, “কাল সন্ধ্যা-বেলায় রাত্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছি, এমন সময় দেখি একটা কুকুর-ছানা বৃষ্টিতে

ভিজতে-ভিজতে কাদার উপর পড়ে কেঁপে
যরছে। আচ্ছা, সে এমনি কাঁদছিল যে
প্রাণ যেন কেটে যায়!—হুতরাং—”

—“হুতরাং আপনি একে নিয়ে এসে
আমার ভেবের ভিতরে পুরে ওঁর নীত
নিবারণ করেছেন?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে করছি বাইরে-
বাইরে এ বেচারীকে মাহুঘ করব।”

—“বতই খাওয়ান-নাওয়ান, আমার নূত
বিখাস শেষ-পর্যন্ত ও কুকুরই থেকে যাবে,
মাহুঘ কখনো হবে না মুহারিবা!—”

—“কি আশ্চর্য! আপনি কি জানেন
না অনেক মাহুঘ কুকুরের চেয়েও নীচু?
যদি করলে কোন কুকুরই নিজেকে সর্গাদা
নষ্ট করে না—বরং তারা যে অনেক মাহুঘের
চেয়েও বড়, সেই পরিচরই নিয়ে থাকে।”

মুহারিবাবুর ঠিক কথা! অপকারীকে
মাহুঘ ভয় করে, কিন্তু উপকারীকে সে
জু-পায়ে খ্যাৎলাতে পারলে আর ছাড়বে না।
এই ত চুনিয়ার ধাতা!

যেহেতুকে নিয়ে বৃদ্ধ ভারি নাগুনাবুধ
হয়ে পড়েছেন। আর বাস্তবিকই তাবনার কথা
ত! তাঁর এমন-কোন আশীর্বাদ নেই, তাঁর
অবর্তমানে যিনি সরমার অতিভাবক হোতে
পারেন।

আমি চাই সরমার সঙ্গে মোহনের বিয়ে
মিতে। মোহনের প্রাণকে বরাবর আমি
বরাগদা বলে জানতুম; কিন্তু তার প্রাণে
এক-হঠাৎ প্রেমের জোয়ার যে এমন জোরে
বইতে পারে, এ খেয়াল আমার ঘোটেই ছিল
না! বেচারী একেবারে ডুবছে! দিন-রাত
আনন্দনা, পড়া-শুনায় মন নেই, কথাও কথায়

সরমার মাম করে,—প্রথমে পড়লে মাহুঘের
এমনি হাস হর বটে! এবারে সে একজামিন
মিলেও তার পক্ষে পাশ হওয়া শক্ত কথা।

মোহন কিন্তু এদিকে বেড়ে জমিয়ে
তুলেছে। সরমা আমার সামনে মুখ গুলে
বেরোর না, কিন্তু মোহনের সামনে বেরোর,
জু-চারটে কথাবার্তাও কর। সরমা পরমা
মুখরী বটে, কিন্তু মোহনও পরমমুখর
পুরুষ। সরমাকে দেখে মোহন যখন তুলেছে
মোহনকে দেখে সরমাও তখন তুলবে না
কেন? এ ত জন্মের ধর্ম! দুটি তরুণ
জন্মের যখন পরস্পরের সামনাসামনি থাকে,
তখন মিলন ত স্বাভাবিক! বিশেষ, কবিও
বলেছেন—

“প্রেমের কাঁদ পাভা ভুবনে

কে কোথার ধরা পড়ে কে জানে!”

এখানেও কাঁদ পাভা হয়েছে—শিকার
পড়তে বেশী বেগি লাগবে না; কাঁদ বার্ষ
হবে না। তা যদি হয়, মোহনের অদৃষ্ট
তবে নেহাৎ মন্দ।

মোহনকেও সেদিন এই কথাটা বললুম।
সে মুচুকে একটু হাসলে—কিছু বললে না।

খানিক পরে সে বললে, “হয়েন, তোমারও
বয়স হোল, এইবার বিবাহের চেষ্টা স্নাথ।”

—“মাপ কর তাই! ও বিবাহ টিবাং
আমার দাগা হচ্ছে না!”

—“কেন হে?”

—“ও জিনিসটিকে আমি কুকুর মত
ডরাইশ।”

—“কারণ?”

—“অনেকগুলো বই পড়া হয়ে গেলে

পর প্রায়ই আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে, এগুলো না পড়লেই ছিল ভাল! তেমনি, অনেকগুলি বিবাহিত বন্ধুর চরিত্র অধ্যয়ন করে আমার এই দিবা জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, যাতে-করে' সহজ মানুষের বিগড়ে বাবার সম্ভাবনা, সে হাস্যম থেকে ভকতে থাকাই বার্থ প্রবোধের কার্য।"

—“মানুষ তবে বিয়ে বিয়ে করে পত্তার কেন?"

—“কারণ, বিবাহ হচ্ছে মিল্লির লাড়ু! কাজেই, না খেলেও পত্তাতে হর—খেলেও পত্তাবে!"

—“এ তোমার মিথ্যা বিশ্বাস!"

—“বন্ধু, আমার মিথ্যা বিশ্বাসে আমার শ্রদ্ধা আছে। সমাজে তোমরা যাকে ‘সত্য’ বল, সেই ‘সত্য’ হচ্ছে এমন কতকগুলি মিথ্যার সমষ্টি—যেগুলিকে সব-চেয়ে সহজে বিশ্বাস করা চলে। একটু তলিয়ে দেখলেই সে-সব জুয়ে সত্যের ভান্না ঠাট বেরিয়ে পড়ে। আমি তাই আনি, পৃথিবীতে ‘মিথ্যা’র চেয়ে বড় ‘সত্য’ আর নেই। তোমাদের কাছে বা মিথ্যা, আমার কাছে তাই সত্য।"

—“তুমি তাহলে বিবাহ করতে চাও না?"

—“না। বিবাহ করে' আমি আমার স্বাধীনতা লোপ করতে চাই না।"

—“হয়েন, তুমি ভারি স্বার্থপর ত!"

—“কিসে?"

—“বারা একলা থাকতে চায়, তার স্বার্থপর নয় ত কি?"

—“ভাই, স্বার্থপরতার একটি মন্ত গুণ আছে; কৃত্রিমের ধ্বংস থেকে আমাদের সে বাঁচিয়ে রাখে।"

—“দিন দিন তুমি বেশ কী হয়ে উঠছ! আমার কথার উত্তরে তোমার এই চর্যোচনা দার্শনিকতা স্বধু যে অসহনীয়, তা নয়—অসামরিকও বটে!"—এই বলে মোহন রাগ করে চলে গেল।

কাল যখন সুরারিবাবুর বাড়ীর কাছে বাই—তখন দূর থেকে যেন মনে হয়েছিল, দুটো লোক সুরারিবাবুর বাড়ীর সামনে চোবের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের কাছে যেতে-না-যেতে তারা ছারার মত সঙ্কার অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে গেল। আমি খানিকক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও আর কারকে দেখতে পেলুম না। কিন্তু মনে-মনে কেমন-একটা খটকা লেগে রইল। সহরের এদিকটা কী নির্জন! যে-কোন একটা অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারে।

পরদিন একটু সকাল-সকাল সুরারিবাবুর বাড়ীর দিকে গেলুম। তার বাড়ীর পাশেই একটা ছোট গলি ছিল,—তার ভিতরে ঢুকে চুপটি করে' বাট আগলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই গলির ভিতর থেকে উকি মেরে দেখলুম, দুটো লোক একটু তলাতে দাঁড়িয়ে আপনা-আপনি কি বলাবলি করছে।

মিনিট দুই-তিন পরে তারা আস্তে আস্তে চারিদিকে চাইতে-চাইতে সতর্কভাবে এগিয়ে এল। তারপর সুরারিবাবুর বাড়ীর সদর দরজাটা একটু ফাঁক করে' ভিতর-পানে উকিঝুকি দিয়ে কি দেখতে লাগল।

কে এরা? বেই হোক—এদের মতলোব ত ভাল নয়! নিশ্চয় এরা কোন-একটা অসং-কাজ করার সুবিধা খুঁজছে।

গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে, পা টিপে-
টিপে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম।
তারপর বেশ বাগিরে হু-হাতে ছুজনের গলা
কাঁক-করে' টিপে ধরলুম।

তারা চমকে উঠল,—আমার হাত
ছাড়াবার অন্তে কটাগটি করতে লাগল।
কিন্তু আমি যখন আচ্ছা করে' এর মাথায়
ওর মাথায় ঠকাঠক্ ঠুকে দিলুম, তখন
তারা কেমন লোকের পাল্লায় পড়েছে বুঝতে
পেরে কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে
দাড়িয়ে রইল।

গ্যালের আলোর নিকে ফিরিয়ে, তাদের
মুখ দেখে নিয়ে বুললুম, গ্যালবারে যে ছুই
মহাপ্রভু মুরারিবাবুর বাড়ীতে অনধিকার
প্রবেশ করেছিলেন, এঁরা তাঁরা ছাড়া আর
কেউ নন!

টিটকিরি দিয়ে বললুম, “এই বে!
সেবার আশা বিয়ে গিয়েছিলেন আবার
বর্শন দেখেন; আপনাত্মা কথা রেগেছেন
যেখে স্বামী হলুম। কিন্তু ছুংখের বিষয়,
আপনারাধের নমস্কার করতে পারলুম না—
যেহেতু আমার হু-হাতই ঝোড়া!”

যে লোকটার চেহারা শুণ্ডার মত, সে
কাতরভাবে বললে, “ছেড়ে, দিন মশাই,
লাগছে!”

খুক-ঝোরে একটা ঠাণ্ডা মেয়ে তাকে ছেড়ে
বিলুপ্ত—সে তিনহাত তফাতে ছিটকে মুখ
খুব্ড়ে পড়ে গেল।

—“ব্যাটা, তালপাতার সেপাই,
কল্কাতার এসেছ শুণ্ডামি করতে! বাও,
আবার যদি কখনো এদিকে দেখি, আর
বাঁচবে না!”—

সে কোন জবাব না দিয়ে চটপট
উঠেই চোঁচা ধোঁড় মারলে!

অন্ত লোকটিকে বাজ করে আমি
বললুম, “ওহে, দেখেছ! ভোমার স্যাঁতাত্-
পড়ল ঠিক লাটুর মত ঘুরতে ঘুরতে, আর
পালান ঠিক টাটুর মত ছুটেতে ছুটেতে।
এখন তোমাকে নিয়ে কি করা যেতে পারে
বল দেখি? লাথি, চড়, গুলি, গাঁটা—বহু,
এর মধ্যে কোনটা তুমি বেশী পছন্দ কর?”

সে মিনতি করে বললে, “আর কেন,
আমাকেও যেতে দিন!”

মুরারিবাবুর মুখে যে অমিথ্যারের কথা
শুনছিলাম, নিশ্চয় ইনি সেই মহাপ্রভব!
জিজ্ঞাসা করলুম, “তোমার নাম কি?”

নাম জিজ্ঞাসা করিতে সে বিরক্ত হয়ে
বললে, “নামে কি দরকার? ছাড়ুন না!”

গলা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম,
“এখনো ঝাঁক! নাম বল বলচি!”

সেই এক ঝাঁকুনিতেই তার সব ঝাঁক
ঠাণ্ডা হয়ে গেল! শুককণ্ঠে আঙে আঙে
সে বললে,—“নবীনজ্ঞে পাল!”

—“নবীনবাবু, তোমার আর-একটু
শিক্ষার দরকার।”—বলে আমি মুরারিবাবুকে
চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম।

মুরারিবাবু বাইরে এসে, ব্যাপট্র দেখে
একবারে থ! বিশ্বাসের প্রথম চমক কেটে
গেলে পর তিনি বললেন, “কি আশ্চর্য!
এবে নবীনবাবু!”

—“হ্যা, আপাতত কিঞ্চিৎ কাই!”

—“ব্যাপার কি?”

—“ক্রমে শুনবেন। আগে বাড়ীর
ভিতরে চলুন।”

—“আহা, ঠিক লাগছে—ছেড়ে দিন
হরেনবাবু!”

—“ছাড়ব বৈকি, এ রকমের দর করে
বেশীক্ষণ রেখে লাভ নেই।”—বলে, নবীনকে
তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও টেনে-হিঁচড়ে বাড়ীর
ভিতরে নিয়ে গেলুম।

সরমা স্নানঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল,—
আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে
আড়ালে সরে বেতে গেল!—আমি কিছু
ডেকে বললুম, “প্রোগ্রামী-ঠাকরুন, যাবেন
না—দয়া করে* একটু দাঁড়াতে হবে।”

সরমা গড়গড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নবীনের গলা ছেড়ে দিয়ে আমি বললুম,
“নবীনচন্দ্র, বাও—ওঁর পায়েস কাছ নাকে
থৎ দিয়ে, ওঁকে প্রণাম করে* বল, ‘মা, আমি
তোমার সন্তান, এমন কাজ আর-কখনো
করব না।’ গেলে না যে? বাও,—বাও
বলছি!”

নবীন তবু নড়ল না—মাথা হেঁট করে*
কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

—“তোমার ও পাগলুখে সহজে তাহলে
মা-নাম বেরবে না? দেখবে? আমার
এ হাতের একটি—একটি মাত্র চড় খেলে
তুমি কি আর বাঁচবে মনে করছে?”—
বলেই আমি চড় তুললুম।

মুরারিবাবু ব্যস্তমস্ত হয়ে আমার
হাতখানা ধরে ফেলে বললেন, “আঁ্যা, আঁ্যা—
করেন কি—করেন কি! কি আশ্চর্য! ছেড়ে
দিন, ছেড়ে দিন—আঁ্যা, আমার মাথা হচ্ছে!”

—“যে মা বলতে* জানেনা তাকে মায়া
করলে মায়ার বাজেখরচ হয় মুরারিবাবু!
নবীন, এখনো যা বলছি কর!”

সে আশ্বে আশ্বে আড়ষ্টভাবে সামনের
দিকে হেঁট হোল।

—“দাও নাকে থৎ! আচ্ছা; প্রণাম
কর! আচ্ছা; বল ‘মা, আমি তোমার
সন্তান, এমন কাজ আর-কখনো করব না!’”

নবীন বিড়-বিড় করে আমার কথা
আবৃত্তি করতে লাগল।

আমি বললুম, “ওতে হবে না—চোঁচিয়ে,
ভাল করে বল!”

সে চোঁচিয়ে আবার বলতে লাগল—
“মা, আমি তোমার সন্তান, এমন কাজ—”

দেখলুম, সরমার সর্কাস দিয়ে হাসির
লহর বহে বাচ্ছে; শেষটা আর থাকতে
পারলে না—নবীনের কথা কুরোবার আগেই
মুখে কাপড় দিয়ে কোনরকমে হাসির বেগ
ধামিয়ে সে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে
গেল। তারপর ঘরের ভিতর হোঁতে তখনতে
পেলুম, তার চাপা হাসির অ’ফুট উজ্জ্বাস!

নবীন মুখ চুপ-করে* দাঁড়িয়ে আছে যেখে
মুরারিবাবু আশ্বে-আশ্বে তার কাছে
গেলেন। তারপর দ্রুহাতে তার একখানা
হাত চেপে ধরে মমতা-মাথানো গাঢ় স্বরে
বললেন, “নবীনবাবু, কিছু মনে করবেন না!”

নবীন আর সামলাতে পারলে না—
অপমানে, চুঃখে বিহ্বল হয়ে সে ফুল-
ফুল কাঁধতে লাগল, চোখের জলে তার
বুক ভেসে গেল।

আমারও তার উপরে কেমন দরদ হোল;
মনের কোঁকে অনেকটা এগিরে গিয়েছি,
হাস্যাত-হোক ভ্রমশোকের ছেলে ত! আমি
তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললুম,

* “ভাই, মাফ কর!”

আমি' যে তাঁর কাছ থেকে মাফ চাইব, এতটা বোধহয় সে আশা করেন-নি। কারণ, নবীন তাঁর সমস্ত চোখ তুলে হৃদয়িত ও বিস্মিত ভাবে একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলে; কিন্তু, কোন কথা না বলে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে, মাথা নীচু করে' ধীরে-ধীরে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি তখন সুরারিষাবুকে একে-একে সমস্ত কথা খুলে বললুম।

সুরারিষাবু প্রশংসার চোখে আমার দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি আশ্চর্য! আপনায় গারে এত জোর!”—তাঁরপরেই বোধ করি নবীনের কান্না মনে করে'ই একটু বিব্রত হয়ে বললেন, “কিন্তু এতটা সাজা দেওয়া আপনার ভাল হয়-নি! হাজার-হোক, অমিয়ারের ছেলে, অপমানের মায়াটা বড় বেশী হয়ে গেছে।”

—“সুরারিষাবু, আজ যদি ওকে অধু মেরেথরে ছেড়ে দিই, কাল তাহলে 'ও তাঁর শোধ তুলতে আবার কিরে আসত। কিন্তু, এই-বে অপমানটা করা হোলো, ওর যদি মনের ভয় থাকে তাহলে আর এ-মুখো হবে না। সে-সব কথা ব্যৃ। অনেক পরিশ্রম করা হয়েছে, অতএব প্রৌপদী-টাককল্পকে বসুন, আমার আজকের গুণটা হাতে-হাতে পরিশোধ করতে। তার জমিয়ে রাখতে পারব না—আমি তেমন নির্কোণ মহাজন নই।”

এগারো

সরমার কথা

মাগো, বাবা যেন কি! কোথা-থেকে একটা হাড়-জিরাজির কুহুরের ছানা ধরে

এনেছেন, সে দিন-রাত তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছে-ফিরছে। বাবা যখন খেতে বসেন, সে তাঁর পাতের পাশটিতে বসে টিক্-টিক্ করে' সক্র-লিঙ্গলিকে ল্যাজটি নাড়ে; বাবা যখন শুতে যান, সে তাঁর পাতের তলায় গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওয়ে পড়ে। আমার করে' তাঁর আবার নাম রাখা হয়েছে ‘মহুয়া’!

আচ্ছা, বাবা আজকাল মাঝে-মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে যান কেন? মুখখানি বিমর্ষ করে' এক-একবার আমার দিকে তাকান, দীর্ঘশ্বাস কেলেন, আর আকাশ-পাতাল কত-কি যেন ভাবতে থাকেন। সময়ে-সময়ে আমাকে বোধহয় কিছু বল্ব-বল্ব করেন—অথচ কিছু বলতেও ত পারেন না।

এ আর কিছু নয়—আমার এই ছার কপালের কথা ভেবে-ভেবে বাবার মনের সব স্বপ্ন-সোয়ান্তি ঘুচে গেছে। কিন্তু আমাকে তিনি কি বলতে চান? কেনই-বা বলতে পারেন না? সে কথা শুনে কি আমার মনে বিশেষ কষ্ট হবে? এমন কি কথা?

সেদিন আমি বাবাকে জোর করে' ধরে বসলুম। বললুম, “হ্যাঁ বাবা, তুমি কি ভাব, আমাকে বলতে হবে।”

বাবার মুখ ক্যাকাশে হয়ে গেল; ইতস্তত করে' বললেন, “কৈ না, কিছু ভাবিনা ত!”

আমি বাবার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম, “না বাবা, তুমি লুকাছ। আজ কিন্তু কিছুতেই আমি ছাড়ব না, বলতেই হবে।”

বাবা আমার মুখের পানে দীর্ঘবে দ্বির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। খানিক পরে দেখি, তাঁর চোখ ক্রমেই জলে ওরে উঠছে!

—“বাবা, তুমি কানছ!”—বলে আমি বাগল হায়ে তাঁর বুকের তিতরে দুখ লুকালুম। মনে হোল বাবার বুকখানা থেকে-থেকে যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অনেকক্ষণ বাবাও কথা কইলেন না—আমিও না। তারপর তিনি আমার মাথার উপর হুটি হাত রেখে আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, “মা সরো, আজ আমি তোমার বে-কথা বলব, সেটা হাল্কাভাবে নিও না। যে হুঃখী, সে তার চঃখ বতই ভুলে থাকতে পারে, তার পক্ষে সেটা ততই মজলের কথা। নারীর দায়-বাতা হুঃখ নেই, তুমি তাই সয়ে আছ। এ-অবস্থার তোমাকে তোমার হুঁভাগ্যের কথা নুতন করে’ স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার উচিত নয়—অথচ এ না করে’ আর উপায়ও নেই।”

বাবা একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, “আমার বয়স বাড়ছে বৈ কমছে না—সংসার থেকে এখন আমার চিরবিদায় নেবার সময় এসেছে। আমার এমন-কোন আত্মীয় নেই, যিনি তোমার ভার নিতে পারেন। এখন আমি যদি যাই, এ পৃথিবীতে তুমি একলা হবে। তোমার এই বয়স—তাতে তুমি জীলোক। এ অবস্থার আমাকে এমন-কিছু করতে হবে, যাতে আমি নিশ্চিত হয়ে মরতে পারি।”

বাবা আবার ধামলেন। আমার প্রাণের ভিতরটা কি-রকম হু হু করতে লাগল।

—“মা সরো, কিন্তু একটি উপায় ছাড়া আমার আর-কিছু করবারও নেই? আজ কাল সমাজে বিধবা-বিবাহ চলছে। পণ্ডিতরা বিধানও দিয়েছেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

তোমার আবার বিবাহ দেওয়া ছাড়া-আমি ত আর বিত্তীয় উপায় দেখতে পাচ্ছি না। এ-বিষয়ে তোমার মত কি, আমি তাই জানতে চাই। তোমার মত না নিয়ে আমি কিছু করব না—করতে পারব না। বেশ করে’ সবস্ত ভেবে-চিন্তে তোমার যা মত আমাকে জানিও। আমার কাছে কিছু লজ্জা কোনো না না, কারণ এর ওপরেই তোমার তবিখ্যাত নির্ভর করছে।”

—এই কথা বলে বাবা ধীরে-ধীরে উঠে বাইরে চলে গেলেন।...

বাবার আজকের কথাগুলো যেন আচম্ভক্য প্রহারের মত আমাকে দুর্জাহত করে’ দিলে! নিষের পূন্য জীবনের যাতনা ভুলি-নি বটে, কিন্তু আবার বিবাহের কথা ত কোনদিন ভাবতে পারি-নি,—এ অসম্ভবের সম্ভাবনা ত কোনদিন শ্রুণ্ডে মনে আসে-নি! বি-ধ-বা বি-বা-হ! আমার অন্তরাত্মা যেন শিউরে উঠল! এক বিবাহের কলভোগ করছি, আবার বিবাহ!...

বিধবা-বিবাহ!—আমার এ নারী-প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বলতে লাগল—‘এ অন্তার, অন্তার, অন্তার!’

... আমার দুখ মনে পড়ল। সে মুখেতে হুঃখবতির কিছু ছিল না, তজ্জি-শ্রদ্ধার কিছু ছিল না... ... কিন্তু, তবু—তবু, তিনি ত আমার স্বামী—তিনি

বাবা এ কি বললেন! দেশে এখন প্রায়ই বিধবার বিবাহ হয়—কিন্তু তা কি হওয়া উচিত? একটিমাত্র স্থল কি দুই দেবতাকে উপহার দেওয়া চলে?

ওগো, তোমাদের পুরুষের পৃথিবীতে

নারী কি অসহায়! পুরুষ একলা এই ধরনীতে দিখির কর' আসতে পারে, আর একাকিনী নারী যদি নিরোর বরের কোণে আপনাতে-আপনি বিলীন হয়ে থাকে, তাহলেও কি সে বাইরের হিংস্র দৃষ্টি থেকে আশ্রয়ক্ষা করতে পারবে না? তাকে রক্ষা করার জন্যে পুরুষ না হলে চলবে না?

কেবলমাত্র আশ্রয়ক্ষার জন্যে আবার বিবাহ! আমার স্বাধীন জনকে আবার পরাধীন করতে হবে! কিন্তু আবার যিনি আসবেন, তিনিও যদি রক্ষক না-হয়ে ভক্ষক হন? তখন তাঁর গ্রাস থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে?

তগবান্! জগতে নারীর মত দুর্বল প্রাণী কেন সৃষ্টি করেছে... কেন?

বিছানার উপর পড়ে, মুখ গুঁঁজড়ে আমি কান্ডাতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চোখের মল মুছতে গিয়ে দেখি,—দরজার কাছে শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, রক্তন বিগ্নিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে, মোহনবাবু!

একী লজ্জা! তাত্তাত্তি তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসলুম। মোহনবাবু যেন নীরবে এসেছিলেন, তেমনি নীরবে চলে গেলেন।

নাগো, তিনি কি মনে করলেন! আরো-কিছুক্ষণ বসে বসে নানান কথা ভাবতে লাগলুম। ভাবতে-ভাবতে মাথাটা কেমন ধরে গেল—বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াবুম।

বাগানের দিকে তাকাতেই আবার দেখলুম, মোহনবাবুকে! তিনি আমার

দেখতে পেলেন না,—আপনমনে মাথা হেঁট করে' ঘাসের উপর পাইচারি করছিলেন।

একটা গাছে ঝাঁকে-ঝাঁকে থোকা-থোকা ফুল ফুটে আছে, মোহনবাবু তার সুস্থে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। অন্তমনস্ক ভাবে গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিলেন। ফুলটি একবার তাক, বিরক্তভাবে সেটিকে আঙুলে ধেংলে আবার ছুঁড়ে কেলে নিলেন। তারপর দু-একবার পায়চারি করে ঘাসের উপরে কেমন অবসরগ্রহণ মত বসে পড়লেন!

ঠাণ্ডা হাওয়ার আমার মাথা-ধরাটা একটু কমল। আমি দরজার কাছ দাঁড়তে, সেখান থেকে চলে এলুম।

ঘন্টাধেড়েক পরে ঘরে আসতেই আবার বাগানের দিকে চোখ গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, মোহনবাবু ঠিক সেইখানটিতে, ঠিক তেমনি চিত্তিত ভাবে বসে রয়েছেন!...

কেন?

সামান্যি বাবার কথা নিয়ে মনের ভিতরটা তোলপাড় হোতে লাগল। বিবাহ—আবার বিবাহ! কেন জানি না, যতবার বিবাহের কথা ভেবেছি, ততবারই মোহনবাবুকে মনে হয়েছে!... এ দুয়ের মধ্যে কিসের সম্পর্ক? এ ভাবনা ক্রমে আমার কাছে জঁর্জবনা হয়ে উঠল। মনকে আমি বারংবার ধোর করে' বোকাতে চেষ্টা করলুম যে—এ অসম্ভব, আমার বিবাহ অসম্ভব! কিন্তু মনকে যেই থানা করি, চোখের লামনে অমনি দেখি, মোহনবাবুর মুখ! কেন দেখি, কে আমাকে বলে দেবে?

সন্ধ্যার সময় সেই আর মন, দুই-ই কেমন
নেতিয়ে পড়ল—বুক ঘেঁষে পুড়ে যেতে
লাগল। হঠাৎ বাবা আমার কপালে হাত
দিয়ে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠলেন, “গরো,
একি! আমাকে তুই কিছু বলিল-নি? কি
আশ্চর্য! আরে তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে!”

বারো

মোহনের কথা

হরেনটা দেখছি, বেজার কাঠখোটা হয়ে
উঠল! বলে কিনা, বিয়ে করব না! সেদিন
সে তাই নিয়ে এমনি আবোল-তাবোল
বক্তৃতা শুরু করেছিল যে, আর বরদাশ করত
না পেয়ে শেষটা আমি রেগে চলে এসেছিলুম।

তার পর দিন যখন হরেনের সঙ্গে দেখা
হোল, সে নিজেই আবার সেই প্রসঙ্গ
তুললে; বললে, “কাল তুমি হঠাৎ রেগে
চলে এলে বড় যে!”

আমি বললুম, “কুন্তি লড়ে লড়ে তোমার
বেহের সঙ্গে মনটাও পাথরের মত শক্ত হয়ে
উঠছে, নইলে—”

আমাকে বাধা দিতে সে বললে, “মোহন,
আমার যা বলবার ছিল, তুমি তা না
শুনেই কাল চলে এসেছিলে। আসল কথা
কি জান, আমি আমার মনে মনে যথার্থ
সহধর্মিনীর যে মূর্তি গড়েছি, হিন্দুসমাজে তা
চলত বলেই আমি বিবাহ করতে চাই না।”

—“হরেন, তোমাকে ধোঁকা তার! কাল
তুমি কঠোর প্রত্যাশিকের মত কথা বলছিলে,
আর আশ একেবারে ভোল ফিরিয়ে কবির
মত কথা বলতে শুরু করেছ!”

—“মোহন, আরসোলা পানী হলেও

হোতে পারে, কিন্তু প্রত্যাশিকের পক্ষে
কবি হওয়া সম্ভব নয়! কিন্তু যাক সে কথা!
স্বাধ ভাই, শিক্ষিত পুরুষের সঙ্গে অশিক্ষিত
রমণীর বিবাহের মত বিসদৃশ ব্যাপার আমি শু
আর কল্পনা করতেই পারি না; আমি তাই
বিবাহের বিরোধী।”

—“কিন্তু হিন্দুসমাজে খোজ করলে
তোনার মনের মত বিদ্বী রমণী পেতে পার।”

—“বলছি ত তা হুজুত। আমাদের
সমাজে যে দু-চারজন লোক মেয়েদের লেখা-
পড়া শেখাতে চান, তাঁরাও শিক্ষার আসল
অর্থ বোঝেন না। কোনরকমে বর্ণপরিচয়
সাপ্ত করিয়ে মেয়েদের বই পড়াতে শেখানোর
নামই লেখাপড়া নয়; এমন অল্পবিদ্যা
মুখতার চেয়েও শোচনীয়।”

—“আমার ত মনে হয় এদেশী মেয়েদের
এ-রকম অজ্ঞতার মূল কারণ হচ্ছে, স্ত্রী-
স্বাধীনতার অভাব। দেখবে, যে-সব দেশে
রমণীদের উপরে ষোড়শোপ খাটানো হয় না,
সেই-সব দেশের রমণীরাই গেরস্থালীর কাজ-
কর্মের সঙ্গেসঙ্গেই বিদ্বী আর নৃত্যগীতবাঞ্চে
নিপুণ। ঘরে-বাইরে তাঁদের গতি অবাধ,
দশজনের সঙ্গে তাঁদের হামেসাই বেলামেলা
করতে হয়; তাই তাঁরা বাধা হয়ে এই
স্বাধীনতার উপযোগী জীবন গঠন করেন!”

হরেন খানিকক্ষণ নিকুন্তর হয়ে বসে
চলতে লাগলো; তারপর হঠাৎ, অস্বাভাবিক
টেবিলের উপরে চটাং করে একটা চড়ু বসিয়ে
দিয়ে বলে উঠল,—“আমাদের দেশে যে স্ত্রী-
স্বাধীনতা নেই, তার আসল কারণ এই যে,
স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্থে আমরা বৃত্তি, স্ত্রীলোকের
পরিভ্রমণা নষ্ট করা! আমাদের পুত্র ধারণা,

ঘরের বাইরে মেয়েটা যদি ঘোমটা খোলেন, অল্প পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তার যোগ দান, তাহলেই তাঁদের নির্মল চরিত্র পঙ্কিল হয়ে উঠবে। হৃদয় যার মুখ দেখতে পার না, অল্প পুরুষের ছায়াও যিনি মাড়ান, না, অত্যাচাৰী স্বামীর সাত চড়েও যার কথা স্নেহে না—আমাদের বিশ্বাস, তিনিই হচ্ছেন পরমা নম্রের সতী! অথচ, সতী বলে যাদের আমরা পূজা করি, সেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীরা পর্দা পূলে বাইরে আসতে, পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইতে ইতস্তত করতেন না! নিম্নকের মুখবন্ধের অল্পে আমরা যে যশস-তখন ঐ সব বিখ্যাত সতীকে আদর্শ করে' দাখাতে যাই, কিন্তু আমাদের রমণীরা কি ঐ আদর্শ-মত চরিত্র গঠন করবার সুযোগ পায়? আবার, এর মধ্যে নম্রা এইটুকু যে, এসব অপ্রিয় সত্য বলতে গেলেই শাস্ত্রীর দল বন বন টিকি নেড়ে তোমাকে 'অহিন্দু, স্নেহ, পাপিষ্ঠ' বলে ঐপতে ছিঁড়ে শাপ দিতে আসবে! দতদিন এই ভণ্ডের দলকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ানো না হচ্ছে, ততদিন আমাদের মা-বোন-মেয়েরা বখাৰ্শ রমণীষের অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবেন,—পত্নীকে আমরা ভাবব, স্বামীর সেবাদাসী মাত্র।"

—“বন্ধু হে, ভেঁতুলগাছের তলার পীড়িয়ে আত্মব্রের আশা চুরাশা মাত্র! তোমার মনের মত রমণী-রত্নের খোঁজ করতে গেলে এ অমমটাই তোমাকে আইবুড়ো হয়ে থাকতে হবে!”

হরেন কিন্তু আমার কথার কান না দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, “আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের, সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

সরস্বতী হচ্ছেন ত্রীলোক; অথচ এই ত্রী-জাতিতেই লক্ষ নিয়ে আমাদের মেয়েরা যদি বেশী লেখাপড়া আর নাচ-গান-বালনা শেখেন, তাহলে স্ত্রুই যে মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তা নয়; সেই সঙ্গে তাঁরা গেরস্থালীর স্বাক্ষকর্ম ছেড়ে দেবেন, স্বামীর অবাধ্য হবেন, সতীত্বের মহিমা খর্ব করে' বসবেন! ওঃ, কি অপূর্ণ বৃত্তি! অতএব বিয়ে যদি করতে চাও, তবে চোখ থাকতেও কাপা, মুখ থাকতেও বোবা, প্রাণ থাকতেও জীবমৃত,—এমন-একটি অন্ধকারের জড়সড় স্ত্রী-জাতির জীবকে, চৌরী কাপড়ে মোড়ো জীবন্ত পার্শেলের মত ঘরে তুলে আনো! আমি দিবা গেলে বলতে পারি, তিনি সতী না হয়ে যাবেন না! সতীত্বের আমার শ্রদ্ধা আর কাকুর চেরে কম না—কিন্তু এসব কৃত্রিম সতীর পায়ে দূর থেকেই আমি গড় করছি।”

হরেনের কথা আমারই মনের কথা। তবু, তাকে চটাবার মংলাবে আমি বম্বম, “সতীকে কৃত্রিম বলা! ওহে পাবণ্ড, তোমার জীভ যে এখনি খসে পড়বে!”

হরেন তার দুখানা বলিষ্ঠ ও চাটালো হাতে আমার ঘ-কাঁধ ধরে পূব কোরে বঁাকানি দিয়ে বললে, “কিন্তু দতদিন জীভ না ধসছে, এই কথাই বলব! মোহন, তুমি কি জাননা যে অশিক্ষিত ত্রীলোকরা যা করে, তা স্ত্রু অন্ধবিশ্বাসের কোরে? একবার কোনরকমে যদি এই অন্ধবিশ্বাস টলানো যায়, তাহলে আর তাদের বঁচোয়া নেই। কিন্তু, যে রমণী বিহীন—যিনি বাইরের লগ্নভের সঙ্গে পরিচিত, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি বেশ সচেতন থাকে,—এ সচেতনতা

অকস্মিকতার মধ্যে নেই; তাই বিধবা আর স্বাধীন রমণীর চেয়ে মূৰ্খ পর্দানশীন স্ত্রীলোকের পক্ষে পতনের ভয় আছে পনেরোজানা। সেইজন্যেই এসের সতীত্বকে আমি বলি কৃত্রিম। হোতে পারে আমি ভ্রান্ত;—কিন্তু আমার এই মত।”

আমি তেমনি কৌতুকভরে বললুম, “হরেন, তুমি কি গানের জোরে তোমার এই অদ্ভুত মত প্রতিষ্ঠা করতে চাও?”

আমার মুখের সামনে তার হৃৎস্পন্দ মুগ্ধিত করে, হরেন মাথা তুলে তুচ্ছ-কুঁচকে বললে, “আঃ, তা যদি পারতুম মোহন! তাহলে মেথিরে দিতুম!”

ভক্তের সময় হরেনকে চটিয়ে নিলে, তার মুখের কথা ও হাতের ঘূষি এক-সঙ্গে চলবার সম্ভাবনা আছে; এইজন্যে তার বিপক্ষে তর্ক করা নিরাপদ ছিল না। তাকে আর বেশী খঁচানো ঠিক নয় বুঝে আমি বললুম, “হরেন, ব্যতাসের সঙ্গে বুকে লাভ নেই; নাও, একটা সিগারেট খেয়ে লাভ হও।”

হরেন খানিকক্ষণ গুচ্ছ হয়ে বসে বসে সিগারেটের ধূমপান করতে লাগল। এবং ঘন ঘন করে কটা টানে ছ-বণ্ডেই লম্বা সিগারেটটা ভস্ম ও ঘরখানা ধূমপূর্ণ করে সে বললে, “মুন্সারিবাবুর ধবর কি হে মোহন?”

—“ভাল।”

—“ভাখ মোহন, সরমাকে-বাতে বিবাহ করতে পার সে-বিষয়ে চেষ্টার জট কোরো না। সরমার মত রূপে-গুণে নিখুঁত স্ত্রী লাভ হওয়া ভাগ্যের কথা। বুকেছ?”

এই বলে সে আমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি সকালে মুন্সারিবাবুর বাড়ীতে গিয়ে কী দেখলুম!

সরমা বিছানার পড়ে বিলম্বভাবে কান্নাচ্ছে! প্রথমটা সে আমাকে দেখতে পার নি; আমিও, সে জানতে পারবার আগেই চলে আসব ভেবেছিলাম—কিন্তু তাকে কান্নাতে দেখে আমি যেন কেমন-একরকম হয়ে গেলুম—ঠিক সম্বরটিতে সরে আসতে পারলুম না। আমাকে সে সেখে ফেললে। দেখেই আমার দিকে সম্বর ভাবে পিছন ফিরে জড়সড় হয়ে বসল। আমিও আর দাঁড়ালুম না।

সরমা কান্নাচ্ছে কেন? যেদিন থেকে তাকে দেখেছি—হাস্তময়ী, লীলাময়ী নৃত্যিতেই দেখেছি—এমন অশ্রু-সজল বিষম প্রতিমা রূপে ত কখনো দেখিনি! ইদানীং তাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গাঢ় হয়ে উঠেছিল, মুন্সারিবাবু আমাকে পুত্রের মত বোহ ক'তেন,—সেও আমার সামনে বোটার, আমার সঙ্গে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কথা কর, আমার গান শোনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তার মনের মধ্যে ছুঁখের আগুন যে এমন তুহানলের মত থিকি-থিকি জ্বলছে, সে যে প্রাণের কান্না মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেছে, তা ত আমি বুঝতে পারি-নি।

হায়, এ বাঙ্গলাদেশের ঘরে-ঘরে বালিকা বিধবা, তাদের সকলেরই কদম ত এমনি আগুন-পোড়ানো কটাহের মত তপ্ত! পুরুষ স্বাধীন, তাই নিষেধ হুঁজিয়া সে উচ্চকণ্ঠে সমাজে ঘোষণা করতে পারে; তার এই আন্দোলনের শক্তি আছে বলতেই,

আপনার ছোটখাট হুঃখও পুরুষ পুত্রের নিতে পারে। আমাদের সমাজে কিন্তু নারী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত; তাই বুক ফাটলেও তার মুখ কোটে না—নিজের হতভাগ্যের চাপে সে নিজেই হুঃখ পড়ে, মনের হুঃখ পে মনেই চেপে রাখে! তাই ত আমার মনে হয়, এমন সমাজে শ্রুণু উদার ও নবীন পুরুষ আত্মপ্রকাশ করলেই চলেবে না;—সেই সঙ্গে চাই বিদ্রোহী নারীর দলকেও—অভ্যর্থকের বিরুদ্ধে, পুরুষের বৈজ্ঞানিকতার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধযোযা করতে পারবে!

রাত্রিবেলা নীচের ঘরে বসে, এতদ্ভে স্বরগ্রাম সাধছি, এমনসময়ে ব্যস্তদমণ্ড হয়ে আশুখানু খেণে মুরারিবাণু এসে হামির।

তাকে এমন অসময়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে এতদ্ভটি নামিরে রাখলুম।

মুরারিবাণু বললেন, “বাবা, বড় বিপদ!”

—“বিপদ! কি হয়েছে?”

—“সন্তোর ভগ্নানক অর!”

তখন উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি মুরারি-বাণুর বাড়ীতে গেলুম।

পা-থেকে মাথা-পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে সরমা গুয়ে আছে। মুরারিবাণু আলো নিরে ঘরের মাথার কাছে গাড়ালেন।

সরমার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে আমি বললুম, “আপনি মুখটা একবার খুলুন ত!”

আমার গলা শুনেই, সেই অরের ঘোরের সরমা চমকে উঠল!

আমি আবার মুখ খুলতে বললুম।

সরমা সাড়াশব্দ কিছুই দিলে না—মুখও খুলে না। বোধ হয় লজ্জায়।

—“আজ্ঞা, মুখ না খোলেন, হাতটা একবার বার করুন দেখি।”

সরমার গায়ের চামেরখানা নড়ে উঠল। মনে হোল, হাত বার করা দূরের কথা, সে যেন তার হাত-ছাথানিকে বুকের আরো কাছে গুটিয়ে নিলে!

মুরারিবাণু বললেন, “সন্তো, যোহনকে লজ্জা কি মা? নে, হাত রাখা!”

কাপড়ের ভিতর থেকে স্তত্যন্ত জড়সড় ভাবে আঙুল-আঙুলে সরমার একখানি শুভ্র হাত বেরল। সে হাত ছুঁতেই কেন জানিনা, আমার গা-টা যেন কেমন করতে লাগল! সরমার হাতও ধরুখন্দ করে কাঁপছিল—অর কি সঙ্কোচে, বুকলুম না!

অরের মাঝাটা বড় বেশী বলে মনে হোল। বাড়ীতে গিয়ে তখনই আমার চেনা এক ভাল ডাক্তারকে ‘টেলিফোনে’ ডাকলুম।

ডাক্তার এসে সরমাকে পরীক্ষা করলেন। বললেন, “ভয় নেই। সামান্য অর, শীঘ্রই সেয়ে যাবে।”

ডাক্তারের কাছে সরমা কোনরকম লজ্জা-সঙ্কোচ করলে না—অথচ, আমার কাছে তার মুখ খুলতে, হাত গাথতে স্তত্য আপত্তি কেন?

ডাক্তার ভুল বুঝছিলেন,—সরমার অস্থ কমন না, বরং বেড়ে উঠল।

মুরারিবাণু ত ঠিক বালকের মত অধীর হয়ে পড়লেন—মুখখানি কাতুর করে থাকেন, কথা-কথার কৈদে কেলেন। তাঁর কাছে থেকে কোন সাহায্য পাওয়া দূরের কথা—রোগীর চেয়ে তাকে নির্যেই বেশী বিব্রত হয়ে পড়লুম।

হরেন বখনি সময় পেত—আসত। সে দুয়ারিবাবুকে যত বোঝায়, তিনি ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কীদো-কীদো বুঝে সেদিন তিনি বললেন, “হরেনবাবু, জানেন না, এ যে আমার অনাথা মেয়ে! ওকে নিয়েই বেঁচে আছি—ওর এ কি হোল! সেদিন ওকে বিয়ের কথা বলেছিলুম বলেই বুঝি যা আমার তেবে-তেবে এমন কাল জর ডেকে আনলে! হায় হায়, জরন কাজ কেন করতে করেছিলুম!”

হরেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আবার বুকের দিকে চাইলে। আমার বুকটা যেন ধড়াসু করে উঠল! দুয়ারিবাবু বিয়ের কথা তোলাতেই গুঁড়াবনার সরমার জর এসেছে? তবে কি সরমার আর বিবাহে মত, নেই?

সরমা এক-দিন জ্বরের ঘোরে একেবারে বেহঁস হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে যা তা ভুলও বকছে। জর ক্রমে বিকারে গাড়িয়ে গেছে।

আমি আজ তিন রাত ভাল করে ঘুমোতে পারিনি—দিন-রাত হতজ্ঞান শরীর ব্যথায় রোগীর বিছানার পাশে ঠায় বসে থেকেছি। দুয়ারিবাবু ত একরকম কাজের বাইরে বললেই হয়; রোগীর সেবা-তত্প্রাণ ওষুধ-খণ্ডদানো সব আমাকেই করতে হয়েছে। সামান্ত যেটুকু সময় আমি থাকতে পারতুম না—হরেন এসে আমার জায়গার বসত।

নিশ্চিন্ত রাতে আমি আর দুয়ারিবাবু রোগীর বিছানার পাশে বসে আছি। একটা টুলের উপর ‘রিডিং-গ্যাম্প’টা জলছে।

রোগীর গতিক আজ-একটু ভাল। ভয়ের অবস্থা কেটে গেছে।

আমি বললুম, “দুয়ারিবাবু, আজ আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।”

“কি আশ্চর্য, সে কি হয় বাবা? বাপ হয়ে আমি ঘুমোব—আর তুমি জেগে থাকবে? তার চেয়ে তুমি বরং ঘুমিয়ে নাও।”

—“বেশ ত, শেষ রাত্রে আমি ঘুমোব এখন, এখন আপনার পাশা। আজ আর কোন ভয় নেই—মিছামিছি দুজনেরই মেসে থেকে কি হবে?”

দুয়ারিবাবু হঠাৎ উজ্জ্বলিত হয়ে আমার হাত ধরে বললেন, “বাবা, আর-জন্মে তুমি আমার কে ছিলে, জানি না! সরমার জন্তে তুমি যা করলে, আমার ছেলে থাকলে সেও হয়ত এমন করে করতে পারত না! মেহ, ভালবাসা, বহু দিবে তুমি যে আমাকে বড় নরক বীথনে বেঁধে রাখলে বাবা!”

দুয়ারিবাবু ত জানেন না, সরমা আমার কে! আমার এই যন্ত্রের মধ্যে তিনি শুধু আমার পরোপকারের প্রবৃত্তি দেখছেন! কিন্তু শুধু পরোপকারের প্রবৃত্তি নিয়ে আমি কি এতটা করতে পারতুম! তা ত নয়! সরমার ভাল-মন্দের সঙ্গে এখন যে আমার অদৃষ্ট এক হুতোয় গাঁথা! আমি যা করছি, এ ত আমার স্বার্থপর প্রাণের টানেই করছি!

কিন্তু এসব মনের কথা ত বুঝ মুটে বলবার মত নয়! উঠে, বাইরের বাঁধা বুলি দিয়ে মনের কথা ঢেকে রাখতে হবে। কাজেই, দুয়ারিবাবুর জবাবে আমি বললুম, “এসব কথা কেন দুয়ারিবাবু! মাথার

আপন্থে-বিপদে মাহুযই সাহায্য করে' থাকে !
যান, আপনি এখন যুগ্মেন গে যান !"

আরও খানিক ইতস্তত করে' দু'রাতি-
বাবু শেখটা অনিচ্ছাসহেও উঠে সেই ঘরেই
এককোণে বিছানা পেতে গুয়ে পড়লেন।

আমি আলোর কাছে বসে বসে এক-
খানা বই পড়তে লাগলুম।

খানিক পরে হড়িতে টং-করে' একটা
বাজল। মুখ তুলে দেখি, সরমা বিছানার
উপরে উদ্ভূত করছে।

তার দিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ সে
কৌণস্বরে বললে, "একটু জল।"

জলের গেলস নিয়ে তার হাতে গিলুম।
সে জল খেয়ে আবার চোখ মুখলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন কেমন
আছেন ?"

আলোটা আমার পিছনে ছিল বলে
জল সেবার সময়ে সরমা আমাকে চিনতে
পারে-নি। কিন্তু এখন আমার কণ্ঠস্বর
শুনে সে সচমকে চোখ চাইলে; তার
পর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হরে আমার দিকে
ঠিক ভীত হরিণীর মত জন্তু নেড়ে
তাকিয়ে রইল—তার সে দৃষ্টি থেকে আমিও
আমার দৃষ্টি কিরিয়ে নিতে পারলুম না।

অনেকক্ষণ পরে একটা চৌক গিলে
সে হৃৎস্বরে বলে উঠল, "আপনি !"

আমি কোন জবাব দিলুম না।

একটু হুপ করে' থেকে সে আবার
জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা কোথায় ?"

—"তিনি ঐ বে গুয়ে-গুয়ে ঘুমোচ্ছেন—
এ ক-বিন দুর্ভাবনার তাঁর চোখে ত নিদ্রা
ছিল না !"

সরমা শুকু হরে চোখ মুখে গুয়ে রইল।
যেখলুম জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়তে তার
বুকটি তুলে-তুলে উঠছে !

কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কেটে বাবার পর,
কি ভেবে সরমা আবার বললে, "মোহনবাবু,
আপনি এখনো জেগে আছেন কেন ?"

কি করে বলব, কেন জেগে আছি ?
সরমা কি আজও তা বুঝতে পারে-নি !—
আমি তার মুখের পরে চোখ রেখে বললুম,
"আপনাকে দ্ব্যধবার জন্তে কাছে সর্জনাই
একজন লোক থাকার দরকার।"

সরমা ঘাড় নেড়ে বললে, "না, কোন
দরকার নেই !"

—"আপনি জানেন না, এ ডাক্তারের
হুকুম !"

—"তবে বাবাকে তুলে দিয়ে আপনি
বাড়ী যান।"

—"আহা, আজ উনি একটু নিশ্চিত
হয়ে গিয়েছেন, শুঁকে কি জাগানো উচিত ?"

—"তবে আমার জন্তে কান্নার জেগে
থাকবার দরকার নেই। আপনি যান।"

সরমার নীরস স্বর শুনে যেন হোল,
আমি এখানে থাকতে সে যেন খুশী নয় !
তবু, তাকে বুঝাবার জন্তে আমি বললুম,
"আপনি এখনি অত কথা কইবেন না,
তাহলে অসুখ বাড়বে। আপনার অসুখ হয়ে-
পর্যন্ত আমি এখানে আছি, আজকের রাতটা
কাটলেই আমাকে আর দরকার হবে
না।"

তিক্ত স্বরে সে বলে উঠল,—"কে
আপনাকে এখানে থাকতে বলছে ?
আপনি যান না !"

সরমার কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। কেন সে আমাকে ডাড়াতে চায়?

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সরমা আবার বললে, “আপনি এখনো গেলেন না! যান!”

নিম্নের শরীরের নানা ভুলে, দিনের বিশ্রামে রাতের নিদ্রা ভুলে, পৃথিবীর সব কথা ভুলে আমি যে তার এত সেবা করছি,

এই কি তার পুরস্কার! আজ সে আমার মুখের উপরে, আমাকে ঘর থেকে দূর করে’ দিতে চায়! তার কিছু কথাই, অস্ত্রায় ব্যবহারে, আমারও মন অপমানে, অভিমানে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল; কিন্তু আপনাকে সামলে নিরে সেখান থেকে আমি তখনই বাইরে বেরিয়ে এলুম।

ক্রমণ

ঐশ্বৰ্য্যকুমার রায়

ছিটে-ফোঁটা

“ছবিটা ছবির মত হওয়া উচিত” এই সহজ কথাটি আমাদের বড়ই হেঁচালির মত ভনতে চলে এবং এর যোগাঙ্গ হওয়াও বড়ই শক্ত হয়ে ওঠে। আমরা এখন চাই ছবির ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম-তত্ত্ব ও বিবিধ প্রকারের গভীর গবেষণা। এককথায় আমরা চাই ছবিটি বিবিধ জ্ঞান-ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হবে এবং তার ভাণ্ডারী হবেন শিল্পী। কিন্তু এটা জানা উচিত, হুকুমার কলা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁথি বা ধর নয়, এটি ঠিক ফুলেরই মত। ফুল যখন ফোটে তখন সে অকারণ পুষ্পকেই ফুটে ওঠে, কিন্তু তার পিছনে অলঙ্কিতে যখন কলের-স্পষ্ট হয় তখন সে কোথায় স্বরে পড়ে তার ঠিকানা নেই। আজ র্যাকেলের, মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে আমরা যে বিশ্বমাতার রূপ দেখতে পাই, সেটা র্যাকেলের কাছে বিশ্বমাতারূপেই যে প্রকাশ পেরেছিল তা বলা যায় না।

তিনি এঁকে গেছেন একটি মায়ের সাদা-সিঁধে রূপ, এখন সেই মাতৃমূর্ত্তি বিশ্বমাতার পরিণত হয়েছে। শিল্পীরা আঁকবে, গড়বে, সৃষ্টি করবে; তাতে তত্ত্বকথা বুঁজে পাওয়া যায় কি না তা তাদের জানবার কোনই আবশ্যক নেই! সে ছবিকে ছবির মত করেই আঁকবে, মূর্ত্তিকে মূর্ত্তির মত করেই গড়বে, এবং সেইটেই তার সাধনা।

• •

ছবিতে যে ছন্দ (Rhythm) আছে, গাছপালার ভিতর, তাদের খেয়াল-পুঁতির মধ্যেও সেইটি বর্তমান। প্রকৃতির মধ্যে নানান বস্তুতে যে ছাঁদটা পাওয়া যায় সেইটে থেকে আমরা ছবির ছাঁদের তাৎপর্য্য যে কি, তা বেশ বুঝতে পারি। ধরন্তীর শোভার মধ্যে এইরকম ছাঁদ না থাকলে যেমন সেটা হুশোভন হতোনা, তেমনি চিত্রশিল্পে

এই ছন্দটি না বন্ধার রাখলে ছন্দহীন কবিতার মতই তা বার্থ হয়ে পড়ে। শিল্পী প্রকৃতির এই দীর্ঘায়িত ছন্দ থেকে তার ছবির স্নিগ্ধতা (back ground) স্থল্লর স্নন্দর ছাঁদের আদর (Sketch) আঁকা লিখতে পারেন। শিল্পীর পক্ষে তাই আঁকতে আঁকার চেয়ে দেখতে আঁকার প্রয়োজন অনেক বেশী।

• •

চিকিৎসকের অস্ত্রচালনার দ্বারা রোগীর রোগ-নিরাকরণের যে আনন্দ, বোদ্ধার অসি-আক্ষালনের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভের যে আনন্দ, শিল্পীর তুলির টানের ভিতরও সেই একই ধ্বনি বর্তমান; কেবল তাতে পূর্বোক্তগুলির মত কোন কলগাতের আশা থাকেনা—সেটা ছেলের মায়ের প্রতি এবং মায়ের ছেলের প্রতি প্রীতির মতই আপনা-আপনি জয়লাভ করে। আসলে শিল্পীর কণা হওয়া উচিত “না কলেশু কথ্যচন।”

• •

ভারতের আধুনিক অধিবাসী কোলদের মধ্যে মালার নামে একটা জাত আছে, তারা পিতৃ-কীসার কাজ করে। তাদের পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, তারা গোড়ার কোলদের স্বজাতি ছিল। বহুকালপূর্বে কোন-একটি কোল-পরিবারে চার ভাই বাস করত। চাষবাস করেই তাদের দিন কাটত। এখন, একদিন তারা চার ভাই ক্ষেতে হাল দিচ্ছে,

এমনসময় ছোট ভাইটি হঠাৎ লাঙ্গল ছেড়ে সেইখানেই মাটিতে বসে পড়ল আর তার খানিক পরেই ক্ষেতের চান নরম মাটি দিয়ে একটা ছাঁচ তৈরি করে ফেললে। তাতে তার অল্প তিন ভাই তারি চটে গেল। তারা তাকে “কুড়ে” “নিষ্কর্ম্মা” প্রকৃতি বলে অজস্র গালিবর্ষণ করতে লাগল। সে কিছু কোন কথা কানে না নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। শেষে তিন ভাই পরামর্শ করলে, ছোট ভাইকে তারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। তারা লাঙ্গল মেওয়া শেষ করে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখলে, তাদের ছোট ভাই যে মাটির ছাঁচ তৈরি করেছিল, তাতে লিভল গালিরে ঢালাই করে একটা চমৎকার ‘পরলা’ (ধান মাপবার পাত্র) তৈরি করেছে। তারা পরলাটার চমৎকার কাকাকারী দেখে এত খুসি হয়ে গেল যে, তারা তখন ছোট ভাইটিকে উৎসাহ দিয়ে বলে, “আজ থেকে তুমি বসে বসে এই নতুন কাজই করবি আর আমরা চাষবাস করে তোকে খাওয়াব।” প্রবাদ এই, সেই ছোট ভাইয়ের বংশধরেরাই ‘মালার’ অর্থাৎ কোলদের কীসারী নামে খ্যাত। অসত্য কোলদের মধ্যে এই হুশিয়ারি আবির্ভাব ও সম্মানের গরুটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষের কাছে ললিতকলা খুব-একটা আদরের বস্তু; কেননা সেরা তাদের মনের খাতি খোঁচায়। মনের খাতির স্নেহে লালিত হইয়া মানুষেই; আর বেহের খাতির অনো ব্যাকুল, পণ্ডতে।

ঐনিসিতকুমার হালদার।

বিচার-বিবেচনা

ভগবান সকলেরি বটে, তবে তিনি আবার এতোকেরি! এতোক হুতাটির উপর দৃষ্টি না দিলে, তাকে অথও না রাখিলে—কিধা ছিঁড়ে গেলে গিট না দিলে, কাপড় যেমন সমগ্র হয় না, যে কাপড় বোনে সে যেমন এতোক হুতাটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে সমগ্র কাপড়খানি সম্পূর্ণ করে তোলে, ঐশ্বরকেও প্রতিটি মানবজীবনের সম্বন্ধে তাই করতে হয়। তিনি আমাদেরও গড়েছেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও সৃষ্টি করেছেন সত্যি, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন কোনো বোঝাপড়া নেই যে, আমাদের ছিঁড়েখুঁড়ে, টুকরো-টুকরো করে, মলে পিবে তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ডেরি উপকার করবেন। আমার মন, আমার বেহুস্তি, আমার আত্মা একান্ত আকাখা, অতৃপ্তি থাকিছু, তিনিই আমার মধ্যে দিয়েছেন, তার সবই বার্ষ করে ধেবেন? মাহুয়ের জীবনে যদি অস্বাভাবিক হুঃখই বেধা যায়, অদ্বুত ঘটনাচক্রে আবর্তনে সে যদি কেবলি বিব্রত হতেই থাকে, অথচ সবই বাহির হতে আসে—তার ত্রেটার স্বপ্নে গড়ে ওঠে—তাহলে কেমন করে স্বীকার করি বিশ্ব-ব্যাপার করুণার সৃষ্টি, জ্ঞানের পরিচালনা? তাহলে যে পা রাখবার ঠাই কোথাও পাওয়া যায়না, খুঁপি হাওয়ায় ঘুরে, মরতে হয়। যেমন দিনরাত্রি হাত-ধরাধরি করে আসে, হুঃখ সাধনা, বিপদ আর আশ্বাস,

অসহ্য উত্তাপের পর বর্ষা, নিরন্তর বর্ষণের পর নিরাময় প্রসন্ন আকাশকে আসতেই হয়। হৃদ্বিনের অবসানে আলো আসতেই হবে। এই ন্যায়ের তুলনাও চলছে—কাঁটার-কাঁটার মাথ ঠিক হচ্ছে না, একে ঠিক হতেই হবে। বিশ্ববিধাতা আপন সত্যে আপনি বাধা। তিনিই আমাদের মনের মধ্যে মাথকাটি রেখে দিয়েছেন, হিসাব ঠিক করে তাকে দিতেই হবে—তবে ত মন মেনে নেবে!

• •

মনে যখন কোনো ভার থাকে না, আশা ও আলোর আশ্বাস জীবনের চারিদিকে, তখন একদিন হুদিন কেন, মাদ বৎসরও দীর্ঘ সময় মনে হয় না। কিন্তু জীবন যখন হুঃখভারগ্রস্ত, প্রতিমূহূর্তই অনিশ্চিত, সমগ্রই অন্ধকার, প্রতিপদক্ষেপে যখন হাতড়ে চলতে হয় তখন একটি দিনও কত ভয়ানক দীর্ঘ মনে হয়। মনের মধ্যে দীর্ঘতার ভার ক্রমে বিপুল হয়ে ওঠে, সম্মুখে আর কিছু থাকে না! ফাঁসীর আসানী যেমন অবশিষ্ট দিন-কয়টা কোনো রকমে কাটায়, তেহি আর কি! প্রভেদ এই যে, সে নিশ্চিত জানে, তার শেষ হবে!

• •

জীবনে সত্যের সম্মুখে সুখোমুখি থাকা মনে বড় কঠিন ব্যাপার। সত্যি, অথ হুঃখ বেচ

বড় ভীত, বড়ই ভীত,—একেবারে মনঃস্থব !
 শেল বিঁধেই আছে, বেধনার সমস্ত জীবন
 জর্জর হয়ে যাচ্ছে, তবু এ শেল তুলে
 নেবার কেউ নেই, এ কত-স্থানে প্রলেপ
 দেবার মত ঔষধ পুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
 যে পরমধনের স্তোত্র দেখমনের প্রত্যেক
 অণু পরমাণু ব্যাকুল হয়ে কানড়ে, তাঁকে
 পেতে হবে, নয় ত মরতে হবে ! প্রথমটি
 পরমানন্দ, তা যদি ঘটে তবে জীবনে
 সমস্ত হঃখের পরিপূর্ণ প্রতিকার হয়ে উপরি
 পাওয়া যায় ; আর তা যদি না হয় তবে
 মৃত্যু ত পরামুক্তি—দব জ্বালা জুড়িয়ে যায়,
 দিনের পর দিন এই চরুহ ভার, অন্ধ
 দৃষ্টি নিয়ে বহুত্ব পথে হাতড়ে, হ'ট খেয়ে
 চলতে হয় না। তবে ত বিরাম, শান্তি,
 স্বপুষ্টি ।

কারো-কারো মনের মধ্যেকার প্রবণ
 ও দৃষ্টি শক্তির কি গোল থাকে, কাছের
 সম্বন্ধের জিনিষ, বাক্য ও সঙ্গীত কেমন
 বেশ ডিঙিয়ে চলে যায়। এ তার ইচ্ছাধীন
 নয়, হয়ে পড়ে ! কিছুতেই মনের শান্তি
 অর্জন করিতে পারে না, কেবলি বোধ
 করে কি-একটা ফ্রিট রয়েছে গেল ! তাই
 তাদের কুলও খুব বড়, ভাল ও অত্যন্ত
 বেশী। ঠিক বত হুঁহু আর যেমনটি হলে
 সব বেশ সামঞ্জস্য করে নেওয়া যায়,
 তেমনটি তার কিছুতেই মনে ধরে না।
 একেবারে চরম চরমপন্থী ! তাই কেবলি
 কষ্ট পায়, প্রতিকার করতে পারে না। যে
 প্রদীপটি আললেই সব অন্ধকার ঘোচে, সে

অপূর্ণ দীপ জ্বালা আর হয়ই না। তেল
 ছোটো ত বস্তি নাই ; বস্তি জুটল, তবে যে দীপ-
 শলাকা দিয়ে তাকে উদ্ভূত করবে, বুকের
 আঁচলে ঘিরে নিরে পথ চলবে, সেই আলো
 বুঁজেই পাচ্ছে না, পাওয়াই চর্যট ! পাওয়া
 যে দৈবাধীন ! বেওয়া মাহুয নিজের সখল
 হ'তেই দিতে পারে ।

তবে জীবনে দৈবই কি বলবত্তর ?
 যার উপর কোনোই হাত নাই, সেইখান
 হতেই কি নির্ধম আঘাত, অসহ বহুবোধনা
 এসে উপস্থিত হয় ? সেদিনে যে-কথাটি
 গুলেছিলাম সেটি খুব ঠিক ! ঈশ্বর, নির্দোষ
 মায়ের মত, ছেলেকে শুধু লুপাই বোগান্ না,
 কেবলি আঘাতে রাখবার স্তোত্রই বাস্তব ন'ন !
 মঙ্গলনর বলেই তিনি অত্যন্ত কঠোর, তাঁর
 দয়া যেমন অপার, তাঁর শাসনও তেমনি
 অমোঘ ! তবে ঐটুকু বোঝা কঠিন হয় যে
 মাহুযের দুর্দল শক্তির পক্ষে এমন দুর্দল
 প্রলোভনের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে তার
 পর যদি সে জুলই করে, তখন তাকে
 এমনতর বহুগা কেন সেওয়া হয় ? সেই
 প্রলোভনই বড় ভয়ানক, যখন মন ঠিক কিছুই
 বুঝতে পারে না, যখন সরল পথ যে কোথায়
 তা মাহুয স্পষ্ট দেখতে পায় না। হঃখ দেখে
 তা দূর করবার স্তোত্র ব্যাকুল হয়ে যা করে
 বসে, তা শুধু স্রাস্তি ! তার কলে অধিকতর
 হঃখই যখন, হয়, তখন সে অবাক হয়ে
 ভাবে, এ কি হল ? কেবলি অহুশোচনীয়
 স্রিষ্ট হতে থাকে, প্রতিকার আর তার
 শক্তিদায়িত্বের মধ্যে থাকে না। বত ভাবা
 যায়, ততই মনে হয় বিধা, দুর্দলতাই
 মাহুযের • সব-চেয়ে বড় ছর্ভাগ্য। যে-মাহুয

এবল নির্ভীকভাবে ভাল হক্ মন্ড হক্, যা তার প্রাণ চাও, তাই করে, তার যেন গতিবৃত্তি আছে, সে আপনার চারিদিকের ভাল ছিন্ন করে, সম্মুখের পথে চলতে পারে। কিন্তু যে হতভাগ্য কেবলি বিধায় আন্দোলিত, শুধুই বাব-কি-যাবনা ভাবনাধ এক পা অগ্রসর হতে পারে না, সে নিজের গতি করতে অক্ষম, অপরের উন্নতির বাধা। 'হেঁথো মারলে সয়' বলে একটা কথা আছে। সেটা ঠিক নয়;—সয়না। বাধা বহন বেশীই হয়। তবু যার বাধনটুকু খোলবার উত্তম পৰ্য্যন্ত নেই, তার পক্ষে বাধার বিধানই চরম বিধান। যে পাড়ে-পাড়ে লাধি-ভাঁতোই থাকে আর বলবে—ভগবানের ইচ্ছা, ভগবান তার সহায় হন না। যে উঠে দাঁড়াবার অস্তে, উঠে বসে; তাকেই তিনি আপন হাত বাড়িয়ে দেন। মনোবৃত্তি যার সমাপ্ত, যে খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, শুধু গোম্বিলির আলো-ছায়ার গোলকধাঁধার ঘূর্ণপাক ঘেয়ে মরে না, সেই সৌভাগ্যবান। কারো-কারো মনশুদ্ধি বোধ হয় অসম্ভাবিক,—কতক খুব ভাল দেখতে পায়, আবার কতক কিছুই দেখে না। দূরের অনেক জিনিস খুব পরিষ্কারই দেখে আর ঠিক বেটা হাতের কাছে আছে, তাই হাতড়ে মরে।

• •

ডেবে দেখলে এই কথাই ঠিক মনে হয়, এ পৃথিবী, Survival of the fittest —বোগাতমের স্বাধীনতার নিয়মেই চলছে। এবলের প্রাধান্যই স্বার্থ। সুস্থস্বাস্থ্য স্বার্থ-ভাবী, সুস্থমন কর্তব্যম,—আত্মরক্ষার স্বার্থ।

উভয়েই প্রাণসার, স্বয়ংসার সম্ভাবনা কম। যার এ দুয়ের অসম্ভাব, সে যে মৃত্যুক্ষতিগ্রস্ত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

• •

অজ্ঞানই হুঃখের মূল কারণ। ছোট ছেলে জানে না, আগুনে হাত দিলে পুড়ে যায়। সে স্বস্তির নির্মূল উদ্ভল বলিবিধায় আন্দোলিত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখে আনন্দে তাকে ছুঁতে জড়িয়ে ধরে। আলা বহুলা ছাড়া আর-কিছুই সে তার হাতের মধ্যে পায় না! মারীচ, সোনার মাহারিণ, সীতার চিরহুঃখের সূচনা করেছিল—মাহা-মুগের চাঁতটীতে প্রিয়কর্তব্যের ব্যাকুল আহ্বানব্রমে সাক্ষাৎ সঙ্গীতরূপিণীও বন্দীও বিচ্ছেদহুঃখের আরম্ভাধীন হয়েছিলেন।

• •

পাপ পুণ্য কি? আমার মনে হয় অপরকে হুঃখ-দেওয়াই পাপ! যা আমরা জেনে-জেনে করি, ইচ্ছে-করে কামি-করে অপরের মন্দ হবে জেনেও করি, সেইটে বেশী অভ্যাস! মাহু ব্রিধায় পড়ে যেটা করে,—কতকটা না বোঝবার নরুন, কতকটা অহঙ্কারবশতঃ জ্ঞাত হলে,—তাঁরা শান্তিও হওয়া সম্ভব, কিন্তু সে শান্তি যেন একেবারে প্রাণ-মাহা বিধান না হ'য়ে বসে!

ভুল কি,—না অনিয়ম! তাহলেই কেমন কষ্ট পেতে হয়, গতির বাধা ঘটে, বিভিন্ন স্বাভাবিক হয়, তাই হুঃখও এসে পড়ে। এ পৃথিবীতে সবাই সবাইকে বাঁচিয়ে চলবে এই হচ্ছে আসল কথা। কেমন-করে এই

বাঁচানো ব্যাপার হতে পারে সেইটে বোকা
কঠিন। “চাচা আপন বাঁচা” করলেই কি সব
কর্তব্য পালন করা হয়? আঁচড়টি লাগলনা,
দ্বিবি আরাধে গারে হুঁমিরে চললাম, তবেই
কি সব ভাল হল? ইংরাজীতে বাক
goodly goodly বলে তাই কি জীবনের
আদর্শ? মানুষ এম্বিভাবে চারিদিক দিয়ে
দশের সঙ্গে জড়িত যে একের মাথার যে
আবাঁতটা পড়ে, সেটা অপরকেও বাজে।
নিজেকে বাঁচাতে হলে অপরের জীবনে
অনধিকার চর্চা করা সম্ভব নয়। নিজের বাঁচা-
বাঁচা যদি গণ্ডী পেরিয়ে না যায় তবেই অপর
কতিগ্রস্ত হয় না। সাম্যরক্ষাই জীবনের
মূলমন্ত্র। কিন্তু এটাও তো দেখতে পাই
বিষমতাই অনেক স্থলে, মুক্তি, স্বাধীনতার
সহায়। লোকে বলে golden mean—
কিন্তু মধ্যপথ কতকগুলি বিষয়ের একে-
বারেই নেই। সত্যের সঙ্গে সর্ভকরা চলনা,
আর মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি করতে বাওয়া
বিড়ম্বনা। সত্যকে একেবারে সমগ্রভাবে
গ্রহণ করতে হয়,—রাজপুত্র-রমণীরা যেমন
করে জহরব্রত পালন কর্তেন। আর মিথ্যাকে

সম্পূর্ণ বর্জন না করলে গতি কোথায়?
খাঁটি কে যোজে? রংচঙে মিথ্যা বড়
চমৎকার, তাকে কতরকমে পাওয়া যায়,—
একেবারে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু! কিন্তু যার এ
মোহ কেটে গিয়েছে, পরিষ্কার আলোতে
যে হুস্পষ্ট দেখতে পেরেছে, জীবন কি,
তার পক্ষে এমন অবাঁহবের মধ্যে
সামঞ্জস্য রাখা যে অসম্ভব! বা অসম্ভব
তা সম্ভব হয় না এই মন্ত ভরসা! গতি
মুক্তি হতেই হয়। মনের সমুখ হতে এক
ছাড়া সবই মুছে যায়। সেই এককে, সত্যকে
বরণ করতে হয়, তার অন্তে হুঃখকে গ্রহণ
করতে হয়, তবেই জীবনের কোনো সাক্ষ্য
যদি আসে। তখন দ্বিধা, দো-মনা করার
সময় থাকে না। ভগবান শুধু হুঃখই দেন,
সে হুঃখও নিঃফল—এ কখনো হয় না।
জীবনের সন্ধিক্ষণের রংসা নিরাকরণ হয়।
দৃষ্টি আসে, প্রবণ-সক্তি প্রবর হয়, লক্ষ্য
হুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আশেপাশ পরিষ্কার শোনা
যায়, জীবনের গতি আর কিছুতেই স্থগিত
হয়ে থাকে না।

ঐপ্রিয়বদা দেবী।

শেমুসী

(গল্প)

সেদিন মানুষটি টিকিট রিনিউ করবার
দিন; তার উপর সাগরবাড়ীর ভিড়; গাঁবার
ঘাটে বিষম গোলমাল লেগেছে। জাহান্নাম
ছাড়তে বিলম্ব দেখে ত্রীজের গারে হুট-

পাতের উপরে যেখানে অনেকগুলো নাগা
সন্ধ্যাক্ষী ধনী আলিয়ে আশুন পোহাচ্ছে
সেইখানে অশব্দগাহের তলার আদি একটু
ধাঁড়িয়েছি এমন সময় রাত্তার ওপার থেকে

অবিন টিকিট কিনে হন্-হন্ করে আমার কাছে ছুটে এসে বলে—“ওহে শেন্দুখী বেখবে তো এসো।”

লোকের ভিড় ঠেলে জাহাজে উঠে দেখি ফাষ্ট ক্লাসে রোজ অবিন বেখানটার বসে সেইখানে একটা লোক ;—চেহারটা বেশ শক্তিশ, পরণে লুঙ্গী, গায়ে বেরালের লোমের একটা আলখালা। তার তার মাথায় একটা অদ্ভুত টুপি—তেমন টুপি আমি কখনো দেখিনি—কতকটা টোপস, কতক পাগড়ী, কতকটা বেন বিলিভী ট্র-হ্যাট!

টীহারে উঠেই অবিন আমার হাত ছেড়ে সেই লোকটার দিকে লোভা এগিয়ে চলে। আমি দেখলেম অবিনের হুই চোখের মাঝখানে একটা জু-কুটি বিভ্রান্তের মতো চমকে গেল। অবিন বেখানটিতে বসে লোকটা ঠিক সেইখানেই বসেছে! তিন বৎসরের মধ্যে বেকের ঐ অংশটুকু থেকে অবিনকে বেহুধল করেছে এমন লোক—কি সাদা, কি কালো—আমি তো দেখিনি। লোকটার ওপালে কি আছে ভেবে আমি বেশ-একটু চিন্তিত হয়েছি এমন সময় অবিন দেখি “ইয়ে: সম্” বলে লোকটাকে প্রকাণ্ড এক সেলাম বাল্লিরে অতি ভালোমাহবের মতো আমার পাশে পিছনের বেকিতে এসে বসলো! লোকটা অবিনের দিকে ফিরেও চাইলে না; সে কেবল নিশ্চের বা-হাতথানা সাপের ফণার মতো বাঁকিয়ে অবিনের মুখের কাছে একবার ছলিয়ে পট হয়ে বসে রইল। কুটিকাটা মূব্বের মতো অবিনকে একেবারে মুহমান রেখে আমার আজ যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমন বিষয়েরও অন্ত ছিল না! অবিনকে

এ-রকম করে দমিয়ে বিতে পারে এমন লোক আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি তাকে চুপিচুপি বম্বু—“ওহে এই ভাগীরথীতীরে এবং নীরে এতকাল তুমি একা সিংহাসনে বিরাজ করছিলে, আজ আবার এ কোন্ ভাবুরক এসে উপস্থিত হল যে?” অবিন আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে কেবল ইশিতে আমার চুপ করতে বলে চোখ বুজে ছুট টানতে লাগল। নদীর মাঝ দিয়ে সারা পথটা তার মুখে আজ কথা নেই। আমিও চুপ করে চেয়ে রয়েছি। দূরে দেখা যাচ্ছে বাগির চড়ার উপরে গোটা-কতক নৌকা কাত হয়ে পড়ে আছে। আরো দূরে সবুজ একটা আকের ক্ষেত; তার পিছনে একটা কলের চিম্নি থেকে একটু-একটু ধোঁয়া উঠছে; একটি শাখিচিল নীল আকাশ থেকে আতে আতে জলের দিকে নামছে।

নদীনার বাসুতীর হুপরের আলোয় মিলে আমাদের চারিদিকে যখন একটা দিবান্বনের সৃষ্টি করেছে আর আমাদের জাহাজখানা কুটীঘাট থেকে আতে আতে ক্রমে ওপারের দিকে মুখ করাচ্ছে ঠিক সেই সময় অবিন হঠাৎ দাড়িয়ে উঠে আমাকে এক বাকানি দিয়ে বলে উঠল—“ওহে সে লোকটা গেল কোথায়?”

সামনের দিকে চেয়ে দেখি সেই প্রথম-প্রেরিত বেকখানা একেবারে খালি—সেই অদ্ভুত টুপির আর চিহ্নমাত্র নেই। জাহাজ তখনো জেটি ছাড়ায়নি; আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম জনমানব নেই, গ্রামের পথ ঘাট-পেরিয়ে লোভা দেখা যাচ্ছে—সেখানে একটা মড়াখেণ্ডো কুতুর রাত্তার

নাথপুনে ধুমোর উপরে মুখ-গুণ্ডে শুয়ে
 রয়েছে—আর অল্প পথিক কাউকে দেখা
 গেল না। অধিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে
 ভাটাজের এধার থেকে ওধার, নীচের ভলার
 কাছরা মার ইন্ডিন হাটা পর্য্যন্ত ভল ভল
 করে খুঁজে এসে, সারো থেকে হুন্সী খালসী
 এবং সকল হাজীদেব একে একে সেই
 লোকটার হবহ বর্ণনা দিয়ে ভেরা করে
 দেখলেন সে-লোকটাকে এ-জাহাজে উঠতেও
 কেউ দেখেনি, বসে থাকতেও কেউ দেখেনি,
 এবং কোনো ঘাটে নেমে যেতেও কেউ
 দেখেছে কিনা তাও জানা গেল না।
 আমরা দুজনে গিরে সেই সামনের বেঞ্চি-
 খানা এবং তার চারিদিকটা এমন-করে সন্ধান
 করুম যে সেই লোকটার লোমশ আলখাল্লার
 বহি একগাছিও লোম সেখানে থাকতো তবে
 সেটা আমাদের কাছে বরা পড়তোই পড়তো।
 কিন্তু এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা
 এলো, বসলো এবং চলে গেল অথচ পৃথিবীর
 কোনোখানে একটু আচড়ও পড়ল না!
 কোনো-কোনো দিন ঘন কুরাসার মধ্যে গিরে
 পাড়াপার করবার সময় দেখেছি কোথাও
 কিছু দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ একখানা
 নৌকা তার পাড়িমারি মালপত্র রসারসি
 নিয়ে চকিতেই মতো কুরাসার গারে ছুটে
 উঠেই আবার নিলিরে গেল,—এ লোকটা
 ঠিক বেন তেমনি করে আমাদের দেখা
 দিলে! আমার মনের মধ্যে কেমন বেন
 স্তিত করতে লাগল। প্রথম-শ্রেণীতে অবিনের
 সঙ্গে একলা বসে থাকতে আমার ভালো
 লাগলো না; আমি তৃতীয়-শ্রেণীতে যেখানে
 ইন্ডিনের ধারে আগুনের তাতে কতকগুলো

চিনেমান ভাণের ফ্যাকাসে মুখগুলো
 ভাস্তিরে নিজে সেইখানে গিরে পাড়ালুম।

“শেয়রী” বেঞ্চ খালি করে দিলেও অবিন
 কিন্তু আজ তার নিজের সিংহাসনে বসতে
 বড় উৎসাহ প্রকাশ করে না। সে বেঞ্চি-
 খানার পিঠে চাত রেখে চূপকরে পাড়িরে,
 থেকে-থেকে খানিক চুকট টেনে-টেনে
 মোতালার—যেখানে সারোংসাহেব চাকা
 ঘুরিয়ে কম্পাসের কাটা দেখে জাহাজ চালিরে
 যাচ্ছে—মই বেয়ে সেখানে উঠে গেল।
 সাধারণ হাজীর মোতালার যাবার হুকুম নেই,
 আমি নীচেই রইলুম। কিন্তু অবিনের গতি-
 বিধি সর্বত্র। সে মোতালার উপর থেকে
 দিবি আমাদের নাকের উপর ছুই পা
 খুলিরে সারোংসাহেবের হুকোর মজলিস
 ক্রমকে তুলে। সারা পপটা তার আর
 কোনো খবরই পেলুম না। ফিরতি জীয়ার
 তখন আহিরীটোলার ঘাটে ভিড়ছে, এমন
 সময় অবিন নেমে এসে বল্ল—“ওহে কাল
 আবার আসছো তো?”

আমি বল্লুম—“আসছি, কিন্তু এ জাহাজ-
 খানার দিকেও আসছি নে!” ঘাটে নেমে
 জাহাজখানার নাম দেখে নিলুম ‘প্রতিভা’।

তার পরদিন থেকে বড়বাজারের
 ঘাটে ‘প্রতিভা’টি বাধ দিয়ে এ-লাইনের
 আর বতনাদের বত জাহাজ সব কথানাতে
 চড়ে বেড়াই কিন্তু অবিনকে আর দেখতে
 পাই নে! সে যে কখন কোন্ জাহাজ
 ধরে যাত্রান্ত করে, তার আর সন্ধান পাই
 নে। দুরবীন লাগিরে দেখছি ‘প্রতিভা’র
 ডেকে তার আরগা শূন্য পড়ে আছে!
 লোকটা গেল কোথা? শেয়রীর মতো তাকেও

গা-ঢাকা হতে বেখে আমি একদিন সন্ধ্যার সময় জাহের আহিরোটোলার ঘাটে নেমে জেট পেরিয়ে অবিনবের বাড়ির দিকে চলেছি এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখি অবিন হন্-হন্ করে শীমার-বাটের দিকে চলেছে; সঙ্গে আলবোলা আর ক্যাবিনের ব্যাগ নিয়ে তার চাকর গোবিন্দ। তখন সন্ধ্যা পটা হয়ে গেছে। বড়বাগার থেকে শেখ-শীমার রাস্তার অন্ধকারে তেঁপুর শব্দ এবং সার্কি লাইটের আলোর গুঁড়ি বোলাতে ঘোঁসাতে রক্তচক্ষু একটা বিরাট জলজন্তুর মতো আস্তে আস্তে জেটির গারে এসে থামলো। অবিনকে এতদূরে জাহাজে উঠতে দেখে আমার তারি-একটা কৌতূহল হল। আমি তার অগাধাতে শীমারে উঠে খার্ড ক্লাসের একটা খালি বেকে শালমুড়ি দিই বসলুম। আমি অবিন এবং গোবিন্দ ছাড়া আর একটি-দ্বয়ে সহযাত্রী একটা প্রকাণ্ড খুড়ির আড়ালে চূপ করে বসে রয়েছে। জাহাজ অন্ধকার জল কেটে স্তম্ভরূপে চলেছে। জাহাজের আলো-গুলো কালো জলের গারে সাপ-খেলালো সোনার এক-একটা রেখা টেনে দিয়েছে। আকাশের আর জলের আঁধার এক হয়ে গিয়ে নদীটা অকূল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। এমন সময় অবিন আমার নাম ধরে ডেকে বলে—“ওহে ইয়ার, শেনুদীর অত কাছে বস। নিরাপদ নহ; এদিকে চলে এস।”

অবিনের চোপ এড়াতে পারি নি দেখে আমি তার কাছে গিঁট বস্‌—“এখানে আমার শেনুদী কোথায় পেলো?” অবিন একবার খুড়ি-কোলে বে মাথুঘটা, তার দিকে ঘাড় হেলিয়ে হুক করে—“শেনুদী

কি একরকম? তারা নানাভাবে অগতঃ গুরে বেড়াচ্ছে।—অভিধানে শেনুদী অর্থে দেখবে বুড়ি।” আমি বল্‌—“বুড়িমস্ত জীবমাজেই যদি শেনুদী হয় তবে তুমি-আমিও তো শেনুদী!” অবিন বল্‌—“না ওই বুড়ির সঙ্গে অতির যোগ হলে তবে হয় শেনুদী। যেমন তোমার ঠগী তেমনি শেনুদীর একটা দল এখনো আছে। আনরা যেমন কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোই, এসেরও মধ্যে তেমনি অনেক পরীক্ষার উত্তার হয়ে তবে হয় শেনুদী। আলম-শেনুদীও হুচারজন আছে। তারা কেমন জানো? হস্তভাগা লক্ষ্মীমন্ত, ধার্মিক ও পানি, ভদ্র অভদ্র, মহাশয় এবং ছরাসা, সুবুদ্ধি ছবুদ্ধি, পানি ছুঁচো, মহাশয় ছরাসর, পণ্ডিত ও ধোম্ব, সবলোচক ও গোবদি, বুদ্ধরূপ ও বেচারী একত্র মেশালে বা হয় তাই। এরা স্রবদ্বায়ে বেখানে খুঁদি বেতে পারে, বা খুঁদি তাই করতে পারে;—বাটি-চালানো, বাটি-চালানো থেকে মাং তোমার লোহার সিঁড়কের ক্যালবাক্স পর্যন্ত সরানো! হোসেন খাঁর বস্ত বুদ্ধরূপী সব এঁদের জানা আছে। এঁরা ইচ্ছে করলে অকুরন্ত তুণ, অক্ষর কবচ, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, খিলগাকরীর মলম—এমন-কি ঘুনের দেশের রাজকর্ভাকও তোমার মুঠোর এনে দিতে পারেন। স্বর্গের অঙ্গুরী এঁদের দাসী; দেবতাগুলো হুকুমের চাকর, তার কৃতগুলো ইয়ার। মনে করে একদ্বয়ের সঙ্গে এঁরা তোমাকে ইস্তের অনুরাবতীতে, কালীকৈর যোগদানে, এমন-কি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়ে আনতে পারেন অথচ তোমার গারে একটু ঘাম দেবে না। এমনি এক-

জন শেমুীকে সেদিন দেখেছ। কিন্তু আমি
বে ঐ বুদ্ধি নিয়ে ওখানে ভালোমাসুঘট
বলে আছে দেখছো, ওঁকে চিনেছ ?”

লোকটা আমার একেবারেই অচেনা।
অবিন আমার কানে-কানে বলে—“উনিই সেই
দিনের শেমুী ; ওঁরই পান্নার একবার পড়ে
একটা বর্ণমূলের পিছনে ছুটেতে ছুটেতে
আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি ! আমার
উনি যে কার সর্জনশ্য করতে কিবা
কার-বা কি ভালো করতে এখানে এসেছেন
তাই ভাবছি।”

লোকটার চেহারার কোনো-রকম
শেমুীর ছিল না। আমি অবিনকে
বলুম—“নির্ভরে তোমার শেমুীর ইতিহাস
বলে বাও, ও-লোকটা এখনি নেমে যাবে।”

অবিন আমার দিকে একটু হুঁকে বলে—
“যেথবে তবে ?” বলেই অবিন তার বুকের
পকেট থেকে একটা বনমাসুঘের হাড়ের
বাঁশী বার করে বলে—“এই হল শেমুীরের
বুকের হাড়ের বাঁশী। গান এবং এই বাঁশীর
সুর এই দুই হচ্ছে শেমুী তাড়াবার এক
মাত্র ওপ্তাধ। ভূমি গান ধর আমি বাজাই।”

হাড়ের মধ্যে থেকে যে এমন সুর বার
হয় তা আমার ধারণা হয়-নি এবং অবিনও
যে এমন বাঁশী বাজায় তা আমি আগে
জানতাম না। সুর যেমন গিরে অন্ধকারকে
বিচ্ছ করলে অমনি মনে হল যেন রাজির
নীল পর্দা খুলে দলে-দলে তারা আমাদের
দিকে উঁকি দিচ্ছে অলের শব্দ এতক্ষণ কানে
আসে নি কিন্তু এখন যেন শুনি অলও
ঐ সুরে, বাতালও সেই সুরে তাল দিচ্ছে।
আর মনে হল রাজির বং ক্রমে যেন পাতলা
হয়ে আগছে। তখন শিবতলার শ্মশানঘাটের
কাছে জাহাজ এসে স্থির হল। পারের একটা
চিতার আগুন ধুধু অলছে। সেই লোকটা
বুদ্ধি-মাথায় জেটিতে নেমে দাঁড়াল। আমি
মেথলেম সেটা বুদ্ধি নয়, সেটা তার সেই
চুপিটা। অবিন বলে—“মেথলে ?” মেথতে
আমার জ্বল হয়-নি কিন্তু শেমুীর সঙ্গে
তার কি লড়াই বেখেছিল যখন তাকে
প্রাণ করুম সে বলে—“জ্বলে গেছি, মনে
নেই।”

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বল্পলিপি

লা সা ।। সা সা সা। রা রা জ্ঞা । রজ্ঞা পমা জ্ঞা। রা সা । ৪ সা সঁ সঁ।
তু মি ডা ক বি রে ছ • কো ন স কা লে • কে উ তা

পধা পা ধা । না । । । । খা পা । মা মা জ্ঞা। রা সা রা । রজ্ঞা পমা জ্ঞা।
জা • নে না • • • তু মি ডা ক বি রে ছ • কো ন স

রা সা। I।।।।। গা গা গা। গা গা গা। গা গ। I সা গা।।
কা লে।।।।। আ মার ম ন্ যে কা দে।। আপন।

গা মা গ। গমা পমা গা। মা।।।।। রা মা জরা। সা ন্। ন্। I
ম।।।।। নে।।।।। কেউ তা মা।। নে

মা।।।।। II
না।।।।।

II {পা পমা পা। মা জা মা। পা না না। সঁ সঁ।।।।। না সঁ জা।।
ফি রি।।।।। আ মি।।।।। উ দা স্ প্রা নে।।।।। তা কা ই

রাঁ সঁ সঁ।।।।। সরঁ সঁ না। না সঁ (নসঁ) }।।।।। গা গা। ধা পা
স বা র য়ে ধে র প্য নে।।।।। ভো মা র য় ত

।।।।। পা পমা। গসঁ সঁ না। গা।।।।। পা ধা পা। মা গা গা।।।।। মা।।।।।
।।।।। এ ম।।।।। ন্ টা নে কেউ ত টা।।।।। নে না।।।।।

।।।।। জরা সনা II
।।।।। তু মি

II।।।।। সা রা জা I রা মা জা। রা সা সা।।।।। গা।
।।।।। নে জে ও ঠে প ন্ চ মে স্ব।।।।। র কেঁ

গা গা গা।।।।। সা গা মা। গা মা মা।।।।। রা জা জা। রা জা জা।।
পে ও ঠে ব ন্ ধ এ ঘ র বা হি র হ তে।

রা রজা মজা। রা সা রা।।।।। রাপা মা। রজা রমা জরা।।
হু রা।।।।। রে ক র কেউ ত্ হা।।।।। নে

সা।।।।। II
না।।।।।

[নসঁ না]
II { (পা পমা) পা। মা জা মা। পা না।।।।। না সঁ।।।।। না সঁ জা।।
কা।।।।। শে কা র ব্যা কু।।।।। ল তা।।।।। বা তা স

রাঁ সঁ।।।।। সঁ না না। না সঁ সঁ।।।।। সঁ না।।।।। ধা পা পা।।
ব হে।।।।। কা র বা র তা।।।।। এ প।।।।। থে সে ই

পা শধা বস।। স। পা ধা। পা ধা পা। মগা রা গা। মা।।।।
গো প ০ ন ক থা কে উ ত আ ০ নে না ০ ০

। জরা সনা।।।।

“কৃ মি”

ঐদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনৌকিক

আমি যখন যখন বিরাট বিশ্বের দিকে প্রথম চাটুয়া দেখিয়াছিল, তখন সে তাহাকে বৃত্তিতে না পারিয়া শিশুর মতই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ-বজ্র, হাবর-অঙ্গন, জড়-চেতন,—সকলই তাহার কাছে ছুজের রহস্যে অভিভূত হইয়া দেখা দিয়াছিল। বিশ্বের এই বিচিত্র রহস্য বৃত্তিতে না পারিয়া নানারূপ অসম্ভব কল্পনা করিয়া সে মনের কোভ মিটাইয়াছিল। বিবিধ অসুত দিব্যলোক, আশ্চর্য্য শক্তিশালী প্রাণিদগ্ধ, অগণ্য বহুরূপী দেব-দেবতা,—এই সকল দিয়া মানুষ তখন বস্তুর এক মানস-অগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

পরে যতই মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই সে কল্পনা ছাড়িয়া সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুক্তি, বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে বিশ্ব-রহস্যকে বখাওঁরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাধনার সিদ্ধিও কিয়ৎ-পরিমাণে হিলিল,—মানুষ বিশ্বের রহস্য-বহনিকা হই-এক আত্মপার একটু-আধটু ফাঁকু করিয়া ফেলিল; আশে-পাশে প্রকৃতির

গোপন ভাঙারের হই-একটা রহস্য কুড়াইয়া পাইল। ফলে তাহার লাহস বাড়িয়া গেল। ফলে ফলে আকাশে সর্ব্বত্রই মানুষ তাহার বিজয়-পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু সে যতই চেষ্টা করুক, এই জ্ঞানের দিকে—বুদ্ধিশক্তির দিকে মানুষের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আর বিশ্বের মধ্যে মানুষের বিজয়-ধাড়া এই সীমার গণ্ডিতে পড়ে পড়ে থামিয়া বাইতেছে। এই অনন্ত-অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কত-টুকুই বা মানুষের স্থান, আর কত সামান্য কত তুচ্ছ তাহার শক্তি, মানুষ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই সেটা ডাল করিয়া বৃত্তিতে পারিতেছে। একটা রহস্য-বহনিকা উঠিতেছে তো প্রোণবীর বসনের জায় সহস্র সহস্র রহস্য-বহনিকা তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিতেছে; একটা সমস্তার যীমাংসা হইতেছে তো, তাহার চারিদিকে লক্ষ লক্ষ নব স্বমতা মাথা তুলিয়া গাড়াইতেছে। এইরূপে মানুষের জ্ঞান যতই প্রকৃতিকে জ্বলিতে লাগিতেছে, প্রকৃতি ততই বৈতা-

লোকের মারা-তুরনের মতো আরও দূরে সরিয়া পলাইতেছে।

জ্ঞানের দিকে—বুদ্ধিশক্তির দিকে একটা সীমা-রেখা টানা থাকিবে ও মানুষের আর একটা দিক আছে, তাহার সীমা নাই। সেটা হইতেছে মানুষের প্রেমের দিক। এই প্রেমের দিক দ্বিরাই মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে,—বিশ্বের স্ফুরহস্তের সঙ্গে একটি অণুও যোগস্বত্ব বাঁধিতে পারিয়াছে। যে হস্তের গ্রাহেলিকা মানুষের জ্ঞানকে চিরদিন ধুলাইয়া দিতেছে, এই প্রেমের কাছেই কেবল তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠে। বিনি প্রকৃতির সর্ব আয়রণের আড়ালে চিরদিন আপনাকে লুকাইয়া রাখিতেছেন, মানুষের এই প্রেমের শক্তিতেই কেবল তিনি ধরা পড়েন। আর, এই প্রেমের শক্তিতেই একদিকে যেমন মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া বাইতে পারে, অত্রদিকে তেমনিই বিশ্বের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে;—একদিকে পরম ভবের সঙ্গে যেমন তাহার যোগ লাভিত হই, অত্র দিকে তেমনিই সর্বভূতের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠে।

আসল কথা, মানুষের বার্থ প্রেত তাহার জ্ঞানের দিক দিয়া—বুদ্ধির দিক দিয়া নহে;—প্রেমের দিক দ্বিরাই তাহার বার্থ হইবে ও মনুষ্যের দোরব। সভ্যতার প্রেত বিকাশ এই প্রেমের পরিণতিতে, সমাজের প্রেত কার্য এই প্রেমবিকাশের সহায়তার, মানুষের প্রেত উত্তরন এই প্রেমের উৎকর্ষে। ইহাই মানুষের = বিশিষ্ট সম্পত্তি, জীবজগতে তাহার স্থান-নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি।

মানুষ যে তাহা কতকটা না বুদ্ধিতে পারিয়াছে, এমন নহে। কিন্তু বুদ্ধিও বহু পুরাতন অভ্যাস তাহার পক্ষে ত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাই সভ্যতার শৈশব-দুগের স্রাব এখনও সে বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিলম্ব-দ্বাভাতেই মত্ত রহিয়াছে;—বিশ্বের পরম শোভনীর ঐশ্বর্য্য-মন্দিরের রহস্ত ভেদ করিবার জন্যই বৈরাগ্য ত্যাগ সমগ্র কাটাতেছে। কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞান গইয়া সেই অনন্ত রহস্যের ধরমার মাথা কুটিয়াও তাহার বিশেষ-কিছু লাভ হইতেছে না। আপনার অক্ষমতা পথে পথে তাহাকে পীড়া দিতেছে ও বিফলতার অকৃত্যিতে সমগ্র মন ভরিয়া উঠিতেছে।

মানুষের এই অক্ষমতা ও অকৃত্যের ভিতরেই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের অবসর। মানুষ অটল বিশ্ব-রহস্ত ভেদ করিতে পারিতেছে না, কেবল কতকগুলি অমার করন-মাগ রচনা করিয়া বাণকের স্রাব আনন্দ অহুস্তব করিতেছে; প্রকৃতিকে ভয় করিবার চেষ্টা পথে পথে ব্যর্থ হইতেছে, আর কতকগুলি মনগড়া কথাকে ‘অতিপ্রাকৃত’ নাম দিয়া, প্রকৃতির হস্তে হস্তের কটক পার হইবার একটা কিনারা হইয়াছে তাবিয়া কুর্জ আশ্রয় লাভ করিতেছে। এইদিকেই মন্ত্রতন্ত্র, যোগবাগ, তুচ্ছতাক, ব্রহ্মকী, কৃত-প্রোভ, ডাকিনী-শাখিনী, মারগ-উচাটন, তন্ত্রন-বনৌকরণ প্রভৃতি তৃণীকৃত ভাবে সামান্য রহিয়াছে। এইদিক দ্বিরাই লোক-লোকান্তর হইতে নানা অদ্ভুত, অশরীরী প্রাণী আসিয়া, মানুষের এই মাতীর পৃথিবীতে, অতি

সাধারণ ভাবে আনাগোনা করিতেছে; ফলে, বেশকালের সীমাকে তুচ্ছ করিয়া মাহুকের মন নানা অশরুপ খেয়ালের দৃষ্টিতে বাতিয়া উঠিতেছে। কিম্বা-বিভা এই পথেই স্বর্ণলোভে কু-দৃশ্যের বৃথা ভ্রমণ করিয়াছে; বিধাতার পুরাতন সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া এইমিক দিয়াই বিশ্বামিত্র নূতন সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন; আর গ্রাষণ স্বর্ণে বাইবার একটা পাকা সিঁড়ি এই মিক দিয়াই পড়িয়া তুলিবার ফিকির করিয়াছিলেন। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে, মাহুকের মন অতি সহজেই ইহার বন্দীভূত হইয়া পড়ে, সমুখের কঠোর সত্যকে ত্যাগ করিয়া লোভনীর কাল্পনিক মারামুগের পাছে পাছে ছুটিতে থাকে।

মাহুকের মনের উপর অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃতের এই অসীম প্রভাব কোনদিনই প্রকৃত পক্ষে হ্রাস পায় নাই। জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা বতই বাড়িতেছে, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের সীমা-রেখা দিকচক্রবালের দ্বারা ততই সরিয়া সরিয়া বাইতেছে,—এই মাত্র ভ্রম। নব বৈজ্ঞানিক যুগে অলৌকিকের মারা হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরই নূতনভাবে তাহার প্রতিভা পঠন করিয়া তাঁহার পূজা চলিতেছে, মাহুকের সসীম হস্তিকের ভিতরে নানা অভিনব শক্তির কল্পনা করিয়া, কুল ভগ্নতের বাহিরে নানা স্বপ্ন লোকের ও জীবের অভ্যর্থনের সম্ভাবনা স্থির করিয়া অলৌকিক চেষ্টার পরিচয় দিতে আমাদের কোনই দ্রষ্টা নাই। আমাদের জ্ঞান ও শক্তির সম্বন্ধে আমাদের এতই 'অবিশ্বাস' ও অত্যাধিকার, কণামাত্র অতিপ্রাকৃতের

কাছে আমাদের সমস্ত জ্ঞান-গরিমা লুপ্ত করিয়া দেহিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না।

সেকালে মহাপুরুষ, অতি-মাহুয বা শ্রেষ্ঠ মাহুয রূপে ধাৰ্ম্মিককে মনে করা হইত, তাঁহাদের শক্তি ও মহত্ব এই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের উপরই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের পৌরাণিক বীর ও মহাপুরুষগণের প্রায় প্রত্যেকেই এই অলৌকিক শক্তির আধার। কেহ চর্য ত বিশাল সাগর এক লাফে উত্তীর্ণ হইতেন, কেহ বা সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়া কেলিতেন, আর কেহ বা এক বাণে সাগর শুষ্কিতেন কিংবা সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতেন। ইচ্ছামত জুড়-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নথবর্ণনে জানা, অশরীরা প্রাণীর দ্বারা শূন্য গুড়া, তপস্তার বলে বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলা, ইহাই তাঁহাদের মহত্বের পরিচায়ক ছিল। আমাদের দেশের ন্যায় প্রতীচ্যেও এই একই ভাব। গ্রীক, রোমান এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পুরাণে সেই অলৌকিক শক্তিরই রাজত্ব। সেকালের দেবতারগণ মাহুকের চেয়ে এই অলৌকিক শক্তির বলেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মাহুয যে প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, তাঁহারা অনায়াসে সে-সকলকে তুচ্ছ করিতে পারিতেন; মাহুকের পক্ষে বাহা অদ্ব্যুত ও অসম্ভব, তাঁহাদের পক্ষে তাহা ইচ্ছামাত্রই ঘটতে পারিত বলিয়াই তাঁহারা দেবতা ছিলেন। চরিত্র দ্বা. স্বভাবগত শ্রেষ্ঠত্ব—প্রত্যেক মহত্ব মোটেই তাঁহাদের দেবত্বের মাপকাঠি ছিল না। বরং সে হিসাবে অনেক = হলে তাঁহারা যে মাহুকের

অপেক্ষা হীন ছিলেন, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মানব-সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গ্রেমই যে সব-চেয়ে বড় জিনিষ, যথার্থ মহুয্য যে গ্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা ক্রমে জানা বাইতে লাগিল। তখন আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র অলৌকিকের উপর নির্ভর করিত না, তাহার যথার্থ মহুয্য বা গ্রেমের বিকাশও প্রয়োজনীয় বোধ হইতে লাগিল। মানুষ যে কত বড় জাহা বৃত্তিতে হইলে, কেবলমাত্র তাহার অতিপ্রাকৃত শক্তিরই হিসাব-নিকাশ পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইল না,—তাহার যথার্থ মহুয্য কতটা বিকশিত হইয়াছে, গ্রেম কি পরিমাণে তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে,—বেহ, নদা, ভালবাসা, ধৈর্য, ভিত্তিকা, ভাগ, প্রভৃতি কি পরিমাণে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরেও দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাই তখনকার বীহারী মহাপুরুষ, তাহাদের মহুয্য ও চরিত্র-বলও লোকে অল্পতব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে ঐতিহাসিক যুগের মহাপুরুষেরা কেবলমাত্র অলৌকিক বাহিকর নন, শ্রেষ্ঠ মানুষও বটেন।

কিন্তু বলিয়াছি ত, যে অলৌকিকের মোহ কোনদিনই মানুষ কাটাইতে পারে নাই। তাই ঐতিহাসিক যুগেও, মহাপুরুষদের ধারণা বিষয়ে, মানুষ যেমন তাহাদের ভিতরকার যথার্থ মহুয্যের বিকাশকেও অল্পতব করিয়াছে, তেমনই তাহাতে ইচ্ছামত অলৌকিকের ভাগ না মিশাইয়াও ছাড়ে

নাই। বরং এই অলৌকিকের ভাগ-কোন কোন স্থলে এক বেশী যে, যথার্থ মহুয্যের দোরব তাহার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধবোধের শিখোয়া তাহার সাম্য ও দৈবত্বের কথা স্ততটা বকে নাই, তাহার নানা অলৌকিক শক্তির কল্পনা বতটা বেশী বুকিয়াছিল। বীণবৃট্টের আশ্চর্য্য ভাগ ও ভগবানে নির্ভরতা বৃষ্টান-স্বপ্ন বতটা না ভাবিয়াছে, তাহার জলের উপর পান্ডে-হাঁটিয়া নদী পার-হওয়া, স্পর্শমাত্রে কুঠরোগীর রোগমুক্তি বা ইন্দ্রিয়মাত্রের বক্তাব্যাস নিবারণ প্রভৃতির হিসাব-নিকাশের গল্প লইয়া তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করিয়াছে। ঐশ্বর্য্যের মহান বিশ্ব-গ্রেম ও অতুল ভাবতত্ত্বতার কথা ভাবিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি নাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা অকৃত অতিপ্রাকৃতের ভাগ মিশাইতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও এই অলৌকিকের পদার কিছুমাত্র কমে নাই। আজ আমরা মহুয্যকে বেশী পরিমাণে বুঝিয়াছি, গ্রেমের মাছাছা মানুষের মনের উপর আর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজও মানুষের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্বকে অলৌকিকের মায়া-স্পর্শ হইতে আমরা একটুও মুক্ত করিতে পারি নাই বলিলেও হয়। আজও শ্রেষ্ঠ মানুষ বা মহাপুরুষের ধারণা,—মহুয্যের যথার্থ গৌরবে ও গ্রেমের মহত্বে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। তাহাদের মধ্যে দতঙ্গ না কিছু অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির আবিষ্কার করিতে পারি, শুভক্ষণ আমাদের প্রাণ আইটাই

করিতে থাকে। সাধারণ মানুষের তু কথাই নাই, অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও এই মোহ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। সাধু-সত্যাসী, মহা-পুরুষ, ভক্ত প্রেমিকদের মধ্যে চরিত্র-গৌরব ও প্রকৃত মহত্বের খোঁজ বড় বেশী লোক নয় না। তাহাদের কোনরূপ বুজবুজী বা অলৌকিক কিছু আছে কি না, সেইদিকেই সকলের ঝোঁক থাকে বেশী। আসল কথা, মানুষ যে কত বড়, তাহার প্রেমের মধ্যেই যে তাহার দেবত্ব পরিচ্ছিন্ন, এ ধারণা এখনও আমাদের ভাল-করিয়া হয় নাই। তাই অভ্যাস-বশে আসল মানুষটাকে আমরা এত ছোট করিয়া দেখি যে, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের কাছে ধার না করিলে কিছুতেই আমাদের মন উঠে না।

অবতারবাদের দ্বারা এই অলৌকিকের দাবী পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত। আমরা অবতারবাদ অবিধান করিবার কথা বলিতেছি না। কিন্তু বখাৰ্হ মহাবাহু, এবং প্রেমের মধ্য দিয়া মানবে দেবত্বের অভিব্যক্তি বর্তমান না আমরা অনুভব করিতে পারিব, ততদিন অবতার-বাদের বখাৰ্হ সার্থকতা বৃত্তিতে পারিব না; বরং অলৌকিকের দাবীও ছুঁরাইয়া বেথানে-

সেখানে অবতারের সৃষ্টি করিয়া মহাবাহুর আদর্শকে আমরা খাটো করিয়া ফেলিব। হইতেছেও তাহাই। মানুষকে বখাৰ্হ গৌরব আমরা দিতে পারিতেছি না। মানুষ যে প্রেমবলে কত মহৎ হইতে পারে, তাহার চরিত্র-গৌরবে দেবত্বের আদর্শকেও সে যে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, এ কথা ভাল-করিয়া না বুঝিয়া আমরা মানুষের মধ্যে মহত্বের অভিব্যক্তি দেখিলেই, সেখানে ঈশ্বর গড়িয়া তুলিতেছি; মহাত্মা বা মহাপ্রেমিকের মধ্যে মানুষকেই বৃহৎভাবে উপলব্ধি না করিয়া বেথানে-সেখানে ঈশ্বরকে বর্ণনাআ হইতে নামাইয়া আনিতেছি। ইহাতে মানব-সমাজের, মানব-প্রকৃতির, পূর্ণ পরিণতির — তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যের সাধনার অপরিণত অতি সাধন হইতেছে। আর বাহ্যিক মহাপুরুষদের চেষ্টা ও ভক্ত সাজিয়া অতি-মাত্রায় এই অলৌকিকের পূজার মন দিতেছেন, তাহারা যে এক-দিশাবে মহাবাহুভক্তির ও মানব-সত্যতার যোগ্যতর শব্দ, এ-কথা বলিলে বোধহয় কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হয় না।

ঐপ্রহরহুমার সরকার।

পিতা-পুত্র

(নাহজাহান ও আওরংজেব) (১)

সামুগড়ের বুদ্ধ শেখ হইরাছে—দারার ভাস্যলক্ষী দারাকে পরিত্যাগ করিরাছেন; মুসল রাজলক্ষী আওরংজেবের অঙ্গদারিনী

হইরাছেন; অন্তঃপুর পিতা-পুত্র যে ঘটনা ঘটে, আমরা তাহাই বলিতেছি। সামুগড়ের মুন্সের তিন কি চারি দিবস

(১) এই গ্রন্থ-রচনার অধ্যাপক ঐযুক্ত বহদুর সরকার-দরবারের "আওরংজেবের ইতিহাস", "আওরংজেব

পরে, আওরংজেব এবং সূর্য্যদ চূর্ণ হইতে তিনমাইল দূরবর্তী আগ্রার সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ উপবনে উপনীত হইলেন। তৎপরে তাঁহার আওরংজেবের একজন বিশ্বস্ত, বাক্পটু এবং চতুর খোজার প্রমুখ্যে শাহজাহানকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি বীর প্রত্নর নামে বৃদ্ধ বাবশাহকে অভিবাদন করিয়া বানাইলেন, বাবশাহের প্রতি আওরংজেবের ভক্তি ও ভালবাসা অকুন্স আছে; সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, যদিও তাহা একমাত্র দাওয়ার অত্যধিক দুর্ভাগ্যক্রমে ও কু-অভিপ্রায়ের জন্যই ঘটিয়াছে, তথাপি তাহার ক্ষমতা তাঁহার ক্ষমিত। তিনি বিশেষ সরলতার সহিত আওরংজেবের মহামান্য পিতৃদেবের স্বাহোয়্যাজিতে অভিনন্দন-জ্ঞাপন এবং পিতার আদেশ গ্রহণ ও প্রতিপালনই যে তাঁহার আগ্রার উপনীত হইবার একমাত্র কারণ, তাহাও নিবেদন করিলেন।

বাবশাহ পুত্রের বাবহারে অজুহোমনের ভাব দেখাইলেন ও বস্ত্রভা স্নীকারে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আওরংজেবের কপটতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার কথা অবশ্যই তিনি অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই সকল বাক্য তিনি আত্মা স্থাপন করিলেন না; তথাপি অটলতা প্রদর্শন, প্রজাবর্ণের নিকট উপস্থিত হওয়া ও ওমরাহগণকে একত্র না করিয়া তিনি নিজের চতুরতা ও প্রত্যাহার আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। আওরংজেব এই উভয় বিষয়েই সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং পিতা পুত্রের মত যে ভাল রচনা করিতেছিলেন, চতুর পুত্রের কৌশলে পিতা স্বয়ং যে সেই জালে নিপতিত হইবেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই! শাহজাহান আওরংজেবকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আওরংজেব চূর্ণীভাস্ত্রে প্রবেশের তত্ত্ব প্রস্তুত ছিলেন না এবং যদিও তিনি পুনঃপুনঃ পিতার সহিত সাক্ষাতের দিন স্থির করিলেন, তথাপি প্রত্যাহাই দিন পত্রিবর্তন করিয়া পরবর্তী দিবস স্থির করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে গোপনীর চক্রান্ত চলিতে লাগিল এবং চূর্ণ-অবরোধও হইল। প্রথমতঃ চূর্ণাবরোধ করিয়া আওরংজেব কোন সুবিধা পান নাই। অবশেষে আওরংজেব চূর্ণের জন্য কষ্ট করিলেন। আগ্রাচূর্ণ সূক্ষ্ম ও গভীর পরিধাবেষ্টিত হইলেও, পানীর জলের অভাবে সকলে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তখন শাহজাহান আওরংজেবকে এই মর্মস্পর্শী চিঠিখানি পাঠাইলেন :—

“বাবা! আমার! বীর আমার! এইমাত্র কাল আমি নয় লক্ষ অখারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ আমার মল দিবার একটা চাকরের অভাব!

‘সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী’ ও এনালীতে লিখিত প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক আরতাইনের ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম এবং বার্মিয়ারের পুত্বেকর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ‘দীর্ঘকাল বানিগারক প্রশংসারূপ (authority) গ্রহণ করিতে পারাধ, তাহাণিককে ইহা বসিসে দখটে হইবে যে তাঁহার বানীকে প্রশংসা (authority) বসিয়া গ্রহণ করেন, সেই আরতাইনও বানিগারক প্রশংসা বসিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Indian Antiquary ১৯১১ খ্রষ্টাব্দ)। বানিয়ার ‘সম্বন্ধীয়ক ভারত’ সম্বন্ধীয়ক হইয়া বসব হইয়াছে।

হিন্দুদের বাহা হটক ধস্ত বসি,
তাহারা মৃত (আত্মীয়) কে জলদান করে।

কিন্তু, হে পুত্র, তুমি এমন অদ্ভুত
মুসলমান যে আমি ভীতিত থাকিতে জল
হইতে বঞ্চিত করিয়াছ।”

আওরংজেব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন,
“যেমন কথ্য তেমনি ফল! আর বেশী লেখা
বোঝাবি।”

বাদশাহ নিরুপায় হইয়া বিজয়ী নির্ধম
পত্রকে এই চিঠি পাঠাইলেন :—

“পিতৃভক্তি একেবারে তুলিয়া গিয়াছে!
আমাকে শত্রু বলিয়া মনে কর এবং আমাকে
যে-সব কষ্ট দিতেছ তাহাতে তোমার ইচ্ছা-
অনুরোধে লজ্জা ও পরকালে সর্বনাশ হইবে।
শেষ বিচারের দিন কি বলিয়া আশ্বস্ত
করিবে? বৃদ্ধ ভয় করিয়াছ বলিয়া উদ্ধত
হইও না। আশা করিও না ভাগ্য চির-
কাল তোমার পক্ষে থাকিবে, কারণ ভাগ্য
বড় পরিবর্তনশীল। বাহাতে নিজেদের ক্ষতি
হইবে এরূপ কার্য করিও না। জগৎজন
আমার রাজত্বের পৌরব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া
বুড় ছিল, ইচার শেষাংশে তুমি বিবমর
করিও না। সাধু পুত্রের মত কার্য
কর, যেন তোমার মান ও ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী
হয়।”

আওরংজেব উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন,
“আমি বাধ্য পুত্র। অধুনা বাহা করিয়াছি
তাহার কারণ এই যে তর ও নিরাশার
আশ্বস্তকারী জন্ত অল্প ধরিতে বাধ্য হইয়াছি।
নচেৎ আপনার উপর সম্পূর্ণ বিবাস করিয়া
চরণে উপস্থিত হইতাম। এখন চূর্ণতা
আমার লোকস্বের লাতে ছাড়িয়া দিউন;

তৎপরে আমি বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া
আপনার কমা তিস্য করিব।”

আগ্রাভূর্ণ আওরংজেবের হস্তে সমর্পিত
হইল। বৃদ্ধ বাদশাহ বসী হইলেন।

শাহজাহান প্রজার সুখ ও রাজ্যের শান্তির
জন্ত দিব্যরাত্রি পরিশ্রম করিতেন। এই
কর্তব্য পালনের জন্য সমস্ত দিবা-ভাগকে ভাগ
করিয়া তিনি নিরমমত সময়ে প্রত্যেক
কাজে নিবৃত্ত হইতেন। ভোগ-বিলাসের
ইচ্ছাকে তিনি সর্বদা দমন রাখিতেন। ফলে,
হিন্দুস্থান তাহার রাজত্বকালে অতুলনীয়
সমৃদ্ধি ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল। বস্ত্র-
উল-আবল-এ আগরী শাহজাহান সম্বন্ধে
লিখিয়াছেন,

“নিজ হস্তে নিজে তুমি গুরু রাজ্যভার।

প্রজন্মদশর তাই তব অপ্রাণন ॥

রাতিদিন নিদ্রা নাই নরনে তোমার।

অন্ত্যাতার তাই হ’ল নিদ্রার মগন।

আওরংজেব শাহজাহানকে বাহিরের
কোন লোককে পত্র লিখিতে নিষেধ করা
সঙ্গেও তিনি পত্র লিখিতে সচেষ্ট হওয়ার,
লিখনোপযোগী দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা
হইয়াছিল। অতঃপর আর স্বহস্তে পত্র
লিখিবারও তাহার অধিকার রহিল না।

তাহার পর, আওরংজেব মনুষ্যতত্ত্ব, দার
শাস্ত্রের পরিতোষ অলঙ্কার ও অন্ত্যস্ত রত্নাদি
শাহজাহানের নিকট হইতে লইবার জন্ত সচেষ্ট
হইলেন। থাকি খাঁ লিখিয়াছেন যে,
আওরংজেব শাহজাহানের একশত গোলাকার
মুক্তাঙ্ক জপের মালা (বাহার মূল্য চারি লক্ষ
টাকা ছিল) ও হস্তের অঙ্গুরীর তাহার
নিকট চাহিলে তিনি অঙ্গুরীর প্রেরণ করেন,



ମିତ୍ର-ପତ୍ର

(ଶାନ୍ତନୁପାଳ ଓ ଆଶ୍ବତ୍ଥ)

ଅକ୍ଷୟୀଙ୍କ ପଦାବଳୀଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ । ପ୍ରକାଶକ: ଶ୍ରୀମାତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ଟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍

কিছু অপের দালা সম্বন্ধে বলেন যে, আওরংজেব পুনর্কার ইহা প্রার্থনা করিলে তিনি মুক্তার এতোকাট তাকিয়া চূর্ণ করিবেন।

যতদিন আওরংজেব-পুত্র মুলতান মুহম্মদ শাহজাহানের কারা-রক্ষক ছিলেন, ততদিন শাহজাহান কথঞ্চিৎ শান্তিতোগ করিতেন। মুহম্মদের পরে, খোজা মৃতবদের উপর এই কার্যভার ন্যস্ত হইলে, বাধশাহের উপর অভ্যস্ত পীড়ন চলিতে লাগিল। এমন কি অনেক সময় খোজা তাঁহার সহিত ক্রীতদাসের স্ত্রীর ব্যবহার করিত। অধিক কি সামান্য পাহুকা বা বস্ত্র ও বখাশময়ে এবং বখাযোগ্যভাবে বৃদ্ধ বাধশাহকে সরবরাহ করা হইত না।

প্রথম বৎসর পিতাপুত্র বাধাহুবাধ-মুচক পত্র ব্যবহার চলিত। আওরংজেব নিজের ব্যবহার স্ত্রীর-সঙ্গত বলিয়া সম্বর্জন করিতেন; এবং কারণ দেখাইতেন যে, বাধশাহের পীড়িত অবস্থার দ্বারা বেজ্ঞাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, দ্বারা জরলাভ করিলে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান-ধর্ম লোপ পাইত; দ্বারার বেজ্ঞাচারিতা-মমনের জন্তই তিনি আশ্রা-অভিস্রুৎ দ্বারা করিয়াছিলেন এবং ধর্মের জন্তই তিনি ভরবারি-গ্রহণে বাধা হইয়াছিলেন। দ্বারার প্রতি অতিরিক্ত দেহই ভ্রাতৃবৃন্দের মূল কারণ, রাজারক্ষা ও প্রজাপালনই রাজধর্ম, স্বখেচ্ছা ও বিলাস রাজধর্ম নহে, অগভীরের ইচ্ছাতেই তিনি জরলাভ করিয়াছিলেন। ওই সকলের উত্তরে শাহজাহান পুত্রকে চোর বলিতেও বিধাবোধ করেন নাই।

এদিকে শাহজাহানের মনঃপীড়ন অবধি

ছিল না। দ্বারা, মুরাদ, ও মুলেমান শমন মদনে প্রেরিত হইলেন; শুভা সপরিবারে অপরিচিত মপের দেশে নিহত হইলেন। কিন্তু, একদা অবস্থান্ত্রেও শাহজাহান ধৈর্য হারান নাই। সাতবৎসর-ব্যাপী কারাবাস-কালে তাঁহার অনেক অল্পরক্ত ভূত্যের সর্কনাশ ও অনেক অভাবনীর হৃৎটনা ঘটয়াছিল; কিন্তু তথাপি তিনি শেখজীবন পর্যন্ত বিচলিত হন নাই। ধর্মই তাঁহার সাধনা ছিল। প্রার্থনা, ধর্মচিন্তা ও কোরাণ-পাঠে তিনি সময়ান্তিপাত করিতেন। ঘোষ্ঠা কস্তা জাহানারা সন্ন্যাসিনীর স্ত্রীর জীবনান্তিপাত করিয়া বৃদ্ধ ও পরিত্যক্ত পিতার সেবা এবং দ্বারা ও মুরাদের কস্তাধরকে মাতার স্ত্রীর লালন-পালন করিতেন।

মুক্তার জন্ত শাহজাহান প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মুক্তার সমুখীন হইতে আর তাঁহার কোন ভয় ছিল না। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তাঁহার অর হর। ২২শে জানুয়ারী তিনি তাঁহার বেগমম্বর আকবরবাগী ও কতেপুরম-হল, ঘোষ্ঠাকস্তা জাহানারা ও ভ্রাতৃগণ পরিত্যক্ত হইয়া দেহ-তাগ করিলেন। কিন্তু বাধশাহ আওরংজেব পিতার নিকটে আসেন নাই। শাহ-জাহানকে তাঁহার প্রিয় বেগম সমতাজমহলের সমাধির পাশে সমাহিত করা হইল।

পিতার প্রতি আওরংজেব বেক্ষণ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা মহযোচিত হয় নাই। জাহাঙ্গীর আকবরের বিরুদ্ধে ও শাহজাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও পিতার প্রতি কেহই একদা নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। আওরংজেবের রাজালিপা

ভক্ততার কোনপ্রকার খাতির রাখে নাই এবং সেজন্য তিনি সাধারণের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন।

ত্রিশ বৎসর মহাসমারোহে ও সমৃদ্ধির সহিত রাজ্য করিবার পর বাহশাহ - শাহ-জাহান পুত্রের হাতে বন্দী হন। কান্নাগারে শেব আট বৎসর কাটাইবার পর মুক্ত্য

ভাষাকে সকল বয়স হইতে মুক্ত করিল। এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক খানি খাঁ লিখিয়াছেন—

“সোনার কলসী মত আমিও অগৎ,
কতু তাহে তিস্ত অল, কতু সরবৎ।

শমনের অর্থ থাকে সদা হৃদয়জিত,

‘আমি বড়’ বলে কতু হযোনা গর্জিত।” (১)

ঈশোগীন্দ্রনাথ সমাদার।

আমাদের সম্পদ

(রূপটকিন হইতে)

প্রাপ্, ঐতিহাসিক যুগে মানুষ বেদিন প্রস্তরকণক ও অকস্মাতলভ সুপার উপর নির্ভর করে’ জীবন ধারণ করত সেদিন-থেকে আজ পর্যন্ত নানা অবস্থা-বিপর্যয় ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা সভ্যতার যে স্তরে উপনীত হয়েছি, এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এতদিন ধরে মানুষ অনবরত বিচার করেছে, পর্যবেক্ষণ করেছে, আবিষ্কার করেছে, নির্মাণ করেছে, ধূলুর সমাট পৃথিবী তাদের চেষ্টার স্বর্ণ শতে ভরে’ গেছে, আকাশের বিজ্ঞান বাতাসের বায়ু তাদের পদানত হয়ে দাঁসবৎ সেবা করেছে, সুনির্দিষ্ট হস্ত যন্ত্র পরিশ্রমের গুরু ভার লাঘব করেছে; এবং এই বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য আমরা অনেকখানি জানতে পেরেছি। এই

হাজার হাজার বছরের অবিভিন্ন পরিশ্রমের ফলে মানুষ যে-সম্পদ সঞ্চয় করেছে তা ‘আরব্য-রজনী’-বর্ণিত প্রাচ্যের সকল ঐশ্বর্যকে রান করে’ দিয়েছে।

নানা কলকৌশলের দ্বারা দেশের জন-করক মাত্র লোক ধনী হচ্ছে বটে তবুও মানবসাধারণ সে-সম্পদ-ভোগে একেবারে বঞ্চিত নয়।

আমরা নিজেদের বতখানি সম্পদের অধিকারী মনে করি, আমরা তার চেয়ে বেশী ধনী; আমাদের যা আছে শুধু তাই নিয়ে নয়, আমাদের উদ্ধাবিত কল-বল বস্ত্র-ভোজ্য সাহায্যে ভবিষ্যতে যথেষ্ট ফসলাভের সম্ভাবনা আছে। বিত্ত আহরণ ও সঞ্চয় ধনীর একমাত্র সঞ্চয় নয়; আহৃত ও সঞ্চিত সম্পদের বার্থ ব্যবহারেই

(১) দারাতলো :—দারিদ্র্যের দ্বার প্রত্যক্ষদর্শী। ভক্তা—সাহসী। সুগায় বয়স—বাহার বাহা পূর্ণ হইয়াছে। আওরতেব—সিংহাসনের অলঙ্কার। ঈহানারা—পৃথিবীর অলঙ্কার। জাহানারার কনিষ্ঠা জৌন-আরা অর্থাৎ আলোকমণ্ডিত।

ধনীরা পরিচর। সাধারণত অজ্ঞাত-বংশপরম্পরা-প্রচলিত ধনবলের ও বিজ্ঞান-কৌশলের সহায়তায় যদি আমরা সার্বজনীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করি, তাহলেই আমরা স্বার্থরূপে ধনী হতে পারব।

বর্তমানে সভ্যসমাজ মাঝেই উপরোক্ত প্রকারে বিপুল সম্পদের অধিকারী। তবে দেশবাসী দারিদ্র্যের এ হাহাকার কেন? জনসাধারণের দেখ-প্রাণনাশী এ নিদারুণ পরিশ্রম কেন? অতীতের ভাণ্ডারলব্ধ এত সম্পদের মধ্যে কর্মী সাধারণের এ সংস্থানহীনতা ও অনিশ্চরতারই বা কারণ কি?

এর কারণ হচ্ছে, সুদূর অতীতে মিথ্যা অধিকারের দাবীতে জনকয়েক লোকে সাধারণের প্রমলক বিস্তার বেশী অংশ হস্তগত করেছেন এবং নিত্যন্ত স্বার্থের মত বদ খেয়ালে সেই অজ্ঞারলব্ধ সম্পদ নষ্ট করেছেন। এর কারণ, ছলে-বলে-কৌশলে সেই সাম্রাজ্য করেকজন লোক জনসাধারণের একমাসের ত দুইয়ের কথা, এক সপ্তাহেরও অরসংস্থান না রেখে, এমন অবস্থার তাদের এনে ফেলেছেন যে আজ সেই জনকয়েক ধনীকে প্রমলক জিনিসের বেশীর ভাগ দেওয়ার কড়ামু কাব করা ছাড়া তাদের আর উপায় নেই। এর কারণ, সেই জনকত ধনী অবশিষ্ট লোকদের বিরে সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী জিনিস তৈরি না করিয়ে বে-জিনিসে তাঁদের লাভ বেশী সেই প্রকার জিনিসই তৈরি করাচ্ছেন। Socialist সম্ভাব্য এই সব কথার আলোচনা ও আলোচন করেছেন অনেকবার; সাধারণের

আহার, বিহার, আশ্রয় ও শিক্ষার কথা তাঁরা ধারবার বলেছেন, কিন্তু কেউ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করবার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করেন নি, কারণ যাদের হাতে এই সংস্কারের ভার, তাঁরা নিজেদের ক্ষতি করেন কেমন করে!

অধিকার-স্বত্বে লব্ধ বর্তমান সভ্যতা, জীবন-মাত্রার সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, পূর্ববর্তী-গণের জীবনবাসী প্রাপ্যত পরিশ্রমের ফল। বিশেষ ঠাক-কিছু গরীবান, ঠাক-কিছু মহীবান, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ লক্ষ বৎসরের একান্ত চেষ্টা নিহিত। প্রতি কাঠা জমি কত শত জাতির শ্রম-বর্শসিক্ত, প্রতি বিঘা জমির পশ্চাতে অজ্ঞাররূপে বাধা পরিশ্রমীরা, দীন-দরিদ্র মজুরের প্রতি দুর্ল্লিসহ অন্যাচারের স্তবীর্ণ নিরানন্দ ইতিহাস। প্রতি রামগুণ, প্রতি হর্দ্যা, সভ্যতার প্রতি অঙ্গ মানুষের শোণিত-সিক্ত। যে বিচিত্র সভ্যতার গর্বে আমরা আজ ক্ষীভ, লক্ষ লক্ষ কর্মীর চেষ্টার সে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীময় প্রাণপ্রণ বহু তাকে রক্ষা করেছে। তাদের অভাবে এ সভ্যতা টিকবে কদিন?

অতীতেরই হোক আর বর্তমানেরই হোক, প্রতি আবিষ্কার, প্রতি চিন্তা সাধারণ সম্পত্তি। বিখ্যাত হোন বা অখ্যাত হোন, হাজার হাজার আবিষ্কার ও শিল্পীর দুঃখ-দারিদ্র্য অপমানের সঙ্গে অনন্ত সংঘাতই বর্তমান সুখ-সমৃদ্ধির মূল। দেশ বা জাতি' মাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি, শ্রম-নিরসনের এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাশ্রম-স্বল্পনের মূল্যেও লক্ষ লক্ষ লেখক, কবি ও মনীষীর এই বিপুল

পরিশ্রম দেখা যায়। কিন্তু সমসাময়িক কৰ্ম্মাণ্ণের সাহায্য পেয়েছি বলেই, অতীতের সঞ্চিত সম্পদ লাভ করেছি বলেই আজ আমাদের পরিশ্রম এতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে; তার অভাবে বর্তমানে কি অবস্থা হোত তা কল্পনা করাও কঠিন। আজ যদি আচাৰ্য বঙ্গের উদ্ভাবিত যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করার মত উপযুক্ত শিল্পীর অভাব হোত তবে তাঁর আবিষ্কারের মূল-নিৰ্দ্ধারণ ততটা সহজ হোত না। তধু তাই নয়, শিল্পীর দল প্রথম-উদ্ভাবিত যন্ত্রের সমস্ত অসম্পত্তি ও অসম্পূর্ণতা পূরিতে তোলবার পক্ষে কতকাল ধরে যে কত সাহায্য করেছেন, তার ইহুতা নেই। বিজ্ঞান ও অধ্যবসায়, মস্তিষ্ক ও মেহের সহযোগিতায় এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে, এ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে; তবে কেন কয়েকজন মাত্র লোক এই সৰ্বসাধারণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে? আমাদের—জনসাধারণের কি এতে কোন অধিকার নেই?

মজুরের ছেলে কৰ্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে' মনিবকে তার উপর ফসলের বা আহত সম্পদের বোঝার ভাগ না দিয়ে কোন ক্ষেত্রে, কোন কল-কারখানায় বা কোন খনিতে কাজ করতে পার না। সাম্রাজ্যবাদের পরিশ্রমের ফলে তার সম্পদ সঞ্চয় তদূরের কথা, অতিকষ্টে দিন-গুজরাণও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনিশ্চিত ও সামান্ত এই মজুরীর বিনিময়ে সে বিক্রয় করেছে তার মেহের শক্তি, তার জীবনের রক্ত। তারই পিতৃপিতামহ মলা সোঁচতে, কল তৈরি করতে, কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের সমস্ত শক্তি এই

কালে ব্যরিত হয়েছে; এবং আমরা তাদেরই রক্তরঞ্জিত এই প্রাচীন সভ্যতার গর্ভিত। কিন্তু তাদের বংশধরেরা আজ দীনতম হীনতম বর্করের চেয়ে ধরিত্র। তাদের জীবন দুঃখ ও হতাশার গভীর অন্ধকার হতে গভীরতর অন্ধকারে এক মহা আত্মবিসর্জন। তাদের পরিশ্রমফল ফলের এক-চতুর্থাংশ তাদের মনিব, অপর-চতুর্থাংশ বেশের শাসনকর্তা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দেওয়া কড়ারে সে কালের অধিকার পার। ধনী-সম্প্রদায়ের খাঁই প্রত্যাহই বেড়ে চলেছে, সে-খাঁই বেটে মজুরেরই সারাদিনের হাড়তাল্লা-পরিশ্রমে। তারপর তার নিজে উন্নতি করার শক্তিই বা কোথায় আর স্থাপাই বা কোথায়? তারা দিন দিন মহাযন্ত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সভ্যসমাজ তাদের পরিশ্রমফল সম্পদ বিলাস-লালসার নষ্ট করে' সভ্যতার আবরণে বর্করতার অভিনয় কচ্ছেন।

সমাজের অভাবের দিকে দৃষ্টি না রেখে যাঁরা বেশের কসলের ব্যবস্থা করেন, তাঁরা ব্যবসায়ীদের লাভ-ক্ষতির বাঁধা পতিরানের দিকে চেয়ে আছেন। এবং ব্যবসায় উঠা-নাড়া, কল-কারখানার গোলমালে হাজার হাজার লোক লক্ষ-হারা হয়ে পথের তিথারী হচ্ছে।

বেশের সাধারণ-সম্প্রদায় নিজেদের হাতে জিনিষ গড়ে, কিন্তু তা নিজের পরিশ্রমফল অর্থে কিনতে পারে না। বেশের কল-কারখানার স্বদেশী শিল্পী বিশেষের রপ্তানির দিকে চেয়ে বসে আছে, সেখানকার বাজারেই তাদের নিজের গতি। আর এই বাজার-দখলের আশায় দুই জাতিসমূহ পরস্পরের

মধ্যে যে স্ফীতির আগুন জ্বলছে, তার শেষ কোথায়? বিশ্ব জুড়ে কেবল কামান-গর্জন, এক-একটা জাতি অস্ত্র-শস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে ধরা-বন্ধ থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সভ্যমণ্ডলে আরও এক-তৃতীয়াংশ অস্ত্রনির্মাণে ব্যয়িত হচ্ছে, আর সেই অস্ত্রের ব্যবহার বহন করছে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত মজুর-সম্প্রদায়।

শিক্ষার সুবিধা এখনও অনেক লোকেই ভোগ করে। মজুরের ছেলেকে যখন ভর-বছর বহলে বাপ-দাদাকে সাহায্য করতে মাঠে, কারখানার বা ঘানিতে যেতে হয়, তখন দেশব্যাপী শিক্ষার কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। সারাদিন হাড়তাল্লা খাটুনির পর তারা শিক্ষা-লাভ করবে কখন? এমনি করে' সুযোগে ও অসুবিধার, সম্পদে ও দারিদ্র্যে সমান দুই পরস্পর-বিশুদ্ধ সম্পদ্যারে যখন বিভক্ত, তখন মানুষের স্বাধীনতার কথা তোলা হাস্যকর নয় কি?

ধর্মগম্প্রদায়ের নীতি-উপদেশ লঘা-চওড়া কথার কথা মাত্র। এই বিপরীত ও অস্বাভাবিক-পরিবর্তনের কথার এ দেশের লোক বিশেষরূপে উদাসীন; কারণ, এই ব্যবস্থার প্রতিকারের ফলে তাঁদের স্বার্থহানি সূনিশ্চিত। নিজেদের সামান্য স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা দেশজুড়ে সবাই অস্ত্রায় ও মিথ্যা আচরণ করি এবং সেই অস্ত্রায় ঢাকবার জন্যে লোক-তুলানো সাহিত্য ও বিজ্ঞান গড়ি। বখার্ব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বদলে পণ্ড পণ্ডিতী আমাদের একমাত্র আশ্রয়। বর্তমানে তওরি ও পণ্ড পণ্ডিত্য, সভ্যমানবের দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সমাজ হয় সত্যের দিকে কিরবে, নয় ধ্বংস হয়ে যাবে। মাঝামাঝি অবস্থা

কিছু নেই। সত্যকে বাদ দিয়ে, অস্ব-সম্মতকে বাদ দিয়ে, পরস্পর সাহায্য ও সমবেদনা বাদ দিয়ে সমাজ বাঁচতে পারে না—অতীতের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ পণ্ড মত মানুষ-অস্ব-ভবিষ্যতে লোপ পাবে। এই মিথ্যার জাল থেকে সমাজকে, আমাদের মনকে বিমুক্ত করতে হবে। যদি বাঁচতে চাও, যদি মানুষকে ও মানুষকে প্রভা কর, তবে এতদিনের সঞ্চিত অস্ত্রায়ের তার লাঘব কর। দেশের ফল সবাই ভাগ করে' নাও। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে আপনার লক্ষ-লালসার প্রয়োগ দিও না। লগতে বা অস্বায় লগহাসীই তার মালিক। এ সভ্যতা একজনে গড়ে' তোলেনি—সুপ-সুগানের পরিশ্রম এর মধ্যে নিহিত। সকলেরই সমান অধিকার; কারও কম বা বেশী নয়—হোক সে শক্তিশাল বা অক্ষম, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা নিধন। অভাবও আছে সবারই, কম বা বেশী; সে অভাব পূরণ হবে দেশের উৎপন্ন জিনিসেই। যাদের মানুষ হবার সুবিধা নেই, তাদের সুবিধা দাও; দশকে হারিয়ে এককে বড় করবার চেষ্টা করো না। তোমার বা একলার নয় তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার তোমার কোথায়?

অস্ত্রায়ের বা সঞ্চিত সম্পদ বখার্ব সভ্যতার পরিচায়ক নয়; জ্ঞানের গভীরতা এবং হৃদয়ের প্রসারই সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি। মানুষকে যখন তার বখার্ব অধিকার দেব, তখনই মানুষের যা বড় কথা তার প্রতিষ্ঠা হবে; সে কথাটি হচ্ছে—“কল্যাণের অধিকার, সার্বজনীন কল্যাণ।”

ঐ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় পরিবার-মণ্ডলীর উপর যুরোপীয়

সভ্যতার প্রভাব

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

যখন ইংলণ্ড, স্বকীয় ব্যক্তি-স্বাভাব্য-মূলক সভ্যতায় ভারতে প্রচার করিতেছিলেন, তখন ভারতের জনসমাজ কিরূপ ছিল তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঐসকল সভ্যমতের পরিসর-সীমা কতদূর বিস্তৃত তাহা দেখাইবার জন্য প্রথমে আমি Smiles-এর Self-Help হইতে তাহার গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ক্রমোন্নতির মূলে আত্মসাহায্যের তরুটি অবস্থিত... অনেক সময়, যে সাহায্য আমরা অপরের নিকট হইতে পাই তাহা আমাদেরকে দুর্বল করে; নিজের নিকটে যে সাহায্য পাই তাহাই আমাদেরকে বলবিশিষ্ট করে। কোন সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য অথবা বিশ্বমানবের হিতের জন্য, কোন ব্যক্তি যে কাজ করে তাহা একপ্রকার হীনতাভাজনক; কেননা, সেই কাজ প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে, নিজের জন্য কাজ করিবার আবশ্যিকতা অপনীত করে; বেশী উপদেশের ফলে, বেশী শাসনের ফলে, মানুষ অগত্যা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহও কাজ করিবার জন্য মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। হৃদয় আদর এইটুকু আশা করিতে পারি যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান, আত্মশ্রদ্ধা সাধনে,

নিজের অবস্থার উন্নতিসাধনে, মানুষকে স্বাধীনতা দিবে।”

আবার, উনবিংশতি শতাব্দীতে আবির্ভূত ইংলণ্ডের দুইজন চিন্তানীল লেখকের লেখা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

John Stuart Mill বলেন :—

“বেচ্ছাচার-শাসন হইতে কেবলমাত্র কিয়ৎ পরিমাণে সুফল তত্ত্বজনই উৎপন্ন হয়, বতকণ না বেচ্ছাচারতত্ত্ব ব্যক্তি-স্বাভাব্যকে একেবারে পিষিয়া ফেলে; কিন্তু যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাহ্য-কিছু ব্যক্তি-স্বাভাব্যকে নিষেধিত করে তাহাই কতকটা বেচ্ছাচারিতা।”

Spencer বলেন;—“প্রভুত্বের হাস— বাহ্য আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির একটা বিশেষ লক্ষণ সেই প্রভুত্ব হাসের বাহ্যিক বিরোধী, তাহার স্বাধীন-চেতা কোন বালককে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হন না। উৎপীড়নের দিকে না-বাণের প্রবণতা যত কম হয় ছেলে-মেয়ের স্বাধীনতার দিকে প্রবণতা ততই বেশী প্রকাশ পায়। এই উভয় প্রবণতাই এমন একটা শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠার সূচনা করে যাহা আমরা নিষেধ করিয়া থাকি : আসল কথা, নিজ কার্যকালের অভিজ্ঞতা হইতে আপনাদিগকে যথাগণে পরিচালিত করিতে

বাশকরা ক্রমঃ অভ্যন্তর হর। এই উভয় প্রবেশতা হইতেই আমাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সঞ্চারিত হয়। স্বাধীনচেতা শিশু হইতেই স্বাধীনচেতা পূর্ণবয়স্ক ইংরেজ বা মানুষ উৎপন্ন হয়। একটি না হইলে আর একটি হইতে পারে না। (১)

বাস্তবত্বাভ্যাস সত্ত্বে এই যে-সব উদ্বোধন,
 উহার কিছু না কিছু পরিণাম-ফল অবশ্যস্বাভাবী।

একজন বাঙ্গালী প্রত্নকার বলেন :—
 “যেখানে চিত্তের প্রশান্তি ও অবিলম্ব প্রদ-
 নীলতা। খুবই দরকার সে কাজে বাঙ্গালী
 সফলতা লাভ করিতে যে পারে না, তাহার
 কারণ, গৃহের মধ্যে বাঙ্গালীর অশান্তি ও
 উদ্বেগ। অনেক স্থলেই বাঙ্গালীর “মদুর
 গৃহ”ই অশেষ প্রকার দোলাবোগ ও অশান্তির
 সূচক-উৎস। যে গৃহে কোন গুণীজন বা
 প্রতিভাবান ব্যক্তি অবস্থিতি করে, সেই

গৃহের প্রাচীরকে যদি প্রশ্ন করা যায়, না জানি তাহার নিকট কত কথাই শুনা যাইতে পারে! না জানি সে কত অশ্রুধারা দেখিরাছে, কত দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস তাহার স্তম্ভপাটের হইয়াছে! কত ক্ষতবিক্ষত চরণের, কত অগাধ দায়ের দৃষ্ট চোখে পড়িরাছে; সে দেখিরাছে— কত চেষ্টা নিফল হইয়া গিয়াছে,— আবার আরাগ্ত হইয়াছে, আবার নিফল হইয়াছে;—গার্হায্য দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া কত বীর-দগ্ধ অনিচ্ছাসহেও আত্মসমর্পণ করিরাছে! এই হিম্মগৃহ, অস্ত্রের কত উৎসাহ-মূলিনকে নির্ঝাপিত করিরাছে, কত মহৎ উদ্দেশ্যকে নিষেধিত করিরাছে। এই যে সব বিনাশের শক্তি ইহার মধ্যে সব-চেয়ে খাপস দারিত্র্য নহে। কিন্তু যে গৃহে অনেক নরনারী একত্রে বাস করে, অথচ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই, অস্ত্রের সম্বন্ধে প্রত্যেকেই

(১) এই অংশ শেখসহরের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে এই কথা আরও আছে :—

[illegible]

একটা না একটা অভিযোগ আছে—সে গৃহে যে-কোনো ও চিত্তচাক্ষুশ্য স্বভাবতই উৎপন্ন হয় তাহাতে-করিয়া সকল প্রকার উত্তম উৎসাহ ও কার্যশক্তি জন্ম না হইয়া যায় না। জীলোকদিগের কণ্ঠা-কণ্ঠি, পূর্ববদিগের বহুদল বিবেচ, “সামাজ্য কারণ হইতে মহাসংগ্রামের উৎপত্তি”—এই সমস্ত ব্যাপারে, হিন্দু-গৃহের দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগের মনে একটুও শান্তি থাকে না। কখন মানমর্যাদার কথা মান লইয়া, কখন ধনসম্পত্তির কথা লইয়া, কখন-বা কর্তৃত্ব ও অধীনতার কথা লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলে। অবশ্য সময়ে সময়ে যুদ্ধের বিরাম হয়, কিন্তু “সমস্ত নিরপেক্ষতা” ছাড়া শান্তির সীমা আর বেশীদূর অগ্রসর না।” (N. Ghosh, Kristodas Pal p.p. 146-147)।

একজন বাঙ্গালী লেখক, M. Bose তাঁহার “হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে” এইরূপ অস্তিত্বের ব্যক্ত করিয়াছেন:—“পাশ্চাত্য প্রভাব, হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিবর্তন অনিবার্য। যে সকল প্রতিষ্ঠান লোপ পাইতে বসিয়াছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের যে স্তুবিধা তাহা আমাদের বুঝা উচিত এবং সেই সকল স্তুবিধা বাহাতে আরও ধীর্ঘকাল আমরা রক্ষা করিতে পারি তৎপ্রতি আমাদের বথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য। আজকালের শিক্ষিত লোকেরা যে সকল সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত উৎসবাদি হইতে নিজে সাবাস্তাবে আহ্বাণে পারি না, সেই সকল উৎসবাদের প্রয়োজনীয়তা তাহারা বুঝিতে পারে না। পারিবারিক

ব্যবস্থা-পদ্ধতির ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজি প্রভাবে পরিপুষ্ট স্বার্থবুদ্ধির সহিত উক্ত ব্যবস্থা-পদ্ধতি খাপ খায় না। নব্য হিন্দুসমাজে ধর্মত্রেতা, প্রাচীন সমাজ-প্রতিষ্ঠিত স্বকীয় অধিকার হারা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ভিক্ষাবানের নিম্না করিয়া থাকে।”

পাশ্চাত্য প্রভাব এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা হিন্দুসমাজে ব্যক্তিব-বৃদ্ধি ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হিন্দু পরিবার-মণ্ডলী, হিন্দুসমাজ, এরূপভাবে গঠিত হইয়া ছিল যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিব-বৃদ্ধি সেখানে মাথা তুলিতে না পারে,..... কিন্তু ইংরাজি-শিক্ষার ক্রমোন্নতি ও ইংরাজি শিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মস্ত একটা বড় কারণ রাখিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এখন বেশ অস্বস্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, নিজ পরিবারের নিকট বা সামাজিক পরিবেষ্টনের নিকট সে সম্পূর্ণরূপে গুপী নহে। যে-জাতের লোকই হোক না কেন, সে সকল ধানের শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সর্বোচ্চ পদগৌরব লাভ করিতে পারে। এই ব্যক্তিব-বৃদ্ধি একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। এই ইতিহাসে যে সকল পরিবর্তন বিবৃত হইবে, এই আকাঙ্ক্ষাই সেই সমস্ত পরিবর্তনের হেতু।” (Hindu Civilisation I. P. LXIX, LXX)।

M. Bose, ব্যক্তিব-বৃদ্ধির পরিপুষ্টির মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভূত প্রভাব যে দেখিয়াছেন তাহা কতকটা ভ্রাম্যসত্য। কিন্তু তিনি যে মনে করেন,

কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই ভারতীয় সমাজে হঠাৎ একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, একথা ঠিক নহে। এই পরিবর্তন, সমাজের বাস্তবিক ক্রমবিকাশেরই ফল। যুরোপীয় সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজ ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইলেও হিন্দুসমাজের গতি সেই একই লক্ষ্যের নিকট উদ্ভূত :—ভাষা, ব্যক্তির নৃক্সিগাধন। জাতের খণ্ডবিভাগ, জাতের পদমর্যাদা-সোপানের পরিবর্তন, পিতৃ-কর্তৃত্বের ও কৌলিক স্বাধিকারের ক্ষয়ধ্বংস; ভাইদিগের ও পুত্রদিগের, অবিস্তৃত পরিবার-পদ্ধতি হইতে বাড়ির হইবার অধিকার; স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার ও অস্ত্রম-বানপত্র অহুয্যী উত্তরাধিকার স্বীকার করা; বৈষম্য-সম্প্রদায়গুরুকর্তৃক প্রচারিত সাম্য ও নৈজী-সম্বন্ধীয় মতবাদ—এই-সব উপাদান ইহা সেই ক্রমবিকাশের অন্তর্ভুক্ত নিছক হিন্দু উপাদান। এবং যুরোপীয় প্রভাবের আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল বিদেশীয় উপাদান সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমাজকে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে, সেই সকল উপাদানকেও গণনার মধ্যে আনা আবশ্যক। এইরূপ, লব জাতির ও মোগল জাতির রীতিনীতি, সামন্ততন্ত্র, কত্র-বীণোচিত ব্যবহার, ইসলামের সাম্যবাদ, তাগা-পরীক্ষক সাহসিকদিগের অস্বাভাবিক বৃত্তান্ত, সর্বোপরি বোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-মাহাত্ম্য

—এই সমস্তও ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত।

তা' ছাড়া, আরো অস্ত্রান্ত উপাদানও ইহার ভিতরে আসিয়া পড়ে :—যথা, অর্থ-নৈতিক উপাদান। M. Bosc ট্রিক্‌ই বলিয়াছেন যে, আরহন্-আরাবের ইচ্ছা, সুখভোগের বাসনা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধানের লক্ষ্য গর্ভ, আধুনিক জীবনযাত্রা-নির্মাণের কঠিনতা, মূল্যবান ধাতুসমূহের মূল্য-হ্রাস—এই সমস্ত, একান্তবর্তী পরিবার-পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধনে সাহায্য করে। ইংরাজের আমলে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাবাধীনে এই সকল অর্থনৈতিক উপাদান সাক্ষাৎভাবে বেশী কাজ করিলেও দীর্ঘকাল হইতেই উহার জিরাফল কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে : অন্তর-মহলে রমনীদিগকে বস্ত্র করিয়া রাখিবার অবশ্য-কর্তব্যতা, মূল্যমান-প্রবর্তিত মেলাই-করা কাপড় ব্যবহারের প্রচলন, মোগল ও পারস্যকবিগের নিকট হইতে বিলাসিতার শিক্ষা,—এই সমস্ত, এদেশের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্র পরিবার-মণ্ডলীয় অধ্যাপন সাহায্য করিয়াছে। কি বৈষয়িক কি নৈতিক উত্তর হিসাবেই, যুরোপীয় সভ্যতা শুধু এই কার্যের সম্বন্ধেই বিধান করিয়াছে, সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে মাত্র—আসলে বহুকাল হইতেই এশিয়িক সভ্যতা লোকের অজ্ঞাতমারে এই পথেই চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীযোতির্ভিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর।

আধুনিক নাট্যসাহিত্য

আমাদের দেশে নাট্য জিনিসটা রঙ্গ-মঞ্চের রঙ্গের সঙ্গে এমনি জড়িত হইয়া আছে যে, stage-craft যে নাটকে নাই তাহাকে আমরা নাটক বলিতেই প্রস্তুত নই। নাটক বলিতে সাধারণ লোক বুঝে, প্রবল ও প্রচণ্ড সব ঘটনার রটনা, যথা প্রণয়ের হাহাকার-হাস্যতাপ, বেব-হিংসা অবিখ্যাস-অভিমানের পালা; তারপর পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, গ্রেপ্তার বা পুনর্বারাপি ব্যাপারে মিলনে বা বিয়োগে সে পালার শেষ। এ ছেন নাটকে কোন অদৃষ্ট ঘটনার অবতারণা করিতে আটক নাই। খুব কল্প রঙ্গ, বীর রঙ্গ, করুণ রঙ্গ, হাস্যরঙ্গ বা তাঁড়ামির ছয়লাপ ঘটলেও তাহাতে ভ্রোতা বা পাঠকদের উৎসাহের অপলাপ হয় না, বরং উত্তেজনার উত্তাপের নাত্রা বাড়িতেই থাকে।

সেই সত্তা আমার মনে হয় যে, নাটক সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা বড়টা অস্পষ্ট, উপভাস বা নবন্যাস সম্বন্ধে ততটা নয়। নাটক সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়াই উচ্চাঙ্কের কোন আধুনিক নাটক পড়িলে তাঁদের কাব্য বা বুদ্ধিতে কষ্ট হয়, কাতো বা সময় নষ্ট হয় এবং কেহবা স্বামণ্য কষ্ট হন! রূপক নাটক পড়িলে, সেটা তাঁদের কাছে ঠেকে বোর হেঁয়ালী, আর বাস্তব নাট্য পড়িলে সেটা হয় সমাজ বা ধর্মের খোন্দ-খোন্দালী পালাপালি। একটাতে পাওয়া যায়

তুধুই কুয়াশা, আর একটাতে দেখা যায় বার্থ কু-আশা!

হুতরাং নাট্যের প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে বোধ হয় ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ বাংলা দেশে আধুনিক কালের রূপক নাট্যই বলি আর বাস্তব নাট্যই বলি, দুচারটে ছালা ধরণের নাট্য দেখা দিয়াছে; এমন আরো দেখা দিবে আশা করা যায়।

নাট্যের উৎপত্তি আমরা কখন দেখি?

এক দেখি, যখন সমাজের মধ্যে জীবনটা বিচিত্র ও বেগবান্ এবং সেই বৈচিত্র্য ও বেগকে প্রকাশ করিবার আবেগ মাহুষের মনকে খুব কমিয়া নাড়ী দেয়। সেই আবেগের দ্বারা নাটকে বস চড়া এবং এবং তার গরটাও নাটকে বস বিলবিত হয়, সাহিত্যের অন্ত কোন রূপে, যেমন খণ্ড কাব্য বা উপন্যাসে, তেমন হইতেই পারে না। তাই জীবন যখন একটা অদৃষ্টপূর্ণ আবেগ-নিবিড়তা কিম্বা বিশ্বস্তের উত্তেজনার উচ্চ সপ্তকে লীলা করে, তখনই দেখি নাটকে তার প্রকাশ। সেই আবেগ-উত্তেজনা কতকটা বিভাইলে ও ধমুকাইলে তবেই উপন্যাসের অবকাশের পালা দেখা দেয়। তুলনা দিতে গেলে নাটককে বলা যায় অর্কেষ্ট্রার গান, আর উপন্যাসকে বলা যায় অর্গেনের গান।

আর দেখি নাট্যের উৎপত্তি, যখন সমাজের মধ্যে সমস্যাগুলো জটিল হইয়া ওঠে এবং তাহাদের নানারকমের সমাধানের

প্রতিবাহ হয়, স্রুতরাং আদর্শগুলোর বাত-প্রতিবাত প্রবল আকারে দেখা দেয়; যখন মানুষের সহজ অখণ্ড জীবনটা সেই সব বাহিরের বিভিন্ন আদর্শের বাতপ্রতিবাতের মধ্যে পড়িয়া নানাধা না হইতে থাকে এবং ভিতরেও এক ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের বাতপ্রতিবাত জাগিয়া ওঠে। কবেই তখন নাটকের আকার ছাড়া অন্য কোন আকারেই এই সব বিকল্প বিভিন্ন সমস্তা ও আদর্শকে সাকার করিয়া তোলা সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু জীবনের বিভিন্নতা হইতেই নাট্যের উৎপত্তি হোক কিংবা জীবনের সমস্তার অটলতা হইতেই তার উৎপত্তি হোক, নাটকে আমরা যে সব চরিত্র দেখি তারা রাক্ষ-ঘাটের মানুষের চরিত্র নয়, কিংবা যে সব চিত্র দেখি সেগুলিও প্রত্যেক দৃষ্টমান জীবনের চিত্র নয়। হামলেটের মত লোক যে পথে-বাটে দুশশতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং বলিতেছে, To be or not to be that is the question—এটা বোধ হয় কেউ বলিবেন না। লিয়রের মত সাধারণ মানুষ যে কারণে-অকারণে সর্বদাই সপ্তমের উপর আঁঠে চড়িয়া আছে তাতো বলা যায় না।

অতএব, নাটককারকে তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রগুলোর ভিতর হইতে নাট্যকল্পিত চরিত্রকে আবিস্কার করিয়া লইতে হয়—নাট্য-উপজ্ঞাসের চরিত্রমাত্রেরই সেই অন্ত এক হিসাবে abstraction। অবশ্য সেরত যে নাটকের চরিত্রগুলো কম “বস্তুত্ব” হয়, তাহা মনে করায় কোনও হেতু নাই। কেননা, বাহিরের সংসারে মানুষেরা যেখানে

লোকেরা করিতেছে, সেখানে আমরা না পাই তাদের type বা বিশিষ্টরূপ, না পাই তাদের temperament বা বিশিষ্ট প্রকৃতি। সেখানে সবাই কেমন যেন কাপুলা—ছায়াবাকীর খেলার মত। কিন্তু সেই বাহিরের ছায়াবাকীর অন্তরালে অন্তরতর জীবনের আসল নাট্যের লীলাখেলা যেখানে চলিতেছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিলে তবেই মেলে ভিন্ন ভিন্ন types, ভিন্ন ভিন্ন temperaments। কল্পনার যোগে নাটককার তাই সেই লীলানাট্যের নাটবেদিকার বাহের ষাড় করান, তাহের abstraction বলিলেও আসলে তারা—

“Forms more real than living man,
Nurslings of Immortality.”

মানুষের চেয়ে বাস্তবতর নাহি তাহে ভুল

তাহাই হচ্ছে অশীমকালের সন্ততিকুল!—

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করি। খবরের কাগজে প্রায়ই পড়া যায় যে, স্বামী জীতে ঝগড়া হইয়াছিল, স্বামী রাগিয়া জীই মাথার দা বসাইয়া দিয়াছে। এই সব কাগজী ঘটনাই যে নাট্যের সব উপযোগী ঘটনা তা নয়। অথচ শেক্সপীয়ারের “ওথেলো”তেও স্বামী জীকে খুন করিয়াছে; সেই খুনের বর্ণনার সঙ্গে আর খবরের কাগজের খুনের বর্ণনার কি তফাৎ? তফাৎ অনেক ধানি। ঐ খবরের কাগজের বিবরণীকৃত বাইরের খুন-খারাপটাই বর্ণনা করা যে শেক্সপীয়ারের “মডল” ছিল, এমন কথা মনে করিলে শেক্সপীয়ারকে নাট্যকার হিসাবে অত্যন্ত খাটো করা হয়। ওথেলোর “প্রতি

ডেসডেখোনার অন্তরের একনিষ্ঠ প্রেম ঐ সন্দেহ এবং হতাকাণ্ডের দ্বারাই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যে প্রকাশ পাইল, খুনের অবতারণার সেই ক্ষেত্রেই প্রয়োজন ছিল। খুনটা কেবলমাত্র বাইরের ঘটনা—নাটকের ভিতরকার ঈর্ষা ও সন্দেহের সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের সংঘাত-বিচিত্রতাই আসল। সেই সংঘাতের climax দেখাইবার অন্তই খুনের অবতারণা।

তবু বোধ হয় খুন ভিন্নও সেটা দেখানো যাইতে পারিত। শেক্সপীয়ারের যুগে violent passions, উদ্দাম প্রবৃত্তির নৃত্য দেখানো নাট্যকলার মধ্যে গণ্য ছিল। প্রাচীন হিন্দু নাট্যকলার কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর কোন প্রচণ্ড দৃশ্যের অবতারণা নিষিদ্ধ ছিল। এখন সাধারণতঃ বড় নাট্যকারেরা সেই প্রাচীন হিন্দু নাট্যকলারই পদ্ধতিরই অনুমোদন করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। যেটারলির বলেন, ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চ হইবে “A Theatre of peace and of beauty without tears.”—অশ্রুপাতহীন শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি। তাহার কারণ তিনি বলিয়াছেন, “A truly illumined consciousness has passions and desires infinitely less exacting, infinitely more pacific, more salutary, more abstract and more generous than an unillumined consciousness”—বস্তুতঃ উজ্জ্বলিত চৈতন্যের হৃদয়বোধ এবং বাসনাগুলি অজ্ঞানচিত্তের হৃদয়বোধ এবং বাসনাগুলির চেয়ে অনেক কম প্রবল, এবং অনেক বেশি প্রশান্ত, স্বতঃ, অতীন্দ্রিয় এবং উদার।

অতঃপর তাঁর মতে, শেক্সপীয়ারের যুগের নাট্যের ঐ সব বাহ্যিক উদ্দাম প্রবৃত্তির দৃশ্যগুলি নাট্যহিসাবে যে খুব উৎকৃষ্ট তা নয়। সে যাই হোক, শেক্সপীয়ার পড়িবার বেলাতেও মনে রাখিতে হইবে যে, সেখানে ঘটনাটাই নাট্যের প্রধান বিষয় নয়। ঘটনার অন্তরালে মানুষের ভিতরকার দৃষ্টিগুলি, বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতগুলিই নাট্যের সত্যিকারের বিষয়। এই মোটা কথাটা গোলার দরুন নাট্য সম্বন্ধে লোকের পক্ষে সত্য ধারণার উপনীত হয়। এতই শক্ত হয়।

আধুনিক রূপ নাট্যকার লিওনিড এন্ড্রেক্‌ ১৯১৩ সালে রুশ দেশের একটা রঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটা চিঠি ছাপেন, তাতে প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ ও ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর আইডিয়া তিনি খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যৎ থিয়েটারের তিনি নাম দেন “Panpsychic” অর্থাৎ all-soul বা all thought, অর্থাৎ আত্মাসর্ব্ব বা চিন্তাসর্ব্ব। তাঁর মতে action মিনিমটার থিয়েটারে কোন স্থান থাকার দরকার নাই। কেননা, আমাদের জীবনে অন্ত্যস্ত বিবাদ বা অন্ত্যস্ত শোকাবহ পরিণাম যে সব দেখা যায়, বাহিরে তাঁর প্রকাশ কতটুকু? ভিতরের দিকেই, আত্মার ভিতরকার গুরুত্বের মধ্যেই, তাঁর সমস্ত লীলা নয় কি? তা যদি হয়, তবে ট্রাজেডি লিখিতে গেলেই যে তাকে actionএর ভিতর দিয়া ফলাইয়া তুলিতে হইবে তাঁর কোন অর্থই নাই। ভিতরকার জীবন-ড্রামাকে উন্মোচিত করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ এন্ড্রেক্স, বেন্‌ভেঙ্কুটো চেলেনি এবং ফ্রেড্রিক নীটশে এই দুটি মাহুকের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। চেলেনি একজন মধ্যযুগীয় আর্টিষ্ট ছিলেন এবং ইতিহাসপাঠক ব্যক্তি যাত্রাই জানেন যে, তাঁর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য বড়, এত অল্প শোকের জীবনেই দেখা যায়। কত খুন-খারাপি, পলায়ন, কত কত-কতি, কত প্রণয়-অপ্রণয় শত্রুতার কাহিনী তাঁর চরিত্র-কথ্যটিকে যুড়িয়া জুড়িয়া আছে। চেলেনির এই চরিত্র-কথ্যটি এন্ড্রেক্সের মতে পুরাণো থিয়েটারের উপজীব্য। শেক্সপীয়ারের অধিকাংশ চরিত্রই এই চেলেনি-ছাঁচে পড়া।

চেলেনির পাশাপাশি নীটশে-চরিত্র যদি দেখা যায়, তবে দেখা যায় যে, যৌবন বয়সে তিনি যখন সৈনিক ছিলেন, তখন বরঞ্চ তাঁর জীবনে কিছু নড়াচড়া ছিল, কিন্তু তখন তাঁর জীবনে নাট্যরস বিশেষ কিছুই জরিয়া ওঠে নাই। কিন্তু যখন হইতে তিনি তাঁর লেখকের নিম্নক আসনে আসীন হইলেন, তখন হইতে তরে তরে তাঁর ভাব-জীবনের বিকাশ ঘটয়াছে। যে নীটশেকে আমরা জানি এবং যার প্রভাব আমরা সবাই জানি, তখন হইতেই বাস্তবিক তাঁর আরম্ভ।

কিন্তু এই নিম্নক অথচ নিগূঢ় নীটশে-চরিত্র ডামার বিচিত্র করিয়া ফলাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। চেলেনি আঁকা বরং সহজ। action দেখানো সহজ, thought দেখানো সহজ নয়। এন্ড্রেক্স এইজন্য তাঁর শেষ নাটকটার নাম দিয়াছেন "Thought"। তাঁর মতে

হালের নাটকের প্রধান নট বা নায়কই thought। সেই হতে নটরাজ।

অবশ্য এন্ড্রেক্সের মতটা হয়ত বা একবর্ণগা বলিয়া মনে হইতে পারে— কেননা, পুরাণো নাটকের সঙ্গে নূতন নাটকের কৌলিক আত্মীয়তার বহুদূরত্বও তিনি ছেদন করিতে চান। সেটা যে সবাই চায় বা চাইবে, তাঁর বিষ কোন প্রশ্ন নাই। হাল নাটক বলিলে সব নাটকই যে থেটারলিঙ্কের ধরনের অথবা এন্ড্রেক্সের ধরণের, তাতো নয়। ইব্‌সেন এবং তৎপরিচয় ট্রান্ডবার্গ, বার্গাড' শ প্রভৃতির নাটকও অন্তরঙ্গ লীলানাট্য নয়, pan-psyche নয়। এন্ড্রেক্স অবশ্য তাঁদেরও পুরাণো নাটকের বশভূক্ত করিয়া থাকেন। আমার বিবেচনার ইব্‌সেন প্রভৃতি, পুরাণো-নূতনের সন্ধিহানেই আছেন; অর্থাৎ action-কে তাঁরা সম্পূর্ণ বর্জন করেন নাই, ওহিকে thoughtকেও তাঁরা সম্পূর্ণ বর্জন করেন নাই। সমাজের উপরকার convention-এর চাকটা তুলিয়া তাঁর ভিতরকার কঁাকাটাকে তাঁরা দেখাইয়াছেন—কিন্তু সে কঁাকার নিমিত্তটা কি, তাহা যেবিবার, অন্য এন্ড্রেক্স প্রভৃতির মত পুথি বেশি দূর পর্য্যন্ত তলান নাই। তাই হোক আধুনিক নাটক বলিতে শুধু এন্ড্রেক্সের Black Maskers বা The Life of Man জাতীয় নাটকই ত বুঝায় না। আধুনিক নাটকের এত বিচিত্রতা ও বিনিমিত্তা আছে যে কোনটাকে যে প্রাচীনের সঙ্গে জুড়িব তাহা নির্ণয় করিতে পিরা জেরবার হইয়া পড়িতে হয়। নাটকের সব

রূপই চাই, সব রূপই ভাল—একথা বলিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। D'Annunzio ত আধুনিক প্রসিদ্ধ ইতালীয়ান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, তাঁর Honeysuckle পড়িলে মনে হয় যে শেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের অহুত্তিই পড়িতেছি। Hamlet-এর আরগার নাটকের প্রধান নায়িকা Audainকে বশান হইয়াছে মাত্র। সেটা কি আধুনিক নাট্য নয়? গ্রীক নাটককারগণ, শেক্সপীয়ার, কালিদাস এঁরা কি আধুনিক নন? শুধু যুগধর্মের মাশকাটিটাই কি আধুনিকতার চরম মাশকাটি? সে মাশে যে খাটো হইল, তাহাকে আধুনিকতা হইতে ছাটো—এইটেই কি সাহিত্যের রাস? তা হইতেই পারে না। কেননা যেখা পেল যে মেটারলিক, এন্ড্রেকের সঙ্গে ইব্‌সেন, শ'ধের খুব তফাৎ। আবার মেটারলিক এন্ড্রেকই যে মেলেন তাও নয়! এন্ড্রেকের বাস্তবচিত্র মেটারলিকের কোন নাটকেই পাওয়া যায় না। সেই জন্য বলিতে হয় যে, আধুনিক নাট্যকার মাদ্রেই স্বয়ং। তাঁরা সাহিত্যের আকাশে ধলের নীহারিকার বাস করেন না; তাঁরা নিজেরাই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। তাঁদের কারো কারো চারিদিকে যদি সৌরমণ্ডলের মত একটা মণ্ডলী বাবে, তবে বাঁধুক; কিন্তু সেই মণ্ডলীটাই আসল মণ্ডলী, এমন হুঃসাহসের কথা বলিবার সাধ্য কারো নাই।

আইরিশ নাট্যকার জে, এন্, সিন্‌কোর নাট্য আধুনিক ত বটে; কিন্তু তিনি ইব্‌সেন, হাপ্টমান জর্দারম্যানের দলে একেবারেই শিঙেন" না। তিনি বেন্‌ জন্সন, মলেরার

প্রভৃতি পুরাণো নাট্যকারদের পক্ষপাতী। তাঁর নিম্নেরও রচিত যে কোন নাট্যই পড়া যাক, যেমন The Well of the Saints, বা The Tinker's Wedding, কিবা The Play boy of the western world—তাঁর মধ্যে কোন 'সমিগো' নাই, "চিন্তা" নাই, রূপক নাই। তাঁর মধ্যে আছে শুধু বাস্তব জীবনের চিত্র ও প্রচুর হাস্যকৌতুক। The Tinker's Wedding নাটকের ত্বমিকার তিনি লিখিয়াছেন "The drama...does not teach or prove anything. Analysts with their problems and teachers with their systems are soon as old-fashioned as the pharmacopœia of Galen—look at Ibsen and the Germans—but the best plays of Ben Jonson and Moliere can no more go out of fashion than the blackberries on the hedges." অর্থাৎ জামা কিছু শিক্ষা দিতেও চায় না, প্রশংসা করিতেও চায় না। সমস্তার হস্ত বিশ্লেষণগণ এবং নানা "বাদের" বাদীপ্রতিবাদী মাঠারগণ গ্যালেনের কার্মাকোপিয়ায় মত নীতাই জানাদি হইয়া পড়েন—যেমন দেখ না কেন ইব্‌সেন ও জর্দারম্যান নাট্যকারদের অবস্থা! কিন্তু ব্র্যাকবেরির যেমন কখনও আধার কমে না, তেমনি বেন্‌জন্সন, মলেরারের শ্রেষ্ঠ নাটক কি কোন দিন বেকাঙ্গান হয়?

সেই মন্ত নানাদিক্‌ তাবিদ্য চিন্তিত্ব আমি অবশেষে বুঝিতেছি এই যে, এটা পুরাণো, ওটা নূতন, এটা সেকলে, ওটা

একেলে, ওর যুগের পত্তন হইয়াছে আর
এর যুগের পত্তন হইতেছে—এসব পাঁচিল-
তোলা সাহিত্যবিচার বোধ হয় শেষ
পর্যন্ত টেকা শক্ত। কেননা আধুনিকেরই
মধ্যে কেউ বা পুরাতন নাটোর, কেউ বা
গীক নাটোর, কেউ বা প্যান্‌সাইকি
নাটোর, কেউ বা সদকা-নাটোর পক্ষপাতী।
সেই ক্ষত্র আমার বিবেচনার সব নাটাই
আধুনিক—‘অধুনায়’ মধ্যে থাকে ধাঁড় করানো
বাইতে পারে এবং হার মানানো শক্ত হয়,
তাই আধুনিক। তার মানে পুরাতনকে
পুরাতন বলিয়া চেষ্টাটা ঠিক নয়। পুরাতনের
মধ্যে অনেক জিনিসই আছে যা চির-নূতন ;
আবার নূতন থাকে বলি তার মধ্যেও
অনেক জিনিস থাকিতে পারে যা “চির”র
অন্তর্ভুক্ত কোন কালেই হইবে না, অচিরেরই
লয় পাইবে।

তবে এটা ঠিক যে, পুরাতনই হোক

আর নূতনই হোক, নাটক বলিতে আমরা
এদেশে সাধারণতঃ বাহ্য বৃত্তি, কোন
নাটকই তাহা নয়। অর্থাৎ তাহা কেবলি
বাহ্য কতগুলো প্রচণ্ড প্রবল ঘটনার ঘটনা
মাত্র নয়। বাহ্য ঘটনা তখনই নাট্য-ঘটনা
হয়, যখন নাট্যকারের কল্পনার মধ্যে তাহা
নব রূপান্তর লাভ করে। গোড়াতেই এ
কথার আলোচনা করিয়াছি, হুতরাং পুন-
রাবৃত্তি অনাবশ্যক। যেমন ইংরাজীতে একটা
কথা আছে যে, There is nothing good
or bad but thinking makes it so—
ভাল বা মন্দ কিছুই নাই, চিন্তাতেই ভাল
মন্দ হয়, তেমনি বলা যায় যে, নাট্যঘটনা বা
বা অ-নাট্যঘটনা বলিয়া কিছুই নাই, নাট্য-
কারের কল্পনাতেই কোন ঘটনা নাট্য-
ঘটনা হইয়া ওঠে, কোন ঘটনা বা হয়
না।

শ্রীঅমিতকুমার চক্রবর্তী।

রূপসী

পাত্র ও পাত্রী

বরাট	মোগল-সেনাপতি
রূপসী	মান্দার-দুর্গাধিপতি
	নিরঞ্জনর কিশোরী পত্নী
ডাঙ্গ	বরাটের বিশ্বস্ত অম্বুজর
মহম্মদ	মোগল সম্রাটের পুত্র
মুলতব	মোগল-সৈন্যধ্যক্ষ
প্রহরীগণ	

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগল-শিবির। বরাটের কক্ষ।

বরাট আসীন ; রূপসীর প্রবেশ

বরাট

এসো রূপসী !...এ কি তোমার হাতে

রক্ত যে—

রূপসী

কাঁধে একটা গুলি লেগেছিল।

বরাট

গুলি লেগেছিল! কোথায়? কখন?
আমাদের শিবিরে? এইমাত্র যে বন্দুকের
আওয়াজ শুনলুম, সে তবে—কিন্তু কার এ
স্পর্ধা হল?

রূপসী

লোকটা পালিয়ে গেল।

বরাট

তোমার খুব লেগেছে? ব্যথা হচ্ছে?

রূপসী

বরাট

আঘাত সামান্য নয় ত! দেখি, ওখু
দি।

রূপসী

কোন প্রয়োজন নেই! এ সামান্য
আঘাত! (ক্ষণেক শুদ্ধতা)

বরাট

তুমি তাহলে এসেছ রূপসী? কিন্তু
একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই যে
এসেছ, এ কি তোমার নিজের ইচ্ছা?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

কেউ জোর করে পাঠায় নি?

রূপসী

বরাট

জানো, কি সর্ব্ব এসেছ তুমি?

রূপসী

জানি।

বরাট

তবু এসেছ! আমি বিম্বিত হচ্ছি।...
অচঞ্চল মনে এসেছ তুমি?

রূপসী

এমন সঠি ছিল না ত তেনাপতি যে
আমার মনের ঢাকলটুকু সেখানে রেখে দিয়ে
আসব।

বরাট

তোমার স্বামী—দুর্গাধিপতি আসবার
অশ্রুতি দিয়েছে?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

ভেবে দেখ নারী, এখনো সময় আছে।
ইচ্ছা হলে তুমি কিরে যেতে পারো—

রূপসী

বরাট

কিরেবে না! আশ্চর্য! জিজ্ঞাসা করতে
পারি, কেন এ সর্ব্ব তুমি রাজী হলে?

রূপসী

কেন! না-হলে ক্ষুধার আগার একটা
বিকালমান জাতি সমূলে ধ্বংস হয়! আমার
স্বামীর কীর্তি অকালে লোপ পায়!

বরাট

এছাড়া আর কোন কারণ নেই?
এই কলঙ্ক রাখার নিয়ে, আপনাকে এভাবে
বলি দিতে—

রূপসী

এছাড়া আর কোন কারণ নেই,

সেনাপতি !...কিন্তু এত কৈফিয়ৎ দেবার
সর্ব বোধ হয় ছিল না !

বরাট

রাগ করো না। আমি শুধু আশ্চর্য
হচ্ছি ! এত উচু প্রাণ !...কিন্তু এখনো আমার
সন্দেহ হচ্ছে, একজন সাধী এমনভাবে—

রূপসী

বলেছি ত আমি তর্ক করতে আসিনি,
সেনাপতি। তা ছাড়া কোন কথার জবাব
দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা।

বরাট

এমন পতিগত-প্রাণা ! আশ্চর্য্য !

রূপসী

নারীর জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করো না,
সেনাপতি ! আমার অন্তরাখ্যা জানে—

বরাট

অন্তরাখ্যা ! আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !...যাক,
আগন্তর সময় আমাদের শিবিরের সম্মুখে
দেখেছি, গাড়ী-ভরা খাত্ত, গাড়ী-ভরা অস্ত্র-শস্ত্র,
সব সজ্জিত রয়েছে—?

রূপসী

দেখিচি।

বরাট

এ-সময় এই যুদ্ধেরে মান্দারে পাঠানো
হবে। আমার সঙ্কেত পেলেই ওরা রওনা
হবে।...কিন্তু ভেবে দেখ নারী, এখনো সময়
আছে—ইচ্ছা হলে তুমি কিরতে পারো—

রূপসী

আমি সর্ব রক্ষা করতে এসেছি,
সেনাপতি, চাহুরী করতে আসিনি।

বরাট

তুমি আমার বড়ই বিস্মিত করেছ !

এ সমস্ত একটা গ্রহোৎপলক বলে আমার মনে
হচ্ছে ! কিন্তু সে সব কথা থাক !...যখন
এসেছ...বেশ, (বংশীধ্বনি করিল) এইবার ওরা
রওনা হোক ! আহা! আর অস্ত্র বা পাঠানো
হচ্ছে, মান্দার তাতে প্রাণ পাবে, নব বলে
বলী হবে, বৃদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করবে !...
তুমি চোখে দেখতে চাও—গাড়ী রওনা হল
কি না ?

রূপসী

বরাট

তবে এলো এই শিবিরের বাঘের।
(পর্দা তুলিয়া ধরিল) ঐ দেখ—

[অদূরে অস্পষ্ট আলো দেখা গেল,—
ও সেই সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র এবং আহাৰ্য্যে-ভরা
অসংখ্য গাড়ী মান্দার-অভিমুখে চলিতে হুহু
করিয়াছে, তাহাও দেখা গেল]

মান্দার আল তার জঠর-জালা জ্বলবে !
কাল প্রত্যবে নব বলে বলী হয়ে মান্দার
দুর্ভব নৃত্তিতে জেগে উঠবে !...সুগভীর জয়ের
উল্লাসে সারা মান্দার প্রতিধ্বনিত হয়ে
উঠবে—আর তার অস্ত্র খস্তবাধ বেবে সে
কাকে, জানো ? তাপের রাগী বিহ্বলিনী
রূপসীকে...দেখলে ? এখন তুমি সন্তুষ্ট
হয়েছ ?

রূপসী

বরাট

এলো তবে, রূপসী। এইবার এইখানে
এসে বসো। যদিও তোমার যোগ্য স্থান এখানে
নেই—এ শিবির—তবু এই জানলার পাশে
বেধীর উপরে এসে বসো।...বেশ শান্ত গতি !

মুহূ. জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে—এইখানে বসো। জ্যোৎস্না তোমার সারা অঙ্গে দৃষ্টিতে পড়ুক! জ্যোৎস্নার ফুটে ওঠা আজ সার্থক হোক!...কিন্তু হাঁ,...তোমার সঙ্গে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই ত? বুকে ছুঁবি, লুকিয়ে রাখনি?

রূপসী

বরাট

বিব?

রূপসী

সন্বেহ হলে তল্লাস নিতে

বরাট

সন্বেহ? না। আর ভয়? মৃত্যুর ভয় বরাট কখনো করে না। তবে—তোমার অন্তই সত্যক হতে চাই—

রূপসী

আমার ভক্ত ভয় করবার প্রয়োজন নেই। আমার কাছে আমার চেয়ে আমার হান্ধারের মূল্য অনেক বেশী—

বরাট

এ তোমার ভুল, রূপসী! বাক্য, আমি মিছে তর্ক করতে চাই না! এসো—এই জানলার পাশটিতে এসে বসো—বাহিরে জানলার ধারে অজস্র মূল ফুটে উঠেছে, পাহাড়ী মূল—সন্ধ্যার বাতাসকে মুহূ গন্ধে আকুল করে তুলেছে! এ গন্ধ আমার বড় ভাল লাগে—এ গন্ধে মন অতীতের অনেক হারানো স্মৃতির স্মৃতি ফুড়িয়ে পায়!...(রূপসী জানাঘার কাছে আসিয়া বসিল)...ঐ দেব, আকাশে একটু ঝানি ছোট্ট চাঁদ উঠেছে—কি শান্ত জ্যোৎস্না

চারিধারে ঢেলে দিয়েছে! তোমার বুকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে—অন্ধর দেখাচ্ছে! (রূপসী মুখ নত করিল; বরাট কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে রূপসীর পানে চাহিয়া থাকিয়া গাঢ় স্বরে ডাকিল) হাসি—(রূপসী চমকিয়া উঠিল) মনে পড়ে, হাসি? সে আজ কত—কত দিনের কথা...সেই অরণ্যের ধারে ছোট্ট কুটার—কুটারের পাশ দিয়ে ছোট্ট রেখা বয়ে তরল রূপার মত জলের ধারা তবু তবু করে বয়ে যাচ্ছিল—আশে-পাশে গাছের ছায়ায় সেই পাবীর গান—দূরে রাখালদের ছেলেরা বাঁশী বাজাচ্ছিল, খেলা করছিল!...উঃ, তারপর সারা জীবনের উপর দিয়ে আমার কি বড় বয়ে গেছে—নৈরাত্তের বাজ কি সে স্বাক্ষর দিয়ে ফিরেছে—সমস্ত প্রাণ আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—কিন্তু আমার হাসিকে তারা কৈ কখনো এ বুকের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি ত!

রূপসী

ও-নাম কি করে জানলে? কে তুমি?

বরাট

আমি! তুমি অবাক হচ্ছ, হাসি, আমার চিনতে পারছ না?...ঐ নাম শুনে কাকেরও আজ তোমার মনে পড়ছে না? কি করে চিনবে তুমি! মূলের মত তার কোমল গুল মনই তুমি দেখেছিলে, আর আজ! মূল নেই, তার একটু বলও নেই—আজ শুধু পাবাণ, পাবাণ, কঠিন পাবাণ, হাসি!...কিন্তু বিশ্বাস করো, এ পাবাণের গারে যদি কোনদিন কোন অন্ধর ফুটে উঠে আজ-পর্যন্তও অটুট থাকে ত সে সেই অতীতের স্মৃতি—হাসি, তোমারই স্মৃতি!

রূপসী

আমার চেেনো তুমি? আমার পে
ছেলেবেলাকার নাম ধরে ডাকলে! কিন্তু—

বরাট

আশ্চর্য্য হলো না, হাসি...সারা জীবন
তরে ধান করে আসছি আমি! নিজেই ধানের
মুঠিকে মাছ কখনো ভুলতে পারে?...এখনো
তুমি চিনতে পারছ না?

রূপসী

(গম্ভীরভাবে চাহিয়া) না। তুমি—?

বরাট

আমি কিন্তু তুলিনি ত, বৃহস্পতির জন্তও
তুলিনি! হতভাগা আমি একটা চেউয়ে
কুল ছেড়ে কোথায় কতদূরে সরে পড়লুম—
তারপর আজ আবার আর-এক চেউয়ে যদি
সেই কুলেরই কাছে এসে পৌঁছানুম, ত সে
কূলে আমার ঠাই নেই! • বারো বৎসরে
অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে আমার, কিন্তু
তুমি ঠিক তেমনি আছ, হাসি, এতটুকু
ভয়ংকর, সেই নির্মল সরল মুষ্টি, সেই
জগৎ ভোলানো মুষ্টি—

রূপসী

কে তুমি? পরিচয় দাও।

বরাট

মনে পড়ে হাসি, সেই তোমাদের
কুটারের সামনে ছোট্ট বাগানটুকুর কথা?
একদিন বিকেলে এক বুঝা সেই বাগানে
গাছে কল পাড়তে উঠেছিল, আর তুমি
অরণ্যের ধারে বসে কাঁদছিলে, অরণ্যের
জলে তোমার আংটি পড়ে গেছিল—তুমি
খুঁজে পাচ্ছিলে না। বুঝা গাছ থেকে
নেমে তোমার কাছে এল, তারপর অরণ্যের

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার আংটি
খুঁজে তুলে আনলে, তোমার হাতে সে
আংটি সে পরিচয় দিলে! তোমার অল-ভরা
ভাণ্ডার চোখটুকু তুলে তুমি তার পানে
চোরে দেখলে...তার পর—তার পর, হাসি—

রূপসী

সে বুঝা—

বরাট

হাঁ, বুঝা। মনে আছে? সেই বুঝাই বরাট।

রূপসী

বুঝা! তুমি বুঝা। (বরাটের পানে
চাহিয়া) হাঁ, বুঝাই বটে! কপালের উপর
সেই তিল! ঠিক—আমি লক্ষ্য করিনি,
তাই চিনতে পারিনি—

বরাট

এখন ত চিনেছ, হাসি? (হাসিল)

রূপসী

হাঁ, এবারে চিনেছি। তুমি বীর,
অনেক নরহত্যা করেছ তুমি, কিন্তু তোমার
হাসিটুকু এখনো তেমনি শিশুর মতই সরল
য়েখেছ ত...এ কি? তোমার চোখের নীচে
রক্ত! অতখানি কেটে গেছে—

বরাট

ও কিছু নয়—সামান্য একটু চোট
লেগেছে মাত্র!

রূপসী

না, না, সামান্য নয়! এসো, আমি
বৈধে দি—(নিজের বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া কত-
স্থানে বাঁধিয়া দিল) এ কাজ তোমারই জন্ত
শিখতে হয়েছে। এ যুদ্ধে এই হাতে অনেক
আত্মতের স্তম্ভন্য করত হয়েছে।...বারো
বৎসর—বললে না?...হাঁ, বা-রো—ব-ব-স-র-ই

বটে। অনেক দিন, তবু মনে হচ্ছে, যেন সে কালকের কথা! সেই বাগান, সেই ঝর্ণা,—বাঁবা—মা—সব যেন আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! মাহুকের জীবনের উপর দিয়ে শুধু ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে—ওঃ, মাহুয এত ভুলে থাকতে পারে! আশ্চর্য্য! আজ নতুন করে সমস্ত অভাব আমার মনে জেগে উঠেছে।...সেই একদিনের কথা মনে পড়ছে, সেদিন ভারী গরম পড়েছিল, এতটুকু বাতাস বহনি, গাছপালাগুলো জ্বলন্ত যেন কঠিন নিশ্চল পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তুমি একটা বগা মেয়ে পিঠে বয়ে সেটাকে নিয়ে এলে—

বরাট

মনে পড়েছে!...শুধু সেইটুকুই মনে পড়েছে? আমার কিন্তু আরো মনে পড়েছে, বগা মেয়ে তুমি কি বলেছিলে। তার পর আমার হাতের রক্ত ধুয়ে দিলে! সেদিন তুমি একটা ফুলের মালা গাঁধেছিলে, মনে আছে, হাসি? সেই মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে তুমি বললে, “বিজয়ী বীরের পুরস্কার এই!”

রূপসী

মনে আছে। তুমি কিন্তু সে মালা তখন গলা থেকে খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দিলে, বললে, ফুল পুরুষের জন্য নয়, তাতে ফুলের অপমান হয়! ফুলের সৃষ্টি হয়েছে, মেয়েদের রূপসীকে হুটিয়ে তোলবার জন্য—...কিন্তু তার পরে হঠাৎ যে তুমি কোথায় একদিন চলে গেলে—

বরাট

কান্দিয়ে। পথে বাবার মৃত্যু

মাও শোকে প্রাণ বিলেন। পথ হারিয়ে আমি গাছারের দিকে চলেছিলাম—একধল পাহাড়ী ডাকাতের হাতে বন্দী হলাম। বণাসকায় তারা কেড়ে নিলে; আমার মৃত্যু-ভয় ছিল না মেয়ে জীবন নিলে না। তার পর সন্ধ্যা করলে। তাদের দলে মিশে লুট পাট দাসা-হাস্যে রীতিমত গড় হয়ে উঠলাম। তার পর যখন বন্দী দশা ঘুচে, নগর-বন্দীর হাত এড়ালুম, তখন একদিন প্রথম স্নেহের পেয়ে তাদেরই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বরাবর আমাদের সেই গায়ে ফিরলাম। সে চার বৎসর পরে। এসে দেখি, তোমাদের কুটীরের চিহ্নও নেই! শুনলাম, তোমার বিধবা মা মারা গেছেন। তোমার সন্ধান বেশের “লোক কেউ দিতে পারলে না। তার পর কত দিন যে তোমার খোঁজ করে বেড়িয়েছি, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর! কেউ বললে, তোমার কায় চুরি করে নিয়ে গেছে—কেউ বললে, তুমি বেঁচে নেই! আরো অনেকে অনেকে কথা বললে, সব শুনলাম—তবে মাহুকের উপর কেনম রাগ হল। তাবলুম, মাহুয আপনাকে নিয়ে এত ব্যস্ত, এত মত্ত! এক অসহায় বালিকার কোন সন্ধান রাখলে না! আচ্ছা, এই মাহুযকে একবার দেখে নেব। মোগল তখন মাহুয মারবার কল পাতিছিল। আমি এসে সেই মোগলের দাসত্ব স্বীকার করলাম! মোগল আমার হুঃসাহস, আমার কৌশল দেখে আমার ভাবিক করলে—তাই আজ আমি মোগল সেন্যের একজন অধ্যক্ষ।...তার পর মান্দার লুট করতে এসে হঠাৎ এক বৃদ্ধ কৃষকের কাছে। মান্দারের রাণীর পরিচয় পেলাম।

ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মান্নারের দিকে মন আরো আকৃষ্ট হল। আর সেই ক্ষণেই অস্বপ্নের অবসর পেয়েও মান্নারকে আমি জয় করিনি। মান্নার অস্বপ্ন করতে আর আমার ইচ্ছা ছিল না—কোনমতে মান্নারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মান্নারের রাগিকে যদি একবার দেখতে পাই, এই হল আমার সাধ—

রূপসী

কিন্তু তবু আমিই যে হাসি, এ তুমি এত শীঘ্র চিনতে পারলে! বারো বৎসর পরে দেখা—

বরাত

বারো বৎসর ত সামান্য, হাসি। যুগ-যুগান্তের পরে দেখা হলেও আমি তোমার চিনতে পারতুম। পৃথিবীর সমস্ত রূপসীর সঙ্গে বিশেষ থাকলেও আমি তোমার চিনতে পারতুম। বললুম ত, হাসি, বারো বৎসর অনেক অত্যাচার করেছি আমি। পশু থেকে নিজেকে এতটুকু ত্যাগ করিনি—তবু এই বারো বৎসরে এমন দিন ছিল না, যেদিন তোমার এই মূর্তি না ধ্যান করেছি! আমার বারো বৎসরের ধানের মূর্তি—তাকে আমি চিনতে পারব না—এ কি সম্ভব, রূপসী?... বারো বৎসর তোমার সন্ধানে কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, কত বন চুঁড়েছি, পাহাড়ে উঠেছি, খণ্ড-স্রোতা নদী সীত্রে পার হয়েছি। কিন্তু তোমার পাই নি! নিজের দেশ নেই, ভূঁই নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, শুধু তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। ভক্ত যেমন করে তার ভগবানের খোঁজ করে, তেমন করে খুঁজেছি। কোথাও

যখন সন্ধান পেলুম না, তখন একবার মনে হল, আর বাঁচা তবে কিসের 'জন্তু'? কিসের আশায়? নিজেকে হত্যা করতে তলোয়ার তুলেছি, উত্তর তলোয়ার হাত থেকে পড়ে গেছে। তখন মনে হল,—না, মরবো না। মনের মধ্যেও কে যেন আশ্বাস দিয়ে বললে, “দেখা হবে, দেখা হবেই!”

রূপসী

তুমি উদ্ভাষ।

বরাত

সত্যই উদ্ভাষ, হাসি। তোমার রূপে উদ্ভাষ! তোমার প্রেমে উদ্ভাষ। কিন্তু তুমি—তুমি—

রূপসী

এ-সব কথা বলো না, মুক্তা—আমি অপরের স্ত্রী, সে কথা ভুলে যেতো না—

বরাত

সে কথা তুমি নি, হাসি।...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কি বেশ মনের সুখে আছ? বল, বল, তোমার প্রাণে কোন হুঃখ, কোন অভাব—?

রূপসী

না, কোন হুঃখ নেই, কোন অভাব আমি জানি না। স্বামীর নির্বিড় হেঁদে-প্রেমে আমার চিত্ত ভরপুর। তার ভালবাসা অগাধ, করুণা অশাশ্বত।

বরাত

বড় বিলম্ব করেছেলুম, হাসি, বড় বিলম্ব।...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার স্বামীকে কি স্বার্থহীন এমনি প্রাণ-মন দিয়ে ভালবেসেছ? বল, বল—

রূপসী

বরাট

বানিনি? মুন্না, তোমরা পুরুষ, বড়
তুল বিশ্বাস নিয়ে নিজের মনে তোমরা
তধু মিথ্যার রাসি জড় কর! নিজের হৃৎ
তোমরা নিজেরা গড়ে তোলা! ...না মারা
গেলেন,—অসহায় আমি অকুল পাথারে
পড়লুম। সে বিপদ থেকে মাথা তোলবার
আগেই আমার অস্ত্র বিপদ হুক হল। বলবান
পুরুষ বলে আমার সূঁচন করতে উদ্ভত হল;
রূপের ভিখারী মিনতি জানালে; চর্তুত্তেরা
ছড়ার দিগে পথ আগলে দাঁড়াল। শেষে এক
মোগলের লোলুপ দৃষ্টি স্ত্রেনের মত আমার
আক্রমণ করলে। নিরাশ হয়ে বর্ষের
একদিন আমার নির্জনে অসহায় পেয়ে
আমার হাত চেপে ধরলে। চারিধার অন্ধকার
সেখলুম—চোখ মুখে ভগবানকে ডাকলুম—
স্বামীর স্তূতি ধরে আমার ভগবান সেদিন
আমার সেবা দিলেন, সে বিপদ থেকে উদ্ধার
করলেন, তারপর আমার পরিচর নিয়ে
তিনি আমার অসীম সম্পদের অধিকারিণী
করলেন, পথের ভিখারিণীকে রাণীর ঐশ্বর্য
দিলেন। স্বামীর প্রেমে, স্বামীর স্নেহে
আমি স্বর্ণমুখ পেলাম। সব শোক তুললুম।
অতীতের বেদনা জীবন থেকে নিমেষে মুছে
গেল। তিনিই আমার পরিহাস করে বললেন,
'তুমি শুধু হাসি নও, রূপের হাসি'! তিনিই
আমার নাম দিলেন, "রূপসী"—...সেই-অবধি
শুধু স্নেহ, শুধু তৃপ্তির মধ্যে আমি ডুবে আছি।
এ যে কি স্নেহ, কি তৃপ্তি, তা বোঝাবার
আমার ভাষা নেই, মুন্না। শুধু এইটুকু
বোঝো যে এর স্পর্শে আমার সমস্ত অতীত
কোথার অদৃশ হয়ে গেছে!

আর সেই-সঙ্গে সেই বাগান, কুটার, সর্গা,
মুন্না, সব তুমি তুলে গেলে!

রূপসী

তাতে কি কিছু অস্ত্রায় হবেছে, মুন্না?
—আমার দেবতা স্বামী, তাঁর অমল
ভালবাসা—এতেও যে মারী অতীতকে
আঁকড়ে পড়ে থাকে, তার চুম্বনের সীমা
নেই! সে ত হুর্ভাগিনী!

বরাট

(শুদ্ধ রহিল; কোন কথা কহিল না)

রূপসী

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি,
মুন্না, হঠাৎ এ সর্ভ তুমি কেন করলে?
একজন নারীকে তার স্বামীর কাছ থেকে
টেনে এনে, তার সব গৌরব ছিনিয়ে
নিয়ে—

বরাট

তুল করেছি, হাসি, অস্ত্রায় করেছি। আমি
ভেবেছিলুম, আমার মত তুমিও বৃত্তি সেই
অতীতকে আঁকড়ে বসে আছ! তাই দুঃখনেই
স্বামী হব, এই ভেবে আমি আমারও সমস্ত
ভবিষ্যৎকে পা দিগে ঠেলে ফেলেছি।

রূপসী

বুঝেছি, এইমত মোগলেরও বিশ্বাস
হারিয়েছ তুমি।

বরাট

মোগলের বিশ্বাস-অবিশ্বাস! সে আমি
গ্রাহ্যও করি না। যে-ইমান মোগলই আমার
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে—এ আমি বুঝেছিলুম,
তাই আমি হাসির স্বামীকে সাহায্য করব; হির
করেছিলুম—অলই করেছে, হাসি। যে

দেশের অস্ত্র আমার সেই হাসি মাথার
কলঙ্কের বোঝা তুলে নিতে এতটুকু চঠেনি,
অকল্পিত পদে মোগলের শিবিরে চলে এসেছে,
সেই-হাসির সেই-বেশকে আমি প্রাণ দিয়েছি,
এ কি কম লুপ্ত আমার!

রূপসী

আমারই দস্ত তুমি এতখানি ত্যাগ
করেছ! নিম্নের একমাত্র অবলম্বনটুকুকে তুমি
পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেছ!

বরাট

কিন্তু কি লুপ্ত পেয়েছি আমি! তোমার
পায়ে কাটা ফুটলে সেই কাটা তুলে ফেলেতে
বে আমি আমার সর্বস্ব দিতে পারি, হাসি।

রূপসী

সুখা, তাই, তুমি মধুং!

বরাট

না হাসি, দ্রুত নরায়ণ বর্কর আমি।
তাই আমি বুকে পেখিনি, তোমার আসতে
বলে কত বড় অন্তর করেছি! তোমার
সর্বনাশ করেছি—

রূপসী

সর্বনাশ!

বরাট

নর? এখন তুমি কিরে গেলে তোমার
স্বামী আবার তেমনি হাসি মুখে তোমার বুকে
তুলে নেবে কি? সারা দেশ—তুমি জানো
না, হাসি, এ বড় লক্ষ্মীছাড়া জায়গা, এই
পৃথিবী! নারীর বিকড়ে পুরুষ হেথায়
দিবারাত্রি বড়বড় করছে, কি করে তাকে
পায়ের তলায় চেপে রাখবে! তুমি জানো না
নারীর ঐতি এখানে পুরুষের কি
দারুণ অবজ্ঞা, গভীর অবিবাহ! তুমি

ভাবো তোমার স্বামীর বিশ্বাস হবে যে—
তুমি নির্মূল নিকলক—?

রূপসী

আমার স্বামীর বিশ্বাস! কেন হবে
না? • নিম্নের মুখে আমি সব কথা ঠায়ে
থুলে বললে—

বরাট

তাই হোক! তখনই তোমার মঙ্গল
করুন!

রূপসী

আর তুমি? তোমার কথা ভাবছ
না?

বরাট

আমার কথা! সে আর জিজ্ঞাসা করে
না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি
করব!...বাক, একটা কথা, হাসি, তুমি
বখন বরাটের শিবিরে আসতে উদ্ভত হলে,
তখন জানতে কি, কোথায় আসছ—কার
কাছে আসছ?

রূপসী

না!...অনেক কথা শুনেছিগুহ...কেউ
বললে, বরাট একটা দ্রুত বর্কর—আবার
কেউ বললে, সে এক তরুণ সুখা, অদ্বুত
রকমের খেয়ালী—

বরাট

কিন্তু তোমার বুদ্ধ বত্তর আমার বেধে
পেছলেন—তিনি কিছু বলেন নি?

রূপসী

বরাট

তুমি নিজেও কোন কথা জিজ্ঞাসা
করনি? জানবার কৌতুহল হয়নি?

রূপসী

না, জ্ঞানবার প্রয়োজনও মনে করিনি।
সর্ব-মত আমার আসতে হবে, এইটুকু শুধু
বুঝেছিলাম! না হলে দেশ-রক্ষার আর
কোন উপায় ছিল না।

বরাট

কিছু আসতে তোমার বুক কাঁপেনি?
পা টেনেনি? এই সঙ্কার এক অপরিচিত
ছব্ব্বস্তের শিবিরে, শত্রুর শিবিরে—সুন্দরী
কিশোরী তুমি একলা আসছ—

রূপসী

বলেছি ত—সর্ব ছিল, আমার আসতেই
হবে।

বরাট

তারপর এখন আমার দেখলে, এখন কি
মনে হল?

রূপসী

কিছুই মনে হয়নি।

বরাট

এখন কি মনে হচ্ছে? যদি আমি
কোন অভিযাত্রা করি—?

রূপসী

অভিযাত্রা! তুমি করবে? (হাসিয়া)
আমার কোন ভর নেই, মুক্তা—কাকেও
ভর নেই! মানুষ মানুষের উপর খামখা
অভিযাত্রা করবে কেন! বিশেষ তুমি!
তুমি ত কোন অভিযাত্রাই করতে পার না।

বরাট

পারি না!—কেন?

রূপসী

তুমিই ত বলেছ, আমার তুমি ভালবাস!

বরাট

হায় নারী, এত সরল, এত নির্মল
তোমার মন!...পুরুষকে তুমি জানো না,
তার প্রবৃত্তি কত কুৎসিত, তার মন কত
কণ্ঠা—

রূপসী

মুক্তা, মিথ্যা আমার তর দেখাবার চেষ্টা
করছ—তুমি আমার ভালবাস, তুমি আমার
মন করতে কখনো পার না—

বরাট

ঠিক বলেছ—হাসি,—আমি তোমার মন
করতে পারি না। তোমার ভালবাসি, তোমার
সুখী দেখলেই আমি সুখ পাই।...কিন্তু
না, আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। চল,
এই রাত্রির গোপনতার মধ্য দিয়ে তোমার
হৃদয়ে রেখে আসি—তোমার স্বামীকে বলো,
বরাট তার বন্ধু, ভাই, আর বলো,—এ মুছে
মান্যের জরী হবেই।

রূপসী

তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

বরাট

বিশ্বাসঘাতকতা! বরাট বিশ্বাসঘাতক
নয়। ভা-ছাড়া কার বিশ্বাস সে ভাগবে?
মোগলের। সে ত সব শোধ-বোধ ছরে
গেছে—মোগল বেদিন আমার অবিশ্বাস
করেছে, সেই দিনই যে মোগলের নিমকের
মেনাও আমি শোধ করেছি—

রূপসী

মোগল বলী।

বরাট

বরাটও মোগলের ভুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী—

রূপসী

নিজের জবিহাং—মোগলের রোব-রক্ত
আঁধি—

বরাট

বরাট খোড়াই তার তোয়াক্কা রাখে !
...হাক, এসো হানি, আর ঘেরী নম। তোমার
পৌছে দিয়ে আসি। (নেপথ্যে কোলাহল—
বহুকের শব্দ ও গুনা গেল) ও কি—

(শব্দযতে ভাহুর প্রবেশ)

ভাহু

সেনাপতি—

বরাট

খবর কি, ভাহু ?

ভাহু

শাহজাদা পানিরেছেন—সমস্ত সৈন্য তাঁর
সঙ্গে যোগ দিয়েছে—তারা আপনার বিরুদ্ধে
উন্নাত হচ্ছে। আপনার অহুতর কুকুর
শাহজাদাকে ধরতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

বরাট

এত অকস্মাৎ— ?

ভাহু

মূলতব সাতশ' ফৌজ নিরে এসে
পৌঁছেছে—

বরাট

দেখ হানি, মোগলের বিশ্বাস দেখ !
মোগলই আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখাচ্ছে।
এর ঐতিহ্যলও তাকে পেতে হবে।...এখন
এসো, শীত্র এসো—

রূপসী

তুমি কোথার বাবে ?

বরাট

মান্য হুর্গে। ভাহু, তুমিও আমার

সঙ্গে এসো—যদি পথে মোগল আমার
আক্রমণ করে, তাহলে তুমি এই মান্যারের
হাটিকে—আমার তরীকে সন্ধাননে হুর্গে
পৌঁছে দিয়ে আসবে। মেঘের আড়ালে
চাঁদ ঐ চাঁকা পড়েছে, বাঃ, চমৎকার সুবোণ
মিলেছে।

রূপসী

মান্যারও যে তোমার শত্রু, মুন্না। হুথারে
হু'ধল শত্রুর মধ্যে পড়ে তুমি—তুমি কি
করবে ?

বরাট

আমার অন্তে তেবো না—এ পৃথিবীর
কোলটুকু বড় ছোট দায়গা নয়—আমার ঠাই
আমি কোনখানে করে নেবই। আর না হয়,—

ভাহু

কিন্তু শিবিরের সামনেই মূলতবের
আস্তানা—

বরাট

বেশ—তবে এই পৃথিবী হু'ড়ই আমার
পাথ করে নেব। এসো হানি।

রূপসী

না, তোমার সঙ্গে দাব না আমি।
তোমাকে বিপদে ফেলে—

বরাট

হানি, এসমর অবুত হকো না। তুমি
আমার কৌশল জানো না—হা বলচি,
শোনো, এসো—নাহলে হুজনের কেউ রক্ষা
পাব না।

রূপসী

তুমি আমার সঙ্গে বাবে ?

বরাট

রূপসী

তবে এসো—কিন্তু একটা কথা, বল,
কিহে আসবে না ? মান্দারেই থাকবে ?

বরাট

তোমার স্বামীর মত হবে ?

রূপসী

আমি তাঁকে সব কথা বলে বলব ।

বরাট

তিনি বিশ্বাস করবেন ?

রূপসী

নিশ্চয় ।

বরাট

যদি না করেন—?

রূপসী

যদি না করেন !...না, না, করবেন
বৈ কি, নিশ্চয় করবেন—আমি নিজে সব
কথা বলব—এসো—

বরাট

না, মান্দারের ঘারে শুধু তোমার পৌছে
যেবে—মান্দারে পা দেওয়া হবে না, হাসি—

রূপসী

কেন, মুজা—তোমার ভর কি ?

বরাট

ভর ! তোমারই জন্ত ভর ।

রূপসী

আমার জন্ত ?

বরাট

হাঁ, তোমারই জন্ত । আমার তোমার
সঙ্গে যেখানে—

রূপসী

সে ভর ত. সমানই আছে—আমি
তোমার সঙ্গেই কিরি কি একলাই কিরি—

নর কি ? ভর তোমারই জন্ত । কিন্তু তবু
আমি সে ভর করি না । বিপর মান্দারকে
ভূমি তার বড়-হৃদনে রক্ষা করেছে, নিজের
ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েও তাকে রক্ষা করেছে,
মান্দার অকৃতজ্ঞ নয়, আজ তোমার হৃদনে
সেও তোমার রক্ষা করবে ।...তাকে ধন্য
করে রেখো না, মুজা,—এসো, মান্দারের রাণী
তোমার নিমন্ত্রণ করছে—এসো ভূমি ।

বরাট

রূপসী

হাঁ । না যাও, আমিও যাব না ।...যদি
আমার ভালবাস, মুজা—এসো, আর বিলম্ব
করো না—ঐ, ঐ শোনো চীৎকার—শীঘ্র
এসো—

বরাট

০ ভায়া, আমার শিবির ছাড়লে ভূমি
শিবিরে আগুন লাগিয়ে যাও, তারপর
অলক্ষ্যে আমাদের পিছনে এসো । যদি আমার
আক্রমণ করে, তাহলে যোগসলকে আমি
রুখে রাখব, ভূমি ততক্ষণ রাণীকে মান্দারে
পৌছে দিতে পারবে ।

রূপসী

মুজা, তাই, এসো—

[বরাটের হাত ধরিতা রূপসী বাহিরে
গেল ; তাহ তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল]

(মহেশ্বর ও মূলভবের প্রবেশ ; সঙ্গে

চারিজন সশস্ত্র প্রহরী)

মহেশ্বর

কোথায় গেল ?

তাহ

আমি এসে দেখি, শিবিরে কেউ নেই ।

মূলতব
কেউ নেই! এ তোমার শরতানী বান্দা!
শাহজাদা, এইই তাহলে এসে সংবাদ
দিয়েছে। মূর্খ—
মহম্মদ
নিমকহারাম—
মূলতব
বল, তোমার বিশ্বাসবাতক মনিব কোথায়?
কোন দিকে গেছে?
ভাছ
জানি না।
মহম্মদ
জানিস না? মূলতব, একে বন্দী কর।

সাঁড়াসি দিয়ে এর জিভ টেনে ধর। দেখি,
কতক্ষণ ও না বলে চুপ করে থাকে।
ভাছ
বেশ! তাই হোক।
(প্রহরীগণ ভাছকে বন্দী করিল)
মহম্মদ
শিবিরে-শিবিরে সন্ধান কর।
ভাছ
(স্বগতঃ) হাক্, অনেকখানি সময় পাওয়া
গেল। বাঃ, এমন হবে, তা ত ভাবি নি
কখনো। সেনাপতি যদি খবরটা পেতেন—
আচ্চ—
(ক্রমশঃ)
ঐসৌরীন্দ্রমোহন সুখোপাধ্যায়।

আর্টের সেকাল-একাল

১

সেকাল ছিল আর্টের কাল; কলা-
লক্ষ্যীয় পাদপদ্মে সেকালের তক্ত রসিকরা
যেমন চিত্ত ঢালিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছিল,
একালে তেমন তদ্ব্যবহা বড় আর দেখা
যায় না। আর্ট লইয়া এখন কথার ছটা
ভর্কের ছটা বাড়িয়াছে, কিন্তু কিভিয়াস বা
মাইকেল এন্জেলো, র্যাকেল বা রেখত্রাণ্ডের
মতন মহা শিল্পী আর ত কৈ জন্মাইল না!
শিল্পীকে লোকে এখন একেজো ঠাওরায়,
আর্টের নামে মাতব্বররা এখন দুর্ভিক্ষ-
আনা-চালে হাসি-ঠাট্টার কোরায় খুলিয়া
ছেন! এখনকার চালচলন, ঐয়ন-ধারণ,

কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরকন্নার
অনিবপত্তর, বাড়ী-ঘর সমস্তই কেমন-বেন
ঐ-সুস্ত, হুম্বসুস্ত, মোটা-মকদের,—কোন-
কিছুই ভিতরে রস-কশের ছিটেকোটাটি
নাই, কেমনগতিকে কাজ চলিয়া গেলেই
আমরা এখন আঃ বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।
সুদূর অতীতের কলাবিদরা জানে ও সভ্যতার
আমাদের মত এতটা অগ্রসর ছিলেন না;
আজকালকার অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রও এ-
নিকে তাঁহাদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে
অতীতের গুণীদের কাছে আমরা প্রায় শিশুর
মত বলিলেও চলে। এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতাতেও
ক্রমোন্নতির বিধানে আমরা যে গতবৃণের কলা-

বিদগ্ধের সঙ্গে পান্না দিতে পারিতেছি না, শিল্পজ্ঞানহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের এই রাজধানী ও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ নগর কলিকাতায় শত শত প্রাসাদ রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের একটিও শ্রী-হাদে ও গঠন-স্থম্বর দিল্লী বা আত্রোর অনেক পুরাতন, ভাঙ্গাচোরা ও ছোট-খাটো বাড়ীর কাছে ছায়ায় মতও পড়াইতে পারে না। বাদশাহী ধনকুবেররা বৎসরে বৎসরে অজস্র অর্থব্যয়ে নূতন নূতন বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করাইতেছেন; কিন্তু তাহাদের ভিতরে কেহ কি জাতীয় আদর্শ বা কচির চিহ্নমাত্র দেখিতে পার? উড়িষ্যার, দক্ষিণ ভারতে, দিল্লী-আগ্রা-লক্ষৌ প্রভৃতি নগরে প্রাচ্য শিল্পের কত স্থম্বর আদর্শ লোকের অবহেলায়, কালের মহিমায়, অজ্ঞানের অজ্ঞতার ভাদ্রিহা-চুরিহা ধূলায় ধুলিরিত হইয়া রহিয়াছে; সে-সব অতুল আদর্শ কেন আমাদের চোখে পড়ে না? আমরা হয় ত বাড়ীর খামগুলো গড়ি গ্রীক আদর্শে, উপরটা গড়ি রোমীয় আদর্শে, ভিতরটা গড়ি প্রাচ্য আদর্শে; আমাদের হাতে গড়িয়া সৌন্দর্যের কি দুর্দশাই ঘটয়াছে! আমাদের নিজেদেরও জাতীয়তা নাই—শিল্পেরও তাই।

সেকালের লোকরা, আটকে যে কতটা ভালবাসিত, ভাষায় তাহার সবটা খুলিয়া বলা যায় না। বড় বড় জিনিষের কথা ছাড়িয়া দি, সাবান যে খটি, বাটি, গেলস, থালা, কুঁজো ও গামলা প্রভৃতি জিনিষ,



প্রাচীন গ্রীশের একটি পাত্র

সেকালে সেগুলি পর্য্যন্ত স্থম্বর শিল্পে এমনি চোখজুড়ানো ছিল যে, তাহাদের একটিকে হাতে পাইলে আপনাকে ধস্ত মনে হয়। গ্রীশ, রোম, মিশর ও ভারতের পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যত-তত এই শ্রেণীর স্থম্বর আসবাব দেখা যায়। কালীর সারনাথ অনেক বাদশাহীই দেখিয়াছেন; সেখানে মাটির তৈয়ারি ছোট-বড় অসংখ্য পাত্র প্রভৃতির প্রত্যেকটিই আমার কথার প্রমাণ দিবে।

আট, জীবনের অভিব্যক্তি বলিয়াই সেকালের লোকরা আটকে জীবনের সহচর করিয়া তুলিয়াছিল। মাহুষের কঠোর বাস্তব জীবনকে কোমল ও স্থম্বর করিয়া তোলে, আট। সুস্বাদের ঝালাফালার আমরা যখন বড় জালাতন হইয়া উঠি, পৃথিবীর পোশাকী

সারিয়া আমরা যখন হু-ধও ধীরে-ধীরে জিরাইয়া লইতে চাই, অবসর জীবনে নূতন উৎসাহ ও নূতন কর্ত্তাপ্রেরণা আনিতে চাই, আট আসিয়া তখন আমাদের চিত্তবিনোদন করে, তাহার সোণার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া তখন আবার আমাদের এলানো প্রাণের ঘুন ভাঙ্গিয়া যায়। তখনকার ধনী-নিধন সকলেই ভাই ললিত কলার কদর জানিতেন। শিল্পের প্রতি এই গভীর সহানুভূতি বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীশ ও রোমে সূচিয়া উঠিয়াছিল। পম্পি, প্রাচীন রোমের একটি তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র সহর—তিহুডিয়াসের অধিবৃত্তিতে ৭২ খৃষ্টাব্দে এই সহরটি ভস্মরূপে ভূবিয়া যায়,—সংগ্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাহাকে আবার উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও, এই সেকালে সহরটি হইতে বড় ছবি, যত মর্দর-মূর্ত্তি, যত শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, একালের অধিকাংশ বিখ্যাত ও বৃহৎ নগর হইতেও তাহার অর্ধেক পাওয়া বাইবে না!

রোমের স্থান শিল্পজগতে খুব উচু না হইলেও রোমবাসীরা আট লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিতেন। অনন্য যে নরবেদী দানব নীরো,—সেকালে জন্মিয়া সেও আটের পরম ভক্ত ছিল। নীরোর রাজত্ব যখন ধর-যার, তাহার চারিদিকে যখন মৃত্যু-ভর, তখন তাহার বিক্ষোভে বিস্ত্রোহী গলদের উত্তেজিত করিবার জন্ত Vindex বলিয়াছিলেন, ‘নীরো হচ্ছে অকবি আর গান-বাজনাতে আনাড়ি!’ Vindex যে সৈসন্ডে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এখনি যে আশ্রয়স্থান ব্যবস্থা নী করিতে

পারিলে রক্ষা নাই, সে-সব কিছুই না ভাবিয়া নীরো রাগে হুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, “এনি অকবি, গান-বাজনার আনাড়ি! Vindex জগৎ পুছে আবার চেয়ে আর-একটি লোককে আহুক না দিবে! সে যা বলছে তা প্রমাণ করুক!”

নীরো যে কত বড় একজন শিল্পরসিক ছিল, তাহার বয়ঃ-উক্তিভেদে সেটুকু বেশ বোঝা যায়। রাজ্যহারা হইয়া, বিতাড়িত বস্ত্র পত্নর মত বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে পথ হারাইয়া, নীরো যখন কর্দমাক্ত জলে অসহ তৃষ্ণা মিটাইয়া আশ্বহত্যা করে, তখন এইকথা তাহার শেষ কথা :—“Qualis artifex perez!”—“আবার ভিতরে কত বড় একজন আটের মৃত্যু হোল!”

গ্রীশের এথেন্স-নগরও শিল্পগৌরবে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তাহার পার্শ্বনদের নাম সকলেই জানেন। সুধু পার্শ্বনন নহে,—এথেন্সে প্রসিদ্ধিরা নামে আর-একটি মন্দির ছিল, গ্রীক লেখকরা তাহার স্থাননির্দেশ করিয়াছেন পার্শ্বননেরও উপরে। গ্রীকরা এতটা শিল্পভক্ত ছিল যে, এথেন্সের প্রধান গোরব বলিতে তাহার বৃকিত, প্রসিদ্ধিয়ার শিল্পকীর্ত্তি। গ্রীশের অন্তান্ত সহরীয় বাসিন্দারা, এথেন্সের নাগরিক-দের এই শিল্পসৌভাগ্য দেখিয়া হিংসার অগ্নিয়া মগ্নিত; আর সে হিংসা এতটা প্রবল ছিল যে, ইপার্মিনোডাস ভিন্তিসম্বত সমস্ত প্রসিদ্ধিয়ার-মন্দিরটিকে নিষ্পেষে দেশে তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন! নীরের গল্পটিতে গ্রীকদের শিল্পাহুরক্তির চমৎকার পরিচয় পাওয়া বাইবে।

Phryne ছিল এথেন্স নগরের রূপদোহনশানিনী বিখ্যাত নর্তকী;—তাহার চপল নরনের সাননে অটল থাকিতে পারে, এমন লোক তখন সারা দেশ ঢুঁড়িয়া একটুও মিলিত না।

যৌবন ও লাবণ্যকে সে আপনায় সেয়া ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিত; পাছে লোক বিনামূল্যে তাহার মোহন তহু দেখিয়া ফেলে, সেই ভয়ে সে রাসপথে বা জনতার ভিতরে বা রঙ্গালয়ে সহজে আদ্য বাওয়া করিত না; যদি বা কখনো পথে বাহির হইত, তবে পা-থেকে মাথা-পর্য্যন্ত কাপড়মুড়ি না দিয়া ও মুখে ঘোনটা না টানিয়া যাইত না। তাহার রূপ দেখিবার তাগ্য হইত খুব কম লোকেই—কারণ, ততটা অর্থ-সামর্থ্য ছিল না অনেকেরই।

তাহার জীবনকে পবিত্র জীবন বলা যায় না। কিন্তু রূপ লইয়া বিকিকিনি করিলেও Phryne-এর ছয় উমার ও উচ্চ ছিল। আলেকজান্দার যখন থিবস্ সহর ধ্বংস করিয়া সেনা, সে তখন ঐ সহরটিকে নিজের খরচে আবার নতুন-করিয়া গড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল। করিন্থের অধিকাংশ শিল্পবিদ্রি কীৰ্ত্তিসম্পন্ন তাহারই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ললিত কলা চাড়া পৃথিবীর আর-কিছুকে সে ভালবাসিত না।

এই সময়ে কিডিয়াসের বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে গ্রীকরা আটের মহান আদর্শের সন্ধান লাভ করিয়াছিল; কিডিয়াসের প্রতিভা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যকে নানা

দিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যাস, ক্রিয়াস, আটেলিস ও এথীনী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি তখন শরীরী হইয়া মন্দিরে মন্দিরে বিরাহ করিতেছিল। কিন্তু রূপলক্ষী ভেনাস—মিনি সৌন্দর্য্যের নিখুঁত আদর্শ,—কল্পনালোক ছাড়িয়া তখনও তিনি নরলোকে ভাল শিল্পীর হাতে যথাযোগ্য আকার ধরিয়া আশ্চর্য্যপ্রকাশ করেন নাই; হস্ত কল্পনার সে অতুল সৌন্দর্য্যের কাছে বাস্তবের সমস্ত শক্তি নিম্নল হইয়া গিয়াছিল।

গ্রীসদেশে প্র্যাক্সিটিলস্ তখন সর্ব্বপ্রধান ভাস্কর এবং আপেলিস সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর। রূপলিয়াসীর কাতর পুত্রা ঠেলিয়া, পুন্ডিত বিদ্যামহুঃর বিলাস-শয়ন ছাড়িয়া, অর্থের সমস্ত মায়া তুলিয়া Phryne, হঠাৎ একদিন ভাস্কর প্র্যাক্সিটিলস্‌র কলাভবনে গিয়া হাজির হইল। কথার সূত্রে ডেউ তুলিয়া বলিল, “শিল্পী, আমি তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাই না, কেবল তোমার শিল্পের আদর্শ হোতে চাই।”

সেহের কৃত্রিম আচরণ কেলিয়া আপন নয় সৌন্দর্য্যকে সে প্রকাশ করিল।

ভাস্করের চক্ষু বিশ্বরে-প্রশংসার একেবারে মুগ্ধ! এ কি কল্পনাভীত দৃষ্ট! এ যে রূপের বীণা,—এ তহু যন্ত্রের একটি তারও যে বেহুতো বাজিতেছে না! এ যে রূপলক্ষী দেবী ভেনাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! প্র্যাক্সিটিলস্ স্বপ্নেও এমন সৌভাগ্যের আশা করেন নাই, নয়তহে ত্রে এত হৃদয়া থাকিতে পারে, এ ধারণাও তাঁহার ছিল না। তিনি সেইদিন হইতেই এই সম্ভাব আদর্শের সামনে বসিয়া প্রতিভা গড়িতে লাগিয়া গেলেন;



গ্র্যান্ডিটিল্‌সের গড়া Aphroditeএর একটি
নকল-প্রতিমূর্তির মুখ

সে প্রতিমার নাম হইল Aphrodite বা Venus of Cnidos। আসল প্রতিমাটি কেমন ছিল, আজ আর তা জানিবার উপায় নাই; তবে, তাহার নকলে আরো অনেকে যে-মূর্তিগুলি গড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই আসলের কিছু-কিছু আঁচ-পাওয়া যাইতে পারে।

গ্রিনি বলিয়াছেন, ভেনাসের এই মূর্তিটি স্পৃহুই গ্র্যান্ডিটিল্‌সের গড়া শ্রেষ্ঠ মূর্তি বলিয়া বিখ্যাত নয়—সমস্ত গ্রীষ্মদেশে, সমস্ত পৃথিবীতে এর চেয়ে নিখুঁত স্মরণীয় মূর্তি আর নাই!

Cnidosএর নাগরিকরা এই ভেনাস-মূর্তিটিকে কিনিয়া লইল এবং একটি শৈল-শিখরে চারিদিক-খোলা বনীরের মধ্যে স্থাপন করিল। বহুদূর হইতে নগরবাসীরা পুলকিত নেত্রে নীল গগনপটে মূর্তিনুত্ত ভেনাস দেবীকে চিত্রশিল্পিতের মত দেখিতে পাইত।

Cnidosএর লোকরা একবার অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা নিকোমেডেস

নায়ে অল্প এক নগরপতি সেই সুমহে ভেনাসের মূর্তিটিকে কিনিয়া যথেষ্ট সমস্ত টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু মহারাজার ভেনাস-মূর্তিটিকে কিছুতেই বিক্রী করিতে রাজি হইল না; বলিল, “আমরা যদি সমস্ত ফুইরে পথের ভিখারী হই, তাহলেও এ প্রতিমাকে ছাড়তে পারব না—এ যে আমাদের প্রাণের রতন!” তাহার বাড়ী-ঘর বিক্রী করিয়া ফেলিতে, পরের গোলাম হইতে, দিন-মজুরী করিতেও প্রস্তুত হইল,—কিন্তু গ্র্যান্ডিটিল্‌সের গড়া এই অদ্বিতীয় শিল্পরত্নকে প্রাণ থাকিতে বিক্রীয়া দিতে সম্মত হইল না! আর্টের প্রতি সমগ্র জাতির এই গভীর প্রেম, সেকালেই সম্ভব ছিল; একালে শিল্পের অল্প এমন আর্থ-ত্যাগের কথা স্বপ্নেও কাকুর মনে আসিবে না।

Venus of Cnidos যেমন গ্র্যান্ডিটিল্‌সের গড়া সকল মূর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি চিত্রকর আপেলিস বহু ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সকলের সেরা হইয়াছিল, তাহার



গ্র্যান্ডিটিল্‌সের গড়া মূর্তির নমুনা



“বিভূষিতা ভেনাস”

Venus Anadyomene নামে পটখানি। এখানেও Phryne যেজ্ঞার আদর্শ হইয়া চিত্রকরকে কৃতার্থ করিয়াছিল। ভ্রূণের বিষয়, আপেলিসের এই চমৎকার ছবিখানির নাম ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নাই।

“Venus Triumphant,” “Venus of the Capitol,” “Venus De Medici” ও “Venus of Milo” প্রভৃতি নামে সৌন্দর্যলক্ষীর অনেকগুলি বিখ্যাত মূর্তি আছে। সমালোচকদের মতে গ্রীসিটলসের Venus of Cnidosএর অমূল্যত্বই এসকল মূর্তি গড়া হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, Phryne

যতদিন পুষ্পভদ্রাবনা ছিল, ততদিন সে-সম্রাটের সকল শিল্পীরই আদর্শ হইয়াছিল। প্রচুর অর্থব্যয় না করিলে কেহই তাহার দেখা পাইত না, কিন্তু সে যখন শিল্পীর আদর্শ হইয়া আপনাদের মূল্যবান সময় কাটাইত, তখন কাচারও কাছ হইতে এক পয়সাও লইত না; স্বতন্ত্রাং আটের প্রতি তাহার অমূল্যবান যে কতটা অকৃত্রিম ছিল, সে কথা বোধ হয় আর খুনিরা বলা অন্যায়। তাহার শিল্পকলায় যে মূর্তিই যে গ্রীক কলার একটা মাত্র অভাব দূর চেষ্টা, তাহা নহে; পরন্তু, রমণীয় নির্দেশ্য সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী একটা স্পষ্ট



“ভেনাস অফ দি ক্যাপিটল”

ধারণা করিতে পারিয়াছে।
Phryne যদি সেকালের
শিল্পীর আদর্শ না হইত,
তাহা হইলে একালের
আর কোন শিল্পী এমন
নির্গুণ গড়ন গড়িতে
পারিতেন না।

এইখানে Phryne-এর
জীবন-কাহিনী হইতে
আর-একটি গল্প বলা
সরকার; কারণ, এই
গল্প হইতে বেশ বোকা
ধাইবে যে, প্রাচীন গ্রীক
জাতি কতটা সৌন্দর্য-
বিশালী ছিল।

Phryne-এর অপকৃপ
রূপের আশ্রমে সকলের

মন পতনের মত পুড়িয়া ধাইতেছে
দেখিয়া, একদল লোক তাহার উপরে খড়গ-
হস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে
আবার Phryne-এর দ্বার হইতে ফিরিয়া
আসিয়াই তাহার শর হইয়া পাড়াইয়াছিল।
বড়বড়ারা Phryne-এর বিরুদ্ধে নালিশ করিল,
সে নাকি এই বলিয়া জাঁক করে যে,
সহরের সমস্ত লোক যদি একজনে পরিণত
হয় আর সে যদি তখন এথেন্সকে কিনিতে
চায়, তবে তাহার একরাশির প্রেমের
লোভে লোকে এথেন্স সহরটি অনায়াসে
বিকাইয়া দিবে! Phryne-এর বিরুদ্ধে আরও
অনেক অভিযোগ উঠিল। অপরাধ
প্রমাণিত হইলে তাহাকে চরম দণ্ডভোগ
করিতে হইবে।



Aphrodite-এর আর-একটি মূখ

নিদিষ্ট দিনে সে বিচারালয়ে গিয়া
হাজির হইল। বিচার দেখিবার লজ্জা সেখানে
তখন হাজার হাজার লোক আসিয়া
জমিয়াছে। সকলে দেখিল, তাহার সর্দাপ
অবগুণে ও বস্ত্রে আবৃত। তাহার বিরুদ্ধে
যে সকল গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে, সে
হিরভাবে সেগুলি শ্রবণ করিল।

তাহার পর বিখ্যাত বক্তা Hyperides,
সেই নির্দোষ রমণীর পক্ষ সমর্থন করিতে
উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের সম্মুখে তিনি
মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, Phryne-এর বিরুদ্ধে
যে-সব কথা রটমাছে, তাহা মিথ্যা।

Hyperides এই বলিয়া তাহার বক্তৃতা
শেষ করিলেন, “হা, সহরের সমস্ত পুরুষ
যদি একজনে পরিণত হয়, Phryne-এর

সম্রাটের অন্ত তবে তাহাদের পক্ষে
এখেন্স নগরকে বিকাইরা দেওয়া কিছুমাত্র
আশংকা নহে।”

Hyperidesএর শেষ কথা শুনিয়া
বিচারকরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আদালতে
উপস্থিত জনতার ভিতর হইতেও অসন্তোষের
খুঁৎখুঁতুনি শুনা যাইতে লাগিল।

চতুর বক্তা তখন Phryneএর কাছে
গিয়া, হঠাৎ তাহার মেহের কাপড় খুলিয়া
দিলেন।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য! গ্রীক পুরাণে
কবিতা আছে, অশ্লীলমোহনা সৌন্দর্যলক্ষ্মী
ভেনাস যেদিন মুক্তবেশী বিবসন হইয়া ভ্রমতে
সংগ্রহম আশ্রয়প্রকাশ করেন, সেদিন

“তরঙ্গিত বহাগিনী ময়নাত্ত ব্রহ্মের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত কণা লক্ষ্যত
করি অবনত।”

আজও এই বিরাট জনতা-মাগরের
মাঝখানে Phryneএর অপূর্ণমূর্তির মণ-
তন্ত্র ও তাহার নিঃশব্দ মুখ-ঐ যেন সেই
পৌরাণিক দৃশ্যের মতই দেখাইতে লাগিল।
বিচারালয়ের যে বেঞ্চানে ছিল, সকলেই
মোহিত, চকিত, তরু! “হৃদয় সুখের অর
সর্ব্বজ্ঞ!”—Phryneএর নামে সকলেই
অধঃপতি করিয়া উঠিল—সে অধঃপতিতে
বিচারকর্তারাও যোগদান করিলেন। চারিদিক
হইতে শোনা গেল—“হ্যাঁ, এ সুখের একটু-
খানি হাসির বদলে আমরা এখেন্সকে
বিক্রি করিতেও রাজি!”—Hyperidesএর
বলিষ্ট বাহু নির্ভর করিয়া সরমন্ত মুখে,
সজোজভূষিত চরণে বিজয়িনী Phryne আপন
আবাসে কিরিয়া আসিল।

Phryneএর অরলভের কথা এক-
জন বিখ্যাত লেখক বলিতেছেন, “In that
celebrated acquittal of Phryne,
we ought to see something more
than, is generally seen in it. It
was not only due to the erotic
frenzy of the people, but also to
the admiration and respect of an
artistic race, bending the knee be-
fore the unexpected and sovereign
apparition of Beauty. They felt
that if they were to suppress that
wonderful type, painters and sculp-
tors would be deprived of a
living ideal, and the feeling that
inspired Hyperides with boldness,
the judges with clemency and
the crowd with enthusiasm, was
one of those inspirations which do
the greatest honour to the Athe-
nian people.”

এই বিচিত্র বিচারের পরেই বিচারালয়
হইতে এক বিচিত্র আদেশ-পত্র বাহির
হইল :—Phryneএর স্বর্গীয় স্রবনা কেবল
ধনীমের অন্তই নহে—সে রূপ সকলেরই
দর্শনীয়। দেবতারা মানুষের অন্ত যে অপূর্ণ
লাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সে লাবণ্য
তাঁহাদিগকেই নিবেদন করিয়া আদরা
তাহাদের প্রতি সন্মান দেখাইতে চাই।
বিশেষ, নির্দোষ রমণী-সৌন্দর্যের আদর্শ
দেখিলে জনসাধারণেরও মনের উন্নতি ও
উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব বিচার-

জয়ের সেদিনকার দৃশ্য, বাহাতে কোন নির্দিষ্ট পর্কে বা উৎসবে, সর্বসাধারণের সম্মুখে আবার অভিনীত হয়, সেইজন্য আদেশ দেওয়া হইল।

এ আদেশ অনাস্ত করিবার সাধা, Phryneএর ছিল না। সুতরাং বৎসরে একদিন করিয়া তাহাকে সাগর-মানে বাইতে হইত। বদনের আড়ালে আপন সুরবাহিত তুলতাপি গোপন করিয়া, সাগরের ঢকল-ভরসে সে ধীরে ধীরে অবগাহন করিত; এবং “বৃন্তহীন পুষ্পম আপনাতে

আপনি বিকশি” যখন সে ফেনুচিত্রিত নীল জলের উপরে আবার ভাসিয়া উঠিত, তখন তাহার ভুবরত্ন নখ তরুর উপরে তপ্ত স্বর্য্যকর প্রেমচূষনে লীলায়িত হইয়া . বাইত। শিল্পীর কলাকৃষ্ণে সে, যে দেবীর আদর্শ হইত, এ সেই ভেনাসের পূর্ণাঙ্গ-কথিত জন্ম-দৃষ্টেরই স্থানর অভিনয়।

তখন সহর খালি করিয়া সমুদ্রতীরে লোকের পর লোক ছুটিয়া আসিত। সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের নির্মল নয়তা দেখিয়া বৃদ্ধ ও যুবা এবং ধনী ও নিধন—সকলেই একসঙ্গে একতানে বলিয়া উঠিত :

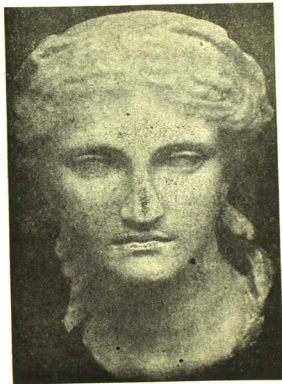
“ওগো স্বর্গের দেবী, তোমার মঙ্গল হোক ! কেননা, মানুষের নয়ন ও হৃদয়ের সম্মুখে তুমি সৌন্দর্য্যের প্রবীণ প্রাণীপ জ্বলিয়া ধরিয়ছ !”

সৌন্দর্য্যের প্রতি সমস্ত গ্রীক-জাতির এমন অগ্রপম প্রজা ছিল বলিয়াই ললিত কলার আজও তাহার অমর ও শ্রেষ্ঠ হইয়া আছে।

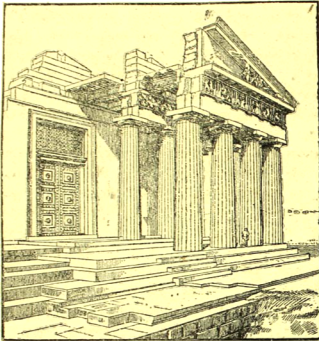
ও

ললিত কলার সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক যে কমিয়া আসিয়াছে, তাহার অন্তিম প্রমাণ আছে।

আট’হুজে সভ্যতার ইতিহাস ; শিল্পীর খোদাল-খুলির সঙ্গে তাহার অজ্ঞাতসারেই আর্টের



গ্রীক ভাস্কর্য্যের একটি স্বমণীমূর্তির মুখ



পার্বননের একাংশ

মধ্যে সমসাময়িক যুগের ছবি আপনি কুটরা ওঠে। অতীতের অনেক বিখ্যাত জাতি কেবল আটের মধ্যেই তাহাদের সভ্যতা ও সমাজের ইতিহাস রাখিয়া ধরাপুষ্ট হইতে অঙ্গ হইয়া গিয়াছে; যেমন প্রাচীন মিশরবাসীরা;—তাহাদের বাহা-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, সবগুই শিল্পের দৌলতে। কলা ও বিজ্ঞানে যদি অনতিদূর হইত, তবে প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোমানদের অনেক কথাই আজ আমরা জানিতে পারিতাম না। ভারতের শুধা-শিল্পে ও পুরাতন শৈব-মন্দিরে এবং গ্রীশের পার্বন প্রকৃতিতে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক জাতির সভ্যতা, সমাজ,

আচারব্যবহার, আকার-প্রকার এবং পৌষিক-পরিচ্ছদের যেমন অলস্ত নমুনা পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতে নয়। পরন্তু, শিল্পে অল্প বাহিরের চেহারাটাই ধরা পড়ে না, মানুষের মনের মতি-গতিও তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ হয়। এইমতই আটকে ছেলে-খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না;—আমরা যতবড়ই সাংসারিক, হিসেবী ও শুদ্ধপ্রাণ জীব হই না কেন, একটু যদি তাবিতা দেখি, তবে জীবনের পথে পথে আটের সার্থকতা বুঝিতে পারিব।

আটের মধ্যে এই গভীরতা আছে বলিয়াই আমাদের উচিত, তাহার প্রতি

প্রজ্ঞাপ্রকাশ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সভা হইয়া আজ আমরা আর্টের উপর যে অসভ্য অত্যাচার করিতেছি সে অনাচারকে কিছুতেই প্রজ্ঞা বলিয়া মনে করা চলে না।

পান্চাত্তা কৃষ্ণক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানব আজ শক্তির গর্বে অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে; অতীতের প্রতি তাহার সম্মান নাই, আর্টের প্রতি তাহার ভক্তি নাই, ললিত কলনার প্রতি তাহার অমুরাগ নাই! কার্শিলে অভূত্যা বে-সকল মন্দির-প্রাসাদ আজ যুগ-যুগ ধরিয়া পৃথিবীর বিশ্বয়-ঐতিহ্য পুষ্পাঙ্কলি লাভ করিয়াছে, অতীত সভ্যতা-স্মৃতির স্বপনে বাহারা এতদিন সমুজ্জ্বল হইয়া ছিল, আমাদের সম্মুখে এতদিন বাহারা সৌন্দর্যের স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছে, বাহাদের প্রত্যেক পাশাপাশি কত জনের সাধনার, কত প্রেমের পূলাকে, কত শিল্পীর বুকের রক্তে জীবন্ত হইয়া জাগিয়া ছিল, সভ্যতার নির্মম বর্স্করতার এখন তাহারা ধ্বংসরূপে পরিণত, অগ্নির সর্বগ্রাসী লিখায় সমর্পিত! মাহুষ গেলে তাহার স্থানে আবার নূতন মাহুষ আসে, কিন্তু অতীতের যে-সব শিল্প-নির্মাণ ধরাপৃষ্ঠ হইতে একবার মুছিয়া যায়, তাহার অভাব পূরণ করে বর্তমান সভ্যতার এমন সাধ্য নাই! বলিয়াছি, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সকল দিকে উন্নত হইলেও, শিল্পক্ষেত্রে সে একান্ত দুর্বল, অক্ষম ও পঙ্গু! প্রতীচ্যের লোকেরা প্রাচ্য জাতিদের বর্স্কর বলিয়া বুণা করে, কিন্তু কিছুদিন আগে তাহারা যখন চীনদেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন চীনসম্রাটদের

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পবিচিত্র নিদান-প্রাসাদ 'ইউয়েন-মিন-ইউয়েন' ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিবার সময়ে তাহাদের কিছুনাট্য চকুলজ্জা হর নাই!

প্রাচীন কালে সভ্যতার শৈশব অবস্থায় এরূপ রর্স্করতার কাহিনী আছে অনেক। ধর্ম্মবেহিতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, সাধারণের অজ্ঞানতা, ব্যক্তিগত নির্দুহিতা ও যুদ্ধবিগ্রহের গোপমাণে সেকালেও অনেক অমূল্য শিল্পরত্ন ক্ষোদা গিয়াছে। গণজাতীর আলাপিক গ্রীষ্মের এলিস সহর আক্রমণ করিয়া; তিন হাজার ধাতুর তৈয়ারি প্রতিমা তাম্বিয়া দিয়াছিল। রোমের মামিয়ার গ্রীষ্মের পরম-সুন্দর কোরিনথকে এমনভাবে ভূমিসাৎ করিয়া যেন যে, তাহার শিল্পস্বপ্না একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। গ্রীক শিল্পের অনেক মূর্তি কনস্তানটাইনে আপনার নূতন সহর সাজাইতে লুটিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; ফলে, মহা-ভাস্কর কিডিয়াস এবং আরো-অনেক শক্তিধর শিল্পীর পরিকল্পনার চিত্র-পর্ধাত্ত আজ আর টিকিয়া নাই। ভারতে মুসলমান ও হিন্দু, যে যখন স্রুবিধা পাইয়াছে, পরম্পরের শিল্পের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে; তবে, এদিকে মুসলমানদের অপরাধই গুরুতর। এমনি ধর্ম্মবেহিতা বা সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার স্রুতাপেও অনেকবার হইয়াছে।

ধর্ম্মোন্মত্ত ভ্রাতোনারোগার প্রয়োচনার ফ্লোরেন্সের অনেক শিল্পীর ভাল ভাল ছাতের কাজ পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মাইকেল এঞ্জেলো প্রথমশ্রেণীর যে কয়টি মূর্তি গড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় জুলিয়াসের প্রতিমূর্তি তাহার অন্ততম। অজ্ঞান জনসাধারণের

বিষদৃষ্টিতে পড়ায় আর সে বিখ্যাত প্রতিমূর্তির
একটুকরাও আর পাওয়া যায় না।

কিন্তু, প্রাচীন কালের এ-সব বিকৃত
কৃতি ও দুৰ্বৃত্য পরিচয় এখনকার বিশ
শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার মধ্যেও
যদি পাওয়া যায়, তবে এ সভ্যতার
সার্থকতা কোথায়? অথচ, সেকালে বর্ষরতাও
যেমন ছিল, উদারতাও তেমনি কম ছিল
না। বরং, আটের প্রতি তখনকার লোকদের
ভক্তি প্রেমের বৃত্ত দৃষ্টান্ত মেলে, ততটা
একালেই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।
Phryneএর কাহিনীতে সে শিল্পাত্মকির
অনেক উদাহরণ আছে,—এবং ইতিহাসেও
এ-সবকে বিবিধ প্রমাণের অভাব নাই।

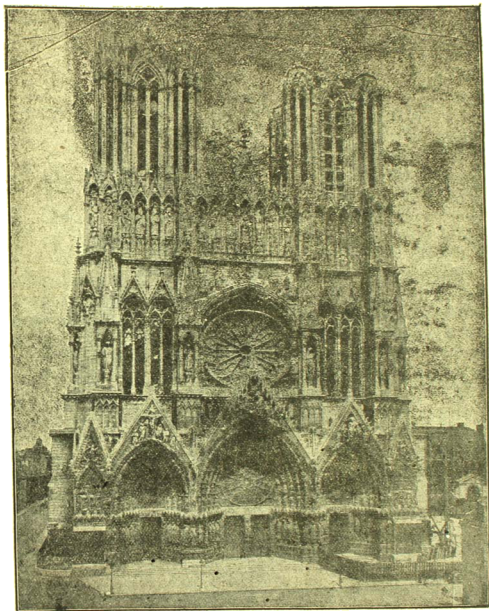
৩০৫ খৃঃ পূর্বাব্দে Demetrius
Poliorcetes বখন রোড্‌স্‌ অবরোধ করেন,
তখন আপন সৈন্যদের আজ্ঞা দেন যে,
সহরের বেদিকটাতে চিত্রকর Protogenesএর
আঁকা Ialysus নামে বিখ্যাত পটখানি
আছে, সেদিকটাতে কেউ যেন অগ্র
না চালায়! পাছে ছবিখানি নষ্ট হইয়া
যায়, তাই এই হুকুম! তিনি একুপ
আজ্ঞা দেওয়ার হেতুও দেখাইয়াছেন :—
“যুদ্ধ যুদ্ধ রোডেসিয়ানদের বিরুদ্ধে—আটের
বিরুদ্ধে নয়!” একখানি নাত্র ভাল ছবি
বাঁচাইতে ছ-হাজার বৎসরেরও আগেকার
একজন সেনাপতি কতটা বহুকের পরিচয়
দিয়াছেন! কিন্তু একালের সভ্যতাগব্বী
আখ্যানরা একখানি ছবিত সামান্য কথা—
এমন কত শত চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত
বড় বড় স্থাপত্য-শিল্পের অলঙ্কৃত নিদর্শনকে
রক্তস্রোতের মুখে একেবারে দুইয়া-পুঁছিয়া

দিতেছে! অথচ এই আখ্যানরা যে
“Culture”এর জীক করে, সেই
“Culture”এর মত সন্মানে প্রচার করেন এক
ঐক চিত্রকর! তাহার নাম Pamphilus;
তিনি ৩২০—৩৪০ খৃঃ-পূর্বাব্দের লোক!
সম্প্রদেহ ঐক চিত্রকর আপেলিস তাহারই
ছাত্র। শিল্পীর কাছ হইতেই “Culture”এর
মন্ত্র নিগা আখ্যানরা এখন শিল্পের
উপরেই মরণ-বাণ মারিতেছে! চমৎকার
কৃতজ্ঞতা!

আমল কথা, আমাদের সভ্যতা হচ্ছে
মুখনিষ্ট ভণ্ডের মৌখিক শিষ্টতার মত;—
ইহার ভিতরটা একেবারে ফাঁপরা! এত
কাল ধরিয়া আমরা যুধু দেহের উপরটাই
নাকিরা-ঘরিয়া চকচকে করিয়া তুলিয়াছি—
কিন্তু দেহের ভিতরে আমাদের যে মনটি
আছে; বর্ধমান সভ্যতা সে অসত্য মনের
ময়লা এখনো মুছিয়া কেলিতে পারে নাই!
তাই সময়ে-অসময়ে মনের ময়লা আমাদের
বাহির-পরিষ্কার দেহের উপরে বেদজালের
সঙ্গে কুটির উঠিয়া তাহার কৃত্রিম পরিচ্ছন্নতা
নষ্ট করিয়া দেয়।

৪

সভ্যতার স্বর্ণকোলাহলে কবির বীণা-
ঝঙ্কার ক্রমেই মূঢ় হইয়া আসিতেছে, জীবন
সংগ্রামের কঠোরতার নাশ্বরের পথ হইতে
আট ক্রমেই সরিয়া দাড়াইতেছে। সভ্য
কথা বলিতে কি, পৃথিবীর বয়স-বাড়ার
সঙ্গে সঙ্গে নাশ্বরের হাত ক্রমেই আট
কম-নিপুণ হইয়া উঠিতেছে। আগেই
বলিয়াছি, আট একেছো বলিয়া কালের
লোকরা, তাকে আর ভালবাসে না।

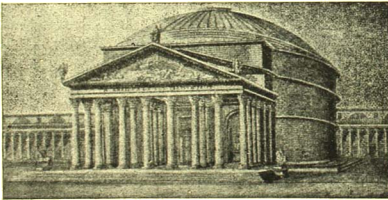


৩
রিম্সের গির্জা

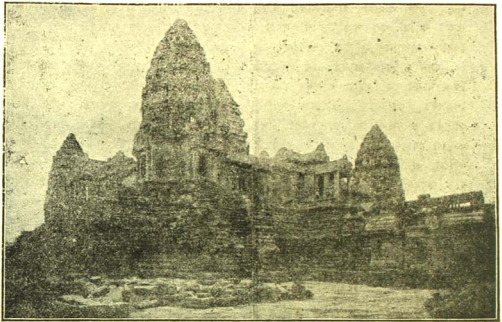
আবার, যারা আরো-বেশী চালাক, তারা চঃ আটকে দাসী-বাঁধীর মত কাজে লাগাইতে! ফলে, তাজমহল, পার্শ্বন ও কপারকের মন্দিরের বধনে, জীবন-বিমা কোম্পানী ও সওদাগরী আপিসের হাঁড়গোড়-ভাঙ্গা দঃের মত বেচপ-বিক্রী অট্টালিকার সারি, আপলো ও ভেনাস প্রভৃতি নথ ও স্বভাবস্বন্দর মূর্তির বদলে নথ-থেকে চুল-পর্যন্ত পোষাক-পরা দরজির মোকামের পুতুলের দল এবং ম্যাডোনা বা মোন' লিসার মত রমণীর চিত্রপটের বদলে, রয়েল আকাদেমির ছাপ-মারা আট্টের দ্বারা আঁকা 'পিরাস' সোপ' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন-পটের সংখ্যা দেখিতে দেখিতে ব্যাঙ্গের ছাতার মত বাড়িয়া বাইতেছে! ভাল আট্টই কম হইলেও এখনো ছ-চারজন টিকিয়া আছেন,— কিন্তু তাঁহারা কলির এক-পরে ধর্মের মত একান্ত চর্চনাগ্রস্ত! সংসারের হাজার কাজের পোড়া বালির তলায় তাঁদের অকেজো মনটি সুকানো ফল্লুর এতটুকু সফ

ধারাটির মত বহিরা দার—কেহ জানিতে পারে না,—জানিতে চাহেও না! তাঁহাদের কমনার রসিন ফাল্গুণ এখনো ভোরের কলো মেঘ-ফাঁকে দোণার রবি-কর-স্রোতে স্থান করে, অর্ধচন্দ্রের আধা-আলোর আধা-ছায়ার তারকার মুখে মুখে সোহাগের চুম্বন দেয়,—কিন্তু সে মঃালোকের আনন্দ-বার্তা লইয়া পৃথিবীর দিকে সে আর সহজে নামিতে চায় না, পাছে এই শত শত সহরের কোটি কোটি কলের মত্ত মত্ত ধূমধূম চিমিঙলো ভাগর হা-মেলিয়া তাহারিগকে গিলিয়া ফেলে! আট্ট এখনো একেবারে হরিয়া না গেলেও, তার যে প্রায় দার-বার অবস্থা, তাতে আর সন্দেহ কি!

অতীত তাহার বিরাট কমনা, মহান আদর্শ ও গভীর আনন্দ লইয়া আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মিশরে কর্ণাকের বিশাল স্তম্ভ-গৃহ, স্ফিংস ও পিরামিড, চ্যাল্ডিয়ার বাবেলের মন্দির, এথেন্সের পার্থেনন ও প্রপেলিয়া, রোমের



রোমের পার্থেনন



‘ওকারধামের মন্দির

পাহিরন, কোরাম ও কলিসিয়ান, গিরিয়ার ব্যালিবেকের মন্দির, ফ্রান্সের রিম্‌সের গির্জা, জাতার বড়বুদ্ধের মন্দির, ক্রামদেশের ওকারধাম এবং ভারতের ইলোরা প্রত্নতত্ত্ব গিরিগুহাশিল্প, ভুবনেশ্বর অগরাধ ও কনারকের মন্দির প্রত্নতত্ত্ব, অতীতের বিশ্বকর্মাণের অমাহুবিধ ক্ষমতা ও প্রতিভার অলস উদাহরণ। আর্ট তখন অসম্ভবকণ্ঠে সম্ভব করিতে পারিত—তাই সে যুগের কবিকল্পনা শিল্পীর হস্তে স্বর্গের লোপান-নির্ধাণের ভার্য্য করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কট হইত না।

আবার, হুগু শিল্পে বলিয়া নহ, জাহিতোও সে যুগের কবি-কল্পে যে বিশাল ধারণা-

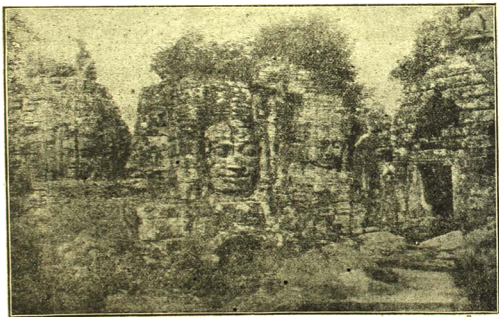
শক্তি ছিল, এখন জাহাও আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য এখন খণ্ড ভাবে নিখিলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারে বটে, কিন্তু পূর্বযুগের সাহিত্যে সমগ্রতার বে মহান সৌন্দর্য্য ছিল, একালে তাহার অভাব হইয়াছে একান্ত। বাস্তবিক, ব্যাস ও হোবারের অমর কাব্যে সমগ্র মানবতার এবং দগর-বৃত্তির যে অপূর্ণ দ্বাত-প্রতিদাত দেখা যায়, দ্বাতের বিরাট কল্পনায় যে স্বপ্নাতীত অদৃশ্য অগৎ বৃত্তমান হইয়াছে, আধুনিক কবির এমন সাধা নাই যে, তাহার তুল্য আর কোনকিছু দেখাইতে পারেন। এতটা বিশালতার তার একালের কবির। একসঙ্গে বোধ হয় সহিতে পারেন

না; তাই তাহার রহিয়া-বসিয়া একটু-
একটু করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে সমগ্র ও
বিশাল সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলেন।

এখন মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বাড়িয়াছে,
কিন্তু মনের যে নির্মল আনন্দ তখনকার
শিমৌদের ছোট-বড় প্রত্যেক কার্য্যকে
প্রাপবন্ত ও সকলদিকে সকল করিয়া তুলিত,
এ-যুগে বোধহয় তাহার অভাব হইয়াছে;
নহিলে, এতদিনের বহুদর্শিতাতেও আমাদের
হাত ক্রমেই অপটু হইয়া পড়িতেছে কেন?
তাহার উপরে, যে ব্যস্ততা হচ্ছে আটের
জঘনজ, সেই ব্যস্ততা আমাদের আধুনিক
জীবনে চুকিয়া হুকুমার শিদের মূলে ফুড়ুনের
বা মারিতেছে। যেখানে কর্ম্মজীবন

প্রবল ও কর্ম্মনার অবসর কম, আট সেখানে
সহজে আদিত্তে ভর পায়।

আমাদের সৃষ্টি-কমতা ত গিয়াছেই;
বেশীর ভাগ, যেখানে আমরা প্রাচীনকে
হুবহু নকল করিতে বলি, সেখানেও
আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা পদে পদে
জাহির হইয়া পড়ে। আগ্রা ও দিল্লীর
মোগল শিমৌদের পুরাণো কাজ মেহামত
করিবার জন্য যেখানেই একালের নূতন
কারিকর লাগানো হইয়াছে, সেখানেই দেখা
গিয়াছে, নূতনের কাজ কতটা অসার, কতটা
খেলো! সে মেহামতের নিষ্ফলতা বেন
হীরার সঙ্গে কাঁচ জোড়া দিবার চেষ্টার মত,
পূর্ণিমার চাঁদিনীর ভিতরে জাক্‌জার পলিতা



হাদে শিবের মুখ—ওড়ারধাম

আলার মত ! মেঘামত করা দূরে থাক
—উড়িয়ার শিল্পক্ষেত্রে প্রাচীন স্থপতিরা
যে-সব মস্ত মস্ত ভারি পাথর অবলীলয়
মেঘচুবী মন্দিরের টঙে হালুকা পালকের মত
টানিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিয়াছেন, একালের
বড় বড় পাশ-করা শুধাকথিত বিশেষজ্ঞরা,
হরেক-রকমের জীবজন্তু ও বস্তুর সাহায্যে
তাহার একখানি পাথরকেও নিকি মাইল
সরাইয়া আনিতে পারে নাই !

আর, সংস্কারের নামে প্রাচীন শিল্পের
বৃকে আমরা কি নির্দয় খাঁড়ার বা মারি !
অগম্যধের মন্দির একসময়ে ভুবনেশ্বর
ও কপারকের মত স্থপতিশিল্পে বিচিত্র ছিল ;
কিন্তু একালের অপূর্ণ সংস্কারের মহিমায়
মন্দিরের সেই মধুচক্রের মত নিপুণখোদাই-
কাজ, চূণ-বাণির প্রলেপে বেহালুম ঢাকিয়া
গিয়াছে। ওনিতেছি, ভুবনেশ্বরেও শুধাকথিত
প্রাচীন শিল্পের সংস্কারের—অর্থাৎ সংস্কারের
বন্দোবস্ত হইতেছে। হুঁ এদেশ বলিয়া
নহ—মুত্রোপেও এই ভয়ানক সংস্কারের
পাল্লা পড়িয়া প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও

চিত্রশিল্পের গণনাভীত নিবর্শন একেবারে
দর্শনাভীত হইয়া গিয়াছে। লিওনার্ডো ডা
ভিন্সির বিখ্যাত চিত্র Last Supperএর
হৃদ্পার কথা ত সকলেই জানেন !

সেকালের তুলনার একালের আর্টিষ্টদের
কল্পনা, ক্ষমতা, প্রতিভা ও ভাবুকতা ত
খাটো হইয়া গিয়াছে বটেই,—তাহার উপরে
আবাদের রসবোধের মাত্রাও এতটা কমিয়া
আসিয়াছে যে, বলিতে লজ্জা হয়। সেকালে
একালে তুলনা,—মাতঙ্গের পাশে যেন
পতঙ্গ ! তাই একালের বামন-রূপী মাছধের
সামনে বিশাল মৈত্রেয়পুরীর বিচিত্র বিস্ময়ের
মত, সেকালকার যে-সকল শিল্পের সৌন্দর্য্য
আজিও কুটুট আছে, নিজেদের অক্ষমতা
ভাবিয়া আমরা যেন স্রদ্ধানত শিরে
তাহাদের কাছে গমন করি। সেবতার
অপমান করিয়া কালাপাহাড় আজ ইতিহাসে
নিম্নিত ; তাহার ললিত কলার অপমান
করে, তাহাদের অপরাধও কালাপাহাড়
অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প নহে।

ক্রিষ্টেনেব্রকুমার রায়।

পঞ্চশরে পঞ্চত

(ওনের দে বালজাক্ হইতে)

ক

যখন নেপোলিয়ন, মর্য্যো হইতে সৈন্তে
হঠিয়া আসিতেছেন, তখন আমি একজন
লেক্টেন্যান্ট।

শীতের সন্ধ্যা ; সৈন্তেরা ছড়ডগ হইয়া

পড়াতে আমি তখন একা। সারাদিন পথ
হাটিয়া একটি গ্রাম পাইলাম। অনেক
খোজাখুজির পর এক জারগার আশ্রয়
মিলিল।

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়াই দেখি, সেখানে

আরো কয়েকজন সৈনিক আসিয়া ছুটিয়াছেন। একটা টেবিলের ধারে বসিয়া তাঁহারা খাওয়া-দাওয়া করিতেছিলেন; দু-চারিটি চেনা মুখও নজরে পড়িয়া গেল। টেবিলের আর-একধারে একটু রমণীও বসিয়াছিল;—এতগুলি সৈনিক-পুরুষের সঙ্গে রমণীর দেখা পাওয়া এ-সময়ে কিছুমাত্র নূতন দৃষ্ট ছিল না।

আমাকে দেখিয়াই বহুদূর আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমিও সকলকে উচিতমত সম্ভাষণ করিয়া ঘরের এককোণে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। শীতের চোটে আমার হাত-পা তখন অসাড় হইয়া আসিয়াছিল; চটপট হাতে শরীরটা গরম করিয়া তুলিতে পারি, সেই চেষ্টায় আমি জড়োসড়ো হইয়া চুপচাপ বসিয়া रहিলাম।

এ-ঘরের ভিতর দিয়া পাশের ঘরে যাইবার ক্ষুদ্র দেয়ালের মাঝামাঝি একটা দরজা—সেই দরজার দিকে পিছন করিয়া ফোজের এক কর্ণেল বসিয়া আছেন। একসময়ে এর তাঁবে আমি কাজ করিয়া-ছিলাম।

এই কর্ণেলটির চরিত্র বড় বিচিত্র,— এমন লোক সহজে নজরে পড়ে না। জাতিতে ইনি ইতালীয়। লম্বা-চওড়া বৈভ্যের মত—গারেও বেজার জোর। পুরুষোচিত বলবীর্যের সঙ্গে তাঁহার আকৃতিতে রমণীমূলক সৌন্দর্যের মিলন হইয়াছে। নাক-চোখ বেন তুলি-দিয়া আঁকা, গড়মট বেন ছাঁচে-ঢালা, রংটি ছুপুরের মত ধূসরবে।

কিন্তু, একবার রাগিলে তাঁহার আর

হুস্তিদিব্য জ্ঞান থাকিত না। সে যে কি বিধম রাগ, তাহার তাহা খুলিয়া বলা যায় না—সে রাগের মুখে পাড়ার, কার হেন সাধা! সকলেই তাঁর কাছে ভয়ে কেঁচোর মত এতটুকু হইয়া থাকিত। তাঁকে ডরাইতাম না কেবল আমি; তার কারণ, আমাকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। কিছুতেই তিনি আমার কোন খুঁৎ দেখিতে পাইতেন না—আমি হাভার বেষ্টিক কাজ করিলেও তিনি বলিতেন, ঠিক!

রাগের সময়ে তাঁর কপালের মাংসের উপরে বোড়ার গুরের মত একটা বাকা দাগ ফুটিয়া উঠিত; তখন তাঁহার অগ্নিবী চোখের অলস দৃষ্টি অপেক্ষা এই চিলুটিকেই দেখাইত, বেশী ডরানক! সে-সময়ে মত হতীও বোধহয় তাঁহাকে এক-পা পিছু হঠাইতে পারিত না। কিন্তু যখন তাঁহার মাথা ঠাণ্ডা থাকিত, তখন তাঁহার মুখ-খানিকে মেয়েলি মুখের মত মধুর ও কোমল দেখাইত!

আমার সামনে, টেবিলের এধারে বসিয়া আছেন, একজন কাপ্তেন। ওধারে, কর্ণেলের সামনেই, কাপ্তেনের দ্রী। তাহার নাম হোসিনা।

বহু-কর আগে এই কর্ণেল ও কাপ্তেনকে লইয়া একটা বিধম হৈ-চৈ লাগিয়া গিয়াছিল।

খ

সে-সময়ে আমি কর্ণেল ও কাপ্তেনের অধীনে কাজ করি।

একদিন আমরা জনশ্রুতির ভিতরে একট

সহ রাত্তার উপর দিয়া কামানের গাড়ী টানিয়া, আনিতেছিল। মাঝপথে উন্টানিক হইতে হঠাৎ আর একদল পণ্টনের সঙ্গে দেখা।

নূতন দলের কর্ণেল ঠোট বাঁকাইয়া আমাদের হুকুম দিলেন, “তফাৎ! তফাৎ! পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!”

কিন্তু সে হুকুম তামিল করিয়া আমাদের কাপ্তেন খাটো হইতে বাইবেন কেন? তিনি দেহালের মত নিখর হইয়া পথের উপরেই খাড়া দাঁড়াইয়া রহিলেন!

বিরোধী পক্ষের কর্ণেল ঝাঁঝালো গলায় বলিয়া উঠিলেন, “কটে, সরবে না? দাঁড়াও, ভাখাছি মজাটা!”—তিনি কিরিয়া তাঁহার কামানের গাড়ীর চালককে বলিলেন, “এই! চালাও গাড়ী!”

চালক, বডটা-সম্ভব পথের একধার বেঁধিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল; কিন্তু তাতেও আমাদের একপ্তরে কাপ্তেনটি বাঁচিয়া পাইলেন না,—গাড়ীর .চাকার পা আটকাইয়া ঘোড়া হইতে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন! সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ডান পাখানি ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখের পলক না পড়িতে এই কাণ্ড! আমরা সবাই ধতমত থাইয়া অবাকমুখে দাঁড়াইয়া আছি,—হঠাৎ দেখি, পিছন হইতে বিদ্যাবৎবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া, মুগ্ধিমন্ত একটা ঝড়ের মত আমাদের কর্ণেল আদিয়া হাম্বির!

সেই মুহূর্তেই কাপ্তেন কাতুরাইয়া উঠিলেন, “ওঃ! পেলুম—পেলুম!”

আমাদের কর্ণেলকে তখন মাঝে মধ্যে

হইতেছিল না! মুখ দিয়া তাঁর ফেরা বাহির হইতেছিল এবং হৃক্কর ক্রোড়ে বাক্যহারা হইয়া রুদ্ধ আক্ৰোশে তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিলেন। আগুনভরা চোখে বনের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া, তিনি ও-দলের কর্ণেলকে ইঙ্গারা করিলেন!

দুই কর্ণেল তখন বনের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। দূর হইতে নিখাস চাপিয়া আমরা দেখিলাম, বনের মধ্যে এদীপ্ত শিখার মত ঝকিয়া উঠিল হুথানা লক্শকে ভরবারি,—এবং পলক না-পালটিতে ও-দলের কর্ণেলের মাথাটা ধড়্ হইতে ছিটকাইয়া মাটিতে সূটাইয়া পড়িল!

সে-দলের লোকেরা আর এক-মিনিট দাঁড়াইল না—যে পথে আসিয়াছিল, উচ্ছ্বাসে উর্দ্ধমুখে সেই পথেই আবার ঘোঁড় মারিল!

কাপ্তেন তখনো কাঁদার উপরে আঁধমরা হইয়া পড়িয়া পড়িয়া গ্যাড়াইতেছেন। এই কাপ্তেনটির জীব সঙ্গে আমাদের কর্ণেলের কিছু মাথামাখি ছিল।... কর্ণেলের এতটা রাগের আসল কারণ তাহাই!... ..

গ .

আজ সন্ধ্যাবেলার সেই কর্ণেল ও কাপ্তেনকে অনেকদিন পরে আবার এক আরম্মার দেখিলাম।

কাপ্তেনের স্ত্রী রোসিনা পরমরূপসী; বয়সত্ত্বে তাহার বৌবনে ভাটা পড়িতে শুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার রূপের স্রোত আজও বদ্ধ হইয়া ধার মাই। এখনো

তাহার ভাগর চোখের কোণে বিভ্রাৎ চম্কার, কপোলে গোলাপী হং ফুটরা ওঠে, চলা-ফেরার ছন্দের তাল পাওয়া যায়! এখনো তাহাকে দেখিয়া কেউ যদি প্রাণ হারাইয়া কেলে, তবে তার পছন্দকে নিশ্চয় করা চলে না।

রোসিনার স্বামী কাপ্তেনকে দেখিলে লোক নেহাৎ মন্দ মনে হয় না। তিনি ভদ্র ও শিক্ষিত; কিন্তু আজ বছরতিন বয়সী তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কর্ণেলের যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তিনি যেন তা দেখিয়াও দেখিতে চান না! হরত তাহার এই বিচিত্র নির্লিপ্ততার আর-কোন গুপ্ত অর্থ আছে!

তবু, এই কাপ্তেনটির মুখের বিকে ধখনি চাহিয়াছি, তখনি কেন জানিনা, আমার মনে কেমন-একটা অবিবাস ও সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে!

তাহার নীচের ঠোঁটটা খুব পাতলা এবং উপরদিকে না উঠিয়া তলার দিকে মুইয়া পড়িয়াছে; ঘানের ঠোঁট এমনধারা, তাদের চরিত্র হয় আলসে ও মাদানারা এবং স্বভাবটা হয় নির্ভর।

ঘরের ভিতরে যে ক-জন লোক বসিয়াছিল, তাহারাও আমার মতই, পথ হাটরা প্রান্ত; কাজেই এই অবসরতার মাঝখানে পরগুজবটা তেমন অমিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

কর্ণেলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তিনি হাত-মুখ পুছিয়া উঠিয়া ঝাড়াইলেন, এবং আমাদের নমস্কার করিয়া রুতের মত বিদায় দািলেন। তারপর, পাখের ঘরে ঢুকিবার আগে, কাপ্তেনের স্ত্রীর দিকে

একবার চাহিয়া স্পষ্ট স্বরেই ডাকিলেন, “রোসিনা!”—উত্তরের কোন তোহাফা না রাখিয়া কর্ণেল, গড়-গড় করিয়া পাখের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

কর্ণেলের এ ডাকের মানেটা যে কি, সেটা বুঝিতে কারুর ঘেরি হইল না। চেনা-অচেনা এতগুলো লোকের মাঝে,—বিশেষ করিয়া—স্বামীর সামনেই কর্ণেলের এমন অন্তর ব্যবহারে, রোসিনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিল; এবং স্বামীর সম্মানে ও তাহার রমণীষে আঘাত লাগাতে, সে পাগাপ-মুখে আড়ষ্ট ও গুম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে কর্ণেলের শরনগৃহ হইতে আবার উচ্চস্বরে ডাক আসিল—“রোসিনা!” এই দ্বিতীয় ডাকে কর্ণেলের স্বভাববিন্দু অধীরতা ও বেজ্ঞাচারিতার ভাবও ফুটিয়া উঠিতেছিল।

রোসিনার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া মিল! ভরে-ভরে সে আসন ছাড়িয়া ঝাড়াইয়া উঠিল এবং একটু ইতস্তত করিয়া, অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত কর্ণেলের ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

এ ঘরে দুই-শব্দটি নাই,—সবাই তটস্থ! হঠাৎ আমি হাসিয়া ফেলিলাম; সঙ্গে-সঙ্গে সকলকার মুখেই আমার হাসির প্রতিধ্বনি খেলিয়া গেল!

কাপ্তেন আমার দিকে চাহিয়া ভুরু কুচকাইয়া বলিলেন, “তুমি কে হাসলে বড়?”

তাড়াতাড়ি নির্ভয়ে সামলাইয়া বলিলাম, “আমার ঘোব হয়েছে, মাক করুন!”

কাপ্তেন কিছুক্ষণ গুচ্ছ হইয়া রহিলেন।

তারপর নীরস স্বরে বলিলেন, “না, মোঘ
তোমার নয়—দোষী হচ্ছি আমি!”

এই ব্যাপারটার পর সকলেই কেমন
বেন মনমরা হইয়া গেল। সমস্ত কথা-
বার্তা বন্ধ করিয়া আমরা যে যেখানে
ছিলাম, শুইয়া পড়িলাম; এবং শীঘ্রই
ঘুমঘোরে আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া
আসিল।

৭

সকাল বেলা; যে বার তল্লিতলা বাহিয়া
আবার রাস্তার বাহির হইয়া গড়িল।
আমাদের কেউ কারকে সাধী হইতে ভাবিল
না—বার বেদিকে খুঁসি, সে সেইদিকে চলিতে
হুকুম করিল।

কিন্তু, খানিকদূর হাইতে-না-হাইতেই
আমরা হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, গিছন হইতে
উচ্চস্বরে কে বেন আর্ন্ত চীৎকার করিতেছে!
কী সে চীৎকার! মাহুদের স্বর কি এমন
হয়? এ বেন আহত সিংহের বিকট গর্জন!
সেই প্রাণ-কাঁপানো, অমাহুবিধ, ভয়াবহ
গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা সবাই
গুলিলাম, নারীকণ্ঠের আর-এক অশ্রুট
আর্ন্তনাগ!

চকিতে আমরা সবাই—যে যেখানে
ছিলাম—কিরিয়া গাড়াইলাম; সকলেই ভয়ে
তরু ও তন্তিত!

যে বাড়ীতে গেল-রাস্তা কাটাইয়াছিলাম,
দূর হইতে সেই বাড়ীর দিকে চাহিলাম।
কিন্তু, এ কি! যেখানে সে বাড়ীখানা
ছিল—এখন সেখানে শুধু ধূ-ধূ-ধূ আগুনের
শিখা ধ্বংস-ধ্বংস করিয়া অলিতেছে! এলমেল
হাওয়ার হত খালে ঢেঁকে ঢেঁকে ধূমের পর ধূম
পাক্‌সার্ট মারিরা আমাদের দিকে ধাইয়া
আসিতেছে—সঙ্গে-সঙ্গে সেই তীব্র অঘট
বুক-ভাঙ্গা, আর্ন্ত, ভয় স্বর; এবং একটা
মাংসপোড়া দুঃসহ দুর্গন্ধ!

অলক্ষণ পরেই কাপ্তেন আনিয়া হাজির!
আমরা তাঁহার দিকে বোবার মত চাহিয়া
হইলাম,—কারুর এমন ভরসা হইল না,
তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে! তিনি কিন্তু
নিজেই আমাদের মনের ধাঁধা মিটাইয়া
দিলেন। ডানহাতে আপনার বুকের পানে
সেখাইয়া এবং বাঁ-হাতটা অলস আগুনের
দিকে তুলিয়া, কাপ্তেন বলিলেন, “এতদিনে
প্রাণের ব্যথা গেল!”

আমরা যে বার পথে কিরিলাম,—
নীরবে, কলের পতুলের মত!

ভাড়া বহি হঠাৎ বিদ্রোহী হয় তবে
তার চেয়ে ভয়ানক আর-কিছু ভাবা
ব্যয় না!

শ্রীমতী রেণু রায়

বঙ্গালীর রসবোধ

বঙ্গালীর অল্প বয়সে গুণ থাক, বা নাই থাক, তাহারা যে বুদ্ধিমান জাতি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রসবোধ বুদ্ধিরই একটি অঙ্গ। কালিদাস ত্রীলোকদ্বিগকে অশিক্ষিতপটু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু আমার ত মনে হয়—বঙ্গালী জাতি-মাত্রেই এই বিশেষণ লাভে অধিকারী। আমাদের দেশের, হস্তকৌতুক, বাঙ্গ-রঙ্গ, কাব্য-কবিতা, গান-ছড়া প্রভৃতি রচনা শিক্ষিত অগতেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে;—বস্ত্ততঃ শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত কবির সংখ্যাই এদেশে অধিক। কারণ, আমাদের আগম-নিগম পুরাণ-কথা-কাহিনীর সরস ভাবোচ্ছ্বাস মাঠ-বাট-জল-দ্বল ওতঃ-প্রোতঃ করিয়া প্রবাহিত। তাই অশিক্ষিত কবি অজস্রবকেও তাব-সম্পদে বিভ্রাপতি চণ্ডীদাসের নিকট হার মানিতে হইয়াছে আর কবিপ্রবর রামপ্রসাদের পদাবলী ভক্তভাবে বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই চরণে অর্পণ করিয়াছে।

বাঙ্গলার সাহায্য পরিপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয়—আজকাল কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকেও অনেকে বঙ্গালী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাধু সাধু! আমরা ইহাদের যত্নকে পূর্ণবৃত্তি সহকারে এই প্রার্থনা করি, তাহাদের উদ্ভব সকল হোক, অভিপ্রায় সন্নিহিত হোক।

নিম্নে আজি যে পদাবলী উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা প্রকৃত প্রভাবে কবিতা-

পদবাচ্য নহে, ইহা একজন বঙ্গালী সৈনিকের ছন্দে লিখিত দৈনন্দিন বিবরণ।

বাঙ্গালী সেনা! এই নামটিতেই চরণ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে! সকলেই জানেন, কিছুদিন হইল বাটজন বাঙ্গালী-সেনা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক করাচী হইতে এখানে আনীত হইয়া বাঙ্গলার দ্বানে দ্বানে নব সৈন্ত-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহারা কলিকাতার উপস্থিত হইবামাত্র মহিলা-সমিতি একদিন ইহাদিগকে অভ্যর্থনা-ভোজ প্রদান করেন। সেই অভ্যর্থনা-সভার ইহাদিগকে দেখিয়া মনে যে অপূর্ণ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। চিরদিন ধরিয়া, গানে, কবিতায়, কথায়, বক্তৃতায়, গল্প-পল্পে আমরা যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছি, পোষণ করিয়াছি—সেই অতৃপ্ত বাসনা আজি সূক্ষ্মমস্ত হইয়া আমাদের নয়নের সন্মুখে বিরাজিত! এই বাঙ্গালী যুবকদিগের সাধ-সম্ভার, চলনে-বলনে আকার-ইন্দ্ৰিতে কি বীর-মাধুর্য! স্বদেশকে তাহারা স্বজাতিতে পরিণত করিবার ইচ্ছার দৃংখ ক্রেশ তুচ্ছ করিয়াছে; রাজার আহ্বানে, দেশের কার্যে, তাহারা আজ অদ্বয়া উৎসাহে দলে দলে মরিতে চলিয়াছে, যুদ্ধকে তাহারা আর ভয় করে না—; প্রাণ তাহাদের নিকট আজি কেবল কর্তব্যের পথ। কি আনন্দ! এই দিনটি দেখিবার অস্তই যেন এতদিন এ যৌবন বহন করিয়াছি! সেদিন আমাদের মনের

এই আনন্দ আকাশে বাতাসে, আলোকে ছায়ায় ঘন মাতামাতি করিয়া বহিরা উঠিয়াছিল।

সেই নিমগ্ন-মৃত্যুর সমবেত সকলের চিত্তবিনোদন স্তম্ভ হাবিলদার দীরেন্দ্রনাথ সেন-রচিত নিয়মিত পদাবলী একজন দৈনিক পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ছন্দ-বন্ধে নির্দোষ নহে, ভাবগাম্ভীর্যও অপূর্ণ

নহে, তথাপি ইহার ছন্দে ছন্দে যে একটি হাতকৌতুক নিহিত আছে তাহা অতি মনোরম, এবং ইহার বর্ণনাও অতি —উপায়েশ। আমি সেইজন্য এই পদাবলী পত্রস্থ করিবার স্তম্ভ লেখকের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছি। আশা করি পাঠকগণ ইহা পড়িয়া আমারই মত তৃপ্তিলাভ করিবেন।

ঔষধকুমারী দেবী

বাক্সালী সেপাইয়ের রোজ-নামচা

প্রথম অধ্যায়

সরকার হাথে তুষ্ট বাক্সালীর বলে,
গঠিল বাক্সালী দৈন্ত পয়সাকার ছলে।
সীমান্ত-প্রদেশে আছে নোশেরা সদর
ভুলিয়াছি তিরদিন দেশ মনোহর।
দৃষ্টে দেয়া, খাষ্টে দেয়া, জল-বাঘু ভালো;
বাঘাম আত্মর পেতা গাছ করে আলো।
নদী চলে বেচে-নেচে মাছ লগে বুকে
এত ভনি বদলুবা ছোটে উর্দ্ধমুখে।
কেউ এল ভ্রমেন-ভ্রমে দিবে প্রাণ রণে,
কেউ এল পেতানুর খাবে প্রাণপণে,
কেউ এল ক্ষুণ্ণা নিয়ে ধরিবারে মাছ,
কেউ এল কল খাবে উপাড়িয়া গাছ।
ছক-ছক হিয়া লগে দিনপাচ পরে
উপনীত হবে সেই স্বপন-সহরে।
হরি হরি, একি হেরি একি মনোবাধা,
আগাগোড়া একেবারে ডালা মিছেকর্ণী!
কোথায় আত্মর-পেতা! কোথায় বাঘাম!
গন্ধ তার দূরে থাক,—নাহি মেলেনাম!

নদী আছে বটে কিন্তু তেপান্তর পার
এমন জীবন স্রোত নামে সাধা কার!
মাছের কথাটা থাক, আসের সন্ধান
পেতে বহি চাও খোঁজ ঔষধপুস্তক।
আলু মূলো প্যাজ ছাড়া আর নাই গতি,
দূর ছাই তাও ভাল পেলে দিন প্রতি!
জীবের জীবন জল সহজে না ছোটে
প্রাণটা রাখিতে গিয়ে প্রাণ ওঠে ঠোটে!
ইদারায় আছে জল বাট হাত নীচে,
তুই হাতে হ'ল ব্যথা লগা বড়ি থিচে।
সঙ্গে এসেছিল চার বামুন ও ভিত্তি
একে একে তাহাদের দিতেছি কিরিত্তি।
বামুন বিক্রম সিংহ চারি দিন পরে
Deserter হরে চুপে পড়িলেন স'রে।
ভিত্তি সে শতীন দাগ চুরি করে এসে,
বাক্সালার ফিরে গেল করেদির বেণে।
রাজেন আরেক ভিত্তি হাসপাতালে বাস,
ছুধ কুটি chicken broth খান বারমাস।
• নগেন রাধুনী পাকা, একা করে কি—
বসে বসে চালে স্বধু গিচুড়িতে বি।

সারস্বতের কাঁচা আসে,—কাঠ সব কাটা,
অস্থির ধোঁয়ার চোটে দার হল বাঁচা।
হুনে-পোড়া ডাল আর কঠিন চাপাটি,
হাসিমুখে পেটে পূরে সারাদিন খাটি।

পাঠারে দিয়েছে সঙ্গে Ladies Committee,
অনেক জিনিষ ভরা এই পুঁটুলিটি !
খটি বাটি থালা আছে, আর সেক্টি পিন,
চিকণী, বুটের লেশ, চিনি একটিন।
বোতাম, চুই ও হুই, সেলায়ের হুতো,
ক্রশ কালি তাও আছে সাক কর্তে কুতো।
বাগিসের খোল, আর তেল একশিশি,
সাবান আরনী আছে হয়ে মেশামিশি।
ডোরাসে, চুস্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি দেশলাই,
মশলা প্রভৃতি আরো বা খুঁজিবে তাই !
এখানেও লভিয়াছি জিনিষ অশেষ,
একে একে সব কথা করিতেছি পেশ।
ট্যাঙ্কটি ভেবনা কোন্ডা, আছে মুদ্রা বাটি,
তা হতে পেরেছি এক মূর্খা-ফেলা খাট।
প্যান্ট, সার্ট, ক্রশ আর কোমরের বেষ্ট,—
চুপিরও আশা রাখি,—made of felt।
একজোড়া Puttec আর একজোড়া মোজা,
ঐচরণে Boot, বাপ্ ! ঐগাধার বোঝা !
পেতে শুতে সত্তরকি, গায়ের কবুল—
কম-বল হজিনাকো—উন্টে বাড়ে বল !
গলা-জাঁটা অপরূপ থাকীর সে কোট,
সব নিরে হল এই বারো দফা মোট !

(৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্যারেড)

বিকৃত প্যারেড-বাঠ করিতেছে ধু,
দাস নেই, ছড়াছড়ি নোড়া-হুড়ি হু !

গলা-জাঁটা কোট আর বুট-পাট এঁটে,
প্যারেড করিতে ছুট চা ও কুট দেঁটে।
ভীষণ যোনের তাতে কাটে খোলা শির,
চোখ ছেপে ঝরে অহো ! বরষার নীর !
ভদ্র বটে মিষ্টমুখ মাষ্টার-মশাই,
প্যারেড-জমিতে কিন্তু সাক্ষাৎ কসাই।
জবর চেহারাদানি, গোফে-ভরা মুখ,
নজরে পড়িয়া গেলে ভয়ে কাপে বুক।
বৈবে যদি ভুল হয়, দিবেনাকো ছাড়ি—
'কুইয়ামে গিরো' বলে উত্তিবে কুকারি !
দুই পায়ে দুই বুট—পাঁচসের ভারি,
ভদ্রপরে রাইকেল—চলিতে কি পারি !
মাথা হেঁট হয়ে আসে, তাকে বুঝি নাক,
পিছে হতে বলে উচ্ছে "মূর্খা উপর-তাক !"

বে-কোন অস্থখ হলে Quinine mixture
শুরুতর হলে কিছু Iodine Tincture।
ডাক্তারের হাতে খালি এইমাত্র পুঁজি,
পথা পাবে হর দটি, নয় দুখ-হুজি।
রবিও বিহাংবারে খাবে কুইনিন;
তা না হলে ম্যালেরিয়া করে বেবে কীণ।

তৃতীয় অধ্যায়

N. C. Os.

আমাদের মধ্যে আছে N. C. O গণ
একে একে তাহাদের দিব বিবরণ।
হাবিলদার নজুমদার অনাদি চাইবো,
নারক বর্ডন আর ঐহুর্গা বাড়ুণ্যে।
অরুণ, ধীরেন সেন; Lance বিমল সিং,
শচীন, পটল আর তারক কড়িং।
দাড়ী-কটা কণ্ঠ-দাদা, বিবেকর ভারি
কারিকর বিকু-ভাই আগে বড় মারা।

আত্মশ্রমে নারায়ণ পেছোয়ারী বেশে ;—
পাঠালেন ফটোগ্রাফ তির তির দেশে ।
এর পরে আসিলেন জমাদার বোস,
বাঙ্গালীর আজ্ঞা পেয়ে দিলু হুগল খোস ।

বর্ণনা

পেটুক মজুমদার, ঘোরে-ফেরে বারবার
থাবার সেখানে ছিলে কৌক !
যা পাবে সে সোজাহুজি থাকবে দুই চক্ষু বুজি
চায়ে মারে এতবড় তৌক !
দশোঁর-জেলার বাস করিয়া বি, এল পাগ
কচ্ছিল উকিলী নিজ দেশে ।
ছেড়ে গাড়িনের মারা কাঁদারে মজেল-ভাগা
হঠাৎ হাঞ্জির রণ-বেশে ।
অনাদি সে অনামুখো মেজাজ বড়ই রুখো
জলের ধারেতে নাহি যায়,
চেহারাটি ধ্রুবর্ণ যুমে আস্ত কুন্তকর্ণ
তারে বুঝা দেবতার দায় ;
গভরটি মোটাসোটি চুলগুলি কটা কটা
কাহারও প্রতি নহে বাম ।
রাতিরে দেখিলে পরে বুক দুক-দুক করে,
মনে মনে বলি রাম রাম !
অতি-ভোজে নন কাবু নারক বর্দ্ধন-বাবু
খেয়ে রুগ, ডিলে কিন্তু ভালো,
দেজারটি খিটখিটে চেহারাটি ফিটফিটে
ঘোবের মধ্যে বর্ণটি কালো ।
আমাদের দুর্গা-ভায়া ডাক-নাম মহামায়া
দেহখানি মার্কেল-সুগোল ।
তার নাম দিল John রসিক সাহেবগণ
কাজে কুড়ে, মূর্খে লম্বা বোল !
ঐক্যরূপ writer, পুলিশটি fighter
শিখেরা বলে আছুর বাবু ।

ভতে পেলেন মুখে হাসি, হু-বেলা বিছানাবানী
ডিলে চটা,—অরে অরে কাবু ।

Lance-বিদলস্ত্র গড়নটি নহে মন্দ,—
—মাগিগর ফুটবল গ্রার ।

প্যারেভেতে দিগে ফাঁকি বন্দুক রাখিতে ডাকি
ঘড়ি-ঘড়ি ঘড়ি পানে চায় !

ঘরে বসে থাকে বেশ রোগের নাইক লেশ
কাজের সমর পায়ে বাধা,

Skirmish করিতে নারে, কি-করে ডিল
সে করে,

গুপ্ত কত থাকে সত্য কথা ?
Evening Roll Call এ দিনতি করিয়া বলে

‘সেন-দাল, বাঁটাও—মোহাই !’
সরে পড়ে ছুটি নিয়ে নিজ কর্ম পরে দিগে

হাতে তুড়ি, মুখে মন্ত হাই !
(বিমলের বিবরণ, করিলাম withdrawn

আধসের জিনিশির লাগি,
বাধ রেখে কথা তার, পড়িও সকল আর,

হে পাঠক, এই ভিক্ষা মানি ।)
উদাস শটীন রাগ, উকী-ভরা সারা গায়

মোনরতী—গভীর পেচক !
বই-হাতে, বিছানাতে সদা শুয়ে, কলনাতে

ছোটে তাঁর মানস-ঘোটক !
পটল অটল বীর চলে উচু করে শির—

বুদ্ধির ভাঁড়েতে মা-ভবানী !
গৌকছুটি খাড়া খাড়া তাতে বন বন চাড়া

বুড়-খোকা, হাসি মুখখানি !
বাঁড়ুয্যে তারকনাথ ভুড়ি-ভরে’ মারে ভাত

এত খেয়ে, দেহটি বাধারি,—
চুলের বাহার ভালো, রং নয় তত কালো—

জামকান্ত রোদে-পোড়া তারি ।

Rumca' ফেলিছে অশ্রু তাহার স্তনীর অশ্রু
কে দিয়েছে ছেঁটে বিলকুল,
অতিশয় গো-বেচারা, মারো-ধরো, নাই সড়া,
রাগে কতু হয় না বেতুল !
খেলোয়াড় বিশেষর বিরস শলার স্বর
জন্ম তার নিজ-বর্ধমানে,

ছাড়ি নবাবের থানা, সীতাতোণ মিহিমানা
ধস্ত ধস্ত, এসেছে এখানে !
বিশ্বকর্মা যিতু-ভাই, মুখে টু-পকট নাই
একটুতে ভাঁকু করে কারা !
লোকটা বড়ই ভালো, তবে কিনা, রংটা কালো
অমাবস্তা নাগাল পান্না !

হাবিলদার ঐধীরেন্দ্রনাথ সেন ।

মাসকাবারী

সাহিত্যে ভদ্রতার আদর্শ

গতমাসের “ভারতী”তে আমরা দেখাই-
বার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে চিত্তরঞ্জন বাবু
ভাঁড়ার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্থিলনীর অভিভাষণে
রবিবাবুর আমেরিকায় বক্তৃতাবিশেষ না
পড়িয়াই তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া রবিবাবুকে
অথবা আক্রমণ করিয়াছেন এবং রবিবাবুর
স্বদেশ ও সমাজ সঞ্চরীর সমস্ত বক্তৃতাগুলি
পড়িয়া (অথবা শুনিয়া) জ্ঞাতসারে হোক
বা কতকটা অজ্ঞাতসারে হোক রবিবাবুর
অনেক কথাই প্রতিলিপি করিয়াছেন।
আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারো কিছু
বলিবার থাকিলে তাহার জবাব দেওয়া
হাইতে পারিত, কিন্তু এ পর্যন্ত ছ একটা
কাগজে বাহা বাহির হইয়াছে তাগ প্রতীবাদ
নয়, অপবাদ দিবার চেষ্টা। বাংলা দেশে
এই চেষ্টাটা সঙ্গতি বিশেষ মূলত হইয়াছে,
কেমনা বিজ্ঞা-বুদ্ধি বা গুণপনা অনেক লোকের
পক্ষেই হ্রস্ব এবং এ চেষ্টার তাহারের সেরেক
কোন দরকারই নাই। সতরাং সুক্তির সুখ বন্ধ

করিবার উপযুক্ত মুখবন্ধ কতকগুলি লোকে
হির করিয়াছেন, প্রতিপক্ষকে অভ্যন্ত ভাবায়
গালি দেওয়া। তাঁরা বেশ জানেন যে এ
আর্টে কোন ভদ্রলোক তাঁদের হার মানাইতে
পারিবেন না, কারণ ভদ্রলোক মাজেই
ভদ্রতা জিনিসটার মর্যাদা জানেন। কিন্তু
বাংলা দেশের বিস্তার ‘ভদ্রলোক’ এই আর্টে
হাত পাকাইতে সক্ষম করিয়াছেন এবং
উত্তরোত্তর তাঁদের লেখার সমগ্রদ্বারের ও
খরিদদ্বারের দল বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া
মনে হয় যে বোধ হয় হোঁরাতে ব্যাঘোর
মত গালি জিনিসটারও একটা হোঁরাচ
আছে। কিংবা বোধ হয় গালির ঝাঁপুনির
মধ্যে একটা রসও বা আছে, যে রসটা
ইত্তর রস হইলেও ক্রমশ ক্রমশ অনেক
লোকেই তাতে স্বাদ পায় ! ভরের যেমন
একটা রস আছে যে-জন্ত হেলিপিলেরা
বত বেগী তর পারু ততই ভূতের গল্প বা
হাক্কের গল্প শুনিতে ভালবাসে, যেমন
বীভৎস বলিয়া একটা রস আছে, যে জন্ত
বীভৎস ওকারজনক দৃষ্টের বর্ণনা পড়িয়া

বই বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইলেও কোন কোন লোকের সবটুকু পড়িবার ক্ষমতা উদ্ভূত করিতে থাকে, তেমনি বোধ হয় একটা গালি-রসও আছে এবং এ রসের রচনার যারা সিদ্ধান্ত তাঁদের নাম না করিলেও অনেকেই জানেন যে তাঁদের গালি-রস-রচনা পড়িবার ক্ষমতা গালি-রসিকদের মনটাও ক্লিপ চঞ্চল হয়।

কোন সময় হইতে মাসিক ও দৈনিক সাহিত্যে এ রসের উৎপত্তি তাহা নির্ণয়ের ক্ষমতা ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন করে না। স্বদেশীর সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় ‘সন্ধ্যা’ কাগজে এই রসটাকে popularise বা সর্জনজনমূলক করেন। তার আগে তাঁর চেয়ে হৃদয়তর ভাবে এ রসের সৃষ্টি করেন ‘সাহিত্য’-সম্পাদক সমাজ-পতি মহাশয়। বিনি ঘাই বলুন, এক সময়ে হাতের কাছে “সাহিত্য” পাইয়া, মাসিক-সাহিত্য-সমাধোচনা পড়িবার প্রলোভন সঞ্চার করা অতি বড় বিশিষ্ট-বাক্যবস্তুর মূর্খির পক্ষেও সম্ভাবনীয় ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের বধন ‘সন্ধ্যা’ বাহির করিলেন, তখন সন্ধ্যার সময় ভ্রাতৃত্ব সবাই মিলিয়া তাঁর মূগ গালি-রস সাগ্রহে উপভোগ করিত, ইহা দেখিয়াছি। তবে ইতিহাসের সাল তারিখ মিলাইয়া দেখিলে এরাও এ আর্টে ‘নভিস্’; কারণ বাস্তবিক ইন্দ্র-নাথ, অমৃতলালই এ আর্টের দেয়া আর্টিষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই। Satire-এর সঙ্গে গালি বিশািব্যার ওস্তাদি তাঁদের ছিল। অনিয়াছি অমৃতলাল এখনকার কোন নামজাদা ‘নভিস্’ সম্বন্ধে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁর

সম্বন্ধরক্ষিত বহুকালের একটি ‘ভাঁড়’ উক্ত ব্যক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে এই ইতার রসটা কেন অনেক কাল ধরিয়া চলিতেছে, তার একটা কারণ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী চরিত্রের মধ্যে একটা লগুতা ও আনোদপ্রিয়তা আছে। এইলগুতা পশ্চিমবঙ্গেই এ রসের উদ্ভব ঘটয়াছে এবং পশ্চিম হইতে উহা পূর্ববঙ্গে ক্রমশঃ সংক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের বাঙালীর চরিত্রের মধ্যে একটা গাভীয়া আছে; সাহসিকতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে তারা পশ্চিম-বঙ্গের বাঙালীকে জিতিয়া আছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হৃদয় কোতুক-হাস্ত তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল; বাঙ্গ-কোতুক আগ্রহে অসম্ভব ছিল। এখনও যে সম্পূর্ণ সহিয়া গেছে তা বলা যায় না; তবে অনেকটা সহিয়া আসিয়াছে বটে।

কিন্তু বাঙালী চিত্তের লগুতাই এই লগু ও ইতার রসের উৎপত্তির একমাত্র কারণ নয়। বাঙালী খুব অল্প দিন হইল নাগরিক সভ্যতার দীক্ষিত হইয়াছে, এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। আজকাল কবির গানের স্বতির একটা ধারা উঠিয়াছে; যারা স্ততি করেন আশা করি তাঁরা তার সব ইতি-বৃত্তান্তটা জানেন। কবির গানে দুই পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ ঘতবেলী অন্নীল ভাবার প্রতিপক্ষকে গালি দিতে পারিত, সে ততই বাহবা পাইত। আজ বিংশ শতাব্দীতে নাগরিক সভ্যতার আমরা সভ্য হইলেও সেই কবির খেউড়ে প্রত্যহ সাহিত্যে যে আমরা বেশী দূর পর্য্যন্ত কাটাঁয়া উঠিতে পারি নাই, তার প্রমাণ মাসিক ও দৈনিক সাহিত্যে প্রত্যহই

এবং অল্প পরিমাণেই পাইতেছি। তারপর সম্প্রতি বাংলার গ্রামা সভ্যতার মহিমা-কীর্তন যে নূতন করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সেই 'গ্রামাসভ্যতার' মধ্যে গ্রাম্যতা বলিয়া যে বস্তু ছিল এবং এখনও আছে, সেটা সভ্যতা কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কেননা দেখিতে পাই যে, উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে এবং এত বছরের সহরে সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে সেই গ্রাম্যতার জড় মরিতেছে না। গ্রামের চতুষ্পাশ্বের আরগার এখন সংবাদপত্রের আলর তৈরি হইয়াছে, সেখানে গালির সোরগোল যত ইচ্ছা চড়াইলেও ভদ্রলোকের কানে তালা ধরে না, এবং গালির চাণবোল কর্ণ্যাতার নাক্সা ছাড়াইলেও তাঁদের কান ফেরে না, বরং কর্ণধর আরো উৎকর্ণ হইয়া ওঠে।

গালির যে একটা রস আছে তাহা ত গোড়াতেই বলিয়াছি। কিন্তু ইউরোপে এক সময়ে ভদ্রলোকদের মধ্যেও Cockfight ও bull-fight দেখারও ত একটা রস ছিল। ইংলেণ্ডে পোপ জাইডেনের আমলে এবং তারও পরে বাইরন প্রভৃতির সময়েও গালির রসটা অথবা খেউড়-রসটাও সাহিত্যে বেশ জমিয়াছিল। * তবে এখন বোধ হয় bullfight-এর রস, তথৈব সাহিত্যে গালির রস, ইংরেজ বা ফরাসী বা জার্মান ভদ্র-লোকেরা তেমন উপভোগ করেন না। কেননা, ভদ্রতার আদর্শটা যে সাহিত্যে ভদ্রলোকের রক্ষা করিয়া চলা উচিত, এ বিষয়ে ইউরোপীয় ভদ্র সাহিত্যে বোধ হয় একটা ঠাণ্ডা ঠিক হইয়া গেছে।

অবশ্য প্রতিবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি চালাইবার সময়ে, দাঁত-কোতুক বা বাঙ্গ-কোতুকের যথেষ্ট অবকাশ আছে—চেইরটন, বার্ণাডশ, বা এইচ. জি. ওয়েলস্ প্রভৃতি হালের কোন লেখকই সে অবকাশটুকু একবার পাইলে ছাড়েন না। মালিকা বা parody এবং বাঙ্গচিহ্ন বা cartoon-এর স্থান সাহিত্যে যথেষ্ট আছে। কিন্তু প্রতিবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দিয়া অথবা তাহার যুক্তিকে বাঙ্গ না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়া কিংবা তাহাকে অশিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া যে অসহ্য কোতুক-হাতের অবতারণা করা হয়, তাহা অত্যন্ত গ্রাম্য এবং অভ্যস্ত রসিকতার নমুনা।

বাংলা সাহিত্যে গ্রাম্যতা ও অশিষ্টতার স্রোতি ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা স্পষ্টই দেখা দাইতেছে। এই ইতর রসের স্বাদে পাঠকসাধারণ একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে, মার্জিত কচি-বিশিষ্ট রচনা আর তাহাদের মনে ধরিবে না, এই অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে ভদ্র সাহিত্যিক মাত্রেরই কোমর বাঁধিয়া লাগা উচিত।

“বাঙ্গলার কথা”

চিত্ত বাবুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সুদীর্ঘ অভিভাষণ সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করি নাই, শুধু তিনি কত আরগার রবি-বাবুর লেখার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি ও রবিবাবুর প্রতি তাঁর অবধা অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছি, ইহাতে কোন কোন খবরের কাগজ হুঃখ

প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম উল্লিখ্যে এই যে, বৈদেশী আন্দোলনের সময়ে রবিবাবু যে সব মত প্রচার করিয়াছিলেন, সবুজপত্রের আমলে তাঁর সেই সব মত কি অপরিবর্তনীয় রহিয়াছে? পরিবর্তনটাই যে জীবনের ধর্ম এবং জীবনধর্মী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই পরিবর্তনের লীলা অথবা অভিব্যক্তির লীলা যে জীবনের পর্ধ্যায়ে পর্ধ্যায়ে দেখা যায়—এ কথা এমনি স্বতঃসিদ্ধ ও স্থূলপটে যে ইহাকে গায়ের ছোরেও অস্বীকার করা চলে না। রবিবাবুর জীবনের ঐতিহ্য বিকাশের ইতিহাসে নানা মত ও আদর্শ-বৈচিত্র্য দেখা যায়; বস্তুত বড় জীবন নাহেই একরূপ বৈচিত্র্য দেখা গিয়া থাকে। যেমন গায়টের জীবনে বড় বৈচিত্র্য, এমন ইউরোপীয় আর কোন মহাকবির জীবনে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশে এমন বুদ্ধিমানও কেহ কেহ আছেন, যারা জীবনের এই নৈসর্গিক অভিব্যক্তির দরুন, জীবনে মতের ও আদর্শের যে সকল বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা ক্রমশ ক্রমশ অবস্ফুটাবীরূপে দেখা দেয়, তাহাকে স্বতঃসিদ্ধতা (self-contradiction) আখ্যা দিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করেন। দেশপ্রেমিকের দ্বারা অভিভূত হইয়া রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে দেশের অনেক প্রথা ও আচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে সকল সমর্থন করেন না—তাঁর জীবনে চিন্তার বা অভিজ্ঞতার এই যে একটা বিকাশ, এটাকে স্বতঃসিদ্ধতা বলিলে নাহুদের জীবনের লীলাই আগাগোড়া* স্বতঃসিদ্ধ একথাও বলা হইতে পারে। বাল্যটা যৌবনের স্বতঃসিদ্ধ,* যৌবন

প্রৌঢ়াবস্থার স্বতঃসিদ্ধ, প্রৌঢ় বৃদ্ধবয়স স্বতঃসিদ্ধ—এমন কথাও বলা হইতে পারে, যদিচ ‘স্বতঃসিদ্ধ’ বলিতে আমরা তাহা বুঝি না। কোন মানুষের বিরুদ্ধে স্বতঃসিদ্ধতার অভিযোগ তখনই উপস্থিত করা যায়, যখন সে একই সময়ে একই অবস্থায় দুই ব্রহ্মের বা নানা ব্রহ্মের কথা বলে। আমরা তখন বলি এ লোকটা self-contradictory—এর মতের স্থিরতা নাই। কিন্তু অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গিয়া তারপরে যদি মানুষের মনের বদল হয়, (যেটা হওয়াই স্বাভাবিক), তবে তখন তাহাকে self-contradictory বলিবার কোন মানেই পাওয়া যায় না। যাই হোক, চিন্তারজন্য রবীন্দ্রনাথের যে সকল আইডিয়াল প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যে এখনও সে সকল আইডিয়াল ধরিয়াই বসিয়া আছেন, এমন কোন আভাস আমরা কোথাও দিই নাই। শুধু বলিয়াছি যে ‘Cult of Nationalism’ অর্থাৎ বৈদেশিক nationalism সত্ত্বে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটা কিছু নূতন মত নয়; “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা” শীর্ষক প্রবন্ধে এবং অন্যান্য প্রবন্ধে সেই একই কথা তিনি বহুপূর্বেই বলিয়াছিলেন। জীবনের বিকাশ ঘটে বলিয়া মানুষের সমস্ত ভাব ও আদর্শেরই যে বদল হইয়া যায়, তার কোন প্রমাণ নাই। nationalism সত্ত্বে রবিবাবুর মতের বদল হয় নাই, একথা বলিলে এটা বোঝায় না যে, তাঁর কোন মতেরই বদল হয় নাই, এইটাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

রবিবাবু এক সময়ে যেকোন যথেষ্ট

idealistic করিয়াছিলেন, তখন তিনি বেশেক realise করেন নাই। তিনি তখন তাঁর একটা মনগড়া ভাবুকতার আবহাওয়ার মধ্যে গোটী বেশটাকে স্থাপিত করিয়া বেধিভেন, তাঁর সেই কল্পনা-প্রবীণ বেশের রূপটাই তাঁর কাছে বেশের বস্তু স্বরূপ ছিল। কখনো কখনো বাস্তব সেই কল্পনার প্রতি-বাদী হইলে বরং কল্পনার উত্তাপে বাস্তবতা বাষ্প হইয়া উবিয়া যাইত, তবু কল্পনার কল্পলোক অটুট থাকিত। রবিবাবুর এই অবস্থার পরিচয় তাঁর নানা প্রবন্ধে ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেই, অ-বিক্ষিপ্ত ভাবে সংহত ভাবে যদি এ পরিচয় কোথাও পাইতে হয়, তবে তাঁর ‘গোরা’ চরিত্রের গোড়ার দিকটার তাহা পাওয়া যাইবে।

অভিভাষণে, চিন্তাবাবু রবিবাবুর সেই “মোহনমুখ” দেশপ্ৰীতির অবস্থার বিস্তর উক্তির পুনরুক্তি করিয়াছেন। তিনি সান্নিধ্যাছেন ঠিক, কিন্তু সে সুর কোথায়? সে ঘোর কোথায়, সে আশ্রম কোথায়, সে দিবা দৃষ্টি কোথায়, বার শুধু তখন তাবীকে কবি পদেপদেই আবির্ভূত করিয়াছিলেন। রবিবাবু বখন “আত্মশক্তি”র মন্ত্র ঘোষণা করেন, তখন অনেকেই হাসিয়াছিল, অথচ অনতিকালের মধ্যেই বখন স্বদেশীর সময়ে সেই আত্মশক্তির মন্ত্র আমরা গ্রহণ করিলাম, তখন রবিবাবুই যে সেই মন্ত্রের প্রথম প্রতীক এবং প্রথম উপদ্রষ্টা তাহা কি দেশের সকল লোক স্মরণ করিয়াছিল? দেশের শিকার তার দেশের “সভাবসঙ্গত” করিয়া দেশের লোকেই গ্রহণ করিবে, একথা বখন রবিবাবু প্রচার করিয়াছিলেন এবং বোলপুরে আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করিয়া এ সবকিছু একটা পরীক্ষাও গ্রহণ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন দেশের লোকের মন ত এ প্রস্তাবের অঙ্গুল ছিলনা। ‘জাতীয় শিক্ষাপরিষদ’ বখন সভা-সভাই গঠিত হইল, তখন তার আদর্শ যে বহুপূর্বে রবিবাবুর দ্বারা দেশে রচিত হইয়া-ছিল, সে কথা কত অল্প লোকেই মনে করিতে পারিয়াছে। এই ভবিষ্যৎদৃষ্টি রবি-বাবুর মধ্যে একটা বিশেষর বলিয়াই তাঁর মোহনমুখ দেশপ্ৰীতির অবস্থার, তিনি যে-সকল বাণী বলিয়াছেন, তার সকল অঙ্গশক্তি, সকল কামনিকতা ও আবাসবতা, সকল ভ্রমপ্রমাণ সবও তার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা জীবনপ্রদ। • ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠনের ক্ষমতা তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

চিন্তাবাবু বাংলার সেই ‘জাতীয়তা’ সবকিছু, বাঙালী জাতির ‘জাতিত্বের দাবী’ সবকিছু যে ভাবে এবং যেদিক হইতে আলো-চনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও প্রথম অঙ্গুলতির সাক্ষ্য পাই। বাঙালীর জাতীয়তা যে বাঙালীর ইতি-হাসদেরই কল—এ বোধটা বোধহয় বন্ধনের পরে রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বড় করিয়া এবং পরিষ্কার করিয়া বাঙালীর মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেন। সুতরাং চিন্তাবাবুর সমস্ত অভিভাষণের মধ্যে গোড়ার এই অংশটুকু চমৎকার ও উপভোগ্য হইয়াছে। তার পরে বাংলার ভূত্বকালের অবস্থার কথা এবং এখনকার কালের ক্ষমতা নানা কালের কথা যেখানেই তিনি পাড়িয়াছেন, সেইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক বোধের অভাব এবং বাস্তব

জ্ঞানের অভাব প্রতিপন্নই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে 'বাংলার কথা'টি পড়িয়াছেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেটা একটা মস্ত abstraction—সেটা কলিকাতাবাসী ভাবুকের বাংলা। আসল বাংলার অবস্থা তিনি বিশেষ কিছু জানেন অথবা আসল বাংলার ব্যবহারও তিনি বিশেষ কিছু খবর রাখেন তাহা তাঁর লেখা পড়িয়া আদর্শেই মনে হয় না।

চিত্তবাবুর ধারণা যে, সেকালে আমাদের সবই ছিল—‘মুক্ত আকাশ’, ‘শ্রামল-পল্লীবোধি’, মাঠভরা ধান, পুকুরের জল যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা সেগুলো এখনও আছে। কিন্তু মাহুষের ‘পরম্পরের প্রতি প্রীতি’ ছিল, শাস্তি, আনন্দ ও স্বশৃঙ্খলা ছিল, মাহুষ বলিয়া মাহুষের স্বাধীনতা ছিল, “মনিরে মন্দিরে সাধনসঙ্গীত” ছিল, আর দ্বারা কথকতা কবির গানে বাংলা সাহিত্যে এক “অতল প্রাণ” ছিল—মুক্ত আকাশ ও শ্রামল পল্লীবোধি প্রভৃতি নৈসর্গিক তথ্যের সঙ্গে এই বাকী ক’টাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ইতিহাসকে পরিহাস করা হইবে। গ্রামের কোন্ডল, দশদলি, গালাগালি; পুরুষাভূত্রে শত্রুতাচরণ, কুৎসারটন, ভবিষ্যারে ভবিষ্যারে লড়াইয়ের স্বচ্ছন্দে প্রজাদের মন্তক কাটন; গুরুপুত্রোহিতদের দুষ্ক্রিয়া, নীচ জাতদের স্পর্শদোষ ও তজ্জনিত নানারকমের মহুষ্যোচিত ব্যবহার; উঁর ও বৈষ্ণব সাধনের বিভিন্ন অবৈধ যৌনসঙ্গমের ব্যবস্থা, কবির লড়াইয়ের অসীলতা এবং পাঁচালীর প্রলাপ—এ গুলো বাংলার গ্রাম্যসভ্যতার যে রিয়ালিষ্টিক

ছবিটা চোখের সামনে এখনো আনে—তার উপর ভাবুকতার ছাত্র পোঁচ দিলেও তার বিগত রঙটা কিছুতেই মরে না। ম্যাগেরিয়া কিছু কম থাক্ বা পুকুরের জল অপেক্ষাকৃত নির্মল থাক্, ধু, নাহ, চাল, ডাল, শাকশব্জী এখনকার তুলনায় অনেক শত্ৰু থাক্, জীবনের মাহাত্ম্য ও মূল্যটা যে এখনকার চেয়ে সেকালের লোকে বেশি বৃদ্ধিত, এ বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। বাংলা গ্রাম ও বাংলা দেশের মাহুষ মোটের উপর সমানই আছে, তবে গ্রামে ভিন্ন পরিবার বেশি নাই বলিয়া তার জগাশয় দূষিত ও তার ঐ-বাবা নষ্ট হইতেছে এটা সত্য কথা বটে।

চিত্তবাবু মনে করেন যে আমাদের এই সমস্ত দুর্গতির একমাত্র কারণ আমরা নিজের আদর্শকে তুলিয়া পরের আদর্শকে ঘরে তুলিয়া লইরাছি। বিলাতী Industrialismই বর্তমান দুর্গতি বর্তমান অনর্থের মূল।

অবশ্য চিত্তবাবু এটা মানেন যে “ওধু কৃষিকার্যে আমাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব”, ব্যবসাবাণিজ্য চাই। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য স্বত্বকে তাঁর ধারণা এই যে, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার মত তারও নাকি একটা “বিশিষ্ট” বাঙালী পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিটা সংক্ষেপে হইতেছে, আমাদের “কুটীর-শিল্পের” পদ্ধতি। আমাদের হাতের তাঁত ছিল, তাতে মিহি কাপড় তৈরি হইত এবং অস্ত্রান্ত অনেক হস্তশিল্পের কাজ এদেশে ছিল। কিন্তু আজ সেই সকল কুটীরশিল্প পদ্ধতির কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতার আঁটিয়া উঠিতে পারিবেনা,

তাহা 'বে' চিন্তাব্যবস্থা 'নিশ্চিত' জানেন তাহা কবুল করিয়াছেন। তবু তাঁর পণ এই যে, সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করা যাইতে পারে। কি উপায়ে? স্বদেশের সময়ে আমরা 'বে' উপায়কে প্রণয়ন মনে করিয়াছিলাম, সেই উপায়ে,—অর্থাৎ বয়স্কদের দ্বারা Industrialism বর্জন করা যাইতে পারে। চিন্তাব্যবস্থা বিদেশী পণ্য বয়স্কট করিতে বলেন নাই; তিনি তাঁর চেয়েও বড় "অর্ডার" দিয়াছেন, একেবারেই "বিলম্ব বর্জন" করিতে হইবে, বলিয়াছেন। "মোটো কাপড়" আমাদের "কটিতে বাধা" দিলেও "তাহা সহ্য করিতে হইবে," Industrialism সমস্যার এই তাঁর সহজ সমাধান। অতএব প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আর রহিল কোথায়? দেশের লোক মানব-প্রকৃতিটাকে এমি রাস্তার মতো বদলাইয়া কেলিবে, হঠাৎ বিলাস-বাসনা দূর করিয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এতটা আশা কোন দেশের মানব-গুরুত্বও করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। বাক্য, এই গেল একটা তাঁর বড়গোচর practical programme, অথবা ১নং নৈতিক উপদেশ। আমাদের বিবেচনায় "বাসনার কথা" নামটার বদলে "নীতিকথা" নাম দিলে তাঁর পুস্তিকাখানি সার্থকনামা হইত। কারণ নীতিকথার চোটেই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া তাঁর বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধ হয় বলা দরকার। চিন্তাব্যবস্থার বিবর্তনের অনেক আইডিয়া প্রতিলিপি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রায়কটিকাল প্রোগ্রাম ও নীতি-

উপদেশগুলি প্রায় তাঁর নিজস্ব। অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তির সময়ে শুধু বিবর্তন কেন, সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে কৃষ্ণরশ্মির উদ্ভাবের দ্বারা ও বিদেশী পণ্য বয়স্কদের দ্বারা আমাদের ব্যবসার উন্নতি হইবে। কিন্তু এখনও এত পরীক্ষা ও অকৃতকার্যতার পরেও সে বিশ্বাস এক। চিন্তাব্যবস্থার ছাড়া আর বোধ হয় কাহারও নাই। তাঁর পর, লোকশিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব তাহা একটু পরেই দেখা যাইবে।

বস্তুত চিন্তাব্যবস্থার সব "কালের কথা"-গুলিই এরিডর, অর্থাৎ অকালের কথা। তিনি একস্থানে চাবার দ্বারা নানা শিল্পপণ্য প্রস্তুত করাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় জানেন না যে, সব ক্রমিক নিজের হাতে লাভল ধরিতেও চায় না, মজুরের দ্বারা সে কাজ করায়। তাঁরপর চাবী চাবের কাজ ছাড়া আর অন্য কোন শিল্পকর্ম করিবেই না, কেননা কাজ-অনুসারে আমাদের দেশে জাত তৈরি হয় এবং নিজের নিজের জাত-ব্যবসার বলয় রাখাই জাত রক্ষার প্রথম উপায়।

লোকশিক্ষা সম্বন্ধে বাক্য কথকতা, কবি-গান, ভাগবত-পাঠ, চণ্ডীপাঠাদি শিক্ষা-বিভাগের যে সকল সাংকেয় ব্যবস্থা ছিল সেইগুলিই চিন্তাব্যবস্থার বৈধ বলিয়া মনে করতাম। কারণ, তাঁর আর একটি অপূর্ণ বিশ্বাস এই যে মহাশয় আমাদের চাবাদি কোন শ্রমকেই আমাদের চেয়ে "কম" নয়। ইংরাজী শিক্ষাটা তাঁর নতুন দেশে প্রভুত্ব অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, সুতরাং চাবাদের পক্ষে সে শিক্ষার আবশ্য-

কতা নাই। তার পর, তারা ত মানুষ আছেই, শুধু ক খ গ জানেনা বলিয়া “হুই একটা নৈশ বিদ্যালয়” হইলেই “আমাদের চাষাদের যে শিক্ষা আবশ্যিক সেই শিক্ষার সহজেই বিস্তার হইবে”। আর বাত্মা, কথকতা, পাঁচালী, কবির গানের শিক্ষাপ্রণালী ত পড়িয়াই রহিয়াছে। অথচ গ্রামেগ্রামে ধিরেটোর-পাটির প্রভাবে বাত্মা-কথকতা প্রভৃতি যে আর উঠিয়া গেছে সে খবরটা চিন্তাবাবু বোধ হয় ভাল করিয়া রাখেন না। এবং নৈশ বিদ্যালয়ের দ্বারা শিক্ষাবিস্তার যে কেমনতর হয়, তারও কোন অভিজ্ঞতা বোধ হয় তাঁর নাই। এ সব শিক্ষার ব্যবস্থা ছুটা ফলসীতে মলচালার মত, কারণ শিক্ষালাভের কিছুমাত্র আগ্রহ চাষীদের মধ্যে নাই। compulsory free education ভিন্ন চাষাদের শিক্ষা হইতেই পারে না।

বর্গীর পোপুলে মহোদয়ের সেই Compulsory Primary Education-এর প্রস্তাবের পর লোকশিক্ষা সম্বন্ধে এমনতর অল্পত অসঙ্গত কথা সাহস করিয়া প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির আসন হইতে কেহ বলিতে পারেন, এটা আমাদের কাছে অকুতভর টেকে। ইংরাজী শিক্ষার বতই কুফল থাকুক, তাহা যে বাঙালীর নব জাতীয়তাকে উদ্বোধিত করিয়াছে, বাঙালীকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় সাধন করাইয়াছে এবং তাহার মনের কোলিক, দৈনিক ছোট বড় নানা ক্ষুদ্র সংস্কারের জাল ছেদন করিয়া বিশ্বমনের সঙ্গে তাবের স্বাধীন জ্ঞানান প্রদানে তাহাকে রত রাখিয়াছে, এ সব কথা ব্যবশিকতার মোহে পড়িয়া কুস্বীকার

করা যাইতে পারে তাহা ত জানিতাম না। চিন্তাবাবু যে বাংলার কথা লিখিয়াছেন, একশো বছর পূর্বে বাংলার ‘মুক্ত আকাশের’ তলায় বসিয়া পল্লীবাসী কোন সেক্ষেপে বাঙালী কি এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন, না এ সব কথা ভাবিতে পারিতেন? অতএব সেই ইংরাজী শিক্ষার বোল আনা ফলটুকু আমরা চিরকাল ভোগ করিতে থাকিব,—কেমনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তুলিয়া দিতে হইবে এ কথা চিন্তাবাবু বলেন নাই, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির গান পাঁচালী ইত্যাদি পড়ানো হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যে সে কল হইতে চাষারা যেমন বঞ্চিত আছে তেমনই বঞ্চিত থাকিবে। অতএব তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ও জ্ঞানবৃত্তির কোন বিকাশ না ঘটুক, তাদের যুগ সংস্কার কোনদিন না ঘুচুক, কালের সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে তারা সকল রকমেই অক্ষম হোক এবং তাদের সেই অক্ষমতা ও অজ্ঞতার প্রকাণ্ড বিপুল টানে তারা সমস্ত জাতিটাকে শুধু ক্রমাগত নীচের দিকে টানিতে থাকুক। এতিন্দ্ৰজাল কন্ফারেন্সের সঙ্গে বেশের এই অশির্কিত সাধারণের স্রোগ নাই, ইহা লইয়া সভাপতি বিলাপ করিতে বাকী রাখিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,—“আমাদের কোন কমিটিতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভাপ্রতীভূত?” দ্বারা সামান্য একটা ওকালতনামা পড়াইবার জন্ত এর তার খোসামোহ করিয়া মরে, নিরক্ষরতার জন্ত হুনিয়ার কিছুই দ্বারা বোঝেনা, তারা এতিন্দ্ৰজাল-কন্ফারেন্স-কমিটির সভাপ্রতীভূত নয় বলিয়া এদিকে সভাপতি অশ্রুপাত

করিতেছেন, অথচ ওদিকে তাদের ইংরাজী শিক্ষার স্বরকার নাই এবং মোটের উপর কোন শিক্ষারই স্বরকার নাই এটাও তিনি প্রমাণ করিবার জন্য বাস্তব। আশ্চর্য্য!

উচ্চশিক্ষিত আমাদের সঙ্গে আর প্রাথমিক চাষাবাদের এই অসামঞ্জস্য যে তাদের শিক্ষার অভাবের দরুণ, এ কথাটা চিন্তাবাবু একবার ভাবিয়া দেখিলেন না ইহাই আশ্চর্য্য! হু একটা নৈশ বিভ্রান্তির স্বপ্নাই এই প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যটা দূর হইয়া যাইবে? কোন দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন অসম্ভব অলৌকিক কাণ্ড ঘটয়াছে কি?

এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য চিন্তাবাবুর দ্বিতীয় নম্বরের নৈতিক উপদেশ এই যে “উচ্চশিক্ষার অভিমান,” “অর্থের অভিমান” “বর্ণের অভিমান,” এ সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। এ জায়গায় বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা তাঁর এই অপূর্ণ নীতি-উপদেশ সবেও আর একটি চমৎকার উপভোগ্য প্রদান হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণ বধন নাই এবং “ব্রাহ্মণ বৈশ্য কার্যের মধ্যে কার্যগত কোন পার্থক্য” বধন তিনি দেখিতে পান না, তখন বর্ণাশ্রম-ধর্মের অস্তিত্বের তাৎপর্য্যটা বুঝা যায় না। কিন্তু এই কথা বলিয়াই তিনি “সামাজিক শ্রেণী তুলিতে চান না” বলিয়া দিয়া পাশ কাটিয়া গেলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম অর্থাৎ জাতিভেদ ভাঙিতেই হইবে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াও সেই সঙ্গে সন্দেহ “তাহা ভাল কি মন্দ” “তার কোন কথায় এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না,” বলিয়া তিনি নিজের বুকের কথাটাকেই নিজে চাপা

দিয়াছেন। তাঁর ধারণায় আমাদের চাষাভাষা তো আমাদের চেয়ে মনুষ্যত্বে বেশি অগ্রসর,— কিন্তু বর্ণের সংস্কারটা তাদের মধ্যে যত প্রবল, আচার বিচারের সংলগ্ন বাধার ততাই যতটা বাহ্যিক, এতটা বোধ হয় আমরা নাই। কেননা, শিক্ষার জন্য আমাদের মনের অনেকটা প্রসার হইয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর লোকের তাহা মোটেই হয় নাই। বাক্য কথকতা, কবির গান, পাঁচালী, হরিসংকীর্তন সবেও বর্ণাশ্রম ধর্মের এই অন্ধ সংস্কার, ব্রাহ্মণের এই অর্থহীন আধিপত্য, এদেশ হইতে একটুও শিথিল হইল না কেন, চিন্তাবাবু চিন্তা করিয়া দেখিলে পারেন।

বাহাই হোক, “মনকে চোখ ঠার” না দিয়া, “ভাবের ঘরে চুরি” না করিয়া এবং ধর্ম-উপদেশটা চিন্তাবাবুর নীতি-উপদেশগুলি সুবোধ বালকের মত সম্পূর্ণ পালন করিয়াও আমরা তাঁর বাংলার কথাই মধ্যে বাংলার কথাই সবচেয়ে অল্প পাইয়াছি। আসল বাংলার কথা,—বাংলার আসল ইতিহাস, সমাজ ধর্ম সাহিত্য, অহুষ্ঠান-উৎসব, কৃষিবানিজ্য, বাংলার ভাব ও অভাবের কথা বাঙালীর জন্য এখনও কেহ তৈরি করেন নাই এ কথাটা লজ্জার সহিত আমাদেরকে স্মরণে রাখিতে হইবে।

নবীন সাহিত্য সম্বন্ধে অভিযোগ

“ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলনে”র বৈশাখ সংখ্যায় “সাহিত্যে নবীন পন্থা” নামক প্রবন্ধের লেখক জীদুক উদ্দেশ্যচক্র গুপ্ত আক্ষেপ করিয়াছেন যে নবীনপন্থী সাহিত্য-কেন্দ্র নারক-নারিকার প্রেম লইয়া বড় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন, তাঁরা ভুলিয়া

হান যে “রমণী কেবল নারিকা নয়, গার্হস্থ্য জীবনের সন্ধিনী”, এবং “নারীত্বের পরি-সমাপ্তি পত্নীত্বে নয় মাতৃত্বে”।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লেখকদের একটা মহৎ দোষ দেখিতে পাই এই যে, সব সময় তাঁদের চিন্তা একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না, সুতরাং কোন চিন্তারই একটা সুবিস্তৃত ক্রম পাওয়া যায় না। পাঠকদের কাছে তাঁরা তাঁদের যে সব ভাবনা নিবেদন করেন, তাহা পড়িয়া অনেক সময়ে তাঁদের সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হয়। “সম্মিলনের” লেখকের বিষয় হইতেছে, সাহিত্যের নবীন পন্থা—আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, নবীন সাহিত্যে আদ্রিসের প্রাধান্যটা কেন? সুতরাং পুরুষ ও নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার, নারীর শরীর ও মনের গঠন, সেই গঠন অনুসারে সমাজে তাহার কিরূপ স্থান হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ স্থান হওয়া উচিত, ইত্যাদি প্রাপুরুষের সম্বন্ধ-ব্যটিত সামাজিক প্রশ্ন তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়। অবশ্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে সমাজের কোন প্রশ্ন আসিয়া পড়িলেই যে রসভঙ্গ হয়, এমন কথা বলি না; কিন্তু সাহিত্যের সীমার মধ্যে সাহিত্যের আলোচনা যদি বদ্ধ না থাকে, সাহিত্যের আলোচনা যদি সামাজিক আলোচনা হইয়া পড়িয়া, তবে তখন লেখককে এই কথাটুকু স্মরণ করানো দরকার হয় যে, সমাজে জীৱাতির স্থান কোথায়, সমাজতত্ত্বের “দিক্ হইতে সেটা ভবিষ্যতে আলোচনা করিলেই চলিবে, উপস্থিত সাহিত্যের নবীন পন্থা সম্বন্ধে • যে সকল ব্যক্তি এই বড় বিষয়টির

সাহিত্যের দিক্ হইতে তাঁর কি বলিবার আছে, তাহাই শোনা যাক্।

সমাজে রমণীর sphere বা কণ্ঠক্ষেত্র কতখানি সেটা ভিন্ন আলোচনা, রমণীর পত্নীত্বটা বড় না মাতৃত্বটা বড় তাও একটা সামাজিক প্রশ্নের বিষয়। তবু লেখক যখন সে সম্বন্ধেই মাথা ঘামাইয়া-ছেন তখন এইমাত্র বলা দরকার যে, সে সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা পূর্বে পূর্বে হইয়া গেছে এবং এখনও বহুটো আলোচনা হইতেছে। মিল, হক্সলি, হার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ; যারা sex-psychology লিখিয়াছেন এমন দার্শনিক ও ইংরেজ বিত্তর লেখক; Sex-Evolution সম্বন্ধে বায়লজির দিক্ হইতে ডারউইন, ওয়াইসম্যান, ক্রপটকিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক; জীৱাতির অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে যারা খবরদারি করিতেছেন তাঁরা; জীৱিকা বাপারে ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী লইয়া যারা পরীক্ষা করিতেছেন—এঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে এই বড় প্রশ্নটির সম-ত্তরের চেষ্টা করিতেছেন। মানিক পত্রের একটা ছোট প্রবন্ধের মধ্যে এতদিনব্যাপী ও এত বিচিত্র আলোচনার ফলগুলিকে ব্যক্ত করিতে যাওয়া নিশ্চল চেষ্টা হইবে। অতএব সরাসরি এ সব আলোচনার নাম-গন্ধ না করিয়া রমণীর মাতৃত্বই শ্রেষ্ঠ এবং মাতৃত্বই তাহার পূর্ণ অধিকার এমন সিদ্ধান্ত অল্প পাঠকদের মাথার উপর বিজ্ঞভাবে বর্ণন করিয়া পাঠকদের প্রতি অহুগ্রহ বা নিগ্রহ হই রকমেরই বর্ণন হইতে পারে।

আলোচনার প্রথমে প্রবৃত্ত হন, যেমন ওগর কত বা লরা হান্সন (ক্রীমনস্তব সম্বন্ধে প্রথম ক্রীমনস্তববিদ) বা রকো, অথবা শ্পেন্সার, ডয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতি—এঁদের কারো নামোল্লেখ পর্যন্ত লেখক করিলেন না এবং এ বিষয়ে আধুনিক বাংলা লেখক তাঁদেরও নামোল্লেখ করিলেন না—কেবল Treitschke বলিয়াছেন যে ক্রীমিনালিস্টরা যাবতিন অধিকারের আইডিয়া “অশুভকর,” তাঁকেই এ সম্বন্ধে লেখক একমাত্র “অথরিটি” খাড়া করিয়া বসিলেন। এ হেন অসম্পূর্ণ আলোচনার কোন মূল্য দাঁড়ায় কি?

ঐশ্বর্যবস্তুর সম্বন্ধ বিচার বিষয়ে এই সব আলোচনার খাড়া যে সাহিত্যে আসিয়া পৌঁছিতেছে না তাহা বলিমা। আধুনিক সাহিত্যে sex-problem অর্থাৎ ঐশ্বর্যবস্তুর সম্বন্ধবটিক সমস্তা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে এ সকল সমস্তা যে-ভাবে দেখা দেয়, সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহাদের যে রকমের সমাধান হয়, তাহার দ্বারাই যে সমাজ চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কথা মনে করিবার কোনই হেতু নাই। ইংলেন্ডের Ghosts অথবা The Pillars of Society, ফ্রান্সের Father অথবা The countess Julie, হাপটুমানের Rose Berndt, বার্মাভ্রমণের The Devil's Disciple, গ্রিহের The Maternity, ইত্যাদি সামাজিক নাট্য পড়িলে ইউরোপীয় সমাজের যে বীভৎস চেহারাটা, আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়, বাস্তবিকই ইউরোপীয় সমাজটা কি তাই? আর বাস্তবিকই কি ইংলেন্ড প্রভৃতি সমাজের এই “

উচ্ছৃঙ্খলতা ও কদর্যা দুর্নীতিগুলিকেই, “সম্মিলনের” লেখকের ভাষায় বলিতে, গেলে “চতুর্দশ শতাব্দীর একমাত্র উপায়” বলিয়া দ্বিধা করিয়াছেন? আমার মনে হয়, সমাজসাহিত্যের ঘাড়ের উপর কোন রকমের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক বা অস্ত কোন উদ্দেশ্যের বোঝা চাপানোটাই ঠিক নয়। প্রথমতঃ, সামাজিক নাট্য সমাজের ফোটোগ্রাফ নয়, কারণ কোন আর্টই সৌন্দর্যের ফোটোগ্রাফ নয়। আর্টের রিয়ালিজম বা বস্তুরতা সমাজের বাস্তবতার সামিল নয়। আধুনিক সমাজের কতগুলো বিশেষ সমস্তা, কতগুলো বিশেষ অবস্থা, মানব-চরিত্রের কতগুলো অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন দিক—বেশব দিক সামাজিক সংস্কারের আবরণে দিয়া আবৃত থাকে ও সচরাচর গোচর হয় না—সেই সব নূতন মানমসলা আধুনিক সাহিত্যিকদের কল্পনাকে নূতন নূতন আর্ট-রূপ সৃষ্টি করিবার দিকে উত্তেজিত করিতেছে এবং তাঁর ফলে এই সামাজিক নাট্যগুলি তৈরি হইতেছে। স্মরণ্য এ সকলও সম্পূর্ণরূপেই কল্পনার সৃষ্টি। তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, সব বিশুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির মতই এ সকল নাট্যও কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বহন করিতেছেন। তা যদি করিত তবে ইংলেন্ড বা হাপটুমান বা ফ্রান্স বা কিম্বা বার্মাভ্রমণ বা শেকস্পিয়ার প্রভৃতিতেই সম্মিলনের লেখকের মত এক একটা সিদ্ধান্ত দ্বিধা করিয়া দিতেন। আর তাই যদি তাঁরা করিতেন, তবে নাটক নভেল না লিখিয়া sex-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিম্বা সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের গবেষণা করাই উচিত হইত। কেননা, উদ্দেশ্যমূলক আর্ট কোন কালেই

আর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদ্দেশ্যমূলক রচনা আর্ট হইলে, ধর্ম ও নীতিউপদেশো এবং ইচ্ছানুষ্ঠানেরো সবাই আর্টই হইতেন সন্দেহ নাই। এবং রসসাহিত্য যে ভাষা হইলে আর ভাষা তুলিতে পারিত না সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। যাক্ সে কথা। ইব্‌সেন্‌ প্রভৃতির নাট্যকে যে বিগুফ আর্ট হিসাবে দেখিতে হইবে তার আরও কারণ এই যে, তাঁরা সবাই সমাজের সমস্তকে একই রকম করিয়া দেখান্ নাই, মানব-চরিত্রের প্রচ্ছন্ন দিকগুলিও একই ভাবে উন্মোচিত করেন নাই। তাঁদের প্রত্যেকের সৃষ্টিই বিচিত্র, কেননা তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই বিশিষ্ট। যেমন ধরুন সমাজের চারিপাশের সংস্কার মাহুদের স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে যে ভাবে চাপিয়া-চূপিয়া রাখে, মাহুদ সেই সব বাধাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে কি অবস্থায় কেমন করিয়া বাধ্য হয়—বোধ হয় এটা ইব্‌সেন্‌ যতটা দেখাইয়াছেন, মাহুদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন মানি-গুলিকে তিনি ততটা ধাঁটাইয়া তোলেন নাই। কিন্তু ট্রান্ডবার্গ, হাপ্টম্যানের মধ্যে সেই মানি, সেই পাকগুলিকে ধাঁটাইয়া তুলিবার চেষ্টা বেশি দেখিতে পাই। আবার ট্রান্ডবার্গের মধ্যে সম্মান-বাৎসল্য যতটা উজ্জ্বল, এমন বোধ হয় আর কারো মধ্যে নয়। তার দৃষ্টান্ত তাঁর The Connecting Link নাট্যটি। লেখান—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পুণ্ডিত চরিত্র, তবু সন্তান উভয়ের মধ্যে বন্ধন হইয়াছে। এমন কিরিয়া দেখা গুাইবে যে তাঁরা সবাই নূতন নূতন দিক হইতে স্বপ্নন করিয়াছেন। তাঁরা কেহই কোন দিকান্ত করেন নাই। তাঁরা কোন উদ্দেশ্য খাড়া করেন

নাই। অবশ্য তাঁদের এই সব সৃষ্টি মাহুদের মনে মনে নব নব চেতনা সঞ্চারিত করিতে করিতে সমাজকেও প্রবল ভাবে আঘাত করিবে সন্দেহ নাই। সাহিত্য মাঝেই তাহা করিয়া থাকে। কিন্তু সমাজকে মুখ্যভাবে চিত্রিত করাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, সমাজ-সমস্তার একটা দ্বির সমাধান খাড়া করাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের রচনা সাহিত্যই—সমাজ-বিজ্ঞানও নয় অথবা সমাজ-নীতিও নয়।

লেখক ডাবিরা আকুল হইয়াছেন কিরূপে এবং কেন আদিরসই আজ পর্যন্ত “সাহিত্যের মাড়ে পনেরো আনা দখল করিয়া বলিয়াছে।” তাঁর মনের ভাব এই যে, মাহুদেহ স্বপ্নকে পৃথিবীর কাব্য উপজালের যতটা ব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল ততটা ব্যস্ত হয় নাই এবং আজও পর্যন্ত হইতেছে না, এটা বড়ই খেদের কথা। কেননা, মাহুদেহ নারিকার প্রেমের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। সমাজের দিক্ হইতে মাহুদেহের মূল্য নাহক-নারিকার স্বাধীন প্রেমের মূল্যের চেয়ে বেশি হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের কাছে মাহুদেহের মূল্য তত বেশি হয় নাই। তার কারণ মাহুদেহের ঘেঁটা রস, তার মধ্যে নব নব উন্মেষ নাই, স্তব্ধতা নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, তার আর এক নান প্রতিভা, সে রস লইয়া ততটা কারবার করিতে সাজি হয় নাই। যে রসে নব নব উন্মেষ, নব নব বিশ্বর, তাহার মধ্যে একটা অনির্কটনীয়তা থাকে—সেইজন্যই তাহা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়। কারণ, সাহিত্যের প্রধান কাজই অনির্কটনীয়কে বচন দেওয়া।

* কিন্তু আদিরস বলিতে আমরা যা বুঝি, সাহিত্যে যুগলপ্রেমের যে বিচিত্র রস এ পর্যন্ত

স্ট হইয়াছে, তাহা সেই 'আদিরসের' কোটাধ পড়ে না। কারণ, যুগল প্রেমের রস বলিতে শুধুই কামপ্রবৃত্তি বা ভোগলালসা বুঝায় না। কোন বড় প্রেমের কবি, কোন বড় ঔপন্যাসিক একান্ততঃ ভোগ-লালসার কবি অথবা চিত্রী নহেন। আধুনিক কালের এমন কোন "বড়" উপন্যাসের নান করিতে পারি না, যেখানে ভোগলালসার চিত্র ভোগলালসাতেই পর্যাবসিত হইয়াছে; তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের গুত্র নির্মলতার উত্তীর্ণ হই নাই। "ঘরে বাইরে"র পরিণামটা ধারণা এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীও অসতী, ঘরে-বাইরের মাদ্রিকা বিহবাও অসতী; কারণ তারা পতি থাকিতেও অস্ত্র পুরুষকে মনে মনে কামনা করিয়াছে। কিন্তু মাদ্রুকের এমন কোন পাপ হইতেই পারে না, যে পাপ হইতে তাহার উদ্ধার নাই। সমাজে আনন্ড পে উদ্ধারের চিত্র সবসময়ে দেখিতে পাইনা। বটে, কেননা সমাজের সংস্কার এবং শাসন এ সম্বন্ধে নিরাক্ষণ। কিন্তু সাহিত্যে দেখিতে পাই। সেখানে Tolstoy-এর Resurrection-এর ব্যাঙ্গনা মালোত্তারও উদ্ধার হয়; সেখানে ডট্টরভুদ্রের Crime and Punishment-এর দেহবিক্রমকারিণী সোনিয়ারও সত্যমুষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই পরিণামটাই সাহিত্যে বিশেষ করিয়া দেখিবার বিষয়, মাঝখানের অভিব্যক্তিটা নয়। এবং বাংলাদেশের এই লেখকটির জায় এই স্রেণীর অন্তর লেখকেরও মনে রাখা উচিত যে ভোগের জীবন পার হইয়া ভোগ-মুক্ত জীবনে উত্তীর্ণ না হইলে,

এই পরিণামের চিত্র কোন সাহিত্য-শ্রষ্টাই আঁকিতে সমর্থ হই না। শেক্সপীয়ার মাঝ-বয়সে তাঁর ট্রাজেডিগুলি লিখিয়াছিলেন; শেষ বয়সে লেখেন সেই ট্রাজি-কমেডিগুলি যাহাতে মাঝখানের জাঁকালো অভিব্যক্তির চেয়ে পরিণামের আভাসই বেশি, কুরুক্ষেত্র পর্বের পরেই শান্তিপর্ব্বের সমাপ্তির কথা আদিয়াছে। গায়টে বেশি বয়সেই কাউন্টের দ্বিতীয় অংশ শেষ করিয়াছিলেন, "Elective Affinities" নামক sex-problem সম্বন্ধীয় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। টলস্টয় তাঁর উজ্জ্বল যৌবন-বয়সে নয়—প্রবীণ বয়সেই অ্যানাক্যারেনি ও রিপারেক্শন্ লিখিয়া-ছিলেন। সুতরাং "রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অর্কে 'ঘরে বাইরে' লিখিতে পারিয়াছেন; আশ্রয় বধন তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার গুণিত প্রতিপাদনের এবং তাঁহার কাব্যের সহিত মন্ত্র-সাক্ষণের সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—সেই সময়েও রবীন্দ্রের লেখনী একটা অনেকেরই মতে নিম্নিত প্রেমলীলা প্রসব করিতে পারিয়াছে"—ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণই নাই। যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ "বৌঠাকুরাণীর হাট" লিখিয়াছিলেন সে বয়সে "চোখের বাগি" বা "ঘরে বাইরে" লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। নভেল পরিণত বয়সেই পাকা হয়। পরিণত বয়স হইলেই সাহিত্য-শ্রষ্টা "মোহমুগ্ধ" বা "বৈরাগ্যগতক" লিখিতে থাকিবেন, ইহা যাত্রা সত্যসত্যই মনে ভাবেন, তাঁরা আর বাই কল্পন সাহিত্য-সমালোচনা না করিলেই ভাল হয়।

ঐযুক্তিকুমার ক্রমবর্তী।



ভারতী

৪১শ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

[৪র্থ সংখ্যা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমালোচক

চৈত্র এবং বৈশাখ সংখ্যার “নারায়ণে” “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” শীর্ষক এক ক্রমশঃপ্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক বেন স্বাধীনভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিত ও তৎকালীন ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পাঠক-দিগকে একরূপ বৃত্তিতে দিয়াছেন। অথচ ঐহিক অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত সুবিস্তৃত গ্রন্থ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিতই যে “নারায়ণে”র লেখকের একমাত্র অবলম্বন ইহা বলিলে বোধ হয় অতুল্য হইবে না এবং উক্ত জীবন-চরিত-পাঠক মাত্রেই নিকট ইহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু লেখক নানাভাবেই অজিতবাবুর সেই জীবনচরিতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথচ অজিতবাবুর বা তাঁহার লিখিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই— “প্রতিবাদকারী” বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধহয় যে অজিতবাবু তাঁহার পূর্বে লিখিত স্বাধীন গবেষণার প্রতিবাদ করিয়াছেন পরে, নহিলে তাঁহাকে “প্রতিবাদকারী” নাম দিবার সার্থকতা কি?

কে প্রতিবাদকারী, কাহার রচনার প্রতিবাদ করা হইতেছে, ইহা পাঠকবর্গকে জানিতে দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। কারণ, অধিকাংশ পাঠকই হয়ত অজিতবাবুর গ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন, কেহ কেহ গ্রন্থের নামমাত্র জ্ঞাত আছেন, কাহারও কাহারও তাহাও না জানিবার সম্ভাবনা। এতদূর ভাবে প্রতিবাদের কারণ কি? পাছে অজিতবাবুর গ্রন্থের সহিত লেখকের প্রতিবাদ কেহ মিলাইয়া পাঠ করেন এবং তাহা হইলে লেখক যে ঐ গ্রন্থ হইতে তথ্য ও তারিখ প্রকৃতি ধাত্য উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ধরা পড়ে, এইজন্য কি লেখক গুরুত্বের নাম করিতে বিরত হইয়াছেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুণ্যলোক ব্যক্তি—স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্ম্যগণ জীবনান্ত কাল পর্যন্ত তাঁহাকে একজন অসাধারণ ঈশ্বর-নিষ্ঠ সাধক বলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ কি ব্রাহ্মসমাজ, সকল

সমাজের ব্যক্তিত্বই তাঁহার মহৎ চরিত্র, সভ্যানিষ্ঠা, পরোপকার, স্বদেশ-হিতৈষ্য ও ধর্মজীবনের প্রতি প্রকার্য্য প্রদান করিয়াছেন। একুশ বৎসরব্যাপী অসহ্য আছেন যিনি ভবী “আত্মজীবনী” পাঠ করিয়া মুগ্ধ ও উপকৃত হন নাই। সেই মহাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া যে সকল অভ্যন্তর ও অসংবেত ভাষা ‘নারায়ণ’ের লেখক প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিলাম, তাহাতে আমরা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি এবং লেখকের বিকৃত কচির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যবোধিত হইয়াছি। একুশ রচনা যে ‘নারায়ণ’ের ত্রায়ী প্রসিদ্ধ মানিক পত্রে স্থান পাইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি এক স্থানে লিখিতেছেন— “তাঁহার শাস্ত্রের দোহাই ও যুক্তির বড়ইয়ের উত্তরে” ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথকে একস্থানে বলিয়াছেন— “অন্ত অনধিকারী”— আর একস্থানে লিখিতেছেন, “তিনি সমস্ত সংস্কার হ্রগ করিয়া এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ‘অসাম-তনের’ মত পড়িয়া থাকেন।” অথচ যে সকল কারণে এই সকল অভিযোগ, সে সকল কারণ সম্পূর্ণরূপেই লেখকের অগ্রহান-প্রসূত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিবেচ্যতা-প্রসূত।

বৈশাখের “নারায়ণ” লেখক স্মৃতিপুঞ্জার স্বপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, রামমোহন রায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি “অবিচার” করিয়াছেন, বৈষ্ণব “তত্ত্ব বিচারের সম্পর্কেও তিনি পাণ্ডিত্যের অভাবই দেখাইয়াছেন” এবং তিনি “বৈষ্ণব সাধনার অনধিকারী ছিলেন”।

এগুলি উক্তিমাাত্র, ইহাদের সমর্থনে লেখক কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। স্মৃত্যু রামমোহন রায়ের “পাণ্ডিত্যের অভাব” দেখাইবার মত সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লেখকের নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এত বড় স্পষ্টতার উক্তি করিতে আধুনিক কালের অনেক বৈদ্যবেদান্তি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও ইতস্ততঃ করিতেন সম্ভব নাই। তারপর কোন্ ধর্মসাধনার রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ অধিকারী বা অনধিকারী ছিলেন তাহাও নির্দেশ করিতে ইনিই স্বেচ্ছায়াতন ব্যক্তি, কারণ রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও অধ্যাত্ম সাধনার কোন ব্যক্তি অধিক অগ্রসর না হইলে একুশ মত প্রকাশ করিতে কখনই সমর্থ হন না। এই সকল ঝগড়গত অথচ জ্যাঠানিপুর্ণ রচনা প্রকাশ করিতে যে লেখকের লজ্জাবোধ হইবার কিছুমাত্র কারণই নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঐহাঙ্গী ছাপেন বা ঐহাঙ্গী পড়েন তাঁহাদের সঙ্গতি-অসঙ্গতি-বোধ নিশ্চয়ই থাকার কথা। তাহাঙ্গী কি না পাঠ করিয়াই প্রবন্ধ ছাপেন?

স্মৃতিপুঞ্জার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু আলোচনা এ দেশে হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। স্মৃত্যু রামমোহন রায়ের স্বপক্ষে বলিবার অনেক কথাই থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল সাধক স্মৃতিপুঞ্জাকে যানেন নাই তাহাদিগকে সে অন্ত অশ্রদ্ধাপূর্ণ বা বাস্তবপূর্ণ বিশেষণে বিশিষ্ট করিবার তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ভারতবর্ষে স্মৃতিপুঞ্জার বিপক্ষে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কিংবা তাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-

সম্প্রদায়ের পূর্বে বহুবহু সাধক-সম্প্রদায়ের
প্রতিবাদোক্তি আছে। ভারতবর্ষ তাঁহা-
মিগকে অস্বীকার করেন নাই। নানকপন্থী
কবীরপন্থী দাদুপন্থী প্রভৃতি ‘লম্বা’গুলি
এদেশে তাহা হইলে স্থান পাইতেই পারিত
না। কবীর বলিয়াছেন—

“প্রতিমা সকল তো ভড়টৈ

বোলে নহি, বোলায় দেখা।

পূরণ কোরাণ সব বাত হৈ

হা ঘটকা পরমা খোল দেখা।”

অর্থাৎ প্রতিমাগুলি সব ভড় পদার্থ, কোন
কথা বলে না—আমি ডাকিয়া দেখিরাছি।
এবং পূরণ কোরাণ কেবল কথা—পর্দা
তুলিয়া আমি তাহা দেখিরাছি। অথচ
সেই কবীরকে সাধক বলিতে ভারতবর্ষের
কিছু মাত্র দ্বিধা হয় নাই। কেহ তো
নারায়ণের লেখকের মত এ প্রশ্ন করে নাই,
“হিন্দুর ঈশ্বপূজাকে অস্বীকার করিবার কি
অধিকার তাঁর ছিল, তাহা আমরা জানি না”।
তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কি পরিমাণ ছিল, তাহাও
ভ্রম করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা কেহ
অগ্রস্তব করে নাই। ঈশ্বপূজা বা যে কোন
পূজাবিধিকে অস্বীকার বা স্বীকার করিবার
অধিকার অধ্যাত্ম সাধকেরই আছে, নানা শাস্ত্র-
বিন্দু পণ্ডিতের নাই—ইহা ভারতবর্ষের লোক
বিশ্বদয় অবগত আছে। কিন্তু কোন সাধকের
সাধনা সম্বন্ধে বাচালের মত মন্তব্য প্রকাশ
করিবার অধিকারটা কোন্ শ্রেণীর অধিকার?

তৎপরে লেখক Vedantic Doctrines
Vindicated নামক ডক্ট্রের সহিত তত্ত্ববোধিনী
পত্রিকার তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্তবাবু
গ্রন্থ হইতে কিছুমাত্র স্বীকার না করিয়া

সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার পূর্বক গ্রন্থকর্তাকে এই
বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, অন্তর্ভুক্ত-বাবুর
“পরম বড় বালাই”,—সেই কারণে তিনি
Vedantic Doctrines Vindicated
প্রবন্ধমালায় আসল লেখক দেবেন্দ্রনাথকেই
স্থির করিয়াছেন। অন্তর্ভুক্ত বাবু বলেন
যে, বুঠান পাণ্ডীনের সহিত তর্কবিতর্কের
প্রবন্ধগুলি দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর দেব মহাশয়ের
দ্বারা ইংরাজী ভাষায় লিখাইরাছিলেন, কারণ
দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজী লিখিতেন না।
নারায়ণের লেখক বলেন তাহার কোনই
প্রয়োজন দেখা যায় না, কেননা “দেবেন্দ্র-
নাথই রামনারায়ণ বাবুকে দিয়া” লিওনার্ড
সাহেব কর্তৃক লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের
“মাগমসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই
ইতিহাসগ্রন্থ লেখাইবার “অদ্বৈত কারণ”
হইয়াছিলেন।” সুতরাং লিওনার্ড দেবেন্দ্রনাথকে
ঐ গ্রন্থের রচয়িতা বলেন নাই কেন?—
দেবেন্দ্রনাথ লিওনার্ড-লিখিত ইতিহাসের “অদ্বৈত
কারণ” ছিলেন, এক্ষণ সিদ্ধান্ত করিবার হেতুও
লেখক মুদ্রণরূপেই জানাইতে লজ্জাবোধ
করেন নাই। নিঃসন্দেহ শোভনতা, সজোচ
প্রভৃতি ভিনিসকে তিনি নিতান্তই বাহুল্য
বোধ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :—“লিওনার্ড
সাহেবের ‘এই ইতিহাসগ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের
সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ—কুচবিহার
বিবাহ প্রভৃতিতে কেশববিগকে বৈরুপ ভাবে
আক্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে সমর্থন
করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছে তাহা লিওনার্ড
সাহেব সম্ভবতঃ নিম্নের বিবেক বুঝি দ্বারা
মতঃপ্রণোদিত হইয়া করিয়া থাকিলেও এই

আছে,—মানসিক বুদ্ধিমা হুজিমা হরত ইচ্ছা করিয়াই যবেশ্রনাথ সে বিষয়ে নিজের নাম জাহির করিতে চান নাই।” ইহার চেয়ে ইংরাজীতে বাহাকে বলে mean insinuation, আর কি হইতে পারে তাহা জানি না। লিওনার্ড সাহেবের ইতিহাসে তিনি রাজনারায়ণ বাবুর নিকট তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছিলেন ইহা ভূমিকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতামতের অন্ত রাজনারায়ণ বাবু বা অপর কেহই দাবী হইতে পারেন না। ভারপর যবেশ্রনাথের ইচ্ছাতে কিছুমাত্রই হাত ছিলনা এবং লিওনার্ডও তাহা কোথাও বলেন নাই,—সুতরাং তাঁহাকে ‘অসুস্থ কারণ’ বলিয়া দ্বিধা করা লেখকের পক্ষে একেবারে “যুক্তির” চূড়ান্তই হইয়াছে বটে। একজন ধর্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সন্দেহে এক্ষণ নীচতার আরোপ করিতে লেখকের কিছু মাত্র বিধা হইল না। এবং ইত্যাকেও তিনি ইতিহাস বলিয়া সর্বজন-সমক্ষে জাহির করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য!

ভারপর লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার পক্ষে Vedantic Doctrines-এর ব্যাপারে যবেশ্রনাথের নাম জানিবার সম্ভাবনামাত্র ছিল না। কারণ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত যবেশ্রনাথের নিকট হইতে তিনি তাঁহার কার্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই। এমনকি রাজনারায়ণের নিকট হইতেও অনেক জ্ঞাতব্য ঘটনা কথামধ্যমপে জাহির করিতেও পারেন নাই। লিওনার্ডের ইতিহাসে জ্ঞাতব্য কথা অল্পই আছে। তাই মনে হয় যে মহাবির শেষবয়সে তাঁহার ‘আত্মকীৰ্ত্তি’

বাহির না হইলে তাঁহার অনেক কীর্তি সন্দেহেই বন্ধবেশ সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ থাকিত। তাঁহার নিকটতম বন্ধুভ্রাতা তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কথা অবগত ছিলেন না। আত্মকীৰ্ত্তি বাহির না হইলে তিনি যে তথ্য-বোধিনী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার উপায় ছিল না। হিন্দু হিতার্থী বিভাগের সহিত তাঁহার যোগ সন্দেহে কিছুই জানা যাইতনা, তিনিই যে প্রথম যথেষ্টের বন্ধুত্বব্যব আরম্ভ করিয়া ছিলেন বা বন্ধবেশে সুগুণ বৈশিষ্ট্যের উচ্চার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যাইত না। তথাপি আত্মকীৰ্ত্তিতেও তিনি নিজের কৃতকীর্ত্তির কথা অল্পই বলিয়াছেন, নিজের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথাই অধিক বলিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লেখেন সে সময়ে এ সকল কথা জানিবার সম্ভাবনা ছিলনা বলিয়াই যবেশ্রনাথের কীর্ত্তি ও কাল সন্দেহে তাঁহার ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য প্রায় আগাগোড়াই ভুল। লিওনার্ড সাহেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্ঞান মহাবি যবেশ্রনাথের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইলে এক্ষণ ভুল হইত না। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট হইতেও তিনি যে যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছেন তাহা মনে হয় না—কারণ রাজনারায়ণের ‘আত্মচরিতে’ যে সকল তথ্য আছে, তাহা লিওনার্ডের গ্রন্থে নাই। এই সকল কারণে ঐ ইতিহাসকে জ্ঞান আর ইতিহাস বলিয়া কেহই স্বীকার করেনা,—অবশ্য নারায়ণের লেখক ছাড়া! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে

তু-একটা ভুল থাকিলেও উহাই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র ঠাট্টা ইতিহাস। কারণ, ঐ ইতিহাসের বহুতম্বা তিনি মহর্ষি মহাশয়ের অনুধ্যায় প্রবণপূর্বক লিখিয়াছেন, স্মৃত্যং উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য। বধা, মহানির্জাণ কন্ডের তত্ত্ববিধি অনুসারে ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা-বিধি কি ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা তিনি মহর্ষির মুখে না শুনিলে ইহা কেহই জানিতে পারিতেন না। স্মৃত্যং তিনি যখন Vedantic Doctrines Vindicated মহর্ষির রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন, তখন তাহাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হইবে। তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে এই যে, তিনি ঐ ইংরাজী রচনা রাজনারায়ণ বাবুর দ্বারা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছেন। সে ভ্রমের কারণও এই যে, রাজনারায়ণবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিবার পরে হইতে ততদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনিই ইংরাজীতে লেখা বেবেশ্বনাথের সকল রচনা ও চিঠি পত্রই লিখিয়া দিতেন—অতএব Vedantic Doctrines Vindicated রচনাগুলিও শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই তাহার কর্তৃক লিখিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এইরূপ ত্রু-একটা ভুল অজিতবাবু দেখাইয়াছেন বলিয়া, নারায়ণের লেখক, তাহার স্তার ‘দারিদ্র্যবোধহীন লেখক’ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই, এইরূপ অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যুক্তির কি অপূর্ণ বোঁড় এবং “দারিদ্র্যবোধ” সঘর্ষে লেখক আগাগোড়া কি সচ্ছন্দ! সর্বসাধারণের নিকট ভক্তিতাজন ধারাতা, তাহাদের সঘর্ষে এতগুলি প্রমাণহীন উক্তি ও অভিযোগ

করার পশ্চাতে কি গুরুতর দ্বিধা-বোধ রহিয়াছে!

অজিতবাবু যে সকল কারণে বেবেশ্বনাথকেই Vedantic Doctrines Vindicated গ্রন্থে আসল লেখক বলিয়া দ্বির করিয়াছেন, সে সকল কারণের মধ্যে একটিমাত্র কারণ উদ্ধার করিয়া অবশিষ্ট কারণগুলিকে লেখক চাপা দিয়াছেন। অজিত বাবু বাহ্য প্রমাণ এবং আভ্যন্তরিক প্রমাণ (external and internal evidence) উভয়বিধ প্রমাণের উপরেই তাহার অহুমানটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু লেখক যে তাহার সেই প্রমাণগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত না করিয়া এবং চাপা দিয়া তাহার ‘যুক্তির অসারতা’ এবং ‘নীচমনোচিত হীনপ্রধান’ পাঠক-সমাজে উদ্ভাটিত করিতে বাস্ত, ইহা তাহার পক্ষে উদার-অনোচিত উক্তম প্রয়াস হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বাহ্য প্রমাণ অজিতবাবু দিয়াছেন দুইটি—(ক) বেবেশ্বনাথ দ্বিতীয় “এত উপনিষদ বচন উদ্ধার করিয়া ও তাহাদের ভিতরকার তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ভাস্কর ডক্টর মতামত খণ্ডন করা তখন আর দ্বিতীয় কাগজে সাখ্যের ভিতরে ছিলনা” (খ) “বইখানি প্রকাশিত হইলে, ইহার প্রণেতা যে কে তাহার কোন উল্লেখ থাকিলনা”। মহর্ষি বেবেশ্বনাথ ঠাকুর ১৩ পৃষ্ঠা দেখ। আভ্যন্তরিক প্রমাণ তিনি দিয়াছেন এই:— “বেদ যে আগুশান্ত তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রী সঘর্ষে বেবেশ্বনাথের ভিতরকার মনের ভাবটি এই সময়েই বাহির হইয়া পড়িয়াছে

দেখা যায়। বাহিরের প্রমাণ যে প্রমাণ নয়, ভিতরের আত্মপ্রত্যয়াদির প্রমাণই যে আসল প্রমাণ এ কথা এ সময়েই তিনি বলিয়াছেন। রামমোহন রায় এ ভাবের কথা বলিতেন না।—গ:—১৩৩—ঐ গ্রন্থ।

নারায়ণের লেখক উপরের ঐ (ক) প্রমাণের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখর দেব রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত-মুদ্রে তাঁহার সহায় ছিলেন—Brahminical Magazine No III এর যখন কৃত্যের সংকলন বাহির হয়, তখন তিনি তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। অতএব তিনি বেবেত্রনাথের অপেক্ষা উপনিষদের দ্রোক উদ্ধার করিয়া পাত্তোদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তারপর তিনি বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের Brahminical Magazine “অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়া” তত্ত্ববোধিনী ডক্টর জবাব সেম্, স্মৃতগ্রাঃ চন্দ্রশেখরেরই ঐ সকল লেখ্য একমাত্র লেখক হইতে কোন বাধা নাই। অথচ লেখকের এই সমস্ত কথাগুলিরই কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী-লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় কখনো কখনো কলিত, নামে বা তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নামে পুস্তক ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিতেন। Brahminical Magazineই এক ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্মৃতগ্রাঃ রাজা রামমোহনের বেদান্ত-মুদ্রে চন্দ্রশেখর তাঁর ভান পার্শ্ব বা রাম পার্শ্ব কোন “পার্শ্বই” ছিলেন না এবং রাজার মত লোকের কাহারো সাহায্যেরই অপেক্ষা ছিল না। তাঁহার বেদান্ত

মুদ্র বা যে কোন মুদ্রে তিনি একাই একশো! তাঁহার সহায় আবার কে ছিল, কেই বা হইতে পারিত? সে বাহাইহোক, চন্দ্রশেখর দেব সংস্কৃত শাস্ত্রাদি জানিতেন তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ কোথাও নাই। রাজা যখন শাস্ত্রাদি লইয়া বিচার করিতেন তখন হরিহরানন্দ জীর্থ-স্বামী ও তদীয় ভ্রাতা রামচন্দ্র বিভাবাগীশ রাজাকে সাহায্য করিতেন, রাজার জীবনী-লেখকেরা ইহা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার বা তর্কবিতর্কে তাঁহার সহায় ছিলেন একথা নূতন শোনা গেল! চন্দ্রশেখরের ঐ ভূমিকা তাঁহার লিখিত হইতেও পারে না হইতেও পারে—রাজা রামমোহন কর্তৃক লিখিত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। আর যদি বা তাঁহার কর্তৃক লিখিত ও হয়, তবে তাহাতেও কিছু আসে যায়না, কারণ উক্ত বিজ্ঞাপন ছিল মাত্র। তাহাতে Brahminical Magazine এর বাস্তববাবে চন্দ্রশেখরের সাহায্যের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। চন্দ্রশেখর যে সাংখ্য পাতঞ্জল যীমাংসা দর্শন পাঠ করিয়া তাহার সব্বদে আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা অতিশয় গীজ্যপূরী গল্প। অতএব চন্দ্রশেখর দেবের হিন্দুশাস্ত্র সব্বদে জ্ঞানের এই যে অপূর্ণ ভাব, ইহা “মিথ্যার ঘোমটার মুখ ঢাকিয়া সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছে” কিনা জানিতে চাই। চন্দ্রশেখর দেবই যদি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি জানিতেন তবে বেবেত্রনাথ বহু অবেৎগ করিয়া বিভাবাগীশকে ছাত্র বোঝাইয়া বুঝিবার জন্য অল্প কাহারো সাহায্য পান নাই কেন, এবং বিভাবাগীশের নিকট উপনিষদ পাঠ করিয়া পরে উপনিষদ প্রচারে

তৎপর হইলেন কেন ? চন্দ্রশেখরের দ্বারা ই
তো সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত ?

রায়মোহন দ্বারের পরে বেদবেদান্তাদি
শাস্ত্র বিনি এদেশে প্রচার করিবার জন্য
একাকী কত পরিশ্রম ও যত্ন করিলেন, তিনি
ইংরাজীভাষী চন্দ্রশেখর দেবের অপেক্ষা
শাস্ত্রাণোচনার ও শাস্ত্রজ্ঞানে অযোগ্যতর
বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। ইহাও ইতিহাস !
কারণ ইহা যে ইতিহাসিক সমালোচনা !

তারপর অমিতবাবু (খ) প্রমাণ সম্বন্ধে
লেখক নীরব। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে
যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার প্রত্যেক-
টিতেই গ্রন্থকর্তার নাম আছে শুধু Vedan-
tic Doctrines Vindicated গ্রন্থে গ্রন্থ-
কর্তার নাম নাই। অমিতবাবু লিখিয়াছেন
যে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখেন নাই, কিন্তু ঐ
গ্রন্থ এখনও নানা লোকের কাছে আছে
এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত সংস্করণ আমরা
দেখিয়াছি এবং আমাদের কাছেই আছে।
তাহাতে কাহারো নাম নাই অথচ অত্যন্ত
সকল গ্রন্থেই নাম আছে। ইহার কারণ কি ?
ইহার কারণ এই যে, চন্দ্রশেখর দেবের দ্বারা
ইংরাজিতে লিখিত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক
রুপিত বলিয়া কাহারো নামে ঐ গ্রন্থ
বাহির হয় নাই। বেনারস বাহির হইয়াছিল।

তার পর অমিতবাবু যে আভ্যন্তরিক
প্রমাণ (internal evidence) দিয়াছেন,
তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে Vedantic
Doctrines Vindicated রায়মোহনের
Brahminical Magazine কে “অক্ষরে
অক্ষরে তুলিয়া ধরে নাই”।

শাস্ত্র সম্বন্ধে রায়মোহন দ্বারা এ কথা

লিখিতেই পারিতেন না যে “To prove
their authority & truth by any
extraneous evidence is impossible”।
P. 31. V. D. V., শাস্ত্রীয় সত্য তবে
কিভাবে নির্ণীত হইবে ? “আবশ্যপ্রত্যক্ষিত
জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিগত জীবনের” দ্বারা। “All
his (God's) revelations are effected
simply by the enlightenment
of the human understanding”।

P. 32. V. D. V. তারপর Vedantic
Doctrines Vindicated পাঠ করিলে দেখা
যাইবে যে, মহর্ষির যে সকল উপনিষদ শ্লোক
সমীক্ষণের প্রের ছিল, বাহ্য পরবর্তী কালে
তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে সমিষ্ট হইয়াছিল, সেই
শ্লোকগুলিই ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে।
রায়মোহনের Brahminical Magazine এর
তার সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শনামির
বিচার ইহাতে আরো নাই। তবু ইহা নাকি
ঐ Magazine এর “দ্ববহ” নকল দ্বারা !

দেবেন্দ্রনাথ যে খৃষ্টান পাণ্ডিত্যের সহিত
বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার আরও
প্রমাণ অমিতবাবু অন্তর দিয়াছেন এই যে,
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের এই বাদানুবাদের সংস্করণ
কোন গতিকে বোধ হয় ইংলণ্ডে পৌছিয়া-
ছিল এবং তৎক্ষণাত্‌ দ্বারকানাথ ঠাকুর পুরস্কে
ভৎসনা করিয়া এক ইংরাজী পত্র লেখেন :—
“আমি তাবিত্তা অবাক্ হই যে, এখনো
সমস্ত বিশ্ব একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই
কেন ! আমার বিশ্বাস তোমার সমস্ত সন-
খবরের কাগজ লিখিয়া এবং মিশনারীদের
সঙ্গে লড়াই করিয়াই কাটিতেছে ইত্যাদি।”
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দেই ১৮৪৫। ইংরাজীপত্রের আছে

"controversies with the missionaries"—এবং ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই Vedantic Doctrines এর দুই সৰ্ব্বোচ্চ দ্বারকানাথ ইন্দির করিয়াছিলেন।

পরিশেষে নারায়ণের লেখকেরই একটি

উক্তি উদ্ধার করিয়া আমি এই প্রতিবাহ-প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে চাই—"এইরূপ ...হীন প্রয়াসে সাহিত্যের কোন কোন অংশ যে হুর্ণপতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আর সম্বন্ধ কি?"

ঐগভাত্ত নন্দা।

প্রতারণা

(গল্প)

চিত্রকর ডি—বলিল,—জীবনে আমি একটি স্ট্রীলোককে শুধু ভালবাসিয়াছি। পাঁচটি বৎসর আমি কি সুখ যে ভোগ করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। এই যে আজ আমার এমন খ্যাতি, কাজে এতখানি অত্যাগ, ইত্যাদি মূল্যে তাহার সেই ভালবাসা। সে ছিল আমার কল্লনার উৎস। জীবনে প্রথম যেদিন তাহাকে চোখে দেখিলাম আমার মনে হইল, এ বেশ আমার অনেক দিনের চেনা—আমার ধানের ধন, স্বপ্নের ছবি! সে কখনও আমার সঙ্গ তাগ করে নাই—আমারই এই হাতে মাথা রাখিয়া সে চিরবিদায় লইয়াছে! কিন্তু আজ তাহার কথা মনে হইলে ক্রোধে আমার চিত্ত জ্বলিয়া উঠে! সেই পাঁচটি বৎসরের স্মৃতি দারুণ হিংসার আমার মনকে তাড়াইয়া তুলে—সেই হৃদয়ের সুখখানি মনে হইলে দারুণ দুঃখের অন্তর তরিয়া উঠে—আমি তাহাকে পুণা করি।

তাহার নাম ছিল ক্লোডিল্। আমারই এক বন্ধুর গৃহে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়—মাদাম বেলোস্ বলিয়াই সকলে তাহাকে জানিত। তরুণী বিধবা। সে ছিল এক সধ্যগরের স্ত্রী। অনেক বেশ খুঁসিয়াছে সে—

তাহার কথাবার্তা হইতে সেটুকু বেশ বোকা বাইত। চালচলন ছিল বাস পারির—বেশভূষাও খাটি পারির কেতার—ভাবতন্দ্রী দেখিলে পারির সৌখীন-সমাজের নারী বলিয়া চিনিতে কষ্ট হইত না।

যেদিন বৃষ্টিলাগ, আমি তাহাকে অসহ্য ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি সেই দিনই সমস্ত বিধা ভগ্ন ঠেলিয়া একেবারে তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব তুলিলাম। অবশ্য কথাটা অপরের মুখে পাড়িয়াছিল। সে শুধু বলিয়াছিল যে আর দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিবে না। শুনিয়াছিলাম, তাহার চোখের কোণে দুই ফোঁটা জলও দেখা দিয়াছিল। তাহার পর অনেক দিন তাহার সহিত আর দেখা করি নাই। ক্রমে দেশে থাকার দায় হইয়া উঠিল—কাজে মন লাগিত না, বন্ধুবান্ধব গম করিতে আসিলে বিরক্ত ধরিত—অর্থাৎ পুরাবস্তুর হত্য-প্রেমিক হইয়া পাড়াইলাম। শেষে বেড়াইতে বাহির হইবার স্থির করিলাম। বাস্তব জীবন শুছাইয়া লইতেছি—সেই দিন রাত্রিই বাহির হইয়া পড়িব—বেশ মনে পড়ে, তখন বেলা নয়টা বাজিয়াছে, হঠাৎ শুনিলাম মাদাম বেলোস্ আসিয়াছেন।

মাধাম আমার জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথায় বাইতেছি। আমি সঠিক কথাটা বলিলাম। মাধাম বলিল, “কেন বাচ্ছ, জিজ্ঞাসা করতে পারি?” তাহার পর বড় কোমল, বড় করুণ। আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিলাম না। মাধাম কহিল, “বুকেছি, তুমি আমার ভালবাস? তাই, না? আগল কথা, আমিও তোমায় ভালবাসি—কিন্তু আমাদের মিলন অসম্ভব,—তার অস্ত্র আমি চুণিত। কি করব?—নিরুপায়! অর্থাৎ বুকেছেন—(এইখানে মাধামের স্বরটা একটু কাঁপিয়া উঠিল) আমার স্বামী বেঁচে আছেন, আমি বিধবা নই।”

মাধাম তাহার কাহিনী বলিতে লাগিল।

সে বেন অশুভকথার মত! প্রেম আর বিরহের কাতর ধ্বনিবাসে ভরা! বিবাহের তিন বৎসর পরে স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হ্র। মাধামের খুব বড় বংশে জন্ম—পারিতে সে-বংশের অভ্যস্ত সন্তান! কুৎসার ভরে মাধাম স্বামীর বিচার মাথায় তুলিয়া লইয়াছে! সন্দ্বীর রাবি তাহার খুঁড়া। হীনবংশে বিবাহের দক্ষণ শিকড়লের সহিত মাধামের বিচ্ছেদ ঘটয়াছে। মাধামের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে এক রেজারের সহিত। স্বামী ত্যাগ করিলেও মাধামকে আশ্রয়ের জন্ত বড় ভাবিতে হয় নাই—লোণা-পড়া মাধাম ভাল করিয়াই শিখিয়াছে—সেলাইয়ের কাজও চমৎকার জানে। গান-বাঁজনাতেও বেশ দক্ষতা আছে।—বড়বড় ঘরে মেজেষের পড়াইয়া, সেলাই ও গান শিখাইয়া মাধামের উপার্জন অল্প বাড়ার না।

দীর্ঘ হইলেও কাহিনীটি অগাপোড়া ভারী এক করুণ-মুখে ভরা। এত

সংক্ষেপে আমি এইকু সারিয়া লইলাম, কিন্তু মাধাম এত বিস্তারিত করিয়া জীবনের ইতিহাস কাঁদিয়া বসিয়াছিল, যে শুনিতে আমার চাই দিন লাগিয়াছিল। কাহিনীটি আমার প্রাণে বাঁধিয়াছিল;—হইমিন কি, ছই বৎসর পরিয়া মাধামের মুখে এ কাহিনী শুনিলেও আমার ধৈর্য্য টুটিত না। মাধাম আমার ভবঘুরে হইয়া বাহির হইতে নিবেদন করিল; সাধনা দিয়া বলিল, “কাজ কর—মিথ্যা ঘোষের ভুলে তবিসাং মাটি করিয়ে না। জীবনটা হেলাকেলার নষ্ট করিয়ে না।” মাধামের সে সাবনার আমার মন পলিয়া গেল; তাবিলাম, কাজ করিব, মাল্লব হইব। এত দ্রুপে পড়িয়াও মাধাম কাজের দৌরব তোলে নাই। নারী হইয়াও কাজে কর্তে আপনাকে এমন জুঝাইয়া রাখিয়াছে, এত বড় বেদনা অনারাসে চাপা দিয়া রাখিয়াছে! আমি মুগ্ধ হইলাম। মাধাম আশ্বাস দিল, রোজ রাত্রে সে আমার কাছে আসিবে—তাহাকে প্রতিদিনকার কাজের হিসাব দিতে হইবে। হিসাব উচিত-মত না হইলে মাধামের সঙ্গে আমার সেশা হইবে না!

সেইদিন হইতে আমার চোখে জগৎ নূতন সৃষ্টিতে সেশা দিল। কাজে উৎসাহ বাড়িয়া গেল। সাতদিন কাজ করিয়া গৃহে কিরিতাম, এইবার মাধাম আসিবে। দীপ জালিয়া মাধামের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম—একটু বিলম্ব হইলে মন অস্থির হইয়া উঠিত। অভিমান করিতাম—মাধাম দাখিয়া কাঁদিয়া অভিমান তাড়াইত। মাধাম আমার জন্ত প্রতাহ ফুলের তোড়া আনিত, —বাছা বাছা তালা ফুলের তোড়া—

শেখার সঙ্গে তরপুর! আমি উপহার দিলে
মাদাম তাহা গ্রহণ করিত না—অনুযোগ
করিয়া বলিত, কেন এ বাজে খরচ—
মাদামের এ-সব প্রয়োজন নাই—আমার
চেয়ে মাদামের টাকা অনেক বেশী।
শোবাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সে-বিষয়ে আমার
কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই!

তাহার উপর মাদাম বলিত, পড়ানো
বা সেলাই প্রভৃতি দেখানো কাজে তাহার
ঘোটেই ক্লাস্তি লাগিত না। ছাত্রীরা সব
বড়লোকের ঘরে—তাহারা মাদামকে খুবই
ভালবাসে; অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কখনো
একটা খুব দামী ব্রেসলেট বা আংটি আমাকে
দেখাইয়া বলিত, অনুগ্রহ ডিউকের ঘরে
তাহাকে দিচ্ছো। অত্যন্ত স্নেহে সময়
কাটিতেছিল। দিনের বেলা যে বাহার কাজে
বাইতাম, আর রাত্রে মাদামের মিলন ছিল
অটুট। শুধু রবিবার মাদামের দর্শন মিলিত
না। রবিবার তোরে সে সাঁৎ আর্থার
বাইত—বোনের সঙ্গে দেখা করিতে; আর
সোমবার তোরে দেখান হইতে করিত।
আমি ট্রেনে অবধি তাহাকে আগাইয়া
দিয়া আসিতাম। আবার সোমবার তোরে
ট্রেনে আসিয়া হাজির হইতাম—মাদাম
হালি-মুখে ট্রেন হইতে নামিয়া—ছাত্রীদের
বাড়ী চলিয়া বাইত, আমিও নিজের কাজে
লাগিতাম। সোমবার রাত্রে বোনের বাড়ীর
খুঁটিনাটি কথা—ছেলেদের ঘরের ছুটামি, ভগিনী-
পতির বিচিত্র খেয়াল প্রভৃতির গল্প বলিতে
মাদাম বেন পক্ষস্থল হইয়া উঠিত।

কি গভীর বিশ্বাসে, আশ্চর্য্য স্নেহে সময়
কাটিতেছিল! মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে

নাই! মাদামের স্নেহে বিশ্বাস লক্ষ্যে কোথাও
ছিলনা;—যে এতটুকু কামিত না, কণ্ঠ এতটুকু
বাধিত না! তবে একটা কারণে রাগ ধরিত।
অত্যন্ত ছোটোখাটো ব্যাপার বর্ণনা করিতে
গিয়াও মাদাম এত খুঁটিনাটি পাড়িয়া বলিত
যে গল্প অনাবস্তক দীর্ঘ হইয়া পড়িত।
মাদাম বেন আপনার চারিদিকে রোমান্সের
জাল বুনিত—নাটকীয় ঘটনার ছড়াছড়ি!
নাঝে-নাঝে হিংসা হইত—এই রবিবারটুকু
মাদামের যদি নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে
পারিতাম! মাদামের এই রবিবারের
আশ্বীৰ্ব-বন্ধুরা মাদামকে অনেকখানি খিঁচিয়া
রহিয়াছে। আমার মনে হইত, এই
রবিবারটুকুর প্রতীক্ষাতেই বাকী করটা
দিন যেন সে সেলাই, গানবাজনা আর
আমার লইয়া কাটাইয়া দিতে চায়! রাগ
হইলেও সুখ-মুটিয়া কিছু বলি নাই। বলিবার
ইচ্ছা হইলে মনে হইত, আহা, পতিপরিত্যক্তা
অভাগিনী তরুণী!

শেষে একদিন কেমন সন্দেহ হইল।
সেদিন সোমবার ট্রেনে গাঁড়াইরাছিলাম।
প্রথম-ট্রেন বান্ধি বাজাইয়া চলিয়া গেল,
মাদাম আসিল না। মন খারাপ হইয়া
গেল। মাদামের কি হইল? কোন অসুখ
করিল না-কি? সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল!
কিন্তু কোথায় বাইব? অত-বড় সহরে
মাদামের ভগিনী পতির বাড়ী খুঁজিয়া বাহির
করা—সে কি সহজ ব্যাপার। নিজের
উপর রাগ ধরিল। এতদিন ইহাঙ্গের গল্প
তুলিতেছি, কোনদিন ভগিনীপতির নামটিও
জিজ্ঞাসা করি নাই! সন্ধ্যার ট্রেনে বাওয়া
সম্ভব নয়—রাত্রে অজানা ঘেঁষে কোথায়

খুঁবিব! ভাবিলাম, মঙ্গলবারে সকালের
টেমেনে বাহির হইব। সেদিনের ছুটি লইলাম।
সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া দীপ
জালিতেছি—এমন সময় মাঝাম আসিয়া
উপস্থিত। মলিন মুখ, চোখে কেমন উদ্বিগ্ন
ভাব। বোনের অস্থখ করিয়াছিল, তাই
সে আসিতে পারে নাই। তখন সে অস্থখের
এক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়া বসিল। আমার
কেমন বিস্ময় ধরিল—এত বেলী কথা
কে শুনিতে চায়! বিশেষ মাঝামের বোন,
সে আমার কে? তাহাকে চিনি না, জানি
না, চোখেও কখনো দেখি নাই!

সে সপ্তাহে দুই-তিন রাত্রি মাঝাম আসিল
না—বোনের অস্থখ সাধে নাই। পর-সপ্তাহে
আবার সব ঠিক-নিয়মে চলিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মাঝামের অস্থখ হইল।
একদিন সন্ধ্যার অর-গারে আসিয়া কহিল,
শরীর অত্যন্ত খারাপ—এখানে রোগ
লইয়া আমার জ্বালাতন করা ঠিক নয়—
মাঝাম তাই বোনের কাছে চলিয়াছে
—সারিলেই আসিবে—একদিনও বিলম্ব
হইবে না। আমি বলিলাম, না, তাহা
হইবে না। এখানে আমি ডাক্তার দেখাইব,
সেবা করিব। শেষে আমার কথাই রহিল।
মাঝাম আমার গৃহেই রোগশয্যা গ্রহণ করিল।
ডাক্তার আনিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা
করিয়া ডাক্তার বলিলেন, রোগ কঠিন।
আশা তিনি একটুও দিতে পারেন না।

আমার সমস্ত অন্তর ছুঁকরিয়া কাঁদিয়া
উঠিল। মাঝামের পানে চাহিয়া ভবিষ্যৎ
ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। *উপায়
কি—কি করিব! ভাবিলাম, আহা অভাগিনী,

—যদি শেবমুহূর্তে কিছু শান্তি দিতে পারি!
মাঝামের বোনের নামে পত্র লিখলাম,
ছাত্রীদের ও পত্র দিলাম। কেহ আসিল না।
রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিতে লাগিল—
হঠাৎ চোখ-ফাটিয়া ঝল বাহির হইল।

কোনমতে চোখের জল মুছিয়া প্রাণপণে
মাঝামের সেবা করিলাম। আমার শান্তি,
আমার আনন্দ, আমার জীবন, আমার
সর্বস্ব! যেমন করিয়া পারি, এই শেবমুহূর্তে
শান্তি তোমার আনিয়া দিবই।

নার্থকে বুঝাইয়া আমি চুপিচুপি সন্ধ্যার
রাবির বাটার দিকে রওনা হইলাম। কখন
পৌছিলাম, সে কথা আর খুলিয়া বলিয়া
কাজ নাই। সে দিন রাবির গৃহে কিসের
মঙ্গলিস ছিল—বাড়ীর সমুখে গাড়ার ভিড়
ঠেলিয়া গৃহে ঢুকিলাম। বৃদ্ধ রাবি তখন নিমন্ত্রিত-
দের লইয়া ভোজে বসিয়াছেন। আমি খাম
মুছিয়া বলিলাম, “বড় বিশদ, কর্তব্যে চাই।”

আমার সেই সৃষ্টি দেখিয়া সকলে ভয়
পাইয়াছিল। কর্তা রাবি লম্বাভাবে আসিয়া
কহিলেন, “কি চাই? কোথা থেকে আসছেন?”
আমি মিনতি জানাইয়া বলিলাম, “আপনার
তাইবী মাঝাম মেলোস্ মুত্য়শ্যার। এ
সময় আর মনোমালিন্য রাখবেন না—একবার
তার শেবমুহূর্তে এসে তার সামনে গাড়ান—
সে বেচারী একটু হাসিমুখে বিদায় নিক।”

বৃদ্ধ রাবি এমন দৃষ্টিতে আমার পানে
তাকাইলেন যে আমি ভড়কাইয়া গেলাম।
আমি বলিলাম, “আপনার তাইবী মাঝাম
মেলোস্ মুত্য়শ্যার—” তিনি বেন অথাক্
হইয়া গেলেন। বিস্মিত হয়ে কহিলেন,
“আমার তাইবী! আগনি এ কি বলছেন?

আমার ভাইই নেই, তা ভাইখী! আপনি বাড়ী তুল করেছেন।”

আমি তাহার সম্মুখে নতজাহ্নু হইলাম, কহিলাম, “এখনো সেই সব পুরানো কথা মনে রেখেছেন! বংশের মর্যাদাকেই বড় বলে ধরছেন! একটা গ্রাণ চিরদিনের জন্ত পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে—মাধাম বেলেস্—মাধাম বেলেস্—চিনতে পারছেন না?”

“না, ও নামও কখনো শুনিনি। আমি বুড়োমানুষ, আপনার সঙ্গে পরিচয় করবারও পাত্র নই। হয় আপনি পাগল, নয় বাড়ী তুল করেছেন, নাম তুল করেছেন।”

বুড় আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। রাগে আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। এই সব বংশ-দর্পিতের বল—হতভাগা, স্বার্থপর বুড়! আবার পরকণে মনে হইল, তবে কি মাধাম আমার মিথ্যা পরিচর দিয়াছে! কিন্তু কেন—কি তাহাতে লাভ তাহার? বাহিরে আসিয়া গাড়ি ডাকিলাম,—প্রসিদ্ধ ব্যাক্তারের কস্তা মাধামের ছাত্রী—ক্যোচম্যানকে ব্যাক্তারের বাড়ীর দিকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম।

একাত্তর বাড়ী। সম্মুখে ভূতাটা গাড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিলাম, “মাধাম বেলেসের কাছ থেকে আসছি, আমি!”

“মাধাম বেলেস!” ভূত্যের মুখেও রাবির মত বিস্মিত ভাব!

আমি কহিলাম, “তোমার দিদিমদিদের বিনিগান-বাজনা দেখান, সেই মাধাম বেলেস্—”

ভূতাটাকে বিড়বিড় করিয়া বকিয়া গৃহমধ্যে ঢুকিয়া লম্বা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বিস্মিত হইয়া বাড়ী করিলাম। করিয়া

এক পত্র পাইলাম—সাঁৎ জার্মানের পোট-জকিসের ছাপমাত্রা চিঠি। খামটা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলাম। মাধামের ভূমিনী-পতি রেঞ্জার সাহেব পত্র দিয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন, মাধাম বেলেস্ বলিয়া তিনি কাহাকেও জানেন না। তাছাড়া তিনি অবিবাহিত, তাহার স্ত্রী-পুত্রই নাই, তা জ্ঞানক!।

যথেষ্ট হইয়াছে! মাধামের মিথ্যা বুঝিলাম।

পাঁচ বৎসর ধরিয়া মাধাম আমার সহিত চাকুরী খেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন—কেন? কি তাহার স্বার্থ ছিল এ মিথ্যা বলবার? কি প্রয়োজন? এতদিন সে তবে কোথায় ব্রূত? আশ্চর্য্য হৈরাণ! রাগের মাধাম রোগশয্যাপারিনী মাধামের প্রতি প্রেমের কড় নিক্ষেপ করিলাম, বলিলাম, “রবিবার তুমি সাঁৎ জার্মান কার কাছে যেতে? দিনের বেলায় কোথায় থাকতে? বল, সব কথা বলে বল।” মাধাম স্থিরমুষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। মুষ্টিতে সেই গভীর দর্প, অটল অবজ্ঞা!

আমি কহিলাম, “তুমি কাকেও পড়াতে যেতে না; সন্ধ্যার রাবির তুমি কেউ নও। সবসময় আমার সন্ধান নিয়েছি। তোমার কেউ চেনে না, জানে না। আগাগোড়া আমাকে মিথ্যা বলে এসেছে! বল, এত গহনা-পত্র, টাকাকড়ি পোষাক-পরিচ্ছদ তোমার কোথা থেকে জুটত? কার কাছ থেকে আদায় করতে?”

মাধাম গভীর বিবাদের মুষ্টি হানিল— সে মুষ্টিতে কি নৈরাজ্য, কি হতভান! আমার দশা শুইল—আহা, কেন এ শেবদুর্ভাগ্যে যেচরীকে এ আঘাত দিলাম! তখনই

কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিলাম। বড় দুঃখে বলিলাম,
“এ পাঁচ বৎসর কেন তুমি আমার শুধু মিথ্যা
বিয়ে ভুলিয়ে এসেছ? আমার এ ভালবাসার
কেন এ অপমান করেছ? সত্য-পরিচয়
কেন দাওনি? তুমি ত বুঝেছিলে তোমার
আমি কি অসহ্য ভালবাসতুম—তবে কেন
এত-বড় চাতুরীর খেওলা তুলে রেখেছিলে?
এই পাঁচ বৎসর তোমার প্রত্যেক স্পর্শে,
প্রত্যেক চুষনে এতখানি গোপনতা
রেখেছিলে—এত ছল! নামহীনা পরিচয়-
হীনা নারী—আজ পর্যন্তও তোমার
পরিচয়, তোমার নাম আমার কাছে
থেকে গোপন রেখে চললে! শুধু খেলা—
মিথ্যা খেলা খেলেছ আমার সঙ্গে!

এখনো বল, কে তুমি—কি নাম তোমার,
—কেন আমার জীবনে এভাবে এসে
উন্নয়ন হয়েছিলে? বল, এখনও খুলে বল,—
একটা অমূল্য জন্মের এতখানি আবেগ
নষ্ট করে দিয়ে যেয়ো না, তাকে কিছু
দিয়ে বাত—কিছু স্বাতি, কিছু—”

মিথ্যা প্রহাস! মাদামের দুই চোখে
শুধু অশ্রু কুটিয়া উঠিল। নিঃশব্দে আমার
তিরস্কার গ্রহণ করিয়া আমারই মুখের পানে
চাহিয়া মাদাম শেখনিখাস গ্রহণ করিল; একটা
কথা কহিল না—মিথ্যাবাদিনী হলনাময়ী
নারী তাহার সকল রহস্য বুকের মধ্যে গোপন
রাখিয়াই বিদায় লইল!

ঐ প্রেমাতুর আত্মবী।

কণিক।

এক-একরকম দুঃখ আছে বৈরাগ্যের
মত, সন্ধ্যার পেকরা আলোর মত শ্রান্ত! তার
মধ্যে কোন আগ্রহ কি চেষ্টা নাই।
কিরণের দীপ্তি নিবু-নিবু করতে করতে
এঁকেবারে নিবে আসে, প্রথম তাশ দূর হয়ে
চারিদিক ছায়ার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,
চারিদিক নিঃশব্দ নির্জন হয়, নিজার
গভীরতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী নিমগ্ন হয়ে
যায়। চরাচর শান্তি লাভ করে, শ্রান্তির
বিরাম হয়, সবুস্ত বিধ নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে।
হয়ত এ দুঃখের অবসানে, নূতন দিনের
চেতনা করে এসে আবার নবীন জীবনের
সূচনা করিতে পারি!

কিন্তু আর-একরকম দুঃখ আছে বা,
রাত্রি-শেষ প্রভাত-সূর্য্যের মত একেবারে

ঐশীল অন্তিম। তার তপ্ত স্পর্শে সব
জড়তা দূর হয়ে যায়—তপনের সহস্র রশ্মির
মতই অজস্র আলোকের তীর তার বুকে
গিয়ে বেঁধে, শ্রান্তি শান্তি স্বপ্ন স্রুতি সমস্তই
সমাপন করে। নিদ্রার আগরণের প্রতি সুহৃৎই
অন্তহীন শব্দের কলোলে, অবিরাম গতির
অবারিত দীপ্ত দৃষ্টির অশ্রুতিতে, উদ্ভূসিত
হয়ে ওঠে। চলা, কেঁদা, বেথা, অবিরাম
চেতনার সমস্ত জীবন জালায়ন হয়।
আকাশের সূর্য্যের সহস্র রশ্মি মনের অন্ধকারে
অজস্র দৃষ্টি সঞ্চার করে, তাকে আকুল করে
তোলে। সুহৃৎের স্বাতি থাকে না। এর
অবসানে যে রাত্রির অন্ধকার আসে, সে
মৃত্যুর মত অনন্ত শান্তির নিশ্চিন্ততা এনে
দেয়। প্রথম জালা-স্রপার শেষে গতির

বিগ্রাম হয়ে, চরম শাস্তির পরম ঠেংরাগের
আঁবাছন করে। চেতনার এই একান্ত
বাধাময় আগরণ, এ জীবন্ত দুঃখ, মৃত্যু ভিন্ন
আর কিছুতেই এর নিবৃত্তি হয় না।

• •

দুঃখের মত নির্বাক কিছু আছে কি !
চোখের জলেও তার প্রকাশ হয় না, দুঃখ
যখন বড়ই গভীর আর মর্মান্তিক হয়,
তখন আঁহা-উছ, গেলান, মলান বলতে
পারা দূরে থাক, তার অসহ বরণা হ্রাস
করে এককোঁটা চোখের জলও যে খরে
পড়ে না ! সমস্ত জীবনের সব রং পুড়ে
থাক হয়ে যায়, মাথার চুল হুদিনে শাদা
হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীর একেবারে শুষ্ক
পড়ে, বুক দুখ আর খোলে না। যে বড়
প্রিয়, থাকে অন্তরের আসনে বসিয়েছি,
তার নাম কি কারো কাছে উচ্চারণ করা
যায়, সে যে ইষ্টমতের মত বড় পবিত্র,
অন্তরেই জপ করতে হয়। ঐখানেও যদি
আত্মবিস্মৃতি না আসে, ঐখানেও যদি আহিরের
ভাব আসে, সে তো বিলাস বৈ আর কিছু
নয় ! রত্নালয়ের দুঃখের অভিনয়, অশিকের
স্রাব ; তবে সেই যে অভিনয়ের দুঃখ,
তাও সে সময়ের স্তম্ভ অন্তরে • স্বার্থরূপে
অহুতব করতে হয়। নয় তো সেই যে
মিথ্যার অভিনয় সে আরো মিথ্যা হয়ে
পড়ে, স্রাকাদির মত দেখায়, দর্শকের মন
স্পর্শ করতে পারে না ! গভীর দুঃখ,
মৃত্যু দুঃখ অন্তর সমাহিত হয়ে থাকে,
তার বহির্বিকাশ নাই বলে সে মনের
মহাকার সব মালিক পুড়িয়ে নিঃশেষ

করে, লব খাম মিটিয়ে শুধু বাঁটটুকু
বন্ধায় রাখে। বেধানে আত্ম-লক্ষ্যের
সম্মান হয় গেল, সেখানে আর থাকেই
কি ? কিছুই না, কঁাকা, ভূয়ো হাঁক-ডাক !

চেতনা আসে বুকের মধ্যে আগুনের
ছোঁয়া, চোখের উপর বিদ্রোহের স্পর্শ !
ধু ধু করে সব আঁড়াল আবর্জনা পুড়ে
যায়, চোখের সামনে ঝাপসা কিছুই থাকে
না—তখন আর অন্ধকার গভীর মধ্যে
লুকিয়ে বসে থাকে চলে না, পথ চলতে
হয়, সেবা করতে হয়। জীবনের এ অপূর্ণ
সুন্দর ভাব-গ্রহের ভাষা নিজেই করে
বেতে হয়। এই ধূলি, কাদা, ভূমিকম্প,
হুদিন হুড়িকের পৃথিবী যেমন আকাশের
কঙ্কণায়, কলকুল তৃণপত্র ধনধান্তে অতুলন
সুন্দর, তেমনি মানুষের এই দুঃখ-হুদিন-
সমুদ্র, প্রলোভনে কণ্টকাকীর্ণ, খণ্ডিত
জীবনও ভাবের স্পর্শে অপূর্ণ মহিমাময়।
ভ্যাগ প্রাপ্তি হতে পারে কিন্তু অপার
শাস্তি সন্ধ্যার অস্থপম কাণ্ডি নিয়ে জীবনে
তখনই আসে, যখন আমরা আর্থের সীমা
সঙ্কুচিত করে আনি !

তার ভরসা ছুই একত্রে মনে আসে।
পথ যখন হয়, চলার শক্তিও তখন আসে।
কারো জীবনই স্বার্থ হবার স্তম্ভ হটে
হয়-নি। হটে পদার্থ মাজের পরিণতি হয়ে
থাকে ; খানিকটা প্রাকৃতিক কারণ, কতকটা
আবার অদৃষ্ট বৈষ শক্তির উপর নির্ভর

করে। ফুল হতে ফল হয়, তবে ফলটি
স্বাদে-গন্ধে, সৌন্দর্যে, আকারে সর্বদা
পরিপুষ্ট হতে হলে যেমন অশুষ্ক রোগ
বাতাস সৃষ্টির উপর নির্ভর করে রাখে, তেমনি
কৃষকের বয় চেষ্টা, সতর্কতারও অপেক্ষা
রাখে। ফলটি দেখা দেওয়া দৈবাহুগ্রহ, তাকে
চক্ষা করা বয়-চেষ্টা-সাপেক্ষ, পুঙ্খবকার!
বাহির হতে বা আসবাব তা আসবেই
অন্তরের অশুষ্কতা যেন কিছুতে নষ্ট না হয়।

• •

কাজ কি? সে তো মানবের অভিব্যক্তি,
স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সীমা! এই যে এত
বড় বিশ্বব্যাপার চলছে, জীবনের এই
অবিভায্য স্রোত এর মধ্যে কোন কষ্ট-চেষ্টা
নাই। প্রাণে, আনন্দে আলোকে সন্নিবেশিত
ছায়ায় অন্ধকারে, সুখ-দুঃখের ছন্দে উদ্বেলিত
উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে
চলেছে! এর ভাবের আর প্রকাশের, কালের
ও উদ্ভবের একটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু
মন যেখানে পড়েমাথা কুটছে, সেখানে বাহিরে
কি উৎসবের আরোহণ ক্ষীণ হস্ত করতে
পারে? বিয়স মনে যে কাজই করা
যাকনা কেন সে দেবভোগ্য হয় না—
মাহুদের তাতে কোন উপকার হয় কি না
বলা কঠিন, তবে যেবতী যে তা গ্রাহ করেন
না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাই হাতের কাজ
আর সুখের কথার সঙ্গে মনের ভাব, অন্তরের
প্রীতি সোজনা করে দিতে হয়, প্রাণের প্রেরণা
আনন্দকে সর্বাঙ্গের বশন বুজী হয়, কল্যাণ
তখনই সর্বাঙ্গীন সৌষ্টব্য লাভ করে।

• •

আজকাল দেবদারুণ পাকা ফল করে
পড়বার সময় কত লক্ষ লক্ষ ফল কেবলি
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে কয়-
টারই বা অম্লুর হতে পায়? আর বার
বা অম্লুর হয় তার মধ্যে কতগুলিই বা
বাঁচতে পায়? যেটি বেঁচে ওঠে সেটিরও
পরিণতির বিকে কত বাধা, ছাগলে মুড়িয়ে
থায়, অনাবশ্যক মনে হলে মাশি এসে তাকে
উপড়ে ফেলে। চারিদিকেই দেখতে পাই
মৃত্যু-পরীক্ষার বে জরী হয়, তারি পরিণতি-
লাভের আশা থাকে—কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই
মৃত্যুর তাকনা চারিদিক হতে ঘিরে আসছে।
আত্মরক্ষার চেয়ে আত্ম-নিবেদনই অধিক
দেখা যায়। এই যে অসংখ্য মৃত্যু এ কোনো
অমরতাকে আশ্রয় করে, কেননা ফুল যা-
কিছু প্রত্যক্ষ নষ্ট হয়েও মরে না, তার
প্রাণ-সার অলক্ষ্য প্রকৃতির মধ্যে কাজ
করতে থাকে। মানব-জীবনের পক্ষেও
কি এই নিয়ম সত্য? জীবনের এই
বারম্বার দুঃখের মধ্যে মনে যা সঞ্চার হয়,
তা কি জন্ম-জন্মের সাক্ষী হবে না! এই
স্বকৃত-সংগ্রহ এবং অপরিণত জীবনের
অভিজ্ঞতা এবং লালনা এ কোন ভাবে
কার্য-কর হবে? এত কথা চিন্তা করে
ভেবে নিশ্চিন্ত করা কঠিন, তবে একটি
জিনিসই শুধু সম্ভব,—ভাবনার বোকা নামিয়ে
ফেলা আর মনকে একেবারে খাঁটি করে
বাহিরের কাজে তারি সঙ্গে মিল রেখে চলা!

• •

আমার ভাবনা দিয়ে ভেবে ভেবে ধন
সব রহস্য পরিষ্কার করে নিতে চাই, তখন

কিছুই দেখতে পাইনে। যে হৃদয় তত্ত্ব-
গুলি দিয়ে আমার দৃষ্ট বস্তু রচনা করব,
তার স্বত্রগুলিই আমার চোখে পড়ে না,
আমার হাতের আরবের মধ্যে আসে না।
কিন্তু নিজে বধন ভাবনার অসাধ্যতা বুঝে
হাল ছেড়ে দি, তুমি বধন আমার বোঝাও
তখন আমি সব পরিষ্কার করে দেখতে
পাই। আমার ভাবনা যেন ঐ আকাশের
মেঘ, আমার স্বর্ণকেও আচ্ছন্ন করে আছে,
আবার বৃত্তিভাষা বর্ণন করে আমার পৃথিবী-
টাকেও আবছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে। তোমার
বিচার-শক্তি যেন ঐ আকাশের আলো,
স্বচ্ছ অব্যবহিত স্বতঃপ্রকাশ! সে আপনাকেও
বেশন দেখায়, আপনায় চারিদিকটিকেও
ভেদনি উজ্জ্বল করে তোলে। সেই আলো
দিয়ে বধন দেখি, তখন সবই সহজ সরল
পরিষ্কার হয়ে যায়।

• •

তুমি যাকে পথ দেখাও তার কি আর
দুঃ তার করে থাকবার উপায় থাকে?
চারিদিকে যে চানির কোয়ালা খুলে যায়,
আলোর ঝোয়ার ভেঙ্গে আসে! আলোর
ভেঙ্গে স্বাধীনতার কোথাও কোন কালো
ঠাই পার না। বুকখানা ঐতনানি বেড়ে
যায়, আর বুদ্ধি কেমন সহজেই সব
সীমান্সা করে কেলে! সোজা পথটি চটু
করে বেহিঁরে যায়! যাব কি বাব-না'র নিচ্ছে
ভাবনা দূর হয়ে যায়। যাওয়ার পথ, আর
না-যাওয়ার অপথ দুইই সুস্পষ্ট দেখা যায়।
নিজের চোখ দিয়েই দেখি আর নিজের

বুদ্ধি দিয়েই বিচার করি, আর দশজনে
কি বলবে—ভাল মনে করবে, না মন্দ
বলবে সে কথা মনেও আসে না। খুব
নিঃস্বার্থ হতে হলে বড়ই স্বার্থপর হতে
হয়, কেননা আমি কতটা ছাড়ব, আর
কতটা ধরে থাকব, সে বিচার অস্ত্রে কখনই
করে দিতে পারে না, এ-বিষয়ে নিজের
উপর নিত্যন্তই নির্ভর করে কর্তব্য-বিচার
করতে হয়। বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে বধন আমার
কোন শক্তির মিলন হয়, আমার ইচ্ছা বধন
কল্যাণময়ী পরমা ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার
করে, তখন আমি স্বাধীন হই। বাধা,
বিপত্তি, বিষ তিরোহিত হয়, গতি-পথে
কোন প্রতিবন্ধকই দ্বারী হয় না!

• •

স্বাধীনতা অব্যবহিক নয়, অবিসৃষ্ট-
তারিতার স্থান তার মধ্যে হয় না। স্বাধীন
মনোবৃত্তি উদ্ভাস নয়, সাবধান এবং সতর্ক!
স্বাধীনতার গতি উদ্ধার মত কক্ষ-ভ্রষ্ট নয়,
সে গতি গ্রহ-ভারকার নিগমিত সফরণ,
অকোহিণী নক্ষত্র সবাই সুকৃপে চলেছে,
উন্নতি, পরিণতি ও নিরতির পথে যাত্রা,
তার মধ্যে বিষমতা নাই বলেই তা স্বাধীন।
উদ্ধার গতিতে ছুটে চলেতে বাধা নাই সত্য,
ওবে তার শেষ সবরই হয়। অনন্তের পথে
অবিরত যে চলতে পারত, সে মধ্যপথে মকস্মাৎ
দীপ্ত অঙ্গারের মত ভস্মীভূত হয়ে পৃথিবীর
উপর ছড়িয়ে পড়ে। তার আত্মবাস্তবতা পরিণামে
কারো কোন কল্যাণই-সাধিত হয় না।

ঐশ্বর্যবলা দেবী।

আলোর আলো

তেরো

সরমার কথা

অরের ঘোরে আমি বধন বেহঁস হয়ে
ছিলাম, তখন অরের মত মনে হোত, কে
বেন আমার শিরের কাছে হুঁকে বসে
আছে, যে বেন কাতর-করুণ চোখে আমার
মুখের পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে!
তার মুখখানি মনে হোত চেনা-চেনা,—
অথচ চিনতে গেলে চিন্তে পারতুম না,
সব বেন আপনা হয়ে যেত!

যেদিন প্রথম জ্ঞান হোল, সেখান
রাজিবংশীর আমার বিছানার পাশে
মোহনবাবু!...

আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—
লজ্জার, লজ্জাচে মাথা বেন কাটা বেতে
লাগল! অরে বধন হঁস ছিল না,
তখন আমার গায়ে কাপড়-চোপড় নিশ্চই
অলামাল হয়েছিল! ছি, ছি, মোহনবাবু
কি-বলে এমনসময়ে আমার ঘরে বলে
আছেন! আর, তাও বলি—বাবাই বা
কি-রকম-নাহু? আমার বিছানার পাশে
একমন পুরুষকে বসিয়ে রেখে, তিনি কিনা
অমানুষে গুরে গুরে বুঝাচ্ছেন! তাঁর
কি বুদ্ধিহুঁড়ি সব লোপ পেরেছে?

তারি রাগ হোল; মোহনবাবুকে ঘর
থেকে চলে যেতে বললুম। তিনি আমার
সহজে নড়তে চান না দেখে আমার রাগ
আরো বেড়ে উঠল। কড়া কথা বলে

তাঁকে ঘর থেকে একরকম ডাড়িয়েই
বিলুপ।

তোর হবার আগেই বাবার ঘুম ভেঙে
গেল। আমি মেগে আমি দেখে তাড়াতাড়ি
আমার কাছে এসে বললেন, “কেমন
আছিস না?”

—“ভাল আছি।”

—“আঃ, বাচলুম! তোর জ্ঞান হয়েছে
দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ এল! এ ক-দিন
বে কি-করে’ কেটেছে, তা—

—“হ্যা বাবা, আমার অস্থখ কি খুব
বেশী হয়েছিল?”

—“ওঃ—মহে-মারুবে টানাটানি! ভাগ্যে
মোহন ছিল, নৈলে তুই কি আর বাঁচতিস
সরো?”

—“মোহনবাবু?”

—“হ্যা মা! এ ক-দিন ক-রাত তোর
অস্তে সে যে মুখের রক্ত তুলে খেটেছে।
হ্যাঁরে, মোহন কোথায় গেল? বাড়ী গেছে
বুঝি? আহা, তার শরীর নিশ্চই কাছিল হয়ে
পড়েছে—এ ক-দিন সে তাঁর তোর বিছানার
পাশে বলেছিল,—আমার চেয়ে তোর উপরে
তার যেন বরদ বেশী! ডাক্তার তাই কাল
বলছিলেন, মোহন যদি না থাকত, তাহলে
তোর অস্থখ আরো সংঘাতিক হয়ে উঠত।
আহা, মোহনের আমার ভাল হোক!”

ভেবেছিলাম, বাবাকে খুব বকব।
কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার মুখ

দিয়ে আর বাকি সরল না। মনের ভিতরে কেমন একটা খেদ ধ্রুগে উঠতে লাগল।

বাবা আমার মাথার হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, “মোহনের মত যদি একটি পাত্ত পেতুম, তাহলে আজ আর তোরা কপালে এ ছঃখঃ”—বলতে-বলতে হঠাৎ তিনি আমার মুখ দেখে খেমে পড়লেন!

আজ সারাদিন মোহনবাবু আমাদের বাড়ীতে আগেন-নি।

বিকাল-বেলায় বাবা বললেন, “কি আশ্চর্য্য! মোহন আজ একবারও এল না বড় বে?”

মোহনবাবুকে ডাকবার জন্তে তিনি ফীকে পাঠিয়ে দিলেন। কী করে এগে বললে, মোহনবাবু সেই ছুপুরে বেরিয়ে গেছেন—এখনো ফেরেন-নি।

বাবা অশ্রুট স্বরে বললেন, “কি আশ্চর্য্য!”

কিন্তু, আমি বুকলুম।

সন্ধ্যার সময় মরেনবাবু এলেন, কেমন আছি তাই জানতে! তিনিও মোহনবাবুর কোন খবর বলতে পারলেন না।

বাবা ষাড় নেড়ে আবার বললেন, “কি আশ্চর্য্য!”

সে রাত গেল। তার পরের দিন শুভলুহ, হঠাৎ কি বিশেষ দরকারে মোহন বাবু মধুপুরে গিয়েছেন।

বুকলুম, এ হুহু অছিল। এ ক-দিন আমাদের বাড়ীতে তিনি সারাদিনই থাকতেন, হঠাৎ একেবারে আসা বন্ধ করে’ দিলে

বাবা সন্দেহ করতে পারেন—এই তথ্যই মোহনবাবু কলকাতা ত্যাগ করেছেন।

না-জানি আমার অকৃতজ্ঞতার প্রার্থে তিনি কী আশাতই পেয়েছেন!

দিনে দিনে আমি সেয়ে উঠতে লাগলুম।

বাবা বড় বেশী করে’ই মোহনবাবুর অভাব বোধ করতে লাগলেন। মোহনবাবু প্রায় সারা দিনটাই আমাদের বাড়ীতে কাটাতেন। মরেনবাবু এখনো রোজ সন্ধ্যায় এক-একবার আসেন বটে, কিন্তু বাকি সময়টা বাবা যে কি-করে’ কাটাবেন, তাই নিয়ে তিনি যেন মহা সমস্তার পড়ে গেলেন!

বাবা সেদিন আমাকে বললেন, “মা সরো, মোহন যে আমার মনের এতখানি দখল করেছে, এতদিন তা বুঝি-নি। তোরা জন্তে সে। এমন করে’ খাটলে-খুটলে, কিন্তু তুই সেয়ে ওঁরবার আদেই হঠাৎ চলে গেল, চিঠি-পত্রেও আর খবরাখবর নিলে না, এর কারণ কি? বিশেষে গিয়ে সে নিজে অল্পখ-বিলুখে পড়ে নি ত!”

বাবাকে সব কথা বলব-বলব করে’ও বলতে পারলুম না—মুখে কেমন বেধে গেল! যিনি আমাদের এমন আত্মীয় ছিলেন, তাঁর প্রাণে যে আমি কত-বড় ষাপাটা দিয়েছি, কোন্‌মুখে তা প্রকাশ করে’ বলব!

বাবা একলাটি বসে-বসে তাঁর বেহালায় উপরে ছড়ি টানেন, যখন বাজনা তাল লাগে না তখন তাঁর নরীয়া-হুঁকুরকে নিয়ে সময় কাটান, তাকে আদর করেন, তাঁর সঙ্গে আবোল-তাবোল কত কি বকেন।

নহুয়ার নত আর-কোন দেশী কুকুর বোধহয়
মাহুকের কাছে এর আগে এতটা আদর
ভোগ করেনি।

আজ সকালে বাবা আবার রাত্তা থেকে
আর-একটি শ্রীব সংগ্রহ করে' এনেছেন।

আমার কাছে এসে বললেন, “কাপড়ের
ভিত্তরে এটা কি নড়ছে বল দেখি?”

আমি কিছুই ঠাহর করতে না পেয়ে
বললাম,—“কি বাবা?”

বাবা হাসতে-হাসতে কাপড়ের ঢাকা
খুললেন—ছোট্ট একটি বেড়াল!

তার গায়ে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন,
“এর নাম কি রেখেছি জানিস?”

—“এর মধ্যে নামও রেখে ফেলেছ
বাবা?”

—“কি আশ্চর্য! নাম না রাখলে কি
চলে? এর নাম রেখেছি মেহুয়া!”

এদিকে বাবার সাড়া পেয়ে ল্যাম
নাড়তে-নাড়তে আল্লাহে ঝিঙ্ বার করে'
নহুয়া এসে হাজির! কিন্তু, বাবার কোলে
হঠাৎ বেড়াল-ছানা দেখে সে বেজার চমকে
উঠে ধমকে গাড়িরে ল্যাম-নাড়া একেবারে
ধামিরে ফেললে। তাকে অমন হতভম্ব
হয়ে যেতে যেখে, নহুয়াকে কোল থেকে
নামিরে দিয়ে বাবা বললেন, “নহুয়া, তোর
খেলার সাথী এনেছি রে!”

কিন্তু আ কপাল, নহুয়া আর মেহুয়া
—দুজনেই দুজনকে দেখে মোটেই খুশী
হল না! কোনরকম ইতস্তত না করে'ই
নহুয়া তেড়ে এসে দিলে মেহুয়ার ঘাড়
খান্কে করে' এক কাঁষড়, আর মেহুয়া
ল্যামটি ছুগিরে কলাগাছ করে', নহুয়ার

নাকের ডগার দিলে ঝা-করে' এক থাবা।
বসিয়ে! থাবা খেয়ে নহুয়ার বেজাজ অমনো
বিগড়ে গেল! সে ঠাঁত বের করে', চার
হাত-পা তুলে মেহুয়াকে তফাৎ থেকেই
নানারকমে তার পেথাতে ছুক করলে—
কিন্তু তারি থাবার সীমানার গুরদা করে'
আর এগুল না।

বাবা নহুয়াকে এক ধমক দিয়ে
মেহুয়াকে কোলে তুলে নিরে বললেন,
“মেহুয়া, এ-বাড়ীতে থাকা সুবিধের নয়
মনে করে', তুমি যেন পালিয়ে-টালিয়ে বেগে
না বাছা! ছোট্ট নহুয়াকে আমি দুদিনেই
শায়েস্তা করে' দেব—তোমার কিছু তার
নেই!”

তার মুখের পানে তাকিয়ে মেহুয়া করুণ
স্বরে বলে উঠল—“মিউ!”

বাবা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, “কি
আশ্চর্য! এরা মাহুকের কথা বোঝে—
সেখঁচিল্ সেরা!”

দিন-পনেরো কেটে গেল—মোহনবাবুর
কোন খবর নেই! মোহনবাবুর বাড়ীতে
দ্রীলোক ছিলেন একজন,—তার পিসীমা।
কীকে পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকেও কোন খবর
পেলুম না—মোহনবাবু চিঠি-পত্র কিছুই
লেখেন-নি।

আমার সেবিনকার কথাগুলো মোহন-
বাবুর প্রাণে গিড়ে যে কতটা বিধেছে,
এতদিনে সেটা বুঝতে পারলুম। নিশ্চয়
মনের ব্যথা বুকেই চেপে রেখে দিনের পর
দিন কাটাচ্ছি, রোজ জাবি আজ তিনি
জ্বাসবেন,—কিন্তু কৈ, তিনি শু এলেন না—

‘‘তিনি ত এলেন না!...’’ সেদিন বাবার বেহালায় যে সুরটি বাজছিল, সেটি শুনে আমার সেই সুরের একটি গান মনে পড়ল—

‘‘বিদায় করেছ বাঘে নয়ন-জলে,
এখন কিভাবে তারে কিসের ছলে ?
মধু নিশি পূর্ণিমার, আসে ঘর বারবার
সেজন কিরে-না আর যে গেছে চলে !’’

আর কি তিনি কিভাবেন ? আর কি তিনি আমাদের দোর মাড়াবেন ?

আজ সকালে কি-একটা কাজে ঘরের ভিতরে এলুম। মোহনবাবুর বাড়ীর দিককার জানলাটা খোলা ছিল। সেদিকে তাকিয়েই দেখতে পেলুম, মোহনবাবু ঘরের যে জানলাটা এতদিন বন্ধ ছিল—আজ সেটা খোলা। একটু কোতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলুম। মোহনবাবুর ঘরের মধ্যে একখানা বড় আরসি ছিল, তার দিকে চোখ পড়ল। আরসিতে একটি লোকের ছায়া! দেখেই চমকে উঠলুম,—একি, এ যে মোহনবাবু!

বিছানার উপরে তিনি আধ-শোয়া আধ বসা অবস্থায় ছিলেন, তাঁর মুখখানি হেট-করা। তিনি কখন এসেছেন? আমরা ত কিছুই জানতে পারিনি! জানলার কাছে আরো এগিয়ে গেলুম—তাকে ডাকা উচিত কিনা, পাড়িয়ে-পাড়িয়ে তাই ভাবতে লাগলুম।

এমনসময় তিনি মুখ তুললেন, কিন্তু আরসির দিকে চোখ পড়বামাত্র চমকে উঠলেন। আরসির ভিতরে আমার ছায়া দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ পাড়িয়ে পড়লেন—

তারপর ঘর থেকে ভাড়াভাড়ি বেরিয়ে গেলেন। দেখলুম, বাবার সময়ে তাঁর মুখে-চোখে বিরক্তির আভাস স্টেট উঠল!

আমার উপরে তিনি এখনো রাগ করে’ আছেন! মনটা কেমন হা-হা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ সেখানে পাড়িয়ে থেকে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

নহুগা আর মেহরাকে নিয়ে বাবা বারান্দার বসেছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, ‘‘বাবা, মোহনবাবু এসেছেন!’’

—‘‘কি আশ্চর্য! কোথায় সে?’’

—‘‘তাঁর বাড়ীতে।’’

বাবা তখনি মোহনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন।

খানিক পরে, আমি রান্নাঘরে বসে আছি, বাবা ফিরে এসে হতাশ ভাবে বললেন, ‘‘হ্যাঁ মা, মোহন এসেছে বটে!’’

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাস্য করলুম, ‘‘কৈ, তিনি এলেন না?’’

—‘‘না মা, বললে রেলের বড় কষ্ট হয়েছে—শরীর ভারি খারাপ!’’

কসু করে’ বলে ফেললুম, ‘‘আমি কেমন আছি জিজ্ঞাস্য করলেন না?’’

—‘‘কৈ আর করলে! আমিই বললুম, সস্তরা এখন একেবারে সেরে উঠেচে, তোমার জন্তেই এ ব্যাড়া সে বেঁচে গেল। মোহন শুনে হ্যাঁ না কিছুই বললে না—খালি একটু হাসল। মোহনকে দেখে মনে হোল, সে-যেন কেমন ঝাণ্‌ছাড়া হয়ে গেছে। কেন বল দেখি মা?’’

আমার চোখে জল এল, পাছে বাবা দেখে ফেলেন সেই ভয়ে আমি ভাড়াভাড়ি উত্তরের কাছে গিয়ে পিছন ফিরে বসলুম।...

ভাতের হাড়ি চড়িয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলুম।

মোহনবাবু যে রাগ করেছেন, এ কথা আর বেশীদিন পুঁকানো থাকবে না। বাবা আর ছরেনবাবু যখন জানতে পারবেন যে, মোহনবাবু কেন রাগ করেছেন, তখন কি হবে? তাঁরা আমাকে কি ভাববেন?

তাঁরা কিছু ভাবুন না ভাবুন, ভাতে ওত বার-আসে না—কিন্তু মোহনবাবুর চোখে আমি কত নীচে নেমে পড়েছি! যে লোক আমাদের বাড়ীতে দিনে এক-শো বার আসতেন, যিনি আমাদের সকল দিক দিয়ে সাহায্য করেছেন, যিনি আমাকে বাঁচাবার জন্যে শরীর দিয়ে মন দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন—স্বাচ্ছন্দ্য কিনা তাঁরই মন আমাদের দিক থেকে একেবারে বেকে পড়িয়েছে, তিনি এখানে এসেও আমাদের বাড়ী মাড়ালেন না, একটিবারও আমার নাম মুখেও আনলেন না! কেন আসবেন, কেন আমার নাম করবেন,—পোড়ারমুখী আমি—আমি যে নিজেই কটু-কথার তাঁকে বিদায় দিয়েছি!

না-বুকে, না-ভেবে অমন কথ' কেন তাঁকে বললুম? রাত্রে আমার ঘরে আছেন বলে' তাঁর উপর রাগ করে' আমি যে একরাত্তরে তাঁর প্রতি অস্ত্রার সম্মুখে প্রকাশ করেছি! একথা কি তিনি ভুলতে পারেন?

হগো তুমি ভুলে যাও, ভুলে যাও! আমি মনে-প্রাণে মার্জনা ভিক্ষা করছি—তুমি এল গো, আমাকে ক্ষমা কর! তুমি ভুলে যাও!

কিন্তু, তিনি এলেন না—আমাকে ক্ষমা চাইবার সুযোগও দিলেন না। সারাদিন এই-আসেন এই-আসেন মনে করে' তাঁর পথ চেয়ে বসে রইলুম,—তিনি এলেন না!

ভুলে-ভুলে স্বপ্নে-রঙ্গ বাগানখানি ছেয়ে গেছে—উদাস-চোখে সেইদিকে চেয়ে জানলার ধারে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখলুম, বাগানের এককোণে—যেখানে বনস্বজ লতাকুল ঘাসের উপরে পুষ্পিত-পল্লবের কম্পমান ছায়াপাত করেছে—সেইখানে দ্বিধা পাথরের স্থতির মত মোহনবাবু একলাটি বসে আছেন। পুকুরের কালো জল আলো করে' ওটিকর রাজহাঁস দীর্ঘশ্রীবা হেলিয়ে একে-বেঁকে জল-খেলা খেলছে, তিনি আনমনে চুপটি করে' গাই যেতেন।

মোহনবাবুকে দেখে আমি আর দ্বিধা থাকতে পারলুম না—আন্তে-আন্তে উঠে পড়ালুম। বাইরের ঘর থেকে বাবার এজ্ঞারের আওরাজ কাণে এল। একবার থমকে পড়িয়ে ভাবলুম, যা' করতে যাচ্ছি—এ কি উচিত? তারপরেই মনে হোল, দোষ যখন করেছি, তখন ক্ষমা চাইতে লজ্জা কি? এক-একবার মনে মায়ীর অভিমান ভেগে উঠতে লাগল কিন্তু সে অস্ত্রার অভিমানকে আমি প্রবল হতে দিলুম না। মনকে শক্ত করে', ষড়্‌কির

সন্ধ্যা দিগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

‘ছায়া’ কচি বাসে-ডরা কচি—মাক-খান দিগে ছোট্ট একটি রাসা কাকের পথ। চলতে কেমন বাধা-বাধা ঠেকতে লাগল—কিন্তু আমি থামলুম না—কি-বেন এক ময়ের টানে কে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—আচ্ছার মত চলতে-চলতে আমি সেই লতাকুঞ্জের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সেখানে গিয়ে মনে হোল, আবার কিরে যাই—একি বেহায়াপনা করছি! কিন্তু তারপরেই ভাবলুম, এতদূর যখন এগিয়েছি, তখন আর কেতা নয়!

কুঞ্জের পাশে বেখানে তাঁকে বেধে-ছিলুম, সেইখানে এক-পা এক-পা করে’ এগিয়ে গিয়ে ছুঁ-ছুঁ বুকে ডাকলুম, “মোহনবাবু!”

কেউ সাড়া দিলে না।

সামনে আর-একটু তুঁকে পড়ে হতাশ চোখে দেখলুম, মোহনবাবু বেখানে বসে-ছিলেন, সেখানে কেউ নেই—তিনি কখন উঠে চলে গেছেন!

মাথাটা ঘুরে গেল—তুই চোখ মুখে সেইখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম।

মনের মাক থেকে কে-বেন সফাতরে বলে উঠল—গুরে অভাগী, তোর প্রাণের কারা প্রাণেই কিরে এসে, তোর রমণীঘের সকল গরু আজ ভুবিরে দিলে যে!

রাজে শোবার আগে বাবার কাছে গিয়ে বসলুম।

বাবা বললেন, “কি মা, আজ যে বড় এখনো জেগে?”

আমি মাতীর দিকে তাকিয়ে বললুম, “হ্যাঁ বাবা, মোহনবাবুর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়-নি?”

বাবা! একটু হুঃখিত ভাবে বললেন, “ওরে, মোহন আর সে মোহন নেই! তার মনে কি হয়েছে তা! সেই জানে!”

—“তাহলে দেখা হয়-নি?”

—“না।”

—“বাবা, মোহনবাবু আমাদের উপর রাগ করেছেন।”

—“রাগ? কেন মা, আমরা তা তার রাগ হবার মত কিছুই করি-নি!”

—“তুমি কিছু কর-নি বাবা, কিন্তু আমি তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি!”

বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, “কি আশ্চর্য! তুই?”

আমি আর কিছু লুকোলুম না—একে একে সেদিনকার সমস্ত ব্যাপার বাবার কাছে খুলে বললুম। সমস্ত শুনে বাবা অনেকক্ষণ গুহু হয়ে বসে রইলেন।

তারপর ব্যথিত স্বরে বললেন, “কি আশ্চর্য! এতবড় অভাগীটা তুই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল! ছিঃ ছিঃ, মোহনের পায়ে ধরে’ তোর মাক চাওনা উচিত!”

বাবার কোলের উপরে মুখ রেখে আমি কাঁঠের মত বসে রইলুম।

—“তাইত বলি, মোহন তা তেমন ছেলে নয়, হঠাৎ সে এমন হোল কেন? তলে-তলে এমন কাণ্ড হয়ে গেছে, কে

মানত তা? সে হয়ত ভাবছে, আমরা কি হীন, কি অকৃতজ্ঞ! ছি ছি, লজ্জার কথা, লজ্জার কথা! সুতরাং—”

চোন্দ

মুন্সারিবাবুর কথা

সরনার মুখে সমস্ত শুনে সাগরাত ভাগরকম ঘুম হোল না; মোহন আমাদের কি ভাবছে, তাই ভেবে আমি যেন মরমে মরে গেলুম।

ঐ ত সরোর ঘোষ! সামান্ত কারণে হঠাৎ এমনি থেকে গাড়াবে যে কার সাধ্য তখন তাকে আর বাগ মানার! ওর ঐ উন্টো স্বভাবের ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে আমাদেরও কি কম ভুগতে হয়? কিন্তু আমি যে তোর বাপ! আমি বা সইব, অন্তে তা সইবে কেন বাছা?

ভোরবেলায় কাক-চিল ডাকতে-মা-ডাকতেই উঠে মোহনের বাড়িতে ছুটলুম। মোহন সব তখন মুখ-হাত ধুয়ে নীচে নামছে,—আমাকে বেখে নামতে-নামতে সে সিঁড়ির উপরেই থমকে গাড়াল।

আমি তার সামনে গিয়ে বললুম, “মোহন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে!”

মোহন অবাধ হয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে রইল; তারপর নেনে এসে আমাকে তার বৈঠকখানার নিরে গিরে বসালে।

মোহনের কাছে কথাটা কি-ভাবে পাড়ব তাই ভাবছি, হঠাৎ “হ্যাঁ হে মোহনলাল, বাবার সময়ও খবর দিলে না,

আসবার সময়ও দিলে না—বাপার কি বল ঘেঁষি?—এই যে মুন্সারিবাবু!”—এসতে বলতে হরেনবাবু ঘরে ঢুকে আমাকে নমস্কার করলেন।

—“হরেনবাবু, আজ এত সকালে যে?”

—“এই অকুণ্ডল মোহনকে থমকতে।

ওর অন্তে বারা ভেবে মরে, কত সহজে ও তাগের ভুলে যায়, দেখছেন ত! আমাদের ঘেরেলি কথার আছে না—‘বনের মোষ খায়, বনের পানে গায়’—ও হচ্ছে সেই জাতীয় জীব! বিশেষে না বলে-করে চলে গেল, একখানা চিঠিও লিখলে না!”

হরেনবাবুর কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—তিনি মোহনের প্রাণের বন্ধু, আম হোক কাল হোক সমস্তই ভুলতে পাবেন ত! এই-সব ভেবে-চিন্তে বললুম,—“হরেনবাবু, মোহন আমাদের উপর রাগ করেছে!”

মোহন চমকে উঠে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে, মাথা হেঁট করলে।

হরেনবাবু খানিকক্ষণ হা-করে’ থ হয়ে দাড়িয়ে রইলেন; তারপর আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, “রাগ!”

—“হ্যাঁ। সরো ছেলেমাছুষ, অয়ে তার মাথা ঠিক ছিল না—কি বলতে কি বলে কেলেঁছে! তার কথার কি রাগ করতে আছে বাবা? মোহন, এই তোমার ছুটি হাত ধরে বলছি, একবার গিরে দেখবে চল, সরো কি-রকম অকৃতজ্ঞ হয়েছে! তুমি এখানে যে ক-দিন ছিলে না, সে ক-দিন সে খালি তোমার কথা তুলত। কিন্তু আমি কি ছাই এ-সব জানতুম! কাল তুমি কলকাতার এসেও যখন আমাদের

বাড়ী মাড়ালে না, সরো তখন কাঁধো-কাঁধো মুখে আমার কাছে গিয়ে সকল কথা গুলে বললে। সে বা বলেছে, না-বুঝে অরের ঘোরে বলেছে! মোহন, বাবা, তোমার আশ্রয়েই আমরা কলকাতার রয়েছি, তুমি আমাদের এত উপকার করেছ—আমরা কি তোমাকে অপমান করতে পারি? চল বাবা, দেখবে চল—সরো তোমার আশায় বসে আছে, তোমার কাছে মাক চাইবে বলে। স্নতগ্রাং—”

হরেনবাবু চীৎকার করে’ বলে উঠলেন, “বটে, বটে? কিন্তু মুরারিবাবু, এতে ত আমি দ্রোপদী-ঠাকরুণের কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না! তিনি কয় দেহে বৈদিক মাথাধ বা বলেছেন, স্বহৃদে মোহন তাতে যখন রাগ করতে পেরেছে, তখন সে যে একটি অস্তি-বড় হস্তীমূৰ্খ, সত্যের অহুরোধে এ আমি বীকার করতে বাধ্য!”

আমি বললুম, “মোহন, বল, আমাদের তুমি কমা করবে?”

হরেনবাবু তাঁর হাতের ছড়াটা ঠক্ঠক্ করে’ মাটির উপরে ঠুকে বললেন, “যে নিজে ঘোবী, সে মত দেবে না—মণ্ড নেবে। এখন ওর প্রতি কি শাস্তি বিধান করা যাবে—আমুন, আলোচনা দ্বারী সেইটেই অবধারণ করা যাক।”

মোহন এতক্ষণ চুপ করে’ বসেছিল। এবার সে লজ্জিতভাবে বললে, “মুরারিবাবু, আমারই অপরাধ হয়েছে—আমাকে কমা করুন।”

আমি বললুম, “কি আশ্চর্য! বাবা আমরা—

হরেনবাবু আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, “মুরারিবাবু, চুপ! আপনি আশ্চর্য্য হবার অবকাশ পরে যথেষ্ট পাবেন। আগে শাস্তির কথা হোক—আপোষে যেখানে চলবে না। তুমি মোহন, তোমার প্রতি এই শাস্তি হোল যে, তুমি অবিলম্বে ঐশ্বরী দ্রোপদী-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে তোমার এই প্রকাণ্ড নিরক্ষুজিতার অন্তে বিশেষ অহুতপ্ত চিত্তে করবোড়ে কমা প্রার্থনা করবে। ওঠ—দেখি নয়, ওঠ।”

মোহন বললে, “এতে আমি রাজি। কিন্তু—”

“কী! আবার কিন্তু? এসব বাক-চাতুরী চলবে না মোহন!”—হরেনবাবু ছ-হাতে শিশুর মত মোহনকে আগে শুল্ল তুলে, তারপর দাঁড়-করিরে দিয়ে আবার বললেন, “যাও! আগে কমা চেরে এস—নইলে আর তোমার সুখবর্ধন করব না! অ্যা,—দ্রোপদী-ঠাকরুণের উপরে রাগ? হার স্বহৃদে ভজিত দ্রুতপক সূচি এবং অন্তান্ত ব্যঙ্গনাথি উদয়গাং করে’ আমরা পৃথিবীতে বসেও স্বপ্নগীরে স্বর্গল্যভের পরমানন্দ উপভোগ করি, তাঁর উপরে রাগ! অকৃতজ্ঞ মোহন, শীঘ্র যাও! ততক্ষণ আমরা এখানে বসে গল্পগল্প করি। যাও—যাও, আর দাঁড়িও না বলছি!”

পনেরো

মোহনের কথা

সরসার ব্যবহারে কে-নিল-কী মর্দাহত হয়েছিলুম!

কলকাতার থাকলে পাছে আবার বাধা

হয়ে সরমাকে বেথতে বেতে হয়, সেই ভয়ে আমি বেশতাপী হইলাম। ভাবলুম, যে আমাকে চায় না—আমিও তাকে ভুলে যাব! কিন্তু বার দিকে আমার সকল প্রাণ-মন একত্র হয়ে আছে, তাকে ভোলা কি সহজ! সামান্য একটা উত্তর আঁড় মেহের উপর থেকে ভুলে ফেলা যায় না, আর মেহের ভিতরে প্রাণের মাঝখানে যে ছবি আঁকা হয়ে বার সে ছবি পুঁছতে গেলে প্রাণকেও যে তাগ করত হয়!

পনেরো দিন বিশেষে ছিলুম—এ পনেরো দিন যে 'কি-করে', কোথা গিয়ে কেটেছে, তা আমি জানি আর জানেন ডগবান! সত্যি, দিন কালর জন্তে বসে থাকে না, দিন কেটে যায়; কিন্তু আশাহীনের এক-একটি ছুঁথের দিনের সঙ্গে-সঙ্গে তার বুকের এক-একটি তরীও যে বেহুরো হয়ে ছিঁড়ে যেতে থাকে!

সরমাকে ছেড়ে থাকতে আর পারলুম কৈ! যদিও তার সেদিনকার নিষ্ঠুর কথাগুলো হৃদের মত বুকের মধ্যে বারংবার বিঁধছিল, তবু জানি না, কি মোহের টানে সেই ব্যথাকাতর প্রাণ নিয়েই আবার কলকাতার কিয়ে এলুম।

কিয়ে এসে সবে বরে বসে বিশ্রাম করছি,—আরসির মধ্যে দেখলুম তার ছায়া! দাড়িরে-দাড়িরে নীরবে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। আমার মনে হোল, তার সেই নীরবতা, মৌন বাগ বৈ আর-কিছুই নয়! সে কি তাই দেখছিল নিঃশব্দভাবে, যে, তার নিষ্ঠুর আঘাতে আমি কতটা 'মুহমান' হয়ে পড়েছি? আবার আমার মনের মধ্যে

অভিমান উথলে উঠল,—আমি তার প্রতি ক্রন্দন স্নান না করেই সে বর ছেড়ে চলে এলুম।

কিন্তু আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম, তাকেও ভাল করে' বুঝি-নি! তখন যদি বুঝতুম 'যে, তার দে' নীরবতা লজ্জা-অহ-তাপের নীরবতা, মৌনতার নীরবতা, তাহলে কি তেমন করে' বুঝ ফিরিয়ে চলে আসতে পারতুম? না, তা' ত পারতুম না!

পরদিন প্রভাতেই যখন ঘুমারিবাড়ি মুখে সমস্ত শুনলুম, তখনি বুঝলুম সরমার উপরে আমি কত-বড় অবিচারটা করেছি! আমার সকল রাগ, সকল অভিমান, আবেগের স্রোতে ক্রুর মত এক লহমার ভেসে গেল—একান্ত লজ্জিত হয়ে হৃদের মত আমি বসে রইলুম।

তারপর দুই হরেন যখন তার বাক্য-চাতুর্যের দ্বারা সরমার সঙ্গে আমার নির্জনে সাক্ষাৎলাভের সুযোগ ঘটরে দিলে, তখন সে বাহেত্রকণকে আর আমি অবহেলা করতে পারলুম না!

বরের দরবার কাছে সরমা প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে বসেছিল। আমার পদ-পদ শুনে সঁচকিতে সে একবার মুখ তুলে আমার দিকে ডাকিয়েই, 'আবার লজ্জিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে।

মৌরীর মত তার হৃদয়ে গিরে দাঁড়াইলুম—কিন্তু কোন কথা কইতে পারলুম না।

সরমাও মৌনমুখে মাথা নামিয়ে হাতের আঙুলে আঁচলের খুঁটটা জড়াতে লাগল।

কি বলি? কি করি? কত কথাই

হবেন হোতে লাগল, কিন্তু মুখের কাছে এসেই বুকের কীথা হারিয়ে যায় কেন ? অনেককণ পরে বললুম, “সরমা !”

সরমা আবার মুখ তুললে ! ‘সরমা’ বলে তার নাম ধরে আর-কোনদিন ডাকিনি, কিন্তু আমার মুখে এই প্রথম তার নাম শুনে সে কিছুমাত্র বিস্মিত হোল না—সে যেন আমার কাছ থেকে এমনি সম্বোধনের অস্ত্রই আগে-থাকতে প্রস্তুত ছিল !

সরমার চোখ দুটো কি কাতর, কি করুণ, কি ছলছল ! সে আরত নয়নে তার প্রাণের বে দুঃখ-তাপের ছায়া এসে পড়েছে, মুখের কথা এর চেয়ে আর বেশী কি প্রকাশ করবে ?

মিনতি করে’ বললুম, “আমি না বুকে তোমার ওপর অত্যন্ত অবিচার করেছি, আমাকে ক্ষমা করা।”

সরমা যেন খুব চেষ্টা-করে’ কথা কইলে । মুহূর্তের, সন্ধ্যায় সে বললে, “মোহনবাবু, অবিচার আপনি করেন-নি,—আমি করেছি । ক্ষমা করবার অধিকারও আমার নেই—আপনার আছে । আমি যা বলেছি, বে অস্ত্রায় করেছি, সমস্ত তুলে গিয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা, করুন ।”—বলে, সরমা উর্ধ্ব-মুখী ফুলের মত তার মুখখানি তুলে হাত-দুটো বাড় করে’ ধরলে !

আমি আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, “সরমা, এসব বিচার-অবিচারের কথা ছেড়ে দাও,—আমাদের মনের অন্ধকার বধন দূর হয়ে গেল, তখন আমরা আর কেউ ভাবের ঘরে চুরি করব না !”

এমনসময় নীচে হরেনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “ওহে মোহন, আশা করি এতক্ষণে তোমাদের পালা শেষ হয়েচে—অতএব, ববনিকা-পতনের স্বকুম হোক !”

হরেন আর মুরারিবাবু উপরে এলেন । সরমা মাথার ঘোমটা টেনে একপাশে সরে গাড়ল । হরেন বললে, “স্রোপদী-ঠাকরুণ, আমকের এই সঙ্কী-স্থাপন ব্যাপারে আমি দূতগিরি করেছি ; অতএব—”

মুরারিবাবু বললেন, “অবজ্ঞ, অবজ্ঞ ।”

সরমা মুহূর্তেরে বললে, “বাবা, শুকে বল যে, উম্মনে আগুন দেওয়া হয়েচে,—আমি এখন গিয়ে কড়া চড়িয়ে দেব !”

গেমিনি দুপুরবেলায় খেতে বসেছি, পিসিমা পরিবেশন করছেন । সংসারে এখন আমার আপন বলতে আছেন, এই পিসিমা আর একটি বোন । পিসিমার ছেলেপুলে কিছু হয়-নি, তিনি বিধবাও হয়েছেন অনেকদিন ।

পিসিমা আমার পাতে মোচার দণ্ট দিতে-দিতে বললেন, “হ্যাঁরে, ও-বাড়ীতে তুই যে হামেসাই আসা-বাওয়া করিস, ওরা কারা ?”

বুললুম পিসিমা মুরারিবাবুদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন । আমি বললুম, “পিসিমা, ওরা আমাদেরই মাত !”

—“তা শুনলুম ওদের নাকি একটি পরমাত্মস্বরী মেরে আছে ?”

—“কোথা থেকে শুনলে পিসিমা ?”

—“ভিন্নর দার মুখে ।”

—“হ্যাঁ, আছে । তার নাম সরমা ।

• সরমাকে দেখেবে ?”

—“তা, দেখতে দোষ কি?”

—“আচ্ছা, খেয়ে উঠেই সরমাকে এনে দেখাব।”

খাওয়া দাওয়া সেরে, সরমার কাছে গিয়ে বললুম, “আমার পিসিমা তোমাকে ডেকেছেন। একবার আমাদের বাড়ীতে আসবে?”

সরমা রাঙ্গি হোল। বাগানের পথ দিয়ে তাকে নিয়ে আমি পিসিমার কাছে এসুম।

পিসিমা, সরমাকে আগে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন,—তিনি সেকেনে হালুহ, একেলে আসব-কারদার কোন ধার ধারেন না।

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, “বোহন; এমনি একটি রাস্তা বো বেমিন জোর জন্তে ঘরে আনতে পারব, সেদিন আমার সাথ মিটবে।”

সরমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, “আহা মা, এই বরষেই তোমার কপাল পুড়েছে—ভগবানের এ কী অবিচার!”

সরমা মাথা হেঁট করে’ গাড়িয়ে রইল।

পিসিমা আবার বললেন, “বাহোক্ মা, খুব সাবধানে থেক! তোমার এই সোমত বরষ, এ বরষে নানান জালা! পুরুষ পরেশ-পাথর, বা করে তা শোভা পায়, কিন্তু ঘেরমাছবের সব ভাতেই—”

“আঃ পিসিমা, কি বে বল তার ঠিকানা নেই। কোথার ছোটো জীল কথা কইবে, না, বড়-সব সৃষ্টিছাড়া কথা! চল সরমা, তোমাকে রেখে আসি।”

পিসিমার কথাই সরমা কেমন জড়সড় হয়ে পড়েছিল। আমি তাঁকে ডাকবা-আই পিসিমার পায়ে সে টিপ করে’ একটি নমস্তার দিয়ে তড়াঁতড়াঁ সেখান থেকে চলে এল।

সরমাকে রেখে আমি যখন বাড়ী ফিরে এলুম, পিসিমা আবার আমার কাছে এসে ধরা দিয়ে পড়লেন।

বললেন, “হাঁয়ে মোহন, এ-সব কি শুনছি?”

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, “কি শুনছ?”

—“তোমের সরমা নাকি বামনা বাজার, তুই গান গাস, ওর সঙ্গে একলা একঘরে বসে কথা কস?”

—“কে বললে?”

—“কেন, তিমুর মা।”

—“কি-করে’ জানলে সে?”

—“তাদের বাড়ী থেকে যে আমাদের ও-বাড়ীর সবটা গাথা যায়।”

—“হ্যা, বা বললে তার কতক সত্তা কতক মিথো! কিন্তু তিমুর মার আমাদের নিয়ে এত মাথাঝাড়া কেন?”

পিসিমা গালে হাত দিয়ে বললেন, “ওমা, অবাক! তুই আইবুড়ো সোমত ছেলে আর সরমা একে সোমত, তার বিধবা! সোকের ঘোষ কি, বলবে না? আরো কত কথা রটেছে, তা কি তুই জানিল?”

আমি রেগে বললুম, “জানতে চাইনা! ফের যদি এ-সব কথা নিয়ে আমার বাড়ীতে নকেউ আসে, তাহলে দরওয়ানকে বলে

মৈব, ঝাঁককে যেন বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়!”

আমাকে রাগতে দেখে পিসিমা খতমত খেয়ে বলতে-বসতে চলে গেলেন, “একালের সব উন্টোছটি—ঘোর কলি কিনা, হবে না কেন?”

এতক্ষণে বুঝলুম, পিসিমা আজ হঠাৎ কেন দুয়ারিবাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সরমার সঙ্গে অমন অপূৰ্ণ ভাবিতা করে কথা কইলেন।

একটু চিন্তিত হলাম। বাঙ্গালী-সমাজে জনরব বড় ভয়ানক জিনিস। দুয়ারিবাড়ী-বৈরকম ভীতু, সরল স্বভাবের মানুষ,—

এ-সব কুৎসিত কথা যদি তাঁর কাণে গিয়ে ওঠে, তাহলে তিনি একেবারেই মূসড়ে পড়বেন। আর, একবার কুৎসা রটাবার, ঘোঁটা পাকাবার সুবিধা পেলে পাড়া-পড়শীরা চরম না-করে ত ছাড়বে না! এখন এর উপায় কি? পিসিমা যা বললেন, সেটা ত উপেক্ষা করবার ব্যাপার নয়! এইবেলা যদি সাবধান না হই, ছটলোকের মুখবন্ধের চেষ্টা না করি, তবে আজ যা সামান্য বলে ভাবছি, কাল তাই অসামান্য ও অসহনীয় হয়ে উঠবেই-উঠবে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বিবেকানন্দ-সঙ্গমে

(Jules Bois প্রণীত Visions de L'Inde হইতে)

সহর দূরে চলিয়া গেল। এতক্ষণে বায়ো মাইল দীর্ঘ পোতাশ্রয় (ডক্) প্রভৃতিরও শেষ হইল। জোয়ার আসিয়াছে। আবাদিগের চারিদিকেই পান্নার জল বর্ধিত হইতেছে। জোয়ারের অস্থূল স্রোত আবাদিগের পাল্লী-খানিকে মঠের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। মঠ-বাড়ীটি তত্ত্ব—সৰ্গত্ব হৃদয় চূর্ণকাম করা, উদ্ভান ও তালীকুলে বেষ্টিত। জিশুল-শীর্ষ বন্ধির-চূড়া সকলের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। অদূরে মঠ-সংলগ্ন নৌধ-শ্রেণী বেন আবাদিগকে শিষ্টভাবে আচ্ছাদন করিতেছে।

আমার সহবাত্রী মার্চিং-ব্রহ্মী গভীর হইয়া পড়িয়াছেন। নিউইয়র্ক সহরে বিবেকানন্দের

সৰ্গচিত্তহারী অপূৰ্ণ নক্তির কথা শুনিয়া তিনি আজ পর্যন্ত তাহা ভুলিতে পারেন নাই। একত্রে সাধু-সন্দর্শনে যাওয়ার প্রস্তাব করিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। এই মহিলাটির বেশ-পর্যটনে ক্রান্তি নাই। পারি-নগরীতে প্রদর্শনীর সময় তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে। তাহার পর, পুনরায় কারগো-নগরীতে সাক্ষাৎ। গতকল্য গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের সম্মুখে আবার দেখা হইল। তাঁহার স্তব্ধ স্বরধার বৃষ্টি, অপাপবিদ্ধ মুখচ্ছবি ও সেই দ্রব্যাকাক্সা অতৃপ্ত ভাব সহজেই তাঁহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, “সেখনি, পৃথিবীটা কত ক্ষুত্র!” বাস্তবিক ধরিতে গেলে, আমাদের এই বিপুল

পৃথিবী একটা বিরাট চতুর্পদ বাড়। এখানে ভ্রমণশীল পশ্চিকবৃত্ত অল্পপ্রবে গমনকালীন সর্বদাই পরম্পরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকে।

বিবেকানন্দ অলিন্দে গাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বিশাল-আরত নেত্রদ্বয় মূখ-মণ্ডলের যেন অধিকাংশই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে ভ্রাম্যন্ত ব্যক্তিটি প্রাচীন আৰ্য্যগণের সেই ছয় সহস্র বৎসরের পুরাতন বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আমি ভূমণ্ডলের যে কোণটিতে বাস করি সেখান হইতে ইহার অনুস্থান কতই না দূরে অবস্থিত! ইনি তিব্ব-ভাষাভাষী, তিব্ব দেবের উপাসক, তথাপি আমি ইহাকেই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে বরণ করিয়াছিলাম। পারি-নগরীতে অবস্থান-কালে তিনি কয়েকসপ্তাহ আমার গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। আমরা একত্রে কনকান্তি-নোপল, গ্রীস ও মিসর বেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম! তিনি তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রতিভা ও বিপুল ভাবোন্মাদনার সাহায্যে আমার মানসকে ভারতবর্ষের যে চিত্র প্রতিকলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সে বেশকি আমার স্বপ্নের পিতৃভূমি-বোধে মেহের সহিত দ্বন্দ্বের স্থান দিয়াছিল। আমার মনের মাধুরী মিলাইয়া আমি যে আদর্শটি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহা এই কল্পনার নন্দন-কাননেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমরা উভয়ে পরলোক ও অদৃষ্টবাদের কত না কথাই আলোচনা করিয়াছি! যে মহাপ্রাণ টলটল এখন মহাপথের আশীষযাত্রী,

তাঁহার দ্বার এই হিন্দুটিরও বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজের চিন্তা ও বিশ্বাস-অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি ভববৃত্তের মত দেশে দেশে ঘুরিয়াছেন, সংসারে মানবের বাহ্য গর্ব ও আত্মবোধ বন্ধ, 'সে সমস্তই তাগ করিয়াছেন; যেহ-ভালবাসা, আত্মীয়-বন্ধন,— এমন-কি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরূপে যশোলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও চিরন্তরে বিসর্জন দিয়াছেন। ইনি এখন সর্বভ্যাগী সন্ন্যাসী! ইমারনের ভাষায় ইহার জীবনের ইতিহাসকেও representative বা আদর্শ-জ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। তরুণবয়সে ইহার একজন সাধুর সহিত পরিচয় হয়—তিনি 'পরমহংস' 'মহাত্মা'। ইনি অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ—বিজ্ঞানের বড় ধার ধারিতেন না; কিন্তু তপশ্চর্যা ও কঠোর সন্ন্যাসব্রতের বিশেষ শক্তিমাত্র ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ হিন্দুধর্মের দুইটি প্রধান দেবতা ও বীরপুরুষের নামানুসারে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত—মনে করিত, একাধারে তিনি এই দুই দেবতারই 'অবতার'। যে সংস্কৃত ভাষা এখনও ভারতে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত তাহাতে রামকৃষ্ণের অধিকার ছিল না। তিনি কখনও বিদেশে ভ্রমণ করেন নাই। কলিকাতার 'উত্তরে একটি কালিকা-মন্দিরের উদ্ভানে তাঁহার অনীর্থ জীবন-স্রোত যুগ্ধভাবেরই প্রবাহিত হইয়াছিল। ভাবাবেশ বন্ধন তাঁহাকে আর ধানের অতল-স্পর্শ গভীরতাও রুদ্ধ রাখিতে পারিত না সেই সময়ে মুক্তিকামী জনগণের প্রতি তাঁহার

* হু. বোমার পুস্তকখানি ১৯০৩খ; অল্পে প্রকাশিত হয়।

কথামৃত অজস্রধারে বর্ষিত হইত। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বাণকাল হইতেই তাঁহার উপদেশাবলী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। বাণকের স্বদেশনিষ্ঠ রূপযশসি তখন দেশের দুঃখ ও নিরাশায় কতনা বেদনার ভরিয়া উঠিত! তিনি ভাবিতেন, এই 'নিসঙ্গ সন্ন্যাসীর উপদেশ অবলম্বন করিয়া তিনি জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে ত্রুটি হইবেন। গুরু তাঁহার বিবেকানন্দ নামকরণ করিয়াছিলেন এবং সংস্কারকের উপযোগী অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁহাকে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তরুণ শিষ্যটির মানবান্ধার পরমাণ্ধায় বিলীনতা সত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি বেশ-ভূষা ছাড়িয়া, অঙ্গে ভঙ্গ লেপন করিয়া পরি-ব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের নানাহানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনও রাজার প্রাসাদে আহার করেন, কখনও দীনহীন কৃষকের গর্নকুটারে আশ্রয় লন—কখনও বা বারান্দার কখনও বা বৃক্ষতলে রাজিবাগন করেন। গুরুদেবের তিরোভাবে শোকাকুল বিবেকানন্দ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে এইরূপ অধীর ভাবেই দিনপাত করিতে লাগিলেন; যাহাতে প্রত্যাহ্বিষ্ট প্রচারকার্য্য সকল ও চিরস্বপ্নীয় হয়, সে-সম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কৃতসম্বল হইলেন।

ইহা বিশ্ব-মানবের ধর্ম্ম—পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। ইহার কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গুষ্ঠান-পদ্ধতি নাই—সকল সেবতা, সকল ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা মহাপুরুষগণের প্রতিই এ ধর্ম্মের সমান ভক্তি ও অঙ্গুরাগ। পর্যটনরত ভিক্ষো-পঞ্জাবী মধ্যাসীর পবিত্র জীবন যাপন করিয়া

আধ্যাত্মিক শক্তি বলবতী হইয়া উঠিলে বিবেকানন্দ মার্কিন দেশে যাত্রা করেন। সেখানে সভার পরিষদে তাঁহার অতীতপূর্ব্ব ঘোষালাভ ঘটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাঁহার বাগ্মণী-মূলত ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যটুকুও সেইখানে নষ্ট হইয়া যায়। বংশগত বক্রতের দোষে ও বহুসূত্রযোগে তাঁহাকে জর্জরিত করিয়া তুলে। যাহা হউক স্ব্থের কথা এই যে, তাঁহার বিদেশ-গমন নিফল হয় নাই। তিনি প্রত্যাগমন-কালে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, মঠ-প্রতিষ্ঠা ও গুরু-ভাইদের একত্র করিয়া সম্ম-স্থাপনার জন্য সেই অর্থই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহস্থারে উপস্থিত হইতেই সর্ব্বপ্রথমে এই সম্বন্ধেই কথা-বার্তা হইল।

বিবেকানন্দ বলিলেন, “বন্ধু, আমি মুক্তি পাইয়াছি। গুরুতার শৃঙ্খলের জায় কাঞ্চনরাশি বহন করিতেছিলাম, সমস্ত উৎসর্গ করিয়া—এখন যেন নূতন করিয়া মুক্তি লাভ করিলাম। আমি এখন জগতের দরিদ্রতম দেশের সর্বাধিকারী দরিদ্র ব্যক্তি। কিন্তু তাহাতে কি? আমার রানকরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখানে আমার গুরুভাই ও শিষ্যগণের এখন মাথা ওজ্জ্বল্য স্থান হইয়াছে।” তিনি আমার সঙ্গিনী মার্কিন-বাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া কতই নব্রতার সহিত জোড়করে—মস্তক নত করিয়া অভিবাগন করিলেন। আমাদের প্রতীচা দেশে এ ভদ্রীটি কেবল প্রার্থনার সময়েই শুধু যায়; কিন্তু হিন্দু-শিষ্য জীবগণের সহ-ভদ্রীতেই ধর্ম্মশিষ্য। তাঁহাদের ভক্তিরিগের সম্মুখে এইরূপ পারিকল্পিত হইয়া থাকেন।

বিবেকানন্দ আমাদিগকে, অপর সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন, 'ইংল্যান্ডই আমার ভ্রাতা ও সম্মানস্থানীয়।'

যোহন উক্সোশবার্ড তরুণ তাপসগণ আমাদিগের প্রতি সহ্যে ক্রিয়্যা চাহিলেন। তাঁহাদিগের সরল অপাঙ্গের অকণ্ঠ দৃষ্টি যেখান সহজেই বুঝা গেল যে, জীবনের কর্মশালায় তাঁহারা এখনও শিক্ষাবীণা বাজ। বৃদ্ধ-মঠবাদিগণ কিরূপের অল্প বেবাদি-সংক্রান্ত গবেষণা হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগের শৈব চিত্তে চিকিত্ত লগাটদেশ আমাদিগের উদ্দেশ্যে অবনত করিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ, ব্রূ, এমন-কি অস্পৃষ্ট চণ্ডাল পর্য্যন্ত একত্রে সম্মিলিত। এই ধর্মোপদেশটাই নিকট ভ্রাতৃত্বের কোনও স্থান নাই—কারণ ইখর সকল মানবেই সমভাবে বিরাটমান। একজন শিষ্য তামাক খাইতেছিল। স্বামীজি তাঁহার হাত হইতে গড়গড়াটি তুলিয়া লইয়া—তাহাতে একবার টান দিয়া ফিরাইয়া উহা প্রতারণা দিলেন। গোলাপী গন্ধে চারিদিক ভরপুর হইয়া উঠিল। বিবেকানন্দ আমাদিগের হাতে করেকটি পদ্মকুল দিয়া বলিলেন, "চলুন, ছাদের উপর যাওয়া যাক। আমার বন্ধুরা এখন "টিফিন" প্রস্তুত করিতে বাইতেছেন।" ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে বিপ্রাহরিক আহার এখন "টিফিন" নামেই অভিহিত।

উপর হইতে কি-এক অপরূপ প্রাপস্পর্শী দৃষ্ট আমাদেবের নয়ন-পথে পতিত হইল! প্রচণ্ড সৌরকরোত্তীর্ণিত, দৃষ্ট গগন-তলে একি বিমোহন চিরনবীন পল্লী-পোতা!

সরসীগুলি আরসির ভাষাই স্বচ্ছ! বেন-কোনেএ পলায়ন-পর্য্য দেববাণী ক্ষেত্ৰলি তুলে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে কানন-শ্রেণী নম্বল-স্বকোমল সুদীর্ঘ রোনাবলীর স্তর প্রতীক্ষমান হইতেছে। গঙ্গার সমুদ্রতীরে প্রণমীর বাহর স্তর বহুধার কটিমেশ বেটন করিয়া রহিয়াছে। পর পারে আর-একটি উচ্চ মন্দির-চূড়া বেধিতে পাইতেছি; উহার সন্নিকটে একটি বিশাল-বিতত-শাখা বটবৃক্ষ। এই প্রাচীন বৃক্ষের শাখাদি হইতে 'শিকড়' নামিয়া—মুক্তিকাংসুপ্ত হইয়া ক্রমশঃ এক-একটি বিভিন্ন বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামীজি কহিলেন, "ওই ছায়াশীতল বৃক্ষতলে আমার প্রভু রামকৃষ্ণদেব প্রথমে সমাধিময় হইয়া পরমাত্মার বিশ্রী হইয়াছিলেন। গোতম বৃক্ষের সাধনার স্থান বৃক্ষ-গঙ্গার বোধিক্রম বোধগণের নিকট বেক্রপ "পবিত্র, ওই বৃক্ষটিও আমাদের চক্ষে তাহা অপেক্ষা কম পবিত্র নহে।"

আধঘণ্টা পরে—তাঁহার ক্ষুদ্র প্রকোটে বিবেকানন্দ আমাদিগকে বহুতে 'টিফিন' আনিয়া দিলেন। ডিম, টাটকা দ্রুদ, সুগন্ধি অন্ন * ও কতকগুলি আত্র রহিয়াছে 'বেলাদ।' এই কলগুলি আমাদিগের নিকট 'পীচ' (Peach) অপেক্ষাও সুবাহু বলিয়া বোধ হইল। মঠে আদিবের ব্যবহার নাই; সেজন্য আদিব-সম্পর্কীয় খাদ্যাদি আমাদিগকে দিতে পারিলেন না বলিয়া স্বামীজি ক্রটি স্বীকার করিলেন। তাঁহার এই কক্ষটি বড় অদ্বুত রকমের।

* কয়লা "grain" শব্দের অর্থ 'berry', বা 'ফ্রু ফ্রু কলও হইতে পারে।

হিন্দু সন্ন্যাসীর আড়ম্বরহীন নগ্নতার সহিত যেন 'পাশ্চাত্য দার্শনিকের ব্যবহারিক গৃহ-সজ্জা' বিচিত্র ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। বোহল আরাধ্য-কেদারা—বহুবিধ গ্রন্থপূর্ণ গ্রন্থাগার সবই রহিয়াছে দেখিতেছি। ইমার্দন ও স্পেন্সার কীটনষ্টে দেশীয় পুঁত্রকাদির সহিত এক পংক্তিতেই ঠাসাঠাসিভাবে স্থান পাইয়াছে একটি নব্রহ্মভাব শিষ্য হরিংপত্রে মণ্ডিত কয়েকটি ('বোনো-করা') পান আমাদিগকে আনিয়া দিল। শুনিলাম, পর্ণপত্রগুলি সমস্তই মঠের উত্তান হইতে সংগৃহীত। আমি বিলি লইয়া চিবাইতে লাগিলাম। কুলের গন্ধে, তাত্রকূটের আশ্রমে ও বিলির রসে আমার মূখ পরিপূর্ণ হইল—নব্রহ্মপতি আরক্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "ভারতবর্ষের সর্বত্রই লোকে মাসক ভ্রমাদি ধূমপান বা চর্কণ করিয়া ব্যবহার করে। আমাদিগের নিকট জীবন শুধুই স্বপ্নবৎ। আপনারা বাহ্যকে স্বপ্ন বলিয়া থাকেন আমরা তাহাই বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করি। দুটিগ্রাঙ্ক বা স্পর্শ-যোগে বলিয়া আপনারা বাহ্য সত্য, প্রকৃত ও সত্যাসংস্কৃত বলিয়া মনে করেন, আমাদিগের নিকট তাহা মাত্র-প্রপঞ্চ মাত্র—যুগভুক্তিকার ভ্রম অলৌকিক। এ সকলই সর্লক্ষণ পরিবর্তন-শীল, সর্লক্ষণই ধ্বংস-প্রবণ। ইহাতে এমন কোনও স্থল নাই বাহ্যতে আসক্তি জন্মাইতে পারে বা বাহ্যর অভ্য এই সকল মারিক দৃষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন ঘটে। নগর-জননধ, বিলাস-বাসন, ঐশ্বর্য্য-গৌরব-সভ্যতা, জাতীর উন্নতি ও অক্ষ-বিজ্ঞানের অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি আমাদের কিছুই

অবিদিত নাই। অল্পের শতাব্দীর পরীক্ষার কলে 'আমরা এখন ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; এ সকল শুধু বাণকের জৌড়নক—বাণকের অভ্যই নির্মিত। আপনারা যে কঠোর স্বপ্নমোহে এখনও আবিষ্ট রহিয়াছেন, আমরা তাহা বর্জন করিয়া পূর্ব্বাচ্ছেই আগরিত হইয়াছি। আমরা খাস রোধ করিয়া কোনও স্মৃৎসং কৃষ্ণের তলায় বলিয়া সেই পুরাকালীন 'অধি'র প্রতি অর্দ্ধনিম্নলিখিত নেত্র চাহিয়া থাকি। যিনি ভূমা—যিনি অনন্ত—যিনি স্বয়ং জগৎচর্য্যের ব্যাপ্ত, তিনিই তাঁহার অপক্লপ দ্বারগুলি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়া যেন—আমরা সেই পথ দিয়া অস্বর্গ্য্যগতের সেই একমাত্র সভ্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকি। আপনারা নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন, এ দাবৎ পূর্ব্ব অরমংখ্যক ইউরোপীয়ই যোগসাধনার এই সকল রহস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

আমরা প্রকোষ্ঠের জানালায় দিকে ফুঁকিয়া দেখিলাম। কোথায় একটা ঘড়ি টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল। নীচে—বৃক্ষবাটিকার একটি উদ্ভবর তরুতলে সন্ন্যাসীরা বৃক্ষাকারে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তালে তালে, যেন ছন্দের মাত্রার মাত্রায় তাঁহারা নিজেদের নির ও পৃষ্ঠদেশে ঢলিয়াইতে ছিলেন। যে সন্ন্যাসীটি একটু পূর্ব্বেই আমাদিগের সহচর ছিলেন, তিনিও বেগিতেছি এক অক্ষতপূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম-স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন; শুনিতে আমাদের গির্জা-ঘরের plain-chant গীতের কথা মনে পড়ে; তবে, তার চেয়েও এই স্তোত্র যেন

আরও একটু কর্তব্য—আরও আনন্দ-পরিপূর্ণ। ভিতর দিয়া পবিত্র ত্রোজ-গীতের প্রতিধ্বনি মধ্যস্থলে অগ্নিহুও জ্বলিতেছে। অগ্নির একপার্শ্বে পুস্তকাগাভারে সজ্জিত শিবের জিপুল শ্রোষিত; যে অগ্নিশিখার দ্বৈততা স্বয়ং বিরাটমান, সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাহারই প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছেন। এই অগ্নিগর্ভে আত্মার সংগ্রহন শক্তিপ্রভাবে কোনও অপূর্ণ স্বপ্নে অভিভূত এই সকল সেক্সির ঘোষণা হইতে কি জানি কি এক বিপুল শক্তি উচ্চে উথিত হইতে ছিল! আমাদেরই উদ্ভূত কর্ম-প্রবণতার কুলনার এ শক্তি বেন আরও তরাবহ! মনে হইতেছিল, এই ভাষণ দৈবধোর

ভিতর দিয়া পবিত্র ত্রোজ-গীতের প্রতিধ্বনি বেন পক্ষ বিস্তার করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে! সুবর্ণপ্রভ মধু-মক্ষিকাগণ স্বর্গাকিরণে এই সকল বোগানন্দে মগ্ন সাধুর মস্তকের উপর নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে। এদিকে পবিত্র গোশালায় ভিতর দ্বারপালিত গাভীগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া যে অপক্লপ ধর্মাহুতানে মানব বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিনা-মৃত্যুতে মোক্ষলাভ করে—সেই অসাধারণ আরাধনা-পদ্ধতির সহিত বেন নিম্নোক্ত সাহচর্য্য জ্ঞাপন করিতেছিল!

ঐওরুদাস সরকার।

আমাদের নিজস্ব সম্পদ কোথায়

আমাদের সম্মুখে এখন বহুবিধ সমস্যা! রাজনীতি, শিকানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, কর্মনীতি,—যেদিকেই তাকাই সেই দিকেই আমাদের জাতীয় জীবনে গোড়ার গলদ দেখি। সংসারটা আগাগোড়া পরিবর্তনশীল; জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে বিশ্বসংসার প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আবৃত্তিত হইতেছে। আমাদের জাতীয় জীবন-ধারাও সর্বকাল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবে, উহাও কতক জ্ঞাতসারে, এবং কতক-বা অজ্ঞাতসারে হইবে।

কিন্তু সম্মুখে এই এক বিষম সমস্যা উপস্থিত যে, আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব? আমাদের যদি নিজস্ব কিছু থাকিত, তবে এমন ভাবে আমাদের

এ ভাবনা ভাবিতে হইত না। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা নিজস্ব সম্পদ হারাইয়া পরের সম্পদেই একরূপ প্রাণ-রক্ষা করিয়া আসিতেছি। তারপর হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, পার্শি, সকলে মিলিয়া ভারতবর্ষে এমন বিভিন্নতার সৃজন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষের নিজস্ব বলিতে সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহারা এতদোকেই আপন আপন মাহাত্ম্য জাহির করিতেছেন। এবং ভারতীয় সভ্যতাকে ইহারা এতদোকেই আপন আপন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে দেখিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষ জাতীয়তার ক্ষেত্রে কোনও দিক দিয়া আপনাতঃ স্বার্থ মহিমা প্রকাশ করিতে পারে নাই।

তাই ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন সভ্যতা জাতীয়-
ত্ব-বিশেষক হইতে বঞ্চিত এবং ইহা হই
জন্ত ভারতীয় সভ্যতা আজ নিতান্ত ধ্বংস
ও পত্ন।

অনেকে প্রচার করিতেছেন, হিন্দু-
সভ্যতার আড়ম্বরহীন সরলতার দিকেই
আমাদের কিরিতা যাওয়া কর্তব্য। এই যে
আমরা আপন তুলিয়া বিশেষীর অধিকরণে জীবন
যাপন করিতেছি ইহাতে আমাদের জাতীয়
জীবন ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।
এরন-কি, গত প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি-
মহাশয় পূর্বকালের সেই প্রাচীন সহজ-সরল
জীবনযাপনের জন্ত অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “তখন
লোকের প্রাণে আনন্দ ছিল, পরম্পরের
সহায়ত্ব ছিল, দেবতার ভক্তি ছিল,
অধিতার সেবা দান ধ্যান ছিল। লোক বিনা
আড়ম্বরে তখনকার দিনে শান্তিময় জীবন
যাপন করিত।”

এ খবর কতদিন আগেকার, তাহা নিরূপণ
করা যায় না। কবে হইতে এ যেনের
এই শান্তির জীবন যে অস্তিত্ব হইয়াছে
তাহাও সাব্যস্ত করা সহজ নহে। আজ
আমরা তাহার জন্ত যে দুঃখ করিয়া থাকি,
সে দুঃখ অনেকটা কালিনিক। রমিচন্দ্র বা জন্ত
কোন মহাপ্রাণ রাজার শাসনে এদেশের
জনসাধারণ হস্ত তেমন শান্তির জীবন
যাপন করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষী রাজা বা
কোন চরিত্র রাজার রাজ্যশাসনে দেশের
সাধারণের অবস্থা তেমন শান্তিময় ছিল কিনা,
সেবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
তারপর, আর-একটা কথা মনে আগে,

বাত্তবিকই লোকে বহি মত শান্ত জীবনযাপন
করিত—তাহা হইলে তখনকার দিনের সেই
নিষ্কল-বিতার মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের
জ্ঞান-বিজ্ঞান অমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে
পারিত কি? আপন আপন পন্নীর ক্ষুদ্র
গতীর ভিতরে “আপনার ভ্রামল নির্মল
কোমল উত্তরী” বিছাইয়া, সমগ্র দেশব্যাপী
জাতীয়তার ঘোড়ে বাত-প্রতিঘাত সহ না
করিয়া যে জীবন-যাপনের স্বপ্ন আমরা দেখি,
তাহা ইংরেজ-আমলেই সম্ভব; তাহা অসম্ভব
ও শক্তিহীনতার পরিচয় দেয় মাত্র। তাহার
ভিতরে ক্ষুদ্রত্বের আনন্দ থাকিতে পারে,
কিন্তু সমগ্র বিশ্বমায়বের জীবন-ঘোড়ের
সঙ্গে ঐ শান্তি-পূর্ণ পন্নী-জীবনের মিলন-
সাধন হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের
জীবন ভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়াছে।
অনেকেই এখন জিজ্ঞাসা করিবে, বর্তমান
সভ্যতার থাকিরা এই যে আমরা আবার
সেই অস্তিত্বের জীবনের জন্ত লাগারিত
হইয়াছি, তাহা কি বাস্তবিকই আমাদের
প্রাণের বাসনা, এবং তাহা কি কোনরকমে
সম্ভবপর?

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের নিজস্ব যে
কোনটি তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা শক্ত ব্যাপার।
এই বেড়শত বৎসরব্যাপী ইংরেজ-রাজত্ব
আমাদের জাতীয় জীবনের কোনও অখ্যায়
ভাল করিয়া পুলিশে ঘেঁষা হয় নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী
যে সকল শক্তির সংঘর্ষ আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিত
সহ করিতেছি, তাহাতে আমাদের আপন
শক্তি কোনদিকেই বিকলিত হইয়া উঠে
নাই? এবং আমরা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক
সামাজিক ইত্যাদি কতকগুলি সংস্কারকে

অবলম্বন করিলেও, সে সকল চেষ্টা মোটের উপর ব্যর্থতাতেই পরিণত হইয়াছে। পাক্ষাত্য রাজনীতির প্রভাবই সকলের উপরে জয়যুক্ত হইয়াছে, এবং আমাদের যে জাতীয় জীবন, তাহার প্রতি অঙ্গে পাক্ষাত্য সভ্যতার আলোক আলিঙ্গা পড়িয়াছে। হইবারই কথা; কেননা, আমরা নিম্নস্থ হইতে বঞ্চিত, এবং দেশের শাসনভার পাক্ষাত্যের হস্তে অর্পিত।

অবশ্য, এ-কথা স্বীকার করি যে, আমরা যদি আমাদের স্বভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়া জীবনের আরম্ভ হইতেই চলিতে পারিতাম, এবং বাহিরের কোন জীবন্ত প্রতিঘাত প্রথম হইতেই যদি আমাদের সহজ বৃদ্ধির অন্তরায় না হইত, তাহা হইলে আমরা আজ স্বভাবের সঙ্গে নিশ্চয়ই একটি অভিনব জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতাম। কিন্তু আধিকার বিনে আমাদের পক্ষে আর ইহা সম্ভব নহে।

ধরুন, আমাদের সমাজের কথা। কে আজ আমাদের সমাজের প্রকৃতিকে সত্যকরূপে ভারতীয় সমাজ বা পুরাতন হিন্দুসমাজের ছাঁচে কেলিয়া একটি নূতন ও আদর্শ হিন্দু সমাজ গঠন করিতে পারে? একসময় ছিল, যখন এ দেশে হিন্দুর প্রভাব ছিল সর্বোপরি প্রবল। অস্ত্র কোন ধর্মসম্প্রদায় তখন আপনার প্রভাব জাহির করিষা হিন্দুসমাজের উপরে ছায়াপাত করিতে পারিত না। তখন হিন্দুই রাজা, এবং হিন্দুই ছিল প্রজা। যদিও পাশ্চাত্য অনাধা-সমাজের প্রভাব হইতে হিন্দুসমাজ তখন

সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলনা, তবু এমন কথা অনাধাসে বলা যায় যে, হিন্দু তখন এক প্রকার নির্যাতনে আপনার সমাজের সীমানার বসিয়া উঠার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারিত। রাজা, ধর্ম, কৃষি ও বাণিজ্যকে আপনার প্রয়োজনানুসারে হিন্দু তখন বেশ একটু সূক্ষ্মতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। মানুষের জীবনটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা, ব্রহ্মচর্যা ও গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ প্রভৃতি আচারের মধ্য দিয়া হিন্দু তখন আপনাকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছিল। যতখানি প্রয়োজন ছিল, ততখানি অর্জন করিতে তাহারা কোনও ক্রটি করে নাই। অর্থাৎ, তখন এমন কোনও শক্তির সংঘর্ষ তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই, বাহা তাহাদের স্বাভাব্যকে লুপ্ত করিতে পারিত।

এখন আমাদের বিচার্য বিষয়, অতীতের সেই সমাজকে আধিকার বিনে আমরা আবার নূতন করিয়া গড়িতে পারিব কিনা, এবং আধিকার বিনে তাহাই আমাদের ঈশিত বস্তু কিনা?

তখনকার দিনে যে সকল অহঙ্কৃত্ত অবস্থার মধ্যে হিন্দুসমাজের বিশেষত্ব প্রস্তুত হইয়াছিল, আধিকার বিনে সে অবস্থা আর বিস্তারিত নাই। এখন দেশের রাজনীতি ও কর্মনীতির ভার শরের হস্তে। গদ্য শোনা যায়, তখনকার রাজস্ববর্গ ব্রাহ্মণকে এমন ভক্তি করিতেন যে, অকাতরে সকল রাজ্য-সম্পদ এককথায় বিসর্জন দিয়া বনবাসী হইতে পারিতেন। আজ কিন্তু ব্রাহ্মণের সে মহাআজ্ঞা আর নাই। রাজা আপনার

পার্শ্বে সাজানো করে এবং এ-দেশীরাগের জীবন-যাত্রা আপনার প্রয়োজনানুসারেই নিয়ন্ত্রিত করে। বর্ণাশ্রমে কৰ্মের যে বিভিন্নতা ছিল, সে বিভিন্নতা বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। কৰ্মজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটয়াছে। বাস্তবিকই সাগর-প্রমাণ অতীত মহিমার মালিক হইয়া আমরা আজ কোন ক্ষুদ্র গভীর ভিতরে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহি। আমরাও এখন চাহিতেছি যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আমাদের বেশকিছু আমরা এক শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। সমগ্র পৃথিবী আজ আমাদের দৃশ্য-ভ্রমারে আনিয়া আঘাত করিতেছে, স্তম্ভাং সকলের সহিত বেনাপাওনা আজ বহি আমরা বুঝিয়া না লই, তবে আমাদের একেবারেই ঠকিতে হইবে।

আজ আমাদের ভিতরে যে বৃহৎভাবে ছাড়াপাত হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রত্বের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহে না। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ত আমাদের এমন স্বভাব ছিল না। অল্প খায়-করা দিব্যের অধিকারী হইয়া আমরা আপন প্রকৃতির বিকাশসাধন করিতে পারিব না, এবং কেহ কখনও তাহা পারেও না। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রই যে ধার-করা সম্পত্তি, এমন ধারণাও ব্রহ্ম-মূলক। কে জানে, এই যে পরিবর্তনের হাওয়া আনিয়াছে, ইহাই এদেশের সঙ্গে বর্ধা উপযোগী এবং স্বাভাবিক কিনা!

বর্তমান একটা জাতি আপনার নিজস্ব সম্বল পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে না পারে, ততদিন পৃথিবীর চক্রে সে বরপীর হইতে

পারে না। ইংরেজ, কন্নাদী, জর্জ ও মার্কিন প্রভৃতি জাতির প্রত্যেকেই কতকগুলি করিয়া নিজস্ব সম্পত্তি আছে। কিন্তু আমাদের যে স্বাভাব্য, তাহার স্বরূপ কেহ ঠাং করিয়াছে কি? তারতবর্ষ এক বিশাল দেশ; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান, সকলে মিলিয়া এখানে পরম্পরবিরোধী এক Chaos জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই আপন আপন পথ করিতে একে অন্যকে তফাতে সরাইয়া দিতেছে। আবার, ইহাদের মধ্যেই শত শত অংশ তত্ত্বাংশ এমন ভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে যে, তারতবাসী বলিয়া একটি সমগ্র জাতির কল্পনা করা একপ্রকার ভ্রমাত্মক ব্যাপার। এখানকার নানা জাতির সামাজিক শাখাশাখাগুলির আবার ক্ষুদ্র বিবরের প্রতি অত্যধিক এবং অস্বাভাবিক টান থাকতে, জাতীয় জীবনের একত্বের শব্দে তাহা বিষম বাধা-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষুদ্রত্বের বিশাল মোহ, পাহাড়-প্রমাণ ধর্ম্মাভিমান, আমাদের একে সঙ্কীর্ণতার এককোণে ঠেসিয়া লইয়া ধাইতেছে। এই মোহ ও অভিমানে একটুখানি আঘাত লাগিলেই সমগ্র বৃথা আন্দোলন করে, অথচ এ দেশের বুকের উপর দিয়া দানবের নর্তন চলিলেও কেহ ক্রোধেণ করে না। ইহাতেই বোঝা যায়, এদেশে মানুষের মনুষ্যত্বের অভাব আছে; সমাজের ভিত্তি এ দেশের সোকেয় যে নিষ্ঠা-প্রবৃত্তি, তাহা শক্তির বিস্তৃতি মাত্র। সামাজিক-উন্নতির উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। সমাজ বর্তমান অসংস্কৃত থাকিবে,

ততদিন জাতির উন্নতি হইবে না। হিন্দু-মুসলমান যেই হউক না কেন, যে সমাজ আত্মপীড়ন করে, সে সমাজ জাতীয় জীবনের ধ্বংসসাধন করে! পূর্বে আমি হু* একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে ক্ষেত্রে এই আত্মহত্যার লীলা তত প্রবল নহে, দেশের গৌরব-পন্নগুলি সেই খানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহাদুরের লইয়া আজ আমরা গৌরব করি, তাহারা এই আত্মহত্যার লীলাক্ষেত্রে হইতে বঙ্গবর তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাতি ব্যক্তির সমষ্টি, কিন্তু সমাজ এই ব্যক্তির স্রষ্টা। আমরা যে সমাজ-সংস্কারের প্রতি এত অমনোযোগী, তাহার কারণ জাতির প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগের অভাব। অথচ বাহাদুরের লইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাহারা সকলেই স্বায়ত্ব-শাসন চাহিতেছে, এবং পৃথিবীতে একটি বিশেষ জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য অন্ততঃ মৌখিক অগ্রহাষিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে সমাজের সংস্কার করিতে আমরা সকলেই আগ্রহবান। কিন্তু সংস্কারের দ্বারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হওয়া কর্তব্য, তাহাও আমাদের ভাবিতে হইবে। বাহাদুর সমাজের কর্তৃদ্বার—তাহাদের দৃষ্টি সমাজের দিকে পড়িলে, তাহারা সমস্ত পুঁটিনাটি ধরিয়া সকল বিষয় আমাদের চেয়ে ভালরূপে বিচার করিতে পারেন। তবে, যে বর্ণাশ্রম বর্ণধর্মকে ভারত-সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম উপাদান বলিয়া আমরা স্বীকার করি, সেই বর্ণাশ্রম ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে জাতি গঠন করা হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের হয় না।

বৈদিক-যুগ বা তৎপূর্ব কালের সমাজের-যে চিত্র আমরা পাইয়া থাকি, আমাদের সমাজ-ব্রাহ্ম আবার সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

যখন এক পরিবারের কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের, কোনও ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের, কোনও ব্যক্তি বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত, যখন জন্মের খাতিরে পার্থক্য ছিলনা, ব্যবসায়ের খাতিরে পার্থক্য ছিল, আমাদের আবার সেই দিনে ফিরিয়া যাওয়া দরকার। এই শতাব্দির বিশাল ভারত-বর্ষে এক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে হইলে, সামাজিক ভিন্নতা ভাঙিয়া না দিলে, জাতিগঠনের আশা আকাশকুসুম বই আর কিছুই নহে। পরীতে পরীতে ঘুরিয়া ঘরে ঘরে দলাদলি, ঘরে ঘরে বিবাদ, পরস্পরের ঈর্ষা, লাঞ্ছনা, শত প্রকার ছাং-কটে বাহাদুর লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা কি মনে করেন, পরীসমাজের লোক কোন ব্রহ্ম কর্ণে পরস্পরকে তাই বলিয়া আশ্বিনন করিতে পারে? সমাজগত পার্থক্য তাহাদের ব্যক্তিব্যকে এমনভাবে বিকারপ্রসূত করিয়াছে যে, তাহারা যুগা সংকীর্ণতার পাকে একেবারে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া রহিয়াছে। এই যে প্রতিনিরত আমরা শুনিয়া থাকি, 'অমুক ব্যক্তি 'একঘরে' হইয়াছে, ইহার মানে কি? ঐ ব্যক্তিকে সমাজ ত্যাগ করিয়াছে; ঘোষা, নাপিত, পুণ্ড্রোদিত পণ্ডিত তাহার বাড়ী ঘাইবে না। এবং কে-কেহ তাহার সংশ্রবে ঘাইবে, সেও নওভোগ্য করিবে। হরত তাহার অপরাধ,

সে কুলীনের ঘরে মেয়ের বিবাহ দেয় নাই, অথল কোন বিলাতকেরতা আখ্যায়কে ঘরে বসিতে দিরাছে! পল্লী-সমাজে ব্রহ্ম এই সকল শাসন-অশুশাসন গাইরাই উদ্ভাস্ত; কোথায় বা দেশ, কেই বা জাতি, এ সব ভাবনা তাহার মাথাই নাই। "পল্লীকে দেশের কথা ভাবাইতে হইলে যে ব্যাধি তাহাকে পাইয়া বসিরাছে, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করা ভিন্ন আর কি পন্থা থাকিতে পারে?

অবশ্য, ইহা একপ্রকার অসম্ভব যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কেহ থাকিবে না, সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া থাকিবে। তেমন মিছা স্বপ্নের ঘোরে কাহাকেও আচ্ছন্ন হইতে বলি না। হিন্দুর নিজস্ব হিন্দুই যদি বজায় রাখে, মুসলমান এবং খৃষ্টানও যদি তাহাদের নিজস্ব আপনাতাই বজায় রাখে তাহা হইলেই এখানে জাতীয়তার স্বপ্ন সম্ভব হয়। বিভিন্নতার ভিতর দিয়াও মিলনের ক্ষেত্রে পৌছান যায়, যদি প্রকৃতি অবিকৃত থাকে।

সমাজের ভিতরে যে আত্মীয়-কুটুম্বিতা হয়, তাহার অর্থ কোনও সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া। যুরোপে এই ক্ষেত্রের পরিসর অতিবিস্তৃত। যুরোপের বিভিন্ন দেশে সম্প্রদায়গত পার্থক্য ভারতের সত বিদ্যমান নহে; সেখানে ভাষা-গত যে পার্থক্য, তাহাও ধর্ম করিবার অস্ত্র যুরোপীয়েরা সর্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশের এই আত্মীয়-কুটুম্বিতার পরিসর যুরোপের তুলনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এবং এই ক্ষেত্রে সমাজ যে ক্রমশ রসাতলের পথ অবলম্বন

করিয়াছে, আমরা এখন তাহাই আলোচনা করিব। বর্তমানে আমাদের ভিতরে বর্ণা-ভ্রমের কর্ণ-গত ব্যবধান আর লক্ষ্য করা যায় না। সকলেই এখন সকল ব্যবসায় করিতেছে, সকলেই এক শিক্ষার শিক্ষিত হইতেছে, এক জল-হাওরার বাহুব হইতেছে। তবু আমাদের ক্ষুদ্রত্ব দূর হয় না কেন?

সমাজের ধর্ম-সম্বন্ধে আমরা কোনও আলোচনা করিতে চাহি না। যদিও, উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা সমাজের ভিতরে প্রকৃত বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে বিশ্বজনীন মহান ধর্ম সকল পার্থক্য একধিনে ঘুচাইয়াও দেয়।

যে সকল বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিলে সমাজ ব্যক্তির স্বজন ও পরোকে জাতি-গঠন করিতে পারে, বাংলাদেশে কোথাও যে তাহা দেখিতে পাইনা, এমন নহে। বাংলার হিন্দুসমাজে প্রাধান্য: তিনটি শক্তিশালী সম্প্রদায় আছে—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কার্বয়। এক জল-হাওরার, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের, এক আহারীর সামগ্রীতে, এক ভাবনা-চিত্তার, এক কর্ণভ্রোতে ইহার। মহুদায় লাভ করিতেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ণচিত্তা, ভাষা ও আদর্শ, সকল বিষয়ে ইহার। অভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে আত্ম-পরিশ্রমে না মিলে অনেক সময় চেনা যায় না, কে ব্রাহ্মণ, কে বৈষ্ণব ও কে কার্বয়। তবু, ইহাদের ভিতরে এক-এক ভায়গার এমন যোগতর পার্থক্য বিস্তমান যেখানে একে অপরের অন্তর্ভুক্ত। একটি ব্রাহ্মণ "এই ভাবটি প্রাণে প্রাণে" উপলব্ধি করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, মুসলমান সকলেই এক, তাই

তাহাদের ভিতরে একতা আছে ; আর হিন্দুগণ এক নহে, তাই তাহাদের ভিতরে একতাও নাই। হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে যে পার্থক্য, ব্রাহ্মণের ও কার্বের মধ্যেও প্রায় তেমনি পার্থক্য। অনেক ব্রাহ্মণ সেবিয়াছি, কার্বের ছোঁয়া জল পর্যন্ত তাহারা পান করেন না। আরো অনেক আচার-বাবহারে তাহারা একে অন্যকে দূরে রাখিয়াছেন।

অনেক বিদেশীর ও দেশীর পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, রক্তের লব্ধ বৃত্ত সুবিস্তৃত হয়, সমাজের ব্যক্তিগত জীবন তত উন্নত হয়। নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্রের বিশালতার উপর আভির মহাব্যয় যে অনেকাংশে নির্ভর করে, এ কথা সর্বসম্মত। কিন্তু, আমরা এই মিলন-ক্ষেত্রকে দিনে দিনে কত সংকীর্ণ করিয়া আনিয়াছি, আপনারা তাহা একবার বিচার করিয়া দেখুন। বাংলাদেশে সর্বসম্মত লাড়ে চার কোটি লোকের বাস, ইহার ভিতরে অনেক মুসলমান। তারপরেও হিন্দু আছে, তাহাদের মধ্যে যে কত ভেদ কত দশাধলি তাহারও টিক-টিকানা নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কার্ব হইতে ভোম, মেথর ও চণ্ডাল পর্যন্ত বোধ হয় একশত বর্ষ আছে। তারপর প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে কতক কুলীন, কতক বংশজ, কতক শ্রেণীয়। আবার বায়েজ, রাঢ়ী, বৈদিক ও মধ্যম শ্রেণী ইত্যাদি শত শত শ্রেণীবিভাগ। ইহারা সকলেই একপ্রকার পরস্পরবিরোধী বিবাহের ক্ষেত্রে এবং আহা-বিহার বাস্পারেও ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর স্রুতি করিয়া

নিম্নেদের পায়ে নিম্নেরাই কুড়ুল মারিতেছে।। আমরা যে বৈদিক, মানসিক এবং চরিত্রের বলে দিন দিন খাটো হইয়া জাতীয় হারাইয়াছি, আমাদের সমাজের সংকীর্ণতা, তাহার অন্য সকলের চেয়ে বেশী দায়ী নয় কি? আমাদের যুবকদের শতকরা ৭৫ জন বৈদিক প্রমাণে অসুপদ্ম বলিয়া লৈনিক-বিভাগে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ; ইহার অন্য দায়ী কে? তাই মনে হয়, নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্রে কণ্টক থাকিতে এবং সেই মিলনে স্বাধীনতার অভাবেই আজ আমাদের এই দুর্দিন।

যদি জাতীয় উন্নতির বাগনা আমাদের দেশের লোকের মৌখিক আন্দোলন না হয়, তাহা হইলে এদেশে নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্রে বিঘ্নিত করিয়া দেওয়া, আমাদের যৌবন-নাশকগণের আভিকার দিনের সম্মুখেই কর্তব্য। ইহার অন্য অন্ততঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কার্বের ভিতরকার সম্পর্ক অধিকতর বর্ধিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। বর্তমানে তাহা না হইবে, তত দিনে এ আভির উন্নতি নাই—কিছুতেই নাই! কেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অহি-নকুল সম্পর্ক? ইহার পার্থক্য কোথায়? কেন সমাজের অগ্রগণ্য এই মিছা সঙ্কীর্ণতাকে গৌরবের মুখোশ পরাইয়া একটা মত্ত অসত্যকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন? হইতে পারে, এই খণ্ডবিখণ্ড সমাজ পুরাতনের বৃত্তিজ্ঞাপক, কিছু অধঃ-সেহী ব্যতীত বেকদণ্ডে ভর করিয়া ঈর্ষা-বিহার সামর্থ্য আর কাহার আছে? সমাজের এই সকল খেলো

স্রীতি-নীতির গুরুগম্ভীর বাধা। করিয়া বাহারা আত্মলন করেন, উহাদের কথা প্রহেলিকার জার তুর্য্যের ও অসার মনে হয়। হিন্দুসমাজের কুস্র কুস্র তেবের গভী এড়াইয়া সমাজকে আবার প্রসারিত ও উন্নয়নকারী দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ-মতা, কারত্ব-মতা এবং বৈতন্যতার ইহাই সর্বপ্রধান কর্তব্য।

এই পন্থা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণকে বৈতন্যকে এবং কারত্বকে যে নিজস্ব সম্পদে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। আত্মীয়তা অক্ষয় করিবার জন্ত হিন্দুসমাজ যদি এতটুকু তাপসীকার না করে, তাহা হইলে আত্মবোধের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! কোলিনা-প্রচার স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখিবার জন্ত এ গোড়ামি অনেককেই ছাড়িতে চাহিবে না, কিন্তু বাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে, বাহারা বর্তমান পৃথিবীর হাল-চাল কিছু-কিছু বুঝিয়াছে, তাহাদের ভিতরেও যদি এই অন্ধ জড়ত্ব দেখি তবে আত্মবোধকে বখাত সলিলে তুরিমা মরা ছাড়া, আর কোন উপায় নাই।

সংস্কারের নাম শুনিলেই একঘল লোক সাবাস্ত করিয়া বসেন যে, উহা পুণ্ডানী অশ্রুতকরণ। বোধ হয় উহাদের প্রকৃতি কোন রকম পরিবর্তন সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এমন প্রকৃতি স্বেচ্ছা অড়ভরতেরই যোগ্য। বাহাতে বাস্তবিক উন্নতি হয়, তাহা গ্রহণ করিব না কেন? কে না আজ যেমিতে পাইতেছে, যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাহা ছিল, বিশ্ব বৎসর পূর্বে তাহা ছিল না, এবং বিশ্ববৎসর পূর্বে বাহা ছিল, এখন

তাহা আর নাই! এই যে বর্ণাশ্রমের গোয়াল করি, প্রকৃত প্রস্তাবে আর উহার গুরুত্ব আছে কি? সেই বৈবিক ও বৌদ্ধ যুগেই ভারতবর্ষ উন্নতির উজনিবরে উঠিয়াছিল বলিয়া যদি আমরা স্বীকার করি, তবে সেই যুগধর্মকেই আত্মবোধের স্বকীয় সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে আত্মবোধ কি বাধা থাকিতে পারে? এই তাত্ত্বিক যুগ কত দিনের? ইহাতে ভারত-বর্ষের কি উপকার হইয়াছে? ইহাতে পারে, মূলমানের প্রভাব হইতে তত্ত্ব আত্মনির্গত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই লোক-বিশুদ্ধকারী জটিল ধর্ম প্রকৃত অধ্যাত্মধর্মকে বিনষ্ট করিয়াছে। এবং আত্মিকার দিনে তাহার প্রয়োজন আর কি আছে? উহা আত্মনির্গত উপনিষদের ব্রহ্মকে বাহ্য-রূপে পরিণত করিয়াছে, আত্মজ্ঞাতিক স্বপ্না-মূলক জাতিভেদের কঠোরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং অবরোধ ইত্যাদি প্রথাকে দৃঢ়তর করিয়া নারী জাতিকে বিশ্বের অলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণ দিনে দিন ত্যাসের মত ভুলিয়া পার্থিব ব্যর্থের দিকে হুকিয়া এবং আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্তই এই তত্ত্ব দ্বারা এ দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। সাহস স্বাধীন তাহে চিন্তা করিবে, স্বাধীন তাহে ভগবানের আরাধনা করিবে, ইহাকে কি পাশ্চাত্য ভাব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব? ইহা তো সর্ব-জীবের, সমগ্র জগতের সর্বিজনীন মঙ্গলময় পন্থা।

তাই বলিতেছিলাম, সংস্কারের নাম

করিলেই যদি উহা পান্ডাতা বলিয়া কাহারও ধারণা জন্মে তবে সে ধারণা নিতান্ত ভ্রমশূন্যক। প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন চরিত্র থাকি সবেও সকলেরই এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, বাহ্যিক সকলেরই প্রাচ্যর বস্ত্র। বাহ্যিক বিশেষভাবে প্রাচ্য, তাহা ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে বাহ্যিক পান্ডাতা, তাহা গ্রহণ করিলে জাতির মুক্তা ঘটিতে পারে। তেমন সংস্কারের কথা আমরা বলি না। কিন্তু সংস্কার চাই। সংস্কার কি এ দেশে ঘটে নাই? হিন্দুধর্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রসূত হইয়া ছিল কেমন করিয়া? কেমন করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভেদভেদে ঘুচাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন? কিন্তু এইসকল পরিবর্তনে কি বিপ্লবাত্মক ছিল? প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন ঘটয়াছিল। এখনও একটা পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ণ-পরিবর্তন হইতে এ পরিবর্তনের প্রকৃতি ভিন্ন। এখন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধননৈতিক ও কর্মনৈতিক সমস্তই বদল না হইলে আমরা কিছুতেই স্বাধীনতা পাব না। আমাদের এখন বঙ্গ জাতির সঙ্গে মিশিতে হইবে, বঙ্গ জাতির সম্পত্তি হইতে ধন-সম্পদ আনিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। অতিমানে সকলকে ঘৃণা করিয়া আপনাদের গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে জীবন-সংগ্রামে আমাদের মরণ নিশ্চয়।

বাস্তবিকই মনুষ্যের অর্জন করার উপর আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের পরিমাণ নির্ভর করে। মনুষ্যবৎ অর্থে আমরা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অনেকখানি মঙ্গল সাধন করিতে পারি।

পরিপূর্ণতাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এগুলি কি সমাজের শিক্ষা ও স্বাধীনতার ফল নহে? অবশ্য, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন। যে ছেলে হাঁটিতে শিখে নাই প্রথমে হাত ধরিয়াই তাহাকে হাঁটিতে শিখাইতে হয়। কিন্তু যে ছেলে খোঁড়া তাহার হাত ধরিলেই বা লাভ কি? ইংরেজ আমলে আমরা যেড় শত বৎসর কাটাইলাম, কিন্তু এতদিনেও আমরা কোন অধিকার লাভ করিলাম না কেন? হইতে পারে, ইংরেজ আমলাদিককে হাত ধরিয়া হাঁটাইতে শিখার নাই, কিন্তু আমরাও কি বারবার পড়িয়া আবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াছি? যদি করিয়াই থাকি, তবে বার্থ হইয়াছি কেন?

আমরা যেখানে বস্তুকু ক্ষমতা হাতে পাইয়াছি, সেটুকুও বিকৃত করিয়াছি কেন? কেন এ সমাজের লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করে না, স্বাধীনভাবে উপাসনা করে না, স্বাধীনভাবে বিবাহ করে না, স্বাধীনভাবে পরস্পরকে ভাই বলিয়া আশ্বাস করে না? সমাজের হাতে যে ক্ষমতা ছিল, সমাজ তাহা বিকৃত করিল কেন? ইহাতে তো বিদেশীয় কোন হাত ছিল না। অবশ্য, রাজ্য সাহায্য না করিলে সকল কাজ সুসাধ্য হয় না। রাজ্যের সাহায্যে আমরা সহস্রগণ-প্রথা, গণ্যায় সম্মান-ত্যাগ-প্রথা ইত্যাদি বর্জন করিয়াছি। কিন্তু প্রতিপদে পরম্পরাগোষ্ঠী হওয়াও নিত্যমুদ্রণ ব্যাপার। বস্তুকু শক্তি আছে, ততটুকুর সদ্ব্যবহার করিলেই ত আমরা অনেকখানি মঙ্গল সাধন করিতে পারি।

বীহারী আজকাল বঙ্গদেশে রাষ্ট্রনীতির
আন্দোলন করেন, তাঁহার চোটা করিলে
সমাজের যে কিছুই করিতে পারেন না,
ইহা আমার বিশ্বাস হয় না! কিন্তু তাঁহার
অবজ্ঞাতরে সমাজের দিকে চাহিয়াই চক্ষু
ফিরাইয়া লন। অথচ, সমাজের উন্নতির
উপরেই দেশের উন্নতি যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর
করিতেছে, এ সহজ সত্যটা ত তাঁহার
চোখে পড়ে না! তারপর, আমাদের
শিক্ষিত সুবক্তৃতা, তাহারও তো বেশ
বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, তেজস্বী এবং বেশপ্রেমিক।
অথচ পাঠ্যবস্তুর তাহারের যে প্রভুত্ব
থাকে, কর্মক্ষেত্রে নামিয়া সে প্রভুত্ব
কোথায় বিলীন হইয়া যায়! কিন্তু ইহারাই
তো হাতে হাতে সমাজের পীড়ন সহ করিতে
থাকে এবং তাহার অন্ত কত অশুভাপ

করে। কতায় পাত্ত ফুটে না, শিশুশ্রমের
ব্যবহন করা যায় না, দোশ-দুর্গোৎসবে
খরচ কুলায় না!

সকল দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে
আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারি, যদি
আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সম্মান
করিতে পারিতাম, জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর
বক্ষে আজ আমরা এতটা হীনতার পরিচয়
দিতাম না। ভারতবাসীর যে দিন
গৌরবের দিন ছিল সে দিন জুলিয়া আমরা
অন্ধের মতন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া নিজের
পথ বাহির করিতে পারিতেছি না।
আমাদের বিশ্বাস, বৈদিক কালের যুগধর্মের
মতোই ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তি, এবং
স্বাভাবিক নিজস্ব নিহিত রহিয়াছে।
আজ কে তাহা উদ্ধার করিয়া আনিবে?
ঐনয়েন্দ্রনাথ রায়।

কবি ও সমালোচক

(Tennyson হইতে)

লোকালয় মাঝে বেই পাখী গায়
উচ্চবৃক্ষে উচ্চস্বরে,
শেষে মতিমাল্য বেউলের দ্বারে
ধরি শেষ গান স্তব্ধ, মরে।
মাংসলোভু গৃহের প্রেয়ী
তার লাগি ঐ উড়িছে নভে,
জনতার মাঝে তার দেখে লয়ে
নির্দয় ভাবে ছিঁড়িতে রবে।

তার চেয়ে ভাল তাহার জীবন,
গায় বেবা গিরি গহন বনে,
বনজল অলি লতায়ঞ্জরী
তাহার মর্ম-কাহিনী শোনে।
নর-নিগরের পার্কিত দশা
বিচার-বচন কতু না সবে,
নীরবে নিভৃত্তে সুখ-সুস্থিতে
পত্র-পুঞ্জ মরিয়া রহে।
ঐকালিনাস রায়।

অস্থি

হঠাৎ সে-ক'দিন জাহাজের ডেকে, কাষবিনে, পল্টুনে এবং টিকিট-ঘরে যাদল-পোকায় খাঁকির মতো কেন এত 'দি আই ডি'র আবির্ভাব হল এবং কেনই বা দেখতে দেখতে একদিন তারা পা-ঢাকা হয়ে এ তলাট ছেড়ে গেল তা বলা শক্ত। কিন্তু তারা অদৃষ্ট হবার অনেক দিন পর পর্য্যন্ত জলে-স্থলে-আকাশে, জাহাজের ডেকের তক্তাগুলোর ফাটলে-ফাটলে, বসবার বেঞ্চগুলোর তলার-তলার, এমন কি টীমারের চিমনির কালো ধূঁয়ার আড়ালে পর্য্যন্ত কতকগুলো বম-মুতের মতো ইংলিস্ আল্কা বেটার উপ-সর্গের ছড়াছড়ি যে দেখছিলেন সেটা আমি বেশ বলতে পারি। বড়বাজার থেকে শাতটা-পকাশের টীমারের ফাটল্লাসের সব-আগের ছোটো বেকির কোণে নটামি, ভাঁড়ামি, গাঁজাখুরি পদ্ম, বাত্মা, গান, কবীর এবং তুলনীমাসের পদাবলী দিয়ে আমরা দ্বিবি একটি কুঁড়েমির নীড় বেঁধে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আরামে কাটাচ্ছিলেন, উপসর্গের উৎপাতে যখন আমাদের সে নীড় ভাঙো-ভাঙো, —গানও অমছেনা, গল্পও প্রায় বন্ধ, ঠিক সেই সময় একটা লোক তার চক্চকে কালো ইদ্রাশী টুপি, টুপির চেয়ে কালো খোলা দাড়ি, মোচড়ানো গোঁপ, চামড়ার পুত্তিন্ আর সোনা-বাঁধা গেটে বাঁশের মোটা ল্যাঠিটা নিয়ে হাঙ্গির হল এবং ঠিক তার আবার সঙ্গেই টীমার-কোম্পানী আমাদের আগের জাহাজখানা বহলে আকাশের দিকে নাক-তোলা, দুপলি এবং অতিরিক্ত-রকম কম-

চোড়া ও অধিক-লম্বা টীমার বড়বাজারের ঘাটে এনে হাঙ্গির করে তখন আমি সে লোকটাকে শেখুরী বলে স্থির করে নিতে একটুইও দেরী-ক'লম না,—যদিও অবিন তাকে গিরগটির চেয়ে উচ্চপদ দিতে মোটেই রাজি হয় নি।

এই জাহাজখানার চড়ে আনাগোনা কচ্ছি বটে কিন্তু এখানার সবই আমাদের অপরিচিত খটমটে ঠেকছে। এটার বয়লার-গুলো কেয়ার বুকজের মতো লোহার চাপরে ঢাকা; এটার খালসী থেকে সারেং স্তম্ভনী সবাই যেন গোস্তাঘের চুরুটের এবং নদের একটা উৎকট গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; —আমাদের সুবিশেষ-অস্থিবিধের দিকে তাদের দৃষ্টিই নেই। আর মকরের শুঁড়ের মতো আগাতোলা সেই কাঠক্লাসের দুপলি ডেক —সেখানে বসে পদ্মাও দেখা যায় না, আকাশের নীলও চোখে পড়ে না, মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা হাঙরের পেটের ভিতর বসে চলেছি—সেখানে অবিনের ওই পুত্তিন্-পর্য্য মামুষটি! আমরা ক'টি বোড়ো কাকের মতো নিজের নিজের ডানার মুখ-মুকিরে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় এক দিন কেয়ার একটা খুব বড় ইংরেজ, জার্নেল কি কার্ণেল হবে, বাম্বা-কোম্বা ইউনিকারেন্সের উপরে পালক-দেওয়া টুপি এবং খোপনা-বাঁধা তলোয়ার হুলিয়ে জাহাজে উঠেই সেই লোকটাকে দেখে বলে—“হেলো, তুমি যে এখানে?”

লোকটা অতি বিগুজ ইংরেজিতে উত্তর

করে—“আমি এখানে কেননা আমার খাবার আর” কোথাও বাকি নেই। এই জাহাজ-খানা আমি পোট কমিশনারদের বেচে কেসেছি কিন্তু এর মারাটা এখনো কাটাতে পারিনি তাই এটার চড়ে চুই-সক্কা বেড়াই। এখানে এক বছর গার্ডেনবীচের ঐ দিকে আমার বাড়ির কাছ দিয়েই ডারমণ্ড-হারবারে যাওয়া-আসা করছিল, এদিকের একখানা জাহাজ বেকল হওয়ার এক্সা এটাকে এখানে এনেছে। জাহাজের সঙ্গে আমিও বকিণ থেকে উত্তরে—ব্রীজের ওপার থেকে এপারে এসে পড়েছি; তোমার সঙ্গে দেখা হল স্বামী চলো!”

তখন কান্দিপুরের গন্ডাউগারির ঘাটে এসে জাহাজ ডিডছে, সাহেব সেই লোকটাকে টাইম্ কি লিজ্ঞাসা করলে। সে জেব থেকে একটা প্রকাণ্ড ব্যোকেব ওয়াচ বার করে করে—“আটটা পঞ্চাশ।” ঘড়িটা আগাগোড়া হীরের মোড়া এবং তার চেনটা সমস্তটা পান্না আর চুনি গাঁথা। সকালের আলো সে ছোটর উপরে পড়ে বিদ্রাতের মতো কক্-করে উঠল। সাহেব শুভ-খবর বলে কান্দিপুরে নেমে গেল। সেই লোকটা অস্ত্রহীনভাবে সেই ঘড়ি আর চেন চুই আঙুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গুদার দিকে চেয়ে আপনার মনে বিড়-বিড় করে কি বকতে লাগল।

কারো কাছে কিছু নতুন দেখলে অধিন সেটাকে অন্তত ষণ্টাখামেকের অস্ত্র কেড়ে না নিয়ে থাকতে পারেনা জানতেন, কিন্তু সে আশা যে এখনটা করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সাহেব নেমে যেতেই অধিন হঠাৎ সেই লোকটার হাত থেকে ঘড়ি মার

চেন ছোঁ-ঝেতে চেনে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে দিয়ে গট্ হয়ে বসল;—আমার মনে হল যেন একটা আশুপের সাপ অবিনের বৃকের পকেটে গিয়ে লুক্কো। লোকটা কী মনে করছে এই ভেবে আমার চুই কান লাগ হয়ে উঠেছে; অধিন কিন্তু শোধি চোখ-বুজু স্থির হয়ে বসে। আর সেই লোকটা একটু নড়লেনা চড়লেনা, অবিনের দিকে কিরেও দেখলে না,—উন্টোমিকে সুখ ঘুরিয়ে পারের উপর পা দিয়ে বেমন ছিল। তেমনই রইল; আর দেখলেন তার ছোটো আঙুল ঘড়ি-চেনটা নিয়ে বেমন ঘুরছিল এখনো তেমনি আস্তে আস্তে স্ত্রে ঘুরছে। কড়া-কথা মস্তি-কথা মিনতি এবং বিনতি সব বখন হার মেনেছে, তখন আমি অবিনকে বল্লেন—“তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।” বলেই আমি তার দিকে শিষ্ট-কারিরে বসলেন। কতক্ষণ এমন কাটলো মনে নেই। একটা সাধা পাখী চেউয়ের উপর পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাগড়িটির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি সেই দিকে চেয়ে রইছি, এমন সময় অধিন আমার পিঠে একটা মস্ত ধাবড়া বসিয়ে দিয়ে চুপি-চুপি বল্লেন—“ওহে, পকেট থেকে চেনটা কোথায় পড়ল দেখেছো!”

সাপে ছোঁ-লালে বেমন আমি তেমনি চমকে উঠলেন, দেখলেন তারে অবিনের সুখ সাধা হয়ে গেছে। আমার চুই চোখ চকিতের মতো ডেকটার একধার থেকে আর-এক ধার যেন ঝেঁটিয়ে নিলে। শিরিস্ কাগজ-করা সেগুন কাঠের সর সৰু তক্তাগুলো এবং শিচালা তাদের জোড়ের সেলাই-গুলো এমন অস্তিরিক স্পষ্ট হয়ে কোনো

দিন আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। অবিনও তার পায়ের কাছে ভ্রম-করা জাহাজের ঘোটা কাছটা যেন আনমনে পা দোলাতে একটুখানি সরিয়ে দেখলে এবং বুক থেকে হঠাৎ থলে-পড়া গোলাপ ফুলটা কুড়োবার অস্থিলায় বেকের তলাটাও একবার বেশ করে হাত-বুলিয়ে নিলে বটে কিন্তু কোথাও আর সেই ঘড়ি তার সাপ-খেলানো চেনের লেজুড়ের ডগাটি পর্যন্ত নাই। এদিকে যেখনি কুম্ভাটার পটুনে মোহাছির কাঁকের মতো লোক জাহাজটা ধরবার অপেক্ষার। আর-একটু পরেই লোকের পায়ের তলার অবিনের এই মহামূল্য বিপদ ভাঁড়িয়ে ধুলো হয়ে বাবে এটা ভেবে আমার লজ্জাও যেমন হচ্ছে তেমনি আর-একটু পরেই অবিনকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে পা-ঢাকা দিতে পারবো ভেবে খানিকটা দৃষ্টি এবং সাহসও হচ্ছে, এমন সময় সেই লোকটা বেশ বীরে-হুঙ্গে বেকি থেকে উঠে বরাবর খার্ড ক্রাসে ইঞ্জিন-ঘরের দ্বারে লালপাপড়ি একজন রিক্সার পুলিশের জমাদারের সঙ্গে কে জানে খানিকটা কী হুস্-ফাস্ করে আবার আঙে আঙে নিজের দ্বারগা এসে দখল করলে! কুম্ভা-খাটার তখন লোক উঠতে শুরু করেছে। পাহারাওয়াল-নাহেব ফাট্‌ক্রাসে আসবার রাস্তাটা আগলে পাড়িয়ে জাহাজের একজন ছোকরা টিকিট-কালেক্টরের সঙ্গে ফিস্-ফাস্ করে কি বে বলাবলি করতে লাগল তা শুনতে পেলেন না, অবিনও চোখ-হুঙ্গে কি ভাবতে লাগল তা আঁমি জানি না, কিন্তু আমি আমার হুই পকেটে হাট্‌ খাঁজে বুট জুতার লুকুতলা থেকে মাথার উপরে . দল একে-একে পা-ঢাকা হল,—পড়ে

টুপি-ঢাকা ব্রজভেলো পর্যন্ত একটা ষ্ট্রট অহুতব করতে লাগলেন। জাহাজ পুরো ধমে কলকাতার দিকে চলছে তার সমস্তটা একটা দ্রুত আবেগে ধর-ধর করে কাঁপছে,—যেন সে আমাদের বত শীত পারে বড় বাজারের পটুনে হাজির করে দাঁচে!—যেখানে নিকলের বোতাম-আঁটা কাণো কোর্তা গারে সাহেব-কন্টেবল কটা চোখের হির দৃষ্টিটা নিয়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এমন সময় অবিন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল—“বেথুন তো আপনার ঘড়িতে কটা?” সমস্ত পৃথিবী কণকালের অন্ত চলা বলা বন্ধ করে আমার হুই চোখের চসমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সেই লোকটার দিকে যেন চেয়ে দেখলে। লোকটা তার ঘেব থেকে সেই হীরের ঘড়ি নাম চেন হারানিধির মতো অবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—“বশটা বিশ হল!” কহাকস্ বাঘলা হঠাৎ কেটে খুঁচা উঠলে যেমন সব পাখীগুলো একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তেমনি জাহাজের দাড়ীঘের কোলাহল, কণের হুস্-হাস্, জলের কল কল সমস্ত একসঙ্গে এসে আমার মনের মধ্যে গুণগোল বাধিয়ে দিলে;—অবিন বে কখন উঠে সেই লোকটিকে ধস্তবাস্ত দিয়ে আছিরি-টোলায় নেমে গেল তা আমি মেথতেও পেলেন না।

আমাদের কুঁড়েমির বাসাটা ভেঙে গেছে। অবিন আর আসে না,—ঘড়িও কোনোদিন আসে তো ঘড়ি-ধরে বাড়ি কেহে! অবিনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নবীন এবং প্রবীণের দুটো জুতার লুকুতলা থেকে মাথার উপরে . দল একে-একে পা-ঢাকা হল,—পড়ে

রইলেম কেবল আমি,—নবীন ও প্রবীণ দুই
 দলই অবশেষ, উন্টে-পড়া মনের পেরালায়
 তলানি একটি ফেঁটা। ইয়ারকির শেষ
 নাড়িচ্ছে বুড়ো গোলোকবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ
 করে আমি আমার সেই আগেকার
 জাহাজে আঙকের সকালে ঠিক সেই আগেকার
 মতো একলাটি এসে বসেছি। এতদিন
 যেন শীতে একটা বহু বরের মধ্যে আগুন-
 তাতে বাস করছিলেম, হঠাৎ আজ দরজা
 খুলে বেরিয়ে এসে দেখছি বসন্তকাল
 জলে-জলে ঢেউ দিয়ে বইছে। মন-ভোলানো
 কাণ্ডের হাওয়া বসন্তবাউরীর সবে-ওঠা
 কচি ডানার মতো হলধে রোগ এখনো শীতে
 কাঁপছে। আমি তারি দিকে চেয়ে একলাটি
 আমার সেই আগেকার হারগার চূপ-করে
 বসে বসে দেখছি—সব নৌকার ফুটো-ফাটা
 নতুন-পুরাতন নির্কিঁশেবে পাগলোতোে আজ
 নতুন দখিনে হাওয়া বেখেছে, নবীর বুকে
 বোবনের জোয়ার তুকান ভুলেছে, জলের কেনা
 যেন ফলের সাধা সাধ। বাইরের এই শোভার
 মধ্যে আপনাকে হারিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ
 ছেড়ে দিয়ে আছি, এমন সময় একটা
 প্রাণখোলা পরিষ্কার বাতাস নদীর এক
 আজলা ঠাণ্ডা জলের কাপটার আমার পা
 থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজিয়ে সমস্ত ডেকটা
 একবার জলের ছড়া দিয়ে দিয়ে ধুয়ে গেল।
 সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলাপফুলের খোসবো
 চোরিদিকে ছড়িয়ে সেই সে হাওয়ারুখো
 টানারের লোকটি বাসন্তী রঙের একখানা
 রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখা দিলেন।
 লোকটির চেহারা যে এত স্বন্দর ইতিপূর্বে তা
 আমার চোখেই পড়েনি। আজ গোলাপী

সাতিনের সন্দী বাসন্তী রঙের কিন্ফিনে ঢাকাই
 মসলিনের বুটিনার চাপকান, তার উপরে
 চিকনের কাজ করা হাতা টুপিটি পোরে মুগ্ধমান
 বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে। সিংহের
 মতো সন্ন কোমর, দরাজ বুক নিয়ে লোকটি
 আমার পাশেই এসে বসলেন। আমি
 তাঁকে একটা সেলাম না দিয়ে থাকতে
 পার্লেম না। তিনি একটুখানি হেসে আমার
 দিকে একবার বাড়ী নীচু করে চাইলেন।
 সেই সময় তার চোখদুটো দেখলেন যেন
 একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা। এমন
 চোখ আমি কার দেখিনি,—এ যেন আমার
 দিকে চেয়ে দেখছে বটে, দেখছে-নাও
 বটে! তখন সেই আজ্ঞার চোখের দৃষ্টি,
 সেই বাসন্তী কাপড়ের আভা, আর সেই
 রুমালে-চালা গোলাপফুলের রং আমাকে
 এমন বিহ্বল করেছে যে আমার মনে পড়েনা
 তাঁকে আমি কোনো প্রণ করছিলাম কি
 না। তিনি যেন আমার প্রেরেরই জবাবে
 বলেন, তবে শুধু—

আমার বংশে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখতো
 না! এটা শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন
 না। পাঁজরের যে হাড়খানা স্বপ্নের বাগা,
 সেই হাড়টা হাকেজের মতো কোনো মহাকবির
 অভিশাপে আমাদের আবিপুত্বের বুক থেকে
 খসে পড়েছিল। সেই থেকে বংশাজ্ঞানে
 আমরা ভরতর বকম কাজের মানুষ হয়ে
 জন্মতে লাগলুম। বুকের ঐ হাড়
 যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁপীর মতো ফুঁ-দিয়ে
 বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কার
 মধ্যে পজাতে পেলেনা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই
 কাজে দৃষ্ণতার একটা শিলমোহর বুক

নিরেই ঘেন আমাদের বংশের সব ছেলে-
গুলো ভূমিষ্ঠ হতো এবং আমাদের মধ্যে
কোনো ছেলের বৃকে যদি কখনো ঐ হাড়ের
বাঁশির অঙ্কুর মাত্র আছে এক্সপ সন্মোহ হতো,
তবে হাকিম এবং বুদ্ধব্রহ্ম ডেকে সেই
শিশু-বৃকে একটা তপ্ত লোহার শলা
চাণিয়ে স্বপ্নের অঙ্কুর বৃদ্ধ করে দিতে
আমাদের কেউ কোনোদিন ইতস্তত করেন
নি, যদিও স্বপ্নের সন্মোহে অনেক সময়
শিশুপ্রাণগুলি পুড়ে ছাই হতে বিলম্ব হয়নি।
আমাদের দারা কেউ নয় তারা একান্তে
হাফাকার করতো, এবং এর অন্তে আমাদের
বংশে অনেক মায়েরও বৃক কাটতো সন্মোহ
নেই, কিন্তু কোনো পিতার তাতে এক-
নিমিষের ক্ষত কাণে একটু শৈথিল্য এসেছে
বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। পুরুষাশ্রমে
কাজ থেকে রস টেনে নিয়ে আমাদের
বৃকের হাড়গুলো বাজ ধরবার সিকের মতো
দক, কালা এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল।

এই বংশের শেষসন্তান আমি যখন
ভূমিষ্ঠ হলোম তার ছমাস পূর্বে পিতা
আমার স্বর্ণারোহণ করেছেন এবং আমার
প্রসব করে মা আমার কঠিন রোগ-
শয্যার তুলে, কাজেই আমার বৃকের ভিতরে
স্বপ্নের বাঁশি যদি থাকে সেটা নিয়ে আমি
বেড়ে উঠতে কোনো বাধাই পেলোম না।
কখনো ডালের শেষ-পল্লবের মতো আমি,
আমার মধ্যে গিয়ে হয়তো এই অভিশপ্ত
বংশের অসংখ্য বিকল স্বপ্নগুলো শেষকূলটির
মতো একদিন ফুটে উঠতেও পারে এই ভেবে
মা আমার এক-এক দিন রোগশয্যার
কাছে আমাকে ডেকে তাঁর শীর্ণ হাতখানা

আমার বৃকের উপর আঙুলে আঙুলে বুদিয়ে
দেখতেন। সে সময় তাঁর ডই চোখ রোগের
ফাণিমার মাঝে এমন একটা উৎকট
আশঙ্কা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত
যে আমি ভয়ে এক-একদিন কঁপে ফেলতুম।
মা আমার চোখে জল দেখে আরামের
একটা নিশ্বাস ফেলে আমার ছেড়ে দিতেন।
আমার বংশে কেউ কোনোদিন চোখের জল
ফেলেনি, সেটাকে তাঁরা স্বপ্নের অঙ্কুরের
মতো সম্পূর্ণ অকেজো বলেই গণ্য করতেন।

মা দুঃসাধ্য রোগে বিকল, কাজেই সেই
জন্মবরস থেকেই আমি কাজের মাহুর
হয়ে উঠলুম। কাজের চাপনে আমার সমস্ত
বৃকটা যখন কলের চাপে পাটের গাঁটের
মতো নিরেট শক্ত হয়ে ওঠবার লোণাড়, বে-
সময় কাজের মধ্যে আমি এমন-একটু
অবসর প্যাঙ্কিনে যে রোগা মায়ের মৃত্যুশয্যার
পাশে গিয়ে একটুও সময় নষ্ট করি, যখন
মা-আমার অসময়ে হঠাৎ মরে অসমাপ্ত
কাজের কোনো ব্যাঘাত না ঘটান এই
প্রার্থনাটা আমার মনে নিত্য জাগছে, সেই
সময় পাটের বাজারে একটা বিবম ধাঁও-প্যাচের
বাক্সখানে মায়ের আসন মৃত্যুর খবরটা
আমার আঁকিস-স্বরে এসে পৌঁছল। বলা
বাহুল্য সেখান থেকে আমার কাজ অসমাপ্ত
য়েখে তখন নড়বার সাধ্য ছিল না। যে
সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখা তিনি তখন
আমাদের ডাক্তার ছিলেন। আমি এক-
ধান চিরকুটে আমার কাজ সেয়ে আসা
পর্যন্ত তাঁকে মায়ের খবরবারি করতে
লিখে পাঠিয়ে কাজে মন দিলোম। আর-
কেউ হলে সব কাজ কলে মুমূর্ষু মায়ের

কছে ছুটে যেতো কিন্তু আমি জানতাম আমি সেই নিরেট বাঁশের শেব ককি— বাঁশ হায়ে বাজা বার পকে অলম্ব্যব।

কাজ চুকিয়ে বাড়ি কিরতে প্রায় দশটা হল এবং বাড়ি এসে কাশড় ছেড়ে জনযোগ করে নিতে আরো খানিকটা সময় অতীত হল। আমি যখন মায়ের ঘরে গেলাম তখন রাত গভীর হয়েছিল। মাকে যে জীবন্ত দেখতে পেলাম সেজন্য আনন্দ হল না, তিনি যে আমার কান-সাজা হবার মাঝেই সরে গিয়ে কোনো অসুবিধা ঘটান নি সেইটেতেই আমার আনন্দ। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে বল্লেন—ওই বান্ধটা এখানে আন। বান্ধটা তাঁর সম্মুখে ধরে দিতেই তিনি কি-একটা বার করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লেন, তুই কখন স্বপ্ন দেখিস?

বান্ধটার ভিতর আমি দেখলাম শুল্ল। আমার মনে হল মায়ের কথাই কি উত্তর দেব সেইটে শোনবার জন্যে সেই লোহার বান্ধটা বেন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি হোঃ হোঃ করে হেসে বল্লম—কোনো পুরুষ স্বপ্ন কাকে বলে জানিনি!—আমার মনে হল আমার কথা শুনে মায়ের বুকের ওঠা-পড়া হঠাৎ বন্ধ হল, তার পর আন্তে আন্তে তাঁর ডান হাতের মুঠো সজোরে কি বেন আঁকড়ে ধরলে।

তার পর বা ঘটল সেটার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। একটা কড় বেন অচণ্ডবেগে ধাক্কা দিয়ে আমার

ভিতরে লম্বাট-বাঁধা কান্নকে হঠাৎ ঠেলে বার করে দিলে। আমার পাঞ্জরের সমস্ত হাড়গুলো তলতা বাঁশের বাঁশির মতো ককণ স্বরে সহসা বেজে উঠলো। আর আমার সেই মরা-মায়ের ডান হাত আন্তে আন্তে তাঁর নিজের বুকের উপর থেকে উঠে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের উপরে এসে আন্তে আন্তে আপনার মুঠো গুলে। তার ভিতর রয়েছে দেখলাম আব্দু আল্লা দেখা আমার অভিশপ্ত অতি পুরাতন পূর্বপুরুষের বুকের হাড়। তার গায়ে সাত-আটটা ছোট ছোট কুটো। সেই দিন সব প্রথম লোকে আমাদের বাড়ি থেকে কান্নার ককণ স্বর শুনতে পেরেছিল। আর সেই দিন আমি প্রথম জানতে পারলাম আমার বুকের ভিতরে সব হাড়গুলো বাঁশির মত কাঁপা ও কুটো, কাজ দিয়ে সেগুলো বোঝানো ছিল মাত্র—

গঙ্গার একটা জলের স্বাপটা হঠাৎ টীমারের ডেক্ ডিঙিরে আমাকে ঠাণ্ডা জলের ছিটের একেবারে ভিঝিরে দিবে গেল। আমি হঠাৎ চমকে উঠে চারিদিক চেয়ে দেখলাম, একটা গোলাপ ফুল আমার পাশে পড়ে আছে কিন্তু সে লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তার পর দিন অধিনের সঙ্গে দেখা হতে সে বল্লেন—“ওহে কাল কি তুমি স্বপ্নে ভোর ছিলে? পাশের টীমার থেকে গোলাপ ফুলটা তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারলাম তাতেও তোমার চৈতন্য হল না, অবাক!”

ঐশ্বর্যদীপ্তনাথ ঠাকুর।



“বসন্তীন কবিতার ভয়েনাক’ হুঁড়ি ;
 হুড়িতে আল কাবা ছ’পন ছ’বুড়ি !”

ঐশ্বর্য বসন্তীনাক ঠাণ্ডা মজিত চিত্র চিত্রে ।

নারীর অবস্থা

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

যে পরিবার-তন্ত্র হইতে সমস্ত সভ্যতার
ক্রমবিকাশ সাধিত হয়, তাহার পরিবর্তন
হুই প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল :-

গৃহ ছাড়িয়া পুরুষদিগের ইতস্ততঃ অপসরণ
(তাইরা পৃথক হইয়া যার, পুত্রেরা পিতৃগৃহ
পরিত্যাগ করে) ;

নারীর দাসত্ব-মোচন ।

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে,—হিন্দুসমাজ
ধীরে-ধীরে চলিলেও—উন্নতির পথে ক্রমশঃ
অগ্রসর হইতেছিল ; ইংলণ্ডের আবির্তাবে,
এই ক্রমবিকাশের কাছ আরও দ্রুতবেগে
চলিতে লাগিল এই যাত্রা ।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে—উন্নতির দিকে
অগ্রসর না হইয়া, ক্রমবিকাশ উন্নতির উল্টা
পথে চলিতেছিল ; তাই নূতন আইন করিয়া
ইংরাজদিগকে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে
চলিতে হইয়াছিল ।

প্রথমে সতীত্ব নিবারণ ।

তাহার পর, শিশুহত্যা নিবারণ ।

উচ্চবর্ণের শোকেয়া, বিবাহ-অনুষ্ঠানে
যে ধর্মপরিসীমার ব্যতীত হইয়া লম্বাঘরের
ইচ্ছা করিত ; তাছাড়া, তাহার নিজ কস্তারের
অন্ত শব্দাতের মধ্য হইতে, বর সহজে
খুঁজিয়া পাইত না । ১৮৫৬ অব্দে, সরকার

হইতে রাজপুতানার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান
প্রবর্তিত হইলে, জানা গেল যে, ৩০৮ গ্রামের
মধ্যে, ২৬ গ্রামে, ৬ বৎসর বয়সের নীচে কোন
বালিকা ছিল না । অত্র ৩৮ গ্রামে,
একটিমাত্র বালিকাও ছিল না । তাছাড়া
এই প্রথাটি কেবল রাজস্থানেরই বিশেষ
প্রথা নহে । বারাণসীতে,—যেখানে
অস্বাস্থ্যের বেন ছেলে হইয়া মৃত্যু,—দেবতার
নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, মেয়েগুলিকে
নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া হইত । আনকাল
আইনের দ্বারা শিশুহত্যা নিবারণ হইয়াছে—
যদিও এখনও গোপনে-গোপনে শিশুহত্যা
হইয়া থাকে । (১)

যে সকল প্রথা ইংরাজ ঐ নৃ-বাহিনীর
ব্রহ্মচর্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা
উল্লেখ করিতেছি :-

উচ্চ-বর্ণসমূহের মধ্যেই বাল্যবিবাহ বা
শিশুবিবাহ সম্বন্ধে প্রচলিত । ১৮৯০ অব্দে,
১১ বৎসরের কম বয়স্ক দশহাজার ভারত-
বাসী পুরুষের মধ্যে ৬০৬ জন বিবাহিত ও ১২
জন গতপত্নীক ; এই একই বয়সের দশহাজার
ভারতবাসিনীর মধ্যে ১৭৫২ বিবাহিতা ও ৫২

(১) রাজপুতানার কোন কোন গ্রামে, ২৫ বৎসর বয়সী অতিমাত্র-বয়সী বালিকাদিগের বিবাহ হয়
নাই । বারাণসীর কোন্ কোন্ গ্রামে, বালিকার বিবাহ যেখানেই বলিয়া কাহারও মনে পড়ে না ।
(Wilkins, Modern Hinduism) M. Ibbetson বলেন, পড়াই, যন্ত্রের অভাবে অনেক বালিকা
মারা যায় । এবং কোন কোন দাখানাতের মধ্যে চিন্তিতপূর্ণ শিশুহত্যার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নহে ।

জন বিবাহ। এই গণনার অন্তর্ভুক্ত—দেশের সমস্ত অধিবাসী, এমন-কি মুসলমানেরাও, যাহাদের ধর্ম, যোগ্য বয়সের পূর্বে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, এবং সেই সকল বয়স জাতি যাহারা এই প্রণালী সহিত আপো পরিচিত নহে। এই প্রথা বিশেষরূপে উত্তর-পশ্চিমাকালে প্রচলিত। ১৮২১ অব্দের আদম তুমারে, দক্ষিণ বেংগলের নিম্নলিখিত সংখ্যকগুলি পাওয়া যায়; মশ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকার মধ্যে, ২৬০৯ জনের বিবাহ হয়;

উদ্যোগে ১৭৭৩ জন হিন্দু ও ৮৬৬ জন মুসলমান; বেংগলের অবশিষ্ট অংশে ও পশ্চিম বঙ্গে প্রায় একই অনুপাত দৃষ্ট হয়।

কতকগুলি পার্শী ও নব্য-হিন্দু সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টার ১৮২০ অব্দে “সম্মতি-আইন” বিধিবদ্ধ হয়,—বাহার যারা ১২ বৎসর বয়সের পূর্বে, বিবাহের পূর্ণ-পরিণতিসাধন নিষিদ্ধ; কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার ক্রাহারও অধিকার না থাকায়,—এই আইনের নিবেদ একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে(২),

(২) Justice Maibu-Swami Iyer M. Rees কর্তৃক Nineteenth Century-তে উদ্ধৃত হইয়াছে—অক্টোবর ১৮২০) এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন:—

“গর্ভাধান ও জন্ম উভয়ই অশুচি ও পূর্ণরূপের কর্তব্যের পরিণাম, সুতরাং উহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক—এই যে ধারণা, ইহা অসহ্যতার সাহা হইতে এবং প্রাপ্তিভিত্ত না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এই বিশ্বাস হইতে সদ্ভূত। বিবাহের অনুষ্ঠান এই প্রায়শ্চিত্তের সত্ত্ব আবশ্যক এবং নারীর পক্ষে বিবাহই একমাত্র অত্যাবশ্যক সাধার-কর্ম।

১৮২১ অব্দের আদম-তুমারের পক্ষ, হিন্দুনারীর রাজিক (civil) অবস্থা এইরূপ ছিল। দেখ:—

বয়স	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিবাহ
০ বৎসরের নীচে	১৩,৬৭২,৪২৪	২২২,১১১	১০,১৩৫
০ হইতে ১	১০,৮০৪,২২৮	১,৮২৩,০৩২	৫১,৮৭৬
১-০ হইতে ১০	৩,৮৪৪,৮২০	৪,৭২৪,৩৭২	১৪০,৭০৪
১০ হইতে ১১	৭৮২,৮৮০	৬,৩০৩,২৮৮	২৮০,২৪২
২০ হইতে ২১	২০৩,২১৬	৭,৬০১,৮০৮	৪৪৪,৪০৪
২০ হইতে ২১	১২১,১০৪	৭,৪০৩,২২৪	৪০৩,২০১
৩০ হইতে ৩১	২২,১৭১	৬,৪০১,৪২০	১,৪০৩,২০৭
৩০ হইতে ৩১	৪৬,৪০৪	৩,৭২৩,৮৪৪	১,৩৬৪,৭০২
৪০ হইতে ৪১	৪৪,০১২	৩,৪৮২,৪১৮	২,৪২১,০১২
৪০ হইতে ৪১	২৬,০৬৭	১,৪০১,৪৬২	১,৪০৮,৪০৮
৫০ হইতে ৫১	৩২,৪১৭	১,৪০৭,৪৫৪	১,০৪২,০৮০
৫০ হইতে ৫১	১২,৩৭৭	৪২২,৬৬৬	১,৬৪২,০৮০
৬০ এর নীচে	৩৬,৫০৮	৩৮,৪০০	৪৭১৭
উল্লেখ-বিহীন			
সমষ্টি			১৭,০,৪৩১০১

• •

বহুবিবাহ প্রথা মুসলমানদিগের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে, হাজার-করা ৪০ জন হিসাবে বিবাহিতা নারীর সংখ্যা, বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; বুনো জাতিদিগের মধ্যে হিসাবটা হাজার করা ৬০ জন। সমস্ত ভারতে, প্রত্যেক হাজারের মধ্যে ৭ জন বিবাহিত পুরুষের

একাধিক পত্নী। এই অসুপাতটা খুবই কম, কিন্তু উচ্চবর্ণদিগের মধ্যে এই অসুখ্যাতের সংখ্যা আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। (৩)

সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী উপজাতি “বিষ্ণুকো” বক্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বহুবিবাহ-প্রথার কু-কলট বিবৃত করিয়াছেন।

নগেন্দ্র নামক এক ধনী জমিদার সূর্য্য-সুখীকে বিবাহ করে। উহারের পরম্পরের মধ্যে খুব ডাগবাগ ছিল। ত্রয়ণ-পথে

সমস্ত এরটার অবস্থা এইরূপ :—

১৮৭২ অব্দে “বেঙ্গল বিবাহ-আইন” জারী হয়; ই আইনে, পুরুষের বিবাহের বয়স ১৮ বৎসর ও বালিকার বিবাহের বয়স ১৫ বৎসর নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাহালা-নিয়মিত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া ঘোষণা করিবে তাহার দ্বারা প্রভাবিত আর কেহই এই আইনের ক্ষেত্রে আসিবে না :—যথা :—হিন্দুধর্ম, মুসল-মানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম, জৈনধর্ম। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও “পরিষ্কৃতিষ্ট” সম্প্রদায় হাড়া আর কাহারও সম্বন্ধে এই আইনের প্রয়োগ হয় না।

১৮৮৫ অব্দে, আইনের দ্বারা বালাবিবাহ নিষেধ করা হয়। কিন্তু বাহালা একটা আন্দোলন আরম্ভ করেন; কিন্তু ১৮৮৬ অব্দে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন। ১৮৯০ অব্দে, একটি ক্ষুদ্র বালিকার বিবাহ হইয়া, বিবাহের পূর্ণ-পরিপক্ক-সাধন একটু বেশী দীর্ঘ হওয়ার, তাহার সূত্র হয়,—এই সূত্রের দ্বারা আবার আন্দোলন শুরু হইল এবং তাহার ফলে ১৮৯২ অব্দে “সম্মতি আইন” বিধিবদ্ধ হইল। সেই অর্থাৎ, বিভিন্ন সভাসমিতি, বালাবিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সভ্য-সংখ্যা অল্প হওয়ায়, সেই সভ্যদিগের বাহিরে আর কোথাও তাহাদের চেষ্টা ফলপ্রসূতি হয় নাই।

আইনের সর্ব-অনুসারে, নারী “বৈবাহিক অধিকার পুনঃস্থাপনের” জন্য ন্যায়মত প্রদানের করিতে পারে। যে অল্পবয়স্ক বালিকাকে বিবাহের পর বউরালয়ে তথ্যাবধানার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই বালিকার পতি মনের দিকট হইতে আত্মগোপনের সাহায্য লইয়া ব্যয় পত্রীকে নিজ গৃহে আনিয়া তাহার সহিত সহবাস করিতে বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ ব্যবহার বরণ, কতকগুলি দুঃখপীড়িত লোক ভারতীয় ইংল্যান্ড-সরকারকে এসকলভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু লোকের আইনভেদ, পত্রীকে পতিগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার পতির আছে। দুঃখপীড়িত লোকেরা আরও এই ব্যবস্থা যদি বেশী অস্বীকার হইয়া থাকে,—সে ঘোষণা হিন্দু রীতিনীতি,—ভারত-সরকারের মধ্যে।

(৩) উচ্চবর্ণ বাঙ্গালীদের মধ্যে, বিশেষত অল্প ব্রাহ্মণেরা বাহালাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সন্মত সেই কুলীনব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা সম্বন্ধে প্রচলিত। কুলীনদের পণ গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি পত্নী গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সব পত্নী পিতৃগৃহেই বাস করে, পিতৃগৃহেই তাহাদের সূত্র হয়। কলিকাতার “সত্যবতী” পত্রিকা হইতে M. P. N. Bose কতকগুলি সূত্রীত উদ্ধৃত করিয়া বর্ণনা প্রদেয় বিবাহের :—১৮৮০ অব্দে, ৪জন বাঙ্গালী ৩০, দুইজনের ৩২, একজনের ৩৪, একজনের ৩৬, একজনের ৩৮, একজনের ৩৯, ও একজনের ৩৯৭ পত্নী ছিল।

বৈবাহিক কুম্মনন্দিনী নামক একটি নিঃসঙ্গল অনাথা যুবতীকে দেখিয়া নগেন্দ্র তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কুম্মনন্দিনীর অপূর্ণ রূপলাবণ্য। মৌন-প্রকৃতি, শান্ত, ধীর ও প্রেমাসক্ত। কিন্তু সেখাগড়া জানে না,—যেবহিঃসাহীন, নিরুদ্ভব ও নিতেজ। নগেন্দ্র তাহার প্রেমে উদ্ভূত হইল। স্বর্ঘ্যমুখী যখন দেখিল, কুম্মের প্রেমে নগেন্দ্র ওষ্ঠাগতপ্রাণ তখন কুম্মকে বিবাহ করিবার জন্ত নগেন্দ্রকে জিদ করিয়া বলিল। কিন্তু স্বর্ঘ্যমুখী তখন আপনার মনের বল ঠিক বুঝিতে পারেন নাই—তাহা অপেক্ষা আর একজনকে নগেন্দ্র বেশী ভালবাসে একথা তাঁর সহ্য হইল না। স্বর্ঘ্যমুখী গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন।

স্বর্ঘ্যমুখী তাহার ননদকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

“বেগিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র স্নেহ নাই, তিনি কুম্ম-নন্দিনীর জন্ত উদ্বাহগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুম্মনন্দিনীকে আবার ফলনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে স্ত্রী করিব। কুম্ম-নন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেননা, আমার স্বামী কুম্মনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুম্মনন্দিনীকে পুনরুদার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আশনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

“কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম; কিন্তু

স্বামীর যে স্নেহের কামনার আপনার প্রাণ আপনিই বধ করিলাম, সে স্নেহ হই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উত্তর সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি স্ত্রী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

“তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

“আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমন ভরসা নাই। কুম্মনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না, আর আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে কিরিব, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব, আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রতীতি হইল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা-রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু

কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম
আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু
আমার ইলিবার যে কপা আছে, তাহা
কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না বলিয়া
তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি বেমন
করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া
আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে
বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ
করিয়া আমি বেশান্তরে চলিলাম না।
তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও
তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও
করিব না! তাঁহাকে ঘনে হইলে আল্লাহ
হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার
উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল,
যতদিন না মাটিতে এ মাটি মিশে, ততদিন
থাকিবে। কেননা তাঁহার সহস্র গুণ আমি
কখনও ভুলিতে পারিব না। এত গুণ
কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই
বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক বোঝে
যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম,
তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার বোঝা
নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত
বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে
বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে
যে, আমি কত দুঃখে সর্জতাগিনী হইতেছি।
“তোমার কাছে জন্মের মত বিদায়
হইলাম, আশীর্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র
দীর্ঘকালী হউক। তুমি চিরস্বামী হও।
আরও আশীর্বাদ করি যে, যেদিন তুমি
স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন
যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমার এই
আশীর্বাদ কেহ করে নাই।”

একজন খুব উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক,
মালাবারি এইরূপ বলেন :—

“হা, একটা-গীতে আছে,—বাহাদেব
ছন্দ পবিত্র, বাহাদেব অন্তঃকরণ সরল,
তাঁহাই যেন নারীদিগের ভাগ্যবিধাতা হয়!
ভেঙ্গে ফেল নারীদের পারের শিকল;
তাঁহারা গোলাম, তাঁহারা বলির পণ;
তাঁহাদের সমস্ত জীবনটা, আনন্দের আঁকাঙ্ক্ষা
করে, সত্য অধিকাররূপে লুপ্তের দাবী করে।
...যখন এই ব্যাধি দূর হইবে, যখন বিধবারা
দুঃখ-আঁধার হইতে মুক্ত হইয়া আবার
আলোকে আসিবে তখনই ভারত প্রকৃত-
রূপে বর্ষভরত উপর জয়লাভ করিবে,
আবার সত্যদুগ্ধ আরম্ভ হইবে,—অজ্ঞাতপূর্ব
এক আনন্দের যুগ আরম্ভ হইবে।

বিধবার এই মুক্তিধাতা,—বিধবানবের
হিতকারী বন্ধু—এই উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত
হইবে। তাঁহার ঘণোভাতি স্বর্গাক্রমণের
স্তায় অগতে উদ্ভাসিত হইবে। আর
অজিকার দিনে বাহারা নারী-পীড়ন অপরাধে
অপরাধী, বাহারা শাস্ত্র-বচনের অর্থ মিথ্যা
করিয়া ব্যাখ্যা করে, সেই অত্যাচারী পাবিত্র-
দিগের অস্ত পুরালোকে অশেষ দুঃখ, অনন্ত
দুর্গতি সঞ্চিত রহিয়াছে। আহা না, তাহা
নহে—যে সকল পরার্থচিত্ত মহাত্মাদিগের
আন্তরিক প্রার্থনা দুর্জনের সাহায্যার্থ স্বর্ণ
হইতে অবতীর্ণ হয়, সেই মহাত্মাদিগেরই
নয়নাশ্র-বারি এই অত্যাচারী নরান্দমদিগের
অন্তঃস্বার্থনা আনিয়া দিবে।

হার, একশে কি-কষ্ট কি-দুর্দশা! যেন
—কতকগুলি বাল-বিধবা, কতকগুলি
বুড়গারী শিশু,—বাহাদিগের সরল অকপট

চক্ষু আগেয় দিকে উন্মুক্ত; অণেক
 তাহু'দিকে বলিতেছে, 'এখানে আশা রাখ'।
 আরও দেখ—এমন কতকগুলি না দেখিতে
 পাওয়া যায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বাহাদিগণের
 হইতে নিবারণ করে। দুর্জয় তার ধরণ
 তাহাদের সর্বনাশ হইয়া থাকে—তাহারা

পতিতা হয়। মার্কিনীর তাহাদের সেই
 দুর্জয়তা! এই দুর্জয়তার দোষে, তাহাদের
 যে সম্মান ভূমিষ্ট হয়, সেই শিক্তর গলায়
 ফাঁস লাগাইয়া তাহারা কাবিত্তে কাবিত্তে
 সেই শিক্তকে হত্যা করে।"

ঐজ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর।

সুন্দরের বরণ

(জামী হইতে)

হে চির জন্মের দেব পরম প্রেমিক
 তব পূণ্য স্মধুর সতি,
 এ বিশ্বের নরনারী জনয়ে জনয়ে
 প্রেমরূপে ভাগিতেছে নিতি।
 তোমারি আনন্দ-উৎসে রসধারা পিয়ে
 প্রেমিকের কর্ণে কুটে তাবা,
 তোমারি চরণ-ছায়ে, প্রণাম করিয়া
 বিনিময় করে ভালোবাসা।
 তুমিই পাগল কর প্রেমিকা-প্রেমিকে
 তুমি প্রবন্ধনরের প্রাণ,
 নাহি রূপ ছাড়া প্রেম তোমা ছাড়া রূপ,
 প্রেম-বিনা যাহু পাষণ।
 কর তুমি 'সমুদ্র'র শোণিত ঢঞ্চল
 গণ্ডস্থলে রহি 'গদা'র,
 শিরীশের রক্তাধরে মাধুর্য্য হইয়া
 সত্ত কর প্রিয়জনে তার।

এ বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-মায়া ঘন ঘনিকা—
 অন্তরালে হইয়া আসীন,
 করিবে বকমা ঘোরে হে প্রবন্ধনর,
 কতদিন—আরো কত দিন?
 ছিঁড়ে ফেল ঘনিকা পূর্ণরূপে আগে
 দূর হতে কেন উকি দাও,
 যম আত্মবালিকারে পুতুল-খেলার
 মিছে আর কেন গো জুলাও।
 নববধূ দম আমি বর-প্রতীক্ষার,
 এস আজি শুভদৃষ্টি হোক,
 বিশ্বের সকল আলো জুলাইয়া দিক্
 তব দীপ্ত আধির আলোক।
 লাজ-নন্দ বধুটির কন্ড কর আধি
 আর যেন চাহে না বাহিরে,
 পূর্ণইন্দুহার তুমি ভাগ চিরদিন
 হে স্নানর, ছদ্ম-নিম্নতীরে।
 ঐকালিনাস রায়।

বাদলার গল্প

দিনটা তারি মেঘলা; সকাল থেকে সেই যে ইন্সেপ্টি হুক হইয়াছে, খামিয়ার আর নামটি নাই। সমস্ত আকাশটার রং যেন বর্ষার শুষ্ক, ঘোলা গঙ্গাজলের মত। পথ-ঘাট কাদার-কাদার একেবারে প্যাচ-প্যাচ করিতেছে।

পরেরের বৈঠকখানার বসিয়া সন্ধ্যা-বেলায় জনকতক যুবা সিগারেট তৃপ্তিতে-ছিল, তামাক টানিতেছিল, গল্পগুজব করিতে-ছিল।

নার্থিক আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, “ভাগ্যে আজ ববিবার,—নৈলে এই বাদলার জুতো বগলে করে’, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, পা পিছলোতে-পিছলোতে আপিসে ছুটতে হোত। ওং, বড্ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে!”

হরেন মুখতার করিয়া বলিল, “ঘরে যাই! বেঁচেছে ত তারি! এমন বেঁচে লাভ কি,—হুগার একটামাত্র রবিবার—গাধল মেঘে সেটিও বাজেধরচ হোল!”

পরের হাই তুলিয়া তৃপ্তি দিতে-দিতে বলিল, “বাজেধরচই বা হবে কেন,—পার-ত কাজে খাটিয়ে নাও না! শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি কতর মত বর্ষারও ত একটা বিশেষত্ব আছে—সে বিশেষত্ব যে উপভোগ করতে পারে, তার কাছে কিছুই বাজেধরচ হার না।”

হরেন বলিল, “কবির মত একহুড়ি বাক্যবার ত কয়লে, কিন্তু তোমার মত

আমরা সবাই ত আর কবি নই,—কাজেই বর্ষা নামলে আমাদের বলতে চর—‘পারে জুতো পথে কাদা যাই কেমন করে’! এই সমস্তের বর্ষার রাস্তার কাদা-ঘেঁটে মরা কিংবা ঘরের কোণে সেই সান্দ্রগন্ধপূর্ণি চিরপুরাতন দ্বার কাছে হাত-পা গুটিয়ে বসে গগনার বাঘনা শোনা ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব আমি ত দেখতে পাই না।”

নবীন হস্ত করিয়া সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “ভুল হরেন, ভুল! প্রথমত, যা বললে সে গুলো তোমার বিশেষত্ব হতে পারে—বর্ষার নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের সকলকার স্ত্রী পুরাতনও নন, গন্ধরূপিনীও নন, স্বামীকে পাশে পেলে গগনার বাঘনাও ধরেন না!”

রমেশ আলবোলায় নলটা পরেশের হাতে দিয়া কহিল, “নিশ্চয়, আমি তোমার বাক্য সমর্থন করি নবীন!”

হরেন চট্টয়া বলিল, “তুমি আর মুখ নেড়ে না রমেশ! তোমার ত বিধে হয়েচে আজ তের বছর, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে এখনো নবীনা বলতে সাহস কর?”

রমেশ বলিল, “আলবৎ! কেননা, আমি আমার স্ত্রীকে কি-মানে দিন-পনেরোর জন্তে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে পুরাতনে নুতনত্বের রসান দিয়ে নি।”

রমেশ কোনদিকেই আঁটিতে না পারিয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া বলিল, “আজ্ঞা, বর্ষার বিশেষত্বটা কি, শুনি!”

মাণিক বলিল, “সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।”

—“কি?”

—“প্রথম, আক্কাই বসে পাঁচজনে মিলে-মিলে গল্পস্বয়ং করা।”

—“সে ত হচ্ছেই।”

—“দ্বিতীয়, ততিশবা; নারিকেল-কুচি আর গম্বাপরম মূল্যবান সহযোগে মুড়ি জঙ্কণ। তৃতীয়, সেই সঙ্গে দাবাবোড়ে, পাশা বা তাস খেলা, কিম্বা—”

—“তাপ-দাব-পাশা—ও; তারি বিশেষ্য।”

—“কিম্বা ভূতের গল্প-শোনা।”

পরের সোৎসায়ে বলিয়া উঠিল, “Bravo ! ঠিক বলেছ। মুড়ি-টুড়ি আমি এখনি আনিরে মিছি, কিন্তু ভূতের গল্প বলবে কে?”

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ তাকিয়ার উপরে নিশ্চেষ্ট ভাবে আড়্ হইয়া চক্ষু মুদ্রিয়া তাবুলরস উপভোগ করিতেছিল। এখন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল, “মুড়ি-মূল্যবান তার যদি পরেশ নেই, গল্প-বলার তার তাহলে আমি নিতে পারি।”

—“কিন্তু, ভূতের গল্প!”

—“অবস্ত্র, অবস্ত্র!”

—“আর, সত্যঘটনা!”

—“নিশ্চয়। গল্পের নায়ক হচ্ছে, আমি।”

—“আর, নারিক?”

—“আমার প্রিয়তমা।”

—“সাদু! সাদু!—এতদিনে এককোড়ো বাস্তব নায়ক-নারিকার সন্ধান পাওয়া

গেল! ওহে পরেশ, মুড়ি আনাও, মূল্যবান ভাঙাও!”

বছুরা সবাই সাগ্রহে চন্দ্রনাথের চারিদিক ঘিরিয়া বসিল।

• • •

বাহিরের মেঘলা আকাশের দিকে একবার চাহিয়া চন্দ্রনাথ আরম্ভ করিল :—

“সে-সময়ে হাওয়া খেতে আমরা মধুপুরে গিয়েছিলুম।

বে বাড়ীতে আমরা ছিলুম,—সেখানা খুব বড়সড়, সামনে বাগান, কাছেই নদী।

তোমরা সবাই জান ত, মধুপুরে গিয়ে আমরা—গারদরকীরা, মেয়েদের পাহের বেড়ী বেপনোয়া হয়ে খুলে দি। মেয়েরাও এমন চর্লিত সুযোগের বোলআনাই কাজে খাটিয়ে নিতে কিংকিম্বাত গ্যাকিলি করেন-না, রোহ পড়নেই তাঁরা আলতা-পর্য পদদুগলের সম্ভাবহার করতে দলে দলে রাতারা বেরিয়ে পড়েন।

কমলাও (বলাবাহুল্য, আমার স্ত্রী— এই গল্পের নারিক) এ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হই-নি। সেও রোহ মাথার আধ-খোমটা টেনে, গ্রীষ্মেও গারে একখানি শীতের আলোয়ান জড়িয়ে, আলতা-পর্য পাহে রাতারা বেড়াতে বেরত।

মেয়েদের বহুসংগ্রহের কমতাও অকৃত। বেড়িয়ে এসে কখনো গ্রাহই বলত, “আজ একটা বৌয়ের সঙ্গে ভাব হোল।”

—“কে?”

“অমুক বাবুর বৌ। কলকাতায় বাড়ী। গারে এক-গা গরনা।”

করি গারে কত গরনা মেয়েরা সকলের আগে সেটা ভাল করে চোখ-বুলিয়ে দেখে

নেহ। কমলাও গরনার 'কম-বেশী'র বেখে আমার কাছে সমালোচনা করত—বেখ, অমুকের গারে এত গরনা—নিশ্চয় খুব বড়-মহিষের বো। অমুকের হাতে শুধু ছ-গাছা বালা আর চুড়ী—তার বর নিশ্চয় তাকে বেখেতে পারে না।”

প্রায় মুখে শুনে আরো বৃত্তম, কমলার এই নিতুই-নুতন বন্ধুর হল একদিনের আলাপেই বেফাঁস হয়ে এত ইঁড়ির খবর বলে ফেলত যে, আমরা—পুরুষরা, দশবছরের আলাপেও কোন বন্ধুর কাছ থেকে তত পেটের কথা আদায় করতে পারি না।

কমলা একদিন নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ সমাপ্ত করে এসে বললে, “ওগো, আমি আমার নেমস্তন্ন।”

আমি বিস্মিতভাবে বললুম, “নেমস্তন্ন! কোথার?”

—“সেই যে অমুক বাবুর পরিবার—যার কথা পরশুদিন তোমার বলেছিলুম।”

—“কি হুতিল, পথে-পথে আলাপ আর পথে-পথেই নেমস্তন্ন!”

কমলা চোখ-মুখ গুরিয়ে বললে, “অবস্ত্র!—

‘আমি ত তেমন সেরে নই!

আকাশ বুড়ে আমি লগা,

পাতিয়ে নিছি দই।’

পথেই এখন আমার আগ্রাসী,—সুতরাং পথেই নেমস্তন্ন!”

—“কিন্তু পথেই যে পাত পাতবে না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাদের বাড়ীতে ত পুরুষমহোদয় আছে, তুমি একলা বাবে কি করে?”

কমলা কৃত্রিম কোপকটাকে আমার

গোঁক টেনে দিয়ে বললে, “হে জটিল-কুটিল নিপট-কপট শঠ, হে সম্মোহের সূক্ষ্মমান অপদেবতা! ‘আশুত্ব হও, তোমার এ সম্মোহ অমূলক! কেননা, পুরুষের ভেতরে একটি পনেরো-ষোল বছরের তাই, হঠাৎ কি দরকার পড়াতে বউটির বর কল্কেতার গেছেন, কাল আসবেন। বাড়ীতে থাক্কার মধ্যে শুধু একপাল মেয়ে আর ঐ বাচ্ছা পুরুষটি। সে-সব না জেনেই কি নেমস্তন্ন নিয়েছি? আমি কি তেমনি হাঁদা গা?—আর, এখান থেকে এমন-কিছু দূরেও নয়—এই খানতিনেক বাড়ীর পরেই। যাবার সময় কী-চাকরকে সঙ্গে নিয়ে যাব,—না গেলে তারা কি মনে করবে বল দেখি?”

আমার এই প্রাণ-বলটি কিংবা অতিরিক্ত এবং অস্তায় রকমের মুগ্ধতা। সুতরাং তার মুখবন্ধের জন্ত আমি বললুম, “প্রিয়ে, লেক্চার খামাও—আমি রাজি!”

কমলা উচু হয়ে আমার গলা জড়িয়ে (আমি লগা ছ-কুট তিন ইঞ্চি, প্রিয়তমা সহজে আমার নাগাল পান না) ধরে বললে, “তুমি আমার শোখানা স্বামী—তাই ত তোমার চরণে কাঞ্চনোপ্রাণে আমার এ জীবন-বোঝন রূপে নিশ্চিত আছি। তে প্রিয়তম, তোমার উচু মাথা নিচু কর, নৈলে আমার চূষন অন্তর্ভুক্ত পৌছুবে না!”

চন্দ্রনাথ চঠাৎ মাঝপথে ধামিরা পড়িয়া বলিল, “ওহে, মুক্তি-কুণ্ডলি এখনো এল না যে!”

পরের বলিল, “দৈর্ঘ্য ধর, এল বলে। তলু তৈলে এখন সংস্কারের দ্বারা

মহাশমারোরে দুর্ভুরি অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন
হচ্ছে, -রাত্রাঘর থেকে ঐবে ভ্রামের বাণীর
চেয়েও স্তম্ভুর ছাঁক-কল্কল ধ্বনি আসচে
—গুনচ না ?”

রমেশ বলিল, “ওহে চন্দর, ভূত কৈ
—বিনামূল্যে হুড়ি-হুড়ুরি খেতে চাইলে ত
চলবে-না ! বল গল্প, খাও হুড়ি—ফেল কড়ি,
মাখ তেল,—ভদ্রলোকের এক কথা !”

চন্দ্রনাথ বলিল, “রও, আগে গোড়াটা
কেঁধে-নি ! নৈলে শেখটা তোমাদের দেয়ার
মুখে টেকব কেমন করে ? তারপর,
শোন !—

সন্ধ্যার একটু আগে শোবার ঘরে
ঢুকে দেখি, বিছানার পাশে পাড়িরে
কমলা আমার একটা হাতা শেলাই করছে।

আমি বদুম, “একি, মাঝগোছ করে’
অসময়ে হুঁচ নিয়ে কি হচ্ছে ?”

কমলা মুখভার করে’ বললে, “দেখনা,
পোড়ারমুখী ‘কুমী’র কীর্তি ! আমি কাপড়
পর্চি, জামাটা ওখানে ঝার করে’ রেখেছি,
আর কুমী এসে কিনা আমার হাতাটা
পাতে করে’ ছিঁড়ে দিলে ! তাগো রেখবের
সুতোয় বাঙালিটা সঙ্গে এনেছিলুম, তাই
তাড়াতাড়ি শেলাই করে’ নিচ্ছি। ধাও-ত
হতভাগার পাতগুলো ভেঙে !”

ঘর নামের’ গোড়ার কমলা দু-দুটো
হুন্দের বিশেষণ প্রয়োগ করলে, সেই কুমী
হচ্ছে আমার সখের কুকুর। কমলা বখনি
তার পাত ভানবার আদেশ দিলে, তখন
সে বুকে নিলে তার বিকড়ে মস্ত-একটা
বড়বড় হচ্ছে। আমি যেই তার দিকে
তাকালাম, সে অমনি পেটের তলার লাজ

ঢুকিরে হুড়ুুু করে’ দর থেকে সরে
পড়ল।

কমলা হেসে বললে, “দেখেও, হতভাগা
মাস্থের চেয়েও চালাক। বোঝে সব,
জামা ছিঁড়েচে চুটুনি করে’।”

এমনসময় চাকর এসে খবর দিলে,
কমলাকে নিয়ে ঘাবার অস্ত্রে লোক এসেছে।

কমলা বললে, “বল-গে যাচ্ছি। ঢুই
আর বী আমার সঙ্গে বাবি।”

চাকরটা, একটু জড়সড় হয়ে বললে,
“না, আপনি কি সেখানে বেশী রাত
পর্যন্ত থাকবেন ?”

—“কেন, সে খোঁজে তোর দরকার
কি ?”

—“না না, মালী বলছিল ও-বাড়ীতে
ভূত আছে। রাত হলে তারা গান
গায়—তবলা বাজায় !”

কমলা ত হেসেই অজ্ঞান ! বললে,
“আচ্ছা, আচ্ছা, ভূতকে আমি মানা করে’
দেব—সে যেন তোর বাড়ি না মটকার।
নে, এখন চল !”

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে কমলার
পিছু-পিছু গেল।

কমলা চলে গেলে পর, আমি জুতো
খুলে বিছানার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লুম।
হাতের কাছেই রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থাবলী
পড়ে ছিল, সেখানা তুলে নিয়ে একটা গল্প
পড়তে লাগলুম। সেটা ভুতের গল্প।

রাজিতে তোমরা কৈউ যদি ভূতের
গল্প পড়ে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই জান যে,
পড়তে-পড়তে কি-রকম একটা অকারণ,

অজ্ঞাত আন্তরে মনটা গুমোট হয়ে আসে। বিশেষ, গল্পটি যদি আবার ভাল লেখকের লেখা হয়! কারণ, ভাল লেখকরা আশুপতির রংটা এমন করে' কলিয়ে তুলতে পারেন, যে মনে হয়, বা পড়ি তা সব সত্য—একবারে বাস্তব আর বাস্তবিক। রবীন্দ্রনাথের কবলে পড়ে আমারও সেই হাল হোল। পড়তে-পড়তে বোধ হতে লাগল, গল্পের সেই ভূতড়ে কাণ্ড আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!

হঠাৎ মনে পড়ল, নেমন্তরে দাবার সময় চাকরটা কমলাকে বলে ছিল, যে বাড়ীতে সে যাচ্ছে সেটা হানাবাড়ী। আশ্চর্য্য কি! মধুপুরের এই ভাড়াটে বাড়ীগুলোতে কত-কতকের রুগী আসে আর মরে—এখানে কোথায় কি আছে, কে বলতে পারে?

এই, আমি যে বাড়ীতে আছি, এটাও ত ভাড়াটে বাড়ী, এখানেও লোক মরেছে নিশ্চয়, এ-বাড়ীতেও ত ভূত থাকতে পারে! কথাগুলো মনে হোতেই গা-টা কেমন ছমছম করতে লাগল। ভূতের ভয় রাত্তিকালে প্রবল হয় কেন? কারণ, রাত্তির সঙ্গে এমন-একটা রহস্যের ভাব আছে, যাতে-করে' সম্ভব-অসম্ভবের মাক-খানকার তলাংটা একেবারে খুঁচে যায়। দিনের আলো হচ্ছে বাস্তব, তার মধ্যে আবছায়া, আধ-চাকা বা গোপন কিছুই থাকবার যো নেই; আর রাতের অন্ধকার হচ্ছে অসম্ভবের বাসা, তার মধ্যে নজর চলে না, তাই তত-কিছু কাননিক, অদেখা, অচেনা ব্যাপার আড়ালে আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।... ..

একটা মেঠো হাওয়া এসে আচমকা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে আগোটা গেল নিবে।

আন্তেআন্তে বিছানা থেকে নামলুম। অন্ধকারেই জুতো পরে বেশলাইটা কোথায় আছে—হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে লাগলুম। বেশলাইটা খুঁজে বের করে' আলোর দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ পিছনে কিসের একটা শব্দ হোল।

ধম্কে গাড়িয়ে পড়লুম। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না—দলও আর নেই। ডাবলুম, বাতাসে বোধহয় ঘরের কোন জিনিষ নড়ে উঠেছে।

কিন্তু, আবার বেই আগোর দিকে এগুব,—কের সেই শব্দ!—না, এ ত বাতাসে জিনিষ-নড়ার শব্দ নয়! ফস করে' বেশলাই জাললুম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। তবে কিসের শব্দ এ?

না, এসময় অন্ধকারে থাকা সুবিধের নয়—আগে আলো জ্বলে তবে অস্ত্র কথা। কিন্তু ততবার আমি আলোর দিকে এগুতে বাই, ততবারই ঠিক আমার পিছনে কিসের শব্দ হয়, অথচ আমি ধম্কে গাড়িয়ে-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দটাও থেমে যায়। ক্রমাগত বেশলাই জালতে লাগলুম,—কিন্তু ঘরের তিনতরে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

এ ঘরে একখানা 'বাট, একটা ছোট টেবিল আর খানজুই 'বেটউড' চেয়ার ছাড়া আর-কিছু আসবাব ছিল না—সুতরাং কেউ যে কোথাও সুঁকিরে থাকবে, সে সম্ভাবনাও নেই।

ঘরে কেউ নেই—অথচ শব্দ হচ্ছে,

এর মানে কি? তবে কি বা ভাবছিলুম, তাই?—এটা কি হানাবাড়ী?—আবার সমস্ত বেহ ডরে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এতক্ষণ ঘর ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, এখন ঘেঘের ফাঁক থেকে আবার টাছ ঘুটে উঠল। জানলা দিয়ে ঘরের 'মাবে-মাবে' জোৎস্নার শিখা এসে পড়ল।

অন্ধকার বে ছিল ভাল! এই খানিক কালো, খানিক আলোতে সমস্ত ঘরখানা বেন অপার্ণিব হয়ে উঠল। মনে হোতে লাগল, আমার চারিদিকে বেন অনেকগুলো ছায়াশরীরী রক্তপিপাসু প্রেতাচ্ছা, তাদের শিল্পিক কঙ্কাল-বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে উৎপেতে শুন্ হরে বসে আছে, যে-কোন মুহূর্তে তারা সবাই মিলে একসঙ্গে হুড়-হুড় করে আমার বাড়ের উপর লাঙ্কিরে পড়তে পারে!

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু আর কোন শব্দ পেলুম না। তবে কি এতক্ষণ আমি মিথ্যাত্বের কুশল দেখেছিলুম? তাই হবে! কুতের গল্প পড়ে মাথাটা আমার বিগড়ে গিয়েছিল, নিশ্চয়!

একটু আশ্বস্ত হয়ে আবার এক-পা এক-পা করে এগুতে লাগলুম। আবার—আবার সেই শব্দ! শব্দটাও ঠিক আমার পিছনে পিছনে এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছে। চকিতে কিরে দাঁড়ালুম,—কেউ কোথাও নেই! আমি খুব জোরে জোরে পা কেলে জানলার দিকে এগিয়ে গেলুম, —সে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অমাহুষ শত্রুর পদ-শব্দও আমার পিছনে পিছনে এগিয়ে এল—থুপ, থুপ, থুপ!

ভয়ে আর পিছনপানে চাইলুম না। কে জানে—কি দেখতে কি দেখবে! প্রাণ-পণে জানলার পরাশেগুলো দুহাতে আঁকড়ে রইলুম।

দেখলুম, রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে একটা লোক যাচ্ছে সে আমার এত কাছে,—কিন্তু আমার মনে হোল, কাছে থেকেও সে বেন বহুদূরে! তার আর আমার মাঝখানে বেন প্রেতলোকের একটা অদৃষ্ট বহনিকা পড়ে গেছে। তাকে টেঁচিরে ডাকতে গেলুম—কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেকল না।

আকাশের গারে উড়ন্ত ভিমির-পিণ্ডের মত একটা পাঁচা, ভীষণ কর্কশ চীৎকারে মৌন নিঋতকে বিদীর্ণ করে দিয়ে কোথায় উড়ে গেল। আমার প্রাণ বেন গলা-পর্বাণ্ড উঠে দুক্‌হুঁ করতে লাগল।

এঁয়ে—পথ দিয়ে লঠন নিয়ে কাজা আসচে না?—এ কি—করলা আসছে? হ্যা, তাইত—ঐবে, ওরা আমার বাড়ীর বাগানের ভিতর ঢুকল। আঃ—বাঁচলুম!

তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে ঘরজার দিকে ছুটে গেলুম—সঙ্গেসঙ্গে ঘরের একখানা 'বেন্টউড' চেয়ার হুড়হুড় করে আমার দিকে সরে এল—তারপরেই পিছন থেকে কে-বেন আমার একখানা পা টেনে ধরেই ছেড়ে দিলে!... .. আমার পাহাটো ঠিক পাখরের মত হয়ে গেল, বুকের মধ্যে প্রাণটা বেন হুড়হুড় করে আছড়ে মরে গেল—ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে "আমি সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম!"

চন্দ্রনাথ গল্প খামাইয়া শ্রোতাদের সুখের দিকে চাহিল। বাহিরে তখনো ঝুঁকুঝুঁকু করিয়া “বুড়ি” বরিতেছে—মাকে মাকে ঘরের ভিতরে কোলো হাওয়া ঢুকিয়া ‘আল্ফ্যান্যাক’র ছবিগুলো বোলাইয়া দিয়া বাইতেছে। গল্পটাও রীতিমত অমিয়া উঠিয়াছে। ঘরের দেয়ালে কালো-কালো ছায়া কেলিয়া শ্রোতাগণ চন্দ্রনাথের সুখের দিকে রুদ্ধনিশ্বাসে বিক্ষারিত চক্ষে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ গর বন্ধ হওয়াতে সকলে মহা উষ্মে, সাগ্রহে, সম্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তারপর! তারপর!”

চন্দ্রনাথ গবাই-লক্ষ্মির চালে খামিয়া খামিয়া বলিল, “তারপর? তারপর—বুকেছ কিনা—বা ঘটল, সে একেবারে—ওর নাম কি—অবর্ণনীয় ব্যাপার। আচ্ছা, আমার গল্পটি ক্রমশঃকাত্ত হলেই ভাল হয় না কি? আজ ত কাটল,—আগামী বাদলে এটি সমাপ্য।”

—“না, না! স্টীপ্লির বল বল্চি! নইলে সুড়ি-মুগুরির থালা কেড়ে নেব এখন!”

—“বুকেছ। তোমরা বোধহয় জান যে, খালি থালা ভক্ষণ করা আমার অভ্যাস নেই—সুড়ি, মুগুরি ইত্যাদি সমস্তই এখন আমার উর-সিন্ধুকে আবদ্ধ। তবে সবাই যখন এতই নাছোড়বান্দা, আমার ‘মধুরেন সমাপণে’ করতে আপত্তি নেই। শোন—

যখন জ্ঞান-হোল, দেখলুম, শিরের হেঁট হয়ে কমলা আমার মাথায় জল চালাছে—কী বাতাল করছে, চাকরটা লঠন-হাতে পাড়িয়ে আছে।

আমার জ্ঞান হোতে দেখে কমলা উষ্ম হরে জিজ্ঞাসা করলে, “হাণা, কি’ হয়েছ তোমার!”

আমি ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাইতে-চাইতে উঠে বসলুম। তারপর বললুম, “কমলা, ঘরে কোন শব্দ-উষ্ম হচ্ছে না? ভূতটা চলে গেছে ত?”

—“ভূত! ভূত কিগো?”

—“হ্যাঁ, তরানক ভূত—দেখা যায় না অথচ শব্দ করে; মাথায় ধরে!”

—“ওমা, তুমি বলছ কি!

দেখেছ না কি?”

—“স্বপ্নই বটে! এও যদি স্বপ্ন হয়, তবে আমি স্বপ্ন—তুমি স্বপ্ন—সবই স্বপ্ন!”
—এই বলে কমলাকে একে-একে সব কথা গুলে বললুম।

সব বলা হয়ে গেলে মুখ তুলে দেখি, লঠনটা কেলে চাকর, পাখাখানা কেলে কী-মাসী সে মুল্লুক ছেড়ে সরে পড়েছে।

পরদিন ভোরবেলায় হঠাৎ চটুল হাসির কলরোলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে চোখ-কজলে চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে বসে কমলা মুখে কাপড় দিয়েও কোনমতে হাসি চাপতে পারছে না। হাসতে-হাসতে তার চোখ দিয়ে জল গড়ছে।

—“হয়েচে কি, অত হাসির ঘটনা কেন?”
কমলা হাসতে-হাসতে হাত নেড়ে আমাকে সবুর করতে বললে;—অর্থাৎ, আগে সে প্রাণ তবে হেসে নিক, তারপর কথাবার্তা। আমি অথাক হয়ে বসে রইলুম।

তারপর হাসির ধুম যখন একটু কমল,

কমলা তখন উঠে, আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। বললে, “গুণমাণ, কালকের সে ছরস্ব ভূতটাকে, তদন্ত করে” আমি আশ্ব এই ঘটনাস্থলেই প্রেরণার করেছি।”

—“কি?”

—“ভূত, মশাই, ভূত! যে ভূত দেখা যায় না অথচ শব্দ করে, মাহুয ধরে! এই দেখ!”

কমলার হাতে খানিকটা রেশমের সূতো!

—“ও ত দেখছি, সূতো!”

—“হু, এ-টুকু তোমার ঐ ‘আলবার্ট স্পিগার’র ভেতর থেকে আবিষ্কার করলুম।”

—“বেশ ত, হয়েছে কি?”

—“ঘরের চারিদিকে চেষ্টা দেখ। তাতেও যদি মশাই বুঝতে না পারেন, তবে আপনার গৌকজোড়া আমাকে বাধ্য হয়ে কর্তন করতে হবে।”

তাইত! ঘরের বেশিকে চাই—খালি দেখি কালো কালো রেশমের সূতো! দরজার কাছে, জানলার কাছে, টেবিলের চারিদিকে, চোরার পায়ের, সূতো—খালি বেশমের সূতো!

কমলা বা বললে, তার মর্মে এই :
নেহস্তরে ঘাবার সমগ্র সূতোর বাণ্ডিলটা সে বিছানাতেই তড়াতাড়িতে “কেলে গিয়েছিল। আমার পা লেগে বা যেমন করেই হোক—বাণ্ডিলটা বিছানা থেকে মাটিতে পড়ে যায়, সেই সময়ে কোনগতিকে খানিকটা খোলা সূতো গিয়ে পড়ে আমার সূতোর ভিতরে। তারপর ঘরের আলোটা বন্ধ নিবে। ভূতের গর পড়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় এখন আলো জ্বলতে নীচে নামি, তখন আমি সেই সূতো-মুহু সূতো পাবে দি। কাজেই, বখনি আমি চলেতে গেছি, সেই পারে-আঁটকানো বাণ্ডিল সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ করে উঠেছে। এই হ’ল ভূত-দেবার প্রামাণিক ইতিহাস!

কমলার কথা অনেককণ ধরে ভেবে দেখলুম!

Circumstantial evidence—এ তার কথা সত্য বলে যেনে নিতে হয় বটে! কিন্তু কি-কান—বলা ত যায় না—

ঐ:—

পুরাতন পূজার সাজ

বঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে, অনেকে সুখে ও মাসিকপত্রে সমালোচনাকালে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, উহা বঙ্গালার ইতিহাসই হয় নাই, কারণ উহাতে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি পাওয়া যায় না। অনেকে বলিয়াছেন যে গ্রন্থখানি ইতিহাস-

মূলক হইলেও উহাকে বঙ্গালার ইতিহাস নাম দেওয়া উচিত হয় নাই; Green-এর History of the English People-এর জায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ বধন বঙ্গালার রচিত হইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে এতদিনে বঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশিত

হইল। প্রাচীনযুগের বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস কখনও Greenএর ইতিহাসের স্তায় সম্পূর্ণবয়ব হইবে কিনা সন্দেহ। যে দেশের লিখিত ইতিহাস নাই, যে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহা অবলম্বনে ইতিহাসের কঙ্কাল যোজনা করিতে হয়, কোনকালে সে দেশে Greenএর ইতিহাসের স্তায় সম্পূর্ণবয়ব ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস কোনকালে ইংরাজ অথবা ফরাসী জাতির ইতিহাসের অথবা রোমক বা গ্রীক জাতির ইতিহাসের স্তায় সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। আধুনিক ইংরাজ অথবা ফরাসী জাতির ও অধুনা-বিশুণ্ড প্রাচীন রোমক ও গ্রীক জাতির লিখিত ইতিহাস ছিল। প্রাচ্য তুণ্ডে কেবল চীন ও জাপান দেশের লিখিত প্রাচীন ইতিহাস আছে। প্রাচীন মিশর অথবা বাবিলনের (Babylon) লিখিত ইতিহাস নাই। খোদিত লিপি, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি অবলম্বনে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডপ্রমাণ যোজনা করিয়া, এই সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কঙ্কাল একত্র হইয়াছে। প্রাচীন ভারত অথবা প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস এইরূপে রচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ইতিহাসের কঙ্কাল যোজিত হইলে যে দেশে যত অধিক উপাদান পাওয়া যায় সেই-দেশে প্রাচীন ইতিহাস তত সম্পূর্ণবয়ব হয়। মিশরে সর্কাপেঙ্কা অধিক এবং বাবিলনে "কিকিং" পদ্ধতিমাণ উপাদান পাওয়া গিয়াছে, এইজন্য প্রাচীন মিশরের ইতিহাস আর সম্পূর্ণবয়ব ও বাবিলনের

ইতিহাস কিকিং অবয়বসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে ও বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন ইতিহাস-রচনার উপাদান অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য, তাহা পাওয়া যায় তাহাও সকল সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে, এইজন্য প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস 'কঙ্কালসার' রহিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস-রচনার যে উপাদান পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না এবং বিশ্বাসযোগ্য হইলেও ব্যবহার করিতে পারা যায় না; কারণ সাহিত্যের

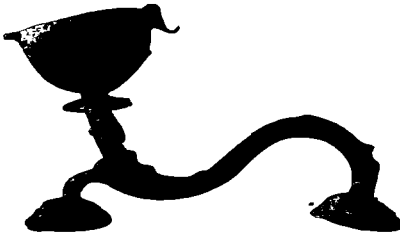


কপুরদান—সমুখ

প্রমাণ কোন যুগের ইতিহাস-রচনায় ব্যবহার করিতে হইবে 'ক'র করা যায় না। ইতিহাসের কল্পনা সম্পূর্ণবাহ্য করিতে হইলে প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করা আবশ্যিক। এখন বাংলা দেশে সামাজিক ইতিহাস বলিলে বাহ্যিক ব্যাপ্তি বলিতেছি। কলকাতার অবলম্বনে মেলবন্ধন, পট-বন্ধন, সমাকরণ প্রভৃতি কৌলীজ ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের বিবাহ-সংস্কার অধ্যায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ।

প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস বলিলে নাথবের আচার, ব্যবহার, জাতকর্ম, বিবাহ, অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া, রীতি-নীতি, ব্যবসায় ও ধর্ম প্রভৃতি ব্যাপ্তি। আনান্সিগের দেশে প্রাচীন সাহিত্যে ইহার অনেক উপাদান আছে বটে, কিন্তু তারিখ নিবন্ধ করা যায় না বলিয়া এই সমস্ত উপাদান ইতিহাস-রচনা কালে ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

প্রাচীন মিশর অথবা বাবিলক্ষে সমাধি-স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন যুগের তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতে যুতদেহ সমাহিত হয় না এবং যুতদেহের সহিত তৈজসপত্রও রক্ষিত হইত না। সেই জন্য প্রাচীন ভারতের তৈজসপত্রের বিবরণ অস্বাভাবিক কোনও ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের তৈজসপত্রের কি প্রভেদ তাহাও নির্ণীত হয় নাই। মৃত্যুকাল-অননকালে ভারতবর্ষের নানান স্থানে পুরাতন তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে কিন্তু কাল-নির্ণয় করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে নৈহাটি গ্রামে একখানি তাম্রশাসন ও কতকগুলি প্রাচীন তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনখানি বাঙ্গালার সেনবংশের রাজা বল্লাল-সেনের,



কর্পূরান—পাখ

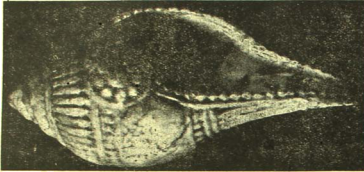
ইহার উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা”র ও “সাহিত্যো” প্রকাশিত হইয়াছে। যেখানে এই তাম্রশাসন ও তৈজসগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটি ও সীতাঘাট গ্রামের মধ্যে অবস্থিত এবং কৃষক-সমাজে “নৈরাজার ভিটা” বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে আবিষ্কৃত তৈজসগুলি পুরাতন পুজার সাধ। তাম্রশাসনের সহিত একটি তাম্রকূণ্ড, তিনটি পানিশিখ, চারিটি পিতলের পানিশিখের আধার ও একটি গন্ধাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাটোয়ার তাত্কালাীন হাকিম বজ্জবর ঐদুক তারকচন্দ্র রায় বি, এ, তাম্রশাসনখানি ও তৈজসগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার চিৎশালার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনিতে পাওয়া যায় যে, তাম্রশাসনের সহিত অনেকগুলি সুবর্ণ ও রক্ত নিষ্প্রিত দেবমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি স্থানীয় কুমাদিকারিগণ পুণ্ডেই সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, “নৈরাজার

ভিটা” একটি প্রাচীন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানে যে তৈজসগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাম্রশাসনের সহিত আবিষ্কৃত হওয়ার অনুমান হয় যে, সেগুলি বঙ্গদেশের সমসাময়িক। বঙ্গদেশের দেব মূর্তির দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পক্ষে বিজ্ঞমান ছিলেন, কারণ ১১১৮—১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব অতিবিকৃত হইয়াছিলেন, অতএব ১১১৭ বা ১১১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

“নৈরাজার ভিটা”র আবিষ্কৃত তাম্রকূণ্ড-খানি বিকৃতাস হইয়াছে, তথাপি ইহা দেখিলে বৃষ্টিতে পাত্রা যায় যে, তখন যে আকারের তাম্রকূণ্ড ব্যবহৃত হইত, এখনও সেইরূপ তাম্রকূণ্ড ব্যবহৃত হয়। পানিশিখ তিনটির মধ্যে একটি কারুকার্যশোভিত, চাকার নিষ্প্রিত পানিশিখে এইরূপ কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তলনিষ্প্রিত পানিশিখের আধার চারিটি পানিশিখের আধার কিংবা শালগ্রাম শিলা বসাইবার টাটু তাহা নিচের বলিতে পারা যায় না। তবে



তাম্রকূণ্ড



পানিশঙ্খ



পানিশঙ্খের আধার

আবিষ্কৃত পানিশঙ্খ তিনটি, ইহার তিনটি
আধারে, অলপূর্ণ করিয়া বসাইলে, স্থির
থাকে। অবশিষ্ট তৈজসটি নূতন ধরণের,
এই জাতীয় তৈজসের চিত্র বুদ্ধগয়ার আবিষ্কৃত
প্রস্তর-মূর্তির পাদপীঠে অঙ্কিত আছে।
প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব সর্বাধক্ষ ডাক্তার
ভোগেল (Dr. J. Ph. Vogel) মাস্ত্রাজে
কপূর্ণ জেলায় মহাল্যম্বেবের মন্দিরে এই
জাতীয় তৈজস বর্তমান কালে পূজার ব্যবহৃত
হইতে দেখিয়াছেন। তিনিতে পাণ্ডুরা যার
ইহা গন্ধাধার, ইহাতে আর্যজিকের সময়ে
কপূর দ্রব্য হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালাদেশে
কোনও কোন স্থানে এই জাতীয় তৈজস
এখনও ব্যবহৃত হয়।

ঐরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপসী

পাত্র ও পাত্রী

নিরঞ্জন	মান্নার-দুর্গাদিপতি
রূপসী	নিরঞ্জনের কিশোরী পরী
আর্যাদন	নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা
বেবল	} নিরঞ্জনের অধীনস্থ সৈন্যধ্যক্ষ
কঙ্কলন	
বরাট	
	যোগল-সেনাপতি

তৃতীয় অঙ্ক

নিরঞ্জনের প্রাসাদ-কক্ষ

নিরঞ্জন, আর্যাদন, বেবল ও কঙ্কলনের প্রবেশ
নিরঞ্জন

আর নয়। তোমাদের সকলের কথাই
রেখেছি আমি, অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি।
কারো মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমি
তত্ত্ব হয়ে এতক্ষণ সকলের তৃপ্তি সাধন করেছি।
নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম—ডাকতে
বাড়ী লুঠে যেখে কাপুরুষ গৃহস্থানী বেহন
এককোণে লুকিয়ে থাকে—তেননি আমি
নিজেকে এককোণে জোর করে লুকিয়ে রেখে-
ছিলুম! আমার ঘর লুঠ হয়ে গেল, তবু
একটা নিশ্বাস অবধি পড়তে দিই নি...
আমার এত বড় অসম্মানেও আমি ধৈর্য্য
হারায়েিনি, মাথা ঝাড়া রেখেছিলুম। তোমরা
আমার সে ত্রুড়তার চূড়ান্ত মূল্য আদায়
করেছ! আমার সম্মানের মূল্যে আপনাদের
তুচ্ছ উদ্ব-পুষ্টি! আর কিনেছ...আমি
কোন কথা কইনি, কোন বাণী দিইনি।
এখন সর্ব রক্ষা হয়েছে, তোমরা উদ্ব

পূর্ণ করেছে—চালা হয়ে উঠে পাড়িয়েছ!
বাম! এখানে রাত্রি কেটে গেছে, প্রভাত
হয়েছে,—আমারও যা থেকে চুক্তির শৃঙ্খল
ধসে গেছে! আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন,—
নিজেকে আবার আমি কিরে পেয়েছি! যা
থেকে সমগ্র লজ্জা, সমগ্র কলঙ্ক ঝেড়ে
ফেলে আবার আমি উঠে পাড়িয়েছি!

আর্যাদন

তোমার এ গ্রন্থ সীমাহীন—এ
গ্রন্থে সাস্থনা দেবার ভাষা নেই, পুত্র...
সাস্থনার কথা তোমার গায়ে কাটায় মত
বিধবে সাস্থনা দেবার চেষ্টাও আমি করছি
না। তবু মনে রেখো পুত্র, তোমার মান্নার
বড় বিপদ থেকে আজ পরিজ্ঞান পেয়েছে। এর
কল্প লজ্জার আমাদের মাথা নত হয়ে আছে,
তোমার মুখের পানে আমরা চাইতে পারছি
না। তবু...শোনো পুত্র, যদি কোন দিন
বুঝে থাকো, আমি তোমার ভালবেসেছি,
সকলের চেয়ে সব-জিনিসের চেয়ে ভাল-
বেসেছি, আমার প্রাণাধিক তুমি, পৌরব
তুমি—ভালো আমার একটা অহরোধ
রেখো—ঐজাদের বশে মন যখন তপ্ত,
বিধবে যখন ধে মুচ্ছিত, তখন সেই মন
দিয়ে আমার মার বিচার করো না তুমি।
...এই রাগ যখন নীতল হয়ে বাবে, বিষাদ
কেটে যাবে, মন শান্ত হবে,—তখন তুমি
এ ব্যাপারটাকে আর-এক মূর্তিতে দেখবে
...না আমার এখনই কিরে আসবে।
আজ তার বিচার করো না পুত্র—কোন

উচ্চ কথা বলো না। এ সম্মান যুহুর্ন্তে তোমার একটা তত্ত্ব বাস প্রলয় ঘটবে তুলতে পারে!...শান্ত হয়ে তার বিচার করো। যদি বোঝো, সে শক্তি তোমার আজ নেই, তাহলে তার সঙ্গে দেখাও করো না।...মাতৃব কতক গুলো দুর্দম শক্তিই খেলনা বৈত নয়, সে শক্তিগুলো বতকণ ভেঙ্গে থাকে, মাতৃব ততকণ বুঝতে পারে না, তার বুকের মধ্যে কতখানি মহত্ব, কতখানি স্থিতি, বুদ্ধি, বিবেক, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা পাখারের মত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে!...সেই শান্ত যুহুর্ন্তে আমার মার পানে চেয়ে দেখো পুত্র, দেখবে, মনে তোমার এতটুকু দৃশ্য হবে না, ক্রোধ মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না। এক অপূর্ণ অসীম ভালবাসার প্রাণ তোমার তরে উঠবে!

নিরঞ্জন

বক্তব্য তোমার শেষ হয়েছে, বৃদ্ধ? আর ও-সব ব্যাক্যছটার প্রয়োজন নেই—তোমাদের দিন কেটে গেছে—এখন আমার দিন এসেছে। তোমরা উদর তরে আহার সংগ্রহ করছ, কড়াক-গুড়ার আমি তার মূল্য দিয়েছি। বাস—দেবা-পাণ্ডার সম্পর্ক চুকে গেছে।...তবু আমি ভাবছিলাম, এখনো তোমার কি বক্তব্য থাকতে পারে! তাই স্থির হয়ে সব শুনছিলাম। আশ্চর্য্য, এখনো সেই এক কথা,—ধৈর্য ধর, সহ্য কর, ক্ষমা কর—! সেই সনাতন যুগ থেকে এই উপদেশ বকে বকে মাতৃব এখনো তা বক্তব্যের স্পর্শা রাখে! যেন মাতৃব একটা বস্ত্র—তবু পরের হাতে দম খেয়েই সে চলবে—নিজের তার কিছু নেই! তার

ইচ্ছা...থাক, আমি বেশী কথার ধার ধারি না। স্পষ্ট করে সহজ ভাষায় বলি, শোনো, আমি কি করব, তা স্থির করেছি। একটা পাখও বহু আমার রূপসীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেছে—বতকণ সে এ পৃথিবীতে আছে, ততকণ রূপসীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই! হর সে, নয় আমি, এক জনকে ছিনিয়ে থেকে সরতেই হবে। বুঝলে? আর আমি যে মূল্য দিয়েছি, তার বিনিময়ে আমি কি চাই, জানো?...মান্য আমার সম্মানের মূল্য এই যে আহার পেয়েছে, সেই আহারে সে আজ বলিষ্ঠ সবল হয়ে উঠেছে। তার নিজস্ব হাতে আবার সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। এখন মান্য আমার সম্মানের মূল্য দিতে বাধ্য—আজ থেকে মান্যদের সমস্ত প্রাণী আমার ক্রীতদাস। আমি তাদের নিজের সম্মান দিয়ে বাচিয়ে তুলেছি। মান্যদের প্রতি আমি আমার কর্তব্য করেছি, এখন মান্য আমার প্রতি তার কর্তব্য করুক! এই সমস্ত প্রাণী আমার হাঁকিতে আজ চলা-ফেরা করবে। আর রূপসী? তাকে আমি ক্ষমা করব—সে বুদ্ধিহীন। দুর্জল নারী! কিন্তু সে পাখও বেঁচে থাকতে এ ক্ষমা পাবে না সে!...জানি, সে প্রভাবিত হয়েছে, কতকগুলো স্বার্থপর ব্যক্তিগুট্ট লোকের কথার ফাঁদে পা দিয়ে বিপর হয়েছে। তবুও সে এতে আশ্চর্য্য সাহসের পরিচয় দিয়েছে।...তার এই সাধুতা, এই মহত্ব এমনভাবে কাজে লাগাতে মান্যর এতটুকু লজ্জা বোধ করলে না? প্রাণটা তার কাছে বেশী দামী হল? আশ্চর্য্য! থাক, যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরাবার নয়!...

ভুলব ? অসম্ভব ! মানুষ এক ভুলতে পারে
—কখনো ?...কিন্তু সেই পাখও—আর তুমি
—আমার পিতা.. জেনো, একটা মহৎ উদ্যম
প্রাণকে তুমি উজ্জ্বল, উন্নত করে দিয়েছ—
তার ভুলও মান্যের বেষ্ট ! তোমার শ্রুতি
মিতে হবে। আমি তোমার ঘৃণা করি। খুব
ঘৃণা—কোন পুত্র পিতাকে কখনো তেমন
ঘৃণা করে নি—পিতাকে তেমন অভিশপ্তাৎ
কখনো ঘেরনি—

আর্বাধন

তাই কর, আমার ঘৃণা কর পুত্র,
অভিশপ্তাৎ যাও—কিন্তু আমার মাকে
মার্জনা করো।...সমস্ত দেশকে আমার
মাই আত্ম প্রাণ দিয়েছে—জগতে
যদিও সে সুবিচার না পায়, জেনো, আর
এক জগৎ আছে, সেখানে সোনার অক্ষরে
মায় এই কীষ্টি-কথা তারা লিখে রেখেছে,
তারা এর সুবিচার করবে।...আমি সুখের
কথায় অহুমতি দিয়েছি মাত্র। অহুমতি দেওয়া
খুব সহজ, কিন্তু তা পালন করা—তাতে
অসাধারণ শক্তি আছে, পুত্র !...আজ তুমি
বহি আমার ঘৃণার চক্ষে দেখ, তাও আমার
সহ্য হবে। সহ্য হবে এই জন্ত যে আমার
না—আমার মা আমার অতুল গৌরব ধান
করেছে ! তার রূপার আমি বর্গ দেখেছি !...
তোমার কোন দোষ নেই, পুত্র। তুমি আমার
ত্যাগ করলে, যে কদিন আমার এ বেহে
প্রাণ আছে, জেনো, আমি তোমার মঙ্গলই
কামনা করব। তোমার কোন অপরাধ নেই।
তোমার নত বয়সে আমিও হয়ত এই রকম
বিচার করতুম, পুত্র। আমি যাচ্ছি, আর
তুমি আমার দেখতে পাবে না, কিন্তু

যাবার সময় আবার অহুত্যাধ করি, পুত্র,
আমার মাকে কঠিন কথা বলো..না,
তিরস্কার করো..না, তাকে ক্ষমা করো।
তোমার ক্রোধের বলি আমারই মাথায় তুমি
নিঃশেষে নিক্ষেপ কর, করে শান্ত হও। এর
একটি স্মৃতিও তোমার বুকে লুকিয়ে রেখো
না। মনে রেখো পুত্র, ক্রোধ এখানে শুধু
ক্ষণিক আন্দোলন করে, সে বড় ক্ষণিকের।
ক্ষমা শান্ত প্রকৃতির নির্মল হাসির মতই
মানুষের বুক ভরে পড়ে আছে। ক্রোধের
ক্ষণিক গর্জনে ভীতা হয়ে প্রকৃতির সে হাসি
মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু বুক ছেড়ে
পালায় না। মানুষ তাই মানুষের পাশে এককাল
নিরস্ত হলেও শুধু সেই গভীর বিশ্বাসেই
হেসে-খেসে বেঁচে আছে !...আমি তোমার
সমস্ত অকরুণা, সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত ঘৃণা
নিরে চলে যাচ্ছি, পুত্র, কিন্তু আমার
একটি প্রার্থনা আছে ! পিতা হয়ে প্রার্থনা
করছি, আমার নিরাশ করো না—মনে
আমার শুধু একটি সাধ আছে, যাবার পূর্বে
একবার আমার দেখতে যাও,—মা আমার
কিরে আসছে, এখনই এসে পৌঁছুবে ! এলে তার
ছই হাত ধরে তাকে তোমার বুকে তুলে নাও।
সে দৃষ্ট দেখে তখনই আমি চলে যাব, হাসি-
মুখে যাব। জীবনে অনেক হুঃখ পেয়েছি, পুত্র,
তোমার এ বিচার বেশী আর—কি হুঃখ সেবে ?
হুঃখের ভারে বাড় আমার হৃদয়ে পড়েছে, না হয়
আর-একটু হুইবে, না হয় এ বাড় সে হুঃখের
ভারে ভেঙে যাবে ! তাতে আমি কাতর হব
না পুত্র কিন্তু দেখো, আমার মাকে যেন
একবিন্দু হুঃখ না স্পর্শ করে...তার সুখের
হাসিটুকু যেন অটুট থাকে !

[অদূরে অম্পট কোলাহল ঝঙ্ক হইল ;
 . . .ক্রমে সে কোলাহল স্পষ্টতর হইলে শুনা
 গেল, অসংখ্য কণ্ঠে অরুণনি উঠিতেছে,

“অরুণাভার অরুণাভার”

“অরুণাভার-অরুণাভার”]

ও, ই না আমার আসছে! কৃতজ্ঞ
 মান্যর মহা-উরাসে ঐ অরুণাভার করছে।
 এ কি সুখ! এ কি সুখ! না, না,
 ডগবান, ডগবান...আমার আত্ম-খানিক
 কাঁচিরে রাখো, চেতন-হারা করো না!

বেবল ও কল্লন বাতান-পার্শ্বে গিয়া

গাড়াইল

বেগতে পাচ্ছ! ঐ—ঐ কাতারে-কাতারে
 সব গাড়িয়ে আছে, ধল-ধল সব লোক
 ছুটেছে! মান্যরের পথ-ঘাট নর-সুও ভরে
 গেছে। পাছের ডালে, চারিধারে—ওধু মাহুয়ের
 মাথা! কিন্তু আমার বা—আমার বা কৈ?
 তোমরা বেগতে পাচ্ছ? আমি বুঝ, দৃষ্টি
 আমার ক্ষীণ, তার উপর অক্ষ এসে
 সে ক্ষীণ দৃষ্টিটুকুকেও রোধ করছে! কৈ,
 কৈ—আমার বা কৈ? বাই, বাই, আমি
 নেমে বাই—

বেবল

(আর্ধ্যনকে ধরিয়া) না, বাবেন না।

মান্যর উন্নত ক্রিষ্ট হয়ে উঠেছে। উত্তেজনার
 অধীর মান্যর—তার পায়ের তলার পড়ে
 আপনি শিবে চূর্ণ হয়ে বাবেন।...ঐ,
 ঐ রাশি আসছেন, মান্যরের পানে সম্মত
 দৃষ্টিতে চেয়ে হাসিমুখে রাশি আসছেন...

আর্ধ্যন

হাসিমুখে! হাঁ, ঠিক বেগছে, তাহলে—
 হাসিমুখে! ঠিক! এই ত আমার মার মুখ,

জয়ের হাসি-ভরা,—বড় গৌরবের হাসি এ!
 আর বার্কো আমার কোঁচ হচ্ছে! যদি
 সে শক্তি থাকত, যদি এ বাহুতে সে বল
 —যাকে আমার এ পথটুকু চলবার কষ্ট
 দিতে পারতুম না, কোলে তুলে নিয়ে
 আসতুম! তোমরা বল, বল, মার মুখে সত্যি
 হাসি বেগছে? বল, বল, মার মুখে দীপ্তি
 বেগতে পাচ্ছ? বিজয়ের উজ্জল দীপ্তি?

কল্লন

অপূর্ণ রশ্মিতে মুখখানি উজ্জল,
 উদ্ভাসিত!...সারা পথে বেন আলো ছড়িয়ে
 আসছেন—

বেবল

কিন্তু ও কৈ? ঠিক-পিছনে ঐ সবে সবে
 আসছে, নত শিরে, অত্যন্ত মন্থর গতিতে?

কল্লন

জানি না। অপরিসীম মুখ! বেশ-কৃষাণ—

[নেপথ্যে আবার অরুণাভার উঠিল]

আর্ধ্যন

ঐ আবার সকলে অরুণাভার করছে!
 কাছে এসেছে!...সমস্ত প্রাণের না
 এই কৈপে উঠল? ঠিক। ওদেরই অরু-
 ণাভারে কৈপে উঠেছে! বেগমালগুলো,
 প্রাণের এ মুক বেগমালগুলো বেন উত্তেজনার
 সাড়া দিচ্ছে! এই বেগ, আমার পায়ের
 তলার মেঝেটা অধি তালে-তালে নেচে
 উঠেছে! আনন্দ, ওরে, চারিধারে বা আমার
 অধীর আনন্দ ছড়িয়ে আসছে। সত্যি
 ত, পথে বেন আলোর হিমাল ছুটেছে...

বেবল

মান্যরের পুরনারীরাও পথে বেরিয়েছে।
 বা ছেলে কোলে করে, তরুণী বিধা-ভর

দূরে ঠেলে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। বাতায়ন থেকে বধূরা ফুল ছুড়ে দিচ্ছে, মালা ছড়চ্ছে, লাগ বর্ষণ করছে ঐ যে গলা থেকে মোতির মালা ফেলে দিচ্ছে! ফুলের পাগড়িতে পথ ভরে গেছে—প্রাসাদের কাছে সব এসে পড়েছে। মান্দার সতাই আল উদ্ভাস হয়েছে। মান্দারের এ মুষ্টি কখনো চোখে দেখিনি! কৃতজ্ঞ মান্দার। না, না—এ যে বস্তার মত জনস্রোত ছুটে আসছে—প্রাসাদ-দ্বারে রক্ষীরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিপুল স্রোত কণ্ঠে রাখতে হবে। প্রাসাদে ঢুকলে প্রাসাদ চুরমার হয়ে যাবে। বাই, আমি বাই, প্রাসাদ-দ্বার বন্ধ করতে আবেশ দিইগে—এ উদ্ভাবের দলকে ভিতরে আসতে দেওয়া হবে না!

আর্যধন

আহা, না,—আহুক, আহুক! ওদের প্রাণে বড় উল্লাস মুগ্ধরিত হয়ে উঠেছে! কৃতজ্ঞ দ্বারে আজ অজস্র ফুল কুটেছে—কঠিন বুক সব কোমল হয়ে গেছে! বড় ছুখে পেয়েছে...বেচারা মান্দার! তার কৃতজ্ঞ দ্বারের এ উচ্ছ্বাস রোধ করে না। মুক্তি এসেছে আজ, মুক্তি—প্রাচীর তুলে এ মুক্তিকে আর রুদ্ধ করে না। ওরে আমার সাহসী বীরের দল,—তোরা কণ্ঠ ভরে যে আনন্দ-সুখা আজ পান করেছিস, সে বড় মধুর সুখা রে, বড় মধুর! কস্, অরুণনি কস্, মধুর হুয়ে সব অরুণনি কস্! আমার জীর্ণ কণ্ঠ! তোদের সঙ্গে সুর মেলাতে পাচ্ছি না—দুঃখে আমি, অভিকৃত হয়ে পড়ছি। আমার সাধ হচ্ছে, তোদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মার অরুণনি তুলি, গগন কেটে

ধাক—গগনের বুক থেকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হোক!...মা, মা—আমার মা—ঐ না, ঐ না প্রাসাদ-গোপানে মার চরণ-পদ ছুটে উঠেছে? আর মা, তোর সন্তানের বুক আর (চুটিয়া গমনোদ্ভত; সেবল ও কঙ্কন আর্যধনকে ধরিয়া রাখিল) ওরে, আমার ধরে রেখেছে—এরা ধরে রেখেছে—আমার এ আনন্দে ওরা দগ্ধিত হয়ে উঠেছে। আর মা, আর, আর,—স্বর্গের সুখমা তোর সারা ক্ষেত্র আজ কি লাভ্য! যে কুটিয়ে তুলেছে! আমার বড়-সুন্দর মা—আমার পুণ্যচরিত মা—আর মা—(কস্-মধ্যস্থ পুষ্পাধার কইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া ছিঁড়িয়া পুষ্পদল ছড়াইতে ছড়াইতে) আর মা, এই সুগন্ধি ফুলের দলে তোর পা রাখবি আর—তোর ঐ ফুলের মত সুন্দর কোমল পা দুখানি বিরে...

রূপসীর প্রবেশ; পঙ্কাতে নতনিরে

বয়ট ও নাগরিকগণ

রূপসী

বাঁবা—

আর্যধন

এসেছি, মা আমার এসেছি! আর (রূপসীকে বুক ধরিয়া) ছেলের বুকে কিরে আর মা! পাড়া, স্থির হয়ে পাড়া, একবার তেরি পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে চেয়ে দেখি। তোর সুখে পানে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার দৃষ্টির শেষ কিরণটুকুও যদি আজ মিলিয়ে যায় ত তাতে কোন কোভ থাকবে না! অল্প আমার দৃষ্টি মোধ করছে মা, তবু সেই অল্পর মধ্য দিয়েও আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—আমার মা—আমার মায় কত রূপ, কত মাধুরী! আমার

• মার মুখে কি স্বপ্নের দীপ্তি! তারা ত এ দীপ্তি কৈ এতটুকু কেড়ে নিতে পারেনি—
ঐ চোখে তোর সেই হাসির চাঁদের আলো,
ঐ ঠোটে তোর সেই শুভ অমল হাসি তেমনি
আছে, ঠিক তেমনি!

রূপসী

বাবা—(চতুর্দিকে চাহিয়া কৈ ?
কৈ ? ... আমি যে সকলের সামনে সব
কথা বলতে চাই, বাবা। প্রথমেই—

আর্যাদন

নিরঞ্জন! ঐ যে তোমার স্বামী, ঐ
সে। আমার আজ সে বিচার করেছে
না, বিচার শেষ হয়েছে, দণ্ড দিয়েছে
আমাকে! কিন্তু তোর প্রতি সুবিচারই
করবে! এত বড় মহাব! বর্করেরও মাথা যে
তার সামনে নত হয়ে পড়ে!... এত বড়
ব্রত উদ্ভাপন করে এলে, যাও না, তোমার
স্বামীকে প্রণাম কর—

(রূপসী নিরঞ্জনকে প্রণাম করিতে
উত্তত হইলে নিরঞ্জন বাধা দিল)

নিরঞ্জন

রূপসী—(নাপরিকগণের প্রতি) যাও
তোমরা। এ ঠিক তাহালা হচ্ছে না যে পাড়িয়ে
দেখবে সব। যাও—

রূপসী

না, না, "থাকুক, সকলে থাকুক—
সকলে শুধুক—সকলকেই বলব আমি!
তুমিও শোনো (নিরঞ্জনের কাছে আসিল)
নিরঞ্জন

না, সরে যাও, আমার স্পর্শ করো না,
রূপসী। (নাপরিকগণের দিকে অগ্রসর
হইয়া) তোরা শুনতে পাচ্ছিল না?

দূর হ কাপুরুষের দল, তোরা চলে যা!
নিরঞ্জনের গৃহে তোরা ঘা-খুঁস তাই করতে
পারিস, কিন্তু এখানে এ আমার ঘর,
এখানে আমি প্রভু—আমার আশ্রয়
করবার শক্তি আছে, তোরা চলে যা।
বেবল, কল্লন, প্রহরীদের ডাকো—বারা
না যাবে, তাদের স্পর্শের শক্তি দাও!
মান্যর আহার পেয়েছে, চুক গেছে। যাও,
সকলে চলে যাও। (জনতা অস্পষ্ট কোলা-
হল করিতে করিতে চলিয়া গেল) কেউ
এখানে থাকবে না, কেউ না! (আর্যাদনকে
ধরিয়া) তুমি যে পাড়িয়ে রইলে বৃদ্ধ?
তুমিও যাবে—তোমাকেও বেতে হবে।
যাও—তুমিও ঐ বর্কর মান্যরের একজন—
তোমার অপরাধ সব-চেহে বেশী, তুমি যাও।
তুমি আমার চোখের জল দেখে আনন্দ
করবে, ভেবেছ? না, তা হবে না—লোকের
নিখাস আমার সহ হচ্ছে না। কলুষিত নিখাস!
কেউ এখানে থাকবে না—যাও। (বগাটকে
দেখিয়া) তুই—তুই কে? মাথা নীচু
করে পাথরের মূর্তির মত নিম্পন্দ পাড়িয়ে
আছিস—কে তুই, বল। কথা ক'। তুই
কি প্রেত না, ছায়ামূর্তি—কে তুই? এখানে
পাড়িয়ে আছিস কোন্ স্পর্শের? এখনো
নড়িল না? ভেবেছিস, আমার হাতে অস্ত্র
নেই? (তরবারি টানিয়া) যেবেছিস, যদি
প্রাণের মায়া থাকে, এই দণ্ডে দূর হ!
কি, হাত তুলছিস? তরবারির আঘাত তুই
রোধ করবি? বাতুল তুই—মানিচ, এ
তরবারি কত বীভূত রক্ত পান-করেছে?
... .. না, তোর সঙ্গে এ তরবারি আঘাত
করব না!... এখনো নড়িল না? মাথা

তোল বর্ষের। এখানে তেঁকে বেঁধেতে এসেছি! জবাব দে। এখনো জবাব দিলি না? *কে তুই? বল—

(বন্ডারের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখে বাঁধা বস্ত্র-খণ্ড টানিয়া সরাইল; রূপসী ছুটিয়া আসিয়া দুইজনের মধ্যে পাড়াইয়া নিরঞ্জনকে সরাইয়া দিল)

রূপসী

না, ওকে স্পর্শ করো না তুমি ...

নিরঞ্জন

এ কি রূপসী! আমি বিস্মিত হচ্ছি—

এত শক্তি তুমি কোথায় পেলে?

রূপসী

এ আমার রক্ষা করেছে।

নিরঞ্জন

এ রক্ষা করেছে! কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, রূপসী! মৎস্য কাঁজ করেছে ও, সম্ভব নেই...কিন্তু—

রূপসী

শোনো, তোমার মিনতি কচ্ছি, একটা কথা শোনো। এ আমার তথু রক্ষা করেনি, আমার বিপুল সম্মানে সম্মানিত করেছে, বিপুল গৌরব দিয়েছে, পুরুষের প্রতি অনেকখানি ব্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছে, প্রভু! এখন এখানে আমার আশ্রিত হয়ে এসেছে ও, আমি ওকে কথা দিয়েছি, কেউ ওর কেশাগ্রও এখানে স্পর্শ করবে না। তুমি অবধি না...রাগ করছ? কর, কিন্তু আমার একটা কথা শোনো—

নিরঞ্জন

কে এ—আমি জানতে চাই।

এ বন্ডাট।

নিরঞ্জন

কে! কি বললে!... এই দে—বাক্য আমি পুঁজছি, এই সে বন্ডাট?

রূপসী

হা, এই সে। বন্ডাট। তোমার অতিথি আল, আমার আশ্রিত। তোমার বন্ধু প্রার্থনা করতে এখানে এসেছে। এই বন্ডাটই আমার দাক্ষণ কলত্র, দাক্ষণ অপমান থেকে রক্ষা করেছে!

নিরঞ্জন

(মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, পরে) হা, এই-বারে বুঝেছি সব।... এই ত আমার রূপসীর যোগ্য কাজ! রূপসী, সহধর্ম্মিণী আমার—বেশ করেছে। পতির ত্রুটে আল তুমি বড় সাহায্য করেছ সতী, ঠিক কাজ করেছে!... তোমার কৌশল এখন বুঝেছি আমি! দুঃস্বাদকে ছলে ভুলিয়ে এখানে টেনে এনেছ! বাঃ, এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি, রূপসী... দুর্জল নারী আশ্রয়তা করে; সেটা দুর্জলতা, পাপ! তাতে কোন লাভও নেই... ক্ষতি—বুণ আরো বেড়ে যায়। কিন্তু তুমি! উচিত কাজ করেছে...কি জরের আভাস পাচ্ছি আমি... (হাত) তোমার পিছনে পিছনে পোষা কুকুরের মত চলে এস!... সুখ, এত সহজে কাঁধে পা দিলে! আশ্চর্য! নিরাশ্রয় একা ওকে গোপনে দিবিরে মেয়ে কেমনে কি হত? কিছ না। এখানে কে জানত? কেউ না। তোমারও কোন গৌরব হত না—লোকের

মনে সন্দেহের ছায়া থেকে বেত। আর এখন ? চমৎকার হয়েছে ! বাঃ—সবাই এখন জানবে, সবাই এখন বুঝবে, নারীর বল কত অসীম, বুদ্ধি তার কত গভীর ! না, ওদের ডাকি—সকলকে ডাকি—সকলে এসে দেখুক, নিজেই চোখে তোমার গৌরব দেখুক—দেখে মাটির কীট সব ধস্ত হয়ে থাক—দেখে কৃতার্ব হোক ! (বাতায়নের দ্বারে গিয়া উঠেঃযরে) এসো, সকলে এসো এখানে। বরাট—বরাট আমাদের কবলে এসে উপস্থিত। আমাদের শত্রু, মান্দারের শত্রু, মহুবারের শত্রু ! সেই বরাটকে আমাদের স্ত্রীর মধ্যে পেরেছি আজ। এসো সকলে।

রূপসী

(নিরঞ্জনকে ধরিয়া) ও কি করছ তুমি ? না, না—তুমি কি উদ্ভাবন করছ ? শোনো, শোনো—

নিরঞ্জন

(রূপসীকে হঠাইয়া) না,—কোন কথা শুনব না, কোন কথা শুনতে চাই না আর ! বরাট, বরাটকে পেরেছি আমি। এসো, সকলে এসো, আমার বৃদ্ধ পিতাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। বড় আনন্দ—বড় সমারোহ আজ ! সকলে আজ রূপসীর অরুণধনি কর—আমিও তোমাদের হুরে হুর মেলাই।

(অন্তর্য প্রবেশ ; সঙ্গে আর্ধ্যধন প্রভৃতি)

বিচার আছে—ভগবান আছে ! কে বলে, নেই ? মূর্খ সে, পাগল সে !... আমি ভেবে-ছিলুম, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর তার প্রতীকার থাকতে হবে ! তার ক্ষত কত নগর, কত বন চুঁড়তে হবে, কত পাহাড়ে চড়তে হবে, কত নদীতে ঝাঁপ

ঝিতে হবে—কিন্তু না, কিছু না, এত সহজে বরাটকে পেলাম ! ওঃ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না... কিন্তু না, কেন, অবিশ্বাস কেন ? ঐ যে, ঐ বরাট—(আর্ধ্যধনকে ধরিয়া) দেখচ বৃদ্ধ, তোমার বৃদ্ধ বরাটকে দেখচ ?

আর্ধ্যধন

হাঁ। এই বরাট—

নিরঞ্জন

দেখ, চিনতে পারছ ত ?

আর্ধ্যধন

হাঁ, বরাটই।

নিরঞ্জন

হাঁ, সে-ই। চেয়ে দেখ, কোন ভুল নয়—কোন সন্দেহ নেই !...দেখ, আরও কাছে এসে দেখ, স্পর্শ করে দেখ। হরত নতুন কোন সংবাদ থাকতে পারে।—হাঃ-হাঃ ! আর সে উদ্ধত শির নেই, উজ্জল বেশ নেই—তবু এতটুকু ধরা করব না আমি, করা হবে না। কদম্বা হীন কন্দিতে যে আমার অপমান করেছে, নিষ্ঠুর বর্করের মত আমার শাস্তির গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—আমার ঘর, আমার স্ত্রী—কারো সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে নি,—এত বড় কাপুরুষ, এত বড় নৃশংস বরাট আজ আমার স্ত্রীর মধ্যে এসেছে—আজ তার শাস্তি দেব। এমন শাস্তি দেব যে সে শাস্তির কথা শুনে—বড় বদমায়েস যে, তারও সমস্ত শরীর কঁপে শিউরে উঠবে—তবে পশু হয়ে বসে পড়বে ! তাহের সমস্ত সর্ত্তানী শক্তি উবে যাবে !...হাঁ, এসো, আরো কাছে এসো—পালারার পথ নেই আর—পালাতে পারবে না। এমন কোন দেবতা কি দানব নেই যে তোকে

আমার গ্রাম থেকে আজ ছিনিরে নেয় !
...শোনো পাখিও, তোমরাও শোনো, এই ছব্বর্ত
দহা তোমাদের ধ্বংস করছিল, তোমাদের
স্বপ্নের ঘর নষ্ট করে দিতে এসেছিল,
তোমাদের সর্বস্ব নষ্ট করতে উত্তত হয়েছিল,
তোমাদের ক্রোধের ক্রান্তির সম্মান হরণ
করবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, তাকে কি
শান্তি দিতে চাও তোমরা ? বল, সকলে
বল। সকলের কথাই আজ আমি রক্ষা
করব। সকলের মিলিত ব্যবহার এচও
শান্তি আবিষ্কার হবে ! আমার ক্রী তাকে
আজ আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে !
...রূপসী, মানুষের এখন কখনো ভুলবে না।

মন্দির গড়ে তাতে তোমার মূর্তি স্থাপনা করবে,
মানুষ সে মূর্তির পূজা করবে।...শোনো,
তোমাদের রাগি কি বলতে চান, শোনো—

রূপসী

হাঁ, সকলে এসেছে—তোমরা সকলে
শোনো। আমি এক আশ্চর্য কাহিনী
বলব, শোনো—

নিরঞ্জন

হাঁ, যন দিগে শোনো—এমন কাহিনী,
নারীর এত বড় জ্বরের কাহিনী তোমাদের
পূরণে নেই, ইতিহাসে নেই, শোনো—

রূপসী

সত্যই নেই। এত বড় গৌরব, এত
বড় সম্মান, পুরুষের সবেবের এত বড় কাহিনী
আজ পর্যন্ত কেউ শোনে নি, কখনো
কল্পনাও করে নি। বাবা, আপনিও
তখন—

নিরঞ্জন

বল, রূপসী—আসল কথাটা শুন করে.

খুলে বল। দেখ, এরা শোনবার জন্য
অধীর হয়ে রয়েছে—

রূপসী

হাঁ শোনো, সকলে শোনো, মানুষেরা
তোমরা সকলে শোনো, জীবনে কখনো
আমি মিথ্যা বলিনি—চিরদিন সত্য পথে
চলে এসেছি, সত্য কথা বলে এসেছি
—কোন বিষয়ে কোন গোপনতা রাখিনি
কখনো—আজও কিছু গোপন করব
না। এত বড় সত্যও আমি আর-
কখনো বলিনি, শোনো—আমার পানে
চেরে দেখ, সকলে, আমার প্রাণের মধ্যে
দৃষ্টি রেখে শোনো—সমস্ত দেবতার নামে
শপথ করে আমি বলছি—আমার কথা
বিশ্বাস কর...কাল রাতে এই শক্তির শিবিরে
আমি গেছলুম, উপার ছিল না। দারুণ ভয়ে
কম্পিত থেকে গেছলুম ! কিন্তু শত্রু আমার
স্পর্শ করে নি, আমার কোন অপমান করে
নি—প্রচুর সম্মানে সম্মানিত করে ভগ্নী
বলে সে আমার সর্ঘর্ষনা করেছে—আমি
যেমন নিফলক বেহ-মন নিয়ে গেছলুম,
তেমনি নিফলক বেহ-মন নিয়েই ফিরে
এসেছি ! এতটুকু কলঙ্ক আমার স্পর্শ করে
নি ! আমি ফিরে এসেছি,—বাহুদের উপর
স্বপ্নভীর স্রদ্ধা আর বিশ্বাস-জরা জন্ম নিয়ে
আমার ভাইয়ের ঘর থেকে আমি ফিরে
এসেছি !

নিরঞ্জন

রূপসী, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে বল
আমাদের ?

রূপসী

নিরঞ্জন

কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

রূপসী

কারণ ? কারণ, বরাট আমার ভাল বাসে, তার তরুণ বয়স থেকে প্রথম কৈশোর থেকে সে আমার ভালবাসে।

নিরঞ্জন

এই কথাই আমি শুনব, তাবছলুম। ...ঠিক...তোমার চোখে তাই আমি অস্বাভাবিক নীতি দেখেছিলুম!...আমি তা গ্রাহ্য করিনি। কি বললে ? তোমার ও স্পর্শ করে নি...?

রূপসী

না, স্পর্শ করে নি। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? তুমি আমার চেয়ে না, তুমি আমার জানো ত—আমি সত্য কথা বলছি, কিছু গোপন করিনি—

নিরঞ্জন

সত্য কথা বলছে ! কিন্তু অস্বাভাবিক সত্য এ, রূপসী। একটা বর্কর, যে বিশ্বাসঘাতকতার হটে না, নিমকহারানিতে পেছপাও নয়, সারা পৃথিবীর যে শত্রু, মহাযজ্ঞের শত্রু, শাস্তির শত্রু, আনন্দের শত্রু—চট করে সে এতটা মহৎ হয়ে উঠবে ! এ অসম্ভব, রূপসী। পৃথিবীতে সম্ভাবনারও একটা গণ্ডী আছে—সে গণ্ডীর অনেক দূরে তুমি আমাদের যেতে বলছ ! কাল সন্ধ্যার কামোদ্ভূত বর্কর, এমন মিথ্যে চন্দ্র-করোচ্ছল রাত্রি, সুন্দরী কিশোরী, নির্জন অবসর—তুমি এ কি বলছ, রূপসী ! পুরাণেও এমন অসম্ভব গল্প কেউ কখনো পড়েনি যে...আজ্ঞা, তোমরা বল,

তোমরা এ কাহিনী বিশ্বাস করেছ কেউ ? (সকলে নিতরুণ) যারা বিশ্বাস করেছ, তারা আমার দিকে অগ্রসর হয়ে এসো— [আর্য্যধন শুধু অগ্রসর হইল] তুমি, বাতুল বৃদ্ধ, এ প্রলাপ তুমিই শুধু বিশ্বাস করেছ—কিন্তু চের দেখ, আর কেউ বিশ্বাস করেনি।

আর্য্যধন

মুচ হতভাগা মান্নার, অকৃতজ্ঞ পাষাণ মান্নার, নীচ কুৎসিত মান্নার—না, তোদের কোন কথা বলতে চাই না !...কিন্তু নিরঞ্জন, এ-ভাবে তুমি সত্যের অমর্য্যাদা করো না। সত্য, তোমার দ্বী ! মনে রেখো, সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষার কথা !...সত্যের পরীক্ষা করছ ! লজ্জা হচ্ছে না ? মার ঘৃণ দেখেও বুঝছ না ! দিক ! তোমাদের আর কি বলব ? না, না আমার, এরা বড় হীন, বড় নীচ এরা, ও মহত্ব এরা ধারণাও করতে পারে না—নির্য্যদের পাপে-ভরা অর্জ্জুরিত জ্বর দিয়ে অপরের জ্বরের : বিচার করে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি না, তোর প্রতি কথা আমি বিশ্বাস করেছি।

নিরঞ্জন

তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছ ! তোমার বিশ্বাসে মান্নারের কিছু আসে যায় না—

আর্য্যধন

কিন্তু এই মান্নারই সব নয়। মান্নারের উপর যে বড় মান্নার আছে, আমার বিশ্বাসে তার বিস্তার এসে বাবে পুত্র—

নিরঞ্জন

বাতুলের সঙ্গে বাসাহাবাস করাও বাতুলতা ! থাক, ...রূপসী, তুমি দেখলে ত—মান্নার তোমায় এ কাহিনী বিশ্বাস করছে না—

রূপসী

মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমি গ্রাহ্যও করি না। এরা কি জানে—কাকে জানে? কিন্তু তুমি, তুমি বল, তোমার স্ত্রীর কথা তুমি বিশ্বাস করেছ কি না!...চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখচ—হী, দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার মুখের পানে চেয়ে দেখ, দেখে বল, তোমার মনে কোন অবিশ্বাস আছে কি না—

নিরঞ্জন

অবিশ্বাস! বলা কঠিন, রূপসী...যে কড় আমার উপর দিবে বয়ে গেছে, সে কড় আমার একেবারে জীর্ণ করে দিবেছে, আমার বার্তিকা এসেছে! আমি চোখে সমস্ত রূপসী দেখছি—আমার চোখের সে আলো নিবে গেছে, আমার কাণে আমি সমস্তই অশ্লষ্ট শব্দ—অনেক আশা করেছিলুম রূপসী, মনে বড় আশা হয়েছিল, —যাক...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না। রাগ নয়, রূপসী, হিংসা নয়—আমার মন খুব শান্ত এখন, কিন্তু সে খই পাচ্ছে না—কোনটাকে অবলম্বন করবে, তা সে কিছু বুঝছে না...যাক, ও আর ভাবব না—আমার এক কথা—একে শান্তি নিতে হবে—! তারপর তোমার কথা পরে ভেবে দেখব...কিন্তু তোমার কোন অপরাধ নেই—যা হয়ে গেছে, তা আর কেরবার নয়। উপায় নেই। তুমি সত্য বলেছ? হবে! , পরে মন স্থির করে আবার তোমার কথা শুনব। হঠাত এখন যা অবিশ্বাস করছি, পরে ঐ বিশ্বাস করতে পারি।

রূপসী

কিন্তু আমার পানে আবার তুমি চেয়ে দেখ—দেখ, এই চোখের পানে চেয়ে দেখ, আর এই শর—দেখ, একটুও কম্পিত দেখচ! এমন অকম্পিত শর দেখেও তুমি 'কিছু বুঝছ' না!...এমন করে মাথা তুলে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারছি, ওর তুমি বিশ্বাস করছ না! আশ্চর্য্য! কিন্তু আমি সত্য কথা বলেছি, প্রভু—বরাট আমার স্পর্শও করেনি—বরাটের দৃষ্টিতেও আমি কোন কালিমা দেখিনি!

নিরঞ্জন

খুব ভাল কথা, রূপসী, খুব ভাল কথা। তোমরাও সব শুনেছ ত, এখন তোমরা যাও।...কিন্তু এবার পূর্বে একটা কথা শুনে যাও—এদের দুজনকে পথ ছেড়ে দিহো—আমার স্ত্রী আর এই বাতুল বৃদ্ধ। এরা তোমাদের দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে—তোমাদের প্রাণ দিয়েছে। এদের পথ রোধ করো না কেউ!...রূপসী, তোমার-আমার মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ—এ ঘটনার পর আর নতুন করে গ্রহি দেওয়া যায় না। আমি মাহুষ, যদি অবিচার করে থাকি—মাহুষ বলেই মার্জনা করো। কিন্তু এই পাপও—এর শাস্তি দেব আমি—অন্ধকার কারাগারে আপাতত একে নিষ্কেপ করব, তারপর অনেক ভেবে শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। এর মুক্তি নেই, মুক্তি নেই—কিন্তু তেই মুক্তি নেই—

রূপসী

মুক্তি নেই...? ওগো, না, না, শোনো—

নিরঞ্জন

কোন কথা নয়—কোন মিনতি গুনব না।
আমার অভিপ্রায় অটল—কারো মিনতিতে
এ বাবস্থা টলবে না—(বরাটকে সবলে ধরিয়)
বর্ষের দহুয়া, তোর উপর আমার সম্পূর্ণ
অধিকার—রাজার অধিকার, স্বামীর অধিকার—
রূপসী

(সবলে বরাটকে বৃত্ত করিয়া) না,
না, ওর উপর তোমার কোন অধিকার
নেই! কিসের অধিকার! শোনো, সকলে
শোনো। আমি মিথ্যা কথা বলেছি।
আগাগোড়া মিথ্যা কথা—এখন সত্য কথা
বলছি, শোনো—এই বর্ষের দহুয়া আমার
কলুষিত করেছে—তাই শান্তি দেবার
জন্ত কৌশলে তুলিয়ে ওকে এখানে এনেছি
—নিজের হাতে আমি ওর অমর্যাদার শাস্তি
দেব—এইটুকু আমার মিনতি! আমি
কত বড় দুলা দিয়েছি, সে কথা মনে
করে এ অধিকারটুকু তোমরা আমাকে দাও,
ওগো, আমি এই নতজাহ্নু হয়ে তোমাদের
সকলের কাছে ভিক্ষা চাইছি—

বরাট

না, না, রাণী মিথ্যা কথা বলছে—
আমার হুকুম করবার জন্ত মিথ্যা বলছে।
রাণী নিষ্কলঙ্কা—স্বর্ণের কালিমাও রাণীর
পায়ে লাগেনি—নির্বলচিত্তা সাধবী রাণী—

রূপসী

চুপ কর বন্দী। না হলে তোমার
প্রগল্ভতার শাস্তি পাবে। বর্ষের দহুয়া—
না, না, তোমরা গারে হাত দিয়ে না!
(জটনৈক শ্রেয়সী হাত হইতে শৃঙ্খল লইল)
দাও, আমাকে দাও, আমি নিজের হাতে

ওকে শৃঙ্খলিত করব। আমি ওকে বন্দী
করেছি—ও আমার বন্দী, বন্দীর উপর আমার
অধিকার! (বরাটকে শৃঙ্খলিত করিল)
তোমরা দেখ—ওর মুখে অস্ত্র-চিহ্ন দেখে?
এ আঘাত আমিই দিয়েছি—আমি। কাপুরুষ,
পণ্ড, নারীর কোন সম্মান জানে না—ওর
শাস্তি, তোমরা পুরুষ, তোমরা কি আবিষ্কার
করবে? ওর শাস্তি আমি দেব। নারীর
প্রতিহিংসা! পর্দাহত অপমানিতা নারীর
বহুতে দেওয়া শাস্তি, তোমরা সে শাস্তির
কথা শুনেলে এখনই সৃষ্টিত হয়ে পড়বে—

নিরঞ্জন

রূপসী—কোন কথাটা তুমি সত্য বলছ?

রূপসী

কোন কথা! তুমি এত বড় ষোড়াস হয়েও
তা বুঝছ না! বুঝবে না। কেবলই মেহের
শক্তি দেখে এসেছ—মাতৃস্বের মন বলে
বে একটা পদার্থ আছে, তার পানে ফিরেও
চাওনি কখনো! হতভাগা স্বামী! স্বাক্ষ,
আমি তর্ক করতে চাই না। বন্দী—এ
আমার বন্দী—এর উপর আমার সম্পূর্ণ
অধিকার।... শোনো সকলে, সেই শিবিরেই
আমি ওকে হত্যা করতে পারতুম,
—পারিনি। অস্ত্র চোখের নীচে আঘাত
করতেই ভীত হুর্ল হাত থেকে অস্ত্র ধসে
পড়ল—তাই এই কৌশল করে ওকে
এখানে এনেছি।... বাবা, বন্দীর তার
আমি আপনার হাতে দিলাম। এর জন্ত দারী
আপনি। খুব সতর্ক থাকবেন। কেন না
পালার, কেন আমার বন্দীর কাছে আর কেউ
না যায়—আমার অধিকারে কেউ না হস্তক্ষেপ
করে! বান, একে আপনি নিয়ে বান—

(আর্থ্যাথন বরাটকে লইয়া প্রস্থান করিল ;
জনতার প্রস্থান)

নিরঞ্জন

রূপসী—

রূপসী

কেন ?

নিরঞ্জন

আমি বুঝছি, এ মিথ্যা—এর সমস্ত
মিথ্যা...বল, এখন বল, এখন এখানে
আর কেউ নেই, সব কথা পূলে বল, আমার
সামনে বল—

রূপসী

সত্যই আমি বলেছি নাথ। বরাট
আমার বাংলা-সহচর, বৃদ্ধ ; আমার পিতার
কুটীরের কাছে থাকত। আমার সে
ভালবাসত। আমিও হয়ত আর এক মুহুর্তে
তাকে দেখতুম—কিন্তু তার পূর্বেই সে
জল গেল ! বরাট আমার ভোলে নি, চিরদিন
আমার খুঁজে বেড়িয়েছে। সে মোহ এখনি
আছে। আমার দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার
স্থখের কথা শুনে 'ভয়' বলে সে আমার
সম্বোধন করেছে—আমার সে স্পর্শও করে নি
...এর জন্য বোম্বলের দারুণ বিষেব সে মাথার
নিরেছে, মোগলকে শত্রু করেছে!—তাই
আমি ওকে এখানে এনেছি। ও আসতে
চায় নি, আমি অভয় দিয়ে এনেছি। সেই শত্রুর
হাতে নিঃসঙ্গ ওকে রেখে আসতে পারিনি
—চুপ করে রইলে যে—বিবাহ হল না ?

নিরঞ্জন

বিবাহে করা বড় কঠিন ! তুমি হুম্বরী
কিশোরী, বরাট তবুও পুরুষ, তারপর

কৈশোরের সে প্রথম অহুয়াপ ! ... বিশ্বাস
করতে চেষ্টা করব রূপসী। বেশ, তোমার
কথাই থাক—বরাটের কারাগারের চাবি তুমি
নিজের হাতেই রাখো—যতক্ষণ না একটা
প্রচণ্ড শক্তি স্থির করিতে পারছি, ততক্ষণ
বরাট তোমারই বন্দী থাক। কিন্তু—

রূপসী

না, আর কিন্তু নয়—বিশ্বাস করতে চেষ্টা
করো নাথ। শত্রীকে যতটা হেয়, যতখানি
দুর্জয় মনে কর, নারী ঠিক ততখানি হেয়,
ততখানি দুর্জয় নয়। নারীর চিন্তাটা
ছোট নয়, সামান্য জিনিষ নয়—বোধ হয়,
পুরুষেরও এতখানি চিন্তা নেই ! ... বেশ
করে বুঝে দেখো নাথ। দেখবে, এ
সমস্তই হৃৎস্পন্দনের মত কোথায় মিলিয়ে
ধাবে... প্রভাতের আলোর প্রাণ তোমার
গুরে উঠবে। তোমার চোখে আমি তার
আভাস দেখতে পাচ্ছি...তা যদি না
দেখতুম, তাহলে বাঁচবার কোন সাধ রাখতুম
না আর। কাল-রাত্রি থাকে না, দিনের
আলো কোটেই—সেই আশার আমি ধৈর্য
ধরে থাকব, নাথ। আমার কোন হৃৎ
নেই, কোন অভিমান নেই। ঐ আলোর
আশা-পথ চেয়ে আমি ধৈর্য ধরে থাকব।
যদি সে আলো সূটেতে দেহী হয়, অনেক
অনেক দেহী হয়, তবুও ধৈর্য হারাণ না।
আমি জানি, নাথ, এ আলো তোমার বুকে
তোমার চোখে সূটেবে, এ আলো সূটেবেই। •

ববনিকা

শ্রীশৌরীন্দ্রবোহন মুখোপাধ্যায় ।

মাসকাবারী

“সাহিত্যে স্বাভিজ্ঞা”

আঠের “নারায়ণ” গ্রন্থক ললিত কান্ত গুপ্ত মহাশয়ের উপরি-উক্ত প্রবন্ধের মত সরস ও প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধ বহুকণ পর্যন্ত বাংলা মাসিক সাহিত্যে পড়া যায় নাই। তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা বাংলার আধুনিক লেখকবর্গের ও সমালোচকবর্গের সম্পূর্ণ প্রশিধানযোগ্য; তাই তাঁর লেখা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

“জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও একমাত্র ব্যতীর্ণ নৃষ্টির মধ্য বিদ্যা। কিন্তু যখনই আমাদের এখান চোঁটা হয়, বিধি নিষেধের খাতি সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ খাতি বিশেষ রীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমরা সাহিত্যের বরণ সম্মা অন্তত করিয়া থাকি।...

“উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জির্জার হিউসো যখন ফরাসী সাহিত্যে তাবের ভ্রমিয়ার বিরণ খটাইতে-ছিলেন, পুরাতনের সর্বাঙ্গী ভাষিমাভ্যক্তি তালিয়া খাতি-নতার খাতগোর সূক্ত জীবনের শ্রোত বহাইতে চাহিতেছিলেন, তখন পুরাতনের হল ভায়খের বলিতেছিলেন, হিউগোর তাবা ফরাসী তাবা নয়, তাহার কবিতায় ফরাসী কবিতার প্রাপ্ত্য নাই, তিনি ভ্রাসিক নহিবেন। ইংরেজ যুগপার হইয়া ফরাসী কবিত্রিতার তথাকথিত কোটি সঙ্কর রাধিয়ার লক্ষ ষাঁড়ান নিসার (Nisard)। এই নিসারকে লক্ষ্য করিয়া উয়ারবুটি সমালোচক স্তম্ভবল বলিতে-ছেন, “অকৃত বৈচিত্র্যে ভরা, সেখানে কত রক্ষারী হাঁচ। প্রতিভারও অবসর। তবে সমালোচক তুমি কেন এক বলিবেই দাস কহিতে থাকিবে।...”

“সাহিত্যে আর এক গুটি ব্যাধি আছে—ইউট

আধুনিক যুগেই বেখা বিদ্যাছে, তাহা হইলেই সাহিত্যের উপর “নীতিকতা”, ঐর্ষিকতা, মৌলতার ধান। সাহিত্যের সূক্ত বিকাশ বধি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি সূক্ত, কোন তাবতেই এ উদাহরণ শাই না যে, মৌলতা সাধুতা এমন কি আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত করিয়াছে। ফরাসীর কথা হাডিয়া দিলাম—লাতিন সাহিত্য বাহার আদর্শে এতখানি শোভনতা বাহুল্যতা, একগম্বীরতার স্থান, যেখানেও উদ্ধৃত হইয়াছেন কাভুল (Catullus) ওতিথ।”

লেখক সাহিত্যের স্বাভিজ্ঞাকে কৃত্রিম বিধি নিষেধের নিগড়ে নিগড়িত করিবার বিরুদ্ধে এই যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণ-হীন সোচ্ছাস উক্তি নয়। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে ভাল রকম পরিচয় আছে, এই সূক্ত প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর সাক্ষ্য মেলে। তাঁর উক্তির সপক্ষে তিনি লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যের জ্ঞান করিয়াছেন—নিরে তাঁর লেখার সেই অংশটি উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

“গ্রীকের সৌন্দর্যবোধ—রসবোধ ছিল উহার বিদ্বত। তাহাদের বৃত্তির মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা,—উহা চলিত স্রবলমিত ভরস্বত্রে। তাহাদের কবিত্রিতার পুরপ্রসারিত অবকাশ, কল্পনগতির বিচিত্র তালিমা। অত পক্ষে বীরকর্মী বস্তুতাত্তিক লাতিন জাতির মধ্যে ভাবুকতার, কল্পনাব্রিয়তার সে মৌলারিত রেখাপাতের নৈশুগ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত কল্পবৃত্তিতে, জিনিষকে বহিতে চাহিত জিনিষের যে শব্দে কুট সহজগ্রাহক অব, তাহার সহারে। কাটিয়া ছাঁটিয়া, বসিয়া মাঝিয়া সব পদার্থকে একই ছাঁট-পড়িতে তাহাদের আনন্দ। বিদ্রোহী জাতি তাহারা—বহুভাষিত, বহুবংশ, বহুপর্কে শিথিয়া এক মহাজাতি, মহাবংশ মহাপর্কে পরিণত

করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমন প্রতিভা করিয়াছিল একটা আদর্শ—বীরের গভীর আদ্য, বিজয়ীর দৃঢ় তেজস্ ওজস, সেনানীর সুবেসে আবেশ-বাহীর অকরকার্ণা, রাজ্যস্থাপনের কঠোর পটভা, বাস্তবতার বীর প্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) দাব্যতাবে কথার চিন্তায় যে সহজবিস্মিত গভ্যতালিকা-প্রবাহ, যে স্বা-চকল উজ্জ্বলগতি, তাহাকে রোম সংবেশার ঢেকেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের (Patricii) শুদ্ধতার গাঢ়াণ।...গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই বেশে সম্পূর্ণ করিয়া রাখে নাই। রোম নগরীর স্রাব এবেশ গ্রীক-সত্যতার তেমন সর্বপ্রাণী ক্ষেত্র হইয়া পড়ে নাই—বতাইহু স্বপ্ন, তাহা বহু পরে। গ্রীসের প্রত্যেক প্রবেশই একটা পাতত্যা—একটা মারাত্মক বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাহাকে একই একরূপে চাপে নাই, তাবকও কোন একটি ব্যায় আবেশ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভবিষ্যার বতঃকরণে এমন বিভিন্ন মহনীর গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বাধীনতা এই যুগ্ম অঙ্গকালনের অতাবে লাভিম সাহিত্য অঙ্গ দিনেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে দুই একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীক কিন্তু শতাব্দির পর শতাব্দী ধরিয়া কত বিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত একরূপে আপনাকে বিকশিত করিয়া বিদ্যাছে।*

এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, তবে কি সাহিত্যে আভিজাত্যের কোন স্থান নাই? মিল্টন, কর্ণেই, ডার্বিন—প্রভৃতি কবির মধ্যে আভিজাত্যের অভিমানে স্পষ্ট বিস্তমান। এ প্রশ্ন যে লেখকের দৃষ্টিকে এড়াইয়া গেছে তা নয়। তিনি ইহারও স্মরণ আলোচনা করিয়াছেন। মিল্টন, ডার্বিন প্রভৃতি কবির নামোন্মেষ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

*তাহারা ছিলেন অতিভাবান, তাই তাহাদের

সৃষ্টি অববস্ত্রান, দীবন্ত, সংবীহ—সকলের পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু পরে তাহারা আনিয়াছেন, পূর্ণবস্ত্রবস্ত্রের আদর্শটি সমুদ্রে রাখিয়াছেন; কিন্তু অন্তরে সেই একই অঙ্গ অমুহুরিত রাখিতে পারেন নাই, তাহাদের দিকট সে আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্রবিধান—কষ্টকল্পনা-মাত্র। সাহিত্যের ব্যাটী—শিষ্টাচারটি অঙ্গুর রাখিতে দিগা হরিয়াছেন স্বাভাব্য, নিজের প্রাণের উপলব্ধি; হারাইয়াছেন সাহিত্য-স্বজনের মূল স্রষ্টা। তাই যেখি, মিল্টনের পরে পোপ, কর্ণেইর পরেই বোয়ালো, ডার্বিনের পরেই ওভিন টাগ, কানিগানের পরেই তত্ত্বি বাবতট।*

লেখক বলেন ক্লাসিক ঠাট বজায় রাখিলেই ক্লাসিক হয় না—

"Classic soul ব্যায় Classic manner তাহারই সহজসিদ্ধ। বহিষ্ঠ পরিষ্ট বলিয়া বিন্দেব একটি কোন ব্যাতি নাই। কালের আদ্যপরিষ্করণ, বিশ্বকবির কবিরশক্তি বহুতঙ্গ। তাহাকে দুই একজন কবির বা দু'একটি কবিনজের ভবিষ্য অবেশ রাখা চলেনা।"

প্রকৃত আভিজাত্য তাই প্রতি কবির অদ্বায় আভিজাত্য।

'কবি সহজেই তাহার সকল ভাব, সকল ভবিষ্যই এক বৈগর্ভিক আভিজাত্যে যতি করিয়া তুলিয়াছেন।"

কবিত্বের এই মূল উৎসটি, লেখক বাহাকে বলিয়াছেন কবির "আদ্যায় তপঃ-অভিভাঙ্গনী", যখন শুকাইয়া যায়, কিংবা আদ্যায় যখন সেই মূল উৎস হইতে মূলে সরিয়া বাট, তখনই বিধানবোধ, অঙ্গকার, একরূপকর্তা প্রভৃতি কাব্য-সংহিতার canons & standards বাড়া করিয়া তুলিবার মন্ত চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টাতেই সাহিত্যের মৃত্যু। সেই মন্ত লেখক আদ্য-বিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন :—

“সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখী—এক আদর্শাবলম্বী হয়, তবে সে সাহিত্য শুভাহিত্যই উদ্ভবে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাই ঘটনায়ে। যেদিন বাগ্‌দাদের আগে বসাইয়াছি শিল্পীকে, যেদিন কেবল অভিন্নপদ্ধতি পরিচয়ের জন্যই কাব্যপুট করিয়াছি, সেইদিন হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অথবা পাকিস্তানের তর্কের শুষ্ক নককৃষির মধ্যে পড়িয়া বাস হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।”

অতএব আমাদের চাই, কোন “বিশেষ আদর্শ” নয়—“সমগ্র জাতির নিগূঢ় সাংস্কৃত ঐতিহ্য”র সম্যক উদ্বোধন। প্রাচীন গ্রীসে—“যেখানটি ছিল বাণিজ্যবীর জীবন্ত বিগ্রহ।” “সাহিত্যেও তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইবে *Peuple Intelligentsia*”, জাতির সাংস্কৃত ঐতিহ্য।

“জাপানের কথা”

নববর্ষের “সবুজ পত্র” রবীন্দ্রনাথের “জাপানের কথা” বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐরা কবির জাপানের পত্র আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছিলেন, এবারকার জাপানের কথায় তাঁরা নূতন করিয়া ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক ভিনিস পাইবেন।

কবি বলিতেছেন, “পৃথিবীতে ঘোটানুটি দু'রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর আর এক জঙ্গম—“ইউরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা” এবং “জাপানেরও মনটাই ছিল স্থাবর জঙ্গম।” সেই জঙ্গম ইতিহাসে আর কোথাও বাহা হয় নাই জাপানে তাহাই হইয়াছে, জাপান

“কবেক বৎসরের মধ্যেই ইউরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে”।

কিন্তু এই স্থাবরজঙ্গমতা জাপান পাইল কেনন করিয়া? কবি তাহার দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—(১) জাপানীরা “মিশ্র জাতি”—তাঁরা এক খাতিতে গড়া নয়। “জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রন হয়েছে এ কথা আর আলোচনা তাদের কাগজে দেখিচি।” (২) “স্থানগর্ভীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মত্ত হৃদয়ে হয়েছে। ছোট জাতিগাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে গুটপাকের কাষ করেছে।”

কবি বাঙালী জাতির সঙ্গে জাপানী জাতির এক জারগার মিল অমুতব করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে বাঙালীরই “নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মত চিত্তের নমনীয়তা আছে।” “তার আর একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশ্রল ঘটেচে”।

কিন্তু সম্প্রতি বাংলা দেশে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা সযত্নে যে একটা অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায়, কবি তার কারণ স্থির করিয়াছেন, ইংরেজের নিকট আমরা বাংলা পাইয়াছি এবং সেইজন্য ইউরোপ সযত্নে আমাদের মনে অভিন্নতা জাগিয়াছে।

জাপানী মিশ্রজাতি এবং বাঙালীও মিশ্র জাতি, তবে কে কি পরিমাণে মিশ্র তাহা বলা শক। বাঙালীর মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্ত আছে এটা নৃতত্ত্ববিদদের একটা সিদ্ধান্ত এবং এ সিদ্ধান্তটাকে উল্টাইবার এ পর্যন্ত কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। এইজন্য “বাঙালীকে ঐরা কেবলই ভাবপ্রবণ মনে

করেন, তাঁরা চুল করেন, কর্ণপটীতেও বাঙালীর শক্তির পরিচয় ক্রমশই পাওয়া যাইতেছে। মিশ্র জাতি বলিয়াই বাঙালীর মধ্যে বহু রকমের type দেখা যা়তেছে, এত বোধ হয় ভারতীয় অন্ত কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তার পর জাপানীরা ইউরোপীয় সভ্যতার যে দিকটা আকর্ষণ করিয়াছে, সেটা ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য সমৃদ্ধির দিক্, বাহ্যশক্তির দিক্। ইউরোপের কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্দুক-কাষান, রাষ্ট্রনীতি, জাপান আয়ত্ত করিয়াছে। ইউরোপের এই বাহ্য শক্তিটাকে উপযুক্ত প্রয়োগ পাইলে বাঙালীর ছেলেও যে জাপানীরই মত আকর্ষণ করিতে পারিত, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এই থানেই বাঙালী ক্রমাগতই প্রতিহত হইতেছে বলিয়াই বাঙালীর মনে ইংরেজ-বিষয়ে উত্ত-রোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে। ইংরেজের কলকারখানার তার সম্পূর্ণ প্রবেশ নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতকাৰ্য হওয়ার তার বিশেষ সুযোগ নাই, যুদ্ধবিজ্ঞা শিক্ষা তার পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল—অথচ এই সব ক্ষেত্রে শক্তিশাল্যের অগ্রই তার সমস্ত মন এখন চকল ও উৎসুক। এবং এইখানেই তার প্রতিদিন হার।

বাঙালীর সঙ্গে জাপানীর এ পর্যন্ত বাহ্য সাবৃত্ত চলে, যেমন জাপানীর সঙ্গে ইউরোপীয়ের এ আরগায় একটা বাহ্য সাবৃত্ত আছে। কিন্তু কবি দেখাইয়াছেন যে জাপানের সঙ্গে ইউরোপের, এবং বাংলারও, “একটা অন্তরতর আরগায় অভৈক্য আছে।” “বে

গুচ্ছ ভিত্তির উপরে ইউরোপের সহস্র প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবল বাহ্য কর্ণনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ।” তিনি তাই লিখিতেছেন :—

“মহাশয়ের যে সাধনা অন্ত দোককে মান, এবং সেই অভিমুখে চমুতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যবহার আর নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনাদিগকে স্থাপন করেছে—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিল বহু সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়।”

তিনি তাই বলিয়াছেন যে জাপানী সভ্যতা একমহলা; তার অন্তর মহাল নাই। এ কথাও বুঝই সত্য। বোধ হয় এইজন্য জাপানী চিত্রশিল্পে রেখার লোলা আছে, কিন্তু রংয়ের বিভিন্ন আবেগ নাই; তার ভাল কাব্য নাই; তার শ্যাণ্ডেল্পে আছে, মাহুকের চিত্র যথেষ্ট নাই—কারণ মাহুকের শরীর সম্বন্ধে তার বোধ নাই, মাহুকের রহস্য সম্বন্ধে তার বোধ নাই।

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার এই যে আসল স্বরূপ, ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্প্রতি আমাদের দেশে অভ্যস্ত কঠিন হইয়াছে। কারণ, আমাদের দেশে আমরা নানা কর্ণমুখে যে সকল ইংরেজের সম্পর্শে আসি, নানা কারণে তাঁদের প্রতিও আমরা প্রভাবান্বিত নই, তাঁরাও আমাদের প্রতি প্রভাবান্বিত নন। ইংরেজ দ্বাত্মকেই এদেশে আমরা “এলো ইভিগান” রূপেই জানি। সুতরাং ইংরেজের সভ্যতা ও সাধনাকে কেতাবে আমরা বহু বড় করিয়াই জানি, আসল মাহুকের মধ্যে তাকে তত ছোট করিয়াই দেখিতে অভ্যস্ত হই। এই

আরও, রামমোহন রায়ের আমলে, কিংবা হেয়ার, বেবু, ডিরোজি, রিচার্ডসনের আমলে ইংরাজি শিক্ষা এদেশের চিত্তে যে নব উদ্বোধন আনিয়াছিল, তার ফলে আমাদের দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে বলি, সমাজ-সংস্কার বলি, সবুজই নব প্রাণে অহুশ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন ইংরাজী শিক্ষা আর সে ফল প্রসব করিতেছে না। ইংরাজি সাহিত্য এখন আর আমাদের প্রাণে সে রস সঞ্চার করে না, ইংরেজের ইতিহাস এখন আর কল্পনাকে সে মাতান মাতায় না। বরং ইংরেজের ইতিহাসের ছিদ্রগুলাই আমরা এখন বেশি করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছি।

যেখানে উভয় পক্ষের সম্বন্ধ সহজ ও আন্তরিক সম্বন্ধ হইতেই পারিবে না, সেখানে মিলনের কথা ভুলিলে তাহা হয় বিকৃতভাবে বেশি করিয়া জাগায়, নয় উদাসীনকে বাড়াইয়া তোলে। এ দুটো অবস্থার একটা অবস্থাও স্বাভাবিক নয়, সম্ভব নয়। এটো ক্ষণ এখনকার কালে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ বিষয়ে সব চেয়ে-বড় সমস্যা এই যে কেমন করিয়া আমরা এত বড় হইব যে ইংরেজ আমাদেরকে আর অবজ্ঞা করিতে সাহস করিবে না। ক্রমশঃ তাঁদের শ্রদ্ধা আমরা ধোর করিয়া অর্জন করিতে পারিব।

মি. "আপানের কথা" লিখিতেছেন তিনি ইউরোপের কাছে সেই বড় সম্মান নিজ প্রতিভাশূণ্যে অর্জন করিয়াছেন। প্রতিভা সকলের নাই, কিন্তু নিজের শক্তির সম্পূর্ণ উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটাইবার শক্তি আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে

যেখানে বাধা কম, সেখানে যদি আমরা সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হই, দেশ-দেশান্তরে সেই শক্তির বোধন করি, তবে এমন দিন আসিতে বাধ্য, যখন ইংরেজ বা অপর ইউরোপীয় জাতি আমাদেরকে জাতি তৈলিতে পারিবে না।

অর্থাৎ রবিবার ঘে "অন্তরমহলের" কথা বলিয়াছেন, আমাদের এখন সেই "অন্তর-মহলের" দরজাগুলোই খুলিতে হইবে এবং বিশ্বজাতির অন্তরমহলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথঘাটগুলিকে প্রশস্ত করিতে হইবে। কবি লিখিয়াছেন "এই মিলনের দ্বার উন্মোচন করবার কাজে বাঙালীর আহ্বান আছে।" এ পর্যন্ত সে আহ্বান বাঙালী জনিয়াও আসিয়াছে। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, হাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, ব্রজেননাথ, —ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ইহার প্রত্যেকেই পূর্ব ও পশ্চিমকে মিশাইয়াছেন। এ কাজ সম্প্রতি ব্যাহত হইলেও, ইহা যে বাধ্যমূলক হইবে তাহা আশা করা যাইতে পারে। তখন আপনারও "অন্তরমহল" রচনা করিবার তার একসময়ে বোধযোগে যেমন ভারতবর্ষ এহণ করিয়াছিল, তেমনি হরত পুনরায় এহণ করিতে পারিবে।

উত্তর-প্রভাস

ম্যাক্টের "ভারতী"তে আমরা প্রীমুখ চিত্তরঞ্জন দাস-মহাশয়ের অভিভাবক-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ-পর্যায়ের অবস্থা অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলাম এবং তাঁর অভিভাবকে

তিনি যে কত জারগার রবীন্দ্রনাথের ভাব

ও ভাষা ধার করিয়াছেন তাহা একে একে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। আবার “ভারত-বর্ষের” “সাহিত্য-প্রসঙ্গ” লেখক একজন বিবম “জং” এবং “লক্ষ্মী” অশুভব করিয়া লিখিয়াছেন যে, এ রকমের সমালোচনার “সাহিত্যের চরিত্র...নষ্ট হইয়া যায়” এবং “সাহিত্য-সেবা ক্রমশঃ বোকানদারীতে পরিণত হয়।” তাঁর এই অভিনব মণ্ড-বেদনার বাংলা দেশস্থ সমস্ত লোক সম-বেদনা অশুভব করিবে সন্দেহ নাই, কারণ “সাহিত্যের চরিত্র” রক্ষা করিবার জন্য “প্রবাসী”র প্রবীণ সম্পাদকের পরেই, তাঁর ঐকান্তিক আশ্রয় ও প্রাপণ প্রদত্ত উল্লেখ করিবার মত বটে !

ঐচ্ছিক চিত্তরঞ্জন দাশ-মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর “সভাপতির আসন” হইতে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকার বক্তৃতা-বিশেষ না পড়িয়াই তাঁর প্রতিবাদ করা এবং ইঙ্গিতজ্বলে রবীন্দ্রনাথ সৰ্ব্বদে কতগুলি অন্তর মোচাটোপ করা জরুরি যোগ করিয়া-ছিলেন বলিয়াই, তাঁর কথার প্রতিবাদ করাও “প্রবাসী” এবং “ভারতী” এবং আরও দু-একটা কাগজ জরুরি মনে করিয়াছিলেন। কেননা, দেশের সভার সভাপতির আসনের একটা মর্যাদা আছে এবং সেজন্য সভা-পতির উক্তিও দারিদ্ৰ্যপূর্ণ হওয়া চাই। চিত্তরঞ্জনবাবু “সভাপতির আসন” হইতে যদি ঐ সব দারিদ্ৰ্যবিশীন কথা না বলিতেন, তবে তাঁর প্রতিবাদ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না—অত্যাচার, ব্যক্তিবিশেষ কোন কাগজে কি বলে না বলে জাহাজে কি আসে যায় ?

লেখক সেই প্রতিবাদ সৰ্ব্বদে কিছু বলিবার ভরসা পান নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে “নকল পণ্ডিত” ও “বালির তাপ” বলা হয় নাই। অতি-ভাষণে চিত্তরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন যে, “আমাদের দেশেই একজন পণ্ডিত” ধরিয়া বলিয়াছেন যে “জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে” “সমগ্র মানব জাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে”। তারপর সেই অজ্ঞাত-নামা দুই-একজন ব্যক্তিকে নকল পণ্ডিত ও বালির তাপ বলিয়া তিনি পরিহাস করিয়া-ছিলেন এবং “এমন কি” রবীন্দ্রনাথও “ঐ মতটি” আমেরিকার “জাহির” করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ “এমন কি” বলার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে নকল পণ্ডিত ও বালির তাপ বলা হয় নাই এইটেই যদি সত্য হয়, তবে জানিতে চাই, ভারত-বর্ষে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বৈদেশিক জ্ঞানতালিম্‌এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন ? তাঁদের নাম ও উক্তি আমরা নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারি—নহিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিই যে ঐ সকল ইঙ্গিত প্রদুষ্ট হইয়াছে, ইহা ভাবিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ থাকিবে।

তাঁর পর ভারতবর্ষের লেখক প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন যে আমরা অভিভাষণে যে সকল আইডিয়াকে রবীন্দ্র-নাথের আইডিয়া বলিয়া মনে করিয়াছি “তাহার একটিও প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া নহে।...সে সমস্ত তাইই ভূতব-বর্তম ও বিবেকানন্দাদির রচনা মধ্যে পাওয়া যায়।” “প্রমাণস্বরূপ” কিছু কিছু নমুনাও

তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথমেই বলা ভাল যে, তাঁর নমুনা-উদ্ধারের একটু বিশেষ বাহ্যিকতা আছে। ভূদেব বা বিবেকানন্দের কোন গ্রন্থ হইতে তিনি যে তাঁদের উক্তিগুলি উদ্ধার করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করা তিনি প্রয়োজন মনে—অনুমান নাই; কেননা পরের উক্তিকে নিজের বুদ্ধিমানিক কাটিয়া-ছাঁটিয়া সামান্যইবার চাতুরী তিনি ইতিপূর্বেও হই—একবার প্রকাশ করিয়াছেন এবং সে চাতুরী কাঁস হইয়াও গেছে। ১৩২৩ সালের শৌর্বে ‘ভারতী’তেই দেখিয়াছিলাম যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে তাঁর একটা উক্তিকে তিনি এমনি নিজের মনের মতন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আসলে যা মত নয়, লেখকের কোটেশন-চাতুরীর দ্বারা তাঁর সেই মতই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। “সাহিত্যের চরিত্র” রক্ষা করিবার জন্য লেখক বিশেষ ব্যস্ত কিনা, সেইজন্য এমন কাণ্ডটা মধ্যে মধ্যে ঘটাই থাকে!

যাই হোক, তিনি রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ার স্বকীর্তা অপ্রমাণ করিবার জন্য এবং চিন্তাধ্বনি বাবুকে রবীন্দ্রনাথের ধননুক করিবার জন্য ভূদেব বিবেকানন্দাদির এবং রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ার সাদৃশ্য যেভাবে দেখাইয়াছেন, চাহিতে ভূদেব প্রভৃতির উক্তিটুকু তোলা হইয়াছে কি হয় নাই তাহা তাঁদের লেখা যাঁচিয়া দেখিবার কিছুমাত্র দরকার করে না। কারণ, সাহিত্যে কোন আইডিয়াই কারো নিজস্ব নয়, এই যখন তাঁর দ্বিধা ধারণা—তখন কোন আইডিয়ার বিশেষত্বটুকু তিনি খসিবেন কেমন করিয়া? কিন্তু এটা

যে শুধু তাঁরই ধারণা তা নয়, এ-সম্বন্ধে তিনি রবিবাবুরও একটা কথা ভুলিয়া দিয়া ইংল-মাষ্টারের মত প্রবাসী ও ভারতীয় “ছেলেমানুষী” উপর দণ্ড আন্দোলন করিয়াছেন। বলিয়াছেন—আঃ ‘এটুকু’ও পড় নাই! ইত্যাদি। রবিবাবু নাকি কোথায় লিখিয়াছেন, যে সাহিত্যের দ্বারা আনা কথাই নিত্যমুখ্য আনা কথাকেই নিজের মধ্যে নতুন করিয়া আনিয়া নিজের মত নতুন করিয়া বলা। কিন্তু কথটা যে রসসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন নাই, আমাদের নবীন মাষ্টার-মহাশয় তাহা ঘোটেই বুঝেন নাই। বস্তুত রসসাহিত্য যে সব ভাব লইয়া কারবার করিয়া থাকে, তাহা কারো নিজস্ব নয়; কিন্তু সেই শাস্ত্রি ভাবই প্রত্যেক রসজ্ঞের হাতে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয়। কিন্তু সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক খণ্ডের সম্বন্ধে একথা ঘোটেই খাটে না যে, সে সকল ক্ষেত্রে কোন মত-বাদীরই নিজস্ব আইডিয়া বলিয়া কিছুই নাই। তাহা হইলে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার Political Theories সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিতেই পারিতেন না, Social Theories সম্বন্ধে বা Economic ideas সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদীদের মতের ইতিহাস আলোচনা করার কোন অর্থই থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশীয় সমাজ-সম্বন্ধে কতগুলি বিশেষ মহামত খাড়া করিয়াছেন এবং সমাজ কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও কতগুলি কাজের পদ্ধতিও উপস্থাপন করিয়াছেন, হুতরাং তাঁর খণ্ডেরও

আছে এবং তার Practical application ও আছে। সেই সবটা জড়াইয়াই তাঁর আইডিয়া। এবং তাঁর সেই গোটা আইডিয়াটাই চিত্তরঞ্জন বাবু তাঁর নিকট হইতে জ্ঞাতসারে হোঙ্ বা অজ্ঞাতসারে হোঙ্,—সইয়াছেন, আমরা ইহা ক্রমে ক্রমে তাঁর লেখার নানা কারণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইরাছি। রবিবাবুর সেই মূল আইডিয়ার সঙ্গে ভূদেব, বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমের মূল আইডিয়ার কোন মিল নাই। তবে লেখক যে ভাবে মিল দেখাইতে ব্যস্ত সে ভাবের মিল—তাঁর কথা অহু-সারেই বলি—বিজ্ঞানাগরের প্রথম ভাগ হইতেও দেখানো বাইতে পারে বটে।

যেমন ধরুন, রবিবাবুর প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের “আত্মশক্তি”র উপর ঠাড়াইতে হইবে, দেশের কল্যাণকর দেশের লোকেরাই সরকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই করিবার চেষ্টা করিবে। এক্ষণে প্রস্তাব বঙ্কিম, ভূদেব বা বিবেকানন্দের লেখার কুজাপি নাই। তবে বঙ্কিম যে কমলকান্তের দপ্তরে পলিটিক্‌স্‌কে ভিক্ষা চাওয়া বলিয়া বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন, এবং যে বিজ্ঞপ্তি-বাক্যটা উদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষের লেখক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা অপ্রমাণিত হইল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে কথাটা পুরা উদ্ধার করিলেই তাহার আসল চেহারাটা ফুটিত। কিন্তু ভারতবর্ষের লেখক ঠিকমত কোটেশন দিতে রুড়ই নাহাজ। বঙ্কিম “স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন”—“সপ্তদশ অষ্টোত্তরোহী মাত্র যে আত্মিকে জ্ঞর করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। “জ্ঞর রাখে কৃষ্ণ!

“ভিক্ষা চাওগো!” ইহাই তাহাদের পলিটিক্স”, এবং তাঁর স্পষ্ট মানে এই যে, যে জাতি পরাধীন, সে জাতির পলিটিক্স মানেই ভিক্ষা চাওয়া—বঙ্কিম তাহাকেই “হুঙ্কর জাতীয়” পলিটিক্স নাম দিয়াছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ পরাধীন জাতির পরাধীনত্ব সম্পূর্ণ মানিয়াই কতটা আত্মশক্তির অধিকার ও চর্চা সেই পরাধীনতার অবস্থার মধ্যেও পূর্বকালে বঙ্গীয় ছিল এবং এখনও থাকিতে পারে, তাহাই আলোচনা করিয়াছেন,—অতঃপর তাঁর আইডিয়া এবং বঙ্কিমের আইডিয়ার মধ্যে সাদৃশ্যটা কেমনতর সেটা পাঠকেরা বিচার করিয়া লউন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি :—“রাজ্যের শাসন আত্মশক্তির করিবার কোন প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী।” “দেশনারক”—“সসুহ”। ৪০ পৃঃ।

তারপর আতিশয়ের অর্থ কি এবং তাহার বিশিষ্ট আদর্শই বা কি, সে-সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন ও রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য আমরা দেখাইয়াছিলাম বলিয়া লেখক ভূদেব, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের রচনা হইতেও (তাঁর মতে) অহরূপ ভাবের বাক্য সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভূদেব বলিতেছেন “এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপরজাতীয় হইতে পারেনা” বঙ্কিম বলিতেছেন “বাসিনী কখন

ইংরেজ হইতে পারিবে না" এবং বিবেচনা-
নন্দ বসিতেছেন "সামাজিক...তাদিগ
চূড়িরা অপরজাতির স্তার গড়িতে পারা
অসম্ভব"। এই তিন উক্তির মধ্যে কতকটা
ভাবগাঢ় আছে বটে, কারণ তিনজনের কথা
সার এই যে, জাতিমাত্রেরই একটা স্বাভাব্য
আছে—ইংরেজের যেটা স্বাভাব্য বাঙালীর
সেটা স্বাভাব্য নয়। এই plurality-টা অর্থাৎ
এই অত্যন্ত সাদা সর্বজনবিদিত মোটা কথাটা
চিন্তরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন বলিয়া আমরা
রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে তড়িৎকি এই
ধরণের গোটাকতক সর্বজনবিদিত মোটা
কথা উদ্ধার করিতে গিয়াছি, তাহা যে
ভারতবর্ষের পাঠকদিগকে বুঝানো হইতাতো,
ইহা "সাহিত্যের চরিত্র রক্ষার" একটা প্রকৃষ্ট
উপায় বটে! কিন্তু আমরা বাংলার জাতি
ও তাহার বিশিষ্ট আদর্শ, বিশ্বজাতির সঙ্গে
বাংলার জাতিত্বের কি সম্বন্ধ, চিন্তাব্যব
এই সমস্ত আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের
আলোচনার মিল দেখাইয়াছি; সুতরাং
ইচ্ছাভাবে আমাদের উদ্ধৃত একটি মাত্র
রবিবাবুর উক্তি ও চিন্তরঞ্জন বাবুর একটি
উক্তি তুলিয়া দিলে পাঠকদিগকে সেরেফ
কাকি দেওয়া হইবে। হুদেব বা বন্ধিনের
লেখার চিন্তরঞ্জনবাবুর এ-কথা কোথায় আছে
যে "সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য সত্যভাবে
আগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে
বিস্তারিত করিতে হইবে। জাতিত্বের
পক্ষেই এক জাতি মান করিতেও সক্ষম হয়
গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।" কিংবা "জাতিত্ব
মরে না—সুধু সকল জাতির মধ্যে সকল
বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে

তাহাই জাগিয়া উঠে।" ? ইহার parallel
passage ভূদেব হইতে ভারতবর্ষের
লেখক বাহির করুন।

দেখুন না কেন, এই জাতিত্বের প্রসঙ্গেই
তিনি যে অংশ ভূদেবের লেখা
হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেখানে
ভূদেব জাতি বলিতে বংশই বুঝিয়াছেন
এবং স্পষ্টই বংশের কথা লিখিয়াছেন।
তিনি বলিয়াছেন যে, "আমরা জানি
যে, মনুষ্যের গোষ্ঠণ অনেকটাই তাহার
পূর্বপুরুষদিগের হইতে অর্জিত।" "সামাজিক
প্রবন্ধ" ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ। এবং তার
পরেই ভূদেব লিখিতেছেন:—"কিন্তু হিন্দুর
এই ভাবে এবং ইংরেজের উল্লিখিত ভাবে
(বৈদেশিক বিবেচনায়) পার্থক্য আছে।
হিন্দুর আত্মগৌরব সৈবায়ত বিষয় লইয়া।
ইংরেজের আত্মগৌরব প্রধানতঃ নিম্নায়ত
বিষয় লইয়া। হিন্দুর আত্মগৌরবে অস্ত্রের
প্রতি তৃপ্তা জন্মিতে পারে না। ইংরেজের
আত্মগৌরবে অস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া
দেয়।" তারপর ইংরেজের ভিন্ন জাতির প্রতি
বিষেবের একটি উদাহরণ দিয়া বলিতেছেন
যে, আমাদের মধ্যে "বর্ণভেদ প্রথা"
প্রচলিত থাকার ভিন্ন জাতীয় লোকের
প্রতি আমাদের বিধেব ভাব জন্মায় না।
এখানেও পাঠকেরা ভারতবর্ষের
লেখকের কোটেশনের বাহ্যিক দেখিয়া
লইবেন। ভূদেবের জাতিত্বের আইডিয়া
সঙ্গে চিন্তরঞ্জনের জাতিত্বের আইডিয়া
কেমন মিল! —

যে বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর ভূদেবের
জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই বর্ণাশ্রম ধর্মের

“অভিমান”টা চিত্তরঞ্জনবাবু একেবারে হুসিমাং করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে Industrialism এর উপর চিত্তরঞ্জন বাবু খড়াহস্ত—কারণ তিনি ও তাঁর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে এদেশে কল কারখানার আমদানি হইলে গ্রামগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং ধনী-দরিদ্রের অসামঞ্জস্য অত্যন্ত প্রবল রূপেই প্রতিভাত হইবে—সেই Industrialism ভূদেব সমর্থন করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন—

“এদেশে কলকারখানা হইয়া বস্ত্রপ্রস্তুত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার কোন ঘোষই হইতে পারে না।”—সামাজিক প্রবন্ধ ১২২ পৃষ্ঠা। অথচ অর্থনীতি শাস্ত্রে যখন বলে যে অপর দেশ হইতে যদি শক্তির তেলের আমদানি হয়, তবে তেলীয় ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে, স্তত্রাং কারো পক্ষে আতি-ব্যবসায় রাখাটা সম্ভব নয়,—তখন ভূদেব বলেন :—

“আমার বিবেচনার ইংরাজ অর্থনীতি শাস্ত্রের এই কথাটি ভাল নয়। তৈলিকেরা কি সমাজেরই একটি অঙ্গ-বস্তু নয়?”

—সামাজিক প্রবন্ধ।

অধিক উদাহরণ উদ্ধারের দরকার নাই। আতিশ্র এবং বিশ্বমানবের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এটা রবীন্দ্রনাথের লেখার যেমন ‘ফুট’, চিত্তরঞ্জনের লেখাতেও তেমনি ‘ফুট’ হইয়াছে। ভূদেব, বঙ্কিম, এমন কি বিবেকানন্দের লেখাতেও হিন্দু সভ্যতায়ই এঙটা প্রাধান্য যে, বিশ্বমানব সভ্যতার একটা অঙ্গ যে হিন্দু সভ্যতা—একথা কোঁসেই আমল পায় নাই। এই মূল ভাষ্যগাটিতে তেহ আছে—বলিয়া চিত্তরঞ্জনর ভাবের সহিত ভূদেব প্রকৃতির

ভাবের সাদৃশ্য দেখাইতে যাওয়া বাস্তবতা মাত্র। ভূদেবে বাহা নাই, ইহা চম্বে বাবু -বরুণ কারো লেখার মধ্যে মাথা খুঁড়িলেও ভারত বর্ষের লেখক তাহা পাইবেন না। অক্ষর-“সনাতনীয়” তাগুর হইতে ব্রাহ্মসমাজে লিখিত ~~বৈদিক~~ ~~সনাতনীয়~~ চিত্তরঞ্জনর কথা অসুস্থরূপ কথা উদ্ধার করা আরও অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট কথা সারিয়া লই। চিত্তরঞ্জন দেশমাতার মধ্যে বিশ্বরূপ দেখিবার কথা লিখিয়াছিলেন; তাই আমরা রবিবাবুর গানের দ্রুতি টুকুয়া তুলিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, সে কথাটাও রবিবাবুর, চিত্তরঞ্জন প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। খেওর মধ্যে অখণ্ডের অন্তের মধ্যে অনন্তের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের এমনিই প্রকৃতিগত বিশিষ্ট বস্তু যে, যদেশের দ্বয়ের বেলাতেও দেশমাতাকে তিনি বিশ্ব-মাতা, দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে তিনি বিশ্ব-দেবতাকে অসুস্থব করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে জীবরা সাধারণতঃ অনন্তকে সান্ত্বন্যে দেখিতেই ভালবাসি, অনন্তকে অনন্ত করিয়া অসুস্থব করিতে চাই না। স্তত্রাং এ জারপাতেও ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষার বর্ধিত চিত্তরঞ্জনর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সহজেই পড়িয়াছে ‘দেখা যায়। কিন্তু চিত্তরঞ্জনর শিক্ষা ও সংস্কার মুছিয়া ফেলিবার ক্ষমতা তিনি ব্যস্ত না হইলেও তাঁর সমর্থকেরা তাহা ব্যস্ত তাহাতো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে!

ভারপর বিলাসের কথা। ভূদেব বলিয়াছেন ‘দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ।’ এ অতি সাধু কথা—বিভাগাগরের আখ্যানমঞ্জরী বা কথামালাতেও বোধ হয় এ

ধরনের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে “বিলাসের ফাঁস” লিখিয়াছেন (সমাজ ২১ পৃষ্ঠা দেখ) বা চিত্তরঞ্জন যে বিলাস-অনিত সর্সনাথের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতরকার কথাটা ভূম্যেবের নীতি-কথা মাত্র নহে। তাহার ভিতরকার কথা এই যে, “পন্নীসমাজ বাক্সালী সভ্যতা সাধনার কেন্দ্র-স্থল,” অতএব বাঙালীকে যদি বিলাস-বাধি আক্রমণ করে, তবে সেই পন্নীতে থাকিবে চির দারিদ্র্য, আর সহরগুলি—“দেশের ভোগ-বিলাসের স্থানগুলি সমুদ্রশালী” হইয়া উঠিবে। এই যে পন্নীসমাজের কথা এবং পন্নীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা, ইহাই চিত্তরঞ্জনের সমস্ত রচনার আসল কথা এবং ইহাই আবার রবীন্দ্রনাথের আসল কথা। এই পন্নীসমাজের কথার অনুরূপ বাক্য ভূম্যেব বিবেকানন্দাবির রচনা হইতে ভারতবর্ষের লেখক উদ্ধার করেন নাই কেন?

ভারতের রবীন্দ্রনাথ বগাবর বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে যে রাজাই রাজত্ব করুন না কেন, “দেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই... স্বায়ত্ত শাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত।” তিনি পন্নীর Local Self-Government এর কথাই বলিয়াছেন।—আমাদের পন্নী যে self-governed self-contained community ছিল, একথার সাক্ষ্য বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরাও দিয়াছেন। পন্নীবাসীরাই আশ্চর্যরূপে পন্নীর শিক্ষারীক্ষা ব্যবসায় ধর্ম কর্ম শাসনাবির সমস্ত ভার নিজেরা লইয়াছে। চিত্তরঞ্জনবাবুও সেই কথা

বলিয়াছেন এবং সেই পন্নী সংস্কারের দিকেই সমস্ত ঞ্চৌক দিয়াছেন। ভূম্যেব লিখিয়াছেন, “হিন্দু সমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। ... অর্থাৎ দেশের অধিপতি হইলেও তাঁহার সমাজপতি হইতে পারিলেন না।” ইত্যাদি। ভূম্যেবের এই কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জনের কথার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, কেননা হিন্দুসমাজের “অন্তঃশাসন” বলিতে ভূম্যেব পন্নীবাসীর স্বায়ত্তশাসন আমো বুঝেন নাই। তিনি অন্তঃশাসন বলিতে কি বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত বাক্য হইতেই বুঝা যাইবে এবং লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত বাক্যের অর্থও পরিষ্কৃত হইবে:—

“ব্রাহ্মণজাতিই হিন্দুসমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শাস্তিহাসন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন।”—সামাজিক প্রবন্ধ।

সুতরাং ভারতবর্ষের লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত বাক্য, জাতি বা সম্প্রদায় বলিতে ভূম্যেব ব্রাহ্মণ জাতিই বুঝিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরাই “সমাজপতি” ছিলেন। এইজন্য পূর্বকালের ভারতীয় শাসনকে ইংরাজীতে theocracy বলা হয়। বিধি প্রণয়ন ছিল ব্রাহ্মণের কাজ, বিধি প্রয়োগ ছিল রাজাদের কাজ। ব্রাহ্মণের legislative function, রাজাদের executive function। এতটা সলাইয়া ভূম্যেবের বাক্যটি লেখক বুঝেন নাই। অথচ, চিত্তরঞ্জনবাবু পরিষ্কার বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন নিয়োগ দিতেন, কিন্তু আমাদের ধরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম।”

“বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি”

আর্চের “সাহিত্যে” শ্রীশুক দেবেশ্বরের
 রায় চৌধুরী “বঙ্গ সাহিত্যের গতি ও
 প্রকৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধে খুব অল্প পরিসরের
 মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটা
 দেখাইবার চেষ্টা করিচ্ছিলেন। সে হিসাবে
 এ প্রবন্ধটি স্থপাঠ্য হইরাছে। তিনি প্রথমে
 বৌদ্ধ সিদ্ধার্থগণের দোহা ও গীতিকার
 কথা বলিতে গিয়া ক্রিষ্টতেছেন :—

“আমাদের বাঙালি ভাষা মূলতঃ ও
মুখ্যতঃ সমাক্রমণেই Democratic বা লোক-
মতাত্ত্ববাদী।” তারপর তিনি লিখিয়াছেন
যে, পাঠানেরা এদেশ জয় করিবার পর
যখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটিল, তখন
সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা ও ভাব বাংলা
সাহিত্যে প্রচুররূপে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু
বাংলার খাঁটি বিশেষত্বটুকুকে নষ্ট করিতে
পারিল না। তখন একপক্ষে এই সংস্কৃতের
প্রভাব, অন্য পক্ষে ফার্সী, আরবী—বিশেষতঃ
হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব দেখা
দিয়াছিল। লেখক বলেন, হিন্দী কবি হুমায়ুন
প্রভৃতির গানই “ভাষান্তরিত” হইয়া নবোত্তম
রাস ও গোবিন্দ রাসের পদাবলী দৃষ্টি
করিয়াছে। ব্রজভাষার সেই সময়ের উদ্যোগ

ভারতের ঐতিহ্যের যুগে গদ্যবাহী-
সাহিত্য যেমন রূপের দিক্ হইতে একটা
অপূর্ণ বিকাশ লাভ করিল, তেমন
ভাষার দিক্ হইতে কৃত্যদাস কবিরাজের
চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি
গ্রন্থ সাহিত্যের নব নব ধার উপলব্ধি
করিল। সেই যুগেই বাংলা যেন নিজেকে

পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল বলা
যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যেও গল্পে ও
প্রবন্ধে যদি Democratic হয়, তবে এই
সময়ে তার সেই Democratic স্বরূপের
চরম বিকাশ দেখা দিচ্ছিল বলিতে হইবে।

তার কবিতা সাহিত্যের যে যুগ আসিল
লেখক তাহাকে “সৌধীন যুগ” নাম দিয়াছেন।
পানী ও সংস্কৃতের দ্বারা বাংলা ভাষাটা
সংস্কৃত হইয়া একটি সুমার্জিত বিলাস-ক্রী
লাভ করিল। ভারতচন্দ্রের কবিতা-তার
নিদর্শন। লেখক বলেন সেই কলা-সৌভ-
পূর্ণ কৃত্রিম ভাষাই “আজিও আমাদের
আগশ”। কিন্তু এই সময়েই আবার কবি-
রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনেরও আবির্ভাব।
উাদের প্রভাবে পাঁচালীওরালী, কবিরালী,
নিধুবাবু, দাণ্ডবাবু, হুকাঠার প্রভৃতির গানের
উৎপত্তি। সুতরাং গোড়াতো বাহা ছিল,
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনিবিংশ শতাব্দীর
গোড়াতো তাহাই রহিয়া গেল—বাংলা ভাষা
ও সাহিত্য লোকসাহিত্যই রহিয়া গেল।

তারপর ইংরেজি যুগের কথাই আসিবে।
লেখক দেখতেছেন যে এগুণে যে সাহিত্য
বচিত হইয়াছে তাহা ইংরেজির অঙ্গকরণ।
বাংলাভাষার গতি ও প্রকৃতি পূর্ন পূর্ন
যুগে যে Democratic ছিল, তার কারণ
বাংলা সাহিত্য ধর্মপ্রচারের মত নিয়োজিত
ছিল; কিন্তু ইংরেজি যুগে সাহিত্য Secular
হইয়া পড়াইল। যে সাহিত্য ছিল সর্ব
সাধারণের, তাহা এখন হইল প্রতিভাবান
কবি বা লেখকের আনুত্বরণ একটা উপ-
করণ। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যকে লেখক
“স্বার্থ সাহিত্য” নাম দিয়া বলিয়াছেন যে,

সমাজে একটা বড় রকমের বিপ্লব ঘটলেই এ সৃষ্টিতা কোথায় মিলাইয়া যাইবে। ইউরোপের Secular সাহিত্যও চিঁকিকে না; এমনতর কথা নাকি সেখানকার বহু প্রাজ্ঞ ও মনীষী বলিতেছেন। অবশ্য আমরা সে কথা ভাবি নাই, এবং ~~কিন্তু~~ ^{কিন্তু} সে সকল লোককে প্রাজ্ঞ বলিতাম কি না সম্ভেদ।

কিন্তু লেখক ইংরেজি যুগে আসিয়া অসুস্থকরণের উপর এমন ধড়াস্ত হইলেন কেন, তাহার কারণ বুঝিয়া পাই না। বৌদ্ধ সাহিত্যের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন, তখন তো বিত্তর বিদেশী ব্যাপার বাংলা সাহিত্যে চুকিয়াছে। তারপর মুসলমানযুগে তিনি বেধাইয়াছেন যে পার্শ্ব আরবীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেশ লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের যুগেতো আরও লক্ষ্য করা যায়। সে সব অসুস্থকরণের বেলায় তিনি বলিবেন, বাংলাসাহিত্য নানা কারণের ভাবকে ও ভাবকে আরন্ত-আত্মসাৎ করিয়াছে—আর ইংরেজির প্রভাবের বেলাতেই সেই আত্মসাৎ করিবার সহজ ক্রিয়াটার অন্তথা দেখিবেন? পৃথিবীতে কোন দেশের সাহিত্য বাহির হইতে কিছুই গ্রহণ করে নাই, এটা যেখানে বাইতে পারে কি? ইংরেজি সাহিত্য বরাবর বাহির হইতেই পুষ্ট, বাহিরের খাইরাই মাহু—ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ব্যাখ্যা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন গুয়াই আনেন। ইংরাজী সাহিত্যে চোরা আদি কবি, আর বার্ণাভদ্র অন্ত-সাহিত্যিক—চোরাের কাব্যকে প্রধান স্তরে গড়িল করাশীল

Chivalric romances-সচরিতা কবিতা, দ্বিতীয় স্তরে গড়িল দান্তে বোকাসিরো পেড্রার্ক প্রভৃতি ইতালীয়ন কবিতা।* এবং বার্ণাভদ্র ইবসেনের শিখা—কটিনেটাল সাহিত্যের পুষ্টিতে মাহু। বাংলাসাহিত্যেও এইরূপ নানা বিদেশী ধাক্কা স্তরে স্তরে ইহাকে গড়িয়াছে এবং আজও গড়িতেছে। একান্ত আক্ষেপের কোন কারণ নাই, বরং আশা ও আশ্বস্তের যথেষ্ট কারণ আছে।

তবে একটা কথা ঠিক। পূর্বেকার বাংলাভাষা ও সাহিত্য যেমন সর্বসাধারণের অধিগম্য ছিল, এখনকার বাংলা সাহিত্য তা নয়। তার প্রধান কারণ ইংরেজি শিক্ষার দক্ষ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান গাঁড়াইয়াছে এবং এখন সেই ব্যবধান কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে, সেইটেই হইয়াছে সমস্যা। এ সমস্যা দূর করার উপায় লোকশিক্ষার বিস্তার ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে “সখের সাহিত্য” বলিতে পারি না—ইহার সঙ্গে দেশের নাকীর সম্পূর্ণ যোগই আছে। দেশের সমুচ্চৈস্তস্ত্রে (mass-consciousness) ইহা পরিপূর্ণ। এখন এক দিন আসিবে যখন এই সাহিত্যের ধাক্কার নবজাগ্রত লোক-সমূহের চেতন উদ্বোধিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে আরও অপূর্ণতর নিবিড়তর বিস্তৃততর করিয়া গড়িবে। তখন যা বাজে তা খসিয়া যাইবে, যা আসল তাই টিকিবে।

ঐঅমিতকুমার চক্রবর্তী।



"চাইট করিল, বেটে দি' সাহস, চাইট,
 তারকার মূলে আনি দিবে আসি চাইট।
 কবি করে—তার গানে লাগে নাক কিছু,
 সে চাইট তিরিয়া আসে হোরা পিছু পিছু।"

— কবি —

ভারতী

৪১শ বর্ষ]

ভাদ্র, ১৩২৪

[৫ম সংখ্যা

দণ্ডনীতির প্রথম ইতিহাস

রাজনীতির চারি অঙ্গের মধ্যে “দণ্ড” অঙ্গতম। রাজ-শাসন ইহার উপরই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে সর্বাঙ্গের দণ্ডেরই অধিক প্রশংসা দেখা যায়। ইহা ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্ণেরই সাধক বলিয়া “ত্রিবর্ণ” নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা :—

“দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্মং তথৈবার্হঃ বিধানতঃ।

কামং সংরক্ষতে যশ্চাৎ ত্রিবর্ণো দণ্ড উচ্যতে।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুম-পুত পুতিকল্পদ্রুমঃ।

“দণ্ড ধর্মকে সংরক্ষণ করে—উচ্চপদে বর্ণানিরমে অর্থেরও সংরক্ষণ করে। যেহেতু (ইহা) কামকেও সম্যক রক্ষা করে—অতএব দণ্ড ত্রিবর্ণ বলিয়া উক্ত হয়।”

এই “দণ্ড” ত্রিবিধ বলিয়া অমরকোষের টীকার নির্দেশিত হইয়াছে যথা—

“স চ ত্রিবিধঃ। বহুঃ অর্থগ্রহণং বহুসত্তাভিনাশিতঃ।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুম-পুত অমরটীকা দায়দ্বন্দ্বী।

“সেই দণ্ড তিন প্রকার—বহু, অর্থগ্রহণ বা স্ত্রিমানা ও বহুদন-প্রহারাদি।” ইহাতে দণ্ডনীতি যে মূলে ইংরেজ-শাসনের ‘Penal

Code’ বা ‘দণ্ড-বিধি-আইনেরই’ সম্পূর্ণ অঙ্গরূপ হইতেছে—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ‘দণ্ডনীতি’ ইংরেজী Penal Code-এর অঙ্গরূপ হইলেও Penal Code নামে আমরা ইহার প্রথম ইতিহাসের প্রকৃত সন্ধান পাই না—বরং ‘দণ্ডনীতি’ নামেই ইহার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায়। “দণ্ডনীতি” নামের ব্যুৎপত্তি অভিধানে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

“দণ্ডেন নীকৃত বোঝাঃ দণ্ডঃ নয়তি বা পুনঃ।

দণ্ডনীতি মিত্যিখ্যাতঃ জীয়ে কানতিযর্গতে।”

“দণ্ডের দ্বারা ইহা^১ নিরমিত হয় বা পক্ষান্তরে দণ্ডকে নিরমিত করে বলিয়াই ইহা “দণ্ডনীতি” বলিয়া আখ্যাত। ইহা লোকজরকে অতিক্রম করিয়া থাকে।”

এখানে আমরা “দণ্ডকেই” মূল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং এই ‘দণ্ড’ শব্দের মধ্যেই ‘দণ্ডনীতির’ মূল ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ‘দণ্ড’ শব্দের মূলার্থের পর্যালোচনা

করিলে তাহার আলোকে জুড়ীতের বনাক-
কার অপসারিত হইয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক
সত্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের
দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের মনে হয় ‘দণ্ড’
শব্দ প্রথম প্রহরণার্থক যটিকেই বুঝাইত এবং
এই দণ্ড বা যট্টিদ্বারাই অপরাধীর শাস্তি
বিধান হইত বলিয়া ‘দণ্ড’ শব্দ শাস্তির
বাচক হইয়াছে। দণ্ড এই প্রকারে শাসনের
প্রধান অস্ত্র ছিল বলিয়াই “রাজদণ্ড”
শাসন-দণ্ডের রূপক হইয়াছে। ইংরেজী
Sceptre, rod প্রভৃতি শব্দ যে রাজ-
চিহ্ন—প্রতীক-চিহ্নের ভোক্তক হইয়াছে—
ইহার মূলও সেই যট্টি অর্থাৎ বর্তমান।

দণ্ডই রাজার প্রধান চিহ্ন বলিয়া ‘দণ্ড-
ধর’ শব্দ রাজার বাচক হইয়াছে। পুরা-
তত্ত্বের বিশেষ অধ্যয়ন দ্বারা—আমরা
‘দণ্ড’ অপেক্ষাও পূর্বেই শাসনাত্তের সন্ধান
লাভ করিতে পারি। সেই সন্ধান আমরা
বেধেই প্রাপ্ত হই। বরুণ বেধের একটা
প্রাচীন ও প্রধান বেধতা। তিনি বেধে
“সম্রাট্” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার
এক নাম “পানী” বধা, “প্রচেতা বরুণঃ
পানী”; তিনি “পানাত্ত” ধারণ করেন
বলিয়াই “পানী” নামে পরিচিত হইয়াছেন।
এই পাশকেই আমরা তাহার প্রধান
শাসনাত্ত বলিয়া মনে করি এবং ‘দণ্ড’
রাজার চিহ্ন বলিয়া যেমন রাজার ‘দণ্ডধর’
নাম হইয়াছে—তেমনই “পানী” বরুণের
সম্রাট্-চিহ্ন বলিয়া তাহার নাম “পানী”
হইয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়।
“পান” শব্দে বন্ধু বুঝাইয়া থাকে। পাশ
বরুণের শাসনাত্ত হওয়াতে বন্ধু দ্বারা বন্ধন

করিয়া অপরাধীর শাস্তিবিধান করা হইত,
ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

বেধের নিম্নোক্ত একটি পাঠ করিলে
বরুণের পাশ-শাসনের কতকটা ধারণা
আমরা করিতে পারি :—

“ক্রথাং যাহ কিত্বু কিরতো যামংগাশা

বরুণো যুযোতৎ।

অথো বধানি অধিতেকপরাঃপুতঃ পাশ

যতিতিঃ সনানঃ।”

ভবেদ, ১২ দণ্ড, ৮৮ হস্ত।

“এই সকল নিত্যভূমিতে বাগবর্ত্তঃ
(আমরা তোমার শ্রব করি)—বরুণ
আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা বেন
অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হইতে বরুণের
রক্ষা ভোগ করিতে পারি।” রমেশবাবুর
অনুবাদ।

বরুণের কোণ সধকে পান্ড্যাত্ম্য বৈদিক
পণ্ডিত রেগোমিন্ গিথিয়াছেন :—

“The accepted poetical expres-
sion of this fact was “Varuna binds
the sinner with his fetters”. Vedic
India, p. 147.

এই বিষয়ই প্রচলিত কবিতার ভাষায়
এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—“বরুণ পানীকে
পাশের দ্বারা বন্ধন করেন।”

বরুণের “পানী” নামের এই সমস্ত
আলোচনা হইতে রক্ষুর দ্বারা বন্ধনই
প্রথম শাসন ছিল—আমরা সেই, লুপ্ত
ইতিহাসেরই সন্ধান পাইতেছি।

বরুণ আমরা পাশের দ্বারা শাসনের
যেমন প্রথম ইতিহাস প্রাপ্ত হই—যে
তেমনই আমরা দণ্ডের দ্বারা শাসনের প্রথম

ইতিহাস প্রাপ্ত হই। তাহাতেই যেবতাদিগের মধ্যে “যমেরই অনন্তসাধারণ ‘দণ্ডধর’ অভিশেষ হইয়াছে। যম কিরূপে দণ্ডের দ্বারা পাপী-দিগের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন—পুত্রাণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়; বলা :-

“পতনোৎপত্তনৈকং বধাধগাণি পিডম্।”

বৃহস্পতীর পুত্রাণ।

“কোথারও পাতকী সকল একবার পড়িতেছে একবার উঠিতেছে, কোথারও পলায়গাণি দ্বারা তাড়িত হইতেছে।”

‘দণ্ডই’ কেবল যে যমের শাসনাত্ম তাহা নহে—‘পাল’ও যমের শাসনাত্ম! তাহাতেই যমের ‘কাল’ নামানুসারে এই পালের নাম ‘কালপাল’ হইয়াছে। যমদূতেরা পাপীকে প্রথম পালের দ্বারা বন্ধন করিয়াই যমের নিকট লইয়া যায়—পরে যমরাজ তাহা-দিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে পালের দ্বারা বন্ধন ও দণ্ডের দ্বারা প্রহার উভয়ই শাসনের অঙ্গীভূত হইয়া একই ‘দণ্ড’ নামের বাচ্য হইয়াছে। এই অঙ্গই পালের নামান্তর “রজ্জু”ও ‘দণ্ডিকা’ নামেই পরিচিত দেখা যায়। বর্তমান ‘হাতকড়া’ ‘বেড়ী’ প্রভৃতিতে আমরা পূর্বের সেই পাল বা রজ্জু বন্ধনেরই নিদর্শন দেখিতে পাই। পান্ডিত্য ভাষার handcuf, Shackles, fetters প্রভৃতির প্রয়োগে সেই পূর্বপ্রকারই অস্বত্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডের প্রথম অহুষ্ঠানেই যে কেবল বন্ধনের রীতি লক্ষিত হয় তাহা নহে—দণ্ডের পরিণামেও সেই বন্ধনের রীতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাহাতেই দণ্ডের পর বেহানে অপরাধী-দিগকে আবদ্ধ রাখা হয়—তাহার নাম হইয়াছে “বন্ধন-বেশ্য”, “বন্ধনাশয়।” ‘বন্ধন’ শব্দের আদি রজ্জু অর্থে হেমচন্দ্রকর্তৃক অভিধানে  হইয়াছে। ইহাচর ব্যুৎপত্তিও এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—
“বধ্যতেহেনেনতিকং ব্যুৎপত্তা।” ‘বদ্ধ করা হয় ইহা দ্বারা’ এইরূপে করণবাচ্যে ইহা সাধিত হইয়াছে। ইহাতে কারাগারেও যে অপরাধীদিগকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হইত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ‘কারাগারে’র কারা শব্দটি পর্য্যন্ত বন্ধনের অর্থই প্রকাশ করে। সুতরাং ‘কারাদণ্ড’ শব্দে কারাগৃহে মিশ্রিত হওয়ারও দণ্ড বুঝাইলেও আদিতে ইহা বন্ধন-দণ্ড পাওয়ার অর্থই যে প্রকাশ করিত আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি।

‘দণ্ড’ যে কেবল রাজ-শাসনেরই অস্ত্র ছিল তাহা নহে, ইহা সাধারণ শাসনেরও অস্ত্র ছিল। ইংরেজী ভাষায় ইহার অতি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। শিশুদিগের শাসন সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে “Spare the rod and spoil the child”—এখানে ‘rod’ স্পষ্টই দণ্ডের বাচক। প্রবাদটির অর্থ—এই “যদি দণ্ড অর্থাৎ বেয়াহি ব্যবহার না কর (তবে) শিশুকে বিগড়াইয়া অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ফেলিবে।” সংস্কৃতের তদনুরূপ বাক্য পাওয়া যায় বলা—“শাসনং পক বর্ধনি বশ বর্ধনি তড়িয়ে।”

“পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আদর করিবে—দশ বৎসর পর্য্যন্ত তড়িনা করিবে।”

“লাগনে বহা বোঝা তড়িনে বহে।

তত্ত্বাৎ পুত্রক শিষ্যক তড়িনে নু লালয়েৎ।”

“লাগনে বহা বোঝা এবং তড়িনে বহা
তত্ত্বাৎ—অতএব পুত্র ও শিষ্যকে তড়িনা করিয়ে
কিন্তু তাহাদের প্রতি আশ্রয় লেখাইব না।”

এখানে “তড়িন” শব্দে দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারই
যে বুঝাইতেছে— তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

সংস্কৃত দণ্ডের শাসন সম্বন্ধে আর একটি
অতি স্পষ্ট বাক্যও আছে; যথা—“মূৰ্খানাং
লাঠৌৰ্ব্বিঃ।” মূৰ্খবিশেষ লাঠীই উৎপন্ন অর্থাৎ
হিতকারক অস্ত্র।

ইংরেজীতে Birch শব্দে যেমন বৃক্ষ
বিশেষকে বুঝায়— তেমনই শিশুদিগের শাসন-
দণ্ডরূপে ব্যবহৃত ইহার শাখাকেও বুঝায়।

সাধারণ শাসন সম্বন্ধে আশ্রয়ের শাস্ত্রে
এইরূপ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়—

“ভাৰ্গ্য পুত্রক বা নন্দ শিষ্যোলাভাৎ সোধরঃ।

আত্মশাসনাভাভাভা প্রায়শ্চাৎ বেনুধসেন বা।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমতঃ।

“পত্নী, পুত্র, দাস, শিষ্য, সোধর স্রাতা
ইহারা অপরাধ করিলে রজ্জু বা বংশদণ্ড
দ্বারা তড়িনীয় হইবে।”

এ স্থলে আমরা বহুদান্যরূপে রজ্জুর
উল্লেখ না পাইয়া তড়িনান্যরূপে উল্লেখ
পাইতেছি। পান্ডিত্যদিগের lash, scourge
ও whip অর্থাৎ চাবুক আমরা তড়িনান্য-
রূপে রজ্জু ও দণ্ড উভয়েরই সংমিশ্রণ
বোধিতে পাই। আশ্রয়ের কণা, চৰ্ম্ম, ঘটি
বা চৰ্ম্মদণ্ডও, চাবুকেরই মত রজ্জু ও
দণ্ড সংমিশ্রিত অথ তড়িনান্য।

এই প্রকারে রজ্জু ও দণ্ডের সহিতই
সকল শাসনের বোঝা দেখা যাইতেছে।
আমরা দণ্ডের ভিবিধ প্রকারের মধ্যে

প্রথমেই যে বধের উল্লেখ পাইরাছি তাহাতেও
এই বোধেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। বধ-
দণ্ডটী সাধারণতঃ “উৎকলন” নামে অভিহিত।
এই উৎকলন যে বহুনের দ্বারা হয়
তাহা শকার্য দ্বারা প্রকাশ পায়।
উৎকলনের শকার্য দ্বারা উৎকলিকে বহুনে
বুঝায় অর্থাৎ বাহাতে সূলাইয়া বাঁধা হয়
তাহাই উৎকলন। উৎকলনের প্রচলিত শব্দ
কঁস বা কঁসি। ইহাতে আমরা যেন
‘পাশ’ শব্দেরই অপভ্রংশ দেখিতে পাই।
‘পাশের’ অপভ্রংশে ‘কঁস’ হওয়া সম্পূর্ণ
স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। কঁস
হইতেই কঁসি হইয়াছে। বহুপের শাসনান্ত্র
“পাশ” এইরূপেই কঁসে রূপান্তরিত
হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন আলোচনা হইতে আমরা
দণ্ডের প্রথম ইতিহাস ইহাই উদ্ধার করিতে
পারিতেছি যে, রজ্জু ও দণ্ডই প্রথমতঃ
শাসনান্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইত। দণ্ড, রজ্জুর
পরে উদ্ভাবিত বলিয়া উভয় শাসনান্ত্র এক
‘দণ্ড’-নামেই পরিচিত হয়। পরিশেষে
দণ্ড শাসনের সাধারণ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া
বহু হইতে ক্রিয়ারূপ ধারণ করিয়াছে।
তাহাতেই দণ্ড এক্ষণে শাসনমাত্রেরই
বোধক হইয়াছে। এই সাধারণ শাসনার্থ
হইতেই দণ্ড শব্দ—দণ্ডের দ্বিতীয় “অর্থ-
এষণ” অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে
দণ্ড ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়া শাসনাত্মক শাসন
হইতে ক্রমে নৈতিক শাসনের অর্থ লাভ
করিয়াছে। “দণ্ডনীতি” দণ্ডের এই অর্থ-
গোববোধই আভাস প্রদান করে।

ঐশ্বর্যভগবতঃ চক্ৰবর্তী।

টুপি

আমাদের এ লাইনের ছানা আহাঙ্গর হঠাৎ শশরীরে বলোরা-লোক গ্রাণ্ড হবার কারণ যে চাইবো বাঁড়বো কি বুঝবো মশারদের পদগুলি নয় সেটা নিশ্চয়। আজমজিসিয়া লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরেণু মেখে, গন্ধাভলে নিষত জুবে পেকে, ও গন্ধার বাতাস সেবা করেও আহাঙ্গ-ছানা মায় তাদের পুরানো তরুর ঘুণ, বেঁকি-গুলোর ছারপোকা-গুচ্ছ গোলোকে না গিয়ে কেন বরাবর বলোরার গোলাপবাগে হাজির হয়, এর সঙ্গে অধিনের নুকের মাঝে বারোমেসে গোলাপফুলের খসে-পড়া পাপড়িগুলোর কোমল স্পর্শের কোনো বোগাযোগ আছে কিনা সেটা আবিষ্কার করতে আমি যখন পুই বাস্ত, সেই সময় একদিন বিকেল সাড়ে-পাঁচটার টিমারে পাশের বেঞ্চে একটু আয়গা কোনোরকমে দখল করে চলেছি—একটু হাওয়া খেয়ে আসবার আশার; কিন্তু দূরদৃষ্ট—এক আহাঙ্গ বটে কিন্তু তাতে লোক উঠেছেন গ্রাণ্ড তিন আহাঙ্গ! তার উপর খালসী আছেন, সারেং আছেন, সাহেব আছেন, সাহেবের বেতে-ছাওয়া চৌকি আছেন আর আছেন সমস্ত পুলিশ কোর্টটি! ন হানং তিল ধারয়েং—এর উপরেও বোঝার উপর শাকের আটির মতো কোনো গৃহস্থীর করমাস-বেওয়া আকিসের ফেরতা মার্কেটের ফুলকপি, শনির তাগাধা-মতো সা ও লা কোম্পানির গ্রীণ্‌ সিল্‌ ইত্যাদি অত্যাশ্চর্যকর

সব অনবরত এসে পড়তে বিলম্ব করছিগে না! এই সময় অবিনকে আহরি-টোলার খাটে তার বাঁহা-তবলা গোবিন্দ চাকর আর আলবোলা নিয়ে লাল কাপড়ে বাঁধা বিশ্বসঙ্গীতের মোটা পুঁথি-বগলে আহাঙ্গ ধরতে দেখে মন আমার 'হা হতোশি' বলে মুর্ছিত হয়ে যে পড়ে এমন-একটু হান পেলে না;—দাবা-বোড়ের আটপাট-বাঁধা রাজার মতো বেচারী কিত্তি-মাতের অপেক্ষা করেই রইল।

বোঝাই কিত্তি আমাদের ঘাট ছেড়ে গলার মাঝ দিয়ে উত্তরমুখে আঙে আঙে চলেছে। আদপাশের মাজ্জের মাথাগুলো এত কাছে এবং এত বড় করে যেখতে পাচ্ছি যে দূরের জিনিস—তীরের ও নীরের কিছু আদ আর চোখেই পড়ছে না। এই মাথামুগুর উপরে কেবল দেখছি একাও খোঁটাই টুপির মতো আধখানা হুঁফা,—বেন লাল সাটিন কেটে দাঁজি সেটা এইমাত্র বানিয়ে সব মাথাগুলোতে ফিট করে নিতে চাচ্ছে! টুপির রহস্তে মনটা আমার যখন বেশ-মর হয়েচে সেই সময় ডিড়ের মধ্যে থেকে অধিন আমার ডাক্লে—“ওহে এদিকে এসো!” সঙ্গে সঙ্গে অধিনের হাত এসে ছোঁ ঘের আমাকে একেবারে ফাট' ক্লাসের প্রথম বেকি থেকে লাইট ক্লাসের শেষ বেকিতে এনে উপস্থিত করে।

চামড়ার ট্র্যাপে বাঁধা হোল্ড অল থেকে চটকানো কাপড়ের হুটটার মতো মাজ্জের

ঐ চাপন থেকে অবিন বখন আমাকে টেনে এনে বাইরে ফেরে তখন কি রে সোরাগি পেলাম! আঃ, জাহাজের এই অংশটা ফাট' ক্রাস থেকে বরাবর পড়িয়ে এসে একেবারে গঙ্গার জল আর দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে ডুব দিয়েছে। এখানে তত্ত্ব-গানার চাপ একমাত্র নেই;—খোলা বুক, খালি পা নিয়ে এখানে কাজ থেকে খালাস-পাওয়া হত খালানী সূর্যাস্তের আলোর মধ্যে নিজেদের মজলিস সান্নি-গানের সুরে ভরিয়া তুলেছে।

সে একটি ছোকরা,—হয় তো ঠিক ছোকরা বলতে বতটা বোঝার বয়সটা তার চেয়ে বেশী হলেও হতে পারে—কিন্তু যুগ-চোখ তার এখনো কাঁচ। অগভীর সঙ্গে আগাপ-পরিচয় শেষ করে দিয়ে বিজ্ঞ হয়ে বসবার এখনো তার ঘেরী আছে সেটা বুঝলুম; এবং তার মুখে এই গানটা আমার তারি অঙ্কুর ট্রেকল—

উত্তর দিকে অ্যালো বঁধু তাতা লায়ের গুণ চান,
আমার বঁধু ঠাড়িয়ে আছে পুরিয়ের ডই চাঞ্চানা।
বঁধু সুবের ময়ুর হাঁদি, তেমনে নয়ানমলে ভাদি,
ইদুর কথা রসে ভরা ট্রিক বেব চিনির পানা!

কলাই-করা ডুকচির বঁগা-তবলার তালে তালে মাথা ঘোলাতে ঘোলাতে—ওই বঁধু, চাঞ্চ, চিনির পানা, নয়ান জল এবং উত্তর থেকে স্তব্ধ টেনে ভরা তরীর আসার মধ্যে সারবস্ত্র কিছু উজ্জার করবার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ একটা দম্কা হাওয়ার অবিনের মাথার কালো টুপিটা উড়ে ডেকের উপর দিয়ে, গদাফাতে গদাফাতে বেকির ওলা হয়ে জাহাজ

টোপকে একেবারে জলে কঁপিয়ে পড়বার ভোগাড় করলে। অবিন তাকে মাথার চড়ালেও টুপিটা ছিল নিতান্ত আঘাত, স্তব্ধতা আমি বখন তাকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার কল্পে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছি সেই সময় পিছনে হোঃ হোঃ হাসির রব শুনে কিরে দেখলুম সেই খালানী ছোকরা তার সব ক'পাটি গাত বের করে হাসছে আর হাত-তালি দিচ্ছে—আঘাত দিকে চেয়ে। আমার তখন রাগ করবার মোটেই অবসর ছিল না। নগদ সাড়ে-সাত টাকা মূল্যের হোসেনবাজার মোকানের নতুন টুপিটা জলে ঘাওর থেকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে আমি নিশ্চিত হয়ে অবিনের পাশে এসে বসেছি সেই সময় সেই ছোকরা খালানী আমাকে এসে সেলাম করে বলে—“হুজুর, বেহাওবি মাণ করবেন! মাথা থেকে টুপি খসে পড়লে আমি বড় খুশি হই। ওটা জলে গেলে আমি আরো খুশি হতুম। টুপি নিয়ে আমি অনেক ভোগ ভুগেছি। ছেলেবেলার আমার বাপ আমাকে কখনো টুপি পরতে যেন্নি। তিনি বলতেন—লর্ডনের উপর সেলাপ, ঢাকা দিলেও বা, মাহুকের মাথার টোপি চাপালেও তা,—আলো পাওয়া শক্ত হয়। টোপকে মাছ বেমন এড়িয়ে চলে, ছেলেবেলা থেকে—কি বেশী কি বিশেষী—সব টোপিকে তেমনি ভরা করে কেবলমাত্র খোবার যেওয়া টুপিটা নিয়ে আমি বড় হতে লাগলুম। সেই সময়ে আমার বাপ একদিন যে কালো টোপি মাথার পৃথিবীতে এসেছিলেন তার কালো রং খোয়া কাপড়ের মতো, এই গদাফালের কৈনার মতো, পুরিমার ডই চাঞ্চের জেঁহিনার

মতো স্থান করে নিয়ে খোঁজাখোঁজ করার দরবারে হাজির হিতে চলে গেলেন।

“মা তো ছিলেননা, বাপও গেলেন—এক ছেলে আমাকে অগাধ বিষয়ের মালিক রেখে! কিন্তু বেশিদিন আমাকে অমাধ থাকতে হল না। অনেক জুটলো, এ গরীবের মা-বাপ হয়ে বসবার লোক অনেক জুটলো;—এত জুটলো যে তাদের ভিড়ে আমার সমস্ত ও অস্ত্র তর্জি হয়ে শেষ আমার মালখানা তোলাখানা আত্মবল পর্যন্ত সরগরম গুলজার হতেও বাকি রইল না। আমার মাথা খালি দেখে বাপও কোনদিন সেটাকে টুপি ঢাকা দিতে বাত্ব হুন্নি এবং মাও কখন চুঃখ পান্নি; কিন্তু এরা আমার মাথার টুপি না বেবে একেবারে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আমার খালি মাথার পর্দা রাখবার ক্ষেত্রে উঠে-পড়ে লেগে গেল এবং মৌলবীসাহেবরা বতদিন না বিচক্ষিতা বলে জাঁকালো একটা খুব উচু টুপি আমার মাথার চাপিরে দিয়ে গেলেন ততদিন এরা কিছুতেই ঠাণ্ডা হল না! টুপিটা বাইরে খুব জম্বুকালো—দরী দরাবতের কাপ, আর ভিতরটা পাদার চামড়ার পদী লাগানো! তারা এমন চমৎকার করে পে টুপিটা বানিয়েছিল যে টুপি-পরা কোনোদিন অভোদ না থাকলেও সেটা পরতে আমার কোনো কষ্টই হল না।

“নতুন গৌর উঠতে আরম্ভ হল, যেমন সময়-অসময়ে সেটাতে তা না দিয়ে থাকা দার না—তেমনি এই টুপিটাকে যখন-তখন মাথার দিগে আমি বেড়াই। টুপির

গুণে আমার খুব দেখতে-দেখতে হুড়োৎসব মত গভীর, আমার কথাবার্তা চালচলন খুব পাকা আর মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা আমার খুবই চক্চকে ও চওড়া হয়ে উঠলো। এই টুপিটা দেখলেই রাত্তার লোকেরাও আমাকে খুব বুদ্ধিমত্তা ঐশ্বর্য এবং আরো কত-কি বলে দ্রুততে সেলাম চুকতে লাগলো আর তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে ছবেলা মহল-ভড়া আমার মা-বাপের পরে তেল দেবার ক্ষেত্রে হাজির হতে লাগল।

এতগুলো মাথা একত্র হয়ে আমার বিয়েটা কি-রকম সর্জগ্রাসী ধুমধামের সঙ্গে বে ঘিরেছিল তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন! এতগুলো শওর-শাতড়ির ঘন খুঁগিরে চলতে আমার ভ্রার কী সে যমযন্ত্রণা! বিয়ের হিসেবের খাতা চুকতে না চুকতে বেচারী প্রাণত্যাগ করলে আর সাতসান্নার ধনে ধনী আমাকে মাথার টুপি ভিক্ষের খুঁগির মতো করে বোগদানের রাস্তার রাজা—মাত্রাঙ্গা থেকে মাত্রাঙ্গার উমেদারি করে ফিরতে হল। টুপিকে আমার কেউ অন্যায় করেনা বটে কিন্তু টুপি দার মাথার বাসা বেঁধেছিল সেই টাকার মতো একটা গোলা টাক-ওয়ালো মালুমটিকে দেখলেম কেউ খাতিয়েই আনতে চাইলে না—সেই চুঃখের দিনে।

“কতকাল টুপি-পরার এই জল—অনেক ভবিষ্যের এই টাক—এ’কে আমার সেই টুপিতে ঢেকে বোগদান ছেড়ে আমি বসোয়ার দিকে রওনা হলাম। যদি কেউ

না ছোটো তবে টুপির একটা লোকান খুলে দেখতেই টুপি পরিবে তবে ছাড়বো! অবিভি এ বুদ্ধিটা বোগদায়ে থাকতে-থাকতেই আমার মাথার বোগালে হোতো ভালো, কিন্তু কে জানে, ঐ টুপির গুণে কিবা যে লোকান আনোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আত্মর করা ছিল তারি গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথার এল তখন বোগদায়ে থেকে অনেক দূরে—বসোয়ার এসে পৌঁছেছি। সেখানে কেউ টুপি মাথায় দেয় না! গোলাপফুলের পাগড়ির মোড়ে-মালা গাঁধে তারা পাগড়ির মতো কিংবা আপনাদের ঐ শিবঠাকুরের সাপের মতো কেবল মাথার জড়িয়ে রাখে। বোগদায়ে আমার মতো সুপুরুষ কমই ছিল; এখানে দেখলেম আমার মতো সুপুরুষকে কেউ বিয়েই করতে রাজি হয় না, তার উপর মাথার মাঝে ছিল সেই টাকা-দ্রোণ টাকটি! যেখানে কেউ টুপি পরে-না সেখানে সর্বদা টুপি দিয়ে টাক ঢেকে যে কি আত্মকে আর অসোয়াড়িতে বিন কাটাতে লাগলেম তা কেমন করে জানাব। আমার কেবলি মনে হতো বসোয়ার এই গোলাপফুলের খোসবোতে ভরা জোর-বাতালে যেদিন আমার এ টুপিটা উড়ে যাবে সেদিন পাথার রোয়ার আত্মরের আওতার টাক-পড়া মাথাটা আমি কোন্‌খানে গিয়ে লুকোবো! বসোয়ার যেমন গোলাপফুল তেমনি গোলাপী টোন্টের মধুর হাসিও অনেক,—সেই হাসির তুকানের ঝাপটা থেকে টাক বাঁচাতে আমারকে কি ভোপই না ভুগতে হচ্ছিল।

টুপিটা আমার মাথার ফুকণী পোকায় মতো;—তাকে টেনে ফেলতে পারা শক্ত, তাকে রাখলেও বহুদার অস্ব নেই।

“এই সময় বহুদার উপর বহুদা,—আমি প্রেমে পড়লেম! আসকের আগুন যদি মগছে জ্বলতো তবে সেটাকে টুপি চাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেন কিন্তু সে যে খোদার নিষেধ হাতে জালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে এমন জারগার তিনি তাকে রাখেন-নি। দুনিয়াকে রোসনাই বিতে সে বাতি তিনি আলিয়েছেন—বুকের মাঝখানে প্রাণের সঙ্গে এক সামান্যনে। সেই বাতির আলোর বাকি আমি ভালোবাসলেম তাকে কি হৃদয়ই দেখলেম! যদিও সে বসোয়ার গোলাপবাসের খুব ছোট ফুল বৈ বড় ফুল ছিল না। সেই দিন আমি সবপ্রথম খোদাতালায় কাছে হাত-পেতে ভিক্ষে চাইলুম আমার ছেল-বেলাকার সেই কৌকড়াচুল খালি মাথা! হাসবেননা বাবু, সবাই চার খোদার কাছে বড় হতে, আমি বল্লম—‘আমার ছোট কর’। দুনিয়া ছিটি হয়ে এমন ভিক্ষে শুধু কি আমিই চেয়েছি, কত লোক চেয়েছে, পেয়েছে, এখনো চাচ্ছে দেখুন না—”

আমি সেই ছোকরার কথাই নবীর পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলেম পৃথিবীর মাথার উপর থেকে সেই লাল মখনলের বড় টুপিটা সরে গেছে, দিগন্তের শিররে কাণো মেঘ এসে লেগেছে, আর নবীর পূর্বপারে চান্দনী রাতে নতুন জ্যোৎস্না, তারি তুলার গাছের আড়ালে একটি মন্দিরের ঘাটে বাঁশিতে সাহানার স্বর বাজছে।

সেই নতুন রাতের মধ্যে বিয়ে আন্তে আন্তে জাহাজ এসে বড়ঝাড়ের ঘাটে লাগল। আমি অভ্যাস-মতো অবিনের কাছ থেকে আমার টুপিটা চাইতেই সে অবাধ হয়ে বলে,—“সে কি! তোমার পাশেইতো সেটা ছিল!”

জাহাজ থেকে অনেকগুলো টুপিওয়ালা নেমে গেল, কেবল আমার ছই বন্ধুতে নামলেন খালি বাধা। তার পর দিন সে জাহাজখানাও বসোয়ার চলে গেল। গল্পের শেষটা শোনবার ইচ্ছা থাকলেও সে ছোকরার আর দেখা পেলুম না।

ঐশ্বর্যবাননাথ ঠাকুর।

সার্বজনীন কল্যাণ

(ক্রপটকিন হইতে)

সার্বজনীন কল্যাণকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—এটি পুরোপুরি বাস্তব এবং কার্যকর সম্ভব। সার্বজনীন কল্যাণের মধ্যে মানব-সাধারণের মনুষ্যোচিত জীবন-ধারণের চেষ্টাই নিহিত। এর অর্থ, মানুষ যাতে মানুষের মত বাঁচেতে এবং তাদের কাজ-চালাবার ও সমাজ-রক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সন্তানপালনের সুবিধা পায়। এতদিন কর্মী-সম্প্রদায় যুগে যুগে, পণ্ডিত মত জীবনধারণ করে* পরের ক্ষেত্রে খেটে মরেছে; এবার তাদের মানুষের মত বাঁচবার দিন এসেছে—মানব-সাধারণের বঞ্চিত অধিকার লাভের পক্ষে বর্তমান শতাব্দী মাহেজ্ঞান।

কর্মী-সম্প্রদায় যদিও সত্য লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, তবু তাদের উৎপাদিত ফসলে এতোকেই সুখসম্বলিত থাকতে পারে। বেশী ভাগ, বেসকল ধনী পরের পরিভ্রম-প্রসূত ফসলের আরে জালন্তে সমর ও

পরিভ্রমের অপব্যবহার করেছেন এবং অপরের প্রাণো হতক্ষেপ করেছেন, তাঁদের যদি পরিভ্রমে বাধা করা হয় তবে প্রচুর ফললাভের সম্ভাবনা। Malthus-এর theory অনুসারে অনেকে মনে করেন যে, খাদ্যবৃদ্ধির অল্পপাত জনবৃদ্ধির* চেয়ে অনেক কম; কিন্তু তার বিপরীত কথাটাই বেশী প্রামাণিক;—যেখানে লোকসংখ্যা বাড়ে, খাদ্য তার চেয়ে বেশী বাড়ে,—কারণ, সেখানকার ভূমির প্রসবশক্তি আবৃত্তকের সঙ্গে ক্রমগতিতে বেড়ে যায়। সকল দেশের ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই জনবৃদ্ধির অল্পপাতে মাত্র প্রজনন-শক্তি ত বৃদ্ধি হয়েছেই, এমন-কি, কোথাও কোথাও দশগুণ পর্যন্তও বেড়ে গেছে।

হরত ভাল অবস্থার পড়লে আরও অনেক গুণ বাড়তে পারত, কারণ পৃথিবীর জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলস ও অধাবিত সম্প্রদায়ও বেড়ে চলেছে।

দেশের' অর্থ করেকজন বাবদ্যায়ী বা ধন-
কুবেরের হাতে জমা হবার বদলে ধনী-
সুখাপেক্ষী বারো ভূতের করতলগত
হচ্ছে—কিন্তু তা'তে দেশের ধনবৃদ্ধির কোন
সহায়তাই হচ্ছে না।

কেবল তাই নয়; মূলধনের মালিক
জিনিব-উৎপাদনের পথে বাধা দিচ্ছে—
যাতে উৎপন্ন সামগ্রী সবাইয়ের পক্ষে
পর্যাপ্ত না হয় সেদিকেই তার দৃষ্টি।
লক্ষ লক্ষ লোক দীর্ঘের দিনে কয়লার
অভাবে কঁপে মরছে। কিন্তু কয়লার খনির
অধিকারী কর্তৃপক্ষক ধনকে সঞ্চারে
মাত্র তিনদিন খনিতে কাজ করতে দেয়।
হাজার হাজার তাঁতি তাঁত বন্ধ করে'
বসে আছে—তাদের ক্রী-পুত্রের জাকড়া
মাত্র অঙ্গের আবরণ, আর লক্ষ লক্ষ
লোকের অনাচ্ছাদন পোষাক নামেরও
অবোধ্য। হাজার হাজার কল-কারখানা
বছরের মধ্যে কতবার বন্ধ রাখা হচ্ছে,
অথচ লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে
কারখানার ঘরে ঘরে হতাশা নিয়ে পড়ে
আছে, এমন-কি অনাহারে প্রাণ-পর্যন্ত
বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে।

যদি এই-সমস্ত লোককে' কাজের
অধিকার দেওয়া হয়, যদি সমস্ত খনি-
কারখানার সঞ্চার-ভোগ কাল চলে, তবে
এই কর্মীদের সানন্দ ও আন্তরিক পরিপ্রসে
আনন্দের ধূলার পৃথিবী সোনার হয়ে
উঠবে। কিন্তু মানুষের এই সম্পদ
অর্থের পথে বণিক ও কল-কারখানার
মালিক তাদের সঞ্চার-বাসনার কাঁটা পুতে
রেখেছে।

এ-সব ত সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক। পরোক্ষ-
ভাবেও কসলের যথেষ্ট প্রতিবন্ধক আছে।
ধনীর বদবেশাল চরিতার্থ করতে বা অসার
বিলাস-সামগ্রী তৈরী করতে যে খাটুনিটা
বাজেখরচ হয় সেটাও ধর্তব্যের বিষয়। আরও
অনেক রকমে কর্মী-সম্প্রদায় পণ্ড্রমে
বাধা হয়ে কসলের ও কারখানার
প্রস্তুত সামগ্রী-উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষতি
সাধন করে। বাজার-মন্ডলের চেষ্টার
জাতিতে জাতিতে যে বৃদ্ধ চলে তার সাজ-
সরঞ্জাম তৈরী করতে যা ব্যয় হয় সেটাও
বাজেখরচ বই আর কি? নিক্ষেপ অথচ
নামজালা চাকুরীদের মাহিনার যে মোটা
টাকাটা খরচ হচ্ছে তা আমাদের লোকসানের
অঙ্কই বাড়িয়ে তুলেছে। তারপর বিচার-
প্রহসনে যে-সব বিচারপতি পুলিশ পাহারা
শান্তিরক্ষার বিচিত্র অভিনয় এবং বাস্তবিক
পক্ষে দেশের অনান্তি-বৃদ্ধিই করছেন তাঁরাও
বিনা-শ্রমে দেশের ও দেশের শ্রমলব্ধ অর্থশোষণ
করছেন; অথচ কর্মী-সম্প্রদায় বছরের পর
বছর দেশের অন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও
করক্লেশে দিন-গুজরাণ করতে অপারগ।
বড়লোকের সংখ্যে কুতূহ ও ঘোড়া
প্রভৃতির মাতাবেলে ও বৈঠকখানার ব্যয়
দাস্য করছে তাঁরাও মস্ত-একটা বাজে
খরচ। এই-সমস্ত বাজেখরচ যদি দেশের
উপকারে লাগান হয় তবে আমাদের সম্পদ
অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়, এবং কল-কার-
খানার উৎপন্ন বহুপাতিতে দোকান ভরে
ও জিনিব-পত্র সত্তা হয়ে সাধারণের
অন্যায়সলভ্য হয়। বর্তমান ব্যবহার কলে
দেশের সিকিভাগ লোক বছরে তিন-চার

মানের মত কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে বাধ্য; আর,—প্রায় অর্ধেক না হোক—অন্তত আরও সিকিভাগ লোকের পরিশ্রম ধনীর বিলাসদালস। চরিতার্থ এবং সাধারণের অর্থশোধক সামগ্রী তৈরী করতে ব্যরিত হয়।

এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থার সভ্য-সমাজে একদিকে যেমন ফসল বাড়ানোর শক্তি আছে অল্প দিকে তেমনি সেই বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকও আছে যথেষ্ট—তা সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—যে-ভাবেই হোক না কেন! কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারছেন যে, বেশের আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতির উপরে আশাতীত প্রাচুর্য নির্ভর করছে; কারণ, কেবল মজুরদল নয়—মানব-সাধারণের একঝোটে চেষ্টার কর্তব্য বহুরের মধ্যে আমাদের সকল অভাব দূর হয়ে যাবে। আমাদের আহা, পরিচ্ছন্ন ও সংসার-সামগ্রীর সৈন্ত ত থাকবেই না, বরং আমাদের অবসর ও শক্তি কোন্ কাজে লাগাব এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

না, প্রাচুর্যের কঁথাটা নিত্যন্ত স্বপ্ন নয়—একেবারে বাস্তব। যখন হাতে কুচি ও শিল্পের ঘর তৈরী করতে হতো, যখন এক-কাঠা অঝোটে একমুঠো শক্ত উৎপাদন করাও কষ্টকর ছিল, তখনকার পক্ষে এটি অবশ্য স্বপ্নকথা! কিন্তু বর্তমান বিশ্বজোড়া সভ্যতার দিনে, বাহ্যের বৈদিক প্রমাণব-কারী যন্ত্রপাতির দিনে এটি আর স্বাভাবিক নয়—কার্য্যত সম্ভব!

* কিন্তু, যদি এই প্রাচুর্য্য কার্য্যে পশ্চিম

করতে হয় তবে যুগে যুগে সঞ্চিত যুগ্মবের বিরাট মূলধন, লক্ষ লক্ষ কল-কারখানা-ঘনি, কৃষিকৃষি, পল্লীনগর ও শিল্পা,—সমস্তই জনসাধারণের অধিকারভুক্ত করতে হবে, একচেটে ব্যবসায়ীর বা বিন্দুশায়ীর খেয়ালের অধীন রাখলে চলবে না; কারণ, এই প্রাচুর্য্যের উপরেই আমাদের শক্তি ও শান্তি নির্ভর করছে। বহু পরিশ্রমে আমাদের পূর্বপুরুষ যা গড়ে গেছেন বা আবিষ্কার করেছেন সেই সঞ্চিত ও ক্রমশ-বর্দ্ধমান সম্পদ সাধারণের সম্পত্তি হবে এবং সম্ভব চেষ্টায় সকলের উপকারে ব্যরিত হবে।

ধনীসের অন্তর অধিকার-চ্যুতিই সার্বজনীন কল্যাণসাধনের একমাত্র উপায়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের উপর সভ্যসমাজে কেবল চিন্তার ও ভাবের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু ধনীঘরের চেষ্টার সে চিন্তা বা ভাব কার্য্যে প্রকাশ পায়-নি; বর্তমান শতাব্দীতে সেই চিন্তা ও ভাবই সামাজিক বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ধনী-নির্ধন সঙ্কলনেই অন্নবিত্তের বুঝতে পেরেছেন যে, বর্তমান ব্যবহার বিরুদ্ধে * একটা বিদ্রোহ অবশ্যজ্ঞাবী। বর্তমানের ইতিহাসে এই অধিকারচ্যুতিই সর্বপ্রধান সমস্যা; কারণ, মানব-সভ্যতার সব-চেয়ে বড় কঁথাটা এরই মধ্যে সঙ্কল হয়ে উঠবে। কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংগঠিত কোন শক্তি এ পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না—সাধারণের একঝোটে চেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান হবে, এই মহান কল্যাণকর পরিবর্তন সাধিত হবে।

লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে আর বলছে, এ বিপদ থেকে পরিজ্ঞানের উপায় কি? এ

প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে এই যে, সভ্য-সমাজের ঘরে ঘরে আত্মপিত্র প্রচার করতে হবে—সকলেরই বাঁচবার সমান অধিকার আছে,—সমাজে সে যে স্থানই দখল করে থাকুক না কেন? হোক সে ধনী বা নির্ধন, শ্রম বা ক্রম, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। আমাদের বলতে হবে, সমাজই সবাই সমাজের প্রত্যেক জিনিসের সমান ভাগীদার। এ-কথা শুধু মনে স্বীকার করলে বা কাগজে লিখে প্রচার করলে চলেবে না, প্রাণে প্রাণে এ সভ্য বিশ্বাস করতে হবে, এই কথা-অনুসারে কাজ করতে হবে।

এই কাজের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সামাজিক বিদ্রোহ—অধিকারচ্যুতি। আমাদের এ বিদ্রোহে শুণ্ড যন্ত্রণা-সভা নেই, গোলাগুলি রক্তপাত নেই; এর মধ্যে আছে উদার সহৃদয়, বার্ষত্যাগ ও বর্ষার্থ বীরত্ব,—যা প্রাণহীননের পরিবর্তে প্রাণরক্ষারই সহায়তা করে। অস্ত্র শব্দের অভাবে আমরা এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনকেই বিদ্রোহ নামে অভিহিত করতে বাধ্য হচ্ছি।

অনেকে মনে করেন, অধিকারচ্যুতি মানে, ধনীঘরের সিন্দুক ভেঙে তাদের সঞ্চিত সম্পদ জনসাধারণের স্বর্গে ভাগ করে' দেওয়া; 'সেটা কিন্তু নিত্য কুল গারগা,—কেননা, আমরা চাই যাতে প্রত্যেক মানুষ জীবনধারণের উপযোগী ব্যবসা শিখতে পারে, যাতে লোকে কোন মালিক বা মহাজনের অধীন না হয়ে সুবিধামত আপনার শিক্ষা ও শক্তি কাজে লাগাতে পারে এবং মানুষের বড় বাঁচবার ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকৃষ্টকেই কড় দিতে না হয়। অর্থাৎ কাউকে আর দিন-

ওজরাণের ক্ষেত্রে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থার বা অর্ধ-অনশনে পত্রের কারখানার, ধনিতে বা মাঠে অনর্থক বুকের রক্ত ঢালতে হবে না। ধনীঘরের অর্থ যদি আমাদের কোন উপকারে আসে তবে সেটা জনসাধারণের সুবিধার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বা শ্রুত-উৎপাদনের উপযোগী কোন কাজে ব্যয়িত হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা অনেক বিদ্রোহের কথা পড়ছি, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ দোষের ক্ষেত্রে সে-সব চোঁটা বর্ণেই-রূপে সকল হয়-নি। আমরা কিন্তু রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর হব—নিজের বা দলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, সুবিধা বুঝে কাজ করলে প্রমাণে ভুলেরই পুনরাবর্তন হবে, প্রকৃত কাজ কিছুই হবে না। এই বিদ্রোহের প্রথমই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে জনসাধারণ উদয়-পুষ্টি করে' যেতে পারে, লক্ষ্যনিবারণের বোমা বসন পারে, মাথা রাখবার মত স্বাস্থ্যকর ঠাই পারে; তবেই-ত তারা বুঝবে যে, মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম তাদের মাথা বোকাবার বন্দোবস্ত হয়েছে, তাদের কাজে-বাটাবার আগে তাদের অত্যাব-অভিযোগ মেটানো হয়েছে—তবেই ত আমাদের প্রয়াস ও পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু, কোন বিশেষ সভা বা কোন কার্য্যকরী সমিতির দ্বারা এ-সব কাজ করতে গেলে কিছুই হবে না, প্রত্যেককেই কোমর বেঁধে ধূলা মেখে কর্মক্ষেত্রে নামতে হবে, জন-সাধারণের নামে তাদের প্রমদ্র সমস্ত সম্পদ ধনীঘের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে—পরস্পর কাপড়, লাঙ্গলের ধীর,

স্বাধীনতার পাত্র—এককথার মাদ্রাসের মত
বাঁচতে হলে যা-কিছু ধরকার, সবই তাগের
অন্যায়ালমতা করতে হবে। একজনের বা
একধর্মের সুবিধা নয়—জনসাধারণের
সুবিধা-সাম্রাজ্যের বিকেই আমাদের সকল
চেষ্টা একত্র করতে হবে—হাতে মাদ্রাস
বাঁচতে পার এবং ভবিষ্যৎ সমাজের উন্নতির
অন্তে স্বাধীনতা মধ্যে সাম্রাজ্যের মধ্যে জ্ঞানের
মধ্যে বাড়তে পার।

একটা তর্ক আছে। অনেক বলছেন,
'স্বীকার করুন, কোন দেশে এমনধারা
পরিবর্তন সাধিত হল এবং সত্যের সকলেই
সহান অধিকার লাভ করলে। কিন্তু ধর,
যদি অল্পবেশ থেকে কোন ধনী মহাজন
এসে সেই দেশে বাস করে এবং কারখানা
খুলে বা বাণিজ্য করে' দেশের সম্পদ-
আহরণের চেষ্টা করে, তবে তাকে বাধা
দেবার উপায় কি? একথা কোনমতেই
বলা যায় না যে, সব দেশে একই সময়ে এই
বিস্তার ঘটবে, তা-হ্যাঁ। তোমাদের শাস্তি-
রক্ষার জন্যে ও পাহারার সৈন্য থাকবে না।'

এ তর্ক যাত্রা তুলছেন, তাঁরা
নিতান্ত একঘেঁষাধনী। হুলধনী মহাজন,

কারখানার মালিক বা অধিকার সবাই একই
উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং সে উপায়
হচ্ছে অভাবগ্রস্ত কল্লী-সম্প্রদায়ের রক্ত
শোষণ। কিন্তু এই অবস্থা-পরিবর্তনের
পর যদি দেশে কারও কোন অভাব বা
অসচ্ছলতা না থাকে তবে তারা অর্থ
বিক্রয় করবে কিসের জন্যে! যদি স্বাধীন
থেকে নিঃশেষ ক্ষেত্রে-কারখানার বা
খনিতে তারা কাজ করতে পার তবে
অপরের দ্বারস্থ হবার তাগের প্রকার কি?
অল্পবেশ থেকে কোন ধনী অর্থসঞ্চয়ের
মংগলোবে সে-দেশে এসে, ব্যর্থমনোরথ হয়ে
তাকে ফিরতে হবে—সৈন্ত-সাহায্যে তাকে
বিদায় দিতে হবে না।

বর্তমানের ধনীরা, কবি ও বৈজ্ঞানিক
আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, কল্লী-সম্প্রদায়
যে-দিন নিঃশেষের কালে, খনিতে ও মাঠে কাজ
করবে, যে-দিন অর্থ-বসন-শরনের জন্যে
কাউকে ক্রয় দিতে হবে না, সে-দিন এস বলে!
অর্থ-ভবিষ্যতের সেই শক্তি, শান্তি ও প্রাচুর্যের
উৎসব-দিনের অপেক্ষার ধরিত্রীর অঙ্গনে
আমরা উৎসুকনৈবে পথপানে চেয়ে আছি।

ঐ-প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দু, মুসলমান ও পার্সী রমণী

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার চির-
ব্রতচর্য—এইগুলি ভারতীয় সমাজের খাঁটি
লক্ষণ-পরিচায়ক বৃত্তি। কিন্তু, সমাজ-
সংস্কারকেরা যোর করিয়া যে সকল দুর্বোধ্য

সৌভিন্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাভাষায়
শিক্ষা, অজ্ঞান, বিশ্বাস, সমস্ত জীবনব্যাপী
নির্বাহপ্রণালী, তাহার বিকৃত।

হিন্দু রমণীরা অন্তঃপুরে ভ্রমরুজা ; পরি-
বারের পুরুষ-পরিজনদেরা পর্বাস্ত তাহার ভিতর
প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ক-হইতে
সাধারণ হইবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন
করা হইয়া থাকে। 'অ-বিভক্ত স্বভাবিকায়-
নিয়মের কল্যাণে, একশো চুশো লোক প্রায়ই
এক বাড়ীতে বাস করে ; কি পুরুষ, কি
রমণী উভয়ই স্বল্পবাসাচ্ছাদিত ; এইরূপ
ঘরের ভিতর বন্ধ হইয়া না থাকিলে পারি-
বারিক নীতির নশাট কি হইত বলা যায় না।

অন্তঃপুরে থাকে—গৃহস্থানীর মা, স্ত্রী,
মেয়ে, বৌ, ছোট ছেলোদের বাগ্‌মস্তা বধু ;
তাছাড়া বড়মাস্তরের বাড়ীতে কতকগুলো
দাসী।

পরিচ্ছন্ন :—ছোট জামা, ছোট ছেলোদের
জন্ত কামিজ, স্ত্রীলোকদের জন্ত কাঁচুলী,
শাড়ী—যাহা কোমরের চারিদিকে অড়াইয়া,
বাস্তুর নিচে দিয়া বাহির করিয়া, মাথার
উপরে আনিয়া ফেলা হয়। বসম্ভেষে কেবল
একখানা শাড়ী মাত্র। বিবাহিতা রমণীর
কপালে একটা লাল ফেঁটা, তাহার স্মরণ
চুল তেল দিয়া আঁচড়ানো ; অলঙ্কারের
সম্বন্ধে প্রাচুর্য।

কাছের মস্তো—বরকরার কাঁজ, রাঁধা-
বাড়া, তাল প্রকৃতি খেলা, গল্প-শোনা বা
গল্প-পড়া, তাছাড়া শিশুদের শিকা দেওয়া।
পরিব স্ত্রীলোকেরা, কাজ করিবার জন্য
বাহিরে যাইতে বাধ্য হয় ; ধনী গৃহের
স্ত্রীলোকেরা কবাচিং গৃহের বাহির হয়,
তাহারা পর্দার ভিতর অবগুষ্ঠিতা ; কখন
কখন তাহারা ব্রম্ভণে বাহির হয়, এবং
প্রায়ই পূজা-অর্চনার জন্য মন্দিরে যায়।

"বিবরুকে" অন্তঃপুরের বর্ণনা এইরূপ
আছে :—"একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরসৌরী
সকলে মিলিত হইয়া পূর্বাতন অন্তঃপুরে
বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনন্তীতবাল্যা
কুমারী হইতে পলিত-কেশা বয়সী পর্বাস্ত
সকলই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল,
কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং উ উ করিয়া
উকুন মারিতেছিল। কেহ পাকা চুল
তুলাইতেছিল, কেহ ধাত্তহস্তে তাহা তুলিতে-
ছিল, কোন স্মরণী স্বীয় বালকের জন্য
বিচিত্র কাঁধা দিয়াইতেছিলেন ; কেহ বালককে
স্বস্তপান করাইতেছিলেন ; কোন স্মরণী
চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে
ঠেলাইতেছিলেন, ছেলে সুখবাসান করিয়া
ভিনগ্রামে সন্তস্তুয়ে রোমন করিতেছিল।
কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেন, কেহ
কেহ খাখা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন।
কোন চিত্রকুমলা কাহারও বিবাহের কথা
মনে করিয়া সিঁড়িতে আলপনা দিতে-
ছিলেন, কোন সঙ্গ্রহসঙ্গ্রাহিণী বিদ্যাবতী
দাস্ত্রায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন, কোন
বয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া স্রোত্রীবর্ণের
কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা
স্ববতী অর্দ্ধফুটবরে স্বায়ীর রসিকতার বিবরণ
সবীমের কাপে কাপে বলিয়া বিরহিণীর
মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর
নিন্দা, কেহ কর্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসী-
দিগের নিন্দা করিতেছিলেন ; অনেকেই
আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। বিনি সূক্ষ্মসূখী
কর্তৃক প্রাতে নিজ বুদ্ধিহীনতার জন্য মুহ
তৎসিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার
বুদ্ধির অসাধারণ প্রাধিকার অনেক অনেক

উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন। যাহার রক্তনে প্রায় লবণ সনান হয় না, তিনি আপনাদিগকে পাকটেনপুণা সম্বন্ধে সুবোধিত করিতেছিলেন; যাহার স্বামী প্রায়ের মধ্যে গণ্ডবৃত্ত, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাকটেন-কৌশল করিয়া স্ত্রীকে বিবাহিত করিতেছিলেন। যাহার পুত্রকন্তাগুলি এক-একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রক্তগর্ভা বলিয়া আশঙ্কিত করিতেছিলেন।”

গৃহিণী, বাড়ীর সকল মেয়ের উপর কর্তৃত্ব করেন। কোন প্রবল অধিপতির পরে কিংবা কোন ধনী বণিকের পত্নী, গরিব মা-বাপের কঠোর অবস্থা হইলেও সর্বজনবাহিত ঘৃণাপীড়িত রমণীর অবস্থা লাভ করিতে অস্বীকৃত হইবে। সে বাল-বিধবা, শতর-শাণ্ডীর দাসী হইয়া পড়িয়াছে তাহার অবস্থা অবশ্য শোচনীয়, কিন্তু যে বিধবা পুত্রবতী, সে স্বীয় শতর-শাণ্ডীর উপর, স্বীয় পুত্রবধূর উপর যেমন প্রভুত্ব করে সেইরূপ প্রভুত্ব গৃহে অপরিজ্ঞাত।

• •

অন্তঃপুরের পর অন্তঃসদন। মুসলমানীরা সমগ্র বাসাবাস; উত্তর পশ্চিমাংশে, চণ্ডা পা-আবার উপর, একটা বিপুল আদাম। উৎসব-পার্বণে, খুব দামী কঙ্করকে রংএর পরিচ্ছদ। মাথার খুব স্নিকমিক দামী পাখরের সিঁদা।

তাঁহাদের জীবনটা এক-ধেরে, কিন্তু—যদি একজন মুসলমান লেখকের কথা

বিস্ময় করা, তার—তাঁহাদের সম্বন্ধে আছে:—

(১) “বহু শতাব্দীর ব্যবহারে স্বীয় স্বভাবের মধ্যে যাহা বহুসূল হইয়া গিয়াছে সেই অত্যাশ্রয় বংশ, মুসলমান-মহিলা বাহিরের লোকের সহিত মেলামেশা করার অর্থ যদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবন নিত্য একধেরে বা অসহ্য নহে। মুসলমান-মহিলা স্বীয় গৃহের অধীশ্বরী; সমস্ত গার্হস্থ্য ব্যাপারের উপর তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত। সমস্ত গৃহের শাসন-তার তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। সেখানে তাঁহারই মতামতের প্রভাব সব-ক্ষেত্রে বেশী। তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিগত গৃহের কোন বিভাগের কাজই করা যায় না। যদি ছেলেরের জন্ত, স্বামীর জন্ত বা আর কাহারও জন্ত কিছু করা আবশ্যক হয়,—তাঁহারই পছন্দ সবচেয়ে দেরা বলিয়া বিবেচিত হয়। স্বামীর পরিধের বস্ত্রের তিনিই কাপড় পছন্দ করিয়া দেন। প্রাচ্য ভূত্যাগে, কোন ব্যক্তির পরিধান-বস্ত্রের পারিপাট্য ও কেতার মধ্যে তাঁহার জ্বর নৈপুণ্যই প্রতিভাত হয়। ভাল করিয়া সুখ-হাত না ধুইয়া, ভালরকম কাপড় না পরাইয়া তিনি তাঁহার ছেলেরিগকে বাহিরে যাইতে দেন না। তিনি খুব রান্নাঘরে গিয়া সমস্ত রান্না চাখিয়া দেখেন, পাছে রান্নার বেশী হুন বা কম হুন হয়। যদি তাঁহার স্বামীর নিকট কোন অল্পপ্রাচ্য বাচ্চা করা আবশ্যক হয়, তিনি জানেন কিরূপে তাহা আদায় করিতে হয়। যখন

বেশের তাহার স্বামী ভাল মেয়েকে আছেন, তিলার্দী অপেক্ষা না করিয়া তখনি তিনি সহজেই মিথের কার্যাসিদ্ধি করিয়া লন। স্বামীকে “স্বামীর ভিতর বকুতা” দিতে জগতের কোন রমণী অপেক্ষা তিনি কম পটু নহেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই রমণীর যুক্তির ধারা একই প্রকার। তাই সুসলমান স্বামী কোন একটা বিষয়ে ত্রীকে কিছুতেই লওয়াইতে না পারিলে শেষে শুধু এই কথাটি বলিয়াই স্বামীর নিকট হার মানেন :—“বীকা পাঞ্জুর হাড় না ভাঙিয়া কখন সোজা করা যায় না”—(ত্রীলোকের পাঞ্জুর হাড় বীকা এইরূপ চলিত কথা আছে)।”

• •

কুস্ত পার্সী সমাজ-মণ্ডলীর মধ্যে রমণীরা খুব স্বাধীন। পার্সী-রমণী সাধারণতঃ স্বগঠিতকার ও পৌরবর্ণ; তাহাদের ব্যবহার মধুর ও স্ত্রীতিম্বনক। তাহারা ধর্ম্মশ্রুতিটুকু একটা কুসংস্কারবশতঃ তাহাদের হৃদয়ের কেশ ঢাকিয়া রাখে; ঢাকিয়া না রাখিলে যে-কোন দেশের স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে।

পুরুষদিগের জায় তাহারাও “পরিচ্ছন্ন কামিনী” পরিধান করে; তাহারা বেশের পরিচালনা করে এবং কামিনীর উপর

তাহাদের উপরীত বাধা থাকে। তাহারা পাচ হইতে ষোল গজ আয়তনের শাড়ী পরে—বেশ মোলায়েম রেশমী শাড়ী। হাত-কাটা কতুরা। সবগুচ্ছ মিলিয়া পরিচ্ছন্ন অতীব রমণীয় ও সুশোভন। তাহার উপর—সোনার গহনা; গলায় রত্নহার; বাহুতে রত্নখচিত বান্ধবন্ধ; সচরাচর একজন পার্সী-রমণীর ৫০০ হইতে হাজার পোতা সূতা-পরিমাণ গহনা-পত্র। ধনী ঘরের ত্রীলোকের আরও বেশী।

(২) “সবাই জানে, পার্সী-রমণীরা হিন্দু ও সুসলমান রমণী অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত। সৌভাগ্যক্রমে বাপ-মায়ের নিকট হইতে তাহারা কোন বাধা পায় না। তাহাদের ছেলেমেয়েরা ভাষা ও সঙ্গীত প্রভৃতির জ্ঞানে যে-কোন জাতির সমকক্ষ দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হন। প্রাচ্য দেশবাসীদের মধ্যে একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগে;—নূতন জ্ঞান লাভের অন্ত তাদের চোটা আছে, কিন্তু সেই নূতন জ্ঞান পূর্বাধিকৃত জ্ঞানকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে না। কালেজের শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া কোন পার্সী-বালিকা মনে করিবে না যে, রন্ধন করা তাহার অযোগ্য; বরং সে অল্প গৃহিণীর জায় ভাল রাখিতে পারে বলিয়া বেশ-একটা পৌরবর্ণ অশ্রুতব করিয়া থাকে।”

ঐজ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর।

নীলপাখী *

তিলতিল—ভাই

মিতিল—বোন

আলো

বেরীলুব—পরী

পিতা

মাতা

সবর

টাইলা—হুহু

টাইলেট—বিড়াল

কটী

আন্তন

জল

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—কাঠুরিয়ার গৃহ

গৃহাভ্যন্তরে তিলতিল ও মিতিল বিজ বিজ শব্দায় শুইয়া আছে। মাতা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদের বুকের উপর স্থিতি দেখিলেন, তাহারা ঘুমাইতেছে। তিনি ইঙ্গিতে পিতাকে কথা কহিতে নিবেদন করিলেন এবং পা টিপিয়া ভানবিকের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন—বাইবার সবর আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ হইবামাত্র আলোটা আপনা হইতে ধলিয়া উঠিল। তিলতিল ও মিতিল আশ্চর্য্য উঠিয়া বলিল।

তিলতিল। মিতিল ?

মিতিল। কি ভাই তিলতিল ?

তিলতিল। ঘুমুলে না কি ?

মিতিল। না। তুমি ঘুমুচ্ছ ?

তিলতিল। না ; ঘুমুব যদি ত কথা কহি কি করে ?

মিতিল। আজ না বড়দিন ?

তিলতিল। না, এখনও বড়দিন হয়নি ; সকাল^১ না হওয়া পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু জীশ্যাম্ এ বছর আমাদের জন্ত * কিছুই আনবেন না

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। আমি শুনেছি, মা বলছিল তিনি আসছে বছরে আসবেন...

মিতিল। আসছে বছরের কি এখনও চের দেবী আছে ?

তিলতিল। চের দেবী বৈকি ! তবে আজ রাতে তিনি শুধু বড়লোকদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের কাছে আসবেন...

মিতিল। সত্যি ?

তিলতিল। হ্যাঁ।...বা শ্রেঁ কি মজা !... মা আলোটা নিবিয়ে দিতে ভুলে গেছে !... আমি একটা কন্দী বার করছি !

মিতিল। কি কন্দী ?

তিলতিল। আমরা উঠে পড়ি এস...

মিতিল। না, না।

তিলতিল। কেন, কেউ ত আর দেখেছে না—আশে-পাশে ত আর কেউ নেই...জাননা দেখতে পাছ ?

মিতিল। হ্যাঁ, বা, কি চমৎকার দেখাচ্ছে !

তিলতিল। ওই যে চক্চকে আলো জানলার ভিতর দিগে আসছে, ও সেই তাদের।

মিতিল। কাদের ?

তিলতিল। বড়লোকদের বাড়ীর... জাননা খুলে ফেলি, কি বল ?

মিতিল। আমরা কি খুলতে পারব ?

তিলতিল। আসবৎ পারব। এখানে

* যদিও মেটরোলিক রচিত Blue Bird নাটকের অনুবাদ।

কে আছে যে বাধা দেবে...গান শুনেতে
পাছ ?...এল, উঠে পড়ি...

দুইজনে উঠিয়া জানালার কাছে বসে এবং
একটা টুলের উপর পাড়াইয়া জানালা খুলিয়া
ফেলিল। উজ্জল আলোক বর আলোকিত হইয়া
উঠিল। বালক-বালিকা দুইটী মুহূর্তেই বাহিরের
দিকে চাহিয়া রহিল।

তিলতিল। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি !

মিতিল। (টুলের উপর পাড়াইবার
একটুখানি আরগাও সে পার নাই) আমি
পাচ্ছি না...

তিলতিল। বরফ পড়ছে !...ছুখানি
পাড়ী আসছে, তাতে ছ-ছটা করে ঝোড়া
ঝোতা !

মিতিল। পাড়ীর ভিতর থেকে বারোটি
ছোট ছেলে বেরল !

তিলতিল। তুমি ভারী বোকা !...ওরা
ছেলে নয়, মেয়ে...সবগুলিই মেয়ে --

মিতিল। চমৎকার সব পোষাক
পরেছে...

তিলতিল। তুমি কিছু জান না...
আহাণ, অমন করে ধাক্কা দিও না...

মিতিল। আমি তোমার ছুঁসুম
কখন যে, ধাক্কা দেব ?

তিলতিল। . . (সমস্ত টুলখানি সে
ধল করিয়া পাড়াইয়া ছিল) তুমি সমস্ত
আরগাটাই যে ধল করছ।

মিতিল। কৈ, আমি একটুও আরগা
পাচ্ছি না পাড়াতে ..

তিলতিল। ধাম, ধাম ! ওই পাছ
দেখতে পাচ্ছি !

মিতিল। কি পাছ ?

তিলতিল। কেন, ওই যে পাছে সব

খেলনা আর খাবার কুলোনো রয়েছে ।...
তুমি দেওয়ালের পানে চেয়ে ও দেখছ
কি ?

মিতিল। কি করব, আমি যে পাড়াবার
মোটাই আরগা পাচ্ছি না...

তিলতিল। (মিতিলকে সামান্য একটু
আরগা ছাড়িয়া দিল) ওই দেখ ! এবার
হয়েছে ত ?...এবার তুমি আমার চেয়ে
ভাল আরগার পাড়িয়েছ...দেখ, কতগুলো
আলো জেলে গিয়েছে !

মিতিল। ও লোকগুলো অত গোলমাল
করছে কেন ?

তিলতিল। ওরা হল বাঙ্গান্দার।

মিতিল। ওরা কি যোগেছে ?

তিলতিল। না, যাপবে কেন ?...
বাজানো কানটী সহ্য নয় ত ! ওতে
কসরৎ পরকার।

মিতিল। ওই আর একখানা পাড়ী
এল ; এর বোড়াগুলো সব সাধা !

তিলতিল। চুপ, কথা করো না !...
চোখে শুধু দেখে যাও !

মিতিল। ওই সোনার মত জিনিষ-
গুলো কি, বল ত ? ওই যে গাছের ডালে
কুলছে ?

তিলতিল। ওগুলো ? ওঃ, ওগুলো
খেলনা...নিশ্চয়। দেখত না, ঐ সব
ভলোয়ার, বন্দুক, সেপাই...

মিতিল। আর পুতুল ? পুতুল আছে
কি না বল ?

তিলতিল। হ্যাঁ,—পুতুল কি আবার

একটা জিনিষ না কি ?...পুতুলে কোন মধ্য
নাই...

মিতিল। আর টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে, ওগুলো কি ?

তিলতিল। ও সব পিঠে, মাখন, ফল

মিতিল। আমি বখন খুব ছোট ছিলাম, তখন একবার পিঠে খেয়েছিলাম...

তিলতিল। আমিও খেয়েছিলাম... কুটার চেয়ে চের ভাল খেতে, না ?

মিতিল। হ্যাঁ, অনেক পিঠে ওখানে রয়েছে ; ঐ যে। সমস্ত টেবিল একেবারে জোড়া... ওরা এখন সবগুলো খাবে না কি ?

তিলতিল। নিশ্চয় ; তা নইলে কি করবে ?

মিতিল। একেবারে সবগুলো কেন খেয়ে ফেলছে না ?

তিলতিল। ওদের এখন তেমন বিবেচনা... পারনি...

মিতিল। (অত্যন্ত বিম্বিত হইয়া) বিবেচনা পারনি ?... সে কি... কেন পারনি ?

তিলতিল। কেন আবার কি ? ওরা যে কেবলই খাচ্ছে। বখনই চায়, তখনই ওরা খেতে পার কি না !

মিতিল। (অবিশ্বাসের সহিত) রোজই ওরা খেতে পার, বখন যা চায় ?

তিলতিল। এই রকম শুনি... মিতিল। সবগুলো ওরা খাবে ?...

একটুও খেবে না ?

তিলতিল। কাদের খেবে ?

মিতিল। কেন, আমাদের ?

তিলতিল। তা কেন খেবে ? ওরা তো আর আমাদের চেনে না...

মিতিল। যদি আমরা চাই ?

তিলতিল। না, হ্যাঁ, চাইতে আছে ?

কখনো চাইব না।

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। চাওয়া ভাল নয়।

মিতিল। (হাততালি দিয়া) হ্যাঁ, ওরা কি মহাই করছে !

তিলতিল। (উচ্ছ্বসিত হইয়া) ওরা হাসছে, কেবলই হাসছে !

মিতিল। আর ঐ ছোট্ট ছেলে-মেয়েগুলি নাচছে !

তিলতিল। হ্যাঁ, এস, আমরাও নাচ। (আনন্দে পা নাড়িতে লাগিল)

মিতিল। বাহবা, কি মহা !

তিলতিল। ওই দেখ, ওরা সব পিঠে-গুলো নিচ্ছে !... ওই তুলছে !... ওই খাচ্ছে, ওই খাচ্ছে, ওই খাচ্ছে !

মিতিল। ছোট ছোট ছেলেগুলিও খাচ্ছে ! এক-একজনে দুটো, তিনটে, চারটে, পাচটা করে খাচ্ছে !

তিলতিল। (আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া) কি সুন্দর !

মিতিল। (কল্পিত পিঠের গণনা করিতে করিতে) আমি বারোটা পিঠে পেয়েছি !

তিলতিল। আমি তোমার চার গুণ বেশী পেয়েছি... তা থেকে তোমাকেও কিছু দেব...

(বসবার কে যা দিল)

তিলতিল। (ভীত চকিত হইয়া চুপ করিল) কি ও ?

মিতিল। বাবা আসছে !

তাহারা ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় দ্বা

হঠকো, পুলিশ। বরজাটা অর্ধেক ফাঁক হইয়া
বেল এবং লাল রঙের টুপি ও সবুজ হুডের
লোম্বাক-পর্য এক ডুকা গ্রীলোক ঘরের মধ্যে
বেশন করিল। সে কীদৃষ্ট ও বস্ত্র এবং তাহার
শিষ্ট একটা কুঁড়। তার মাথ বঁড়ীয়া মত।
সে কোমর বোয়াইয়া লাঠির উপর ভর দিয়া
চলিতেছিল। চেহারা যেমনই হোক, সে একজন
পত্নী।

পত্নী। তোমাদের এখানে কি এমন
ঘাস আছে যা গান করে, কি এমন
পাখী যার রক্ত নীল?

তিলতিল। ঘাস এখানে অনেক রকম
আছে, কিন্তু তুমি গান শুনিতে পারে না
কখনো! ঘাসে আবার গান করবে কি?

মিতিল। তিলতিলের একটা পাখী
আছে।

তিলতিল। সেটা কিন্তু আমি দিতে
পারব না...

মিতিল। কেন?

তিলতিল। সে যে আমার পাখী।

পত্নী। তোমার পাখী? তা কোথায়
সে পাখীটি?

তিলতিল। (অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া)
ঐ বাঁচার মধ্যে...

পত্নী। (পাখীটিকে ভালরূপে পরীক্ষা
করিবার জন্য সেমা চোখে দিলেন) এ
পাখী আঁরি চাই না; এটা ত তেমন নীল
নয়। দেখ, তোমার এক কাজ করতে
হবে। আমি যে রকম পাখী চাই, ঠিক
সেই রকমটি খুঁজে আনবার জন্য তোমার
যেতে হবে।

তিলতিল। কিন্তু সে পাখী কোথায়
আছে, আমি তা জানি না...

পত্নী। আমিও জানি না। আর সেইজন্যই
ত তোমায় যেতে হবে। যে ঘাস গান করে
তা না হলেও আমার চলতে পারে—বহিও
সে জন্য অনেক কষ্ট পেতে হবে; কিন্তু এই
নীল পাখীটি আমার চাই-ই। আমার ছোট
মেয়েটির জন্য দরকার। তার বড্ড অসুখ
কি না!

তিলতিল। তার কি অসুখ?

পত্নী। আসল অসুখ যে কি, তা ঠিক
জানি না। তবে সে খুঁসি হতে চায়...

তিলতিল। সত্যি?

পত্নী। আমাকে চেনো তোমরা?

তিলতিল। আমাদের পাড়ায় ঐ যে
বারলিংগট আছে, তোমার দেখতে তার মত...

পত্নী। (হঠাৎ ক্ষুব্ধ হইয়া) কখনো
না!...তার চেহারা সবে আমার একটুও
মিল নেই!...এমন কথা বল! এ
অসহ!...আমি কে, জানো?...আমি হচ্ছে
পত্নী বেরীলুন...

তিলতিল। সত্যি? তা—

পত্নী। শোন, তোমাকে এখন যেতে
হবে।

তিলতিল। তুমিও সঙ্গে যাবে ত?

পত্নী। না, আমার বাওরা হতে পারে না
...তোমাকে একলা যেতে হবে। আমার
হাতে গেরহালীর অনেক কাজ। দেখ তুমি
কোন পথে যাবে, বল হেঁথ—ছাদের পাশ
দিয়ে, না, চিমনির তিতর দিয়ে, না
জানলা দিয়ে?

তিলতিল। (সতরে দরজার দিকে
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) আমি ঐ দরজা গুলে
যাব...

পরী। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) না, না, তা কি হয়! কখনো? সে যে অসম্ভব! আবার হুধ নীচু করে দাঁড়ালে! যাবে না? তোমাদের কি বধ স্বভাব!...আচ্ছা, তবে ঐ জানলা দিয়েই যাও। কেমন...আর দেয়ী করছ কেন?...দীপ্‌গিরি সাধ-গোজ করে নাও...

(ভিলভিল ও মিভিল ভাড়াভাড়া গিয়ে লাগিল)

ভিলভিল। আমাদের জুতো নেই...

পরী। তাতে কিছু এসে যায় না। আমি তোমাকে একটি ছোট টুপি দেব। আচ্ছা, তোমাদের বাবা আর মা কোথায়?
ভিলভিল। তাঁরা ওই যে ঘরে ঘুমোচ্ছেন...

পরী। আর তোমাদের ঠাকুর্দা, ঠাকুমা?

ভিলভিল। তাঁরা মরে গেছেন...

পরী। আর সব ভাই-বোনেরা কোথায়?...কী ভাই-বোন তোমারা?

ভিলভিল। তিনটা ছোট ভাই...

মিভিল। আর চারটা ছোট বোন...

পরী। তারা সব কোথায়?

ভিলভিল। তারাও সব মরে গেছে...

পরী। তাদের সবাইকে তোমাদের দেখতে ইচ্ছা হয়?

ভিলভিল। তা আর হয় না? খুব ইচ্ছা হয়!...কোথায় তারা, এখনি দেখাও!

পরী। আমি কি তাদের সঙ্গে করে এনেছি যে এখনি দেখাব?...তবে দেখতে পাবে—দীপ্‌গিরিই তাদের দেখবে। এখন স্বপ্নের দেশের ভিতর দিয়ে ঐ নীল পাখীর

সন্ধানে তোমরা যাবে, তখন তাদের সকলেরই দেখা পাবে...আচ্ছা, আমি এখন ঘরজার যা মারি, তখন তোমরা কি কর্জিলে?

ভিলভিল। আমরা ছ'জনে পিঠে খাওয়া খেলা করছিলাম...

পরী। তোমাদের কাছে পিঠে আছে?...কৈ, বেশি?

ভিলভিল। ওই যে ওখানে বড়লোকদের ছেলেদের কাছে আছে...দেখবে?...ঐ দেখ...কি চমৎকার!... (পরীকে ঘরজার কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া দেখাইল)

পরী। (জানালার কাছে দাঁড়াইয়া) বাক্স থাকে তারা ত সব অপর লোক!

ভিলভিল। হ্যাঁ, ওরা থাকে, আর আমরা দেখছি...

পরী। ওদের উপর রাগ হচ্ছে না?

ভিলভিল। রাগ হবে কেন?

পরী। সব পিঠেগুলোই ওরা খেয়ে ফেলে, তোমাদের একখানাও দিলে না! এ ওদের ভাণ্ডার!

ভিলভিল। অস্ত্রার মোটেই না... আমাদের কেন হবে! বাঃ! ওরা যে খুব বড়লোক...আচ্ছা, ঐ-...জারগাটা খুব চমৎকার দেখাচ্ছে না?

পরী। আমাদের এখানকার চেয়ে ওদের ওই জারগাটা যে বেশী চমৎকার, তা নয়।

ভিলভিল। ইস্! এখানটা ত অন্ধকার, একরকম, আর এখানে একখানাও পিঠে নেই...

পরী। ও জারগাটা যেমন, এখানটাও

ঠিক নৈশঘনি; কেবল দেখতে তিলতিল। দেখতে পাচ্ছি বৈ কি !
পাচ্ছ না...

তিলতিল। কেন, আমি ত বেশ দেখতে
পাচ্ছি; আমার চোখ খুব ভাল। আমি
ঐ দূরের দিগ্গজর বড় দেখতে পাই...
বাবা পার না...

পরী। (হতাঃ ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি
বলছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ না !...আমার
দেখছ ত ?...বল ত আমি কি রকম
দেখতে ?... (তিলতিল চূপ করিয়া রহিল)
বল, জবাব দাও। আমি জানতে
চাই, তুমি আমার দেখতে পাচ্ছ কি না ?
আমি দেখতে সুন্দর, না, বিকী ? জবাব
দিছ না বে ?...বলি, আমি কি দেখতে
বুড়ী ?...তুমি হরত বলে বসবে বে, আমার
পিত্তে একটা মত্ত কুঁজ আছে...বল, বল—

তিলতিল। না, বেশী ত বড় নয় !

পরী। হাঁ গো হাঁ; তোমার মত
সকলেই এটাকে মত্ত বড় দেখবে...আচ্ছা,
আমার নাকটা কি খুব উচু, আর আমার
একটা চোখ কি নেই ?

তিলতিল। না, না, আমি তা বলছি
না...কিন্তু চোখটা কি করে সেল ?

পরী। (অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া)
ওরে, হতভাগা ছেলে, চোখটা আমার
নেই, কে বললে ?...দেখছ না, এটা
কত বড়; কেমন জল্ জল্ করছে...
আকাশের রঙের চেয়েও বেশী নীল...
আচ্ছা, আমার চুলগুলি কেমন সুন্দর, নয়
কি, বল দেখি !...কেমন ঘন আর নয়ম
...এক গোছা আমার হাতে রয়েছে,
দেখতে পাচ্ছ কি ?

পরী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) কি ! পাতলা ?
...এমন ঘন ঘন লোনালি চুল...দেখছি, তুমি
আমল জিনিষ কিছুই দেখতে পাও না !
আমি জানি, এমন অনেক মানুষ আছে,
যারা চোখ থেকেও অন্ধ, কিছু দেখতে পার
না। সুখের বিষয়, আমি সর্বদা
এমন সব জিনিষ সঙ্গে রাখি, যাতে
নয়র খোলে আর সব জিনিষ স্পষ্ট দেখা
যায়...আচ্ছা, আমি থলির ভিতর থেকে
কি বার করছি, বল ত...

তিলতিল। বাঃ, বেশ চমৎকার সবুজ
টুপি ত ! আচ্ছা, ওতে কিতে বাধা ওটা
ও কি অলছে ?

পরী। ও হল এক টুকরো বড় হীরে।
এইটে চোখে দিলে মানুষ ভাল দেখতে
পার...

তিলতিল। সত্যি ?

পরী। হ্যাঁ, সত্যি। টুপিটা মাথার
পরে হীরেটাকে একটুখানি ঘুরিয়ে
দাও; বা দিক থেকে জান দিকে—এই এমনি
করে—বুঝতে পারছ ? তার পরই একটা
পট্টকার মত আগুয়াজ হবে, আর সঙ্গে
সঙ্গে তোমার চোখ খুলে যাবে।

তিলতিল। আগুয়াজ হবে ! লাগবে
না ত ?

পরী। না; কেউ সে আগুয়াজ তুলতেও
পাবে না। আর চারিদিক অমনি বদলে
যাবে, দেখবে। প্রত্যেক জিনিষের ভিতর-
পর্ধ্যন্ত দেখতে পাবে। কচী, চিনি—এদেরও
সব গ্রাণ আছে, দেখবে।

ভিলতিল। কতীর প্রাণ আছে? যে কটী আমরা খাই? আর তা চোখে দেখা যাবে?

পত্নী। (কম্প হইয়া) নিশ্চয়! দেখ, আমি বাধে কথা লোক নই। মিথ্যাও বলি না। আমার কাছে যা ছিল, সব তোমার দিলুম। তুমি নীল পাখীর সন্ধানে যাচ্ছ, এ সব ভিনিষ তোমার খুব কাজে লাগবে। তবে উড়ন্ত আসন, আর আংটি—সে আংটি হাতে দিলে একেবারে অশুভ হওয়া যায়—এ দুটো তোমাদের বিতে পারলে আরও ভাল শুভ, কিন্তু যে বাসে দেগুলি আছে, তার চাবি হারিয়ে গেছে। ওহো, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি। (দোরক খণ্ডের প্রতি দেখাইয়া) দেখ, এইটা যখন পরে থাকবে, তখন এই নিকে একবার ঘূর্ণলেই সমস্ত অতীত দেখতে পাবে—আরও একটু এমনি ভাবে ঘূর্ণলে ভবিষ্যৎ নগরে পড়বে। এটা ভারী আশ্চর্য্য ভিনিষ।

ভিলতিল। বাবা কিন্তু এটা আমার কাছ থেকে নিরে নেবে।

পত্নী। তিনি দেখতে পাবেন না; হস্তকর্ণ তোমার মাথার ঐ টুপি আছে, শুভকর্ণ কেউ তোমার দেখতে পাবে না। আচ্ছা, একবার পরখ কর ত। (ছোট সবুজ টুপিটা ভিলতিলের মাথার পরাইয়া দিলেন) এইবার হীরেটা ঘুরিয়ে দাও, আর—একটু!—বাস্!

ভিলতিল হীরকটা ঘুরাইবামাত্র এতোক মিনিষ অদ্ভুত রকমে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বৃদ্ধা পত্নী তৎক্ষণাৎ অগুরু দম্ভরী হইয়া উঠিল। পুরু-বেত-হালের অপরিষ্কার অন্তরগুলি যদি-মানিক্যের দ্বার খলিয়া কহিতে লাগিল। পুত্রের সামান্য আসখান-পর সম্মান হইয়া উঠিল। বেতহালের গারে খড়ির

দুখটা চোখ, নৈমিষ্য হাদিতে লাগিল, এবং খোলকের দরজা খুলিয়া 'সবচে'র এক-একটা খটা পত্রীর ধারণ করিয়া একে একে বাহিরে আদিত লাগিল ও পরস্পরের হাত-বরাধরি করিয়া সকলে তালে তালে নাচিতে শুরু করিল।

ভিলতিল। (হস্ততত্ত্ব হইয়া ঘটাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ হুন্দের মেয়েগুলি কারা?

পত্নী। ভয় পেয়ে না; ওরা হল তোমাদের জীবনের এক-একটা খটা। ওরা ছাড়া পেয়ে এক মুহূর্তের অজ্ঞও যে তোমাদের দৃষ্টি-পথে আসতে পেরেছে, এইতে ভারী খুসী হয়েছি।

ভিলতিল। সেওয়াল এমন চকচকে হল কেন? সেওয়ালটা চিনির তৈরী, না, পাথরের?

পত্নী। সব পাথরই সমান, আর সব পাথরেরই দাম আছে, কিন্তু মাহুব এ-সব ত আর গালি চোখে ঠিকটি দেখতে পার না।

যে সমস্ত ইহাদের কথাবার্তা চলিতেছিল, সেই সময় পুত্রের মধ্যে অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যালিক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল। পাঁচকণীগুলো ছোট ছোট মাগনের আকার ধারণ করিয়া, আঁটা-মাটা শোষাক পরিয়া হামাগুড়ি বিয়া কড়াই হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল এবং টেবিলের উপর নর্তন-মুর্চন আরম্ভ করিয়া দিল। ইতিমধ্যে 'আওন' হলবে এবং 'দি'য়ে হকের শোষাক পরিয়া কলীগুলার উপর আদিয়া পড়িল এবং আলোকে আটকানা হইয়া তাহাদের পক্ষান্তে ঘোড়াইতে লাগিল।

ভিলতিল। এই সব বিজ্ঞী ছোট্ট মাহুবগুলি কারা?

পত্নী। ওরা? ওরা হল সব কটীর আত্মা। এতদিন কড়ারের ভেতর খুব লক্ক ভাবে আটকে ছিল, এখন বাধীন হবার সুবিধে পেয়ে কড়াই থেকে বাইরে আসছে।

তিলতিল। আর ওই নাল রঙের লম্বা লোকটা? ওর গায়ে কি বিশিষ্ট গন্ধ, মগ্নো!

পরী। চূপ, চূপ! অত চোঁচিয়ে না, ও হল আগুন, বড় ভয়ানক লোক।

এই সকল কথোপকথনের মধ্যেও কিছু ইন্দ্র-জালের বিহীন ছিল না। কুকুর এবং বিড়ালটা এতক্ষণ খাদ্যের টেবিলের নীচে ঘাঁচার মধ্যে চূপ করিয়া শুইয়াছিল; হঠাৎ ইহার ঠাৎকার করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া পেল এবং ইহারে পরিবর্তে দুইজন লোককে দেখা পেল। ইহারে একজনের মূখ কুকুরের মত এবং অপরটির মূখ বিড়ালের মত। কুকুরমূখো লোকটা (ইহাকে আমরা অতঃপর কেবল 'কুকুর' বলিয়াই অভিহিত করিব) আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিলতিলের কাছে ছুটিয়া আসিল ও তাহাকে চুষন করিয়া মানা প্রকারসোহাগ জানাইতে লাগিল। কিন্তু বিড়াল-মূখো লোকটা (ইহাকে আমরা অতঃপর 'বিড়াল' নামেই অভিহিত করিব) সেমিকে ঝুৎপাত করিল না। সে আপন মনে চুল খাঁচড়াইতে লাগিল এবং পরিচার পরিচ্ছন্ন হইয়া গৌকে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিতিলের কাছে গেল।

কুকুর। (আনন্দে লাফালাফি করিতে করিতে) আমার প্রিয় দেবতা, তোমার নমস্কার! আমার আরাধ্য, আমার প্রিয়তম, তোমার নমস্কার! কি-দোস্তা! এতদিনে আমরা মন খুলে কথা কইতে পারিব! আমার কত কথা আছে তোমার বলবার! আমি এতদিন শুধু লাজে নড়ে ঠাৎকার করে আমার মনের ভাব তোমার জানিয়েছি, কিন্তু তুমি কিছুই বোঝ নি! আর আমি! আঃ, কি আনন্দ! প্রিয়তম, তোমার আবার নমস্কার! আমি যে তোমার কত ভাল-বাসি! তুমি কি এখন আমার দু-একটা

খেলা দেখতে চাও? আমি কি পেছনের হু পায়ে দাঁড়িয়ে নাচব, না, সায়নের পায়ে উপর তর বিয়ে ডিগ্বাজি বাব?

তিলতিল। (বিস্মিত হইয়া পরীর প্রতি) এই ভয়লোকটা কে?

পরী। দেখতে পাচ্ছ না? এ তোমার প্রিয়তম কুকুর টাইলোর আত্মা; একে তুমি মুক্ত করে দিবেছ।

বিড়াল। (মিডিলের নিকট গিয়া তাহার হাত চুটি ধরিয়া অতিশয় আশ্চর্য ও কার্যময় সহিত) নমস্কার, কুমারি! আজ তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে।

মিডিল। নমস্কার মশার! (পরীর প্রতি) এ কে?

পরী। দেখছ না? তোমার প্রিয় বিড়াল টাইলেট তোমাকে অভ্যর্থনা করছে! যাও, ওর মুখে চুমু খাও।

কুকুর। আমার শুভ! আমি আমার প্রিয়দেবতাকে চুষন করেছি। হাঃ হাঃ, আজ কি মজা! টাইলেটকে ভর সেখাব, ওকে জম্ব করব! ভৌ-ও, ভৌ-ও, ভৌ-ও!

পরী। (ছড়ি উঠাইয়া কুকুরকে শাসাই-লেন) ধবরদার! চূপ কর; তা নইলে তোমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এ ক্ষণে আর খুলবে না।

ঘরের কোণে চরকাটা বন্দন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল এবং উজল আলোক-রশ্মি গাইয়া হুতা কণ্ঠিতে লাগিল। আর এক কোণে ভলের বলটা হঠাৎ উঠু মূখে পান ধরিয়া মিলি? বলের মুখ হইতে বিভিন্ন ধারার নিখরিস্তি বাহির হইয়া গার্মিক রশ্মি-মুক্তা ছড়াইতে লাগিল এবং ইহার সম্মুখে হইতে ভলের আত্ম আত্মলিঙ্গিত ভেদে, সিক বন্দন বাহির হইয়া আসিল। ইহার চকু দুইটি

অকস্মিকভাবে। সে তৎক্ষণাত্ আঙনের দহিত লড়াই বাঁধাইয়া দিল।

তিলতিল। কে এই মেরেমাছুদী?

পরী। ভয় নেই। এ হল মলের আত্মা...এই মাত্র মলের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

টেবিলের উপর হইতে হঠাৎ আলোকখানটা পড়িয়া পিয়া অগ্নিগা উঠিল এবং সেই মুহূর্তে দুই-মধ্যে এক অপূর্ণ প্রশ্নের আদিভাব হইল। তাহার বেশভূষা চাকচিক্যময়। উজ্জ্বল এবং যজ্ঞ আবরণে তাহার মুখবগল আবৃত; সে অপূর্ণ ভবিষ্যৎ ধাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

তিলতিল। ইনিই হলেন রানী!

মিতিল। আহা, যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকান্নী!

পরী। না, ইনি আলো!

ইতিমধ্যে বরজার কে তিনবার বা মারিল।

তিলতিল। (সভয়ে) ওই যা...বাবা আসছে, সব টের পেরেছে!

পরী। হোরেটা ঘুরিয়ে ফেলো...বা-দিক থেকে ডানদিকে...লীপুগির!

তিলতিল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হীরকখণ্ডটা ঘুরাইয়া দিল।

পরী। না, না, অমন করে নয়!...

কি সর্কনাশ!...সব মাটি!...তুমি বড় তাড়াতাড়ি করে ফেরে। এরা সব এখনও আর সময় পাবে না আগেকার জারগার ফিরে যেতে। এখন দেখছি, আমাদের বিস্তার অল্পবিধা ভোগ করতে হবে...

পরী পূর্বের জার যুদ্ধা হইয়া গেল। দেওয়ালটা পূর্বের বেঘন ছিল, ভেদনি সাধারণ আকাশে ধারণ করিল। কটাগুলি একে একে খড়ির মধ্যে ফিরিয়া গেল। চরকা বন্ধ হইয়া

গেল। অত্যন্ত সুন্দর নিজ নিজ আধিন অবস্থায় প্রাপ্ত হইল। কিন্তু 'আগুন' বোম্বারী ঘরের চতুর্দিকে ছুটাহুট করিয়াও নিজের ভিত্তি স্থানীয় পাইল না। আর এক-খানা 'জটা' তাড়াতাড়ি নিজস্থানে আধিকার করিতে পিয়া যাক্স লাগিয়া পড়িল। দেখে সে তখন তবে কাণিতে লাগিল এবং কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরী। কাঁদছ কেন?...কি হয়েছে তোমার?

জটা। আমি নিজের জারগার যেতে পারিনি!

কুকুর। (দোলায়ে) প্রিয়দেবতা, আমিও এখানে আছি!...এখনও আমি কথা কইতে পারছি!

পরী। কি সর্কনাশ!...তুমিও আছ?

কুকুর। নিজের জারগার ফিরে যেতে দেবী হয়ে গেল। আমাদের খাঁচার দরজা বড় তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

বিড়াল। আমারও সেই দশা! কিন্তু এখন উপায় কি?...কোন বিপদ হবে না ত?

পরী। তা হলে এবার সত্যি কথাটাই বলতে হল। দেখ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তিলতিল আর মিতিলের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধানে যাবে, রাত্তা ফুরিয়ে গেলেই কিন্তু তাকে প্রাণ হারাতে হবে।

বিড়াল। (কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া) লে হে, আমরা খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকি...

কুকুর। না, না; আমি এখানে আর যাব না!...আমি আমার প্রিয়তমের সঙ্গে থাকব!...তা হলে আমি সর্ককণ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পাব!

বিড়াল। আহাশ্রক কোথাকার!

বরজার পুনঃ পুনঃ বা গড়িয়ে লাগিল।

জটা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি

মরতে পারব না!...আমি কুড়াই-এর মধ্যে
কিরে বাব...সেখানে ঠাসাঠাসি করে থাকি
সেও ভাল...

আণ্ডন। (এতক্ষণ পাগলের মত
ছুটাছুটি করিয়া রাগে গম্ গম্ করিতেছিল)
আমি আমার চিনি পুঁজে পাচ্ছি না!

বল। (নলের ভিতর প্রবেশ করি-
বার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল) আমি যে
নলের ভেতর ঢুকতে পারছি না!

পরী। এরা সব কি মূর্থ!...বেমন
মূর্থ, তেমনি ভীক!...বেশ সকলে...তা হলে
তোমরা অল্প খাচার মধ্যে, বাক্সের মধ্যে,
নলের মধ্যে থাকতে চাও! অথচ এই ছুটি
ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধান
যেতে রাজী নও?

সকলে। (কুকুর এবং আলো বাড়ীত)
না, না; জানরা কেউ বাব না...আমরা
আমাদের সাবেক জায়গার কিরে যেতে চাই!

পরী। (আলোর প্রতি) আর
আলো!...তুমি কি বল?

আলো। আমি এঁদের দুজনেরই সঙ্গে বাব...

কুকুর। (জানন্দে উৎফুল্ল হইয়া)
আমিও...আমিও বাব!

পরী। বেশ, কথা...তা ছাড়া এখন
খুব ঘেরা হয়ে গেছে। তোমাদের
সাবেক জায়গার কিরে বাবার পথও বন্ধ;
...কাজেই তোমাদের সকলকে এঁদের সঙ্গে
যেতে হবে...কিন্তু আণ্ডন, তুমি সাবধান,
কারো কাছে বেসে এলো না। কুকুর,
তুমি বিড়ালটাকে বিরক্ত করো না। আর
জল, তুমি নিজেকে একটু ঠাণ্ডা-মেজাজে

রেখো।...যে-সে জায়গার উপর দিগে বেন
ধোঁড় দিগো না...

এবার বরজার খুব জোরে ঝাড়া পড়িতে লাগিল।

তিলতিল। বাবা আবার, উঠেছে!

এবার নিশ্চর আসছে; হ্যাঁ, ঐ যে পাবের
আওরাজ শুনতে পাচ্ছি।

পরী। চল, আমরা জানলা দিয়ে বেরিয়ে
পড়ি। তোমাদের সকলকেই আমার বাড়ীতে
আগে যেতে হবে; কেন না, জানোয়ারগুলিকে
আর জিনিষগুলিকে বেশ ভাল সাব-গোজ
পরতে হবে। (কুটার প্রতি) কুটা, তুমি
খাঁচাটা নাও; এর ভিতরেই নীল পাখীকে
রাখতে হবে। এটা তোমারই জিম্মার রয়েল।
নাও, নীলগিরি নাও; আর সময় নষ্ট
করা যায় না।

ছাৎ জানালাটা খুলিয়া গেল—তখন সকলে
বাহির দইয়া পড়িল। জানালা আপনা-আপনি পুর্কের
দ্বার আবার বন্ধ হইল। বর আবার অন্ধকারে
আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল ও মিতিলের বিছায়া
দুইটা রাজা বসীকৃত হইয়া রহিল। ডান দিকের
বরজা খুলিয়া তিলতিলের মাতা ও পিতা করর
মধ্যে খুব বাড়াইলেন।

পিতা। না, কিছু না—শুধু ঝিঝি
পোকাগুলো কিচুনিচ্ করছে।

মাতা। তিলতিল আর মিতিলকে
দেখতে পাচ্ছি না ত!

পিতা। বাঃ, ওই যে ওরা অসাড়ো ঘুমচ্ছে।

মাতা। হ্যাঁ, নিখাসের আওরাজ শুনতে
পাচ্ছি!

বরজা খুববার বন্ধ হইয়া গেল।

ক্রমশ

ঐশ্বানীকান্ত গোস্বামী।

বংশানুক্রমের গোড়ার কথা

পূর্বে একটি প্রবন্ধে * বলিয়াছি যে, পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের গুণাবলী সন্তানে সংক্রামিত হয়। কেবল যে দৈহিক গুণই সংক্রামিত হয়, তাহা নহে, মানসিক গুণও সংক্রামিত হয়। যে নিম্নে পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী এইরূপে সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাহাকেই বলে বংশানুক্রম (Heredity)। এখন আমরা একটু তলাইয়া এই বংশানুক্রমের মূলরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মোটামুটি এ কথা বলা হইয়াছে যে, দুইটি পিতৃমাতৃকোষের সহযোগে একটি মূলকোষের উৎপত্তি হয়, আর ঐ মূলকোষই গর্ভস্থ ক্রমের আদি। পিতৃকোষে (sperm-cell) পিতার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী নিহিত থাকে;—আর মাতৃকোষে (Ovum) মাতার গুণাবলী নিহিত থাকে;—এবং মূলকোষে (Stem-cell) এই উভয়প্রকার গুণাবলীই একত্র সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলনের ফলে সন্তানের মধ্যে কি-ভাবে পিতা মাতার গুণ প্রকাশ পায়, তাহা বিশেষ ভাবে এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। পিতৃমাতৃকোষের মধ্যে কোথায় এই গুণাবলীর মূল-আশ্রয় ও কি উপায়ে তাহারা নূতন জীবের মধ্যে সংক্রামিত হয়, সেই সব কথা বলাই আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে cell বা জীবকোষের গঠন-প্রণালী আলোচনা করা যাক। অধিকাংশ

জীবের মধ্যে cell দুই প্রকারের। পুংকোষ (sperm-cell) ও স্ত্রীকোষ (Ovum)। এই স্ত্রীকোষ প্রথমাবস্থায় সাধারণত গোলাকার থাকে। ইহার প্রাণময় অংশকে (active constituents) দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১)—কূটর ও অন্তরতর অংশ,— ইহাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস (nucleus) বা কেন্দ্রাংশ; (২) বৃহত্তর বাহিরের অংশ, বাহ্য নিউক্লিয়াসকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহাকে বলা হয় বাহ্যংশ cell-body বা cylosoma,। এই উভয় অংশই যে কোষল প্রাণময় বস্তু দ্বারা নির্মিত, তাহার রাসায়নিক গঠন অতীব বিচিত্র। সেই প্রাণময় বস্তুকেই বলা হয় জীববস্তু (Protoplasm)। জীবকোষে এই জীববস্তু ছাড়া আর এক-প্রকারের নিষ্ক্রিয় বস্তু (passive portion) থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত পরে তৈরী হয়। কোষের নানারূপ পর্দা ও ভিতরকার রূপ প্রভৃতি এই নিষ্ক্রিয় বস্তু দ্বারা গৃহীত। বলা বাহুল্য জীববস্তুই (Protoplasm) প্রাণের মূল ও তাহাই জীববস্তুকে গঠন করে ও জীবনের নানা বিভিন্ন কৰ্মকে চালাইয়া থাকে।

পুংকোষ স্ত্রীকোষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মাতৃকোষের মধ্যে সাধারণতঃ ইহা শাস্ত্রলবিশিষ্ট লম্বা রকমের, সুওটা স্বেৎ স্ফটল। ইহার আরতন স্ত্রীকোষের

ভূলম্বার বার-পর নাই ক্ষুদ্র। পুঙ্খ ইহাকে cell বলা হইত না। কিন্তু অধুনা বহু পরীক্ষার প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা আসলে cell ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার হ'চল মুণ্ডভাগেই অতি ক্ষুদ্র Nucleus বা কেন্দ্রাংশ আছে ও তাহার চারি দিকে cell-body বা বাহ্যংশও আছে।

এখন কেন্দ্রাংশ ও বাহ্যংশ জীব-কোষের এই দুই অংশের মধ্যে কোনটী বংশাধিক্রমের মূল আশ্রয়স্থান? কেন্দ্রাংশ না বাহ্যংশ? আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কেন্দ্রাংশই বংশাধিক্রমের মূল আশ্রয়। গর্ভাধানের সময় পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রাংশ মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায়।

কিন্তু শুধু এইটুকু বলিয়াই থামিয়া থাকা যায় না। জীবকোষের এই কেন্দ্রাংশের মধ্যে আবার কি আছে আলোচনা করিবার দেখা থাকে। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে কেন্দ্রাংশের মধ্যে আবার জালের মত তন্তুর একপ্রকার পদার্থ আছে; তাহা কয়েকটী বিশিষ্ট বর্ণ দ্বারা বেশ রঞ্জিত হইতে পারে। এই জালের মত পদার্থকে বলে chromatin। খুব শক্তিশালী অল্পবীক্ষণ দ্বারা এই chromatinকে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার পদার্থ আছে। তাহাকে বলা হইয়াছে chromosomes। 'ক্রোমোসোম' সম্বন্ধে একটী প্রধান ব্যাপার এই জানা গিয়াছে যে, এক-একটী বিশিষ্ট জীববর্গের (species) অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীর দেহস্থ জীবকোষে ইহাদের সংখ্যা সমান। প্রাণের জীবকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা

৩৬; একজাতীয় ইঁদুরের মধ্যে ২৪; বাঁড়, গিনিপিগ, শূকর ও মানুষের মধ্যে ১৬ ইত্যাদি। আবার আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ গর্ভাধানে একত্র মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে এই 'ক্রোমোসোমের' সংখ্যা দেহস্থ অল্প সাধারণ কোষের (Body-cell বা somatic cell) 'ক্রোমোসোমের' সংখ্যার অর্দ্ধেক দেখা যায়। পিতৃমাতৃ-কোষ যখন পরস্পর মিলিয়া মূলকোষে পরিণত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে ক্রোমোসোমও পরস্পর মিলিয়া যায় ও যিগুন হয়; আর এইরূপে দেহস্থ অল্প সাধারণ কোষগুলির 'ক্রোমোসোমের' সংখ্যার সঙ্গে তাহাদের সংখ্যা সমান হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতামাতার জননোন্ত্রের মধ্যে যে সকল পুংকোষ বা স্ত্রীকোষ সঞ্চিত হয়, তাহাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা নিশ্চরই কোন একসময়ে করিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যায় ও গর্ভাধানের সময় ঐ দুইয়ে মিলিয়া দ্বিগুণিত হইয়া, আবার স্বাভাবিক সংখ্যায় দাঁড়ায়।

এই সকল আবিষ্কারের ফল আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা আশঙ্কাল বলিতেছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে ঐ 'ক্রোমোসোম'-গুলিই প্রধানতঃ বংশাধিক্রমের মূল আশ্রয়স্থান। বংশাধিক্রমিক গুণগুলি উহারাই বহন করে ও জীবদেহের মধ্যে বিকাশ করিয়া তোলে।

এখন অনেকটা বুঝা গেল যে, প্রধানতঃ 'ক্রোমোসোম'-গুলিই বংশাধিক্রমের মূল আশ্রয়স্থান। কিন্তু কিরূপে পিতামাতা ও পুরুষপুরুষের দৈহিক ও মানসিক গুণ পিতৃমাতৃকোষের মধ্যে—বিশেষ করিয়া

ক্রোমোসোমের মধ্যে—সজিত হয়, কি করিয়াই বা তাহারা ঐগুলি বহন করে এবং কি উপায়েই বা তাহারা এক জীবদেহ হইতে অল্প নূতন জীবদেহে সেগুলি সংক্রামিত করিয়া দেয়? এই রহস্যময় ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু না জানিতে পারিলে মনের কুপ্তি হয় না। কিন্তু জীবদেহের এই নিগূঢ় রহস্যটি প্রকৃতি এ-পর্যন্ত এমনই সংগোপনে রাখিয়াছেন যে, সে-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই বলিলেই হয়। তবে প্রতিভাশালী পণ্ডিতেরা এসম্বন্ধে নানা অনুমান করিতে ছাড়েন নাই। তাহাদের মধ্যে প্রধান দুই-একটির পরিচয় দিলে বোধ হয় মনের কুখা কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে।

পণ্ডিতশ্রবর স্পেন্সার জীবদেহের মধ্যে একপ্রকার 'দৈহিক অণু' (physiological units) করনা করিয়াছেন। তিনি বলেন এই 'দৈহিক অণু'গুলি ঘেহের রাসায়নিক অণু (chemical units) ও জীবকোষের মাঝামাঝি বস্তুদের। ইহারা পরীক্ষার সকল অঙ্গের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে এবং নানাপ্রকার গুণের বীজ ইহারাই বহন করিতেছে। এক-একটি অঙ্গ যে বিশিষ্টভাবে গড়িয়া উঠে, এই সকল 'দৈহিক অণু'র গঠন-বৈচিত্র্য ও মিলন-বৈচিত্র্যই তাহার কারণ। ইহারাই সকলে মিলিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক কুড়িয়া দেয়। আবার, ইহারা সকলে মিলিয়া যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও আবার ইহাদের উপর সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

জীবদেহের পরিণতির সময়ে এই সকল

'দৈহিক অণু'ই কতকগুলি যাইরা সংকোচ ও প্রীকোষের মধ্যে সজিত হইয়া থাকে। নূতন জীবগঠনের সময়ে Stem-cell বা মূলকোষের মধ্যে ইহারা সংক্রামিত হয়। সেখানে নূতন জীবের বিকাশের পক্ষে ইহারা সাহায্য করিতে থাকে ও তাহার মধ্যে তাহার সাধারণ ও বিশিষ্ট গুণাবলী ছুটাইয়া তোলে।

স্পেন্সারের মতে কেবল যে জীবের প্রকৃতিগত গুণই ইহারা বহন করে তাহা নহে; কৰ্ম্মগত পরিবর্তনাদিও (modifications) ইহারা এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তরে বহন করে। কৰ্ম্মের বলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্তন হয়, আর সেই পরিবর্তনের ফল 'দৈহিক অণু'গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে; দৈহিক অণুগুলি আবার নূতন জীবদেহে সেই প্রভাবের ফল সংক্রামিত করিয়া দেয়।

মনসী ডাক্টন প্রায় ইহারই অনুরূপ এক মত প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে স্পেন্সারের physiological units-এর স্থানে তিনি gemmules নামে আর একরকম বস্তুর করনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

(১) জীবদেহের প্রত্যেক কোষ—একপ্রকার gemmules বা 'বীজ' নিক্ষেপ করে। gemmules-গুলি ঐ কোষের বিশিষ্ট গুণ বা লক্ষণগুলি বহন করিয়া থাকে।

(২) এই সকল gemmules শক্তি ও বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বর্ধিত হয়, কিন্তু নিজেদের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হারায় না।

(৩) জীবদেহের জননেন্দ্রিয় স্থলেই এই gemmulesগুলি বিশেষরূপে সঞ্চিত হইতে থাকে ও তাহা হইতে নূতন জীব-দেহে সংক্রামিত হয়।

(৪) জীববিকাশের সময় gemmules-গুলি পম্পর-মিলিত হইয়া তাহাদের আদি কোষের (যে কোষ হইতে তাহারা বিকশিত হইয়াছে) অল্পরূপ কোষ গঠন করিয়া তোলে, কখন বা অজ্ঞাত কারণ বশতঃ মৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। এই রূপে শিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে গুণের সাদৃশ্য বা পার্থক্য—এককথার বংশাধিকারের রহস্যময় ব্যাপার—এই সকল gemmulesদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্পেন্দার ও ডার্কইনের এই সকল অস্বাভাবিক জীবতত্ত্ববিৎগণ মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন। কেননা,— তাহারা 'দৈহিক অনু' ও gemmulesদের উপর এক-বেশী ক্ষমতা চাপাইয়া দিয়াছেন, যে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে।

বর্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিসমান (Weisman) একটা নূতন মত প্রচার করিয়াছেন। তাহার সেই মতের নাম Theory of Germinal Continuity। তিনি বলেন, জীবদেহের যে সূত্রবস্ত—বাহ্যর মধ্য দিয়া সমস্ত দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়,—তাহার নাম দেওয়া দায়—Germ-plasm বা প্রাণবস্ত। Germ-cell বা জীবকোষের মধ্যে এই প্রাণবস্ত থাকে। নূতন জীবদেহ গুরুত্ব ও ক্রীড়াকোষের মধ্যে এই প্রাণবস্ত

হইতেই গঠিত হয়। কিন্তু সমস্ত প্রাণবস্তটাই সাধারণ দৈহিক গঠন-ব্যাপারে নিশ্চেষ্টে ব্যরিত হয় না। কতকটা জননেন্দ্রিয় স্থলে পুংকোষ ও ক্রীড়াকোষের মধ্যে বাইরা সঞ্চিত থাকে ও পুনর্জার নবজীবদেহ গঠনের সময় কাজে লাগে। এইরূপে পুরুষাধিকারে এই 'অবিচ্ছিন্ন' প্রাণবস্ত হইতে নব নব জীবের বিকাশ হইতেছে, কিন্তু আসল ভিনিষটা একেবারে খরচ হইতেছে না,— কিছু পরিমাণে বরাবর সঞ্চিত থাকিয়া বাইতেছে। সুতরাং ইহার ফলে কেবল যে শিতামাতার গুণই তাহাদের অব্যবহিত সন্তানে সংক্রামিত হইতেছে তাহা নহে, বহু বহু পূর্বপুরুষদের গুণ ধারাবাহিক ভাবে সৃষ্টির আদিকাল হইতে প্রাণবস্তর সহযোগে অদ্বন্দ্বিত পুরুষদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহারই নাম Germinal Continuity বা প্রাণবস্তর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ('অবিচ্ছিন্ন প্রাণের ধারা')।

এই প্রাণবস্তর মূল আশ্রয়স্থান জীবকোষের কেন্দ্রাংশ; আরও বিশেষভাবে Chromatin; তাহা হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে বণ্ডিত গেলে Chromosomes। বিসমান আরও একটু সূক্ষ্মতর করণা করিয়া বলিয়াছেন যে এই ক্রমোসোমের মধ্যে আবাস সূক্ষ্মতর Ids বা Idants আছে। তাহারা প্রত্যেকটা অসম্পূর্ণ—জীবদেহের দাবতীর গুণের কেন্দ্রস্থল তাহাদের ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজস্বরূপ। নবজীব-গঠনে, এই Ids বা Idants দ্বারাই পূর্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী সন্তানে বিকশিত হইয়া উঠে।

এইরূপে বিসমানের মতে জীব-জগতে বংশাঙ্কুরের এই ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলিয়াছে। আদিকাল হইতে একই মূলবস্ত্র পূর্ণপূর্ণ পুরুষদের গণাবলী বহন করিয়া উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে ও এক-এক প্রকার বিশিষ্ট জীববর্গের (Species) সাধারণ ও বিশিষ্ট লক্ষণ-গুলিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এক হিসাবে জীবকে নূতন বিশেষ কিছুই করিতে হয় না। সে এই ‘আতীত গণাবলীর’ ‘ট্রাঙ্কি’ স্বরূপ। পুরুষাঙ্কুরে এই গুলিকেই বংশ-বৎ বিতরণ করিয়া সে অনাগি জীবপ্রবাহ অঙ্গুর রাখিয়া চলিতেছে।

একই চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে,

দার্শনিক কর্মবাদের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক বংশাঙ্কুরবাদের খুব সাদৃশ্য আছে। কর্মবাদের মতে পূর্বপূর্ব জন্মের ‘সংস্কার’ নব নব জন্মে জীবের মধ্য দিয়া সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে ও সেই সকল ‘সংস্কার’ই জীবের কর্মফলরূপে দেখা দিতেছে,— তাহার স্বভাব ও পরিণামকে বিকাশ করিয়া তুলিতেছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক বংশাঙ্কুরবাদেও পূর্বপূর্ণ পুরুষদের গণাবলী (প্রকারান্তরে ‘সংস্কার’ বলিলেও বলা যায়) অধস্তন পুরুষে প্রাণবস্ত্ররূপে মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে এবং জীবের স্বভাব ও পরিণাম নির্ণয় করিয়া দিতেছে।†

ঐপ্রকুরকুমার সরকার।

পূজা

যেদিন হাসি ছিল বহু, ছিল যেদিন গান,
তোমার চোখে, আলোক মন করেছিলেন দান,
যুগ হাসে মধুর ভাবে প্রাণের কল তানে
অজস্র ভরিয়া ছিহু তোমার পরাণে।

আজকে শুধু অশ্রুমালা, নাইত কিছু আর
হৃৎথ এ যে, চিরমৌন, কোথায় ভাষা তার?
নিশীথের শুভ্র স্তম্ভ, মেঘের তলে তারা,
তরীখীন বোণার বুকে গীতি-বাক্য-হার!

এ যে পূজা দিবারাতের এ ডির বেদন,
মুকের বৃক্ণরা বাধা, আঁখির আবেদন!
নিশির চেনে নিশার পারে উষা আশো চাওয়া,
চোখের দেখা বিরল হ’লে মনের মাঝে চাওয়া!

নত নয়ন, মৌন মুখ, রুদ্ধ হিয়া আর,
হ’ল এবার চিরদিনের পূজার উপহার।

ঐপ্রিয়দর্শনা দেবী।

† এই গ্রন্থক সম্বন্ধে প্রধানতঃ Thomson's "Heredity", Haeckels' "Evolution of Man" ও Karl Pearson's "Science of National Eugenics" হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

আলোর আলো

পনেরো

সরমার কথা

সেদিন মোহনবাবুর পিসিমা যে কথাগুলি বললেন,—কেন জানি না, আমার মনে হোল—তার মধ্যে সমবেদনার চেয়ে বিষের ঝাঁকটাই যেন কিছু বেশী পরিমাণে ছিল। তিনি যে অধু আমাকে আমার ভাঙ্গা কপালের কথাটাই মনে করিয়ে দিলেন—ভাঙ্গা; যেন তারও অতিরিক্ত কোন একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করলেন। নইলে, যে প্রসঙ্গ মোটেই আমার স্ট্রীতিকর নয়, প্রথমদিনেই একেবারে সে কথা তোলা কেন,—অকারণে আমাকে সাবধান করে দেওয়াই বা কেন? কী আমি করেছি, সাবধান হব কিসের ভয়ে? কিছুই স্পষ্ট বুঝলুম না—অথচ মনে-মনে কেমন একটা দৌকালেন্দ্রে রইল।

কিন্তু, দু-চারদিন পরেই যেন একটু আঁচ পাওয়া গেল।

বানী-বী একদিন আমাকে চুপি চুপি ভেঁকে বললে, “বিদিশি, তোমাকে নিয়ে পাড়ার দশজনই দশ কথা বলছে।”

পাড়ার দশজননের একজনকেও আমি চিনি-না, চিনতেও চাইনা; কিন্তু দশকথা কি যে বলছে সেটা জানতে আগ্রহ হোল। জিজ্ঞাসা করলুম, “কি বলছে?”

বানী গাঙ্গাঘরের মেঝেতে জাতা বুলতে-

বুলতে বললে, “যত সব ছাই কথা মা, যত সব ছাই কথা! সে আমি বলতে পারব না।”

—“যদি বলতেই পারবি-নি, তবে কণাটা তুললিই-বা কেন?”

বানী নিজেই মনেই বকে যেতে লাগল, “আর এও বলি বাপু, কার ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তোদের সে খোঁজে দরকার কি! কথার আছে বিদিশি, ‘ভাত দেবার কেউ নন কিল মারবার গোলাই’—এরা হচ্ছে তাই! উম্মনমুখীদের মুখে আগুন লাগেনা গা? ওমা, ধাব কোথা! বলে কিনা, মোহনবাবুর সঙ্গে তোমার নাকি...”

সবটা শোনবার আগেই বুঝে নিলুম। ধমকে বললুম, “চুপ কর বানী, তোর এ-সব কথার দরকার কি?”

বানী খতমত ঘেরে বললে, “তা মা, যা বলেছে! আমরা দাসী-বাঁধী, বড়লোকের বড় কথার আমাদের কাজ কি! তবে, কি জান বিদিশি, তোমাদের ভয়ে আমাদের গুনতে হয়, কাজেই বলতেও হয়!”

—“গুনতে হয় গুনিস্, কিন্তু আমার কাছে আর বলতে হবে না! ফের যদি তোকে কেউ কিছু শোনাতে আসে, তাহলে বলিস্ যে আমি বলেছি, আমরা কি কারীর আটচালার ঘর বেঁধে বাস করি যে লোকের কথার ধার ধারব?”

—“এই বলে আমি উপরে উঠে এলুম।”

দশজনের দশ কথা শোনা, আমার জীবনে এই নতুন নয়। বাবা আমাকে একাদশী করতেও দেন না, খান কাপড় পরতেও দেন না। বলেন, আমাকে বিধবার বেশে দেখলে তাঁর বুক শেল বাজবে। দেশে থাকতে এই নিয়ে কি ঘোঁটাটাই না হয়েছে! শুধু কি তাই—যত সব কুৎসিত কাণাকাপি, ইতর কথা, অজ্ঞার ইঙ্গিত!—বিধবাকে একটু বাগে পেলে কেউ ছেড়ে কথা কর না, যা মুখে আসে তাই বলে—ও-সব সয়ে সয়ে বুক আমার দরাজ হয়ে গেছে,—দশজনের দশ-কথার দাম যে কত,—তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে!

তবে, এ কাণাকাপি বাবা যদি শোনেন, তাহলে কাতর হয়ে পড়বেন বটে। বাবা আমার মজার মাহুষ। তিনি দশজনকে চট্টরে কাজ করতে বেজার মজবুৎ, অথচ দশকথা সহিতে হলে একেবারে কান্না! আমার আরো মজা এই যে, তিনি এ-সব শুনে কাহিল হন বটে, কিন্তু তবু, এক-বার যে পথে চলেন, দশজনের সঙ্গে বনিবনাও করে' সে পথ ছেড়ে কিরতেও আর রাগি হন না!

কিন্তু মোহনবাব কোন দলের লোক, সেটা ত জানা নেই! এ-রকম কুৎসা শুনে তিনি সব ভুঙ্ক করবেন, না, গ্রাহ্য করবেন? আমার ত পাজার মন্ত্রাদেশ মুখনাড়ার একটুও মাথাবাথা হয় না—কিন্তু পরীবাণী চুহু'খদের উচ্চভাবকে তিনিও স্ববুদ্ধির মত হেসে উড়িয়ে দি'ত' পারবেন ত?

আগর সন্ধ্যার বিষম অন্ধকার পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে ধীরে-ধীরে প্রসার হয়ে উঠছে। বাগানের এককোণে গোটা-তিনেক ভাল-গাছ এ-ওর মাথা-ঠোকাহুঁকি-করে' গাড়ির আছে, তাদের বাঁতাসে-দোড়ল বাকলে বাকলে গুল-চিকণ জ্যোৎস্না এসে বেগার আলোর কিন্নিকি কোটাচ্ছে; বেঁচে যেন হচ্ছে, যেন তিনটে আকাশমুখো মত্ত কলকুরি থেকে-থেকে ঝিক্মিকে আলোর টুকরো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দিচ্ছে!

চাঁদের আলো, পাপিয়ার গান আর ফুলের গন্ধ আজ আমার চোখ-কাণ-মনকে বিভোর করে' তুললে! বিধবার মানস-চোখে লোকে জোর-করে' যে হুঁলি বসিয়ে দেয়, এমন রাতে এমনসময়ে সে হুঁলি আপনি খসে পড়ে—মনের অন্ধত্বা আপনি ছুটে যায়,—তোমাদের ও বেশাচার, লোকাচার, বিচার-অবিচারের কোন দার না ধরেই!

আমরাও যে মাহুষ!...

আগ্রে-আগ্রে এপ্রাণটিকে কোলে তুলে নিশুম। বারোয়ার করণ রাগিণী আমার প্রাণের মুক থেকে বেরিয়ে ধীরে-ধীরে এপ্রাণের তারে-তারে স্বপ্নের জোয়ার বহিয়ে দিলে। সে স্বপ্নের সঙ্গে আমার উদাসী প্রাণও যেন ঐ আলোচরা তারাতরা নাগে-ডরা অনন্ত আকাশের দিকে—উপরে, উপরে,—আরো-উপরে উঠে বেতে লাগল—বাধীনতার মত্ত, মুক্তির মত্ত, অসীমের মত্ত!

হৃদয়ে আজ অকালে বসন্তের সাড়া পেয়েছি—এপ্রাণ আমার এমন-করে' অনেক দিন কথা কর-নি!

একই রাগিনী অনেকক্ষণ ধরে, অনেক বার আলাপ করলুম। এখন থামলুম, তখন রাত্তির স্তব্ধতার সঙ্গে চাঁদের আলো আরো ফুটফুটে হয়ে উঠেছে, কুলের গন্ধ আরো ঘন হয়ে উঠেছে, পাণির 'পিউ-কাহা' আরো মধুর হয়ে উঠেছে! এতাজের তারে-তারে রাগিনীর শেষ প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না যেতেই পিছন থেকে গুনলুম—“থামলে কেন, সরমা, ফের বাজাও!”

সচকিতে ফিরে দেখি, ছাদের উপরে দীর্ঘ ছায়া কেলে মোহনবাবু দাঁড়িয়ে!

মাথার কাপড় খসে কাঁধের উপর এসে পড়েছিল;—তাড়াতাড়ি এতাজকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে, এতজভাবে মাথার কাপড় তুলে নিলুম।—মাগো, মোহনবাবু বেন কী!

—“সরমা, তোমার নরম হাত থেকে খসে মাটির উপরে পড়ে এতাজের তারগুলো কী ক্যারার হয়ে অনুধ্বন করে” উঠল, শোন! তুমি কি আর বাজাবে না?”

—“না।”

...“কেন?”

—“এটা হোল চুরি-করে’ গান-শোনার সাজা।”

—“তোমার বাজনা কি মিষ্টি!”

—“সেটা বোধহয় চকুলজ্জার খাতিরে প্রকৃত-উক্তি। স্বগত-উক্তিতে নিম্দের ‘থামলে বাঁচি’! কি বলেন?”

—“সরমা, দিন-কে-দিন বাজনার তোমার হাত বেশী খুলছে, কি কথার তোমার মুখ বেশী খুলছে—সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।”

—“যা বুঝতে পারছেন না, তা বেশী বোঝবার চেষ্টা করা মিছে সময়-নষ্ট মাত্র,—এটা ত অবশ্যই বুঝতে পারছেন?”

—“বাজনা বন্ধ করে’ বধন কথাই শ্রুত করলে,—তখন অগত্যা বসে বসে তাই শোনা যাক; কেননা, প্রবাদ বিধান দিয়েছে, মধু হ্রলত হলে গুড় খাওয়াই প্রশস্ত!”—এই বলে মোহনবাবু ছাদের উপর বসে পড়লেন।

আমি বললুম, “মোহনবাবু, মেয়েমাহুষের কথা আর কি গুনবেন বলুন! আপনারা পুরুষমাহুষ, আমাদের কথা আপনারের ভাল লাগবে কেন?”

—“সরমা, রমণীর সঙ্গে বধন পুরুষের কথা হয়,—কথার মধ্যে তখন যেমন বৈচিত্র্য আর মাধুর্য্য আসে, এমন আর কখনো নয়। আমার ত মনে হয়, একঘরে যদি দশজন পুরুষও কথা কর, তবে সেই দশজনের কথাই যেন একটিমাত্র লোকেরই স্বগত-উক্তির মত শোনায়ে!”

—“কিন্তু, তবু ত আমাদের কথাকে আপনারা মেয়েলী কথা বলে ঝণা করতেও ছাড়েন না!”

—“এর কারণ, আমাদের মেয়েরা কথার মত কথা কইতে জানেন না। আমরা সাধ করে’ আমাদের মেয়েদের অবস্থা এমন তরানক করে’ রেখেছি যে, মেয়েরাও শিক্ষিত পুরুষদের কথা বুঝতে পারেন না। আর শিক্ষিত পুরুষরাও অশিক্ষিত মেয়েদের কথা শোনবার যোগ্য বলে ভাবেন না। নারীদের *অজ্ঞ রেখে আমরা নিজেরাই যে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, এটা এখনো

আমাদের মাথার ঢোকে-নি—এ বড় আশ্চর্য্য!। যেরেণের কথা বলবার যে একটি বিশেষ ভঙ্গি আর স্বাভাবিক শক্তি আছে, শিক্ষার দ্বারা মার্জিত হলে তা যে কতটা মধুর, কতটা সরস হয়ে উঠতে পারে, আমাদের সে ধারণা নেই। তা যদি থাকত, তাহলে আমাদের অন্তঃপুর আনন্দের আভ্যাস হয়ে উঠত। খ্রী-শিক্ষা আর খ্রী-স্বাধীনতার অভাবে পুরুষদের আলাপের সঙ্গে বাল্যী মহিলারাও যোগ দিতে পারেন না,—আমাদের জীবনও তাই দিন-কে-দিন একঘেয়ে, নীরল হয়ে পড়ছে। নারী-প্রকৃতি স্বভাবতই কোমল। পুরুষের কঠোরতার সঙ্গে নারীর এই কোমলতা যদি মিশতে পারে, তাহলে জীবনটা কি বিচিত্র হয়ে ওঠে!”

...“মোহনবাবু, নারীকে আপনি যে এতটা উচ্চাঙ্গন বেন, আমি ত তা জানতুম না!”

—“উচ্চাঙ্গন যে না? এ যে নারীর প্রাণা! নারীকে আমরা আমাদের কণ্ঠের মস্ত্রী, অবলম্বের সাধী, সুখে-দুখে জীবনের সহচরী করতে পারছি না বললেই তাড়াতাড়ি সঙ্গ আমাদের কেবলমাত্র ইঞ্জিরের একটা নীচসম্পর্ক গাড়িয়ে গেছে। ছায়া যেমন আলো-কে কোমল করে, হৃদয় করে, মধুর করে, নারীও তেমনি ছত্র পুরুষ-প্রকৃতি-কে শান্ত, মিষ্ট, সুখী করে’ আনে। পুরুষ আর নারী,—এরা দুজনেই যদি দুজনকে জীবনের সকলদিক দিয়ে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে গুণবানের সৃষ্টিই যে অসম্ভব হতে পারে। এদের দুজনেরই

স্বাভাবিক গতি দুজনের দিকে,—যা-কিছু এই গতি-কে ঠেই মিলন-সুখকে বাধা দিতে চায়, তাই-ই অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, অশোভন! সরমা, যে দেশে নারীর সাহায্য পুরুষ প্রত্যাখ্যান করে, সে দেশের অশেষ হুতাপা!”

কিছুক্ষণ পরে আমরা দুজনেই নীরবে বসে-বসে বাহিরের সৌন্দর্য্যকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করলুম। তারপর, আমার ঘোঁসায় যে গটিকর চাপাফুল গৌড়া ছিল, তারই গন্ধ বোধের বাতাসে মোহনবাবুর নাকে গেল; কারণ, হঠাৎ তিনি ঘোঁসায় টেনে বলে উঠলেন, “আঃ! চাপার কি মিঠে গন্ধ আসছে!”

আমি একটু ভ্রূঙ্গড় হয়ে চুপ-করে’ই রইলুম। গন্ধটার উৎপত্তি যে কোথায়, সেটা আর প্রকাশ করে’ বললুম না।

মোহনবাবু একবার আমার দিকে তাকালেন। আমার চোখও তার দিকে গেল। মুহূর্ত্ত পরে তিনি চোখ নামিয়ে মুখ কিরিরে নিলেন—আমিও মাথা হেঁট করলুম।

হঠাৎ একখানা কালো মেঘের আড়ালে চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে গেল। চারিদিকের তরল অন্ধকার পৃথিবীকে’ বেন আরো ছোট আরো নিরিবিলা করে’ জ্বললে! আমরা দুজনেই দুজনের নিশ্বাসের শব্দ শুনেতে পাচ্ছিলুম। আমার মনে হোল, সে নিশ্বাস বেন লুকানো আঁখার অশ্রুট ভাষা,—বে ভাষা সুখে ফোটে না, যুক্কে ভোগে ওঠে!

আচম্ভা! একটা দমকা বাতাসে পাছের পাতার পাতার কি-য়েন কাণাকাণির আবেশালন

আগিয়ে দিবে গেল। আমরা এমন বিভোর হয়ে ভাবছিলাম যে, সে শব্দে ইজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলুম!

যেখলুম, মোহনবাবু ফিরে বসে আমার দিকে মুখ করলেন। সেই অল্প আধারের ভিতরে তার চুটি চোখ চুটি সিঁদোজল দীপ-দীপার মত আমার মুখের পথে স্থির হয়ে রইল!

আমার বুকের ভিতরটা কেমন শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল!

মোহনবাবু খুব-আগ্রে—শোনা-বার-কিনা-বার এমনি করে—ডাকলেন, “সরমা!”—তার স্বর কাঁপছিল!

সে স্বর শুনে আমার তর হোল, তাড়াতাড়ি বললুম, “মোহনবাবু, অনেক রাত হয়েছে—চলুন, আজ বাই!”

মোহনবাবু কোমলস্বরে বললেন, “সরমা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।”

এমনসময় একরাশ তাসা-ছেঁড়া মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো ফুটে উঠে, নীল-জলে পদ্মের পাপড়ির মত নীলাকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মোহনবাবুর কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি বললুম, “আঃ, বাঁচলুম! আজ্ঞা মোহনবাবু, আপনি কি ভালবাসেন—আলো, না অন্ধকার?”

—“আমার দুই-ই ভাল লাগে।

কখনো আলো ভালবাসি—কখনো অন্ধকার।”

—“আমারও তাই, মোহনবাবু! কখনো আলোতে বেজিরে আসতে চাই, কখনো চাই অন্ধকারে বসে থাকতে!”

—“সরমা!”

—আবার সেই স্বর! তেমনি কোমল,

মৃদু, কম্পিত!—আমি আর পারলুম না, জোর-করে গাড়িয়ে উঠলুম। শুককণ্ঠে বললুম, “কি বলছেন মোহনবাবু?”

—“সরমা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। শুনবে?”

আমি ধানিকক্ষণ চূপ-করে রইলুম। তারপর ছাদের উপর থেকে এতদ্রাষ্ট্র তুলে নিয়ে দ্রুত-দ্রুত বুকে বললুম,—“কি, বলুন!”

মোহনবাবু একবার আমার মুখের পানে চেয়েই আবার মুখ নামিয়ে নিলেন। তারপর হঠাৎ উঠে গাড়িয়ে বললেন, “নাঃ, থাক! আজ অনেক রাত হয়ে গেছে—আজ-একদিন শুন তখন”—এই-বলেই ছাদের উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।...

ঘরে গিয়ে বিছানার উপরে আমি বিবশ হয়ে লুটিয়ে পড়লুম! বুকের তুকান আর বাগ্‌না মেনে চোখের কানায়-কানায় উপছে পড়তে লাগল।

বোঁপার চাপার গন্ধ কি বিস্তী! দূর করে' ফুলগুলো টেনে কেলে দিসুম... অবরুদ্ধ কণ্ঠে ডুকরে বলে উঠলুম—“মা গো!”

বোলো

হরেন্দ্রের কথা

মোহন এসে আমাকে মত্ত মুকুর্বি পাকড়াও করেছে! অর্থাৎ, তার অভিপ্রায় এই যে, আমি মুরারিবাবুর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে সরমার বিবাহের ঐশ্ব্য করি!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, “কাল কিছু শুনলুম না, আর আজ হঠাৎ উদ্বাহ-

বন্ধনে বন্দী হতে তোমার এতটা আগ্রহ কেন ? হে ? একদিনেই প্রেমের এতটা পরিণতি—প্রেমের পাঠশালায় তুমি যে দেখছি ভবল-প্রমোদন পাচ্ছ ! ধস্ত সখা, ধস্ত !”

—“ভাই, পাড়ার ছুঁচোগুলোকে জান ত ! তাদের মুখ এইবেলা বন্ধ করতে হবে !”

—“কেন, তারা কি বলতে চায় ?”

—“বক্ত-সব অতঃপর কথা ! তাদের স্বভাব ত জানই, ‘অহুমান করে’ নাও না !”

—“বেশ, তা-যেন বুঝলুম। তবু এখানে একটা কিস্ত আছে। সরমা কুমারী ছোলে কোন কথাই ছিল না, সে বিধবা বলে একটা বিষয় আগেই জেনে নেওয়ার দরকার।”

—“কি ?”

—“এ বিবাহে তার কি মত ? সেমিকে কিছু সুবিধে-দুবিধে করতে পেরেছে ?”

—“ভাই, এতদিনেও সরমার মন ত বুঝতে পারলুম না।”

—“পুরুষের কাছে রমণী দুর্বোধ, আবার রমণীর কাছেও পুরুষের হৃদয় একটা মস্ত গোলকধাঁধা ! কিন্তু যখন হৃদয়ে হৃদয়ে বৃদ্ধ বাধে, তখন এক হৃদয়ের উদ্ভিত হচ্ছে, অস্ত হৃদয়ের গুপ্তকথা বক্তা-পারে সমকে” নেওয়া ! যে পক্ষ অস্ত পক্ষের ভিতরের কথা বক্ত-বেশী জানতে পারে, বুড়ে তারই জিৎ হয়। তুমি কি কিছুই বুঝতে পার-নি যোহন ?”

—“একবার মনে হচ্ছে বুকেছি, আবার মনে হয়, বুঝি-নি। এ বড় মুদ্রিল ‘ভাই, তাকে ধরি-ধরি করে’ও যেন ধরতে পারি না।”

—“রমণী হচ্ছে ছায়ার মত ; তাকে যদি অহুসরণ কর, সে তোমার নাগালের বাইরে-বাইরে ছুটবে ; তাকে ছেড়ে যদি সরে আস, সে তোমার পিছনে-পিছনে ফিরে আগবে ! সুতরাং একটু মাথা-থাটোনো চাই। কিন্তু যোহন, আমার বিশ্বাস, তোমার মত দুর্বল জীবের পক্ষে রণক্ষেত্রে নামাটা উচিত হয়-নি :—তুমি অধু দুর্বল নও, তুমি অক্ষ ! যদি কেউ প্রেমের ইতিহাস লেখেন, তাহলে তিনি প্রণয়যুদ্ধে গুপ্তার অনেক নেপোদিসনের সাক্ষ্য পাঠবেন। তাঁদের অনেকের চেহারা হয় ত কুৎসিত, চরিত্রও ভেদন লোভনীর নয়, তবু অস্তপক্ষের হাল-চালটা শীঘ্র বুঝে নেবার শক্তি ছিল বলেই তারা বড় বড় যুদ্ধে সহঁমেই কেলা হতে করেছেন। কিন্তু হে যোহন, তোমার নিকৃঙ্কিতার জন্তে তোমার উপরে আমি দোষারোপ করতেও পারি না। কেননা, যখন হচ্ছেন সেই যারাবী, —যার সূত্র সখাস্থাপন করলে রাগাই বল আর ডিখারাই বল, ‘শকলেরই বৃদ্ধিহ্রাসি কর্পুরের মত উবে যায় ! বাস্তবিক বন্ধ, তোমার এ-হেন হৃদয় চেহারা, হৃদয় স্বভাব,—তার ওপরে বিজ্ঞা ও অর্থে তুমি এতটা ভাগ্যবান—”

—“চরন, তুমি কি Mutual Admiration Society খুলতে চাও ?”

—“উহু, একেবারেই না। আমি বলতে

চাই, তোমার সব আছে, কিন্তু তুমি একটা আশু গর্দভ। জগতে সকলেরই পায় আছে, কিন্তু নিকোদের কোন গতি নেই।”

—“তবে হেয়ালি-ছেড়ে, তুমিই আমার খেয়ার কাণ্ডারী হও।”

—“আমি বা বললুম, তা মোটেই হেয়ালি নয়। কিন্তু যাদের কাণ কিকিং লক্ষ্য, তাদের কাছে দুনিয়ার অনেক জিনিষই ছাঁকা-হেয়ালি। আর দেখ মোহনলাল, আমার কথাকে হেয়ালি ছাড়া আর-কিছু বলতে তুমি নিতাইই যদি শরাজ হও, তাহলে ভেনে রেখ বে, সমাজে অনেক কথা হেয়ালি দিয়ে প্রকাশ করাই ভাল; কেননা সরল কথা অনেক সময়ে চক্ক-লজ্জা উপস্থিত করে, আবার প্রীতিকর না হোলে ভীতিকর হোতেও পারে।”

—“অতএব, হেয়ালিরই জর; কিন্তু উপস্থিত তোমার ধার্মিক পবেষণা একটু স্থগিত রাখলেই ভাল হয় না কি?”

—“এমন সাধাসিবে কথাকে বে পবেষণা বলে ভ্রম করে, তার সঙ্গে বাদলা মাসিক পত্র পড়াই হচ্ছে প্রশস্ত।”

—“তাই, তোমাকে দুক্কি ধরে আমি দেখছি, অলস আশুণ থেকে পরম কড়ার এসে পড়েছি। অতএব, তুমি নিরাপদে তোমার পবেষণার নিবৃত্ত থাক, আমি চললুম।”

—“কিছুতেই নিবৃত্তিচিৎ হওয়া আমার স্বভাব নয়, স্তম্ভর্য আমিও চললুম।”

—“কোথায়?”

—“মুরারিবাবুর বাড়ীতে।”

—“কেন?”

—“গর্দভের সঙ্গে দড়ি সংগ্রহ করতে।”

—“গর্দভ বেন আমি! কিন্তু দড়ি পুজতে সেখানে কেন?”

—“আমার প্রিয়তম গর্দভকে সেই দড়ি দিয়ে উদ্ধার-বন্ধনে বাঁধব বলে।”

মোহন কৃতজ্ঞভাবে আমার হাত চেপে ধরলে!

মুরারিবাবুর বাড়ীতে হাজির হয়ে দেখি, ঊঁর বৈঠকখানাটি বেজার সরগরম হয়ে উঠেছে। বাহির থেকেই দেখতে পেলুম, পাড়ার যত-সব মাতব্বর এসে সেখানে আসর জমুক বসেছেন। বাপার কি? মুরারিবাবু ত কাকুর সঙ্গে মেশামেশি করেন না, তবে অকস্মাৎ এতগুলি মহাত্মা আজ এখানে পহুগুনি দিয়েছেন কেন? দেখতে হোল।

একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকলুম না, —কারণ ‘ঘণ্ডমার্ক’ ও ‘পৌরার’ বলে পাড়ার আমার স্ত্রীমণি হয়েছে অনেকদিন। আমাকে এঁরা পছন্দও করেন না, ভালও বাসেন না,—হঠাৎ আমার আবির্ভাব হলে, এখনি এঁরা আঁংক উঠতে পারেন। অতএব, বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে পাড়িয়ে-পাড়িয়েই ঘরের মধ্যে উকি-ঝুকি মারতে লাগলুম।

যিনি কথা কইছিলেন, তিনি হচ্ছেন পাড়ার বিত্তগুড়ো। তিনি হুকোয়-নাগানো একটা কলাপাতার নলে টান দিতে-দিতে বসেছেন, “মুরারিবাবু, বাস্তবিক আসরা আপনার ক্ষেত্রে দুঃখিত!”

বিগুণ্ডো হুম্মিত ? তবে ত ব্যাপার বড় সন্নিহিত ! তিনি যখন হুম্মিত হন, তখন কাককে অবাই করবার আয়োজন করেন, এ আমার বিলক্ষণ জানা আছে !

বিগুণ্ডো বললেন, “যেহুন, সমাজে থাকতে গেলেই আর-পাচাষের সঙ্গে নেলা-মেলা করে থাকতে হয়।”

আর-একজন গুড়োকে তারিক করে বলে উঠলেন, “গা বলেছে ! গুড়ো, তোমার একথা লাখটাকার এক কথা !”—ইনি হচ্ছেন, ঘোঁটে-পাক্যাবার ওস্তাদ পাড়ার একচক্কু হুর্লভ বাঁড়ুয়ো !

হুর্লভ বাঁড়ুয়াকে সমর্থন করে আর-সকলে তারদ্বরে বলে উঠল, “অবিত্ত, অবিত্ত !”

বেচারী মুরারিবাবু ! তিনি এই মাতব্বরদের পায়ার পড়ে দ্বন্দ্বমত বাবুড়ে গেলেন ! কিছুই বুঝতে না-পেরে বললেন, “কি আশ্চর্য ! আপনারা এতকণ ধরে খালি আধারে ঢিল ছুঁড়েছেন কেন ? মশাইদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, পরিষ্কার করে বললে বাধিত হব !”

বিগুণ্ডো গলা-বাঁকারি নিয়ে বললেন, “কি-আনেন মুরারিবাবু, আপনি যখন এ পাড়ার এসে বসবাস করছেন, তখন আমাদের কাছ থেকে—ওর-নাম-কি—দুটো ভাল-মন্দ শুনতে হবে বৈকি ! তা যদি না শোনেন, তাহলে আমরা বড়ই হুম্মিত হব। কি বল হে হুর্লভ ?”

হুর্লভ বাঁড়ুয়ো একচোখ কুটুকে বললেন, “তা, হুম্মিত হব না আর—এ-বে বড় নিম্নের কথা !”

আর-সকলে • বললে, “তা বৈকি—তা বৈকি !”

মুরারিবাবু বললেন, “আপনারা সকলেই যে আমার ভক্তে যৎপরোনাস্তি হুম্মিত, সে ত বেশ বুঝতেই পারছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, আমার হুম্মটা যে কোথার সেইটেই খালি বুঝতে পারছি না। হুওরাং—”

বিগুণ্ডো বললেন, “মুরারিবাবু, আমরা আপনার কাছে জান যে ক্যানো এসেছি, অতঃপর মন দিয়ে তা শুনুন। আপনার একটি—ওর-নাম-কি—বিধবা মেয়ে আছে ?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ,।”

—“গাছা, হুঃখের কথা ! কার কপালে যে কি আছে, তা কে বলতে পারে ? হরি হে, তুমিই সত্য !”

—“তা কি বলতে চান, বলুন !”

—“হ্যাঁ, বলচি-কি—আপনার মেয়েটি নাকি গান গায়, বাজনা বাজায় ?”

—“হ্যাঁ, সে গান-বাজনা জানে বটে।”

—“সে নাকি পরপুরুষের সামনে বেবোয়, দার তার সঙ্গে একলা বসে কথা কর ?”

—“পরপুরুষটা কে মশাই ?”

—“এই থকন, আমাছের মোহনলাল !”

—“মোহন, সে ত আমার বাড়ীর ছেলের মত ! হুওরাং—”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ, ঋণু আপনার ক্যানো, মোহন আমাছেরও বাড়ীর ছেলের মত। তা-বলে ত আমরা আমাছের বাড়ীর বিধবা বৌ-বীর সঙ্গে তাকে চোখের আড়ালে দিশতে বা গান-বাজনা করতে দিতে পারি না ! কি বল হে হুর্লভ ?”

দুর্লভ বাঁড়ুয়া শাসকের খোল থেকে খুব বড় একটপ নত নিয়ে, একচক্ষু কুঁচকে নাকের মধ্যে গুঁজতে-গুঁজতে বললেন, “তা বটেই-ত, তা বটেই-ত !”

বিত্তগুড়া ছকোর খুব-একটা ছোর-টান লাগিয়ে বললেন, “আপনার মেয়েটিকে সাবধান করুন,—তার সম্বন্ধে আমরা আরো অনেক কাণাবূষো শুনিছি।”

দুরারিবারু এতক্ষণে সমস্ত বুঝে ভাবা-চাকা খেয়ে বললেন, “ও সব মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা !”

দুর্লভ বাঁড়ুয়া একচোখ নেড়ে বুকঝি-আনা চালে বললেন, “আজ্ঞে, না-জেনে আমরা কিছু বলতে আসি-নি। বেথানে মিথ্যো—জানবেন, দুর্লভ শর্তা সেখানে নেই ! আর, আমাদের কথা যদি না কাণে তোলেন, আপনাকে তাহলে একঘরে হোতে হবে—এটা বেন ভুলে যাবেন না !”

দুরারিবারু অত্যন্ত স্ত্রিয়মান হয়ে, কাতর ভাবে সকলকার মুখের পানে তাকাতে লাগলেন,—কিন্তু সেখানে এমন মুখ একটিও দেখলেন না, যাতে একটুও মারামমতার ভাব মাথানো আছে !

বিত্তগুড়া চোরা কটাক্ষে দুর্লভ বাঁড়ুয়ার মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি বাঁকা হাসি হাসলেন। সে হাসিটার মানে এই যে, এতক্ষণে চারে মাহ এসেছে !

দুর্লভ বাঁড়ুয়া অত্যন্ত উৎসাহিত ভাবে আর একটপ নত নাকে পুরে বললেন, “দুরারিবারু, সেইজন্তেই আপনাকে আগে থাকতে আমরা সাবধান করে’ দিতে

এসেছি। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে হবে ত !”

দুরারিবারু বললেন, “আমি আপনাদেরই আশ্রিত। স্ততঃ—”

ককির ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ ঘরের এক কোণে ঘাড়-ছইরে বসে আকিমেদ সেশায় কিছুচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর তিমিত চোখ-দুটি বখাখা বিস্ফারিত করে’ আপনার অগ্নিস্থের প্রমাণ দিয়ে বললেন, “ও আশ্রিত-অনাশ্রিত বাছতে গেলে সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষা করা কি চলে মশর ?”

আমি দেখলুম, আর আড়ালে থাকা চলে না, দুরারিবারু বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন !

—“কাদের কাছে আপনি আশ্রয় চাচ্ছেন দুরারিবারু ?”—এই বলে আমি ঘরের সেই শূণাল-সভার মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

দুরারিবারু আমাকে দেখে বেন হাত-বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, “আম্বন, হেরনবারু আম্বন !”

আমি অস্ত্র কোনদিকে না তাকিয়ে দুরারিবারুকে বললুম, “আপনি কাদের কাছে থেকে আশ্রয় চাচ্ছিলেন ?”

—“এই যে, এঁদের ক’ই থেকে !”

—“এ ঘরে মাহুয় আছে নাকি ?

বটে, তা ত জানতুম না ! আরে কেও, বিত্তগুড়া ! এদিকে এটি কে ? দুর্লভ বাবু ! ওদিকে ভট্টাচার্য্য-মশায় বুঝি ? বেশ, বেশ, এ যে দেখছি, নরক গুলমার !

—দুরারিবারু, আপনি এদিক যথো এত ভালি মুহাম্মার সঙ্গে আলাপ ক্রমিয়ে ফেলেছেন ? সাধু, সাধু !”—আড়চোখে

একবার সকলকার মুখ দেখে নিয়ে, ঠিক মাঝখানে গিয়ে আমি বসে পড়লুম।

আমাকে দেখবামাত্র বিত্তগুড়োর মুখ থেকে হাজার কলাপাতার নল খসে পড়ল, ককির ভট্টাচার্য্যর নেশা বিলকূল ছুটে গেল, একচল্লু চল্লু বাঁড়ুঘো হঠাৎ উদাসভাষে উর্দ্ধমুখে কড়িকাঠ গুণতে শুরু করলেন এবং মজা জমতে-জমতে জমল-না দেখে আর-আর সবাই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

এঁদের আকস্মিক ভাবান্তর দেখে মুরারি-বাবু একেবারে অবাক!

কোনরকমে হাসি চেপে আমি বললুম, “কি বিত্তগুড়ো, হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষার কাজ আজ-কাল কেমন চলছে? খবর সব ভাল ত? আর কখন লোক একবারে হোল, ক-জন পাণিষ্ঠ আভিচ্যুত হোল?”

গুড়ো এদিক-ওদিক চেয়ে আচম্কা গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, “বাবা হরেন, আজ আমাদের হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী-সভার অধিবেশন আছে। আমি ও আর থাকতে পারছি-না।”

চল্লু বাঁড়ুঘোও শাস্ত্রকের খোলট ট্যাঁকে গুঁজে টপাস্-করে’ উঠে পড়ে বললেন, “ওহো, ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে! আমাকেও সেখানে যেতে হবে যে!”

বিত্তগুড়ো আর চল্লু বাঁড়ুঘো চোকাঠ পার না-হতেই ককির ভট্টাচার্য্য ও প্রহান গুণে তরানক চৌচিরে উঠলেন, “ওখুড়ো, ও চল্লু! আমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে তোমরা চললে কোথায়? দাঁড়াও,

দাঁড়াও, আমিও বাব!” বলতে-বলতে বুদ্বাবনী নামাবলী-খানি ভাড়াভাড়ি গারে জড়িয়ে ভট্টাচার্য্য ও চট্টপট্ট সরে পড়লেন। বলাবাহুল্য, ঘরের মধ্যে আর-আর বাঁরা ছিলেন, মহা-জনের পদাঙ্ক অহসরণ করতে তাঁরাও কিছু-মাত্র বিলম্ব করলেন না!

মুরারিবাবু বললেন, “এঁরা দেখছি আপনাকে ভালচোখে দেখেন না।”

—“ভালচোখে দেখবেন কি, এঁরা আমাকে বনের মত ভয় করেন। কারণ, এঁদের প্রত্যেকের নাড়ীর খবর আমার জানা আছে! ঐ যে বিত্তগুড়ো, উনি ‘হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী-সভা’র পয়ম বৈক্য সম্পাদক—ওঁর মাথার চুল হাত-ডালে পাবেন লম্বা টিকি, আর উঁদর হাত-ডালে পাবেন মুরঙ্গির কাট্টলেট! আমি একদিন একটা হোটেলে ঐকে হাতে-নাতে পাকুড়ে অত্যন্ত নির্দয়ের মত ঐকে টিকিহীন করে’ দিয়েছিলুম। ঐ চল্লু বাঁড়ুঘোটরও ঘোড়া বেলা চল্লু। উনি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করতে চান, কিন্তু নিজে দুটি অস্ত্রাঙ্গিনীকে কুলের বাহির করেছেন। আর ঐ যে ককির ভট্টাচার্য্য, ভাল করে’ উনি একবার রেল বেড়িয়ে এসেছেন! এঁরাই আজকাল আমাদের সমাজপতি! এঁরা মহা-ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না, অথচ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করার সম্পদ রাখেন! এঁদের এখানে আগবায় উদ্বেষ্ট আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি—সুতরাং আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। তবে একটি কথা আপনাকে বলে রাখি। এঁদের কাছে কখনো নরম

হবেন না, তাহলে বীপবাসী বুড় যেমন
সিন্ধবাসের ঘাড় চেপে বসেছিল, এঁরাও
তেমন আর আপনার ঘাড় ছেড়ে নামতে
রাজি হবেন না। এঁরা হচ্ছেন পরমের
গোলাম আর নরমের বম।”

মুরারিবাবু হতবাক হয়ে বললেন, “মামুষ
কি এত নীচ হতে পারে!”

—“মামুষের ভিতরে বেনীম ভাগই নীচ,
ভাল ভাগ খুব কম। আর কম বলেই,
সাত্ত্বিক-বাটে ভাল’র ছড়াছড়ি নেই বলেই,
ভালকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি,
শ্রদ্ধা করি। চুনিয়ার বা ওল’ভ, তারই ত
আধর অধিক।”

—“কিন্তু হরেনবাবু, এঁরা যে-সব
ভয়ানক কথা বলে গেলেন, তাতে আমি
বড় আঘাত পেয়েছি। সরমার নামে চার-
দিকে নানান কথা রটেছে।”

—“রটুক। মনে যে খাঁটি, নিম্নকের
কলর-রটমার তার কাণ পাতবার -ধরকার
নেই।”

—“হরেনবাবু, অমন-যে সবল-চরিত্র
সামন্ত, নিম্নকের জিহ্বাকে তিনিও ত
অবহেলা করতে পারেন-নি!”

—“তার কলুটা কি হয়েছিল, তাও
ভেবে দেখুন! নিম্নকের মন রাখতে গিয়ে
সামন্ত সীতাকে হারিয়েছিলেন, সতীর
অপমান করেছিলেন।”

মুরারিবাবু চুপ-করে বসে রইলেন।
আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, “আপনি
যদি এই কুৎসিত কাণাকাণি বন্ধ করতে
চান, তাহলে একটি উপায় আছে।”

—“কি?”

—“আপনার ঘরের বিবাহ দিন।”

—“হরেনবাবু, আপনি কখনো কাক্সি
বত সহজ মনে করছেন, আসলে এটি তত
সোজা নয়।”

—“কেন?”

—“প্রথমে ত ভালপাত্র বেখেতে পাওয়া
যায় না। ভালপাত্র পাওয়া গেলেও সে
হয়ত বিধবা-বিবাকে রাজি হবে না।
তারপর, এ-বিষয়ে সরমার মত জ্ঞানতে
হবে।”

—“ভালপাত্রের সন্ধান আমি এখন
ধিতে পারি মুরারিবাবু, কিন্তু আপনার মত
হবে কিনা, জানিনা।”

—“ভালপাত্র? কোথায়?”

—“আমার বন্ধু মোহন।”

—“কি বললেন? কে?”

—“মোহন আপনার ঘরেকে বিবাহ
করতে সম্মত আছে।”

—“কি আশ্চর্য! আপনি কি পরিহাস
করছেন? মোহন? মোহন সরমাকে বিবাহ
করতে রাজি! এ কি সম্ভব?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ, মোহন নিজের মুখে এ
কথা বলেছে। আপনি কি তার হাতে
কক্সাপ্রদান করবেন?”

—“বলেন-কি! মোহন আমার জামাই
হতে চায়, এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস
করতে পারছি না। আমার কি এত
সৌভাগ্য হবে?”

—“আপনার ঘরের মত কি, আপনি
আজ-দুইটা ঘেনে রাখবেন। আমি কাল
এসে সব শুনব-অধন”—এই বলে সেদিন-
কার মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আগতে-আগতে গুনগুন, ঘরের ভিতরে
মুগারিবাবু। আপনমনে বলছেন, “কি
‘আচ্ছা, মোহন? সে আমার সরমাকে
চায়? এতবড় আশা আমি ত একদিনও
করি-নি! হুতরাং—”

সভেরে।

সরমার কথা

ওগো, আমার এ বার্থ জীবনকে কোন্
মত্রে তুমি সার্থক করতে চাও, আমার
এ শূন্য বুককে কি-মিহে তুমি পূর্ণ করতে
চাও! স্বরা পাপড়ি কুড়িয়ে ফুল-ফুটানো
ধাঘনা গো ঘাই না,—যে স্বরতে চায়,
করে পড়েছে, তাকে করতে দাও, সে করে
মরুক...মরে সে বাঁচুক!

আমার মনের গোপন পরনে নারীর
নারীষটুকু ঘুমিয়ে ছিল এতদিন, কে তুমি
সোণার কাঠি হাতে করে’ তার পিররে
এসে দাঁড়িয়ে আছ? আজ সকালের
অকণ-আলোর তরুণ লগাট তোমার অপূর্ণ
মহিমার জল-জল করছে—অবাক হয়ে
তোমার মুখপানে চেয়ে আছি, আমি চেয়ে
আছি! তুমি কি ভাবছ, তোমার ঐ
হাসির তাপ দিয়ে আমার এই কান্নার
শীতলতাকে তপ্ত করে’ তুলতে পারবে?

কঁদতে-কঁদতে চিঠিখানি আমার
চোখের সামনে তুলে ধরলুম—আবার পড়তে
লাগলুম।

“সরমা,

সেদিন ছাদের উপর তোমাকে যে
কণ্ঠা বলতে গিয়ে বলতে পারি-নি, আজ
এই চিঠিতে আমি ‘সেই কথা’ বলব।”

বলব, কিন্তু তুমি উল্টবে কি? তোমার
শোনার উপরেই আমার জীবন, আমার
মুখ, আমার শক্তি,—সমগ্র নির্ভর করছে।
তুমি শোনো সরমা, তুমি বধির হোয়ো
না—পাখাটি মূর্তির মত মৌনবুখে দাঁড়িয়ে
থেক না!

হঠাৎ-পূর্বে-পাওয়া রত্নের মত প্রথম
যেদিন তোমাকে দেখি, সেইদিন থেকেই
তুমি আমার আপনায় হয়ে আছ, সেইদিন
থেকেই আমি আলোক-রাস্তাে বাস
করছি। আমার বিশ্ব এখন তোমার,
আমার ভিতরে তুমি, বাহিরে তুমি,—
আমার জীবন-পথ আলোক-করে’ আছে যে
ঐবতারা, সে তুমি, তুমি!

‘আনন্দময়ী মুরতি তোমার,

কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!

অমৃত-সরস তোমার পরশ

তোমার নরনে দিবা বিভা!’

সরমা, তোমার এই আনন্দময়ী মুরতি
কি আমার নিরানন্দ গৃহকে আনন্দে পরিপূর্ণ
করে’ তুলতে পারবে না?

তুমি আমার হবে?

তোমার বাবার মত জানতে আমি
আমার বন্ধকে পাঠিয়েছি, আর তোমার
মত জানবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি
লিখলুম।

আমার ভবিষ্যৎ এখন তোমার হাতে।

ইতি মোহন।”

মত? আমার মত? কি মত দেব,
কি বলব?

তখনও বসে-বসে ভাবছি আর ভাবছি।...

এমনসময় এককোলে নহর, আর এককোলে মেহরাকে নিয়ে বাবা এলেন।

মনের কথা মনেই চেপে বাবাকে বললুম, “হ্যাঁ বাবা, নীচে অত গোলমাল হচ্ছিল কিসের?”

বাবা বললেন, “গোলমাল বিশেষ-কিছু নয় মা, পাড়ার জনকত ভদ্রলোক এসে-ছিলেন।”

—“ভদ্রলোক! মাগো, আমি ভাবলুম বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়েছে!”

বাবা হো-হো-করে’ হেসে উঠে বললেন, “কি আশ্চর্য! ডাকাত ভেবেছিলি বুঝি?”

—“এস বাবা, তোমার পাকাচুল তুলে দি, তোমার মাথার পাকাচুল বড় বেড়ে উঠেছে, বাবা।”

—“বরষা বাড়ছে না, পাকাচুলও বাড়ছে! কলে পাক খরে গাছ থেকে খসে পড়বার মতো, তা জানিস্ ত?”

—“চুপ কর বাবা, ও-সব- বললে তোমার সঙ্গে আমি আড়ি করে’ দেব-কিন্তু।”

—“তোমার আড়িতে আমি তর পাই-না। রোজই ত তুই আমার সঙ্গে আড়ি করে’ কের সেধে ভাব-করতে আসিস্!”

—“তবে যাও! আমি আর তোমার পাকাচুল তুলে দেব না।”

—“না মা, তোকে আর চুল তুলতে হবে না। তুই আমার স্নুখে এসে বোস্ দেখি! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।”

বাবার গলায় খরেই বুকলুম, কি কথা! আমার এমনি লজ্জা করতে লাগল!

বাবা একটু চুপ-করে’ থেকে বললেন, “মা, সেদিন তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, মনে আছে? তোমার বিয়ের কথা?”

আমি কিছু বললুম না—নীরবে নহরার মাথার হাত-বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

বাবা বললেন, “আজ আমার বাধা হয়ে তোমার কাছে সেই কথাই তুলতে হচ্ছে। মোহন বলে পাঠিয়েছে, সে যদি তোকে বিবাহ করতে চায়, তাতে আমার মত আছে কি না।”

আমি ঘাড় হেঁট করে’, যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বসে রইলুম।

বাবা বলতে লাগলেন, “মোহন যে আমার জামাই হতে চাইবে, এ স্বপ্নেরও অপোচর! রূপে-ভগ্নে এমন ছেলে হাজারে একটও হয় না। আমি বড় সমস্তার পড়েছি মা! এ বিবাহে তোমার মত আছে কি না তা-ত আমি জানিনা! অথচ, তোমার অমতে মোহনকে কিছু বলতেও পারছি না! কি করি, বলত সরো?”

আমি কি বলব? এর কি উত্তর দেওয়া যায়? আমি যেন একেবারে বোবা হয়ে গেলুম।

“কি আশ্চর্য! চুপ-করে’ রইলি যে? লজ্জা হচ্ছে বুঝি! আ আমার বোকা মেয়ে, এখন কি লজ্জার সময়?”

ফিক, মুখ তবু কোটে কোটে কোটে না!

“বল, বল, কথা ক! আমার যে আর উপায় নেই! তা-নইলে তোকে কি এমন-করে’ লজ্জা দি!”

অনেক কষ্টে মুখ তুলে বললুম,
“বাবা!”

—“বল্ মা, বল্! এ বিবাহে তোরা
মত আছে?”

প্রাণপণে বললুম, “হ্যাঁ!”—বলেই জ্বালা
বাবার কোলের ভিতরে মুখ তুলে আনলে,
লজ্জার কঁদে ফেললুম!

ক্রমশ

ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সাহিত্যের গণ্ডগোল

সাময়িক সাহিত্যের আগের অজকাণ
সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে বেশ-একটা লড়াই
বেধে গেছে। সমাজ-সংস্কারকের দল বলছেন,
সমাজের উপর সাহিত্য ভারি অত্যাচার
স্বক করেছে অতএব—; অতএব যে কি,
তা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যাই
হোক, সনাতন সমাজের উপর এই রকম
বিষম অত্যাচার চলছে বেধে গুটিকয়েক
লোক মিলে একটা Band of mercy-র
দল গঠন করেছেন। তাঁরা এই নিয়ে লম্বা
বে, হঠাৎ কোনো কানকে কেউ বেন কলমের
খোঁচা মেয়ে সমাজকে কানু করে না ফেলে।

সমাজবৈবর্ত-পুরাণে নাকি লিখিত আছে,
কলমাধাতে সমাজ-দেহে মারামারক বিব
প্রতিষ্ট হয়ে সমাজকে মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে
যায়। সেইজন্য এই mercy-র দল বিষম ক্ষিপ্ত
এবং ধীশূর হয়ে উঠেছেন। প্রথমত দুটি-একটি,
তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে এই দলে
ছুটেছেন, কারণ তাঁরা নাকি সন্ধান পেয়েছেন
এই দলের পিছনে বেশ ছুটেপুটে পৃষ্ঠপোষক
বর্তমান। কাজেই তাঁরা সময় বুঝে যে
পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে লাজ্জিত হবেন না তা বেশ
বোঝা যাচ্ছে।

সাহিত্যের স্বভঙ্গ দিয়ে কে কোথায়
সমাজকে ঝাল করছে তা অনুসন্ধান করতে
কঠোর সাহিত্য-কোটাণরা বিশেষ-করে
রবীন্দ্রনাথকে প্রোত্তার করেছেন। তাঁর
বিব্রুছে অভিযোগ বিস্তর, তবে প্রমাণাত্মক
কতক ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি তাঁকে
এক অভিযোগেই বিশেষভাবে অভিযুক্ত করা
হচ্ছে। অভিযোগটি এই যে “তিনি হিন্দু-
সমাজের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন,
অতি বর্জনের ভার হিন্দু-আবশ্যের পর্যন্ত-বৎ
গর্ভ ধর্ষ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।” তাঁদের
মতে, এই চেষ্টা অবশ্য তাঁর রচিত উপন্যাস
থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই
যে, তাঁর রচনার সমাজ যে কোন্‌ স্থানে আঘাত
প্রাপ্ত হ'ল সেটি অগ্রহমান্য করা সকলকার
বুদ্ধির পক্ষে সমান সহজ বলে প্রমাণিত
হচ্ছে না। কেউ কেউ বলছেন, তিনি
উপন্যাসের ভিতর দিয়ে মানুষের মনের ভাবকে
বিলম্বণ করে দেখিয়েছেন, আবহাওয়া
মানুষের মনের উপর কেমন-করে আধিপত্য
বিস্তার করে, প্রলোভন সামনে পড়লে মানুষের
মন কেমন-করে সেমিকে ছুটে যায়;
তারপর কোথাও সে থাকা খেয়ে ফিরে আসে,

কোথাও-বা ভেঙে পড়ে, তারি ছবি তিনি এঁকেছেন। উপভাস তার নিজের ভাগাণার আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সমাজ-সমস্তার কোনো জটিলতা এসে পড়লে তার বিকাশের মুখে নিজের প্রয়োজন-অঙ্গুসারে সে তাকে গ্রহণ বা বর্জন করে। সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তার চলে না। সমাজ যা চায় সাহিত্যের নিজের বিকাশের জন্যে হয়ত সেটার প্রয়োজন হয় না; কিংবা তার উন্মোচনা দরকার হয়, কিন্তু সেখানে সে যদি সমাজকে মেনে চলে এবং নিজের স্বাভাবিক গতিকে না মানে তাহলে সমাজ হয় ত রক্ষা পেতে পারে কিন্তু উপভাস রক্ষা পায় না। উপভাস লিখতে হলে কতকগুলো লোক, স্থান আর অবস্থার অবতারণা করা দরকার, এটা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না। এর মধ্যকার কোনো কোনো মানুষ নিতান্তই যদি সমাজের চক্রে বেরাড়া বোধ হয় কিংবা তাদের অবস্থা যদি সমাজের ঠিক মনের মত না হয়, তাহলে আর কি করা যাবে? সমাজের মধ্যেও তেমন বড় মানুষের অসম্ভাব নেই এবং সমাজ তাদের যেমন-করে সহ্য করে, উপভাসেও ঠিক তেমন-করে তাদের সহ্য করা যেতে পারে। সমাজ থেকে যখন বেরাড়া মানুষ তাড়াতাড়ি পার-নি তখন উপভাস থেকেও পারবে না। তবে কেউ-কেউ বলতে পারেন, উপভাসের মধ্যে এমন মানুষ রাখবার দরকার কি? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যিনি দরকার মনে করবেন না তিনি তা রাখবেন না; যিনি দরকার বুঝবেন তাকে রাখতেই হবে। দরকার নেই একথা যতক্ষণ

না প্রমাণ হবে যাচ্ছে ততক্ষণ দরকারকে অস্বীকার করি কি-করে? কিন্তু এসব তর্ক নিয়ে উপভাসের বিচার নয়— উপভাসের বিচার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। যারা উপভাসকে উপভাসের দিক দিয়ে দেখেন না সমাজের দিক দিয়ে দেখেন, তারা সমাজের হিতকারী হলেও সাহিত্যের পক্ষে যে অপকারী সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

যারা এই-সব উপভাসের কবল থেকে সমাজকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন তাঁদের মুক্তিটা কি-রকম, একবার যাচাই-করে দেখা যাক। “রবীন্দ্রনাথের ছুটি উপভাস” নামে একটি প্রবন্ধ সম্প্রতি একখানি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে; লেখক বলছেন, “আজকাল স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতেছেন—তাহা ভাল কি মন্দ বলিব না—এখানে তাহা আলোচনার বিষয়ও নহে। বাঙ্গলা ভাষার লিখিত উপভাসাদি তাহারাই পাঠ করেন। বহুবিধা বিবস্ত্রকে যে গরল আনিলেন তাহাতে নিজের কোন ঘেহ-ভালমের নাকি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল।” বিবস্ত্র পড়ে যদি কোনো মহিলা বিধবান করে থাকেন, তবে তাঁর প্রতি ভগবানের কিছু অহুগ্রহ-বৃষ্টি আছে বলতে হবে; কারণ বিবস্ত্র পড়বার আগে কিংবা পরে অস্ত্র কোনও পুস্তক-বর্ণিত বর্ণনা পড়ে তিনি যদি আর কোন পদ্য-অঙ্কলখন করতেন, তাহলে সমাজকে বিধবান অপেক্ষা অধিকতর গুরু আঘাত ভোগ করতে হ’ত, সন্দেহ নেই। পূর্বোক্ত

প্রবন্ধ-লেখক আবার বক্তৃতির ধরে সাক্ষাৎ
গেয়েছেন—“বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই দেবী-
চৌদুরাণীতে বক্রিমবাসু সপ্তমী ধরেও নিকাম
ভাবে ক্রতপে থাকা যায় সেই চিত্র দেখাইয়া
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।” তা যদি সত্য
হয় তবে বক্রিম স্বামীরা যারা ত্রীর পদসেবা,
গৃহস্থ-কল্লার ডাকাতি-ব্যবসা প্রভৃতি
সংখ্যাতীত ব্যাপার সংঘটিত হতে দিলেন
কেমন করে, এ বোঝা শক্ত। বক্রিম যে
অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন-নি তার
অনেক প্রমাণ তাঁর সৌভাগ্য থেকেই দেখা
যেতে পারে। আর সত্যই যদি তাঁর
প্রায়শ্চিত্ত করবার মতলব হ’ত তাহলে তাঁর
বিষয়বস্তুর গায়ে আগুন দিই যে তার অস্তিত্বও
তিনি নিশ্চয় লোপ করে যেতেন। যারা
এইভাবে বক্রিমকে বিচার করেন, বক্রিমের
রচনার প্রতি তাঁদের যে কতদূর প্রভা তা
তাঁদের উক্তি থেকেই ধরা পড়ে। এই
ভাবে বিচার করলে শুধু বক্রিম বা রবীন্দ্র
কেমন, অগতের সমস্ত সাহিত্যকে ভূয়ানলে
পুড়িয়ে ফেলতে হয়। কারণ, কোনো বইই
নীতি বিশারদদের মাপকাটিতে মেলে দেখলে,
নিখুঁত হবে না। এঁদের যুক্তি যদি গ্রহণ
করা যায় তাহলে এই কথা বলতে
হয় যে, পৃথিবীতে আর মানুষ নেই,
সমাজ নেই। কারণ মানুষ কিংবা সমাজের
অস্তিত্ব লোপ করবার যতগুলি অস্ত্র আছে
অর্থাৎ খুন, আত্মহত্যা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি,
এ-সমস্তই পুতকে পড়ে পড়ে, মানুষ তারই
দ্বারা এতদিনে নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে গেছে।
কোনো দুর্বল-দুঃখ কি দুর্বল-মস্তিষ্ক পাঠক-
পাঠিকা যদি বই পড়ে কোনো অপকর্ম

করে বসে, তাঁর মস্তকি বই লেখা বন্ধ
করতে হবে? দুর্বল পাঠকের অপকর্মের
মস্ত দাবী বই নয়,—তার নিজেরই দুর্বলতা।
সাহিত্যকাররা এখন চিকিৎসক নন, তখন
তাঁরা পাঠকের জদই-পরীক্ষা করে তাঁদের
উপযোগী পুঁথি তৈরি করতে অপারগ,
এ-কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

সমাজে আঘাত লাগছে বলে আজ এই যে
তারপরে চীৎকার উঠছে, এটা সত্য কি-না
সে-বিষয়ে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।
আমাদের মনে হয় ব্যক্তিগত মতে আঘাত
লাগলেই জনকতক লোক হেঁ-হেঁ করে ওঠেন,
—হায়, সমাজ একেবারে গেল! সমাজের ধরে
তাঁরা যে-সব যুক্তি বাড়ান করেন সেগুলিও
নিতান্ত ছেলেমানুষী। সমাজের শাসন
মেনে যদি সাহিত্যকে চলতে হ’ত, তাহলে
শিশুশিক্ষার প্রথম নীতি “সদা সত্য কথা
বলিবে” ও “চুরি করা মহাপাপের” উপর
সাহিত্য কোন কালেই এক ইঞ্চিও উঠতে
পারত না; কেবল নীতি ও ধর্ম ইত্যাদির
আগড়ে আটেপুটে বেঁধে রাখলে সাহিত্য
কখনও বড় হ’তে পারে না। সাহিত্যই
সমাজকে পথ দেখায় ও উন্নতির পথে টেনে
নিয়ন্ত্রণ করে। কোন সামাজিক রীতি এখন
সাহিত্যকে বলতে থাকে, তোমার অভ্যাসে
আমার তিষ্ঠানো দায় হয়েছে তখন সাহিত্য
বলে যে, তোমাকে তাড়ানোই আমার উদ্দেশ্য
—সুতরাং তুমি এখন মানে মানে পথ দেখতে
পার। Oscar Wildeএর একটা বচন আছে,
“যে রচনা সমাজের লজ্জার কথা প্রকাশ
করে সমাজ সেই রচনাকে গালাগালি
দেয়।”

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্র ও বঙ্কিমের উপগ্রাস, বা সাহিত্যের পরম সম্পদ বলে গণ্য হয়েচে, তাকে অন্নীল, সমাজ-বিশ্রোধী বলে তেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য-হিসাবে অতি নগণ্য এবং অন্নীলতার ও ভূমিতিতে একেবারে লঘু এমন উপগ্রাস বাংলা সাহিত্য ছেয়ে ফেললেও তাদের প্রতি সমাজের এই-সমস্ত নীতিবিশারদদের দৃষ্টি পড়ছে না! সাহিত্যের দ্বারা সমাজের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে ত এই সব বইয়ের দ্বারাই তা হয়েছে। অন্য আঘাত করতে হয় ত, এদের প্রতিই তা করা উচিত। কারণ, ও-সব বই শুধু সমাজ নয়, সাহিত্যেরও রীতি-নয় নষ্ট করচে। এর উপরে আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধবোধবাণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই সমাজের ধার ধারতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের কোনোই ধার ধারেন না—কারণ, তাঁদের যে সাহিত্য-রচনার ক্ষমতা আছে কিম্বা তাঁরা যে সাহিত্য-রসের রসিক, এ পরিচয় এখনো নেন-নি। বৈরসিক এবং অসাহিত্যিকের গুণগোলে বেচারী রস-পিপাসুদের প্রাণ গুঁটাগত হয়ে উঠেছে।

মানুষের মন যে কারাগার হয়ে বেড়ায়, সমাজ লক্ষ কাঁধ পেতেও সেখানকার একটা দ্বারও খুলতে পারে না, অথচ সমাজকে আঘাত করবার বড় বড় অস্ত্র সেইখানকার কারখানাতেই তৈরি হয়। মানুষের কাজকর্মের অবকাশ

দিয়ে সেইখানকার এক-আধটা তীব্র এসে সমাজের গায়ে লাগলেই, খোঁচার চোটে সমাজ প্রথমটা তুড়িলাক খেতে থাকে। ক্রমে তার এমনি ছাল হয়ে ওঠে যে, সমাজ আর সে-রকম আঘাতকে আঘাত বলেই মানে না। চিন্তা-রাশ্মির স্বরূপ-মূর্তিকে ধরে আনতে পারে, এক সাহিত্য। কবির চিন্তা এখন সাহিত্যে মূর্তি ধরে সমাজের সামনে এসে দাঁড়ায়, সমাজ তখন মোটামুটি তাকে ছ-রকমে উপভোগ করে; একদল, বারা রচনাটা পড়েই আনন্দ পায়, তার ভিতরকার অর্থ গ্রহণ করতে তারা চায় না,—এরা হচ্ছে একরকম নির্ধিরোধী, একটু আনন্দ পেলেই বস্ত্রে গেল। এ আনন্দের উৎপত্তি কোথায়, অত খুঁটিনাটির ভিতর তারা ঢুকে চায় না। আর একদল আছে,—যারা কবির মনের ভাব খোঁজবার চেষ্টা করে, সেই কাব্যের মধ্যে আপনাতঃ চিন্তকে অহুত্ব করে, এবং তাতে যে আনন্দ পায় সে আনন্দের উৎস কোথায়, সেটাও তারা খুঁজে বার করে। এ-প্রশ্নটির পাঠকরাই সমালোচক হবার উপযুক্ত। আমাদের সমাজ এখন এমন-একটা তে-মাধার মোড়ে এসে দাড়িয়েছে যে, যেখানটাতে পথ দেখাবার লোক নেই অথচ কোন-একটা পথে চলতে গেলে পথ রোধ কর্তার লোকেরও সম্ভাব নেই। এমন একটা সাহিত্যের এখন নিত্যন্ত প্রয়োজন, যে আলো হাতে করে আমাদের জাতীয় সমাজকে তার এই জীবন-সঙ্কটে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কানে বঁ বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছেন,

সেটাকে, হেতু ও বৃত্তি দিয়ে তার
 স্রম প্রতিপন্ন করে' যদি কেউ অস্ত
 পং দেখিয়ে দিতে পারেন ত তিনি অগ্রসর
 হোন, তাতে বরং একটা সমস্তার সমাধান
 হবে; কিন্তু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বিবৃদ্ধ সমালোচনা
 করতে প্রবৃত্ত হন তাঁরা এখানে নামমাত্র
 সমালোচনা করে' তারপর তাঁকে
 ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। সমালোচনার
 এমন উদ্ভট পদ্ধতি সাহিত্য-সম্প্রদায়

নয়ই, উল্টে এটা সমাল-বিবৃদ্ধ অন্তর্ভুক্ত।
 স্বাভাবিকভাবে গালাগালি দেওয়াই যদি এই
 সব সমালোচনার উদ্দেশ্য হয় তবে সমাল-
 শিল্পীকে সম্মুখে রেখে তার পিছনে প্রবেশ
 থেকে এমন বাণ বর্ষণ করবার দরকার
 কি! গালাগালি-পূর্ণ ছাওবিল রাত্তার বিলি
 করলে এর চেয়ে ভালো ফল পাওয়া
 যাবে বলে বোধ হয়।

ঐশ্রম্যহীন আতর্ষী।

স্বপ্ন-সুন্দরী

(ওয়াসিংটন আরভিং হইতে)

ক

করাসী-বিপ্লব তখন পুরাণমে চলিতেছে।

নিকুম রাজি—চারিদিকে ঝোড়ো হাওয়া
 হাঁকিয়া-হাঁকিয়া ফিরিতেছে! আকাশের
 কালো বৃকে অগ্নিময়ী সর্পীর মত বিদ্রোহের
 সীলা! এবং ঘন-ঘন বজ্রমাগে বৃষ্টিধৌত
 সহরের সমস্ত ঘর-বাড়ী-রাস্তা কনক-
 বাজিরা উঠিতেছে।

এমন বিষম ঝড়-জল মাথায় করিয়া
 একটি বুঝা প্যারীর নির্জন পথে বাড়ী
 ফিরিতেছে। এই বুকের বিষয়ে আগে
 কিছু বলা দরকার।

এর নাম উল্ফ-গ্যাস—জাতিতে জার্মান।
 বিপ্লবের শেষমুখে সে প্যারী-সহরে আসিয়া
 একটি বাসা ভাড়া করিয়া আছে।

উল্ফ-গ্যাসের লেখাপড়ার ব্যতিক্রম ছিল
 বড়ই বেশী। প্যারীর বড়বড় পুস্তকালয়ে,
 দেকেলে লেখকদের লেখা পুরানো

পুঁথিরাশির মধ্যে সারাদিন সে বিভোর
 হইয়া বসিয়া থাকে। এই পড়ার ব্যতিক্রম
 ছাড়া সংসার-সমাজের আর কোন-কিছুর
 ধার সে ধারিত না। সে নির্জনতা
 ভালবাসিত, লোকজনের সঙ্গে তেমন
 মেলা-মেশাও করিতে পারিত না।

আপনার চারিদিকে এই যুবক ছাত্রটি
 এক কাল্পনিক জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল।
 কেন জানিনা, কেমন-করিয়া তাহার মাথায়
 একটা ধারণা গাড়াইয়া গিয়াছিল যে,
 কোন কু-আখ্যার দৃষ্টি তাহার উপরে
 পড়িয়াছে,—তাহার কবল হইতে মুক্তির
 কোনই উপায় নাই! এই উদ্ভট ধারণা
 তাহার নিঃসঙ্গ জীবনকে তারবহ করিয়া
 তুলিয়াছিল। স্থান-পরিবর্তনে হরত কোন
 উপকার দর্শিতে পারে—বন্ধুদের এই পরামর্শে
 মেশ ছাড়িয়া সে প্যারীতে আসিয়া
 হাজির হইয়াছে।...

উল্কাগাঙ্গ মুখচোমু ও অমিত্তক
হইলেও, রমণী-রূপের তারিক করিতে
অনিমিত্ত। আপনার নির্জন ঘরে বলিয়া সে
কমনার যত্ন নেশার মঙ্গল হইয়া
থাকিত,—তাহার চোখের সুখ দিয়া
চেনা-অচেনা কত সুখী মুখের ছবি
একে-একে ভাসিয়া যাইত। তাহার
কমনার রূপসে সে মুখগুলির আদর্শ এতটা
উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাস্তব তাহার
কাছে কোথায় লাগে! তাহার মনের যখন
এমনি প্তিক, তখন হঠাৎ একদিন সে
স্বপ্নে দেখিল, এক পরমা সুন্দরী তরুণীকে!
এই স্বপ্নটাই রূপসীর রূপ ছিল এমনি
অপূর্ণ, যে আগরপেও সে আর তাহাকে
ভুলিতে পারিল না!... ..দিনের পর দিন
যায়, কিন্তু শরমে-স্বপনে আহারে-বিহারে সেই
সুন্দরীর সুখী মুখের স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলিতে
পারিল না—সে মুখের মোহ যেন ক্রমেই
তাহাকে পাপল করিয়া তুলিল!—

সেদিন বড়ের হাতে বিজন পথের পশ্চিক
হইয়া উল্কাগাঙ্গ যখন বাড়ী কিরিতেছিল,
তখনো তাহার মন সেই স্বপ্ন-সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যেই বিভোর হইয়া ছিল!

—খ

চলিতে-চলিতে উল্কাগাঙ্গ সহরের
বে-দিকটাতে আসিয়া পড়িল, সেদিকটাতে
কয়েকদিকের গ্রাণধা হর।

নিকটে সোপার কবের মত, অধার হুঁড়িয়া
হঠাৎ বিদ্যায় বকিয়া উঠিল—সেই রূপগ্রস্তার
উল্কাগাঙ্গ সত্তরে দেখিল, সাবনেই বধমকের
উপরে, বাসুকের মাথা-কাটিবার বস্ত্র—
গিলোটিন পাড়াইয়া রহিয়াছে! বিদ্রব তখন

চরমে উঠিয়াছে এবং এই গ্রাণধাতী তরানক
যত তখন প্রতিদিন শত-শত* অস্তাগাকে
গ্রোগ্রাসে গ্রাস করিতেছে! সেইদিনেই এই
বধমকের উপর দিয়া বাসুকের রক্তধারা
জোড়ের মত অবাধে বহিয়া গিয়াছে!
দিনের আলোর সঙ্গে আবার কখন নুতন
বলি আসিবে, বেন সেই আশাতেই উদ্গ্রীব
হইয়া, এই বুধস্ত সহরের মাধ্যমানে রক্ত-
তৃষিত গিলোটিনগুলো শুকুভাবে সার
বাধিয়া হা-করিয়া পাড়াইয়া আছে!

উল্কাগাঙ্গের গ্রাণ বেন হৃদয়ের ভিতরে
বসিয়া গেল! শিরিরা, তাড়াতাড়ি
সে অস্ত-মুখে কিরিতে যাইতেছে, এমন
সময়ে দেখিতে পাইল, বধমকের সিঁড়ির
উপরে অডোপডো হইয়া ছায়ার মত একটি
বেহ বসিয়া রহিয়াছে!

বিদ্যাতের পর বিদ্যায় চমকিতে লাগিল!
বে বসিয়া আছে, সে রমণী—পরপে
কালোরঙের কাপড়। সামনে হুঁকিয়া
হুইহাতের ভিতরে সে মুখ ঢাকিয়াছে—
তাহার দীর্ঘ, এলমেলো চুলগুলো বৃষ্টির মলে
ভাড়াইয়া মাটির 'পরে লুটাইতেছে।

উল্কাগাঙ্গ থমকিয়া পাড়াইয়া পড়িল।
হরত এ অস্তাগীর কোন গ্রাণের আত্মীয়
আজ এখানে পৃথিবী হইতে চিরবিদায়
লইয়াছে, তাই এই ঝড়-বৃষ্টির অশান্ত
রাতও সে শোকের আবেগে এই তরানক
স্থানে পাপলিনীর মত ছুটিয়া আত্মিয়াছে!
এ-সময়ে অনেক রমণীর রমণীর মুখও বে
গিলোটিনের পাড়ের চাপে বেহ হইতে
*বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সে কথাও তাহার অজ্ঞান
ছিল না।*

উল্কাগ্ন্যঙ্গ জুপা আগাইয়া গিয়া কোমল স্বরে আন্তঃ-আন্তে স্রোতোকটিকে ডাকিল।

সন্ধ্যাবেক মুখ তুলিয়া, রমণী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল,—সে দৃষ্টি সূত্র, কিন্তু কী তোর!

এ কি! বিছাতের আলোকে এ যে তাহার সেই স্বপ্নস্বন্দরীর মুখ আগিয়া উঠিল! হ্যাঁ,—ঠিক সেই মুখ! উল্কাগ্ন্যঙ্গ ইহার মত প্রস্তুত ছিল না—সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল!... ..

সেই পাণ্ডুর, বিষম—অঞ্চল অসীমস্বন্দর মুখের দিকে স্থিরচোখে তাকাইয়া উল্কাগ্ন্যঙ্গ আবার বলিল, “এমন বড়-বামলে, এত রাতে আপনি এখানে কেন?”

তরুণী নীরবে গিলোটিনের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

—“চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করে’ আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌছে দিচ্ছি।”

—“আপন বলতে আমার কেউ নেই!”

—“কিন্তু আপনার বাড়ী আছে ত?”

—“হ্যাঁ।”

—“কোথায়?”

—“কবরে!”

উল্কাগ্ন্যঙ্গের প্রশ্ন সে অভাগীর হৃৎকেন্দ্রে যেন গলিয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে বলিল, “আমি অচেনা বলে আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে বন্ধুর মত আমার বাড়ীতে আসুন। আমি এ সংসারে একলা বিদেশী।”

• •

সেই গৃহহীনা স্বন্দরী উল্কাগ্ন্যঙ্গের সরল মুখ দেখিয়া বোধহয় তাহাকে

বিশ্বাস করিল। কাগজ, সে তবনি জিহ্বা তাহার পাশে আনিয়া ধাড়াইল।

গ

তরুণীকে সঙ্গে-করিয়া উল্কাগ্ন্যঙ্গ তাহার বাগাবাড়ীর ঘরের ভিতরে লইয়া আসিল। তাহার বরখানি শাবাসিধে—সাজগোছের লাকলমক তাহাতে একেবারেই ছিল না।

ঘরে আলো জ্বালা হইলে পর, উল্কাগ্ন্যঙ্গ তাহার সরিনীকে ভাল-করিয়া দেখিবার স্রোযোগ পাইল। বাস্তবিক, তেমন রূপ সহজে চোখে পড়ে না! কাগজের ভিতর হইতেও তাহার হাড়োল পড়নট সূটরা উঠিতেছিল। তরুণীর চোখজুটি উজ্জ্বল ও ডাগর,—তবে দৃষ্টিতে এমন-একটা আশ্চর্য্য প্রবর্তা আছে, যা দেখিলে মনটা কেমন দমিয়া যায়! তাহার সান্ত্বনোহে আর কোন গহনা ছিল না... .. গলার হীরা-বসানো, চওড়া ও কালোরেঙের বকনটি ছাড়া।

উল্কাগ্ন্যঙ্গ এখন এই-বড় মুন্ডিলে পড়িল যে, এত রাতে দুবতীকে সে কোথায় শুইতে দিবে! শেষটা ঠিক করিল, দুবতীর মত তার নিজের বিছানা ছাড়িয়া দিয়া, আলকের রাতটা সে অস্ত্র-কোথাও গিয়া ফাটাইবে। কিন্তু বাই-বাই করিয়াও বাইতে তাহার পা উঠিতেছিল না, এই আত্মরহীনা অপরিচিতা স্বন্দরীর রূপের কুহকে সে একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিল।

দুবতীর ভাষ-ভঙ্গীতেও একটা পরিবর্তন আসিয়াছিল। গিলোটিনের কোন প্রসঙ্গই সে আর তুলিল না—তাহার মুখের উপর হইতে শোকের ছায়াও সরিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া দুবক-ছাত্রটি বেমন মুগ্ধ,

যুবককে দেখিয়া সেও যেন তৈর্মনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে! উল্কাগ্যাস তাহাকে যে আদর-দত্ত করিতেছিল, যুবতী যেন প্রাণবন্দিয়া তাহা উপভোগ করিতেছিল!

মনের আবেগ এখন আর কোনমতে বাগ্-মানিল না, উল্কাগ্যাস তখন আপনার হৃদয়কে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। যুবতীকে সে তাহার বিভিন্ন স্বপ্ন-দেখার কথা বলিল এবং জানাইল যে, চোখে দেখিবার আগে, স্বপ্নেই সে তাহাকে ভাল বাসিয়াছে!

যুবতী একটু চকল হইয়া উঠিল। তারপর মুহূর্ত্তের বলিল, “কেন জানিনা, আপনাকে যেহে আমারও মন যেন কেনন হয়ে গেছে!”

উল্কাগ্যাস উৎসাহিত হইয়া বলিল, “তবে আর আমাদের মিলনের বাধা কি? জীবনে-মরণে আমি তোমার!”

যুবতী হঠাৎ গভীর হইয়া ভীতসৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল,

“জীবনে-মরণে?”

—“জীবনে-মরণে!”

—“তবে, আমিও তোমার”—বলিতে বলিতে যুবতী, তাহার বৃক্কে চলিয়া পড়িল। আবেগে তাহার ছইচোখ ঢুলিয়া আসিল।

উল্কাগ্যাস যুবতীকে চেয়ারের উপরে বসাইয়া তাহার যুগ্মে প্রণয়ের প্রথম চূষন-রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর যুবতীকে বিজ্ঞানের স্বেদে দিবার অস্ত্র অধীর আনন্দে ঘর-ছাড়িয়া রাস্তার বাহির হইয়া গেল।

সারারাত্ত্র স্নেহের উত্তেজনার মাতিয়া

সহরের পথে-পথে সে আনন্দে দুরিয়া বেড়াইল; তারপর, উষার প্রথম আলোকে আকাশ এখন হাসিয়া উঠিল, তখন আবার, বাড়ীর পথে ফিরিল।

এর মধ্যে তাহার একবারও মনে হইল না যে, প্রথম আলোশেই এই অপরিচিতা যুবতী যে-ভাবে তাহার কাছে প্রেমস্বীকার করিয়াছে, তাহা কতটা অস্বাভাবিক!

খ

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া উল্কাগ্যাস দেখিল, চেয়ারের উপরে একখানি হাত রাখিয়া, যুবতী উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

সে তাহাকে ডাকিল, কিন্তু সাড়া পাইল না। তাহাকে -জাগাইয়া দিতে উল্কাগ্যাস আন্তে-আন্তে যুবতীর একখানি হাত ধরিল;... ..কিন্তু ধরিয়াই, বিদ্যুতাহতের মত সে হাত ছাড়িয়া দিল!

এ কি! এ যে মড়ার হাত! সে সত্তরে দেখিল, যুবতীর মুখ মলিন ও রক্ত-হীন! তাহার মেহে প্রাণ নাই!

উল্কাগ্যাস আঁৎকাইয়া পিছনে হঠিয়া আসিল। তারপর চীৎকার করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া তখনি সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি পুলিশও ডাকিয়া আনা হইল।

পুলিস-মরোয়া ঘরে ঢুকিয়া লাশ দেখিয়াই কেমন-বেন গুস্তিত হইয়া গেল। বিস্ময়িত চোখে শবের দিকে চাহিয়া সে আশ্চর্য্য করে বলিল, “এ কি ব্যাপার! এ লাশ এখানে? এল কি-করে?”

উল্কাগ্যাস আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি এঁকে চেনেন?”

—“বল কি, এ প্রীলোকটিকে বেলাল
গিলোটিনে কেটে ফেলা হয়েছিল!”—এই-
বলিয়া দারোগা সামনের দিকে ছ পদ
আগাইয়া আসিল। তারপর, যুবতীর হীর-
বসামো গলাবন্ধটি টান-মারিয়া খুলিয়া
দিল—শবদেহের মাথাটি অমনি তাঁটার মত
একদিকে গড়াইয়া গেল।

চেঁচাইয়া ‘উঠিল, ‘পেরী! আমার ঘাড়ে
পেরী চেপেছে! আর আমি বাঁচব না!’
সকলে বিছাই তাহাকে সান্থনা দিতে
লাগিল—কিছুতেই সে শ্রবোধ মানিল না;
তাহার দৃঢ় ধারণা হইল, কোনো শ্রেষ্ঠাত্মা
ঐ যুবতীর মৃতদেহে ঢুকিয়া, তাহার কাছে
আসিয়াছিল।...

উল্কাগাম পাগলের মত বিকটস্বরে

কিছুদিন পরে পাগলা-গারবে তাহার
মৃত্যু হইল।

শ্রীমতী রেণু রায়।

হিম্মোল-বিনাস

প্রাণে মনে হিম্মোল

বনে বনে হিম্মোল

মুখে মুখের বোল মৃদু-মহর;

প্রাণপেরি ছন্দে

কদমেরি গন্ধে

আয় তুই চকল! চির-অন্দর!

নিশাসে কি সৌরভ!

কালো চুলে মেঘ সব!

পশ্চিম পশ্চিম রূপ ধন গো;

কালো চোখে বিজ্ঞান

কোনোখানে নেই ধ্বংস

অদ্বিত! অদ্বিত! তুই স্বর্গ!

আরো কাছে আয় তুই

কালো চোখে চোখ খুই

ভুলে থাকি দিন-দুই ছনিয়ার সব,

গুপ্ত হাসি আর গান

গুপ্ত সারঙের তান

ভালোবাসার প্রাণ—গুপ্ত উৎসব।

কে গেছে কে যায় আর

অতলত ভাবনার

সুখসুখ নেই আর নেই, বহু!

তুমি আছ এই খুব

ধ্যানের ধরে ওই রূপ

জয়পুর চিত্তের সব তত্ত্ব।

এ মিলনে, অক্ষর

মেশে যদি খান্ধ সুর

কি হবে তা? হয় বা কি ভেবে বিস্তর?

কেরা শুঁড়ি তবে মাখ্

তুলে নে রে লাখে লাখ্

জুই ফুল বিলকুল চুলে তুই পর।

আমি দেখি তুমি

চেরে চেরে মন্থর

শত তারা যাক হেসে লাখ্ ইন্দু;—

যদিও এ বায়লায়

খিকি-ডাকা কাজলায়

নেই চাঁদ জোয়ার নেই বিন্দু।

শ্রীমতী রেণু রায়।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিরাছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্য্যন্ত বজা বহিরা' বার, পথিকের জুতাভোড়াটা ছাতার মতই শিরোধার্য্য হইয়া ওঠে, এবং অস্বস্ত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রার যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় বাট বছর পার হইল। তখন বাম্প ছিল কলীর যুগের প্রধান বাহন, এখন বিভ্রাৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে; তখন পরমাণু-তত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদ্ভুত, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের পিপড়ার মত মানুষ আকাশে পাখা মেদায়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগ-বণ্টন লইয়া সরকারের মধ্যে মামলা চলিবে এটারি তার দিন গণিতেছেন; চীনের মানুষ একত্রাজে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাক্ষ্য করিল, এবং আপান কালসাপের এমন-এক বিপর্য্যয় লার্ক মারিল, যে, পলাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আভিধেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কংগ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের শব্দিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পথচারিকরে
ছন্দাপর সাত্তরি পার হবে?

আর আর যখন চোমকলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোকের কাছে ঝুলিয়া পড়িল—আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার রাগেণ, বতিভালাভাণ।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি হুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। বা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও, ক্ষণে ক্ষণে ঢমক লাগিল। বর্ষাও নামিয়াছে ট্রাম-লাইনের বেরান্দাও শুরু। বার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে জ্ঞানশাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্রামওয়ালাদের অন্তর শাস্ত্রে বেরান্দার আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন-কাটার সহযোগে যখন চিংপুর রোডে অলজোড়ের সঙ্গে জনজোড়ের দ্বন্দ্ব দেখিয়া মেহমন আর্জি হইতে লাগিল তখন অনেক দিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ করি কেন?

সহ না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একবার 'পাঁ বাড়াইলেই তা বোকা যায়। এতাই সহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তকাংটা এই, আমাদের সর ওদের সর

না। যদি চোরগণী রাস্তার পনেরো আনার হিসাব ট্রামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন সেৱামত এমন স্তম্ভের গণ-গমনে চলিত আশ তবে ট্রাম কোম্পানির দিনে আহাৰ রাস্তে নিভ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমাহুষটি বলেন, “সে কি কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্রামের রাস্তা সেৱামত হইবে না?”

“হইবে বই কি! কিন্তু এমন আশ্চর্য্য স্তম্ভ মেলাজে এবং দীৰ্ঘ মেয়াদে নয়।”

নিরীহ ভালোমাহুষটি বলেন—“সে কি সম্ভব?”

হা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হইতে পারে এই ভুল ভালোমাহুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক ভালে, এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া ছাৎকে আমরা সর্ব্বদা মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাংগার মত সেটাকে দেশের চারদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আগলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোন কর্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরানাতার বুকিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাখা বুড়িয়া অবশেষে বুকিল যে কাঁচটা জল নয়। তার ধরে সে বড় জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুকিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি আঙুলিতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা-চুকিবার ভরটা আমাদেরও হাড়মালে

জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমত্যা মারের মর্মেই বাহে প্রবেশ করিবার বিজ্ঞা শিখিল, বাহির হইবার বিজ্ঞা শিখিল না, তাই সে সর্ব্বদা সপ্তরবীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও ভগ্নিবার পূৰ্ণ হইতেই বাধা-পড়িবার বিজ্ঞাটাই শিখিলাম, গাঠ-খুঁলিবার বিজ্ঞাটা নয়; তারপর ভগ্নমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে হুক করিয়া চলা-ফেরাটা পর্য্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রখী আছে, এমন কি পৰ্ব্বাতিক পর্য্যন্ত, সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মাহুষকে, পুখিকে, ইসরায়েকে, গভাকে বিনাবাকো পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত, যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সম্মুখীয়ে উপস্থিত হইলেও কোনামতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতী চরমা পরিলেও না।

মাহুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্ৰে, নানা স্নোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা বে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই ভয় বে-দেশে মাহুষ আচারে আপনাকে আটপেটিটে বাধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এই ভয় নিজে পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে যখনই মোহাই দিয়া মাহুষকে নিজের পরে অপরিণীম অশ্রদ্ধা করিতে দেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার মন্ত সকলের চেয়ে বড় কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গান্ধীদেৱ

সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন—
“তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না,
অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া
চলিবে না।”

আর যাই হোক, মহু-পরামর্শের এই
আওহাদটা ইংরেজি গণ্যর ভারি বেহুয়
বাধে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই
সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা
বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয়
স্বাধীনকর্তৃত্ব না-পাওয়াটা যেমন। ভুল
করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে
পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নির্ধন নির্ভুল
হইবার আশার যদি নিরতুল নিশ্চয়্য হইতে
হয় তবে তার চেয়ে না-হয় ভুলই
করিলাম।

আমাদের বলিবার আরো কথা আছে।
কর্তৃত্বকর্মের একথাও স্বরণ করাইতে পারি
যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের ঘোঁড়ার
গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-ধাকিতে
বখন গোকর গাড়িতে ধরা হুক হইয়াছিল
তখন খাল-খসার মধ্য দিয়া ঢাকা-দুটোর
আর্ন্তনায়কিক অরক্ষার মত শোনাইত না।
পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল
কাকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক
নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে,
গোড়াগুড়িই ঈদরোয়ার-টানা পাকা রাস্তা
পায় নাই। কত ঘুঘাঘ, ঘুঘাঘুঘি, ধলাদলি,
অবিচার এবং অব্যবহার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া
হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাঝা, কখনো
গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদ-
ওয়ালাগণও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন-এক
সময় ছিল সমস্তেরা যখন জরিমানা ও

শাসনের ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত।
আর গলমের কথা যদি বল, কবেকার কালে
সেই আয়ারল্যান্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে
আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ
এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটামিয়া পর্যন্ত
গলমের লড়াই কর্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের
কর্দটাও নেহাৎ ছোটো নয়—কিন্তু সেটার
কথার কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে
কূবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুশীষ্টি
করে সেগুলো সামান্য নয়। জেহুসের
নির্ধ্যাতন উপলক্ষে ক্রানের রাষ্ট্রতন্ত্রে নৈমিক-
প্রাধান্যের যে-অস্ত্র প্রকাশ পাইয়াছিল
তাছাড়া রিপূর অকলঙ্কিত হইত হাত বেথা
যায়। এ সকল সবেও আজকের দিনে
এ-কথার কারো মনে সম্বন্ধ লেনমাত্র নাই যে,
আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ
ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটার, অস্ত্রায়ের
গর্তে বাড়-মোড় জাতিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি
করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছ-
মোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পাথর দুলিয়া
দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে আর
উপার্জননের চেষ্টার উপবাসী হইতে দেওয়াও
ভালো।

এর চেয়েও একটা বড় কথা আমাদের
বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্ম-
কর্তৃত্বকে কেবল যে সুব্যবস্থা বা পরিচর্য্য
জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আরতন বড়
হয়। কেবল পরোপকার, বা ছোটোবড়ো
সামাজিক শ্রেণীবিভাগে মনের মন বড়, রাষ্ট্রীয়
কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে
বড় পরিদ্রুত মধ্যে যেবিবার তারা সুযোগ
পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক

মাহুয মাহুয-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মাহুযবের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাতরঙ্গা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মাহুযের এই আত্মার ধর্মতা তার প্রাণনাশের চেয়ে চেয়ে বেশি বড় অমঙ্গল। ভূমিব স্রবং নামে স্রবমস্তি। অতএব ভুল-চূকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আবাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিবে না।

এই অবাবই সত্য অবাব। যদি না-ছোড়াগন্ধা হইয়া কোনো একদিকে মাহুয এই অবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সেদিক হইতে সে interned হইতে পারে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই অবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে ঘাটিল করি, যদি বলি, “তোমরা বল, দুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব যগজ্ঞটাকে অগ্রাহ করিয়া পৃথিটাকে শিরোধার্য্য করিবার জন্তই আমাদের নত-শিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড় অপমানের কথা আমরা মানিব না,” তবে চতীমতপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্তা তখনই সামাজিক internment-এর হুকুম জারি করেন। যারা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্ত পাখা কটপট করেন তাঁরাই সামাজিক গাড়ের উপর পা-ছটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আমল কথা, নোকাটাকে তাঁইনে চালাইবার জন্তও যে হাল, বাঁধে চালাইবার জন্তও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আরম্ভ করিতে পারিলেই সমাজেও মাহুয সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মাহুয সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিংপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গীর তফাৎ। চিংপুর একবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিং হইয়া রহিল। চৌরঙ্গী বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত-ছটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন বোগ আছে চৌরঙ্গী এই কথা মানে বলিয়াই অগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিংপুর তাহা মানে না বলিয়াই অগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উন্টাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘর-গড়া কুণো নিরমকেই সব চেয়ে বড় মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিরম আছে। নিজের চেষ্টার সেই নিরমকে ধল করাই শক্তিশাল্য, সমৃদ্ধিশাল্য, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত। ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানের নয়, বিশ্ববিধান—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে যুরোপের এতবড় যুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উন্টাইয়া দীর্ঘ-

নিষাদ ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছা কর্ণ। সেই কর্তৃটিকে,—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিষের দায়োগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্বতন্ত্র, বা ঈশ্বর, মনসা, ওলাবিবি, দক্ষিণদায়, মনি, মঙ্গল, রাহু, কেতু,—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেক্টর পাঠক বলিবেন—আমরা ত এসব মানিনা! আমরা ত বস্তুর টীকা লই; ওলাউঠা হইলে ঘরের ঘলের পিচ্-কিরি লইবার আরোহণ করি; এমন কি, মশা-বাহিনী মাগেরিয়াকে আছো আমরা যেহী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্ত কীট বলিয়াই গণ্য করি;—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মস্তুরা তাবিলটাকে পেটভরা পিলের উপর ফুলাইয়া রাধি।

মুখে কোন্টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ঐ মানার বিধে আমাদের মনের ভিতরটা লক্ষিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরচরব্যাপী অনিশ্চিত স্তরের উপর। অথও বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অথও বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনার বুদ্ধিটাকে আগেরভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। তার কেবলি বলে, কি জানি, কাজ কি! তার মিনিসটাই এই রকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনোএকটা ছিন্ন দিয়া তার ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বার্থকেই চুলিরা যায়,—যে প্রব আইন তাদের

শক্তির প্রব নির্ভর তারই উপর। চোখ বুজিয়া হুড়াল চালাইতে থাকে। তখন তার-রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেষ্ট্রিক রক্ষাকে তার চেয়ে বড় মনে করে,—এবং বিধাতার উপর টেকা দিয়া ভাবে প্রচার চোখের লগটাকে গারের কোরে আগুনানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লক্ষ্যের ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেইত বিশ্ববিধানের প্রতি অবিবাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিবা ছোটো লোভ, কিবা কাঙ্ক্ষা লোভা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অল্পভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাধি। বাতিবাত্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি—“কর্তার ইচ্ছা কর্ণ”—এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে সেনে অনেকগুলি দেশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের লোকলের ভাগ্যে সেই দেশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার অস্ত কেবলি ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে ধামকা একটা-না-একটা কর্তা হুড়িয়া ওঠে। তার এক-মাত্র কারণ, যে-দেশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বলে, খার ধার, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিও লইতে হাত বাড়ার কর্তার ইচ্ছার; ফিলে পাশ কিলে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হাঁকার

জল ফেলিতে হইবে, ক'চাত বেগের কুয়ার জলে স্নান করা যার, ডোকান ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে মরতার হাতের সুচিরই বা কি গুণ কটিরই বা কি, স্নেহের তৈরি মধুরই বা কি আর স্নেহের ছোঁয়া জলেরই বা কি, কর্তার ইচ্ছার উপর বরাং দিরা সে-বিচার তারা চিরকালের মত সারিরা রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাড়ে নোংরা খুঁট ডুবাইরা যে-জল বাসুতিতে লইরা ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি-মিঞা ফিল্টার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা ত তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা ত কর্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসংকার নয়, অস্বাস্থ্যসংকার পর্য্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর দলদলিয়ারা বাসের অতি সামান্য খাওয়া-ছোঁওয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে বারী কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্র-ব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় লক্ষ্যেচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ বৈবের কাছে, এতের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া উরে-ভরে কাটার। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া 'ছুটিয়া থাকে তাহা বাংলায় প্রাচীন মঙ্গল কাব্যে। ঠাধ সদাগরের মনের জাদর্শ মহৎ, তাই যে-সেবতাকে নিকট বণিরা কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুখে তাই

শক্তির কাছে তাকে চার মানিতে ছইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা জ্ঞান ধর্ম্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র বস্তুই যথেষ্টাচারী ততই সে ভরস্কর, ততই তার কাছে নতিস্বত্তি। বিশ্বকর্ষ্মের এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, আর তার মূলক ভার; প্রবলের অভি-চারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; চরকলের একমাত্র উপায় স্তবস্বত্তি, যুবদাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেব-চরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্র-তন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, 'ব্রাহ্মত্বাতো'র্ধান ব্রাহ্মণ্যে শাস্ত্রীভ্যোঃ সমাভ্যোঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান ব্রাহ্মত্ব, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাস্ত্র কালের। তাহা নিত্য-কাল হইতে এবং নিত্যকালের অন্ত বিহিত, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন খেগাল নয়। সুতরাং সেই নিত্য বিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্তৃকর দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে বস্তুই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইরা চলিব। কেন না, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একে-বারে ঠেকিয়া বাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই! এই নিত্য এবং ব্রাহ্মত্ব বিধানকে ব্রাহ্মত্ব রূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে যুরোপের মনে এত বড় একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে,

ম্যানেজরিমাকে বিদায়-কর্তৃত্বই, কোনো রোগকেই টিকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব আরের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে বে-কেহ অস্থিবে সকলেই নেহে মনে হুহ সবল হইবে এবং রাষ্ট্র-তয়ে ব্যক্তিব্যক্তির সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিষ্ঠাছিল, অবিষ্টাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিচায়। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এত বড় সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কি পরমাসক্ত ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারি না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে যুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তাড়ুও দুল কপাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিষ্টাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতার লইয়া বাহিতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে জন্মে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; জন্মে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে-মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তৎকাৎ করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা

সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশে বিজ্ঞান সঙ্গে অবিজ্ঞান একটা আপোস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মত উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মান্যমানে একটা ঘেরাল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে কর্ণে আচারে বিচারে বৃত্ত সঙ্গীর্ণতা, বৃত্ত স্থূলতা, বৃত্ত সূচুতাই থাকে উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলার বসিয়া জানী বলিতেছে, “যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে,” অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিকার কুলি তরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, “যে-বেটা সর্বভূতকে বৃত্ত-দূর সম্ভব তৎকাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা নাপিত বন্ধ,”—আর জানী আসিয়া তার মাথার পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল—“বাধা বাঁচিয়া থাক !” এই জন্তই এদেশে কর্ণসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্তই শত শত বছর ধরিয়া কর্ণসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার!

যুরোপে ঠিক ইহার উল্টা। যুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্রে কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোনো খুঁৎ দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এই জন্ত সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল

মাথাকে আশা দেয়, সাহস দেয়,—তাহার বিকাশ তত্ত্বময়ের কৃপাণের ঢাকা নহ, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিরাছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে বাধা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-দুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর-সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি, যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাদন হোক,—উপর হইতে যেমন-খুশি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুসিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁখে চাপাইলেই বোকা হইয়া উঠে, ওটাকে এমন-একটা ঢাকা-ওয়ালা ট্রেনাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পরি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্তব্য সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনার আমরা যে বোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্মে,—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তৃত্বভা, সেটা আমাদের পক্ষে নিত্য লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমরা ধর কাছে দেখা দিতেছে এটাও শুভলক্ষণ।

* সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ প্রভট

জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে-আত্মাভিমান আমাদের শক্তিকে মানুষের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি মানুষ, কিন্তু যে-আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটার আমাদের বলির পাঠার মত লাধিতে চায় তাকে বলি থিক্! এই আত্মাভিমান বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভার আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, “ধবধব, ধর্মতন্ত্রে, সমাজ-তন্ত্রে, এমন কি, ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তব্য হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না,—ইহাকেই বলি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরক হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে, আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিতৃর উপর এখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ল করিয়া বলিয়া উঠিল, “ওপড়াও ঐ বেত-বনটাকে!” ভুলিয়া গেছে বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই, বাঁশও নাই, আছে আপনার মধ্যেই, অপরাধটা এই যে, সত্যের জারগার আমরা কর্তাকে বানি, চোখের চেয়ে চোখের তুলিকাকে প্রজ্ঞা করাই আমাদের চিরাত্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ষোপে-কাড়ে বেত-বন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন একসময় রূপেও প্রবল ছিল।

তারই বেড়-জালটাকে কাটাতে যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লড়া করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের বৈপারনভা ইংরেজের পক্ষে একটা বড় সুযোগ ছিল। কেননা যুরোপীয় ধর্মতত্ত্বের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিজির টংলওর পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্মতত্ত্ব বলিতে যা বোঝায় ইংলণ্ডে আজো তার কোনো চিহ্ন নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু বড় ধরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। এক সময়ে যাদের কাছে সে মথ-নাড়া দিরাছে, স্তারে অস্তারে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জারগা, খোরপোষের জন্ত সামান্য কিছু মালহারা বসাদ। হালের ছেলেরা পূর্ন-মস্ত্রমত বৃত্তিকে হস্তায় হস্তায় প্রশ্রয় করে বটে কিন্তু মাত্র করে না। এই গৃহিণীর দাব-রাব যদি পূর্বের মত থাকিত তবে ছেলেমেয়েদের কারো আজ চুঁশক করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বৃত্তির শালন অনেকদিন হইল কাটাইরাছে কিন্তু স্পেন-এখনো সম্পূর্ণ কাটার নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে আঘাটার সে আপনার জরজর উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বৃত্তি বসিরাছিল, তাই আজ সে একে-বারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম ধমেই সে এতটা ঝোঁক দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার

কারণ কি? তার কারণ, বৃত্তিটা বহুবাহু ছিল তার কাছে চড়িয়া। অনেক দিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা যায়, যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাধা কিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্মবিদ্যাসও যেমন সনাতন প্রথা বাধা তার নৌ-যুদ্ধ বিভাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ ঢকল জল হাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বান্ধি-নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি তার কৌশল যেমনি থাকে সে ইংরেজ যুদ্ধজাহাজের সদ্য হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপথে কারো অধিকার ছিল না।

আজ যুরোপের ছোটোবড় যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিরাছে সর্বত্রই ধর্মতত্ত্বের আত্ম কর্তৃত্ব আত্মগা হইয়া মানুষ নিজেকে প্রজ্ঞা করিতে শিখিয়াছে। গণ-সমাজে যেখানে এই প্রজ্ঞা নাই—যেমন রাশিয়া—সেখানকার সমাজ বেগুয়ারিল ক্ষেত্রের মত নানা কর্তার কাটাগাছে জল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়ালা হইতে সেকালের পুঁথি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অস্তার খাননা আগার করে।

যেন রাধা দয়কার, ধর্ম আর ধর্মতত্ত্ব এক জিনিস নয়। ও যেন আন্তন "আর ছাই", ধর্মতত্ত্বের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর ঘোড়দৌ করিতে থাকে। তখন জেত

চলে না, মনকুহি ধু ধু করে। তার উপরে, সেই অটলতাটাকে লইয়াই মাহুৎ বধন বুক ফোলায় তখন গণ্ডন্তোপরি বিকটিকং।

ধর্ম বলে, মাহুৎকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বলে, মাহুৎকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নির্ধৃত করিয়া না নান' তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হানন করে। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নদান তুলিয়া দেয় সে পাপকে লাগন করে। ধর্ম বলে, অমুশোচন ও কল্যাণার্থের দ্বারা অস্ত্রে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরসিঁরি পায় হইয়া পৃথিবীটাকে বেধিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতত্ত্ব বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লজা করিয়া নাকে ধুও দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মাহুৎ বধার্থ মাহুৎ, সে যে-দেয়েই জমাক পুণ্ডরীক, ধর্মতত্ত্ব বলে যে মাহুৎ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক মাথার পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তি যত পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের যত পড়ে ধর্মতত্ত্ব।

আমি জানি একদিন একজন দ্বাজা কলিকাতার আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাত্রা তিনি কালেজে পাশ-করা মুশিক্ষিত।

অতিথি বসন, বেণী সারিয়া গাঁড়িতে উঠিবেন এখন সময় বাড়ি যার তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন—“আপনার মুখে পান!” গাড়ি যার তিনি ধারে পড়িয়া মুখের পান কেলিলেন, কেননা সারথী মুসলমান। এ কথা বিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই, “সারথী বেই হোক মুখের পান ফেলা যার কেন?” ধর্ম-বুদ্ধিতে বা কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া বসন্তের পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে-দেশের মাহুৎ অন্যায়ের বর্জন করিতে প্রস্তুত সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অস্ত্রাঙ্গি সংকার করিয়াছে। অথচ বেধি যারা গোড়ার কোণ ঘের তারাই আগার জল ঢালিবার মজ্জ ব্যত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশে এদেশে আশিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে উারা সেই-ভাবেই দেখেন একজন আটিষ্ট পুরানো ডাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে,—তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্থানবাসীর পক্ষের বর্ণনা হইতে কলিকাতার আসিতে গলাবানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেষ্ট্র ভাগ শ্রীলোক। ষ্টীমারের ঘাটে ঘাটে রেলোয়ের স্টেশনে স্টেশনে তাহদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্ভাগী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই

দিলেন। প্রঃ বাড়িতেই চলিল। এই
 যেহেতু মানব-স্বভাবের বেড়ার মধ্যে
 যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের
 সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট
 করিল এবং পরকালের সমস্ত চাক্ষর
 কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল।
 নিজের কাকের বাথাকে স্বাক্ষর বাক
 বাক গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং
 নিজের উন্নতির অন্তর্যাক্ষ আকাশ-পরিমাপ
 উচ্চ করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি।
 সত্যের জন্ত মাহুষ কষ্ট সহিবে এইটেই
 জ্ঞান। কাণ-বুদ্ধি কিবা খোঁড়া-শক্তির
 চাত হইতে মাহুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি
 সর ভাবে সেটা কুদৃষ্ট। কারণ, বিধাতা
 আমাদের সব চেয়ে বড় বে-সম্পদ দিয়াছেন
 —ভাগ স্বীকারের বীর্য—এই কষ্ট তারই
 বৈহিসারী বাজে খরচ। আজ তারই নিকাস
 আনন্দের চলিতেছে—ইহার অপের ফর্দটাই
 মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি • হাজার
 হাজার মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-
 পথ দিয়া নামে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে
 মাটিতে পড়িয়া একটি বিশেষী যোগী মরিল,
 সে কোন্ জাতের মাহুষ জানা ছিল না
 বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই-ত
 অগম্যে মেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু
 পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে জ্ঞান কি
 ইহার লোকসনে সঞ্চারে। যে-অন্ধতা
 মাহুষকে পুণ্যের জন্ত বলে দান করিতে
 ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা সুখের
 সেবার নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর
 দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল,
 কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের

চিরজীবনের তপস্কাকল হইতে তার সমস্ত
 আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে
 সুচ নিষ্ঠার নিরপিত্তর বিফলতা, বিধাতা
 ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা
 তাঁর দানের অবমাননা। পরাতীর্থে দেখা
 গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা না আছে
 চারিত্র, ধনী ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা
 চলিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে।
 সেই সময়ে তার ভক্তিবিকলতা ভাবকের
 চোখে জন্মের কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা,
 এই অপরিমিত বধ্যততা কি সত্য দ্বার
 পথে এই ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর
 করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবুত সে
 টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে
 পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ
 করিতই না, কিবা নিজের জন্ত করিত।
 সে কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মন্ত
 লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে
 কিবা নিজের জন্ত খরচ-করাটাকে সে ধর্ম
 বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের
 দাস্য হইতে তার মন মুক্ত থাকিত।
 মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি
 বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা
 যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো
 হইয়াছে, চোখ বুজিয়া চলিতে তার পা
 কাপে, অজ্ঞাত দাসের মত যে কেবল
 মনিবের ক্রান্তই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে,
 আপনি প্রভু হইয়া যেছার স্বাধীনতার
 জন্ত প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই অন্ধই আমাদের পাড়াপায়ে অর জল
 প্রাণ্য শিকার আনন্দ সমস্ত আজ তাঁটির মুখে।
 আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পরোপায়ী

উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ার ঝাণাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ার আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক কোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া হার হার করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, “নিজের মজুরী দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব। তারা ভাবিল পূণ্য হইবে ঐ সেখানে লোকটার, আর তার মজুরী ভোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি!” সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দশা, এর কারণ,—গ্রামের ষা-কিছু পুণ্ডরীক তা এ পর্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরং হয় বিধাতার পরে নয় কোনো আগন্তকের উপর। পুণ্যের উদ্দেশ্য যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোমাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোওয়া-বলা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা, বুড়ি এদের মনটাকেই আকস্মিক খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কলেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুদ্ধিতন্ত্রের গুণ গ্রাহিতহীন। ভারত-

বর্ষকে দশভদ্র ধাতোর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইহাদের তারি গর্ক—বলেন, ওটা বড় উচ্চ জাতিগা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না, বলেন, ঐ কাঁখে থাকিগাই আশ্চর্যের সম্বল হাতে ধরিলে বড় শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, গ্রামের পর গ্রাম, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; ঘমলোকের বত-গুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতের ডাকা করিলেও যেমন আমাদের অন্ন তুলিবার ক্ষম নাই তেমনি এই অমরলগ্নো লাফ দিয়া যখন বাড়ির উপর পাত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্ধুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেবাইবার অন্ন জ্ঞানের অন্ন, বিচার বুদ্ধির অন্ন। বুদ্ধির শাসনের প্রতি যাদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, “ঐ অন্নটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সাধারণ শিবিব এবং যতটা পারি খাটাইব।” অন্ন একেবারে নাই বলিলে অহুষ্টি হয় কিন্তু অন্ন-পাসের আইনটা বিঘ্ন কড়া। অন্ন ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর যোলানা, কোঁক। ব্যবহারের গতি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক হইলেই এত দুর্জয় কানদলা; সমস্ত গুরু পুরোহিত, তাগাতাবিজ, সংস্কৃত শ্রোত ও মেয়েলি মন্ত এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অন্নভাগের বন্ধুটা লইগাই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

বাই হোক, “পায়ের বেড়িটা অক্ষর হোক” বলিয়াই যখন আলীকাদ করা হইল

তখন 'ধরাতু' লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে, "মাহুষদের কাছে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও!" বতরাকোর জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, 'বলি' এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রে বাধ্যপ্রস্তু ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে সজ্ঞার করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়—তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্ত দল বাঁধো। কিন্তু চাই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্তের বড়া-ঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবহাৱ বিধাতার সহ হয় না!

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত যে হুং-দারিদ্র্য তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা প্রকার।

ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই, রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতত্ত্ব চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বৃকে শেল হানিহুছে এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাট। এই কথাই সরকারী বিভাগের আমরা সর্বদা বলিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগুঁজামিন পাস করি। এ-কথাটাকে এখন আমাদের কাছে হঠাতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাট।

কংগ্রেস বল, লীগবল, এসমস্তর মূলই এইখানে। যেমন দুরোপীয় সারাসে আমাদের

সকলেরই অধিকারটা সেই সারাসেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ রাষ্ট্রতত্ত্ব ভারতের প্রচার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশোজন ইংরেজ বলিতে পারে ভারতীয় ছাত্রকে সারাস শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভাল কিন্তু সারাস সেই পাঁচশো ইংরেজের কঠকে লজ্জা দিয়া বস্ত্রস্বরে বলিবে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমন হোক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, আমাদের গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ কর।" তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজার জন ইংরেজ রাজসভার মধ্যে বা ধবরের কাগজের স্তরে চড়িয়া বলিতেও পারে, যে ভারতশাসনতত্ত্বে ভারতীয় প্রচার কর্তৃত্বকে নানা প্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্তণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বস্ত্রস্বরে বলিতেছে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমন হোক তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, ভারতশাসনতত্ত্বে ভারতীয় প্রচার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ কর।"

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বোলায় খাটে না এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল, উচ্চতর জ্ঞানে ধর্ম কৰ্মে সূত্রের অধিকার নাই, এও সেই দ্রুতমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আপাগোড়া পাকা করিয়া ঠাঁবিধাছিল—যাহাকে বাহিবে পসু করিবে তার মনকেও পসু করিয়াছিল। জ্ঞানের

দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কৰ্মের দিকে ভালপাওয়া আপনি শুকাইয়া যায়। শূন্যের সেই জানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই—তারপর হইতে তার মাথাটা আপনিই হুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদ্যরজে আলিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আশাবাদের জানের দ্বার বন্ধ করে নাই,—অথচ সেইটেই শক্তির সিংহদ্বার। রালপুরুষেরা সেলন্ত বোধ করি মনে মনে আপুসোন্ করেন এবং আন্তে আন্তে বিভ্রালয়ের দুটো একটা আনন্দাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি,—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, স্রবিদ্যার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতই হয়।

ভারতবাসনে আমাদের স্তাষা অবিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মতোই নিহিত এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার অল্প বিস্তর দ্বন্দ্ব লড়া, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্বল অভ্যাসে বলিয়া বলি, কর্তার ইচ্ছা কৰ্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে স্রুগভীর নৈরাশ্র আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাওঁ ;—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাংহেব ভালো কিবা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মহিষভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মল সাংহেব ভারতগঠিব, হইলৈ হয় ত আমাদের স্রুদিন হইবে নর্যত

আমাদের তাঁরা এই বিভ্রাল 'বনেন' পিঙ্গা বনবিভ্রাল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্র, এর আশাবাদের মাটির তলার স্রুগন্ধের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিস্তার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বেষ্টকে বসাইয়া শক্তির বার্থতা স্রুটি করে। হয় উদ্ভাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না,— এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ রাষ্ট্রনৈতিতর মণে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড় সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বাৰ্প-পরতা, ক্ষমতাস্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহঙ্কার সমস্তই লীলা চলিতেছে, কিন্তু মাংসের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে, যেখানে আমাদের অস্ত্রেরও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্রলোভে লুক্ক, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ষ্ট্রীয়া বিবেচ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়, আমরা ার, আমরা ত্যাগী তপস্বী স্রদ্ধাবান, সেখানে মন্তপক্ষে বাছা মহৎ তাহার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়,—সেখানে অস্ত্র পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা ারী াই, বাহিরে না হইলেও অস্ত্রের। আমরা যদি ভীতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ গবর্নেন্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে চাইপক্ষ লইয়া করিবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে রেম দুর্বলতা। অস্রাঙ্কণ যখন জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের

অধঃপতনের। গভীরা তখনই পতীর করিয়া
ঝোড়া হইল। সবল দুর্বলের পক্ষে যতবড়
শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম-
বড় শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ
আমাকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা প্রায়ই
বল পুলিশ তোমাদের পরে অত্যাচার করে,
আমিও তা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু তোমরা
ত তার প্রমাণ দাও না।” বলা বাহুল্য,
পুলিশের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি কর
একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অস্ত্রাঘাতের সঙ্গে
লড়াইত পারের জোরে নয়, যে ত তেজের
লড়াই, সে তেজ কর্তব্যবুদ্ধির। দেশকে
নিরস্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য এক-
দল লোকের ত বুকের পাটা খাকা চাই,
অস্ত্রাঘাতের তারা আপনপে প্রমাণ করিবে,
পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি পুলিশের
একজন চৌকিদারও একজন ময়ূরমায়া নয়,
সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিশের
পেছাদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমার
গবর্মেণ্টের হাজার হাজার টাকা খরচ
হয়। অর্থাৎ আদালৎ-মহালমুদ্র পার হইবার
বেলায় পেছাদার জন্য সরকারী হীমার,
আর গরীব করিগরাদীকে তুকানে সীতার দিরা
পার হইতে হইবে,” একথানা কলার ভেলাও
নাই। এ বেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া
দেওয়া, বাপু, মায় যদি খাও তরে নিঃশব্দে
মরাটাই অতীব স্বাভাবিক। এর পরে
আর হাত পা চলে না। প্রেস্টিজ! ওটা
বে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক।
ঐ ত কর্তা, ঐ ত আমাদের কবিকল্পের
চণ্ডী, ঐ ত বেহলাকাব্যের মনসা, জ্ঞান ধর্ম

সকলের উপরে একেই ত পুষা দিতে হইবে,
নহিলে চাড় শুড়! চইরা বাইবে! শুভএব
বা মেবী রাজ্যশাসনে

প্রেস্টিজ-রূপেণ সংস্থিত

নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ

নমস্তস্তৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই ত অবিজ্ঞা, ইহাই ত মারা।
যেটা স্থলচোখে প্রতীতমান চইতেছে তাই
কি সত্য? আসল সত্য আমাকে লইয়াই
গবর্মেণ্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের
চেয়ে বড়। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী
—সেই বল আমারও বল। ইংরেজ
গবর্মেণ্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই
সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে।
আমি যদি ভীকু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের
নীতিতত্ত্বে আমার যদি প্রজ্ঞা না থাকে
তবে পুলিশ অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের
পক্ষে হুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেস্টিজ
দেবতা নষ্ট-বলি দাবী করিতেই থাকিবে
এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন
ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ কথার উত্তরে তিনি “রাষ্ট্রতন্ত্রে
নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে
পারমার্থিকভাবে বানা চলে কিন্তু
ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে,
অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ পরম-
পদ্ম—নয়ত প্রেস্ এজের সুখ-খাবার নীচে
পরম-নিঃশব্দ নরম পদ্ম!”

হাঁ, “বিপদ আছে বই কি,” তবু
জ্ঞানে, যু সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য
করিব।”

* . “কিন্তু আমাদের বেশের লোকেই জরে

কিন্তু লোভে স্ত্রীর পক্ষে সাফ্য দিবে না, কিছুই দিবে।”

এ কথাও ঠিক। তবু লভাকে মানিয়া চলিতে হইবে।”

“কিন্তু আনন্দের শেষের লোকেই প্রশংসা কিনা পুরস্কারের লোভে ধোপের মধ্য হইতে আমার মাথার বাড়ি মারিবে।”

“একথাও ঠিক! তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।”

“এতটা কি আশা করা যায়?”

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইচ্ছার একটুকুও কম নয়! গবর্মেন্টের কাছ হঠাৎও আমার বড় দাবীও করিব কিন্তু নিষেধের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড় দাবী করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবী চিকিৎসা না। এ কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্বল; কিন্তু সকল বড় দেশেই প্রত্যেক দিনই অনেকগুলি কারিয়া মানুষ জন্মেন যারা সকল মানুষের প্রতিনিধি— যারা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যারা সমস্ত বিকৃততার মধ্যেও যথাস্থানকে বিদ্যমান করেন এবং বার্ষিকতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্বে প্রান্তে অকণোদয়ের প্রতীকার আশিয়া থাকেন। তারা অবিখ্যাতীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোতের সঙ্গে বলেন— “শ্রমপাত্ত ধর্ম্মস্ত ত্রাহতে মহতো ভয়াৎ”— অর্থাৎ “কেবলম্বলে যদি শ্রমমাত্রও ধর্ম্ম থাকে তবে পরিধার দিকে রাশি রাশি ভুতরূপেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতবে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে

তাহাকেই মমদার—ভ্রীতিকে নয়, ভ্রীতিকে নয়! ধর্ম্ম আছে, অতএব মহা পর্য্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে কর ছেলের শত্রু বামো। দেহস্ত দূর হইতে শরৎ ইংরেজ সিভিল সার্জনকে আনিয়াছি। শরৎ বড় কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি ময় পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওয়ার মত বিষম ঝড়াকুড়ি লুফ করিলেন, রোগীর আত্মপুরুষ জাহি জাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব,—“দোহাই সাহেব, ভূত বাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।” তিনি চোখ রাতাইয়া বলিতে পারেন, “তুমি কে হে! আমি ডাক্তার নাই করিনা তাই ডাক্তারি!” ভয়ে যদি বুদ্ধি ধমরা না যায় তবে তাঁকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে “বে-ডাক্তারি তব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড় বলিয়াই জানি, তার মূলোই তোমার মূল্য।”

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড় জোর এই ডাক্তার সম্ভারেরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার বড়ই আফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পাত্রে না। এমন কি, রাগের দূখে সে আমাকে ঘৃণিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া পাড়ীতে বসার চেয়ে এই ঘৃণির মূল্য বড়। এই ঘৃণিতে সে আমাকে বত মারে, নিষেধকে তার চেয়ে বেশী মারে। তাই বলিতেছি, বে-কথাটা ইংরেজের কথা

নয় কেবলমাত্র ইংরেজ-আমলদেয় কথা, সে-
কথার যদি আমরা সার না নিই তবে আল
হুৎথ ঘটতে পারে কিন্তু কাল হুৎথ কাটিবে।

সেইসে বহুর ভারতে ইংরেজ-শাসনের
পর আত্ম এমন কথা-শোনা গেল, মাস্ত্রাজ
গবমেণ্ট ভালোমনে যাই করুক বাংলা
দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি কেলিবার
অধিকার বাঙালীর নাই এতদিন এই
জানিতাম, ইংরেজের অথও শাসনে মাস্ত্রাজ
বাংলা পাক্কাব মাস্ত্রা ভিতরে বাহিরে এক
হইয়া উঠিতেছে এই গোরবই ইংরেজ
সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেল-
জিয়ম ও ফ্রান্সের চর্গভিত্তিক আপন চর্গভিত্তি
মনে করিয়া ইংরেজ মুকুটে গ্রাণ দিতে
ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই
বার্তা, তখন সমুদ্রের পূর্বপারে এমন নীতি
কি একদিনো খাটিবে যে, মাস্ত্রাজের ভালো-
মন হুৎথ বাঙালীর কোনো মাথা-
বাধা নাই? এমন হুকুম কি আমরা রাখা
হেঁট করিয়া মানিব? একথা কি নিশ্চয়
জানিনা যে, সুখে এই হুকুম যত জোরাই
হাকা হেঁট অন্তরে ইহার পিছনে মন্ত
একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই
অস্ত্রাঘের গোপন লজ্জা আর "আমাদের
মহুযাঘের প্রকান্ত" লালস—এই দুয়ের মধ্যে
মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের
কাছে সন্তো বহু; ইংরেজ. হুরোপীর
সভ্যতার দারিদ্র বহিয়া এই পূর্ব দেশে
আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার
প্রতিশ্রুতি বাণী। সেই দলিলকেই আমরা
সব চেয়ে বড় দলিল করিয়া চলিব,—এ কথা
তাকে কখনই বলিতে দিব না যে, ভারত-

খর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাছ-
কাটা করিবার জন্তই সমুদ্র পার হইয়া
আসিয়াছি।

বে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে
সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে
দান করিবার জন্তই পাইয়াছে। যদি সে
রূপগতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত
করিবে। হুরোপের প্রধান সম্পদ, বিজ্ঞান,
এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্ম-
কর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি
ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে
ইংরেজশাসনের বিধিনস্ত রাজ-পরোয়ানা।
এই কথা শাসনকর্তাদের শ্রবণ করাই-
বার ভার আমাদের উপরেও আছে।
কারণ, চইপক্ষের যোগ না হইলে বিশ্বভিত্তি
ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই
দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জন-
সাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মন্ত
জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া
তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া
তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" একথা
মানি। অগতে এক-এক অগ্রগামী দল
এক-এক বিশেষ সভ্যকে আবিষ্কার করে।
সেই আবিষ্কারের গোড়ার অনেক তুল,
অনেক হুৎথ, অনেক তাগ আছে। কিন্তু
তার ফল ব্যাধি পার তাহাদিগকে সেই
তুল সেই হুৎথের সমস্ত লম্বা রাতটা
মাড়াইতে হয় না। বেখিলাম, বাঙালীর
ছেলে-আমেদিকার গিয়া হাতে কলমে
একদিন গড়িল এবং তার তবও শিবিয়া
লইল কিন্তু আগুনে কাংলি চড়ানো হইতে

স্বক করিয়া দীর্ঘ এতিনের সমস্ত ঐতি-
হাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত
তবে সভ্যবৃণের পরমায়ু নহিলে তার
কুলাইত না। যুরোপে যাহা গজাইয়া
উঠিতে বহুবৃণের রোগে বৃষ্টি বড় বাতাল
লাগিল জাপানে তাহা শিকড় বৃদ্ধ পুঁতিবার
বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের
চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্ত্তৃশক্তির বিশেষ
অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই
বিশেষ দরকার কর্ত্তৃশ্বের চর্চ্চা। ব্যক্তি-
বিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া-
হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে
কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো
কালেই হইবে না। আত্মকর্ত্তৃশ্বের স্বযোগ
দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন
শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—
সেটাকে বোধ করিয়া রাখিয়া যদি
আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে
চিরদিন অবজ্ঞাজ্ঞান করিয়া রাখ তবে
তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর-কিছু হইতেই
পারে না। ভাইনে ধীরে ছুঁপা বাড়াইলেই
যার মাথা ঠক্ করিয়া দেহাঙ্গে গিয়া ঠেকে
তার মনে কখনো কি সেই বড় অশা-
টিকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল
বিভাগে আপন মহত্বকে প্রাণ দিয়া ও সগ্রমাণ
করে ?

দেখিয়ার্ছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয়
সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই
সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো
ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া
ধাপে ধাপে যদি আত্মির উন্নতি হইত তবে
মহাকাশকেও হার মানিতে হইত। মানুষ

আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে
স্বযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য
হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ
স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির
দেমাঙ্ক করিতেছে! কিন্তু যুরোপের জন-
সাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা
আছে—সে সব কুৎসার কথা বাঁটিতে ইচ্ছা
করে না! যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই
সমস্ত ঘটকণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি
তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে
বীভৎসতা ত থাকিতই, আবার সেই পাপের
যাতাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া
যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের
ব্যক্তিষাভ্যন্তর্য্য ধারণায়, দুর্ব্বলতা ঘণ্টে
আছে সে কথা চাকিতে চাহিলেও চাক।
পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্ত্তৃ
চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা
মিটমিট করিয়া জলিতেছে বলিয়া যে
আর-এককোণের বাতি জ্বলাইবার দাবী
নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের
বে-সলতে দিয়াই হোক আলো জ্বলাই
চাই। আজ মনুষ্যব্দের দেহাঙ্গি মহোৎসবে
কোনো বেশই তার সব বাতি পুঁয়া
জ্বলাইয়া উঠিতে পারে নাই--তবু উৎসব
চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছু-
কাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের
শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বলাইয়া লইতে
যাই তবে তা লইয়া রানারাগি করা
কলাপের নহে। কেননা, ইহাতে তোনা
দের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের
আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদের কাছে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিবেদন করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন? সে যে কেবল ধনী বজ্রমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়ার নামে সে টেনশন পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরীবের বেলায় তার ব্যবহার উট্টা—এটা ত সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্দ্বারী যদি লক্ষ্যরূপে দৃষ্টের দেবা না দেন, তবে ক্রোধ রূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উদ্ভাসের মধ্যেও আছে, আশার মধ্যেও আছে। বাঙালীকে আমি প্রহ্লাদ করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনই চিরদিন ধারকরা বার্তাকোর যুগল পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যারা স্বাধাতির কাছে লাহন। সহিষ্ণুও ইংরেজ ইতিহাস-বৃক্ষের অন্তর কলটি তারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরুণও আমরা তেমনি মানুষের মত মানুষ, চাই যারা বাহির হইতে প্রহ্লাদ এবং স্বজনদের নিকট হইতে পিতার সহিতে প্রস্তুত। যারা বিকলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মহাবাহু প্রকাশ করিবার জন্য বাঞ্ছা।

ভারতের প্রাচীনতম স্রোত গগনান আজ আমাদের আশ্বাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আশ্বা অপরিমেয়, যে আশ্বা অপরিমিত, অমৃতলোকে বাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আশ্বা আজ অন্ধ

প্রহা ও প্রভুত্বের অপমানে দুলায় যুগ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত যেমন পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আহ্বানং বিদ্ধি! আপনাকে জান।

আজ আমরা সমুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ক্রমকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির মধ্যে চড়িয়া তিনি মহাকাশের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমালো তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ধর তিলকে তার উজ্জলগাতি মহোজ্জল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তার জল আগমনীর প্রত্যাক রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন! ওরে অকাল-মরা-জর্জরিত, আশ্ব-অবিদ্যাসী ভীক, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষার ক্ষুদ্র বিষয়ে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মত কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দিয়া নিম্নে কলুষিত হইয়া রাখিবে না, যে অহঙ্কার কেবল আপন গৃহকোণের অঙ্কুরেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বস্তার সমুখে ঘাফা উপহাসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষয়ের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভায়ে আমাদের পৌকন হ্রাসিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি সুবৃদ্ধি—সেই বহু

পতাকার আবর্জনা আর সবলে সন্তোষে
 তিরসৃত করিবার দিন। সমুখে চলিবার
 প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে ;
 আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া
 আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে ;
 তাহার ধূলিপুঞ্জে গুরুপদে সে আঘিকার
 নৃতনগুণের প্রভাতস্থর্য্যকে ম্লান করিল, নব-
 নব অধ্যবসায়শীল আমাদের ধৌবনধর্ম্মকে
 অভিত্যক্ত করিয়া দিল, আর নির্ধম বলে
 আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি
 দিতে হইবে তবেই নিত্যসমুৎপত্তমী মৎস্য
 মহুয্যবের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম
 বার্ষতায় লক্ষ্য হইতে ধাঁচিব, সেই মহুয্য
 যে মুক্তাকরী, যে চিরজাগরক, চির সন্ধান-
 রত, যে বিশ্বকর্ষার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতি-
 বালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী,
 যুগযুগের নবনব তোরণধারে যাহার অরুণনি
 উজ্জ্বলিত হইয়া দেশেদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত ।

বাহিরের দুঃখ প্রাণের ধারার মত
 আঘানের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত
 হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক
 অগুচিভা, আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে
 হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় ?
 নিভের মধ্যে নিভের ইচ্ছার দুঃখকে বরণ
 করিয়া। সেই দুঃখেই পবিত্র হোমায়ি,—সেই
 আগুনে পাপ পুড়িবে, মৃত্যু বাষ্প হইয়া
 উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে
 মিশাইবে। এস প্রভু, তুমি ধোনের প্রভু
 নও। আমাদের মধ্যে যে অধীন, যে
 অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর
 তুমি তাহারই প্রভু—ডাক আর তাহাকে
 তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে ! ধীন
 লজ্জিত হউক, দাগ লাগিত হউক,
 মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্বাসন গ্রহণ
 করুক !

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

গান

যেদু দেশ নবিত করি সজ্জিত তব ভেরী ;

আশিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ।

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?

সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-মন-পশ্চাতে ?

লউক বিবকন্দার নিলি দবার সাথে ।

প্রেরণ কর, ভৈরব, তব হৃদয় আত্মান হে,

আগ্রত ভগবান হে, আগ্রত ভগবান ।

বিদ্যবিপদ দুঃখমহন তুচ্ছ করিল যারা

মুক্তাগহন পায় হইল টুটিল মোহকারা ।

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?

নিষ্কল নিঃসীমা বাহু কৰ্মকোত্তিহীনে

ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে

আগ দাও, আগ দাও, দাও দাও আগ হে,

আগ্নেত ভগবান হে, আগ্নেত ভগবান ।

নূতন-যুগ-যুগা উঠিল, ছুটিল ভিমির স্বাদি,

তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাজ্ঞী ।

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?

গত গৌরব, হত আসন, নতমস্তক লাগে,

মানি তার মোচন কর, নরসমাজ থাকে

হান দাও, হান দাও, দাও দাও হান হে,

আগ্নেত ভগবান হে, আগ্নেত ভগবান ।

জনগণপথ তব অস্বৰ্ণক্রেমুখর আভি,

স্পন্দিত করি সিগ্দিগন্ত উঠিল শব্দ বাজি ।

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?

দৈত্যলীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,

আগকছু চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,

কোটিমোহকল্পণ বাণী কর দান হে,

আগ্নেত ভগবান হে, আগ্নেত ভগবান ।

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরম্বায়ে,

অর্জিল তব অর্জিল অর সার্বক হল কাছে ।

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?

আত্মঅবিস্মার তার নাশ কঠিন বাতে,

পুত্রিত অবলম্বিতার হান অবনিপাতে,

ছায়াভরচকিত মুচ, করহ পরিজ্ঞাপ হে—

আগ্নেত ভগবান হে, আগ্নেত ভগবান ।

• • • শ্রীযদোজনাথ ঠাকুর ।

বিরূপবজ্র ●

যে দু-তিনটি প্রবীণ প্রতিভার প্রযোজ্যে বঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পকলা প্রোজ্জ্বল, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদেরই মধ্যে একজন ; হস্তরং বাঙ্গলা আর্টের খবর বাহারা একটু-আধটুও রাখিয়া থাকেন, গগনেন্দ্রনাথের রেখাকাব্যের সঙ্গে তাঁহার্য্য যে পরিচিত, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

চিত্রমাত্রই হয় বর্ণকাব্য, নয় রেখাকাব্য ; অনেকের ছবিতে রঙের দীপ্য। বস্তুটা বেশী দেখা যায়, রেখার খেলা ততটা নয় ; রং দেখান রেখাকে প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের একটা আসল গুণ এই যে, তাঁহার নিপুণ হাতে তুলির মুখে রং আর রেখা সমান অবলীলার খেলিতে পারে ; বেষ্ট্রভাগ, ধরিতে গেলে—তাঁহার অনেক ছবিই একেবারে রেখা-প্রধান। ছবির ক্ষেত্রেপাত যে রেখার, চিত্রশিল্পের এই মূল নিয়মটি তাঁহার আলোচ্যের মধ্যে বেশ জাজ্বল্যমান।

প্রতীচ্যের আট বর্ণপ্রধান, আর প্রাচ্য আট রেখাসংকর না হইলেও বিশেষ করিয়া রেখার ভক্ত বটে। যুরোপের অনেক খ্যাতনামা চিত্রকরের পট হইতে যদি রং মুছিয়া বেওয়া হয়, তবে তাহার ‘চিত্রত্বের’ অস্তিত্ব বোধ হয় কিছুদূর থাকে না ; কিন্তু ভারতীয় চিত্র হইতে অনেকসময়ে বর্ণকে বাদ দিলেও চিত্রিত বিষয়টি পরিস্ফুট থাকে এবং ছবির

মৃষ্টিও তাহাতে মরিয়া যায় না ;—কেননা, বর্ণ এখানে রেখাকে কৃত্রিম দিয়া আড়ালে রাখিয়া সমস্ত বাহ্যচরিতা নিজের ভাগেই টানিতে চাহে না—রেখা আর বর্ণ দুইই এখানে ছবির বিষয়টি ছুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। অবশ্য, এ নিয়ম যে সব-জায়গাতেই সমানভাবে খাটে, তা-নয় ; তবে এটিকে সাধারণ নিয়ম বলা চলে।

রেখাপাতে গগনেন্দ্রনাথের কারণ-কৌশল চমৎকার ! তাঁহার ছবির প্রত্যেক রেখাটিতে জীবনের যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহাতে অবাক মানিতে হয় ; পরন্তু, ছন্দে, সামঞ্জস্যে, অনার্য্যস গতিতে ও অনাহত সৌন্দর্য্যে এবং বিভিন্ন কোমলভাব তাঁহার রেখাগুলি অপূর্ণ। তাঁহার হাতের এমন রেখা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা,—বাহ্যঃ দুর্বল বা আড়ষ্ট বা বেথাল্লা ! অনেকসময়ে এক-একটি তুলিকাঘাতে, সলীল রেখার এক-একটি টানে তিনি একেবারে একটি আত্ম মুখ বা বেহ আঁকিয়া তুলিয়াছেন—একালে, রেখা-পাতে এতটুকু দক্ষতা বড়ই দুর্লভ। তাহাদের সামান্য চিত্রবোধ^{*} আছে, তাঁহার্য্য গগনেন্দ্রনাথের অনেক ছবি দেখিলে সমগ্র চিত্রের ভাবের ঐশ্বর্য্য বা বর্ণের সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া, কেবল তাহার একাংশের একটি মাত্র জীবন্ত রেখার টান লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিবেন। তাহার উপর, তিনি কখনো অকারণ রেখা-বাছল্যের পক্ষপাতী

* ইতিহাস পাণ্ডিত্য হাটস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

নন, একটি ভাব বা ছবি ফুটাইতে তিনি বত-পায়েন ওত-কম রেখাপাত করেন; বাইরা যে আটের মত শত্রু, এ তিনি কখনো ভুলেন নাই।

গগনেন্দ্রনাথের আর-একটি বিশেষত্ব, তাঁহার অঙ্কিত অনেক চিত্রে কবিতা যেন পরিত্রি। সে-সব ছবি যেন রেখা-বর্ণের মধুর শিল্পিক,—তাঁহার ভিত্তিকার সুরের মীনা, ছন্দের নাচ ও তালের মাত্রা প্রাণের বাণে যেন শোনা যায়! চিত্রকে এমনি কাব্যের মত বিচিত্র করিয়া গগনেন্দ্রনাথ মর্শকের চিত্রকে কল্পনার মায়াপুরীতে উড়াও উড়াইয়া লইয়া যান।

সংগ্রহিত গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্র-প্রতিভাকে একটি নূতন পথে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কলে, আমরা তাঁহার অঙ্কিত “বিরূপবস্ত্র” নামে বাঙ্গলিভাষাণীর বইখানি পাইয়াছি। প্রথমেই শিল্পীর বেত্তন ও বিশেষত্বের কথা বলিয়াছি, এই বাঙ্গলিভাষাণীও ঐ-সকল গুণে ও বিশেষত্বে বিশেষরূপে বিশিষ্ট।

সুরোপীয় চাক্ষুশের বাঙ্গলি একটি প্রধান অঙ্গ। ‘কাটু’ন’ আঁকিয়া সেখানকার অনেক আর্টিষ্ট হুধু যে স্ত্রীকে কিনিয়াছেন, তা. নয়; —অমর হইয়া গিয়াছেন। সাহেবদের ছেলে-বুড়ো-যেহে সকলেই এই বাঙ্গলি দেখিতে যে কতটা লাগারিত, “পাক” ও “পাক্” প্রভৃতি বাঙ্গলিভাষ্যের কাগজের দেশবোড়া নাম-ডাক্ ও অগুণি কাটুতিই তাঁহার প্রমাণ। বাক্য-বন্দুকে ফাঁকা আওরাজ না করিয়া বাঙ্গলিভাষ্যের প্রতীক্ষার রাজনীতি ও সমাজনীতির বড় বড়, গলপ এবং তরল বিকটি চোখে আঁঙ্গুল দিয়া

সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলিভাষ্যের শিল্পীরা সেখানে এত-বেশী শক্তিশালী যে, সময়ের-সময়ে এক-একখানি একরকম ছবি অত-বড় সুরোপকেও রীতিমত নাড়া দিয়া সাড়া তুলিয়াছে। যাঁহাদের নামের ডাকে গগন ফাটে, বেগে বা সমাজে যাঁহারা মোড়ল ও খয়ের-খাঁ, একটি আঁঙ্গুল হেলাইলে যাঁহারা অনেককে ধনে-প্রাণে মহাইতে পারেন, বাঙ্গলিভাষ্যের বেগমোরা তুলিকে তাঁহারাও ভরে-ভরে নস্বরমত সমঝাইয়া চলেন; কেননা, সুরোপের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের নানক প্রভৃতি সকলকার মাথার উপরেই বাঙ্গলিভাষ্যের এই অমোঘ বজ্র অষ্টপ্রহর উদ্ভত হইয়া আছে; —একটু তুল-চুক হইলেই, একবার পা ফরাইলেই আর মুখ রাখা ধর! সেখানে এমন নামজাদা লোক বোধহয় একজনও নাই, বাঙ্গলিভাষ্যের যাঁহাকে মানে-মানে রেহাই দিয়াছেন। বাঙ্গলি বড় নির্দয়; —এ কথা কহ না, সৌরচক্রিকা করে না, গোল-হরিবোল দেয় না, হুধু নীরবে ঘরের সামনে হাটের মাধ্যমানে পাথর গা থেকে সিংহের চামড়া খুলিয়া তাহার লথা কাণ জাহির করিয়া দেয়! ব্রহ্মজ্ঞানবলনে এ হচ্ছে অব্যর্থ পাণ্ডুলত অস্ত্র!

বাঙ্গল্যবেশে বাঙ্গলিভাষ্য এতদিন ছিল না বলিলেই চলে। দেশী খবরের কাগজে রাশি-রাশি বে-সব ছবি পড়ন্ত হয়, সেগুলি নামেই বাঙ্গলিভাষ্য, গুণে অষ্টরঙ্গ! সে হচ্ছে ব্যক্তিগত অতি হিন্দুত্বের পরলোকগার, ব্যক্তি-গত স্বগড়ার ঝাল-ঝাড়া, তাঁহার ভিত্তরে না-
* আছে * সাক্ষ্যবাহিনী, না আছে কল্যাণবাহিনী,



শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঐকান্তিকতার হালকার অঙ্কিত।

না-আছে রসিকতা বা ভাবুকতা! অবনীন্দ্র-
নাথের বেশী ছিড়ে ও কালিখাটের পটে
যতটা ভাব, গগনেন্দ্রনাথের বাসুচিহ্নের
সঙ্গে ঐ-সব কাণ্ডে হিম্মতবিরিৎ এতদী ঠিক
ততটাই! এখানে তুলনার কথা তুলিলাম
এইজন্য যে, গগনেন্দ্রনাথের “বিক্রপবক্ষ”র স্বরূপ
বুঝিতে কেউ যেন দেখে দেখী কাগজের কুরুপ
“কাটুঁন”গুলোকে বুঝিয়া না বলেন!—

স্বপ্নের কাগজের এই সব কাকের ছানা বকের ছানা"র কথা ছাড়িয়া দিলে, বঙ্গদেশে ব্যঙ্গচিত্রের রসভর আর-কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল ওস্তাদ-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দিনকতক আগে একবার বাঙ্গালসে তুলি ডুবাইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের মত এরকম বিশেষভাবে এদিকে তিনিও কোঁক দেন নাই।

অরুণিদের ভিতরেই গগনেন্দ্রনাথ বাঙ্গালি আঁকিয়াছেন অনেক। বিবর-বৈচিত্র্যে যেমন, অল্পন-নৈপুণ্যেও সেগুলি যে তেমনি উপভোগ্য, একথা বলা বাহুল্য। দেশের, সমাজের, সাহিত্যের ও ধর্মের কৃত্রিম ও বিকৃত নানান দৃষ্টি এই সব ছবিতে সারি-সারি সাজানো। এগুলির ভিতরে কলা-কৌশলের সঙ্গে শিল্পীর হৃদয়, পর্যবেক্ষণ-পটুতা, রসগ্রাহিতা ও চিত্রাঙ্গীলতাও যথেষ্ট রূপে বিকাশপ্রাপ্ত। দেশের ও দেশের অস্ত গগনেন্দ্রনাথের বৃক্কে যে ব্যথা বাজে, তত্ত্বের তত্ত্বানি যে তাঁহার চক্ষুশূল, এই চিত্রাবলীতে সে পরিচর্য তিনি ভাল-করিয়াই দিয়াছেন।

তুমিকার তিনি লিখিয়াছেন—“When deformities grow unchecked but are cherished by blind habit it becomes the duty of an artist to show that they are ugly and vulgar and therefore abnormal.” বাস্তবিক, ব্যঙ্গচিত্র বলিয়া এ ছবিগুলিকে যিনি হালুকা ভাবে দেখিবেন, তিনি ভুল করিবেন। বাঁহারা ভাবুক, গগনেন্দ্রনাথের এই বিভিন্ন তুলির লিখনে তাঁহার ভাবিবার অনেক খোঁজা পাইবেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে দু-চারটি কথা বলিয়া লইতে চাই। গগনেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নালিশ চাইয়াছে, তিনি নাকি সমাজ-বিশেষকে বাস করিবার লক্ষ্যই ছবি আঁকিতেছেন। এ নালিশ ডাছা মিথ্যা। কারণ, কোন-একটি বিশেষ সমাজকে তিনি ছবির মডেল করেন নাই বা কোন সমাজের প্রতি বিষেষ আছে বলিয়াও তুলি ধরেন নাই। ইহার প্রমাণ “বিরূপবস্ত্র”র ভিতরে অল্প। তাঁহার আঁকা দু-একখানি মাত্র ছবি দেখিয়াই একটা বিরোধী মত খাড়া করিয়া নেওয়া বিবেচনার কাজ নয়। যিনিই গগনেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যঙ্গচিত্র দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিবেন, বাঙ্গলা দেশের পুরাণো ও নূতন সমাজের এবং ছোট-বড় সকল সম্ভ্রমভেদেই অপূর্ণতা ও ক্রটিবিচ্যুতি শিল্পী স্পষ্টভাবে ও নিষ্কিচারাে আঁহির করিয়া দিয়াছেন। গগনেন্দ্রনাথ গগনের মতই পরম উদার,—ভণ্ডামি ও নটামির উপরেই তিনি কঠোর হইয়া বা মারিয়াছেন—সে-সব ভণ্ড প্রাচীন কি নবাসমাজের লোক, ধর্ম্মে তাহার হিন্দু কি ব্রাহ্ম—এমন বাচবিচার কোথাও রাখেন নাই। বিশেষ, কোন সমাজেরই বখার্ব্ব ভণের উপরে খোঁচা মারিয়া তিনি অন্তর্য্যতা ও হৃদয়ের প্রমাণ দেন নাই, পরন্তু, পাক ডাক্তারের মত কেবল রোগহুই স্থানেই অস্ত্র ঢালাইয়া গিয়াছেন। অবশ্য, রোগী কখনো চুপ-মারিয়া বসিয়া-বসিয়া নিজের গারে ডাক্তারকে ছুরি খোঁচাইতে দের না। হরত, গগনেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আশ্রয় যে-সব অভিযোগ ও গোণোযোগ শুনিতেছি, সে হুঁজু, শীড়িত সুমাধপতিদের ভীত আত্মনাদ ?

গগনেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গুলি স্বকল্পকে আত্মীয় মত—এ আত্মীয় অনেক বাদ্যর, অনেক গাথা ও অনেক গল্পই আপনাদের কুৎসিত যুগ দেখিয়া, নিজে-নিজের আতিশুলভ হয়ে চেঁচামেচি শুরু করিবে। যে-সকল অপূর্ণতা সত্যই বাস্তবোপযোগ্য, সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া তিনি অনেক অবিকল Type তৈরি করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের মোহ তাঁহার লক্ষ্য নয়—এক-এক সম্প্রদায়ের অনেক লোকের ভিতরে যে-সব মোহ আকৃষ্টার নজরে পড়ে, তাঁহার লক্ষ্য সেই দিকেই। তাঁহার অঙ্কিত ব্যক্তিগত মাহু-গুলি তাই Typical হইতে পারিয়াছে; এবং এই ছবিগুলি দেখিলে তাই প্রত্যেক ঘোবাই ঠগরাইয়া লইবে, ‘আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এ ছবিখানা নিশ্চয় আঁকা হইয়াছে।’ আমাদের ভরসা আছে যে, ‘ঠাকুরঘরে কে?’ বলিলে বাহারা চটুপটু কলসী-ভক্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাতিরা সাফাই দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই দলের বোকা ঘোবাইয়ের অনেকেই এই ব্যক্তিগত দেখিয়া হাটের মাঝে নিজের হাড়ি নিজেই ভাঙিয়া বসিবে।

গগনেন্দ্রনাথের চোখ আসল ব্যঙ্গবস্ত্র চিনিতে জানে। বাহা ব্যঙ্গের অব্যোম, তাহাকে উপভোগ্য করিবার মস্ত কোথাও তিনি কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেন নাই। তাহার উপরে, ব্যক্তিগতকারীর আর-একটি যে মস্ত গুণ—তীক্ষ্ণতা, সেটিও তাঁহার প্রত্যেক ছবিতে বিলক্ষণ আছে। ব্যঙ্গ যদি ভোঁতা হয়, তবে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া যায়। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ শাণ্ডেও মেরু ছোঁরাই মত ধরাশায়ী—ভঁড়ের দস্ত

চর্খে ঠেকিয়া ভাঙা ফেঁদে না—মর্মে গিয়া বিধিয়া একেবারে মর্মান্তিক জ্বালায় তাহাকে জ্বালাইয়া মারে।

“বিকল্পবস্ত্র” গগনেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যক্তিগত প্রকাশিত হয় নাই; বর্তমান সংগ্রহে তেরখানি নানাপ্রকারের ছবি ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই তেরখানি ছবিতেই চিত্রকারীর সমস্ত বিশেষত্ব ও নিজের পরিচয় আছে। গভীর ভাববাক্য ও বিভিন্ন সৌন্দর্য-রসের চিত্র আঁকিয়া গগনেন্দ্রনাথ এতদিন উচুঘরের ভাবুক শিল্পী বলিয়া রসিক-সমাজে বিখ্যাত ছিলেন; সংগ্রহিত রঙ্গব্যঙ্গের এবং কৌতুক রসের যৌতুক হাতে-করিয়া তিনি অবসর-আসর জমাইতে আসিয়াছেন; এই নূতন রঙ্গবিকাশেও তিনি যে কত-বড় একজন ওস্তাদ, “বিকল্পবস্ত্র”র প্রত্যেক চিত্রই তাহা প্রমাণিত করিবে।

সর্বশেষে, “বিকল্পবস্ত্র”র ছবিগুলির সংসামান্য পরিচয় দিয়া আমরা বিদায় লইব।

১। ব্যঙ্গ—[অর্থাৎ বঙ্গের ইংরেজী কারবার (Bangla) উচ্চারণ]। চিত্রকর কল্পনা করিয়াছেন, একটি টবের ভিতরে গাছের বদলে এক ভূঁইফড়ি ও বিজাতীয় পোষাক-পরা অদৃষ্ট জীব দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বামঅঙ্গে মনোকুল, কলারী, নেকটাই, সাট, কোট, পেটুপেন ও হ্যা এবং দক্ষিণ অঙ্গে চামর, পাঞ্জাবী, ধুতি, ছড়ি ও নাগরা। ইনি হচ্ছেন একালের অনেক বিজাতীয় বাঙ্গালীর নিখুঁত আদর্শ; হরি-হরের মত ইহাতে আধা-দায়েবী ও আধা-দেবীস্বরূপ চংএর মিলন হইয়াছে। কড়িয়ার্ড

কিপুলিং কবিতার বর্ণিতছিলেন, প্রতীচ ও প্রাচ্যের মিলন অসম্ভব ; এ নক্সাখানি দেখিলে অমন কথা কি তিনি ভ্রমেও মুখে আনিতেন ?

২। দেশীলোকের উদ্ভানে ভোজের দৃশ্য। নবাবদের ফেরদা ধরণ-ধারণ, এ ছবিতে ঠিকঠাক ফুটিয়াছে। নিমন্ত্রণকারী ও নিমন্ত্রিতরা সবাই যে এদেশী,—চিত্রকর যদি নিজেই সে পরিচয়টা না দিয়া দিতেন, তবে কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। কারণ, বাবুদের সাবানকে-হার-মানানো কাকতল্য বর্ণ ছাড়া, চেহারার দেশীকত্বের আর-কোন ল্যাঠা নাই। তাহাদের হার-ভাষ সাহেবী, পোষাক সাহেবী, খানাপিনাও সাহেবী। অনেকের হস্তধৃত পায়ে আবার মহিমময়ী চলচলারমানা বোতলধরী সপোরবে অবতীর্ণ। এই অবাধ-ভোজ দেখিয়া, নবাবদের নিকটে রসিক চিত্রকর একটি সমস্তা উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে দেশী লোক কোন্ট ? এই সমস্তা সমাধান করিতে গিয়া দেখি, সভার ঠিক মাঝখানে একটিমাত্র দেশীলোক খাড়া আছে—সে বাবু-সাহেবদের খানসানা! এই একটিমাত্র খানানামার দেশী পোষাকের পাশে আর-সকলকার ফেরদা বেশ কী বিসম্মত দেখাইতেছে! অনূষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসেই বেধেকরি এই কালো সাহেবদের কুচ্ছ ভৃত্যের গাত্রবর্ণও পোর চইয়া উঠিয়াছে!

৩। বিস্তার কারখানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার খোলা; দলে-দলে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধ যুবক ছাত্র ভিতরে ঢুকিতেছে—তাহারাই বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা-তরঙ্গ!

ভিতরে বিস্তার বিরাট কারখানা—উপবে কর্তৃপক্ষরা পাহারার নিযুক্ত। চিহ্ননি দিয়া ধূম বাহির হইতেছে—একাত্তি এতৎ-যন্ত্র পূর্বদমে চলিতেছে এবং তাহারই কঠোর চাপে আঠেপুটে বেংলাইয়া বাবালীর ভবিষ্যৎ শিবরাত্রির সন্তেরা যখন বাহির হইয়া আসিতেছে, তখন তাহাদের আর সে ঘোরালো গড়ন ও হুঁই চেহারা নাই; বিভাবস্রের পেথনে হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া তাহারা তালপাতার সেপাই হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কাহারও বেহে খুঁতি-চাপর—বোধ হয় কেরাণী; কাহারও পরোপে চোগা-চাপকান-দামলা—নিশ্চয় উকিল; কেহ হাত-পা ছড়াইয়া পপাত ধরপীতলে—সম্ভবত পকতপ্রাপ্ত; কেহ মাটিতে বসিয়া—হরত দাঁড়াইতে পারে না; কেহ লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া—বুঁকি চলিতে পারে না! আর একদিকে কাতারে-কাতারে কলেজ-আউট ছোকরা একটা ক্তের তলার জমায়ে হইয়া বেজার হৈ-চৈ শুরু করিয়াছে;—বাপার কি? উপরপানে চাহিয়া দেখি, ধামের মাধ্যম মস্ত-এক টোপর—তার তলার আঁকা সোনার চাব ও একটি ভারার গারে লেখা বি-এ (বিরে?)! তখন বুলিলাম, বিভাবস্রের চাপ ও ছাপ, বাহির বাহির হইয়াই এষ্টকলো বামন ঐ সোনার চাব ধরিবার কিকিরেই ওখানে গিয়া লালালাকি করিতেছে!

৪। স্বদেশীর সম্মান বা পরভূতের কাকলী। রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরা। দরজা খুলিয়া এক লম্বাট-কোট-প্যাট-পরিধৃত হোঁৎকা বাবু-সাহেব;

—তাঁহার মাথার সাড়ে-পনেরো আনা-
আধমুদ্রা স্ফাপানে ছাটা চুল, ভানহাত
সার্বেবোধরূপে পকেটব, বাঁ-হাতে বংশের
সঙ্কিশ্ত সংস্কারের মত সপ্তদ্বীপ চুরোট এবং
এক-পা আগে-বাড়ানো—নূতন আরোহা
যাহাতে গাড়ীতে উঠিতে না পারে। বেকের
তলায় একটি চামড়ার কেশ—তাঁহার উপর
এই ইঙ্গ-বঙ্গ পুরুষ-পুংসবের পরিচয়,
ইংরেজীতে লেখা—মিঃ এ, বি, সিঃ—
তোতাপাখী-ক্লাবের মেম্বর! মুক্তি-
চান্দর-পাল্লাবা-পর। একজন প্রৌঢ়বয়স্ক পাঁচ
বঙ্গালী গাড়ীতে উঠিতে উত্তত; তোতা-
পাখী-ক্লাবের মেম্বর এই কালা-আধমুদ্রা
পেরিয়াই হাঁ-হাঁ করিয়া দমকাইয়া উঠিতেছেন
“Not here Baboo!” স্বদেশী বাবু এই
বিলাতী বাবুর উত্তরে কি বলিলেন, তাহা
অজ্ঞাত; কিন্তু তাঁহার চোখের ঝাঁক
চাহনি ও কৌতুকমাখা গুঁঠাধরের ভঙ্গী
চিত্রকর স্তম্ভকোশলে দেখাইতে স্মরণ নাই।
দেশী বাবুর দ্বায়ে একখানি বই,—তাঁহার
নামটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাহা
Burgson প্রণীত Laughter!

৫। পুচ্ছ-পরিবর্তন বা বা-রে
লাংগ্রেস্ট্রো! বরের মধ্যে টেবিলের সামনে
চেয়ারে আসীন এক জীব, বাহার মুখ
পক্ষীজাতীয়—তীক্ষ্ণচক্ষুবিশিষ্ট, পশ্চাতে বাহার
মস্তুরপুচ্ছ, হাতে সেই পুচ্ছ-তৈয়ারি কলম,
পরিধানে বিলাতি কোট, সাঁট, কলার এবং
লম্বা সাদা টাই। তাহার স্তম্ভে, দরজার
বাহিরে গাড়ীয়া আছেন এক তরুণ লোক;
দেশী সজ্জা। দেয়ালে নোটশ-বোর্ডে লেখ্য
আছে—“Indian Dress not admitted!”

৬। “সেবীদর্শন” বা “অহিন্দাদের
সম্মান?” যে দেশে বরে-বাহিরে সীতা-
সাবিত্রীর নামের বোহাই তিন, সেই
দেশেই এক রেল-স্টেশনে গিয়া চিত্রকর
মহিলাদের প্রতি সম্মানের অগস্ত দৃষ্টান্ত
দেখিয়াছেন! টেনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়
ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে হরেক-
রকমের পাগড়ীওয়ালা, টেড়িওয়ালা ও গৌক-
ওয়ালা মুখ চকম এবং উন্মুখ হইয়া
উঠিয়াছে;—সেই অগস্ত মুখের অগস্তা দৃষ্টির
কোনটি বিস্ময়িত—কোনটি ক্রোধিত; কোনটি
লালসার প্রদীপ্ত—কোনটি অপাঙ্গে নিশ্চিন্ত;
কোনটি চুলচুলে, নৃত্য—কোনটি-বা কটমটে,
লুহ! সেই শত-শত ক্ষুধাতর চোখের সামনে
লক্ষ্যবর্তী-লভ্য মত ভাবিনা-পড়িয়া ছুটি
ভ্রমমহিলা নতনিরে ত্রস্ত রূপে চলিয়াছেন
—তাঁহাদের পঙ্কতলে তখন ধরলী দ্বিধা
হইলেই তাঁহারা যেন বর্তাইয়া যান! গাড়ীর
ভিতর হইতে কোন-কোন অগস্তা আবার
তাঁহাদের দিকে অশ্লীলনির্দেশ করিয়া
মহিলা-সম্মানের চরমে উঠিয়াছে! তাঁহাদের
চোখ এড়াইবার অস্ত্র মহিলাদ্বিগে যে অস্ত্রদিকে
কিরিয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবেন, সে
পথেও কাঁটা; কেননা, অস্ত্রদিকেও তাঁহাদের
সম্মুখে রূপের নেশার মসৃণল আর দুই
মহাপুরুষ লোগুণ-চোখে হাঁ-করিয়া পথ-সুড়িয়া
অচল ভাবে বিরাজমান!

৭। সহধর্ম্মিণীর সম্মান বা অসহ-
ধর্ম্মী। স্থান—রেলস্টেশন, বাঙ্গালা। কাল
—বর্ষা, সুপস্থাপ অল পড়িতেছে। আগামিকর্ত
‘বর্ষান্তি’ অড়াইয়া ছাতি-মাথার বাঙ্গলার
কোতো বাবু সিগারেট ধরাইয়া পহন

আরম্ভে বেহটা গরম হুটিতে-করিতে
 টেনের অপেক্ষার পাড়াইয়া আছেন।
 অদূরে তাঁহার সহধর্মিনী বর্ষার অজস্র
 ধারা মাথার করিয়া, কোণের শিতকে
 ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে বুকের মাঝে ঢাকিয়া,
 হেটমুখে স্বামীর গভীর প্রেমের কথা
 তাবিতোছেন! ছাতির তলার আশ্রয় লইবার
 ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই! কারণ, ছাতির
 তলার স্বামীর পাশে তাঁহার বাগ এবং স্ত্রীর
 চেহেরেও সূচ্যবান সখের কুকুরটি বাকি
 জারগাইকু ধখল করিয়া আছে, আর তিল-
 ধারপের ঠাইটুকুও নাই—স্ত্রী ত কোন্
 ছায়!

৮। বাহবা বেশ! চিত্রকর এখানে
 নিপুণ তুলিকাপাতে বাঙ্গলার ছুটি অদ্বুত-
 চমৎকার এবং কিছুতুচ্ছিকাকার বিপরীত দৃষ্ট
 অঙ্কন করিয়াছেন। রত্নমির একদিকে
 আঘাঘের সোনার বাঙ্গলার সহস্রসহস্র
 শিঙাশ্রম পল্লী-স্ত্রীর মধ্য দিয়া, বুড়ো-মিথের
 মন্দির-সোপানে আমনা আঁকিয়া গ্রামপ্রান্ত-
 বাহিনী নদীর স্রোতধারাটি খেরাতরী বুকে-
 করিয়া বহিয়া বাইতেছে। এদিকে সামনেই
 ছুটি বুকে-বুঝতী—তাঁহাদের আকৃতি যথুর
 ও কোমল, তাঁহাদের পরোণে, তাঁহাদের
 ফুলের-মত ছড়াইয়া-পড়া, খাটি
 বাঙ্গালীর সরল-স্বন্দর কাপড়-আনা-চাদর।
পিছনে আলোকপ্রাপ্ত বাঙ্গলার
 কল-কারখানা, চিমনির ধোঁয়া, সারি-সারি
 ইটের কোটর, সহরে ও সভা ইন্-বদ এবং
 তাঁহাদের ভব্য নকলকারীর দল,—তাঁহাদের
 আবালবৃদ্ধবনিতার বেহে বেশী-বিলাসী
 শোষাকী বিচুড়ী! শোষাকী লগতের

ক্রমবিকাশের অপরূপ নমুনা এবং বিচিত্র
 বাহার এ ছবিতে কী স্থান্যর ছুটিয়াছে!

৯। দেবতার ফুল। লগাটে ত্রিপুরক,
 গলদেশে উপবীত, বাহুতে চন্দনলেখা লইয়া
 এবং মালাকোটা মারিয়া এক পুষ্পতটিক
 ব্রাহ্মণ মড়মড়শব্দে গাছের ডালকে ডাল
 ভাঙ্গিয়া সাবাড় করিয়া সোৎসাহে কোমল
 পুষ্পচয়নে নিমুক্ত,—ঠাকুরের পূজার লাগিবে
 বলিয়া। কিন্তু নম্র দেবসেবকের মত তাহার
 চেহারা নহে—চেহারা তাহার গুণ্ডার মত,
 চকুদুটো লাল-করমচার মত। “দেখে সে রক্ত
 আঁধি ভক্তি বা তা ছুটে পালায়!”

১০। নীতিরক্ষা। একটি নবীন
 ছোকরা রাস্তা দিয়া বাইতেছিলেন, কোথা
 হইতে নীতিবাগীশ ‘হাঁ হাঁ, কর-কি চে, কর-
 কি’ বলিয়া ভীষণ চোৎকারে আশিয়া প্রাণ-
 পণে ছোকরাটির চোখ-কণ টিপিয়া ধরিয়ান্নে!
 কেননা, স্বমুখেই যত-সব ভাঙ্কর দুর্নীতির
 স্বত্তি! বধা, বকুল-তমাল-কদম প্রভৃতি
 বিখ্যাত অশ্লীল বৃক্ষ এবং পেশোয়াজ,
 বাঈ ও তবলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অশ্লীল
 পদার্থ! স্বর্গের উপর বজ্রাঘাত—গাছের
 ডালে বলিয়া আবার একটা দুষ্ট কোকিলও
 ডাকিতেছে যে! নীতিবাগীশ তাঁহার
 খিরাট বুটের তলার কোণভরে একটি কদম-
 ফুল খেংলাইয়া আছেন!

১১। বাংলা চুলের কেতা। বাঙ্গলা-
 দেশে যে কতরকম ক্যাননে চুল
 আঁচড়ানো হয়, তার নমুনা। ব্যাখ্যার এ
 ছবির ঝল বঝানো বাইবে না।

১২। চোর। একহাতে ছুটি হাড়-
 জিরজিরে ও ভয়ে-আধ-দুঃ আপোণও শিত-

চোরকে, পাঞ্চাইয়া বৃক-ছাতি-বাধা
বিয়ারপু পাহারাওয়ালা বিপুল গর্কে
দ্বিধাবাদী বীরের মত চলিরাছে। অবোধ
বাণকট্টার অপরাধ, ক্ষুধার আলা সহিতে
না পারিয়া তাহার গোটাগ্রহক কাটা
আম চুরি করিয়াছে। আমটুকু এখন
পাহারাওয়ালারই কবলগত—দৃঢ় দৃষ্টিতে
আবদ্ধ।

১৩। আপনি-চলা লেকচার তৈরি-
করা কল বা 'বাক্ষত্র'। বক্তৃতার অক্ষম
মহারাণা, অমিবার ও কাউন্সিলের সমস্ত
প্রভুতির পক্ষে মহা হযোগ! অনেক টাকা
মাহিনা দিয়া বক্তৃতা রচনা করিবার চেষ্টা
আর কাহাকেও প্রাইভেট পেক্টোরা

পুথিতে হইবে না; যতবড় লম্বা-চওড়া
এবং যে-কোন বিষয়ের বক্তৃতাই হউক না
কেন, বাঙ্গলার এডিলনের উদ্ভাবিত এই
আন্দর্ভা বাক্ষত্রের দ্বারা এই সে-কার্য
জলের মত সহজে সিদ্ধ হইবে। এই
বাক্ষ-বয়ে অনেক মজার জিনিষ আছে;
বাহারা উদ্ভাব, ছবিবানি দেখিয়া তাঁহার
চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করুন!

এ ছাড়া মলাটে আর-একখানি ছবি
আছে,—পাখানের উপর অক্ষপাত এবং
অরণ্যে রোদন দেখিয়া এক গলা-কোলা কোলা
বাঙ প্রাণের মাত্রা ছাড়িয়া পেটকাটা হাসির
পান হুক করিয়া দিয়াছে।

ঐচ্ছমেগ্রকুমার গার।

মিসরবাসীর পূর্বপুরুষ

প্রাচীন মিশর আধুনিক যুগে একটা
মুগ্ধমান রহস্যের মত পড়াইয়া আছে।
তাঁহার সভ্যতার অল্প নিদর্শন আবাদিগণকে
বিস্ময়কর করিয়া দেয়, কিন্তু বাহাদের নিপুণ
হস্ত সে অতুল সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল,
তাঁহাদের অনেক কথাই আজ অভীতের
কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আলোচনা করিয়া
দেখিয়াছেন, প্রাথমিক যুগেই মিশরের সভ্যতা
অধিক-সম্পূর্ণ ছিল—অত্যন্ত অনেক ধরনের
সভ্যতার মত তাঁহার মধ্যে ক্রমোন্নতির
নিদর্শন দেখা যায় না। প্রাচীন যুগ
হইতে মিশর যতই আধুনিক যুগের দিকে

আগাইয়া আসিয়াছে, তাঁহার সভ্যতা ততই
অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

হুতরাং এ সভ্যতা যে মিশরেই সর্ব-
প্রথমে অকুরিত হয় নাই, পরন্তু অন্য-কোন
দেশ হইতে পরিপুষ্ট অবস্থাতেই তাঁহার
আগমন হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই
সন্দেহ নাই।

এই-সব দেখিয়া-তুলিয়া সকলেই জিজ্ঞাসা
করেন, মিশরের সভ্যতা কোথা হইতে
আসিয়াছিল? যে জাতি পিরামিড গড়িয়াছে,
তাঁহার আদিবাস কোথায়? মিশর-
সভ্যতার বাহারা বিশেষতঃ, তাঁহার এই
জিজ্ঞাসার উত্তরে নিম্নস্তর হইয়া থাকেন।

কোন জাতি মিশরকে এই সভ্যতার
শিকারি দিয়াছিল আজ-পন্থা কেই
ভাষ্য ঠিকরূপে নির্ণয় করিতে পারে
নাই। The Greater Exodus
নামক পুস্তকে জে, এক, জী,
বলিতেছেন, এইসকল জাতির গায়ের
রং ছিল লাল। ইহাদের মুখে দাড়ী
কি গোঁফ গজাইত না, পুাতন
Peruvian-ধরণের একরকম টুপি
ইহারা ব্যবহার করিত। মিশরে
দ্বিতীয় রামেসিসের বে মমি পাওয়া
গিয়াছে, তার মুখের গড়ন—বিশেষ-
করিয়া তাহার নাক ও গাড়া
আমেরিকার বেড ইণ্ডিয়ানদের মত;
এইজন্য মনে হয় যে, মিশরবাসীদিগের
পূর্বপুরুষ আমেরিকা হইতেই প্রথমে
আগমন করিয়াছিল।

মেক্সিকোর ইউকেটানে এই রক্তবর্ণ
বাণেশের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।
সে দেশে জঙ্গলের ভিতর কয়েকটি ধ্বংস-
স্থানে এখনও অনেক আশ্চর্য্য তথ্য
আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি হইতে জানিতে
পায়া যায় যে, বহুকাল পূর্বে ওই প্রদেশে
এক জাতি বাস করিত; ইহারা বিজ্ঞান,
জ্যোতিষ ও সূর্য্যমার শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে
বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।
আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহাদের
স্থাপত্যশিল্পের আদর্শ মিশর ও বাবিলন প্রভৃতি
দেশের প্রাচীন শিল্পীরা গ্রহণ করিয়াছিল।

Dr. Augustus le Plongeon এবং
তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই ইউকেটান প্রদেশে
আসিয়া প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার-কাণ্ডে



দ্বিতীয় রামেসিসের মমি

তাঁহাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।
এই দুজনে কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে
অজ্ঞানতার ও অনাচার প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ
স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল; এমন-কি,
অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের হস্তে অনেকসময়ে তাঁহাদের
প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইবারও সম্ভাবনা ছিল।
Dr. Plongeon মারা (Maya) ভাষা এবং
Hieroglyphic অক্ষর পড়িতে শিখিয়াছিলেন;
যাহারা তাঁহার Queen Mao and the
Egyptian Sphinx কিংবা Sacred
Mysteries among the Mayas
and Quinches নামক গ্রন্থের পঠি
করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন
যে, কি পণ্ডীর অধ্যবসায়ের সহিত তিনি
ইহার চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু Dr.
Plongeon এই জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে



ইউকেটানের ধ্বংসাবশেষের একাংশ

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বেশবাসীর উপহাস এবং গুণা! উক্ত অমূল্যস্থানে তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল; এমন-কি, মৃত্যুর পূর্বে অর্থের অভাবে এবং বেশবাসীর এই নির্মম ব্যবহারে তিনি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন তাঁহার কার্যের মর্যাদা সকলেই বুঝিতে পারিবে। Chichen Itzaতে Chaacmol অথবা Prince Choc

সমাধি-আবিষ্কারের পর, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক অজ্ঞাত ইতিহাস জানিতে পারা গিয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের সময় Dr. Plongeon-এর সঙ্গে তাঁহার সহধর্মিণী এবং কতকগুলি নিরক্ষর লোক ব্যতীত অন্য কেহই সহায় ছিল না।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে মধ্য-আমেরিকায় যে নানা অজ্ঞাত জাতির অস্তিত্ব ছিল, তাহার বহু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। অধুনা-

আবিষ্কৃত কতকগুলি ধ্বংসাত্মক দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে শিল্প ও কারুকার্যে এই সকল মাত্রি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। Chichen প্রদেশের এই তৃণ-গুলি আজিও তাহাদের গঠনকারীর অতীত জাতির গৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এগুলি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বুঝিতে পারিয়াছেন, আসীরিয়া, বাবিলন এবং মিশরের সাবেক বাসিন্দারা যখন নগরবস্তুর বনে-বনে বিচরণ করিত, তখন Chichen-প্রদেশবাসীরা সভ্যতার সম্প্রীতি শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

এই প্রদেশে দুইটি ধ্বংসাত্মক দেখা যায়। প্রথমটিতে ছোটবড় নগরী প্রস্তর-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এখানকার অনেক পাথরের গারেও রকনার মূর্তি ও অক্ষর কোথা আছে। দ্বিতীয়টিতে সাতটি ক্ষোদিত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। বলাবাহুল্য, এদেশের এখনকার অধিবাসীরা এগুলির কোন সন্ধান রাখে না। দ্বিতীয় তৃণে প্রাপ্ত মূর্তি ও গৃহগুলির গারে নানা-প্রকার Hieroglyphic লিপি আছে। Dr. Plongeon-এর পূর্বে এই সকল প্রাচীন ও ইব্রিক-প্রধান লিপির পাঠোদ্ধার করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া প্রাচীন মিশরীয় লিপিরও অক্ষর পড়িতে শিখা করিয়াছিলেন।

সেই শিখা তাহাকে এ-দেশীয় লিপির পাঠোদ্ধারে অনেক সাহায্য করিয়াছে। কারণ, প্রাচীন "মারা"-ভাষার অনেক মিশরীয় অক্ষরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তৃণটি এ-প্রদেশে "সন্ন্যাসিনীর মঠ" বলিয়া বিখ্যাত। আর-পই

বলিয়াছি, এই "সন্ন্যাসিনীর মঠ" অনেক ক্ষোদিত প্রস্তর ও মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলিতে স্মৃতিরস্ত-লক্ষ্যে কয়েকটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। Mrs. Plongeon বলেন, এই স্মৃতিরস্ত ব্যাপারটি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মানবদম্ভাজ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আশ্চর্যের বিষয়, এখানকার প্রস্তর-লিখিত অক্ষরগুলি অধিকাংশ হলেই পুরাতন মিশরীয় অক্ষর ব্যতীত আর-কিছুই নহে। এই "সন্ন্যাসিনীর মঠ"র দক্ষিণদিকে চরিশ-ধাপের একটি স্তম্ভর সোপান আছে; তাহা পঞ্চাশতট চওড়া। এই সোপান বাহিরা নামিয়া গেলে আর-একটি অট্টালিকা দেখা যায়; তাহাতে সাতটি কামরা। বরগুলির গারে হরেক-রকমের ছবি আঁকা আছে; কিন্তু চূড়ামণির বিষয়, একটি চিত্রও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। Chichen-এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আর-একটি ব্রাহ্ম-গ্রাম্যদের মত স্তম্ভর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাহার নাম দিয়াছে, "কুনা"। "কুনার" অর্থ, ভগবানের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের দরজা পশ্চিমমুখী, ভিতরে একটি-মাত্র বৃহৎ ঘর। দেওরান নানাবিধ ছবিতে ভরা, ছাদ কোদাই-করা পাথরে তৈয়ারি। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই সকল পাথর ছায়ে লাগাইবার পূর্বেই কোদাই করা হইয়াছিল। ঘরের ছবিগুলিতে অনেক ভীষণাকার জীবের মূর্তি আছে; এই সকল জীবের অভিন্ন আজিও প্রমাণিত হয় নাই; বরং সেগুলি কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। সকল দেশের মত এদেশের লোকেরাও

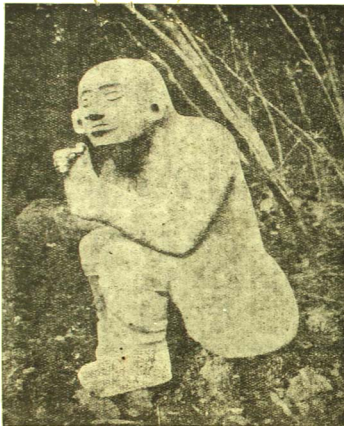


ইউকেটানে প্রাপ্ত একটি মূর্তি

অনেক কাল্পনিক জীবকে বিশেষ তর ও ভক্তি করিত। জীবগুলির নামও এখানে বেথিতে পাওয়া যায়; তাহা 'মারা'-ভাষায় লিখিত। এ-দেশের Prince Cohএর প্রেমের কাহিনী এবং মিশরের আইসিস ও ওসিরিসের প্রচলিত গল্প প্রায় একই ধরণের। আবার, এই গল্পটি প্রায় সকল দেশেই কোন-না কোন আকারে চলিত আছে, এমন-কি, বাইবেলে পৃথক এইরূপ একটি গল্পের আভাস পাওয়া যায়।

Prince Cohর কবর খনন করিবাক্স সময় একটি বৃহৎ প্রস্তর-মূর্তি বাহির হয়।

মূর্তিটির ওজন প্রায় ৩৫০০ পাউণ্ড। এখন সেটি মেক্সিকোর বাহুঘরে রক্ষিত। এই মূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে উইটি তাম্রাধারও পাওয়া গিয়াছে,—একটির ভিতরে কিছু ছাই আছে এবং অপরটিতে একটি অস্বাভাবিক্ত মনুষ্য-হৃদয় (human heart)। রাসায়নিক বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হইয়াছে, উহা মনুষ্য-হৃদয় ছাড়া অন্য-কিছুই নহে। মিশরেও এমন মনুষ্য-হৃদয় রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। Prince Cohর সমাধি ছাড়া এখানে আরও একটি সমাধি খোঁজা হইয়াছে। তাহা হইতেও আর-



মেক্সিকোর আর-একটি প্রাচীন মূর্তি

একটি মূর্তি এবং একটি ভাস্কর্য পাওয়া
 গিয়াছে। এই পাত্রটি এক বড় যে,
 ইহার উপরের ঢাকনাটি সরাইতে
 চার-পাঁচজন লোকের প্রকার হয়। এই
 পাত্রটির ভিতর ছাই এবং কতকগুলি গহনা
 ছাড়া আর-কিছুই পাওয়া যায় নাই।

মিশরীয় ভাষার আর এক-কৃত্যংশ শব্দ
 মারা-ভাষা হইতে গৃহীত। আরও একটি

বিশেষ আন্তঃযোগ বিবরণ এই যে, গ্রীক-ভাষার
 অনেক কথার সহিত এই মারা-ভাষার
 অনেক কথার মিল আছে এবং কতকগুলির
 মূল যে একমাত্র মারা-ভাষা, তাহাও
 প্রমাণিত হইয়াছে। মিশরে, যেসকল
 অমার্গুটি হইতে রক্ষা করিবার জন্য
 নীলনদে কুমারী-বিলম্বন দিবার প্রথা ছিল,
 Chichen প্রদেশেও এমনি এক প্রথার

চলন ছিল। তবে একেত্রে নবোত্তর আমেরিকার আত্মাঙ্কলার সঙ্গে মিসরীয় বিপ্লবের নীতি বিরুদ্ধতার মধ্যে কূপে কেলিফা বেওয়া হইত। চলতি দেব-দেবীর পূজা ছাড়া, দুই দেশেরই প্রাচীনজাতি একমাত্র মিসরকার পরমেশ্বরের গুণগান করিত। অতীতকালে জানা যায় যে, ইহাদের নববর্ষও একইসময়ে আরম্ভ হইত। মিসরের গ্রামবাসিনের যে মন্দির পাওয়া গিয়াছে, তাহার মুখের আদর্শের সঙ্গে যে আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ানদের মুখের হাঁচ আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়, একথাও আগে বলিয়াছি। তাছাড়া

এখানকার আত্মাঙ্কলার সঙ্গে মিসরীয় ভাস্কর্যের আদর্শ-সাদৃশ্যও সকলকার লক্ষ্যের বিষয়। পরন্তু, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, সাধ-সম্বাদ, পত্নপালন-চিকিৎসা এবং গার্হস্থ্য কর্মপদ্ধতি প্রভৃতিতেও মিসরীয়দের এবং মায়া-ভাষা-ভাবীদের মধ্যে অত্যধিক ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাই আবিষ্কার দেখিলে মনে হয়, এই মায়া-ভাষা-ভাবীরাই কোন কারণে যদেশ ত্যাগ করিয়া মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

ত্রিঃ—

মাসকাবারি

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

(১)

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ জর্জাণ লেখক হেনরিক ভন টুট্টের "পলিটিক্স" গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং জুন মাসের "লিটারেরি ডাইজেস্ট" পত্রে তার সমালোচনাও বাহির হইয়াছে।

নব্য জর্জাণির world politik বা বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ভিত্তি পত্তন করেন নিটুশে। নিটুশের "overman" বা অতিমানবে নবীন জর্জাণ আপনাকে প্রতিচ্ছবি দেখে। তারপক্ষ বাস্তববাদী সেই অতিমানবের অতীতব্যাপারটা যে অনতিদূরে, সেটা সাব্যস্ত করেন,—তিনি ইহারস্তর প্রায়শই আঁকিয়া দেখেন। নবমানু তার উপরে গড়িয়া তুলিলেন এই যে—অষ্ট্রো-মার্কীয় সঙ্গে

জর্জাণির মোট বাহিলে অবৈধ জর্জাণ-অতিমানবের কাছে বিশ্বমানব পরাস্তব মানিতে বাধ্য। সবশেষে টুট্টের রাষ্ট্রতত্ত্বের এক বিশাল গম্বুজ তৈরি করিয়া এই ভিত্তির উপর নির্মাণকে সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

টুট্টের মতে রাষ্ট্রই সর্বোচ্চ—রাষ্ট্রের বাড়ি আর কিছু নাই। রাষ্ট্রের ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছার অগ্রকূল হোক বা প্রতি-কূল হোক, সেই ইচ্ছাই সর্বজনীন হইবে—কেননা ব্যক্তি রাষ্ট্রের অধীন, রাষ্ট্র ব্যক্তির অধীন নয়। কোন রকম আন্তর্জাতিক বিচার-সভার দ্বারা এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, ইতিহাসের শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিবাদের বিসংবাদে নিষ্পত্তি হইবে। অতএব টুট্টের বলেন যে, রাষ্ট্র যত বড় হয় ও যত ক্ষীণ হয় ততই তার

সৌরব—বড় রাষ্ট্র ছোট রাষ্ট্রকে আত্মনাৎ সব interest। সব স্বত্বশক্তির স্থান হইতেই করিয়া বড় হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

“লিটারেরি ডাইজেট” পত্র ট্রিট্‌য়ের এই রাষ্ট্রনীতিকে নিন্দা করিয়াছেন। ইংরাজি অনেক কাগজেই ইহার কড়া জবাব বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ রাষ্ট্রনীতিকে একমাত্র নব্য জর্মানির রাষ্ট্রনীতি বলার কোন অর্থ নাই। ইউরোপের সকল দেশেই আর রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবের আব আর সকল বড়বিক্ সকল মহত্ত্বতিকে ছাড়াইগ ও চাপা দিয়া একরাট ও বরহু হইয়া উঠিয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। একটা জাতির শিল্পজীবন, সাহিত্যজীবন, ধর্মজীবন, ধর্শন-জীবন, শ্রম-জীবন, বাণিজ্য-জীবন, প্রভৃতি জীবনের নানা বিভিন্ন বিক্ আছে এবং জাতির সর্কাক্সন বিকাশের পক্ষে সে সকল বিভিন্নতার স্থান রাষ্ট্রনীতির চেষ্টে কিছুমাত্র কম নয়। অতএব, রাষ্ট্রবের সমূহ-চৈতজ্ঞের (mass-consciousness) একটা বিশেষ দিকের একটা বড় রকমের প্রকাশ যদি রাষ্ট্র হয়, তবে সেই সমূহ-চৈতজ্ঞের অস্ত্রান্ত বিক্ জুলির প্রকাশের অস্ত্র-ঐ এক ধরনের পলিটিক্স-সর্কব তপৈব স্তের-নীতি-মণ্ডনীতি-কূটনীতি-সর্কব রাষ্ট্রে বখন কৃপাইবে না, তখন নানা আধার—নানা রাষ্ট্র—নানা কেন্দ্র কেন না তৈরি হইবে? কোন রাষ্ট্রব ছইটা, কোন রাষ্ট্রব পাঁচটা কেন্দ্রের সহিত যোগ রাখিবে—যার যেমন শক্তি ও ইচ্ছা সে ততগুলি কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে। ঐ একটা কেন্দ্রের মধ্যেই রাষ্ট্রবের

এখনকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র-নীতির একচেটিয়া আধিপত্যে রাষ্ট্রবের অস্ত্রান্ত স্বত্বশক্তিগুণা বাটগত ভাবে ক্ষুতি পাইতেছে বটে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে—জাতিগত ভাবে—ক্ষুতি পাইতেছে না। এ আক্ষেপ রাস্কিন করিয়াছেন, কার্লাইল করিয়াছেন, সম্ভ্রতি বার্ট্রেও রাসেল আরো ক্ষুতর ভাবে করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর “নেশন” গ্রন্থে সেই পুৰাণে আক্ষেপটাকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। অতএব ট্রিট্‌য়েকে যা দিতে গেলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিটাকেই যা দিতে হয়, কারণ ট্রিট্‌য়ের স্টেট-বরহুয়ের আদর্শটা শুধু নব্য জর্মানির নয়, সেটা সমস্ত ইউরোপেরই। কোথাও প্রবল কোথাও দুর্বল আকারে সেই আদর্শ ইউরোপের দেশে দেশে জাগ্রত।

“নেশন” গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এই যে রাষ্ট্র ব্যক্তিব্যকে চাপিয়া রাহিতেছে, স্বতরাং তিনি চান যে রাষ্ট্র-কৃহক হইতে ব্যক্তি পূর্ণভাবে মুক্ত হয়, ব্যক্তি আপন স্বরূপে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমষ্টি-চৈতজ্ঞ বাহাতে প্রতি ব্যক্তির চৈতজ্ঞ হয়, ব্যক্তি বাহাতে সর্কাক্স হু হয়, এক্ষেত্রে সমূহাক্স হু হয়, সেই অস্ত্রহিতো রাষ্ট্রের উদ্ভব, নেপনের উৎপত্তি। ইতিহাসের ক্রমবিকাশের দ্বারায় এ উৎপত্তির কারণটুকুকে অস্বীকার করিবার শক্তি কাহারও নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্র বা “নেশন”ের দ্বারা সমষ্টি-চৈতজ্ঞের

একটা মনু আনন্দিক দিক্ মাত্র প্রতি-
বাক্তির চৈতন্যে অনুভূত হইয়াছে,—কেবল
ঐ পলিটিক্সের দিক্টা। সেই সঙ্গে
অজ্ঞাত দিক্গুলিও যদি প্রতি বাক্তির
চৈতন্যে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিত,
তবে পলিটিক্স তার জাঘা হান ও
অধিকারকে ছাড়াইয়া এমন একান্ত ও দুর্দান্ত
হইয়া উঠিত না। ব্যক্তি তাহা হইলে বৃহৎ
হইত, ব্রহ্ম হইত। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির
বিরোধ ভঞ্জন হইত।

আগলে মানুষের চৈতন্য বহুকেত্রিক ;
স্বতন্ত্রাঃ চৈতন্যের প্রকাশও একটিমাত্র
কেন্দ্রকে আশ্রয় করিতে পারে না। তার
অজ্ঞান নানা কেন্দ্র চাই, নানা রাষ্ট্রতন্ত্র চাই।
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরস্পরের
সঙ্গে পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী সন্ধক থাকেও
চাই। অতএব, monistic state অর্থাৎ,
অদ্বৈত এক ঠেটের আদর্শও অসম্পূর্ণ,
আবার pluralistic state অর্থাৎ, অসংখ্য
ঠেটের আদর্শও অসম্পূর্ণ। একমাত্র স্বয়ং ঠেট
যে মানুষের আর আর সকল দিক্কে
চাশিয়া বড় হইবে তাও ঠিক্ নয় এবং
বহু বিচিত্র unions বা সমবায় যদি
দাঁড়ায়, তবে তাদেরও কোথাও ঐক্য
না থাকিলে তাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য
হইবে না। টিউন্সের “পলিটিক্স”কে এই দিক্
হইতে সমালোচনা করা হাইতে পারে।
কিন্তু নব্য জর্জাপির দানবীর উৎপাতের
সঙ্গে টিউন্সের রাষ্ট্রতন্ত্রের ঐকান্তিক সন্ধক
আছে বলিয়া সে রাষ্ট্রতন্ত্র বিশেষভাবে ‘অর্থপূর্ণ’
—একথা বলিলে, অর্জনতা বলা হক্
মাত্র।

কিন্তু রসিক (বিনি কবি এ, ই, নামে
খ্যাত) টিউন্সের রাষ্ট্রের আইডিয়াকে অজ্ঞ
একভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ইনি
আইরিশ এবং আরলওঁর স্বাধীনতাকামী,
স্বতন্ত্রাঃ এ বিষয়ে ইহার কথাটা প্রশিধান-
যোগ্য।

“Imaginations and Reveries”
নামক তার সবপ্রকাশিত প্রবন্ধপুস্তকে
“The spiritual conflict”—প্রবন্ধে এ বিষয়ে
তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তার
আলোচনার মোট কথাটা এই : তিনি বলেন,
প্রত্যেক যুদ্ধের ভিতরেই একটা বড় আইডিয়া
নিহিত থাকে। ফরাসী বিপ্লবের কালে
গণতন্ত্রের আইডিয়াটা সকলের চেয়ে বড়
আইডিয়া ছিল, তাই মানুষের মনে মনে
তার রূপের অঙ্গাঙ্গ্য প্রতিরূপ দেখা দিয়া-
ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের জিহা-
প্রতিক্রিয়ার নিয়মের মত একটা আইডিয়া
পৃথিবীতে যেমনি বড় হইয়া ওঠে, অমনি
তার প্রতিজিহা সূক্ষ্ণ হয় এবং তার উল্টা
আইডিয়াটা ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে
থাকে। তাই ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রের
আইডিয়ার পরিবর্তে এখন উঠিয়াছে নব্য
জর্জাপির যন্ত্রবদ্ধ বিপ্লবারতন ট্রেট-আইডিয়া।
আগে ছিল এইকথা যে, ট্রেট আছে ব্যক্তির
মস্ত, ট্রেট ব্যক্তির অধীন। এখন কথা
দাঁড়াইতেছে এই যে, ব্যক্তি আছে ট্রেটের
মস্ত, ব্যক্তি ট্রেটের অধীন।

ফরাসী আইডিয়াকে যেমন বাহির
হইতে সমস্ত ইউরোপ এবং ভিতর হইতে
নেপোলিওনের মত প্রবলশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি

পরাকৃত করিতে পারেন না, তখন অস্বাভাবিক আইডিয়াস বিকল্পে বসিতে পারেন। সত্যাপণ দাঁড়াইলেও সে আইডিয়া সহজে পরিত্যক্ত হইবার নয়। এখনই তার প্রত্যাবের লক্ষণ চতুর্দিকে দেখা যাইতেছে। অজ্ঞাত সকল দেশের রাষ্ট্রই অজ্ঞাতনারে জয়মান হুঁচকি গড়িয়া উঠিতেছে—ক্রমশঃ আরো গড়িয়া উঠিবে। ভবিষ্যতে ইউরোপের সকল দেশে টেটুই যে সর্ববিষয়ে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করিবে, তাহা এখন হইতেই দৃষ্টব্য হইতেছে।

রাসেল মনে করেন যে, তখন সাহিত্যেরও বদল হইবে। গণতন্ত্রের প্রভাবে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিগোচ্রে বেশিমানার—সে সাহিত্যের কাব্য ব্যক্তিত্বের কাব্য, একটি মাত্র ব্যক্তির জন্মের কথা এবং সে সাহিত্যের উপভাস ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচিত্র সম্বন্ধকেই উদ্ভাটন করিয়া দেখায়। ভাবী ট্রেডিংয়ের প্রভাবে যে সাহিত্য জন্মলাভ করিবে, তাহাতে বহুব্যক্তিত্বের সমষ্টিগত রূপ দৃষ্টিগোচর বলিয়া মনে হয়, সাহিত্য সেই অখণ্ড সমষ্টিকে, সেই সমষ্টি-চৈতন্যকে তার কাব্য-উপভাসে প্রকাশ করিতে থাকিবে।

তার মানে দুই বিকল্প আশ্রয়ের মধ্যে দোলকের (Pendulum) মত বিঘ্নমানব যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে—একবার ব্যক্তিত্ব হইতে সমষ্টিতন্ত্র, একবার সমষ্টিতন্ত্র হইতে ব্যক্তিত্বের। মধ্যযুগের ইউরোপে সমষ্টিতন্ত্র ছিল ধর্ম, চর্চ ছিল সমষ্টিতন্ত্রের রূপ। সেটা ভাঙিয়া হইল অসংখ্য অগণ্য ব্যক্তিত্ব। আবার এখন একটা বৃহত্তর

সমষ্টিতন্ত্র রচনার প্রয়াস দেখিতেছি। কিন্তু ব্যক্তিত্বই বলি আর সমষ্টিতন্ত্রই বলি, এ সম্বন্ধে কি আশ্রয় লীলার এক একটা রূপ মাত্র নয়? সেই লীলাই ব্যক্তিগত সমাধান এমনি করিয়াই তো স্থির করিতেছে। ব্যক্তিকে সমষ্টি গ্রাস করিয়া দাঁড়ায় এও সে চায় না, আবার ব্যক্তিই সর্বগ্রাসী হইয়া ওঠে, এও সে চায়না। অতএব এই যে ব্যক্তি ও সমষ্টি, ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিতন্ত্রের ভিতরকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, ইহার দ্বারা আমাদের অধ্যাত্মজীবন পূর্ণতার হইয়া উঠিতেছে, সন্দেহ নাই।

রাসেলের কথা শেষ করিলাম। এই ধরণের লীলাভবের একটা দৃষ্টান্ত এই যে, তাহা ভালমন্দের পার্থক্যকে অনেক সময় লুপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ আশ্রয় পায়। যদি এটা সত্য হয় যে, জন্মান ট্রেডিং ব্যক্তিকে মারিয়া, ব্যক্তির অসীম মূল্য ও অবাধ স্বর্ধৃষ্টি ও সম্প্রসারণকে বর্জ্য করিয়া তবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তবে ঐখানেই যে মত্ত বড় একটা গলগ থাকিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সেখাইতেছেন যে, ঐখানেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিমান-বীজ নিহিত রহিয়াছে। টেট সর্বসংস্কার হইলে পলিটিক কাটাগাছের মত মানুষের জীবনজীবনের অজ্ঞাত সকল পূর্ণবিকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া একান্ত হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। তার আভাস এখনই ঘণ্টে পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং তার আরো ভবিষ্যৎ বিকাশ দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই টেট-বহুত্বকে আশ্রয় বিগ্রহ মনে করা আশ্রয় জীবনের পক্ষে কল্যাণকর কিনা,

তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কেননা এর মধ্যে স্পষ্টই যে অজ্ঞার ও অকল্যাণ রহিয়াছে। এই মুহুর্তটাই সেই অজ্ঞার ও অকল্যাণের পূর্ণীভূত রূপ, সেই অজ্ঞারের সুনিশ্চিত পরিণাম। সুতরাং ভবিষ্যতে ঠেটতর যদি সর্বগ্রাসী হয়, তবে তাহা মাহুবেয় কল্যাণের আকর হইবে না, সুতরাং মাহুয তাকে সহ করিতেও পারিবে না। তাকে ভাঙিয়া মাহুযকে নিজের মুক্তির রাস্তাটাকে পরিষ্কার করিয়া দিতেই হইবে।

ঠেট-বরষার আদর্শের মধ্যে আদ্যার দর্শকের লীলা যেমন ক্ষুণ্ণি পাক, মাহুযের বিভিন্ন স্বরূপ-লীলাকে তাহা পীড়িত ও ব্যাহত করে বলিয়াই সে আদর্শকে পরিহার করিতে মাহুয বাধ্য। অবশ্য বিকল্প আদর্শের সংঘাতেই আমরা সত্য আদর্শের পরিচয় পাই—এ হিসাবে বিকল্প আদর্শ আসা স্রেয়স্কর, এ কথা মানিতে কারো আপত্তি হইতে পারে না।

আর্টের আদর্শ

ত্রিভুজ রাধাকমল সুখোপাধ্যায় তাঁর বৈশাখের উপাসনার “বাংলার ভাবী সাহিত্য” সঞ্চকে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁর উপ-সংহারে আর্টের আদর্শ সঞ্চকে এই ক’টি কথা আছে :—

{ “পুরাতন আর্ট ” }

“আর্ট” তবু আর্টের জন্ত। আর্ট নিরালস্ক। জীবনের অস্থল্যর বিখ্যা ও অকল্যাণের সঙ্গে তাহার সঞ্চ নাই।

{ “ভাবী আর্ট ” }

• “আর্ট দারিদ্র্যজনে জীবন্যক সংশ্লেষিত

ও কল্যাণের চরিত্রে আর্ট জীবনের শিখর।
এই সঞ্চকে আর্ট সঞ্চকে ভবিষ্যৎটি করিবার
অধিকার রাধাকমল বাবুর আছে কিনা তাহা
জানি না। সুতরাং ভবিষ্যৎ আর্টের কথা
ভবিষ্যতের জন্ত মূলভূমি থাকুক। উপস্থিত
বর্তমান আর্টের সমালোচনা-ক্ষেত্রে এটা
প্রায় প্রত্যাহই দেখিতে পাইতেছি যে, এক
মল লোক সামাজিক মলশায়কলের দিক
হইতে আর্টের বিচার করেন এবং অন্য
মল বলেন আর্টের কাজ কেবলমাত্র আনন্দ
দান করা,—সামাজিক স্তোত্রভেদে সঙ্গে তার
একান্ত সঞ্চ নাই। ঐ “উপাসনা” কাগজে
প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই পড়া যায় যে বাংলা
সাহিত্যের আধুনিক গল্প-উপন্যাসগুলি
সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে,
অতএব হিন্দুসমাজের সীতাসাহিত্যীত্বপী
কুলবধূয়ের ঐ সকল উপন্যাস পড়া একে-
বারেই উচিত নয়। পরপুরুষের সঙ্গে কোন
বিবাহিতা রমণীর অবৈধ প্রেমা-ব্যাপার যদি
কোন উপন্যাসের আখ্যান-বস্ত হয়, তবে
সে কাহিনী বতই বস্ততর হোক এবং তার
পরিণামটা যেমন স্থল্য ও মহৎ হোক না
কেন, দেখিতেছি যে, সমাজের অস্তিত্বকে
মল শুধু সেই উপন্যাসকে গালি দিয়া কাত
হঁ না, উপন্যাস-রচয়িতার চরিত্র সঞ্চকেও
অজ্ঞভাবে কটাক্ষপাত করিতে লজ্জা বোধ
করেন না। কাজেই তখন অন্যদিক আর্টের
মোহাই জানিবার বলেন যে, সমাজের দিক হইতে
কোন জিনিসটা ইষ্টকর বা অনিষ্টকর
আর্টের সে জন্য কোন মাধ্যম্য নাই।
গল্প বা উপন্যাসের বিষয় যেমন হোক
না কেন, রচনাটা কল্যায়োত্তমবর্ণ ৩

রসযুক্ত হইয়াছে কিনা সেটাই আরেক বিষয়।

আমলে তর্কটা আটের সঙ্গে সমাধের সম্বন্ধ লইয়া গাড়ায় না—আটের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ বিচার লইয়াই—এই তর্ক। অর্থাৎ ওয়াটার পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড্ প্রভৃতির সঙ্গে আর রাব্বিনের আটের আদর্শের যে ভেদ, বাংলা সাহিত্যে বাবা আর্ট সম্বন্ধে বাদ্যজ্ঞানে লাগিয়াছেন তাঁদের দুই গুলের মধ্যেও সেই ভেদ দেখা যাইতেছে। তর্কটা সেই পুরাণে তর্ক, বাংলা দেশের মাটিতে নূতন করিয়া গজাইতেছে মাত্র।

অস্কার ওয়াইল্ডের The Picture of Dorian Gray নামক উপন্যাস যখন প্রথম বাহির হইল, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক গুলি সংবাদপত্রের কিছুকাল ধরিয়া তুমুল মসীযুক্ত চলিয়াছিল। তখন ওয়াইল্ড বলেন, আটের সঙ্গে নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। আমি কেন এমনতর উপন্যাস লিখিয়াছি, তার একমাত্র জবাব, আমার খুসী। তাই তিনি, পেটার ও সিমন্স প্রভৃতি এই মত ঘোষণা করিলেন যে, আর্ট আটের জন্য, আটের সিক্ হইতেই আটের বিচার করিতে হইবে।

পঞ্চাশতাব্দে রাব্বিন তাঁর সমস্ত আর্ট—সমালোচনার এই মতটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, আটের সঙ্গে নীতির অবিলম্বে সম্বন্ধ, উচ্চ নৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন উচ্চতরের আর্ট একেবারেই সম্ভব হইতে পারে না। রাব্বিনের Lectures on Art, The Two Paths, প্রভৃতি সর্বজনবোধ্য রচনাকলি পড়িলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, রাব্বিন

আগপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যখন কোন জাতির নৈতিক অবনতি ঘটে তখন কখনো কখনো তার আটের আপাতঃ উৎকর্ষ দেখা গেলেও সেটা আসল উৎকর্ষ নয়, বরং সেটা অশুভকর্ষ। কারণ আর্ট যখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সহজে যোগযুক্ত, যখন সেই বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীকরণ করা হয়, ব্যাখ্যা করাই (interpret) আটের কাজ, তখন মানুষের সমস্ত বৃত্তি-গুলি বলিষ্ঠ সতেজ হুহ ও হুহর থাকে। আর নানাকারে যখন মানুষের সমাজে নৈতিক বিকার দেখা দিতে থাকে, যখন বিলাসিতার ঘুল সমাজকে ভিতর হইতে জীর্ণ করিতে থাকে, তখন যে সৌন্দর্য আর্ট জন্মায়, তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ থাকে না। সে আর্ট অপকৃত আর্ট।

রাব্বিন বা অস্কার ওয়াইল্ড্ এসের কারো মতকেই আধুনিক রসজ্ঞের পাকা মত মনে করেন নাই। আটের মধ্যে সব ক্ষেত্রেই নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণার সন্ধান করিতে গিয়া রাব্বিন্ যে সব সময়ে আর্ট সম্বন্ধে সুবিচার করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। একটা অত্যন্ত স্পষ্ট উদাহরণ আমার মনে পড়িতেছে। The Two Paths গ্রন্থে “Conventional Art” সম্বন্ধে যখন রাব্বিন বক্তৃতা দেন, তখন তারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ ঘটয়াছিল এবং সিপাহীদের নৃশংসতার অতিরঞ্জিত খবর সমুদ্রপারে ইংলণ্ডে পৌছিতেছিল। রাব্বিন তাঁর সেই বক্তৃতায় বলিলেন “যে, ভারতবর্ষের কলাসামগ্রীর দৌর্ভাগ্যবৈচিত্র্য ও বর্ণের বাহার অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু তারতবর্ষের লোক যখন

নীতিতে এত দুর্বল, এমন সব লোভবর্ষণ-কাণ্ড যখন তারা অনায়াসে করিতে পারে—তখন তাদের আর্টের মধ্যেও নিশ্চয় দুর্বলতা আছে। নৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে আর্টকে অতিমাত্রায় জড়াইবার চেষ্টা করিলে এরিতর জুল সমালোচনার আশঙ্কা থাকে।

এইজন্ম হুইস্‌লার আর্টকে পুনরায় নীতির আধিপত্য হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য একলাে একথা কেহ বলেন না যে, আর্টের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নাই, বরং এই কথাই সর্বত্র শোনা যায় যে আর্টই জীবনের প্রকাশক, আর্টই জীবনের উদ্ঘাটক। তবু আর্টের বিচার যে ধর্মনীতির দিক্ হইতে বা চারিত্রের দিক্ হইতে হওয়া উচিত নহ, এ সম্বন্ধে বোধ করি কারো দ্বিমত নাই।

কারণ, ঐ রকমের কোন একটা খিওরি বাড়ী করার একটা প্রধান মূর্ত্তিল এই যে, তারপর হইতে সেই খিওরির সঙ্গে আর্টের সব ছাঁদগুলোকে মানান্দাই করিবার জন্ত মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা প্রবল তাসিন্দা জাগিয়া উঠে। যেটা বেমানান, সেটা তখন তখনি বাতিল হইয়া যায়। এবং অতঃপরে দেখা যায় যে, কোন খিওরিতে এমন সম্পূর্ণ নয় যে আর্টের সব ছাঁদগুলো তার আওতার মধ্যে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় লইতে পারে। বাড়ির খিওরির জন্ত পোপ তাঁর কাছে ইংরেজ কবিরের মধ্যে একজন উদ্বোধন করি বলিয়া গণ্য ছিলেন। উল্লেখ্য খিওরির জন্ত আধুনিক পনেরো আনা সাহিত্য তাঁর What is Art গ্রন্থে সাহিত্যের এলাকা হইতে নির্দাসন দণ্ড পাইয়াছে।

খিওরি বাড়ি। এই কথাটাই কলিয়া বান-
কোন শিরবস্ত্র যখন করেন,
তখন তিনি আপনার অস্ত্রতর আশ্রকেই
অহরণ করেন এবং যে পরিমাণে তিনি
আপনার ভাবনিগূঢ় ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ ছাপটি
তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন,
সেই পরিমাণেই কলাশ্রুতা হিসাবে তাঁর
সার্থকতা। বাড়ির কোন খিওরি বা
মানস ও বা মডেল যদি তাঁর কল্পনাকে
কিছুমাত্র অতিক্রম করে, তবে সেইখানেই
তাঁর কার খরাপ হইয়া বাইতে বাধ্য।
সেইজন্ম কোন আর্টস্ট্রি নৈতিক কি
অনৈতিক সেটা বিচারের বিষয় নয়।
কেননা এটা সত্য যে, আর্টিষ্ট যে-পরিমাণে
মহৎ উশলিক করিবার শক্তি রাখেন, সেই
পরিমাণে তাঁর রচনার মধ্যে মহৎ আপনিষ্ট
অজ্ঞাতসারে ক্ষুণ্ণ হইবে। এবং যদি বা
কোন নৈতিক আদর্শ তাঁর রচনাতে নাও
পাওয়া যায়, তবু এমন কিছু পাওয়া
যাইবেই বা মূল্যনতাকে শ্রীহীনতাকে লক্ষ্য
যের, বা মঙ্গলে যখনই অবিলম্বে যোগকে
প্রকাশ করে। হুইস্‌লার আর্ট-শ্রুতির রসাহু-
ত্বটির প্রসার ও গভীরতা কতখানি, তাঁর
উপরেই 'আর্টের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর
করে। সেইজন্মই আর্টিষ্ট মানবের শিক্ষক
হইতে পারেন না; কারণ, আর্ট হইতে
আমরা - যে শিক্ষা পাই সেটাকে গোপ
শিক্ষা বলিতে পারি—ধর্মনীতি বা সমাজ-
নীতির শিক্ষার মত সে শিক্ষা মুখ্য শিক্ষা
নয়। আর্ট আমাদের রসাহুত্বকেই
গভীর, প্রসারিত, সুমার্জিত ও সুন্দর
তোলে, এই হিসাবে তাহা শিক্ষা দেয়

বসি বস, ভাবে তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সে শিক্ষা বিশ্বের সকল দিকের সম্বন্ধেই দিয়া থাকে, সে শিক্ষা আকাশও দেয়, চাঁদও দেয়, গাছপালাও দেয়। সুতরাং তাকে শিক্ষা নামে দেওয়ার দরকার কি? খিওরি হইতে যেমন আটের জন্ম হয় না, আট নিজেও তেজি কোন খিওরির অঙ্গদাতা নয়।

কিন্তু কোন খিওরি না হইলে আটের বিচার কেমন করিয়া হইবে? আটের বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ আটটি তাঁর ভিতরকার কোন vision বা কোন রস-ভাব তাঁর কলাস্থিতিতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আট-রসিকের কল্পনাগটে বা মানসগটে সেই প্রকাশ কি পরিমাণে আপনার ছাপ স্থায়ীভাবে রাখিয়া যাইতে পারিল, তারও খবর লইতে হইবে। কেননা কবির সব চেয়ে বড় কবিতা কাব্যরসিক, চিত্রকরের সব চেয়ে বড় চিত্র চিত্রের সমজ্ঞান। শিল্পীর চিত্তের সঙ্গে রসিকের চিত্তের যোগ হয়—শিল্পের ভিতর দিয়া। বিশ্বের রসকে শিল্পরসিক চাখেন শিল্পীর রসরচনায়, আবার শিল্পরসিকের রসালো ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া শিল্পীর রচনার রসকে গোড়ামনেরা চাখিয়া থাকেন। এই জন্ত কবির চেয়ে কাব্যরসিক নূন নন,

শিল্পীর চেয়ে শিল্পরসিক খাটো নন। মাটির বা ঘিলেট বা করট বা রসোটিকে বৃত্তিত হইলে সাধারণ ব্যক্তিকে শিল্পরসিকেরই শরণাগত হইতে হয়। সেখান হইতে রসোন্মেষ হইলে পর হরত লেই ব্যক্তি ঐ সকল চিত্রকরের চিত্রে বড় বড় শিল্প-রসজ্ঞও যাহা দেখেন নাই, এমন কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন—হরত সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে ঐ সকল চিত্রকরের চিত্রের রসব্যাখ্যা করিতে পারেন। শিল্পস্থিতি বিশ্ব-স্থিতির মত চিরকাল নব নব রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে বলিয়াই শিল্পস্থিতি সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট খিওরি খাড়া করা চলে না।

বাংলা সাহিত্যে ধারা খিওরি লইয়া যারামারি করেন, তাঁদের রচনার রসবোধ ও রসবিশ্লেষণের ক্ষমতার পক্ষ পৰ্য্যন্ত পাই না। কবি রাসেল তাঁর একটা লেখার গল্প করিয়াছেন যে, একজন আইরিশ ক্রিটিক সমস্ত সন্ধ্যাবেলা Constable Monet প্রভৃতির চিত্রে মুগ্ধজ্ঞিত এক ঘরে বসিয়া আট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গেলেন অথচ একবার ছবি-গুলির দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। আটের আদর্শ এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে সে সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক না করিয়া কোন একটা আটের নোদুখ উপভাটন করিয়া দেখাইলে আটের মর্যাদা রক্ষা হয় এবং বাংলার পাঠকবর্গেরও কাণ জুড়ায়।

শ্রীঅমিতকুমার চক্রবর্তী।



白雲(白雲)

ভারতী

৪১শ বর্ষ]

আশ্বিন, ১৩২৪

[৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্যায়োগ

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে সকল শ্রেণীর দৃষ্টকাব্য অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়, ব্যায়োগ তাহার অন্ততম। ‘ব্যায়োগ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ,—“যাহাতে বহু পুরুষ-চরিত্রের যোজন। হয় তাহাই ব্যায়োগ।” (“ব্যায়ুজ্যন্তে অগ্নিন্ বহবঃ পুরুষা ইতি ব্যায়োগঃ”) এই ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতেই বুদ্ধিতে পারা যাইতেছে যে ব্যায়োগ-শ্রেণীর নাট্যে স্ত্রী-চরিত্র অল্প ও পুরুষ-চরিত্রই অধিক থাকে। এই প্রধান লক্ষণ ভিন্ন ব্যায়োগের অন্ত লক্ষণও আছে। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে নিবলিখিত রূপে সুভগির নির্দেশ করিরাছেন :—

“ব্যাত্তিতত্ত্বো ব্যায়োগঃ বহুগুণনসংযুতঃ ।

হীনো গর্ভমিন্দ্র্যাত্ম্যং নৈরর্থতত্ত্বিরাশ্রিতঃ ।”

একাক্ষর্য জবেত্রানিবিদ্যসমরোষমঃ ।

কৈশিকীযুগ্মিরিত্তঃ প্রত্যাক্ষতত্ত্ব নারকঃ ।

রাজধিগুণ লিখো ॥ বা জবেত্রানিবিদ্যতত্ত্ব সঃ ।

হাত্তপুত্রাশ্রিততত্ত্ব ইতরেত্র আশ্রিতো রসঃ ।”

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২৩১-২৩৩ শ্লোক । বোম্বাই সংস্করণ
৩৩৬ পৃষ্ঠা]

“ব্যায়োগ যে ইতিবৃত্ত লইয়া রচিত তাহা বিখ্যাত হওয়া চাই। ইহাতে স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা অল্পই থাকিবে; গর্ভ ও বিন্দ্র্য ব্যায়োগে থাকিবে না। ইহাতে বহু পুরুষ-চরিত্র থাকিবে। এক একে ব্যায়োগ সমাপ্ত হইবে। ইহাতে গুণে বুদ্ধ থাকিবে, তাহা স্ত্রীনির্মিত হইবে না। ব্যায়োগে কৈশিকী বৃত্তি প্রযুক্ত হইবে না। দ্বিবা পাত্র অথবা রাজর্ষি ব্যায়োগের নায়ক হইবে। নায়কের ধারোদ্ধত গর্ভাশ্রিত হওয়া চাই। হাত্ত, শূদ্র ও শত্রু ভিন্ন অন্ত যে কোন রস ব্যায়োগের অপৌত্ব হইতে পারিবে।”

সংস্কৃত নাট্যে সকলজি প্রযুক্ত হয়। প্রথমে নাটকের ইঙ্গীতৃত ঘটনায় প্রদর্শিত হয়; ইহা মুখ-সন্ধি। পরে ঐহং-রূপে উক্ত বীজ-বস্তুক কারণ প্রকাশ করা হয়; ইহার নাম প্রতিমুখ-সন্ধি। তাহার পর এই বীজ অধিক প্রকাশ পাইলে অস্ত্র কারণাদির দ্বারা তাহা হ্রাস বা অধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই গর্ভ-সন্ধি। গর্ভ-সন্ধি অপেক্ষা অধিক বিকাশ বা অস্ত্রায় প্রভৃতি দ্বারা সজোড় বধি পরে প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে তাহা বিমর্শ-সন্ধি আখ্যা লাভ করে। আর যেখানে মূখ্য ঘটনা অস্ত্রান্ত্র বিক্ষিপ্ত ঘটনার সহিত উপসংহার প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্বহণ-সন্ধি-রূপে কথিত হইয়া থাকে। (১)

ইংরাজী নাট্য সাহিত্যে পঞ্চাশ নাটকে এক এক আঁকে এইরূপ সন্ধির প্রয়োগ দেখান হইতে পারে। সংস্কৃত নাটকে কয়টি অঙ্ক থাকিলে তাহা নির্দিষ্ট না থাকায়, অঙ্ক ধরিয়া এইরূপ বিভাগ দেখান

দেয়া যাইবে। কিন্তু এটা স্থির যে সকল দেশের নাটকেই এইরূপ সন্ধি দেখান হইতে পারে। মূল ঘটনার অবতারণা (মুখ-সন্ধি), তাহার ঐক্যবিকাশ (প্রতিমুখ-সন্ধি) অস্ত্রান্ত্র বিরোধী ও অস্থূল ঘটনার সহিত সংঘর্ষ (গর্ভ-সন্ধি), এই সংঘর্ষের বিস্মৃতি (বিমর্শ-সন্ধি) ও পরিশেষে সমাপ্তি (নির্বহণ-সন্ধি) ইহা আর সকল নাট্যেই অস্বাভাবিক পরিমাণে বিস্তারিত থাকে।

ব্যায়োগ এক আঁকে সমাপ্ত বলিয়া ইহাতে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি থাকে না। অর্থাৎ বৃহদবয়ব নাটকে মূল ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে অস্থূল বা প্রতিমুখ অস্ত্রান্ত্র বিবিধ ঘটনার মধ্যে ফেলিয়া যে আলোড়ন দেখান হইয়া থাকে, ব্যায়োগে তাহা হইবার উপায় নাই। মূল ঘটনাটি অবতারণিত হইয়া (মুখ-সন্ধি) তাহার ঐক্যবিকাশের পরেই (প্রতিমুখ-সন্ধি), একে-বারে উপসংহার (নির্বহণ-সন্ধি) প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যায়োগের অবয়বের অন্তর্গত হেতুই এইরূপ ঘটনা থাকে, তাই বিখ্যাত

(১) "মুখঃ প্রতিমুখঃ গর্ভো বিমর্শ উপ-সংস্কৃতিঃ।

ইতি পঞ্চাশ তেজাঃ শ্রীঃ ক্রমায়তনমুদ্রাতঃ।

বত্র বীজ-সমুৎপত্তিনীবার্হরস-সমুদ্রা।

প্রাক্তন সমাবৃত্তিসমুখ্য পুরিকীর্তিতম্।

*কলত্রানোপায়স্ত মুখসন্ধিবিবেচিনঃ।

সম্বাদিকা ইবোক্তেযঃ বত্র প্রতিমুখঃ ৫ ভবঃ।

কলত্রানোপায়স্ত প্রাপ্তস্ত্রিত্ত কিলন।

গর্ভো বত্র সমুদ্রো হ্রাসাবেশবান্ মুখঃ।

বত্র মুখ্যকলোপায় উক্তিযো গর্ভতোহধিকঃ।

শাপাঙ্কঃ সান্তরায়স্ত স বিমর্শ ইতি স্ততঃ।

বীজবজ্রাঃ মুখান্তর্গা বিপ্রকীর্ণাঃ ধ্বাববন্। * *

এবার্হরসনীক্রে বত্র নির্বহণং হি স্ততঃ।"

[সাহিত্য-বর্ণনঃ। ঘট-পরিচ্ছেদঃ ৭ বোধাই সংস্করণ, ২০০, ২০৪ পৃঃ]

ব্যায়োগের লক্ষণে লিখিরাছেন, ব্যায়োগে ,
গর্ভ ও বিবর্ণ সন্ধি নাই।

ব্যায়োগের ঘটনা কাল্পনিক হইবে না।
পূর্য্যাদিতে প্রসিদ্ধ ঘটনা লইয়াই ব্যায়োগ
রচিত হইবে। ব্যায়োগে যখন ক্রী-চরিত্র
অন্ন ও পুরুষ-চরিত্র অধিক তখন ক্রী-নির্মিত
বুদ্ধ-বিগ্রহাদি ইহার অঙ্গীভূত হয় না।
পুরুষ-চরিত্রগণের মধ্যে অস্ত্রান্ত কারণে যুদ্ধ
প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ব্যায়োগে কৈশিকীভূতি থাকিবে না।
শূদ্রার রূপেই কৈশিকীভূতি প্রযুক্ত হয়।
উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র বেশভূষাবৃত্ত, নৃত্যগীত-
বহুল ক্রীজনসমূহ, মনোহর বিশালমূর্ত্ত
ও শূদ্রার অঙ্গপূর্ণ ভূতিই কৈশিকী
ভূতি। (২) ব্যায়োগ নাটকে হস্ত, শূদ্রার
বা শাস্ত্ররস অঙ্গীভূত হইতে পারে না।
বহু নারী-চরিত্রও ইহাতে থাকে না। কাজেই
কৈশিকী ভূতিও ইহাতে ব্যবহৃত হইতে
পারে না।

ব্যায়োগের নায়ক সেবতা, নররূপধারী
সেবতা (রামচন্দ্রাদি) অথবা রাজর্ষি হইবে।
এই নায়ক আবার ধীরোদ্ধত, পর্যায়ভুক্ত
হস্তা চাই। প্রচণ্ড, চপল, অহংকারী,
দণ্ডী, আত্মপ্রাধানিরত, রাজ্যবী নায়ককে
ধীরোদ্ধত বলা হইয়া থাকে। ভীমসেন
প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। (৩)

ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে ই-
এক-“ব্যায়োগ” নামের ব্যাংপতি হইতে
অধিকাংশ লক্ষণগুলিই একে একে আসিয়া
পড়িয়াছে। কারণ “বহু পুরুষ বাহাতে
প্রযুক্ত হয় তাহাই ব্যায়োগ” এই ব্যাংপতি
হইতে ইহাতে ক্রীচরিত্রের অন্নতা ও পুরুষ-
চরিত্রের বাহুল্য বুঝিতে পারা যাইতেছে।
আবার ক্রী-চরিত্রের অন্নতা হেতু শূদ্র-রস
ব্যায়োগের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। হস্ত
শূদ্রার-রসের সহিত খনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট।
সুতরাং এ রূপের প্রয়োগও ব্যায়োগে বিরল।
শূদ্রার-রস না থাকাতে তত্ত্বযোগী কৈশিকী
ভূতিও অগ্রহণ্য। ক্রীজনের অন্নতা-বশতই
ব্যায়োগে যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্রী-নির্মিত হইতে পারে
না। বহু পুরুষ-চরিত্র থাকাতে বীর-রস
প্রয়োগ করা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দেখানই
সুবিধা; এবং ধীরোদ্ধত পাত্রই ইহার
উপযোগী।

সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ ব্যায়োগের
উদাহরণস্বরূপ লিখিরাছেন, যথা “সৌগন্ধি-
কাহরণম্।”

নির্ণয়লাগর প্রেস হইতে কাব্যমালায়
৭৪ সংখ্যার বিশ্বনাথ কবি-বিরচিত সৌগন্ধি-
কাহরণ নামক ব্যায়োগ প্রকাশিত হইয়াছে।
গ্রন্থখানি হইতে কবির পরিচয় বিশেষ-কিছু
জানা যায় না। কেবল বিশ্বনাথ কবি

(২) “রা রজনৈপকাদিশেষ-চিত্র।

ক্রীসমূহা পুরুষদ্যুগীত।

কামোপভোগা প্রভ্রোপভোগ

না কৈশিকী চারুবিলাসমূহ।”] সা ৮। ৩ প।

(৩) “ব্যায়োগঃ প্রচণ্ডচপলোহংকারীদণ্ডীঃ।

আত্মপ্রাধানিরতঃ বীরবীরোদ্ধতঃ কথিতঃ।” যথা ভীমসেনাদিঃ। [সা ৮। ৩ প।

তাহার মাতুল অগতঃ নিকট জ্ঞাত্যাস করেন এইটুকু মাত্র জানিতে পারা যায়। স্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টি যে স্নোক ছুইটিতে কবি ও তাঁহার মাতুলের পরিচয় আছে, তাহা এই—

“বিশ্রাম ইতি পাতঃ কবিরতি বহুভয়ঃ ।
অকাক্ষমরক বিদ্যাঃ কর্ণভূষণঃ ।

অথবা

বাচস্পতি কবেত্বারমধুরা ইত্যত্র চিত্রঃ কিম্ব
অথাতঃ সন্ধ্যায় দিব্য ভদ্রম্ জ্যোতিষতঃ সুখীঃ ।
বেদভঙ্গ্যুখীকরাভূগিলদলসরকণধরকী
বাচো মুক্তিসংহতিবর্ণিতহৃদয়ান্না স বদ্যাতুলঃ ।
তেন কবিনা প্রস্তুতমভিনয়ঃ সৌগন্ধিকাহরণঃ নাম
শ্রেয়শকন্যাস্ত্রাভিনীতপূর্ণমাত্রঃ । তদ্বিনাশিঃ প্রভুজানঃ
সামাজিকমনাঃপ্রাবর্ত্যমিহ ।”

নাট্যখানির প্রথমে রাজা প্রতাপরুদ্রের নামোল্লেখ আছে। প্রতাপরুদ্রের সভাসদ-গণের সম্মুখে নাট্যখানি অভিনীত হইয়াছিল। স্ত্রীদ্বয়ও বলিতেছে—

“রাজা প্রতাপরুদ্রঃ সভাসদৈরুপসংবিভাগ্যেণ
সারসংকল্যকৌশলেনভক্তিঃ সভাসদ্বিহায় সৰ্বস্বমন-
সামিহোহসি ।”

এই প্রতাপরুদ্র যে কে, তাহা নাট্যখানি হইতে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। তাঁহার নামের পূর্বে ব্যবহৃত “কোলাবনাবলী-বিশ্রান্তনিজবগতুরঙ্গপূর্ণমুদ্রনিদ্রমমিত্রিতল্লগ-ধিতরঙ্গনির্বোধমদুরবলিগুণমনবীরভঙ্গ্যেণ” এই বিশেষণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে উদ্ভিষ্য অধিপতি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক

প্রতাপরুদ্ররূপে কল্পনা করিলে বড় বৈশ্বকর্ম অহমানের সাহায্য লভ্য হয়।

সৌগন্ধিকাহরণের নামক ভীমসেন। ইনি যৌরোদ্ধত নামক। বীর ও অক্লান্ত বল নাট্যখানির অঙ্গীভূত। নাট্যকার স্বয়ং এ কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (৪) নাট্যখানির ঘটনা এই—

প্রথমে ভীমসেন প্রবেশ করিতেছেন ;
তাঁহার সঙ্গে ধনু লম্বিত ও ছতে গদা।

“সৌগন্ধিকঃ কিমপি পদ্মবোহগনীত-
মালোক্য কোভুকবতা জ্বলেন কৃষ্ণা ।
অজানি বাচিতবতী কিল ভাবুমানি
সম্ভবতাঃ স্ততিবিধে বম বাহরয়েঃ ।”

“বায়ুদ্বারা বাহিত একটি সৌগন্ধিক (কল্লার বা স্বেতপদ্ম) ধর্মন করিয়া স্রোপদী কোভু-হলবশে আরও সেইপ্রকার পুষ্প প্রার্থনা করায়, আমার এই বাহু সেই পুষ্প আহরণে উদ্বৃত্ত হইয়াছে।”

ভীমসেনের এই সর্গপ্রথম উক্তি হইতেই নাট্যের নামের পার্থক্যতা বুঝিতে পারা বাইতেছে। সৌগন্ধিক বা স্বেত-পদ্মের আহরণ অর্থে সৌগন্ধিকাহরণ নামকরণ হইয়াছে। নাম হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ও সূচিত হইতেছে।

ভীমকে পাঠাইবার সময় স্রোপদীর চিত্র আশ্রয় বিচলিত হইয়াছিল। ভীম তাঁহাকে লাম্বনা দিয়া বাত্মা করেন। পরিক্রমণ করিতে করিতে স্রোপদী-প্রার্থিত সেই

(৪) “বুতির্গির্যুতি বিশেষভক্তা যৌরোদ্ধতঃ নেতৃবিদেষ্টিতক ।

বীরাভূতো বত্র রসো চ বীড়ো এত্যেকবেত্তানি হরতি ততঃ ।”

“শক্ত শৌচপরাশ্রমভূতনিবিধীয়োদ্ধতঃ নারকঃ ।”

[অতীর্ণা]

পুষ্পের সৌরভ ভীমের নানিকার্য্য এবেশ
করিল। ভীম বলিলেন—

“বৈরাগ্য জগৎপিতব-ক্রমপুলাসমৈ-

রয়ে যদুত্তমমুদৈক্যপদুভাবনঃ।

মৌলিককৃত কথ্যকৃত্যুপদানবার্ণঃ

কোহপোষ্য মৌরভময়ো বহলঃ এবাঃ।”

সেই গন্ধের অহুসরণ করিতে করিতে
ভীম বনভূমি লঙ্ঘন করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে
উপনীত হইলেন। হনুমান সর্ব্বদা সেই
শৈলে বাস করিয়া থাকেন—

“ভেনাথোগ হনুমতা নহু সয়া শৈলোহ্মদযাত্ততে।”

হনুমান এই সময় এবেশ করিলেন।

কিম্বদন্তি কথিত শ্রীত রামচরিত্র প্রবণ করিয়া
বহুদিন তিনি এই শৈলে কালযাপন করিতে
ছিলেন। তাঁহার প্রতি সীতার বেদ স্মরণ
করিতে করিতে লহঙ্গা তাঁহার দক্ষিণ চক্ৰ
স্পন্দিত হইল। তিনি বলিলেন—

“সীতাধিনার্গপথিও সম চক্ৰবাহুত

শম্বঃ পরীক্ষিতওভাগম এব ভাতঃ।

সম্ভাশি ক্রুরি হর তথৈব কুহ—

তুং কিং হু ভবনমুভাধিতা মনোহরম্।”

“পূর্বে সীতার অবেশন করিতে করিতে
বখনই আমার দক্ষিণ চক্ৰ স্পন্দিত হইয়াছিল,
তখনই সীতাদেবীকে পাইয়াছিলাম। দক্ষিণ
চক্ৰ স্পন্দনে যে তত দূর তাহা আমার
পরীক্ষিত। আজ আমার এখন তাহা
স্পন্দিত হইতেছে। কোনও পুঙ্খ কি
আমার তত করিতে আসিল।”

ভীম এমিকে অরণ্যবাসী জঙ্ঘদ্বিগকে
আসিত করিবার জন্ত সিংহনাথ করিতে
লাগিলেন। বৃক্ষ হইতে বহু উড়িয়া পড়িল,
হরিণ-হরিণী নিকটে থাকিয়াও উড়ির চিত্তে
পরস্পরকে খুঁজিতে লাগিল, হস্তী নোড়িতে

নোড়িতে যুথ কঁরাইয়া—হস্তিনীকে
লাফিল, নিস্রান্ত্রজে সিংহ অর্কোখিত হইল।
হনুমান তখন ভীমসেনকে দেখিলেন।
ভীমসেন সন্দর্পে নিজ পরিচয় ঘোষণা করিয়া
কুবেয়ের সরোবরের পথ দেখিতে চাহিলেন।
হনুমান ইহার আকৃতি দেখিয়া প্রশংসা
করিলেন এবং বলিলেন, “নিজ-রূপ
গোপন করিয়া কিছুকাল ইহার সহিত
কৌতুক করিবার জন্ত ইহার পথ রোধ
করি।”

“অভিরাধক্যকিত্তকণ এবাঃ

কতিংকালমদ্যাহ মহ এবোহ—”

সম্পাদনার্ণাণমনবার্ণাধিত্তাধি।”

এই বলিয়া শাখাযুগের রূপ ধরিয়া হনুমান
পথ রোধ করিয়া শয়ন করিলেন। ভীম
তাঁহা দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিলেন,
“আমার দেখিয়া এই অরণ্যের প্রাঙ্গণগকে
জন্ত ব্যাকুল দেখিয়াও নির্ভীক ভ্রমরে বানর
বভাবজাত চণলতা পর্য্যন্ত পরিতাপন করিয়া
লাঙ্গুল বক্রভাবে বিস্তার করিয়া পথে শয়ন
করিয়া আছে,—কি আশ্চর্য্য!”

“মদ্বর্ষনাভকিত্তবিক্রতবীরসবঃ

পত্তরম্যাদিবরণাধিত্তাধি।

উৎসব্যা ভাতাশি চাপলমেষ বৈরা।

“ভির্ঘক্ এদাধা পুধি বালিধিষ্টমাতে।”

হনুমান ভীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি
জন্ত এই বনের সকল জন্তকে আসিত
করিতেছ।”

ভীম বলিলেন, “তাঁহাতে তোমার কি?”
হনুমান বলিলেন, “পরের উপর অত্যাচার
আমি সহ্য করিব না।”

ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি
করিবে?”

হনুমান বলিলেন, “আমি তোমার নিবারণ করিব।”

ভীমসেন উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, “কি! বানর বীরকে নিবারণ করিবে?”

হনুমান হাসিয়া বলিলেন, “শ্রীতি-উপদেশ দিয়াই নিবারণ করিব। এই নিরীহ অরণ্যচর প্রাণীদের ভীত করিয়া তোমার কি বীৰ্য্য প্রকাশ পাইবে?”

ভীম এ কথা শুনিয়া শাস্ত হইলেন। হনুমান তখন ভীমের পরিচর জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীম নিজ পরিচর-প্রদানজ্বলে বলিলেন, “অজাতশত্রুকে জান কি?” হনুমান জানিবার উত্তর করিলেন, “না।” ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “কি! যুদ্ধিরকে জান না?” হনুমান তখন বলিলেন, “যে শত্রুগণ কর্তৃক হৃতরাগ্য হইয়া অরণ্যে বস করিতেছে, সেই না কি?” ভীম মধ্যে মধ্যে নিজ বীৰ্য্য দিকার দিয়া বলিলেন, “এইটুকুই কি যুদ্ধিরের পরিচর?” হনুমান বলিলেন, “পাণ্ডবের প্রতি তোমার এত পক্ষপাত কেন?” তখন ভীম আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন।

“এযাবস্থাবিশদ্যার রক্ষা-

মন্ত বতাকরশিক্ষণ করঃ।

বিদ্বিবকঃকলকে মহাবলঃ

ন এষ ভীমোহস্মি যুদ্ধিরামুহঃ।”

তাহার পর ভীমের মনে পড়িল, কথার কাল অতিবাহিত হইয়া বাইতেছে। তিনি হনুমানকে বলিলেন, “পথ হইতে লান্ধুল সরাইয়া লও, নহিলে হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তেমনি আমিও তোমাকে উলঙ্ঘন করিয়া বাইব।”

“মহাভীকানঃ কিমিবাতিপাত্যতে

বিস্তম্যত্যে বাসবিরজ্ঞনম্বয়।

বিলম্বা গম্যাম্যনুনা হবাবহঃ

পুত্রা হনুমানিষ রাশিরক্ষসাম্।”

“হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করিয়া ছিলেন” এই উপমা শুনিয়া হলক্রমে হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, “হনুমান কে?” তখন ভীম হনুমানের পরিচর দিলেন। কুমার-সম্ভবে বৈষ্ণব ছদ্মবেশী শিব কর্তৃক নিজ নিন্দা ও পার্শ্বভীর শিব-প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও হনুমান কর্তৃক সেই-রূপ নিজ নিন্দা ও ভীম কর্তৃক হনুমানের প্রশংসা বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতে লাগিল। হনুমান শেবে শ্রীত হইয়া নিজরূপ ধারণ করিলে ভীম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিজরূপ চাপলোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হনুমান তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও শুনিয়া বলিলেন, “কমল-সহিত সরোবরই তোমার নিকট আনিয়া দিতেছি।” ভীম বলিলেন, “আমিই আনিব।” তখন হনুমান বলিলেন, “সেই সরোবর কুবেয়ের। যক্ষেরা তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। মায়াবশতঃ সে সরোবর তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। যক্ষেরাও মায়াবী। সুতরাং সরোবর বাহ্যতে দেখিতে পাও সেজন্য ও যক্ষের জয় করার জন্য একটি বিজ্ঞা তোমার দিই, গ্রহণ কর।” ভীমের তাহা লইবার ইচ্ছা না থাকিলেও হনুমান অসম্মত হইবেন তাহা তিনি বিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। হনুমান বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর ভীমসেন হনুমান কর্তৃক উপ-দ্রষ্ট পথে পরিক্রমণ করিতে করিতে কদম্বীবন অতিক্রম করিয়া তমালবনের মধ্যস্থিত পথ দিয়া চলিয়া সরোবরের নিকট

উপনীত হইলেন। নেপথ্যে শব্দ উঠিল, “ওহে বক্ষবীরগণ, না বলিয়া কে এই বনে বরিবার অস্ত্র প্রবেশ করিয়াছে?” ভীম মোংলাহে গদা ধরিয়া কমল লইবার অস্ত্র সন্ধ্যাবরে অবতীর্ণ হইবার উত্তোপ করিলেন। নেপথ্য হইতে শুনা গেল, “ওরে ছুরাশ্বন! নাহিন্ না। নাহিন্ না।” তখন বাক্স কলহের পর ভীমের সহিত বক্ষবীরগণের তুলুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীম রত্নমঞ্চ হইতে নিজস্ব হইয়া গেলেন।

কক্কী ও কুবের ইহার অন্ন পূর্বে রত্নমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাদের কথোপকথন হইতে ভীমের সহিত বক্ষ-গণের তুলুল যুদ্ধের কথা বুঝিতে পারা গেল। বক্ষগণ শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ভীম তখন রত্নমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কুবের সামনে তাহাকে আছন্ন করিলে ভীম বিনীতভাবে অগ্রসর হইলেন; কুবের তাহাকে গাঢ় আকিঞ্চন করিলে ভীম বলিলেন, “আমার বিনয়ের ব্যতিক্রম করা করুন।” কুবের বলিলেন, “মানীনের ইচ্ছাই স্বভাব। তাহার পদের স্পর্শই সহ্য করিতে পারেন না। মেঘের গর্জন প্রবণ করিয়া সিংহ কি ওহার লুকাইয়া থাকে?”

“নহু মানকডেরা: ভগ:

সহতেছলৌ পরবর্জিতা ন বং।

মিশময়্য বনাবনধানি:

নিহৃতভিষ্ঠতি কিং হু কেশরী?”

এই সময় বৃষ্টিষ্টি, দ্রৌপদী, নুতুল ও সহদেব ভীমকে অঘেঘণ করিতে করিতে গেলি স্থলে উপনীত হইলেন। বৃষ্টিষ্টি

উৎকণ্ঠিত ও দ্রৌপদী ভীত হইয়াছিলেন। নুতুল ও সহদেব ভীমের পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের আশ্বাস দিতে-ছিলেন। এক্ষণে তাহাদের সকলের মিলন হইল। কুবেরকে সূর্যে প্রণাম করিলেন। কুবেরের আজ্ঞার কক্কী বেষ্ট কমল আহরণ করিয়া আনিবে ভীমসেন তাহা বিদ্যা দ্রৌপদীর অঞ্জলি ভরিয়া দিলেন। কুবের দ্রৌপদীকে বিজ্ঞাপা করিলেন, “ঋগ-রাজনন্দিনি! ভীমসেন তোমার আর কি অভিলাষ পূরণ করিবে?”

দ্রৌপদী সলজ্জভাবে অধোমুখে গাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃষ্টিষ্টি বলিলেন, “আপনার অশ্রুগ্রন্থ ভিন্ন আর কি প্রার্থনীয়? তথাপি ইহা হউক—” এই কথার পর চিরন্তন প্রথামত নিরলিখিত ভরতবাক্যে নাট্যগানিত সমাপ্তি হইয়াছে।

“হানান: পরিশালয়ন্ত সত্যং ভাষ্যেণ গা: বন্ধনা

মধ্যমানেতিভজিনন্ত রহিত: দীবাং বর্ণপ্রভা:

কিঁকীকণ্ঠ অতিভাঙ্গাপদলতা: সানন্দমুখিগদ্যৌ

শেষং বক্সরোগকণ্ঠেধু বিব্রুথা: বাশ্বেতভা বর্ষতাদ্ধ”

এ-ভাবে মৌগন্ধিকাছরণের বর্ণাহুবাধ হয় নাই। এই ব্যারোগখানি ব্যতীত আমার জ্ঞাত ও হইখানি ব্যারোগের মন্ধান পাইয়াছি। একখানি - ভাণ্ড-রচিত মধ্যম-ব্যারোগ, অপরাধানি কাকনাচাণ্ডী রচিত ধনঞ্জয়-বিব্রুগ। বর্তমান প্রবন্ধলেখক কক্কী “মধ্যম-ব্যারোগের” বর্ণাহুবাধ ‘মানসী ও রত্নবাণী’ পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছে। ঐদিক দ্রোণাতিরজ্ঞ-নাথ ঠাকুর ধনঞ্জয়-বিব্রুগের বর্ণাহুবাধ করিয়াছেন। বিবাহুয়ের অনন্তশয়ন এখা-

বঙ্গীর ক্ষুদ্র হইয়া মধ্যম ব্যাধোগের মূল ও নির্ধারণের প্রেস হইতে প্রকাশিত কাবামালার ৪৪ সংখ্যার ধনতর-বিবরণের মূল প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যম ব্যাধোগ নাট্যের নাম হইতেই ইহা যে ব্যাধোগ তাহা বুঝা বাইতেছে। ইহার নামকও ভীমসেন। কুরুক্ষেত্রে যুগ-গ্রামবাসী কেশবদাস নামক ব্রাহ্মণ স্বীয় বাতুল বজ্রবহুর পুত্রের উপনয়নে নিমন্ত্রিত হইয়া পত্নী ও তিন পুত্র সহ মাতৃশালায় বাইতেছিলেন। যে বনে পাণ্ডবদের আশ্রম ছিল, তথায় রাক্ষসের উপদ্রব নাই গুলিয়া তাহার কথা দিয়াই বাইতেছিলেন। এক ভীম ব্যতীত অন্য পাণ্ডবেরা কেহ তখন আশ্রমে ছিলেন না; শতকৃত্ত নামক বজ্র করিবার অস্ত্র মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে গিয়াছিলেন। হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ আসিয়া কেশবদাসের পথরোধ করিল। হিড়িম্বা উপবাসের পারশ্বের অস্ত্র পুত্রকে একটি নহা আনয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ আশ্রিও ঘটোৎকচ মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ব্রাহ্মণের পথরোধ করিল। শেষে ব্রাহ্মণের অস্থানে ঘটোৎকচ বলিল, “যদি তোমার এক পুত্রকে ছাড়িয়া দাও—তাহী” হইলে তোমাদের রক্ষা।” কেশবদাসের পত্নী নিজ শরীর দিতে চাহিলেন—ব্রীলোক বলিয়া ঘটোৎকচ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেশবদাস নিজ বেহ দিতে চাহিলেন—বৃদ্ধ বলিয়া তাহাকেও ঘটোৎকচ লইতে চাহিলেন না। তিন পুত্রের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ বেহ দিবার অস্ত্র বাঞ্ছা হইয়া উঠিলেন। কেশব

দাস ঘোড়া ও কেশবদাস-পত্নী কনিষ্ঠকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। সন্নিবে মধ্যম পুত্র তখন অগ্রসর হইয়া নিজ বেহ দান করিতে গেলেন। ঘটোৎকচ তাহার এই আশ্চর্য্যে চমৎকৃত হইল। মধ্যম পুত্র ঘটোৎকচকে বলিলেন, “আমি ঐ জলাশয় হইতে পিপাসার শান্তি করিয়া আসি।” ঘটোৎকচ বলিল, “বাও।”

ব্রাহ্মণ বেদ করিতেছেন, মধ্যম পুত্রের আশ্রিতে বিলম্ব হইতেছে, এমন সময় ঘটোৎকচ “মধ্যম” “মধ্যম” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ব্যাঘ্রম করিতেছিলেন। তিনি সেই ডাক গুলিয়া তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া দ্রুত তথায় আগমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কেশবদাস তাহার পরণাপর হইলেন। ভীম ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া নিজ শরীর বিনিময়ে তাহার পুত্রের শরীর ঘটোৎকচের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; তিনি ভীমকে নিবেদন করিলেন। ভীম বলিলেন, “আমি ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের শরীর আমার শরীর দিয়া রক্ষা করিব।” ঘটোৎকচ ভীমকে বলিল, “এস।” ভীম বলিলেন, “নাথ্য থাকে, আমার লইয়া লে।” ঘটোৎকচ বলিল, “জানিস, আমি কে?” ভীম বলিলেন, “জানি। আমার পুত্র।” ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হইলে উভয়ের মধ্যে বাগযুদ্ধের পর বাহুবল আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ বৃদ্ধ উৎপাটন করিয়া, শৈলশূন্য উদ্ভলন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিল। তাহাতেও ক্ষুণ্ণের কিছু হইল না দেখিয়া

মায়াপাশে তারাকে বদ্ধ করিল। ভীম মায়াপাশ হইতেও নিজেকে অবলীলাক্রমে মোচন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ বলিল, “তুমি ত ব্রাহ্মণ-পুত্রের যিনিময়ে নিজ শরীর দিতে প্রতিজ্ঞিত হইয়াছ। সেই প্রতিজ্ঞা-অনুগারে আমার অঙ্গসংরক্ষণ কর।” তখন ভীম তাহার অঙ্গসংরক্ষণ করিলেন, হিড়িম্বার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা পুত্রকে বলিলেন, “এ কাহাকে আনিয়াছ?” ঘটোৎকচ বলিল, “কেন! মাহুস আনিয়াছি।” হিড়িম্বা তখন বলিলেন, “এ কি মাহুস! এ যে দেবতা।” তখন ঘটোৎকচ পিতৃ-পরিচয় পাইল; পিতাকে অভিবাदन করিয়া নিজ চপলতার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভীম ও ঘটোৎকচ পুত্র ও পত্নীসহ কেশবদাসকে নির্ঝরে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া গেলেন।

মধ্যম ব্যাঙ্গোপের ঘটনা এইরূপ। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র মধ্যম তপস্বী ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই উভয়ের নাম মধ্যম হওয়াতে নাট্যখানির সন্ধিক্ষেত্রে ঘটনার গুণ্টি হইয়াছে। ইহা ঘটনার জন্তই ইহার নাম মধ্যম ব্যাঙ্গোপ প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

ধনঞ্জয়-বিজয় কাকনাচার্য্য রচিত। নাট্যায়ত্তে সূত্রধারকে একজন পুরুষ এক পত্র আনিয়া দিল। জয়দেব সেই পত্রে রত্নমণ্ডন নামক নটকে (৫) আজ্ঞা করিতেছেন, “বীরবসন্তক অদ্ভুত কোনও রূপক অভিনয় করিয়া গদাধর (৬) প্রভৃতি আমার পারিষদবর্গকে অভিনন্দিত কর।”

“অতি প্রবলবিরহঃ সীমাত্রদেবঃ। ... স চ এসাদেব রত্নমণ্ডনঃ নাম নটঃ দ্যমনিগতিঃ। ... তবিরানীঃ তবতা বীরবসন্তকঃ রত্নমণ্ডনীয় গদাধর প্রমুখঃ—পরিব্রাজকশীল ইতি।”

এই অরবেব যে তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। ঐহিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর লিখিয়াছেন, “গদাধর শতাধীর শেষে জয়দেব নামে কনৌজের এক রাজা ছিলেন। ইনি সেই জয়দেব কি না বলা দুরূহ।”

ঐহিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন, “এই ব্যাঙ্গোপ নাট্যখানি গদাধর মিশ্র প্রভৃতির চিত্তবিনোদনার্থ পরংকালে অভিনীত হয়। গদাধর মিশ্রও একজন হুলেথক বলিয়া খ্যাত।” এই উক্তি ভিত্তিহীন। পুরোদ্ধৃত সংস্কৃত গংক্তি-গুলি হইতে বৃষ্টিতে পায়া বাইবে যে ‘গদাধর’ গ্রন্থ পারিষদ-গণের চিত্তরঞ্জনার্থ ধনঞ্জয়-বিজয় ‘অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান বাবু নিজেও ঐ অংশের অঙ্গ-বাবে লিখিয়াছেন, “আপনি বীরবসন্তক কোন রূপক অভিনয় ক’রে গদাধর প্রমুখ আমাদের পরিষদ মণ্ডলীর আনন্দ বর্ধন করুন।” অর্থাৎ, ভূমিকায় গদাধর স্থলে তিনি কেন যে গদাধর মিশ্র লিখিলেন, ও গদাধর মিশ্র নামক হুলেথকের সহিত তুলনা করিলেন, তাহা বৃষ্টিতে পায়া গেল না। সম্ভবতঃ অনবধানতার জন্তই এইরূপ ঘটয়া থাকিবে।

(৫) ঐহিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর কৃত ‘অনুবাদে নটকে’ এই শব্দের পরিবর্তে ‘নটকে’ এই সূত্রাক্ত-প্রমাণ আছে।

(৬) ঐহিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর কৃত ‘অনুবাদের ভূমিকায় ‘গদাধর মিশ্র’ এই তুল আছে।

ধনঞ্জয়-বিজয়ের রচয়িতা কাকনাচার্য্য। তিনি বাবীশ্বর উপাধি-ধারী * নারায়ণ উপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

"ভ্রাতৃত্বদ্বাপাধ্যায়ো নারায়ণ-সমভ্যাসঃ।
জিতবাহিনিসম্রোধঃ শ্রীশ বাবীশ্বরাতিকাম্ ।...
তৎপুত্রঃ কাকনো নাম সমস্তগুণধরতঃ ।
গৌড়ীশালেব বিদ্যানাং বস্ত তিষ্ঠা বিহাষতে ।"

বিরাট নৃশতির পোদন-হরণে প্রবৃত্ত চর্য্যোদন প্রভৃতির অর্জুন-চরিতে পরাজয় বৃত্তান্ত লইয়া ধনঞ্জয়-বিজয় রচিত। ধনঞ্জয়ই এ নাট্যের নায়ক। প্রথমে ধনঞ্জয় ও অমাত্য প্রবেশ করিলেন। নগরের উপকণ্ঠ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনিবার ভক্ত বিরাট-পুত্রকে পাঠান হইরাছে—
বিরাট-পুত্র সারথি হইতে স্বীকৃত। মুচ্ছ-সম্ভাবনার অর্জুন অভিযয় উৎসাহিত। এই সময় বিরাট-পুত্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিল, অর্জুন সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণ করিলেন। অর্জুনের আদেশে অমাত্য উদ্বিগ্ন পৌরজন-গণকে আশ্বস্ত করিতে গেলেন, অর্জুনের রথ বেগে কৌরবদের অভিস্রুখে ধাবিত হইল। কৃপাচার্য্য অর্জুনকে ঘেঁষিয়া চিনিতে পারিলেন, চর্য্যোদন সকলকে "উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অর্জুন, দ্রোণ ও ভীমকে প্রশংসা করিয়া উত্তরকে তাঁহাদের পরিচয় দিলেন এবং চাণাসন, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণকে চিনাইলেন।

এই সময় বিদ্যধর ও প্রতীহারীর সহিত ইন্দ্রদেব প্রবেশ করিলেন। ইহাদের কথোপ-কথনেই অর্জুনের সঙ্গিত কৌরবদের তুলন মুক্ত বর্ণিত হইরাছে। রথারোহণে চর্য্যোদন

প্রবেশ করিলে, অর্জুনের সহিত তাঁহার বাগ্ম্যুজ্জ্বল হইল। পরে উভয়ে যুদ্ধার্থ সম্মতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইবার মন্ত রত্নময় পরিভাণ করিলেন। ইন্দ্র, প্রতীহারী ও বিদ্যধর তখন মুচ্ছ বর্ণন করিতে লাগিলেন। অর্জুনের পরে কুরুদৈত্য বিবেকল ও ক্ষত-বিক্ষত হইল। দ্রাক্ষস, পিশাচ, যোগিনীরা সানন্দে রথক্ষেত্রে রক্ত পান করিতে লাগিল। ভীম অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলে অর্জুন বরুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। কর্ণ ভূজস্বায় প্রয়োগ করিলে অর্জুন গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দ্রোণ বাণ-বাণ প্রয়োগ করিলে অর্জুন সিংহ-বাণে তাহাতে বাধা দিলেন। ভীমের অশ্ব ও দ্রোণের সারথি নিহত হইল—
কর্ণের রথ ভগ্ন, কৃপ সংজ্ঞাহীন, অশ্বখামার ধ্বংস ছিন্ন। কুরুদৈত্য পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জুন চর্য্যোদনের রত্নমুকুট বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন; পরে প্রস্থাপন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রে কুরুদের সকলে মোহাজ্বর হইয়া পড়িল। অর্জুন তখন এক ভায় বাতীত অপর সকলের বসন অপহরণ করিলেন ও উত্তরকে অক্ষত শরীর ঘেঁষিয়া অক্সায় প্রকাশ করিলেন। তাহার পর রথারোহণে বিরাট-রাজের রাজধানী-অভিস্রুখে চলিলেন। ইন্দ্র অর্জুনের বিজয় ঘেঁষিয়া দৃষ্টান্তে চলিয়া গেলেন।

অর্জুন ও উত্তর ঘাইতেছেন এমন সময় যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও সপত্রিকরে বিরাটরাজ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে পরস্পরকে অভিনন্দন করিলেন। বিরাটরাজ অর্জুনকে

বলিলেন, “তুমি দ্রোণদীর অবমাননার শোধ লইলো।” ভীম বলিলেন, “তার প্রতিশোধ আমি লইব।” যুধিষ্ঠির বলিলেন, “তুমি দৌগন্ধিক বনের (৭) [কমল বনের] লক্ষ্যে অপহরণ করিগাছ। হেলায় হিড়িম্বকে বধ করিগাছ। তোমার বিক্রমকে রোধ করিবে?” পরম্পর সঙ্কল্পনার পর নাট্য শেষ হইল।

ঐযুক্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান্য ঠাকুর লিখিয়াছেন, “বার্গোপের দৃষ্টান্তরূপ আর অন্য সকল রচনাই বিপুল কিংবা ছুপ্রাপা; কেবল এই বার্গোপখানি (ধনঞ্জয়-বিজয়) এখনও পর্বাত কালকবলে পতিত হয় নাই।” ভাস্কর মহাশয় বার্গোপ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইরাছে। “দৌগন্ধিকাহরণ”ও সম্ভবতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান্য বাবুর চোখে পড়ে নাই। এই তিনখানি নাট্য স্পষ্টতঃই বার্গোপ বলিয়া ঘোষিত হইরাছে। এই তিনখানি ছাড়া লক্ষ্য দেখিয়া অন্য কোনও নাট্যকে বার্গোপ বলা যায় কি না তাহা প্রবন্ধাত্মক দেখাইব।

যে তিনখানি বার্গোপের আদ্যরূপ আলোচনা করিয়া, বীররস তাহাদের সকল গুলিরই অঙ্গীভূত। দৌগন্ধিকাহরণে বীররস ব্যতীত অল্প রসও আছে। হনুমানের শাখাশূণ্য রূপধারণ, উজ্জল বিভ্রাট আবির্ভাব প্রভৃতি অল্প রসের উল্লেখ করে। তিনখানির মধ্যে চুইখানিতে বীরোদ্ভূত নায়ক ভীম ও একখানিতে ধনঞ্জয়। পুন্নাহরণের অন্ত দৌগন্ধিকাহরণে,

বার্গোপের পূত্র-রক্ষার অন্ত মধ্যম বার্গোপে ও গোদন-উদ্ধারের অন্ত ধনঞ্জয়-বিজয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণিত, ইহাদের মধ্যে একটি যুদ্ধও স্ত্রী-নির্মিত নহে। দৌগন্ধিকাহরণে একমাত্র স্ত্রী-চরিত্র দ্রোণদী এবং মধ্যম বার্গোপে কেশবদাসের পত্নী ও হিড়িম্বা। ধনঞ্জয়-বিজয়ে স্ত্রীচরিত্র আদৌ নাই। একদিকে যেমন এই স্ত্রীচরিত্রের অল্পতা, অন্যদিকে তেমনি পুরুষ-চরিত্রের বাহুল্য সবগুলিতেই লক্ষিত হয়। দৌগন্ধিকাহরণে ভীম, হনুমান, কুবের, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব; মধ্যম বার্গোপে কেশবদাস, কেশবদাসের তিন পুত্র, ঘটোৎকচ ও ভীম; ধনঞ্জয়-বিজয়ে অর্জুন, উত্তর, ইন্দ্র, বিভ্রাট, চর্যোদন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাটরাজ প্রভৃতি চরিত্র বিস্তারিত। পুন্নাহরণ বা হস্তরস কোনটিতেই নাই। মৃত্যু-গীত-বাহুল্য, নারীগণের হাবভাব-বিলাসযুক্ত কৈশিকীকৃতিকোথাও প্রযুক্ত হয় নাই। একাঙ্কেই নাট্যগুলি সমাপ্ত। একটি মূল ঘটনাই ঐক্যবিশিষ্ট হইয়া উপসংহত হইরাছে; অন্তান্ত ঘটনা-পরম্পরার দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। স্তূত্রের গুণ ও বিমর্শ-সন্ধির প্রয়োগ কোনখানিতেই দেখা যায় নীচ।

সুতরাং পূর্বেকৃত নাট্যগুলিতে বিদ্যমান নির্দিষ্ট বার্গোপের লক্ষণ বিস্তারিত। এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র নাট্য আর পরিসরের মধ্যে

(৭) ঐযুক্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান্য ঠাকুর কৃত অস্থানে “দৌগন্ধিকরণ ঐ” এইরূপ আছে। ইহা দুইভাগ-এমত; ‘দৌগন্ধিকরণ’ হইবে। মূল অষ্টকটি এই :-

“লীলোদ্ভূতকোবেরদৌগন্ধিকবনজিহা।

লীলাবৃত্তিহিড়িম্বা, বিক্রম তে রূপতি কঃ।”

এক একটি ঘটনা সুন্দররূপে সূটাঁয়া তুলিয়াছে। মধ্যম ব্যায়েগে ঘটনাটি বর্ণনা-বাহুল্যে বা কবিত্ব-প্রকাশের চেষ্টার ভাৱ-ক্রান্ত হয় নাই। প্রাচীন কবি ভাস্কর সময়ে এরূপ বাহুল্য ও প্রয়াস ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শৌণ্ডিকাহরণ ও ধনঞ্জয়-বচনে বাহুল্য-বর্ণনা ও কবিত্ব-প্রকাশের চেষ্টা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকস্থ হিসাবেও মধ্যম ব্যায়েগের স্থান অন্য ব্যায়েগ দুইখানির উপরে।

ব্যায়েগের স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া রচিত নাট্যের উদাহরণ অল্প বেশের নাট্য সাহিত্যে বিয়ল। প্রহসন প্রকৃতি ও নৃত্য-গীতপূর্ণ অপেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। আর এ-প্রকার নাট্য সংস্কৃত-সাহিত্যেও

আছে। কাজেই এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্র নাট্যগুলি নাট্যাভিযাত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, এ কথা অসম্ভোটে বলিতে পারা যায়। আলকাল ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বেকর অভিনয়-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই প্রকার নাট্য তাহাদের অভিনয়ের সম্যক উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এগুলিতে আদিবাসের প্রয়াস আদৌ নাই; স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা অতি অল্প, কোথাও বা একেবারেই নাই। বৃহৎকার নাটক অপেক্ষা এগুলির অভিনয়-শিক্ষা বা শাসন-সম্বাদি-সংগ্রহও অতি অল্প আয়োগেই সম্পাদিত হইতে পারিবে। সংস্কৃত নাট্য বাহারা অভিনয় করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

ঐশ্বরকান্ত ঘোষাল।

নীলপাখী

বিভীয়া অক্ষ

তিলাতিল—ভাই	নুতর
মিতিলা—ঘোষ	জল
বেরীসুন্দ—পরি	কটী
আলা	গাছকা
বিড়াল	গাছকা
চিনি	তিলাতিলের
আঙন	ভাইঘোষ

} স্বত

প্রথম দৃষ্ট

পর্যায় গৃহে

পরিঃ বেরীসুন্দের যেতনবর্জ-রচিত দ্বীপ স্বসজ্জিত গৃহ। গৃহের উচ্চ দ্বার, দান এবং বেণ্ডাল ঘর মৌণ্য-খণ্ডিক এবং চাকচিক্যময়।

বিড়াল, আঙন এবং চিনি দুই জনকালো পোষাক পরিয়া একটা উচ্চল কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিড়াল রঙেতে পোষাক পরিয়া এক ছোড়া বুটছুতা গায়ে বিরাডিল। আঙন রঙেতে লামা গায়ে বিরাডিল। উপর একটা সিঁড়ির রঙের আলুখান্না পরিয়াছিল। চিনি একটা চমৎকার রেশমি পোষাক পরিয়াছিল।

বিড়াল। এইদিকে। আমি এ বাড়ীর অন্ধ-সন্ধি সব জানি। বেড়ে-দালা এই বাড়ীটা বেরীসুন্দকে ঘিরে গেছেন...সে অনেক কথা...পরীর ছোট মেয়েটির সঙ্গে তিলাতিল, আলাপ কচ্ছে, আমরায়ও ততক্ষণ একটু কথা-বার্তা করে নি, এল।...দাদাঘরের কঁরসি গলায় পরতে আর বড় দেয় নেই...

দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই। কি ভদ্রানক অবস্থায় আমরা পড়েছি তা বুঝতে পারছ কি?...এখানে আমরা সকলেই রয়েছি ত ?

তিনি। সাবধান !... টাইলো পোষাকের ঘর থেকে বেরিয়েছে।

আগুন। সংসারে ওর থাকবার দরকার কি ?

বিড়াল। একটা পনাতিকের পোষাক পরেছে দেখছি...টিকই হয়েছে...খোসানুদে চাকর ছাড়া ও আর বেশি কিছুই নয়।... আমরা থাকার আড়ালে লুকাই, এস ওকে তার অবিদ্যাস করি আমি, ... যে সব কথা তোমাদের বলব, তা ওর না শোনাই ভাল।

তিনি। এখন আর লুকোনো মিছে... ও আমাদের দেখতে পেরেছে.. ঐ দেখ, পোষাকের ঘর থেকে জলও বেরিয়ে আসছে। আহা! কি চমৎকারই মানিয়েছে !

হুহুর এবং জল আসিগা ইহাদের সমিত মিলিত হইল।

হুহুর। (আনন্দে লাকাইতে লাকাইতে) দেখ, দেখ, আমি কি সুন্দর পোষাক পরেছি !...এর ফিতেগুলির কি বাহার !... আর সোনালি কাগজগুলিই বা কি সুন্দর ! ...এ সব সোনা, খাঁটি সোনা !

বিড়াল। তা বেশ ; কিন্তু এ সব বাজে কথাই চেয়ে আমাদের চের দরকারি কথা আছে...কটী কোথায় গেল ?... তুমি জড়ই অপেক্ষা করছি যে...কোথায় সে ?

• হুহুর। এখনও সে পোষাকের ঘরে..

তার রক্তম যদি দেখতে !...কেন পোষাকটা পরবে, তা ঠিক করতে পারছে না।

আগুন। ঠিক হয়েছে ; যেমন তার চেহারাখানি !...একান্ত ভুড়ি, দেখলেই মনে হয়, নিরেট আহাদ্যক !

হুহুর। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়ার পর একটা মূলমামনি পোষাক তার পছন্দ হল...পোষাকটা কিন্তু বেশ দামী, যদি-মুক্তা দিবে সাজানো। একটা পাগড়ী আর একখানা তলোয়ারও সে পছন্দ করেছে...

বিড়াল। ওই যে সে আসছে !...এ ত দেখছি মেড়ে-দামার ভাল পোষাকটাই সে পরেছে...

মূলমামনি হইয়া তটী প্রবেশ করিল। একটা রেশমি গটিন তারার বুহু উপরে উপর স্থিতহিল ; মাথার একাত পাগড়ী ; এক হাতে তলোয়ার, অন্য হাতে নীলপাখীর মত সেই ঝাঁক।

কটী। (সদন্তে পরিক্ষেপ করিতে করিতে) কেমন ?...এবার আমার কি রক্তম দেখাচ্ছে ?

হুহুর। (কটীর চারিদিকে লাকাইতে লাকাইতে) আহা, চমৎকার ! বেন নিরেট বোকা ! সুন্দর ! বা রে বোকা !

বিড়াল। তিলতিল আর মিতিলের পোষাক পরা হয়েছে ?

কটী। হাঁ। তিলতিল পরেছে নীল কোট আর লাল পা-জামা। মিতিল পরেছে ভারি চমৎকার একটা ঝাঞ্জা। কিন্তু বড় সুন্দর আমাদের এই আলো-ঠাকরুণকে নিয়ে...

বিড়াল। কেন ?

কটী। পরী-ঠাকরুণ তাকে এতই

সুন্দর দেখলেন যে কোন পোষাকই তাকে পরিবে তাঁর পছন্দ হয় না। আমি দেখলুম, মত্ত বিপদ। আমি তখন তাকে বললুম যে আলো যদি কিছু না পরে, তাহলে কিন্তু তাকে নিয়ে আমি একসঙ্গে দেখা দিতে পারব না...

আশুন। তাকে একটা ঢাকনি পরিবে দিতে হয়!

বিড়াল। পরী তাতে কি বলেন?

কতী। আমার কথার ভয়ঙ্কর চটে পরে আমার পেটে ছ-বা ছড়ি বসিয়ে দিলেন।

বিড়াল। তার পর?

কতী। আমি চুপ করে গেলুম। কিন্তু শেষকালে আলোর মনে কি হল, সে কোচ্ছনার পোষাক পরতে রাজী হল।

বিড়াল। থাক; ও কথার কান নেই...আমাদের ঈগুগির একটা কিছু ঠিক করে কেলতে হবে...কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ বড় সুখিদের নয়...তোমরা তিনেছ, পরী বলেছেন যে রাক্তা শেষ হবে বাগুরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও প্রাণ শেষ হয়ে যাবে...তা হলে এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, পুঁব রেয়ি করা, আর যে কোন উপায়ে হোক রাক্তাতাকে বাড়ানো। আমাদের নিজেদের জাতের স্বার্থ দেখতে হবে ত!...কিন্তু তাতে হেলে-নেমে-হুটীর অদ্ভুত কি ঘটবে, সেটাও ভাখা চাই।

কতী। হী, হী; শোন, শোন, বেড়াল-মশাই ভাখা কথাই বলেছেন!

বিড়াল। থাম, বাস্তব হয়ো না!...আমাদের যে আত্মা আছে অর্থাৎ আমরা

জানোয়ার আর জিনিষ-পত্তর হলেও যে কথা কইতে পারি, আমাদের বোধ-শোধ আছে, মানুষ এখনও তা টের পার-নি। আর টের পার-নি বলেই এখনও আমাদের একটু-আধটু স্বাধীনতা ভু আছে। কিন্তু, যে দিন সে নীলপাবীর সন্ধান পাবে, সেদিন সমস্তই জানতে পারবে; আর আমাদেরও চিরকালের জন্য তাদের পোলায় হয়ে থাকতে হবে।...এ কথা আমি এতদিন জানতুম না। আমার প্রিয় বন্ধু রাজি, জীবন-রহস্তের সে একজন গ্রহরী কি না, সে-ই আমাকে একটু-আগে এ সব বাতুলে দিলে। এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, নীলপাবীর সন্ধান সাধ্যমত বাধা দেওয়া; এতে যদি তিল-তিল আর মিতিলের প্রাণ যায়, তবে তাতেও আমাদের হঠলে চলবে না।

কুকুর। (সক্রোধে) কি!...বলহিস্ কি তুই!...আবার বল ত গুনি...বল না...চুপ করে গেলি কেন? বল, বল!

কতী। চুপ, চুপ, চুপ কর। তোমার ত কথা কইবার পালা নয়!...আমি হচ্ছে এই সভার সভাপতি, আমি বাস্তব করছি, চুপ কর।

আশুন। কারা তোমার সভাপতি করেছে?

জল। (আশ্বিনের প্রতি) চুপ কর, বলছি!...মিছে কেন বক্ বক্ করছ?

আশুন। আমার বা খুশী তাই বলব, তুমি বাণ্য দেবার কে?

চিনি। মাপ করবেন মশাইরা...এখন ঈগুগা করবার সময় নয়!...বিষয়টা শুধ-

তব...কি উপায় করা যাবে, সেটা এখন ঠিক করে ফেলা দরকার।

কতী। চিনি আর বেড়াল-মশাই যা বলেন, আমি তা খুব অহুমোদন করি।

কুকুর। আমি করি না...এ রকম কথাকে বাতুলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।...মাছল বখন আছে, তখন সবই ত আছে।...এর উপর আমার কি চাই?...আমরা তাকে মাস্ত করে চলব, সে যা বলবে, তাই শুনব—তা হলেই ত সব হল।...আমি ত তাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না।...মাছলই চিরকাল থাকুক। জীবনে মাছল, মরণে মাছল, সব রকমে—সব অবস্থায় মাছল!...মাছলই ভগবান!

কতী। ঠিক বলেছ তুমি। আমারও এই মত।

বিড়াল। (কুকুরের প্রতি) কিছু তোমার এ সব কথার যুক্তি, বেথাও।

কুকুর। যুক্তি!...যুক্তি আমার কিসের! আমি মাছলকে ভালবাসি এই-ই যথেষ্ট!...তোমার বলে রাখছি-টাইলেটু, মাছলের বিরুদ্ধে যদি সামান্ত কিছু করতে যাও, তাহলে আগে তোমার টুটি টিপে ধরবো, তারপর তখনই সিরে তাকে আমি সব বলে দেব।

চিনি। (ধীরভাবে বাধা দিয়া) আমার মাক করবেন। এ রকম কটুকটিয়া করাটা আমি ঠিক মনে করি না। কোম কোম বিষয়ে আপনাদের চোখেনেই ঠিক বলছেন। আপনাদের চোখেনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে। • •

কতী। চিনি ঠিক বলেছে। দুজনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

বিড়াল। আমরা সকলেই কি অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করছি না?...আমরা সকলেই—জল, আগুন—কতী, চিনি তোমরাও, টাইলো তুমিও—যুঁকে হাত দিয়ে বল'বেশি, সকলেই কি আমরা মাছলের ক্রীতদাস হয়ে পড়িনি?...মনে কর বেশি, সেই সময়ের কথা, বখন মাছলবেগ এখানেই দস্ত ছিল না, প্রভু ছিল না—তখন আমরা পৃথিবীতে কি রকম অবাধে, বেজামত ঘুরে বেড়াতুম!...আগুন আর জল তখন অগতির সর্গময় কর্তা ছিল, এখন তাদের চর্দশা বেশি...আমাদের অবস্থাটাও তাহো!...হৃদয় বস্ত্র পত্তর বংশধর আমরা, আমাদের এই চূপ, চূপ, ওরা আসছে...সাবধান হয়ে যাও...দেখাও যে আমরা কিছুই করছি না...আলো আর পত্নী এতিকে আসছে, আলো মাছলের সপ্ন নিয়েছে...আলো হল আমাদের চির-শত্রু!...এই যে ওরা এসে পড়ল।

বুড়া গ্রীলোকের বেগে পত্নী এবং পদ্মাক্তে আলো এবং তিলিঙ ও মিডিল অংশে করিন। •

পত্নী। কি হচ্ছে মই?...ওই কোণটিতে বসে তোমরা কি সব গুজ্-গুজ্ করছ?...বেশে মনে, হচ্ছে, কোঁন ফলী অঁটিছ।...ওঠো সব, এখনই তোমাদের বেরতে হবে।...আমি ঠিক করলুম যে আলো তোমাদের পথ বেধিয়ে নিয়ে যাবে।...আমরা তোমরা বেরকম মাস্ত কর, তাকেও সেই রকম করো। আমি আমার ছড়ি-পাছটী তাকে

বিজি। তিলতিল-মিতিল আজ সন্ধ্যাবেগার
তাদের ঠাকুর্দা আর ঠাকুর্মার সঙ্গে দেখা
করতে যাবে। তোমরা পিছনে থেকো!...
ভারা আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা তাদের মৃত
আত্মীয়-বৃদ্ধদের সঙ্গে কাটাবে, সেই সমস্ত
তোমরা কালকের জন্ত সব যোগাড়-বস্ত্র করে
নিয়ো, কাল অনেক পথ হাঁটতে হবে।...ঐস,
আর বসে থেকো না, এখন যে যার কাজে
তৎপর হও।

বিভাল। (ভগ্নামির সহিত) মা-ঠাকরুণ,
টিক এই কথাটাই আমি এদের এতকণ
বোঝাচ্ছিলুম।...নিজেষ্টের প্রত্যেক কাজটী
বেশ বিবেচনা-মত নির্ভরে করে যাবার জন্ত
এদের আমি উৎসাহ দিচ্ছিলুম; কিন্তু
আপনোষ এই যে কুকুর কেবল আমার
কথার বাধা দিচ্ছিল, আর...

বিভালের ঘাড়ে কুকুর লাকাইসা পড়িবার উপক্রম
করিল; তিলতিল পুঞ্জই তাহা বৃকিতে পারিল
সামকে বমক দিয়া নিবৃত্ত করিল।

কুকুর। কি? কি বলছিস্ তুই?...
আচ্ছা!...

তিলতিল। খবরবার টাইলো!... ধরলে
আর রক্ষে রাখবো না!

কুকুর। তুমি জান না; ও মিছেই...

তিলতিল। (বমক দিয়া) চুপ, কোন
কথা শুনেতে চাই না।

পরী। বাস, হয়েছে।... তিলতিল,
জানকের মত তুমি খাঁচাটা কটীর কাছ থেকে
নাও। জাতকের মধ্যে অর্থাৎ তোমার
ঠাকুর্দার ওখানে হরত নীলপাখীর সন্ধান
পাওয়া যেতে পারে।... সেখানে যখন যেতেই
হল, তখন ছাঁদার খাকা ভাল!... আচ্ছা,

আমরা সব এই দিকে যাব এবার।...
(তিলতিলের প্রতি) তোমরা ওই দিক দিয়ে
যাও।

তিলতিল। (উদ্বিগ্নভাবে) আমরা দুটী
ভাই-বোনেই শুধু যাব তাহলে?

মিতিল। আমার খিমে পেয়েছে।

তিলতিল। আমারও পেয়েছে।

কটী তলোয়ার বাধির করিয়া নিজ পাকস্থলী
হাতে দুটী টুকরা কাটিয়া তিলতিল ও মিতিলকে
স্বপ্ন করিল।

চিনি। (অগ্রসর হইয়া) আমিও এই
সঙ্গে চিনির দু-এক টুকরো তোমাদের
দিজি।

সে তৎক্ষণাৎ নিজ বাহরতের পাঁচটা আঙ্গুল
কাটিয়া তিলতিল ও মিতিলকে উপহার প্রদান
করিল।

মিতিল। দেখ, দেখ, কি করলে!
ও নিজের সব আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলে!

চিনি। ধেরে দেখ, ভারী চমৎকার!...
এগুলি খাঁটি চিনির তৈরী।

মিতিল। (একটী খাইয়া) সত্যি, বড়
চমৎকার!...এ রকম কি তোমার অনেক
আছে?

চিনি। (নম্রভাবে) আছে। আমি বত
ইচ্ছে পেতে পারি।

মিতিল। যখন কেটে ফেলো, তখন কি
তোমার বড় লাগে?

চিনি। একটুও না; কেটে ফেলে বরং
লাভ আছে; তখনি আবার নতুন আঙ্গুল
পঞ্জিরে ওঠে; এতে আমি সর্ব্বথা পরিষ্কার
নতুন আঙ্গুল পাই।

পরী। বেশী খেয়ো না!...মনে থাকে

যেন স্রোতের ঠাকুর্দা আর ঠাকুয়ার সঙ্গে
আলি সন্ধ্যা বেলায় খেতে হবে।

তিলতিল। তাঁরা কি এখানেই
আছেন?

পত্নী। এখনি তাঁদের দেখবে।

তিলতিল। তাঁরা ত মরে গেছেন,
তবে তাঁদের দেখব কি করে?

পত্নী। তোমাদের স্মৃতির মধ্যে যখন তাঁরা
রয়েছেন, তখন মরতে পারেন না। মাকুষের
জ্ঞান এত অল্প যে এই রহস্যটুকু তাঁরা বোঝে
না। বাই হোক, হীরেটুকুর গুণে তোমরা
দেখবে যে তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন,
বাদের কথা তোমাদের মনে আছে, তাঁরা
সবাই তোমাদেরই মত স্থখে স্বচ্ছন্দে
রয়েছেন।

তিলতিল। আলো কি আমাদের সঙ্গে
যাবে না?

পত্নী। না, তোমরা কেবল দুজনই
যাবে।...অচেনা কারও সঙ্গে গিয়ে কাজ
নেই। আমিও এখানে থাকব। তোমাদের
হৃদয়কে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা যেতে
বলেন নি।

তিলতিল। কোন্ দিকে আমরা যাব?

পত্নী। এই দিকে।...তোমরা এখন
স্মৃতির দেশের দরজার পাড়িয়ে রয়েছ।...
হীরেটী ঘুরিয়ে নিলেই সামনে দেখবে, একটা
মস্ত গাছ, তাতে একথানা তক্তা ঝুলানো
রয়েছে।...সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে
তোমরা ঠিক আয়নার গিরে পৌঁছেছ; কিন্তু
ভুলে যেরো না যে ন'টার আগে তোমাদের
হৃদয়কেই ফিরতে হবে।...যদি ঠিক সময়ে
ফিরে না পার, যদি একটু দেরী করে

যায়, তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে।...ন'টার
আগে ফেরা চাই, বুঝলে,—এ কথা যেন
ভুলো না।...আচ্ছা, এখন তবে এসো।...
(বিড়াল, কুকুর, আলো প্রভৃতিকে ডাকিয়া
লইয়া) তোমরা সব আমার সঙ্গে এস...
ওরা গম্বিকে যাবে।...

আলো ও আনোয়ার প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পত্নী
ডান দিকে চলিয়া পেল; তিলতিল ও মিতিল ডান
দিক দিগা বিজ্ঞান হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্মৃতির দেশ

যন ছয় বটিকায স্থানটি দাঁড়ায়। সমুখ এক
বৃক্ষের গাছ, তাহাতে একখানি তক্তা ঝুলানো
রহিয়াছে। স্মৃতি, স্তম্ভ আলোকজ্যোতির চারিদিক
উদ্ভাসিত। তিলতিল ও মিতিল বৃক্ষতলে বসিয়াছেন।

তিলতিল। এই সেই গাছ।

মিতিল। ঐ যে তক্তা ঝুলানো
রয়েছে।

তিলতিল। কি লেখা আছে—পড়া
যাচ্ছে না; খাম, গাছে উঠি। এইবার
হরেক্কে; লেখা আছে, “স্মৃতির দেশ”।

মিতিল। ঠাকুমা আর ঠাকুর্দা
কোথায়?

তিলতিল। ঐ পিছনে, যেখানে কুয়াশা
নেই; এখনি দেখতে পাব।

মিতিল। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি
না...নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে
না।...উহুহু, কি দীর্ঘ! আমি আর
হাঁটতে পারবো না, খাড়া ফিরে যাই।

তিলতিল। ধাম। কচিপুতীর মত
প্যান্ প্যান্ করে কাগা ভাল-বেধার না।
...এত বড় ধাড়ী মেয়ে, লজ্জাও করে না
কান্নাতে?...ওই বেধ, কুয়াশা কেটে বাজে;
শিঙেন কি আছে, 'এখনি বেধতে পাব।

কুজুটিকা নড়িতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে
ক্রমে শাওলা ও হালকা হইয়া অবশেষে অব্যত
হইয়া গেল। আলো ক্রমশঃ বহু তাঁর কুটীর উঠিতে
লাগিল, এবং অব্যত মনোরম লতাফুলের মধ্যে
একটা বহুত কুটির বেধা গেল। কুটিরের ধরমা
এবং জানালা খোলা ছিল। জানালার পার্শ্বে পুষ্পা-
ধার সজ্জিত ছিল, বেওয়ার্ষের গায়ে একটা বহুত্রে
মন্দিরকার দল গুন্ গুন্ করিতেছিল। বাটার মধ্যে
একটা কালো রঙের পানী ঘুঘাইতেছিল। বহুতর
পাশে একখানি চৌকির উপর একটা বহু ক্রক ও
কাছা পাতা পাতা বিস্তার অতিকৃত। ইহারাই
তিলতিলের পিতামহ ও পিতাবতী।

তিলতিল। (বুড় ও বুড়াকে চিনিতে
পারিরা) ওই যে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা।

মিতিল। (আনন্দে করতাসি দিরা)
হাঁ, হাঁ, ওই যে তাঁরা, ওই যে!

তিলতিল। (এখনও তাহার লক্ষ্যে দূর
চর নাই) থামো, বাস্তব হরো না। এখনও
মিক বলা যায় না, তাঁরা নড়তে পারেন
কি না! আমরা গাছের নীচে দাঁড়াই এস।

ঠাকুমা চোখ চাছিলেন, মাথা ঝুলিলেন, অবশেষে
কুটীর বসিলেন; একটা নিখাস হাড়িরা বুকের দিকে
চাছিলেন। বুড়ও বীরে বীরে ছাটখাট বসিলেন।

ঠাকুমা। আমার নাতি-নাতিনি ধারা
বেঁচে আছে,—আমার কেমন মনে হচ্ছে,—
আজ তাঁরা আমাদের বেধতে আসবে।

ঠাকুর্দা। তাঁরা আমাদের কথা ভাবছে
বৈকি; কারণ আমার পারের তলা চুলকুছে।

ঠাকুমা। আমার মনে হয়, তাঁরা
খুব কাছেই আছে; কেমনা, জানবে
আমার চোখে জল তরে উঠছে।

ঠাকুর্দা। না, না; তাঁরা এখনও
অনেক দূরে রয়েছে।...আমি এখনও কাহিল
বোধ করছি!

ঠাকুমা। কখনো না!...আমি বলছি,
তাঁরা খুব কাছে আছে; আমার বেশ
আনন্দ হচ্ছে।

তিলতিল ও মিতিল। (বুকের পশ্চাৎ
হইতে কুটীর বাহির হইয়া) এই যে
আমরা এসেছি, এই যে—ঠাকুর্দা, ঠাকুমা,
আমরা এসেছি গো, এসেছি!

ঠাকুর্দা। বেধেছি গিরি, ঠিক বলেছি
কি না, যে, আজ আমার নাতি-নাতিনি
নিষ্ঠর আসবে।

ঠাকুমা। তিলতিল? মিতিল? এস
ভাই, এস দিদি। (উত্তীর্ণ তাহাদের নিকটে
ঘাইবার চেষ্টা করিরা) বেধ, আমি তাড়াতাড়ি
হাঁটতে পারি না, এখনও সেই বাতে
জুগচি।

ঠাকুর্দা। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বত
শীত সম্ভব চেষ্টা করিরা) আমারও সেই
দশা।...কাঠের পা নিয়ে আমিও তাড়াতাড়ি
হাঁটতে পারি না। সেই যে গাছ থেকে
পড়ে প। ভেঙ্গে কাঠের পা পরেছিলুম, সে
পা এখনও তেমনি আছে।

ঠাকুর্দা, ঠাকুমা এবং নাতি-নাতিনি পরস্পরের গা
আঁদাচ্ছে বহু হইল।

ঠাকুমা। তিলতিল, বা ভাই, জুই ত
বেশ বড়-সড়টী হয়েছ!

ঠাকুর্দা। (মিতিলের চুল ধরিয়া টানিরা)

আর মিতিল ? ...মিতিলের দিকে চেয়ে দেখ,
বিবিধ চুলগুলি কি চমৎকার চরেছে!
চোখচুটীও ভারী হৃন্দর !

ঠাকুমা। এল কোলে এস, একটা চুমো
দাও।

ঠাকুর্দা। আর আমার—

ঠাকুমা। তুমি একটু পামোনা !...
আমার কাছে আগে এস।...তোমাদের
বাবা আর মা ভাল আছে ?

তিলতিল। বেশ! ভাল আছে ঠাকুমা।
আমরা বখন আগি, তখন তাঁরা ঘুমু-
চ্ছিলেন।

ঠাকুমা। (ভাল করিয়া দেখিয়া এবং
আজ্ঞাযে তিলতিল-মিতিলকে ওড়াইয়া ধরি ১)
কি হৃন্দর তোরা হয়েছিল। হ্যাঁরে, তোদের
এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজ-গোজ পরিধে
মিলে কে ? মা বুঝি ?...তোরা হাসেশা
কেন এখানে আসিস না ? তোদের দেখলে
বে কত খুসী হই !...বাসের পর মাস কেটে
গেছে, একবারও ত কই আমাদের মনে
করিস নি !...এতদিন যে আমরা কাউকে
দেখতে পাইনি, তাই !

তিলতিল। আগতে পারিনি ঠাকুমা ;
আর আসবই বা কি করে ? আজ যে
এসেছি, সে কেবল পরীর দ্বারা।

ঠাকুমা। আমরা এই জারগাটী খেকে
কোথাও নড়িনে ; কিন্তু দেখা ত কই কারো
সঙ্গে হয় না !...কালে-ভায়ে কেউ হয়ত
এসে পড়ে...এই তোরাই এলি কদিন
পরে, বল যেণি !...সেই এক দিন এসেছিলি,
মনে পড়ে ?...সেই যে দিন গির্জার ঘণ্টা
বাজছিল, সে আজ এক বছরের কথা না ?

তিলতিল। সে দিন ত কই আমরা
বাড়ীর বার ষ্টনি, ঠাকুমা !...আমাদের
দুজনকেই যে সেদিন বড্ড সর্দি লেগেছিল।

ঠাকুমা। বাড়ীর বার ষ্টনি, কিন্তু
সেদিন আমাদের মনে করেছিলি যে তাই।
তিলতিল। হ্যাঁ, তা মনে করেছিলুম
বটে।

ঠাকুমা। তা হলেই চল। বড়বার
তোরা আমাদের কথা ভাবিস্ ততবারই
আমরা জেগে উঠি আর তোদের দেখতে
পাই।

তিলতিল। তোমরা কি চক্ষিণ এন্টাই
ঘুমিরে থাক ?

ঠাকুর্দা। হ্যাঁ, তাই ঘুমটা আমাদের বড্ড
বেশী বটে ; কিন্তু বাসের প্রাপ আছে,
তারা আমাদের মনে কল্পেই আমরা জেগে
উঠি।...প্রাপ শেষ হয়ে গেলে ঘুমটাই সব
চেয়ে ভাল লাগে কি না ! তবে মাঝে মাঝে
জেগে থাকও বেশ।

তিলতিল। তা হলে তোমরা সত্যি
মরনি ?

ঠাকুর্দা। অ্যা, কি বলি ?...ও গিরি,
এরা আবার ও সব কি বলছে ?...এর মানে
কি ?...এমন একটা কথা বলে, যা আগে
কখনও শুনি নি।

তিলতিল। সে কি ?

শোন নি ?

ঠাকুর্দা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ কপাই বটে !
তা ও কথাটার মানে কি তাই ?

তিলতিল। এর মানে যে বখন দেখে
আর প্রাপ থাকে না।

ঠাকুর্দা। তোমরা দেখছি,

আহা! ও একটা কথাই নয়!... না, কিছুই বোঝ না...ভালো আহা!...

তিলতিল। (বিস্মিতভাবে ঠাকুরদা ও ঠাকুরমাকে দেখিতে লাগিল) ঠাকুরদা, তুমি ঠিক তেমনটিই আছে; একটুও খেলাও নি—একটুও না; ঠাকুরমা, তুমিও সেই আছে। তোমাদের চেহারাও বয়স আরো জলসু হয়েছে।

ঠাকুরদা। হ্যাঁ, আমরা বেশ ভালই আছি...আমাদের বয়স আর বাড়বে না, আমরা আর বুড়োও হব না; কিন্তু তুমি যে মজা চেনা হয়ে উঠেছ, তাই।

তিলতিল। (কৌতূহলের সহিত চারি দিকে চাহিয়া) কিছুই বলবার নিও, বাঃ! যে যেমন ছিল, সে ঠিক তেমনটিই আছে; কেবল আগেকার চেয়ে বেশী সুন্দর হয়েছে।

মিতিল। তিলতিল, দেখ, ওই সেই বুড়ো কালো পাবীটী!...বাহবা! ও কি এখনও গান করতে পারে?

কালো পাবীটী মাগির উট্টা উঠ হয়ে গান করিয়া ছিল।

ঠাকুরদা। দেখলে ত!...ওর কথা মনে করেছ কি ও অমনি গেসে বসেছে!

তিলতিল। (প্যাবীটিকে বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, সেটি একেবারে নীলগের) এত দেখছি একেবারে নীল। বা রে! এই পাবীটাই ত আমরা চাই, এইটাই ত পরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এত বুঝে বেড়াচ্ছি, আর এটা এখানে রয়েছে, তোমরা আমাদের বলনি? বেশ পাবী, আগ-

গোড়াই নীল, তি চমৎকার! (আমাদের হুত্রে) ও ঠাকুরা, ঠাকুরদা, এটা আমাদের দেবে?

ঠাকুরদা। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। কি বল গো গিরি?

ঠাকুরমা। অবিশ্বাস। এ আর বেশী কথা কি? ওটা রেখেই বা আর কি হবে? কেবল ত পড়ে পড়ে বুঝার; গান করতে ত একদিনও শুনলুম না।

তিলতিল। আমি একে আমার বাঁচা পুরে নিয়ে যাব...আচ্ছা, সে বাঁচাটা কোথায়?...ও, মনে পড়েছে, গাছতলার মধ্যে এসেছি...লাড়োও, নিয়ে আসি। (সে 'ভৎক্ষণ' ছুটিয়া গিয়া বাঁচা লইয়া আসিল এবং তাহার ভিতর পাবীটিকে বদ্ধ করিল) তা হলে ঠাকুরা, সত্যি এটা আমার দিলে ত? কালো আর পরী দুজনে দেখে কত খুসীই যে হর্বে এখন!

ঠাকুরদা। বেশ, নিয়ে যাও; কিন্তু এর বিষয় কিছু বলতে চাই না; তবে আমার ডর হয়, সে দেশে গিয়ে ও বেশী দিন টিকতে পারবে না। বসন্তের হাওয়া এই দিক পানে বইবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ফিরে আসবে।

তিলতিল। আচ্ছা, আমার ছোট বোন-গুলি কোথায়? তারাও কি এখানে আছে?

মিতিল। আর ছোট ভাইগুলি?

ঠাকুরদা। এই যে তারা, এই যে! মনে করতে না করতেই বাছারা সব সঙ্গে হাজির হয়েছে!

ভিলভিল ও মিভিল ছুটিয়া গিয়া তাহাদের
জড়াইয়া ধরিল এবং হাত ধরাধরি করিয়া আল্লাদে
নাচিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দ-কলরবে স্থানটি
স্থগিত হইয়া উঠিল।

ভিলভিল। কিরে পীরোট, কেমন
আছিস?...আগে যেমন আমরা লড়াগড়ি
করতুম, তেমনি করি, আর। ও রবার্ট, ও
জিন, তোদের পুকুল কোথায় রে? ও
পলিন, ও রিকেট!

মিভিল। এট যে পিরোট, এই যে
মাদুলিন!...ও খুকী, তুই যে এখনও হামা
টানছিস?

ঠাকুমা। ও অমনিটিই থাকবে, আর ত
বাড়বে না।

ভিলভিল। পলিনের নাকের উপর
এখনও সেই মার্গের চিবিটা রয়েছে!

ঠাকুমা। ওটা অমনিই থাকবে, সারবে
না।

ভিলভিল। এরা সব কেমন মোটা-
মোটা, কেমন দুন্দর আর পরিষ্কার রয়েছে!
...পালগুলি কেমন লাল টুকটুকে!...
ঠাকুমা, এরা বোধ হয় ভাল খেতে-দেতে
পায়, না?

ঠাকুমা। যেদিন থেকে ওরা এখানে
এসেছে, সেদিন থেকে সব খুব ভালই আছে।
শরীরে অল্পই নেই, কিছুই ভয় নেই, কোন
রকম ভাবনা নেই...

হুজীরের মধ্যে বড় বাড়ীতে ঢুকে করিয়া আটটা
বারিল।

ঠাকুমা। (আশ্চর্য্য হইয়া) ও কিসের
আওয়ার?

ঠাকুমা। তাইত!...ওটা বাড়ি না?

ঠাকুমা। তেতই পারে না; এদিন ত
কই বাজে নি!

ঠাকুমা। তা বাজবে কেন! আমরা
কখনও সময়ের কথা যে মনেও করি নি।
আচ্ছা, তোমরা কি কেউ এখন সময়ের
কথা মনে কচ্ছিলে?

ভিলভিল। হ্যাঁ, আমি মনে কচ্ছিলাম।
এখন সময় কত ঠাকুমা?

ঠাকুমা। কি জানি। আমার কোন
ধারণা নেই। আটবার ওটা বাজলো;
তাইতে মনে হচ্ছে এই সময়টাকে তোমরা
আটটা বল।

ভিলভিল। আলো আর পরী আমার
মস্তে বসে রয়েছে; নটার আগে তাদের
কাছে গিয়ে হাজির হতে হবে, বড় জরুরি
কাজ আছে!...আনি তবে এখন চলুন!

ঠাকুমা। বাম্, বাম্, পাগল! অমন করে
কি চলে বেতে আছে!...খাবার তৈরি, খেয়ে
বা। চল, সব বাইরে গিয়ে খেতে বসি।
খুব কমংকার কপির কোল আর কুলের
চাটনি তৈরি আছে।

সকলে ধরাধরি করিয়া টেবিলটা বাইরে আনিয়া
বালা-বাদন, চামচ প্রভৃতি লম্বাটতে লাগিল।

ভিলভিল। সেই যে বাড়ী থেকে
বেরিয়েছি, এর ভিতর একদিনও কপির
কোল খেতে পাই নি। নীলপাখী ত
পাওয়ার গেল, এখন আমি নিশ্চিন্তি। আজ
পেট ভরিয়ে কপির কোল খাব। কি বল
ঠাকুমা?

ঠাকুমা। আচ্ছা, বত পারিস, বা, তাই।
...বসে বা না যে সব তোরা!...তাড়াতাড়ি
বদি খেতে হয় ত আর ধেরি করছিস কেন?

বাগাটা উস্কাইয়া নেওয়া হইল। খোল
পরিবেশ করা হইল। ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা নাতি-
নাতনিদের লইয়া আহারে বসিলেন। বেগুলা উল্লাসে
চেঁচাইতে লাগিল—খাবার কটকটা কাডাকাড়ি হুলা-
হুনি আরম্ভ করিয়া দিল।

তিলতিল। (পেটুকের মত গিলিতে
লাগিল) ভারী চমৎকার, ঠাকুমা, ভারী
চমৎকার!...আরো খাব, ঠাকুমা, আর-
একটু দাও।

চোত হাতে করিয়া অস্থিরভাবে নাড়িতে
লাগিল এক বাংলায় উপর খুব জোরে ঝুঁকিতে লাগিল।

ঠাকুর্দা। আরে খাম্, খাম্। অত ব্যস্ত
কেন?...তুই যেমন ছুট ছিলি, ভেমনিই
আছিল, দেখছি। পালাটা ভেঙ্গে ফেলবি
না কি?

তিলতিল। (টুলের উপর উঠু হইয়া)
আমার আরো দাও, আরো, আরো।
(কোলের বাংলাটা শুদ্ধ বহিরা নিঃসৃত মিকে
টানিতে লাগিল। আর অমনি গরম তোল
পড়াইয়া তাহার হাঁটুতে পড়িল। সে বাউনার
টানকার করিয়া উঠিল)

ঠাকুমা। বেশ হয়েছে; কে-রকম ব্যস্ত-
বাস্তব!

ঠাকুর্দা। (তিলতিলের পালে খুব
জোরে এক চড় বহাইয়া দিলেন) কেমন,
এবার হয়েছে!

তিলতিল। (প্রথমটা চমকিয়া উঠিল;
তারপর পালে হাত বুলাইয়া ভারি খুশী
হইয়া) ঠিক এই রকম চড় তুমি মারতে,
যখন তুমি বেঁচেছিলে, ঠাকুর্দা। দেখ,
আমার ভারি মজা লাগছে।...এর জন্তে
তোমার একটা চুমো দাও।

ঠাকুর্দা। সত্যি না কি! তবে আরও
এক বা চোস নাকি?

(ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল)

তিলতিল। ওই বাঃ, সাড়ে আটটা
বেগে গেল! মিতিল, চল, চল, আর
সময় নেই!

ঠাকুমা। একটু পাম্। আর ৫-টার
মিনিট। কদিন পরে তোরা এলি, অমন
ডাড়াডাড়ি চলে যাবি!

তিলতিল। না, না, আর থাকতে পারি
না। আলো আমাদের জন্তে বদল রয়েছে...
আমি তাকে কথা দিবেছি। মিতিল, এস।

ঠাকুর্দা। হা ভগবান! এরা কাজ-
কর্ম নিয়ে কি কটাই না ভোগ করে!...
একটুও কি এদের সোয়াস্তি নেই?

মিতিল। (খাঁচা হাতে লইয়া ব্যস্তভাবে
প্রত্যেককে চুম্বন করিয়া) ঠাকুর্দা, তবে
চলুন। ঠাকুমা, আলি, ভাই সব,
বোনগুলি, এখন তবে চলুন। কিছু মনে
করো না। আমার থাকবার বো নেই।
কোনো ঠাকুমা আমি আবার আসব—
এখন থেকে চামেশাই আসব।

ঠাকুমা। ই্যা মিদি, রোম আসিন্।
তিলতিল। আচ্ছা ঠাকুমা, ভাই হবে।
দত্তবার পারি, আসব।

ঠাকুমা। তোরা যে মাঝে মাঝে
আমাদের মনে করিস, এইটুকুতেই
আমাদের যা-কিছু সোয়াস্তি!

ঠাকুর্দা। এ ছাড়া আর কোন রকম
আমোদ আমাদের নেই।

তিলতিল। নীপুণিত, নীপুণিত।
আমায় খাঁচা কোথায়—পাখী?

ঠাকুর্দা। (খাচাটা তিলতিলের হাতে
দিয়া) এই নাও। কিন্তু আমি বলতে
পারলুম না, এর রঙটা ঠিক নীল কি না!

তিলতিল। আমরা তবে চমুখ।

ছেলে-বোরেগুলি সকলে। এসো, মিতিল,
এসো, তিলতিল, আমাদের মনে রেখো;
আবার এখানে এসো।

তিলতিল ও মিতিল চলিয়া গেল। সকলে
তাহাষিককে ক্রমাগৎ মাড়িয়া বিদায় দিল। স্থানটি
আবার কুত্রকটিকার আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল
ও মিতিল পুনরায় বৃক্ষতলে আশ্রয় পাইল।

তিলতিল। এই রাত্তা ত ?
মিতিল। হ্যাঁ, আলো কোথায় গেল ?
তিলতিল। কি জানি ? (খাচার দিকে
চাহিয়া) কি আশ্চর্য! পাখীটা ত নীল
রঙের নয়, এ যে মিশ্ কালো !
মিতিল। আমার হাত ধর তাই;
বড় শীত করছে—আমার ভারী ভয়
পাচ্ছে।

ক্রমশ

ত্রিগামিনীকান্ত সোম।

সামাজিক পরিবর্তন

(রূপটকিন হইতে)

আমাদের প্রার্থিত এই বিদ্রোহ যদি
সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে পরিণতি লাভ
করে, তবে আগেকার অসন্তোষ বিদ্রোহের
সঙ্গে এর কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের প্রভেদ
হবে না, উপায়েরও বৈশিষ্ট্য প্রভেদ থাকবে।
নূতন উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে নূতন উপায়
অবলম্বন করতে হবে।

গত একশ বছরের মধ্যে ক্রান্তি
যে তিনটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, তাদের
প্রত্যেকের মধ্যে উপায় ও উদ্দেশ্যের নানা-
রকম তফাৎ থাকলেও একদিকে বৈশিষ্ট্য
একটি ছিল। প্রতিবারেই যেনের জন-
সাধারণ পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদের
জন্তে লড়াই করে বুকের বুক দিয়েছে
এবং কিছুদিনের জন্তে বুকের আঘাত-
* চিল ধারণ করে সর্ব্বত্র ছুইয়ে বিপ্লবিত

মধ্যে তলিয়ে গেছে। প্রতিবারই মধ্যবিত্ত
সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত কার্য্যকরী সমিতি
দর্শনতত্ত্ব আর রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিতরকার বহুদিনের
অবিচ্ছিন্ন দূর করার চেষ্টায় যে পরিমাণ
সময় ও শক্তি ব্যয় করেছে, জন-সাধারণের,
বুদ্ধরত কর্ম্মীর অভাব-অভিযোগের দিকে
সেই পরিমাণ অনমনোযোগী হয়েছে। মধ্য-
বিত্ত সম্প্রদায়ের বিজ্ঞতার ফলে রাষ্ট্রনীতির
তর্ক হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবস্থানের কথাটা
সেই গোলেমাশে ঢাপা পড়ে গেছে।

সেই বিদ্রোহে, মানবসভ্যতার সেই
অকরণীয়ের এমন-সব বড় কথা এবং মহৎ
ভাব জন্মান্ত করেছে, যার জন্তে আরও
জগৎময় সাড়া বেগে আছে। এক শতাব্দীর
ব্যবধানকে তুচ্ছ করে' সেই-সব কথা
এখনও আমাদের শ্রোণে নতুন প্রেরণা

এনে দ্বিজে, কিন্তু সে-সব বড় কথা।
কশ্মীরের কোন উপকারেই আসেননি।
বিকলমহারাজ হয়ে-তার। দুর্ভাগ ও নোংরা।
কুটীরে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে অনাহারে অলসার হয়ে
মরেছে; কারণ, বড় কথার মন ভরতে
পারে, পেট ভরে না।

বিত্রোহের সময় কল-কারখানা বন্ধ
হবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-প্রবোধ উৎপাদন ও
বিস্তার বন্ধ হয়ে গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য
স্থপিত হল, আর মূলধন ধর্মের দিম্বুকের
মধ্যে ডালু-ডাপা হয়ে রইল। 'তাতে-করে'
খনির মালিক বা কলের মালিকের অবস্থা
কোন অভাব হলো না। গরীবের রক্ত শুধে
তিনি বা সফর করেছেন, তা শুধু উদ্ব-পুষ্টি
কেন,—বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করার পক্ষেও
যথেষ্ট। কিন্তু অলসারে মরলে কশ্মী-
সম্রাট—অভাবের কথাকে তাঁদের জীর্ণ
শ্রাণ ভেঙ্গে পড়ল—চর্চিক করণ নৃষ্টিতে
যেদের বৃক মরণ ছড়িয়ে ফিরতে লাগলো।
—তেনন বৃষ্টি অঙ্গ-কখনও হয়-নি।

জনসাধারণ মনে করলে, মথাবিত্ত হল
তাঁদের অনাহারে মরেছে; অনাহারে বরণার
কিন্তু কশ্মীরে তাঁদের ফাঁকি দিলে এবং
নিজেদের মধ্যে থেকে মূল গড়ে তাঁদের
তাতে কর্তৃত্ব তুলে 'বিলে। কিন্তু জন-
সাধারণের অভাব কমানোর কোন চেষ্টাই
সফল হল না।

জনসাধারণের মধ্যে অবলাদের লক্ষণ
যেবা বিলে। রাজপুত্রী হল এবার সুবিধা
বৃক শক্তি সফর করতে লাগলো; এক-
দিকে যেনন কর্তাদের অভাব ও কষ্ট
বাড়লো, অন্যদিকে তেননি ধর্মের সাহসও

বাড়তে লাগলো। তারা গুপ্তহান ছেড়ে
বেহিষে এল; প্রজার চরণভেদী ক্রমশ ও
বৃত্তার মাথানে বিস্ত-বিলাসে পঙ্কিত
রাজশক্তির আনন্দকোলাহল আকাশ বিদীর্ণ
করে' তুললে। কিন্তুমনে অবসর বেহে
বিত্রোহীদল বার্ষিকম হয়ে তাদের কুটীরে
কিরে স্থিতি গ্রন্থের অপেক্ষার বণে' রইল।
রাজশক্তির পুনঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার
মারামারি কাটাকাটি চললো—অজ্ঞান রক্তপাতে
বাণীমতার ভূমি মলিন ও কলঙ্কিত হয়ে
উঠলো। কশ্মীরের অভাব কিন্তু কোন-
দিনই ঘুটলো না—মাক থেকে লক্ষ লক্ষ
লোক অকালে অকারণে পৃথিবী থেকে চির-
নির্দামনে চলে গেল। এমনি-করে' বারে
বারে বিত্রোহীদল বার্ষিকাগ করে' ও যথেষ্ট
বীরত্ব দেখিয়েও বর্ষা লক্ষ্য পৌছতে
পারেনি।

কিন্তু ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা
কাজে লাগাব—আমরা প্রথম থেকেই যথেষ্ট
সাবধান হয়ে চলবো। আমাদের বিত্রোহ
আর-কিছু চায় না—লক্ষের শ্রুতে পথ্যাপ্ত
আহার পেলেই সে সন্তুষ্ট হবে। রাজশক্তির
পরিতাপ্ত শিল্পির সিংহাসন ও শিরোপায়
উজ্জ্বল পরবাসী করণা ও বড় কথার
তর্ক বার্তা করতে চায় তাঁদের সঙ্গে
আমাদের কোন কাজ নেই। বিত্রোহের
আরও থেকেই আমাদের দেখতে হবে, যাতে
মলভুক্ত একজনও অনাহারে না থাকে—
যেদের একজন স্রীলোক বা শিশুও
অন্নভাবে ক্ষান্ত না হয়। মথাবিত্ত সম্রাট
বড় বড় কথা নিয়ে চিরকালই মাথা ঘামায়।
কিন্তু সে-সব নিত্যন্ত অসার কল্পনা বৈ আর

কিছু নয়। সাধারণের যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা সকলের আহ্বার-সংস্থানে ব্যয়িত হবে। আমরা দোর-গদার প্রচার করব যে, অঙ্গের অধিকার সকলেরই আছে এবং সকলের পর্যাপ্ত অঙ্গেরও কোনদিন অভাব হবে না। পর্যাপ্ত অঙ্গের স্বচ্ছলতাই আমাদের এই পরিবর্তনের মূলমন্ত্র।

বিশ্রোহীর দলভুক্ত সকলকেই শরন, অশন ও বসনের অভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। দৈনিক অভাবের দার থেকে ছুটি পেলে তারা খুশী মনে কাজে যোগ দিতে পারবে এবং এগুলো যদি ঠিক হয়ে যায় তবে পরিবর্তনও ঠিক পথে চলবে। কাজেই অল্প তর্ক ও রাজ্য-মৌমাংসা ছেড়ে সাধারণের অভাব অভিযোগের কথাই সবার আগে বিচার্য। এই অঙ্গের অধিকার বিচার করতে গেলে সাম্যকে ভিত্তি করতে হবে; সাম্য, যৈজ্ঞী ও স্বাধীনতা হাত-ধরাধরি করেই চলে—এদের একটিকে ছেড়ে অপরের প্রতিষ্ঠা কোনমতেই সম্ভব নয়।

মেশ-ছুড়ে যদি এই বিশ্রোহ আগে, তবে দেশের কল-কারখানা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফলে হাজার হাজার লোক সপরিবারে কর্মহীন হয়ে অনাহার ভোগ করবে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে, দেশের সমস্ত কদল ও খাজদামদ্রী অধিকার, তার হিসাব রাখা ও সেই সক্তি খাজ জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেকের অভাবাহুলাবে বিতরণ। কলকারখানার কর্মীদের সঙ্গে চুক্তি করে তাদের কাজ করবার অবকাশ ও সুবিধা দিতে হবে। তারপর দেশের পতিত অধিতে

যাতে হুম্বর আবাদ হয় তার চেষ্টাও করতে হবে। এছাড়া অল্প-কিছু উপায় ত আমরা দেখছি না; এবং দরকার পড়লে কেউ যে এ উপায়-মত কাজ করতে পশ্চাৎপন্ন হবেন, তাও মনে করি না।

মধ্যবিত্ত দলের ধারণা, কর্মীসম্প্রদায়ের পক্ষে পর্যাপ্ত আহ্বার যোগানোর মানে, দেশের সর্জনশ করা; কারণ, সমস্ত শক্তি তাদের হস্তগত হলে তাদের আর বাধা দেবার কোন উপায়ই থাকবে না। জনসাধারণকে যারা একপাল অসত্য, নিষ্ঠুর ও বর্জ্য বলে মনে করে, তারা হচ্ছে কুসংস্কারের তকমা-জাঁটা ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ইতিহাসে এ-সব কথাই কোন প্রমাণ আমরা পাই-না। কিন্তু উপরওয়ালাদের এ-সব কথা কোনমতেই বোঝানো যাবে না। কারণ, যারা কর্মক্ষেত্রে তাদের কোনদিন দেখে-নি, নিজেদের সংস্কারের মোহে কেবল অবজ্ঞাই করেছে, তারা বিশ্বাস করতে পারেনা—কতখানি সাম্য, যৈজ্ঞী ও জ্ঞাননিষ্ঠার বিশ্বাস নিয়ে তারা কাজ করে! তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে না মিশলে, তাদের জীবনের সঙ্গে সহায়ত্বিত না থাকলে বোঝাই যাবে না যে, তাদের প্রাণ কত উন্নত, কত মহৎ! রোষ্টার, বুদ্ধের, শিতর ও নাচারের জন্তে অত্যাধি দত্ত ও স্বার্থভ্যাগ সভ্য সমাজের আর-কোথাও পাওয়া যাবে না। এই যে সত্যের প্রতিষ্ঠান, এ তাদেরই একটি বিশেষ কৌশল এবং বর্তমানের অত্যন্ত অত্যাচারের ও অভাবের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা,—যেখানে সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন। এ

বিগত থেকে উদ্ধারের আর-কোন উপায়
আমরা জানি না।

মধ্যবিত্তদের কথা যদি সত্য হয়, যদি
পৰ্যাপ্ত আহায়ে জনসাধারণের সাহস বেড়ে
দায়, তবে তাতে ভাবনার ত কিছু দেখি না।
খাবারের দোকান ও হাটবাজার লুট না
করে ও তারা দেশের খাদ্য একজায়গায় জড়ো
করবে—আপনাদের স্বার্থ-চেষ্টার লোকের
অনিষ্ট তারা যে করবে না, এটা স্পষ্ট-চিত।
অধিকার-চ্যুতি এই পরিবর্তনের প্রধান
অস্ত্র এবং জনসাধারণই এ-কাজে প্রধান
কর্মী। এখন থেকে ঠিকরে দেশকে ভূগিরে
ধনীরা যা সঞ্চয় করেছেন, জনসাধারণ সেই
সম্পদ দেশের কাজে ব্যয় করবে। শিক্ষিত
লোকেরা সেই-সব আহত খাণ্ডের তালিকা
করবেন এবং সেই তালিকা সূত্রিত অবস্থার
সকলের মধ্যে বিতরিত হবে। যাকে সহজেই
জানবে, দেশে খাদ্য কত, কোথায় পাওয়া
যাবে এবং কি উপায়ে বিতরিত হবে।

নগরের প্রতি বিভাগে, প্রতি রাস্তার
যেচ্ছাসেবক-সমিতি গঠিত হবে—তারা প্রত্যেক
দলের সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করবে।
জনসাধারণ যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে
পারে, তবে কিছুদিনের মধ্যেই অসংগ্ৰহ ও
বিতরণ কার্য স্বস্বরূপে পরিচালিত হবে।
আমরা স্বীকার করি যে, ক্রমত দিন-পনের বা
মাস-খানেক একটু গোলযোগ, একটু কষ্ট
হবে; কিন্তু তাতে এসে যায় কি?—‘স্বাধীনতা
থেকে মুক্তিই সে কষ্ট পূরণ করবে, দেশে
সুবিধার দ্রুত নিজের কষ্টস্বীকার আনন্দ
বলে’ মনে হবে; বিদ্রোহের সময় বিলাসের
আশা কেউ নিশ্চয়ই রাখে না।

কষ্ট হোক বা না হোক, এটা সকলেরই
বোঝা উচিত, সভার পর সভার তর্ক করে’
চারটে ঘেরালের মধ্যে বহু হাওয়ার বাস
করে’ ‘বিগতী’-প্রেমিক যা তৈরি করেন, তার
চেয়ে অভাব থেকে যা ব্যবস্থা হয় সেটা
শতগুণে ভালো। মধ্যবিত্তদের ছেড়ে জন-
সাধারণের হাতে কাজের ভার দেবার এটাও
একটা বিশেষ কারণ।

খাদ্যসংস্থান থেকে আরম্ভ করে’ দৈনিক
ব্যবহার্য্য সব জিনিষই সঙ্কল্প অধিকারভুক্ত
করতে হবে এবং সেটা দৃঢ়-শীঘ্র হয় ততই
ভালো; কারণ তা হলে দুঃখও কমবে এবং
সংখ্যাতও কমবে। সকলেই যাতে অধিকার
পায় এবং সে অধিকার সবায়ের পক্ষে সমান
হয় এ ব্যবস্থা করতে হলে সমাজকে কোন
প্রতিষ্ঠান-ভূমির উপর গাড় করতে হবে;
ভোড়াতাড়ি দিয়ে কিছু খাড়া করলে
তাতে দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রায় সব সভ্যদেশে অতি পূর্বকাল
থেকে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ
সঙ্কল্প ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে।
সবায়ের অধিকার বলার রেখে সমাজ-
ব্যবস্থা করতে হলে সেই সঙ্কল্প আমাদের
আদর্শ বলে মেনে নিতে হবে এবং দেশ জুড়ে
তারই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এককথায়
ব্যবস্থাটি হচ্ছে এই, যে জিনিষ সঙ্কল্প মধ্যে
অপর্যাপ্ত, তা সকলেই বিনাবাদ্য ইচ্ছা-
মত ব্যবহার করতে পারবে এবং যাকিছু
কম বা কম হবার সম্ভাবনা আছে, তা
সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে’ বেণা হবে।
নগরে নগরে অল-সরবরাহের যে বন্দোবস্ত
আছে, তা এই ব্যবস্থারই একটি অংশ।

আমরা বিশ্বাস করি, এ ব্যবস্থার সকলেই সরকার-মত জিনিষ-পত্র ব্যবহার করে,— দেশের অস্থবিধা ঘটরে অপব্যয় করে না। সাধারণ জীবনের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, পৃথিবী ঘেঁটে যারা খালি ‘খিওরী’ তৈরি করে’ জীবন কাটিয়ে দেয়, তারা কেবল এ-সমস্যাতে অবিশ্বাস করতে পারে।

বিস্ত্রোহের প্রারম্ভে খাদ্য সংগ্রহ ও সরকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় উঠবে, খাদ্যের অধিকার-লাভ করবে কারা? প্রতি নগরে, বিস্ত্রোহের প্রতি কেন্দ্রে এ প্রশ্নের সমাধান হবে। যতদিন-না কাজকর্ম ঠিকভাবে চলছে, ততদিন বোকা হবে না, কারা যথার্থ কর্মী আর কারাই বা নিকর্ষা, সেইরকম আত্মত খাদ্য সকলের পক্ষে সমান ভাগ হবে। যারা নতুন দলের বিরুদ্ধে, দাসত্ব বাদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে গেছে, নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশ ছেড়ে যে-যার পথে সরে পড়বে। কিন্তু তারা থাক বা থাক, জনসাধারণ তাদের অন্ন সবারের সাথে ভাগ করে’ নেবে—জেতা-বিজিতের প্রভেদ তারা কোনদিন করে-নি, করবেও না। এই যৈত্বী ও সহায়ত্বভিত্তি কালে বিস্ত্রোহের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না—কাল আরম্ভ হলে, যারা বিরোধী তারা আবার ভাই বলে’ কাছে এসে কর্মীদের সঙ্গে মিলে দেশের কাজে আনন্দে যোগ দেবে। স্বাধীন সমাজে অন্নসম্বের কাছ থেকে ভয় পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেউ হয়ত বলবেন, সবাইকে পেট পূরে খেতে দিলে খাবার যে দাস-খানেরের মধ্যে ছুরিরে থাকে; বেশ তা! ইতিহাসে এই প্রথম সুধী

পর্যাপ্ত আহারের অধিকার ত আপে পাক্— নতুন খাদ্যসংস্থানের কথা পরে হবে।

কেবল যে এক দেশেই এই বিস্ত্রোহ জেগে উঠবে, এ পরিবর্তন সাধিত হবে, এমনও ত বিশ্বাস করা যায় না; অবশ্য, সব দেশ যে একসঙ্গে বিস্ত্রোহে যোগদান করবে, এমন কোন কথা নেই। তবে এটা বেশ বুঝতে পারি, কোন দেশের এক নগরে এ পরিবর্তন হলে আর পাঁচটা নগর ক্রমে সেই ব্যবস্থার চলতে পারে এবং ক্রমে সমস্ত দেশটা সেই নতুন ব্যবস্থাকে আদর করে’ গ্রহণ করতে পারে। এটা একদিনে, না-হয় এক বছরে হবে। যে-সব দেশ শিকার ও শক্তিতে এগিয়ে গেছে পিছিয়ে-পড়া দেশের সঙ্গে একত্র হওয়ার আশায় তারাও ত আর পিছিয়ে আসতে পারে না; অন্নসম্বের পশ্চাদ্বর্তীদের মস্ত ইতিহাস কোন দিন অপেক্ষা করে-নি। যারা এগিয়ে চলেছে, তাদের স্বাধীনতা, শান্তি ও শক্তি দেখেই অল্প বেশ তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবে। অবশ্য সব দেশে যে একই ব্যবস্থা হবে, তাও নয়; লক্ষ্য এক হলেও দেশের অবস্থামত ব্যবস্থা হবে।

কোন নগরে বিস্ত্রোহ আরম্ভ হলে দেশের কর্মীজন কৃষি ও শিল্পকার্য প্রভৃতির উপযোগী ঝর তৈরি করবে। সাধারণের কাজ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী পোষাক তৈরি করবার ক্ষেত্রেও গতর খাটাতে হবে; অল্প বেশের সঙ্গে পরিবর্ত বন্দোবস্ত না করে’ দেশের সকল অভাব দেশের লোকের পরিস্রমেই মিটেবে। সহরে উৎপন্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার গ্রামে উৎপন্ন-খাদ্য প্রভৃতির সঙ্গে বণ্যাবদলি করা হবে। চোখ

তার দরকার-মত ফসল বেখে বাকি সব সহরে পাঠিয়ে দেবে; কারণ সে বুঝেবো সহরবাসী কন্নী তার ভাই, তার বন্ধু,—জবরদস্ত উপর-ওয়ালা নয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা না হলে কেবল যে অসুবিধা হবে, তা নয়, বেশীর ভাগ, বিদ্রোহীদল আমাদের কুলের সুবিধা পেয়ে শক্তিশালত করবে এবং আমাদের সকল চেষ্টা অবসাদ ও অপমানের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে।

বড় বড় সহরে খাদ্যসংগ্রহের জন্যে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। পরিবর্তন সাধিত হলে আমরা বখাসব্ব কম-নির্ভর করবার চেষ্টা করবো।

বর্তমান সভ্যতা-৯ ভিত্তি, গরীবের শ্রমপ্রদায় ফল ঘোর করে' কেড়ে-নেওয়ার উপর। আমরা এই অত্যাচার বন্ধ করব। গ্রাম উদ্ধার দিয়ে বড় বড় সহরে খাদ্য-সরবরাহও বন্ধ করতে হবে। বিদ্রোহের ফলে অত্যাচার-পীড়িত দেশ এই সম্পদ লাভ করবে যে, সে আর-কারণ অধীন থাকবে না। কোন্ দেশে ঠিক কি ব্যবস্থা হবে, তা বলা কঠিন। পরের দায়িত্ব করে' সেলান বাজিরে আর মাটি চবে' হারা পিঠের পাড়া ছুইয়েছে, বিদ্রোহের ফলে তারা সোজা হয়ে পীড়ার সাহস ও শক্তি ছুই' পাবে। পরের জন্যে, পরের অধীনে অর্থাহারে চোখ-পনেরো ঘন্টা কাজ না করে' দতকণ ইচ্ছা কল্প করবার তার পূর্ণ-অধিকার থাকবে। এতে দেশের ফসল কমবে না। যে-দিন তারা বুঝবে, তারা ধনীর ক্ষীণতাবির আরও ক্ষীণত করবার জন্যে বেঁচে মরছে না—দেশের ও দেশের জন্যেই

পরিশ্রম করছে—দে-দিন দেশের ফসল স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে উঠবে। দেশে দেশে যখন নতুন ভূমি কর্ষণোপযোগী করে' নতুন দেশ-সাহায্যে চাষ হবে, তখন ফসলের অভাব ত হবেই না, বরং সকলের পক্ষে যথেষ্টই হবে।

এটা খুব সত্য কথা যে, অন্তর্দেশ থেকে আন্দোলন বন্ধ হলে প্রথম প্রথম খাদ্য-সংস্থানের পক্ষে বিশেষ গোল হবে। এ গোল যেটাবার একমাত্র উপায়, সহরে যে-সমস্ত শোক আকিস-আগালত প্রকৃতিতে বাজে কাজ করে' পরের পরিশ্রম অপব্যয় করছে,—যারা অন্য দেশের বড়লোকের জন্যে ফাসান তৈরি করছে, তারা সবাইকে কাজে লেগে বেঁচে হবে; তাহলেই দেশে ভূমির অভাব হবে না। উত্তর ভূমি বলে' কোন স্থান নেই, মানুষের শক্তিই মাটির শক্তি;—বর্তমানে কৃষি-বিজ্ঞানের এইটে সব-চেয়ে বড় কথা। অবশ্য, কেবল মুখে শক্তির আশ্বাসন করলেই চলবে না—চাতেনাতে কাজ না করলে কোন প্রমিতাই দোনা ফলতে পারে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির কাজ আরম্ভ হলে, কৃষক-সম্প্রদায় স্বাধীন ভাবে কাজ করতে শেলে, দেশের জন্যে কাজ-করা উৎসব বলে মনে হবে। এবং শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক ক্ষুধিতে মানব-জীবন পুষ্পের মত স্বত-বিকসিত হয়ে উঠবে। কৃষি ও শিল্প,—দুয়ের সমাবেশে জীবন-যাত্রা সরল, সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাম্য পরিবর্তনের সব-চেয়ে বড় কথা।

ঐ প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

দোশানা

শালখানা দেখতে সচরাচর যেমন হয় ;
—একখানা অরুণ-কালো-সবুজ আর লাল
রঙের চারবাগ। কিন্তু সেখানি পোরে
হীমারের কাঠ-ক্লাসের বেকিতে এসে যে
বসলো তার চেহারাটা মোটেই সেই
কান্দীরী শালের উপযুক্ত ছিল না ;—খোঁচা
খোঁচা দাড়ি-গোঁক, মাথাটা কিটুকিতে ময়লা
পাগড়িতে ঢাকা, গালের হাড়হুটো উচু
আর তারি কোটরে শুক্কো আঙুরের রং
হুটো বিস্তী চোখ ! অবিনের দস্তর, নতুন
লোক দেখলে সে তার দিকে খানিক
কটমট করে না-তাকিরে থাকতে পারে
না। সেদিনও বেকিখানার সামনে দাঁড়িয়ে
মিনিট-পাঁচেক সেই লোকটাকে আপাধ-
মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে তবে অবিন
আন্তে আন্তে আমার পাশে এসে বসলো।
তার পর এ-বাট ও-বাট সে-বাটে ভিড়তে
ভিড়তে জাহাজ লোকে লোকে ভর্তি হতে
হতে বথন আমাদের ঘাটে এসে পৌঁছল,
সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক
ভদ্রলোক অবিনকে বলে উঠলেন—“আপনার
শালখানা এবনি, হাওয়ার উড়ে গন্ধার
পড়বে, ওখানাকে একটু সাবধানে রাখুন।”
আমরা ছুজনে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম
সেই চার-রঙা চারবাগ শালের ক্রমাশাট
জাহাজের রেলিং থেকে ঝুলছে, সে মাহুঘটা
নেই !

শালখানা ঘর সে নিশ্চয় গন্ধার কাঁপ
দিবে আত্ম-হত্যা করেনি। স্তুত্যাঃ অতুসী

হুই বন্ধুতে নিশ্চিন্ত মনে ভাত-খরাখরি
করে আহিরিটোলার ঘাটে নেমে গাড়িতে
উঠেছি এমন সময় এক ছোকরা খালাসি
—“বাবু শাল আপনর।” বলেই তাড়াতাড়ি
গাড়ির জানলা গলিবে সেই শালখানা
অবিনের কোলের উপর বেলে দিবে চট্-
করে ভিড়ের মধ্যে নিশিরে গেল। আমি
গাড়ি থামিয়ে সেই খালাসিকে ডাকতে বাই,
অবিন বলে “থাকনা, কাল কিরিয়ে” দিলেই
চলেবে।” বন্ধু-বাকবের টুপি ইত্যাদির মতো
টুকিটাকি ব্রিনিষ হলে আমার আপত্তি
ছিল না ; কেননা সেগুলো অবিন গ্রাহ্যই
ধার নেয় এবং আজ বাসে কাল, নহতো
পরশ, স্নগুছ সেগুলো কিরিয়ে দিতে
কিছুমাত্র দেরি করে না ; কিন্তু এই শাল-
খানা ঘর সে নিশ্চয়ই অবিনকে সেখানা
বখশিস” কিংবা একরাজের মতো ত্যাঁড়া
দেবার মতলবে টিমার পর্যন্ত ত্যাঁড়া-করে
আপেনি সেটা ঠিক ; এবং সে যে পুলিশে
থবর না দিবে চুপ করে বসে থাকবে
সেটাও সম্ভব নয় ; কাজেই পোর্ট-কমিশনারের
হায়াণে! মালের আকিস-ঘরের দিকেই
গাড়িটা চালাতে আমি অবিনকে বিশেষ
করে অতুরোধ করলুম ; কিন্তু সব বৃথা !
বাঘের থাবা শিকারের উপরে যেমন, তেমনি
অবিনের মুঠো সেই শালখানার একটা
কোণ সেই যে চেপে রইল আহিরিটোলার
বাড়িতে পৌঁছন পর্যন্ত সে মুঠো আর
কিছুতে শিথিল হল না। তারপর ঘরে

চুকে অবিন বখন সেই শালখানা ঘেঁষের উপরে বিহিরে দিলে তখন দেখলেন, কি আশ্চর্য! লোণা-ঝোপা-রেশমের তাঁর দিয়েই সেটা বোনা! ঠীমারে শালখানার সবটা আমার চোখে পড়েনি, এমন বাতির আলোতে যেন একখানা নকশ-কামন আমাদের চোখের সম্মুখে এসে উদ্ভব হল। এরি উল্টো পিঠে দেখলেন বোনা রয়েছে—বীণা-হাতে এক কালো-কুৎসিত কাঁকড়া-চুল ডাইনি-বুড়ি। পরের ভিনিককে ঠিক লোট্র ভেবে নিয়ে সেটার উপরে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়ে থাকা আমায় পকে সম্ভব কিনা সেটা পরখ করবার কারণ কোনোদিন আমার কাছে উপস্থিত হয়নি কিন্তু কারিগরের হাতের অপূর্ণ সৃষ্টিগুলোর উপরে আমার যে প্রাণের টান সেটা যে অবিনের হাত থেকে এই অনুলা শালখানা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে না-চাচ্ছিল তা নয়।

কিন্তু অবিনকে আমি চিন্তেই, কাজেই শালখানা তাকে খুব সাবধানে রাখতে আর পুলিশ-হাসানার পূর্বেই যদি সম্ভব হয় সেটাকে দখলস্থানে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ করে বলে আমি বাড়ী এলেম। তার পর দুদিন আমি বাহাজে বাওরা কানাই দিলেম। না বাওরার কারণ নানা; তার মধ্যে প্রধান কারণ লাগপাগড়ি আর ঠীমারের উপরে সেই শাল-হাতে অবিনের একটা অবর্ণনীয় রূপ কল্পনা।

চুতীর দিনের সকালে সাতটা-বশের ঠীমার আমাকে একলা নিয়ে বড়বাড়ার ছেড়ে আহিরিটোলার দিকে চলেছে। সকালের রোদে ভাটার বল আর জলের ধারে

অনেক দূর পর্য্যন্ত ভিলে কাঁধা মাজা-কালার মতো ঝকঝক করছে, তারি উপরে অনেক-গুলো মানুষ কালো-কালো আবলুস কাঠের পুতুলের মতো দেখছি। ঘাটের ধারে পাটিলে-ঘেরা শ্রমণের মধ্যে দিয়ে থানিকটা সাধা ধোঁয়া আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। এরি উপরে দেখতে পাচ্ছি লাল সাদা-ডোরা-টানা তেতালা একটা বাড়ীর চিলের ছায়ে মাটির এক মহাদেব পিতলের ত্রিশূল উচিয়ে দাঁড়িয়ে; আর ঠিক তারি পিছনে আলোর গায়ে একটি মঙ্গলদেব তিনটে গম্বুজ—অপরাজিতা কুলের মত নীলবর্ণ।

আহিরিটোলার ঘাটের যে কোণটিতে রোজ অবিন দাঁড়িয়ে থাকে সেই কোণটার দূর থেকে তার বিশাল বৃক্কর মাঝে চিরবসন্তের সিংহনলের আলোর মতো বড় লাল গোলাপ-ফুলটার সন্ধান আমার চোখ আজ ঘোড়ে গিরে দেখছে অবিনের আরগার একটা রবাব কাঁধে একজন পেন্ডোরারি—কালো লুনি, চিলে কোর্তা, বড় পাগড়ি, কটা দাড়ি, কোকড়ানো চুল নিয়ে সোম্বা দাঁড়িয়ে আছে!

একটা বরা প্রেমকিন করে ঠীমার উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে ঘুরে তবে আজ আহিরিটোলার ঘাটে ভিড়লো। অবিনকে না দেখে সেদিনের সেই শালখানাই যে তার এদিনের ছুটি এবং কানাই জুরেরই কারণ এবং পুলিশ-কোর্টেই যে তাকে আটটার মধ্যে খেয়ে হাজরি দিতে হচ্ছে ওটা আমি একরকম স্থির করেই নিয়ে চুকটটা ধরিয়ে একলা কবীরের পুথির সঙ্গে জু-থক্টা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসলাম।

ঘাট ছেড়ে জাহাজ আর-একবার একটা পাখাবোটের রূপ ধরে পাট-বোঝাই এক-থানা কিল্ডিকে সমুদ্রে ধাক্কা মেরে বাগবাঝারের লোহার পোল ডাইনে রেখে দোলা কাশিপুরের দিকে চলে।

খড়-বোঝাই হোলাগুলো অসিহ্ন যুগের লোশন কতকগুলো উভচর জন্তুর মতো ডাঙার পূর্ব কাছাকাছি কান্না-জলে নিজেদের অনেকখানি ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার উপরে মালগাড়ির সার বেন আর-একটা শক্ত পোলের মোড়া বিকটাকার গুটিপোকাকার মতো আস্তে আস্তে চলেছে। দূর থেকে কাশিপুরের জোটটা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে অবিন দাঁড়িয়ে—জলের নীলের উপরে সোলা বিশাল স্থির নিবাত নিশ্পরিব। তার কাঁধ থেকে দেই শালখানা নানারঙের ফুলের একটা মস্ত গোছার মতো ফুলে পড়েছে হুল্লর ভরীতে। আমি গুন্-গুন্ করে হুস করেছি—

“ছন্না জব ইক মস্তান।

কট্টেই সব লোগ দিওরান।”

রবাবটার একটা মস্ত স্বর্কার দিয়ে পিছন থেকে দেই পেনোয়ারাটা হঠাৎ আমার পাশে এসে বসলো—

“জিসে লালি সোঈ জানা

কহেসে দর্দ ক্যা মানা ॥”

পশু-ন থেকে অবিন টেচিয়ে বলে উঠলো—
—“আগা-সাঈব, কাবুলী গীত ফরমাইয়ে, নেহিতো বোশালা ছোড়গা নেহি।” এর পরেই জাহাজ ঘাটে ডিকতেই অবিন-খুপ করে দেই শালখানা আমার ছুঁড়ে দিয়ে, টামারে উঠে এল। আগা-সাঈব তাকে

একটা মস্ত পেলাম-বাগি করে রবাবের সঙ্গে একটা কাবুলী গান আরম্ভ করলে—

সুনিওনী পমঙ্গল সুনিওনী

পমঙ্কেনা পমঙ্গল সুনিওনী-ঈ-ঈ—

সুত্র যেমন কথাও তেমনি বিন্দুতে!

পমঙ্গল পমঙ্গল বেন মশার কাঁকের মতো কানের কাছে কেবলি ভন্ ভন্ করছে আর মাঝে মাঝে সুনিওনী সে-গুলোকে হুঁ-মিরে উড়িয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য্য এই যে অবিন বেশ মগন হয়ে এই গুন্-গুনিয় মাঝে হুগে বসে রয়েছে। কানে কন্দুরটার এবং তার উপর সাতপুরু চানর জড়িয়ে একটি রোগা ছেলে—এর কন্দুরটার ছাড়াবার জন্তে আমি তাকে রোজ ধমকতে ছাড়িনে কিন্তু আজ তাকে দিবা হাতরুখে সামনের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আমার কি হিংসেই না হচ্ছিল! প্রবণের দরজার আগল টেনে ছোকরা আজ কি সুখেই আছে—সুখ-বেসুখ সবার থেকে দূরে! নিবিড় নীরবতার অন্তরে আপনাকে ডুবিয়ে রাখবার আমার প্রার্থনাটা বোধ হয় বিনা-তারের টেলিগ্রাফের মতো মা-গঙ্গার কাছে পৌঁছে থাকবে তাই রবাবের সুরটা বাগির ঘাটে পৌঁছবার কিছু আগেই একটা তার-কাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল—কাবুলী গানের মাধ্যম যেন বজ্রাঘাত করে। অবিন হুস করে একটা হাওয়ার চারিদিক থেকে শোনা গেল—বস! অবিন একটা মিলটারি বকম সেলাম দিয়ে আগা-সাঈবকে বলে—
—“তাগা তো টুটা, অব্-?” “অব্-গুনিয়ে” বলেই আগা-সাঈব আরম্ভ করেন শোস্ত উর্দু আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি।

একটা আত্মজীবনী পাঠ্যপুস্তক গল্প—সেই শালখানার আত্মজীবনী। গল্পটা খুব গুরুত্বপূর্ণ করেই—আগা-দায়েব আত্মজীবনী উপহার দিলেন—ভাষা প্যার রচনা আর হিং গিনেরই বৃদ্ধি দিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অবিন গল্পটার খুব তারিক করলেও আমি সেটা থেকে বড়-কিছু রস গ্রহণ করতে পারলুম না। মাথা তখনো আমার কাবুলীর সেই বেলুরো গান আর রবাবের কন্ঠনানিতে বিগড়ে ছিল স্মরণ্য গল্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এক আহার্য্যে পাঠাতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না—কিন্তু মনে মনে! কারণ কাবুলী-মাত্রেয়ই যেটা ভিন্নগতর যেটা সেই লাঠি তার সামনে দুখ-কুটে কিছু বগা একেবারেই আমার মতবিরুদ্ধ।

সকালের গঙ্গার পরিষ্কার পটখানির উপর হিলিহিলির মতো এই লোকটার গল্প আর গান! সেটা শেষ করে দেখে বসে কটা দাড়ির আড়াল থেকে বস্ত্রিশপাটি দাঁত বের করে বলে—“বাবু, শাল দেও অব হাম চলে।”—তখন অবিন খুশির সঙ্গে তাকে সত্যিই সে শালখান দিয়ে বের বেখে আমি আর রাগ সামলাতে পারলুম না, “ক’ করে অবিনের হাত থেকে শালখানা টেনে নিয়ে বললেন—“তুমি ফেরন হে! কার শাল তুমি কাকে দাও? কোথাকার একটা।” কোন্‌কোর মিথ্যা বকরবকর করে ফাঁকি দিয়ে এই দামি শালটা নিয়ে বাবে এ হতেই পারে না।”

অবিন আমার ব্যবহার দেখে একটু প্তমত খেয়ে গেল। কাবুলীটা হস্তার দিখে বলে উঠল—“ক্যা বাবু, হাম জুগচোর ছায়ে।”

আমার রাগ তখন সপ্তমে, স্মরণ্য গলাটাও সেই সুরে বলে—“বেন কাবুলের আমীর রে! বাঃ বাঃ আর শাল পরতে হবে না, এটা আমার শাল ছায়ে, জানতা এগনি তোমাকে পুলিশকা হাতে জিয়ে করে বেগা।” রাগের মাথার বিভ্রাস্তাগরী বাংলা একেবারে হারিয়ে ফেলে গড়গড় করে চলতি বাংলাতে আমি তাকে বাজেটাই বলে গেলুম। কে জানে চলতি ভাষায় একসেন্টের জোরেই হোক বা বালির ঘাটে লাগপাসড়ীর জীবন্ত একসেন্টাকে দেখেই হোক কাবুলীটা তার গলাপ-ঘোড়া রবাবটাকে কাঁধে তুলে চৌ-চৌ চম্পট দিলে—সোহা পটুন বেয়ে লেলুয়ার সুখে। আমি তখন খুব গম্ভীর হয়ে শালটা নিজের কাঁধে ফেলে আপনার আঘাট দ্বিঃ হয়ে বসলুম। গঙ্গার বাতাসে রাগ ঠান্ডা হতে আমার বেশীকণ লাগলো না। অবিন দেখলেম দুইচোখ নিমোহিত করে সম্পূর্ণ ধ্যামত্। গাল খেয়ে কাবুলীটা আমার ঘনি খুনও করে যেতো তবু তার চোখ খুলতো কি না সন্দেহ। এবনি খুব চেপে দুইচোখ বন্ধ করে সে পৃথিবীর গুণগোল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে চলেছে সেটা আমি বেশ জানি এবং সে এই চোখ বন্ধ খুলবে তখন যে ধমকের অগ্নিবাণটা আমার উপরেই প্রথম পড়বে তাও আমি জানতাম। আমি আর তিলাজি বিলম্ব না করে শালখানি আন্তে আন্তে তার পাশে রেখে পাশ-কাটরে একটু দূরে বসলুম—বেন প্রথম চোখ খুলেই শালখানাকে অবিন দেখতে পার—পোড়ে তো শালখানাই পুড়ুক, আমি কেন মরি! বা! ভেবেছিলাম তহি।

শালখানা চোখে পড়তেই অবিন সেটাকে সম্বোধন করে গম্বীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বসন্তের ফুলে-ফুলে-বিছানো ফুলগন্ধ্যার চাপরখানার মতো সেই অপূর্ণ শালটি উড়তে উড়তে গিয়ে জলে পড়ল—দিকবিদিক বেন আলোক করে। আমি বললাম—“ওহে করে কি?” —“পরের জিনিষ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ কলেম। বাব জিনিষ তাকে জোছোর বলে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে নিজের পকেটে সেটা না পুরে।”—বলেই অবিন আমার দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। আমি এতক্ষণে বুঝলাম শালখানা কাবুলীকে নিয়ে যেতে বাধা না দিলে জুয়াচুরির কলকটী কাবুলী পর্যন্তই থাকতো, আমার গায়ে গড়িয়ে লাগতো না। অবিন পুলিশ কাবুলী এবং বাটপাড়ির কলক

তিনটে থেকে বেঁচে গেল, ধরা পড়লুম আমি—অম্মিম্বের বাটটার ঠিক আড়পারে!

তারপর থেকে বসন্তের হাওয়ায় আমি রবাবের ছেঁড়া তারের উষ্ণতার গুনতে পাচ্ছি আর সেই শালের উন্টো পিঠে লেখা ডাইনি-বুড়ির কাঁচা-পাকা চুলের চেউটাই গম্বীর নির্মূল স্রোতকে ধোলা করে দিয়েছে দেখছি! পাকা ধানের সোনার, কটি ধানের সবুজ, দিনের উষ্ম-অস্তের রক্ত, রাত্রির যুনের অন্ধকারে ছোপানো চারবাগ শালখানা ফুলের ডেলাখানির মতো ভাসতে ভাসতে আর-কোনোদিন যদি নতুন করে আমার চোখে পড়ে তবেই আবার তার কথাটা তুলবো, না হলে এই পর্যন্ত।

ঐ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‘আঁধারে-আলোকে’

আহা! ছাড়ল। আজ অনেক আরোহী। আকাশ পরিষ্কার হ্রদ, বিভিন্ন বর্ণ-সমারোহে মহিমাময়; প্রতিকূল স্রোত, অহুত বাতাস; বাজা আরম্ভ হল। হ্রদের দৃষ্ট অধিকার পর্যন্ত আর নাছোড়-বান্ধার মত সঙ্গ রাখতে পারলে না। কেননা যে নদী বেয়ে আমরা চলেছি, তার মত বৈষ, সঙ্গীত-গতি—প্রবাহ আর-কোথাও আছে কিনা জানিনে। দণ্ডে দণ্ডে পট-পরিবর্তন হচ্ছে। এঁকেবেঁকে, প্রবল বলে জল কেটে দু-ভাগ করে, জোয়ারের জোয়ার গতিতেও অপ্রতিহত হয়ে, আমরা অগ্রসর হ’তে লাগলাম। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া, চারিদিকের

নিরন্তরতা, জলের কল্লোল-সঙ্গীত, সমস্ত মনের মধ্যে উদাস প্রশান্তির সঞ্চার করলে।

রাখী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। মেঘ ভেদ করে পরিপূর্ণ চাঁদ সেখা দিল। আকাশে আলোকের দ্রাবন; জলের উপর রক্ত-আলো পড়ে আকাশের নীহারিকানালায় মত একটি ছায়াপথ স্বজন করেছে। আহা! গতি-অস্থিরে সে বাষ্প-গুহ পথ কখনো আমাদের সমুখে, আবার কখনো বা পিছনে পড়ে আছে। হ্রদের সঙ্করমান দৃষ্টের উপর চাঁদের আলো পড়ে সবই কুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জলের উপর আলোর পথ উন্ময়-তীরক সংযুক্ত করেছে।

আজ যখন চেয়ে দেখলাম তখন
 হৃদয়ান্বিত হয়েছি। সোণার আলোর উজ্জ্বলে
 আকাশের নীলিমার গায়ে, প্রবালের
 অশোক-রাঙা আভা দেখা যাচ্ছে—সাদা
 মেঘের উপর সোণার কিরণ পড়ে, তাকে
 নারায়ণের রঙে ছুঁয়ে দিয়েছে। আমার
 ঘর পশ্চিম-মুখো, তাই হৃদয়ান্বিতের
 আলোকের অভিনয় আমি প্রত্যক্ষ দেখতে
 পাইনে, পশ্চিমের আকাশের মুখে তারি
 যে প্রসিদ্ধা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তাই
 আমি দেখি। সবুজ গাছপালা, দুর্বার
 ঢাকা মাঠ, আকাশের খণ্ডিত নীলের
 বাবধান পূর্ণ করে, দীপ্ত আলোক দ্রবিত
 স্রবের মত ঝলমল করতে থাকে। সাদা
 আর ধূসর মেঘের মুখে, সেকন্ডা আর
 হাফা বেগুনি কিছা হরিতাত নীলের ঝলর
 কুলে পড়ে, ডালপালা দোলে, অসংখ্য পত্রা-
 বলি বিচলিত হয়ে কত জল্পনাই করতে
 থাকে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—নূতন
 দিনের আবাহন, স্তন্যে পাই—সচেতন-
 করা আলোকে উষাকালের উদ্বোধন-মহা।

• • •

আজ সকালে সোণালি আলোতে চোখ
 মেলে মেলে ওঠা হর-নি, তোরেই স্মৃতি
 আরম্ভ হয়েছিল। ধোঁয়াটে নিবিড় ঘন
 মেঘে ঢাকা আকাশ, স্মৃতি করে করে ক্রমে
 হাফা হয়ে এল। মনে হচ্ছিল আকাশ
 আড়াল করে অনেকগুলি ভিন্নে কাপড়
 টাঙান ছিল, এক-একখানি করে কেউ

বেন সরিয়ে নিলে, আর সুনীল আকাশ-
 বানি প্রকাশ হয়ে পড়ল! এখন আর
 স্মৃতি পড়ছে না, আকাশ চুপচাপ, শ্রান্ত চোখে
 চেয়ে আছে। নীরব বর্ষণ আমার বড় কাতর
 করে, মনে হয় সে যেন বড়ই দুঃখের কান্না!

• • •

কি ক্ষমার সোণার আলোর ঝলমল-
 করা এই সকালবেলা! খোলা জানালা দিয়ে
 দেখছি নীল আকাশের এই গলানো
 সোণার ধারা দূরে নিমগ্নদের হাফা-হলুদ
 পাতাগুলির স্তবকের উপর পড়িয়ে
 করছে। দেখি আর তাঁবি এই সোণার
 আলোর ছবির আমার ভরে নিতে হবে।
 সত্যের প্রকাশে, মিথ্যার স্রবণে সব
 অন্ধকার চিরদিনের মত অন্তর্ধান হয়ে যাবে।
 সন্মুখের আলো-ভরা পথেই আমি চলব,
 —দিনের কিরণ সর্কাসে বহন, আর দুটি
 অব্যাহত নেত্রপুটে ধারণ করে অচকল
 চিন্তেই চলব। রাজিও আমার কাছে
 অন্ধকারের বিভীষিকা আনতে পারবে না,
 তার আত্মিক পাত্রে অনির্কণ অগণ্য
 তারকার দীপ্তি, অনন্তের পথে অভিনন্দন
 করে আশু বাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সন্মুখেই
 চলব—পিছু ফিরে আর চাইব না; তার
 পর যেদিন সিঁড়ি হারায় গোদুলির শুভ
 স্মৃতিতে তুমি আমার তোমার মনিরে স্থান বেবে
 সেদিন সমস্ত জালাই নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে।

• • •

আলো দিয়ে তুমি বা লিখে দিয়েছ
 অন্ধকারে যেন-বসে তাই আমি পড়ছি।

সে যে তোমার তারার আখরের লেখা
অনির্কণ, অনির্কণ !

ক-দিন ধরে কেবলি বৃষ্টি ঝরে ঝরে
আকাশের মেঘ অনেক হাড়া হয়ে এসেছে,
তবু সম্পূর্ণ সবে যায়-নি ! এই বাম্পাকুল
আকাশে আজ একটু রোদও দেখা দিয়েছে,
তবে এ শরতের জলজলে সোণার আলো
নয়, এর দীপ্তিও ঘান, চোখের জলে
ভরা দৃষ্টির উপর একটু হাসির চেষ্টার
মত । তবু যে অনিবার ধারাবর্ষণের
ঈষৎ বিজ্ঞামণ্ড হয়েচে, আত্ম আত্ম
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কিছুক্ষণের জন্তে শান্ত
হয়ে আছে, এই সংঘত অবসরটুকু,—
আলোর মুখে দরজা-জানালা খুলে দিয়ে
একটু ভাববার সুযোগ যে পাওয়া গেল,
এও পরম লাভ মনে হচ্ছে । বাতলা দিনে
অন্ধকার ঘরে শুষ্ক হয়ে আর কত বসে
থাকা যায় ! মনও যে ঝড় হয়ে আসে,
কোনোখান হতে কোনো আলো সংগ্রহ
করে আনতে পারে না । মনের সেই অসাড়
পাখা-ভার বড় দুর্ব্বল !

ক-দিনের অবিরাম ধূলর মেঘ আর
অনিবার বৃষ্টির পর আকাশে স্বচ্ছ-নীলের
অবসর এক-একটি আশার আলোক-বীণের
মত দেখা দিয়েছে । আমারও অন্ধকার
মনের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা
ঝেঁগেছে,—নিকষপটে সোণার লিখন কেটে
বসবে,—শুধু অবাস্তর কথা নয়, প্রেম-
প্রণয়ের উদ্ভাস্ত প্রলাপ নয়, ছন্দোবদ্ধ,
বীজিতে সম্পূর্ণ, শোভন সম্বদ্ধ শ্লোক-ছুটে

উঠবে—ককণার যার জন্ম, জানে যার
স্থিতি !

উদ্ভাস বর্ষার আক্রোশ দূর হয়েছে
আকাশ স্বচ্ছ-নীল, চারিদিকে নির্মল
স্বর্বাণলোক, পর্বাণ্ড প্রচুর পল্লব;—তরুণের
নিবিড় হরিত-সৌন্দর্যের সর্ব্বাঙ্গে এই
স্বর্বাণলোকের দীপ্তি বিদ্য-করণ হয়ে দেখা
দিয়েছে ! আকাশ-ঝোড়া আলো নিয়ে
তুমি আমার সম্মুখে এসেছিলে, আমি
চোখের সম্মুখে পর্দা খাটিয়ে, আধার রচনা
করে বসে-বসে ভাবছিলাম, তুমি কোথাও
নাই ! হাওয়ার মুখে পর্দা খসে গেছে,
তোমার চোখ-ধাঁধিয়ে-ধেওয়া আলো চারি-
দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ! কি অশোভনতার
মধ্যে, কি আবর্জনা-স্তূপের পাশে, জীবন
যাপন করছিলাম তা হুস্পষ্ট বেথতে পেরেছি ।
এখন বাঁচতে হলে উঠে-পড়ে লেগে বাস-
স্থানটি সংস্কার করতে হবেই ! নইলে
বাঁচাই দুঃসাধ্য হবে যে ! বাঁচব বলেই
যে সঙ্কল্প করছি ! অবলাহের দিন অবলান
হয়ে গেছে ! সকাল-বেলাকার এই মন
আমি রাতে কোথার হারিয়ে ফেলি,—
অন্ধকারের অশ্পটতার, ছায়ার নিরুদ্ধে পথে,
আর অগণ্য নক্ষত্র-লোকের গহনের মধ্যে !
তখন যে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার
ধারণাই থাকে না । আমি একটা খেরাসের
মত, কৌণপ্রাণ লবু বাশের মত কোথার
ভেলে চলি, দেহবোধ চলে যায়, স্বপ্নের
মধ্যে অর্দ্ধস্ত্রীর একটি চেতনা জাগ্রত
হয়ে থাকে ! আমি যে কেবল একটি
আত্মা, এই দেহসম্বন্ধে বৃত্ত হয়েও বিবৃত্ত,
এই অহুত্বটিই কণে কণে পরিপূর্ণি লাভ

করে! আমি যে মাহুশ, নাম সংজ্ঞাহরিণী
নারী, আমি যে সমাজ, আত্মীয়তা জাতীয়তা
প্রভৃতির মধোকার কেউ—এই ধারণা
আমার চেতনার মধ্যে স্থান পায় না।
আমি শুধু প্রাণ, এই কথাই মনে হয়,
এবং এই প্রাণ যেন কোনো সংস্কারের
সঙ্গীতের জালে বাঁধা পড়ে প্রতিহত
নয়। মনে হয় আমি বাতালের মত মুক্ত,
আকাশের মত ব্যাপ্ত, জলের মত নিখল,
আলোকের মত দীপ্তিমান আর পৃথিবীর
মত স্নান—চিরস্নান! একটা অসীমতা,
বাধ্যনীর অবাধ্যতা শক্তি নিজের মধ্যে
অহুতব করি, কেমন আনন্দ আবার কেমন-
যেন ভয়ও হয়। বিশ্বের স্তম্ভিত হয়ে বাই।

• •

আজ ভোরে উঠে বেড়ি জানালা খুলে
দিলাম, অমনি শুভ-স্বন্দর নিকলজ প্রভাত

আমার আগত জানালে। এমন পরিপূর্ণ
নিখল সকালবেলাটি আলোর-আলোর
গানে-গানে ডরা, এ কি শুধু আমার জন-
দার হতে তার বারতা না জানিয়ে কিরে
যাবে? আকাশের আলো নীলিমাকে
আরো স্নান করছে, ধূলির মেঘকে শুভ
করেছে; গাছের পাতার সোণার দীপ্তি,
মাঠের ঘাসে শিশিরের বৃক্ষে হীরেনাটিক
ছড়িয়ে দিচ্ছে—আমার চোখে আর
আমার বৃক্ষে তার প্রদাম-আনন্দ এনে
মেবে না? নিশ্চয়ই বেবে! আজ নয়ত
কাল, নয়ত আরো চ দিন বাবে, সে তার
নিখিল-মহন-করা অমৃতের অভিষেক,
অন্ধকার-নির্মূল-করা আনন্দের মত পাঠ
করে যাবেই, তার সন্দেহ নেই;—মন
অবারিত, প্রবণপণ উন্মুক্ত, নেত্র উৎসুক
হয়ে থাকুক, সার্থকতা আসবেই।

ঐপ্রিয়দম্মা বেবা।

আলেনার আলো

আঠারো

মোহমের কথা

আমার সমস্ত মন বগছে সরমা আমার!
ছেলেবেলার রূপকথার রাজকন্তাকে যেমন
চূর্ণিত মনে হোত, এতদিন আমার কাছে
সরমা ছিল ঠিক তেমনি। রূপকথার স্বর্ণবস্ত্র
আমার জীবনে আজ সত্য হয়ে দাঁড়ালো!

আমার প্রাণে আজ আনন্দের যে
ছোপ ধরেছে, তারই রঙ্গ-রঙ্গে সারা

বিশ্ব যেন রঙিন হয়ে উঠলো। আকাশের
ঐ অসীম নীলিমা যেন একটি নিখল
সঙ্গীতের মত স্নান, আর, এ নিখিল
যেন তারই সুরে, বজারে, ছন্দে ও তালে
পরিপূর্ণ হয়ে আত্মহারা! বিশ্ববীণার সূক্ষ্মতার
মত সর্ষীর এই কলগুঞ্জন আজ আমার
সুস্থিত হৃদয়কে সঙ্গায় করে' তুলেছে,—
যৌবনেদু নুবীনতা যে কি, সকল প্রেমের
অমৃতরসে সরস হয়ে আমার এ প্রাণ আজ
তাঁ প্রথম স্পৃহিতব করলে!

আজ সকালে সরমা এখন বাগানে ফুল ফুলতে এল, আমি পা টিপে-টিপে ঠিক তার পিছনটিতে গিয়ে দাঁড়ালুম।

চুপিচুপি ডাকলুম, “সরমা!”

গলাটি মধুরভাবে হেলিয়ে, সরমা চম্কে উঠে থম্কে দাঁড়াল! তার সেই বড়-বড় চুল-পড়া চোখে আমার দিকে একবার মাত্র চোরে দেখেই, লজ্জিতভাবে সে মুখ-খান বীচু করে’ রইল।

তার মাথার উপর একটি পুষ্টি শাখা নত হয়ে রয়েছে। সেটি ধরে আমি ধীবে-ধীবে নাড়া দিলাম,— একরাশ শিউলি ফুল তার মুখ-কাঁধে-বুকে ঝরঝরিয়ায় ঝরে পড়ল।

ছকছকানি বেকিয়ে সরমা বললে, “বাও! অমন করলে আমি রাগ করব!”

—“তুমি রাগ কর সরমা! শুনেছি, রূপসীর রাগ বড় মন্দার!”

সরমা হেসে ফেললে। বললে, “পথ ছাড়ুন, আমি বাই!”

আমি পথ-আগলে দাঁড়িয়ে হু-হাতে তার একখানি হাত চেপে ধরলুম! সরমা হির-দৃষ্টিতে আমার পানে চোরে রইল,—ক্রমে-ক্রমে আমার সূতির মধ্যে তার সেই কোমল বাহুখানি নিশাড়-নিষ্পন্দ হয়ে নেতিয়ে পড়ল। সেই নিভৃত তরুতলে, সঙ্গোপনে আমরা দুটি প্রাণী পরস্পরের দিকে বিভোর হয়ে চেয়ে-চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, অনেক—অনেকক্ষণ।

কি-এক অজানা মোহে জগুং ভুলে আমাদের দুজনের মুখ দুজনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে, ধীরে, ধীরে!

সরমার ঘন-ঘন তপ্তবাসে আমার সুশ্রাব্য শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল।... সে কি নিশ্বাস,—না, বসন্ত-বায়ুর প্রথম উচ্ছ্বাস?

সরমার ধরধর গুঁঠাধরের উপর আমার ত্রিভিত গুঁঠ নত ভোল—কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে না-করতেই আমার হাত-ছিনিগে চকিতে সরমা পিছনে সরে গেল; তারপর তীব্রভাবে তিরস্কার করে’ উঠল, “মোহনবাবু! আমি এখনো আপনার স্ত্রী নই!”

এ কি কঠোর সত্য! আমি বেশ চটাত স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলুম। আমার “নিজের প্রতি নিজের একটা দিকার মনের উপর বারংবার যা দিতে লাগল—অস্বতন্ত্র হয়ে কাতর হয়ে আমি বললুম, “মাক্ কর, আমার মাক্ কর!”

কোন উত্তর না দিয়ে, সরমা বাগান থেকে বেরিয়ে গেল,—স্পর্শাতীত, মন-ভরা, তীব্র এক বিদ্রোহের মত!

এদিকে আমার বিবাহের কথা নিয়ে পাড়াময় বিধম বোঁটের ধুম পড়ে গেছে।

গিসিয়া কেঁদে চোখ রক্তাক্ত করে’ আমার কাছে এসে বললেন, “বাবা মোহন, এক সর্ব্বনেশে কথা শুনেছি!” তুই কি তোর নিকলঙ্ক কুলে কালি দিতে চাস্?”

আমি বললুম, “কুলে কালি দিতে চাই কি-রকম?”

—“তুই নাকি বিধবা-বিয়ে করবি?”

—“তা করবই ত! বিধবাকে বিয়ে করলে কুলে কালি দেওয়া হয় নাকি?”

—“তা হয় না? সত্যি জেতা ছাপা

সুখে কেউঁ বা করেনি,
করতে চাসু ?”

—“এটা যে কলিকাল, পিসিমা !
এখন যে সত্তা রেতা ঘাণেরের নিম্ন
বাতিল হয়ে গেছে ! আর তাও যদি ধর,
তাহলে যেচাপ্পে স্ত্রীবা আর বিভীষণ
বিধবা বিয়ে করেছিলেন, কথক-ঠাকুরের
সুখে তাও কি শোন নি ?”

—“আমি ও-সব কিছু বুঝি-নি বাবা,
এ বিয়ে কিছুতেই হোতে পারে না।”

—“কেন, এবে শাস্ত্রের বিধান !
পণ্ডিতরাও এতে মন্ত দিয়েছেন !”

—“অমন শাস্ত্রের সুখে ছাই, অমন
পণ্ডিতের সুখে আগুন !”

—“অত গোল কোরো না, তোমাদের
কোন কথা আমি শুনব না। এ বিয়ে
আমি করবই !”

—“তবে আমাকে কান্দি পাঠিয়ে দে,
আমার এখন তিনকাল গিয়ে এককালে
ঠেকেছে, এতবড় প্রেচ্ছ বাপারটা প্রাণ
ধাকতে আমি দেখতে পারব না !”

—“তোমার পুত্রো হবেছে ?”

—“না, এ-সব কথা শুনে পুত্রো-টুকো
আমার ঘুরে গেছে !”

—“তবে এইবেলা মানে-মানে সরে পড়
পিসিমা, মানে-মানে সরে পড় ! এই কাপড়ে
আমি চারের সর্পে পাউরুটি আর সুস্বাদু ভিন
খেরেছি, এখনি তোমাকে ছুঁয়ে দেব !”

—“হুঁপী, হুঁপী ! সরে যা পৌষার-
পৌষা—সরে যা !”

—“এখনো গেলে না ? এই দিলুস
ছুঁয়ে !”

—“অ মোহন, ছুঁসনে বাবা—অ মোহন,
ছুঁসনে বাবা”—বলতে-বলতে পিসিমা “পিছু
হটুতে-হটুতে সরে পড়লেন !

পিসিমার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে
নীচে নেমে দেখি, পাড়ার বিত্তখুড়ো,
চল্লভ বাঁড়ুঘো ও ককির ভট্টচার্যি আমাকে
আক্রমণ করবার জন্তে একেবারে রীতিমত
ঠেঁরি চরে অপেক্ষা করছেন।

বিত্তখুড়ো আমাকে দেখবামাত্র কিছুমাত্র
ভূমিকা না-করেই বলে উঠলেন, “মোহন,
এমন কার্য্য কোরো না ! তাহলে আমি
দ্রঃখিত হব !”

—“কি করব-না বিত্তখুড়ো ?”

ককির ভট্টচার্যি বললেন, “ঐ প্রেচ্ছ
সুত্রারিটার বিধবা-ঘেরেকে ভূমি বিয়ে কোরো
না বাবা !”

চল্লভ বাঁড়ুঘো তাঁর একচকে বসটা
দ্রঃখের ভাব জাহির করা যায় তা জাহির
করে বললেন, “তাহলে আমাদের সনাতন
হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে !”

—“আপনারা এইজন্তেই আমাকে
বুঝি সাবধান করতে এসেছেন ?”

বিত্তখুড়ো উৎসাহিত হয়ে বললেন,
“হ্যাঁ বাবা, আমরা তাই এসেছি। মনে
কর, আজ তোমার পিতা জীবিত থাকলে
এখন অধর্মের কাজ তোমাকে কিছুতেই
করতে দিতেন না। আজ তিনি পরলোকে,
ভূমি ছেলে হয়ে তাঁর নাম ভূবিও নী।”

চল্লভ বাঁড়ুঘো বললেন, “স্বপ্ন তাই
নয়, তাহলে সনাতন হিন্দুধর্মের সর্বনাশ
হবে।”

আমি শান্তভাবেই বললুম, “হলুভাবাবু, আপনাদের মতন মহাপুরুষদের লীলাখেলা বধন সনাতন হিন্দুধর্ম নির্মিত্য ভাবে লক্ষ্য করছে, তখন আমরা এই বিধবা-বিবাহে তার পারে কুশাচুত-বৈধার বাধাও লাগবে না।”

বিশ্বখুড়ো ধতমত খেয়ে বললেন, “আঁ, তোমার এ কথা অর্থ কি মোহন?”

—“অর্থ খুব স্পষ্ট। বাড়ীতে গিয়ে বুঝে দেখবেন। আসল কথা কি জানেন, দেশ আর আপনাদের চারনা—আপনাদের ধাঙ্গাবাজিতে, তুংগে ভড়ং দেখে দেশের লোক আর ভুলবে না। আপনারা বিধবা-বিবাহ করবেন না, অথচ বিধবা অপহরণ করলে এ বিধা সমাজ-বিধিতে কেউ পতিত হবে না। আপনারা যে ভেজাল-মেশানো নকল সমাজকে হিন্দুসমাজ বলে খাড়া করতে চান, সে ত অগম্যের মন্দিরের মত! বাইরে তার ঘায়ে ঘায়ে বিপের আলো কেঁদে মরে, অথচ ভিতরে দরজা বন্ধ করে’ সর্বত্র অন্ধকার ধরা আছে; বাইরে সে প্রশস্ত, অটল, উচ্চ—কিন্তু ভিতরে সঙ্কীর্ণ, কোণ্ডা, নীচু! এ কি সত্য হিন্দুসমাজ? তা নয় বশাই, তা নয়! সত্য হিন্দুসমাজ আছে,—আপনারা তার খবর রাখেন না! আপনারা থাকে সমাজ সাজিয়ে প্রণামী আদায় করতে চান, সে হচ্ছে ভগ্নামির আখড়া, ভোচ্ছোরের আতানা, মুখামির আড়াল।”

আমার কথা শুনে পাড়ার মুকুবিদের আঁকেল একেবারে শুকুঁম হয়ে গেল! তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন-নি যে, আমি তাঁদের

মুখের উপর এমন-করে’ অপ্রিয় সত্য বলতে পারব!

অনেকক্ষণ পরে বিশ্বখুড়ো মুখ পূলে বললেন, “বেশ মোহনলাল, এ ভাল হচ্ছে না কিন্তু! এর ফল হাতে-হাতে তোমাকে ভুগতে হবে!”

আমি উচ্চস্বরে তাক্কীলোর হাসি হেসে বললুম, “কি হবে গুনি? আমাকে এক-ঘরে করবেন, না জাতে ঠেগবেন?”

ফকির ভট্টাচার্য বললেন, “সে দেখতেই পাবে তখন! আমাদের অপমান, আঁ!”

আমি বললুম, “ভট্টাচার্য, বাড়ী যাও, তোমার আঁকিম বাবার সমর-হোল, মৌতাত চটে যাবে! তোমরা সকলকে একঘরে কর, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ কি, দেশে এখন তোমরাই সাধ করে’ একঘরে হোতে বসেছ! তোমাদের ভগ্নামিকে বাদ দিয়ে দেশে এখন এক যথার্থ হিন্দুসমাজ গড়ে উঠছে—এ নির্মল, উদার, অটল; এ তোমাদেরও গ্রহণ করবে, কিন্তু তোমাদের যথেষ্টাচারকে প্রসন্ন দেবে না!”

হলুভাবাবু একচোখ রাঙ্গিয়ে বললেন, “তোমার এ মুখসাবাসি কতক্ষণ ট্যাকে, রেখা যাবে!”

এদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা বৃথা। এদের তড়পানি বন্ধ করতে হোলে আরো কঠিন হোতে হবে। অতএব হাঁক দিলুম, “গুট্টা সিং!”

“হুজুর!”—বলে আমার দ্বারবান গুট্টা সিং এসে, তার লম্বার-চওড়ার বিশাল শরীরে দরজা প্রায় ঢেকে, সিঁথে হয়ে দাঁড়াল।

তিনমুঠির দিকে ফিরে বললুম,

“আপনারা বোধহয় জানেন না যে, আমার হারবান শুটো সিং আমার চেরেও চের-বেশী পাকত! আমি যদি হুকুম দি, তাহলে ও এখনি অস্ত্রানবধনে আপনারদের টিকিগুলি একসঙ্গে বিউনি করে’ বেঁধে, তিনজনকেই রাস্তার নিরে গিরে ছেড়ে দিতে আসবে। এমন-কি, আপত্তি করলে চরত চটে চড়-চাপড়াত বসিয়ে দিতে পারে! অতএব,—”

আমার ‘অতএবের’ নর্থ বুঝতে তাঁদের একটুও ধেরি লাগল না! কারণ, “সমান্তন চিন্মুখের” কথা বোঝা’ ভুলে গিয়ে সেই তিনমুখিই এত তড়াতাড়ি পাতাড়ি গুটিয়ে সরে পড়লেন যে, দেখে আমিও অবাক মানলুম। কবি ঠিক বলেছেন, “তর্কের সেতা প্রমাণ লাটির গুতো!”

আমার বিধবাবিবাহের বোঁট্ নিরে, পাড়ার মোড়লরা বধন বেলায় ধুমধাড়া বাধিয়ে তুলেছেন, তখন হঠাৎ “একদিন সুরারিবাবু নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশ্রয় করলেন। প্রথমে আনরা ততটা গা করি-নি, কিন্তু দু-একদিন বেতে-না-বেতেই বোকা গেল, সুরারিবাবুর অর্ধ বড় বে-সে-অর্ধ নর।”

আমি আর হরেন পাণা করে’ সুরারি-বাবুর সেবার তার গ্রহণ করলুম। সহরের ভাল-ভাল ডাক্তার দিয়ে রোগীর চিকিৎসা চলতে লাগল।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সামান্যতিক হয়ে উঠল। সুরারিবাবুর নিশাসে চূর্ণক পেয়ে বুকলুম, তাঁর হৃদয়ে ‘গ্যাসট্রিক’ হয়েছে।

আমরা তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলুম।

সরমাকে আমরা কিছু খুণে না-বললেও তার কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। তার মুখ দেখে আমার বুক যেন কেটে যেতে লাগল। বাপ ছাড়া এ সংসারে আমার বলতে তার আর কেউ ছিল না! শৈশবে মা-হারা হয়ে সে বাপের কোলেই মানুষ হয়েছিল; বালিকা-বয়সে বিধবা হয়ে আবার সেই মেহমত পিতার বুকেই আলুর পেয়ে কোনরকমে সে আপনার তিক্ত জীবনকে ভুলে ছিল। আজ সেই পিতাই তাকে একথা কহলে কেন? অজানা দেশে জন্মের মত চলে বাচ্ছেন— তার এ হৃৎ যে যোবার স্বপ্ন-বেধার মত; সে ত কথার প্রকাশ করা যায় না!

সরমা যেন কেমনধারা হয়ে গেল! সে কীসে না, কথা কর না, দীর্ঘশ্বাস কহে না, হুখু বাপের শিররের কাছে চূপ-করে’ উদালচোখে পাখরের মূর্তির মত বলে থাকে,—“কিবা রাত, কিবা দিন! রাত্রে বধন রোগীর ছুঁকটামি বেড়ে ওঠে, অসহ ত্বায়া তিনি ক্রমাগত ‘জল জল’ বলে চেঁচাতে থাকেন, নিশাস কহলে তাঁর অত্যন্ত বয়সা হয়—সরমা তখনো পিতাকে ছুটো সাশ্বনার কথা বলে না, রোগীর কষ্ট দেখে কিছুমাত্র ঢাকল্য প্রকাশ করে না, তার মুখে উষ্মের রেখামাত্র দেখা যায় না! সেই মরণের ভয়ে-ভরা ঘরে ‘অস্ত্র’ পহার পাশে বলে, জীবন-মৃত্যুর অশ্রাৎ মুখা-যুঁকি দেখতে-দেখতে মন বধন ভারাক্রান্ত করে কিনিয়ে-কিনিয়ে পড়ছে, তখন ধমুধমে

নিশ্চিতি রাজ্যে, নিবুনিয় নৌপের ত্রিভিত
আলোকে, সরমার সেই স্বাক্ষর, দ্বিত, পাণ্ডু
মুখ বারংবার চোখের হৃদয়ে দেখতে পাচ্ছি
আর বুকের কাছটা কেমন ছন্দমু করে
উঠছে! উঃ, সরমার সেই মৌন-অচল
মূর্তি, নিরুপ রাতের সেই হৃৎসহ নীরবতা
আর তারই মাঝে মরণাহত রোগীর বিকৃত
স্বরে চীৎকার,—এ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!
যরের বেওয়ারিস-দেওয়ালে আলো-আঁধারে ঐ
যে দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া থেকে-থেকে চুপি-চুপি নড়ে-
নড়ে বেড়াচ্ছে, আমার মনের গতিক এমনি
হোল যে, ও-গুলোকে দেখেও আমি আচ্ছন্ন
প্রাণে শিউরে-শিউরে উঠতে লাগলাম!

রাত তখন পাঁচটা, পূর্ণ-আকাশে
অম্ল-অম্ল ভোরে অলস ছবি ফুটে উঠছে।
মুরারিবাবু হঠাৎ জড়িত স্বরে বললেন,
“মোহন!”

আমার একটু-একটু তম্বার ঘোর
আসছিল, মুরারিবাবুর গলার আওয়াজে সে
ঘোর ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে
গিয়ে বললাম, “কি বলছেন?”

মুরারিবাবু নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে
তাকিয়ে বললেন, “মাতৃঘরে যা করবার,
তা তোমরা করেছ,—আর করবার কিছু
নেই। আমি বুঝতে পারছি, আমার সমস
হয়ে এসেছে। স্মরণ—”

—“মুরারিবাবু, আপনি ও-সব কথা
জাবেন না।”

মুরারিবাবু অল্প হেসে বললেন, “কি
আশ্চর্য, আর জাবব কেন বাবা? আমি
এখন সেই দেশে বাচ্ছি, ভাষনা বেঁধানে

নেই। উঃ, বড় কষ্ট হচ্ছে, একটু জল
দাও ত. মোহন!”

জলপান করে’ বললেন, “সরমার
জন্মে আমার বড় ভয় ছিল, সে ভয় তুমি
বুঝিবেছ। দেখ বাবা, সরো আমার কন্ম-
দুঃখী - ও বেন স্নেহে থাকে। জুগে যদি
কোনদিন কিছু অপরাধ করে, কন্মা-পুণা
কোরে সে মোহ নিও না। বড় সাধ
ছিল তোমাদের দুটিকে পানাপানি দেখে
যাই, কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হোল না!
সরো, দেখি মা, তোরা চান-মুখখানি এক-
বার দেখেনি!”

সরমা বাপের বুকের উপর আপনাত
মুখখানি নিয়ে গেল। মুরারিবাবু অনেক-
ক্ষণ ধরে নিশ্চলক নেত্রে মেরের মুখের
পানে চেয়ে রইলেন। অস্তিত্বের সে ত্রিভিত
শেষদৃষ্টি কি মৰ্মস্পর্শী! বেহায়াজুল পিতার
সমস্ত প্রাণটি বেন তখন সে অকৃপ
চাহবির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।
একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুরারিবাবু বললেন,
“মা, তোরা কোন ভয় নেই, মোহন তোকে
দেখবে। আশীর্বাদ করি, স্বামী-পুত্র নিয়ে
চিরজীবনী হয়ে থাক।”

আমার দিকে-কিঁয়ে বললেন,
একটা মাঠ নামগান কর ত!”

আমি মুহূর্তেরে গাইলাম,
“কেবল আমার আশা শুভে আসা আগাম্য হলো।
ধেবন চিত্রের পট্রেতে পড়ে অমর জুগে বহিলো।
মা, নিম পাওয়ালে তিনি বলে, কথাব করে’ ছল,
ওমা! দিয়ার লোভে তিতমুখে মারামিনটা গেল।
মা, খেলবে বলে ক’লিকি দিয়ে নামালে তুতল,
এখন লজ্জাবোলায় কোলেরে ছেলে ঘরে নিয়ে চলে।”

মুন্সারিবাবু পাড়ায়ের বলে উঠলেন, “তোমাদের পৃথিবীতে আজ প্রভাত হচ্ছে, কিন্তু, আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনিরে এসেছে—এখনি সব আঁধার হয়ে যাবে—আঁধার! ঠিক কথা, আঁধার গাও মোহন, আঁধার গাও—‘এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল’। নিয়ে চল মা, ঘরে নিয়ে চল!”

আমি আবার গাইলুম। মুন্সারিবাবু মুদ্রকটে বললেন, “মোহন, আমার মাথাটা একটু উচু করে’ তুলে দাও। জানলটা ঘুলে দাও। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে,—বত-কণ বেথতে পাই, পৃথিবীর নতুন স্বর্গ, নতুন আলো প্রাণতরে বেঁধে-নি!”

• • • • •

সব শেষ! সন্ধানমু মুন্সারিবাবুর প্রসন্ন মুখ এ পৃথিবীতে আর কেউ দেখতে পাবে না। তাঁর সেই ঈশতল ও অসাড় দেহ বেথানে নিয়ে গিয়ে অরিশবার ঝুইয়ে বিরেছিলুন, এখন সেখানে শুধু কয়দুটো তপ্ত ছাই পড়ে আছে।

দাঁহ শেষ করে’ ফিরে দেখলুম, ঘাটের কিনারায় সরমা গালে হাত দিয়ে স্তম্ভিত-ভাবে বসে আছে,—তার ‘স্বত্বপুষ্টি’ গগার ঢোল স্রোত পেরিয়ে, ওপারের লবুঙ্গগাছের শার ঢাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে, কে জানে!

আগে-আগে কাছে গিয়ে ডাকলুম, “সরমা!”

সরমা কোন গাড়া দিলে না, তাব-হীন মুখে আমার দিকে কাল্‌কাল্‌ করে’ চেয়ে রইল।

“সরমা, দান করবে চল।”

সরমা কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল। একবার শ্রাণনের দিকে ফিরে দেখলে,—মুন্সারিবাবুর নিবৃত্ত চিত্তা থেকে তখনো অন্ন-অন্ন ধোঁয়া উঠছে এবং তারই পাশে একটা উপুড়-করা মেটে কলসীর উপরে হঠেন নীরবে মাথা হেঁট করে’ বসে আগুনমনে কি ভাবছে।... ..

হয়েরনের সামনেই আর-একটা নতুন চিত্তা সাজানো,—তার উপরে একটি পরম-সুন্দর যুবকের শব—মরণ তার হিম-হাতে ছুঁয়েও যুবকের ঐকিছুমাত্র মলিন করতে পারে নি! যুবর দেহ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে এক তরুণী রমণী চিত্তার উপরে ছদ্ম্ভি ধরে পড়ে আছে—অনন্ত লোক অনেক টানাটানি করে’ও তাকে সরিয়ে আনতে পারছে না—সকলে তাকে বড়ই বোঝাচ্ছে, সে অতাপী ততই আর্ন্তনাশ করে’ বলে উঠছে, “ওগো, আমাকেও ওঁর সঙ্গে পুড়িয়ে ফেল—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার এ পোড়ারমুখও পুড়িয়ে দাও গো, পুড়িয়ে দাও!”

আঃ, এ কী দৃশ্য! হয়েরনের দিকে চেয়ে দেখলুম, হ-হাতে সে মুখ ঢেকে কেলোছে, আনিও আর সহিতে না পেরে আঁধার বললুম, “সরমা, দান করবে চল।”

কোন কথা না বলে সরমা ধীরে-ধীরে আমার সঙ্গে গগার জলে গিয়ে নামল। তার এই নির্ঝাঁক, উদাস ভাব বেঁধে আমার ভারি ভাবনা হোল।

ঠিক তেমনি তাবেই আঁধার সে আমার সঙ্গে এসে গাড়ীর ভিতরে ঢুকল।

কিন্তু যেমনি আমি গাড়ীর দরজাটা লম্বা বন্ধ করে' দিলাম, সরমা অভ্যস্ত চমকে উঠে বললে, “আ! বাবা কৈ! তিনি এলেন না যে!”—তার মুখ বেখে মনে হোল, সে যেন এইমাত্র একটা দীর্ঘ শ্বস থেকে ভেগে উঠল!

—“সরমা, এ কি বলছ? হির হও!”

—“কেন মোহনবাবু, আমি ত হির হয়েছি!” বলে সে অভিশয় তুচ্ছ হাসি হাসলে,—সে হাসিতে আমার প্রাণ যেন উড়ে গেল! সরমা হাসছে? এখন,—এই অবস্থায়!...

আমি তার হাত চেপে ধরে আকুল-ভাবে বললাম, “সরমা, সরমা!”

সরমা পলকহীন নরনে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখের ডাব বদলে বেতে লাগল, ধীরে ধীরে তার চোখদুটি ‘ছল-ছলে’ হয়ে এল। অবশেষে স্থিরতার বাণির বীধ ভেঙ্গে হঠাৎ সে “ওগো বাবা, বাবা পো!” বলে উচ্চস্বরে কঁদে উঠে, হৃ-হাতে আমার হৃ-হাঁটু জড়িয়ে ধরে, আমার কোলের ভিতরে তার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি লুকিয়ে কেললে!

টুনিশ

সরমার কথা

মনে হচ্ছে, এ পৃথিবীটা শুধু মস্তবড় একটা ফাঁক! এ ফাঁক আর-কি' কখনো ভরে উঠবে? ঐ আকাশ বাতাস আল্লা সবই আজ বাইরে পড়ে আছে, আমার

ভিতরে তারা আসতে পারছে না, আমাকে ‘অভিভূত’ করতে পারছে না, আমাকে আমার হতভাগ্যের কথা ভোলাতে পারছে না। আমি একলা, আমি একলা!

বাবা—বাবা!... ..

ঘরের দেওয়ালে বাবার এম্বাজ, বেহালা—বেমন-করে' তিনি শেষবার টানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই—টানানো রয়েছে। কত বেহে কত ঘরে ওদের গারে হাত-বুগিছে, ওদের সঙ্গে তিনি সকাল-সন্ধ্যার প্রাণের কথা কইতেন, তাঁর সুখ-দুঃখের প্রতিধ্বনি নিয়ে ওরা কত হেসেছে, ওরা কত কঁদেছে! তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গেসঙ্গে ওদেরও আজ সকল হাসি-কান্নার অবসান। ওরাও আজ অনাথ—ওরাও আজ মরেছে!...

বাবার বড় আদরের ননুয়া মেহুয়া মুখ চুপ করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে,—ঘরে-ঘরে তাঁর খোঁজ করছে। এ হৃ-রাত তারা কী করণ-ঘরে কঁদেছিল! এক-একবার তারা আমার কাছে এসে, বিমর্ষ চোখে আমার মুখপানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আহা, অবোলা জীব! কিছু ত বলতে পারে না—কিন্তু তাদের'সে' কাতর চাহনি যেন বলতে চায়, ‘ওগো, তিনি কোথা গেলেন—তিনি?’ ননুয়া বাবার খাটের তলায়, বিছানার উপরে,—এমন-কি, লেপের ভিতরে পর্দায় আঁতিপাতি করে' খুঁজেছে,—কিন্তু কোথাও তাকে না-পেয়ে শেষটা কুই-কুই করে' কঁদে মরেছে, বাহুবীর মতই তার হৃ-চোখে ধারা বয়ে গেছে! সে খেতে চায় না, খাবার দিলে মুখ ফিরিয়ে

বসে থাকে, আর ত্রিহমান হয়ে কি-বেন
ভাবে।

নিৰ্জন বাড়ীতে একলা বসে-বসে
চোখের বলে বুক ভাসাচ্ছি। মোহনবাবু
আর হরেনবাবু নাকেরমাঝে এসে সাব্বনা
দিয়ে হান।

বিপদে-আপদে আমার লজ্জা-সরম দুই
গেছে; হরেনবাবু আমাকে দিদি বলে
জাকেন, আমিও তাঁকে বাবা বলি,—
এতদিন তাঁর সঙ্গে কথা কইতুম না, কিন্তু
এত বৈশাখিণির পর আর লজ্জা করা
চলে না। আমার বড় সাধ, বাবার শেষ
কাজটা ভাল করেই করব—এতে তাঁরাই
আমার বা-কিছু আশা-ভরসা।

কাল সকালে এ-পাড়ার যিনি পুরুতের
কাজ করেন, তিনি এসেছিলেন। লোকটিকে
বেখে আমার আদোপেই ভাল লাগল না।
তিনি আমাকে মা-বলে কথা কইছিলেন
বটে, কিন্তু তাঁর চোখ-মুখের ভাব 'এমন
বিজ্ঞী যে, আমি মাথার কাপড়টা আরো
একটু টেনে না দিয়ে থাকতে পারলুম
না। এ-সব মানুষকে দিয়ে পবিত্র কাজ
করাতে আমার মন সরে না! কিন্তু কি
করব, উপায় নেই,—যারা চতুর্দলের চেরেও
নীচ, সবাকে মূখু পৈতে দেখিয়েই তারা
সকলের মাথার উপরে পা দিয়ে চলে
বেড়াচ্ছে।

পুরুতঠাকুর এসে বললেন, “মা, একটা
কথা বলতে এলুম।”

—“বলুন।”

—“তোমার পিতার প্রাধিকারী পুরুষ
কেউ ত নেই?”

—“না।”

—“তাহলে তোমাকেই চতুর্থী করতে
হবে ত?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“বেশ, তাহলে এইবেলা থেকে
আয়োজন করো না! আমিই এ-পাড়ার
পুত্রোহিত।”

—“আমি ত তা জানি না!”

—“তুমি না জানতে পার, কিন্তু ককির
ভট্টাচার্য্যকে পাড়ার কে না চেনে?
তোমার পিতার সঙ্গেও আমার যথেষ্ট
আলাপ-পরিচয় ছিল; আচ্ছা, তাঁর মত
পুণ্যবান একালে আর ছুটি দেখা যাবে
না। এই সেদিন তিনি ‘ভট্টাচার্য্য-মশাই,
ভট্টাচার্য্য-মশাই’ বলে কত গল্পই বললেন,
আর এত-মধ্যেই এই ব্যাপার! হরি হে,
তোমার মহিমা বোকা স্তায়! বাক, পতন্ত
শোচনা নাহি! তুমি মা, পিতার উপহৃত
কত্তা, কার্য্যটা কি-রকমে সম্পন্ন হবে,
ওনি।”

আমি যা করতে চাই তাঁকে সব
বললুম। তিনি অন্ত্যস্ত আনন্দের ভাব
দেখিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, একেই বলি বাপের
মত মেরে! হবে না কেন! শুনে বড়
সুখী হলুম মা, পরকালে বেশ বুঝছি,
তোমার ভাগ্যে অক্ষর বর্গলাভ হবে!
তা মা, করতে হলে এখন থেকে বন্দোবস্ত
করতে হয়।”

—“ঠাকুর, বন্দোবস্ত যা করতে হবে,
তা মোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা না করে’ ত
বগতে পারছি না!”

ভট্টাচার্য্য-মশায়ের সুখ খেন শুকিয়ে

এতটুকু হয়ে গেল। একটু গভীরত্ব ধরে
আমতা-আমতা করে বললেন, “মোহনবাবু ?
কেন না, তুমি পাক্তে মোহন কেন ?”

—“তিনিই এখন আমাদের একরকম
অভিভাবক। তাঁর হৃৎ না নিয়ে ত কিছু
করতে পারি না।”

ডট্‌চাখা-মশাই গাড়িয়ে-গাড়িয়ে কিছু-
ক্ষণ ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস
ফেলে বললেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, তাই ভাল
না, তাই ভাল। বাই, একবার মোহনের
কাছেই বাই !”

আমি একটু আশ্চর্য হলাম। পুরুত-
ঠাকুর হঠাৎ এতটা ভেবড়ে গেলেন
কেন ?

কিন্তু একটু পরে মোহনবাবুর সঙ্গে
যখন দেখা হোল, পুরুত-ঠাকুরের সম্বন্ধে
তখন অনেক কথাই শুনলাম। ঠাকুরটি যে
ভাল লোক নন, তা তাঁর মুখ দেখেই
কতকটা ঠাণ্ডা করেছিলুম; কিন্তু তাঁর
অভাব যে এতটা অল্প, তা কল্পনা
করি-নি।

মোহনবাবু বললেন, “ককির ডট্‌চাখ
আমার কাছে কাকুতিমিনতি করতে
গিয়েছিল বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছে নয়
যে ওকে দিয়ে তোমার বাবার কাজ
করানো হয়।”

আমি বললাম, “আহা, এতটা আশা
করে যখন এসেছে, তখন আশার নিরাশ
করা কি ভালো ? হাজার হোক ব্রাহ্মণ
ত ! আর, বাবা বহুদিন ঐচ্ছছিলেন,
অতি-বড় শত্রুকেও তিনি শত্রু বলে ডাকত
পারতেন না। এখন তাঁর শেষ কামের

সময় বিরোধটাকেই বড় করে’ দেখতে
কিছুতেই আমার মন সরছে না।”

—“তবে তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক !
কিন্তু তুমি জাননা সরমা, উপকার করলে
এদের শত্রুতা বিগল বেড়ে উঠবে। নাহব-
রূপে যারা সদতান, অপকারীকে তারা
ভয় করে, কিন্তু উপকারীকে দু-পা দিয়ে
খাতলায় !”

বাবার কাজ ভালোর-ভালোর শেষ হয়ে
গেল ; এ জীবনে তাঁর নামে পবিত্র
এত বড় দিন আর-কখনো আসবে না—
এই মনে করে’ আমার প্রাণ-মন হুহু
করতে লাগল।

চতুর্থীর পরদিন সকালে উঠে নহুদাকে
দেখতে গেলুম না। তারপর একে-একে
সাত-আটদিন কেটে গেল, নহুদা আর
কিছু এল না—অনেক সন্ধানও তাঁর
কোন উদ্দেশ্য মিলল না। ঘে-রাস্তা থেকে
বাবা তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, রাস্তার
কুকুর আবার সেই রাস্তাতেই হারিয়ে
গেল। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলাম,
নহুদা কি বাবাকে খুঁজতে গেল ?
অন্যবের “মারা মাহুরে” ভুলে যায়, কিন্তু পণ্ড
হয়েও নহুদা ত তা ভুলে থাকতে পারলে
না,—মারার ডাকে সে ঘর ছেড়ে, হুথ ছেড়ে
পথে বেরিয়ে পড়ল হুথকে আপন করে’ !

বাবা যখন-তখন একটা কথা বলতেন
মনে পড়ল, ‘কুকুর অনেকসময়ে মাহুরের
চেরেও চের বড়’ !

মাসখরনক কেটে গেল। বাবাকে হারিয়ে
বে জীবনের কথা ভেবে আমাতে আর
আমি ছিলাম সেই শূন্য জীবনই
বীর-বীরে আবার স্বাভাবিক ও পূর্ণ হয়ে
আসছে। জীবনের সুখে আজ আবার
নতুন ভাবে জেগে উঠছে—নতুন পথ, নতুন
আশা, নতুন আলো! বিচিত্র মাহুয়ের
প্রাণ!

এর-মধ্যেই আর-এক ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন হুপুরে একলাটি বসে-বসে বই
পড়ছি, হঠাৎ মোহনবাবুদের বাড়ীর কী
এসে বললে, “মা-ঠাকরুণ আপনাকে একবার
ডেকেছেন!”

বুকলুম, আমার ডেকেছেন মোহনবাবুর
শিশিরা। একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা
করলুম, “কেন?”

সে বললে, “জানিনে বাছা, তাঁর নাকি
কি কথা আছে। আসবেন কি?”

আমার সঙ্গে কথা! কি কথা?
কিছুই ঠাওরাত্তে না-পেরে বই মুড়ে উঠে
বললুম, “চল, তোমার সঙ্গেই যাই।”

কীঘের সঙ্গে বাগানের পথ দিয়ে মোহন-
বাবুদের বাড়ীতে গেলুম।

ঘরবালানে পাড়ার একদফল মৈরে বসে
জটলা করছে—তাঁর মধ্যে বাগিকা, দুবতী,
বুড়া,—সকল বয়সের জীলোকই আছে।

আমাকে দেখবামাত্র হৈঁচৈ বন্ধ হোল
—সকলের মুখ দিয়ে কেসম-বেন একটা
চাপা টিটকিরির ভাব খেলে গেল। এক
সঙ্গে অনেকগুলো বাঁকা চোখের ধরপুষ্টি
আমার মুখের সাবনে বেন ধারালো ছোয়ার
মত জ্বলতে লাগল। হুক হুক বুকে হাতির

দিকে চোখ নাহিয়ে চোরের মত জ্বামি
একটি পাশে পাড়িয়ে রইলুম।

চোখ দিয়ে ততটা বেঁধা ব্যর, ততটা
বিঁধে, কে-একজন মুখ গুলে বললেন,
“হাঁগো মোহনের পিসি, মোহন কি একেই
বিয়ে করতে চায়?”

—“হ্যাঁ বাছা, আমার অধেষ্ট! কপালে
আরো কি আছে, ধীনবদ্ধই জানেন!”

এককোণে বসে চুপিচুপি—অথচ
আমাকে গুনিয়ে-গুনিয়েই কে বেন কাকে
বললে, “আ মরণ, গিসির মত পোড়ারমুখ
দিয়ে এখানে আসতে লজ্জা করল না,
তাই?”

আমার সর্কাক অলাড় হয়ে এল, কোন
মতে অক্ষুট হয়ে বললুম, “আমাকে কেন
ডেকেছেন?”

মোহনবাবুর পিসী বললেন, “ভূমি বাছা
বাবীকে খেয়ে আবার আমার মাথা খেতে
বলেছ কেন বল দেখি?”

এ কী নিমারুণ কথা! আমার মাথার
উপরে এ বেন বাজ্ ভেঙ্গে পড়ল!

—“বেশের মেয়ে বেশে যাও,—বিধবা
হয়েছ বিধবার মত থাক, তা নয়,—বত
সব রেছ ব্যতায়! তোমাকে কেন ডেকেছি
জান? আমার মোহনের ঝাতে সর্কানশ
না হয়, তাই বলতে! এ অন্যাক্ষি অন্যাক্ষারে
ডায়ও কুলে কালি পড়বে, তোমারও
খর্শে সইবে না,—কি বল তিহুর মা?”

তিহুর মা বোধকরি এতক্ষণ কিছু বলতে
না-পেকে পেটকুলে হাঁপিয়ে উঠছিলেন!
কেননা, মোহনবাবুর পিসীর মুখের কথা
মুখে থাকতে-থাকতেই তিনি চোখ-পাক্ষি

বলে উঠলেন, “ওমা, তা নয় মা, তা নয়? ধর্ম কি সহীল? এই ত অমন ললজাত্য বাপটা পটু করে’ মরে গেল!”

আর-একজন—চক্র ধরে সাপ বেমন খোলে—মাথা তুলে তেমনি দুলতে-দুলতে কোঁশ করে’ উঠলেন, “মরে যাবে না! ধর্মের কল বে বাতাসে নড়ে!”

আর-একজন বৃদ্ধা ছই ভূক কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে বললেন, “মা, মা, মা! বিধবার বিয়ে? একালের ছুঁড়িগুলো হোল কি! মুখে আভন, মুখে আভন!”

—“গলায় দড়ি! দেশ থেকে এসেছেন পুরুষ নজাতে!”

—“ও যে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে আসেনি, তাই-বা কে বলতে পারে!”

যাঁর বা মনে আসে, তিনি তাই বলতে লাগলেন, নেকড়ে বলে আমি যেন অলহার এক হরিণ! এতগুলো মাহুঘের ভিতরে এমন কি কেউ নেই, যিনি এ অভাগিকে এদের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারেন? দেহালের গা ঘরে আমি বোবা হয়ে পড়িয়ে রইলুম,—হাখে কষ্টে অপমানে আমার দু-চোখ অন্ধকার হয়ে গেল, অশ্রুধারা বুক ভেসে গেল।

কে-একজন কাঁসরের মত পুন্থনে গলায় বললেন, “জানো মোহনের পিসি, কতী বলছিলেন যে, ছুঁড়ীর বাপের আঁছে গিরে তিনি ডারি অভায় করেছেন!”

হঠাৎ নতুন গলায় আর-একজন কে তীব্রভাবে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, “খাম পুরুত-গিদি, খাম! আঁছে গিরে মোটী, প্রণামী আবার করবার সময়ে ককির

ভট্টাচার্য্যের ধর্মজ্ঞান কোথায় ছিল? ‘কব্জের বেলায় কালী, কাজ কুলেই পালী’! তোমার কতীটি বেশ লোক দেখচি!”

মোহনবাবুর পিনী বিরক্ত স্বরে বললেন, “যমুনা, বামুনের মেরেকে তুই মন্দ কথা বলছিস্ কোন্ মুখে?”

—“গিসিমা, তুমি খাম বলচি—আমাকে রাগিও না! বুড়ো-বয়সে তোমার ভীমরক্তি হয়েছে! এ বেচারী সব বাপকে হারিয়েছে, আর তুমি কিনা একপাড়া লোক ডাকিয়ে ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ! তুমি এই করতেই আমাকে বৃদ্ধি খণ্ডরবাড়ী থেকে আনিয়েছ? আর তোমাদেরও বলি বাছা, গোমাদের কাকুর আগে কি দম্মা-ধর্মের লেশ নেই, একটা ষোট্ পেলেই কি এমনি খেই-খেই করে’ নেচে উঠতে হয়?”

একজন টিপে-টিপে বিনিমে-বিনিমে বললেন, “কিলো যমুনা, বড় বে ক্যাট-ক্যাট করে’ গুনিরে দিচ্ছিস্, তোর আবার এত মুখ হুটলো কবে লো?”

আর-একজন বললেন, “সেদিনকার মেরে, উনি আবার আমাদের দম্মা-ধর্মের মোহাই দিচ্ছেন।”

—“ও-সব ভদ্দিমা করে’ কথা আমার সঙ্গে চলবে না, যমুনা কাকুর খাতির রেখে কথা কর-না! তোমাদের সকলকার হাড়ির খবরই ত জানি,—যদি মান বাঁচাতে চাও মুখটি বুজে চুপটি করে’ বসে থাক; নয় ত যে বার পথ দেখ।”

কে এসে আমার হাত ধরলে; চোখের অল মুছে ভাল করে’ চেরে দেখি, একটি

পরমহুঙ্সরী' বুঝতী !

যমুনা ?

তিনি কোমল স্বরে স্নেহভরে আমাদের বললেন, “লক্ষ্মীট, কঁদ না ভাই ! দাদা বাড়ী নেই বলে এরা বো পেয়ে তোমাকে চেপে ধরেছে ! এতটা হবে জানলে আমি তোমাকে আনতে দিইতাম না। কিছু মনে কোরো না ভাই, বাড়ী যাও !”

বাড়ীতে এসে যখন নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকলুম, তখন আমার প্রাণ যেন বৃকের মাঝে চটকটু করছে !

জীবনে প্রথম পেরেছি চের, কিন্তু এত লজ্জা এত অপমান আর-কখনো আমাদের সহিতে হয়-নি। বাবার স্নেহ-আশ্রয়ে এতদিন আমি পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম, বাইরের বড়-ঝাপটা আমাদের স্পর্শ করতেও পারে-নি। আজ বাবা বেই সামনে থেকে সরে ঝাড়িয়েছেন, নির্দয় সংসার অমনি তার সকল করণ্যতা নিয়ে বিবাক্ত নিখাসে আমাদের লক্ষ্যকৃত করে' তুলতে চাছে ! এইজন্যই তিনি ভয় পেতেন যে, তিনি গেলে আমার কি হবে ! বুঝেছি, বুঝেছি !

আজ বা তনুলুম, এ যে শুভানক কথা ! এরা কি ভেবেছে, মোহনবাবুকে আমি প্রতিনীর মত পেয়ে বসেছি ? এমন কথাও শুনতে হোল—দাদাগো !

এর পরেও আর ত আমার এ-পাড়ার থাকা চলে না ! থাকা ত চলে না কিন্তু বাব কোথা ? যার মা নেই, বাপ নেই,

স্বামী নেই, আপন বলতে তার আছে যুধা ঘর। হাঁ, ঘর—ঘর ... একলা নারীর মরণ ভাল !

আজকের এই প্রথম লাজনা এইখানেই থেমে যাবে মা, দিনে-দিনে বাড়তে থাকবে। লোকের রপনা নিত্য-নূতন ঘটনা ঘটাবে—যে-সব বাক্যবগ্নগার কানে আশুল মিতে হবে। একলা পেয়ে অবলা পৈরে সমাজ আমাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে—আমার অলহার জীবনকে তারবহ করে' তুলবে।

আমার পক্ষ নিয়ে কে তখন এগিয়ে আসবে ? মোহনবাবু ? ... হ্যাঁ, তিনি আসবেন, কিন্তু আমার ভেত্রে কেন তিনি আত্মীয়কে পর করবেন, সমাজকে শত্রু করবেন ? আর আমাকে বাঁচাতে গিয়ে কেনই বা তিনি বিপর্যয় হবেন ? এতে আমিও ভুখী হব না, তিনিও হবেন না—এ যে আরো ভয়ের কথা !

জীবনের সামনে বহু সোনার স্বপন ছুটে উঠছিল, ভবিষ্যতের অকুল পাথারে আবার তা ডুবে গেল। আজ বুঝছি আমার এ প্রথম মরুভূমির মত অপার,—এর-মাঝে বাবজীবন অগত্যা আগুনে বৃক পুড়িয়ে ছা-ছা করে' ছুটে মরে লাভ কি ? তার চেয়ে মরা ভাল, মরা ভাল !

হৃ-হাতে বৃক চেপে ডুক্করে কঁদে উঠলুম, “বাবা-গো, আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও !”

• •

ক্রমল

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

একতারা •

(১)

বাংলার আধুনিক কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কবিতা অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। হালের অনেক কবি তরুণ বয়সে শকরাচার্য্যের মতে “তরুণীমুক্ত” না হইয়া পরমার্থ চিন্তার মন দিতে শুরু করিয়াছেন যেহিহা এক এক সময়ে আশঙ্কা হয় যে, বাংলাদেশে বৃষ্টি যৌবন আর নাই। এখানে প্রকৃতি যখন স্ৰীতাপগমে নব মল্লিকার মালা কেশে পরিয়া এবং চূতমঞ্জরী কাণে কর্ণাভরণ করিয়া অস্ত্র-সারিকার বেশে বাহির হন, তখন তরুণ কবির দল ‘শান্তিনতক’ আওড়াইতে থাকেন—ভাঁদের মনের কোন কোণার বসন্তের আমেজ যে লাগিয়াছে, মোহের রং যে ধরিয়াছে, তার লক্ষণটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

যৌবন যে শুধুই বসিয়া বসিয়া ‘ঋতু-সংহার’ বা ‘অমরুশতক’ কিংবা ‘গীতগোবিন্দ’ রচনা করিবে—যৌবনের ধর্ম্মই যে লাগসা—যৌবনকে এত ছোট করিয়া দেখিয়া তাকে আনি অপমানিত করিতে পারি না। অবশ্য লাগসার দীপ্ত অগ্নিবর্ণকে কাব্যে ফুটাইয়া তোলাও শক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। এ-দেশে বাররন, কি হাইনে, কি বিওকিল গোতিরের মত কবি যদি একজনও জন্মিত, তবে বাংলাদেশটার মধ্যে একটা জীবন-

বেগ আছে, ইহা বিশ্বাস করিতাম। বাংলা কাব্যে বাসনার উজ্জ্বল ও দীপ্ত কোথায়? যে প্রবল বাসনার অগ্নিবর্ণে গ্রীক ট্রাজেডি, শেক্সপীয়ারের অমর নাট্যগুলি রঞ্জিত, যে চূর্ণাস্ত বাসনার ছন্দোময় রূপ বাররনের কাব্যে বিভ্রাণমান—বাসনার সেই প্রাণীপ্ত বিভাস বাংলার কাব্যে কোথাও নাই। তবু সেই দীপ্ত বাসনাবেগকেই যৌবনের সারসর্কীয় বস্তু মনে করিতে পারি না। Romanticism বলিতে যাহা বোঝায়, যৌবনেই তার উদ্বোধক, তার প্রবর্তক। একালের সাহিত্যে বস্তুতত্ত্বতা (Realism) স্বভাবতত্ত্বতা (naturalism) ব্যক্তি-তত্ত্বতা (individualism) এবং বিশ্বতত্ত্বতা (humanism) যে শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত ও প্রবর্তিত হইতেছে, তারই নাম যৌবন। আর রোমান্টিক সাহিত্য বলিতে ঐ সব আদর্শগুলিরই সমবার বুঝায়; অর্থাৎ ঐ সব আদর্শের সমবারেতেই রোমান্টিক সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এখানেও যৌবন-ধর্ম্মের ক্ষতি হয় না। যৌবন, সাহিত্যের মধ্যে সমস্ত জীবনের নানা জটিল সমস্তার বাস্তপ্রতিঘাতজনিত একটা স্বভা-ময় আলোড়ন আনিয়া ফেলে। সেই স্বভাময় (“storm and stress”) সাহিত্যও যৌবনেরই সৃষ্টি।

অতএব, বাংলা সাহিত্যে যৌবন তার

• শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরনাথ বসু এইতঃ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা।

কাজ 'কিরিতে পারিতেছে না বলিয়া বধন
 আক্ষেপ করা হয়, তখন সাহিত্য' এতগুলি
 দিক্ হইতে পূর্ণ ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে
 না বলিয়াই সেই আক্ষেপ। কেননা,
 কাব্য-সাহিত্য বলিতে যারা পদ্যবলী
 সাহিত্য বা আউল বাউল সাহিত্য
 বুঝিয়া বলিয়া আছেন, কাব্য-সাহিত্যের
 সেই "রূপান্তর" ঘটাইয়া যারা যুগান্তর
 উপস্থিত করিবার দ্বংস্র মেষিতেছেন,
 তাঁদের আমরা বলি যে, ও-সব অধ্যাক্ষ-
 রসাম্বক কাব্যসাহিত্য উদ্বোধনের জিনিস
 হইলেও পুরোদস্তুর সাহিত্য নয়। এবং
 ঐ-সব সাহিত্য বাধে, বাংলা সাহিত্যে,
 নোপাসী-ফোবোরের গল্পের একটু আধটু
 ফিকে গোচের নকল চলিতেছে অথবা মধ্য-
 ভিত্তোত্তরীয় Idyll-রচয়িতা টেনিসন-হোসেটি-
 হুগো'র অশুদ্ধরূপে বাংলা পরীক্ষামূল্যের
 বৃন্দ চিত্রাঙ্কণ চলিতেছে বলিয়াই বাংলা-
 সাহিত্য করাসীন্ বা ইংরাজী সাহিত্যের
 সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এমন কথা মনে
 করা যায় না। একা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের
 সব রসের আধার, সব আশ্রয়েরই উদ্বোধক
 হইয়া আছেন। তিনি নিজেই এক মহা
 সাহিত্য। তাঁর মধ্যে সাহিত্যের 'সব
 বিভাগেরই কিছু কিছু রূপ মেলে।
 কিন্তু কোনো কোনো বিষয় বাহা তিনি
 ছুঁইয়া গেছেন যাত্র, অন্তান্ত আর্টিষ্টদের
 তাহাই বিচিত্র করিয়া সাহিত্যের আসরকে
 জমার্ট করিয়া তোলা প্রকার। বাংলা
 সাহিত্যে সেই কাজের অপেক্ষা আছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথর বাগ্‌টির "এক-
 তারা" কাব্যটি পড়িয়া এইজন্য অত্যন্ত

আনন্দবোধ করিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের
 'মানসী' ও 'চিত্রায়' যুগল প্রেমের বিচিত্র
 উপলব্ধির যে একটুখানি আভাস পাওয়া
 যায় এবং যে-জারগার ভিত্তোত্তরীয় যুগের
 ইংরাজী সাহিত্যের টেনিসন, ব্রাউনিং, রসেটি,
 হুইমসবর্গ এবং করাসী সাহিত্যের ভিক্টর
 হুগো, গার্ড্‌বাত্ অগস্ত ত্রিজো, বিওফিল
 গোতিয়ে প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাবৃত্তা ও
 সাক্ষ্য পাওয়া যায়—যুগল প্রেমের সেই
 বিচিত্র উপলব্ধির দিক্‌টা, সেই বিচিত্র মানস-
 রসলীলার দিক্‌টা, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথরূপের
 কাব্যে নূতন রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। তিনি
 রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য; রবীন্দ্রনাথের ভাব
 ও ভাবার দ্বারা বহুল পরিমাণে পুষ্ট। কিন্তু
 তাঁর উপলব্ধির নবীনতার ও সরসতার
 তাঁর কাব্য উজ্জল ও নবীন। এই জন্য
 আমি তাঁর এই কাব্যটিকে সাহিত্যের সভার
 সামনে অভিবাদন করিতেছি !

ভিত্তোত্তরীয় যুগের যে সকল কবির নাম
 করা গেল, তাঁরা সকলেই যুগলের বৈতক
 যুগলভবের শেষ কথা বলিয়া মানিয়া
 লইয়াছেন। তাঁদের প্রাণশিত্ত মার্গ বৈত-
 মার্গ, যুগল প্রেমের মার্গ, ব্রাউনিংয়ের
 ভাবায় "love-way"। সেখানে নারক ও
 নারিক। পরম্পরের বাহিত্তিকে নানা পরীক্ষা
 ও ভাঙাগড়ার ভিত্তর দিয়া পুঁজিতেছে।
 শেলির 'এপিসাইকিডিরন' যুগলের সেই
 অবেষণের কাব্য। কিন্তু বধন পুরম্পর
 পরম্পরকে বাহিত্তি বলিয়া চিনিম, তখনও
 এই 'অবেষণের বিদ্যায় নাই—এ অবেষণ
 চিরন্তন অবেষণ—কেননা, এক যে অস্ত্রের
 মধ্যে আর্পনার "শত জনমের চির সফলতা"

মাগিতেছে। ব্রাউনিংয়ের “Love in a lilt” যুগলের সেই চিরঅবেষণের কাব্য—সে অবেষণ জীবনব্যাপী অবেষণ। কারণ, যুগল প্রেম বৈতের প্রেম বলিয়া এ প্রেমে মিলনেও বিরহ—‘হুহু’ কোরে হুহু কানে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’—এবং বিরহেও মিলন—যে অস্ত্র মৃত প্রিয়তমা অভিশিন্ হোপের দিকে চাহিয়া তার প্রণয়ী বলিতেছে—“I claim you still, for my own love's sake”—“আমারি প্রেমের অস্ত্র আমি এখনও তোমার পরে দাবী রাখি। হরত আরো অনেক জীবনের ভিতর দিয়া আনাদের মিলন! বিলম্বিত হইবে, বিচিত্র জগতের পথে হরত আমাকে চলিতে হইবে—তবু একদিন তোমাকে পাইবার সময় আসিবেই।” তাই, এই যুগল প্রেম দ্বন্দ্বাত্মক বলিয়াই ভোগের অস্ত্র বধন দেহ মন ব্যাকুল—‘প্রতি অঙ্গ কানে প্রতি অঙ্গ তরে’—তখন ভোগের মধ্যেও আগে ভোগ-বিরতি, আগে বৈরাগ্যের সুর। আবার সেই ভোগ-বিরতির অবস্থার অপূর্ণ মানস সন্তোষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য যুগল প্রেমের কবিতা যুগলের এই বৈত, যুগলের এই দ্বন্দ্বের লীলা ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুরটায় সকল পদ্যই তাঁদের কাব্যে পূর্ণ-স্কুট—এ সুরের কোন গমক বা কোন সুন্দরী তাঁরা বাদ্য যেন নাই। বৈতের এই সুর কবি দ্বিজেন্দ্রনাথরায়ের ‘এক-তারাত্তেও দিবা বাজিয়াছে। স্কুট সেই খানেই তাঁর নৃতনব নয়, তাঁর বিশেষত্বও নই।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সকল যুগল প্রেমের কবি। গান গাহিতেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভিত্তিরী যুগের কবির একটা আয়গার পার্থক্য দেখিতে পাই। তাঁরা যুগলের বৈতত্বকেই চরম বলিয়া মনে করেন না। দুরের মধ্যেই দুরের শেষ তাঁরা দেখেন না। আমি এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, জর্জ উইলিয়াম রাসেল (এ, ই,), ল্যান্সেলিন্ এবারক্-মুবি প্রভৃতি অত্যন্ত আধুনিক কবিরের কথা বলিতেছি। তাঁরা যুগল প্রেমের দ্বন্দ্বাত্মক লীলার পরিণতি ও পরিসমাপ্তি দেখিতে পান্ অদ্বৈত প্রেমে বা একের অল্পভূতিতে। যুগল প্রেমের সমস্ত সীমাবদ্ধ বাসনা, কামনা, বিরহ, মিলন, তৃপ্তি, অতৃপ্তি,—সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই অনন্তের মধ্যেই চির-পরিণাম ধোঁজে।

হঠাৎ মনে হইতে পারে, বাহ্যকে সেই এক, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অনন্ত বলা যাইতেছে, তিনি বুদ্ধি ঈশ্বর। একেবারেই না। যুগল প্রেম* বে এক-প্রেমের মধ্যে আপনার উপলব্ধির চরমতাকে ধোঁজে, সে এক—যুগলেরই এক। সে এক—দুই মিলিয়া এক। দুরের কেন্দ্রগত এক। দুরের পরিণত এক। যে ভাবেই ইহার ব্যাখ্যা করিবার কোন, দুরের মধ্যেই সেই একের রহস্য বিরাজিত। তাকে পাইলেই বৈতের বৈত রেটে, নহিলে বৈতের চক্রে কখনো তৃপ্তিতে কখনো অতৃপ্তিতে, কখনো সুখে কখনো দুঃখে, কখনো মিলনের মধুভৃত্য কখনো বিচ্ছেদের বেদনার, সুরিয়া মরাই সার হয়। বৈত প্রেমে ব্রাউনিংয়ের ভাষায়—“Infinite passion and the pain

of finite hearts that yearn"—সীমাবদ্ধ বাসনামূলক হৃদয়ের কেবলি অনন্ত ব্যাকুলতা এবং কেবলি অনন্ত খাটনা। কিন্তু সেই একে বধন বৈত মেটে, তখন সে এক তুরীয় বা স্থিতিশীল এক থাকে না। সে একও বিচিত্র গতিশীল এক (dynamic unity)। তাহা "বিশ্বেতন প্রেম"। তাহা দুইকে এক করিয়া, এককে আবার বহুর দিকে ছেঁড়া যায়। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, সে একের তুরীয় অবৈত স্বরূপ (statical Absolutism) থাকে না, সে একের স্বরূপ গতিশীল বহু (dynamical Pluralism) ছেঁড়া উঠে। কবি বিজ্ঞেন্দ্র-নারায়ণের মধ্যে আধুনিক কবিতার এই গতিশীল একের স্রবণ পাইয়াছি বলিয়াই তাঁর "একতারা"কে যুগল প্রেমের এক পরমাস্তর্য, পরম রহস্যময় ইতিহাস বলিয়া আদর করিতেছি। যুগল প্রেমের স্বরূপকে কোন গ্রামই তাঁর কাব্যে রপিত হইতে বিরত হয় নাই। তাঁর কাব্যে ভিত্তোরীয় যুগের স্রবণ যেমন আছে, তাঁর কাব্যে আধুনিক যুগেরও স্রবণ তেজিই আছে। তাঁর কাব্যের আরম্ভটা সে যুগে এবং সমাপ্তিটা এ যুগে।

(২)

প্রথমে তাঁর কাব্যের পুরাণে স্রষ্টারই আলাপ শোনা যাক,—অবশ্য তাঁর অস্থ-ভূতিতে সে স্রবণ নবীন হইয়া উঠিয়াছে। যুগলের পরম্পরের রহস্যের অন্বেষণের দিক্‌টা তাঁর কাব্যের আরম্ভভাগে দেখিতে পাই। বৈক্যব কাব্যহিসাবে এ হচ্ছে পূর্বরাগের কথা। আমরা ইহাকে পথের

কথা বলিতে পারি। পরম্পর পরম্পরকে ছইটা নবাবিভক্ত জগতের মত পাইরা তাঁর নানা রহস্য উন্মোচন করিতে লাগিয়াছে। এখানে জানিয়া যেটুকু ভূপ্তি আসে, না-জানার অন্ত তাঁর চেয়ে চেয়ে বেশি অতৃপ্তি ঘাপে। আবার জানার মধ্যে কত সুকাহুরি, কত ছন্দবেশ, কত আশ্চর্যভারণা—সেগুলিও জানিতে হয় এবং সেগুলিকে জয় করিয়া ও অতিক্রম করিয়া তাঁর চেয়ে সত্য-তার নিত্যতার জানাকেও জানিতে হয়। এই যে একটা মহাব্য-হৃদয়ের অজানা জগতের গিরি-নদী-ব্রহ্ম-অরণ্য-সমুদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে যাত্রা, এইটাই যুগল প্রেমের পথের কথা, এই হচ্ছে যুগল প্রেমের পূর্বরাগের কথা।

কবি বিজ্ঞেন্দ্রনারায়ণ যৌবন বয়স পার হইয়া তারপর প্রেমের কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছেন বলিয়া তাঁর এই পূর্ব-রাগের কথা, বা পথের কথা স্মৃতির কথা হইয়া পীড়াইয়াছে। স্মৃতিটা বেশ তাআ আছে স্বীকার করি, তবু ত সেটা স্মৃতি। তাঁর যৌবনটা তাই মানস যৌবন। তাঁর "যৌবন-চোর"-প্রেম যৌবনের সব আবেশ, সব রং, সব মাধুরীকে, সেই মানস-বনে চিত্রপুঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। কানেই নূতন করিয়া সেইখানে সেই অমর যৌবনকে অমৃতব করিয়া কবি প্রেমের নূতন অন্বেষণে চলিতেছেন।

"দৌহাকার এক প্রেম ছাট যৌবনের পাখে

..

উড়ে যে স্রুত্রে,

বাসনার স্বর্ণ সেই নখে কিণো দৌহাকারি

.. .. অন্তরের পুরে ?"

তাই দেখিতেছি, কবি তাঁর “জীবন-যাত্রা”র অনেকটা পথই অভিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর এ জীবনযাত্রার সবটাই সামুনের দিকের ঘাড়া নয়, এর অনেকটাই পিছনের দিকে বিলম্বিত।

“তোমার মনোবনের পথে জীবনযাত্রা মোর
ঝিল্লিময়ে ঘনায় মোহ নিবিড় নিশি ঘোর।”

এই অজানা আধার ঘেষের ভিতর দিয়া ‘জীবনযাত্রা’র একটি মাত্র আশ্বাস এই যে :—

“আধার পথের পথিক আমি
ধাব বেধার হঠাৎ ঘামি

দেখবো বিপুল মেউল শিরে সোণার

আলো রাজে”

এবং তথ্য—

“কোন্ দেবতা সিংহাসনে ?

তুমিই সে যে তুমি !”

সমস্ত জীবনব্যাপী প্রেমের অব্যবহের পর বাক্য অব্যবহ করা বাইতেছে তার সন্ধান মিলিবেই, এই ভরসা না থাকিলে কে এত খোঁজাখুঁজি করিত !

এই কবিতাটি ব্রাউনিংএর ‘Love in a life’ কবিতাটি দ্রবণ করার ; যদিচ তার উপমা এবং ধরণ ধারণ একেবারেই স্বতন্ত্র। সেখানে উপমাটা এই যে, একজন প্রণয়ী একটা বাড়ীর ঘরের পর ঘরে প্রিয়াকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাকে প্রেমের করিতে পারিতেছে না। কোন ঘরে তার চুল্লীর স্বেদন পায়, সুত্রে তার নিশ্বাস-তিল দেথা যায়—যেন বহুতরপূর্বে সে সেখানে ছিল ! কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসে, শুভ্র খোজ মিলে না। সে ভ্রমরাও হাঁড়

না, দরকার পর দরজা তার কাছে কেবলি খুলিয়া বাইতেছে, এবং সেই প্রেমের নিভৃত গোপন ভবনের সব রহস্যই সে দেখিয়া লইতেছে।

তার চেয়েও এ কবিতাটা সীতবাস্তবের ‘Oh Desert of the Heart’ কবিতাটি মনে আনিয়া দেয়।

সে কবিতাটির ভাব এই :—প্রেমের পথ যখন মরুভূমি হইয়া গেছে এবং হিহি করিতেছে, তার উপর শীতের বাতাস, যখন কোথাও আশ্বাসের চিক্‌মাজ নাই—তখন মন এই কথাই বলে যে এ সব পায় হইয়া এমন কোন একটি শীতল কুঠে পৌছান যাইবে যেখানে নিশ্বাস সত্যত উচ্ছ্বসিত হইতেছে, যেখানে শুষ্ক উসর ধূসর মরুবাসুকার অন্তহীন পাণ্ডুর বিস্তার আর নাই।

কিন্তু প্রেমের এই যে ব্যাকুল বিদ্যাব-পূর্ণ অব্যবহ, এই যে সুদীর্ঘ অভিসার যাত্রা—ইহার ভিতরে ঐ প্রাণের আশ্বাস বা ভরসা লাগিতেই পারিত না, যদি প্রেমটাই বিগড় প্রেম না হইত। প্রেমের ছদ্মবেশ অনেক রকমের আছে, সেগুলি যখন বেধা দেয় বা ধরা পড়ে, তখন ঐ খোঁজা আরো বিলম্বিত হয়, পথ দীর্ঘতর হইয়া ওঠে। আমাদের প্রকৃতির ভিতরকার সেই ছদ্মবেশগুলো যে কি ভীষণ তাই ছবি আঁকিয়াছেন আধুনিক রূপ নাট্যকার এনড্রিক তাঁর ‘Black Maskers’—“কালো মুখোশওয়ালা”—নামক নাট্যে। ভিতরকার সেই কঠিন বাধাগুলো যে কত বিরূপ আকার ধারণ করিয়া আমাদের

পথস্ট্র কবিবার চেষ্টা করে, তাহা ব্রাউনিং-এর "Childe Roland to the Dark Tower Came" কাব্য পড়িলেই আশ্চর্য-রূপে ঘেঁষিতে পাওয়া যায়। যিহেস্ত্রনারায়ণ এই পথের বাণীর স্বরূপে একটি কবিতা লিখিয়াছেন—তার নাম 'ছন্দঃপ্রেম'।

"তোমার ভালবাসার ছলে সেদিন আমি শুধু কেবল ভালোবাসিহু আপনাকে ;

তোমার গলে পরাহ নালা, আপনি হ'বে চোর
আড়াল হ'তে করিহু চুরি তারে।"

কিন্তু এই কবিতাটিতে ছন্দতার ইঙ্গিত মাত্র আছে, ছন্দতার সব রূপ এখানে কোটে নাই। বরং তার পরের কবিতা "দেবতার আবির্ভাবে" ভিতরকার বেদনার হৃদয়কারময় চিত্ত-আলামার প্রাণের একটা গোপন কালো অংশ একটুখানি খুলিয়া আনিয়াছে। কবিতাটি অপূর্ণ। তার ভাব এই যে, প্রিয়তমার পায়ে কবি তাঁর সাত মহালা পুরীর সমস্ত ঐশ্বর্য ঢালিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কবিত্রিয়ার মন ভরিল না। কারণ, এখনও কবি দেখান্ নাই একটি 'জীর্ণবর রক্ত চিরতরে,' যেখানে—'হৃদয়ের বুলিয়ানি তারে কেলিয়াছে ঢাকি'। তিনি ত্রিয়ারকে সন্মোদন করিয়া বলিলতছেন—'এত রক্ত এত হৃদয়' কেলিয়া সেই আঁধারের বন্ধ জুড়িয়া যেখানে 'অনাধি হুঃ' বিরাজিত, সেখানে তুমি যাইতে চাও কেন? সেই ঘরের দরজা তো বৃন্দবাসীর বরিয়া কেহই খোলে নাই—সেই দরজা আজ তুমি বুলিতে চাও কেন? কিন্তু সেই কালো ঘরটাই তো প্রেমের সব চেয়ে কাঁসনার বন্ধ; সেই ঘরের দরজাই

যদি বন্ধ থাকে তবে প্রেম আর করিল কি?

ভন্ মেইসকিন্ডের 'Death Rooms,' 'মৃত্যুর ঘর' নামক একটি কবিতা আছে। সেই কবিতাটিতে তিনি বলিতেছেন যে, 'আমার আশ্রয় অনেকগুলি পুরাণে জীর্ণ ঘর আছে, সেই সব ঘর মৃত্যুর দ্বারা অধিষ্ঠিত। কিন্তু আমার প্রিয়া সেগুলি কখনো ঘেঁষিবে না, তার চরণ সেখানে কখনই পড়িবে না।' যিহেস্ত্রনারায়ণও সেই Death Rooms-এর কথাই বলিয়াছেন; শুধু তাঁর মুখে এই জোরের কথা মিলিল যে, আমার প্রিয়া সেগুলি না ঘেঁষিয়া ছাড়িবে না, তারই চরণ সেখানে সর্বাগ্রে পড়া দরকার। নহিলে আমার উদ্ধার কোথায়?

এদম একটা আশ্চর্য প্রেমের কবিতা আমি বাংলা কাব্যসাহিত্যে পড়ি নাই। সকল কবিতার মধ্যেই এই একটি গভীর স্নেহের সাড়া পাই—ইহা হইতেই বুঝিতে পারি যে কবির কাছে প্রেমের বাস্তবতা কতখানি সত্য! 'প্রেম ও যৌবন' কবিতা-টিতে তিনি যৌবনের ঢেঁকল ভোগপূর্ণ প্রেমের ছবিটা বেশ ভাল করিয়াই আঁকিয়াছেন, অথচ ইহাও বুঝিয়াছেন যে, সে জিনিস চিরন্তন নয়, সে ক্ষণিক। 'ভোগবতীর ঢেঁকল লীলা কোন্ দরতে হয় যে হারা'। কিন্তু 'মহাশক্তিনীর অমল ধারা' তো আর হারাইয়া যাইবার নহি।

অপুস্ত্র ত্রিয়ার একটি কবিতা আছে 'In praise of women'—তাতে গোড়ার দিকে তিনি তাঁর প্রিয়ার রূপ বর্ণনা দিয়া

হুকুরিয়াছেন। কিন্তু একদিন যখন বিবাসে তাঁর হৃদয় তুগপ্রায়, যখন কোথাও কোন সান্দ্রতা নাই,—“Then woke thy hid beauty in the midst of my sorrow”—তখন সেই বিবাসের মধ্যে প্রিয়তার গোপন সৌন্দর্য্য বিভাসিত হইল। তাই কবিতার শেষের দিকে তিনি বলিয়াছেন যে নারীর দুই রকমের সৌন্দর্য্য—“a visible beauty and a beauty unseen”—এক দৃশ্য রূপ আর এক অদৃশ্য রূপ। দৃশ্য রূপ ভোগের বস্তু, অদৃশ্য রূপ পূজার বস্তু।

সেই অদৃশ্য রূপ চোখে পড়ে না বলিয়াই কবি তাঁর অবেবণের পালায় প্রেমকেই ‘অস্বীকার’ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে ‘লোকের মুখের শোনা কথার আলুগা জানার জানবো না’। আমি শেষ পর্য্যন্ত জানিব, নহিলে তোমাকেই অস্বীকার। ‘অন্ন হৃদয়ের লোভে আমি ছয়াবের কর হানবো না।’

(৩)

অবেবণের যে হৃদয়, উপলব্ধিরও সেই হৃদয়। বৈত প্রেমের উপলব্ধি প্রেমের সকল বৈত বা দৃশ্যভাবে সমাধানের ক্ষমতা ব্যাকুল। প্রেমের একটা দিক্ দূরের, অস্তরিক দিক্‌টের; একটা দিকে তাহা ব্যাপ্ত হইতে চায়, অস্তরিকে তাহা একটিমাত্র আধারে আপন উপভোগকে নিবিড় করিতে চায়। তার একটা দিক্ ঘেহের, অস্তরিক দিক্ ঘেহাতীতের। একদিকে তাম্র . সীমার রূপ, অস্তরিকে অসীম রূপ। তার ত্যাগে ভোগ, ভোগে ত্যাগ; “মিলনে বিরহ,

বিরহে মিলন; বেশকাল নহিলে তার নয় অঞ্চ বেশকালহীনের দ্বন্দ্বও তার ব্যাকুলতা। উপলব্ধির এই বৈচিত্র্যের সুরগুলি কবি বিবেচনারাশ্রয়ের অনেক গুলি কবিতার মধ্যে পাই। কয়েকটি কবিতার নমুনা দিই।

“বিরহ ও মিলন” কবিতাটিতে কবি মিলনের পরম সুহৃদে অশ্রুভব করিতেছেন যে, তাঁর বিরহের প্রিয়াকে দূরে ফেলিয়া আনিয়া তিনি নিকটের প্রিয়তার মিলন সন্ভোগ করিতেছেন। তাই বিরহের বেদনা মিলনের আনন্দকে রান করিয়া দিতেছে।

“আকাজিক মিলনের মাঝে

প্রাণে বাধা বাজে,

হৃদয়ের গোপন গভীরে

কোনু ভৈরবীর বাধা কেঁদে কেঁদে ফিরে
উদাস বিবাসে ভরে মিলনের গান।

* * *

“ওগো প্রিয়া—যে অন্তর-রাগী,

আপনারে ছাড়াইয়া কেমনে না জানি

মিশে গেছ নীলাভের সর্ব প্রান্ত-শেবে,

কোনু আলিঙ্গন মোর বাবে সেই বেশে?”

প্রেমের দূর ও নিকটকে এক হৃদয়ে গাঁথিতে “না পারিলে তার আর শক্তি নাই। সেইজন্য “মিলন” কবিতাটিতে কবি, প্রিয়তার সহিত তাঁর মিলন আর বিবাহের সহিত তাঁর মিলন, এই দুই মিলনকেই—এক পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলিয়াছেন।

“এ মিলন কি মিলন তব শুধু আহার সনে ?

ঐ যে উহার বৃকের তণ্ডু,

সব গগনের তারা জলে,

সব কাননের ফুলের গন্ধ ভাসতে সমীরণে।”

“এ মিলন যে ভীষণ পরম নিখিল ভুবনের”

“তোমার আমার প্রেমের ডোরে

নিখিল ভুবন বাঁধা” ।

তারপর প্রেমের মিলনে শুধু তো ছুটি
আখ্যায় মিলন হয় না, বেহের মিলনও
সেখানে আখ্যায় মিলনের চেয়ে কম নয় ।
মিলনের পরিপূর্ণতার দেহ বড় কি আখ্যায়
বড়, এ প্রশ্নের কোন স্থানই থাকে না—
কেননা শুধু আখ্যাতেও মিলনের পূর্ণতা
নাই, শুধু বেহেতেও নাই । ব্রাউনিং এ তব
খুবই বুঝিয়াছিলেন, তাই ‘র্যাবি বেন্ এন্ড্রা’
কাব্যে তিনি লিখিয়াছেন—‘nor soul
helps flesh more now than flesh
helps soul’—আখ্যায় যে দেখকে বেশি
সাহায্য করে কি দেখ আখ্যাকে বেশি
সাহায্য করে তা বলা যায় না । ‘কেরিজাঙ্ক
ফ্যান্‌সিন্’ নামক তাঁর কাব্যে—‘Not
with thy soul, O Love’ একটি স্মৃতি-
কবিতায় তিনি বলিতেছেন যে, শুধু আখ্যায়
দিয়া ভালবাসিয়া আমার সব তৃপ্তি হয় না,
আমাকে দেখ দিয়াও নিবিড় করিয়া ভাল-
বাসিতে হাও । তখন—‘Sense queching
soul’—বেহ আখ্যায় সব ক্ষণের শাস্তি
করিয়া দিবে ।

সেই মেহ ও আখ্যায় পরিপূর্ণ মিলনকে
কবি যিজেক্সনারায়ণ “পরম মিলন” নাম
দিয়া আর একটি পরম দ্বন্দ্বের কবিতা
লিখিয়াছেন ।

“বেহের ঘারে প্রাণের নিতি

অর্ন্ত আকুল হানাহানি,

সেদিন লাগে হানুত হিয়া,

বুঝেছি আন—কি সেই বাণী !

তোমার আমার বেহে আসে

অহু কত লক্ষ কোটি,

উপবাসী সবাই যে তার

পরশ লতি ধ্বজ ক’টি ।”

এমনি করিয়া যে-প্রেম সব দ্বন্দ্বের
সমাধান করিতে করিতে চলে, তার কাছে
মৃত্যুভয়টা কিছুই নয় ।

“তব তো শুধু আপন মাকে—

আপন পরে অবিশ্বাস,

তব যে শুধু মুচ প্রাণের প্রেমের

প্রতি পরিহাস ।

“তুমি আমার যা পেয়েছো সে পাওয়া

কি অমনি পাওয়া

সে যে আমার তোমার মাকে তব

খানিই হ’য়ে যাওয়া ।

“নিত্য-মুখের উর্দ্ধচপল কল্লোলিত

প্রাণ-সাগরে,

ক’ণিয়ে আমি পড়েছিলাম তিলেক তরে

তব না ক’রে ;

তাইতো তোমার পেয়েছিগো রবি

শশীর আলোর দেশে,

বেটুক তোমার প্রাণের লীলার চেউবে

চেউয়ে বেড়ায় ভেসে ।

তেমনি আমার তোমার পাবো,

পাবো তোমার অচঞ্চলে,

পাবো তোমার শুদ্ধ গভীর ওই

মরণের সিন্ধুতলে ।”

এই কবিতাটি ব্রাউনিংয়ের “Never
the time & the place” নামক মৃত্যুদ্বন্দ্বী

প্রেমের কবিতাটি মনে পড়াইয়া দেয়।
ব্রাউনিং সেখানে জোরের সহিত বলিতে-
ছেন :—

"Do I hold the past

Thus firm & fast

Yet doubt if the future

hold I can ?"

আমি যদি অতীত সবক্কে এমন নিশ্চিত
ও সুদৃঢ়, তবে ভবিষ্যৎ সবক্কে আমার
সন্দেহ করিবার কারণ কি থাকিতে পারে ?

"This path so soft to pace shall lead
Thro' the magic of May to herself
indeed !"

এই কোমল স্নহের পথ বসন্তের সকল
মোহন ইন্দ্রজালের ভিতর দিয়া আমার
আমার হারানো প্রিয়তার কাছেই লইয়া
যাইবে।

(৪)

এ পর্য্যন্ত গেল পুরানো সুর। বই-
খানির শেবের দিকে নতুন সুর ফুটিয়াছে—
সেইখানেই আধুনিক যুগের কবিতার সঙ্গে
ইহার নাড়ীর যোগ দেখিতে পাই। এ
যুগের কবিদের কাছে সব চেয়ে বড়
রহস্য যৌন সবন্ধের রহস্য (sex-
mystery)। পতিপত্নী, নারক-নারিকা,
এ-সব লৌকিক সবন্ধের আবরণ খসাইয়া
শুধু স্ত্রী এবং শুধু পুরুষকে তাদের
অনাদি সবন্ধের চির রহস্যে নিমগ্ন করিয়া
ভীরা উপলব্ধি করিতে চান। আবার
যৌন সবন্ধের প্রধান আধার যৌন প্রেম—
তারও আবরণ খসাইয়া কেবলমাত্র অনাদি
যুগলের রহস্যকে—চিরন্তন নর এবং চিরন্তন

নারীর সবন্ধ-রহস্যকে—অগ্রভব করিতে চান।
এ যুগল কোথা হইতে আসিল, এ যুগলের
রহস্যের শেষ কোথায় ? এই প্রশ্নই আধু-
নিক কবির সব চেয়ে বড় প্রশ্ন।

"বেশকামাজীত" কবিতার কবি বলিতে-
ছেন "পতি নহে পত্নী নহে, কেবল তুমি
আমি"—"হুই চেতনা দোহে মিশে ছুটছে
দিশাহারা দিশে"। "তুমি আমি" কবিতার
গিথিতেছেন যে, এক নিমেষে তোমার
আমার জন্ম হইয়াছিল। তার আগে তুমি
স্বপ্ন ছিলে, আমার চেতনাও অসুদৃষ্ট ছিল।
হৃদয়ের মিলনে মায়া মিলাইয়া গেল, হৃদয়
হৃদয়কে দেখিলাম। আমি ভিন্ন তুমি নাই,
তুমি ভিন্ন আমি নাই। "দোহার মাঝে
দোহার বিকাশ রাজি দিনে।" কবিতার
নাম যদিও তিনি দিতেছেন "আমি তুমি,"
কিন্তু এ আমিও আমি নয় এবং এ তুমিও
তুমি নয়। কে আমি, কে তুমি, তাহা
নির্ণয় করিবে কে ?

ইংরেজ কবি জামুয়েল ওয়াডিংটনের
একটা কবিতার আছে যে, প্রেম যখন প্রেমের
ঘারে আসিয়া বা দিল, তখন ভিতর হইতে
প্রশ্ন হইল, কে তুমি ? বাহির হইতে
প্রেম উত্তর দিল 'আমি'। কিন্তু ভিতরের
প্রেম দরজা খুলিল না। আবার প্রেম
আসিয়া ঘারে আঘাত করিল। এবারও
ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে তুমি ?
তোমার নাম কি ? বাহির হইতে প্রেম
উত্তর দিল, "আমি তুমি"। তখন দরজা
খুলিয়া গেল, "and love's mystery told"
—প্রেমের রহস্য বর্ণিত হইল।

"ব্যবধান" নামক আর একটি পরমাস্ফর্য

কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, ভূমি-
আমি'র মধ্যে এতটুকু ব্যবধানের ভার
সহ্য হয় না; “চিরস্থগের স্রীতি’র স্বত্বের
ভার সহ্য হয় না; জ্ঞান ৬র্থ কণ্ঠ
প্রভৃতির আধরণ সহ্য হয় না; এমন কি
মেহের ব্যবধানও সহ্য হয় না।

কবিতাটি পড়িয়াই মনে হইল বৃগল রহস্তের
এমন কবিতা আর কোথায় পড়িয়াছি ?
ল্যাগিনিস্ এবারক্রম্‌বি’র “Emblems
of love” কবিতাটি মনে পড়িল। সেই
কাব্যে অনাদি “He” পুরুষ এবং অনাদি
“She” নারী নিম্নোক্তর দ্বারা আকর্ষণের
রহস্ত আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যত। তারা
বুঝিতেছে যে এক অক্ষরও আনন্দ “আপনারে
হুই করি লভিছেন সুখ”—সেই অষ্টমেরই
ভাষ্য বৈত, পুনরায় সেই অষ্টমেরই হইবার
জন্য তাদের ভিতর হইতে তাগিন্
আগিতেছে। “contrived joy is sex
in life”।

(৫)

কিন্তু এই রহস্তের মেঘলোকই এ
কাব্যের সমাপ্তি হয় নাই। সর্গাবরণমুক্ত
বৃগলের অপূর্ণ রহস্ত-উপলব্ধিতেই কবির
বৃদল প্রেমের গান শেষ হয় নাই। সেই
মেঘলোক হইতে তাঁর প্রেমকে মর্ত্যে
অবতরণ করাইয়া তাকে সফল করা
হয়কার। হুই দিক্ হইতে ‘সফল প্রেম’র
কথা তিনি বলিয়াছেন। এক সফলতা—
সম্মান সন্ততির মধ্যে। প্রেম সেইখানে

চির-অমর। ‘মোহের ছেলে মেহের মাকে
মোহের জীবন ধারা বহে।’ কিন্তু তাঁর
চেয়েও বড় সফলতা যখন প্রেম “বিশ্ব-
চেতন প্রেম” হয়—যখন প্রেম এই কথা
বুঝে যে সর্বমুক্তি বিনা কারো একলায়
মুক্তি নাই। জগতের যত বন্ধন, যত
বেদনা, যত অশান্তি, যত ক্ষুধা, যত হাহাকার
—সেই সমস্তকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে
তবেই বৃগল, বৈত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি
লাভ করে। বৈত হইতে মুক্তি পাইতে
গেলে প্রথমে হৃদের মধ্যে এককে অহুতব
করিতে হয়। কিন্তু এককে অহুতব করার
পর সেই একের মধ্যে বহুর অহুত্ব
আসে। সেই বহুর অহুত্বের কথাই
‘বিশ্বচেতন প্রেম’ কবিতাটিতে আগিয়াছে।

“তোমার আমি বাসবো ভালো

বাসবে ভূমি নোরে

এইতো ছিল কথা—

কোথা হ’তে পড়লো এসে

হারগো কেমন ক’রে

সব জগতের বাধা।”

“পরম অভিব্যক্তি যে প্রেমের সবার আবিষ্করণে
নিবিদ্য স্বরূপে।”

এই বহুর চেতনাতৈই বৃগল প্রেমের
কাব্য সমাপ্ত। অন্তর্যমি এইখানেই
এ কাব্যের পরিচয়ের কথা শেষ করিতে
পারি।

শ্রীঅমিতকুমার চক্রবর্তী।

ভারত-রমণীর অবস্থার উপর যুরোপীয়

সভ্যতার প্রভাব

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

ভারত-রমণীগণের এই প্রকার অবস্থা। পাসো-রমণী বাতীত, অধিকাংশ রমণীই কুল-সংস্কারপন্থা, অজ্ঞ। পুরুষরা প্রায়ই তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করে, তাহারা প্রায়ই হতভাগা ও অ-সুখী।

নারীর অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকেরা খুব উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন।

মৈত্রিক অবস্থা।—এই সম্বন্ধে, লেডি ডকরীনের কাজটাই সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য। কোনও ডাক্তার, মুসলমান মহিলা অথবা

হিন্দু-মহিলায় নিকটে ঘাইতে পারে না বলিয়া, লেডি ডকরীন ভারতের বড়-বড় নগরে, নারীদিগের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন, একটি ডাক্তারী-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই সকল ডাক্তারী হাসপাতালে কাজ করেন, অল্প-পুণে রোগী দেখিতে যান। (১)

মানসিক অবস্থা।—রমণীদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য, কতকগুলি যুরোপীয় ও কতকগুলি হিন্দু মহিলা অন্তঃপুরে বা অন্তঃমহলে বাতাস্ত করেন। কতক-

(১) রোগমত্যা ভারত-রমণীরা,—গাছ-গাছড়া বিহীনতা ও গুহাদিগের শরণাগত হই; বাতীরা “বাই” নামে অভিহিত হইয়া থাকে; বলা বহলা, উহার চিকিৎসাধার ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনজ্ঞ। এই কারণেই, অন্তঃপুরের মধ্যে দুক্কায় হার এত বেশী। তাই “সম্মতসংস্থা রমণীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-অর প্রায়ই হইয়া থাকে। শিশুহত্যা প্রচলিত :—একজন বৃদ্ধা বাই পঁচ পঁচ মবজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া কবুল করিয়াছিল।

লেডি ডকরীনের কাজটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, লাহোর, আত্রা, কলিকাতা, মাদ্রাজ, উমরপুর, অমৃতসর, ধারওয়াদা, মাদপুর, রেজুন, মহীপুর, হইয়াবাব প্রভৃতি স্থানের কার্য “ভারতরমণীর চিকিৎসার সাহায্যার্থ জাতীয় সভা” কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। তাহারা “রোগীদিগের সুস্থায়কর করে তাহারা কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত যথা :—ডাক্তারী (ইংলণ্ডের বা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপাধি); সহকারী ডাক্তার (assistant surgeon এবং হাসপাতালের সহকারী (hospital assistant)।

১৮৯১ অব্দে হাজীর সংখ্যা ১৯৭,৬৬২; সাক্ষর রমণী ৪০৩,৪৯৪; নিরক্ষর রমণী ১২৭,৭২৬,৭০৮। ১৮৯০-৯১ অব্দে, মুন্সের হাজীর সংখ্যা। ব্রজদেশে (৬৮,৪৪০); আসামে (৮,৭০৯); বঙ্গদেশে (১০,৩,০৬১); সম্মিলিত প্রদেশে (২১,০১৪); পঞ্জাবে (২৩,০৭০); ঘোষাইএ (১৯,৭৪৪); মধ্যপ্রদেশে (১১,২০৮) মাত্রাজে (১২৮,০৭০)। মুন্সে-বাগড়া বালিকা ও বালকের অনুপাত :—মুন্সেগাঁও কলিকাতার মধ্যে (১ হইতে ১০৭); বেঙ্গলী মুন্সেগাঁওর মধ্যে (১ হইতে ১,০৯); পাসোদিগের মধ্যে (১ হইতে ১,০৪) হিন্দুদিগের মধ্যে (১ হইতে ১০,৪৭); মুসলমানদিগের মধ্যে (১ হইতে ১১,১২); বঙ্গ-মুসল-মানদিগের মধ্যে (১ হইতে ২০,৯৯)।

গুলি ভাষ্যভাষী তাহাদের মেয়েদিগকে মূল কিংবা কালেক্টে পাঠাইয়া থাকেন। অবশ্য শিক্ষার কাজ খুব মন্থর গতিতেই চলিতেছে। ১৮৯১ অব্দে শতকরা ১০০ জন হিসাবে ২২, ৪২ জন একেবারেই নিরক্ষর। ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে ৪২৪, ৭৬৯ জন বালিকা সরকারী কিংবা বেসরকারী স্কুলে গমন করে; ১৯০০-১৯০১ অব্দে ৪২৯, ৬৪৪ জন। সেই বৎসরেই ৪৫, ৬০৬ জন বালিকা মাধ্যমিক শিক্ষা, ১৭১জন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। পক্ষান্তরে কতকগুলি ভারত-মহিলা ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় এম্ব লিখিয়াছেন। (২) অনেকগুলি সংবাদ-পত্র কেবল রমণীর দ্বারা পরিচালিত, তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য “বাকালী” *

সামাজিক অবস্থা।—শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে, অবশ্যে ততটা কড়াকড় ভাবে রক্ষিত হয় না। রমণীরা ঘিরেটাতে গিয়া পরাধো-বেস্তা “বাল্লী”-আসনে উপবেশন করে; উহাদিগকে রাত্তার বেথা যায়, দোকানে বেথা যায়, সরকারী উদ্ভানে বেথা যায়, প্রেমশর্শিতে বেথা যায়। উচ্চবর্ণের রমণীরা যে অবগুষ্ঠন ব্যবহার করে তাহা ততটা লম্বা নহে, ততটা মোটা নহে। পার্শ্ব-রমণীরা বোম্বাই-নগরে একটা ক্লব

স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতায় কতকগুলি হিন্দু-মহিলা গাড়ী হাঁকান, ঘোড়ার চড়ে, ছোট্টোলে আহার করেন, বড়লাটের অভ্যর্থনা-সভায় গমন করেন।

রক্ষণশীল দলের লোকেরা এই যুরোপীয় রীতি-নীতির অহঙ্করণ চুপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি মাত্রাজের কোন-এক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল (১৮৯৩):—

এই যুবকবৃন্দ ক্যাশানের ভক্ত, লম্বু আয়োজ-প্রমোদের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহারাই এমন ভাবে নিজ পত্নীদের শিক্ষা দেয় বাহাতে তাহারাই তাহাদের বোণা সঙ্গী হইতে পারে। তাহারাই স্ত্রীর সহিত একসঙ্গে উপভাস নাটকাদি পাঠ করে এবং এইরূপ ধরণের উপভাস ও নাটক বাহাতে অতীব হীনচরিত্র নায়কের প্রেমশীলা অতি উচ্ছল কর্ণে চিত্রিত হইয়াছে; নির্দোষ অন্নবয়স্কা বালিকাদিগের কচি কসুমিত করিবার ইহা অপেক্ষা উত্তম উপায় আর কি-হইতে পারে? ইহাই সব নহে। তাহারাই আপন স্ত্রী-দিগকে যুরোপীয় বেশ-ভূষার ভূষিত করে,

(২) “হিন্দুযুবকের শিক্ষাক্ষেত্র কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মারী-সমিতি,” ১৮৯১ (১০০ হাজ ১৮০০ অব্দে “চর্চ-বিশদারি সোসাইটির ক্লব” এবং “গভন-বিশদারি সভা”। Drinkwater Bethune কর্তৃক বেথুন-ক্লবের প্রতিষ্ঠা (১৮৪৯); ১৮৫৭ অব্দে এই ক্লব সরকারী স্কুলে পরিণত হয়। হিন্দু-মতান্তর দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ১১৪) M. Bose কতকগুলি হিন্দুহিলার দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন তাহারাই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমিডিস্যাক করিয়াছিলেন, যথা:—অক্যুটাই, যিনি মধ্যভারতের এক রাজ্য শাসন করিতেন; নাটোর-রাষ্ট্রের রানী ভবানী, ইত্যাদি Calcutta Review Vol LX. P. 56 এবং LVI, P P. 10-27 ত্রিখ্য)।

* এ সংবাদটি আশ্বিনের বিকট ও দুই মৃত্যু—হয়েছে বাহু এ সংবাদ রাখেন কি?—অনুবাদক।

এবং একসঙ্গে বিদেশী পাণ্ড ভোজন করে—এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আমাদের এই তথাকথিত অগ্রসর যুবকেরা তাঁহাদের নব্যতায়ে নীকিত পরীক্ষাকে অতিমাত্র প্রভর দেন : সুতরাং তাঁহাদের পত্নীরাও পরিবারের অন্তর্গত অন্য আত্মীয়দিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা রান্না এবং অস্ত্রান্ত ঘরকন্নার কাজকে মজুরের কাজ মনে করেন। তাঁহারা কতকগুলি সহচরীর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া নব্য কেতার সাজগোজে আপনাদিগকে বিভূষিত করিয়াই কালযাপন করেন। ঐখানেই কখন ডান-পাশা খেলিয়া, কখন বা গল্পের বই পড়িয়া সময় কাটান। কাজে-লাগিবার মত যদি কোন কাজ কখন করেন তো সে পশমী টুপি ও গলাবন্ধ শেলাই করা;—তাও আমোদের হিসাবে করেন, এয়োজনের হিসাবে নহে। এই সকল জিনিষ পরিবার-মণ্ডলীর মধ্যে প্রায় কখনই ব্যবহার হয় না। ঐ সকল জিনিষ উপহারস্বরূপ বন্ধুবর্গকে বিতরণ করা হয়।

এই তথাকথিত “জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত” মহিলাদিগের আচরণ গিরিদিগের চোখে বড়ই খারাপ ঠেকে এবং এইরূপে গৃহের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। পরিবারের অন্তর্গত অন্য রমণী, তাঁহারা “আলোক-প্রাপ্ত” ধাঁচার লোক নহেন তাঁহারা কেবল ঘরকন্নার কাজেই ব্যাপৃত থাকেন। সুতরাং কেতা-ছবত মহিলারা যে-সব কাজে হাত না দেন সেই-সব কাজ অগত্যা, গৃহীণীদের হৃদয়ে আসিয়া পড়ে...

* যে-সব গুণের অন্তঃস্থ • হিন্দু-রমণীরা

প্রসিদ্ধ তাহা একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। যেখানে আত্মীয়দের প্রতি, পাড়া-প্রতি-বাণীদের প্রতি মমতা ছিল, সেই মমতার স্থান স্বার্থপরতা আসিয়া অধিকার করিয়াছে; শুক্লজনের প্রতি, যেখানে ভক্তি ছিল, সেখানে ঐক্যতা আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের যে পরিচ্ছন্ন ধর্ম্মাহুতানের উপযোগী ছিল, তাহার স্থান, বিলাতি বেশভূষা আসিয়া দখল করিয়াছে।*

প্রাচীন গুণের হিন্দুরা এইভাবে চিত্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে প্রাচীন মতে শিক্ষিতা ও পরিবর্তিতা রমণীগণের প্রতিকূলতা যতটা প্রবল, পুরুষদিগের প্রতিকূলতা ততটা প্রবল নহে।

উন্নতির পথে অগ্রসর কোন এক সংবাদপত্র এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন :—

“নারীর অবস্থার উন্নতিসাধন করা যে কি শুক্লতর ব্যাপার, তাহা শুধু যুরোপীয় ইতিহাস হইতে নহে, পরন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু নিজের অমর্যম সমাজসংস্কার-চেষ্টার অভিজ্ঞতা হইতেই দেখিতে পাইবেন। ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকের পক্ষে যে তীব্র প্রতিবন্ধক আছে তাহা জ্ঞানান্ধ শাস্ত্রের আদেশ কিম্বা জ্ঞাতের বাম-খেয়ালী শাসন-নিয়ম ততটা নহে যতটা আমাদের রমণী-দিগের অজ্ঞতা। শিক্ষিত পুরুষেরা, কি শাস্ত্র, কি জ্ঞাত হইরের কোনটাতোই আবদ্ধ নহে; সমাজ-সংস্কারের অন্ত তাঁহারা উভয়কেই অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু গার্হস্থ্য হৃৎকের বিনিময়ে স্বকীয় শ্রীতি-ভাজন ও তত্ত্বিতাজন আত্মীয়দের শুভকামনা ও সাহচর্যের বিনিময়ে, নূতন-কিছু

প্রবর্তিত করা,—খুব বেশী আত্মবলিদানের কাজ বলিয়া তাহার মনে করেন; বস্তুত তাহার মনে করেন, ঐরূপ নূতন-কিছু করার কোন ফল হইবে না। শিক্ষিত পুরুষদিগের দ্বারা শিক্ষিতা রমণীগণ সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিতে কেন না পারিবেন—না বুঝিবার কোন হেতু নাই। কেবল যদি আমরা ভারত-রমণীদের শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করি, তাহা হইলে অল্প বাধা-বিঘ্ন আমাদের পথ হইতে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইবে। হিন্দু-সমাজ—একটা প্রকাণ্ড প্রাণমূর্ত্ত অঙ্গপিণ্ড; উতাকে নড়াইতে হইলে, অনেকটা জ্বরগা লইয়া খুব একটা ঠেলা দেওয়া আবশ্যক। বতই সাহসী ও উৎসাহী হউন না কেন, চুই-একজন লোকের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না; সুবিধাবোধ বা ব্যক্তিগত গর্বও আমাদের সমাজকে নড়াইতে পারে না। সমাজের মধ্যে একটা নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইবে; সমাজের মধ্যে প্রাণ-শক্তি আবার ফিরিয়া আসা চাই। কিন্তু বতদিন না রমণীরা সংস্কার ও উন্নতির পথে পুরুষদিগের সচিব একত্র চলিয়া পুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিবেন, ততদিন ইহা কখনই ঘটবে না”। (Hindu 1889)।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে, নব্য হিন্দুদিগের সংস্কার-চেষ্টার মর্মভাবটা আমরা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, “পজিটিভিটি”-সম্প্রদায়ের নেতা M. Ghoseর গ্রন্থ হইতে কিরূপে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“আমাদের বর্তমান অবস্থার, এই কথাটা উপেক্ষা করিলে চলিবে না যে, আমাদের অতীত ইতিহাসের বৈধ পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি পাইব বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। এবং আমাদের চিন্তা আমাদের অবস্থার উর্ধ্বে সমুথিত হইলেও, যদি সেই সকল চিন্তা ও উচ্চসূহা আমাদেরিগকে একেবারে ভালাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের ধর্মের নিকট আমরা খাটি থাকিতে পারিব না। আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, সমস্ত জগতের আশীর্বাদস্বরূপ যে “পজিটিভিজম” সেই “পজিটিভিজমের” খাতিরে আমরা সেই সব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বাহ্যদের মধ্যে অতীতকাল, বর্তমানেও সজীব ও সচল রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের দেশের সেই সব অধিকাংশ লোক—বাহ্যদের নিকট যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, এবং বহুকাল পর্যন্ত অপরিচিতই থাকিবে। নিকটকালে আমরা আপন সমাজ হইতে এইরূপ পৃথক্ হইয়া থাকিতে দিব না। শুধু তাহা নহে,—বরং চারিকোটি লোক দ্বারা আমাদেরিগকে বিরীতা আছে, আমাদের নিজের ভাবার দ্বারা কথা কহে—সেই সব লোকের উপর আমাদের সমস্ত দেহমমতা কেন্দ্রীভূত করিব। আমাদের বিবেচনার আমাদের এই প্রশ্নবাসীরা বতই পশ্চাদবর্তী হউক না কেন, পজিটিভিজম আদিতা আমাদেরিগের সমস্ত ঐক্যটাকে যে বিচলিত করিয়া তুলিবে তাহার কোন সার্বকতা দেখা যায় না। পশ্চাত্যের সহিত সম্মতি

একা স্থাপনের অনিশ্চিত ও সংশয়াজ্ঞক লাভের ভয়, আমাদের নিজেদের জঘাট্ট ঐক্যকে বিচলিত করা আমরা আবশ্যিক মনে করি না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের অনেক অসুবিধা আছে। যুরোপীয় শিক্ষা-নীকার সহিত আমাদের সংস্পর্শটাই আমাদের সেই শক্তিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে যে শক্তির দ্বারা আমরা—কোৎ হাফাকে বলেন “সহজাত প্রবণতা”, আমাদের স্বদেশবাসীর সেই সহজ প্রবণতা-সমূহের উচিত মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণ করিতে পারি। ঐ প্রবণতাগুলির মধ্যে একটা কষাকষির টান অহুভব করিয়া, আমরা তাহাদিগের হঠতে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। তাই পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যতীত ঐ সকল প্রবণতা স্বাধীন ভাবে কিরূপে পলিটিজনে আসিয়া মিলিত হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করিতে পারি এরূপ আমাদের অবস্থা নহে; তাহাদের ক্রম উন্নতিসাধনকল্পে আমরা কিরূপ সাহায্য করিতে পারি, সে বিষয়ে কোন কিছু স্থির করাও আমাদের পক্ষে আরো দুঃসাধ্য...

সে ঘাই হোক—যদি আমরা মনে করি, আপাতত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ‘অচর্যের মধ্যেই আমাদের কাজটাকে বদ্ধ রাখিব, তাহা হইলে দেখিব এই সমস্তার জটিলতার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। কারণ, আমরা যে সমাজ ও গবর্ণমেন্টের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, সেই সমাজ ও গবর্ণমেন্টের গভীর মধ্যে থাকিয়া, যদি আমরা প্রত্যেকে, প্রকৃত পলিটিজিটের মত জীবন যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লোকেও নিকট এই

সমস্যা-প্রশ্নের একটা ভাল-রকম উত্তর দেওয়া হইবে। হিন্দুধর্ম ও পলিটিজিট ধর্মের দ্বারা দুই অতি বিভিন্ন উপাদানকে যদি আমাদের জীবনে আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সুবিধা মিলন স্থাপিত হইয়া বেশ একটা কাজ হইবে।” (কটনের New India গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ-১৭০)

• •

এক্ষেণে, টেনিংসন সভ্যকোতে ভারতীয় সমাজে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার অহস্কানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক! এই পরিবর্তনের দুইটি স্পষ্ট কারণ দেখা যায় :— এই সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ; এবং ইংলণ্ডের ও যুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব। বতই জটিল হউক না কেন, এই পরিবর্তনের উপর একটি তথ্যের আধিপত্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় :—প্রাচীন সমাজের ঐক্যত্ব যে “পরিবারতন্ত্র” সেই পরিবারতন্ত্রের স্থান, অর্ধপ্রাচীন সমাজের ঐক্যত্ব যে “ব্যক্তিত্ব” সেই ব্যক্তিত্ব আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

পরিবার বা বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করিবার জন্য—তাহীদের পদমর্যাদাক্রম বজায় রাখিবার জন্য, বর্ণভেদ-পদ্ধতি কতকগুলি স্তম্ভাশ্রয় নিয়ম স্থাপন করিয়াছিল। খুব প্রাচীনপন্থাদিগের নিকট এই সকল নিয়ম, আধিকার মিনে, অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, নব্য হিন্দুদের চক্ষে ঘৃণিত ও হাতজলক বলিয়া মনে হয়। বংশের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য, বংশের

মর্যাদাব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য পিতৃপ্রভুত্ব, অ-বিভক্ত স্ববাধিকার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আলিয়ার দিনে, ভায়ে-ভায়ে পৃথক্ হইতেছে, পিতা-পুত্র পৃথক্ হইতেছে। একপক্ষে বাগ করিলেও, এই সম্মিলন তাহাদের নিকট ভারবহ বলিয়া মনে হয়। একপক্ষে খাড়া সম্বন্ধে অনেক আপত্তি করেন; উহাতে করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তম-চেষ্টা অক্ষাৎ হইয়া পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ-গুণ বা শক্তি-সামর্থ্য বিলুপ্ত হয়। এতাবৎকাল কোলিক^১ রীতিনীতি, কোলিক পূজা-পদ্ধতি বলার রাখাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, উহার নিকট ব্যক্তি-বিশেষের গুণ ও প্রতিভা নগণ্য ছিল।

কিন্তু আলকাল নারীর কালসম্বন্ধে সমাজসংস্কারকদের বেক্ষণ মতামত, তাহার মধ্যে এই সকল নূতন ভাবের চিহ্ন আরও স্পষ্টরূপে অঙ্কিত দেখা যায়।

অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ হয়— ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কি জন্য এই ব্যবস্থা? কারণ, বেশী বয়সে তাহারা নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে চলিবে, তাহা হইতে অযোগ্য নিলন সংঘটিত হইবে, এবং এই-অযোগ্য মিলনের ফলে, বর্ণভেদ-পদ্ধতি বিরূপ হইবে।

শাস্ত্রে বহুবিবাহ অনুমোদিত। কেন অনুমোদিত? কারণ, কোলিক ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত পুত্রের অধিষ্ঠান একান্তই আবশ্যক;

প্রথম বিবাহে পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পরিবারের কর্মী অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন।

শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। কি জন্য নিষিদ্ধ? কারণ, বিবাহ মনঃসংস্কারের মতো একটা সংস্কার,—সকীর্ণেক্ষা পবিত্র অনুষ্ঠান। বিবাহের দ্বারা কস্তা, স্বকীয় ধর্ম হইতে, গৃহদেবতা হইতে, গোত্র হইতে তফাৎ হইয়া পড়ে; সে নূতন ধর্ম, নূতন গৃহ-দেবতা, নূতন গোত্র গ্রাপ্ত হয়। এবং এই একই বিবাহিতা কস্তা, বে-পত্নীর অনুষ্ঠানের দ্বারা সতিবংশের সহিত বিবাহবন্ধনে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়াছিল সে-সমস্ত বিশ্বত হইয়া আল কিনা সে অল্প গৃহের দেবতাকে বরণ করিবে?

কিন্তু নারী এই তিন নিষেধকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, এইরূপ সমাজ-সংস্কারকেরা ঘোষণা করেন। কাহার নামে তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন?— স্বাধীনতার নামে, মানব-গৌরবের নামে তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন। শাস্ত্রাবিরি আরও এই কথা বলেন:—নারীগণের স্বকীয় হইবার যে-অধিকার আছে সেই অধিকারের নামে, তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন।

বংশের উদ্দেশে, সমস্ত সমাজ-পদ্ধতির উদ্দেশে, নারীকে বেক্ষণ বলিধান করা হয়, তাহা অনেক ভারতবাসী একপক্ষে ঘোরতর অপরাধ বলিয়া মনে করে। (৩)

শ্রীমোতিবিন্ধ্যনাথ ঠাকুর

(৩) কৌতের "পরিচিৎ কিলভাক" হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রের এই ভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনটি দেখ করিব। (পঞ্চম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩০)

"এই দাবীকৌমিকতা। দুর্দান্ত পরিবর্তন স্পষ্টরূপে পণ্ডিত্য এবং চরিত্রের পদ্ধতিগত দৃষ্টিতে ও পত্নীরূপে বহুপুত্র; ইহা হইতে আমাদের এইরূপ তাহা উচিত যে, ঐহার অনুবিধা বর্তী হউক নী

খ্যাতি

(পদ্য)

রাতি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও বেলা নাই! এক অনিশ্চিত
মিতির কুলদরক দ্রুত আলিঙ্গা বাড়ীর মধ্যে ভয়ে মায় প্রাণ পাফিয়া থাকিয়া কানিয়া
প্রবেশ করিল। মা জানালার ধারে উঠিতেছিল। বাপ বিছানার অন্ত ছেলেদের
বসিয়াছিল—এতখানি রাতি হটরাছে, ছেলের লইয়া শুইয়াছিল; বোন্ কিটী একখানা

কেন্, জাতের অত্যাধিক্যে, মানবজাতির প্রধান অয়োজনগুলির সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য ছিল।
কলত ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, কি সামাজিক, কি মানসিক সকল বিষয়ের মূলগত ক্রমবিকাশের
একটা পূত্রপাত আবশ্যক ছিল। গ্রন্থমতঃ পট্টই বেলা যায়, উহা বতঃক্ষুণ্ণ; কারণ, আধিন কালে
ইহাট খুব স্বাভাবিক যে, ব্যবসায়ের বৌলিকতা পার্হা অসুকরণের দ্বারা, নিজার একটা সহস্র ও প্রবল
উপার হইয়া দাঁড়াইবে। তখনকার কালে এই উপায়টিই ত্রুণা ছিল।

আবার জ্ঞানের দ্বারাই তখন সমস্ত ঐতিহ্য বংশগতশরীর সংক্রামিত হইত...

বিত্তোরঃ এই বতঃক্ষুণ্ণ বাড়ীত এই আধিন পদ্ধতির যে কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, তাহাও
নির্দিষ্টভাবে বোঝার করা ঘাইতে পারে। বিচার ও আচারের মধ্যে ঐ পদ্ধতি একটা-যে গিরদ্বারী সর্বোচ্চ
বিভাগ স্থাপন করিয়াছিল, মানসিক ক্রমবিকাশ তাহার দিকট চিরকণী। একটা চিরদ্বারী 'প্রাত' একটা
বিশেষ একাত্তের উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেই সময় মানসিক ক্রমবিকাশের পূত্রপাত করিয়াছিল। কালের
পুষ্ঠিতা ও বারোবাহিকতা সম্পাদনের দ্বারা যে পরমধাণা ও অমর আবশ্যক, উক্ত প্রাত বস্তাবতই সেই
পরমধাণা ও অমর লাভ করিয়াছিল।

সামাজিক দৃষ্টিবৃত্তি হইতে দেখিতে গেলে, আধিনকালে এইরূপ পদ্ধতির সুবিধাও কম পরিস্ফুট
নহে। প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে, হাতিবই উহার প্রধান ধর্ম পট্টই বেলা যায়। কি আভ্যন্তরীণ, কি
বাহ্য সকল একরূপ জীবন আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে বা সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, বহু প্রকার
সতর্কতার উপার অবলম্বন করা ঘাইতে পারে তৎসমগ্রই যথাসম্ভব প্রকৃত উদ্ভব সহকারে প্রবর্তিত
হইয়াছিল। অন্যতরে, বিস্তৃত বহু-প্রাতগুলি, আসলে পরস্পর-বিজ্ঞিত,—পুরোহিত-প্রাতের অধীনেই,
তাহারা একটা সাধারণ ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কারণ তাহারা সকলেই মানাশ্রমকার অত্যধ
অনুভব করিত, এবং একমাত্র পুরোহিত প্রাত হইতেই তাহাদের বৈশ্বিক অত্যধ বোধন হইত; পুরোহিত
প্রাত হইতেই তাহারা প্রতিদিন জ্ঞানের আলোক ও কর্ণের উজ্জীর্ণা লাভে করিত, সকল বিষয়েই
পুরোহিত প্রাতের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের একবাক্যও চলিত না। পরে এই সর্বোচ্চ প্রাতের মধ্যে
বেতন পতীর ভাবে ও ভীতভাবে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল এরূপ আর কুমারি দৃষ্ট হয় না।

এই স্রেষ্ঠ প্রাতের অন্তর্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তি, অন্তত পুরোহিত-প্রাতের অন্তর্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তি, শুধু
পুরোহিত ও নগরপালের কাছ করিত না, পরস্পর পণ্ডিত, কলাবিৎ, শিল্পী ও চিকিৎসকের কাছও করিত।

এই সকল উত্তরগণসভাও ইহা নিশ্চিত,—এই পৌরোহিতিক পদ্ধতি, সকল বিষয়েই মানব-ক্রমবিকাশের
একটা পূত্রপাত করিয়া দিয়া,—পরে উহাই আবার চরম উন্নতির,—মানসিক বা সামাজিক উন্নতির বিষয়েই
হইয়া উঠিল। অতিমাত্র হাতিববর্ধ-প্রকৃত এই পদ্ধতি ক্রমশঃ একত্রে ধরনের ল-গনিস্থতাই দিকে
পুষ্ঠিকিয়া গড়িল। উন্নতির নতুন নতুন বিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, নতুন সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের
যে আবশ্যকতা আছে তাহা উহার বারিগার আদিল না।

নভেলের শেষ পৃষ্ঠাকবরখানার উপর সমস্ত মনটুকুকে চালিয়া দিয়াছিল।

মিতিয়া আসিয়া দাঁকিল, “না।”

মা চমকিয়া মিতিয়ার পানে চাহিল। মিতিয়ার মুখ উত্তেজনার ভরা; চুলগুলো কন্দ, গর কল্শিত। মা বলিল, “কি রে, বাপার কি? এতক্ষণ তুই ছিলি কোথায়, বল দেখি?”

“ছিলুম কোথায়!” মিতিয়া কহিল, “আশ্চর্য! কিছুই জান না? কোন খবর পাওনি! বল কি,—সারা রাত্টিতে এ খবর রটে গেল, আর তুমি, আমার মা, তুমি সে খবর জানো না!”

বিস্ময়ে মা মিতিয়ার পানে চাহিয়া রহিল। কিটী নভেল ফেলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া মিতিয়ার কাছে আসিয়া ঠাড়াইল—বাপও নশারি তুলিয়া মুখ বাড়াইয়া ছেলের দিকে চাহিল।

কিটী বলিল, “হয়েছে কি, দাদা? তোমার চেহারা যে ভুতের মত দেখাচ্ছে!”

“ভুতের মত!”

মা বলিল, “তা না ত কি! চুলগুলো উত্তো-পুত্তো, মুখের সে ঐ নেই! বাপার কি, বল ত!”

মিতিয়া বলিল, “বংশের মুখ আজ আমি উজ্জ্বল করেছি, মা। বড় সৌভাগ্য আমার। সারা রাত্টিয়া আজ আমার নাম-জেনেছে। কে জানত রাত্টিয়ার কোন্ কোণে কোথায় মিমিড্রি কুল্লবরফ বলে কেউ থাকে কি না! কিন্তু এখন রাত্টিয়া আমার নাম জানে, ঠিকানা জানে, সব জানে। ওঃ—”

মিতিয়ার উচ্চহাসে ছোট তাইগুলির

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা বিচিত্র কুলবরফ ছড়িয়া দিল। বাপ বিছানা ছাড়িয়া মিতিয়ার কাছে আসিয়া কহিল, “কি হয়েছে, সব খুলে বল দেখি!”

“কি হয়েছে—! পৃথিবীর খবর তোমরা কোনদিন রাখলে না ত! জানবে কি, কি হয়েছে! আর এই কিটী, রাজ্যের বাজে নভেল পড়ছে শুধু, খবরের কাগজ কোনদিন ত একখানা পড়লে না! দেশ-বিদেশের যত বড়বড় খবর তাতে বেরুচ্ছে! যেখানে যে যত ঘটনা ঘটছে, খবরের কাগজগুলোয় অমনি তা ছেপে দিচ্ছে, আর পৃথিবীর সে খবর নিমেষে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুই আর কোথাও চাপা থাকছে না। যত বড় বড় লোকের খুঁটিনাটি খবর ছেপে বেরুচ্ছে আর দিক্-বিদিকে সে খবর রটে যাচ্ছে—”

বাপ বিরক্ত স্বরে কহিল, “নে, পাগলামি করতে হবে না আর, হাত হয়েছে, শুণে যা। সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আবার পাগলের মত বকুছিস, লজ্জা করছে না?”

“লজ্জা! এই দেখ তব পড়ে। কি লিখেছে, পড়। সমস্ত রাত্টিয়া এ কথা জানে, আর তোমরা জানো না! নাও, পড়—পড়ে কাগজখানা তুলে রেখো, যোগ একবার করে সকলে পড়ব। মিতিয়া কুল্লবরফ কত বড়লোক তা এ খবরের কাগজ পড়লেই বুঝতে পারবে।”

মিতিয়া একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া বাপের সম্মুখে ধরিল—একটা জারগা বেথাইয়া কহিল, “এই যে এইখানাটার লিখেছে। পড়, টেটিয়ে পড়। আচ্ছা, কিটী, তুইই পড়, বাকি থাকে শুনিয়ে পড়ে যে।”

কিটা পড়িতে লাগিল, “২৭এ ডিসেম্বর রাত্রি” এগারটার সময় নিমিত্তি কুলদরফ নামে এক তরুণ যুবা—”

বাধা দিয়া মিত্তিয়া কহিল, “নিমিত্তি কুলদরফ—কোনছ? দেখছ ত—হাঁ, নিমিত্তি কুলদরফ—তরুণ যুবা—কিরকম মিলে আছে, দেখ—”

কিটা আবার পড়িতে লাগিল,—“নিমিত্তি কুলদরফ নামে এক তরুণ যুবা একটা সরাই হইতে বাহির হইয়া আসে। মদ খাইয়া মত্ত অবস্থায়—”

“এখানটার একটু রং ফলিয়েছে তবে আসলে ঠিক আছে। সরাই বটে, মদও বটে,—তবে সিমেন আমার সঙ্গে ছিল, সে জানে, তেমন মত্ত অবস্থা নয়—পড়ে বা, কিটা, পড়ে বা—”

“—আসিতে আসিতে দুবরার সাঁকোর কাছে পৌঁছিলে হঠাৎ কেমন বেটকরে তাহার পা পিছলাইয়া যায়। সাঁকোর উপর দিয়া তখন একখানা ঠিকা গাড়ী আসিতেছিল। পা পিছলাইয়া কুলদরফ একেবারে সেই গাড়ীর ঘোড়ার পায়ের তলায় গিয়া পড়ে। গাড়ীর গাড়োয়ান অতিক্রমে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইবার চেষ্টা করে! ঘোড়া কেমন ভড়কাইয়া কুলদরফকে লাথি মারিয়া উর্জ্বাসে গাড়ী লইয়া ছুটিতে থাকে—পুলিশ অনেক কষ্টে সে গাড়ী থামায়। পরে কুলদরফের কাছে আসিয়া পুলিশ দেখে, বেচারী ঘোড়ার চাটু খাইয়া মুজ্জা গিয়াছে। তখন পুলিশ কোন মতে কুলদরফের দেহটাকে টানিয়া তুলিয়া নিকটে এক ডিস্পেন্সারীতে লইয়া যায় এবং

ডাক্তারকে দিয়া পরীক্ষা করায়। পরীক্ষার দেখা যায়, ঘোড়া কুলদরফের বাড়ির নীচে একটা চাটু মারিয়াছে—”

কিটা সহলা মিত্তিয়া মিত্তিয়ার নিকে চাহিল। মা সময়েই কুলদরফের বাড়ি হাত রাখিলেন। কুলদরফ সরিষা আসিয়া কহিল, “আমার বাড়ি দেখতে হবে না—বাড়ি কি পাবে কিছু? খবরের কাগজেই সব খবর পাবে খন। পড়, কিটা, পড়—”

কিটা পড়িতে লাগিল,—“আবার সামান্যই। কুলদরফের তেমন চোট লাগে নাই। বেচারী খুব রক্ষা পাইয়াছে। চাটু যদি আর একটু সরিষা লাগিত তবে বেচারার মাথার গুলি কিছুতেই রক্ষা পাইত না, ফাটিয়া গাইত।”

“হাঃ, হাঃ হাঃ!” উচ্ছ্বাস করিয়া মিত্তিয়া বলিল, “বুঝলে মা, আমার বাড়ি ডাক্তার বরফ লাগিয়েছিল। ওনলে ত, দেখলে ত সব? কি ভাবছ? বংশের দুখ উজ্জ্বল করিনি? খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে গেছে। আর চাও কি? সারা রাশিয়া আমার নাম জেনে কেলেছে। আর আমার কিসের ভাবনা! হাঃ হাঃ হাঃ, নিমিত্তি কুলদরফ এখন সকলের জানা, সকলের চেনা লোক। সে, সে, কিটা, কাগজখানা পাকানু নি, নষ্ট হয়ে যাবে,—কাগজখানা দে। মাকারফের পড়িয়ে আনিগে—তবে আইভালককে এখনো দেখানো হয় নি। নাতালিয়া বলে আছে—তাকে বলে এসেছি, নীপসির আসছি, মত্ত খবর আছে! সে হরত শুতেও যায় নি—”

আলাদিন তুতে ঘাছিল—এ কথা শুনে সেও
নাভালিয়ার সঙ্গে বসে আছে।*

কোনমতে কথার ঝড়, বহাইরা কিতাব
হাত হইতে ধবরের কাগজখানা টানিয়া

লইয়া কাহাকেও কোন কথা বলিবার
অবসরমাত্র না দিয়া মিতিরা ছুটিয়া ব্যহির
হইয়া গেল। *

প্রিয়মহাত্মার আত্মবী।

ভাঙ্কর্য্য

শিল্পকলার অনন্ত-রসের সন্ধানে মানুষ
ভিরবিন সাধনা করে আসছে। কোনো
শিল্পী সে-পথের বহুদূর এগিয়েছেন, কেউ-বা
শিখিয়ে আছেন, আবার কেউ-বা মোটেই
অগ্রসর হতে পারেননি। আমাদের দেশেও
বহু প্রাচীন কাল থেকে কলাবিজ্ঞান এই
সাধনা চলে এসেছে। মকেমাকে কোন
কোন স্থানের শিল্পের পুরোপুরি সন্ধান পাওয়া
যায় না বটে, কিন্তু এখনো ভাঙাচোরা
টুকরো-টুকরো স্থিতি বা চিত্র বা ভারতবর্ষের
নানান স্থানে ছড়িয়ে আছে তার মধ্যেই ঐ
সাধনার ইতিহাস বাঁধা পড়ে আছে। শিল্পের
এই সাধনার পরিচয় বিশেষ-করে আমরা
পাই ভাঙ্কর্য্য ও চিত্রের ভিতরে। ভারতীয়
চিত্রের খবর প্রাচীন কালের মধ্যে যা-কিছু
পাওয়া যায় তা অজ্ঞতা, বাঘ ইও গ্রামগড়ের
সেহালার গারে আঁকা ছবিগুলি থেকে।
ভাঙ্কর্য্যের নিদর্শনও ভারতের প্রায় সর্বত্রই
কিছু-না-কিছু ছড়িয়ে আছে, এক-নিঃশাসে
সেগুলির নাম করা শক্ত। এই ভাঙ্কর্য্যের
নিদর্শনগুলি অবিকৃত অবস্থায় না থাকলেও

এগুলিতে শিল্পীদের রসবোধ ও কলাকৌশলের
যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ঘোঁটাসুটি দেখতে গেলে দেখা যায়
আমাদের দেশের ভাঙ্কর্য্য একটা conven-
tion বা একটা বাঁধি প্রথার দ্বারা শাসিত।
আটকে কখনও একটা প্রথা দিয়ে বাঁধা
চলে না সভ্য, কিন্তু তেবে দেখলে দেখা
যায় যে, আটের বিকাশের পক্ষে এই প্রথা
একটু সহায়তা করে। আট সেখানে
এই বাঁধা প্রথার চাকর নয়, এই বাঁধি
প্রথাই তার ভাবে। শিল্পের এই বাঁধি
প্রথার মত Symbol বা রূপক-চিহ্নকে
আটটি অনেক সময় বাধ দিতে পারেন
না। কেননা এই রূপক-চিহ্ন শিল্পীর ভাব-
প্রকাশের অনেক সহায় হয়। অনেকস্থলে
শিল্পীরা সেটার ওজনমত ব্যবহার করে
ভাবের চাবি খুলে দিয়ে থাকেন। তাই
দেখা যায় কবিকেও এই রূপকচিহ্নের আশ্রয়
নিতে হয়েছে। কবি যেমন বেগু, বীণা, তরী,
তুফান, আলো ও অন্ধার প্রভৃতি কথাগুলির
ব্যবহারের দ্বারা সেগুলির প্রচলিত অর্থকে

* * আদম্ শেকত হচিত পর হইতে।



এলিফেন্টার ত্রিমূর্তি

অতিক্রম করে তাঁর ভাবেরই অতিবাস্তি
আগিয়ে তোলেন, তেমন শিল্পীরাও পদ্ম,
শঙ্খ, বস্ত্র প্রভৃতি এবং বিশেষ বিশেষ
মুদ্রার সংকেতে অনেক কথাই হুটিয়ে তুলতে
পারেন। আমাদের দেশের মূর্তিমান
Conventional শিল্পের সূক্ষ্মস্বরূপ ধ্যানী
বুদ্ধের যে-কোন প্রতিমূর্তি দেখতে, দেখা
যাবে যে সেগুলি করি-কটি, বৃন্দাবন,
শীলগ্রাম মহাবল্লভ ইত্যাদি স্থান ছাড়া বা

ধাঁচায় বাধা পড়লেও
সেগুলি বুদ্ধের বুদ্ধ
প্রস্তুতি করবার পক্ষে
বিশেষ সহায়তা করেছে।
কিন্তু বাধা প্রথা যখন
আবার আর্টের পায়ের
বেড়ির মত হয়ে পড়ে,
তখন তার পরিণাম বড়ই
শোচনীয় হয়। তার
সাক্ষী আমাদের দেশের
মুদ্রার প্রতিমাগুলি।
সেগুলি আবহমান কাল
একই ছাঁচে দেখা দিতে
এবং পুরোহিতেরা তাতে
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেও
প্রাণের কিছুমাত্র পরিচয়
দিতে না। আবার,
আমরা প্রাচীন ভারতের
মধ্যেও যখন সিংহলের
কপিল ও কোন তামিল
নাথুর মূর্তি পাথরের গায়ে
খোদাই করা দেখতে
পাই, তখন দেখি এই

বাধা প্রথার মায়া-কাল কাটিয়ে শিল্পীরা
কত-বড় দ্বিনিয় দেখাতে পেরেছেন। যেখানে
বাধা প্রথা ছিল মত তালেতালে
চলে, সেখানে তার দৌলখা ছড়িয়ে পড়ে
কিন্তু যখন সে বিধিবদ্ধ হয়ে পায়ের
বেড়ির মত হয়ে পড়ে তখন সে আর্টকে
বিষম ভারাক্রান্ত করে তোলে।

নবীন সাহিত্যের উপর আমাদের
প্রাচীন মহাকাব্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি



দাক্ষিণাত্যের নটরাজ

যেমন, প্রাচীন শিল্পকলারও তেমনি নবীন শিল্পের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। নবীন শিল্পীরা প্রাচীন শিল্পীদের সাধনা-গ্রন্থত ফলগুলি নিয়ে মত করে নিয়ে যখন আবার স্বাধীনভাবে ভারতেও নতুন ভাবে সৃষ্টি করতে থাকবেন, তখন শাস্ত্রের শাসনের কথা কারো মনেও আসবেনা, তখন

শিল্পীর ব্যক্তিত্বই শিল্পে প্রকাশ পাবে। যেখানে Individuality makes an artist—সেখানে শিল্পশাস্ত্রের বাধাবাধি কোনমতেই ঢিক্ থাকতে পারবে নী। তাই আমরা বাধাবাধি দেবসৃষ্টি ছাড়াও কপিল প্রভৃতির মত স্বাধীন চিন্তাগ্রন্থত সৃষ্টিও গড়ব। শিল্পী যখন স্বাধীন চিন্তাক



সিংহলের কোন তামিল সাধু

দ্বারা ভাবপ্রকাশের সঙ্গে বিশেষ রেখা বা ছন্দ আধিকার করেন, তখন সেটা তাঁর চলবার পথের মত হয়—তা বেড়ার মত বাধা দেয় না। কিন্তু যখন পরবর্তী কোন শিল্পী পূর্ব-শিল্পীর সেই বিশেষ বিশেষ রেখা বা ছন্দকে দস্তর কুলে মেনে নিয়ে তার অঙ্গ অঙ্গসরগে প্রবৃত্ত

হন, তখন তাঁর আর অগ্রসর হওয়া হয় না, বানির পাকে ঘুরে ঘুরা হয়।

কবিরের মনে যেমন বর্ষার স্বর স্বর শব্দে, পাতার মরমর শব্দে অঙ্গুঠ ভাবের উদয় করে তেমনি শিল্পী বা কবি চোখে দেখেন তার ভিতর থেকে রূপ ও রস পেয়ে থাকেন। আবার কবির যেমন মনের সুখ-দুঃখের অম্ল কৃতির দ্বারা অঙ্গপ্রাণিত হয়ে তার প্রকাশ করেন, কোন কোন শিল্পী সেইরূপ নিজের মনের ভাব চিত্রে বা ভাস্কর্যে স্ফুট করে তোলেন। এই আত্ম-শক্তির প্রকাশই শ্রেষ্ঠ শিল্পের লক্ষণ।

ভাস্কর্য্য একটি ভাট জিনিষ, তাকে চোখ দিয়ে দেখা যায় আবার তাকে স্পর্শও করা চলে। সে নির্ভেজর বিশেষ একটা অংশ খালি দেখার না, তাকে চারিদিক দিয়েই 'আমরা' নেড়েচেড়ে দেখতে পারি। নানান কারণে ভাস্কর্য্যকে খুবই সাধাসিধে এবং স্পষ্ট হাতে হয়েছে—সে শিল্পীর হাতে যখন দেখানে এসে শেষ হবে তখন তাঁর উপর কারো— এমন কি শিল্পীর নিজের কলমও

চলবে না। তাতে কিছু যোগ করাও চলবে না বা বাদও চলবে না। এই হিসাবে ভাস্কর্য্য চিত্রের চেয়ে বড় জিনিষ। ছবিতে একটা ছবিতে এই আছে যে, তার আত্মবলিক নানান ভিন্‌ব, রং, গাছপালা ও আসবাবপত্র প্রভৃতির সামঞ্জস্য তার মোট ভাবটিকে ধরা বাধাতে পারে, কিন্তু ভাস্কর্য্যকে তার আশে-



কপিল

পাশের সব চিনিষকে ছাড়িয়ে নিজে নিজেই সম্পূর্ণ হতে হয়। একটি পাথরের প্রতিমূর্তি তার নিজেই কথ্য বাক্য করবার কল্পে গাড়িয়ে থাকে কিন্তু চিত্রে তার আশেপাশের অনেক জিনিষের সামঞ্জস্যে তাবপ্রকাশের সুবিধে হয়। ভাস্করকে এই কারণে তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি তাঁর ভাস্কর্যে খুবই স্পষ্ট করে দেখাতে হয়, কিন্তু চিত্রকরেরা সেটাকে রেখার ও রঙের কৌশলের মধ্যে—কতকটা কল্পনার মাধ্যমে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারেন। পৃথিবীতে এই কারণে বোঝা যায় ভাল চিত্রের চেয়ে ভাস্কর্যের এত অভাব।

আধুনিক যুগের ইউরোপীয় ভাস্কর্যের খবর আমরা অবশ্য খুবই কম পাই; তার মধ্যে সেদিন কোন-একজন এন্থ্রিকাবাসী ভাস্করের তৈরি মূর্তির একখানি ছবি চোখে পড়েছিল। প্রথমে ছবিখানি দেখে নিতান্তই হতাশ হতে হয়, কিন্তু তার পরমুহূর্তে—যখন একটি মূর্তিমান রূপের গভীর বেদনার

ভাব এই একটি সহজ ও সাধাসিধে ভাস্কর্যের ভিতর দেখতে পেলুম, তখন আশা হতে হল। আর-কিছু নেই—একটি ঘোমটা-ধেওয়া মেয়ে হেঁট হয়ে বসে আছে; তার ঘোমটার মধ্যে মুখের ও বুকের আকৃতির চিত্রমাত্র নেই—তার বদলে কেবল পুঞ্জীকৃত ঘননীল অন্ধকার; বুকের ভিতরটা যেন কেবলি শূন্য হাহাকার করচে। এই বেদনার ছবিটিতে শিল্পী বিশেষ কিছুই দেন-নি—অথচ সবই দিয়েছেন। এই ভাস্কর্যের বা-কিছু অসম্পূর্ণতা তা ইচ্ছাকৃত; সেটার উপর কলম চালালে কখনই এই রূপের প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ হতে পারতো না। এটি প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ হলেও, এটির মত সম্পূর্ণ ভাস্কর্য আর-কিছুই হতে পারে না।

প্রায় দেখা যায় আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্যের কাপড়ের texture, দেহের প্রতিচ্ছবি প্রভৃতি আনুমানিক জিনিষগুলির উপর এত বেশী নজর দিয়েছেন যে, তার

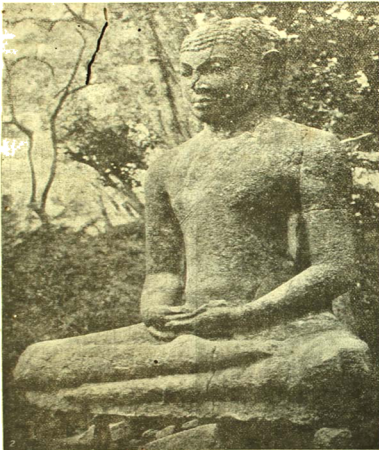
ভিত্তর নানান কোশল থাকলেও শিল্প-কলায় প্রাণের বিশেষ অভাব দেখা যায়। এখন তাঁরা ভাস্কর্য্যের সম্পূর্ণতার রসের চেয়ে, খুঁটিনাটির উপর বিশেষ নজর দেন, যেমন—কোন মূর্তিতে সিংহের কাপড় পরান হলে সিংহের মত দেখতে হচ্ছে কিনা, হুতির কাপড় পরান হলে হুতির ভাবটি পাথরের মূর্তির মধ্যেও ধরা পড়তে কিনা।

আমাদের দেশের বৌদ্ধযুগের এবং তৎপরবর্তী সময়ের যে-সব ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাই সেগুলির মধ্যে সিংহলের বুদ্ধমূর্তি,



সায়নাথের বুদ্ধ.

যবদ্বীপের প্রজাপারমিতা, ইণ্ডোরাহর সুবাস্তী, দাক্ষিণাত্যের বটরাঙ্ক ও এলিফেণ্টার ত্রিমূর্তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। সিংহলের নিবাতনিরম্প দীপশিখার দ্বারা দ্বির ধ্যানী বুদ্ধের বিরাট মূর্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মূর্তিটির এমন একটি গভীরতা আছে যে, এটির কাছে দাঁড়ালে তার আশেপাশের সমস্তই তুলে বেতে হয়—তার গভীর ভাব দশককে একেবারে অভিকূত করে ফেলে। ভারতের অপরাণর বুদ্ধমূর্তি-গুলিতে ভাবের অভাব না ঘটলেও সেগুলি এত-বেশী অলঙ্কারপ্রধান হয়ে পড়েছে যে, তার মোট ভাবটি হুটতে অনেক বাধা পায়। দৃষ্টান্তরূপ আমরা সায়নাথের ধ্যানী বুদ্ধের উল্লেখ করতে পারি। সায়নাথের এই মূর্তিটিতে যে অলঙ্কারপ্রধান কারুকার্য্য সিংহাসন ও জ্যোতির্মণ্ডলীটিতে আছে, সেইটেই ভাবপ্রকাশের বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর সায়নাথের এই মূর্তিটি ছাড়া অস্ত্রান্ত বুদ্ধ-মূর্তিকেও অনেক স্থলে অলঙ্কার-প্রধান শিল্প এই ভাবে চাপা দেবার দোষাগড় করেছে। মোটভাবটিকে সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে ভাবে কাটাতে হলে যে অল্পবিধে আছে, তা আমাদের ভাস্কর্য্যের বেশ জানতেন এবং তাই আমরা দেখি, রূপক-চিত্তকে আশ্রয় করে তাঁরা অনেক বড় বড় কথা প্রকাশ করেছেন। যেমন, আমাদের এলিফেণ্টার ত্রি-মূর্তি। এই ত্রি-মূর্তিটিকে যদিও ভারতীয় পুরোপুরি প্রকাশ করেন-নি, তার কোমর থেকে পারের



সিওলের বুদ্ধমূর্তি

দিকটা মাটির ওলার অদূরই বেধে গেছেন, সম্পূর্ণতা এক-একটি বড় বড় মূর্তিতে পাওয়া
তবুও তাঁর বক্তব্য মোটেই অসম্পূর্ণ থেকে যায় না—সেখানে সে কতকটা ছবির
যায়-নি। এইখানে খ্রি-মূর্তির ভাবপ্রকাশের মত, আশেপাশের সব ভিনিথকে নিয়ে ফুটে
সহায় হয়েছে তাঁর হাতের শঙ্খ-চক্র উঠেছে। এখানে মন্দিরটিই এই ভাববোঝার
প্রকৃতি টুক।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ভারতীয় কালের বরবোঝার, কোনারক, ইলোরা
বেঁধানে মন্দির প্রকৃতির গায়ে অলঙ্কারের এবং দাম্বাঙ্গিগাঠ্যের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য।
মত পূব ঘন ঘন সাঙ্গানো আছে, সেখানে তাঁর শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

ফিলিপাইনে শিক্ষাবিস্তার

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ উনিশ বৎসর হইল মার্কিন সাম্রাজ্যের হস্তগত হয়। পূর্বে দ্বীপগুলি স্পেনসাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এট কয় বৎসরের ভিতরে সেখানে অসভ্য দেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞাপিক্ষার সহিত স্রমজীবী-শিক্ষার ব্যবস্থার কিরূপ ফল হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে আলোকাল-কার দিনে বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। ক্যাপিটাল নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে উপস্থিত প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

ফিলিপাইনের অধিকাংশ লোকই বিশেষ-রূপ বর্কর ছিল। তাহাদের চালচলন ঘোটেই সভ্যসমাজের উপযোগী ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহে তাহারা বিশেষ পটু ছিল। এই করেক বৎসরের মধ্যেই তাহারা বেশ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের সভ্যতার প্রসার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষাবিস্তারই সভ্যতা-প্রসারের প্রধান সহায়; প্রথম হইতেই অল্পখরচে বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া ছাত্রেরাই নিম্নহাতে অনেক বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্মাণ করিয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চাষবাসের ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণ্যজনীর ব্যবহার্য জিনিষ তৈয়ারির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে চাষের কাজ শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা ঘরে

আসিয়া বাপ-দাদার অপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন করিতেছে। এই কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রের অভাব হয় না। ছেলেদের দ্বারা মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের জন্য রান্না, কাপড়-বোনা, কাপড় কেয়ারির কাজ, লেস-তৈয়ারি ইত্যাদি ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। যে সকল জিনিষ বিদ্যালয়ে তৈয়ারি হয় তাহার বিক্রয়েরও ব্যবস্থা আছে। সুক্কি, চুবড়ি, বেতের নানারকম আসবাব, কেয়ারির কাজ, লেস, নাগর, পাপস ও দড়ির গালিচা ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা প্রস্তুত করে। নিয়মিতরূপে সকল বিদ্যালয়ের উৎপন্ন সকল সামগ্রীর বিক্রয়ের বন্দোবস্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ হইতে এই সুকঠিন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হইতেছে। ১৯১৬ জুন মাস হইতে ১৯১৬ জাণুয়ারি মাসের মধ্যে ১৮টি প্রদেশের মধ্যে ১৩০টি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকম জিনিষ তৈয়ারি করিয়া বিক্রয়ার্থ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই কার্যে ২২৬৬ জন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ১৩০টি আচ্ছন্ন বস্ত্র মাল তৈয়ারি হয়, তাহা ছাড়া ৪০০০ বিদ্যালয়ে আন্ডার ছয় লক্ষ ছাত্র বস্ত্র মাল উৎপন্ন করে, সেই সমস্ত বিক্রয়ের জন্য একটি সাধারণ বিক্রয়-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের মধ্যে স্রমজীবী-শিক্ষার বৈ অগ্রদান, তাহাকে একটি প্রাক্তন কারখানার সহিত

তুলনা করা-বাইতে পারে। প্রভেদ এই মাত্র যে, কারখানা কোন-এক নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। শিকার এই বিভাগ ১,২৫০০০ বর্গমাইল ব্যাপ্ত। শিকার এই বিভাগের আর-একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহার সকল উৎপন্ন প্রবাহ হাতে তৈয়ারি, কোনরূপ বস্তুর সাহায্যে নয়; আর, সকল জিনিষই সামান্য রকমের, এবং অতি সহজ ও সরলভাবে তৈয়ারি।

এই সকল বন্দোবস্ত পাড় করা হইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। প্রথমে শিকারীদের শিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল জিনিষের অধিক প্রয়োজন, তাহার মালমশলা বেশের মধ্যেই আছে এবং বাহা সহজে তৈয়ারি করা যায়, সেই সকল জিনিষ তৈয়ারির বন্দোবস্ত প্রথমেই করা হয়। ক্রমে ক্রমে সেই সকল জিনিষের উন্নতি করা হইয়াছে। এবং উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধড়ির গালিচার কথা বলা যাইতে পারে। পাঁচ বৎসর হইল এই কার্য আরম্ভ হয়; তখন ধড়ি-তৈয়ারি ভাল হইত না এবং ধড়ির উপাদান বা ডাঁটার খাঁস,—যাহাতে ধড়ি-তৈয়ারি হয় তাহা ভাল করিয়া প্রস্তুত হইত না। Panama Pacific প্রদর্শনীতে এই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে স্রুতা তৈয়ারি করিবার ও বুনিবার ভালরকম প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং কয়েক প্রকার নমুনা স্থির করিয়া তাহারই অনুযায়ী মাল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয়। এই রূপ নির্দিষ্ট নমুনা-মাপিক সমস্ত মাল

সকল বিভাগের ও সকল আড্ডাতেই হইতেছে। এবং যতরকম মাল তৈয়ারি হয় তাহার এক-এক আভের জিনিষের যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে, তাহারও তালিকা আছে। মালগণের ও প্রদর্শনীতে এই সকল মালের নমুনা রাখা হইয়াছে। এই সকল নমুনা দেখিয়া কোন ক্রেতা যদি কোন জিনিষ পাইতে চান, তবে ঠিক নমুনা-মতই জিনিষ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিভাগসমূহে সকলরকম কাল তদারক করিবার বন্দোবস্ত আছে। যাহাতে কোন মাল খেলো না হয় এবং নিখুঁত রকমে করা হয় তাহার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। প্রত্যেক জিনিষ উৎপন্ন করিতে কি খরচা পড়িল তাহা খতান হয় এবং প্রধানত তাহার দর ধার্য্য হয়। ডা-ছাড়া কোথায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের মাল পাঠান হইতেছে বা কি পাওয়া যাইতেছে তাহারও হিসাব রাখা হয় এবং হিসাবের সঙ্গে মাল মিলাইয়া দেখা হয়। সকল ব্যবস্থার মধ্যে এমনই রকম-রকম বাঁধুনি আছে। কোনস্থান হইতে বিশেষ কোন-রকম মাল যোগাইবার হুকুম আসিলে ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট কাছাকেও সেই হুকুম তামিল করিবার ভার দেওয়া হয়। তাহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সঙ্গে অন্য ছাত্রদেরও দেওয়া হয়। যে জিনিষ সরবরাহ করিবার হুকুম আসে তাহার সহিত একটা নক্সা থাকে, তাহা সর্দার-ছাত্রকে দেওয়া হয়। সে তাহার অঙ্গরূপ জিনিষ তৈয়ারি করাইবার জন্য দায়ী হয়। তাহাকে ডাক্তার হইতে উপযুক্ত পরিদর্শন

উপকরণ সব দেওয়া হয়। এইরূপ দারিদ্র-জ্ঞানের সহিত ছেলেরদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়; ফলে, তাহারা পরে যে কাজেই পড়ুক তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে পারগ হয়। ছাত্রদের শিক্ষার মধ্যে এইরূপ দারিদ্র-শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী।

শিক্ষা-বিভাগ হইতে এই সকল ব্যবস্থা হইবার পূর্বে ছয়ঘণ্টা কিরিগা জিনিব বাজারে আসিত; তাহাতে যে-সকল শোক জিনিব প্রস্তুত করিত, তাহাদের লাভের অংশ অনেক কমিয়া যাইত। বাজারে পাইকারি হিসাবে যে দরে জিনিব বিক্রয় হইত নির্ধারিত। তাহার অর্ধেক ও পাইত কিনা সম্ভব। শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্তে এখন কেবল দুই হাত কিরিগা বাজারে জিনিব পৌছায়। প্রথম, প্রত্যেক প্রদেশের প্রমুখী-বিভাগ; দ্বিতীয়, বিশেষ বিশেষ আজ্জার (Centre) কর্তা। ইহাদের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে সকল জিনিব তৈয়ারি হয়। এই সকল কর্তব্যচারী নির্দিষ্ট বেতন নাই; বস্তু পরিমাণ মাল বিক্রয় হয়, তাহার উপর ইহারা একটা কমিসন পাইয়া থাকে। কতকগুলি বেতনভোগী শিক্ষক আছে, তাহারা স্থানে স্থানে কিরূপ কার্য হইতেছে তাহার তদারক করিয়া বেড়ায়।

কিলিপাইনে এইরূপ কার্য-শিক্ষার সহিত বিভাগশিক্ষার প্রণালী অনেক দিন হইতে চলিতেছে। এতদিনের পরীক্ষায় এই প্রণালীর উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রমুখী-শিক্ষা অতি-সহজ উপারে লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থানীয় মাল-মসলা গহীরা ব্যবসায় প্রস্তুত

হয়। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে বিভাগীয় ছাত্র পরও বিদ্যের দ্বার বন্ধিরা কাজ চালাইতে পারে। কাজ বাহ্যেই না ধারণ হয়, তাহার তত্ত্বাবধান থাকার ক্ষমতা প্রস্তুত কোন দ্রব্য খেণো হইতে পার না। আমাদের দেশের জায় কিলিপাইনে আভাবিক সুবিধা অনেক-রকম আছে। মেরেরা বুদ্ধিমান ও সাহসী এবং আভিভেদ ও তাবার বৈচিত্র্য না থাকার দরুন তাহাদের উন্নতির পথে কোন বাধা হয় না। এ দেশে শিক্ষকদের সামাজিক জর উন্নত। তাহারা বেশি খাতির পাইয়া থাকে।

মধ্যে মধ্যে ছুটির সময় নানা আয়োজ-প্রয়োজের সহিত শিক্ষকরা বাহ্যেতে একত্র হইয়া শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা করেন, তাহারও যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়।

বিভাগের যত্নরকম কার্য শিবান হয়, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লেখা হইল:— চাব-বাস, মাছ-ঘরা, গৃহপালিত জন্তু-পোষা, মাটির বাসন, হুড়ি, বেতের আসবাব ইত্যাদি তৈয়ারি, লোহা গালাইয়া চাষের যন্ত্র-তৈয়ারি, ময়, চাষড়া, ইপি ও বুনিয়া কুতা তৈরি করা, তুলা, রেশম, আনারসের ছালের সুতার বুনিয়া তাহাতে কাপড় তৈরি, এবং কাপড়ে কেয়ারি কাজ প্রভৃতি। কিলিপাইন জাফ-ইসমান নামক এক মাসিকপত্র এই সকল কার্যের বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই পত্রের প্রধান সম্পাদক শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্তব্যচারী। এই কাগজে বিশেষজ্ঞ ছাত্র আর কেহ আলোচনার অধিকারী নন বলিয়া ইহাতে যে সকল লেখা বাহির হয়, তাহাতে সাধারণের অনেক উপকার হয়।

জীম—

তেলুগু গান

সন্ধ্যা-প্রার্থনা

সাঁকের প্রার্থীপ জ্বলে নত করি শির,
সন্ধ্যা-প্রার্থীপ প্রভু! তব মন্দির!
প্রার্থীপে যে আলো জ্বলে সে ত্যাগিত তোমার,—
সে জ্যোতিতে পাপ-তাপ পোড়ে যে সবার;
দীপের কনক-মিখা বেউল কচির,
বেব-বেব! সে বেউলে তুমি হাস ধির!
ওরে ও সাঁকের দীপ তোর তুলা নাই,
সন্ধ্যাদীপের আমি বন্দনা গাই।

মন্দির-ঘরে।

জাগো জাগো মনোহর। খাবে ননী স্নায় সর!
জাগো, জাগো, নাড়ুরা-গোপাল!
জাগো পুলকের ধন! পোলোকের হে রামন!
জাগো, জাগো, হরেছে সকাল।
জাগো হে দুয়ার খোলো, মন্দিরে ভিড় হ'লো,
চেয়ে ডাখো ব্যক্তি নাই আর;
বালক, বনিতা, বুড়া, ভিড়ে ব্যাখো হ'লো ভ'ড়া,
হুণ তুমি ঘুটাও সবার।
তোমার আরাতি তরে ধ'রে আছি নিরোপরে
মনোহর মালতীর মাল,
জাগো হরি! জাগো হরি! খোলো দ্বার কৃপা করি'
হৃন্দর! নন্দ-দ্রুশাল!
ঐসত্যোজ্ঞানাথ নন্দ।

মাসকাবারি

শক্তির ধর্ম ও আনন্দের ধর্ম

আবারের "নারায়ণে" "ধর্মপ্রচারে" রবীন্দ্র-
নাথ" শিবক প্রবন্ধের' লেখক বলেন "যে
"রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন সেই জীবন—যাহা
আনন্দপূর্ণ, বৃত্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, যেখানে ঘন
মাই, বৈশাখ্য নাই"। "রবীন্দ্রনাথ যে দিকটি
নির্গণ্যেব দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই,
তাহা হইতেছে শক্তি—বীর্ঘ্য, তেজ, বুদ্ধ,
সংঘর্ষ, হুলি, ঘনঘটা, বজা, ক্রোধের বিকৃতি।"
এ দিকটা নিটুশে দেখিয়াছেন বলিয়া হঠাৎ

মনে হইতে পারে, কারণ নিটুশের মত—
"will to power"। কিন্তু লেখক বলেন
যে নিটুশে শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তারই
অভিব্যক্তির অগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শক্তির যে
সকল বিকৃতি, যথা মদ মাংসপা জ্বরতা
ইত্যাদি,—তাদেরও নিত্যবস্ত্ত করিয়া
নাইরাছেন।

লেখক মনে করেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে
যে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে যে সংঘাত
বর্ত্তমান যুগে অত্যাধ হইয়া উঠিয়াছে, সেই

বর্তমান অগতের সমস্ত বন্দবিলোধ, মন্তব্য, ত্রুটি "হতই হুৎসিত হউক না কেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে বহিরাছে সমীচীনতা, জীবনকে—অগতকে তাঁরই ভাবে স্পষ্টতর ভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস।" রবীন্দ্রনাথ যে কখনও কোন দৃষ্টে প্রবৃত্ত হন নাই একথা বলা লেখকের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তব্ধে দৃষ্টের অব্যর্থতার যে স্থান নাই, ইহা বলাই তাঁর অভিপ্রায়। এমন কি তিনি বলেন যে রসভোগাত্মক কর্ম ভিন্ন দৃষ্টান্তক কর্মেরও কোন স্থান রবীন্দ্রনাথের তব্ধে নাই।

এই প্রতিষ্ঠিত লেখাটি আমাদের চোখে পড়ার পূর্বে বিখ্যাত সাহিত্যিক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ লিখিত "God, The Invisible King" ঈশ্বর অদৃশ্য রাজা নামক নবপ্রকাশিত বইটি পড়িতে হিলাম। আধুনিক মানুষের ধর্মটা প্রকৃত প্রস্তাবে কি হইতে পারে, তারই কতক কতক আভাস ওয়েল্‌স্ সাহেব তাঁর নূতন গ্রন্থে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন খৃষ্টধর্মের ট্রিনিটি বা তিন ঈশ্বরের তব্ধে একাংশে কেউ মানেনা, এখনকার কালের মানুষের যিনি ঈশ্বর তিনি একমাত্র সসীম ঈশ্বর। ওয়েল্‌স্ তাঁকে সসীম এই অর্থে বলিয়াছেন যে, যে ঈশ্বরকে লইয়া মানুষের কারবার, ঈশ্বকে মানুষের প্রয়োজন আছে, তাঁকে সীমাবদ্ধ একজন পুরুষ হইতেই হইবে—কেননা পুরুষের সঙ্গেই পুরুষের বোগ ঘটিতে পারে, অসীম অনন্ত একটা শক্তি বা সত্তা মাত্রেয় সঙ্গে মানুষের কোন সম্বন্ধই পাড়াইতে পারে না। অনন্ত

শক্তি মানুষ ধারণা করিতেই পারে না; লোকলোভাত্মক বা পিতৃ কৌন শক্তি বহি কৌন সত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তবে ওয়েল্‌সের ভাষায় সে একটা Veiled Being মাত্র, অব্যক্তগত সত্তা মাত্র। হরত কৌনকালে বিজ্ঞান তার ঘোষটা ধসাইতেও পারে, নাও পারে—কিন্তু তাকে বধন জানিনা, তখন তাকে পূজা করিতেও পারি না।

অনন্ত দেশকাল হইতে যেমন ঈশ্বরকে ওয়েল্‌স্ তর্ক্য করিলেন, তেমনি প্রকৃতির রমণ্যু হইতেও তাঁকে তিনি বিদ্যায় দিয়াছেন। যে প্রকৃতির রমণ্যু হইতে ক্রমাগতই বন্দবিলোধ জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে, সেই হানাহানি কাড়াকাড়ির ক্ষেত্রেও ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর আছেন শুধু আমাদের জীবনের মধ্যে। মানুষের জীবনে, মানবলোকে, মানবের অধিনায়ক রূপেই তাঁকে আমরা দেখিতে পাই। মানুষের জীবনের ভিতরে থাকিয়া তিনি সেই জীবনের ভাঙাগড়া উত্থান পতনের লীলার ভিতর দিয়া তাঁর অভিপ্রায়কে ক্রমশঃ স্রবস্তুর করিতে করিতে চলিয়াছেন। মানুষের তিনি সহযোগী, সহকর্মী। তিনি বহন মানুষের জীবনে আবিস্কৃত হন তখনই। মানুষের জীবন পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়।

সুতরাং ওয়েল্‌সের মতে ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা বীরের স্বরূপ, শূরের স্বরূপ। তিনি বলেন যে, প্রাচীনকালে ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল বৃদ্ধ পিতা বা পিতামহের স্বরূপ; একালের ঈশ্বর তরুণ যুবা। তাঁর দৃষ্টি অতীতের দিকে নয়,

তবিত্যক্তের দিকে। তিনি তরবারি হস্তে
যাত্রা করিয়াছেন তাঁর মাথা, প্রতিষ্ঠার
অস্ত। এইজন্য যে বৈজ্ঞানিক সংস্কারবাদী
তাকে সংসার করে, সে তাকে সব চেয়ে
বেশি মানে; যে অকৃত্রিম সেও না জানিয়া
এই নবীন ঈশ্বরেরই অর্জনার আয়োজন
করিয়াছে—“The Religion of
Atheists” অধ্যায়ে ওয়েল্‌স্ তাহা স্বপ্নের
রূপেই দেখাইয়াছেন।

নারায়ণের লেখক ওয়েল্‌সের সসীম
ঈশ্বরবাদ মানেন কিনা জানি না, তবে পূর্ণ
জীবনে সকল রকমের বিতৃষ্ণিত্য যে একটা
স্থান আছে, “সাক্ষ্য পিচাচ পণ্ড অমর”
প্রকৃতি সকলেরই স্থান আছে, একথা তিনি
বলিয়াছেন। ওয়েল্‌স্ ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতির
বিতৃষ্ণিত্য স্থান মানেন না; তিনি ঈশ্বরকে
কেবলমাত্র মানব মনে করেন এবং মানবের
সকল চিত্তবৃত্তি যে ঈশ্বরের মধ্যে আছে
তাহা স্বীকার করেন। শুধু এই জায়গার
ওয়েল্‌সের সঙ্গে নারায়ণের লেখকের ভাবের
মিল আছে। কিন্তু আমাদের দেশের
বোধাত্তর অমর্যারে ঈশ্বরকে যদি শুদ্ধ বুদ্ধ
মুক্ত ও নিত্য স্বভাববান মনে করা যায়,
এক কোণ কোণ বৈক্য অকারণের ব্যাখ্যা
অমর্যরণ করিয়া একথাও সেই সঙ্গে বলা
যায় যে, মানুষের অন্তর্ভুক্ত শোষণ করিবার
অস্তই ঈশ্বর শুদ্ধ, মানুষের ভ্রমকে নিরাকরণ
করিবার অস্ত, তিনি বুদ্ধ, মানুষের সকল
বন্ধনকে মোচন করিয়া মানুষের মধ্যে
“কৃতকৃত্য” হইবার অস্তই তাঁর সূক্তস্বরূপ এবং
আমরাও যে পরিমাণে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হই,
সেই পরিমাণে ঐ-বিক্ হইতেই আমাদেরও

মুক্তির সার্থকতা—তবে তো ঈশ্বরকে সসীম
বলার কোন দরকারই থাকে না। কেননা, শুধন
ঈশ্বরের স্বরূপ অসীম হইলেও তাঁর প্রকাশ
সীমার। হুতরাং যেখানে তাঁর প্রকাশ, সেখানে
এক হিসাবে তাকে সসীম বলাও তো চলে।
অথচ তাকে শুধু সসীম বলিলে তাঁর স্বপ্নের
লীলার কোন অনির্জন্যের মন্ত থাকেনা।
যেমন পরিপ্রেক্ষণ (Perspective) ভিন্ন
ছবির রস কোটনা, তেহি অনন্ত ভিন্ন সীমার
সৌন্দর্য্য ও রহস্য প্রকাশ পায় না। তাছাড়া
তাঁর সসীমতাই সত্যও নয়। কেননা, অনন্ত
দেশ কাল হইতে ঈশ্বরকে পৃথক করিয়া লইয়া
যদি কেবলমাত্র মানুষের জীবনের অধিপতি
করিয়াই তাকে জানি, তবে সেই মানুষ-
বের চৈতন্তই তিনি তাঁর সীমা ছাড়াইয়া
বাইবেনই। সে চৈতন্ত যে চক্র হইতে
পরিবর্তিত চক্রে ক্রমশঃ অধিরোহণ করিয়া
বিশ্বেচৈতন্ত—অনন্তচৈতন্ত—হইয়া উঠিবে।
অতিব্যক্তির নিয়মে চৈতন্তের পরিধির কি
ক্রমশঃ বিস্তার ঘটে নাই? এবং আরও
উত্তরোত্তর বিস্তার ঘটবে না?

সেই অস্ত, সীমার দিক্ হইতে বাহ্য
সংগ্রাম সংঘর্ষ বলিয়া প্রতীত হয়, অসীমতার
দিক্ হইতে তাই শান্তি ও স্বভি, তাই
আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের দেবতা “সীমার মাঝে
অসীম”। তাঁর দেবতা ক্রম ও বটেন,
মক্ষিণ ও বটেন। “তিনি গেছেন যেখান
হাটি ভেঙে করতে চালা চালা”। অস্ত
ক্ষেত্রে তিনিই “উড়িয়ে ধরলো অস্ত্রভেদী
রথে, ঐয়ে তিনি ঐ বাহির পথে”।
“সুগন্ধের পথে তোমার তুষ্ট বাক্যে, অকণ-
বর্ষে জালাও চিত্ত-মাঝে”। “সময় ধীতে

অমর করে রক্ত নির্মূর রেহ, সেইত তোমার
 রেহ”। “জয় তব ভীষণ সব কল্বনাশন
 রক্ততা”। এই গেল এক বিদ্। অল্প
 দিকে “হৃন্মর তুমি এগেছিলে আজ প্রাতে,
 অরুণবরণ পারিষ্যাত লয়ে হাতে”। “মোর
 ছদরের গোপন বিজন ঘরে একেলা রয়েছ
 নীরব শয়ন পরে।”

জাতীয়তার আদর্শ

ভারতবর্ষের স্বাভাৱ্য বা জাতীয় ভাবের
 উপাদান উপকরণ কি ও আদর্শ কি এবং
 অস্তিত্ব দেশের জাতীয় ভাবের উপাদান
 উপকরণ ও আদর্শের সঙ্গে তার মূলগত
 কোন একা অথবা অনেক) আছে কিনা,
 এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আধুনিককালে যথেষ্ট
 আলোচনা হইতেছে। তার প্রধান কারণ,
 আমরা একটা যুগসন্ধিস্থলে উপস্থিত
 হইয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতা, রীতিনীতি,
 শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সমস্তই আমাদের
 এই বহু প্রাচীনকালের সমাজের উপর
 হঠাৎ আসিয়া পড়িতে আমাদের সমাজে
 স্বভাবের নিঃসে নানা পরিবর্তন দেখা দিতে
 লুক করিয়াছে। অথচ সমাজ তার চিরাগত
 প্রকৃতি ও আদর্শকেও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন
 দিয়া এই নবগত আকস্মিক সভ্যতার
 ছাঁচে আপনাকে আত্মল বদল করিতে রাজি
 নর। সেইজন্য অনেক দিন হইতেই উত্তরের
 মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা চলিতেছে।
 এই চেষ্টার কেউবা পুরাতনের পক্ষপাতী,
 কেউ বা নৃতনের। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি
 অহুসারে এ সকল বিষয়ে সামাজিক
 আদর্শের তারতম্য নির্ণয়ের ভেদ ঘট

অবস্ত্ৰজ্ঞাতী। কিন্তু আমাদের পক্ষে বোধহয়
 আধুনিক, সাহিত্যে, এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-
 প্রসূত সমাজ-পন্থনের আদর্শের আলোচনা-
 গুলি পরম করার মত উৎসাহজনক ব্যাপার
 আর কিছুই নাই।

স্বামোহন, দেবেশ্বনাথ, রাজনারায়ণ,
 বঙ্কিম, কুশেব, চন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি
 সকলেই প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সভ্যতার পরস্পরের
 ষাৎপ্রতিষাৎ, ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব
 এবং ভারতীয় জাতীয়তার বিশিষ্ট আদর্শ
 সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁদের
 মধ্যে অনেক মতবৈচিত্র্য আছে। তাঁদের
 প্রকৃতির ভিন্নতা ত আছেই; তাছাড়া তাঁদের
 পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ও যথেষ্ট ভিন্নতা আছে।
 যেমন ধরুন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও
 পশ্চাত্য দুই সভ্যতা সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান
 ছিল; সুতরাং কোন সভ্যতাটার কোন দিকে
 উৎকর্ষ, কোন সমাজের কোন কোন দিকে
 শক্তির ক্ষুণ্ণি, তাহা তিনি যেমন পরিষ্কার
 দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এমন কুশেব
 কি চন্দ্রনাথ পান নাই। আবার তখনকার
 কালে গুপ্ত কালের ধর্শন পড়িয়া সমাজ-
 বিজ্ঞান সম্বন্ধে কুশেব বা বঙ্কিম যতখানি
 জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে
 নানাধেশে, ইতিহাস পড়িয়া কুশেব যে
 পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে
 পরিমাণ জ্ঞান চন্দ্রনাথ কিংবা রাজনারায়ণের
 ছিল না, যদিচ অস্ত্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁদের
 যথেষ্ট অধিকার ছিল। কালচারের এই
 সব ভিন্নতা, কালের ভিন্নতা, পারিপার্শ্বিক
 অবস্থার ভিন্নতা—এসমস্ত হিলাব করিয়াই
 তবে এক এক জনের আদর্শের বিচার

হইবে এবং কে কতটা সমুদ্রদলী তাহারও নির্ণয় হইবে।

অতএব আমরা মাসে মাসেই জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে এই সকল মনীষীর আলোচনা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিব। তাঁদের কালের হিসাবে তাঁদের আলোচনার মূল্য এবং তারপর উত্তর কালের ক্রমবিকাশমান ধারার তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মূল্য আমা-
দ্বিগকে বেশ করিয়া বাচাই করিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। কেননা, কালের হিসাবে অনেক কথার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বকালের হিসাবে সে মূল্য টেকেনা।

প্রথমে ভূষেবের “সামাজিক প্রবন্ধ” সম্বন্ধেই আলোচনাটা তোলা যাক। কিন্তু “সামাজিক প্রবন্ধ” যে সময়ে রচিত হয়, তাঁর পূর্বে যেনে অনেকগুলি বড় বড় আন্দোলন হইয়া গেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে সেই আন্দোলনগুলির ধারা বেগিয়া গেলে তবে ‘সামাজিক প্রবন্ধ’ যে কালের রচনা, তাঁর ভাব কতকটা ক্ষয়ক্ষয় করা বাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান কালচার ও সভ্যতার ত্রিধারার এতটা প্রস্তুত মোহানার পাড়াইয়াছিলেন, ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তিবাদীদের মনের সঙ্গে তাঁর মনের আশ্চর্য্য সাবুখ্য ও সাদৃশ্য ছিল—ইয়েরাজ ডাইট, হিউম, গিবন প্রভৃতি সংগ্রহবানী, ফরাসী এন্সাইক্লোপিডিট এবং ভল্টের্রান্ন, ভল্টিন প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লোক্তিকান্-
ত্ৰুপিতদের একেবারে লগোজ মন ছিল রামমোহন রায়ের। সেই কারণে

কোন রকমের অন্ধ সংস্কার তাঁর মনকে বাধিতে পারে নাই; তিনি সহজেই ‘সকল ধর্মের ও সকল সভ্যতার অন্তর্নিহিত বিশ্ব-ভৌমিক সভ্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মের শাস্ত্রকে মানিয়া লইয়াই তাঁর আসল সভ্যগুলি কি, তাঁর বিশ্বদৃষ্টিগুলি কি, তাহা প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রের ভিতর হইতেই টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহনের এই Cosmopolite এই বিশ্বভৌমিক দৃষ্টিটাই তাঁর একমাত্র দৃষ্টি নয়; তাঁর আর একটি বড় দৃষ্টি তাঁর স্বাভাসিক দৃষ্টি। সেখানে তিনি শাস্ত্র-মীমাংসক, সমাজ-সংস্কারক, বিধিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যাতারূপেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর ‘বেদান্তভাষ্য’, ‘বেদান্তসার’, তাঁর ‘ব্রাহ্মণ সেবাধি’ পত্রিকার লেখা গুলি, তাঁর ‘চারি প্রস্তাব উত্তর’, তিনি যে ভিত্তির উপর হিন্দুর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা পত্রিকার করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের অশেষ শাস্ত্রের ধর্মবিধি ও কর্মবিধির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার ঐক্যত্বটিকে অর্থাৎ তাঁর মুক্তিবটিকে এমন আশ্চর্য্য এমন উদারভাবে রাজা রামমোহনের মত আর কেহই ধরিতে পারেন নাই। সকল রকমের সাধন ও মার্গ, সকল রকমের সম্ভাব্য ও বিভাগের মধ্যেই যে মানুষের সর্বাধারণ, সর্বসংস্কার হইতে মুক্তির একটা উদার পথ ভারতবর্ষ উন্মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই হিন্দু সভ্যতার সর্বশাস্ত্র ও সর্বমার্গের বিশিষ্ট ও নিবিষ্ট আলোচনার দ্বারা রাজা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

যুক্তির আদর্শকে তিনি নিষেধের জাতির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্ব-জাতির মধ্যেও তাকে দেখিতে তিনি বাধা পান নাই। সেইজন্য বেদান্তের পাশাপাশি এই ব্রাহ্মণ-তন্ত্র সাহস করিয়া Precepts of Jesusও প্রকাশিত করিয়াছিলেন; আবার বেদান্তের অমৈত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় humanitarianism অথবা লোকপ্রেমের বাককেও খাপ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের জাতীয়তার আদর্শ সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই ছিল যে, ভারতবর্ষকে জাতীয় ভাবে সার্কুলারীনি এবং সার্কুলারীনি ভাবেই জাতীয় হইতে হইবে।

রামমোহন যে সূত্রটি ধরাইয়া দিয়া গেলেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁর পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে দুইটি ধারা দেখা দিয়াছিল। এক, অক্ষরকুমারের যুক্তিবাদের ধারা, আর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'খিজম্' ও ভক্তিবাদের ধারা। দুটি ধারাই বিশ্বভৌমিকতার অভিমুখী ছিল। দুজনেই রামমোহনের যেন দুই অংশ পাইয়াছিলেন। অথচ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বাভাবিকতার এক হিসাবে অস্বাভাবিক ছিলেন বলা যায়। তিনি তাঁর উন্নত ধর্মের আদর্শে দেশীয় সমাজের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানকে শোধিত সংস্কৃত করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। Conservative Reformer—রক্ষণশীল সংস্কারকের আদর্শ অবলম্বন করিয়া তিনি বহুটা পায়ের দেশীয় ভাব ও রূপ রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতি-সাধনে মন দিলেন। মাহুতের ধর্ম-বোধ উন্নত হইলেই সমাজ আপনাই উন্নত হইবে, ইহাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। দেশের

ভাষা, সাহিত্য, শব্দীত, শিল্প, অমুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান সমস্তই তিনি দেশীয় ভাবেই উন্নত করিবার জন্য চিন্তাজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ধর্মতত্ত্বে এবং সানাজিক ব্যবহারেও তিনি অনেক জিনিস পশ্চিমের সভ্যতার ভাঙার হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলিকে এমনি বেমানান দেশীয় আদর্শে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাদের বৈদেশিকতা কোথাও সহজে ধরা পড়িতে চায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ব্রাহ্ম-সমাজে কেশবচন্দ্র প্রভৃতি নব্য যুগল যখন সমাজ সংস্কারের তুমুল আন্দোলন তুলিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে অগ্রসর ও অনগ্রসর দুইধলের মধ্যে ভেদ হইয়া সেই ভেদ ক্রমে বিচ্ছেদ উপস্থিত করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন না; কিন্তু তিনি জাতীয়ভাবে ও ধীর ভাবে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জাতীয়তার আদর্শ লইয়াই তাঁর সঙ্গে নবাবলের বিরোধ হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বিবাহ বিধির আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলিয়াই ঘোষণা করিলেন, অগ্ররপক অহিন্দু স্বীকার্য্যে আশ্রয় করিয়া তিন আইনের বিবাহকে মানিয়া লইলেন। তার পর হইতেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।” নবগোপাল মিত্রের “হিন্দুমেলা” জমিয়া উঠিল; ঐ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেই মহর্ষির সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ ‘হিন্দুধর্মের প্রেচতা’

সম্মুখে বক্ষত) মিলেন; এই ঘটনাকেই বক্তৃতির প্রতিভার নবরসি “বঙ্গবর্ধনের” ভিতর দিয়া দেশে এক নূতন প্রভাত উপস্থিত করিল। বেবেত্রনাথ ও আদি-ব্রাহ্মসমাজ বেণী পরিমাণে হিন্দুসমাজ-ব্যাপ্য হইয়া পড়িলেন; এবং তখন হইতেই স্বদেশিকতার বৃগু এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের বৃগু দেখা দিল। ক্রমে শশবর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ধর্মশক্তির আন্দোলন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এক নূতন ধর্মসম্বন্ধ, জনসেবা ও কর্মসম্মানসের আন্দোলন,—এই সমস্ত পরে পরে উপস্থিত হইতে লাগিল। এ সমস্তেরই ভিতরকার কথা এই যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতা পান্ডিত্য দেশের ধর্ম ও সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে ধর্ম নহ, চাই কি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।

এই প্রতিক্রিয়ার সুখেই ভূম্বের “সামাজিক প্রবন্ধ” লেখা হয়। “সামাজিক প্রবন্ধ” আলোচনা করিতে গেলে সর্বকালের গোড়ার এই কথাটা মনে রাখা দরকার।

প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনের মধ্যে দু'খা জিনিস যেমন অনেক থাকে, তেজি ভালও অনেক জিনিস থাকে। ঐকান্তিক ভাবে জাতীয়তাকে উপলব্ধি করিতে গিয়া ১৮৭২ হইতে আর ত্রিশ পঁত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত, দেশের ইতিহাস, প্রকৃতি, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, ধর্মনীতি, প্রাচীন সাহিত্য, প্রকৃতি সকল বিষয়ে দৃষ্টান্ত ব্যাপক ও গভীরভাবে অন্বেষণ ও গবেষণা হইয়াছে, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই। মনে রাখা দরকার যে, স্বদেশী

আন্দোলন একটা ভূঁইকোড় আন্দোলন নহ—দেশ সম্বন্ধে এককাল ধরিয়া এত বিভিন্ন ভাবে অন্বেষণ ও সাধনার ফলে আমাদের জাতীয় মনে যে প্রবল স্বদেশোচ্ছাস ও স্বাভিমান জন্মিয়াছে, সেটা অন্তঃসলিলা করণার মত অগোচরেই প্রবাহিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হঠাৎ একটা কারণের বাধা পাইয়া তাহা প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য এক দিকে যেমন ঐকান্তিক জাতীয়তা কতগুলি গোড়ামি, অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তাহা জাতির অন্তর্নিগূঢ় নানা মূল্যবান সম্পদকে উদ্ঘাটিত ও আবিষ্কৃত করে—সে কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

“সামাজিক প্রবন্ধ” ভূম্বের যে জাতীয়তার আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ঐকান্তিক জাতীয়তার আদর্শ। হিন্দুসমাজের মূল প্রকৃতি কি, তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন:—“হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ আছে। সেই আচারে পবিত্রতা, ধর্মভীরুতা, আত্মসংবৎস, ক্রমা, দয়া, ধৈর্য্য, প্রকৃতি শাস্ত্রের স্ববিচার্য্য শিক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শাস্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃখাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুসমাজের প্রকৃতি—শাস্তি।” “প্রাক্কন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিভুজবাহী হিন্দু শাস্তিপরাধ, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী, অমানসকৃতি ১০০ ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাহী পৃথিবী ইউরোপীয় অশান্ত, বৈরাচার, উচ্ছ্বাসীল এবং ভোগস্বপনিক।” “আমরা

জানি যে, মুছম্বোর দোবগুণ অনেকটাই তাহার পূর্বপুরুষদিগের হইতে অর্জিত। স্বতন্ত্রাৎ আমরা যে বংশজ্ঞাত, অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই ঠিক তেমন হইতে পারেন না।...আমাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রকার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে, লোকে এক ধর্মাবলম্বী, এক বৈশ্যবাসী এবং এক ভাষাভাষী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ না হইয়া, পান ভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি আন্তোন্তের শরীর স্পর্শে অস্বাভাবিক না হইয়া এক সমাজসম্বন্ধ, এক মতামুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে।” ...“জাতিভেদে প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাভাবিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই আত্মগৌরব রক্ষা করে।” “সকলেই মূলতঃ এক, কর্মভেদে পৃথকভূত।”

এখানে তিনি তিনটি বড় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন (১) হিন্দুসমাজের অন্তঃশাসনের কথা (২) হিন্দুর প্রাক্তনে বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস হইতে পৃথিবীতে বৈবাহ্যের সমস্তার নিম্নপত্তি। (৩) বর্ণের স্বাভাবিকতা ও বৃত্তিভেদের ব্যবহারে অল্প হিন্দু সমাজের প্রতি-বিশ্বতাহীন শাস্তিনিষ্ঠা। হিন্দুসমাজের মূল প্রকৃতি আলোচনা করিলে তার সামাজিক ইতিহাস ও বর্ণনের দিক্ হইতে এই তিনটি মূলতত্ত্বকে চোখের সামনে রাখিতেই হইবে। কর্মফলবাদী হিন্দু পূর্বপুরুষাধিকৃত কর্মের ফলে পৃথিবীতে নানা বৈবাহ্যের সৃষ্টি হইয়াছে একথা বিশ্বাস করে বলিয়া তার মধ্যে ঐহিক শক্তিসাধনের জন্য ঠেলাঠেলি ও কাড়াকাড়ির ব্যাপারটা তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

তারপর আবার পূর্বপুরুষদিগের হইতে অর্জিত কর্মের ফল আছে, সেই ফলের চাপকেও এড়াইয়া যাইবার কোন উপায় নাই। যে ব্যক্তি যে বংশে অস্থিরাছে, যে বংশের যে বৃত্তি, সে ব্যক্তি সেই বংশের ধর্মকে রক্ষা করিয়া সেই বংশের বৃত্তিকে অগ্রসীলন করিয়া চলিবে—স্বতন্ত্রাৎ অল্প বংশের লোকের প্রতি বা অল্প অল্প বৃত্তির প্রতি তার প্রতিবন্ধিতার ভাব জাগিতে পার না। তারপর আবার এই বর্ণবৃত্তিভেদমূলক শাস্তিনিষ্ঠ সমাজের অন্তঃশাসনের ভার রাষ্ট্রার উপর নহ, ব্রাহ্মণের উপর। Legislative function—বিধি প্রণয়নের ভার ব্রাহ্মণের, কতক পরিমাণে Judicial function বিচারের ভারও ব্রাহ্মণের। রাজা শুধু executive head শাসনরক্ষণের কর্তা এবং কতক পরিমাণে বিচারকর্তাও বটেন। “বিবিধ প্রবন্ধে”—দ্বিতীয়ভাগে—“বঙ্গসমাজে অন্তঃশাসন” দীর্ঘক’ অধ্যায়ে ভূমবে এই অন্তঃশাসনের ইতিহাস ও প্রণালীটি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—“হিন্দুসমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্ভ্রমভায়ে দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। মূলতঃ এই শাসনের বিবরণ এমন সকল পাণ্ডাচরণ বাহা রাজদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নহে।...আদ্যোতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে তাঁহার সমাজপতি হইতে পারিলেন না। সেই কারণেই ব্রাহ্মণেরা ‘সমাজপতি’ হইয়া দেশের অন্তঃশাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। গ্রাম্য পকারেতের শাসনের কথা ঐ প্রবন্ধে সোড়ায় উল্লিখিত আছে বলিয়া কাহারও কাহারও

এমন অদ্ভুত ধারণা হয় যে ভূদেব 'অন্তঃ-শাসন' বলিতে স্ফল। প্রকৃতির হিতকর্মে বাংলার জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বের অধিকার বুঝিয়াছেন। জনসমূহের সর্ব বিষয়ে আত্মকর্তৃত্বের কোন কথাই ভূদেব কোথাও বলেন নাই—তার জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে সে কথার কোথাও কোন স্থান হইতে পারেনা।

সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্বের স্বরূপকে ভূদেব theocracy অথবা ধর্ম-মূলক রাষ্ট্রতত্ত্বের স্বরূপ বলিয়াছেন এবং সেই স্বরূপকেই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ইহার শাসন চুই ভাগে বিভক্ত—বিহঃশাসন রাজ্যের; অন্তঃশাসন ব্রাহ্মণের। ইহার ব্যবস্থা জাতিভেদ ও বৃত্তিভেদমূলক ব্যবস্থা। এক্ষণ শাসনে এবং ব্যবস্থার স্ফল্যতির বা বৈষম্যের অল্প পৰ্য্যন্ত কোথাও উল্লিখিত হইতে পারে না। কারণ, অশান্তি বা বৈষম্যের মূল পৰ্য্যন্ত উপ্ভাইয়া কোলা হইয়াছে।

আর্টের উত্তর

(বেনেডেটো ক্রোচের মত)

আধুনিক ইতালীর সাহিত্যে 'কার্ছুচি (Carducci), ডানানুজিও (D'Annunzio) এবং প্যাস্কোলি (Pascoli) ইউরোপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বহু, কতক হইতে বেনেডেটো ক্রোচেও একজন তত্ত্ববিদ ও কলারসিক হিসাবে গুণীকরণসমাজে আদর পাইতেছেন। তত্ত্বের সঙ্গে রসের মিলন প্রায়ই খটিতে দেখা যায় না; কিন্তু ক্রোচের রচনা যে কেউ পড়িয়াছেন, তিনিই

অনুভব করিয়াছেন যে তাঁর মধ্যে সে মিলন ঘটয়াছে। বিশ্লেষণ ও বিচারের শক্তিতে তিনি কোন ভাববিষয়ের চেয়ে কম নন, আবার অথও রসাত্মকভাবে তিনি কোন কলা-রসিকের কাছেও হঠিয়া যান্না। সুতরাং আর্টের তব সম্বন্ধে তাঁর মত বাঙালী পাঠকের প্রাধান্যযোগ্য।

গতবারে আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা রাস্কিন ও অস্কার ওয়াইল্ডের মত আলোচনা করিয়া দুজনেরই আর্টের আদর্শের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছিলাম এবং আমরা আর্টের কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তার আভাসও দিয়াছিলাম। ক্রোচের মতের সঙ্গে সেই আলোচনার যোগ আছে বলিয়া আমাদেরি বক্তব্য কথার পরিচ্ছিন্নের উদ্দেশে ক্রোচের মত উদ্ধার করিতেছি।

ঐশ্বর্য্য হীরেন্দ্রনাথ মত মহাশয় 'Intuition' শব্দটার বাংলা করিয়াছেন 'বোধি' শব্দের দ্বারা। তিনি বলেন, Intellectকে আমরা বলি বুদ্ধি; Intuitionকে বলা যাইতে পারে—বোধি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর Intuition এর প্রতিশব্দরূপে 'সহজ জ্ঞান' কথাটা ব্যবহার করিতেন। আমরা বুদ্ধির দ্বারা বাহ্য বুদ্ধি তাহা বুদ্ধি; সহজ প্রত্যয়ের দ্বারা বুদ্ধি তাহা বোধি বা সহজ জ্ঞান। আমার বোধ হই 'বোধি' কথাটির চেয়ে 'সহজ জ্ঞান' কথাটা 'Intuition'-এর ঠিক অর্থটা বেশী জ্ঞাপন করে।

ক্রোচে দেখাইয়াছেন যে, আমাদের জীবন-যাত্রার আমাদের প্রায় বারো আনার উপর ভর ঐ সহজজ্ঞানের উপর। যে

যাক্তির দেশের আসল অবস্থা। সবচেয়ে একটা সহজ "বোধ" নাই, যে শুধু তব লইয়া তর্ক করে, কোন রাষ্ট্রনৈতিক তাকে আমল দেয় না। আর্টের সমালোচক কোন ধিওরির দ্বারা আর্টের রসবিচারে প্রবৃত্ত হয় না, আর্ট সবচেয়ে তার সহজ বোধের দ্বারা সে রসকে উপলব্ধি করে এবং রসকে উল্কাটিত করে।

অবশ্য কোচে ইন্ট্রিবোধ, কল্পনা এবং ঐক্সির ও কল্পনাবৃষ্টি সকল রূপ ও ভাব-সম্পত্তি, এ সমস্তই সহজ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। কেবল যে গুলি Concept বা বুদ্ধির বিষয়, সেই গুলিকে তিনি ইহার সীমানার বাহিরে চেলেন। সেইজন্য সহজ জ্ঞান এবং প্রকাশ ("Intuition and expression") এই দুয়ের মধ্যে কোন তেজ তিনি দেখিতে পান না। কেননা, প্রকাশ ভিন্ন সহজ জ্ঞান গাড়াই-তেই পারে না বলিয়া তাঁর ধারণা। অতএব, যে জিনিসটা প্রকাশে বাস্তব হইয়া উঠে না, তাহা কেবলমাত্র ইন্ট্রিবোধের বিষয় অথবা কল্পনার বিষয় হইতে পারে কিন্তু সহজ জ্ঞানের বিষয় হয় না। কারণ সহজজ্ঞান মানেই প্রকাশ। যদি বলি যে একটা চতুর্কোণ বা ত্রিকোণের সহজজ্ঞান আমার আছে, তবে তার ছবিটা নিশ্চয়ই আমার মনে এমনই সুস্পষ্ট যে, আমি থাকে তখনি তখনি আঁকিতে পারি। তেমনি ভিত্তিকার যে কোন ভাব বা রস যখনি সহজজ্ঞানের বিষয় হয়, তখনি তাহা প্রকাশ হইয়া বসিয়া আছে।

* সুতরাং সাধারণতঃ লোকের যে ধারণা

যে, তাদের অনেক বিষয়েই বোধ আছে কিন্তু কবি বা চিত্রকরের মত প্রকাশের শক্তি নাই, কোচে এই ধারণাটা একবারেই তুলো বলিয়া উড়াইয়া দেন। তিনি বলেন, সাধারণ লোকের মনের বিষয়েই যে বোধ থাকে, সেটা অত্যন্ত আবছায়া ও ভাসা-ভাসা, সেইজন্যই তাহা প্রকাশে স্পষ্ট হইয়া উঠে না। প্রত্যেকের জীবনযাত্রার কিছু পরিমাণ প্রকাশ অবশ্যই দরকার করে—কিন্তু সে কতটুকু প্রকাশ? যেমন বই না পড়িয়া হুচী ও নির্বণ্ট পড়া—সাধারণ লোকে ঐ নির্বণ্ট পড়িয়াই কাজ চালায়, তাদের বই পড়ার আর দরকার হয় না। সেইজন্য তাদের মধ্যে কবি বা শিল্পীর প্রকাশশক্তি নিতান্ত কণা পরিমাণে আছে, কেননা তাহা যদি না থাকিত তবে কবি বা শিল্পীকে বৃথিব্যের শক্তি তাদের থাকিত না। সুতরাং কোচের মতে সাধারণ লোক এবং প্রতিভাশালী আর্টের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নাই, যাহা কিছু পার্থক্য তাহা পরিমাণগত ("Quantitative")। এক আধটুকু সহজ বোধের প্রকাশ সবলোকের পক্ষেই করা সম্ভব; কিন্তু নানা ভাবের সহজবোধের বিভিন্ন জটিলতার প্রকাশ বড় আর্টের ভিন্ন আর কারো দ্বারা সম্ভাবনীয় নয়।

আর্টের তথ্যে একটা চিরকালে তর্ক আছে যে, আর্টের বিষয় বড় না রূপ বড়? 'Content' বড় না 'Form' বড়? না, দুয়ের সম্বন্ধেই আর্ট হয়। কোচে বলেন যে, আর্টের রূপটাই বড়, আর্ট রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে সহজ জ্ঞান

ও প্রকাশের মধ্যে যখন কোন ভেদ নাই, তখন আটকে প্রকাশ হই' আর, কি বলা যাইতে পারে ?

অতএব, সহজ জ্ঞানই আটকের একমাত্র বিষয় এবং সহজজ্ঞান মানেই প্রকাশ—ক্লোচের এই মত মানিলে এ কথা বলার উপায় থাকে না যে, কেবলমাত্র অহুত্বই আটকের বিষয়, কেননা অহুত্বভিটা সহজ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। এবং এই মতে, এ খিওরিও টেকে না যে, মাহুয়ের কতগুলি বিশেষ বিশেষ রসবোধ বা "Aesthetic senses" আছে এবং সেইগুলিই আটকে সৃষ্টি করে। কারণ, ক্লোচের মতে সকল রকমের বোধেরই স্থান আটকে আছে, শুধু সৌন্দর্য্য-বোধের ত নয়।

ক্লোচ বলেন যে আটকের ক্রিয়া সমস্ত রকমের সহজ বোধকে বা "impressions"-কে একটা অণুভূত রূপ দান করে; সেই ভিত্তি আটকের প্রত্যেক প্রকাশই আশ্চর্য্য-রূপে স্বতন্ত্র। আট বহুকে এক করে, বিভিন্নকে সচিহ্ন করে। আটের রূপ বা প্রকাশ অণুভূত রূপ বা প্রকাশ বলিরাই আমরা যখন কবিতাকে বিশ্লেষণ করিতে যাই বা ছবির খুঁটিনাটিগুণা আলাদা করিয়া দেখিতে যাই, তখন সেই দেখিবার প্রণালীটা একবারেই ভুল প্রণালী হইয়া পড়ে। মাহুয়ের শরীরটাকে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, হাডু, মাংসপেশী প্রভৃতিতে বিভক্ত করিয়া দেখিতে গেলে যেমন মড়াকেই দেখা যাইতে পারে, স্ত্রীবস্ত্র মাহুয়কে নয়—তেমনি আটের প্রকাশকেও অণুভূত তাহেই দেখিতে হইবে, টুকরা টুকরা করিয়া তাকে দেখা সম্ভব নয়।

অবশ্য তাই বলিয়া কি তার বৈচিত্র্য দেখিব না? সব প্রকাশই কি সাদৃশ্যিমা, ভাটল প্রকাশ কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেমন কটাহের মধ্যে ধাতুর ইকরা-গলাকে গলাইয়া লইয়া তার তারপরে তার অণুভূতিকে তৈরি করিয়া তোলে, তেমনি সমস্ত সহজ সহজ বোধগুলিকে গলাইয়া তবে আটের রূপ তৈরি হইয়া উঠে। সে রূপ অণুভূত স্বতন্ত্র রূপ। এইজন্য আটকে, কোন রূপের সঙ্গেই কোন রূপের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই।

আটকে এই বিচিত্রতা অণুভূত হইয়া উঠিতেছে বলিরাই, আটকে মাহুয় আপনার সৃষ্টিকে অহুত্ব করিতেছে। আপনার স্তিত্বরূপ সমস্ত বোধকে যখন বাস্তব-রূপে আপনার বাহিরে আটকের মধ্যে মাহুয় অণুভূত করিয়া দেখে, তখন সে আপনার পাশ হইতেই আপনি মুক্ত হয়। এইজন্য আটকনের মধ্যে যেমন হৃৎপিণ্ড-রাগ বা "passion"-এর প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনিই বিরতি ও শান্তি বা "serenity"-র পরিপূর্ণতাও লক্ষ্য করা যায়। "passion"-এর কটাহে বিচিত্র বোধ দ্রবীভূত হইতে থাকে, এবং সৃষ্টির শক্তির মধ্যে আটকের অণুভূত রূপ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

ক্লোচের মত সংক্ষেপে বলিলাম। ক্লোচের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল এইখানে যে, আটকের প্রণালী বিষয় 'Intuition' বা সহজজ্ঞান হইলেও, তাহাই আটকের একমাত্র বিষয় নয়। আটকের বিষয় বস্তু, আট মানেই রস। এই রস ভিনিসটি জ্ঞান নহী—একটি অণুভূত আশ্রয় পীক

বয়ের রস যেমন বাহিরের বস্তকে শরীর বস্ত করিয়া তোলে, আমাদের জনরের রস-বোধও তেমনি বাহিরের জগৎটাকে এবং জ্ঞানের জগৎটাকেও অন্তরঙ্গ আনন্দ-লীলার জগৎ ও রসের জগতে পরিণত করে। আর্টের এই রসজগৎ একটা জগৎ, তাহা বিভিন্ন কুশাশা-পূর্ণ কতকগুলি সহজবোধের সমষ্টি মাত্র নয়। এই অল্প শুধু ইন্টুই-শনের দ্বারা একটা সুছন্দিত সুবিস্তৃত সুন্দর জগৎ গড়িয়া ওঠে না, একটা অগভ্যতাস পাওয়া দাইতে পারে বটে। তার দ্বারা জ্যোতির্ঘর লোক তৈরি হয় না, মধ্যে মধ্যে আলোকের ঝলক পাওয়া যায় মাত্র। বিজ্ঞানে বর্ণনে আমরা গড়ি অ-মূর্ত

concept'এর জগৎ, সাহিত্যে আর্টে আমরা গড়ি স-মূর্ত রসের জগৎ। অবশ্য ক্রোচের এই কথাটা খুবই মানি যে প্রত্যেক আর্টিষ্টেরই এই রস-জগৎ বিশিষ্ট ও বিভিন্ন। অথচ সেই সঙ্গে এই কথাও বলিব যে, সে ভিন্নতা যেন পৃথিবী হইতে শুষ্ক বা বৃহস্পতি গ্রহের ভিন্নতার মত—পৃথিবী, শুষ্ক, বৃহস্পতি প্রভৃতি যেমন এক সৌরজগতের অন্তর্গত, তেমনি প্রতি আর্টিষ্টের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রসগোণক আবার এক পরিপূর্ণ বিশ্বমানব-জগতের অন্তর্গত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, অসংখ্যও যেমন সত্য, অদ্বৈতও তেমনি।

ঐ অমিতকুমার চক্রবর্তী।

সমালোচনা

কাব্যসুখ। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় বিস্তারিত গ্রন্থিত। কলিকাতা, ৩৪নং কলেজ স্ট্রিট, ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। বর্ণপ্রমেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি সমা-লোচনা-গ্রন্থঃ বক্তৃতাচক্রের উপভাস অবলম্বনে রচিত। তবে এ সমালোচনার এখানি একই স্বভাব ধারণের।—লেখক কৃত্তিকার লিখিয়াছেন, বক্তৃতা-স্ট্রিট চরিত্রগুলির এক-একটি পার্থক্য সম্পর্ক ধরিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং সংকৃত সাহিত্যে প্রাচীন ও বর্তমানচক্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা এবং ইংরাজী সাহিত্যে, ঐ স্ট্রিটের যে-সকল চিত্র আছে প্রাসঙ্গিকভাবে সেগুলির সহিতও উক্ত চরিত্রগুলির তিনি তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ও বর্তমানচক্রের সম-সাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সমালোচনা-কালে সুন্দর আদর্শ সহিত বক্তৃতাচক্রের বর্ণনার স্পষ্টতা ও মৌলিকতাও বেথানো হইয়াছে। এই

গ্রন্থে "নন্দ-ভাজ", "বোনে-বোনে", "শান্তী-বৌ" ও "একাদশী পরিবার" শিরক চারিটি অধ্যায় সম্বিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে প্রধানতঃ বক্তৃতাচক্রের উপ-ভাসাবলী ও সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্য হইতে এই সকল পার্থক্য-সম্পর্ক কেমন মধুর উজ্জল বর্ণে চিত্রিত আছে, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে ও বক্তৃতাচক্রের উপভাসে ইহারই আদর্শ কি-ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, লেখক তাহার হৃদয় আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা, বেশ বন্ধ এবং গিলি-গোড়ারের শুনে তাহা উপভাসের মতই জ্বরগ্রাসী হইয়াছে। লেখকের অন্তর্লীন-সত্যের ছাপ সর্বত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। সমালোচনা-বিভাগে এই গ্রন্থখানি মূল্য আলোক সম্পাত করিয়াছে। এ গ্রন্থ প্রত্যেক সাহিত্য-রসিক ও পারিবারিক আদর্শ-সম্বাদীর তুল্য আদর্শের সাক্ষী হইয়াছে। বিধবানির ছাপা-কাসব তাল—উপহার বিধার মত।

পাগলা কোরা। ঐহুক ললিতসুন্দর
যথোপাযায় বিভারয় প্রস্তুত। কলিকাতা, ৩০ নং
কলেজ স্ট্রীট, ভট্টাচার্য এও সন্দের পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত। বর্ণনামে সুস্বিত। মূল্য পাঁচশিকা।
এই গ্রন্থে “তানাহু তব,” “মলক সঙ্কট” প্রভৃতি
সংস্কৃতোক্তি সরস সঙ্গায় ও “কান্দিয়াস” নামে একটি
অঙ্গ-সঙ্গল সম্বন্ধ সংস্কৃত হইয়াছে। কোরুক
সম্বন্ধগুলিতে বহুদলে লেখক সহস্র সহস্র সহিত
সরস ভঙ্গ হাতধারা সিংহাঙ্গ বিদ্যায়ের। কোথাও
অস্বাভাবিকতা পাঁক নাই। গ্রন্থকারের কোয়ারার ভাষা
“পাগলা কোরাও” বাঙ্গালী পাঠকের অবসরটুকুকে
আবোধ-হাসিতে দ্বিগুণ প্রসূর করিবে। এ বহিধানিরও
চাপা কাগজ-বাঁধাই বেশ সমোদয় হইয়াছে।

খুলামাটি। ঐহুক ললিতসুন্দর সেন বাণী-
কুণ্ডল প্রস্তুত। কালিকা দাহাবিধা প্রিটিং ওয়ার্কসে
ঐকীপনতক হাঙ্গ কর্তৃক সুস্বিত। একশক, ঐনিধিল
বোহন সেন, পাত্রী-নিবাস, কালিকা। মূল্য দুই
আনা। এই মোট পুস্তিকার লেখক অল্প পরিদরে
অনেক গুরুত্বীয় তথ্যকথার অবতারণা করিয়াছেন।
গরমহাসে রসকুণ্ডের ও অজ্ঞাত সাধকপণের বাঁধি
সমুদ্র হইতে এই সকল কথার ভাষ ও উপায়ান
সংস্কৃত। সাধারণ লোক-আদল চাড়াই বকল
কতখানি গ্রহণ করিবে, তাহা বিবেচ্য।

ইলিয়াড। ঐহুক সুদীপ্তসুন্দর রায় প্রস্তুত।
একশক, সিঙ্কিহুক সোসাইটি ৩০, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা। সুস্বাদী প্রেসে সুস্বিত। * মূল্য দুই
আনা। এখানি হেলেনিষ্টিক। এ বহিধানিতে বেশ
সহস্র ভাষায় ইলিয়াডের কাহিনীটুকু বিবৃত হইয়াছে।
জন্যের তথ্য সরল, বর্ণনার কোমলতা আভ্যন্তর
বা আকাদন নাই। সেবার গুণে কোরুল আপনা
হইতেই উত্তীর্ণ হইয়া উঠে। হেলেনা এ বহিধানি
পড়িয়া বসেই আবশ্য পাইবে। গ্রন্থে কয়েকখানি
ত্রি আছে।

পড়াশুনা। ঐহুক সুদীপ্তসুন্দর রায় প্রস্তুত।
একশক, ইট রায় এও সন্দের ১০০ নংপার মোট
কলিকাতা। ইট রায় এও সন্দের কর্তৃক সুস্বিত।
মূল্য চারি আনা। এখানি বর্ণিতর গ্রন্থ ভাষ।
এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য—“শিত্তবিশকে বর্ণ ও শব্দের
গুণটুকু জান কেবল, বস্তুটুকু হইলে তাহারা কলিকার
ভিন্ন সহস্র সরল ভাষায় লিখিত বাংলা পড়িতে পারে।”
লেখিকার উদ্দেশ্য এ গ্রন্থে সিদ্ধ হইবে। এ গ্রন্থে
সামান্য বস্তুার সহিত শিত্তকে বর্ণ পরিচয় করা-
বার উপদেশ আছে। নারীই শিত্তকে শিক্ষা বিহার
উপযুক্ত পাত্রী—শিত্তর চিত্তবৃত্তি বুঝিার সহস্র সরল
ভাবে নারী যেমন শিত্তর আশ্বিনিক শিক্ষার ব্যবস্থা
করিতে পারেন, পুরুষ কখনই তেমনটি পারেন না।
সেই জন্যই এ গ্রন্থে মহিলা লেখিকা শিত্তকে বর্ণ
পরিচয় বিহার যে পদ্য নির্দেশ করিয়াছেন,
তাহা শুধুই অভিব্যব নহে, তাহা সহস্র হইয়াছে
এক কাজের হইয়াছে। গ্রন্থখানি বহু চিত্তে যত্নিত
—এক সমস্ত চিত্তগুলিই শিত্তবোধে চিত্তে প্রসূর
আবশ্য ও কোরুল জাগাইয়া তুলিবে। এ গ্রন্থ হাতে
পাইলে পড়াশুনাকে বিকীর্ণিতর মত না ভাবিয়া
হেলেনা খুব সোভনীয় বলিয়াই বুঝিবে।

মুরজ-মুরঙ্গী। ঐহুক সুদীপ্তসুন্দর সর্দা-
বিকারী প্রস্তুত। সীলা প্রিটিং ওয়ার্কসে সুস্বিত।
মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ।

সুভকর্মে গল্প-পড়া। ঐহুক সুদীপ্ত
সুন্দর সর্দাবিকারী প্রস্তুত। কলিকাতা, সীলা
প্রিটিং ওয়ার্কসে সুস্বিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।
এই গ্রন্থে লেখক “সুভকর্মে গল্প পড়া লিখিবার
কয়েকটি বোটাটুকু নিয়ম” বাঁধিয়া বিদ্যায়ের এক
নিম্নের লেখা “বিদ্যায়ের গল্পগল্প” সাহেব কুখিয়া
হা পাইয়াছেন।

• •

ঐসত্যব্রত সর্দা।

কলিকাতা ২৭, কলিকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা প্রেসে ঐহুকসুন্দর বাঙ্গালীয়া সুস্বিত ও ৩, বাণী পার্ক, বাণীপুত্র হইতে
ঐদীপ্তসুন্দর যথোপাযায় হারা প্রকাশিত।

ভারতী

৪১শ বর্ষ]

কার্তিক, ১৩২৪

[৭ম সংখ্যা]

এবারের আগমনী

শরতের সে পোনার আলো কই গো কোথা আজ !

কোথায় বা নেই কিরণ-আলা

নৌলের পায়ে, বকের মালা,

কাণের ঝালর হুলিয়ে-বেওয়া নদীতীরের সাজ ?

পথের পঙ্ক ঘুড়িরে দিহে,

ধানে সোণার টেউ হুলিখে

ফুরফুরে সে শীতল সমীর পিছিয়ে কেন আজ,

ভরা-নদীর অঙ্গে কোথা মৃদঙ্গ আওয়াজ ?

মহামায়া'র আগমনী, সাজবে মাঠ বন,

নাইত জানা, কোথায় পড়ে সে রাঙা-চরণ !

কমল সে তাই সরোবরে

শতদলে দলিল ভরে,

সহিতে তুমি-দ্বার পথে কোমল আত্মরণ,

বাকন করে জানে শুধি-হাকুল সমীরণ !

আয়োজন সে নাই গো কেন আমকে বলকুমে ?

আকাশ বেন ধূসর মেঘে মগ চিতা-ধূমে !

হাহা করে' বইছে হাওয়া,

চোখের অগ্নি কানন ছাওয়া,

কমল-যুগে নাই যে হাসি, নেতিরে অটুটে হুমে,

আলোর চোখে মিলার আলো, পাণ্ডু মরণ-ধূমে !

নির্মীলনে তাঁমে ছেলে শূন্য গৃহঘর,

শত শত মায়ের আশ্রয়, শুধুই চাহাকার !

তাইতে মহামারীর মনে,

নাইরে পূলক আগমনে,

লুটিরে কাদে পথের পরে শিউলী-ফুলের সার

আগমনী গায়না বানী, কাঁদেছে হুঁরে তার

বিসম্বন্ধের বিদায়-বাণ্য,

অশ্রুভরা শোকের কথা,

মায়েরি-কোল-হারা-ছেলের বেদনা অপার,

পর্শদিনের অগ্নি দীপ, কুখন অন্ধকার ।

ত্রিপ্রবদা দেবী.

শিক্ষাশিক্ষা •

কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আগে বা পরে কিছু বলিতে হয়। যন্ত্র পড়ার এই প্রথাটা সকল দেশেই চলিত দেখা যায়। সর্বদেশের সনাতন এই নিয়মকে অগ্রাহ্য করিতে পারি—এমন সাহস আমার নাই। অতএব এ-ক্ষেত্রে কণ্ঠ্য আয়ত্তের পূর্বে আমাকেও হুঁ-এক কথা বলিতে হইবে।—কি বলিব ? নূতন কিছুই নয়। যুগে যুগে বারি অবতার হন তাঁরাই নূতন কথা

বলেন—আমরা সেই সনাতন উপদেশেরই ধূয়া ধরি মাত্র। আজও সেই পুরাতন কথাই এক্ষণে একটু-ব্যাখ্যা করিব।

আমরা সকলেই জানি—এ জীবনটা ছদিনের, অণভক্ষুর,—নবর—

যত্নে ভূপ কাঠখান রহে যুগ পরিমাণ
কিন্তু যত্নে বেহ নাশ না হয় ব্যয়ণ।

কিন্তু এই সত্যেরই পাশাপাশি একই সঙ্গে আর একটা মহাঅসত্য মহাসত্য যে

গাথা রহিয়াছে তাহা কি? না এই কণ্ঠস্বাধী জীবনের মধ্যেও বিরাজিত বেথিতে পাই একটি ভূমি সার্থকতা। জীবন চুইনে নষ্ট হয় কিন্তু এই সার্থকতা অমর ভাবে বংশানুক্রমে মানব জাতিকে অমর করিয়া তোলে। এই জন্তই ইরোরপের যুদ্ধে আজ স্বদেশী বিদেশীর মধ্যে প্রাণদানের এত আগ্রহ এত উৎসাহের বস্তা ছুটিয়াছে।

কিন্তু সার্থকতা এই কথাটা খুব একটা বড় কথা; তুলিলেই মনে কেমন একটা হতাশা আপে, কি করিয়া ক্ষুদ্র আমি এ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিব! অথচ হতাশ হইবার কারণ ইহাতে নাই।—প্রকৃত পক্ষে, বড় ছোটরই সমষ্টি মাত্র, অণু-পরমাণুতেই এই প্রেকাণ্ড অগণ্য। আমরা যদি কেবল মাত্র ছোট্ট মুহূর্ত্তগুলিকেই ধরিতে শিবি তাহা হইলেই আমাদের জীবন অতি সহজে স্মর্যক হইয়া ওঠে। এই মুহূর্ত্তগুলির সম্মুখবাহারেই কবি ভাবনপতের বিজ্ঞানবিদ বহির্গতের রাজ্য হইতে সক্ষম। ইরোরপের লোকে মুহূর্ত্তকে বাঁধিতে জানেন তাই যে কার্যে তাঁহারা অসিদ্ধ থাকিয়া বান তাহাতেও তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা নষ্ট হয় না। ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাদের পথ অনুসরণে সেই কার্যে সিদ্ধ লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষার খুবই অভাব।—সম্ভবতঃ এই কারণেই আমাদের এমন অধঃপতন হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করি—আমাদের দেশের জনবাহু আলস্তসঞ্চারী, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে চোঁটা ঝাঁপিলে আমরা কি এই প্রতিভুল আশ্রয়গুরুকেই আমাদের অনুকুলে

আনিতে পারি না? শীত কি ইংরাজকে বাধিয়াছে না ইংরাজ শীতকে বশ করিয়াছেন? শীতদেশের মানুষ বাহারা তাঁহারা কি এদেশে আসিয়া আশ্রয়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দেন? এমন কি, গরমি কালেও তাঁহাদের টেনিস খেলাটি বাদ যায় না, আর হৃৎপরের রৌদ্রেও মাঠে কুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিতে তাঁহারা মতিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন, নানাকারণে,—প্রধানতঃ শরীর-রক্ষার জন্ত এরকম ব্যায়ামের প্রয়োজন। জাপান ইহারও উর্দ্ধে উঠিয়াছে; জাপানীরা ঝাণ নাক—উচ্চ করিতে সচেষ্ট। জাপানীরা নাকি বলিয়াছে যে একশতাব্দির মধ্যে দেশে আর একটিও ঝাণনাক দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইহাকেই বলি মানুষ!

আমাদেরও মানুষ হইতে হইলে অন্ততঃ আলস্তটাকেও বিসর্জন দিতে হইবে। এখন কি আমরা কাজ করি না বা সারাদিনই আলস্তের স্রোতে গা ঢালিয়া চলি? না তাহা নহে। তবে যে ঝাণটুকু না করিলে ঠিক চলেনা, প্রাণধারণের জন্ত বেটুকু দরকার সেই কাজই আমরা করি। বাহারা এ সম্বন্ধে অসাধারণ এ স্থলে অবশ্য আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগকে বর্জন বিধির মধ্যেই ধরিয়া লইতে হইবে কিন্তু সাধারণত সকলেরই এবং সকল কাজের মধ্যেই কেমন একটা তৎপরতার অভাব, কেমন একটা নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে পারে—ইহা গীতা কথিত নিলিপ্ত ভাব, পরজন্মের স্মৃতি ইহাতে নাক হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইচ্ছাশ্রমে ইহাতে মগন নাই ইহা নিশ্চয়।

কৃষকগণ তাহাদের বাপ-পিতামহের চালে মাঠের কাজ করিয়া যায়—তাঁহা ছাড়া বেশীকিছু উন্নতির আশা রাখেনা। কৃষি মজুর বোরা উঠাইয়া পরলাটি চাতে পাইলেই নিশ্চিন্ত, তাহার উপর আর একটি সারাক্ষণ কাজ করিতে বলিলে তাহারা মনে করে তাহার পক্ষে সেটা অসম্ভব। এমন কি একজন মেথরকে তাহার নিয়মিত কাজ ছাড়া যদি একখানা কোর্দাল ধরিতে বল বা জানালা দরজাগুলো সাফ করিতে বল—ত সে বলিবে—তাঁহা করিলে তাহার জাত ঘাইবে। একজন মেম এই বলিয়া আমার নিকট চূপ করিতেছিলেন;—তিনিয়া হাসিব কি ঝাঁদিব বুঝিতে পারি না। ঘরের দাসী বাঁধি হইতে গৃহিণীগণ পর্বাঙ্ক সকলেই নিজের নিজের বাঁধা কাজ-ইক শেষ করিয়া—আহারান্তে দিবানিদ্ৰার পর কেহ বা পা ছড়াইয়া বলিয়া কেহ বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া বতকণ গল্পের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন ততকণ কোন কাজের চিন্তাতে মন দিলেও কাজ হইত। এইরূপে আমরা কাজকে ক'রিকি হিতে গিয়া কিন্তু নিজেদেরই ক'রিকি দিই। উক্তরূপ গল্পের বেশীটাই পরচর্চা—এবং অনর্থ-উৎপাদক। ইংরাজ যে এ সম্বন্ধে সেবাবি মহাবি ভা নন; কোন বেশেই কেবল নিজেদের লইয়া বা নিজের কথা লইয়া সংসার চলে না। শুধু তৎকাল এই যে তাঁহারা কাজ ভুলিয়া কথা কহেন না। এখন এই কৃষকের সবর ইয়োরপের মেয়েরা বেতন কাজ করেন—তুলিলে অবাক হইতে হয়। কৃষিকার্য্য হইতে শুনিবারক প্রকৃতি প্রকৃতির ভারও তাঁহাদের উপর। নহিলে এ

বড় চলিতেই পারিত না। এ দেশের ইংরাজ মেয়েরাও সারাবিহীন অসম্ভব রকম কাজ করেন। বড় বড় ইংরাজের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া সেথায়ছি তাঁহারা মুখে গল্প করিতেছেন কিন্তু হাতে সৈনিকদের জন্ত সেলাই চলিতেছে।

ইংরাজদের কাছে আমরা বাইরের চালচলন অনেক শিখিতেছি কিন্তু যে সকল গুণে তাহারা এত বড় একটা জাতি, তাহাদের সেই গুণগুলি শিখা করাই কি আমাদের সর্ব্বাঙ্গে উচিত নহে? আমরা এখন চাহিতেছি রাজনৈতিক উচ্চাধিকার, আমরা চাহি স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু এ কার্য্যে যোগ্য হইবার জন্ত ক্রী-পুরুষে ছিলিয়া কি আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন নহে? সে বিষয়ে আমরা কি করিতেছি? এখন গৃহিণীর কেবল রন্ধন-কার্য্যেই নিযুক্ত হইলে চলিবে না—এখনকার উপযোগী ন্যূনাকার্য্যে তাঁহাকে হৃৎক হইতে হইবে। সেই দক্ষতা লাভের প্রধান মন্ত্র সুস্থর্ষের সদ্ব্যবহার। সেই মন্ত্রেই প্রথম আমাদের উত্তমরূপে দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। লেখা-পড়া এবং শিরবিজ্ঞান শিখা সুস্থর্ষ ধরিবার প্রধান উপায়। এবং ইহাতে নারীমাত্রেয়ই অস্বাভাবিক শক্তি উদ্বেষিত হইয়া ওঠে। সুশিক্ষা পাইলে তাহারা নিজের এবং দেশের অনেক কাজ করিতে পারেন।

ছাঃবিনী বিধবাপণ চিরদিনই আমাদের দেশে আত্মীয়ের গলগ্রহ। কক্সকদর বিজ্ঞা-নাগর তাই পুনর্বিবাহ ব্যবস্থাদানে তাহাদের হৃৎ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উদার চরিত্র-মণীষ লোকের বহু চেষ্টাযেও বিধবা

বিবাহ আমাদের দেশে আজও সহজ স্বাভাবিক হইয়া উঠিল না। তবে কি চুঃখভোগ ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। শিক্ষা লাভে তাহাদের জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। যখন কোন বিধবার সুখের দিকে চাইয়াছি চিরদিনই এই কথা আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই ইচ্ছার কি কোনই ফল হয় নাই? সে কথা বিশদরূপে বলিবার স্থান ইহা নহে তবে এইটুকু বলিতে পারি—যে ভগবান কোন শুভ ইচ্ছাকে নিফল করেন না।

কয়েক বৎসর পূর্বে হিরণ্ময়ী দেবী দু'একটি বিধবাকে লইয়া যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে সেই আশ্রম এখন অনেকগুলি বিধবার শিক্ষা ও আশ্রয় স্থান। এ পর্য্যন্ত আর তিনশত বিধবা সেখানে হইতে শিক্ষা ক্ষুদ্র শিক্ষাগানে এবং অল্পাঙ্গ কার্যে ব্যাপৃত আছে। আর ২৫০০ জন অনাথা নারী নিরমিতভাবে এখানে এখন সেখাপড়া এবং শিল্প শিক্ষা করে। কিন্তু একটি শিল্পাশ্রম বা একটি বিধবাশ্রমে দেশের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। সহরে গ্রামে বড় তরু যেমন বহু নারীবিভাগের প্রয়োজন সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষারও প্রয়োজন হওয়া উচিত। এবং এ চেষ্টা বাহ্যিকই করেন তাঁহারা ই আমাদেহ দ্বন্দ্ববাহ-ভঞ্জন।

কেবল বিধবা বা অনাথা নারী কেন সাধারণ নারী মাঝেরই পক্ষে এই অর্থকরী শিল্প-শিক্ষা হিতকর। আজকাল আগের মত অল্প ব্যয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয় না।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থনারী ঘরের দরকার' পিরাণ চাপকান জ্যাকেট কামিজ নিজে প্রস্তুত করিতে পারিলে দরজির খরচ কতটা বাঁচিয়া যায়। মুসলমান কল্যাণ গৃহের অন্তরালে থাকিয়া সূচিকার্য্য করিয়া অনেক সংসার প্রতিপালন করে। ধনীঘরগীর শিল্পশিক্ষা ব্যয়-সঞ্চোচ ক্ষুদ্র ভেদন নহে, কিন্তু কোনরূপ কলাবিত্তা ভাল করিয়া শিক্ষিতে পারিলে মনোবৃত্তি কত ক্ষুদ্র লাভ করিবে। ইহা বাতীত যত্নপ্রস্তুত শিল্প পরোপকারে দান করিয়া আনন্দ এবং প্রশংসা উভয়ই এক সঙ্গে তিনি লাভ করিতে পারিবেন। শুনিতে পাই এক সময়ে ভারতনারী শিল্প-কলার সাতিশয় হুমিপুণা ছিলেন। ভারতের অন্তঃদেশের কথা বলিতে পারি না কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়েরা বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কাঁথা প্রকৃতি নানারূপ হস্ত শিল্প রচনার এখনো সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এ সকল কাজে, সময় ও পরিশ্রম যত লাগে, ততহ্রস্ব লাভ হয় না।—তাই এখন কাটা শিল্পই প্রধানভাবে অর্থকরী। আমাদের দেশে পূর্বে কাটা কাপড়ের ব্যবহার ছিল না সেইজন্য বাঙ্গালা দেশে এত দ্রুতের মধ্যেও দরজি আস্ত নাই। কিন্তু এখন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দরজির কাজও আমাদের শিক্ষিতে হইবে। কাট ছাঁটের সেলাই বাতীত যে সকল আবস্তকীয় হস্ত চাক-শিল্পের বেশী ব্যবহার আছে,—তাঁহার বিক্রয়েও লাভ হইতে পারে। গভর্ণমেন্টের প্রসাদে এরূপ শিল্প বিক্রয়েরও সুবিধা হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট গৃহশিল্পের উন্নতির জন্য বৎসেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইংরাজিতে একটি প্রবাহ

আছে নিজেকে যে সাহায্য করে ভগবান
তাঁহারই সহায় হন। কথাটা বড় সত্য।
পতঙ্গমোচনের সাহায্য এতদূর আমাদের
হৃদয়ত্যাগী চাই। অতএব এরকম নারী
শিক্ষাপ্রম বতই স্থাপিত হয় ততই বেশের
পক্ষে মঙ্গল এবং গাহারা নারীশিল্পের উন্নতির
চেষ্টা করেন তাঁহারাই আমাদের কৃতজ্ঞতা-
ভাজন। এই শিক্ষাপ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং
প্রতিষ্ঠাত্রী মজুমদার মহাশয় এবং তাঁহার

পত্নী এই আশ্রমের মঙ্গলকর বেতন কষ্ট
স্বাকার করিতেছেন, তনিলে তাঁহাদের প্রতি
দুঃখ প্রদানত হইয়া উঠে। ভগবান
সিদ্ধিলাভা যে তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সকল
করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুঃখের
রক্ত দিয়া যে মঙ্গল-প্রদ এতদূর করা যায় তাহার
পরিণাম বার্থ হইবার নহে ইহা আমার
বহু অভিজ্ঞতার ফল।

ঐশ্বর্যকুমারী দেবী।

ইন্দু

প্রিয়বর্ন, প্রিয়ভাষী, সখা-হাস্যমুখী, ভার্য-
আমার সুপ্রিয়ান আনন্দের মতো,—পট্টনের
পুলিশ থেকে আহার্যের বাতী, সারোগ, খাদ্যসি
সকলের কাছে প্রিয়; কেবল অধিন ডাকে
ডাকে প্রিয়া বলে!

কবে কোন্ সূত্রে তারা যে আমার
সীমারের 'গুণক-সভা' বা ভূমিকিন্-ক্লাবের
প্রেসিডেন্ট অবিনের কাছে থেকে এই
সম্মানের উপাধিটা লাভ করেছিলেন তা
আমার মতো একজন নতুন গুণকের
জানা সম্ভব নয়; কেন না সীমারের
ডেকে সবেমাত্র একটি ঐতকাল কাটিয়ে
আমি প্রথম বসন্তে পা দিয়েছি, স্তব্ধতা
গুণক-সভার বাই-ল অহুসারে আমার
এখনো সুখ-দীপ্ত গুণিনি,—আদল বয়েস
আমার বতই হোক না।

এখনকার নিয়ম অহুসারে ক্রমাকারে চার-
পাঁচটা বছর, দিন আট-প্রহর, বড়বড়
সবকটাতে জল-বাতাস আলো-অন্ধকারে

থেরা দিয়ে, চল্লিশের ঘাট পেরিয়ে, উনপঞ্চাশের
বাতাসে পাল ভুলে পঞ্চাশের পারে—
বেথানে চিরবসন্তের কুঞ্জতীরে পাশিরা
শিরা শিরা বলে দিন-রাত ডাকে সেখানে
আমার তরী নিরাপদে এনে জেজ্ঞাতে হবে
তবে যদি শিয়ার খবর পাই! আমার
বয়েস সবে চল্লিশ স্তব্ধতা উনপঞ্চাশে
সুখবাতাসের সঙ্গে শিয়ার খবরও আমার
পেতে এখনো হেরি আছে—যদি না
ইতিমধ্যে হঠাৎ ভালো-মন্দ একটা-কিছু
ঘটে যায়। এমন দু-এক সময় ঘটে যে
খবর না চাইতে খবরটা এসে জোর করে
কানে ঢোকে, যেমন যেখ না চাইতে জল,
এবং গালি জল চাইতে যেমন জল-খাবারের
খাদ্য—বেটা বলব সে কাহিনীটা এমনি-
করেই আমার কাছে পৌঁছল।

হজিল সেদিন লাঠি-ভাঙার মাংসা।
অধিন স্রাঙ্গ ফবিন ধরে লাঠি ভাঙবার
কৌটার কিরছে—কার পিঠে বসে বটে কিন্তু

লাঠি-বংশ তাকে করেও যে রক্ষে পাবে এমন আশা কিছুমাত্র নেই। আমরা সবাই লাঠি আনা ছেড়ে দিয়েছি। কেবল তার-আমার তাঁর নিজের লাঠি আঁকড়ে রয়েছেন। তিনি অবিনশ্বে লাঠি ভাঙতে উকে, দেবার মূল হুতরাং তাঁর লাঠি যে চিরদিন অক্ষত পরীয়ে বর্তমান থাকবে সেটা আশা করা অল্প লোক হলে যেতেনা, কিন্তু তিনি অবিনের শ্রিঙ্গা-উপাধির পাত্র, সেইজন্যই যদি তাঁর লাঠিটাও বেঁচে যায়। সমস্ত আহাঙ্কের মধ্যে এখন হুটমাত্র লাঠি। এক, তারার হাতের ষোড়ার কাটা পা দেওয়া আবলুলের ছড়ি, আর অবিনের হাতের বাঁশের উপরে মিনের কাক-করা আধা-পাখী আধা-মাছব একটি কিররী-বসানো হিমালয়ের দেবদাক খুঁটি।

এই ছই লাঠিতে যেদিন ঠোকাঠুকি বাধলো, সেদিন জলে-বাতাসে স্নেহেতে-আলোতে কোনো বিবাহ ছিল না। এমন-কি ওস্তাদী রাগরাগিনী আজ বাদী-বিবাদী সব সুরগুলো নিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিল। একটা আশ্রম আর শান্তির মধ্যে দিয়ে আহাঙ্ক চলেছে উত্তরের হাওয়া কেটে। জলের ঢেউগুলোতে কিছুমাত্র চকলতা নেই; বেন ঘুমন্ত বৃকের নিশাসের মতো আশ্রমে উঠছে পড়ছে। স্বর্গ্যাস্তের দিকে কোনো রঙের খেলা নেই। স্বর্ণ-টাঁপার মতো একটি দ্বির দীপ্তি সমস্ত পশ্চিম আলো করে রয়েছে। তারি উপরে তাঁয়ের গাছ বেন কালি দিয়ে আঁকা দেখছি। ভরা-পালের নৌকো যেমন, আজকের সন্ধ্যার সমস্ত পৃথিবী তেমনি 'বেন-চম্পাই রঙের একাঙ শালখানি তুলে রাখির মুখে

বজ্রদ্য পতিতে ভেসে চলেছে নিঃসাড়ার। শ্রীতঃসন্ধ্যার অরুণোদয়ের তপ্তকাকনের সঙ্গে কতটা হীম বেশালে সাহসসন্ধ্যার এই টাঁপাফুলি*আলোর রংটি পাওয়া যায়। এটা যখন আমি বিশ্বকর্মার কাছ থেকে মনের নোটবুক টুকে নিছি—বার্ড ক্লাসের একখানা বেকির কোণে বসে, সেই সময় ফাট' ক্লাসের দিকে 'করেন-কি ! করেন-কি' ! রব উঠলো! কেউ আহাঙ্ক থেকে এলে রূপিয়ে পড়ল কি-না দেখবার জন্তে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি অবিন তার হাঁটুর চাড়া দিয়ে তাঁর নিজের লাঠিখানা ধরকের মতো বেঁকিয়েছে; তাঁর মূখ গোলাপফুলের মতো রাঙা; আর-একটু হলই লাঠিখানা হু-ইকরো হয়ে গলা পাবে। ভরাই যে আজকের ধরক-ভঙ্গের নাটের গুরু এবং তাঁর লাঠিটা বাঁচাতে তিনি অবিনকে আপনার লাঠি ভাঙতেই যে উকে দিয়েছেন এটা বুলুম। অবিনের লাঠিটা এত হৃদয় যে সেটাকে ভেঙে-ফেলা আর একটা মাহুকের বাড়-মটকে জলে কেল-দেওয়ার আমার কোনো তকাং মনে হল না। মাহুকের সৃষ্টিকে নষ্ট করাও বা ভগবানের সৃষ্টিকে আঘাত দেওয়াও তাই,—একই পাপ আমি মনে করি। অবিনের লাঠির মাথাই সেই কিররীর বাঁশের সাতটা সুর যেন একটা কান্না নিয়ে আমাকে মিনতি করতে লাগল—'বাঁচাও বাঁচাও'। আমার বৃকের মাঝে কেমন করতে লাগলো কিন্তু মুখ দিয়ে আমার একটি কথাও বার হল না। দেখলেম লাঠিটা ক্রমে বেঁকছে। লাঠি এতটা যে হুইতে পারে তা আমি ধারণাই করতে

পারি-নি! পাহাড়ের রূপ টেনে বেড়েছিল সেই সব দেবদাক্তর জাল! অধিন সমস্ত জোর দিয়েও তাকে ডাঙতে পারলে না। লাঠিখানা বৈকে সাপের মতো তার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তখন আমি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে অবিনের হাত ধরতেই অবিন একটা নিখাণ ফেলে লাঠিখানা ছেড়ে দিলে। দেখলেম সেই নিখাণের সঙ্গে অবিনের মুখ কাগজের মতো পাঙাল হয়ে গেল। যেন একটা প্রকৃষ্ট থেকে উঠে অবিন আমার দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর আমাকে সেই লাঠিটা দিয়ে বললে—“নাও তোমাকে দিচ্ছি।”

লাঠিটা আমার কাছে শিল্প-হিসাবে খুব মূল্যবান স্মরণ্য সেটাকে সহজে বর্খশিস্ নিতে আমার লজ্জা হল। কিন্তু দিয়ে একবার ফিরে নেওয়া অবিনের কুস্তিতে লেখেনি স্মরণ্য অন্তত তখনকার মতো হাতমুখে লাঠিটা আমার নিতে হল। তাছাড়া লাঠিটাকে এখন কিছুদিন অবিন এবং তার স্ত্রী—আমার ভাড়াটির কাছ থেকে সরিয়ে রাখলে সবদিকেরই মঙ্গল, এটাও সেই লাঠিটা খুঁটির সঙ্গে ধস্তাধরি দিয়ে বর্খশিস্ নেবার আর-একটা কারণও বটে। কাছেই লাঠিটা সেদিন আমার হাতে-হাতে আমার বাড়িতেই এল। তাছাড়াও এককোণে সেটাকে রেখে আমি গারের কোট ছেড়ে রাখব এমন সময় বাতির আলোর লাঠির গায়ে একটি বিদ্যুতের রেখার মতো একটা দাগ তল্কে উঠলো—“ইশু”। তিল তিল হীরের আলো দিয়ে সেই দাগ লেখা। লাঠিটা বাইরে ফেলে,

রাখতে আমার আর সাহস হলনা; আমি সেটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখলুম। সঙ্গে নিয়ে খেলুম, সঙ্গে নিয়ে গুলুম। অবিন লাঠিটাকে কি-ভাবে দেখতো তা জানিনে কিন্তু তার ইশু বা ইশুমতী অথবা ইশুমতীর লাঠিটা আমার যেন বুদ্ধত তরুণীর মতো—চলিত কথাই বলব না—হয়ে উঠলো। পাছে তাকে হারাই, পাছে স্ত্রীকে কেটে চোর আমার কোণের কাছ থেকে তাকে চুরি করে পালায় এই ভাবনাতে আমার খেয়ে মুখ ছিল না, গুয়ে খুব ছিল না।

ক-দিন পরে অবিনের সঙ্গে যখন দেখা, তখন প্রথমে আমার ভয় হল অবিন বুঝি-বা লাঠিটা ফিরিয়ে নেয়, যদিও অবিনের কোনো দিন এমন স্বভাব নয় বেশ জানতাম। সেদিন আমি লাঠিটা খুব জোর করে স্মরণ্য ভিতরে যে রাখলুম তা বলতেই হবে। সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা, গঙ্গার একটা মনোরম সোতার মধ্যে দিয়ে আহাঙ্গ চলেছে। পশ্চিমতীরে দেখতে পাচ্ছি সাহেব-মিস্ত্রীর বানানো রাজাদের একটা পুরানো বাগান-বাড়ি; পূর্ব পাশে দেখছি—প্রকাণ্ড একটি মন্দির—ঘাটের ধারেই; পূর্ণিমার চাঁদ জলের উপর দিয়ে একটি আলোর পথ আমাদের আহাঙ্গ থেকে এই ঘাটের কোণ পর্যন্ত রচনা করেছে। আর এই আলোর পথের ধারটিতে আহাঙ্গের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অবিন—পূর্ণিমার চাঁদের দিকজিতে চেয়ে। অবিনকে আমি কতবার এমন-করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু আকাশের পূর্ণ ইশু আর আমার হাতের স্মরণ্য হীরের বিশু দিয়ে লেখা দাগটার

দিল বেধে মনটা আমার নড়ে উঠলো। আমার মনে হতে লাগলো অবিন হয় তো ওই আকাশের চাঁদের মধ্যে তার ইন্দুমতী বা ইন্দুমুখীকে দেখতে পাচ্ছে। হয় তো এই চাঁদের আলোর স্বকৃত্তকে তার গুলির মধ্যে দিয়ে সে তার অনেক দিনের হারানো ইন্দুর কাছে বহু দূর-পথে—বহুদিনের পথে প্রাণের আকৃতি বিরহী স্বপ্নের মতো সারা জীবন ধরে পাঠাচ্ছে—প্রতি পূর্ণিমাগ। হয় তো পূর্ণিমায়ে অবিনের এ-জন্মের ইন্দু ছিল অলকার তরী ত্রাণা ইন্দুরেখা কিররী। হয় তো সেখানে কোনো নাগেশ্বর চাঁপার ফুলবনে অবিনে তাতে প্রথম দেখা; তার পর প্রাণ-বপ্নের মাঝখানে চুজনের সহসা বিচ্ছেদ এবং আকাশ থেকে বসে-পড়া ছুটি তারার মতো, পৃথিবীতে তাদের করে পড়া! এখানে এসে স্বপ্নটা আমার ঘেম আটকে গেল। ওই আতিরিটোলার গলিতে যে অলকার কিররী ইন্দুরেখা ইন্দুবালা চক্রবর্তী, ইন্দুমুখী কী, ইন্দুমতী সুন্দী কিম্বা আরো-কোনো একটা নাম নিয়ে অবিনের ঘরে গৃহিণীপণ্য করতে করতে

অথবা অবিনের সঙ্গে কোটসিং, চালাতে চালাতে হৃদয়স্থের রোগে হঠাৎ মাত্রা পড়ল—অবিনকে তার শেষ-দান এই লাঠিটা দিয়ে—এটুকু মন আমার কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না। আমি ফাঁপরে পড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম সে আমার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছে। আমি লাঠিটা সকোরে ঠুকে বলে উঠেলাম—“এ হতেই পারে না।”

অবিন আন্তে আগন্তে এগিয়ে এসে বলে—“কি হতে পারে না হে আটিষ্ট!”

আমি উত্তর করেম—“আকাশের চাঁদের তুললে পতন! ইন্দুরেখা কিররীর তোমার আহিরীটোলার গৃহিণীপণ্য!”

অবিন গম্ভীর ধারে বাগান-বাড়িটা দেখিয়ে বলে—“ইন্দুরেখা ও-পাড়ার ইন্দু-ভূষণ হলে কি তোমার আপত্তি আছে?”

“কিছু না।”—বলে আমি লাঠিটা ইন্দুভূষণ থাকে দিয়েছিল তাকেই কিরিয়ে দিলেম। কিছু সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ইন্দুরেখার সোনার কাঠিটা আমরাই মুঠোর রয়ে গেল;—হাতের মুঠোর নয়—মনের মুঠোতে।

ঐশ্বরীনাথ ঠাকুর।

নীলপাখী

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাত্রি
বিড়াল
তিসতিল
মিতিল
কটী

হুহু
চিনি
নকরগণ
জানোয়ারগণ
বৃক্ষগণ

রাত্রির আবাস

চতুষ্পাণ্ডবিশিষ্ট এক হৃদয় কক। কক-ভাষার কুকবর্ণের; এবং কুকবর্ণ ত্র্য-সামগ্রী ধারা উত্তমরূপে সজ্জিত। হানট অতিশয় গভীর। একটা কীণ আলো ছলিতেছে। এক উজ্জ্বল আলো

কালোজরর জন্মকালো পোষাক পরিয়া রাত্রি বসিয়া আছে। রাত্রি বেধিতে অতিশয় দুঃখ। তাহার এক পাশে একটা নগ্ন মেয়ে শুইয়া আছে; দুমাইতে দুমাইতে সে হাসিতেছে। অপর দিকে আর-একটা মেয়ে নিশ্চলভাবে গাড়াইয়া; তাহার আপানমন্তক আবৃত।

বিড়াল প্রবেশ করিল।

রাত্রি। কে যার ওখানে?

বিড়াল। (অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে) আমি গো, মা-জননী! বস্ত্র ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি।

রাত্রি। কি হয়েছে বাছা তোর?... তোকে এমন রোগা শুকনো দেখছি কেন? সর্ব্বদা কাশা মাথা—ব্যাপার কি?... বুড়িতে আর বরকে ছুটোছুটি করছিলি বুঝি?

বিড়াল। না মা, সে সব কিছু নয়। ...এ তারি গোপনীর কথা—আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত!...আমি মা, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি, তোমাকে সাবধান করে দিতে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, কিছুই হয়ত করা যাবে না।

রাত্রি। কেন? কি হয়েছে?

বিড়াল। সেই বে গো, কাঠুরের ছেসেটা, নাহ তার তিলতিল; সে একটা ভুড়ড়ে গীরে পেয়েছে। এখন সে তোমার কাছে আসছে নীলপাখী আমার কর্তে।

রাত্রি। এখনও ত আমার কর্তে পারেনি, তবে অত ভয় কিসের?

বিড়াল। কিন্তু নীলগিরিই আমার করবে, যদি না তাকে ভয় দেখিয়ে আটকাতে পার। সব কথা বলি, শোন। আলো আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাহুঘের পক্ষ নিয়েছে। সে তার পাশে

থেকে তাকে পথ দেখাচ্ছে। তার টের পেরেছে যে, নীলপাখী তোমার এখানেই সুকানো আছে। সেইটাই ত আসল, কারণ দিনের আলোর সে বেঁচে থাকে; অস্ত্র প্রায়গার বা আছে, তা কেবল অ্যোৎসার আলোয় বেঁচে থাকে, চোখে রোপ লাগলেই মরে যায়। আলো জানে যে তোমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবার তার এক্কার নেই। সেইজন্য সে তিলতিল আর তার বোন মিতিলকে লাঠাচ্ছে। তুমি ত আর মাহুঘকে আটকাতে পারবে না। সে এসে তোমার দরজা খুলে সমস্ত গুপ্ত সজ্জা জেনে নেবে। আমি ভেবেই পাচ্ছিনে, অণ্টে কি আছে! যদি সত্যি সত্যি সে নীলপাখী হাতে পার, তবে আর আমাদের সর্ব্বনাশের বাকী থাকবে কি?

রাত্রি। তাইত বাছা, তাইত! এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পেলুম না। মাহুঘকে আমি এ ক'বছর ধরে বুঝতে পারিলাম না। তার মতলব কি? সে কি চায়? সব সে আরজ কর্তে চায় না কি? আমার গোপনীর তত্ত্বগুলি ত বাত্রো-জানা সে দখল করে বসেছে। আমার ভূত-প্রেতগুলো সব পালিয়েছে। ভয়-বিভীধিকা ত তার দৌরাণ্যে ঘর থেকে বেরতে চায় না। আদি-ব্যাধিগুলো রোগে ভুগচে—মাহুঘ-ভাগ্যের এমনি জন্ম করে ছেড়েছে।

বিড়াল। জানি মা, সব জানি। এখন সময় বড়ই খারাপ। আমাদের একাই মাহুঘের সঙ্গে লড়তে হবে। ওই যে আগরাল পাচ্ছি, তারা সব আসছে। এখন

কেবল একটা মাত্র উপায় আছে। ওরা হল ছেলেমানুষ। আমরা সব এমন ভয় ওদের দেখাব যে পিছন দিকের বড় দরজাটা খুলতে না ওদের সাহস হয়। কারণ সেইটেই হল নীলপাখীর আড্ডা।

রাজি। (বাহিরের দিকে কান পাতিয়া)
আওয়ায পাচ্ছি। ওরা কি অনেক লোক আসছে ?

বিড়াল। না, বেশী লোক তেমন নেই।
কুটা আর চিনি আমাদের পক্ষে। চল
বেচারীর অস্থ করছে, সে আসতে পারে
নি। আগুনও এস না, কেমনা আলো
তার ফুটন। কেবল ফুফুটাই হল ওদের
পক্ষে। তাকে কিন্তু কোনরকমে আটকে
রাখা সম্ভব নয়।

ভীতচিতে তিলতিল, মিতিল, কুটা, চিনি এবং
ফুফু প্রবেশ করিল।

বিড়াল। (ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া)
এই দিকে ফুফু, এই দিকে। আমি
রাজি ঠাকরপকে সব বলেছি; তিনি
তোমার দেখবার জন্য তারি উৎসুক। কিন্তু
তাকে দাক করবেন। তাঁর শরীর কিছু
খারাপ বলে এগিয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে
দেখা করতে পারেন নি।

তিলতিল। (রাজির প্রতি) সুপ্রভাত !

রাজি। (ফুফু হইয়া) কি ! অপমান
করতে এসেছ তুমি ! সুপ্রভাত ! তোমার বলা
উচিত ছিল, ‘সু-রাজি’ !

তিলতিল। (লজ্জিত হইয়া) আমার
দাক করবেন—আমি তা জানকুম না।
(রাজির দুইট ছেলের প্রতি) অস্থূলি নির্দেশ
করিয়া) ও দুই বুরি আপনার ছেলে ?

রাজি। হ্যাঁ। এটির নাম নিত্রা।

তিলতিল। ও অত মোটা কেন ?

রাজি। ও বেশ আরামে ঘুমোর কি না,
তাই !

তিলতিল। আর ওটির নাম কি ?
ও অমন করে সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে কেন ?
কোন অস্থ করছে নাকি ?

রাজি। ওটা নিত্রার বোন, ওর নাম
না বলাই ভাল।

তিলতিল। কেন ?

রাজি। ওর নামটা শুনে ভাল
লাগবে না।...তা দাক, আমরা এখন অন্য
কথা কই, এসো, কাজের কথা।...
বেড়ালের মুখে শুনলুম, তুমি নাকি নীলপাখীর
সন্ধানে এসেছ ?

তিলতিল। হ্যাঁ; সেটা কোথায়, দরজা
করে বলবেন কি ?

রাজি। দেখ বাছা, আমি কিছুই জানি
না।...আমার এখানে সে নেই...আমি
তাকে চোখেও দেখিনি কখনো।

তিলতিল। আলো বে বলেছে সে
এখানেই আছে...আপনি দরজা করে চাষি
গুলো দেখেন কি ?

রাজি। কিন্তু বাছা, তোমার জানা উচিত
ছিল যে দরজা প্রথম এখানে আসে তাধের
কখনই আমি চাষি ছেড়ে দিই না।...
প্রকৃতির গোপনীর বিনিময়লি আমার কাছে
গচ্ছিত আছে; সেগুলি কারো হাতে তুলে
দিতে নিবেদ। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে
তা কোনমতেই দিতে পারি না।

তিলতিল। আপনার কোন অধিকার
নেই অধিকার করবার...মাহুষ চাইবামাত্রই

আপনি সব ছেড়ে দিতে বাধ্য।...আমি
এ সব কথা ভাল জানি।

রাজি। কে তোমার বলেছে?

ভিলভিল। আলো। •

রাজি। আলো! সব তাতেই
আলো!...কি সাহসে সে এসব কাজে
হাত দেয়?

কুসুর। হুজুর, হুকুম হরত আম
জবরদস্তিতে বার করে নি।

ভিলভিল। চূপ ক' হতভাগা; অভভ
কোথাকার!...(রাজির প্রতি) আসুন, দয়া
করে আমার চাবিভিল দিন।

রাজি। চাবি ত চাইচ। তোমার
কাছে এমন-কোন মিশানা আছে কি?

ভিলভিল। (ইপিতে হাত দিয়া)
এই দেখুন হীরে।

রাজি। আচ্ছা, তাহলে এই নাও
চাবি। ঐ হল-ঘর খোল গিয়ে...কিছু খায়াপ
টারাপ হয় ত তুমি জান...আমি সেদিক
দায়ী নই।

কটী। (উষ্ম হইয়া) কেন, কোন
বিপদ-টিপদ ঘটবে নাকি?

রাজি। তা আর বলতে?...অন্ধকার
বড় বড় সব গর্তের দরজা যখন খুলে যাবে,
তখন যে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে, আমি
তা বুঝতে পারছি না। হলের চারদিকে
লোহার তৈরি, পিতলের তৈরি বড় বড়
ঘর আছে; তার ভিতর দত রানোর
আধি-বাধি, গুঃ-বারিজা, প্রেগ বড়ক, আর
বত সব বিভীষিকা, আপদ-বিপদ করে
হুঃ রয়েছে। আমি নিগতি দেবার সাহায্যে
কি কষ্টেই যে তাদের কয়েক করেছি, তা

আমি জানি। এখন আমি তাদের শাসনে
রেখেছি। তোমরা দেখেছ ত তাদের মধ্যে
একটা যখন ছাড়া পায়, তখন পৃথিবীতে
গিয়ে কি ভয়ানক কাণ্ডই বাধিয়ে দেয়!

কটী। রাজি ঠাকুরণ, আমি বুড়ো
হরে গেলুম এই ছেলে দুটোর হেপাকত
করে; এদের আপদ-বিপদের কথা
আমাকেই আগে ভাবতে হয়। একটা
কথা আপনাকে মিজাসা কর্তে পারি?

রাজি। স্বচ্ছন্দে।

কটী। যদি কোন হাঙ্গামাই বাধে,
তবে পালিয়ে যাবার পথটা কোন্ দিকে?

রাজি। এখান থেকে পালাবার পথ
নেই।

ভিলভিল। (চাবি হাতে অগ্রসর
হইয়া) এই দরজাটাই আগে খোলা যাক।
...এর ভিতর কি আছে?

রাজি। বোধ হয় এটা ক্ষুভের ঘর।
একবার এর দরজা আমি খুলেছিলাম, সেই
সময় গোটা কতক বেয়িরে পড়েছিল।

ভিলভিল। আমি খুলে দেখি। (কটীর
প্রতি) খাচা ঠিক আছে ত?

কটী। (তবে তার গাত বাহির
হইয়া পড়িয়াছিল) আমি ভয় পেয়েছি
ডেবো না, তবে বলছি কি যে দরজাটা
না খুলে দুটোর ভিতর দিয়ে উকি মেয়ে
দেখলে ভাল হত না?

ভিলভিল। তোমার পরামর্শ আমি
গুনতে চাই না।

ভিলভিল। (কাঁদিতে শুরু করিল)
আমার বড্ড ভয় করছে...চিনি কোথায়
গেল...আমার বাড়ী নিয়ে ছুক।

চিনি। এই বে হেথায় আমি, এই বে। কেরো না।

তিলতিল। বাস্, ঢের হয়েছে।

চাষি খুঁটাইয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিল। অমন পাঁচ ছয়টা ভূত নিমেষে বাহির হইয়া হলের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মিতিল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। কঁটা হাঁটমাঁট করিয়া বাঁগা কেলিয়া হলের পিছনে গিয়া পুকাইল। ভূতগুলোকে ধরিবার জন্য হাজি তাহাদের পন্যতে ছুটিল।

রাজি। তিলতিল, শিগগির দরজা বন্ধ কর, শিগগির, নইলে সবগুলোই পালিয়ে যাবে, শেষে একটাও ধরা যাবে না।

রাজি অনেকক্ষণ ভূতগুলোর পন্যতে ছুটিয়া মগের-মুখওয়ালা চাঁতের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া আনিতে লাগিল।

তোমরা আমার সাহায্য কর, শিগগির এস।

তিলতিল। টাইলো, দাঁড়িয়ে দেখছ কি, শিগগির যাও, ওঁকে সাহায্য কর।

কুকুর। (লাকাইয়া চীৎকার করিয়া) হাঁ, হাঁ, এই বে!

তিলতিল। কঁটা কোথায় গেল, ও কঁটা!

কঁটা। (হলের পিছন হইতে সতর্ক) এই বে আমি এখানে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা পালাতে পারবে না।

ইতাবদর একটা ভূত সেইদিকে গিয়া পড়ায় কঁটা তীব্রতর চীৎকার করিয়া গলাইয়া আসিল।

রাজি। (তিনটা ভূতের ঘাড় ধরিয়া আনিতেছিল) চল এইদিকে। তিলতিল, দরজাটা একটু ফাঁক কর ত। (ধাকা

দিয়া ভূতগুলোকে ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল। কুকুর আরও তিনটাকে তাড়াইয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া ফেলিল। তিলতিল তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিল।

তিলতিল। (অন্ত এক দরজার নিকট গিয়া) এর মধ্যে কি আছে?

রাজি। তা শুনে আর কি হবে? সেখানেই ত ব্যাপার! নীলপাখী এখানে নেই, আমি আগেই ত বলেছি। দরজা খুলতে চাও, সে তোমার ইচ্ছে। এর ভিতর কিন্তু অন্ন, কাশি এরা সব থাকে।

তিলতিল। (তালা খুলিতে খুলিতে) এবার আমি খুব সাবধান হব!

রাজি। এদের বোলায় তা দরকার হবে না। বেচারারা অতি নিরীহ। চুপচাপ পড়ে থাকে! এতটুকু মুখও ওদের নেই। মানুষ এখন ওদের ওপর কি জুলুমটাই না করছে...দরজা খুলে ফেলো, দেখতে পাবে।

তিলতিল। (দরজা একেবারে ফাঁক করিয়া খুলিয়া দিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না) এরা ত কৈ বাইরে বেরচ্ছে না?...

রাজি। আমি ত বলেছি, এরা ভারি নিরীহ।...ভক্তগণদের অত্যাচারে বেচারারা একেবারে নিরুন্ম হয়ে গেছে। একবার ভিতরে ঢুকে দেখে এসো, ওদের অবস্থাটা।

তিলতিল। (ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আসিল) এর ভিতর ত কৈ নীলপাখী নেই। ওরা সকলেই বড়

কাহিল বোধ হল; কেউ একবার মাথাও তুলে না।

এই লম্বা একটা স্তূপ দ্বীপ মাথের আশে বাহিরে আশিরা হলের মধ্যে ঘুরিতে পারিল। তার সর্বদা গরম কোটে ঢাকা, মাথায় একটা চুল্লি হুপি।

ঐ দেখ একটা পালাচ্ছে...কে ও ?

রাত্রি। ও হল সর্দি-কাশি। অস্ত্র সকলের চেয়ে ওর দুর্দশা কিছু কম। ওর স্বাস্থ্যও মন্দ নয়।...ওহে ও সর্দি-কাশি, তুমি পালাচ্ছ কোথায় ? এদিকে এস। এখনও সময় হয় নি।...দীপের এখনও চের দেয়।

সর্দি-কাশি হাঁচিয়া, কাশিয়া নাক বাড়িতে বাড়িতে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল; তিলতিল তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া বিল।

তিলতিল। (অস্ত্র একটার কাছে গিয়া) এইটে এবার দেখা যাক। এর ভিতরে কি আছে ?

রাত্রি। সাবধান ! এখানে যুদ্ধের সব থাকে। এরা যেমন বলবান, তেমনি ভয়ানক। ভগবান জানেন, এঁদের একটা বধন ছাড়া পায়, তখন কি বিভ্রাটই না ঘটে। সৌভাগ্যের বিষয়, এরা যেমন মোটা তেমনি ভারি, সহজে নড়তে পারে না। তা'হলেও আমাদের খুব সাবধানে থাকা দরকার। তুমি একটুখানি ফাঁক করে চক্কর নিয়ে যে ভিতরটা দেখে নিও; আমরাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে দরজা চেপে দরব।

তিলতিল অতি সতর্কণে তার একটুমাত্র ফাঁক করিয়া ভিতরে ঢুকি যারিল, এবং তৎক্ষণাৎ দরজা ঢাঙ্গিা বন্ধিা টেলীতে লাগিল।

শিগ্পির এস, শিগ্পির। বত জোরে

পার, সকলে মিলে চেপে দর। ওরা দল বেঁধে এদিকে আসছে। এই যে দালা মারছে।

রাত্রি। এসো সকলে।... প্রাণপণে চেপে দর বন্ধি, কোথায় গেলে তুমি...ওখানে কি করছ... খুব জোরে খুব জোরে...হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। বাস্কে, কি জোর... এখন সব সেরে গেছে।...তিলতিল, ওদের দেখেছ ত ?

তিলতিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি, কি ভয়ঙ্কর বৃক্ষত, চেহারা,...ওদের কাছে নীলপাখী আছে বলে ত বোধ হয় না।

রাত্রি। ওদের কাছে থাকতেই পারে না। থাকলেও ওরা তাকে খেয়ে ফেলেছে। কেমন, এবার ত মন মেনেছে ?... কোথাও ত পাওয়া গেল না...এখন কি করবে বল ?

তিলতিল। আরি আরও দেখব। আলো আমাদের এতোক জায়গা খুঁজতে বলে দিয়েছে।

রাত্রি। তা ত বলবেই...বাড়ীতে বসে বসে অমন সবাই বলতে পারে।

তিলতিল। (অস্ত্র এক দরজার গিয়া) আচ্ছা, আমরা এইটে খুব...এটাও কি ভয়ানক না কি ?

রাত্রি। না, এতে ভয়ের কিছু নেই। এর ভিতর আমার নিজের অনেক বন্ধুদের সুগন্ধি জিনিষ আছে—অনেকগুলি আলোর রশ্মি আর এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যারা এ পর্যন্ত আকাশে দেখা যায় নি।... তা ছাড়া চমৎকার চমৎকার প্রজাপতি সব, সোশালি রঙের বৌমাছি, ঢলঢল শিশির-

বিশ্ব, নাইটিংগেল পাখীর গান, এই রকম আরও সব সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে।

ভিলভিল প্রশংসাবে বরষা খুলিয়া দিল। নক্ষত্র-জলি হৃদয়ী হৃদয়ীর বেশে বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া কৃৎজকে খোঁচটা টানিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অশ্রুপূর্ণ ভ্রমির মূর্তি স্বাভাবিক করিয়া দিল। হৃৎকি এবং শিশির-বিশ্ব গিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল এবং নাইটিংগেলের সুললিত সঙ্গীত তাগিয়া আসিয়া চতুর্দিক সুবিস্তৃত করিয়া তুলিল।

মিতিল। কেমন সুন্দর মেয়েগুলি!

ভিলভিল। আহা, কি সুন্দর ওয়া নাচ্ছে!

মিতিল। অগ্গ্রে চারিদিক ভ্রমভূর করছে!

ভিলভিল। সুন্দর গান!

রাজি। (হাততালি দিয়া) বাস, আর না।...ওগো নক্ষত্র-হৃদয়ীরা, এবার তোমরা শব্দে ফিরে এস। এখন তোমাদের নাচবার সময় নয়...আকাশ পরিষ্কার নয়...ভরস্কর মেঘ করে রয়েছে।...শিগগির ঘরে যাও, নইলে আমি রোদ্দুরকে ডাকব।

নক্ষত্র, শিশিরবিশ্ব একত্রে ওড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই সঙ্গে নাইটিংগেলের গানও ধামিয়া গেল।

ভিলভিল। (পিছনের একটা দরজার) এই যে একটা বড় দরজা...এইটে এবার খোলা যাক্।

রাজি। (সহসা পস্তায় হইয়া) এটা খুলো না; খবরদার!

ভিলভিল। কেন?

রাজি। এটা খোলবার বো নেই!...

ভিলভিল। তা হলে এইখানেই নীল

পাখী লুকোনো আছে, নিশ্চয়ই! আলো আমাদের এই রকমই বলেছিল।

রাজি। (বাৎসল্যের স্বরে) দেখ বাছা, আমাদের কথা শোন; তুমি আমার ছেলের মত। তোমার কল্পে যা করেছি, আর করও কল্পে আমি কখনও সেরকম করিনি। আমার নিজের লুকোনো জিনিস সব তোমায় দেখিয়েছি।...তোমাকে ছেলের মত ভালবেসেছি বলেই এতটা করেছি। এখন আমার কথা শোন...আর এগিয়ে না...এখন বাড়ী যাও...ও দরজাটা খোলো না।

ভিলভিল। (আবেগ-ভরে)

কি জন্ত খুলব না?

রাজি। কারণ, আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি মায়া যাও। বার-বার এ দরজা খুলেছে—একটু ফাঁক করে দেখেছে, তারা কেউ আর অন্যত্র ফেরে নি—তাদের কাকেও বনের আর আলো দেখতে হয় নি। ...তাই বলছি, ও দরজা খুলো না। তবে যদি আমার কথা না শুনে নেহাত খুলতে চাও, তবে একটু ধাম, আমাদের নিরাপদ আরগার পার্কের যেতে যাও...তার পর তুমি যা ভাল বোঝ, কর।

মিতিল কাঁধা উঠিল, তবে তার মুখে কথা ফুটিতেছিল না। সে সেখান হইতে পলাইয়া বাইবার জন্ত ভিলভিলকে ধরিয়া টানিতে লাগিল।

কটী। (তবে তার চোখ ঠিকুরাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল) বোহাই ছুঁর, খুলো না। আমি তোমার পায়ে ধরছি...আমাদের দয়া করা...রাজি ঠাক্কণ ঠিক কথাই বলেছেন।

বিভাগ। হুকুর, আমাদের সকলকে কি
যেয়ে ফেলতে চান?

ভিলতিল। দরজা আমি খুলবই।

মিতিল। আমি খুলতে হবে না...
কিছুতে না।

ভিলতিল। চিনি কোথায় গেল!...
দেখ চিনি, তুমি আর কতী মিতিলের হাত
ধরে এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি
দরজা খুলতে যাচ্ছি।

রাজি। পালাও সব এখান থেকে...
প্রাণে বাঁচতে চাও ত পালাও!

(নিজে পলাইয়া গেল)

কতী। থাম, থাম; একটু থাম;
আমাদের পালিয়ে যেতে যাও!

(হলের অপর প্রান্তে গিয়া সকলে
খানের আড়ালে লুকাইল)

হুকুর। আমি থাকব, আমি থাকব;
...আমার ভয় করে নি, আমার ভয় করে
নি, আমি থাকব, আমি থাকব!

ভিলতিল। (হুকুরের পারে হাত চাপ-
ফাইয়া) বেশ টাইলো, বেশ!...একটা
চুরো যাও!...তুমি আর আমি, দুজনে!...
কি বল!...এবার দরজা খুলি?

ভানোর পারে ঢাচি লাগাইয়া দাঁড় হলের অপর
প্রান্ত হইতে ভয়ানক গীৎকার-ধ্বনি উঠিল।
দরজা খুলিতে না খুলিতেই একটা মনোহর উদ্ভাস
প্রকাশিত হইল পড়িল। তদ্ব্যতীত বিভিন্ন
আলোকমালা, উজ্জ্বল ব্রহ্ম তারকার। বসুন্ধর করিতেছে
বেধা বেশ। আর বেধা গেল, অসংখ্য নীলপাখী
—সেগুলি চমৎকার নীল! উপর হইতে নীচে এবং
নীচে হইতে উপরে তাহার। অধিশ্রাব উড়িয়া
বেড়াইতেছিল। হানসী অপূর্ণ নীলবর্ণে উদ্ভাসিত।

ভিলতিল। (বিম্বিত ও চমকিত হইয়া

দেখিতে লাগিল) ওহো, কি আশ্চর্য্য!
(পলাতকগণের প্রাতি) শিশুগির এস,
শিশুগির এস...এইখানেই তারা আছে!
...এই যে নীলপাখী!...এই যে নীলপাখী!
হাজার হাজার রয়েছে!...মিতিল, শিশুগির
এস!...টাইলো কোথায়!...এস, আমাদের
সাহায্য কর!...শিশুগির এস!...(পাখীগুলোর
উপর গিয়া পড়িল) হাতে করে ধরা যাবে।
...এরা পালার না! ভয় পায় না!...
(রাজি এবং বিভীল ব্যতীত সকলে সেখানে
উপস্থিত হইল) ঐ দেখ, কত রয়েছে!...
ওরা চাঁদের আলো খাচ্ছে!...খাঁকে খাঁকে
এত উড়ে বেড়াচ্ছে যে আর কিছু দেখা
যাচ্ছে না!...মিতিল, কোথায় তুমি!...
টাইলো, ওদের কামড়ো না বেন!...আজ্ঞে
আজ্ঞে ধর!

মিতিল। আমি সাতটা ধরেছি...আঃ,
তারি ঝটপট করছে...ধরে রাখতে পারছি না।

ভিলতিল। আমিও এত বেশী ধরেছি
যে সামলাতে পারছি না!...ঐ একটা পালিয়ে
গেল!...টাইলো অনেকগুলো ধরেছে!
এরা আমাদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে—আকাশে
নিরে তুলবে...শিশুগির পালাই চল!
আলো-বেচারা বসে রয়েছে...দেখে কত
খুশী হবে...চল, পালাই চল!...এই পথে!
এই পথে!

পাখীগুলোকে লইয়া তাহার। যাবান হইতে
নিজ্জাত হইয়া গেল। কতী ও চিনি তাহার। সহিত
বিদিত হইল। সকলে হল হইতে বাহির হইয়া
গেল। কেবল রাজি এবং বিভীল যাবানে ফিরিয়া
আসিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে দেখিতে লাগিল।

রাজি। আমার পাখীটাকে তারা ধরতে
পারেনি।

বিভাল। হাঃ, হাঃ, কি মজা!...ওই
বে সেটা টানের আলোর বসে রয়েছে...
অত উচ্চতে নাগাল পারনি।

সহিত দেবিয়া) এগুলো খেতে কি বেশ
লাগে?

সকলে একসঙ্গে নিজস্ব হইয়া গেল।

দৃশ্যান্তর

আলো ভিতরে প্রবেশ করিল। তিলতিল, মিহিল
এবং টাইলো সর্ব্বাঙ্গে পানীগুলোকে হুলাইয়া
ছুটাই আদিল; কিন্তু পানীগুলো সব চেতনা-হীন বলিয়া
মনে হইল। তাহাদের মাথা লট্কাইয়া পড়িয়াছে—
ডানা খুলিয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহারা ঝট্-
পট্ করিতেছে না; কেবল নির্জীব বেহুলাই
হুসিতেছে।

আলো। কেমন! পানীটিকে ধরেছে ত?
তিলতিল। হ্যা, হ্যা, এই বে!...এই
বেশ না!...হাজার হাজার ছিল!...এই
বেশ না!...(আলো-কে দিতে গেল, কিন্তু
বেখিল, মরিয়া গিয়াছে) কি আশ্চর্য্য! যথ
গেছে বে!...তাই ত!...কি করে মলো!
...মিহিল, টাইলো, তোমাদের গুলোই
গেছে?

(বাগ করিয়া মরা পানীগুলোকে
মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিল)

ভারি বিস্ময়!...মলো কি করে!

(হাতে খুঁজ ঢাকিয়া হুঁপাইয়া কানিতে
লাগিল)

আলো। (আদর করিয়া তিলতিলের
পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কেঁদো না
বাবা, কেঁদো না!...যেটা দিনের আলোর
বেঁচে থাকে, সেটাকে ভূমি ধরতে পারনি।
সেটা আর কোথাও গেছে।..আমরা আবার
তাকে খুঁজে বার করব।

হুহু। (এরা পানীগুলোকে আগ্রহের

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বৃহৎ অরণ্য। ঝাউকাল। আকাশে চাঁদ;
অরণ্যাত্মক বহুবিধ প্রাণী বৃক্ষ রাশি; যথা
—গুঁক, বীট, বেখাক, ঝাউ, এলু, সাইয়েদ,
লেহুগাছ, বাঘামগাছ, ইত্যাদি।

(বিভাল প্রবেশ করিল)

বিভাল। ওগো গাছেরা, তোমাদের
সকলকে নমস্কার!

বৃক্ষগণ। (পত্রের মর্ম্মস্থ শব্দ করিয়া)
নমস্কার!

বিভাল। আজ আমাদের বড় শুভ-
দিন!...এমন দিন আর হবে না!...
আমাদের শত্রু আগছে। তোমাদের আত্মাকে
বৃক্ষ করে দিয়ে তোমাদের চাতেই সে
আজ নিজেকে গঁপে দেবে। শত্রু কে,
জান ত? সে হল ঐ কাঠুরের ছেলে
তিলতিল!...কাঠুরে তোমাদের বে কি
অনিষ্ট করেছে, তা বোধ হয় আর বলতে
হবে না!...ছেলেটা নীলপাখী খুঁজে
বেড়াচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম থেকে তোমরা
এটাকে লুকিয়ে রেখেছ। মাহুঘই কেবল
এর সন্ধান আনে!...(বৃক্ষপত্রের মর্ম্মস্থ
শব্দ) এঁা, কি বলছ? কে ভূমি! কাউ-
গাছ?...হ্যাঁ। তার কাছে এক টুকরো
দীয়ে আছে, তা দিয়ে সে অন্ন সময়ের মধ্যে
আমাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিতে পারে,

আর নীলপাখীটাকে জোর করে আদায় কর্তে পারে; কিন্তু তা হলে কি হবে, জানি? আমাদের সকলকে চিরকালের জন্যে মানুষের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে। (বৃক্ষপত্রের মর্মমন্ শব্দ) ও কে কথা কইছে? ওক! ভাল আছে ত? (ওক পত্রের মর্মমন্ শব্দ) এঁা, আরও তোমার সন্ধি সারে নি?...বারোমাস যে রকম ঠাণ্ডা ঘাস জড়িয়ে থাক!...আচ্ছা, নীলপাখীটা তোমার কাছেই আছে ত!...(পত্রের মর্মমন্ শব্দ)...হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে! ছোঁড়াকে মেরে কেলতেই হবে...এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে? (পত্রের মর্মমন্ শব্দ) এঁা, কি বলছ?...ঠিক বুঝতে পারছি না,...ও, আচ্ছা...তার ছোট বোন? সেটাকেও মেরে কেলতে হবে...(পত্রের মর্মমন্ শব্দ) হ্যাঁ, কুকুরটাও সঙ্গে আছে বটে...তাকে ও মারবার কোন উপায় দেখি না...(পত্রের মর্মমন্ শব্দ) কি বলছ?...যুধ দিয়ে?...অসম্ভব. চেষ্টার ক্ষমতা কতি নি...(পত্রের মর্মমন্ শব্দ) আর কে কে আছে? আগুন, চিনি, জল আর ঝটা!...সকলেই আমাদের দিকে, কেবল ঝটাকে একটু সন্দেহ হয়!...আলো শুধু একা মানুষের পক্ষে; কিন্তু সে আসবে না!...আমি তিলতিলকে বুঝিয়েছি যে আলো যেমনি যুমোবে অমনি যেন তারা সূঁকিয়ে বেরিয়ে পড়ে।...এমন সুযোগ কি আর হয়?... (পত্রের মর্মমন্ শব্দ) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, জানোয়ারদের খবর দিতে হবে বৈকি!...খরগোসের কাছে তার নাগরটা আছে ত?

আচ্ছা, তা হলে তাকে একুনি নাগরা পিটে জানোয়ারদের খবর দিতে বল...বাহবা! ঠিক হয়েছে...এদিকে যে এরাও এসে পড়ল!

খরগোসের নাগরার লগ শুনা গেল। তিল-তিল, মিতিল এবং কুকুর প্রবেশ করিল।

তিলতিল। এই কি সেই আরগা?

বিড়াল। (অতিশয় নম্রতা এবং আগ্রহ ভরে অগ্রবর্তী হইয়া) এই যে প্রকৃত এসেছে!...আজ কি হৃদয়, কি চমৎকার তোমার দেখাচ্ছে!...তোমার আসবার খবর আগেরই আমি ওদের দিতে গেলুম।...খবর ভাল!...আজ রাতেই আমরা নীলপাখীটাকে হাত করতে পারব!...দেশের প্রধান প্রধান জানোয়ারদের জড় করবার জন্য আমি খরগোসকে নাগরা পিটুতে বলে দিয়েছি...ওই যে জানোয়ারদের আওরাজ শোনা যাচ্ছে...ওই যে গাছতলার সব একে একে জড় হচ্ছে...কিন্তু ওরা একেবারে তোমাদের কাছে আসবে না...একটু লাজুক কি না! (নানাপ্রকার জানোয়ারের আওরাজ শুনা যাইতে লাগিল, পক্ষ, শুয়ার, মাধা, ঘোড়া, ইত্যাদির। বিড়াল তিলতিলকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গেল) দেখ, কুকুরকে কিন্তু আনা ঠিক হয় নি...সকলের সঙ্গেই ওর ঝগড়া...গাছেদের সঙ্গেও ওর বনে না...আমার ভয় হয়, ও হতেই বুঝি-বা সব পণ্ড হয়ে যায়!

তিলতিল। ওকে কেলে রেখে আসতে পারি নি!...(কুকুরের প্রতি সরোবে) দূর হ হতভাগা! সকলের সঙ্গেই ঝগড়া! দূর হয়ে যা কুই এখন থেকে!

কুকুর। কে? আমি!...কেন?...
আমি কি অপরাধ করছি?

তিলতিল। দূর হ বলছি...তোকে
আমরা এখানে চাই না...বা, দূর হরে
বা!

কুকুর। আমি দুখটী বুঝে থাকব—
একটাও কথা কব না।...তার! আমার
সেখতে পাবে না...আমার মাক কব...
তাড়িয়ে দিও না

বিড়াল। (তিলতিলের প্রতি চুপে
চুপে) ওকে কি এই রকমে প্রসন্ন মিতে
চাও!...তারি অধাধ্য ত!...দাও না বা
কতক বলিয়ে...অসহ করে তুরে!

তিলতিল। (কুকুরকে প্রহার করিল)
এইবার বোধ হয় আমার কথা শুনবি!

কুকুর। (বদ্বন্দ্য) ঠে! ঠে! ঠে!...

তিলতিল। কি বলিস্ এখন!

কুকুর। তুমি আমার মারলে; এবার
আমি তোমার মুখে চুম খাব...

তিলতিলকে লড়াইয়া ধরিয়া ঘন ঘন চুম্বন
করিতে লাগিল।

তিলতিল। আচ্ছা, চের হরেছে, এবার
বাও এখান থেকে!

মিতিল। না, না; কেন ও যাবে?
আমি ওকে যেতে দেব না; ও কাছে
না থাকলে আমার বড় ভয় করে।

কুকুর। (আজ্ঞাসে কঁপাইয়া পড়িয়া
চুম্বনে চুম্বনে মিতিলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া
তুলিল) এই ত কথার মত কথা!...
কি ভ্রমর তুমি!...কি চমৎকার তুমি!...
আর একটা চুমু দাও, আর একটা,
আর একটা।*

বিড়াল। আত্মশয়ক কোথাকার!...
আচ্ছা, দেখা যাবে তখন!...আর সময় নষ্ট
করা ঠিক নয়।...হীরেটী ঘুরিয়ে ফেল।

তিলতিল। কোথার আমি গাঁড়াব!

বিড়াল। এই চাঁদের আলোর...তা
হলে ভাল রকম দেখা যাবে; এইবার
আন্তে আন্তে ঘুরোও।

তিলতিল হীরকটী ঘুরাইয়া দিল। বৃক্ষ সকলের
ডালশালা হিন্ হিন্ শব্দে নড়িল উঠিল। পুরাতন
এবং একান্ত একান্ত গাছের ডাঁড়ি কাঁক হইয়া
দিগা দ্রোতাকের ভিতর হইতে আত্মা বাহির হইতে
লাগিল। বৃক্ষের চেহারা-অসুখারী তাহাদের আত্মা
গুলিও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিল। কেহ
বা হাত-পা লড়াইয়া আসক্ত ভাঙিয়া ওড়ির ভিতর
হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল—বেশ
কতকাল ধরিয়া সব ঘুমাইতেছিল। কেহ কেহ বা
উৎসাহকরে লাফাইয়া বাহির হইতে লাগিল। সকলে
আদিয়া তিলতিল ও মিতিলকে খিরাই দাঁড়াইল।

কাউগাছ। (সর্বপ্রথম অগ্রবর্তী হইয়া
এবং প্রাণপণে চীৎকার করিয়া) মাহু? ...এই
ছোট্ট মাহু?!. আমার এদের
সঙ্গে কথা কইব!...আমাদের মুখ জুটেছে;
নিশ্চয়তা ভেঙ্গে গেছে!... এরা কোথেকে
এসেছে! কে এরা!...কি করে?

(সেবু গাছের প্রতি; সে হুসুট টানিতে টানিতে
সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।)

খুড়ো, এদের চেন কি?

সেবুগাছ। এদের কখনও দেখেছি বলে
ত মনে হচ্ছে না।

কাউগাছ। নিশ্চয় তুমি দেখেছ!...
তুমি সব মাহুবকেই চেনো; তুমি তাদের
ঘরের উপর সর্বদা জুলে থাকো।

সেবুগাছ। (তিলতিল ও মিতিলকে

ভাল করিয়া দেখিয়া) না; আমি ষ্টিক বলছি, এদের চিনি না।...এরা এখনও ভাবি ছেলে মানুষ। আমি চিনি শুধু প্রণবীদেব, যারা চাঁদের আলোয় আমার কাছে আসে। আর চিনি মাতালদের, যারা আমার তলায় বসে সন্ধ্যা যায়।

বাধামগাছ। (চলমাথানি ভাল করিয়া চোখে লাগাইয়া) কে এরা?...বড় গরিব? ...পাড়া-গাঁ থেকে এসেছে বোধ হয়!

কাউগাছ। তোমার কথা যদি বলতে হয়, তুমি ত বড় বড় সহরের রাজা ছাড়া আর কোথাও বড় একটা দেখা দাও না! উইলো। ও ভাই, ওরা আলানি কাঠের জন্তে আমার আমার হাত পা কাটতে এসেছে!

কাউগাছ। চুপ্-চুপ্-; ওক্ আসছে; সে তার প্রাণাধার ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। আজ ত ওকে বড়ই অনুহ দেখছি!...ক্রমশ বড়ো হয়ে পড়ছে কি না! আচ্ছা, ওর বয়স কত হতে পারে?...কেউ কেউ বলে, ওর বয়স নাকি চার হাজার বছর!...আমার কিন্তু মনে হয়, অন্ত নয়...সব কথা আজ সে নিজেই খুলে বলবে।

ওক্ বীরে বীরে লম্বুবে আসিল। সে অতিশয় বৃদ্ধ। একখানি সবুজ আড়ম্বার তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত; মস্তকে লতার মুকুট; সাদা ধবধবে দাড়ি বাতাসে টড়িতছিল। সে অন্ধ। একগাছি মস্ত লাঠির উপর ভর দিয়া আগে আগে সে হাঁটতেছিল। একটা ছোট ওক্ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছিল। নীলপাখীটি তাহার কাঁধের উপর বসিয়া ছিল। সে আসিয়া উপস্থিত হইলে সবুজ বৃক সারথী গাড়াইল এবং তাহাকে সমস্তই অভি-বন্দন করিল।

ভিলভিল। এই যে, এর কাছে নীল-পাখী...শিগগির, শিগগির ওটা আমার দাঁও। বৃকসকল। চুপ্-চুপ্! বিভ্রাল। টুপি খোলো, বৃক সম্রাট ওক্ উপস্থিত!

ওক্। কে পা তুমি?

ভিলভিল। মশাই, আমি ভিলভিল।...নীলপাখীটি কখন আমার ঘেবেন?

ওক্। ভিলভিল? কাঠুরের ছেলে?

ভিলভিল। হ্যাঁ মশাই।

ওক্। তোমার বাবা আমাদের কি উত্তর অনিষ্ট করেছে, জান? কেবল আমার বংশেরই কতজনকে মেরেছে, দেখ। আমার ছ'-ন' ছেলে, পাঁচশ খুঁড়ো-খুঁড়ী আর তাহের ছেলে মেরে বাহো-ন', চার-ন' জন বউ, আর বার হাজার নাতি-নাতুনিকে সে মেরে ফেলেছে।

ভিলভিল। মশাই, আমি আর কিছুই জানি নে। তিনি বোধ হয় ইচ্ছে করে মারেন নি।

ওক্। তুমি কি জন্তে এখানে এসেছ? আমাদের নিরুদ্ভতা ভঙ্গ করে কিজনত আমাদের বাইরে এনেছ?

ভিলভিল। আপনাদের বিরক্ত করেছি বলে মাক চাইছি...বেড়াল বলে, নীলপাখীর সন্ধান আপনারা বলে ঘেবেন।

ওক্। হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি নীলপাখী খুঁজে বেড়াচ্ছ, তার মানে প্রত্যেক জিনিসের গুণ রহস্তচুহু!...তা হলে সব রকম স্বথ হাতে আসবে, আর মানুষ আমাদের দাসত্বটাকে আরও কঠোর করে তুলবে।

ভিলভিল। না মশাই, তা নয়। পরী

বেরাপুনের ছোট মেয়েটার তারি অস্থখ, তারই জন্য এটা দরকার।

ওক্। (চূপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল) ভাল!... জানোয়ারদের আন্তপ্রায় এখনও স্থাননি... কোথায় তারা!...এতে আমাদের যেমন স্বার্থ, তাদেরও তেমন। ...আমরা অর্থাৎ শুধু গাছেরা মিলে একটা সিদ্ধান্ত করলেই চলবে না, তাদেরও মতামত নিতে হবে।

দেবদারু। খরগোলের সঙ্গে জানোয়াররা-সব আসছে; এই যে তারা। ঘোড়া, বাঁড়, ভেড়া, নেকড়ে, শুয়ার, ছাগল, গাধা আর ভালুক একে একে সব এইদিকে এসেছে।

জানোয়ারগণ আদিরা উপস্থিত হইল। দেবদারু এতোকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল এবং তাহারা আদিরা একে একে পছতলায় বসিল। কেবল ছাগল এবিধ শুধিক-খুরিরা বেড়াইতে লাগিল এবং শুয়ার গাছের পেড়ার ঘেঁষা ঘেঁষা করিয়া বাট খুঁড়িতে লাগিল।

ওক্। সকলেই হাজির?

খরগোস। মুরগী তার ডিম ছেড়ে আসতে পারবে না; সম্ভাব্য বাড়ীতে নেই; হরিণের শিং শুধু বাক্য, সে আসতে পারে নি; শেয়ালের অস্ত্র, সে ডাকারের চিঠি দিয়েছে—এই যে চিঠি; হাঁস আমার কথা বুঝতেই পারলে না; আর মোরগ ত চটেই লাল, সে গঙ্গাগিরে চলে গেল।

ওক্। এদের অস্থখস্থিতির জন্যে আমরা চুঃখিত।...বাই হোক এতেই আমাদের সভার কাজ চলবে।...দেখ তাই সব, আমরা কি করতে আজ জড়ো হয়েছি, তা জান বোধ হয়? এই যে ছেলেকী,—ও নীলপাখীকে নিতে,

এসেছে; ইচ্ছে করলে সেটা নিতে পারে। কিন্তু তা হলে যে গুপ্ত রহস্যটুকু আমরা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সৃষ্টির এসেছি, সেটুকু হাতছাড়া হবে বাব।...মাহুকে চেনো ত? একবার এটা পেলে আমাদের দুর্দশার আর আর অন্ত থাকবে না। সেজন্যে আমি বলি যে আর ইতস্তত করা উচিত নয়... আর এক মুহূর্ত্ত ঘেরি না করে ছেলেকাকে খাবড়ে দি, এল।

তিলতিল। ও কি বলছে?

হুহুর। (ওক্কে আক্রমণ করিবার জন্য তার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল)

এইও বুড়ো, পাখী ব্যাটা! আমার দাঁত দেখেছিল?

বীচ। (জুঁক হইয়া) ওক্কে অপমান করছে, দেখ।

ওক্। কে ওটা, হুহুর!...দাও ওকে তাড়িয়ে...বিখ্যাসখাতকের স্থান এখানে নেই...

বিড়াল। (একান্তে, তিলতিলের প্রতি) হুহুরকে তাড়িয়ে দাও ওদের কথার উণ্টো মানে করছে...আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি...কোন ভয় নেই.. হুহুরকে কিন্তু তাড়িয়ে দাও!

তিলতিল। বা বলছি এখান থেকে! হুহুর। হুহুর, হুহুর দিলে এই বেতো, বুড়ো ভিথিরি ব্যাটার পা দুটো খুব কসে আঁচড়ে দি; তারি মজাই হবে এখন!

তিলতিল। চূপ কর পাখী!...তুই বেরো এখান থেকে!

হুহুর। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

...তোমার বরকার আমি আসব।

বিড়াল। (একাত্তরে : চল্লিশের প্রতি) একে বেঁধে রাখাই ভাল, কি জানি কি হান্ধামা বাধিরে বলবে...শেষে গাছেহাও সব চটে যাবে আর সব পণ্ড হবে।

ভিলভিল। বাঁধব কি করে?...শেকল ত আনিনি...

বিড়াল। সেজন্তে ভাবনা নেই, এই বে আইতি রয়েছে .. খুব শক্ত করে সে বেঁধে ফেলাবে।

কুকুর। (গর্জিয়া উঠিয়া) ও, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম; বেড়াল হল বত নষ্টের গোড়া!...ওকে আমি দেখছি।

হ্যাঁতে, কি কিস্ কিস্ করে কচ্ছিস তুই!...ওরে বেইমান, ওরে নচ্ছার, ওরে পালী!...তোঃ, তোঃ তোঃ!

বিড়াল। দেখছ, আমাকে অপমান করছে।

ভিলভিল। বক্ত বাড়াবাড়ি করে চুরে!...আইতি, তুমি ওকে আছা করে বেঁধে রাখ ত!

আইতি। (ভয়ে ভয়ে কুকুরের নিকট গিয়া) কামড়াবে না ত?

কুকুর। (গর্জাইতে গর্জাইতে) না, বরং তার উঠো...একটু খাম...আছা,... তুমি আমার সঙ্গে চল।

ভিলভিল। (ছকি উঠাইয়া) টাইলো!

কুকুর। (ভিলভিলের পারের নিকট ভইরা ল্যাগ নাড়িতে লাগিল) ছকুম করুন, আমার কি করতে হবে?

ভিলভিল। সটান ওরে শক্ত...আইতি

তোমার বাঁধবে...তুমি চূপটা করে থাক, নইলে—

কুকুর। (মুখ ব্রিয়ার পর্জন করিতে লাগিল এবং আইতি তাহাকে বাঁধিতে লাগিল) বাঁধ, বাঁধ, যেমন করে ইচ্ছে, বাঁধ!...দেখ ছকুম, আমার নখগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে, নিখাস চেপে ধরছে!

ভিলভিল। আমি কিছু জানি না... যেমন তোমার নঠামি চূপ করে থাক... নড়িস্ নি...বক্ত বাড় বাড়িয়েছিস্ তুই!

কুকুর। তুমি আগাগোড়া ভুল বুঝছে...বেড়াল নেমকহারামি করেছে...ওরা তোমার মেরে ফেলবে...হুঁশিয়ার হও... এই দেখ, মুখ বাঁধছে...আমি কথা কইতে পারছি না!

আইতি। কোথায় একে রাখব...খুব শক্ত বাধন দিয়েছি...কথা কইবারও বোটা রাখিনি।

ওক্। আমার একটা বড় শিকড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও—একেবারে পিছন দিকে ওর বিচার পরে করা যাবে... আছা, এবার হয়েছে ত?...এখন কাজের কথা বলি...মালুয়ের অভ্যাচার আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে রয়েছে...আমি যে কি ভয়ঙ্কর ব্যতনা ভোগ করেছি, সে আমিই জানি।...এই প্রথম, আজ আমরা মালুয়ের বিচার করতে বসেছি; সেও আমাদের ক্ষমতা বুঝতে পারবে।...যে অনিষ্ট সে আমাদের করেছে, যে রকম নিষ্ঠুরতা সে এদিন দেখিয়েছে, তাতে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে আমাদের কারও এতটুকু আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সমুদ্র বৃক্ষ ও আনোয়ার। না, না, না ;
কিছুতেই নয়!...কাঁসি দাঁড়, মেয়ে ফেল...
ভয়ানক অত্যাচার!...ঘোর অবিচার!
আর লক্ষ হর না!...টুকরো টুকরো করে
ফেল...মেয়ে ফেল...আর ঘেরি না...এই
দণ্ডে...এইখানেই—

তিলতিল। (বিড়ালের প্রতি) এরা
অমন করছে কেন? চটেছে না কি?

বিড়াল। ভয় নেই...একটু বিরক্ত
হয়েছে বটে, কেননা বলন্ত গৃহ আসতে
এখনও ঘেরি...তা হোক; ভয় নেই...
আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

ওক্। তাহলে আমরা ঠিক করে ফেলি
এস, কি উপায়ে হত্যা করা যাবে। কোন্টো
সব চেয়ে সোজা, সব চেয়ে নিরাপদ
এবং কি উপায় করলে বেশী দাগ-টাগ
থাকবে না, যাতে শেষে ধরা না পড়ি।

তিলতিল। এরা কি করছে সব?...
...কিসের এত গুণগোল? আমি ত আর
পারিনা!...ওর ডাছেই নীলপাখী রয়েছে,
দিয়ে কেলেই ত চুক ঘাস!

বাঁড়। সব চেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে
পেঠের নীচে আমার শিরের একটী
গুতো দেওয়া!...বল ত আমি—

ওক্। কে ও কথা কইচে!...

বিড়াল। বাঁড়।

বাঁড়। আমার সব চেয়ে উচু ডাল আমি
দিতে পারি ওদের কাঁসে ঝোলাবার অন্তে।

আইভি। কাঁসি লাগাবার অন্তে খুব
ভাল দড়ি আমি দিতে পারি।

বেবদার। কাঁকনের অন্তে আমি চাক-
খানা তক্তা দিতে পারি।

উইলো। সব চেয়ে সোজা উপায়
আমার মনে হয় নদীতে চুবিয়ে মারা...
আমি তার ভার নিতে পারি।

লেবুগাছ। (নম্রস্বরে) থাম, থাম;
একেবারে অতদূর করাটা কি সত্যি সত্যি
দরকার?...ওরা এখনও বড্ড ছোট। আমি
বলি, ওদের কয়েক করে রাখ, যাতে কোন
অনিষ্ট না করতে পারে। আমি বরং
চারদিক ঘিরে ওদের কয়েকের ব্যবস্থা করে
দিচ্ছি।

ওক্। কে ও? লেবুগাছের মিষ্টি
আওয়ার পাচ্ছি না?

বেবদার। হ্যাঁ, সেই।

ওক্। তা হলে দেখছি, আনোয়ারদের
মত আমাদের মধ্যেও ধর্মস্রোহী আছে...
আজ থেকে তবে ফলের গাছকেও রাজ-
স্রোহী বলে ধরা গেল। ফলের গাছ ত
আর সত্যি সত্যি গাছ নয়!

গুহার। আমি বলি, ছোট্ট যেহেতুকে
আগে পেরে ফেলা যাক্। আহা! কি
মোলাহেমই লাগবে!

তিলতিল। কি বলছে ওটা?

বিড়াল। কি জানি, ওরা কিসের
গুণগোল করছে! গতক বড় ভাল
দেখছি না।

ওক্। এখন কণা হচ্ছে, আমাদের
মধ্যে কে প্রথম হাল্ধককে আক্রমণ করবে?
কে প্রথমে এগুবে?

বেবদার। এ সম্বন্ধে আপনাদেরই প্রাণ,
আপনি হলেন রাজা—আমাদের মধ্যে
প্রধান।

ওক্। কে ও, বেবদার! ভায়া, এখন

আমি বড়ই বুদ্ধ হইছি...গোখত্রী এক
...হাতে আর সে ধোর নেই...সেদিন কি
আর আমার আছে!...তুমিই বরং এ সম্মান
গ্রহণ কর; তুমি চিরশত্রু, উঁচু মাথা,
অনেক গাছের লগ্ন তুমি দেখেছ! আমার
অক্ষমতার এ সম্মান তোমারই প্রাপ্য।
তুমিই অগ্রসর হও।

দেবদাক। ধস্তবাস; কিন্তু ককিনের
লগ্নে তত্তল জোপায় সম্মান বধন আমার
রয়েইছে তখন এর উপর আমার একটা ভার
নিতে গেলে অস্ত্র গাছের উপর অবিচার
করা হয়; এতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হতে পারেন।
সেইজন্তে আমি বলছি যে বীচকেই বরং এ
সম্মান দেওয়া হোক! আমাদের পরে
প্রাচীনত্বে এবং বংশ-মর্যাদায় সেই-ই এ
সম্মানের অধিকারী।

বীচ। তোমরা জানই ত উইপোকায়
আমার লক্ষ্য রাখা করে কলেছে;
ডালগুলো সব কোঁকরা-ঝোর নেই।
কিন্তু এসু আর সাইগ্রেসু বেশ লক্ষ আর
বলবান।

এসু। এ সম্মান আমি আফলাদের
সঙ্গে নিতে পারতুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি
সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না—কাল
রাতে আমার পায়ে বড়ো আত্ম একেবারে
বুড়ো গেছে।

সাইগ্রেসু। আমার যদি বণ ত আমি
প্রস্তুত! কিন্তু আমিও তাঁরা দেবদাকর
হত বেশী অধিকার নিতে ইচ্ছুক নই।
সোয়ের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়;
তা ছাড়া কবরের উপর অস্ত্রপাত করবার
সম্মানও আমার আছে, তবে আমার বাড়ি

আবার আর-একটা কেন?...কাউকে বরং
নিজাঙ্গ কর!

কাউগাহ। আমাকে? সত্যি বলছি
নাকি?...কেন, জান না কি যে কচি
ছেলের হাড়ের চেয়েও আমার কঠিন নয়?
তাছাড়া আমার অবস্থা এখন বড় সাংঘাতিক।
আমি জ্বরে কাপছি—আমার পাতাগুলো
দেখছ না!...ভোর হবার আগেই আমার
তরফের সর্দি ধরবে।

ওক্। (সক্রোধে) দেখছি, তোমরা
মাথাকে দস্তুরমত ভাঙ কর।...চুটো
ছোট ছেলে—একরুতি, কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই
তাদের হাতে, তাড়াও তোমাদের বশ করলে?
তাদের দেখেও ভয়ে কেউ এগুতে পারছ
না?...চোর হয়েছে...আমি একাই বাব; এ
স্ববোধ ত ছাড়া আর না...আমি বুড়ো
হয়েছি—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না—
হাঁটতে পারি না—চোখে দেখতে পাই না—
কিন্তু তাতে কি যায়-আসে!...আমি আমার
চিরশত্রুর বিরুদ্ধে একাই বাব...কোথায়
সে?

লাঠি উচাইয়া তিলকির দিকে অগ্রসর হইল।
তিলকিল। (পকেট হইতে ছোরা
বাহির করিয়া) কি?...বুড়োটা বুঝি লাঠি
নিরে আমাকে মারতে আসছে?

বৃকসকল। (ছোরা সেবিয়া ভয়ে চীৎকার
করিয়া উঠিল এবং বৃদ্ধ ওক্কে আড়াল
করিয়া দাঁড়াইল, ছুরি বার করেছে।...
লাবধান!...ছুরি বার করেছে!

ওক্। (আশ্বাসন করিয়া) বেতে দাঁও
আমার!...তুমিই হোক বা কুড়ালিট
হোক।...কিন্তু যায়-আসে না!...আটকাছ

কেন আমার?...এঁটা, কি বলতে চাও তোমরা?... (নাটি ছুঁড়ি ফেলিয়া দিয়া) আচ্ছা, তাই হোক,...খিক্ আমাদের... আনোয়ারদেরই বলুন আমাদের রক্ষা করতে! ষাড়। বেশ কথা!...বেথ, আমি কি করি? শিঙের এক শাঁতোতেই ঠিক করে দেব!

মিছিল ভরে চাৎকার করিগা উঠিল।

তিলতিল। ভর কিসের?...আমার পিছনে থাক...ছুরি রয়েছে, ভর কি!

ডেড়া। ছোট ছেলেটার দেখছি ভাবি সাহস!

তিলতিল। তোমরা তা হলে সকলেই আমার বিপক্ষে?

গুয়ার। ভগবানের নাম কর; তোমার মরণ উপস্থিত।...কিন্তু ছোট মেরেটাকে অমন করে লুকিয়ে রেখে না... আমি তাকে চোখে চোখে রাখতে চাই... আগে আমি ওটাকে ধাব।

তিলতিল। (ডেড়ার প্রতি) তোমার আমি কি করেছে!

ডেড়া। না, কিছুই করনি...কেবল আমার ছোট ভাইটা, বোন দুটা, কাকাকাকী, ঠাকুর্দা আর ঠাকুর্দাকে তোমরা জবাই করে খেয়েছ।...ধাম, দেখাচ্ছি তোমার মজা। যখন মাটিতে চিংপাত হয়ে পড়বে, তখন দেখবে যে আমারও দাঁত আছে!

গাধা। আর আমারও খুর আছে!

ষোড়া। (উচ্চতভাবে পা আছড়াইয়া) বেথ, আমি ভোর কি দশা করি! এক লাথিতে মাটিতে কেল দাঁত দিয়ে ডোকে কেঁড়ে ফেলব!... (তিলতিলের দিকে ধোঁড়িয়া,

গেল, তিলতিল হোঁরা উঁচাইয়া পাড়াইল, হঠাৎ ষোড়াটা ভর পাইয়া রণে ভঙ্গ দিল) এ কিন্ত ভাবি বিশ্রী!...ও আবার হোঁরা দেখায় যে!...এ রকমটা কিন্ত ঠিক নয়!

ডেড়া। ছোট ছেলেটার ত ভাবি সাহস! গুয়ার। (ভল্লুক ও নেকড়ে প্রতি)

বেথ তাই, তিন জনে মিলে ওদের ধাল করি, এস।..আমি পিছন থেকে তোমাদের সাহায্য করব। ছেলেটাকে মাটিতে কেল দিয়ে মেরেটাকে তিন জনে ভাগ করে খাব।

নেকড়ে। সামনে গিয়ে তোমরা ওকে ভর দেখাও, আমি পিছন থেকে লাফ দি। (তিলতিলের গায়ে লাফাইয়া পড়িল, তিলতিল পড়িয়া গেল)

তিলতিল। পাখও!... (এক হাঁটুতে উঁচু হইয়া প্রাণপণে ছুরি চালাইতে লাগিল এবং মিছিলকে কোনও রকমে বৃকের নীচে ঢাকিয়া রাখিল। আনোয়ার এবং বৃক্ষসকল একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে অশ্রম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিলতিল প্রাণপণে বৃক্ষিতে লাগিল) টাইলো, কোথায় তুমি? শিগগির এস! সাহায্য কর!... টাইলেট কোথা গেল!...টাইলেট, টাইলেট!

বিড়াল। (এক পা তুলিয়া ধরিয়া) আমার চলবার শক্তি নেই, পাটা গেছে—একেবারে মচড়ে গেছে!

তিলতিল। (ছুরি চালাইতে লাগিল এবং প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল) টাইলো, সাহায্য কর—আমি একা পারছি না!...গুয়া অনেক...ভালুক, গুয়ার, নেকড়ে, গাধা, বেবদাক, ষাউ সব একসঙ্গে জুটেছে শিগগির এস টাইলো, শিগগির এস

টাইলো ধীরে হিঁড়িমা এক লাফে আশিস তিলতিলের লম্বুবীন হইল এবং জানোয়ারগুলোকে অসহনভাবে আক্রমণ করিল।

কুকুর। এই যে আমি এসেছি...আর ভয় নেই!...এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আমার গাভের কত জোর!...এই যে ভালুক, এই যে গুগার, এই যে খাঁড়,...কেমন, আর লড়বে?...এই যে গাছের ধল,...এবার তোমাদেরও ঠিক করছি, গাড়াও!

তিলতিল। আমি আর উঠতে পারছি না...সাইগ্রেস্ আমার মাথার খুব এক ধা মেরেছে।

কুকুর। ঠেং, ঠেং! উইলো আমার পা জখম করে দিলে।

তিলতিল। ওরা আবার আসছে, ওই দেখ, নেকড়ে সকলের আগে রয়েছে!

কুকুর। ধাম, ওকে এবার আছা করে দেখিয়ে দি!

নেকড়ে। (কুকুরের প্রতি) বোকা, তোমার এই কাজ!...তুমি শু আমারদের ভাই!...তোমার কি মনে নেই যে তিল-তিলের বাপ তোমার সাত-সাতটা ছেলেকে ঠেঙিয়ে মেরেছিল!

কুকুর। বেশ করেছিল!...সেগুলো তোমারই মত দেখতে হয়েছিল কিনা, তাই মেরেছিল!

জানোয়ার ও বৃক্ষগণ। অধার্মিক!... বিশ্বাসঘাতক!...আহামক! ওকে ছেড়ে দে!...ওটা ত মরে গেছে!...এখনও বলছি, আমাদের ধলো আর!

কুকুর। কখন না!...প্রাণ থাকতে নয়!...তোমরা সকলে এক দিকে, আমি

এক। অন্তরিকে!...ভগবান আছেন, ধর্ম আছেন, ভয় কি!...তিলতিল সাবধান, ভালুক ভেঙে আসছে!...খাঁড়টাও আসছে!...আমি লাফিয়ে ওর ছুঁটি ধরব!...উঃ-হঃ-হঃ, গাধা বাটা এক ধা লাগি মেরেছে রে!...ছুটো দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে! উঃ!

তিলতিল। টাইলো, আমার রফা রফা!...উঃহঃ-হঃ এলুম আমার মাথার আর এক ধা খুব মেরেছে...এই দেখ, রক্ত কুঁষিরে পড়ছে!

কুকুর। আহা, হা! এস, এস, আমি বেশ করে চেটে দি; এখন সেবে হবে!...তুমি আমার পিছনে থাক, ভয় নেই!...আবার ওরা আসছে!...এবার আমাদের প্রাণপণে ঝুখে গাড়াতে হবে!

তিলতিল। (মাটাতে তইরা পড়িয়া) না...আর আমি গাড়াতে পারছি না!

কুকুর। (কাণ পাতিয়া গুনিয়া) ওই তারা আসছে...ওই তাদের আগুয় পাছি...গন্ধ পাছি!

তিলতিল। কোথার!...কে আসছে!

কুকুর। আর ভয় নেই! আলো আসছে!...সে আমাদের খুঁজে পেরেছে!...ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার প্রভু বেঁচে গেলেন...ঐ দেখ গাছগুলো, জানোয়ারগুলো সব পলু হঠ্ছে...ওরা ভয় পেরেছে!

তিলতিল। আলো, আলো! শিগগির এস, শিগগির এস!...ওরা বিমোহী হয়েছে...আমাদের বিপক্ষে গাড়িয়েছে!

আলো এসেছিল। সে এসেছিল কবিরামের বনতুমি আলোকিত হইয়া উঠিল—ভোর হইল।

আলো। কি এ!...বাপার কি!...

কিন্তু বাছা, তুমি করছ কি—জান না?...
হীরেটা ঘুরিয়ে দাও, এখন সব নিশ্চয়,
অলাড় হয়ে যাবে।

তিসতিল হীরকণ্ডে ঘুরাইবামার বুক সকলের
আশা। পিগা শুড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।
জানোয়ারের আশ্রয় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং
কতকগুলি নিরীহ বাড়, ভেড়া, গাধা, ছাগল প্রভৃতি
ঘুরে চরিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। বনভূমি নীরব,
নিশ্চয় হইল। তিলতিল বিষয়ে চতুর্দিকে চাহিয়া
দেখিতে লাগিল।

তিলতিল। কি আশ্চর্য! কোথায়
গেল সব!...কি হয়েছিল ওদের? ওরা...

আলো। না, ওরা সর্বদাই এই রকম
দুর্দান্ত; কিন্তু আমরা তা জানতে পারি না,
কেননা দেখতে পাই না।... আমি প্রথমেই
তোমার বলোছিলাম যে আমি এখন না থাকব
তখন ওদের আগালেই বিপদ ঘটবে!

তিলতিল। (ছুরি মুছিতে মুছিতে)
টাইলোই কাঁচিয়ে দিলে, আর এই ছুরিখানা
..আমার ধারণাই ছিল না যে ওরা এত-বড়
দুর্দান্ত!

আলো। এখন বোঝা সমস্ত ভগ্নভেদ
বিপদে মাহুৎ একাই সব।

কুকুর। প্রিয় দেবতা, তোমার ভারি
লেগেছে!

তিলতিল। তেমন নয়...মিতিলকে
কিন্তু তারা ছুঁতেও পারেনি!...টাইলো,
তোমার কিন্তু বড় লেগেছে...তোমার সুখময়
রক্ত, পা ভেঙ্গে গেছে! আহা!

কুকুর। ও কিছু নয়!...সকাল ধলেই
সেয়ে যাবে। লড়াইটা কিন্তু ভারি অবর
চলেছিল!

বিড়াল। (পিছনের একটা ঝোপের মধ্য
হইতে বাহির হইয়া নোংরাইতে নোংরাইতে)
কি লড়াই-ই বেধেছিল!...উঃ! ঝাঁড়টা
আমার পেটে এমন এক গুঁতো মেরেছিল...
দাগ টের পাওয়া যাচ্ছেনা বটে, কিন্তু
বড় বেদনা!...ওক্ আমার পা ভেঙ্গে
দিয়েছে।

কুকুর। সত্যি?...কোন্ পা-টা!
হ্যাঁ, কোন্ পা-টা!

মিতিল। আহা বেচার!..বড় লেগেছে।
...কোথায় ছিলে তুমি, একবারও ত তোমার
দেখিনি!

বিড়াল। (ভগ্নামির সাহিত) আর মা,
সে কথা বিজ্ঞাসা কর কেন? শুধারটা
তোমার খেতে আগছিল, আমি তাকে
তাড়া করতে গিয়েই না বাণ হয়ে পড়লাম!
আর বড়ো ওক্ অমনি বাগ পেয়ে এক দা
বাগিয়ে দিলে—আমি গজান হয়ে গেলুম।

কুকুর। (সরোবে দাঁত কড়মড়
করিয়া) আমি তাকে একটা কথা বিজ্ঞাসা
করতে চাই...ওরে নেমক্‌হারাম, দুখাল?
আর বেশি তুই আমার সঙ্গে।

বিড়াল। (মিতিলের প্রতি) বেশ না
মা, আমার অপমান করছে...মারবে বলে
পালাচ্ছে।

মিতিল। (কুকুরের প্রতি) আহা,
না, না, ছেড়ে দে ওকে; ওরে এই পাখা,
হতভাগা!

সকলে দিচ্চতে হইয়া গেল।

ক্রমশ

ঐযামিনীকান্ত সোম।

সৌভাত্র

(Tennyson Turner হইতে)

কনকনে শীত মাঘের বিষম রাত
হবে গেছে মাঠে ধান-কাটা সব সাক্ষা,
নিজ নিজ ধান করেছে থামার-ঝাং
এখন কেবল বাকী আছে অধু মাড়া।
সহসা জাগিয়া বড় ভাই সেই রাতে
ভাবিল “বে ধান শেষেছে ভাইটি মোর,
হরত তাহার বছর যাবেনা ডাতে”
বাইল থামারে রাত্রি না হতে ভোর।

কনকনে জাড়ে চোরের মতন গিরা
থামার হইতে লয়ে ধান বোকা-ছর,
গোপনে ভায়ের থামারে আসিল দিরা
ভায়ের দেহটি এমনি গোপনে বর।
টিক সেই রাতে জেগে উঠে ছোট ভাই
ভাবিল—“দামার সংসার চলা ভায়,
ঐ ক’টি ধান—অন্ত উপায় নাই—
ছেলেপুলে লয়ে কেমনে চলিবে তার?”

উঠে ধীরে ধীরে কবল গাধ বুড়ে
বোকা-ছর ধান থামার হইতে গড়ে’
চুপেচুপে গিরে দামার ধানের কুঁড়ে
দিয়ে এলো ভাই মাথায় করিয়া বয়ে।
আপন আপন থামারে বাইরা প্রাতে
ওপে দেখে বোকা যেমন তেমনি রয়,
ভাবে দোহে ভবে স্বপন দেখিল রাতে!
বারবার গোপে বেড়ে যায় বিষয়।

বুড় মোড়ল একথা শুনিল যবে
চোখ দিবে তার দরদর দারা বর,
কহিল “বাণু হে, এমনি হয় ভবে
হুটী হুপি প্রায়ে সমান যখন রয়।”
হুইলেন ডাকি কহে বুড়া তারপর -
“একই গৃহে রও আজি হতে হুই ভাই
আজি হতে হোক তোমাদের কুঁড়ে-ঘর
গ্রামবাসীদের দেবতা-পূজার ঠাই।”
ঐকালিদাস রায়।

ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

ব্রহ্মপুত্র মতানন্তর প্রভাবে ভারত-
বাসীদিগের আচার-ব্যবহার কিরূপ পরিবর্তিত
হইয়াছে তাহা আমি দেখাইরাছি, এক্ষণে
অগ্রসর করা আবশ্যক, এই পরিবর্তনের
কালে ইংরেজ ও ভারতবাসীর পরস্পর

ব্যবহার সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে
কি না।

এক্ষণে, এই উত্তর জাতির সামাজিক
সম্বন্ধ এবং তাহার পর উভয়ের রাষ্ট্রনৈতিক
সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া দেখিব।

প্রথমে সামাজিক সম্বন্ধ।

ভারতীয় সমাজ ও ইংরেজ সমাজ—এই উভয়ের মধ্যে দুইপ্রকার প্রতিকূলতা আছে। একপ্রকার প্রতিকূলতা,—প্রাতি হুইতে, আবহাওয়া হুইতে, হাটহাঙ্গ হুইতে সমুৎপন্ন : উহা হুইতে, একদিকে যেসকল ধর্মসম্বন্ধে, আইন সম্বন্ধে, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পার্থক্য, সেইরূপ আর এক দিকে, রাষ্ট্রসংক্রান্ত সমাজসংক্রান্ত, পরিবারসংক্রান্ত ধারণা ও সংস্কার সম্বন্ধেও পার্থক্য ঘটিয়াছে। অন্য প্রকার প্রতিকূলতার হেতু—সভ্যতার অসমান উন্নতি ; এমন কি যুগোপেও,—অতীতের প্রাতি বাহ্যিক আসক্ত, এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কল্পনা অল্পসারে বাহ্যিক বর্তমানকে সংশোধন করিতে চাহে—এই উভয়ের মধ্যে স্ভাব্যতাই একটু মন-কষাকষি হয় না কি ?

নিরক্ষর সরল লোকের মনে, ইংরেজের রাতিনীতি কিরূপ বিষয় উপাদান করে, M. Kipling তাঁহার দুই নভেলে বেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

“পুত্রোহিত বর্জিত বিবাহ” নামক নভেলে, একজন ইংরেজ সৈনিকপুরুষের সহিত এক মুসলমান-যুবতীর অবৈধ বোন-মিলনের বর্ণনা আছে।

আমরা মেম-লোকদিগকে ঘৃণা করে। এই বলিষ্ঠ সাহসী মেম-লোকদিগকে সারাক্ষেপাড়ী করিয়া সে লাইতে দেখিয়াছে ; উহাদের হাড়ভাষা বুঝেই কম (ধাত্মী ও অগ্না শিওরের রক্ষণাবেক্ষণ করে) ; উহারা

পতিব্রতা। নহে, স্বামীর উপর উহাদের ভালবাসা নাই (সর্বদাই বাহিরে থাকে, আপনাদের সাজসজ্জা, আপনাদের গুণ লইয়াই ব্যাপৃত)।

—“শোন বলি, আমি মরে গেলে, তুমি কি বরবে বল দেখি ? তুমি আমার তোমাদের সেই সাহসী সাদামুখ মেম-লোকদের কাছে কিরে যাবে ? সকলেই ত আপনার লোকের কাছে আমার কিরে যার।

—সব সময়ে না।

—দ্রোলোকরা যার না বটে, কিন্তু পুরুষেরা চিরকালই যার। শ্রীমতী হোক, ছদ্মনি পরেই হোক, তুমি আপনার লোকের মধ্যে নিশ্চয়ই কিরে যাবে। এখানে আমার পক্ষে সবই সমান ; কিন্তু পরম্পরে, তুমি আমা হতে ভিন্ন স্বর্গে যাবে, সে স্বর্গের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই...এ কথা কি সত্যি, সাদামুখ বড় বড় মেম-লোক, আমরা যে পরিমাণে জীবন বাপন করি, তারা তিনগুণ বেশী জীবন বাপন করে ? একথা কি সত্যি, তারা বুড়ো বয়সেও বিয়ে করে ?

—তারা অন্তরের মতোই করে, বিয়ের যোগ্য বয়স হলেই বিয়ে করে।

—তা আমি জানি, তারা ২৫ বৎসর বয়সে বিয়ে করে। সে কথা সত্যি।

—হ্যাঁ।

—ইহা আশ্চর্য ! ২৫ বৎসর বয়সে ! নিত্যও বাধ্য না হলে তোমাদের কোন পুরুষ মাহুদই ১৮ বৎসর বয়সের মেয়েকে বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু ২৫ বৎসর বয়সে আমি ত একেবারেই বুড়ী হয়ে পড়ব। কিন্তু এ

মেম-লোকেরা চির-যুবতী; আমি
হঠকে দেখতে পারি নে!

—ওরা তোমার কি-করেছে?

—আমি জানিমে। হয় তেঁা এই পৃথিবীর
কোন জায়গায় কোন রমণী আছে যার
বরষা আমা অপেক্ষা দশ বৎসর বেশী।
আর আমি যখন বুড়ী পুথুরে হয়ে পড়ব,
তখন তুমি সেই রমণীকে ভাল বাসবে।
এটা কিন্তু ভ্রান্তসম্ভব নয়। তাহেয়ও একদিন
মরণ আছে (১)।”

Lispeth। একজন প্রটেস্ট্যান্ট মিশ-
নারী সতীক আসিয়া পঙ্কাবে বাসস্থাপন
করেন। তিনি একটি পাহাড়ী মেয়েকে
কুড়াইয়া পাইয়া তাহাকে “লিস্পেথ-ইজ্”
করিয়া তাহার নাম রাখেন—Lispeth।
মেয়েটি ক্রমে বড় হইয়া উঠিল; অমন
জন্মের মেয়ে প্রায় দেখা বাইত না। পাঁচকুট
দশ ইঞ্চ দীর্ঘ, সুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, ক্যাকাশে

রং, বড় বড় চোখ। খুব সামান্যিধে, খুব
দম্ভালু, খুব গরীত। একদিন সে দেখিতে
পাইল,— এক প্রাণীতত্ত্ববিৎ ইংরেজ, একটা
প্রজাপতিকে অহুধাবন করিতে করিতে,
থামে পড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাকে জোড়ে
তুলিয়া লইয়া, বাড়ী আসিল। তাহাদের
বাড়ী সেখান হইতে প্রায় ১২ মাইল
দূরে। বাড়ীতে পৌছিয়া পাত্রিসাহেবকে
বলিল:—এই মেয়ে আমার “বর” এনেছি,
একে আরাম করে তুলুন, তারপর আমবা
বিয়ে করব। পাত্রি ও তাহার পৃহিনী,
সাধ্যমুসায়ে ঐ ইংরেজের সেবাওক্রমা করিতে
লাগিলেন। ইংরেজ সারিয়া উঠিলে তাহাকে
বুঝাইয়া বলা হইল, কিন্তু সে তাহাকে ভাল
বাসে ও তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে;
মুখের সামনে একেবারে “না” বলিতে না
পারিয়া, সে সম্মতির ভাণ করিল; এবং শীঘ্র
কিরিয়া আসিবে বলিয়া, দূরদূরেশে চলিয়া

(১) আদ্যায় একটি পুত্র সন্তান হইল (তার নাম “তোতা”)। অতি দৃশ্যর হেলে; হাত-পাওলা
কচি কচি কিন্তু বেশ সুগোল; গায়ের রং অশুভাশী পুথোর হতো সোনাশী। শিশুটি ক্রমে দৃশ্যর
আলোকে হেলে হটয়া ঝাঁড়াইল, সে যত্নের কেড়াসের উপর, তোতাপাখীর উপর ক্রমাগত অজ্ঞানতার করিত;
তার বুজা খাতী, তার আত্মীয়-বন্ধন সর্ববাই তার নিচট “কেঁতো” হইয়া থাকিত। একদিন তোতা
করে আলাও হইল; তাখা চিড়ার হাযল হইয়া তাহার হাতা অবশেষে কলো-রোগে মারা গেল।
তাহার সেই দুঃখোশী হেলে ঝাঁড়া গেল। বলিষ্ঠ জাতি হইতে এহুত এই হেলে রোগ হইতে, হোদের
কষ্ট হইতে মুক্ত হইল। আদ্যায়র পথ-কথাগুলি অতি দৃশ্যর, কিন্তু উহা। হাযু হাযুদর হতোও নয়,
দুদলমাদীর হতোও নয়, উহার ভিতর অনেকটা “আর্টিষ্টের” রচনা, “আর্টিষ্টের” মনোভাও একাধ পায়।
“আমার কিছুই রেখে না। এক গাছি চুলও না। শেষে সে চুলগাছিও পুড়িয়ে কেলেতে তোমাকে সে
বাধা করবে। আর সেই-আঙনের জালায় আমিও জলু। আর একটু হেট্, হও—আরও একটু।
এইটুকু তবু মনে রেখে, আমি তোমারি হিলাব, আমাব পর্তের একটি সন্তান তোমাকে আমি বিয়েছি।
কাল তুমি একজন সাধা-সুখ হমনীকে বিবাহ করবে, কিন্তু এখন অশুত সন্তানের আদ্যর তুমি তার
কাছ থেকে পাবে না। তোমার পুত্র জন্মিলে আমার কথা মনে কোরো, তোমার সেই পুত্র তোমার
নামই ধারণ করবে। আমি তার বলাই দিয়ে মরি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এখন
কোন দিঘর সেই মিনি...তুমি, আদ্যায়র... (without benefit of clergy in Lelife's Hand cap)

গেল। মনে করিল, কালক্রমে লিস্‌পেথ সমগ্রই তুলিয়া যাইবে। যেমন বলা তেমনি কাল। ইংরেজ গ্রহণ করিল। দুই মাস, তিনমাস চলিল গেল। প্রতিদিন প্রাতে লিস্‌পেথ পথের দিকে চাহিয়া তাহার প্রতীক্ষার থাকে। অবশেষে সে অধীর হইয়া উঠিল। তখন পাত্রি-গ্রহিণী তাহাকে সভ্য কপাটা বলিল। লিস্‌পেথ বলিয়া উঠিল “এই রকম করে তোমরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ। সব বুড়াদেরাই মিথ্যাবাদী”। সে তাহার ঘুরোপীয় পোষাক খুলিয়া ফেলিল, এবং নিজের পাহাড়ী কাপড় পরিয়া তাহার নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেল। আবার স্বধর্ম গ্রহণ করিয়া, এক পাহাড়ী ছোকরাকে সে বিবাহ করিল। ছোড়াটা তাহাকে প্রহার করিত, কিন্তু লিস্‌পেথ তবু তাহাকে ভাল বাসিত : আর যাই হোক সে মিথ্যা কথা কহিতে আনিত না (২)।

ঘুরোপীয় আচার-ব্যবহার বেধিয়া শুধু যে সাধারণ লোকে বিমিত হই তাহা নহে, শিক্ষিত ভারতবাসীরাও উহার মর্ম ঠিক বুঝিতে পারে না। মালাবারীর “ইংরেজি জীবনযাত্রার উপর ভারতীয় দৃষ্টি” নামক গ্রন্থে, লণ্ডনের এই বিজ্ঞপাত্ৰক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই :—

“রাস্তার সমস্ত লোকই বে-শ্ম ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার কারণ—গ্রহিবাত, অভ্যাগ্ন বা প্রয়োজন। অবশ্য, এই ব্যস্ততা

ও কণিক উত্তেজনার মধ্যে, অনেকেরই পক্ষে, এই জীবনীতল বায়ুই সুখের বা কাঙ্ক্ষার উদ্দীপনানুরূপ। আমার ভারি আশ্রয় বোধ হয় যখন দেখি, মেয়ে পুরুষ সবাই বোচকা-বুচক লইয়া রেল-কর্মচারীদের সুখের সামনে ছাড়া আন্দোলন করিয়া, ট্রেনে পাগলের মতো ছুটিয়া আসিতেছে। একটি “গিল্লী-বারি” প্রলোক, যে সময়ে ট্রেন ছাড়িবে, ছাড়িবার বাঁশী দিরাছে, টিক্‌সেই শেষ-বুহুর্ন্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পৌছিয়াছে...”

প্রকৃত এসিয়াবাসীর স্তায় মালাবারী আরও এই কথা বলেন :—“এই উন্নত জীবন-চাকল্যের মধ্যে, এই সব লোকেরা কথা কহিবারও অবকাশ পায় না; অল্পট উচ্চারিত কতকগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দমাত্র, একটা পুত্রবাক্য আর শুনা যায় না। রাস্তার এমন একটি লোকও দেখা যায় না, যার চলন-ভঙ্গীতে বা ভাষায় একটু গাভীর্ষ আছে। তুমি যদি সরিয়া না যাও, তোমাকে ঝুড় ভাবে এক ঠেলা দিবে, তোমার পানে একবার চাহিয়াও দেখিবে না। কেহ কেহ ক্ষমা চাহে; কিন্তু তোমার মনে হইবে—অপরোধ ত করিয়াছে, তাহার উপর আমার অপমান (৩)।” এই চিত্রের সহিত মালাবারী-প্রণীত গ্রন্থে আর কতকগুলি কঠোর পৃষ্ঠা যোগ করিয়া দিতে হইবে, বাহাতে মালাবারী ঘুরোপীয় সমাজের মাতলামি, বেস্তাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত পাপ-চারকে চাব্‌কাইয়াছেন।

(২) Lisperth—Plain tales of the hills.

(৩) (Malabari, “The Indian eye on English life” P. 30)

অপক্ষপাত লেখক,—তিনি যেমন দোষ দেখাইয়াছেন, তেমনই অনেক গুণও স্বীকার করিয়াছেন।

ইংরেজের গুণ ও শিক্ষার প্রশংসা করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“ইংরেজদের মধ্যে, গার্হস্থ্য জীবনে সামান্য নীতি অল্পমাত্র হইয়া থাকে। সামান্য অর্থে, মতের স্বাধীনতা ও অস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন। স্বামী ও স্ত্রী,—ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে উল্টা মত পোষণ করিতে পারে; গৃহে কিন্তু উহার এক-প্রাণ। উহার পরম্পরের বিশ্বস্ত সঙ্গী; পরম্পরের প্রেমে আবদ্ধ, একান্ত অল্পমাত্র, সেবা-নিরত; উভয়েই সাধারণ চাকারের কষ্ট স্বংগ করিয়া আনে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সঘন, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যেও সেই রূপ মধুর সঘন। সন্তানদিগের মনে কোন চাকচাক্য তাহ নাই, পিতামাতার মনেও কোন সন্দেহতা নাই। মা ও মেয়ে যেন দুই তগিনী এবং বাপ ও ছেলে যেন দুই ভাই,—তাহাদের ব্যবহারে এইরূপ মনে হয়। পিতা মাতা সন্তানের উপর নিজের প্রভুত্ব জ্ঞারি করে না, সন্তানেরাও স্বকীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করে না। যখন কোলের শিশু, তখন হইতেই প্রত্যেকস্তরায় দায়ের শিক্ষা, দায়িত্ব শিক্ষা লাভ করে; তাহার কিছু কাল পরে, মানসিক শিক্ষাও আরম্ভ হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিটা কি-আভাবিক। শিক্ষা দিবার প্রণালীটাও কি-শ্রীতিকর! এই শিক্ষা ক্লাসিকজনক নহে, এই শিক্ষা “গিলাইয়া বেগুয়া” শিক্ষা নহে”.....

মালাবারী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—ভারত-

বাসীরা ইংরেজ-প্রভুর দোষগুলি না শইয়া শুধু গুণগুলি গ্রহণ করিতে পারেন না কি? কিন্তু তখনই আবার তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে সকল ভারতবাদী শিক্ষালাভ করে, তাহাদের মধ্যে ইহার বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

“আমি অনেক সময় আশ্চর্য হইয়াছি—কেন আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংলণ্ডের কালেজে করেক বৎসর অতিবাহিত করিয়া, শেষে খিটখিটে-মেজাজ ও ভিত্তিবিরত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। উহার কারণ বুঝিতে বেশীদূর বাইতে হইবে না, যে ব্যক্তি সমস্ত অবস্থা জানে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে। ভারতীয় শিক্ষার্থী, ইংরেজ সঙ্গীদের সহিত সমানভাবে মিশিতে পারে না। নিজের বাড়ীতে অন্ন বরসে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহাতে এইরূপ ভাবে মিশিবার ক্ষমতা সে প্রস্তুত হয় নাই। একটা দ্বিধার তার বড়ই অভাব আছে। যে খেলাধুলা ইংরেজি কালেজে, চরিত্রগঠনের ও বজ্জতার প্রধান উপাদান, সেটসব খেলাধুলার সে খুবই পশ্চাদ্-বর্তী। কোন কোন সদাশয় ইংরেজ সহপাঠী, করেক সপ্তাহ তাহার দুরূহি হইতে পারে, কিন্তু তবু সে যেন তাহাকে কাঁধের বোঝা বলিয়া অনুভব করে; কেননা, ভারতীয় শিক্ষার্থী, ইংরেজ ছাত্রের অভ্যাস ও মর্মান্ব-ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কিছুদিন ইংরেজ সহপাঠীরা ভারতীয় ছাত্রের ভাবভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া শেষে উহাকে ছাড়িয়া দেয়—উহার সঙ্গে তাহার কোনো সংশ্রব রাখে না। তখন সেই বিশেষ ছাত্র একলা হইয়া পড়ে। কখন-কখন কালেজের

কিংবা পাড়ার যে সব ছেলে খুব নিকটে-
সভাব তাহারাই উহার দুকবি হইয়া
পাড়ার। সে তখন তামাক খাইতে শেখে,
মদ খাইতে শেখে, জুয়া খেলিতে শেখে,
বাঁজি রাখিতে শেখে, এবং নানা প্রকার
বদখেলাসৌতে টাকা উড়াইয়া দেয়। “কামরা
ভাড়া করিয়া” জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে
তখন সে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাপি নীচ
রকমের বিবিধ অপব্যয় হইতে সে নিত্তার
পায় না। সে রোগগ্রস্ত হয়, পণগ্রস্ত হয়,

শেষে কাগেজের উপাধি লইয়া কিংবা
বিনী উপাধিতেই বেশে প্রত্যাগত হয়।
সে ইংরেজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কতকগুলি
ভুল ধারণা সঙ্গে করিয়া আনে। তাহার প্রধান
কারণ, অল্প বয়সে গৃহের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা
তাহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার
উদ্ধে সে কিছুতেই উঠিতে পারে না। বত
দিন এই দুই জাতির ‘গাহবা’ জীবনে
পার্থক্য থাকিবে, ততদিন অনেক স্থলে
এইরূপই চলিবে।”

ঐন্ধ্যোতিরিস্তনাথ ঠাকুর।

আলোর আলো

বিশ

যমুনার কথা

শিশিয়ার চিঠি পড়ে ছুঁড়িটার উপরে
হাড়ে-হাড়ে চটে গিয়েছিলুম। বটে, আমার
দাদাটিকে ভালমাহুব পেয়ে মাথা খাবার
চেষ্টা? ও ডাইনি, রও, আগে একবার
বাপের বাড়ী যাই, তারপর জীশখটি দিয়ে
নাক কেটে নেব! আমি ঐরকমী যমুনা,
—মাজিষ্ট্রেট দ্বার স্বামী—পক্ষের মুখে ছাই
দিয়ে এখনো অলম্যাস্ত বেঁচে আছি, আমি
ধাকতে এতবড় বৃকের পাটা? উহু,
সেটি হচ্ছে না!

আর দাদাই-বা কেমন মাহুব বাপু!
যেহে হোলে এতদিনে নাস্তি-পুতি নিয়ে বর
করতে হোত, মুখ-নাবাসি করে’ ‘বিরে করব
না বিরে করব-না’ বলে এতখানি বয়স পর্যন্ত

আইবুড়ো থেকে, শেখটা কিনা কোথাকার
কোন্-এক বুড়ো-খাড়া বিধবাকে দেখে
একদম মন-হারিয়ে ফেলা! মন কি আলপা-
ট্যাকের শিকি-চুআনো, যে, বলা নেই কওয়া
নেই—যেখানে-সেখানে বে-টপকা কসু করে’
অমনি হারিয়ে ফেললেই হোল! বাবা,
বাবা, পুরুষের পায়ের নমস্কার!

এমনদমর হাকিমী গেরে জুতো মস-
মসিয়ে স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন।
আমাকে দেখে বললেন, “কার চিঠি পড়া
হচ্ছে?”

—“তোমার চিঠি নয়।”

—“সে ত বুঝছিই—কিন্তু লিখেছে কে?”

—“সে কথা জন্মপ্রকায়। হে মদুর-
পুচ্ছদাত্তা পাঁড়কাক, আগে পুচ্ছ ত্যাগ
করে’ ঠাণ্ডা হয়ে বহন, তারপর ধীরে-স্থৈ
সব গুনবেন।”

—“বসুনা, তুমি না হিন্দুললনা! বামীকে পাড়কাক বলা? অ্যাঃ!”

—“হিন্দুললনার পক্ষে কি সত্যকথা বলাও নিষেধ?”

—“ভাবলে বামীর সঙ্গে নেহাৎ পাড়-কাকটার তুলনা বেওয়া ভায়সম্ভব নয়। চকুলজ্ঞার খাতিরে অন্তত কোকিল বললেও বলতে পারতে ত?”

—“হঁ, পারতুম। কিন্তু কোকিলকে কেউ-কখনো মন্থরপুচ্ছ ধারণ করতে দেখে-নি, তাই তুমি কালো হলোও কোকিল নও!”

—“বটে! তোমরা,—রমণীরা হোজ্জ খিরেটারের কমস্যাট-বাগনার মতন; সে বাগনা না-থাকলে মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করে, কিন্তু থাকলে প্রাণ আকি-আহি ডাক্ ছাড়তে থাকে। জান বসুনা, তোমার কথার আমি ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছি!”

—“ক্রুদ্ধ যদি হও প্রিয়ভম, তবে দিন বুকে আর-একদিন হলো! আজ তুমি ক্রুদ্ধ হলে আমার কার্যোদ্ধার হবে কি-করে? স্তম্ভরায় দ্বারে পড়ে তোমার কাছে আমি মাক চাইছি। কেনন, হোলো ত? যাও, এখন বড়-চুড়ে ছাড়গে!”

বামীকে জলখাবার দিয়ে, পাখার হাওয়া কর্তে-কর্তে আমি বললুম, “কালকে আমি দিনকতকের জন্তে বাগের বাড়ীতে যাব, তোমার মত কি?”

বামীর হাতের রঙ্গগোলা হাতেই রইল—চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, “অ্যা, বাগের বাড়ী! এই একান্ত হরত

বসন্তকালে আমার প্রাণান্ত করে’ তুমি বাগের বাড়ী প্রস্থান করতে চাও? অসম্ভব!”

—“মাক করতে হোল, মহাশয়ের আপত্তিকে আমি বেদবাক্য বলে মাথা পেতে নিতে পারলুম না।”

—“বসুনা, আমার মত-উদার হলেও অন্তঃপুরে আমি Suffragetteএর আন্দোলন সহ করব না।”

—“তা না করতে পার, কিন্তু এই চিঠিখানা দ্বা করে’ পড়তে পারবে ত?”—বলে আমি পিগিমার পত্রখানা তাঁর হাতে দিলুম।

পত্রে পিসিমা লিখেছিলেন, দাদা নাকি কোথাকার এক অজানা ঘরে বিধবা বিবাহ করতে চান, কাকুর কথা শুনেছেন না, আমি যেন পত্র পেয়েই মেরি না করে’ বাগের বাড়ী চলে যাই।

চিঠিখানা পড়েই স্বামী চোমার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। টেবিলে কোরে একটা খুঁসি ঘেরে বলে উঠলেন, “হুস্বে, হুস্বে! সাবাস বোহন, সাবাস! তোমার এতটা সংলাহল হয়েছে—তুমি বিধবা-বিবাহ করতে চাও! সাধু, সাধু!”

আমি মুগ্ধতার করে’ বললুম, “স্বরে বাই আর-কি! আমার দাদা বিধবাকে বিয়ে করবেন বলে হজুরের অন্তটা খুঁসি হবার কারণ কি?”

—“খুঁসি হবে না—বল কি? কুসংস্কারের জন্তে মেনে বিধবাসের কষ্ট কত, জানত। এ কুসংস্কারের হাত এড়াতে পেরেছে বলে বোহন আমার স্তম্ভার পাত। আর, তুমি-ই-

বা কি-বকমের মানুষ যমুনা? তুমি যুখে বল, বিধবাদের বিয়ে-দেওয়া উচিত, আর আজ তোমার ডাই বিধবা-বিবাহ করতে চেয়েছে শুনেই পিছিয়ে দাঁড়াচ্ছ বড় বে?"

—“বা বুড়ি! পিছিয়ে দাঁড়াব না? বার বার জানিনা, কুল জানিনা, পড়াব জানিনা, তাকে বুঝি ধাঁ-করে' বিয়ে করে' কেললেই হোল?”

—“সে-সব না-জেনেই কি আর মোহন বিয়ে করতে চেয়েছে?”

—“পুরুষকে বিশ্বাস করি না। স্ত্রীলোক দেখলেই তাদের জিত দিয়ে জল করতে থাকে, তাদের মাথা ঘুরে বার। তখন তারা না পারে এমন কাজই নেই।”

—“যমুনা, পুরুষের পক্ষ থেকে আমি প্রতিবাদ করে' বলছি, তোমার এ বিশ্বাস ভ্রান্ত।”

—“প্রমাণ?”

—“আমি। অকস্মৎ একদল স্ত্রীলোকের মাঝখানে গিয়ে পড়লে আমি আর মাথা তুলে চাইতে পারি না। জিতে জল আদা চুলোর দাব্, উটে জিত শুকিয়ে আসে!”

—“হম্মারের মত রূপে-গুণে-সেরা স্ত্রী সকলের ভাগো মূল্য নয়! তুমি যে পরস্রীকে মাতৃবৎ দেখ, সে খালি আমার গুণে!—বুঝলে সখা, আমার গুণে!”

—“তোমার গুণ কি আমার গুণ সেটা আমি বলব না; কারণ, তোমার মত আত্মপ্রশংসা করে' আমি পাপসকর করতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু, আর-একটা কথা বলি, শোন। স্ত্রীলোক যখন বক্তৃতা দেয়, একসঙ্গে তখন এল দুটি পাপ করে:—

প্রথম, সে পৃথিবীতে রাবিশের স্তূপ বাড়ার; —দ্বিতীয়, সে তার সৌন্দর্যের মাদুরী নষ্ট করে! অতএব প্রিয়তমে, সাবধান —সাবধান!”

—“তোমার স্ত্রী-চরিত্রের ব্যাখ্যা এখন থামাও গো থামাও। আমার বক্তৃতা যদি বন্ধ করতে চাও, তাহলে এখন আমার বাপের বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে—”

—“হ্যা, আমি তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে দিতে পারি বটে, কিন্তু এক শর্তে।”

—“সন্ততি কি, গুনি!”

—“মোহনের বিবাহে তুমি বাধা দিতে পারবে না।”

—“যদি দাদার যোগ্য ঘর হয়, দাদার যোগ্য বউ হয় তাহলে আমি কোন আপত্তি করব না।”

—“হ্যা, তোমার একথা সম্মত বটে। অজ্ঞা, তোমার কলকাতার দাদার আন্তরিক মঞ্জুর হোল।”

* * *

কলকাতার এসে পিসিমার যুখে সমস্ত গুনগুণ। পিসিমা যেমন ভাবে বর্ণনা করলেন, তাতে বোকা সেল, মেরেটি পেস্তার মত কুৎসিত ও অতিশয় বেহারা, সে একেবারেই গৃহস্থের বউ হবার উপযুক্ত নয়, দাদাকে সে গুণু খাইয়ে গুণ করেছে। আরো যে-সব কথা গুনগুন, তাতে মেরেটার উপরে আমার স্থণা ও রাগের মাত্রা বাড়ল বৈ, কমল না। পিসিমাকে বললুম, তাকে একবার ডাকিয়ে আনিবে বুঝানো থাক যে, তার মত

বিধবাকে বিয়ে করা আমার দামার পক্ষে
অসম্ভব।

সেমিন চুপুরবেলার আমাশের বাড়ীতে
মেরে-সভা যখন বেশ জমকে উঠেছে,
মেরেটিকে তখন ডেকে আনা হোল।

ভেবেছিলুম, হাড়কুৎসিত হৃদয়েহারা
একটা বুড়ো-খাড়ী মেরেকে দেখব। ওমা,
তার বয়সে এ কী! এ যে লজ্জাবতী
লতার মত ছুরে-পড়া, বনফুলের মত
স্বন্দর ছোটখাট একটি সোমের পুতুল!
মনে হোল, বেন ভাল আঁকিয়ের
তুলিতে আঁকা একটি দেবীর সৃষ্টি
কীর্ত হয়ে পট ছেড়ে সভার মাঝখানে
এসে দাঁড়াল! এমন চমৎকার তার
রং, এমন গোলগাল তার গড়ন-পটন যে,
দেখলেই তাকে ভালবাসতে সাধ যায়।
আমি আর চোখ ক্লিরাতে পারলুম না—
অবাক হয়ে তার পানে তাকিয়ে রইলুম।

ইতিমধ্যে শিমা আর তার পাড়া-
বেড়ানী সাদপাঙ্গরা মেরেটিকে বাছেতাই
তুলিয়ে দিতে লাগল। মেরেটিকে বেধে
আমি এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে,
কিছু বলবার অবকাশ পাইনি। তারপর
যখন দেখলুম, এই সরল, লজ্জাশীলা, ভাল-
মাহুষ মেরেটিকে ধল্লরে পেরে পাড়ার
রন্ধিনীরা সবাই মিলে ধা-খুঁসি অপমান
করতে যেতে উঠেছে, আর মেরেটিকে একটিও
কথা না-বলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাপুল চোখে
কঁদছে, তখন তার জন্তে আমারও প্রাণ
কঁদে উঠল।

আমি তার পক্ষ নিয়ে সবাইকে বেশ
দৃ-কথা তুলিয়ে দিলাম। এরা সকলে জানত

যে, আমি মুখ চোটিলে কাকুর মান
বজার থাকবে না। কাল্লে-কালেই তারা
চুপচাপ হয়ে গেল। মেরেটিকে আমি
তখন আবার তার বাড়ীতে পাঠিয়ে
দিলাম।

কিন্তু মন তবু বোঝ মানল না।
আহা, এই সবে-বাণ-হারী অভাগী মেরেটিকে
আজ আমার জন্তেই এত লাঞ্ছনা আর
বাক্য-বহুলা সহ্য করতে হোল—এই ভেবে-
ভেবে তার জন্তে আমার প্রাণটা ছটফট
করতে লাগল। দামার কাণে যদি এসব
কথা ওঠে তাহলে তিনিই-বা কি মনে
করবেন! শুনলুম, মেরেটির বাড়ীতে এখন
পুরুষ আর কেউ নেই, দালাই তাকে
সেখেন-শোমনে। আমি আর থাকতে
পারলুম না—বাগান দিয়ে তার বাড়ীতে
গেলুম।

গিরে সে কী দেখলুম!

মেরেটি বাটিতে লুটিয়ে চোখের জলে
বুক ভাসাচ্ছে আর তাকাগলার মণকে
ডাকছে! উঃ, কি নির্দয় আমি!

নিজেকে থিকার দিতে-দিতে আমি
তার পাশটিতে গিরে বসলুম। নিজের
ছঃখে সে এমনি বিভোর হয়ে ছিল যে,
মোটাই আমার সাড়া পেলো না! তার
পায়ে হাত দিয়ে বললুম, “ছি ভাই, এমন
করে” মরণকে কি ডাকতে আছে?”

সে চমকে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল;
সজল চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে
অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

তখনো তার চোখ ছাপিয়ে গাল বয়ে
টস্‌টস্‌ করে’ জল বরছে দেখে আমি নিজের

আঁচলে তার চোখ মুছে দিলুম। বললুম, “লজ্জাটি, আর কেঁব না!”

সে বাধো-বাধো গলায় বললে, “আপনি—আপনি কে?”

—“আমি মোহনবাবুর বোন। কেমন, এখন চিনতে পারলে ত?”

আমার পরিচয় শুনে আবার সে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ল।

আমি হেসে বললুম, “ভয় নেই বোন, ভয় নেই। আমি বাড়ী বয়ে তোমার সঙ্গে কোঁদল করতে আসি-নি। আমি এসেছি মাক চাইতে!”

সে হেঁটমুখে খানিকটা চুপচাপ রইল। তারপর খুব আন্তে-আন্তে বললে, “কেন, আপনি কি করেছেন যে, মাকু চাইছেন? বরং আমিই আপনাদের কাছে দোষী।”

—“তুমি কিসে দোষী বোন!”

সে স্তম্ভিতভাবে জ্বলে-জ্বলে বললে, “দোষী নই! আমার আপন বলতে তিন কুলে কেউ নেই, আমি গরীবের মেয়ে তার বিধবা, আমি কি না আপনাদের নির্মল বংশে কালি দিতে চাই! আমার কথার বিশ্বাস করুন, ভে-ব্রাভি না পোরাভে-পোরাভে এ আপন বাড়ী ছেড়ে যেদিকে ছ-চোখ যায়, চলে যাবে—আপনাদের আর ভাবতে হবে না!”

মনে-মনে প্রমাদ শুনে আমি বললুম, “ভাই, আমাদের মাক করে। পিসিমা-বুড়ী চিরকালই অমনি ষা-তা বকেন, আর পাড়ার লোকেরা ত এমনি খোট পাকতে পারলেই বাঁচে। ওদের কথার তুমি কাণ দিও না, ওরা কি না বলে! তোমাকে

আমি কোথাও বেতে দেব না—তুমি আমাদের বউ হবে—আমাদের সংসার আলো করে’ থাকবে।”

—“ওগো না, আমি চিরজীবী, আমার চঃখের জীবন সংসারে কান্নার কাজে লাগবে না! আমার জন্তে সমাজে কেন আপনারা মাথা হেঁট করবেন,— আমি কোথাকার কে!”

আমি আর থাকতে পারলুম না,— ব্রহ্মতে জোর করে’ তাকে বুকে টেনে নিয়ে ছর করে বললুম,—

“তুমি আমার মোহন-পানী আমি তোমার পিত্তর।”
ছাড়া পেলে তবে ত উড়ে পালাবে? কিন্তু আমরা তোমার ছাড়িব না ভাই, ছাড়িব না, এমনি-করে’ বুকে বেঁধে রাখব!”

আমার বুকে মাথা রেখে সে আবার হুঁপিয়ে-হুঁপিয়ে কান্নাতে লাগল। আমি তার মুখখানি তুলে ধরে বললুম, “তোমার নামটি কি ভাই?”

—“সরমা।”

—“আর আমার নাম বদুনা। তা জাখ্ ভাই সরম, তোর এই ব্রাভা ঠোটে আমার একটি চুম্ব খাবার ভারি লোভ হচ্ছে—তোমার এ ঠোটেখানি এখনো ত কেউ মোরসী-পাট্টা করে’ নেই-নি? আমি চুম্ব খেলে সেটা বেআইনি হবে না ত? আমি ভাই হাকিমের গিন্নী—সব কাজেই আইন বাঁচিয়ে চলি!”

সেই অল-ভরা চোখেই সরমা কিক্-করে’ হেসে ফেললে; তার হাসি বেখে বুকলুম, আমারই জিৎ! আমি আদর করে’ তার হৃদে একটি চুম্বন দিলুম।

—“আমাকে আর আপনি বলে ডাকিস
নি! তা-বলে তুই-তোকাটিটাও বেন করিস
নি,—আমি একে তোর চোর বংশে বড়,
তার ঈগণির তোর ননম হব!”

—“আপনি বড়—”

—“কেবল আপনি। আমার কথা অমান্য
করলে এখনি থেকে ননম-নাড়া শুরু করে’
যেব কিন্তু।”

—“তুমি তারি হুই, ভাই, আমাকে
খালি-খালি হাসিয়ে দিচ্ছ!”

—“হেসে-নে ভাই হেসে-নে, হাসতে
পার ক-জন? কাদা-ভরা সংসারে এক-
একটি হাসির দাম লাখ টাকা রে লাখ
টাকা!”

—“তুমি কে ভাই, একদিনেই বেন
কত-ময়ের আপনার পোকের মত কথা
কইছ!”

—“তোর তপ দেখলে বে জগৎ ভুলে
যায়—আমি কোন্ ছার! তোকে দেখেও
বে তোকে আপন করতে চাইবে না, সে
কি মাহুব?”

—“তোমার পায়ে পড়ি দিদি, খালি-
খালি এমন-করে’ আর লজ্জা দিও
না।”

—“সরমা, আমার দাদাকে তারিক
করি—তার মন্থ খুব উঁচু বটে। ভাই
ত আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, যে মাহুব বিরের
নায়ে জলে উঠত, সে হঠাৎ এমন বির-
পাগলা হয়ে উঠল কেন! এতকণে সব
বোকা গেল; দাদা ত পুরুষমাহুব, তোকে
দেখে আমারই মাথা ঘুরে গেছে!”

—“হাও, আবার!”

—“আচ্ছা ও-কথা আর বলব না।
কিন্তু অন্য-একটা কথা বিজ্ঞাসা করব।”

—“কি?”

—“লুকোচি নে, ঠিক জবাব দিবি?”

—“কথাটাই আগে শুনি!”

—“সরমা, দাদাকে তোর মনে ধরেছে?
তাকে তুই ভালবাসিস?”

সরমার মুখ লজ্জার রাঙা হয়ে
উঠল।

—“কথা কচ্ছিল না বে! বল না—
লজ্জা কি?”

—“দিদি, দিদি—”

—“থাক, থাক, আর বলতে হবে না,
তোর চোখ দেখেই সব বুকেছি!”

• একুশ

মোহনের কথা

সুরারিষ্যবুর স্বর্গারোহণের পর ৬-মাস
কেটে গেল; সরমা পিতার অভাব এখনো
ভুলতে পারেনি বটে, কিন্তু শোকের প্রথম
ধাক্কাটা সে সামলে নিরেছে।

এর-মধ্যে খণ্ডরবাড়ী থেকে ঘনুনা এসে
দিনকতক এখানে ছিল। পিসিমার মুখে
শুনেনিচলুম, আমার বিয়ে বন্ধ করবার জন্তে
ঘনুনাকে তিনি চিঠি লিখে আসতে বলেছেন।
আমার এই ছোট বোনটিকে আমি যেমন
ভালবাসি, তার হুই জিতকে তেমনি ডরিয়ে
চলি। যদিও তার ভয়ে আমি সরমাকে
ত্যাগ করতুম না, তবু, সে এসে আবার
কি নতুন দাদাম বাধিয়ে বসে, ভাই ভেবে
আমার মন একটু উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল।
সেইজন্তে প্রথম যেদিন সে এখানে আসে,

সেদিন তার কাছ থেকে পালিয়ে-পালিয়ে
বেড়িয়েছিলুম।

কিছু দ্বিতীয় দিন আমি যখন খেতে
বসলুম, যমুনা এসে আমাকে গ্রেপ্তার করলে।
বললে, “কি দাদা, বিয়ে করে’ য়েঁকে বাড়ী
আনতে-না-আনতেই মাছের পেটের বোনকে
পর করতে চাও নাকি?”

যমুনার ইনিয়ে-বিনিরে ভূমিকা শুনেই
বুঝলুম, সে আমাকে নাতানাবু’ না-করে’
ছাড়বে না। নরম হলে পাছে সে বাগে পেয়ে
বলে সেই ভয়ে একেবারে চড়া মেজাজে
কড়াগলায় বললুম, “কেন, হয়েছে কি?”

যমুনা দুটোমির হাসি হেসে বললে, “না,
না, হবে আর-কি! তবে কি না, কাল
থেকে তোমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়-নি,
তাই বলছিলাম! কাল ছিলে কোথা?”

—“যেখানে থাকি না, ভোর সে ঘোঁষে
হরকার কি?”

—“ওমা, তুমি যে দেখছি গোড়া
থেকেই বুদ্ধ দেখি বুদ্ধ দেখি শুরু করলে!
এতদিন পরে খণ্ডরবাড়া থেকে এলুম,
তুলেও একবার জিজ্ঞেস করলে না, কেন
আছি!”

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, “কিছু মনে
করিস্ নি, আমা আমার শরীরটা তেমন
ভাল নেই।”

—“ভাল নেই! কি হয়েছে দাদা?”

“না, না, এমন-কিছু নয়, মাথাটা
বড় ধরেছে!”

—“মাথা ধরেছে? চল, খেরে-ঘেরে
শুয়ে থাকবে চল, আমি তোমার মাথা
টিপে দেব-অমন!”

—“না রে না, বেশী মাথা ধরে-নি,
ডোকে ভাবতে হবে না, দা!”

—“এই বললে বড় মাথা ধরেছে,
আবার বলছ বেশী ধরে-নি! দাদা তোমার
হোল কি?”

আমি বুঝলুম, দুটু যমুনা আমাকে
কিছু বলতে চায়—তার এ মাথা-টেপবার
আগ্রহ ছিলমাত্র। কি আর করি, সে
যখন ধরেছে তখন অমনি-অমনি ছেড়ে দেবে
না—সুতরাং যাওয়া শেষ করে’ বাড়ীর
তিতরেই আসতে হোল।

যমুনা আমার পিছনে-পিছনে ঘরে ঢুকে
বললে, “দাদা, তোমারও মাথা ধরে-নি,
আমাকেও মাথা টিপে দিতে হবে না, এ
আমি খুব জানি! কিছু তুমি আমার কাছ
থেকে এমন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন
বল দেখি?”

আমি চটে বললুম, “তুই কি ভাবছিল,
ভোর ভরে?”

—“সে কি কথা! তুমি হলে পুরুষ,
আমি স্ত্রীলোক; তুমি হলে দাদা, আমি
বোন; তুমি হলে বড়, আমি ছোট;
আমাকে ভর! ওং, অসম্ভব-অসম্ভব!”

—“ধাম, ধাম, অত পাকা কথা বলে
আর ঠাট্টা করতে হবে না!”

—“আচ্ছা, আর পাকা কথা বলব না।
দাদা, তুমি নাকি বিয়ে করবে?”

—“হঁ।”

—“বিধবা-বিবাহ?”

—“হঁ্যা, হঁ্যা, কি হয়েছে তা?”

—“তোমার বউকে আমি দেখেছি।”

—“বেশ করেছিল।”

—“সরমার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে।”

যমুনা কি বলতে চায়? কিছু বুঝতে না-পেরে আমি চুপ করে’ রইলাম।

যমুনাও খানিকক্ষণ শুক থেকে হঠাৎ গভীর হয়ে বললে, “দাদা, সরমাকে হত শত্রু পার, বিবাহ কর। পাড়ার বে-রকম সব কথা রটেছে, তাতে এত দিন বাবে ততই গোল বাড়বে। এতে সরমার মনে কষ্ট হতে পারে। তার জন্যে তুমি এক-ঘরে হবে—এই ভাবনাও এখনি তার মন বৈকে ধাঁড়িয়েছে। গোশমাল বেশী পাকিরে উঠলে সে হরত তোমাকে বিবাহ করবে না। তোমার কোন ভয় নেই দাদা, পাড়ার লোকের চোখ-রাখানিতে তুমি ভয় পেও না, ওরা তোমার কিছুই করতে পারবে না।”

যমুনা যে আমার সহায় হবে, এটা আমি কল্পনাও করি-নি। আমি ভেবেছিলুম, তার মনও সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সঙ্কীর্ণ, অহুদার। বিলাতকেরং আমার লংসারে গিয়ে তার চরিত্র যে এমনভাবে বদলে গিয়েছে, এ আমি জানতুম না।

আমি বললুম, “বোন, পাড়ার লোককে আমি একটুও ডরাই না।”

—“কিন্তু সন্ধ্যা তোমাকে নিয়ে গণ্ড-গোল হোলে, তোমার ভালোর জন্যে সরমা হরত আর বিবাহ করতে চাইবে না। আমি আজকে নানা কথাগুলো সরমার মন বেশ করে’ জেনে এলেছি, তাই এ কথা বলছি। এ বিয়েতে তুমি ঘেরি কোরো না দাদা, সরমার মত স্ত্রী তুমি আর-কোথাও পাবে না।”

যমুনা কিছুদিন আমাদের বাড়ীখানি সরল হাসির তরল স্রোত তালিয়ে আবার স্বাধীর কাছে চলে গেল। এই ক-দিনেই সরমাকে সে একেবারে নিজের করে’ নিয়েছিল। তার অজ্ঞান হাসির কোয়ারায় সরমার শোকাক্ত প্রাণও সরস হয়ে, তার বিম্ব সুখখানিও হাসির আভালে মধুর হয়ে উঠেছিল। রোজ দুপুরবেলার তারা দুজনে বসে-বসে গল্পগুজব করত; যমুনায় মিনতি এড়াতে না পেরে সরমাকে এতদূর বাজাতে হোত, কোন-কোনদিন তার বাজনার সঙ্গে যমুনাও গুলু-গুলু করে’ গান গাইত। তার নিসঙ্গ জীবনে এমন-একজন সঙ্গী পেরে সরমাও যেন বর্তে গিয়েছিল।

যমুনা চলে যাবার পর একদিন সরমার কাছে গেলুম। সরমাকে নীচে না দেখতে পেয়ে ছাদের উপরে উঠলুম।

সূর্য তখন আকাশের রঙের স্রোতে ডুব দিয়ে তলিয়ে গেছে। পশ্চিমের অলস নীলপট সোনার আভার ক্রমেই সোনালি হয়ে উঠছে; তারই উপরে নরপ্রাণের বিচিত্র-অনন্ত আশার মত গোখুরির রঙিন মেঘমালা ছবির পর ছবি আঁকছে আর সুছেছে, আঁকছে আর সুছেছে। সেইদিকে অপলক চোখে চেয়ে সরমা চুপটি করে’ দাঁড়িয়ে আছে।

আমার পারের শব্দ তার কাণে গেল। সে কিরে ধাঁড়াল।

আমি বললুম, “সরমা, এখানে একলাটি যে।”

সরমা দ্রুত হেসে বললে, “আপনার কোন হৃদনের জন্যে এসে আমার প্রাণটিকে

বন্ধী করে' তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেছেন।
তাঁর অন্তে আমার মন-কেমন করছে!"

—“এমন একলা থাকলে মন বে
আরো খারাপ হয়ে যাবে।”

—“দোকলা হই কি-করে' মোহনবাবু,
আমার আর কে আছে?”—বলে সরমা
মাথা হেঁট করলে। প্রথম বসন্তের একটা
দম্কা বাতাস এসে সরমার ছোট্ট কপাল-
খানির উপরে একরাশ কঁোকড়াচুল নাটিয়ে
তার মাথার কাপড়খানি খসিয়ে দিয়ে
গেল।

সরমা মাথার কাপড় তুলে দিতে গেল।
আমি বাধা দিয়ে বললুম, “থাক্, প্রকৃতির
দূতকে বাধা দিও না! আমাকে এ ছরস্র
বাতাস কারকে রূপ ঢেকে রাখতে দেবে
না, যতই মাথার কাপড় লাগে—সে ছুট্‌নি
করে' কের খুলে দেবেই বেবে। সরমা,
আর আমাকেই-বা তোমার লজ্জা কি!”

—“বাতাসের সঙ্গেসঙ্গে মানুষরাও যদি
অধীর হয়ে ওঠে, তাহলে লজ্জাবেচারীর
বোঝ আর কি বলুন!”

—“রূপ যখন অধীরতা আনে, লজ্জা
তখন বড় কঠোর, সরমা! রূপ যখন চার
ফুটতে, লজ্জা তখন চার চাকতে; অধীরতাকে
বোঝ দিচ্ছ, কিন্তু এতে যে অধীরতা আরো
বেড়ে ওঠে! আর, প্রকাশেই ত সৌন্দর্য!।
মাথার উপরে ঐ যে বিরাট আকাশ,
আবরণকে সরিয়ে রেখেছে বলেই সে এত
সুন্দর। আবার দেখ, স্বরণীর নাচ তখনই
মধুর হয়ে ওঠে পাহাড়ের অন্ধকার-গুহার
আবরণ তার লীলাকে যখন আর আড়ালে
রাখতে পারে না।”

—“মোহনবাবু, আপনি অনায়াসেই
কবি হোতে পারবেন।”

—“সরমা, সমস্ত-বিশেষে মানুষমাত্রই
কবি। চাঁদের আলো, ভোরের রোদ,
ফুলের হাসি, পাখীর গান, বসন্তের বাতাস
আর রূপের বোধ,—এরা অবোধ শিশুকেও
কবি করে' তোলে,—তুমি-আমি কোন্
ছার! তবে কেউ এদের সাড়া শুধু
অহুতব করে, আর কেউ সেই অহুতৃতিকে
ভাষায়, ছন্দে, স্বরে প্রকাশ করতে পারে,
এই বা তফাৎ।”

—“থাক্ মোহনবাবু, বাক্য-নবাবদের
সঙ্গে—আমি সামান্ত নারী—পেরে উঠব না।
আমি হার মানছি। তবিশ্রুতে আপনি অহুগ্রহ
করে' পত্ত ছেড়ে গস্তে কথাবার্তা কইলে
স্বামী হব!”

সরমা শুদ্ধ হোল। আমিও শুদ্ধ হয়ে
মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলুম, তার এলানো
খোঁপার তলার মধুর ভঙ্গিতে হেলানো শুভ্র-
নখর ষাড়খানির উপরে, গোদুলির স্বর্ণকর
কেমন চুখন-সুচ্ছিত হয়ে পড়ে আছে!

আমি একটু ইতস্তত করে' তারপর
বললুম, “সরমা, আর কতদিন তুমি এমন
একলা থাকবে?”

সরমা নীরবে তার হুড়োল হাতধুখানি
তুলে কপালের চু-পাশ থেকে চূর্ণকুস্তল-
গুলি সরিয়ে দিতে লাগল।

—“বিশেষ, এ-ভাবে আমরা আর বেশী
দিন বেশামিলি করলে লোকের কুৎসাক
প্রশ্নর দেওয়া হবে। আর বাস্তবিক, এটা
ভালও বেধার না।”

সরমা খুব মুতস্বরে বললে, “কিন্তু

মোহনবাবু, আপনি বিবাহ করলেও ত
লোকের কাণাকাণি বন্ধ হবে না!”

—“হ্যাঁ, কিছুদিন কাণাকাণি করবে বটে।
কিন্তু নিরুপায় কাণাকাণি আর কুৎসিত
কুৎসার মধ্যে অনেকটা তফাৎ আছে।”

সরসী কাতরভাবে বললে, “আমাকে
নিজে আপনি স্বামী হতে পারবেন না—”

—“সরসী, আজ একদিন পরে ও কি
কথা বলছ! আমার ভবিষ্যতের অন্ধকারকে
তুমি সূর্যের মত উজ্জ্বল করে’ তুলেছ,
তুমি—”

—“মোহনবাবু, ডেবে দেখুন আমার
জন্তে আপনাকে সমাজের কি কঠোর
অত্যাচার সহ করতে হবে। হুংস সন্দেশে
সহ বুক আমার পাবান হয়ে গেছে;
আপনাকে না পেলেও সে হুংস আমি সহ
করতে পারব, কিন্তু চিরস্বামী আপনি,
আমার জন্তে আপনি কি-করে’ এত হুংস
সহিবেন বসুন!”

—“তোমাকে জীবনের সঙ্গী করতে
পারলে আমার আবার হুংস? সরসী, আজও
তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না, এই
হুংসটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি কাতর
করে’ তুলেছে।”

—“জানিনা মোহনবাবু, কেন আমার
মনে হচ্ছে যে, কি-একটা মহাবিশদ যেন
হাঁ-করে’ আমাকে গিলতে আসছে—যেন
শীঘ্রই কি-এক অমল্ল এসে বাজের মতন
আমাদের মাথার উপরে ভেঙে পড়বে!”

—“তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস না,
সরসী।”

—“মোহনবাবু, এ কী বলছেন!”

—“সরসী, এই আমার শেষ কথা।

তুমি আমাকে বিবাহ করবে?”

সরসী হুংসে হুংস ঢেকে বললে, “এর
জবাব ত অনেকদিনই আপনাকে দিয়েছি!
আবার নতুন করে’ ও-কথা কেন তুলছেন?”

—“তাহলে বিবাহের দিন স্থির করি?”

সরসী হুঁপ। তার বুক নিশ্বাস-নিশ্বাসে
উঠতে নামতে লাগল।

—“কথা কও, কথা কও।”

—“মোহনবাবু!”

—“না—বল, দিনস্থির করব, কি,
করব না!”

—“কখন।”

—“সরসী, তুমি বাঁচালে, আমাকে
বাঁচালে! অমন করে’ হুংস ঢেকে থেক না
—খোলা, খোলা, হুংস খোলা!”—এই বলে
আমি তার কম্পমান হাতধুখানি নিজের
হুংসের তিতরে জোর করে’ টেনে নিলুম।

সরসীর সমস্ত সূখখানি রান্ধা হয়ে উঠেছে
—বেমন রান্ধা গোলাপফুল। তার কপালের
এলমেল চুলগুলি ঘামে একেবারে ভিজে
গেছে, তার ঠোঁটের উপরে চিকুরের উপরেও
ছোটছোট শিশিরের কোঁটার মত বর্ণ-
বিশ্ব!

সরসী অবসর হয়ে ছাদের উপরে
আমার দিকে পিছন করে বসে পড়ল।

আমি যেন কেমন আত্মহারা হয়ে
গেলুম। সরসী আমাকে দেখতে পাচ্ছিল
না;—আমি ধীরে-ধীরে—নিজের ইচ্ছার
বিরুদ্ধেও—তার উপরে হুঁকে পড়লুম,
তারপর তার সেই নীল-ধবনি-আঁকা ঘোমের
মত নরম, দুধের মত সাদা গলাটির উপরে

চুপন করবার জন্তে আবেগভরে মুখ নানালুম,
—কিন্তু, সেট মুহূর্তেই সরমা আমার মুখ
কেরালে, চকিতে আমিও আপনাকে সামলে
নিরে সরে এলুম,—মনে পড়ল, আমাদের
এখনো বিবাহ হয়-নি!

* * *

বিবাহের সমস্তই ঠিক হয়ে গেছে।
আর সাত দিন! তারপর, সরমা
আমার!

আজ সকালে পিসিমা আমাদের সকলকার
কথা ঠেলে তাঁর স্বপ্নর-সুন্দরকের কোন্-
এক আখীরের বাড়ী চলে গেলেন; সেখানে
থেকে তিনি নাকি কালী বাবেন,—এ বাড়ী
আর বাড়াবেন না, আমাদের মুখ আর
সেখবেন না!

আখীর-হুঁচুখের কেউই আমাদের
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না—আমিও সেজন্তে
কাককে কাকুতি-মিনতি করলুম না। ঝাড়া
ভেবেছিলেন আমি তাঁদের কাছে নীচু হব,
আমার এই অভাবিত উপেক্ষার ভাব দেখে
তাঁরা মনে-মনে নিষ্ঠুরই যথেষ্ট আশ্চর্য্য ও
মৰ্ম্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন। আপনায় লোকের
মধ্যে এল খালি যমুনা। সে একাই একশো,
তার কলহাতেই আমার বাড়ীখানি আসর
উৎসবানন্দে ভরপুর হয়ে উঠল।

আমার ভবীপতিও আমাকে যথেষ্ট
সামুদ্রিক দিগে চিঠি লিখলেন যে, আমার
এই সংসাহসে তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন
এবং বিবাহের উপলোভন নিয়ে তিনি যে যথা-
সময়ে নববধূ দর্শন করতে আসবেন,—পড়ে
এ-কথাও বিশেষ জোরের সহিত লিখতে
কুলেন-নি।

কিন্তু, ভবিষ্যতের সৌভাগ্য-স্বপ্নে মুগ্ধ
হয়ে আমি যখন নিখিল বিশ্বকে একটা
আনন্দের রঙ্গভূমি বলে মনে করছিলুম,
অকস্মাৎ দুর্ভাগ্য এসে ঠিক সেই সময়েই
আমার জীবনে যে রাবণের ভিতা জেলে
দেবে,—এ ত আমি ঘূনাকরেও আশঙ্ক
করতে পারি-নি! ওঃ, সে কি নিষ্ঠুর
আঘাত—অদৃষ্টের সে কী কঠোর পরিহাস!
তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় ছিল,—মরতে পারলে
ত একেবারে সমস্ত দুঃখের যেত—এমন
পলে-পলে, তিলে-তিলে মরণ ত আমাকে
গ্রাস করতে পারত না; সেইদিন থেকে
বুঝেছি, একগাছি সরু হুতার ভারি
পাথরের মত মাথবের সমস্ত আশা-ভরসা
হলছে, যে-কোন পলকে সে হুতো ছিঁড়ে
যেতে পারে—মুহূর্তের ছের-কেরে স্নেহ-সরস
তোমার জীবন ছুঃখে-বিরস এবং নিশ্ফল
হয়ে যেতে পারে!

বাক্,... ... ঘটনাটা কি-করে' ঘটল, এখন
তাই বলি।

বাগানের বেখানে মৰ্ম্মর-নিখরুর সহস্র-
ধারা, ভোরের তরুণ রবিকর পান করবার
জন্তেই বেন চপল পুলকে ঝলকে-ঝলকে
উপরে উঠলে উঠছে, সেইখানে সরমা
আর যমুনা দুজনে হাত-ধরাধরি করে'
দাড়িয়েছিল।

আমি হুতলার ঘরে জানলার ধারে
টেবিলের সুস্থে বসে ডায়েরি লিখছিলুম,
তাদের দেখতে পেরে লেখা বন্ধ করলুম।
তাঁরা দুজনে নিজেদের কথাতেই যেতেছিল,
আমাকে দেখতে পেলেন না।

হঠাৎ যমুনার কি খেয়াল হোল,—সে

সরমাকে সেইখানে বসিয়ে রেখে বাগানের অন্ধদিকে চলে গেল। সরমা একলাটি কোয়ার্টার জলাধারের উপরে তুঁকে—বোধ হয়—লালমাছের বেলা দেখতে লাগল।

খানিক পরে বমুনা হাসতে-হাসতে কিয়ে এল—আঁচল-তরা একরাশ ফুল নিয়ে।

উপর থেকে তাদের অস্পষ্ট বর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

বমুনার আঁচলে ফুল যেখে সরমা বললে, “অত ফুল কি হবে?”

—“ফুলে ফুলে আজ তোকে ফুলরাশি সাঝাব।”

সরমা ষাড় বেড়ে এবল আপত্তি জানিয়ে বললে, “না।”

—“কেন, না কেন শুনি?”

—“উহু, সে হবে না। পাগলের মত খাদ্যকা ফুলের সাজ পরতে যাব কেন?”

—“তোমার যে বিয়ে লা ছুঁড়ি!”

—“তোমার দাদারও ত বিয়ে! অতই যদি সাধ, ষাও না, তাঁকেই সাঝিয়ে এস!”

—“দাদার ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে না। দুদিন পরে দাদাকে তুই হাত-ভরে ফুল নিয়ে গ্রাণ-ভরে সাঝাস। আজ ত আমি তোকে সাঝাই।”

—“না ভাই, না!”

বমুনা, সরমার গালে আদর করে’ ঠোনা ঘেঁরে বললে, “ইন্, না বললেই শুনব কিনা! নে, নে, লক্ষ্মীটির মত চূপ করে’ বোস। দুদিন বাসে যে তোর নন্দন হবে, তাকে চটাস-মে!”

অগত্যা বমুনার কথার সরমাকে রাগি হোতে হোল। ঘাসের উপর হাঁটু পেড়ে বসে বমুনা নিশুণ হাতে সরমাকে ফুলের গহনা পরাতে লাগল। সরমার মাথার, কুন্তলে, শ্রবণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুতে, আঙ্গুলে, কটিতে ও চরণে—যেখানে যে ফুল লাগে, সেখানে ঠিক সেই ফুলের মানান-সৈ গহনা পরিয়ে, বমুনা একটু তকাত সেরে গিয়ে ষাড়-বেঁকিয়ে দাঁড়াল,—তাকে কেমন দেখাচ্ছে, তাই দেখতে! বাস্তবিক, টাটকা ফুলের গহনার সরমার বতাব-হৃদয়ের রূপের শিখা যেন আরো উস্কে উঠল,—তার পানে তাকাতে গেলেও চোখ বেম বল্লে যায়!

এমন সময় চাকরটা এসে ঘরে ঢুকল। তাকে কতগুলো জিনিষ কিনতে বাজারে পাঠিয়েছিলাম, সেইগুলো কিনে সে একটা মোড়কে বেঁধে এনেছিল। মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অজ্ঞানতার ভাবে হতো ছিঁড়ে আমি মোড়কটা খুলতে বসলাম। একখানা খবরের কাগজ দিয়ে মোকানী জিনিষগুলো বুড়ে দিয়েছিল। আঁচলকা কাগজখানার এক জরিগার চোখ পড়ে গেল। সেখানে বড় বড় হরকে লেখা ছিল :—

৫০ টাকা পুরস্কার!

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শান্তিপুর-নিবাসী ঐশ্বর্য্য নুরারিমোহন মহম্মদের তাঁহার কন্যা ঐশ্বর্য্যী সরমা দেবীকে সঙ্গে লইয়া কোথায়

নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। সুরারিবাবুর বয়স্ক প্রায় চতুঃষষ্টি বর্ষ, বর্ণ গৌর, আকৃতি হুহ, মুখে স্রষ্টগুণ আছে। তাঁহার বামগণ্ডে একটি রক্তবর্ণ গোলাকার জড়ুলের চিহ্ন আছে। তিনি এতদাঙ্গ ও বেহালা বাজাইতে নিপুণ। যিনি নিরুলিখিত ঠিকানায় সুরারিবাবুর জামাতার নিকটে তাঁহার সন্ধান প্রদান করিবেন, তাঁহাকে উপরক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইতি

ঐশ্বর্যস্রোতানোহন চৌধুরী
মং—ভানবাজার স্ট্রীট।
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটি একবার, দু'বার, তিনবার রুদ্ধস্থানে পড়লুম,—পড়তে-পড়তে চোখের স্রব্ধ থেকে পৃথিবীটা যেন ক্রমে-ক্রমে সরে যেতে লাগল, দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এল, মাথাটা ঘুরে গেল—তারপর টলতে-টলতে মাটির উপরে আমি সূচ্ছিতের মত পড়ে গেলাম।... ..

সেই অবস্থার কতক্ষণ ছিলুম, জানিনা ; যখন ধূঁকতে-ধূঁকতে কোনরকমে বেহটাকে টেনে তুললুম, তখন আমার প্রাণের ভিতরটা বে কেমন করছিল, তা স্রধু ভগবান জানেন, ভগবান জানেন !

এ সত্য, না স্বপ্ন ? আমি হঠাৎ পাগল হয়ে ঘাইনি ত ?—কাগজখানা আবার তুলে ধরলুম, আবার তার আগাগোড়া পড়লুম। না, কোন সম্বোধ নেই—সমস্তই মিলে যাচ্ছে, সুরারিবাবুর বয়স, চেহারা, তাঁর পালের জড়ুলের দাগ, তাঁর মেয়ের নাম, জামাইয়ের নাম—সমস্ত, সমস্ত ! হা ভগবান, অভাগ্যের এ কী করলে !

কিন্তু, কিন্তু,—সরমার স্বামী ত বেঁচে নেই,—স্বরা মানুষ কি-করে' কিরে এল ! অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারলুম না, এ চর্যোপদে বহুজ্ঞের মধ্য থেকে কেবল এই ভয়ানক সত্যটা বারংবার ভেগে উঠতে লাগল যে, আমার সর্বস্ব আজ হারিয়ে গেল—জন্মের মত, জন্মের মত !

বাগান থেকে সরমা আর ঘনুনার মূঢ় হাস-কলরব ভেসে এল—আমার সর্বস্ব যেন সে হাসি শুনে হা হা করে' উঠল। ওরে ঘনুনা, তুই-না সরমার দেহ-খানি ফুলের গহনার পুষ্পদেবীর মত সাজিয়ে দিয়েছিস ! কার এ পুষ্পদেবী ? এ যে পরের প্রতিমা, একে যে বিসর্জন করতে হবে !

বিসর্জন করতে হবে, বিসর্জন ? সরমা আর আমার নয় ? এ কি সম্ভব ? না, না,—এ হোতে পারে না, এ হোতে দেব না ! এমন-করে' আমি আত্মহত্যা করতে পারব না ! সমাজ, সংসার, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম,—চুলোর দাক ! এ-সব মিছে, এ-সব খালি মানুষের স্বাধীনতাকে বাধা দেবার জন্তে ! এ মিথ্যাকে আমি মানব না, এ বাধা ভেঙে আমি বেরিয়ে পড়ব—দুর্দাস্ত, উন্মত্ত অশ্বের মত। দেখি, কে আমার কি করতে পারে !...

বিবাহের আর বিলম্ব নেই ! সরমার, স্বামী যখন এতদিন তার খোঁজ পাঠ-নি, তখন এর-মধ্যেও পাবে না ! আমিও সরমাকে কিছু বলব না,—না, একবর্ণও না ! আগে বিবাহ হবে দাক—তারপর যা হবার, হবে ! সরমার স্বামী জানতে

পারলেও কোন স্তর নেই, আমার কাছ থেকে তখন ত আর সে স্ত্রী বলে সরমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না!...

আর জানতেই-বা শেষ কেন ? বিবাহের পরে সরমাকে নিয়ে আমি দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব ! দুঃ-বিদেশে, গহর ছেড়ে সবুজ বনের ভিতরে, আঁকাবঁকা নদীর ধারে, ছায়া-করা পাহাড়ের আড়ালে, লতা-পাতার কুটির গড়ব,—কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, শুধু আমরা দুটি প্রাণী সেই বিজনে-নিভুতে কাননের বিচিত্র ঈশ্বর-প্রলাপ, পাবীর স্বাধীন গান, করণার অশ্রুত ভান গুনতে-গুনতে কপোত-কপোতীর মত সুখোমুখি হয়ে প্রেমের গুঞ্জে দিনের পর দিন কাটাও—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন!... মাথার পরে নীলপরের রং-

মাথানো অনন্ত আকাশ, চরণতলে কোমল হৃদয়ালের শ্রামলোকুল, বনে-বনে ঢকল আশো-অঁধারের অবিরাম লুকোচুরি, গাছে-গাছে ফুলে-ফুলে বাতাসের শিঙমধুর শ্বাস,—ওঃ, সে কী জীবন!... ..

কিছু, এসব আমি কি ভাবছি?... না, না, সে কি হয় ? ঐ দেবতার নির্দ্বন্দ্বের মত নির্দল সরমাকে আমি কি আমার পাপমার্শে কলঙ্কিত করতে পারি ? প্রেমে বেথানে কপটতা, সেখানে শাস্তি কোথায় ? মনে অশান্তি, মুখে প্রেম ? সে যে আরো অসহ ! না,—মিছা এ লুকোচুরি, মিছা এ আশ্ববকনা,—বতাই যরণা হোক, সত্যের আবেশ আমাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতেই হবে। ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বিদায়

আসিয়াছ ! তবু ভাল—এও হয় তব ;
তবু ত বিদায়কালে দুটি কথা কব
হৃদয়-বন্ধুর সনে জননের শোধ ;
তুধু ক্ষমা করো যদি দৃষ্টি করে রোধ
এ বিদায়-বিজলতা ; রুদ্ধকণ্ঠ কীণ
বেধনার বাশ্পে যদি বিলম্বিত দীন
বাণীবিনিময়কালে হয়ে গড়ে তুলে’—
শেষভিক্ষা অপরাধ লইওনা তুলে’ ।
এ নিবেদন হবে শেষ—কতকণ আর—
সময় হ’ল যে বন্ধু বিদায় নেবার !

হে চণ্ডাল—শেষ তবে করে’ লহ বেলা ;
চুকাইয়া লহ গুণ এ অন্তিম বেলা ।

এই সে প্রথম পদ, বিজয়ার রাতে,
আশীর্বাদহলে বাহা দিরেছিলে ছাতে
জন্ত কবরীতে ‘ওঁ রে’—নিদীধ-শরনে
যে বিব করিহু পান প্রাণান্ত গোপনে ।
বিশ্বের রহস্বে হর্ষে স্পন্দমান হিয়া
সকোচে লভার হাড়ে রেখেছে পুহিয়া
গোপন বন্ধের তলে বেধনার মত—
কত দীর্ঘ দিনমান, দীর্ঘ রাত্রি কত ।
কে জানে সে আশীর্বাদ অভিলাষে ভরা—
পলে পলে ধণ্ডে ধণ্ডে কিরে’-কিরে’ মরা ।

নিরন্তর মুঢ় ভক্তে যে আঘাত কিরে’
হিরাছ দেবতা ঘোর—সে শব্দকটরে—

তারেও কিরায়ে লহ—সাগ তার কাজ—
 মরমের রক্তমাখা—ফিরে' লহ আজ ।
 নেনিন কি মনে আছে ? তবু বিগ্রহেরে
 দোলপর্জমিনে সেই ভেতলার ধরে
 কারে খুঁজিবার ছলে কারে পেয়ে এক।
 কহিলে কল্পিত কঠে—‘তোমারি সে দেখা
 চাহিয়া এসেছি শুধু’—কররক্তকাগ
 পরশিল চরণের ঝলকক রাগ ।
 লিহরি গেছ যে মরি—অজ্ঞাত হরণে,
 লিপি সাথে ঐ তব বিচ্যৎ পরশে !

একান্ত বাচনা সেই ঠেলিতে কি পারি ?
 ধরা পড়িলাম বন্ধু—সে দোষ আমারি !
 নেনিনও ত বজ্র দিয়া বীথিয়া ছদর
 কিরাইতে পারিতাম ! আজি মনে হয়
 কেন তাহা করি নাই—কেন মিছা তুলে’
 মসীমাখা মৃত্যুবাণ হাতে নিহ্ন তুলে’ ।
 রাজা যে কাঙালদ্বারে সাজিল ভিখারী
 হাত পাতি—রিক্ত কি তা’ কিরাইতে পারি !
 বুঝিলাম মরিলাম—তবু নিরুপাধ—
 সে আগ্রহ আকূলতা কিরান’ কি বার ?
 মরিলাম—একছয় ‘আমিও তোমারি’
 নিমেষের চরুকতা—এত দণ্ড তারি !
 এ জনমে কিরিবে না—কিরেনা সে আর—
 সেই মোর এক শান্তি সেই পরভার ।
 হায় বন্ধু, তারপর—আবো বাহা বাকী—
 এই কিরাইয়া লহ—করে কর রাখি’—
 সেই বাখান্তরা দৃষ্টি আদো মনে হয়,
 মোর চিরজনমের চরম বিষয়—
 ‘কতু তুলিব না তোমার’—সে ‘কতু’ কি আছে ?
 অভাগীর ভাগ্য সাথে সেও মজিরছে !

তার পর—তার পর—মেখি তুমি আজ
 ভিখারীর স্বপ্নস্বর্ণ—তুমি রাম-রাজ
 কাঙালের বন্ধুস্বষ্টি—এই চিন্তভীরে
 লাহ রাখি দীপ্তিটুকু মিশিয়েছে ধীরে ।
 সেই ভাল—সেই সভা—দ্বারেরে বিখ্যাস,
 ইন্দ্রধনু পরিবে সে পরশীর কঁাস ?

তবু যে পাইছ দেখা আজি শেখবার
 এই বুদ্ধেরের লাগি—সেও সে আমার
 স্বপ্নভাগ্য—ধরিত্রের পরশ-মানিক
 দাঁড়াও আঁখির আগে দাঁড়াও খানিক
 মন ত যার না দেখা—নিহ্ন বা দিবার—
 কিরাব কেমনে বাহা নহে কিরাবার !
 এ যে ধরিত্রের স্মৃতি—এ নহে ধনীর
 ক্ষণিক চিন্তের দীপ্তি বেলাল-খনির !
 মোর সেই এক ছয়—অপরায় কিহর’
 দাঁও, এই শেষ ভিক্ষা আজি জুখনি-রে ।
 সেই মোর একছয় কলঙ্কের কালী—
 শুধিব কালিমা তারি ছবি-রক্ত ঢালি ।
 কোন কথা আর কিছু নাহি কহিবার—
 সময় হয়েছে শেষ বিদায় নেবার ।

তবু শেষ-আশা ত্রির, যদি কোন দিন
 চিন্তে মেঘ করে’ আসে বেহাঙ্গ নবীন
 আজি জীবনের মত—পূর্ণ ক্লে-ক্লে
 সমস্ত আকাশ ভরি—পূর্ণ স্মৃতিফুলে’
 উঠে সে পালের মত মরমের তলে,
 জানিও একটি চিন্ত ছায়া-অবস্থানে
 হবে চির-নির্নিমেষ ঐ মুখ চাহি’—
 এই সে অন্তিম সাধ—অন্ত সাধ নাহি ।
 ঈশ্বরভ্রমোহন বাগটী ।

স্মরণ

গৃহিষ্ঠির বে বলেছিলেন, "প্রতি মুহূর্তেই মানুষ মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছে তবু আমরা মৃত্যুকে প্রত্যাহার করিনে, এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। এ বড় সত্যকথা। মহামারী আমরা দেখি, প্রতিবেশীর গৃহে মৃত্যুদূত এসে যখন তার সর্ব্ব স্বপ্ন আত্মসাৎ করে তখন বে মর্শ্চভেদী আর্ন্তনামে চারিদিক কাতর হয়ে ওঠে, তাও আমরা গুপ্তে পাই, তবুও মৃত্যুর বে কি ভীষণতা তা আমরা জানিনে। যতক্ষণ এ মৃত্যু-অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে এসে না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ এর স্বার্থ স্বরূপবোধ আমাদের জন্মায় না। মৃত্যুর অস্তিত্ব আমরা জানি, মানুষ মরে এ-কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু মৃত্যু যতক্ষণ আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব হরণ করে', না পলায়ন করে, ততক্ষণ তার পরিচয় হয় না, তার বেদনার অহুত্ব আমরা লাভ করি-নে। স্বপ্নের সংসার বেশ চলছিল, আশা আমাদের বর্তমানকে নানাবর্ণ-বৈচিত্র্যে স্তব্ধ করে', উজ্জ্বল করে', সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত করে' দিয়েছিল; আজ বা হচ্ছে কালও তাই হবে, কিম্বা তার চেয়ে আরো সুখকর কিছু ঘটনা ঘটবে এ প্রত্যাহার মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে এমন কল্পনাও মনের কোণাও স্থানলাভ করবার সুযোগ পায়-নি। আমরা বড় নিশ্চিন্ত হয়েই ছিলাম, এমন সময় বজ্রবেদনা বহন করে' মৃত্যু যখন তার করাল মুষ্টিতে আমাদের সম্মুখীন

হয়, স্বপ্নের সংসার তেড়েচুরে গুড়ে ছারখার হয়ে যায়, আশার নিতানবীন সৌন্দর্য অন্ধকারে বিলীন হয়, আনন্দসঙ্গীত স্তম্ভিত হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, জীবন একেবারে নিঃশব্দ হয়, তখন বুঝি মৃত্যু কি ভয়ানক ! সে বেদনার প্রথম অভিঘাত এমনি প্রচণ্ড যে অনেক সময় বোধ-শক্তিই হারিয়ে ফেলি, অভাব বে কতবড় হল তা আমরা ধারণা করতেই পারি-নে। তারপর, যখন চেতনা আসে, তখন মনে হয়, এতবড় অবিচার কেন হল ? মন বিমোহী হয়, সেহ সহ্যহুত্ব সাধনা সবই তার কাছে বিরূপ মুষ্টিতে দেখা দেয়, বিশ্বের উজ্জ্বল শোভা, স্নানিমিত আনন্দ বাজা তার কাছে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়। তার সঙ্গে ত্রৈন সংসারের সমস্ত স্বপ্ন বিছিন্ন হয়ে যায়, কিছুই আর তাকে আনন্দ দিতে পারেনা। সে বড় একা হয়ে পড়ে, স্বপ্নে, অন্ধকারে, নির্জনতার থাকতেই তার ভাল লাগে। বিশ্ব তখন তার কাছে বেন থেকেও থাকে না। একান্ত নিঃশব্দ হবার, শোকের মধ্যে এই যে প্রেরণা, বেদনাস্রবের এই যে স্বাতন্ত্র্য, অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের কামনা, এর মধ্যে বড় একটি মঙ্গল-ইচ্ছা নিহিত থাকে, আমরা প্রথমে সে কথা বুঝতে পারি-নে। যারা ফোটোগ্রাফী (Photography) করেন, তারা জানেন ছবির ছায়াপাত আলোকেই হয়ে থাকে, কিন্তু আভাসে বা থাকে তাকে সম্পূর্ণ ও পরিণত করতে হলে,

অন্ধকারেই তাকে রাখতে হয়। শোকের দিনে নির্জনতার যখন আমরা থাকি তখনই আপনার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের হ্রাস হয়। যে বাণী বারবার মনের দ্বারে এসে কিয়ে গিয়েছে, যে মঙ্গল-জ্যোতিঃ বাহিরের বিকিণ্ড কিরণে আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হতে অবসর পায়-নি, সেই বারতা প্রবণের, সেই আলোক দর্শনের হ্রাস ঘটে। যন বা নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, আমরা দেখতে পাই সে সকল ক্ষণিক ও ক্ষণভঞ্জে আর চলেনা। যাকে এতবড় করে' রেখে-ছিলাম, যে আমার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আড়াল করে' ছিল, যার বাড়ী আমার আর কিছুই ছিলনা, সেই যখন চলে গেল, সংসারের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে পড়ল, তখন, মনের নতুন জীবনের অন্তে, এমন কিছু আবর্তক হয়, যার অস্বাভাবিক এতদিন তার অন্তরে ছিলনা, সমস্তপ্রান্ত অন্তরের বৃদ্ধি আর তুচ্ছতা নিয়ে, ক্ষণিক বিশেষে যেটেনা, সে আপনার মধ্যেই সেই আনন্দ-উৎসের অহলক্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়, যার সুখার ধারা দিনে দিনে তাকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করতে পারবে। নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের আভাস পায়!

নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের হ্রাসগলাভ করে। যে দাস্যনা, অপরের দেহ-প্রীতিতে সম্পূর্ণরূপে এতদিন সে পায়-নি, কারো কথার মধ্যে যে পরম বাণী সে শুনেও বোঝে-নি, যখন সেই অমৃতবাণী আপনার মনের কাছেই শোনে, তখন যে চরিতার্থ হয়ে যায়। যে বিধানের তার বেদনার স্মৃতি হয়েছিল, সেই বিধানের নিকট

হতেই সে দাস্যনার দান গ্রহণ করে। যা যখন সন্তানকে শাসন করেন, বাধা দেন, তাঁর কোলের কাছটিতে না পেলে, তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে না কাঁদলে ত সে বেদনা দূর হয় না, চোখের জল তিনিই মুছিয়ে দেন, তবেই ত শান্তি আসে! যে ছুঃখ একদিন বড় অবিচার বলে বোধ হয়েছিল, আবার জানিনা কেমন করে' তারি মধ্যে তরুণ আনন্দের জন্ম হয়, বর্ষাধৌত নীলাবরে সূর্যালোকের মত, বিশ্বের প্রীতি নির্মলতর বলে মনে হয়—বর্ষার অতিবিক্ত সূর্য ধরণীর মত মনের ক্ষেত্রে বীজ বপনের গুণ অবসর আসে। আমরা পরিপূর্ণ মনে বলতে সক্ষম হই, “তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করণামর স্বামী।”

ম্যাটারলিনকের (Materlinck) নীলপাখী (Blue Bird) বলে' মাটিকাতে পড়ে-ছিলাম, একবার পৃষ্ঠ-অস্ত্রোৎসবের পূর্ক রাত্রিতে ছুটি ভাই বোন সন্ধ্যার প্রাকালে ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্নে তারা দেখলে, যেন কোন অপূর্ক লোকে গিয়েছে, কত হৃদয় হৃদয় স্থানে বেড়াচ্ছে, দেখলে কত নবজাত আত্মা সেখানে অতিথি, আবার কতজন আমাদের এই পৃথিবীতে কিয়ে আসবার অন্তে নোকার আরোহী। এমি সময় ঘুরতে ঘুরতে একটি মাধবীর একটি কুটারের সম্মুখে এসে, সেখানি তাদের বড়ই পরিচিত বলে মনে হল, হুরারের পাশে বড়ো কুকুর পাহারা দিচ্ছে, ঘরের দাওয়ার তাদের জানা-শোনা বিড়ালটি বসে বসে কিমছে—গ্রহলক্ষ্য চিত্রপরিচিত! তারা বলে উঠল, এই যে দেখছি ঠাকুর-মা আর দাদামশায়ের ঘর—

ভাড়া অগ্নি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, দেখলে তাদের দাদামহাশয় আর ঠাকুরমা যেমনটি ছিলেন অবিকল তাই আছেন, তারা তাঁদের কাছে দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে বলে, দাদা-মশায়, ঠাকু'মা—তোমরা তো তবে মরে যাও-নি, তোমরা বে ঠিক তেঁরই আছ!—তারা বলেন, তোমরা যখন আমাদের মনে করে' রেখেছ, তখন তো আমরা মরি-নি, তোমরা বুলে গেলেই আমরা আর থাকি-নে, তোমরা যদি মনে করে' রাখ তাহলে ত আমরা চিরদিন অমর হয়েই থাক্‌ব!

বাঁরা চলে গিয়েছেন—তারা আমাদের এই প্রহ্মার স্বরূপের মধ্যে চিরদিন অ-মৃত। আমরা ত তাঁদের হারা-নি বরং অস্তরের মধ্যে আরো নিবিড় ভাবে পেরেছি—তাঁদের ক্রটি, জ্ঞাতি, মানি, কিছুই আর আমাদের মনে নেই—যা-কিছু হৃদয়, পুণ্যময় তাই অগ্নান শোভার চিরন্তন হয়ে আমাদের অস্তরে

অস্তরে বিরাজ করছে। আমাদের স্নেহের স্বরূপে নিরন্তর সঞ্চারিত হয়ে চিরজীবী হলেন, শুধু কি এবারকার মত! এ-সব স্বীতি যে আমাদের আত্মার সঞ্চল, তারি মত অক্ষর ও অবিদ্যমানী—তারা আমাদের যুগ-যুগান্তের জন্ম-জন্মের সঙ্গী হয়েই রইলেন!

যে বিশ্বজননীর দেহকোড়ে জন্মগ্রহণ করে', তারি আদেশে জীবনের অভিনয় সাধ করে' তারা বিহার-নিরেছেন, তারি চিরপ্রসারিত অনন্তের আনন্দ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মা উন্নততর, পুণ্যতর, শ্রেষ্ঠতর সদগতি লাভ করুক, এই আমাদের আজিকার একাধ্র প্রার্থনা—চিরদিন তাঁহাদের জন্ত যেন,—যধু বাতা ঝাতারতে, যধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ। মাধ্বীরঃ স্বেষাধীঃ, যধু নক্ত-মৃত্যোসো মধুমং পার্থিবং রজঃ। যধু ধৌঃরজ নঃ পিতা। যধু মাত্রে বনস্পতির্ধুমং অস্ত-হৃদ্যঃ। মাধ্বী গাবোভবত নঃ।

ঐপ্রিয়দর্শনা দেবী।

ভূতগত ব্যাপার!

(খ্যালি নক্সা)

হেলেবেলা হইতে আমার তারি ভূতের ভয়। সায়াগে এ-এ পাশ করিয়াছি তবু ভূতের ভয় ছাড়ি নাই। বলিতে লজ্জা করে, এই বুফো-বয়সে এখনও রাত্রে অন্ধকারে একা থাকিলে গা-ছম্ভম্ভম্ভ-চিপ-চিপ-প্রভৃতি বতগুলো ভরাস্বক ব্যাধি আছে সবগুলো একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করে।

হরত এই ভূতের ভয় বরস এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া বাইত, কিন্তু কাল করিয়াছে ঐ বিলাতের কুতুর্কে-সভা—সাই-কিকাল রিসার্ফ সোসাইটি! এখন ত দেখিতেছি বিলাতে হেন নামজাদা লোক নাই যিনি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন। বাঁহাদের জানের একটু টুকরাখান লইয়া

বিদ্যামন্দিরের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া বশবী হইয়াছি, যখন দেখি তাঁহারও আমার মনে তখন আমার ভূতের ভয় যে আরো বৃদ্ধ হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য কি !

আমার বিশ্বাস, কি জ্ঞানী কি মুর্থ, পৃথিবীর সকল-লোকের মনেই ভিতরে-ভিতরে সমান ভূতের ভয় আছে। কেহ দুখ-কুটিয়া কবুল করে, কেহ লজ্জার বলিতে না পারিয়া দম-কাটিয়া মরে। যাহা হোক, এখন কুতূহলভার দৌলতে বিজ্ঞানের কাপড় পরাইয়া ভূতের ভয়টাকে সভ্যসমাজে বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে। তাহাতে ভূত-ভয়ের লজ্জা হইতে সভ্য-মানুষ পরিভ্রাণ পাইয়া বাচিবে। ভয়কে গোপনে চাপিয়া রাখা শরীর এবং মন উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক।

জয় হোক সাইকিকাল রিসার্চ সোসাইটির ! যদি তাঁদের সাহসের পরোয়ানা না পাইতাম তাহা হইলে আজ যে-সব কথা বলিতে বলিয়াছি তাহা কি এত লোকের সামনে এমন অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম ! আমার ত এ অতি নগণ্য ব্যাপার, এর চেয়ে আরো কত আজগুবি কুতূহল কাণ্ড, বিলাভের ভৌতিক সভার সভ্যরা কাগজে-কলমে জাহির করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

ভূতের ভয় জীবনে অনেকবার পাইয়াছি কিন্তু সেবারের মতন তেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার কাহারো অদৃষ্টে কখনো ঘটিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সে-কথা মনে করিতে এখনো গা ছম্‌ছম করে। তাহাদের ভূতের ভয় প্রবল, গোড়া হইতে বলিয়া রাখি, তাঁহার কানে আন্তুল দিন। কারণ এই গল্প শুনিতে শুনিতে বুক-চিপচিপানি প্রবল

হইয়া যদি কাহারো হার্ট-ডিসিস্ হয় ততক্ষণ আমি দ্বারী হইতে পারিব না। বুড়ো মারিয়া শেষে খুনের দায়ে পড়িবার ভয় আমার নাই। আমার ভয়, গ্রাছে তাঁহার। ভূত হইয়া কোনো ঘোর নিশীথে আমার সহিত রসিকতা করিতে আসেন !

যাক এখন আসল কথা। সে-বৎসর পূজার ছুটিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। বাড়ি হইতে এই আমার প্রথম বিশেষ-বাড়া। সন্ধ্যা ছিল আমার বালাবন্ধু জীশ। ছেলেবেলা হইতে দেখিতোছি জীশ লোকটার আশ্চর্য্য সাহস। তাহার প্রাণে ভূতের ভয় একেবারে নাই। সে বলে রাত্রে অন্ধকারে সে একলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দিবা ছাদে বেড়াইতে পারে ; ঘোর নিশীথে অশথ কিছা বেল-গাছের ডলা দিয়া বাইতে তার এতটুকু গা ছম্‌ছম করে না ; পোড়ো-বাড়ির নামনে দিয়া সে বেশ গট গট করিয়া চলিয়া যায়। এবং এমন-কি সে ভূত কখনো দেখে নাই একথা দিবা-দ্বিপ্রহরে সকলের সমক্ষে চীৎকার করিয়া বলিতে এতটুকু সঙ্কোচ করেনা।

ভূত লইয়া তাহার সহিত আমার অনেকবার তর্ক হইয়াছে। সে বলে ভূত থাকিতে পারে কিন্তু তাহের ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, বেহেতু ঘাড় মটকাইতে হইলে যে হাতের দরকার তাহা তাহাদের নাই ; এবং তাহার। বাড়ি চাপিলে ক্ষতি কি, যখন তাহাদের মেহের কোনো ভয়ই নাই। আমার মত কিন্তু অস্ত্র-রক্ষক। আমি বলি, ভয় যদি না থাকে তবে ভূতও নাই। ভয়টাকে বাদ দিয়া শুধু ভূতটাকে

রাখা একটা জঘন্য কুসংস্কারমাত্র। যেটা কথা খ্রীশের সঙ্গে তর্ক করিয়া কোনো লাভ হয় নাই। কারণ খ্রীশের বৃত্তিতর্কে আমার ভূতের ভয় এক ভিন্ন কমে নাই এবং আমার ভৌতিক গবেষণার দ্বারা তাহার মনে এতটুকু ভূতের ভয় সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি নাই। সে আমাকে ঠাট্টা করিত। আমি রুদ্ধ আক্রোশে মনে-মনে বলিতাম, রোসানো, বাছাধন একদিন টের পাইবেন! কিন্তু কি আশ্চর্য, এত দিন চলিয়া গেল তবু ঐ বাছাধন এখনো কিছুই টের পাইলেন না। ভূতের মধ্যেও কাপুরুষ আছে না কি! কোনো সাহসী ভূত খ্রীশকে এখনো সারেস্তা করিল না দেখিয়া, চুপি-চুপি বলি, আমার মন এক-এক সময় ভূতের অস্তিত্বলব্ধকে বিবোধ সংশয়ী হইয়া উঠে। মনের কথা বলিয়া কেলিগাম, আজ রাতে অদৃষ্টে কি আছে জানিনা!

আমি অবাক হইয়া ভাবি খ্রীশ আমার মতো সার্বাঙ্গে নয়, সাহিত্যে এমন-এ, তবু সে ভূতের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল কেমন করিয়া! সাহিত্যে ত ভূতুড়ে ব্যাপারের অন্ত নাই! সে বলে ছেলেবেলার তার একটু-একটু ভূতের ভয় ছিল, বড় হইয়া ছুটিয়া গেছে। আমার মনে হয় বড় হইয়া তার সেই ভয় আরো অসুস্থ হওয়া উচিত ছিল। ফ্রান্সেট পড়া তার একেবারে বুঝা হইয়াছে।

কলিকাতা ছাড়িয়া খ্রীশের সঙ্গে বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম। নতুন দেশের নতুন-নতুন দৃশ্যে আমরা আবিষ্ট ছিলাম বটে কিন্তু তার মধ্যে

ভূতের কথা যে একবারও মনে উঠিবার অবকাশ পায় নাই তাহা নহে। কারণ খ্রীশের ইতিহাস ও প্রকৃতবে সখ আছে। তার চর্চা করিতে সে ছাড়ে নাই। সেও ত একরকম ভূতেরই কথা। কারণ তার ত কেউ জ্যান্ত নয়, তার অতীতের কবর হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বাহুবের মনের ঘারে সাক্ষাৎ দিতে আসে। খ্রীশ এক-এক জায়গায় বার আবার সেখানকার ইতিহাস আবৃত্তি করিতে লুপ্ত করে। আমি সাত-আট শত বৎসরের পূর্বেককার দৃশ্যাবলী আমার মানস-নয়নে প্রতিফলিত হইয়া উঠে অর্থাৎ আমি দিন-রুপরে ভূত দেখিতে থাকি।

কানীর সারনাথের মাটি খুঁড়িয়া এক প্রাচীন সহর বাহির করা হইয়াছে। দেখিয়া আমার মনে হইল একটা ছোট-খাটো সহর-ভূত কবর ঠেলিয়া উকি মারিতেছে। তার অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম যেন কারা সব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ-কেহ সবেমাত্র মাটি ঠেলিয়া উঠিয়াছে, আবার কাহারো যেন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইবার জন্ত সম্বোরে ঠেলা মারিতেছে। সবই অপরিচিত মুক্তি! দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়, আবার ভয়ও করিতে থাকে। সুশ্রুত মন্তক, গেরুয়া-বসন-পদ্মা নৈর-পুরুষ দলে-দলে চলিয়াছে—সকলকার শাস্ত্র সৌম্য মুক্তি, সংযত মুক্তি, সংযত আচরণ! হাতে হাতে সব ভিক্ষাপাত্র। ছোট ছোট কুটুরীর মধ্যে বসিয়া কাহারো সব মালা ঘুরাইতেছে, শাস্ত্র পড়িতেছে, গান গাহিতেছে।

একস্থানে বৃদ্ধদেব তাঁর প্রকাণ্ড দেহ লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন।

কত দিন পরে আজ তাঁহার মেহের উপর সকালবেলাকার সূর্য্যের আভা আসিয়া লাগিয়াছে তবু তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। কত যুগ চলিয়া গেল, কত লব-বিলব বটিয়া গেল, মাটি পাথর হইয়া গেল, পাথর ভাঙিয়া ধূলা ভঁড়া হইয়া গেল, তাঁহার নিম্নের মেহ পাথর হইয়া গেল তবু তাঁর আগিবার সময় হয় নাই। সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সামনে দাঁড়াইয়া আমার কেমন ভয় হইতে লাগিল, যদি এখনি ইহা পা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াই! আশে পাশে দেখিলাম আগ্নেয় কত দেব-দেবী নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের এমন ভাবভঙ্গী যে কখন যে তাঁহাদের খেয়াল হইবে আর আগিয়া উঠিয়া একটা কাণ্ড বাধাটরা বসিবেন তার ঠিক নাই। চতুর্দিকে বা দেখিতেছি এরা সবাই যদি একসঙ্গে মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া কলরব করিতে থাকে তাহা হইলে আমরা দুটি ক্ষুদ্র বর্ষক এঁদের মধ্যে যে কোথায় হারাইয়া যাইব কেহ খুঁজিয়াও পাইবে না। হরত এঁদের সঙ্গে আবার মাটি-চাপা পড়িয়া কত কাল আমাদের এইখানে থাকিতে হইবে! আমার সর্বাঙ্গ ধরণ করিতে লাগিল। আমি ঐশকে টানিয়া লইয়া পালাইয়া আসিলাম।

তার পর আগ্রার দুর্গ। ঐশ তার ইতিহাস সুখ-বলিয়া বাইতে লাগিল। এক-একটা স্থান দেখায় আর তার আত্মবলিক গল্প বলিতে থাকে, অমনি সহস্র সহস্র সাহায্য, নবাব-জাদা সাধার ডাক, হাতে গজদন্তের ছড়ি, পায়ে লপেটু পরিয়া ছড়মুড় করিয়া ছুটিয়া

আসে। হাজার-চাকার বেগম সাহায্যী ও তাহাদের সখীরা ওড়না উড়াইয়া সামনে দিয়া চলিয়া যায় • • ঐ অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে কি যেন একটা গুপ্ত মহলা চলিয়াছে, তার কিস্কাস্ কিস্কাস্ শব্দ ত্বন্তের নিখাসের মতো গায়ে আসিয়া লাগিল • • • যেন একটা বড়গর চলিতেছে • • হঠাৎ একটা বিকট-আকৃতি লোক একখানা ধারালো চক্কে ছোরা-হাতে সামনে দিয়া চলিয়া গেল • • একটা ক্ষুদ্র ঘরের জানলার ধারে এক পরম রূপসী হঠাৎ মনে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া আছে • • হঠাৎ সে চাতপালের মতো চলিয়া পড়িল, তার সর্বাঙ্গের সোনালী আভা একেবারে নীল হইয়া গেল • • নর্ত্তকীদের পায়ে বৃত্তের বৃত্তের আওরাজের সঙ্গে, মদের পেয়ালার চূনচূন, সারেরের ছড়ির মিঠা টানের একটা ঝটকা কানে আসিয়া লাগিল • • আতর-গোলাপের গন্ধের সঙ্গে মদের গন্ধের একটা হলুদ নাকের সামনে দিয়া চকিতের মধ্যে বহিয়া গেল • • হাসির একটা তুকান • • আবার একটা মর্ষভেদী করুণ দীর্ঘশ্বাসের বড় • • ঐ না কার নেশার বিহ্বল জড়িত কণ্ঠের অশ্রুট শুকন • • ও কি, ও কার অকুরত করুণ আর্তনাদ • •

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ। সারেরের তার খুব উঁচু পর্দার উঠিয়া যেন ছিঁড়িয়া গেল। অমনি গান বন্ধ, বৃত্তের আওরাজ শুক • • গুপ্তকক্ষের কপাট সম্মুখে বন্ধ হইয়া গেল • • বেগম-মহলের জানলার জানলার

শত শত অলঙ্কারে আঁধি কপোলের স্তম্ভ
একটা ভয়মিশ্রিত কোতুহল দৃষ্টি হানিয়া
একেবারে নিশ্চয় হইয়া কোথায় লুকাইয়া
পড়িল • • ঘরে ঘরে জানলা-কপাট বন্ধ।
বাদশাহ, বেগম, তাহাদের প্রজ্ঞকতা, কিঙ্কর-
কিঙ্করী কে যে কোথায় গেল আর সন্ধান
মিলিল না • • একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি-ধোঁয়ার
সমস্ত ছাইয়া গেল। তখন চারিদিক কেবল
কালো কটি পাথরের মতন অন্ধকার।
সেই অন্ধকার-পাথরের ধাক্কার ধাক্কার
মহুসিংহাসন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।
গগনম্পর্শী প্রসাধনধর মাটির উপর
ভাঙিয়া পড়িল, স্তম্ভ চূর্ণপ্রাচীরে বড়-বড়
কাট ধরিল, হীরেজহরৎ মণিমাণিকা
এবং সমস্ত আসবাবপত্র বেন একটা প্রকাণ্ড
হামান-বিস্তার পড়িয়া ভাঙা হইতে লাগিল
—তারই ধূলায় চারিদিকের অন্ধকার আরো
ঘনাইয়া আসিল। • • •

আমি চোখে অন্ধকার দেখিয়া প্রায়
মূর্ছা গিয়াছিলাম। হঠাৎ শ্রীশের কণ্ঠ
ওলিলাম। সে বলিয়া উঠিল—“তুমি অমন
করে পুস্ত-দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে
কি দেখছ ?”

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলাম—
“চল, চল, এখান থেকে পলাই !”

সে বলিল—“কেন !”

আমি বলিলাম—“ভূতের এই উৎপাতে
মাছব এখানে টিকতে পারে !”

শ্রীশ বলিল—“এই দিন-চুপুরে তুমি
ভূত দেখলে কোথায় !”

আমি বলিলাম—“কোথায় নয় !—চারি-
দিকে কেবল মাংসো ভূত গিসগিস

করছে। এখানকার মাটি থেকে দেয়াল
কড়িকাঠ পর্যন্ত সব ভূতখোনি প্রাপ্ত হয়ে
রয়েছে ! এ কি আর সেই আসল
জিনিস আছে ?”

শ্রীশ হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—“হাসচ বটে, কিন্তু
জাননা, এ সব বাদশাহী ভূত ! এদের
খেয়ালের কথা বলা যায় না।—আমাদের
নিষে এমন রসিকতা করতে পারে যে—”

শ্রীশ আমার কথার কান না দিয়া
একজন পাইডের সঙ্গে কি-একটা তর্ক
জুড়িয়া দিল। আমি উসখুস করিতেছি
দেখিয়া সে আমার পানে চাহিয়া বলিল
—“ধবরদার, এ চূর্ণ থেকে একলা বেরোবার
চেষ্টা কোরো না—এমন গোলকধাঁধার
মধ্যে গিয়ে পড়বে যে আর পথ খুঁজে
পাবে না।”

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চন্ডন্
করিয়া মাথায় উঠিল। আমার হাত-পা
একেবারে অবশ হইয়া আসিল। • •
আমি প্রাণপণশক্তিতে দৌড় দিলাম।
দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ বেধি একটা
সুড়ঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিক
অন্ধকার। সামনের দিকে চলিলে পথ
পাই, কিন্তু কিরিতে গেলেই বেধি পিছনের
পথ কালো পাথরের দেয়ালে বন্ধ।
সর্কমাশ ! কি করি, সামনে চলিতে লাগি-
লাম—কিন্তু পথ ফুরায় না, চলিতে-চলিতে
পা অসাড় হইয়া গেল, বসিয়া পড়িলাম,
যেমন বলা অমনি সামনে একটা পাথরের
দেয়াল পড়িল। হাত বাড়াইয়া দেখি সামনে
দেয়াল, পিছনে দেয়াল, পশ্চিমে দেয়াল,

মাথার উপর দেয়াল ;—দেয়ালগুলো ক্রমেই
কাছ-খেসিরা আসিতে লাগিল ;—বাড় উচু
করিলে মাথার ঠেকে, পাশ ফিরিলে
গারে ঠেকে। এ কি আমার জীবন্ত সমাধি
হইল নাকি ! • • • • •

বাড়ি ফিরিয়া বৈকালিক জলযোগের
পর খ্রীশ বলিল—“চল তাজ দেবিতে
যাই !”

আমি বলিলাম—“না !”

খ্রীশ অবাক হইয়া বলিল—“সে কি !”

আমি জোর করিয়া বলিলাম—“না, আমি
যাবো না !”

সে বলিল—“তবে চল ইংমৎদোলা !”

আমি বলিলাম—“না !”

—“সেকেন্দ্রা ?”

—“না !”

—“তবে চল বন্দুনার ধারে ঠাণ্ডা বাতাসে
তোমার বেড়িয়ে নিরে আসি !”

আমি এ-কথার কোনো উত্তরই দিলাম না।

অগত্যা খ্রীশ একলা বাহির হইয়া
গেল। আশ্রা দেখা শেষ করিয়া আসিয়া
বলিল—“এবার কোথায় যাবে ?”

আমি বলিলাম—“বাড়ি !”

সে বলিল—“দূর পাপল ! বাড়ি যাবে
কি ! চল দিল্লী যাই !”

—“সেখানে কি আছে ?”

—“দিল্লী দুর্গ !”

আমি বলিলাম—“তবে আমি নাই !”

—“আজ্ঞা বেশ, দুর্গ না দেখ, জুআ
আছে, কুতুব-মিনার আছে হযাযুন-কবর
আছে।”

আমি কবরের নামেই বলিয়া উঠিলাম
—“না না, সে-সব হবে না !”

এমনিতর তর্ক করিতে করিতে ট্রেনের
সময় বহিরা^১ যাইতে লাগিল। খ্রীশ রাগিয়া
উঠিয়া বলিল—“তবে কোথায় বেতে চাও ঠিক
করে বল !”

আমি বলিলাম—“দেশ-দেখার সব
আমার মিটেছে ; এখন ঘরের ছেলে ঘরে
চল !”

খ্রীশ খানিকক্ষণ গৌ হইয়া রহিল।
চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল
—“তবে চল অরপুর যাই !”

—“সেখানে কি আছে ?”

—“ওনেছি সহরটি দেখতে খুব ভালো।”

—“প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ সে
সহর হয়ে ভূত হয়ে নেই ত ?”

—“না হে না !”

—“নবাবদের হানা বাড়ি ?”

“আরে না না, সে সব নেই। তোমার
পক্ষে খুব safe place !”

আমি বলিলাম—“ঠিক বলছ ?”

খ্রীশ আমার গারে হাত দিয়া শপথ
করিল।

ট্রেন ছাড়িবার অন্তরাত্ন বাকি, আর
হাঁ-না করিবার বেশি সময় নাই, খ্রীশের
কথার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আমি রাজি হইয়া
গেলাম।

গাড়ি ছাড়িলে আমার হঠাৎ মনে
পড়িল অরপুরের কথা। আমি বলিলাম
—“খ্রীশ, রাস্তেল, মিথ্যেবাদী ! অরপুর
তোমার safe place !”

খ্রীশ অবাক হইয়া বলিল—“কেন ?”

—“কেন ? অথরের প্রাসাদ!—সেটা কি ? সেটা ত একটা আগু ভুহুড়ে বাড়ি !”

ঈশ বলিল—“তোমার তথ্য নেই, সেখানে তোমার নিরে বাথোনা—ভরপুর সহর থেকে সে অনেক দূর !”

ভরপুর স্টেশনে যখন ট্রেন আসিয়া থামিল তখন রাত্রি বায়েটা বাজিয়া গেছে। কুলির মাথার ঘোট চাপাইয়া: প্লাটফর্ম হইতে বাহির হইতেছি কুলি বলিল—“কোথার যাবেন বাবু ?”

আমরা বলিলাম—“সহরে !”

সে বলিল—“সহরের কটক বন্ধ, ঢোকবার যো নাই !”

ঈশ ও আমি মূখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। ঈশ বলিল—“তবে চল ওয়েটিং রুম !”

ওয়েটিং রুমে বিনিময় নামাইয়া সব-মাত্র বসিরাছি, স্টেশন মাষ্টার আসিয়া বলিল—“এখানে আপনাদের থাকতে দিতে পারি না। রাত্রে আর ট্রেন নেই—এখনি স্টেশন বন্ধ করে আমরা সব চলে বাথো !”

ঈশ বলিল—“তা বান না। আমাদের বিরক্ত করেন কেন ?”

স্টেশন মাষ্টার বলিল—“আপনাদের এখানে থাকতে দেব না।”

ঈশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—“সে কি রকম কথা ! আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, জানেন !”

স্টেশন মাষ্টার বলিল—“তা জানি। কিন্তু আপনাদের safetyর জন্তে আমি responsible হ’তে পারব না।”

ঈশ বলিল—“আমরা কি booked

luggage বে আমরা আপনার safe custodyতে থাকবার দাবী করছি !”

সে বলিল—“ও ! ব্যাপারটা আপনারা জানেন না দেখি। সপ্তাহখানেক হল এই ওয়েটিং রুমে একটা খুন হয়ে গেছে। একটি passenger এসে রাত্রে এইখানে আশ্রয় নিরেছিলেন, সেই রাত্রেই তিনি খুন হন, তাঁর identification হয়নি—কারণ তাঁর মাথা পাওয়া যায়নি।”

ঈশ বলিল—“আশা করি, তাঁর মাথা আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে বলে আপনি সন্দেহ করছেন না।”

স্টেশন মাষ্টার একটু হাসিয়া বলিল—“সে সন্দেহ করছি না বটে কিন্তু আপনাদের নিজের মাথা বগাবান্নে থাকে কিনা এই সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠছে।”

ঈশ বলিল—“তাহ’লে কি আপনার এই প্রস্তাব বে আমাদের মাথা-ছুটো আপনার Iron safeএ আপাতত গচ্ছিত রাখা হোক।”

মাষ্টার বলিল—“ঠাট্টা রাখুন মশায়, ব্যাপার বড় serious।”

ঈশ বলিল—“আপনি নিশ্চিত মনে ধরে বান, আমাদের মাথার জন্তে আপনার মাথাব্যাবার কোনো দরকার নেই।”

—“তা হ’ল মশায় আমার ঘাড়ে কোনো দার রইল না !”

ঈশ নিজের মাথার হাত দিয়া বলিল—“আমাদের মাথার দার আমাদের ঘাড়েই আছে, আপনার ঘাড়ে নিশ্চয় নেই—এ ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন।”

—“বা ভালো বোঝেন কখন। মোট কথা রাত্রে খুব সাবধানে থাকবেন।”

ঐশ মাথা নত করিয়া বলিল—
“ধন্যবাদ।”

ঐশ ও ষ্টেশন মাষ্টারের কথোপকথনে
“মাথা” কথাটা বার বার আমার কানে
আসিয়া লাগিয়া আমার মাথায় ভিতর
কেন্দ্র যেন একটা জটলা পাকাইয়া তুলিল।
যে কথাই তাহাতে ঘাই তার মধ্যে যেমন
করিয়াই হোক ‘মাথা’ কথাটা ঢুকিয়া
পড়ে।

ঐশ বলিল—“রাত্রি অনেক হয়েছে,
নাও কাপড়-চোপড় ছেড়ে গুয়ে পড়।”

আমি ভগ্নানক ঐতকাতুরে। গারে আমার
একাত্ত একটা ওভার-কোট ছিল, তবু
আমার ভিতরের হাড়তল কাপিতেছিল।
আমি বলিলাম—“জামা কাপড় আমি
ছাড়ছি না, এই সবতল গুয়ে পড়ব।”

ঐশ ওভারকোটটা খুলিতে খুলিতে
বলিতে লাগিল—“বাবা! ঐ গাধার বোকা
পিঠে নিয়ে তুমি ঘুমবে কেমন করে?”

তারপর ঐশ আর বিকৃত্তি করিল না।
যেমন বিছানার পড়া অমনি ঘুম। আমি দুবার
ঐশ ঐশ করিয়া ডাক দিলাম, কোনো সাড়া
পাওয়া গেল না। আমি তখন গাথের
কবলটা মাথা অবধি মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া
ওইলাম। সমস্ত শরীরটা গরম হইয়া উঠিয়া
বেশ-একটু আরাম করিতে লাগিল। চোখে
ভগ্নার আবেশ আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, আমি
ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি জানি না, হঠাৎ আমার
ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙিবার কারণটা
ঠিক বৃত্তিতে পারিলাম না। মনে হইল
কে যেন আসিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিয়াছে।

কবলটা দেখি মাথা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে।
দূরে একটা কোণে হারিকেন লঠনটা
অগ্নিতেছিল বটে কিন্তু তার তেমনি
উপরকার ধোঁয়া ও ধূলা ছাঁকিয়া যে আলো
বাহির হইতেছিল তাহা অত্যন্ত বোলাটে।
চারিদিক হইতে বোর অন্ধকার বয়ের মধ্যে
ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল।
লঠনের ক্ষীণ আলো সেই জমাট অন্ধকারের
গারে সামান্য একটু আভা ফেলিতেছিল
মাত্র, তার গভীরতা ভেদ করিতে পারিতে
ছিল না,—তার কট্রন গারে লাগিয়া আলোর
তীরগুলো প্রতিহত হইয়া যেন লজ্জার দ্বান
হইয়া পড়িতেছিল।

ঐশকে ঠিক দেখিতে পাইতেছিলাম
না,—কোথার সে ওইয়া আছে তারই একটা
আন্দাজ পাইতেছিলাম মাত্র। আমাদের
ব্রিনিসপত্রগুলো কালো-কালো ছোটো-ছোটো
টিবির মতন চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল।
কোথার এক-দ্বারগার আমাদের একটা পুঁচুশী
হইতে একটু দাখ। কাপড়ের অংশ বাহির
হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হইল যেন ঐ
অন্ধকারটা তার দাখ দাঁতের পাটি বাহির
করিয়া ক্রুটি করিতেছে। আমার মাথাটা বোঁ
করিয়া উঠিল। চোখে অন্ধকার দেখিলাম।
তাড়াতাড়ি কবলটা মাথা অবধি টানিয়া
চোখ বুজিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম।
ভগ্নর গরম বোধ হইতে লাগিল। কপালে
কোঁটা কোঁটা ঘাম দেখা দিল। মাথা অবধি
কবলমুড়ি অসল্ হইয়া উঠিল। আমি
সেটা টানিয়া ফেলিয়া দিলাম। দেখি
চারিদিকে অন্ধকারের খেলা অমিয়া উঠিয়াছে।
কোনোখানটা বোর জমাট, কোনোখানটা

পাতলা। কোথাও পাথরের মতন কঠিন ভারি, কোথাও মেঘপুঞ্জের মতো হালকা হ্রস্বত্বের। কোনোজায়গা কালির মত নিশ-কালো, কোনো জায়গা ছাইয়ের মত ফিকে—পাঞ্জীস। চারিদিকে কেবল কালো রঙের নানা গুহ—নানা বৈচিত্র্য।। ঘরের মধ্যে যে-সব বিনিল ছড়ানো আছে, সেগুলোকে আর বিনিল বলিয়া মনে হয় না, সেগুলো যেন অন্ধকারের সব তাক্কা-বাচ্ছা।। উপরে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া দেখি যে কয়েকটা অন্ধকার-জীব বিছানা পাতিয়া ছেলেপুলে লইয়া শুইয়া আছে। ঘেরালের দিকে দেখি তার গারে বড়-ছোটো নানা-ব্রকমের সব নির্জীব পোকামাকড় লাগিয়া আছে। এ যেন অন্ধকারের রাজ্য—এখানে যেন ব্রহ্মাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নাই। • • •

হঠাৎ দেখি চোরারের উপর একটা লোক অলসভাবে বসিয়া আছে—তার হাত-ছুটো চোরারের ছপাশে স্তাতার মতো খুলিতেছে। একবার মনে হইল বৃষ্টি ঞ্জিণ চোরারে বসিয়া ঘুকাইয়া পড়িয়াছে। আমি ডাকিলাম—
 ঞ্জিণ! কোনো উত্তর পাইলাম না। কেমন সন্দেহ হইল। খুব ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখি—এ কি লোকটার মাথা নাই যে! কাঁধ অবধি শরীরটা পিঙ্গা—বাস, সেইখানেই একেবারে শেষ হইয়া গেছে। আমার সমস্ত শরীর ক্রিম্ ক্রিম্ করিতে লাগিল—আমি ভাড়াভাড়ি কবলটা মাথা অবধি টানিয়া চোখ বুজিয়া রহিলাম। • • •

মনে হইল লোকটা চোরার ছাড়িয়া উঠিয়া ঝাঁড়াইয়াছে—যেন আমার দিকে

আদিতেছে। আমার সমস্ত শরীর গুটাইয়া একেবারে কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল। আমার শিররে ঝাঁড়াইয়া কে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। সে নিশ্বাসের বাতাস কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা! কবল হুঁড়িয়া আমার ভিতরের হাড় ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপাইতে লাগিল। লোকটা সাপের নিশ্বাসের মতো হিম্ হিম্ করিয়া বলিয়া উঠিল—“আমার মাথা কৈ? —আমার মাথা!” • • •

মনে হইল যেন একথানা হাত আমার মাথাটাকে পত্রীক্ষা করিতেছে—এদিক-ওদিক ঘুরাইয়া কিয়াইয়া দেখিতেছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। গলা হইতে কোনো শব্দ বাহির হইল না। এমন অসাড় হইয়া গেলাম যে বোধ হইল যেন আমার বুকের কাপুনি পর্য্যন্ত ধামিয়া গেছে। তখন আড়ষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিলাম হুথানা হাত কেবল চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে আর একটা অক্ষুট শব্দ উঠিতেছে—মাথা কৈ? মাথা কৈ? • • •

চং চং শব্দে সমস্ত দিক কাঁপাইয়া বঁটা বাজিয়া উঠিল। কবল হুঁড়িয়া একটা আলোর রেখা আমার চোখের পাতার আসিয়া লাগিল। ওয়েটিং রুমের বাহিরে একটা কলরব উঠিয়াছে। ঞ্জিণ আমার নাম ধরিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে—“ওঠ, ওঠ, বেলা হল।”

আমি কবল হইতে এতটুকু সুখ বাহির করিয়া চাহিলাম। ঘরের দরজা জানলা তখনো বন্ধ, ভোরের অন্নমাত্র আলো দেখা দিয়াছে। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে যেখিলাম ঞ্জিণ চোরারখানার পাননে ঝাঁড়াইয়া

আছে। তার দিকে চাহিতেই মনে হইল
স্বাত্তর সেই কক্ষকাটা লোকটা যেন ঐশ্বের
গানের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল।

আমি চোখ বুজিয়া ফেলিলাম। তার পর দেখি
ঐশ ও তারকেট আঁটরা আমার ঘুম ভাঙাইবার
জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে। • • •

ঐমলিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বাদশাহ আকবরের নিরক্ষরতা

কিছুদিন হইতে, বাদশাহ আকবর
নিরক্ষর ছিলেন কিনা—এই সম্বন্ধে বঙ্গীয়
লেখকগণের মধ্যে বাধাহুঁবাস চলিতেছে।
ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এ-বিষয়ে একরূপ
স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আবহমান
কাল হইতে আমাদের দেশেও প্রচলিত
কথা এই যে আকবর নিরক্ষর ছিলেন।
শ্রদ্ধের বহু ফার্সিভাষাভিহীন শ্রীযুক্ত কুমার
নরেন্দ্রনাথ লাহা-মহাশয় তাঁহার পুস্তকে
চিরাচরিত এই অপবাদ দূরীকরণের প্রয়াস
পাইয়াছেন। কিন্তু, এই বিষয়ে গভীর গবেষণা-
শ্রুত অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেও
আমাদের ঠিক মনে হয় না যে, তিনি এই
বিষয়টী প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।
সম্প্রতি এই বিষয়ে কিছু কিছু বিকল্প প্রমাণ
শ্রীমান ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়া
কুমার নরেন্দ্রনাথের প্রমাণাবলী জ্ঞাত
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু, আমার মনে
হয়, বিচারযোগ্য এই ঘটনা-সম্বন্ধে তাঁহার
উত্তরে বহু ফার্সী ও আরবী-গ্রন্থের প্রমাণ
প্রয়োগ করিলেও গৃহসমীক্ষিত বিবেচনাযোগ্য
ও একহিসাবে অস্বস্ত একটী প্রমাণের
সাহায্যগ্রহণ করেন নাই। আমরা কুমার
নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেই

প্রমাণটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে এই স্থানে
সন্নিবেশিত করিলাম।

বাঁকিপুর খুদাবক্স শাহজেরার কাসি ও
আরবী পাণ্ডুলিপি সমূহের কথা বঙ্গীয়
পাঠকগণ অবগত নহেন। এই পাঠাগারের
দুইখানি পুস্তকের কথা এই প্রসঙ্গে সমধিক
উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিওয়ান-ই-হাকিম—এখানি সিরাজ
নহরের সুবিখ্যাত কবি হাকিমের ভাবপ্রধান
গীতিকবিতা সমষ্টির পুঁথি। এই পুঁথি-
(বা হস্তলিখিত পুস্তক) খানি পাঠাগারের
একটী অমূল্য রত্ন। হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর
বাদশাহবন্দের সাক্ষর, অর্থবোধাত্মক
চিহ্ন ও কথা প্রকৃতিদ্বারা অনেক পৃষ্ঠা
সুশোভিত। এই পুস্তকখানি যে হুমায়ুন ও
তাঁহার পরবর্তী বাদশাহগণের “সঙ্গের সঙ্গী”
ছিল তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।
কিন্তু ইহাতে হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের হাতের
লেখা থাকিলেও, আকবরের সাক্ষর বা
হস্তলিপি দৃষ্ট হয় না। পুঁথিখানি-সম্বন্ধে
একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক।

মুদলমানগণ কুরাণ ও হাকিমের কবিতা-
দৃষ্টে অনেকদূর অদৃষ্টের ফলাফল বিচার
করিতেন। রোমক ও আরবজাতির



বাহশাহ আকবর

মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল! যদিও
অনুষ্ঠানের কলাকল বিচার অনেক মুসলমান
দৃষ্টিতে মনে করেন, তথাপি এরূপ
বিচারে ব্রতী লোকের সংখ্যাও কম ছিলনা।
বিভিন্ন প্রকারে এই কলাকল নির্ধারিত
হইত। পুস্তকখানি খুলিয়া প্রথমে যে
কবিতার প্রতি চোখ পড়িত তাহার মর্ম
হইতেই আরম্ভ বা অভ্যন্ত কাণ্ডে সিদ্ধিলাভ
ঘটিবে কি বিফল-মনোরণ হইতে হইবে
তাহা প্রাধান্য করা হইত। হাকিমের এই
পুঁথিখানি এইরূপ বাহশাহ হুমায়ুন ব্যবহার
করিতেন এবং আবশ্যকমত পার্শ্বে (মাজিনে)
মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। জাহাঙ্গীরেরও
বহুমন্তব্য এই পুঁথিখানির অনেকস্থানে দৃষ্ট

হয়। বাহশাহ আকবরের
জাজ্ঞের শেষভাগে মান-
সিংহ যখন চক্রান্ত করিয়া
সেলিমের সিংহাসনাধি-
রোহণের অন্তরায় হইতে-
ছিলেন, তখন সেলিম এই
পুঁথিখানি খুলিয়া নিজ
অনুষ্ঠানের কলাকল বিচার
করিয়াছিলেন। শাহজাহান
পুত্র দারাতকোও এই
পুঁথির কথা উল্লেখ
করিয়াছেন। হুমায়ুন
হুমায়ুন হইতে দারাতকো
পর্যন্ত সকলেই এই
পুস্তকখানি যে ("Heir-
loom") কুলক্রমাগত
পুস্তকরূপে ব্যবহার করি-
তেন তাহা মনে করা

যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পুঁথিতেও
আকবরের কোন সাক্ষর বা লিপি নাই।

দ্বিতীয় আর একখানি পুঁথির অলোচনা
করা যাউক। ইহা "দিওয়ান-ই-মির্জা
কামরান"। এই বহুমূল্যবান ও অদ্বিতীয়
পুঁথিখানির স্বত্বাধিকারী ছিলেন হুমায়ুন-
জাদা কামরান। ইহাতে জাহাঙ্গীর ও
শাহজাহানের সাক্ষর এবং আকবর, জাহাঙ্গীর
ও শাহজাহানের দরবারস্থ অনেক ওমরাহ
ও কর্মচারীদের সাক্ষর ও মোহর রহিয়াছে।
কামরানের জীবদ্দশায়ই এই পুঁথিখানি যে
লিখিত হইয়াছিল প্রথমতঃ তাহারও প্রমাণ
পাওয়া যায়।

এক পৃষ্ঠার রহিয়াছে (ইহার প্রতিলিপি



আহাদীত ও শাহজাহানের হস্তাক্ষর

আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম ১, “ঈশ্বর সর্ব-শক্তিমান। এই দিওয়ান আমার পূজাপাদ পিতৃদেবের গুলতাত নির্জা কামরানের। ইহা আমার হস্তাক্ষর। শুবদিন মুহম্মদ আহাদীত শাহ আকবর। রাজত্বের বিংশ বৎসর, হিজিরা ১০৩৪।”

ইহা বাদশাহ আহাদীতের হস্তাক্ষর।

ঐ পৃষ্ঠায়ই বাদশাহ শাহজাহান-লিখিত নিম্নোক্ত মন্তব্য ও সাক্ষর দৃষ্ট হয়—

“শুগবানকে ধন্যবাদ যিনি এই দাসের নিকট এই পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। আকবর বাদশাহের পুত্র আহাদীত, আহাদীত বাদশাহের পুত্র শাহজাহান।”

এস্থলে উল্লিখিত হইতে পারে যে ১০২৪ হিজিরার (১৬১৬ খৃষ্টাব্দে) আহাদীত প্রের

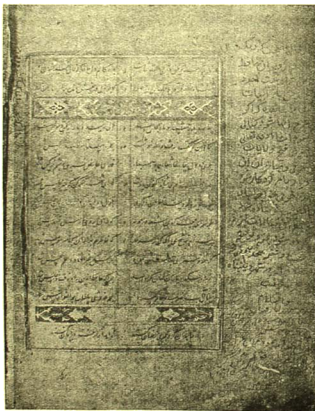
পুত্র গুলতান খুররমকে শাহ খুররম উপাধিতে ভূষিত করিয়া, দাক্ষিণাত্যভাগে প্রেরণ করেন। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পরে রাজকুমার খুররম বৃহানপুর হইতে নাগুতে অবস্থিত বাদশাহ আহাদীতকে সম্মান প্রদর্শনার্থ আগমন করেন (হিজিরা ১০২৬ = খৃষ্টাব্দ ১৬১৭) এবং দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ রাজকুমারকে শাহজাহান উপাধিভূষিত করেন। খুররমই যে তখন বাদশাহের প্রেরপাত্র ছিলেন তাহা দিওয়ান-ই-হাকিমের পূর্বোন্নিখিত পাণ্ডুলিপিতে আহাদীত যে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা হইতেই প্রতীক্সমান হয়:—

“বৃহস্পতিবার, আমার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে মানুহগে সাক্ষাৎ হয়। পঞ্চম

হাস ও একাদশ দিবসের অধিককাল আমরা পৃথক ছিলাম। নমস্কার ও চূষন আচার প্রতিপালিত হইলে আমি পুত্রকে জলিনের উপরে আছান করিলাম এবং অত্যধিক মেহ ও আগ্রহাতিশয্যে আমি তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে মেহপাশে আবদ্ধ করিলাম। তাঁহার যতই সন্ধান ও যৈন্তের ঘোষাতি বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমারও অহুগ্রহ ও মেহ তরুণ বৃদ্ধি পাইতেছিল

এবং আমার সরিকটে উপবেশনার্থ তাঁহাকে আদেশ করিলাম।”

অপর যে চিত্রখানি আমরা হাকিম হইতে প্রদান করিলাম তাহাতে বাঘনাহ হনায়ুন ও জাহাঙ্গীরের স্বহস্ত-লিখিত মন্তব্য ও সাক্ষর আছে। আমরা বাঘনাহের চিত্রোন্মিষিত লিপির মর্ম নিয়ে প্রদান করিতেছি। প্রথমমাংশ হনায়ুন-বাদশাহের—“হাকিমের সিওয়ান অহুসকান



হনায়ুন ও জাহাঙ্গীরের স্বহস্তলিপি

করিয়া আমি এতগুলি শুভদায়ক চিহ্ন পাইলাম যে এগুলি বিস্মৃতভাবে উল্লেখ করিতে হইলে একখানি পুস্তক হইবে। ভগবানের ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গল ও ঐ প্রদেশস্থ সৈন্তসকল বশীভূত হইলে উপহার প্রদান করা বাইবে এবং এইসকল চিহ্ন ঈশ্বরের অঙ্গুগ্রহে ও আদেশে একত্রীভূত করা হইবে। ১৬২ হিজিরা।” বিভীষাংশ তাহান্দীর লেখা—
উহার মর্ম্ম এইরূপ :—“আমি রাগার সহিত বুদ্ধার্থ আজমীর গিয়াছিলাম। যুগ্ম-কালে হীরকের কবচ আমার মস্তক হইতে পতিত হয়। আমি দিওয়ান অহুসদান করি এবং তৎপর দিবস কবচটী প্রাপ্ত হই—
আকবর-বাদশাহের পুত্র মুজদ্দিন তাহান্দীর-কর্তৃক ১০২৪ হিজিরায় লিখিত।”

এই চিত্রখানি কিছু অস্পষ্ট এবং জাহান্দীরের লিপি অধিকতর অস্পষ্ট।

হুমায়ুন, জাহান্দীর ও শাহজাহান—এই তিনজন বাদশাহের হস্তলিপি পাওয়া বাইতেছে। যে দুইখানি পুস্তকের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, সে দুইখানিই যে আকবরের সময়েও ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে। কিন্তু ইহার কোনটীতেই আকবরের লেখা পাওয়া বাইতেছে না। পুণাবন্দ লাইব্রেরীর অল্প কোন পুঁথিতেও এ-পর্যন্ত আকবরের লেখা বা সাক্ষর পাওয়া যায় নাই। অস্ত্রাজ প্রমাণের সহিত ইহা হইতে মনে করা বাইতে পারে যে, আকবর নিরক্ষর ছিলেন। ভারত-ইতিহাসে অবশ্য একরূপ নিরক্ষরতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ঐতিহাসিকসমাজ।

অন্ধকার

ক

জমিদার ভুবন-চৌধুরীর পুত্র নগেন সেদিন একটু বেগী রাতে বাড়ী ফিরিল। তাহার মাথার চুল উন্মথিত, জামার বোতাম-গুলো খোলা, পা-দুটো টলমল, কাপড়-চোপড় এলমেল—পিছনের কাছা বেপরোয়াভাবে অগ্রবর্তী হইয়া সামনের কোঁচাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে।

বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; আগিয়া আছে শুধু নূতন ব্রাহ্মণী। গিরিমার হুহুম, নগেনকে না-খাওয়াইয়া সে ঘন

ঘুমাইয়া না-পড়ে। তাহার নাম রাইমণি, বয়সটি কাঁচা।

নগেন এখানে-ওখানে চৌকর খাইতে-খাইতে দালানে আসিয়া, বেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল; কোনমতে এড়াইয়া-এড়াইয়া বলিল, “বাবার কোথা?”

খাবারের থালা হাতে-করিয়া রাইমণি আন্তে-আন্তে দালানের ভিতরে ঢুকিল। তাহার মুখে ঘোমটা, ডাব-ভঙ্গী সজ্জিত।

রাইমণি আশা-পর্যন্ত নগেনের পিপাসী গোথ শিকারীর দৃষ্টির মত তাহার পিছনে-

পিছনে ঘুরিতেছে। কিন্তু রাইমণি এমন সাবধানী যে, নগেন কিছুতেই তাহার মুখ দেখিতে পার নাই। তবে, তাহার স্বভোল গড়ন ও নিটোল হাত দুখানি দেখিয়াই সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল, যে, এত সুশ্রী দ্বার দেহ, তার মুখ কখনই বিস্মী নহে।

নগেন পাড়াইয়া-পাড়াইয়া দেখিল, রাইমণি অলহুড়া দিগা খাবারের খালাখানি মেঝের উপরে রাখিল; তারপর আগুনখানি বিছাইয়া ও জলের গেলাসটি আগাইয়া দিগা এককোণে সরিয়া পাড়াইল।

এমন নিম্নম্ন রাতে রাইমণিকে এতটা কাছে নগেন আর-কখনো পার নাই। তাহার মনে এর আগে একটু-বে ইতস্তত ছিল, আজ নেশার রসে সেটুকুও ঢাকিয়া গিয়াছে।

রাইমণির বিকে বীকা-চোখে একবার চাহিয়া, নগেন আসনের উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল; অন্ত্যস্ত উত্তেজনাহ তাহার নাকের ডগাটা তখন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে।

খানদুয়েক লুচি খাইয়া নগেন বলিল, “একটু নুন দিয়ে যাও ত!”

রাইমণি কুণ্ঠিতভাবে নগেনের সামনে আসিয়া, হেঁট হইয়া খালার নুন দিতে গেল।

নগেন দেখিল, পাতলা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমণির ডাগর চোখদুটির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। এবং সেইসঙ্গে মাথা-দ্বা দশলার একটা মিশ্র ও মিষ্ট গন্ধ আসিয়া নগেনের মাঝল প্রাণকে পাগল করিয়া তুলিল,—সে আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—হঠাৎ স্বপ্নধবিকের স্থিকিয়া এক

টান্ মারিয়া রাইমণির মুখের ঘোমটা ফুলিয়া দিল।

“ওগো মাগো!”—বলিয়া রাইমণি বিছাতাহতের মত ঘরের মেঝেতে হুমুড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

নগেন বলিল, “চুপ, চুপ—চিচিও না, সবাই শুনে পাবে!”

ঠিক পাশের ঘরেই থাকিতেন, গৃহিণী; সেদিন অসময়ে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। রাইমণির আশ্চর্যের তাহার কাণে তেলিল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন।

দেখিলেন, রাইমণি হু-হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপরে পড়িয়া আছে আর নগেন ভাবাচাক্য খাইয়া খালার সামনে কাঠ হঠয়া বসিয়া আছে।

তাঁহার এই গুপ্তধর পূত্রটির স্বভাব-চরিত্রের কথা তিনি বেশ ভালোভাবেই জানিতেন, সুতরাং ব্যাপারটা বুঝিতে গৃহিণীর বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে তিনি ডাকিলেন, “নগা!”

নগেন একেবারে কঁচো! একটিও কথা না বলিয়া সেখান হইতে সে শ্রুতশ্রুত করিয়া উঠিয়া গেল।

গৃহিণী, রাইমণির গারে হাত দিয়া আত্তে-আত্তে বাধিত স্বরে বলিলেন, “ওঠ মা, ওঠ! নগার যে এতটা সাহস হবে, আমি তা জানতুম না। জানলে, তার সামনে কি তোমাকে একলা বেরুতে দিতুম?”

খ

সপ্তাহ-খানেক পরে একদিন দুপুরবেলার রাইমণি, গিরীর মাথার পাকচুল তুলিয়া দিতেছিল। এই ব্রাহ্মণ-কস্তাটিকে পাইয়া

গিন্নী বেন বর্ষিয়া গিয়াছেন; রাইমণি তাঁহাকে মাঝের মত ভক্তি করে, মেয়ের মত বদ্ব করে; রান্নাবান্না ও গেরস্থানীর কাজে সে এতটা নিপুণ, যে তাহার হাতে সংসারের সব ভার শপিয়া গিন্নী বেন নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন।

গিন্নী বলিলেন, “বামুন-মেয়ে, কাল না তোমাকে একটু সকাল-সকাল উঠতে হবে।”

রাইমণি জিজ্ঞাসা করিল, “কেন না?”

—“কাল আমাদের শুকঠাকুর আসবেন।

তাঁর সঙ্গে আলাবা হৈসেল কেঁড়ে রান্নাবান্না সেয়ে, তবে আমাদের হাঁড়ি চড়বে। সকাল সকাল উঠুন আগুণ না-দিলে ওদিকে অনেক বেলা হয়ে যাবে কি না!”

রাইমণি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “আজ্ঞা।”

ধানিক পরে গিন্নী আবার বলিলেন, “হ্যাঁ মা, রোজই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব করব ভাবি, তা পোড়া মন এমন বেতুল যে, রোজই কেমন ভুলে যায়।”

রাইমণি বলিল, “কি কথা মা?”

—“গুনেছি, তোমার স্বামী আছেন।

কিন্তু এতদিন এখানে রইলে, কৈ, একখানা চিঠি লিখেও তিনি ত তোমার খোজ-খবর নিলেন না!”

চুল বাহিতে-বাহিতে রাইমণি হঠাৎ ধানিয়া পড়িল—তাহার সরল হাসি-হাসি মুখখানি চকিতে বেন একটা কালো ছায়া অঙ্ককার হইয়া গেল।

গিন্নী তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না; তাই সহজভাবেই আবার বলিলেন, “চূপ করে রইলে কেন? বল না।”

রাইমণি জোর-করিয়া কথা কহিল; বলিল, “জানি না।”

—“এখানকার ঠিকানা তোমার স্বামী জানেন ত?”

—“না। আমি যে এখানে আছি, তাও তিনি জানেন না।”

গিন্নী অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “সে কি! তোমার স্বামী জানেন না?”

রাইমণি বেন ভাদিয়া পড়িল; কোন কথা না বলিয়া চূপ-করিয়া সে বসিয়া রহিল।

গিন্নী একটু ভাবিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ বামুন-মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে কি বগড়া করে? তুমি এখানে এসেছ?”

রাইমণি কুণ্ঠিতবরে সংক্লিষ্ট উত্তর দিল, “না।”

—“তবে?”

—“তিনি আমাকে নিতে চান না।”

গিন্নী বেন আকাশ থেকে পড়িলেন। বলিলেন, “জ্যা! তোমাকে নিতে চায় না! তোমার এত রূপ, এত গুণ,—তোমাকে নিতে চায় না, কেমন লোক সে?”

রাইমণি পুতুলের মত বোবা ও স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী যদি পিছন করিয়া না থাকিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, রাইমণির বড়বড় চোখ ধীরে-ধীরে জলে ভরিয়া উঠিতেছে।

গিন্নী আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে বাইতে ছিলেন, হঠাৎ কর্তা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন; তাড়াতাড়ি বোমটা টানিয়া, সেখান হইতে পলাইয়া, রাইমণি বেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

গ

রাইমণি কিন্তু বুকিল, এমন লুকাচুরি আর বেসীদিন চলিবে না, তাহার সব কথা একদিন-না-একদিন বাহির চাইয়া পড়িবেই !

তার স্বামী ? হ্যাঁ, তিনি আছেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে থাকিরাও তিনি আজ বহুদূরে, বহুদূরে ! এ বাবধান তাহার নিজের পাপে ঘটে নাই—নিষ্ঠুর নিয়তি আজ তাহার জীবন-দেহতাকে জোর-করিয়া হিনাইয়া লইয়া গিয়াছে,—তাহার কাকুতি, তাহার অঙ্গ, তাহার বেদনা ব্যাকুলতা এ চিরবিচ্ছেদকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই ! আজ তাহার এ দেহ যেন জীবনহীন যন্ত্রাণিত শবের মত ; এ শব কবে কোন্ বাকিত মুহূর্তে বৈতরণীর ধরস্রোতে পড়িয়া পরপারে গিয়া ঠেকিবে—ভগবান জানেন—মনে মনে সে এখন হুধু সেই কামনাই করিতেছে ! সে জানে, এমন মরিয়া বাঁচিয়া কোন লাভ নাই ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ-সীমার গিয়াও মানুষ যে মন থেকে আশার ছবি মুছিতে পারে না ! নিরাশার মরুভূমির মাঝে পথহারা চাইরাও রাইমণি আজও তাই এই মরণভরা জীবনকে কোনক্রমে কার-ক্রেমে টানিয়া লইয়া চলিরাছে !

তাহার স্বামী ছিলেন বেহমর, প্রেমময়, সজদর। সেও তাহার স্বামীরকে ভালবাসিত সমস্ত জীবন-যৌবন চালিয়া। স্বামী বিনা আর কারকে সে চিনিত না, জানিত না। চরিত্রে সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে সেও কিছু খাটো ছিল না ; কিন্তু যে-আমাদের ধর্ম সীতার পায়ে পুষাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে আকাশে তুলিয়াছে, সেই-আমাদেরই সমাজ

তাঁহাকে আবার পাতালে পাঠাইতে যখন ইতস্তত করে নাই, তখন তুচ্ছ রাইমণির হৃৎকের মেঘে আঙণ লাগিবে না কেন ?...

রাইমণির সম্বল নেত্রের সমুখে সমাজের সিংহদ্বার সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার বুককাটা কারার এখন দেবতার আসন টলিলেও, সমাজপতির হৃদয় গলিবে না !

রাইমণি কাদিতেছে—কাঁদুক ; এমন কত রাইমণির নিফল অঙ্গ সমাজের পায়ে নিষত করবার করিতেছে, কে তার শবর রাখে ?

ঘ

দুবন-চৌধুরীর বাড়ীতে আজ সকলেই শশযন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, অনেকদিন পরে গুরুদেব আজ এখানে পারের ধূলা দিরাছেন।

পুত্র পশমের আসনে গুরুদেব তাঁহার নখর-নিটোল বেহটি লইয়া ত্রীভুজ অ্যাক্সা বসিয়াছেন। গুরু সে গুরুভার হুটপুট দেহখানিতে ব্রহ্মচর্যের কোন লক্ষণ না থাকিলেও তাঁহার বোঁটাওরালা বেলের মত স্বাড়া মাথার দিবা আধ-হাত টিকি, তেল-চক্কে কপালে কোঁটা, খায়া নাকে তিলক, গলায় কঙ্কীর মালা, হাতে হরিনামের মুলি ও পরোনে পটবস্ত্র প্রভৃতি গুরুতর মাল-মদলার কিছুমাত্র ক্রটি নাই।

সকলের আগে বাড়ীর কর্তা আসিয়া গুরুদেবের পা ধরিয়া মাটিতে ধস্তবস্ত হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার পরে গৃহিণী, পুত্র ও অন্তঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের পালা।

তারপর, মাঝার একহাত ঘোমটা টানিয়া রাইমনি আসিয়া সলজ্ঞভাবে প্রণাম করিল।

গুরুদেবের চক্ষুদুটি এতক্ষণ ভাবভরে চুলুপু করিতেছিল; পরের প্রণাম লইয়া-লইয়া তাঁহার ঐশ্বর্যকমল-দৃষ্টি এমনি অশাড় হইয়া গিয়াছিল যে, এতগুলো কৃষ্ণের মৌব আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া এত যে টানাটানি করিয়া গেল, সেদিকে তাঁহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না; কিন্তু, ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমনির মুখ দেখিবার জন্য তাঁহার মূমত্ব দৃষ্টি সন্ধ্যা হইয়া উঠিল।

তাকিয়া ছাড়িয়া, দোলা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, কর্তার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “ভূবন, এ মেয়েটি কে?”

কর্তা বলিলেন, “এ মেয়েটি আমার বাড়ীতে রাঁধে।”

—“কৈ, গ্যালবারে এখন এসেছিলুম, তখন ত মেয়েটিকে দেখি-নি।”

—“ও সব মাসতিনেক এখানে আছে।”

—“মাস তিনেক! তবে কি?”—বলিতে বলিতে খামিয়া পড়িয়া, গুরুদেব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাইমনির দিকে চাহিলেন।

রাইমনি তখন অত্যন্ত অড়োপড়ো হইয়া আন্তেআন্তে চলিয়া বাইতেছিল—গুরুদেবকে দেখিয়া সেও যেন কেমন ধতমত বাইয়া গিয়াছিল।

খানিক শুক খাকিয়া গুরুদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়েটির নাম কি?”

—“রাইমনি।”

—“রাইমনি! ও কি তড়া-আটপুর গাঁ থেকে এসেছে?”

গিন্না একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর, আপনি জানলেন কি করে?”

সে কবার কোন জবাব না-দিয়া, গুরুদেব হতাশভাবে তাকিয়ার উপরে আড় হইয়া পড়িয়া বলিলেন, “ভূবন, এখানে আর আমার সেবতার ভোগ হোতে পারে না—তোমার জাত্ গিয়েছে!”

গাঁয়ের সমাধিপতি ভূবন-চৌধুরী,—যিনি কত লোককে একঘরে করিয়া ‘পত-পত-রবে’ হিন্দুধর্মের অর্থবজা উড়াইয়াছেন, বাহার ভরে ছেলে-ছোকরার দল চোরের মত আটখাট না বাঁধিয়া ঐ-ঐ রানপক্ষীর বিখ্যাত মাস ভক্ষণ করিতে পারিত না, বাহার একটু ইঙ্গিতেই ধোপা-নাপিতের অভাবে অনেক অভাগার কাপড় হইয়াছে করলার মত মথলা এবং দাড়ী-গোক হইয়াছে বাত্না-ধিয়েটারের মুনি-জ্বিষের মত নাতিচূষনোক্ত,—তাঁহারই এত দ্বন্দ্ব বাঁচানো পৈতৃক জাতিটি খাম্কা মারা গিয়াছে? গুরুদেব বলেন কি! ‘মেঘনা-বধে’র রাবণ এখন ভয়দূতের মুখে ‘নিশার স্বপনসম ব্যরতা’ তুলিয়াছিলেন, তখন তিনিও বোধকরি আমাদের ভূবন-চৌধুরীর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যবিত হইবার সুযোগ পান নাই! কর্তা বসিয়াছিলেন, লাকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “প্রভু, এ কি নিদারুণ কথা! আমার জাত্ গিয়েছে? অ্যা! অ্যা!”

—“হ্যাঁ, তোমার জাত্ গিয়েছে! এতে আর কোন সন্দেহ নেই।”

—“রাইমনি কি বাসুনের মেয়ে নয়?”

—“হ্যাঁ, সে বাসুনের ঘেরে।”

তুবন-চৌধুরী হুক কুচকাইয়া বানিক ভাবিয়া বলিলেন, “তবে কি ও কুলভাগ্য করেছে?”

—“না।”

তাইত! তুবন-চৌধুরী অতিশয় ভয়ঙ্কর সমস্তার গড়িয়া গেলেন! তিনি জানিলেন না শুনিলেন না—অথচ তাঁহার এত সাধের জাতিটি কোন্‌ ফাঁকে শ্রেয় কপূরের মত উবিয়া গেল! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা তিনি হাল ছাড়িয়া হতাশভাবে বলিলেন, “তবে?”

হরিনামের সুলির ভিতরে ঘন-ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে-করিতে গুরুদেব বলিলেন, “শোন বলি। রাইমণির স্বামী আমারই শিষ্য। ওর স্বভাব-চরিত্র খুব ভালো—কাকর দিকে উঁচুনজরে চাইতে ওকে কেউ দেখে-নি। কিন্তু গতজন্মে ও কি পাপ করেছিল জানি না, এ-জন্মে তাই বুঝি তারই শাস্তিভোগ করছে। হরি হে, তোমারি কৃপা!”

তুবন-চৌধুরী গুরুদেবের এ পোশক-ধাধার ভিতরে কিছুতেই ঢুকিতে পারিলেন না, সুপ্র ক্যান্‌-ক্যান্‌ চোখে হাঁ-করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব আবার বলিলেন, “হাস-চারেক হোল, একদিন রায়ে রাইমণিদের বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা দাবার সমরে রাইমণিকেও ধরে নিয়ে যায়। গাঁয়ের লোকেরা তার চাঁৎকার আর কালা শুনেও ডাকাতের ভয়ে কোন উপায়ই করতে পারলে না। পরে পুলিশ এসে রাইমণিকে খুঁজে বার করলে। গ্রামের বাইরে একটা

জঙ্গলের ভিতরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল।”

সকলে শুভিতভাবে বসিয়া রহিল, কাহারও মুখ বিরা বাক্য-স্মৃতি হইল না।

তুবন-চৌধুরীর দিকে চাহিয়া গুরুদেব আবার বলিতে লাগিলেন, “পুলিস-তদারকের পর জনকতক ডাকাত ধরা পড়ল—তাদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কিন্তু ডাকাত ধরা পড়লে কি হবে—তাদের সংস্পর্শে রাইমণি যে অমূল্য রত্ন হারাল, সে ত আর ফিরে পাবার নয়! স্বামীর পা ধরে সে অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক কানাকাটি করলে; বললে সে নিশাপ। ভগবান জানেন, সে কথা সত্য কি মিথ্যা! কিন্তু মাহুদের মনের সম্বন্ধে ত চাপা দেওয়া যায় না। এর ক্ষেত্রে সীতাকেও অধিপত্নীকা দিতে হয়েছিল। ওর স্বামীও ওকে আর ধরে ঠাই দিতে পারলে না।”

তুবন-চৌধুরী বিম্বলভাবে গুরুদেবের দুই পা ধড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “ও মাগী নিজের জাত-পুঁইয়ে কুল-মজিরে শেষটা কিনা আমাকে মজাতে এল! আমার কি উপায় হবে প্রভু, আমার কি উপায় হবে?”

গুরুদেব বলিলেন, “ওকে কি তুমি জানতে না?”

—“জানলে কি ওকে ঘরে ঠাই দিভুম—খুলাপারেই বিদেহ করভুম! বত নষ্টের গোড়া নাপিত্রী-মাগী, সেইই কেনে-শুনে ওকে আমার ঘাড়ে গছিরে ঘিরে গেছে। ছি, ছি, এ কথা প্রচার হোলে সমাজে আর মুখ দেখাব কেমন করে?”

গুরুদেব তাঁহার প্যাসন্ডরা বেলুনের

মত কোলা, মোটামোটা ছাঁড়িটির উপরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “ভর নেই। এ তোমার অজ্ঞানকৃত পাপ। তবে, প্রাশস্তিত্ত আবশ্যক। আর রাইমণিকেও এখান থেকে ডাড়িয়ে দিতে হবে।”

৬

ঘরের মেঝেতে রাইমণি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে,—তাহার দুইপাল দিরা সর সর অশ্রুর ধারা বহিয়া বাইতেছে।

হঠাৎ কে তার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিল; চমকিয়া, মুখ তুলিয়া সে দেখিল, ঠিক তার সামনেই নগেন—সন্ধ্যার তরল আঁধারে তাহার চোখদুটো গিরগিটির চোখের মত জলিয়া জলিয়া উঠিতেছে! ভয়ে একটা অক্ষুট আশ্বিনাধ করিয়া রাইমণি তাকাতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

নগেন চাপা-গলায় বলিল, “চোঁচিও না—চোঁচিও না! আমি যা বলতে এসেছি, শোন।”

ঘোমটার মুখ চাকিয়া, রাইমণি ধূমধূম করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

নগেন বলিল, “বেথ, সমাজে কেউ তোমাকে ঠাই দেবে না—যেখানে যাবে সেখান থেকেই ডাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সমাজ তোমাকে না-চাইলেও আমি তোমাকে কেলতে পারব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, আমি তোমাকে রাজ্যরাণির মত রাখব—তোমার কোন অভাব থাকবে না। তোমার ধর্ম ত গিয়েছেই, তবে তুমিই-বা কেন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে মিছে পরের লাহনা সহ করবে?”

রাইমণি যেমন ছিল, তেমনি পাড়াইয়া রহিল, হ্যা না কিছুই বলিল না।

নগেন বুকিল, মোনই সম্ভতির লক্ষণ। সে আন্তরিকভাবে বলিল, “আমি তোমাকে ভালবাসি রাইমণি! এত ভালবাসি, যে বলবার নয়। আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব। আজ শেখরাতে খিড়কীর দরজার আমি তোমার অন্ত্রে অপেক্ষা করব,—তোমাকে অস্ত্র কাঠপার নিয়ে বাবার অন্ত্রে। তুমি কিছু ভেব না, তুমি যা চাইবে তাই পাবে—বাড়ী-ঘর, কাপড়-পখনা, দাসী-বাঁদী! জান ত টাকা আমার হাতের মূল্য।”

হঠাৎ বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। নগেন ব্যস্তভাবে বলিল, “ঐ কে আসছে—আমি চম্চুম। মনে রেখ—শেখরাতে খিড়কীর দরজার।”—বলিয়াই, সে তাকাতাড়ি চলিয়া গেল।

ছইহাতে মুখ চাকিয়া রাইমণি সেখানে বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের অন্ধকার ক্রমেই গঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল সেদিন সে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ আর জলিল না।

৮

নিম্নম্ন রাজি। আকাশ ছড়িয়া হুঘের ধারার মত জ্যোৎস্নার রূপের ঢেউ চলুকাইয়া উঠিয়াছে, ভাস্বাসেবের ধারেধারে চাঁদের হাসি আলোক-পদের পাশড়ির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চৌধুরী-বাড়ীর দরজা খুলিয়া এই নীরব নিম্নে এক রমণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে-ধীরে একাকিনী চলিতে লাগিল।

ঘুমের কোলে শুইয়া গ্রামখানি নিসাড় হইয়া আছে। তাহারি মাঝখান দিয়া নানা পৰচিত্র-লেখা আঁকাবাঁকা পথের রেখাটি অগ্নের ছবিয় মত চলিয়া গিয়াছে,—কখনো আলোকে আগিয়া, কখনো ছায়ার মিলাইয়া।

রমণী সেই পথ ধরিয়া চলিল—চন্দ্রালোকে সেই শুভ্রবসনা রহস্তময়ী সূৰ্ত্তি দেখিয়া গেরো কুকুরগুলো ভয় পাইয়া পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

মাত্রের ধারে পথের শেষ।—রমণী কিন্তু থামিল না, সেই ধূ ধূ মাত্রের ভিতর দিয়াই সে স্বপ্নাবিষ্ট অন্ধের মত সমান অগ্রসর হইতে লাগিল;—দূরে জলাভূমিতে ভৌতিক ব্যাপারের মত আলোয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; আরো-দূরে স্বপ্নানের চিত্রের মত কি-একটা আগুন ঘাউঘাউ জলিতেছে;—তার কিন্তু কোনদিকেই ক্রক্ষেপ নাই, সে যেন মরণকে একটুও ডরায় না!

চাঁদ যখন পাণ্ডুপথে পশ্চিমে নামিতেছে, মাঠ তখন শেষ হইল। সামনেই গভীর অরণ্য, তার মধ্যে পথ নাই আলো নাই শব্দ নাই; রুধু কষ্টিপাথরের ঢেয়েও কালো,

একটা বিরাট নিশ্পন্ন জমাট অন্ধকার, এক অনন্তবেহ পিণ্ডাচের মত বিথকে গিলিয়া কেলিবার অস্ত্র যেন হাঁ-করিয়া ওং পাতিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ কোন্ দূর কুন্ডলনে পাণিয়ার ঘুম ডালিয়া গেল। চারিদিকের ধম্পনে তুচ্ছতার মধ্যে পাণিয়ার আকস্মিক গান শুনিয়া রমণীও ধমকিয়া গাড়াইয়া পড়িল; এতবড় দীর্ঘপথে এই প্রথম সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, চাঁদের অস্তিমহাসি স্রোতের ত্র্যমলতার উপরে তখনো সূৰ্জিত হইয়া পড়িয়া আছে... ... বিদায়ের মলিন হাসি!... ...

রমণীর বুক ঠেলিয়া একটি চাপা নিশ্বাস উঠিল--সে যেন চুপেচুপে অশ্রুট হাহাকার!... ...

তারপর, সেই চাঁদের আলো, পাণিয়ার গান পিছনে রাখিয়া, রমণী স্তম্ভপানে অগ্রসর হইল;—চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া বিপুল অন্ধকার তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে... ... সূতার মত!

ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের নিয়ম

আমরা পূর্বে (১) বংশানুক্রমের মূল অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পিতা মাতা ও পূর্বপুরুষদের গুণাবলী সন্তানে সংক্রামিত হয় যেটামুট তাহা বলিয়াছি, ও কিরূপে জীব হইতে জীবান্তরে সেই

সংক্রমণক্রিয়া সাধিত হয়, তাহারও কতকটা আভাস দিয়াছি। কিন্তু সৃষ্টিধারার যে আর-একটি প্রবল শক্তি কাৰ্য্য করিতেছে তাহার কথা বিশেষ কিছু বলি নাই। সে প্রবল শক্তির নাম 'পরিবর্তন' (Variation)।

ইহাই জীবজগতে বৈবধ্যকে আনয়ন করিতেছে,—তাহার অপূর্ণ বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। বংশাশুক্রম যেমন প্রত্যেক জীবজাতি (Genus) ও জীববর্ণের (Species) মধ্যে, সাদৃশ্য বা সাধারণ্যকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, পরিবর্তন (Variation) তেমনই উহাদের বৈবধ্যকে ছুটাইয়া তুলিতেছে। বংশাশুক্রম না থাকিলে যেমন জীবজাতি ও জীববর্ণসমূহের মধ্যে কোনো সাধারণ ধর্ম থাকিত না, পরিবর্তন না থাকিলে তেমনই এই নানা বিচিত্র জীবজাতি ও জীববর্ণাদির বিকাশ ঘটত না। দার্শনিকের ভাষায় একটি গতিশক্তি (Dynamic), অপরটি স্থিতিশক্তি (Static); একটি স্থটিকে রূপ হইতে নব-নব রূপান্তরে লইয়া যাইতেছে, অপরটি সেই সকল বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্রতার মধ্যে নিয়ম-রজ্জুর বন্ধন টানিয়া রাখিতেছে।

কেবল যে বিভিন্ন জীবজাতি বা জীব-বর্ণের মধ্যেই এই বৈবধ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, এক এক জীবজাতি ও জীববর্ণের অন্তর্গত জীবসমূহের মধ্যেও এই সাদৃশ্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, এক পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও এই বৈবধ্য বেশ স্পষ্টরূপে চোখে পড়ে। একই জাতি একই বংশ একই পিতামাতার কোনো-দুই সন্তানের মধ্যেই স্বভাব, প্রকৃতি, আকৃতি, গঠন একরূপ নয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে সেই সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালেই একটা সাধারণ্যও বেশ স্পষ্ট অঙ্কিত হয়;—সকল বৈবধ্যকে ছাপাইয়া সাদৃশ্যের রূপ উজ্জলভাবে ফুটিয়া

উঠে। ইহাই বংশাশুক্রমের ধারা। এই বংশাশুক্রমিক গুণাবলী কি নিয়মে আশ্রয় প্রকাশ করে, আজ সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব। পরিবর্তনের কথা বাস্তবত্রে হইবে।

এই বংশাশুক্রমিক গুণাবলী নানা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়। স্থূলভাবে বলিয়াছি যে, পিতা ও মাতা এই উভয়ের গুণ সম্বন্ধে একত্র মিলিত হয় ও সেই মিশ্রিত গুণ হইতেই সন্তানের বৈবধ্য ও মানসিক গুণাবলীর গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এই শিশুগণ ও যাতৃগণ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তাহারা কিভাবে পরস্পরের উপর কার্য করে, একে অপরকে ছাড়াইয়া পৃথক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে কি না অথবা পরস্পরে মিলিয়া নূতন কোনো সৃষ্টি গ্রহণ করে কি না,—এই সকল রহস্যের ভিতর একটু তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

যেভাবে এই বংশাশুক্রমিক গুণ সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, নানা বৈজ্ঞানিক তাহা নানা নিয়মের মধ্যে বাধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক-এক জন এক-এক রকম শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন। আমরা অত সব গণ্ডগোলের মধ্যে যাইব না। সকল বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ, নামকরণ প্রভৃতি ষাঁটিয়া ষোঁটামুটি তিনটি স্থূল নিয়ম দাঁড় করানো যাইতে পারে। এই তিনটি স্থূল নিয়মের নাম দেওয়া যায় মিশ্রক্রম (Blended Inheritance), একান্ত ক্রম (Exclusive Inheritance) ও অমিশ্র ক্রম (Particulate Inheritance)।

১। মিশ্রক্রম (Blended Inheritance)—কখনও কখনও দেখা যায় যে পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া যায় ও সেইরূপ মিশ্রিত তাঁর সন্তানে প্রকাশ পায়। মাতার নীলকেশ ও পিতার কৃষ্ণকেশ মিশিয়া-মিশিয়া সন্তানে উভয়ের মাকা-মাঝি একরূপ নীলকৃষ্ণ সৃষ্টিতে দেখা যায়। সন্তানের মুখখানি স্থিরভাবে থাকিলে হয়ত তাহাতে মাতার মুখের সৌন্দর্য দেখা যায়, আবার মুখ-খানি ঘুরাইলে পিতার সৌন্দর্য আদিয়া উঠে। কয়েকটি স্তব্ধবর্ণের উদ্ভিদের মধ্যেও পিতৃমাতৃগুণের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিতৃমাতৃগুণের মিশ্রণের মধ্যেও আবার নানা তারতম্য আছে। অনেক সময়ে তাহার প্রায় সম-পরিমাণে মিশিয়া যায়। তখন সন্তানের গুণের মধ্যে পিতা ও মাতা উভয়ের গুণই বেশ লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় আবার পিতার গুণ বা মাতার গুণ একটু অধিক পরিমাণে সূচিয়া উঠে। তখন সন্তান হয়ত একটু বেশীভাবে পিতা বা মাতার অনুরূপ হয়।

২। একান্তক্রম (Exclusive Inheritance)—যখন পিতৃগুণ বা মাতৃগুণ এইরূপে খুব বেশী-পরিমাণে সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে বলা যায় 'একান্তক্রম'। পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পরের সম্পর্কে আসিয়া, কোনো আত্মাত্মকারণে না মিশিয়া, একে অত্যন্ত ছাড়াইয়া উঠে। তখন হয় পিতৃগুণ কিবা মাতৃগুণ সন্তানের উপর একান্ত আধিপত্য বিস্তার করে,—অপরটির চিহ্ন পর্দাভ হইত দেখা যায় না। পিতা বা মাতার কোনো কোনো বিশেষগুণই একরূপ

স্থলে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু কখনো কখনো সন্তানের গুণাবলীর মধ্যে পিতৃগুণ বা মাতৃগুণের আধিপত্য এত বেশী প্রকাশ পায়, যে মোটের উপর সন্তানের মধ্যে পিতা বা মাতার প্রতিরূপিতই আত্যাত্মিকভাবে সূচিয়া উঠে।

এই অবস্থায়, কেন্ গুণগুলিতে পিতার আধিপত্য দেখা যায়, আর কেন্ গুণগুলিতেই বা মাতার আধিপত্য লক্ষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে বাধাধরা কোনো স্ত্র আবিষ্কার করা যায় নাই। তবে কোনো কোনো গুণের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু ইঙ্গিত করা যায় মাত্র। যথা বিলাতের অবস্থায় আলোচনা করিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে সাধারণতঃ পিতার শারীরিক বৈদ্য মাতার শারীরিক বৈদ্য অপেক্ষা সন্তানের উপর বেশী কাজ করে, অর্থাৎ শারীরিক বৈদ্য হিসাবে সন্তান মাতা অপেক্ষা পিতার অনুরূপই বেশী হয়। আমাদের দেশের কোনো উৎসাহী পণ্ডিত যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন তবে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

এই একান্তক্রম সম্বন্ধে কতকগুলি লোকবিশ্বাস বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। যথা, সন্তানের বাহ্য আকৃতির উপর পিতার প্রভাব বেশী, আর স্বভাব ও প্রকৃতির উপর মাতার প্রভাব বেশী হইয়া থাকে। পশুপালকদের মধ্যেও মোটামুটি এইরূপ ধারণার বিশ্বাস দেখা যায়। কিন্তু এসকল বিষয়েই কোনো সাধারণ নিয়ম গড়িবার মত মালমসলা আবিষ্কৃত হয় নাই। লোকের বিশ্বাস বাহাই হউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে যার পর নাই সাবধান হইয়া কথা বলেন।

অনেকসময় দেখা যায় যে পুত্র অবিকল পিতার অধরূপ আর কন্যা মাতার অধরূপ হয়; কখনো-না পুত্র মাতার অধরূপ, আর কন্যা পিতার অধরূপ হয়। পূর্বোক্ত বিবরণের দ্বারা এ-সম্বন্ধেও ঠিক করিয়া কোনো নিয়ম বাধা নিরাপদ নহে।

৩। অমিশ্র ক্রম :—অনেক স্থলে আবার পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পর মিশিয়া যায় না বা একে অত্যন্তে ছাড়াইয়াও উঠে না। পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ উভয়েই অমিশ্রভাবে সম্ভাব্যের অবশিষ্টে দেখা যায়। পিতা ও মাতা উভয়ের গুণই এত স্পষ্ট ও পৃথকভাবে দেখা যায় যে তাহাকে মিশ্রণ বলা চলে না। কৃষ্ণবর্ণ পিতা ও ক্রিকে রঙের মাতার সংযোগে ছাত কোনো-কোনো অংশাবকের মধ্যে উভয়-প্রকার রঙই পৃথকরূপে দেখা যায়! কাল/পিরাস'ন বলেন যে চোখের রং আরই একান্তক্রমে (exclusively) প্রকাশ পায়। কিন্তু হাওয়ার-করা দুই একটি দৃষ্টান্ত এমনও দেখা যায় যে, সম্ভাব্যের দুই চোখের একটির রং পিতার মত আর-একটির মাতার মত; কিংবা একই চোখে দুইরকম রঙের ছাপই থাকে। একটি বিলাতী sheep-dog-এর এক চোখ পিতার মত, আর-একটি চোখ মাতার মত দেখা গিয়াছিল। এ সকলই অমিশ্র-ক্রমের দৃষ্টান্ত।

কিন্তু উপরে যে তিনটি নিয়মের কথা বলা হইল, তাহা শুধু কতক-গুলি ঘটনার বর্ণনা ও শ্রেণীবিন্যাস মাত্র। বংশাধিকৃত বৈশিষ্ট্য নানা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায় তাহার সবগুলি ঠিক ঠিক ইহাক্রমে দেখা যায়। পড়ে না অথবা

তাহার অন্তর্নিহিত রহস্য কি তাহাও বুঝা যায় না। এখন কথা হইতেছে এই যে এমন কি কোনো নিয়ম হইতে পারে না, বাহা পিতৃগুণ ও মাতৃগুণের সংযোগ-রহস্য ও তাহাদের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে?—সমস্ত বংশাধিকৃত গুণবিকাশের প্রণালীগুলিকে একটা বড় নিয়মের মধ্যে বাধিয়া কেলিতে পারে?—একটা সাধারণ সূত্রের মধ্য দিয়া সমস্ত বিভিন্ন ব্যাপারকে বুঝাইয়া দেয়? এইরূপ চেষ্টা যে না-হইয়াছে তাহাও নহে। মেণ্ডেলের বিখ্যাত নিয়মই (Mendel's Law) এইরূপ একটা বৃহৎ চেষ্টা।

মেণ্ডেলের নিয়ম বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান এ নহে। আপাতত সে সম্বন্ধে কেবল কয়েকটি স্থলকথা বলিব। মেণ্ডেলের কতকগুলি পরীক্ষার ফলে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, পিতৃমাতৃগুণগুলি মূলগুণ (unit characters); আর ইহাদের আশ্রয়স্থান তত্ত্বরূপে 'অণু' (Representative Particles) আছে। এই মূলগুণ-গুলি পরস্পর স্বাধীন-স্বতন্ত্র, কাহারও সঙ্গে কেহ মিশে যায় না। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি (dominant) সক্রিয় আর কতকগুলি (recessive) নিষ্ক্রিয়। যদি এরূপ দুইটি বিভিন্ন বর্ণের (varieties) যৌন-সংযোগ করা যায়—তাহাদের একটিতে সক্রিয় গুণ ও অপরটিতে নিষ্ক্রিয় গুণ আছে, তবে তাহার ফলে যে সক্রিয় বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহাতে শুধু সক্রিয় গুণই দেখা দিবে, নিষ্ক্রিয় গুণের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া

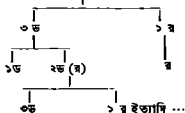
নিষ্ক্রিয় গুণ লোপ পায় না, শুধু চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র। কেননা সেই সত্ত্বরবর্ণের পরম্পরের মধ্যে যদি আবার বৌদ-সংযোগ করা যায়, তবে ৩:১ এই অমুপাতে সক্রিয়-গুণ ও নিষ্ক্রিয়-গুণ বেধা দিবে। অর্থাৎ একভাগ বিত্ত্ব নিষ্ক্রিয়-গুণের পুনরাবির্ভাব হইবে, আর তিনভাগ সক্রিয়-গুণ হইবে। এই সক্রিয়-গুণযুক্ত বর্ণের মধ্যে আবার বৌদসংযোগ করিলে, ১:২ এই অমুপাতে বিত্ত্ব সক্রিয় ও সত্ত্বরবর্ণের উৎপত্তি হইবে। পুনশ্চ এই সত্ত্বর বর্ণের মধ্যে বৌদসংযোগ করিলে আবার ৩:১ এই অমুপাতে পূর্বের স্তার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় গুণের প্রকাশ হইবে। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা বুঝানো বাইতে পারে :—

ড = সক্রিয়-গুণ

র = নিষ্ক্রিয়-গুণ

ড × র

ড (র)... 'র' চাপা পড়িয়া গিয়াছে।



পূর্বোক্ত ও আরও-কয়েকটি অমুরূপ পরীক্ষা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য পাওয়া বাইতে পারে :—

(১) মূলগুণগুলি পরম্পর স্বাধীন-বস্তু, —তাহারা কাহারও সঙ্গে কেহ মিশ যায় না।

(২) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় গুণযুক্ত দুইটি বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে প্রথমত সক্রিয় গুণ আধিপত্য বিস্তার করিলেও নিষ্ক্রিয় গুণ লোপ পায় না, চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র,—সংযোগ পাইলেই আবার বেধা দেয়।

(৩) যে দুই পিতা-মাতার সংযোগ হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুণ না-থাকে, সম্ভানে তাহার বিকাশ হইতেই পারে না। যদি পিতামাতার মধ্যে একজনের কোনো গুণ থাকে, তবে সম্ভানে সেই গুণ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। আর যদি পিতামাতার দুই জনেরই কোনো গুণ থাকে, তবে সম্ভানে তাহা বিশিষ্ট ও পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

মোটের উপর মেণ্ডেলের মতে এই দাঁড়ায় যে, মূলগুণগুলি স্বাধীন-বস্তু বস্তু। পিতামাতার মধ্যে যদি কোনো মূলগুণ না থাকে, সম্ভানে তাহার বিকাশ হইতেই পারে না। সম্ভানে যে সব গুণের বিকাশ হয় সেগুলি পিতামাতার গুণগুলিরই সাক্ষ্যানো-গোছানো অবস্থা—প্রকারান্তর মাত্র। পিতা-মাতার কোনো গুণ সম্ভানে না বর্তিলে মনে করিতে হইবে, তাহা কোন কারণ বশত কিছুকালের ক্ষণ কেবল চাপা পড়িয়া গিয়াছে; সময় ও সুবিধামত কোনো কালে কোনো অখণ্ডন পুরুষে আবার তাহার বিকাশ হইতেও পারে।

একটু অভিনিবেশ করিলেই বেধা যায় যে, মেণ্ডেলের এই মতবাদের প্রাকৃত-বিজ্ঞানের পরমাণুবাদেরই (Atomistic Theory) স্ববহু প্রতিরূপ। মেণ্ডেলের মূলগুণগুলি (unit characters) পরমাণুরই মত।

কে এল আজ পাঙ্কশালে ? বলতে চাহে শেষ কথা—
স্বপ্নসম চপল ছুটি চোখ ।

নিবেছে হায় পথের আলো, নিশীথভরা শুদ্ধতা,
"ওগো তুমি কোন্ বিদেশের লোক ?

চিনি চিনি হে অতিথি, বধিণ হাওয়ার বাও ভেসে,
আমার ঘরে নাই তো এবিঠাই ;—

এসেছ আজ অসময়ে, ফুরিয়ে-বাওয়ার সবশেষে,
হারিয়েছি বা আর কি করে পাই !

লাগর-চেউএর চাপা আগুয়াক আসুছে ঝাউএর বনচ্ছায়
একলা আমি শুনিছি দিবারাত ;—

লক্ষ যুগের যুত্য়া-ফেনা যাক্স করে শেষ-খেলায় ;
বহু আমার করুছে যাতায়াত ।

রাত্রি এসে বন্দী করে আমার জীবন-স্বপ্নকে,
গরল-ফুলে এলায় দেহ-মন—

তুকিরে গেছে তরুণ কলি আমার মানস-চম্পকে,
যুত্য়া মেছে কাস্তানী চুখন ।

আজ ছবরের লব-শেখর টলুছে গভীর রূপ-শোভার,
দীর্ঘ রতি পড়ল জীবন-গীতে ;

বিরহী ওই লুকিয়ে থেকে ছায়া-পথের বীণ-বাজার,
কাপুছে পরাণ তারার কাপুনিতে !

ঐকরুণানিধান বহোপাখ্যায় ।

মল্লারের স্মরণ

(গর)

তার নাম লক্ষ্মীমণি । সে অছ । রাত্তার বিলাসিতার প্রাসাদ-দিগরে বসে তারের
ভিক্ষা করে বেড়ায় । প্রতি কুপা-কটাক করত । হাসি, গান

চিরদিন তার এ অবস্থা ছিলনা । তার আর তার সঙ্গে শতশত পুরুষের তোষাষাধ
রূপ-বোবন, ধন-দৌলত সবই ছিল । আজ উপভোগ করেই তার সকাল থেকে লঙ্কা
যারা তাকে মেখে পুণায় সুখ-কিরিরে অবধি কেটে যেত । আজ তার কণ্ঠস্বর
চলে যায়, এমন দিন ছিল যখন সে তার বিকৃত, কিন্তু এই কণ্ঠই বিচিট্রী স্রবের লীলায়

যখন উজ্জ্বলিত হয়ে উঠত তখন মনে হ'ত বেন রাগ-রাগিণী সুরি ধরে শ্রোতাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃত্তি আকাশ-বাতাসে এমন সুর নেই যা তার গলায় সুরে ধরা না দিয়েছে। কিন্তু আজ? আজ কোথায় সে সুর? প্রাণের বীণায় তার ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় ছড়িয়ে গেছে,—তাতে আর কোনো সুরই বার হয় না একটা লজ্জা-ভরা স্তব্ধতা কর্তৃক ভাঙা সুর ছাড়া।

কেমন করে এমন হ'ল? ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু তাই থেকে তার ভাগ্যে এত-বড় একটা প্রলয় ঘটে গেল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা।

সে দিন আকাশে খুব ঘটা করে বর্ষার উৎসব লেগেছিল। তারই সন্ধ্যার বোল, বর্ষণের সুর আর সুপূর-নিকনের তাল পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে এখানেও একটা ছোটখাট উৎসব জ্বলিয়ে তুলে ছিল।

এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীমণির মঞ্জলিগে একটা জলসা চলছিল। লক্ষ্মী ধরেছিল মন্ত্রীরের করুণ স্ত্র। শ্রোতা ছিল যারা তারা যে খুব রসিক সে কথা কথা বলা যায় না—কিন্তু স্ত্রের সেই কার্যার মত কাপুনি তাদের নিষাড়ে জ্বলনের মধ্যে গিয়ে যে ভোল-পাড় আরম্ভ করলে তাতে তাদের সমস্ত অন্তরটা কেমন-একটা অজানা ব্যাধার গলে পড়তে লাগল—বেন সেখানেও একটা বর্ষণ শুরু হয়েছে। লক্ষ্মী গাইছিল বে-করুণ স্ত্রের তার-করুণতা তাকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল।

যখন এমনি করে আসার জমে উঠেছে—

যখন ভিতর-বাহির চারিদিকে কার্যার মত একটা করুণ স্ত্রের তরে উঠেছে, যখন এই করুণতার স্ত্র লক্ষ্মীমণির সেই ঘরে আর ধরেনা তখন হঠাৎ ঘরের দরজা খোলে কে প্রবেশ করলে। মনে হ'ল যেন বাইরের ব্যাকুল রক্ত পাগলের মত ছুটে এলে ঘরে ঢুকেছে। যে এল রক্ত তার বেশ, রক্ত তার বেশ, কে যেন তার শুদ্ধ বেহ, মলিন বসনের উপর জল ও কার্যার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ বেধে মনে হ'ল এ যেন কোনো আগন্তুক নয়, ঘরে-বাইরে আজ যে করুণ স্ত্রের শ্রোতা চলেছে তাই থেকেই যেন এই সুরি ছুটে উঠেছে—এমনি করুণ তার সুরি। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সে বলে উঠল—“আমার ছেলে? আমার ছেলে কৈ?”

তখন মনে হ'ল এ যেন কথা নয়, কার্য!

গান খেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার করুণ রেশ সমস্ত ঘরের মধ্যে, শ্রোতাদের সমস্ত মনের মধ্যে তখনও ঘুলিয়ে উঠছিল। মনে হ'ল সেই রেশের সঙ্গে বৃষ্টির গলা যেন একসুরে বাঁধা। শ্রোতাদের মধ্যে তারই কন্‌বনা বেজে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার বললে—“আবার ছেলে কোথায় গেল!”

কেউ কোন উত্তর করতে পারলে না—

চুপ করে রইল।

লক্ষ্মীমণি বললে,—“কে তোমার ছেলে?”

বৃদ্ধ বললে—“বিগিন।”

বলেই সে আর্দ্রনাশ করে উঠল—

“সর্বনাশ হয়েছে।”

তার সেই আত্মনাদের মূরে সকলের মনে হল যেন একটা সর্বনাশ সত্যই ঘনিষে এসেছে। বাইরে আকাশের বিজ্ঞাতের কাপুনি, মেঘের কনকনা যেন সন্ধ্যায় কেঁপে কেঁপে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল—“আজ ছুদিন সে বাড়ী যায় নি। কি করেছে সে জানি? আফিসের টাকা ভেঙেছে। পুলিশ আজ সমস্ত দিন ধরে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করেছে—তার বল আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার উপর কি অভিযাচার করেছে দেখবে?”—বলে সে চাদরখানা খুলে শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাতে লাগল। রক্ত তখনো ঝুঁজিয়ে পড়ছে।

সেইদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখ থেকে বেরিয়ে উঠল—“আহা!” অমনি সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা অশ্রুত প্রতিধ্বনি উঠল—“আহা!”

লক্ষ্মীমণি বললে—“কি করলে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাও? তোমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আচ্ছা, আমি রাজি আছি।”

বৃদ্ধ বললে—“না না, তাতে কোনো ফল হবে না। টাকাগুলো তুমি কিরিয়ে দাও, আমি আফিসের লোকদের হাতে-পায়ে ধরে যেমন-করে পারি মিটিয়ে নেব।”

লক্ষ্মীমণি আশ্চর্য হয়ে বললে—“টাকা! কোন্ টাকা কিরিয়ে বেব?”

বৃদ্ধ বললে, “বে টাকা সে তোমার এনে দিয়েছে। সে ত তোমার ভগ্নেই চুরি করেছে, তার জী-পুত্র না খেঁদে মারা গেলেও তার মাথার টনক নড়ে না।”

লক্ষ্মীমণি বললে—“আপনি ত্বল করছেন, টাকা সে আমার ঘেরনি।”

বৃদ্ধ বললে—“নিশ্চয়ই দিয়েছে, নইলে সে চুরি করবে কেন? সে ত আগে এমন ছিল না, বেদিন থেকে তোমার কুহকে পড়েছে, সেদিন থেকেই তার মতিগতি বিগড়েছে।”

তার কুহকে পড়ে অনেকের মতিগতি বিগড়েছে লক্ষ্মীমণি সে কথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন। কিন্তু এ চুরির টাকা তার তহবিলে যে আসেনি এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তাই সে মাথা-বেড়ে চীৎকার করে বলে উঠল—“না না, আমি বলছি টাকা সে আমার ঘের নি।”

বৃদ্ধ বললে—“নিশ্চয়ই দিয়েছে। জানি তোমরা অনেক চাতুরী জান। এ বুড়োর সঙ্গে কেন চাতুরী খেলছ? নগদ টাকা না দিয়ে থাকে তোমার গহনা গড়িয়ে দিয়েছে, দাও সেগুলো কিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি দাও।”—বলে বৃদ্ধ তার পা বাড়িয়ে ধরলে।

লক্ষ্মী পা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছনে সরে গেল। তার নিঃশব্দ পাওয়া সেই মাল্লারের মূর তখনো তার মনের ঘরে আঘাত দিয়ে দিয়ে কিরছিল; মনের বাঁধকে আলগা করে দিয়ে তাকে কেমন যেন সব জ্বলিয়ে দিচ্ছিল। বৃদ্ধের চোখের জল দেখে তার চোখের পাতা ভিজে এল। সে বলে উঠল—“কত টাকা?”

বৃদ্ধ একটা আশার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—“আট হাজার টাকা।”

আট হাজার! লক্ষ্মীমণির মনে হতে লাগল একটা বুড়ো বাবুন একটু চোখের জল

কেলে এতগুলো টাকা নিয়ে যাবে? সে হবে না। সে বলে উঠল, “না না, অত টাকা হবে না—তুমি যাও।”

বড়ের ঝাপটে শুকনো গাছ ঘেঁষন ভেঙে পড়ে বুড়ো ঠিক তেমন করে ভেঙে পড়ল। সেই সময় আসন্ন থেকে একজন উঠে বৃদ্ধকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বরজা অবধি বাবার আগেই লক্ষী বলে উঠল,—“না না, কেন ওকে টানাটানি করছ! গাড়াও।” এই বলে দেয়াড়ের টানাটা খুলে একথানা নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বললে—“এই নিন।”

বৃদ্ধ হাত পেতে তার কাছ থেকে নোটখানা নিয়ে কল্প দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—“এতে কি হবে? নাও, নাও, আরো কি আছে নাও, আর দেখি কোরোনা। হতভাগা দুদিন বাড়ী যায়নি, তার বাড়ীতে যে কি কাণ্ড চলছে তা সে একবার ভাবেও না। আজ দুদিন আমরা সবাই একরকম অনাহারে কাটিয়েছি, তার ছোট ছোট মেয়ে-ছেলেগুলো ক্ষিধের আশায় সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে পড়েছে, এ সব না হয় সহ্য হবে কিন্তু হতভাগার যদি ঝেল হয় তাহলে যে কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলো না খেতে পেয়ে মারা যাবে—ওর জীকে যে রাত্তার গাড়াতে হবে।”

রাত্তার গাড়াতে হবে! এই কথা ভাবতে ভাবতে বহুকালবিশ্রুত একদিন সন্ধ্যাবেলাকার একটা ছাঁব লক্ষীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। আকাশের সমস্ত বিভাবিকা নিয়ে এসে সেদিনকার সন্ধ্যা তার চোখের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ছাঁসি, নাচ,

গান-তরঙ্গ পৃথিবী সেদিন তার চোখে কী যিব ছড়িয়ে দিয়েছিল! কী ভয়ঙ্কর অসহায়তা, কী নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই না তাকে লড়াই করতে হয়েছিল!—বিশ্রোহী মন যে-পথে বাবার বিরুদ্ধে বৈকে দাঁড়িয়েছিল সেই মনকে কী নিষ্ঠুর শাসন করে, কি-রকম ক্ষতবিক্ষত করে তাকে ফেরাতে হয়েছিল!—সে যথা সে আশ্রয় ভুলতে পারেনি। তার পোশাক ছনরের পরতে পরতে অশ্রুত লিপিতে যে কাহিনী লেখা ছিল অতীত আজ বর্তমানের দৃষ্টি ধরে সেগুলোকে তার মনের সামনে আজ স্পষ্টতর করে দৃষ্টিতে ভুলতে লাগল—সে কি ভীষণ যন্ত্রণা!

ছুটে গিয়ে লক্ষী আলমারির দরজা খুলে গরমার বাস্কাটা এনে বৃদ্ধের সামনে কেলে দিয়ে বললে,—“বাও, নিয়ে যাও, আর একমিনিটও দেরি কোরোনা, তাহলে হয়ত তোমার পুত্র-বধূকে রাত্তার গাড়াতে হতে পারে। যাও, যাও—কী ক্যাণক্যাণ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছ!”

বৃদ্ধ বাস্কাটা খুলে অবাক হয়ে একবার গধনা-গুলোর দিকে আর-একবার তার মুখের দিকে তাকাতো লাগল।

পাগলের মত চৌচিরে উঠে লক্ষী দুহাত দিয়ে ত্রলে তাকে একেবারে বরের বার করে নিলে।

তার মাথা তখনও ঘুরছিল; মনে হতে লাগল গরনাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রক্তও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, বর্ণন তখন খেঁখে গেছে;—আকাশ যেন তার সমস্ত সম্পদ অরিরে দিয়ে ঠিক তারই মত নিঃশ হয়ে

তিনিই পড়েছে। লক্ষ্মী রিক্ততার একটা ব্যাকুলতার আত্মহারা হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তার অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবেরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

তারপর পিছনের বারান্দা থেকে একজন ছোকরার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে লক্ষ্মী বললে—“চুরির টাকা কোথায় রেখেছিল বন্। শিগ্গির বন্। সে টাকা আমার একুনি এনে দে। আমার সর্ব্বের আজ তোর জন্তে বিলিয়ে দিচ্ছি, জানিস্।”

বিপিন বললে, “জানি। কিন্তু কেন দিলি ? —টাকা আমার নেই।”

লক্ষ্মী বললে,—“কোথায় গেল টাকা ?”

“কি হবে তা শুনে ? সে টাকা ত আর ফিরে পাবিনি।”

“তবে তুই কাউকে দিয়েছিলি ?”

“হ্যাঁ।”

“কাকে দিলি ? বন্, শিগ্গির বন্, কে তোর পেরায়ের লোক আছে।”

“আমি বলবনা। শুনে তুই রাগ করবি।”

“না না তুই বন্।”

বিপিন অড়িতকণ্ঠে বললে,—“টাকা আমি কামিনীকে দিয়েছি—”

“—কামিনী—কামিনী ! চোর কোথা-
কার, পাখি, মদমারেস, বেয়া এখান থেকে,
বেয়া !”

বিপিন লক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, “রাগ করিসনে তাই !”

লক্ষ্মী সজোরে তার হাত ছিটকে ফেলে দিলে সরে দাঁড়াল ; বললে—“চোরকে আমি ঘরে ঠাই দিইনে—বেয়া তুই, চোর !”

বিপিন উত্তেজিত হয়ে বললে—“চোর চোর করিসনি বলছি !”

লক্ষ্মীমণি একটা অটুহাস্ত করে বলে উঠল,—“ওরে আমার লাগুয়ে ! তুই চোর না ত কি !”

বিপিন আর সামলাতে পারলে না,—
সামনে থেকে একটা ঘটি তুলে নিয়ে
লক্ষ্মীমণির পায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলে।
সেই ঘটি তার মুখের উপর এসে লাগল—সে
ঘুরে পড়ল—তার দুটো চোখ আর মুখের
খানিকটা একেবারে খেঁড়লে গেলে।

বিপিন তাকে একা কলে ছুটে বেরিয়ে
গেল।

শ্রীশ্রেনাচুর আতর্ষী।

প্রভাতে ও রাত্রে

কাল সকালে হঠাৎ আঁধি বেলি
তোমার যদি না পাই এ ঘোর ঘরে ;—
হিরণ তব আঁচোল বেড়ার খেলি
উদাস উদার নীল আকাশের পরে ;
নাইকো রবি তোমার ও মুখ ছবি

রোদের মতো হুড়ার প্রেমের আলো,—
পঙ্কজ তার মধুর লাগে সবি—
সবাই বেন বাগছে সবে ভালো ;
ফুটেছে তুলে তোমার প্রাণের বাস,
ছুটেছে হাওয়া মধুর তোমার হাস,

অবাক্ আমি হবইনাকো মোটে
সহজ সবই হতেই এবে পারে !
সুস্থল যদি ফুলের মাঝে ফোটে
অবাক্ হরে কেইবা বেথে তারে ?
জাগছে প্রেমে বিকাশ-অসীমতা *
নইলে যে তার মিটবেনাকো বাপা ।

নিশীথ রাতে হঠাৎ ভেগে উঠি
দেখিই যদি পাশের পানে চেরে
চন্দ্র তারা তোমার মাঝেই নুটি
সব নিশ্চিতি তোমার আছে ছেঁরে ;
সুন্মের ঘোরে তোমার যে হাতখানি

শিথিল ভাবে ছড়িবে আমার বেঁচে
নিশীথিনার স্তব্ধ গভীর বাণী
ঘেরা বিপুল আশ্রম বিরাম বেঁচে ;
এলানো ওই আকুল কেশের ছায়া
ভাগ্য তুবনভরা অগ্নি মায়া ;
তুমি যদি নিশীথ-রাগির রূপে
ভেগেই উঠ কখন চূপেচূপে
ঠিকের লাগি অবাক হবমারে—
হবার কথা হোতেই এবে পারে ।
নিশীথ প্রাণের স্তব্ধ বিরাটখানি
তোমার মাঝে আছেই আছে জানি ।
ঐদিকেস্ত্রনারায়ণ বাগচী ।

আট্টে অধিকারী-ভেদ

শান্তি-কলায় বাহারা অহুরাগী, তাঁহারা
যেন বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের
এই উক্তিটি সর্বদা স্মরণ রাখেন :—I, at
any rate shall never be able to
join a party which has the major-
ity on its side. Bjornson says,
"The majority is always right";
and as a practical politician he is
bound, I suppose, to say so. I,
on the contrary, of necessity say,
"The minority is always right."

কলা-অগতির সর্বত্র, ইবসেনের ঐ
দামী কথাগুলির, সার্থকতা অক্ষরে-অক্ষরে
খাটিয়া যায়। সাহিত্যে বাহারা প্রতিভার
অবতার, তাঁহাদের অনেকেই কেবল বাছা
বাছা অনকতক বলিকের প্রাণের পিপাসা

নিটাইতে পারেন;—সকলকার মনোহরণ
করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ! একথার অলস
প্রমাণ যিনি চান, তিনি যেন কোন সাধারণ
পুস্তকালয়ে যান। সে-সব অরণ্যের রোজ
যদি ষোলজন লোক বই লইতে আসে, তবে
তাঁহাদের মধ্যে পনেরোজন লোক লইবে
বটতলার দার্শনিক ঔপজ্জাসিক প্রভৃতির লেখা
চমকধার বই ; বাকীজন্য প্রভৃতির উপজ্জাসের
দিকে তাহারা ভুলিয়া ও কিরিয়া চাহিবে না ।

গানের আসরে ভাল গাইয়ের গলায় সরু
কাক বা উচুঘরের রাগরাগিণীর আলাপ কেহ
বুঝিবেও না—শুনিবেও না ; কিন্তু সেই-
খানেই যদি অস্ত-কোন লোক একটা হাল্কা
স্রবের চটুল গান ধরে, তবে যখন
বাহবাহ চোটে প্রাণ ও কাণ একেবারে
আন্টান্ ও যান যান করিতে থাকিবে !



ভেলাসকুয়েজের একখানি ছবি

শিল্পক্ষেত্রেও ঠিক এমনি কারখানা।
 Millais বা Velasquez এর আঁকা ছবি
 দেখিতে লোকে ততটা ভালবাসে না—বতটা
 ভালবাসে Whistler বা Murilloর আঁকা
 ছবি দেখিতে। জনসাধারণ Rodin ও
 Manetকে কোঁলয়া Rouguereau ও
 Canovaকে লইয়াই মাতামাতি করিতে
 চায় বেশী। প্যারীর Sainte Chapelle
 দেখিয়া লোকে তেমন অভিভূত হয় না,
 রোমের St. Peter দেখিয়া যেমন হয়।

মুরোপের উচ্চশিক্ষিত জনসাধারণের
 অবস্থাও যদি এমনি শোচনীয় হয়, তবে
 আমাদের দেশের সাধারণ লোকের শিল্প-

রসবোধের মাত্রা যে কতটা অল্প, তাহা কল্পনা
 করাও শক্ত! তাই শিল্পার্থী অবনীজনাধের
 মোচন তুলির লিখনকে ছোট বেকাইয়া এক
 পাশে তেলিয়া রাখিয়া, এখন কোন সবজাত্তা
 কষ্ট-ক্রিটিক আউথুলের দ্বিতীয়বারিক ছাত্রের
 আঁকা রসচক্ষে পটের তারিক করিয়া পরম
 বিজ্ঞতার (এবং চরম মূর্থতার) পরিচয় দিয়া
 বলেন, তখন আমরা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য
 হই না; কারণ, এ-দেশী ক্রিটিকের বুদ্ধির
 দোড় এমনি বিষম স্বমীর্ণ হওয়াই তা
 স্বাভাবিক!



କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧା

ଶ୍ରୀମତୀ ଅବନୀକାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଡିଅ ହସ୍ତେ

অবশ্য, ‘অধিকাংশ’ (Majority) যে সব-সময়েই ভ্রান্ত, এটাও ভোর-করিয়। বলিবার মত ভোর আমাদের নাই। কারণ, সময়ে-সময়ে দেখা গিয়াছে যে, ‘অধিকাংশ’ ও ‘অল্পাংশ’ (Minority) এক-জারগার আসিয়া মিলিয়া এ-ওর সঙ্গে ‘সেক্-হাও’ করিয়াছে! ভালমহল বেধিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রসিক-অরসিক, সাধারণ-অসাধারণ সকলেই শতমুখে তারিফ হুঙ্কার করে। তাত্ত্বিক ঐক্যবিরোধী গড়া Venus of Melos এবং চিত্রে রাকেলের আঁকা Sistine Modona দুই দলেরই প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিম্‌সের গির্জার পশ্চিমদিকের কলানৈপুণ্য দেখিয়া অধুনা শিল্পরসিক হুঙ্কার চন না; তাহারা শিল্পের গুড় রসের স্বাদ পায় নাই, এখানে আসিয়া তাহারাও সুদৃশ্যে লুক্কায়িত সেই অপূর্ণ কারুশিল্পের ছায়াতলে অবাক হইয়া পড়িয়া থাকে। এখানে কঠিন পাথরের উপরে মানব-প্রাণের ভাবের কমল এমনি শত-দল মেলিয়া ছুটিয়া উঠিয়াছে যে, গত সাতশো বছর ধরিয়া হাজার-হাজার নুতনপ্রিয় ধ্বংসোদ্ভূত ও বুদ্ধপাগল দল্লার দল বারবারে ইহার হুমুখ দিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রিম্‌সের স্বর্ণমাধুরী তাহাদের পাবাণ প্রাণকেও পেলব করিয়া তুলিয়াছে,—তাহাদের উদ্ভূত নিহুঁহ হত হইতেও রক্তাক্ত অস্ত্র খসাইয়া দিয়াছে! হার, সেই সাতশত বৎসরের পৈশাচিকতার চাপা আগুণ যে আজ বিংশশতাব্দীর পরিপূর্ণ সভ্যতার যুগে ইঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রিম্‌সের জন্ত চিত্তাকর্ষণ করিবে, প্রতীচোর বর্তমান রক্তপাথার দেখিবার আগে কে তাহা

ভাবিতে পারিয়াছিল? রিম্‌সের সে অপূর্ণ সুবন্দা আর নাই; বিংশশতাব্দীর নব-কুরুক্ষেত্রে সভ্যতার মহাবড়ো তাহা বোটা-ছেঁড়া কুলের মত পথের ধূলায় পরিণত পড়িয়াছে!

এ সকল ক্ষেত্রে ‘অধিকাংশ’ ও ‘অল্পাংশ’ একত্রে মিলিত হইলেও, এই দু-দলের মিলনের যেতু কিন্তু এক নয়। ‘অধিকাংশ’ এখানে যে কারণে শিল্পশিল্পকে প্রশংসা করে, ‘অল্পাংশ’ সে কারণকে স্বীকার করে না। সাধারণ লোকেরা শিল্পের নিন্দা-প্রশংসা করে ভাবপ্রবণতার বিক হইতে; কিন্তু, তাহারা সমঝদার, তাহারা সত্যের নিকরে কথিয়া শিল্পকে পরণ কাঁচিয়া দেখেন। যে-সব কলাবিদের কার্য একসঙ্গে ভাবপ্রবণ ‘অধিকাংশ’ এবং সত্যসন্ধানী ‘অল্পাংশ’কে আকর্ষণ করিতে পারে সেই সকল শিল্পী



চন্দ্রালোকে (প্রাচীন চিত্র)

সাধারণ-অসাধারণ সব সমাজেই কল্কে
পাইয়া থাকেন। যেমন, রায়কলের মাতৃমূর্তি।
বেহমতী জননীর কোলে তাঁহার প্রাপ্যপুত্রগণ
সন্তানের খেলা—ছবিয় এই শিবরতি সৰ্ব-
সাধারণকে যে পুৰ সহজেই অভিভূত করিবে,
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু এ
ছবিতে রায়কলের যে হাতের কারদা, তুলির
টান, রেখা-রঙের লীলা আছে এবং সর্কোপরি
ইহার মণি শিল্পীর যে স্বস্তৃষ্টি, সত্যাত্মকৃতি

ও ভাবের প্রেরণা আছে, তাহা সাধারণের
চোখ এড়াইয়া কেবল সমস্বপ্নারের চোখেই
ধরা পড়ে—এবং সমস্বপ্নারের কাছে মাতৃমূর্তির
যে এত আদর তাহার আসল কারণ হইতেছে
রায়কলের ঐ কলাকৃৎশলতা এবং প্রবঞ্চন।
“চন্দ্রালোকে” ও “কৃষ্ণ” নামে আমরা দুখানি
ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি এখানে
দিলাম, “এ-দুখানিও দু-দলের দর্শকের
মনোরঞ্জন করিতে পারিবে—কেননা, এ



নট কৃষ্ণ (প্রাচীন চিত্র)

ছবি-দুখানির বিষয়ও যেমন জনপ্রিয়, অঙ্কন-পটুতাও তেমনি চমৎকার।

বিষয় খরিসা শিল্প-বিচার করে বড়িগ্রাই জনসাধারণ আসল-নকল চিনিতে পারে না। শিল্পজগতে এমন করে কথানি ছবি আছে, সম্বন্ধযোজ্য যে-গুলিকে রাকেলের “মাতৃ-মূর্তি”র চেয়েও ভালো বলিয়া জানেন। কিন্তু সে-সব ছবির বিষয় সাধারণের চোখে চমক লাগাইতে পারে না বলিয়া তাহাদের

সঙ্গে সকলের পরিচয়লাভের সুযোগও ঘটে না। Giorgione-এর Castelfranco Madonna নামে ছবিখানি শিল্পীসমাজে অত্যন্ত বিখ্যাত। কলাজগতে এমন ছবি চলক, সমালোচকরা বাহাকে নিখুঁত বলিয়া মানিয়া নেন, Giorgione-এর অঙ্কিত এই ম্যাডোনা-মূর্তিটি উক্ত চলক গুণের অধিকারী। এই ছবিখানির অঙ্কনকাল পাঁচ শতাব্দীরও আগে—কিন্তু এতকালের মধ্যে খুব কম লোকের কাছেই ইহার আদর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব কম লোকের মুখেই ইহার



মাতৃমূর্তি
(Castelfranco Madonna.)

নাম শোনা যাইবে। সমস্তর ইহার গুণ যদি না-বুঝিতেন, এ ছবিখানি তাহাহইলে বিশ্বস্তির অন্তরে তলাইয়া যাইত।

সমস্তহারেরা সকলদিক 'ভাবিতা-বুঝিতা' দোষগুণ বিচার করিয়া একবার বাহ্যকে ভাগো বলিয়া গ্রহণ করেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেলেও আর তাহাকে ভাগ করেন না। কিন্তু জনসাধারণকে এমন-ধারা বিশ্বাস করা চলে না; তাহাদের নিজ্ঞা প্রশংসা বিচারবুদ্ধি-সাপেক্ষ নয় বলিয়া, তাহারা আর বাহ্যকে মাথার চড়ার, কাল তাহাকে পথে বসায়! ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। একসময়ে Bernini, Canova ও Tharwaldsen সর্ব-সাধারণের প্রিয় ছিলেন; আর-একসময়ে Carlo Dolci, Guido Reni ও Domenichino প্রভৃতি শিল্পীকে সকলেই পূর্ব পছন্দ করিত; কিন্তু জনসাধারণের মন লক্ষ্যীয় মত চকল বলিয়া ঐ-সকল শিল্পীর জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমিয়া বাইতেছে। এইজন্য, বড়ই আপাতমধুর হউক, জনসাধারণের প্রশংসাকে কোন শিল্পীই যেন সত্য বলিয়া গ্রহণ না করেন। সাধারণের মন রাখিতে গিয়া, এবেশে অত বই লিখিয়াও রাজকৃষ্ণ রায় সাহিত্য-সমাজে নিজের জন্ত একটুখানি আয়ত্তা করিয়া লইতেও পারিলেন না!

সাধারণের শিল্পবিচারে আর-একটি মন্ত খুঁজ আছে। তাহারা আসল সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে না। তাহারা ভাবে, যেখিতে যাহা সুন্দর, তাহার মধ্যেই বুদ্ধি সৌন্দর্য্য পাওয়া যায়! কিন্তু তা ত নয়! Beauty হচ্ছে এক জিনিষ আর Prettiness হচ্ছে

আর এক জিনিষ—রূপা ও কাঁসা যেমন আলাদা জিনিষ,—এ দুটিও ভেদনি!

সৌন্দর্য্য আছে কেবল সত্যের মধ্যে; তাইত কবি বলিয়াছেন 'সৌন্দর্য্য হচ্ছে সত্য, সত্য হচ্ছে সৌন্দর্য্য'! যে কলাবিন সত্যকে পাইয়াছেন, কেবল তাহার সৃষ্টির মধ্যেই সৌন্দর্য্য তাহার সিংহাসন পাতিয়াছে।

ফ্লোরেন্সের প্রথম যে চিত্রকর স্বয়ংস্তার অধিকারী হইয়াছেন, তাহার নাম Giotto, —১৩১৬ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। কি রেখা পাতে আর কি বর্ণপাতে,—Giottoর চেয়ে বড় অনেক শিল্পী জগতে নাম কিনিয়াছেন। কিন্তু অনেকদিকে অসম্পূর্ণ হইলেও, Giotto সত্যের সাক্ষ্য পাইয়াছিলেন; তাই তাহার অঙ্কিত চিত্রাবলীতে সৌন্দর্য্যের যে স্বরূপ-বর্ণন হয়, রেখা ও রঙে ওস্তাদ অনেক নামজাদা আঁকিরের ছবিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। Bouguereau একজন একেণে পটুয়া; দেখিতে সুন্দর এবং রেখারঙ্গ নিখুঁত হয় বলিয়া বাজারে তাহার আঁকা ছবিগুলির নাম-ডাক বখেটে। তাহার সুন্দরের আর-একটি কারণ, জনসাধারণের ভাবপ্রবণতাকে আগাইয়া তুলিতে তিনি একজন মন্ত-ওস্তাদ। তাহার অঙ্কিত নানা চিত্রের মধ্যে The Virgin as Consoler নামে শোকেস ছবিখানি অনেকের কাছেই পরিচিত এবং কিছুদিন আগে "সাহিত্য" পত্রে এই পটের একখানি প্রতিলিপিও বাহির হইয়া গিয়াছে। সুন্দর-সুন্দর সৃষ্টি আঁকিয়া রঙের বাহার দেখাইয়া প্তিনি বোকা লোকের চোখে চটক লাগাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এত-করিয়াও সত্যের সঙ্গে-তাঁহার সাক্ষাৎকার

হয় নাই; তাই তাঁহার চিত্রাবলীতে চোখজ্বলানো রূপ থাকিলেও মনজ্বলানো সৌন্দর্য্য ঘেঁষিতে পাওয়া যায় না। রেখাবর্ণ-পাতকৌশলে Giotto তাঁহার চেয়ে ঢের খাটো; তথাপি সমালোচকরা Bouguereau-এর উপরে Giottoর আসন নির্দেশ করিয়াছেন কেন? কেননা, Bouguereau যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান নাই, Giottoর ছবিতে সেই সৌন্দর্য্যের শিখা জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

• •

অমূল্যবান না করিলে শিল্পবোধ হওয়া অসম্ভব। সাধারণের মধ্যে সাধারণত এই অমূল্যবানের একান্ত অভাব দেখা যায়; তাই তাহাদের রুচির উপর নির্ভর করা চলে না। কেন চলে না, একটি দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দু-দু মাই—নির্জন, শুষ্ক, উদাস। তার মাঝখানে কোন্‌কালের একটি পুরানো বাড়ী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার ছাদ গিয়াছে, দরজা-দ্বারলা বসিয়াছে, খ্রী-ছাঁদ সমস্ত ভুটিয়াছে, থাকিবার মধ্যে আছে মৃদু এখানে-ওখানে ছ-একটা বুনো-গাছে-ভরা শেওলা-মাথা নড়বোড়ে ফাট-থরা প্রাচীর।

খানিক-কালো খানিক-আলো লইয়া প্রথম-সন্ধ্যা। এখন দিবস-রজনীর মিলন-রেখায় আসিয়া দাঁড়ায়, এখন এই ধ্বংস-স্থলের মধ্যে একটা রহস্যপূর্ণ ভাব জাগিয়া উঠে।

এমনসময় যদি কোন সাধারণ লোক

এ-পথে আসিয়া পড়ে, তবে সে এ ভাঙ্গা বাড়ী দেখিয়াও একটিবার ধমকিয়া দাঁড়াইবে না—বরং আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে আরো-তাড়াতাড়ি হুহুয়ের লোকালয়ের উদ্দেশে চলিয়া যাইবে। কিন্তু বাহার চোখের মত চোখ আছে, যিনি কলাবিদ বা কলারসজ্ঞ, এখানে আসিয়া পড়িলে ঐ লোকটির মত তিনিও এমন একটি দৃষ্ট দেশ্যর সুযোগ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন না; এখানে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ চোখে, বিস্তার প্রাণে তিনি দেখিবেন, এই স্তম্ভিত, গভীর সন্ধ্যাআকাশের তলার, এই বিঘন, নিভৃত ও প্রান্তহীন প্রান্তরে, এই পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ ও নিঃশব্দ ধ্বংসস্থলের মধ্য হইতে কেমন-একটা অদৃষ্ট জীবনের আভাস ও বিবর ভাবের ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছে! ঐ লতাগুচ্ছশৈবালে চিত্রিত, মতোহত তথ্য প্রাচীরগুলিও কি-এক মোহন সৌন্দর্য্যে অপূর্ণ-স্বন্দর, হাসি ও অশ্রুর মত আলো-ছায়ার ঢেঁকল লীলার বিচিত্র! সময় বিশেষে জড়ের মধ্যেও প্রাণের বে অভিযান্ত্রিকি দেখা যায়, রসজ্ঞের হৃদয় এখানে আসিয়া তাহা একান্তভাবে অনুভব করিবে।

‘অধিকাংশ’ ও ‘অসামান্য’র মধ্যে এই পার্থক্যেই তর্ক; প্রতিদিন আমরা যে-সকল দৃষ্ট দেখি, যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে আসি, জনসাধারণ সেগুলিকে তলাইয়া দেখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করে না; কিন্তু রসিকরা সেই সকল নিত্যদৃষ্ট দৃষ্ট ও বস্তুর মধ্য হইতেই নূতন ভাব, নূতন রূপ ও নূতন রসের সন্ধান পাইয়া থাকেন।

রসিকের এই-যে গভীর হৃদয়টী ও রসগ্রাহিতা, সাধারণের ভাগ্য নাই। তাই বলে তারি হইলেও 'অধিকাংশ' কখনো 'অসামান্য'কে তৈলিয়া ঘণ্যই উন্নত সমাজে চুকেতে পারে না; 'অধিকাংশ'র মতই তির্যকাল সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠাপাত করিয়া থাকে। এবং এইজন্যই আটের মধ্যে জনপ্রিয়তার (Popularity) কোন মূল্য নাই। এমন-কি, যে আটটির সৃষ্টি বেশী-লোকের পছন্দ-সে, তিনি যে খুব উচুতরের আটই নন, কিছুমাত্র ত্রুটি না-করিয়া অনেকসময়ে সে কথাটাও ফল-করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়।

শিল্পরসজ্ঞগণ তাই মনে করেন, আটটির পক্ষে জনপ্রিয়তার মত মারাত্মক দ্রুত আর-কিছু নাই। আটটির গুণের যখন সর্বজনপ্রিয় হইবার বাসনা জাগে, তাহার আট তখন বেশিতে 'আহামরি' হৃদয় হইলেও হইতে পারে—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মাকাল কলের মত ঘণ্য!

এমনি সঙ্কলনিক চাইতে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আট হইতে যাওয়া আভিজাত্য উঠাইয়া দিতে চান, তাহাদের বুদ্ধির গোড়ার কিংকিৎসল আছে! কারণ, আট এখনো সাধারণ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হয় নাই। সুযোগে জনসাধারণের ত্রুটি, শিক্ষা ও রসবোধ গ্রহণকার চেষ্টা আর বেশী

ধাওয়া, উন্নত ও প্রগতি; তবুও সেখানকার কবি, শিল্পী আর সমালোচকরা জনসাধারণের নির্মূল্যতা ও অরসিকতার দ্বন্দ্ব একান্তে 'হা-হাজারি' করিয়া থাকেন; সুতরাং আমাদের বেশে—বেশানে শিক্ষা এখনো শৈশবে, পাঠকের মন এখনো ভাঙা—সেখানে আট সাধারণ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ভুলিতে যাওয়াই মন্ত-একটা হাসির ব্যাপার। এদেশে আটকে যদি সর্বজনপ্রিয় করিয়া ভুলিতে হয়, তবে বাঙ্গলা রসিকের গল্পের ও ডিটেকটিভ উপন্যাসের অপরাধ ছবি ছাড়া আর কোন-রকম চিত্র আঁকা চলিতেই পারে না; সাহিত্যেও তাহাই হইলে মাইকেল-বক্সিম-রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিবর্তে চলিবে বটতলার জনপ্রিয় সাহিত্য (যার দুখ হইতেছে—“একটি পরমা খরচ করে, অবাক কাণ্ড দেখুন পড়ে”) এবং সঙ্গীতে শুনিব বিভূচ্চ রাগরাগিনীর উচ্চাঙ্গের আলাপের পরিবর্তে ঝিরেটাগের নাকী-হরের অপূর্ণ বিলাপ! সাধারণ-তত্ত্বের হাড়িকাঠে আটকে পুরিয়া কেলিলে বেচারীর মাথাটি বাঁচানো দায় হইয়া উঠিবে—আটকে যাওয়ার রক্ষা করিতে চান, তাহারা যেন সাধারণ-তত্ত্বের কথা ভুলিয়াও যুখে না-আনেন; কেননা, যুধু বাঙ্গলাদেশে কেন—পৃথিবীতেও এখনো সে শুভদিন আসিতে অনেক—অনেক দেরি আছে।

ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়।

গান

একদা তুমি, প্রিয়ে,
আমারি এ
তরুণী
বসেছ ফুলসাজে
সে কথা যে
গেছ তুলে !
সেখা যে বহে নদী
নিরবধি
সে তোলে নি,
তারি যে স্রোতে আঁকা
বাঁকা বাঁকা
তব বেগি ;
তোমারি পথেরখা
আছে লেখা
তারি কুলে
আমি কি সবি ফাঁকি ?
সে কথা কি
গেছ তুলে ?

গেঁথেচ যে রাগিণী
একাকিনী
দিনে দিনে
আলি ও বার বোপে
কৈপে কৈপে
তুণে তুণে ।
গাঁথিতে যে আঁচলে
ছারাতলে
'ফুল মালা
তাহারি পরশন-
হরষণ
সুখা ঢালা ;
ফাগুন আয়ো বেরে
খুঁজে ফেরে
চাঁপাফুলে
আমি কি সবি ফাঁকি ?
সে কথা কি
গেছ তুলে ?
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মাসকাবারি

স্বামী-স্ত্রী

ভাস্করের "সবুজপত্র" ঐক্য বরদাচরণ
গুপ্তের "স্বামী-স্ত্রী" গ্রন্থকে গোটা কতক
স্পষ্ট কথা কিছুমাত্র বিধা না করিয়া বলা
হইয়াছে যেহিহা অভ্যস্ত আমদলাত করিলাম ।
যে-সব কথা আমরা অনেকেই মনে মনে

আলোচনা করি কিংবা চু-পাচোজন সঙ্গীর
মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলি, অথচ সমাজের
কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পাই না,
বরদাবাবু আমাদের মনের সকোচের ববনিকার
আড়াল হইতে সেই কথাগুলিকেই টানিয়া
আনিয়া, বাংলার পাঠক-সভার হাজির
করিয়াছেন ।

লেখক বলেন যে, মেয়েদের শৈশব হইতে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের "গোটা মনুষ্যত্বই বিকৃত এবং সংহত হয়ে জীবে পরিণত" হয়। তাদের সমস্ত শিক্ষাসৌকার্য একটিমাত্র লক্ষ্য এই যে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে পতিব্রতা গৃহধর্মচারিণী জ্ঞী হইতে হইবে—তাদের উপর এর চেয়ে সমাজের কোন বড় দাবী নাই। তার পর হাম্পত্য সম্বন্ধে "নৈতিক দায়িত্ব" নিঃশেষে জীর উপর চাপানো হয় বলিয়া একপক্ষে যেমন করমাসী সীতাসাবিত্রীর মত স্ত্রী তৈরি করার চেষ্টা দেখা যায়, অল্পপক্ষে তেহি সত্যবান বা নলরাজার মত স্বামী তৈরি করার চেষ্টা মোটেই দেখা যায় না। অথচ স্বামীর মনুষ্যত্ব না থাকিলে জীর পতিব্রতা কিনিষ্টা যে স্বাভাবিক হয় না, এ-কথাটা আমাদের সমাজ ভুলিয়া বসিয়া আছে।

বঙ্কিম বাবুর "বিধবুদ্ধের" নারক নগেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী স্বর্গানুখী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে স্বর্গানুখী তাঁর "কেবল স্ত্রী"মাত্র ছিলেননা, তিনি "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, মেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রেমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী"—এ সবই ছিলেন। কিন্তু লেখক বলেন যে, স্বর্গানুখীর মধ্যে "কেবল স্ত্রী"র প্রাধান্য যদি না থাকিত, তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ যদি অমন বিচিত্র হইবার সুযোগ পাইত, "তাহলে নগেন্দ্রনাথের সংসার-প্রাঙ্গণের বিষ-বীজ অচ্ছুরিত হবার অবসর পেতোনা।" তিনি মনে করেন যে, নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালের গৃহিণীরা যদি "উগ্রচণ্ডা ক্ষেমধরী" গোচের হইতেন, তবে

গোলমাল কিছুই হইত না। অর্থাৎ আমাদের দেশের স্ত্রীদের স্বামী হইতে "বস্ত্র সত্তা থাকতে নাই" বলিয়াই "স্বামীকে ভালো করার স্পর্ধা তাঁরা মনেও আনেন না"। তিনি লিখিয়াছেন, "গিরদান বাবুর সামাজিক নাটক "গৃহধর্মশ্রীতে" এমনও দেখেছি পতি-প্রাণা সতী স্বামীর অন্তে নিজগৃহে বারবণিতা আনবার অহুরোধ কর্জেন—স্বামীর কাছে! আবার ধর্মমূলক বিষয়কালে অতিবিপরায়ণ "ধনিক" নিজস্বীকে ইন্ড্রিয়পরায়ণ অতিবির তুষ্টিসাধনে অহুরোধ করেছেন—স্বামী স্বামীর কথা ঠেলতে না পেয়ে তাতেও সম্মত!"

সুতরাং লেখকের প্রধান অভিযোগ এই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীর মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না এবং তার আত্ম-বোধ জাগ্রত হয় না বলিয়াই "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সর্বস্বাধীন সহায়কৃতি, একটা নিাবড় মিলন এবং পরিপূর্ণ সমবেদনা প্রায়ই ঘটে ওঠেনা। আমাদের চোখে যে মিলন .খুব প্রগাঢ় বলে বোধ হয়, সেখানেও বুদ্ধিবৈষম্যের একটা চোরাকর্ষক লুকানো থাকে।...বঙ্কিমবাবু... নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলালের মনের এই সব গোলাগুলি মোড়াতালি বাইরে এনে সমাজের সামনে ধরেছেন। রবীন্দ্রবাবুও "ধরে-বাইরে"তে ঠিক তাই করেছেন বিমলা সম্বন্ধে।"

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা অত্যন্ত সংকর্ণ হওয়ার দরুন এবং অস্ত্রান্ত নানা কারণে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বোধটা স্পষ্ট অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কতগুলো অস্ত্রান্ত সংস্কারের দ্বারা এই এদেশের মেয়েরা সকল বিষয়েই চালিত ও

নিয়ন্ত্রিত হয়—এটা যে গ্রাম বা রোআনা মেয়েদের জীবন সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ সত্য, তাহা বোধহয় নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের আসল সমস্যাটা এইখানে যে,—যদি উভয়ের ব্যক্তিত্বটাই বেশ পরিষ্কৃত না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রেমের স্বাধীন আদান প্রদান হইতেই পারে না। স্বামীর মধ্যে ব্যক্তিত্বটা ক্ষুট আর স্ত্রীর মধ্যে সে পদার্থটা একবারেই হুগু হইলে, সে স্ত্রীকে কোন স্বামীই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করিতে পারে না এবং শ্রদ্ধা না থাকিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খাঁটি প্রেমও জন্মে না। কাজেই স্ত্রী তখন স্বামীর ভরে এবং শাসনে চলে—সংসারের ব্যাপারে তার বিশেষ কোন কর্তৃত্বই থাকে না। যত দিন পর্যন্ত তার রূপবোদন থাকে, ততদিন সে স্বামীর অহুগ্রহভাগিনী হয়, রূপ না থাকিলে বা বোদন গত হইলে স্বামীর সংসারে, স্বামীর চোখে, কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন স্ত্রীরই যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মান থাকে বলিয়া মনে করি।

তবে ছেলে মেয়ের “মা” হিসাবে একটা বড় পদ স্ত্রীলোকের থাকে সত্য—সেই একটা দিক্ হইতে স্বামীর উপর তার জোরও থাকে, বলও থাকে। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর সঙ্গে যে সব স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ হয় না, মা হিসাবে তাদের স্বামীর সঙ্গে একরকমের একটা সম্বন্ধ ঠাড়াইয়া যায়। প্রধানতঃ এই কারণেই আমাদের পরিবারতন্ত্রে স্ত্রীর চেয়ে মায়ের আগুন বড়। এই অল্পই যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী সন্তানবতী ও বয়স্ক না হয়, ততদিন স্বামীর সঙ্গে তার সর্বসম্বন্ধে একান্তি ভাবে সেখানোনার পর্যন্ত

সম্বন্ধের কথা—অন্তলোকের সামনে স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হইলে ছদ্মনেই এমনভাবে ধারণ করে যেন কেউই কড়িকে চেনেনা! স্ত্রী যে গৃহের দীপ্তি, সে মহুর হিসাবে কেবল “প্রজননার্থ” কিনা। সেইজন্য রাত্রির নিরুদ্ধনতা ভিন্ন, দিনের আলোর অন্য নানা বিষয়ে, নানা ভাবে, নানা রসে, নানা সামাজিক ক্ষেত্রে, স্ত্রীর পক্ষে পতিসকটা সনাতন দেশাচারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে খেদাইয়া রাখিরাছিল। এ কালের হাওয়ার সেই সনাতন ব্যবস্থার সবই ওলোটাপালোট হইয়া যাইতেছে বটে কিন্তু তার সংস্কারের জড় এখনো মরে নাই।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে মনের সম্বন্ধ, আত্মার সম্বন্ধ এবং ছদ্মনের স্বাধীন আদান-প্রদানের যোগেই যে তাদের সংসার-রচনা সুন্দর ও সফল হইয়া উঠিতে পারে, এ বোধ বেদন খুব অল্প স্বামীরই আছে, তেমি খুব অল্প স্ত্রীরও আছে। এ বোধ স্বামীদের মধ্যে আশ্রিত করিবার একমাত্র উপায় স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের আগরণ ঘটানো। এবং স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর উপায় ছেলেবেলা হইতে তাদের মনকে প্রস্তুত শিক্ষা ও সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে রাখিয়া তোলা এবং পরিণত বয়সে বিবাহ দিবসের সময়ে কিছু পরিমাণে তাদের স্বাধীন নির্দীচনের সুযোগ দেওয়া। ইহা না করিলে, স্ত্রীলোকের status সম্বন্ধে চিরদিনই নগণ্য থাকিবে এবং যে সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা হীন, সে সমাজ কেমন দিনই উন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিবেনা, এটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মতই বলা যাইতে পারে।

সুতরাং লেখক যে বলিয়াছেন আমাদের সামাজিক অনুশাসন “একচোখো” বলিয়া তাহা নৈতিক অপরাধের জন্য ত্রীকে দণ্ড দেয় আর পুরুষকে রেহাই দেয়—সেদিক্ হইতে অভিযোগের কোন জোর নাই। যে ত্রীর ব্যক্তিত্ব নাই, সে ত্রী অস্ত্রায় শাসনের দণ্ডটাকে যে আপনিই মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। যে জাতটার মধ্যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য কোটে নাই, যে জাত কোনো দিক্ হইতেই বিশ্বমানবকে দান করিবার মত কোনো সম্পদ অর্জন করিল না, সে যে শাসকের সূক্ষ্ম আপনিই আপনার গলায় পরিল! পৃথিবীতে যে স্বভাবতই শাস, তাকে প্রবলের শাসন ও শোষণ হইতে রক্ষা করিবে কে?

অথচ এ কথাও একেবারেই বলা চলে না যে, ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জিনিসটা পুরো-পুরি ছুটিলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা “সর্বাদীন সহায়ত্ব বা নিবিড় মিলন” দেখা দিবেই! স্বামী যতক্ষণ প্রভু এবং ত্রী অধীনা, ততক্ষণ সংসারে যে একটা ভাসিক শান্তির চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মধ্যে ব্যক্তিত্ব যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানে সব ক্ষেত্রে তেমন-তর শান্তির সম্ভাবনা হ্রাসিত নাও হইতে পারে। ইউরোপে স্বামী-স্ত্রী যেখানে পরস্পরকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করিয়া লয়, সেখানে হয়ত বারোআনা ক্ষেত্রেই তাদের সম্বন্ধ “নিবিড় মিলনের” সম্বন্ধ হয় না। যে অস্থানে পরস্পরকে এক সময়ে বাধ্যগাছিল, কিছুকাল পরে হয়ত দেখা যায় যে, “সে অস্থানের ভিত্তিটা যথেষ্ট দুর্বল নয়, যথেষ্ট

গভীরও নয়। পরস্পরের মধ্যে মিলের চেহে অমিল ঢের বেশি।

সুতরাং বরষা বাবুর অভিপ্রায় যদি এই হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সকল দিক্ হইতেই স্বাধীন আদান প্রদানের সম্বন্ধ হইলে এবং ত্রী কেবল “ত্রী” না হইয়া বিভিন্নবাবুর মগজ-নাথের ভাবায়, বিভিন্ন সম্বন্ধের রসে স্বামীর সহিত তার সম্বন্ধটি রসাইয়া লইলেই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনটা নিবিড় হইতে পারে—তবে আমি বলিব যে, এ সব সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মিলন স্থায়ী না হইতেও পারে। দূর্য্যবতী বা ত্রমর “কেবল ত্রী” ছিল বলিয়াই যে তাদের স্বামীর সঙ্গে তাদের মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই, তারা “উগ্রচণ্ডা ক্ষেমকরী” হইলেই যে কোন ‘গোলমাল’ উঠিত না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কোন উগ্রচণ্ডা বা ক্ষেমকরীর সাধ্য নাই যে, স্বামীর মন বিগড়াইলে তাকে ভালো পথে টানিয়া আনে।

মাহুকের sex-affinity বা মিশ্র-সম্বন্ধের রহস্য এত বিচিত্র যে, পরস্পরকে ভালবাসিয়া নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিবার সুদীর্ঘ কাল পরেও হঠাৎ এক সময়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আবিষ্কার করে যে, তারা পরস্পরের স্বার্থ মিশ্রন নয়—নিরত কাছে বাস করিয়াও তারা পরস্পর হইতে অন্তস্ত দূরে। গায়টে তাঁর “Elective Affinities” উপন্যাসে মিশ্র-সম্বন্ধের এই রহস্যকেই উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। এমন কি যে গ্রেম স্বার্থ গ্রেম, তাকেও একবার ভাঙচুরের ভিতর দিয়া হারাইয়া পাইলেই তাইই তাকে নিত্য

করিয়া পাওয়া যায়—বন্ধিমবাবু তাঁর ‘বিশ্বক’-ও কৃষ্ণকান্তের উইলসে’ পুস্তকের পক্ষে ত ইহাই দেখাইয়াছেন—কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে দেখান নাই। রবিবাবু ‘ধরে-বাইরে’ উপন্যাসে পুরুষ ও স্ত্রী দুজনের পক্ষেই তাহা দেখাইয়াছেন। স্ত্রীর দিক্ হইতে এটা দেখানো এ দেশে নূতন বলিগাই আমাদের সমাজে ঐ উপন্যাসের বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গায়টে ‘একিনিটির’ ইতিহাসকে বতদূর পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততদূর পর্য্যন্ত ইহার কেহই বান্ নাই। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের “একিনিটিকে” পাইল না এবং অবশেষে স্বামী অস্ত্র নারীভূত এবং স্ত্রী অস্ত্র পুরুষে সেই “একিনিট” আবিষ্কার করিল,—গায়টে একিনিটির ইতিহাসকে এতদূর পর্য্যন্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক এ সকল বিষয়ে সংস্কারমুক্ত হইয়া আলোচনা করিতে গেলে, এই সমস্ত সমস্তাই সমাজে ও সাহিত্যে ক্রমশ দেখা দিতে পারে, এ কথাটা বলিয়া রাখা ভাল।

নুতরায় স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হইলে সমাজে মোটের উপর শান্তির চেয়ে অশান্তির সম্ভাবনা বেশি। বস্তুত সেই অশান্তির সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াই ত মানুষ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লয়। কেননা, অশান্তিকে ঘুচাইবার একমাত্র প্রণালী স্বাধীনতা, মানুষকে অল্প ভাস্করিক সংস্কারের গারদে ভিন্নদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে যে নানা গোলমালে সমস্তা আছে, আমাদের বাংলা

সাহিত্যে যে ক্রমশ ক্রমশ সে সকল গোলমালের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ যে আমাদের দেশে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা অল্পে অল্পে ধোঁরাইরা উঠিতেছে। ধারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্বিতীয় ও আচ্যারের কুলের বাতাস দিয়া এ ধোঁরাটাকে নিবাইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁরা ধোঁরাটাকে ক্রমশ আগুনে পরিণত করিয়া তুলিতেই সাহায্য করিবেন। ‘গৃহস্থ’, ‘উপাসনা’ প্রভৃতি কতগুলি কাগজে সেই চেষ্টা শুরু হইয়াছে। ইহাতে আমরা কত খুসিই আছি, কারণ জানি যে ব্যক্তিত্ব একবার অলিবার উপক্রম করিলে তাকে কেউই নিবাইতে পারে না। নহিলে পোপেদের শাসনে ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাকে আগুনের মুখে ধরিয়া পোড়াইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সেই পাবক হইতেই পুত হইয়া নূতন বিক্রমে অলিরা উঠিল কেন? অতএব, মাইতে।

বঙ্গে আত্মহত্যা

আমাদের “প্রবাসীতে” সম্পাদক মহাশয় তাঁর “বিবিধ প্রসঙ্গে” বঙ্গে আত্মহত্যা সম্বন্ধে বাংলার পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—“বাংলা দেশের ১৯১৬ সালের যে স্বাস্থ্য-রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, ঐ বৎসর ১০০৩ জন পুরুষ এবং ২০০৭ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাংলা দেশে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম; প্রতি এক হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন করিয়া স্ত্রীলোক বঙ্গে আছে।

আত্মধাতিন) ত্রীলোকের সংখ্যা কিন্তু আত্মধাতী পুরুষের সংখ্যাও তেঁও তপেরও অধিক।" তিনি দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতা সহরেও ত্রীলোকের আত্মহত্যার হার পুরুষের চারি গুণেরও বেশি। বাংলার আত্মহত্যার অমুপাতের সঙ্গে বিহার-উড়িষ্যা ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের আত্মহত্যার অমুপাতের তুলনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলা দেশেই "আত্মহত্যার প্রবৃত্তি প্রবলতম", যদিও অন্যান্য প্রদেশেও পুরুষের চেয়ে ত্রীলোক বেশি আত্মহত্যা করিয়া থাকে। তার পর ঐ তিন প্রদেশের মধ্যেই বাঙালীর মেয়েদের ভিতরেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি সব চেয়ে বেশি দেখা যায়।

অথচ পান্চাত্য দেশের একজন বিশেষজ্ঞ-ব্যক্তির উক্তি উদ্ধার করিয়া সম্পাদক দেখাইয়াছেন যে, পান্চাত্যদেশে পুরুষের ত্রীলোকের চেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালী মেয়েদের হৃৎস্ব সব চেয়ে বেশি এবং তাদের শরীর ও মনের বল কম বলিয়া বাংলাদেশে আত্মহত্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাঙালীর মেয়েরা বেশি গল্প পড়ে বলিয়া বেশি আত্মহত্যা করে, এ সম্ভাবনাটাকে সম্পাদক একেবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি গল্প পড়ে, কৈ তারা তো বেশি আত্মহত্যা করে না। তার পর লেখাপড়ান্না মেয়েরাই যে আত্মহত্যা করে তারও কোন প্রমাণ নাই। পান্চাত্য দেশের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় উপন্যাস পড়ে

কিন্তু তারা যে এত আত্মহত্যা করে তাহা দেখা যায় না। সুতরাং বেশ গল্প পড়ানো আত্মহত্যার কারণ নয়।

গল্প পড়ানো আত্মহত্যার আসল কারণ এবং ভূমিকা কারণ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাহা যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে একথা অস্বীকার করা যায় না। পান্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের 'সাহিত্যে ত্রীপুরুষের প্রেমের যে স্বাধীন সংস্কারমুক্ত, উদার ও উচ্চ আদর্শটা ছুটিয়া উঠিয়াছে, সমাজের মধ্যে তা তার স্থান হয় নাই। সেই কারণে এই নূতন সাহিত্যের অরুণোদয়ে ত্রীলোকের মনের চারিদিক হইতে যখন সংস্কারের কুলাসটি কাটিয়া যায়, তার মন যখন জাগে, তখন তার বাইরের সংসারের সমস্ত কৃত্রিম বিধিনিষেধের তর্জনী তাকে এক পাও অগ্রসর হইতে দেয় না। তার জীবনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রের চারিদিকে চিরাপত সংস্কারের কালো পর্দাগুলি নীরঙ্কভাবে টানিয়া বেঁধেয়া হয়। এমনি করিয়া সে সাহিত্যে যে-জীবনটার কল্পরূপ দেখিয়া মনে মনে তাকে বরণ করিয়া লয়, সমাজের জীবনের বাস্তবরূপের সঙ্গে তার বৈষম্যটা এতই স্তিরস্তর যে, তার ভিতরের সঙ্গে বাহিরের, তার আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, তার অহুত্বের সঙ্গে সংস্কারের একটা প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়া যায়। অথচ সে বিরোধের কোন কুলকিনারা পাওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা, পুরুষের সমস্তার সমর্থান তার নিজের হাতে, কিন্তু মেয়েদের তো তা নয়। এই আত্মবিরোধের ঘোটানার মধ্যে পড়িয়া অনেক

যেয়ে নিশীড়িত হইয়া যে আত্মহত্যা করে, তার অনেকগুলি নিদর্শন আমি প্রত্যক্ষ ভাবেই পাইরাছি।

আমাদের সমাজে মেয়েদের বত হুঃখ বত অপমান এমন আর কোন সভ্য দেশের কোন সমাজে নাই। যে দেশের বারো আনা লোকের বিশ্বাস যে জ্রীলোক বাহিরে আসিলে বা পর পুরুষের সঙ্গে মিশিলেই তার সত্য নষ্ট হইয়া বাইতে বাধ্য, সমস্ত জ্রীলোককে সে দেশের লোক অপমানিত করিয়াছে, কেননা জ্রীলোকের প্রতি এক বড় অশ্রদ্ধার কথা কোন সভ্য সমাজের লোকের করনার উদয় হওয়াও অসম্ভব।

আমরা পুরুষ, আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য বিশ্ববিজ্ঞান চাই, সমাজে প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র চাই, রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকার চাই—কত বিচিত্র আবেগন এবং কত প্রতি-বোপিতার নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতে তবে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটু আধটু জীবন-ম্পন্দন দেখা দিলেও দিতে পারে! কিন্তু আমাদের বিবেচনার মেয়েদের ব্যক্তিত্বপদার্থটা সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কেননা, বিধাতা তাকে মন ও আত্মা বিবর্জিত করিয়াই পড়িয়াছেন।

প্রথমতঃ তার জন্মটাই পিতামাতার পক্ষে একটা “দার”। তারপর তার বর্ষ এগার বছর পার হইতে না হইতেই সে “অরক্ষণীয়া” হইয়া পড়ে; তখন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া বিবাহের বাজারে তার ভাঁগ্য পরীক্ষা হয়। তারপর একদিন মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত বেশ করিয়া পরণ করিয়া বা করাইয়া

সইয়া রণবস্ত্র বাজাইয়া যে বীর ব্যক্তিত্ব তাকে বরে সইয়া যান তিনিই তখন হইতে তার ভাগ্যবিধাতা। দৈবাৎ তাঁর হৃদয়ের যদি সে পড়িল ত ভাল, নহিলে—কপালে করাঘাত এবং ক্রন্দন! কিন্তু কুনজরেই পড়ুক আর কুনজরেই পড়ুক, সে অস্ত্রের যে জৌড়নক সেই জৌড়নকই থাকিয়া যায়। তার চিত্তের ক্ষেত্র ঐ অস্ত্র-পুত্র—তার স্বামী পুত্র কন্যা, তার পরিবারের অন্তান্ত আত্মীয়, ইষ্টকুটুম্ব প্রভৃতির মধ্যেই তার সমগ্র কর্তব্য বিস্তৃত।

পুরুষের পক্ষে চাই সমস্ত জগৎটা, আর মেয়েদের পক্ষে ঐ পারিবারিক ক্ষেত্রটুকুই পর্যাপ্ত। অথচ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নাকি বলে যে, পুরুষের সহধর্মিণী স্ত্রী, সেই তার বড় পদ! পুরুষ আর স্ত্রীর মনের মধ্যে এতবড় একটা অসামঞ্জস্য যে সমাজ পাক করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, সে সমাজে জ্রীলোকের নানানিকেই হুঃখ ও অপমান অনিবার্য। মুক্তির অভাবই সব চেয়ে বড় হুঃখ, বন্ধনের বেদনাই সব চেয়ে বড় বেদনা।

আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহে যে সকল পুরুষকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইতেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অকর্মণ্য জীবনের হুঃসহ বেদনা সহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশে জ্রীলোকেরা যে তাদের চেয়ে সহজভাবে বেশি নজরবন্দী, তারা যে তির্যাকণের মত interned, এবং তাদের বন্ধনের বেদনা যে কত নিবিড়, তাহা আমরা অহুস্তবমাত্র করিনা বলিয়াই

যখন তারা কেউ কেউ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আত্মহত্যা করে, তখন আমরা উপহাস করিয়া বলি,

“পাঁচেকোঁসী কোঁকর মধ্যে পাঁচশী নারী যদি আত্মহত্যা করিল, যখনই চাঁদকার আর চাঁদকার কিন্তু প্রতিবৎসর শতশত নরনারী ধর্ম ও নীতির পথ ছাড়িয়া জীবন হারিয়ে, সে দিকে কত জনের লক্ষ্য আরো?”—(দুঃখ)

হী, যে কারণে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়িতেছে, সেই কারণেই তাদের মধ্যে স্রষ্টা নারীর সংখ্যাও বাড়িবেই। ছই রোগের ভিন্ন গন্ধ হইলেও তাদের মূল কারণ এক। মূল কারণ—বাস্তববিরহীন, সংস্কারপুঙ্খলিত, অবরুদ্ধ জীবনের মানি ও হুঃখ এবং সেই হেতু শরীর ও মনের অবসাদ ও দুর্জলতা। মেয়েদের শরীরের স্বাস্থ্য যেমন নানা রোগের দ্বারা জীর্ণ হইতেছে, তাদের মনের স্বাস্থ্যও না থাকার সেখানে নৈতিক দুর্জলতা সহজেই দেখা দিতে পারে। সে সম্বন্ধে statistics সংগ্রহ করিবার জন্ত আমরা সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি-মাত্রেই অহুঃখ করি। দমন নীতির দ্বারা কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, কোনদিনই ভাল ফল হয় নাই, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিবে।

বর্তমান সাহিত্যের গতি

আমাদের “ভারতবর্ষে” ‘ঐ’ প্রাকৃতিক কোন লেখক, বর্তমান সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রিয়া প্রী-পুরুষের সম্বন্ধবোধিত যে সকল সমস্ত বর্তমান বাংলা সাহিত্যে দেখা দিতেছে, তাহা “নূতন ধরণের”, কিন্তু “অস্বাভাবিক নয়”

বরং “স্বাভাবিক,” ইহাই যেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক নিজে রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি”র ভক্ত হইলেও ঐ উপ-ভাষ্যটি সম্বন্ধে তাঁর পরিচিত এবং প্রজ্ঞাতাৎমন একজন গোড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত উদ্ধার করিয়াছেন। সেই পাণ্ডিত মহাশয় মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির মনস্তত্ত্বে কিছুমাত্র ভুল নাই, কিন্তু “যা সম্ভব নয় সেটাকে রবীন্দ্রনাথ সত্যই স্বাভাবিক করে তুলেছেন।” পণ্ডিত মহাশয়ের বিশ্বাস যে চোখের বালির “দর্শন” ভারতবর্ষে চলিবে না, কেননা “বৌদ্ধের উচ্চ শোণিতের আধিক্য এই সব দর্শনের জন্য হয়।” পণ্ডিত মহাশয়ের মতে “নৌকাভূমির মধ্যে হিন্দু দর্শনই এক পবিত্র কবিত্বের আকারে কুটিয়া উঠিয়াছে”—“কোন ইউরোপিয়ান বা আমেরিকানের সাধা নয় এমন পবিত্র উপভাষ্য সেখা”। যে কমলা রমেশকে তার স্বামী বলিয়া জানিত, যে মুহূর্তে সে টের পাইল যে রমেশ তার স্বামী নয়, সে মুহূর্তে তার প্রতি তার মনের কিছুমাত্র অহুঃখ রহিল না, ইহাই পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্চর্য লাগিয়াছে এবং ইহাকেই তিনি ‘হিন্দুদর্শন’ নাম দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

লেখক বলেন কবি তাঁর স্বপ্নের “impulse” হইতে উপভাষ্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন, স্মৃত্যং

“সেখানে সমালোচনার মাপকাঠি বা মাপের বর্ষ ও সামাজিকতা আদিগা বুঝাশুভ কি প্রয়োজন?... সাহিত্যের আদর্শ হতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও প্রকাশ করা সেই হিসাবে চোখের বালি উপভাষ্যকে মন্দ বলিবার ত কোন কারণ দেখি।...একজন হিন্দু যত্নের



হতাশের খেদ

“ও মিস্-এডুকেশন ! তোমার সঙ্গে সর্ব্বথ ত্যাগ করলুম
তবু তুমি আমার হলেনা !”

ঐশ্বর্য গগনেজ্ঞাপ ঠাকুর অঙ্কিত ।

বিধবা বাগোই বানী সম্পর্ক রহিত হইয়া যৌবনে তাহার আচার-বিচার পূর্বা-পদ্ধতি দূরে রাখিয়া। সহজে একজন গুপ্তবান্ পরশুকেব্রি প্রতি আসক্ত হইতে পারে, তাহাকে সত্যই প্রেম বিতে পারে, তাহা যে একটা স্বত পাপও নয়, এই হতে স্ববীজনাথের symbol...বে ঘটনা, যে পুত্র এখানে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা পশ্চিম দেশে symbol হইতে পারিত না। ...বাঁট মনত্বের উপ-মাস বাংলায় তিনিই প্রথমে লিখেছেন। বিধ-সাহিত্যের সহিত তাঁহার লেখার তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে, এই ধরনের উপমায়াস লেখার হিসাবে তাঁহার স্থান কত উচ্চ। ঘটনাক্রমে পড়িয়া তাঁহার নানক বাহিকা প্রভৃতির মনোভাব কিরূপ পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি হঠাৎ বান্ধা, অস্বাভাবিক একটা কিছু করিয়া যেন না—পাঠকেরই মাঝে মাঝে হিঙ্গা রাখিতে হয়। এমনি বৃদ্ধ পরিচয় তাঁর বক্তাবের সঙ্গে। 'চোখের বালিকে প্রমাণ হই না বেধে আবার আশ্রয় বোধ হয়, অথবা নিষা করা বেধে আবার হুগে হয়।'

অবশ্য লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন যে, গল্প উপস্তাসকে সামাজিক আদর্শের মাপ-কাঠির দ্বারা বিচার করা উচিত নয়—মানব-প্রকৃতির সত্য ও স্বাভাবিক সৃষ্টি হইলেই গল্প উপস্তাসকে আমরা আদর করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁর পণ্ডিত মহাশয় যখন উপস্তাসের পবিত্রতা ও হিন্দুধর্মের দোহাই পাড়িয়াছেন, তখন তাঁকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিত যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে এই তথাকথিত পবিত্রতার আদর্শ ও হিন্দুধর্মের ছড়াছড়িটা দেখিতে পাওয়া যায় কি? মহাভারতের মধ্যে বসন্তলি বৈধ ও অবৈধ প্রণয়-কাহিনী আছে, সেগুলি তাঁর হিন্দুধর্মের

কোটার নিচেরই পড়ে না, অথচ হিন্দুর পক্ষম বেদ মহাভারতকে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য না বলিয়া কোন উপায় নাই। কালিদাসের "শকুন্তলা" গোপন প্রণয়েরই কাহিনী—তাতে পবিত্রতার ভণ্ডং নাই। এবং গান্ধার্ক বিবাহের ব্যবস্থাটা সেকালের "বোহিমিয়ান" অপচ বৈধ ব্যবস্থাই ছিল। তাঁরপর কৃষ্ণ-লীলার ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া যে সব রসসাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিলে, তাহদের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও পবিত্রতা বে কি পরিমাণে বজায় থাকে, তাহা খোলসা করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না।

সাহিত্য সর্বত্রই সাহিত্য। হিন্দু সাহিত্যে বা হিন্দুধর্মের সাহিত্যে যদি এমন কোন অদ্বুত পদার্থ থাকে যার উদ্ভব হিন্দুর বেশ ছাড়া আর কোথাও ঘটিতে পারে না, তবে সেইখানেই সে পদার্থটা সত্য কিনা সে সব্বদে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেননা, যাহা সত্য তাহা বিশ্ববাসী, তাঁর সর্বত্র প্রকাশ। মানুষের মন সাহিত্য-কলার দর্শনে ও বিজ্ঞানে আপন জ্ঞানের আপন অজুত্বের পরম সত্যকে, কৌলিক, দৈনিক প্রভৃতি সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছে বলিয়াই সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে আশ্রয় পাওয়া ও সারপাই আমরা দেখিতে পাই। কবি ও গার্ডবার্থের কাব্যে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার আভাস যদি পাওয়া যায়, তবে এমন অদ্বুত ও চাতকর কল্পনা করার আবশ্যকতা থাকে কি যে,

পুনর্জন্ম মানিলে, ইহা বলা যায় যে, “আমাদের কোন পূর্বপুরুষ সূত্রার পর ইউরোপে গিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থরূপে জন্ম গ্রহণ করেন” ? কিংবা এই কথা বলিয়া আশ্বালন করার কোন মানে আছে কি যে, “ওয়ার্ডসওয়ার্থও হিন্দু”। হিন্দুদের আদর্শ বিশ্ব আদর্শ নয়, ইহা মনে করিলেই এই সকল হাতকর কথা বলা সম্ভব হয়। পৃথিবীতে সব জাতিই বিশ্বমানবের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ মাত্র, মূলে সবাই এক—এইটাই সত্য এবং এই সত্য আছে বলিয়াই এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভাবের আদান প্রদান চিরকাল চলিতেছে এবং চিরকালই চলিবে।

স্বামী

নারায়ণের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার প্রকাশিত ঐক্য শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের “স্বামী” গল্পটা বাংলায় মাসিক সাহিত্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য গল্প।

গল্পের গল্পটাই এই :—

সৌদামিনীর এক বছর বয়সে তার বাপের মৃত্যু হইলে তার মা তাকে লইয়া নিজের ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় ন্দ। তার মামা ছিলেন খোর নাতিক—বেশি ধুল পণ্ডিত ভাত্যকি বিবাহ না দিয়া তিনি তাকে লেখাপড়া শিখাইলেন। শ্রাবের জীবিত্যর যিখিন বহুযবায়ের হোলে নয়ন কলিকাতায় বি.এ. পড়িত; সে সৌদামিনীর মামার সঙ্গে গ্রাহই আলোচনা করিত আসিত—মামা নিজের ভাত্যর সঙ্গে নয়নের তর্কবিতর্ক বাধাইয়া দিতেন। ক্রমে পড়াশুনা বেলা ধূলা হাত পরিহাসের ভিতর দিয়া দুজননি মন পরশরের দিকে আকৃষ্ট হইল বটে,

কিন্তু সামাজিক বাধা থাকার তাদের মধ্যে বিবাহ যে হইতে পারিবে না তাহা দুজননি জানিত। ইতিমধ্যে অন্য এক জাণনা হইতে সৌদামিনীর সম্বন্ধ আসিল। তার মামা এতদমতীতে আগতি করিলেনও পাত্র নিজে বেবিয়া আসিয়া হঠাৎ কবরোগে মারা গেলেন, কিন্তু মরিবার পূর্বে বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া গেলেন। বিবাহ হইয়া গেল। সৌদামিনীর মন বহিল নয়নে আদত—স্বামী বর দিয়া স্বামীর সহিত এক নব্যায় শুইতে তার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু আশ্বর্ষের বিষয় এই যে, তার স্বামীও কোন বিঘ্নে তাকে কোন দিন কিছুমাত্র বাধা দিলেন না। সৌদামিনীর সং স্বাভাবিক তার স্বামীর প্রতি কিছু বর করিতেন না; তার বেশ বেগম এক গল্যাও মংসারে সাহায্য করিতেন না, অথচ বাড়ী-হুহ লোকের সমস্ত বস্তু ও আহার তিনি একজাই পাইতেন। স্বামীর প্রতি সৌদামিনীর ভালবাসা না থাকিলেও তাঁর প্রতি বাড়ীর এই অর্থযোগ্য তার পা খলিত এবং ক্রমে তার স্বাভাবিক সঙ্গে ইহা লইয়া তার বিটমিটি চলিতে লাগিল।

সৌদামিনীর স্বামী বাঙালি বৈষ্ণব। তিনি স্ত্রী প্রতি বস্তু করিতেন, স্ত্রীর দেহাও করিতেন—অথচ তার কাছে কোন স্বামী করিতেন না। কাহারও কাছে তাঁর কোন স্বামী ছিলনা।

স্বাভাবিক সঙ্গে বৌয়ের স্বাস্থ্যের স্বর ক্রমে সৌদামিনীর স্বামীর কাপেও উঠিল এবং সৌদামিনীর সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিলে, সে তৎ-যান মামে না হঠাৎ এই কথা তার মূখে শুনিয়া তার স্বামী অত্যন্ত বাধা পাইলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয় কিছুই বলিলেন না, শুধু মায়ের সঙ্গে কথা কহিতে তাকে নিষেধ করিলেন। তাঁর সেই প্রথম নিষেধ-বাধা আদত হইয়া সৌদামিনী বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ অসুখতি দিলেন।

এমন সময় তাদের বাড়ীতে হঠাৎ নয়ন আসিয়া উপস্থিত হইল। নয়নের সঙ্গে একান্তভাবে সৌদামিনী

বেথা' না করিলেও নরেন কোন হাথোপে তার সঙ্গে বেথা করিল। নরেন তার বাসী মুক্তকে হাত করিয়া লাইয়াছিল। সে শুনিয়াছিল যে, সৌধামিনী এখনো তাকে ভোলে নাই, তাই সে তাকে পাইবার আশায় তার বাসীর ঘূহেই আসিয়াছিল।

তার হাঙড়ী আড়ি পাতিয়া তাবের রহস্তালাপ কতকটা শুনিয়াছিলেন। তারপর বাড়ীহস্ত লোকের ঘূষ অত্কার হইল। শুধু তার বাসীর ঘূষ শূর্কর যেমন এসয় ছিল, পরেও তেমনিই এসয় রহিল।

নরেন মুক্ত'র হাত দিয়া পলায়নের প্রস্তাব করিয়া তাকে চিঠি পাঠাইল। সে চিঠি পড়িয়া সৌধামিনী সেটা হি'ড়িয়া কেদিল। ইতিমধ্যে বাসীর কাপড়খোবাকে দিতে গিয়া তার নিজের নামের একটা চিঠি পড়িয়া সে আনিত পাবিল যে তার বাপের বাড়ী পুড়িয়া গেছে। বাসী তাকে সেই চিঠি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করিল না। তার মনে হইল পারে 'অর্ধ সাহায্য' করিতে হয়, সেই ভয়ে তার বাসী তার নিকট হইতে চিঠিখানি খোপন করিয়াছেন। বাসী-হ্রীতে বিশ্বাস করিয়া হইয়া গেল।

সেই ভাবে নরেনের সঙ্গে সৌধামিনী বাসীর ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কলিকাতার নৌবাজারের একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া নরেন তাকে সেইখানে রাখিল।

কিন্তু নরেনের সঙ্গে বাহির হইবার পর মুহূর্তেই সে বুঝিল তার সমস্ত ঘন করণ তার অলঙ্কিতে তার বাসীর অনুরাগে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেন তার সুখে বাসী-প্রীতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত সুখভর হইয়া গেল, সে তাকে আরবার বুঝাইল যে এখন সে কিরিতে চাহিলেও তার বাসী তাকে গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু সৌধামিনীর ঘনে অটল বিশ্বাস ছিল যে, তার বাসী তাকে মার্জনা করিবেনই।

মুক্ত'র কাছে সৌধামিনী শুনিয়া যে, তার বাসী তার সমস্ত বুঝাও জানেন। তিনি সেই বাড়ীতেই বেথা দিলেন। তিনি শুধু বলিলেন, "তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি তুমি আদারই আছ।" বাড়ী চল।"

পল্লটা এইমত ভাল লাগিল যে, এ গল্পে বাসী-প্রীতির মধ্যে মিলনের কোথাও কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শেষ-কালটাতে মিলনটা যে সত্যসত্যই ঘটয়া উঠিল, তাহা কোন সামাজিক সংস্কারের তাড়নায় ঘটে নাই। সমস্ত পল্লটার তিতর-কার অস্তিত্বই হইতেই গল্পের পরিণামটা অধি সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখক গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সৌধামিনীকে কোথাও ক্রিমি মতী বানাইবার চেষ্টাশূন্য করেন নাই। সে নরেনকে ভালবাসিয়াছে, বিবাহের পরেও তাকে ভোলে নাই এবং বাসীর ঘর ছাড়িয়া তার সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু তার বাসী যে সমস্ত আনিয়া ওনিয়াও তাকে একদিনের মত শাসন করেন নাই কিংবা তার উপর কোন প্রভুত্ব খাটাইবার চেষ্টা করেন নাই, তিনি যে ধৈর্যের সঙ্গে তাকে ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া তার ভালবাসা পাইবার মত প্রতীক্ষা করিয়াই রহিয়াছেন, ইহাতেই তিনি ভিতরে ভিতরে তার প্রীতির ক্ষর ক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রীতি সে খবর টের পায় নাই। যেদিন সে ঝগড়া করিয়া বাসীর ঘর ছাড়িয়া গেল, সেদিন নরেনের সঙ্গে তার জীবন কাটাইবার অভিপ্রায়ে সে ঘর ছাড়ে নাই—সে ঘর ত্যাগ করিয়া-ছিল অভিমানে। কিন্তু বাহির হইয়া পড়িতেই তার সমস্ত লজ্জা একেবারে অনাবৃত স্মৃতিতে তার সামনে আসিয়া দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে তার বাসীর ধৈর্য-শীল প্রতীক্ষাপরায়ণ প্রেমে সে যে কতটা অভিভূত হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিল।

অবশ্য তার স্বামী তাকে গ্রহণ করিলেন ; এই যে, 'ঘটে যা' তা সব সত্য নহে' ।
অথচ এমনটি যে এমেনে ঘটে তাহা মনে হুতরাং ঔপন্যাসিকের কল্পনায় বাহা সত্য, তাহা
করিবার কারণ নাই । সাহিত্যের মন্ত তরঙ্গা বাস্তব সত্যের চেয়ে সত্যতর ।

ঐঅনিতকুমার চক্রবর্তী ।

বন্ধ ঘরের ঘুলঘুলিতে

বন্ধ ঘরে বন্ধ বৃকে
আঁকড়ে শিলা একটু টেরে
শিকলি পায়ে শিকলি পলে
অন্ধকারে তলিয়ে কে রে !

হাতকড়ি সে মাংস কেটে
কামড়ে এটে বসছে হাড়ে,
গুম্বারেরি ঘুলঘুলিতে
চাম্‌চিকেতে পাখনা নাড়ে ।

ঘুলঘুলিতে একটু আলো
তাও যে চাক কাল-পেঁচাতে,
আগ্ন-পরতে একটু আশা
হুঁপিরে মরে—নেই চৌচাতে ।

হুঁপিরে মরে গুম্বরে একা
অগ্নে কত ডুকরে ওঠে
চটুকা-ভাঙা কাপলা চোখে
অশ্রু-ভীতি-চিহ্ন কোটে ।

মন-মরা জীৱন্তে-মরা
তুই মরিয়া কটে যে রে,
আকুশোবে কি শুদ্ধ হিয়া ?—
চক্ষু জলে আসছে ভেরে ?
মর্দ ওরে ! হ'সনে চিলে
কান্না দিলে কেন্নতে শোখো,
পাঁজরা যদি পুড়ুত থাকে
পুড়িরে তাকে আগুয়া রেখো ।

আগুয়া রেখো আগুয়া রেখো
তগ্ন রাজ্য নীলি-ভরা,
নেই আশা ?—কে বলতে পারে ?—
আগুবে শিখা হাসুবে ধরা ।

ভস্মা রাখো চান্না থাকো
শক্ত সাজা তুচ্ছ করে'
অয়েছ মাহুস হ'য়ে যে
চলবে না তা' তুলসে পরে ।
দণ্ড সে মান্দগু কত
নর মাহুসের,—ভুল কোরো না,
নর কোতোয়াল সেই অহরী
কবুবে যে অন তগ্ন সোনা ।

কু এহ কু-দৃষ্টি হানে,—
হুংখ সেহে,—হুংখ মনে,
তাই বলে' কে হুং জুড়ে
বসুবে গ্রহ-স্বতায়নে !
নিখায়তনে নেই বাতনা
শান্তি হবে নির্জিচারে ;
ভাগ্য ভগবান চেয়ে ভাই
হয় না বলী,—শব্দা কারে ?

কাইমী না রে হুংখ-দশা ;
কাইমী কিবা মরকো পাকা—
বর্তমানে-গর্ভ খুঁজে
ব্যর্থ হ'য়ে বর্তে' থাক ।

আর্জ্যুকে ওরে মৌন ! তোরে

অন্ধকারে অন্ধ করে

চৌচাণটে চাপতে থাকে

বুকটাকে অগ্নিদগ্ধ পাথরে ।

আর্জ্যুকে বেন দুনিয়া কাঁকা

নেইক কিছু নেইক কেহ

তৃফা-খরা শুক খরা

নেইক ক্রীতি নেইক রেহ ।

আর্জ্যুকে বেন লুপ্ত হাসি

দৃষ্টি ঘোলা ক্রান্ত চোখে,

হয় তো সবি বদলে বাবে,—

রাত পোহালে,—দিবালোকে ।

ইচ্ছা-মহাশক্তি সাধে

যুক্ত হবি একনিমেবে,

আত্মবাহী জল্পনা সে

মূর্ছা যাবে অট্ট হেসে ।

প্রাণ দিবে যে চাইতে পারে

দৃপ্ত দৃষ্টি চিত্তবেগে

প্রাণ পূরে নিম্ভর পাবে সে,

অনুবে অধা বস্ত্র-মেঘে ।

অন্ধকারে আসবে রবি—

তার কপালে—আসবে ঘরা,—

ঘুলুঘুলিতে গলিবে দেবে

ধাম্‌ধানি ধোশ-খবর-ভরা ।

আগছে হিরা,...আগবে আলো,...

আগছে ভাষা,...আগছে আশা,...

ওম্ম-ঘরেবি ঘুলুঘুলিতে

ঘুলুঘুলিতে বাধছে বাসা ।

ঐশ্যোজ্ঞনাথ দত্ত ।

সমালোচনা

খাত্ত । ঐশ্যোজ্ঞনাথ দত্ত আই, এম, ও, এম, বি, এফ, সি এস অর্জিত । কলিকাতা, কলেজ এসে দুজিত । একালক, ঐক্যোতিঃএকাল বহু, কলিকাতা । তৃতীয় সংস্করণ । মূল্য বেড় টাকা । এই গ্রন্থে খাত্তা সত্যকে একোজনীয় কথা পাড়িয়া বিতর্কন গ্রন্থকার খাত্ত সত্যকে সত্য কথা অত্যন্ত বিনয়ভাবে আলোচনা করিয়াছেন । ‘খাত্ত কাহাকে বলে’ ? তাহার উত্তরে লেখক বুঝাইয়াছেন, বাহা আমরা বাই এবং বাহা হারা আবাদিগের পরীরের পুস্তিস্যবন ও পক্তি সত্য বহু তাহাই বার্থ খাত্ত ; ‘আমরা বাহা কিছু বাই’, তাহাই খাত্ত নহে । তার পর তিনি বলিয়াছেন, ‘এরপ সত্যকগুলি খাত্ত আছে বেগুলি খাত্তাবিক অবস্থাতেই পরীর-পোষকের উপযোগী হইয়া থাকে, যেমন, দুহু, চেনি, হুশক কল ইত্যাদি । অপরগুলি রচনাবি কুজিম

উপারে পরিবর্তিত না হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, যথা,—ভাল, চাল, বজা, যৎত, বাংস তরকারী ইত্যাদি ।’ “খাত্তের একোজন—পরীরের পুস্তি-সাধন ও বল-বিধানের লক্ষ্য । আমরা যে কোন কান্নই করি না কেন, পরীর তাহাতেই কর পার । চলাফেরা, উঠা-বসা, বোড়ান ব্যায়াম প্রভৃতিতে বৈহিত্তি বাসেপুস্তি আবুজন-এসারগের লক্ষ্য কর পার—এবং পরীত্যান, চিত্তা প্রভৃতি মানসিক কার্যে যতিতাবি পরীরিক যন্ত্রের কর হয় । পরীর তকা করিতে হইলে পরীরের সেই কর পূরণ করা বৈহন একোজন, পরীরিক পক্তি সত্য ও সে পক্তির বুঝিবও ওভমনি একোজন আছে । একজন এমন খাত্ত আবাদিগকে গ্রন্থ করিতে হইবে, বাহা কর পূরণ ও পক্তি-বর্তনে সাহায্য করে । গ্রন্থকার অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিনয়ভাবে পরিশাক-প্র, পরিশাক-

ক্রিয়া, বাস্তবের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের গুণাগুণের আলোচনা করিয়াছেন : এমন কি বাস্তবের পরিমাণ অবধি বিস্তরণ করিয়া বিদ্যাছেন। অল্প-তোজন, অভিতোজন এবং সু-তোজনে কত ঘোষ, তাহাও তিনি বুঝাইয়াছেন ; বসন এবং অবস্থান্তরে বাস্তবের পরিমাণ ও সম্বন্ধ-নির্ধারণেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহারও তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করিয়াই কান্ড হন নাই—
 কি ভাবে চন্দ্রা উঠিত, বলিয়া বিদ্যাছেন। উপবাস নব্বন্ধে এখন নানা হুনির নানা মত। গ্রন্থকার বলেন, উপবাসের উপকারিতা বিলম্বন। তাহার মতে, “মানুষ যদি আলস্যজন পরিমিত-তোজী হয়, শরীর পোষণের ক্ষমতা যে পরিমাণ যে জাতীয় বাস্তবের প্রয়োজন তাহা যদি নিষ্কির ওজনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার উপবাস করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনাত্মিক বাস্তব-গ্রহণই আশ্বাসের বাস্তবিকতার মূল কারণ। বাস্তবের এই অতিরিক্তাংশ যেহেতুটির ক্ষমতা পূরিত হয় না, উহা অসময়ে ব্যক্তিগত বিকার প্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ বিবাক্ত পদার্থ (toxins) উৎপাদন করে। এই সকল বিবাক্ত পদার্থ রক্ত-প্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং শারীরিক সমস্ত ক্রমের মধ্যে অংশে করিয়া উহাদিগের প্রাথমিক ক্ষতির অপচয়, ঘোরতর এবং ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উৎপাদন করে। শিরঃশীতা, হৃৎকম্পের রোগ, অস্বাভাবিক, উত্তরাসন, পেট-বেদনা, বমন, জ্বর, উদ্বাহাটন প্রভৃতি নানা রোগের একটি কারণ—অস্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনাত্মিক বাস্তবের বিকার। একপ অবস্থার পুনরায় বাস্তব গ্রহণ করিলে উপরোক্ত বিবাক্ত পদার্থ নষ্ট হয় শরীরের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দ্রুততায় পূর্ণকণিত রোগগুলির লক্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অস্ত্রশূল, মূত্রশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ হ্রাসোগ রোগ বেহের মধ্যে প্রাপ্ত হয়। বাস্তবের এই অতিরিক্তাংশ ও তত্ত্বগত বিবাক্ত প্রাণ নাশ করিবার একমাত্র উপায়

উপবাস। “আমিষ ও নিরাষিষ তোজন” সবচে গ্রন্থকার বলেন, “কোনটিই অতিরিক্ত সত্যের হুণ্ডার উচিত নহে। যখন হাংস অধিক পরিমাণে বাইসে নানাবিধ বাস্তবগণ উৎপন্ন হয়, তত্ৰপ্ত ভাত, ভাল, লটী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পদার্থ অধিক বাইসে নানাবিধ অস্বাভাবিক রোগ ও বহুমূত্র রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।” এ-সময় আলোচনার পর গ্রন্থকার বাস্তব তেজাল ও তত্ত্বিয়ারণের যে সকল উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন প্রত্যেক বাস্তবিকায় ব্যক্তিরই তাহা পাঠ করা উচিত। প্রকৃত উপসংহার-ভাগে কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা এবং সে পথ্যাবির প্রস্তুত প্রকরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নানা দিক দিয়া এ গ্রন্থখানি উপদেশ দিইয়াছে। অস্ত্র গ্রন্থকারের বক্তব্যগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত একটিও বাস্তব কথা হইতে নাই। বাস্তবের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আমরা এই অতি-প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম ; বাস্তবধীন বাস্তবগণ যেন এ গ্রন্থের আরো বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৩০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এই দ্রব্যী গ্রন্থের মূল্য বেড়টাকা মাত্র। কিন্তু এই বেড় টাকা মাত্র ব্যয়ে যে ভাঙার ও গুণ-বরষ বাবন অন্ততঃ বেড়সত টাকার অপব্যয় কমিবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুস্তক। *শ্রীহৃৎ গোপেন্দ্রনাথ হার অর্জুন* গ্রন্থিত। একাংশ, যাদবেন্দ্র পরিদর্শক শ্রীহৃৎ। শ্রীহৃৎ পরিদর্শক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। ভাষা-ভাব নিত্যশ্রী এলো-বেলো ; রচনাও অক্ষম, বিশেষবহীন।

Rambling Thoughts. By Mucindra. P. Sarvadhikari, Printed and Published by Manikchandra Ghose at the Lila Printing Works. Calcutta. 1916. এখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত কয়েকটি স্বল্প কবিতার সমষ্টি।

শ্রীসত্যব্রত শর্মা।

কলিকাতা ২২, হকিঙ্গা স্ট্রীট, কাণ্ডিক প্রেসে শ্রীহরিরণ মাস্তা দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বাসিন্দা হইতে শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

বালক

ইহাতে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী সরল সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছেলে-মেয়েদের উপযোগী। বয়স্করা পড়িয়াও আনন্দ পাইবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন গল্পের বই

পাপুড়ি

প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১২ এক টাকা।

ইহাতে হতভাগ্য জীবনের করুণ কাহিনী-সম্বলিত আটটি গল্প আছে। প্রায়

দুইশত পৃষ্ঠা ভালো বাঁধাই—মলাটের উপর নূতন ধরণের নক্সা।

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূতপত্নীর দেশ !

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মাসির বাড়ির গল্প—পিসির বাড়ির গল্প।

এমন মজার গল্প ছেলেরা কখনো শোনে নাই।

অনেক ছবি আছে। মূল্য আট আনা।

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস—২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট এবং অমৃত্যু পুস্তকালয়।

আপনার ফটো

এবং তৎসহ ৩০ টাকা মাত্র পার্শাইলে আপনি ১৫×১২ ইঞ্চি মাপের একখানি সুচক ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট পাইবেন, বাহ্যিক মূল্য বাতাবে ১০-১২ টাকার কম মতে এ সুযোগ বৈধদিনের, ক্ষত্র নয়; আমাদের সুচক-সম্পন্ন ছবি বাহাতে তারতের ঘরে ঘরে শোভাবর্ধন করে, সেই উদ্দেশ্যে কিছুদিনের ক্ষত্র, সম্বব হউন। বন্দোবস্ত করিলে—স্বলভে নক:বশুে কটো তোলা হয়।

এস, সি, পাল এণ্ড কোং, ১৬নং বাবানলী বোম্বের স্ট্রীট, কোড়ানাকো, কলিকাতা।

চিত্রে চিত্রময়, শিক্ষায় দীক্ষায় অতুল !

বার্ষিক মূল্য সভাক ৩।০

প্রতি সংখ্যা ১।০

নূতন অভিনব মাসিক সাহিত্য

ত্রিবেণী ! ত্রিবেণী ত্রিবেণী !

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ।

বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রকর, এমগ্রোতার ও লেখকগণ ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন,
অজস্র অর্থায়! সাধে সম্রাট, রস ও শিক্ষাদীক্ষায় ভরপূৰ্ব! আমাদের বেশে এভাবে
কাগজ সম্পূর্ণ নূতন। শারদীয় সংখ্যা শীঘ্রই বাহির হইতেছে, পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের শারদীয় সংখ্যা

নামমাত্র মূল্য এবার পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার! আট আনার

পূজা বাড়ী সর গরম !!

এই সংখ্যার বিশেষ মূল্য ১।০ আনা, ডাকমাতলাদি সহ ৪/১০ জরি আনা অম।
দ্বিগুণ গেলোই ঠিক পূজার দিনে বাকী মূল্য তি পি হইয়া যবে যবে ত্রিবেণী পৌছিবে।

সচিত্র পূজার কৌতুক, হাসি, গল্প ও রঙ-তামাসা !!

তত্ত্বপরি পূজার ও ঠাকুর দেবতার মনমাতানো অসংখ্য ছবি।

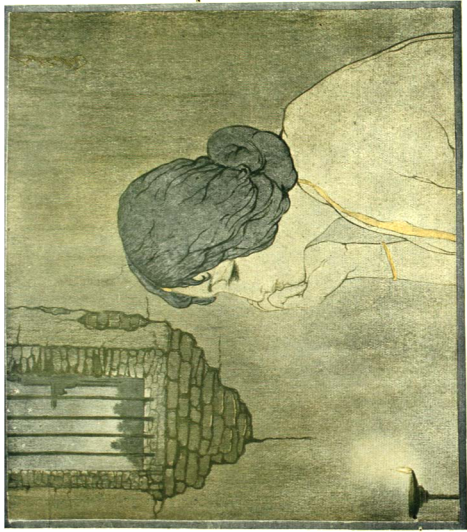
বাহারা এক সঙ্গে এক বৎসরের মূল্য জমা দিবেন,

তাহাদের শারদীয় সংখ্যার অল্প অতিরিক্ত কিছুই দিতে হইবে না।

আমরা ভাল ভাল লেখক ও চিত্রশিল্পীগণকে ধ্যানাধা উৎসাহিত করিতে প্রস্তুত।
এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ শারদীয় সংখ্যা ত্রিবেণীতে দেখুন। নির্দিষ্ট সংখ্যা মাত্র
ছাপা হইতেছে, সম্বন্ধ ঘটন।

সোল এক্সেন্টস—একেডেমিকেল লাইব্রেরী,

১৬৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।



—“বুদ্বল খেলে অমোর লালি, না ফেলে রাত কাটাও লালি,
 তেমনি তোর খাণ্ডার আনার কবর আছে ফেঁসে।”—কবীন্দ্রনাথ।
 ক্রীতদাসবৃত্তান্তের গল্পেপাখ্যার অঙ্কিত

ভারতী

৪১শ বর্ষ]

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

[৮ম সংখ্যা]

পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি ও পল্লী-সংস্কার

আজকাল পল্লীগ্রামের কথা লইয়া বেশ একটু নাড়াচাড়া চলিতেছে। সহরের মাসিক পত্রিকাগুলিতেও পল্লীবাসীর সাদরে স্থান পাইতেছে। ঠাণ্ডারা কদাচিত্তে রগ্রামে গমন করিতেন, ঠাণ্ডারাও এখন মধ্যে মধ্যে দেশে আসিয়া পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের আলোচনার যোগদান করিতে আর সেরূপ উৎসাহীন নহেন। কর্তৃপক্ষের সহানু-ভূতিরও অভাব নাই। স্বয়ং বঙ্গের চাইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন দেশীয় কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই পল্লীবাসীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অভাব-অভিযোগের কথা অবগত হইতেছেন। কিছুদিন হইল কেবল পল্লীগ্রামের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্ত স্থানে স্থানে সার্কেল অফিসার নামক এক শ্রেণীর নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহারা নামে চৌকিদারী কার্য-পরিদর্শনের জন্ত

নিয়োজিত হইলেও পকারেত ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণের সাহায্যে রাস্তাঘাটের উন্নতি, পানীর জলের ব্যবস্থা, জঙ্গল ও আবর্জনারি পরিষ্কার, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ, নূতন পাঠশালা স্থাপন ও পুরাতন পাঠশালাগুলির উন্নতি-বিধান, দুঃস্থ কৃষকগণের সাহায্যার্থ বোখ-কণমান-সমিতির প্রতিষ্ঠা, কৃষি বিভাগের কর্মচারীগণের সাহায্যে কীটাদি হইতে ফসল-রক্ষা প্রভৃতি নানা জন-হিতকর কার্যে অবহিত হইতে-ছেন। ম্যানেজিয়ার প্রতিকার-কলে সরকার ও জেলা বোর্ড হইতে বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। গ্রাম বিশেষের অবস্থা-অনুসারে জঙ্গল ও ড্রেন প্রভৃতি কাটাওয়া যাওয়াতে ম্যানেজিয়ার এবং মশকের হাত হইতে গ্রামবাসীগণ উদ্ধার পায়, সে বিষয়ে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। কোথাও বা ডাক্তার বেন্টলি (Dr. Bentley)

কর্তৃক অমুমোদিত Beneficazione প্রথার বস্ত্রার মলে পন্নীর বিবাক্ত আবর্জনাদি ধুইয়া কেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে ; কোথাও বা চতুশ্চাখিত্তি জঙ্গলাদি সাক করিয়া গৃহস্থের আগ্নেয়ে নির্মল বায়ু-চলা-চলের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে । অবশ্য সর্বত্র সমানভাবে কাজ হইতেছে না এবং এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের কলে সরকারী বেনরকারী সকল অহুতানেই কিঞ্চিৎ বার-সকোচ করিতে হইয়াছে, কিন্তু গ্রাম-গুলি বাহাতে আধুনিক স্বাস্থ্যনীতির-অমুমোদিত প্রথার শিক্ষিত সমাজের বাসোপ-যোগী হইয়া উঠে, বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা চারিদিকেই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে ।

বাহার। পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন জেলার মালেরিয়ার সংহার স্ত্রুতি স্বচক্ষে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের চরে অবস্থিত অটুট স্বাস্থ্য ও নবীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামগুলি দেখিয়া তাঁহারা হরত এই সকল পন্নীর প্রকৃত অবস্থা জঙ্গদম করিতে পারিবেন না । একবার নদীয়ার বড়-আঙুলি, সুবর্ণপুর প্রভৃতি স্থান স্বচক্ষে দেখিলে পন্নীর বৈবরিক পরিবর্তনের কথা বৃদ্ধিতে পায় ঘা—অতঃই যনে হয়, পন্নীর বৈবরিক উন্নতিষ্ট পন্নী-সংস্কারের মূল ভিত্তি ।

ইচ্ছার হউক বা অনিচ্ছার হউক বাহাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, প্রকৃত বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীর সহিত পরিচর-লাভের সুযোগ তাহাদের যথেষ্টই ঘটয়া থাকে । এই সকল বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা ও আশা-ভরসা সহিত সহরবাসী শিক্ষিত সমাজের কিঞ্চিৎ যোগ বা সামঞ্জস্য না থাকিলে কেন

যে সম্পূর্ণ জাতীয়ত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহাও বেশ বৃদ্ধিতে পায় ঘা । মহীপুত্রের প্রধান মন্ত্রী সার মোক্ষগুণ্ডম বিম্বেশ্বরীয়া, মানব-সমাজের ক্ষুদ্রতম সমষ্টি গ্রাম হইতেই উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হওয়া উচিত, ইহা অমুমতব করিয়া মহীপুত্রে এক নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন । সহরে আমরা উন্নতি-মার্গে খুব দ্রুত চলিয়াছি বটে কিন্তু মকঃবলে আমাদের গতি একে-বারেই শব্দকের মত । দেশের ভদ্র-শ্রেণী গ্রামত্যাগী হইয়া প্রায়ই এখন সহরে আশ্রয় লইতেছেন । একে জীবন-সংগ্রামের দাক্ষণ চাপ, তাহাতে আবার মালেরিয়ার উপদ্রব । গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক মিলে না, ছেলেদের ভাঙ্গদগ্ন শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না, জাতি-কুটুম্বগণের সহিতও অনেক সময় সামাজ্য বৈবরিক বা সামাজিক ব্যাপার লইয়া ঘোরতর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাই এখন অনেক শিক্ষিত বাঙালীই পড়ে প্রায় ৫০৬০০ টাকা মাসিক আয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ীভাবেই সহরে আশ্রয় লইতেছেন ; ইহাতে পন্নী ও শিক্ষিত সমাজ এ উভয়েরই যে বিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিবার নহে । এ মাহিনার আর গ্রামে গিয়া দোল-দুর্গোৎসব করা চলে না, বিপুল যৌথ পরিবারেরও প্রতিপালন হয় না ; কোন-রূপে স্বাস্থ্য-দ্রো ও সন্তানাদি লইয়াই সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয় মাত্র । পৈতৃক গৃহাদি সংস্কারও অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে । বাহাদের উদাহরণ দেখিয়া দেশের অশিক্ষিত লোকেরা নানা হিতকর অহুতানে যোগ দিতে

বা সজ্জা করাতে শিখিবে, তাহারাই যদি দেশত্যাগী হইয়া গ্রামের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখেন, কিম্বা দেশে থাকিয়াও উপকার করা দূরে থাকুক নানারূপ মামলা-মকদ্দমা ও কলহ-বিবাদে পল্লী-জীবনের সুখ-খ্যাতি নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে শুধু দুইচারিজন পরহিতব্রত ব্যক্তি ও গবর্ণমেন্টের পরিদর্শনকারী কর্মচারীদের চেষ্টায় জনসাধারণ গ্রাম কিছুতেই নন্দন কাননে পরিণত হইতে পারে না। এই ত গেল ভ্রলোকবিগের কথা। এখনও বঙ্গদেশে কৃষক ও শ্রমজীবীগণ আপনাদের বাসস্থান ছাড়িয়া সকলে মিলায়া সহরে আসিতে সুরু করে নাই। রেল-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাতায়তের সুবিধা হওয়ায় সময় সময় বাঙ্গালী 'মুনিব' মহুরেরা ধান-কাটা, মাটি কাটা প্রভৃতি কাজের চেষ্টায় এক জেলা হইতে অত্র জেলায় বাতায়ত করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানী কুলিগণের দ্বারা তাহার দীর্ঘকাল বাড়ী ছাড়িয়া বা সপরিবারে স্থায়ীভাবে কর্মস্থানে আসিয়া বাস করিতে প্রস্তুত নহে। কলিকাতার অনতিদূরে ডাঙ্গারখী-তীরে ও পূর্ববঙ্গ রেল পথের পার্শ্বভাগে যে-সকল পাট-কল দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির সন্নিকটস্থ অল্প কুলি-নিবাস সমূহের অবস্থা দেখিলে বুঝাযাই যেন হয় বৃষ্টি বা কল-কারখানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও পান্ডিত্য Slum-এর দ্বারা আবাস্যকর ও দ্রুতী-সম্মূল কুপলীসমূহের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। বিলাতে শ্রমজীবী সম্ভ্রদারের সংখ্যা অধিক, তাই শ্রমজীবী-

গণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা অনেক মহাপ্রতাপ ইংরাজের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া থাকে। কুলিগণের বাসস্থানের অবস্থা দেখিয়া অধ্যাপক গেড্ডিস (Prof. Geddes) ঘূর্ণীর কৃত্তকারগণের দ্বারা কুলি-লাইন ও কৃষক কুটারের ক্ষুদ্র আদর্শ বা "মডেল" (model) তৈয়ারির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সভ্যতার আলোক-সংস্পর্শে আসিয়া কুলি লাইনে বাস করা অপেক্ষা তাহারিগণের পল্লীকুটারের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্যায়ে বাস যে কত ভাল, তাহা এই 'মডেল'-গুলি দেখিলেই শিক্ত সমাজ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্বেও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভারত-বাসীগণের দৃষ্টি সহরের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। ভারতীয় অর্থনীতির জন্মমাতা মহাশয় গোবিন্দ রায়গাড়ে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে বলিয়াছিলেন, "The progress of ruralization in modern India means its rustication." অর্থাৎ পান্ডিত্য প্রতিযোগিতার কালে যদি দেশের শিল্পী ও কারিকরেরা সহর ছাড়িয়া পল্লীতে গিয়া আশ্রয় লয় তাহা হইলে সে গতি অবনতির পথে চলিয়াছে, বৃদ্ধিতে হইবে—তাহা হইলে লোকের কর্ম-কুশলতা, বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাবলম্বন-শক্তি সমস্তই লোপ পাইতে থাকিবে। প্রতিযোগিতার অপারগ হইয়া শিল্পীগণ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিলে তাহা যোষের কথা, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতার স্রোত যতই পল্লীমুখী হইলে তাহাতে আনন্দ বৈ দুঃখের কারণ দেখি না। (১)

(১) এ সম্বন্ধে মতভেদ কিন্তু এখনও মিটয়া যায় নাই। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রমদর্শন বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পল্লী-অবিবাসিনগণের গ্রাম ছাড়িয়া সহর-অভিমুখে গতি স্বাভাবিক বৈ অস্বাভাবিক নহে। তিনি রায়গাডের

আমরা এখন দ্বারে ঠেকিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে পল্লীর উন্নতি না হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ বৈবয়িক উন্নতি একবারেই অসম্ভব। ধীরে ধীরে পল্লীর ধনোৎপাদন-সামর্থ্যই আমাদের দেশে অর্থনীতির প্রধান কথা। পল্লীগ্রামগুলির ধনোৎপাদন-শক্তি যদি উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে প্রায়শঃ পল্লীসমষ্টি-গঠিত এই বিশাল ভারতবর্ষের বৈবয়িক উন্নতি ক্ষুদ্র-পর্যায় হইয়া পড়িবে।

পল্লীতে বাস করিতে হইলেই যে কৃষি-কাৰ্য্য লইয়া থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ এখনও বঙ্গদেশের অনেক গুরুগ্রামে শিল্পী ও কারুজীবীর সংখ্যা বড় কম নয়। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী থাকা আবশ্যিক এ কথা এখন আর সন্দেহাবাহী-সম্মত। মহীশূরের স্যাম্ মোকশুগুও ইহা হৃদয়লব্ধ করিয়া বলিয়াছেন, গ্রামের প্রতি ৫০-জন লোক-পিছু তাঁত চালান, বাসন তৈয়ারি, বা চামড়া কৰ করার জার একটি করিয়া শিল্প বা কারবার প্রচলিত থাকা একান্ত আবশ্যিক।

বঙ্গদেশের কয়েকটি গ্রামা শিল্পের কথা ধরা যাক। দুর্গিয়ারাম ও মুন্সীগঞ্জের রেশমীবস্ত্র ও শম্মবস্ত্র বর্ষেই পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

মহীশূরের ডাইহাট মাটিয়াগিরি কাঁসার কলনের কারবারের জন্ত প্রসিদ্ধ। এই সকল কারবারে স্থানীয় বাবসায়ীগণের মধ্যে কেহ কেহ বেশ দুইপরলা সঞ্চয়ও করিয়া থাকে। ইহা বাতীত 'লাক' বা গালা প্রস্তুত (lac industry) এবং তাহা হইতে খেলনা চুড়ি প্রভৃতি নির্মাণ, চিনি ও তুড়ির ব্যবসায়, তসর ও এণ্ডি উৎপাদন, শোলা ও ডাকের সাজের কাপড় (tinsel industry), পাটি ও চটাই তৈয়ারি প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায় পল্লীগ্রামে চলিতে পারে এবং চলিতেছেও। মধুমক্ষিকা পালন আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু আধুনিক প্রেধায় মক্ষিকা-বাস নির্মাণ করিয়া কিরূপে মধু সংগ্রহ করা হইতে পারে, তাহা কীটতত্ত্ববিৎ জীবজন্তু কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সেমিন রামমোহন লাইব্রেরিতে বস্তুতঃ-কালে ভালরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন পল্লী-শিল্প ও কারবারের কথা অধ্যাপক জীবজন্তু ব্রাহ্মচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নব-প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থে (২) বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার পুস্তকের প্রথমমাংশ হস্ত-শিল্পের কোষ-গ্রন্থ বলিলেও অতুক্তি হয় না। কি কি আধুনিক উপায় অবলম্বনে এই সকল গৃহশিল্পকে পুনরজ্জীবিত করা

যত উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন, "... there was a tendency for a larger and larger proportion of the people to become rural. Of recent years however there has become discernible a tendency working in the opposite direction and towns are once more beginning to take their proper place as centres of thought, culture and industry in the life of the nation.

(Indian Economics. p. 28)

(২) Foundations of Indian Economics. Longman's 1916—9 shillings (Rs. 9) PP. XXVI 515.

ঘাটেতে পারে, তাহা পল্লীর হিত-কামী চিন্তা-শীল ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া দেখা কর্তব্য।

কল-কারখানার জন্মস্থান ইউরোপেও গৃহ-শিল্প একবারে লোপ পায় নাই। বস্তুতঃ দেখা যায় যে কল-কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শ্রেণীর উৎকৃষ্ট শিল্পেরও ঐচ্ছিক হইতেছে। এ সম্বন্ধে রাধাকমল বাবুর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। তিনি

১৮৮১ খৃঃঅঃ ১৮৯৫ খৃঃঅঃ

একক শ্রমজীবী—

১,৪৩০,০০০ ১,২৩৭,০০০

১ হইতে ৫ জন লইয়া ছোট

কারখানার—

৬ হইতে ৫০ জন লইয়া ছোট

কারখানার—

৮৫০০০

১৮৭,০০০

নিম্নক হস্তশিল্প ত আছেই, তাহার উপর জলবায়ুসাধ্য গ্যাস ও অয়েল এঞ্জিনের আবিষ্কারের সহিত, এই সকল ছোট কারখানা ইউরোপের পল্লীতে সহজেই স্থান পাইয়াছে। শুধু জার্মানি বলিয়া নহে, ফরাসী দেশে ও সুইজারলণ্ডে বেলনা নির্মাণ, লেস্ তৈয়ারী, কাটা কাপড় প্রস্তুত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর গৃহ-শিল্পের 'উত্ত-রোত্তর' ঐচ্ছিক হইতেছে। ফরাসী দেশে কাটা কাপড় ত পল্লীগ্রামেই অধিকাংশ নির্মিত হইয়া থাকে। কলিকাতার উপকণ্ঠবাসী মেটিয়া-বুজের নরজীবীরাও নিম্নগৃহে পোষাক প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার ব্যবসায়ীগণকে সরবরাহ করে। পল্লীগ্রামে তরবার শিল্প (Tailoring) শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর কাটা কাপড় ত্রিভিন্ন গ্রামে প্রস্তুত হইয়া সহরের বিপণীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আরও দেখাইয়াছেন যে ইউরোপে একক কারিকরের সংখ্যা কমিয়াছে বটে কিন্তু ১ হইতে ৫ বা ৬ হইতে ৫০ জন শ্রমজীবী লইয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা চালানো হয়, তাহার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শুধু জার্মানিতে এইরূপ একক শ্রমজীবী ও ছোট কারখানার কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলি হইতেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

ব্যবসারের গোড়াপত্তন যদি ভালরূপে করা হয় তাহা হইলে বেলজার্মার ব্লাউস বা কাস্ট নগরের ফ্রঙ্ক ফরাসভার্মার ধূতির স্রাব কেন যে এগিজি লাভ করিবে না, তাহা ত বুঝিতে পারি না। সুতরাং পল্লীতে বাস করিতে গেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদিকা শক্তির (law of diminishing returns) নিয়মাস্তরগত কেবল যে কৃষিকার্য লংগ্রাই ব্যস্ত থাকিতে হইবে, এমন নয়।

কলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে গৃহ-শিল্প একেবারে বিনাশ পাইতে পারে না, তাহা দেশী কলের বস্ত্রের তুলনার ভীতির বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বিবেচনা করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। ১৯০৫-৬ সালে ১৫০ হাজার শোভ (পৌণ্ড আয় অর্ধ সের পরিমিত ওজন) দেশীয় কলে নির্মিত বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯০৬-৭, ১৯০৭-৮ ও

১২০৮-৯ সালে উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া বৎসরক্রমে ১৮২০-১ লক্ষ, ১৮৭০-১ লক্ষ ও ২১৭০-১ লক্ষ পৌণ্ডে পরিণত হয়। এই কয় বৎসরে তাঁত নিষ্পত্তি বস্ত্রের দ্রাব্য-বৃদ্ধি নিম্নলিখিত পাদটীকা হইতে বৃত্তিতে পাত্তা যাইবে :—
(Vide p. 152-3 R. K. Mukherji's Foundations of Indian Economics)

১২০৪-৬	১২০৮-৭	১২০৭-৮	১২০৮-৯
২৪২০	২৬৮০-১	২৪৬০-১	২৪৭০-১

লক্ষ পৌণ্ড লক্ষ পৌণ্ড লক্ষ পৌণ্ড লক্ষ পৌণ্ড।
১২০২-১০ সালে তাঁতের বস্ত্রের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধের বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দর বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ার তাঁতের কাপড় যে পুনরায় অধিক পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে ও তাহার কাটুতিও বে বাড়িয়াছে এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হয় অন্তর্য হইবে না। অবশ্য ইহা হইতে এ কথা বলা চলে না যে, ক্রমে তাঁতের কাপড় পুনরায় কলের কাপড়ের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। সুখোপাধায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে কাপড়ের কল, পাটের কল, লোহ ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি কালে বাড়িবে বৈ কনিবে না; তবে অল্প মূলধন-সাধ্যা এতদিন প্রভৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য-পৃষ্ঠপোষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা পল্লীগোষ্ঠ-সমূহও প্রতিষ্ঠিত হওয়া

ক্রমশঃ সমধিক সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। (৩) কারখানা বতই বাড়িতে থাকে supplementary demand বা মান্যতা-পরিপূরক প্রয়োজনের অন্ত ছোট শিল্পেরও যে ততই প্রয়োজন হয়, এ কথা ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বৃদ্ধা যায়। ইউরোপে কল প্রতিষ্ঠার সহিত অনেক সরকারী হস্ত-শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে সুতরাং কল বসিলে সকল হস্ত-শিল্পই যে লোপ পাইবে, এমন নহে। জাপান এখনও “ছোট কারখানা” বেশই রক্ষিয়াছে। হস্ত ও কারুকার্যবিশিষ্ট বস্ত্র এখনও হস্তে নির্মিত হইতেছে। বাঙলায় মটকার বস্ত্র বহুদূর এইরূপ একটি কল-ভর-বিহীন শিল্প বলিয়া মনে হয়। যে সকল রেশম কোরা রেশম-কাট কর্তৃক বিদীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, মূর্শিবাবাদ চক্ ইশলানপুর প্রভৃতি স্থানে তাহা হইতেই স্বতঃ বাহির করিয়া মটকা কাপড় নির্মিত হইয়া থাকে। এরূপ কাটা Cocoon (কোরা) কারখানার ব্যবহারে আসে না, কিন্তু গৃহ-শিল্পের কল্যাণে সেগুলিও কাজে লাগিয়া যায়। পূর্বে পল্লীগোষ্ঠে বহু স্থলে কাগজ প্রস্তুত হইত। মূর্শিবাবাদ জেলার পুরাতন সরকারী কাগজ-পত্রে দেখিয়াছি, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের কালেক্টারগণ লালবাগের নিকটস্থ চুনাখালির কাগজের ক্ষুদ্র মূর্শিবাবাদের কালেক্টার সাহেবকে মধ্যে মধ্যে তাগিদ দিতেন।

(৩) সম্ভাব্য-প্রকার উপর ছোট দ্রাব্য শিল্পশালাগুলির স্থান যে অনেকাংশেই নির্ভর করিতেছে সে কথা ডাঃ প্রিন্সিপ অবস্থাপন্য সুখোপাধ্যায় মহাশয়ও নিম্নগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার মতে জাপানী শিল্পের উন্নতির কারণ দুইটি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা (১) কর্মসূচীর বক্ষতা ও (২) দেশী পণ্যের উপর শুদ্ধ বসাইয়া সুরক্ষণ-প্রদান (the protection given to them by the state through the system of high tariffs)

এখন চুনাখালি আশ্রয়বাগিচার জন্তাই প্রসিদ্ধ। খুঁজিয়া একজনও “কাগজী” পাওয়া যায় কি না সন্দেহ! অবশ্য ধবরের কাগজ ও ছাপাখানার সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাগজের প্রয়োজনও একপ বাড়িয়া উঠিয়াছে যে শুধু হাতে-তৈয়ারী কাগজে সমগ্র বঙ্গদেশের টান (demand) পূরণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলিয়া হাতে-তৈয়ারী কাগজের বে কাট্টি হইবে না, এ কথা বলা চলে না। মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছি, প্রাচীন শ্রেণীর বোকানদারগণ এখনও দেশী কাগজ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে হিসাবের খাতা বাঁধিয়া হিসাব লেখেন। ঠাহারা বলেন, এ কাগজ কলের কাগজ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখিয়াছিলাম এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণের দেশীয় প্রথাগত প্রস্তুত চিঠির কাগজ ও খাম অমেকেই ব্যবহার করিতেন; এমন কি পুরাতন “ভারতী”র কভারও সেই হরিদ্রাবর্ণের তুলোট কাগজের

দিব্যশ্রীতে-ভূষিত হইত। বিলাতি হাতে-তৈয়ারী চিঠির কাগজ (hand-made stationary) আমাদেও দীর্ঘদিন সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। বিলাতী প্রথাগত অধুনা জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহেরও hand-made paper edition (হস্ত-নির্মিত কাগজের সংস্করণ) হস্ত অল্পদিন মধ্যেই আমাদের পুস্তক-প্রিয় ব্যক্তি-গণের নিকট আদর পাইবে মোটকথা, আধুনিক প্রথাগত আধুনিক কৃতি-অনুযায়ী একপ কাগজ তৈয়ার করার ব্যবস্থা হইলে তাহার বাজার পাইতে বিশেষ ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ প্রকার হস্তশিল্প-সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য ব্যবসায় লাভজনক করিতে হইলে co-operative production বা সমবায় উৎপাদনের সহিত co-operative distribution সমবায় কাট্টি বা বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা আবশ্যিক, নতুবা পাইকার শ্রেণীর (middle man) মধ্যস্তরের লোকই লাভের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া ফেলিবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ঐত্তরঙ্গদাস সরকার।

পল্লী-উৎসব

(চিত্র)

সমুদ্রে ছেলে সমুদ্র তীর বোনের
সুগন্ধবাকী বেলডাঙ্গা গ্রামে বারোয়ারী উৎসব
দেখিতে আসিয়াছে। আজ বেলডাঙ্গা-বাসী
সকলেই আমনে মাতোয়ারা;—একপ্রকার
জ্ঞানশূন্য বলিলেই হয়। আজ গ্রামের জমিদার-
পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চৌকিদার-পুত্র

পর্য্যন্ত সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়াছে।
সকলেই বেশ শক্ত করিয়া “মালকোঁচা”
আঁটিয়া কাপড় পরিয়াছে। কাহারও কাঁধে
“তোষালে”, কাহারও কাঁধে “গামছা”, সকলে
সেই ঢাকের বাজনার সঙ্গে উদ্‌ঘোষের মত
লাফাইতে লাফাইতে, ঠাফুর-বাড়ী হইতে

ঠাকুর আনিতে চলিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধ-সম্প্রদায়, কোন বিষয়ে চোখ-কাণ দিবে ন। পিতার সাক্ষাতে পুত্র মন খাইলেও পিতা সেলান হইতে সরিয়া যাইবেন। আজ কেহই বিতর্কহন্তে নাই; কাহারও হস্তে সত্ত্ব-আহরিত বৃদ্ধশাখা, কাহারও হস্তে তৈলপক ঝটি, কাহারও হস্তে-বা তিন-চারিটা পরিপূর্ণ মদের বোতল।

চারিত্রনের দ্বন্দ্ব একখানি “চেতুর্দোলা” তাহাতে ঠাকুর বাইবে। সকলেই আনন্দে চীৎকার করিতেছে। নেশার কোঁকে কেহই স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, সকলেরই পা টলিতেছে। সকলের চীৎকারে ও ঢাকের গর্জনে এক তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে।

গ্রাম পঞ্চাশ-ষাট জন বলিষ্ঠ পল্লীবাসীর এই উন্মত্ততা দেখিয়া সত্ত্বাবের মুখ শুকাইয়া আসিল। সত্ত্বাব নবানচরের “পলাশীর যুদ্ধ” পড়িয়া মনে মনে তাহার যে ছবি আঁকিয়াছিল, আজ এই পলা-উৎসবের নিকট তাহার সে চিত্র রান বলিয়া বোধ হইল।

ঠাকুর-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য “বান্ধনা” বাধিল।

পুরোহিত-মহাশয় ঠাকুর লইয়া আসিয়া “চেতুর্দোলা” চাপাইয়া দিলেন। ঠাকুর আসিবামাত্র সকলে একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

“বাবু আসছে,” “বাবু আসছে” বলিয়া একটা মত্ত সাদা পড়িয়া গেল। সত্ত্বাব প্রথমে ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না।

তারপর দেখিতে পাইল, অদূরে একজন অতি সুন্দরকার যুবক টলিতে টলিতে আসিতেছে। যুবকের সোন্দর্যো কোথাও খুঁৎ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধব-ধবে ফরসা রং; আকৃতি কিঞ্চিৎ কুণ। গলাটের উপর কুঞ্চিত কেশদাম আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে যুবককে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। যুবকের দিকে একখানি “তোয়ালে” আলুথানু পড়িয়া আছে। পশ্চাতে একজন ঘরবান প্রকাণ্ড একগাছি যষ্টিদ্বন্দ্ব দ্বীরে দ্বীরে আসিতেছে। “অমৃত” অভ্যস্ত মাতাল হইয়াছে দেখিয়া, অমৃতের মা একজন ঘরবানকে তাহার পশ্চাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অমৃত এই বেলডালা গ্রামের জমীদার নসীরাম দত্তের একমাত্র পুত্র।

অদূরে অমৃতসাবুকে আসিতে দেখিয়া পুরোহিত দলের নখা হইতে একজন ছুটিয়া গিয়া, অমৃতকে কাছে করিয়া লইয়া আসিল। তখন আবার একটা বিষম কোলাহল উঠিল।

অমৃতবাবু আসিয়া চীৎকার করিয়া হুকুম দিলেন, “এই, সব চুপ!” দখ অর্ধ-উচ্চারিত হইবামাত্র সেই বিরাট কোলাহল—এমন-কি, শিশুদিগের ক্রন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। সেই উত্তাল তরল-কল্লোলবৎ জন-কলরব অমৃতবাবুর এক কথাতই শান্তভাবে ধারণ করিল।

অমৃতবাবু পুনরায় কহিলেন, “এই, সবাই শোনো,”—মত্ততাহেতু তাহার কণাটা জড়াইয়া বাহির হইল।

সত্ত্বাব ভাবিতে লাগিল, অমৃতবাবু

আসিয়া এ গোল বন্ধ করিয়া দিলেন, হস্ত আর একত্রে এত লোক জড়ো হইয়াছে, এই সুযোগে একটা-কোনো সাধারণ লোক-হিতকর সংকল্পের প্রস্তাবনা হইবে। সম্ভাব্য খুব উৎসাহিত চিত্তে “লেকচারে”র অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় সেই তরুতা ভঙ্গ করিয়া অমৃতবাবু কহিলেন, “দেখ, এখন সব চূপ, আমি বেই বলবো অম্মি সবাই মিলে বাজাবি আর হেইট করে নাচবি।” সুখের কথা শ্রীও বা, কাজেও তাই। সম্ভাব্য বিষয়ে একেবারে আড়ট হইয়া গেল।

ঠাকুরবাড়ী হইতে যে স্থানে গ্রাম্য দেবীকে আনিয়া পূজা করা হয়, সে স্থানটির নাম “পূজাতলা”। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে;—আর তাহার কিয়দূরে বাঁধা বাটওয়ারা এক প্রকাণ্ড পুকুর। সেই বটগাছের চতুষ্পার্শ্ব স্থানটুকু খুবই বিস্তৃত ও পরিষ্কার। বর্ণিত “পূজা-তলায়” আজ বিস্তর লোক জমায়েৎ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেকেই হাতে একটি করিয়া নিরীহ অজ-শিত রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ। অসহায় ও বধ্য অজশিত-গুলি লোকের চাংকারে, প্রচণ্ড জোঁঠ মাসের রৌদ্রের তাপে, আর কামানের জ্বার শব্দারমান “বোমে”র আওতাধে প্রায় মর’মর হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদূরে পৃথক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া জনকতক লোক পড়িয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকেই গায়ে এক-একটা বোতাম-ছেঁড়া পকেট-খোলা গরম কাপড়ের ময়লা কোট; কাঁধে একখানি করিয়া ময়লা শত-ছিন্ন

সুতার চাদর ও হাতে গাটতোলা পাকা বাঁশের লাঠি। তাহাদের লম্বা জুলুপি দিয়া ভৈল করিতেছে। ইহাদের নিকটে একটি বিপুল-শৃঙ্গ বিরাটকার মহিষ বাঁধা রহিয়াছে। মহিষটির পৃষ্ঠদেশে সিন্দূর ও অস্ত্রাঙ্গ কি-সব মাখানো হইয়াছে।

ইহারও কিছু-পূর্বদিকে একটি চায়ী অশ্বখ বৃক্ষের তলে কতকগুলি লোক পড়িয়াছে। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই কপালে সিন্দূর, হাতে দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। ইহাদের নিকটে একটি ক্ষুদ্রকার শূকর-ছানা কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আনপণে চাংকার করিতেছে।

ইহা বাতীত ছাগল ও ভেড়া যে কত আসিয়াছে ও আসিতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

পূজা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় গ্রামের শ্রমসম্মানের দা’ঠাকুর কেদার ভট্টাচার্য আপত্তি তুলিলেন, “রাইচরণ মণ্ডলের পাঠা আমি কিছুতেই উৎসর্গ করব না, কারণ সে আমার অমির জল কেটে নিরেছে। ওকে আতিচ্যুত করব তবে আমার নাম কেদার ঠাকুর।”

এই কথা শুনিবামাত্র রাইচরণ মণ্ডল কান্দকান্দ স্বরে অমৃতবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, “বাবু, আমার পাঠা তো বোধ হয় বলি হন না, তুমি বা হয় করুন আগে।”

অমৃতবাবু বলিলেন, “ওহে রাইচরণ, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। তুমি পাঁচটা টাকা জরিমানা দাও, আমি তোমার পাঠার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।”

এই কথা বলিবামাত্র রাইচরণ অমৃত-

বাবুর পদতলে পড়িয়া টাকা দিতে স্বীকার করিল এবং তাহার মানসিকের পাঠাটির ব্যবস্থা করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। অন্ততবাবু তখনই কেদার ভট্টাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া রাইচরণের পাঠা উৎসর্গ করিবার জন্য হুকুম দিলেন। কেদার ঠাকুর অগত্যা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রাইচরণের পাঠার কাণ ধরিয়া জনের ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ইহার পরই এক নতুন বিপদ বাধিল। গ্রামের দুইপাড়ার ছোটলোকের মধ্যে কাহার পূজা আগে হইবে, তাহা লইয়া মহা হলদুল উপস্থিত হইল। ক্রমে বেধিতে বেধিতে সেই বচসা দাক্ষার পরিণত হইল। দুই পাড়াতেই ছোট লোক বিস্তর, প্রত্যেকেই বেতর ঘাতাল হইয়াছে। সকলেরই হাতে লাঠি। স্ততঃ দাক্ষার অলঙ্ঘন হইবার পক্ষে কোনই সম্ভাবনা নাই। খুব আঁকালো রকমেই দাক্ষা আতঙ্ক হইল।

সন্তোষ আর স্থির থাকিতে পারিল না;—ছুটিয়া গিয়া অন্ততবাবুকে বলিল, “অন্ততবাবু, আপনি বললে এক কথার মিটে যাবে, দাক্ষা মিটিয়ে দিন, নয়ত এখনি একটা খুন হয়ে যাবে।”

অন্ততবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, “মশাই, আপনারা সহরের লোক, আপনারা তো জানেন না, যেটালে চলবে কেন? একটু পাকাপাকি রকম হোক, নইলে—” কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দাক্ষার মধ্য হইতে, বলিষ্ঠকার ঘন-মুষ্টি এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া অন্ততবাবুর

পদতলে পড়িয়া বলিল, “বাবু, হুকুম দিন।”

এই ব্যক্তির সর্বাঙ্গে রক্তের ধারা ছুটিতেছে;—পরিহিত বস্ত্রখানির গ্রাণ বারোআনা রকম রক্তে লাগ-টকটকে হইয়া গিয়াছে;—মাথার একঝারিয়া কাটিয়া গিয়া, রক্তের ধারা কপাল বহিরা টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

সন্তোষ ইহার পূর্বে, এমন দৃশ্য কখনও চক্ষে দেখে নাই। “ভি, এল, রাঘের” নাটক দেখিবার সময় এক একবার “রক্ত” “রক্ত” বলিয়া চীৎকার শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ভীষণ রক্তারক্তি যে কি, সে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। আজ চোখের সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুক কেমন ধড়কড় করিতে লাগিল।

আজ রাতে বাক্স পোড়ান হইবে। দাক্ষার পর হইতে “ভুবড়ি”, “বোম”, “হাউই” “আকাশভাঙ্গা” প্রভৃতি ব্যক্তিগণিকে ধবাস্থানে রাখা হইতে ছিল। প্রতি বৎসরই এই বেশভাঙ্গার ব্যোয়ামি পূজার বাক্স পোড়ানো উপলক্ষে পুলিশ মোতায়েন থাকে। পুলিশ আর কেহ নয়,—গ্রামেরই নিতাই হাড়ি চৌকিদার, পলাশপুরের ভ্রাম্যামস্ত দক্ষাধার, আর ঐ গ্রামেরই হরি দাঙ্গা কনটেবল।

তাহারা পোষাক পরিয়া বস্ত্রভঙ্গ লইয়া সেখানে আসিয়া ঝাঁড়াইল। তাহার পর অন্ততবাবু এখন বলিলেন, “হ্যা রে, তোরা কি অগ্নি করে রাত রাত ঝাঁড়িয়ে থাকবি? খোলসগুলো ছেড়ে ভুবড়ি-টুবড়ি

বয়ে সিঁগে যা না।” অমনি অবিলম্বে চৌকিদার, দফাদার ও কনষ্টেবল স্ব স্ব পোষাক ছাড়িয়া সকলের সঙ্গে বাক্সন বহিতে শুরু করিল।

সন্তোষ এই সব দেখিতেছে এমন সময় একজন লোক সন্তোষের সম্মুখে আসিয়া বলিল, “বাবু, লাচ দেখবে?” বলিয়াই সে বিকট ভাণ্ডে আরম্ভ করিয়া দিল। সন্তোষ ত দেখিয়া অবাক! এই ব্যক্তিকেই যে কাল সে এক মজলিসে বেশ ভদ্রভাবে কথা কহিতে দেখিয়াছে; আর আজ মাতাল হইয়া সে “লাচ” দেখাইতে আসিয়াছে!

কণপরেই গ্রামের ধারে মাঠে, এক প্রশস্ত জায়গায় বাজি-পোড়ানো আরম্ভ হইল। বোমগুলি বোম বিদীর্ণ করিতে করিতে বেশ ভীষণ প্রাণের আশার কাটিয়া পড়িতে লাগিল। এক-একটা তুবড়ি অগ্ন্যুৎসারী পর্বতের স্তার অজল অগ্নিকণা ভীত হুৎকারে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একটা “আসমান-তারা” সিংহের কোলে প্রধাবিত হইয়া নিম্নের অন্তর-পোষিত অগ্নি-ফুলিঙ্গগুলিকে ছড়াইয়া দিয়া একটা দান হাতের কৌণ ভ্রোড়িতে গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিতে লাগিল।

এই সমস্ত দৃষ্টে সন্তোষ তন্ময় হইয়া ছিল; এমন সময় একটা চীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল;—সে দেখিল, গ্রামের মাঠের দিকের একখানি কুঁড়েঘর ধূ-ধূ অগ্নিয়া উঠিয়াছে। সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া মুহূর্তের ভিত্তর সন্তোষের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট

হইবামাত্র এক বিকট চীৎকারধ্বনিতে সারা গ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিল। সকলেই “আন জল” “চাল জল” শব্দে চীৎকার করিয়া দৌড়িল। জনতার মধ্য হইতে জ্বর ডোম এক লম্ফে, সেই উত্তালতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রবৎ শেলিহান-ঝিল্ল অগ্নি-মধ্যে পতিত হইল এবং বিপুল বিক্রমে অগ্নিরাশিতে জল ঢালিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল অগ্নির বিক্রম অপেক্ষা জ্বরের বিক্রম অনেক বেশী। নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কলসী ভরিয়া সকলে জ্বরকে জল যোগাইতে লাগিল, জ্বর “মটকা” হইতে হড়হড় শব্দে জল ঢালিয়া অগ্নি নির্মূল্য করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অগ্নি নির্মূল্য হইয়া আসিল, তখন সকলে একসঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

পরদিন সন্তোষ বাড়ী কিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় তার বোন নীহার বলিল, “দাদা, তুমি আজ বাবে বলছো বটে, কিন্তু আর একদিন থাকলে ভাল হত। কাল অসুতবাবুর সখের মনের ঘাতা হবে।”

সন্তোষ কহিল, “সখের দল কেমন অভিনয় করে?”

নীহার বলিল, “অভিনয় করে মন্দ নয়, তবে বড় বেশী গোল করে। এমন-কি সময়ে সময়ে হাঁক-ডাকের চোটে পালা ভেঙ্গে যায়।”

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, “বটে, তাহলে অভিনয় হত হোক আর না হোক মজা দেখবার অন্তে আমার থাকতে হবে!”

অসুতবাবুর বৈঠকখানাটি বেশ সুন্দর

সাজানো। ঘরের বাহিরে চারিধারে জাকরির বেড়া দেওয়া স্থলবাগান। বাগানটি বেশ মনোরম। ঘরের ভিতর একধারে তিনটি আলমারি পুস্তক-ভরে প্রসীড়িত। অল্পধারে সাত-আটটি কাঠের সিন্দূকে যাত্রার দলের সাল-পোষাক। বাস্তবস্থ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সন্তোষ ঘীরে ঘীরে গিয়া বৈঠকখানার উঠিল। ঘরের ভিতর অনেকগুলি লোক বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। সন্তোষকে আসিতে দেখিয়া সকলেই চূপ করিল। অমৃতবাবু তাকাতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সন্তোষের হাত ধরিয়া বলিলেন, “আহুন মশাই, আপনি যে আবার এই “ন চ্যাংডার” অড্ডার পদার্পণ করবেন, এটা তাবিনি।” সন্তোষ অমৃতবাবুর এই নিরঙ্কর আলাপে বিশেষ তুষ্ট হইল। উভয়ে দুইবারি চেয়ারে উপবেশন করিলে, সন্তোষ কহিল, “মশাই, আজ আমি বাচ্চিলুম, তবে শুনলুম যে আপনাদের সখের যাত্রার দলের অভিনয় হবে, শুধু তাই শোনবার আগ্রহে আজকের দিনটা থেকে গেলুম। আর আমার ভদ্রীও তাই আজ যেতে দিলে না।”

অমৃতবাবু সহাস্ত বসনে কহিলেন, “মশাই, আপনার ভদ্রী যে আমার দিদি হন। দিদি আমার তাইয়ের মনের কথা বুকেই আপনাকে যেতে দেননি। আপনি তো কলকাতায় কত বড় বড় অভিনয় দেখেছেন, আর আজ এখানে আপনাকে এক নূতন অভিনয় দেখাব—”

সন্তোষ কহিল “আপনাদের এ সমিতি কি রকম?”

অমৃতবাবু উচ্চহাস্ত করিয়া বলিলেন, “মশাই! এ সমিতি-টাইতি কিছুই নয় এর নাম হচ্ছে “ন বিভ্রাটের সখের দল”।”

সন্তোষ বিশ্বয়ের সহিত বলিল, “আবার কি?”

অমৃতবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “তবে শুনুন, সখের দলে স্বভাবত ন’টি করে বিভ্রাট ঘটে থাকে। প্রথমতঃ—গোপ-বিভ্রাট—অর্থাৎ কেউ জী-লোকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ—“পাট-বিভ্রাট”—অর্থাৎ কেউই হুমান কি রূপ ব্যক্তির ভূমিকার নামতে চায় না। তৃতীয়তঃ—“পোষাক বিভ্রাট”—অর্থাৎ সখের দল, কেউ কারও মাইনে খায় না, সকলেরই ইচ্ছা, নতুন পোষাক পরে অভিনয় করে;—বিশেষতঃ “টেল’ বা পূর্ন-আচ্ছাদনীর উপর অনেকেরই লুক দৃষ্টি। চতুর্থতঃ—“সম্বন্ধ-বিভ্রাট” অর্থাৎ কারও হরত সহোদর ভাই, তার স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকার “নাথ” “প্রিয়ভগ্ন” ইত্যাদি সম্বোধনে রাজি নয়। পঞ্চমতঃ—“ভূমিকা-বিভ্রাট” অর্থাৎ যারা নাট্যেকান্ত যুদ্ধান্তে জরী হবে, যেমন অর্জুন, ভীম, রাম ইত্যাদি, সকলেরই সেই ভূমিকা নেবার ইচ্ছা। ষষ্ঠতঃ—“শ্রোতা-বিভ্রাট”। এ গ্রামের দল শুনে কেউ গুনতে দাবে না, অনেককে খোসামোদ করে, সম্ভব হলে ধমক-ধামক দিয়েও আসরে বসাতে হবে। সপ্তমতঃ—“মস্ত-বিভ্রাট”। কেউ বলবে আমি পেলুম না, আবার কেউ বা বসি করতে থাকবে। অষ্টমতঃ—“উচ্চপদ-বিভ্রাট”—দলের বাকী দার হইতে গ্রহণ অথাক পর্যন্ত সকলেরই

ইচ্ছা প্রোগ্রামে “অমুক নাট্যর” বলে বেন তার নাম ছাপানো হয়। নবমতঃ “হঁকা-বিভ্রাট”—এর মধ্যে আবার দল্যদলি আছে, কেউ তামাক খেতে পেলে না, আবার কেউ-বা চক্কির ঘণ্টাই হঁকোর মুখ বুড়ে রইল। ফলে “হঁকো!” “হঁকো!” বলে এক তুমুল কোলাহল হয়ে উঠে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।” এই কথা বলিয়া অমৃতবাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বারোয়ারিতলার আটচালাখানিকে যতদূর-সম্ভব সাঝানো হইয়াছে। দুই-একটা গ্যাসের কাড় শ্বেত-বর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। আর কিছুক্ষণপরেই বাত্মা আরম্ভ হইবে। গৃহস্থেরা সকলে ঘে-বাহার গৃহকৰ্ম তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতেছে। সন্তোষ সন্ধ্যার পর চা পান করিয়া নীহারকে বলিল, “আমরা সকলেই বাত্মা শুনেতে যাও, তাহলে ঘরে কে থাকবে?”

নীহার কহিল, “কে আবার থাকবে? এখানে সহরের মত চোরের ভর নেই, তিনদিন বাড়ীতে না থাকলেও কেউ এক-গাছি কুটো নাড়বে না।”

সন্তোষ প্রথমে বারোয়ারি-তলার গমন করিল। সন্তোষ বাইবামাত্র দলস্থ সকলে অতি সমাদর করিয়া তাহাকে আসরের মাঝে বসাইল। অনতিবিলম্বে একটি সুগন্ধ ধূমোপায়ী বিরোটোদর হঁকা আসিয়া সন্তোষের নিকটে থানিকটা আয়গা দখল করিল। সে ইহা রূপরে পড়িয়া গেল।

একধারে থানিকটা প্রশস্ত আয়গা চিক

দিয়া ধেরা। ত্রীলোকেরা একে একে আসিয়া তাহার মধ্যে আয়গা করিয়া লইল। অনতিবিলম্বে চিকের মধ্য হইতে শিশু-ক্রন্দন স্বকৌশল মাতৃ-আগমনবার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দুই-একজন লোক “ওগো, ছেলে থামাও না গো!” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে “আথড়াই” বামনা আরম্ভ হইল।

অমৃতবাবু সন্তোষের নিকট আসিয়া বলিলেন, “মশাই, অভিনয় যে কেমন হবে তা বোধ হয় বুঝতে পারছেন? শিশুর রোদনে ঘর প্রস্তাবনা, তার উপসংহারে বুঝি বুড়ো পর্যন্ত কাঁদবে!”

সন্তোষ উচ্চহাস্তে বলিল, “না, না, আমার বোধ হয় অভিনয় খুব ভালই হবে!”

অমৃতবাবু বলিলেন, “তবে আপনি বহু, আমি ততক্ষণ বেশকায়ী কাৰ্য্য করিগে।”

গতকলা সমস্ত রাত্রি আগিয়া বাত্মা শুনিয়া, আজ সারাদিন ঘুমাইয়া, বৈকাল বেলা কতকগুলি লোক এক আয়গার আসিয়া জড় হইল। অমৃতবাবু পূর্ণ হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলে নানাকল্প খোসগল্প করিতেছে, এমন সময় ধীরে ধীরে সন্তোষ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমৃতবাবু সামনে সন্তোষকে বসাইয়া বলিলেন, “মশাই, কাল কেমন কেলেঙ্কারি দেখলেন?”

সন্তোষ কহিল, “কেন, কেলেঙ্কারি কেন? অভিনয় তো মন্দ হয় নি। যে লোকটি “বদন্ত” সেজে ছিল, আর যে স্বর্ণের

“দেববালা” সেজে নেচেছিল তারা ত হুজন
বেশ পাকা লোক।”

অমৃতবাবু বলিলেন “সন্তোষবাবু,
আপনি এখনও ছ’-একদিন থাকবেন তো?”

সন্তোষ শশবাস্ত্রে বলিল, “ছ’-একদিন
কি মশাই! অনেক পূর্বেই যেতুম, কেবল
আপনার ব্যাটার অভিনয় দেখবার জন্মেই
রইলুম, আর সেরি করব না।”

অমৃতবাবু সন্তোষের হাতখানা চাপিয়া
ধরিয়া বলিলেন, “না, মশাই! আমার
অহুরোধ, আর একদিন থাকুন, আমি
নীহার-বিদিকে বলে দিচ্ছি, তিনি যেন
কিছুতেই না ছাড়েন!”

সন্তোষ ভাড়াভাড়ি অমৃতবাবুর হাত
ছাড়াইয়া কহিলেন, “করেন কি মশাই!”

অমৃতবাবু বলিলেন, “কাল আমাদের
বাড়ী ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে, আপনাকে
ধাকতেই হবে। আপনার মত একজন
বিচক্ষণ লোক থাকা চাই-ই চাই!”

বেলা তখন প্রায় তিনটা, চারিধারে
রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মাটি তাতিয়া লাল
হইয়াছে, নরপথে স্তম্ভিকা স্পর্শ হইবামাত্র
তৎক্ষণাৎ ঘরগা হর। এমন সময় ব্রাহ্মণদের
ভাক পড়িল। ক্ষণপরে ভ্রাম ভট্টাচার্য, রাখাল
মুখ্যো, প্রসন্ন সামন্ত, ভূতনাথ হালধার,
কালিদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি মাতব্বর-মাতব্বর
ব্রাহ্মণবর্গ, যুবক-সম্প্রদায়, বালকমণ্ডলী, এবং
অন্যান্য চৌদ্দবংশসম্ভবন্তা বালিকা, প্রত্যেকেই
এক একটি ঘটি হস্তে আসিতে আরম্ভ
করিল।

সংখ্যায় প্রায় একশত আন্দাজ ব্রাহ্মণ
সমবেত হইলে, দুইশত আন্দাজ পাতা বাহির

হইল, তথাপি কুলান হর না। সন্তোষ
অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, “মশাই,
ব্যাপার কি?”

অমৃতবাবু সুখে একখানা কমাগ জড়াইয়া
ঘর্ণাস্ত্র কলেবরে বাতিবাত্ত হইয়া বেড়াইতে
ছিলেন; সন্তোষের কথায় ক্ষণেক থামিয়া
বলিলেন, “আপনি একবার গিয়ে দেখে
আনুন।”

ইত্যবসরে তিন-চারিজন গোয়ালী দধি
ও ক্ষীরের বাঁকস্বন্ধে প্রবেশ করিল।

অমৃতবাবু আসিয়া বলিলেন, “সামন্ত-
মুখো, রাখাল দা, আপনারা দই-ক্ষীরগুলো
“কুং” করে নিন।”

সন্তোষ বিশ্বম্ভের সহিত বলিল,
“কাকে বলে?”

অমৃতবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,
“ওটা আন্দাজেরই নামান্তর।”

সন্তোষ বলিল, “কেন, আন্দাজ করবার
দরকার কি? ওজন করে নিন না!
এর পর জিনিষ কুরোলে পাত্রগুলি ওজন
করে “কড়তা” বাদ দিলেই চলবে।”

“নাহে ছোকরা! তুমি ধামো, এখুনি
সব হবে।”

সন্তোষ পশ্চাত্তাপে চাহিয়া দেখিল, বিরাট
হঁকাহুড়ে সামন্ত মুখো ও মুখ্যো ঠাকুরের
দল আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রাখাল মুখ্যো একটি ক্ষীরের হাঁড়ি
হাতে করিয়া বলিলেন, “কত বে?”

স্বধাময় গোয়ালী কহিল, “আজ্ঞে এক
বোন চার সের।”

রাখাল মুখ্যো একটু হাসিয়া উচ্চ-
আঙুরায়ে কহিলেন, “ওরে, তুই তো সেই

বেহারের বেটা, তোর আবার নাম-দস্তুর কি ?
বাটা পেনাদ পেয়ে বা ।” তারপর গম্ভীর
ভাবে বলিলেন, “লেখ হে ! বত্রিশ সের ।”

স্থায়ী হাত জোড় করিয়া কান-কান
ঘরে বলিল, “মশাই, মারা বাব, দোহাই
মশায়, গলায় পা দেবেন না ।”

স্থায়ী ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্তোষ কহিল,
“রাখালবাবু, ওতে যদি না বেশ, তবে না
হয়——”

প্রশ্ন সামস্ত গর্ভাকীত মুখে বাড় নাড়িয়া
কহিলেন, “বাবু, সামস্তর কলম একপাই
নড়-চড় হবে না ।”

পরক্ষণেই আর একটি হাঁড়ি পূর্বোক্ত
প্রকার কামাটাটিতে “কুৎ” হইয়া গেল ।
এই প্রকারে অনেকগুলি হাঁড়ি ওজন হইল ।
সব-শেষে একটি হাঁড়ি কুত্তের সমস্ত
রাখাল মুখ্যে বলিলেন, “সাদে বাইল সের ।”

সামস্ত বলিলেন, “না, ন’ একুশ সের ।”
ইহা লইয়া উভয়ে ভীষণ বচসা আরম্ভ হইল ।
ক্রমেই মাজা বাড়িতে লাগিল । শেষে
উভয়েরই ক্রমিত কথকিং-সত্য মুষ্টির ভিতর
হইতে নৈসর্গিক পল্লী-স্বলভ স্বভাবমুষ্টি
বাহির হইয়া পড়িল ! বেছুট গালাগালি ! তার
পর সামস্ত খুঁড়া রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে
কহিলেন, “তোকে যদি সমাজ থেকে রহিত
কর্তে না পারি, তবে আমার নাম প্রসন্ন
সামস্ত নয় ! তাহলে আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি
• • • • ।” এই বলিয়া রাগে পর-পর
করিতে করিতে লাঠি ঠক-ঠক করিয়া তিনি
বাহির হইয়া গেলেন ।

সন্তোষ তেঁও একেবারে অবাক !

অমৃতবাবু বলিলেন, “বাবু, বা হবার

হয়ে গেল, এখন উপস্থিত যে ক’জন
ব্রাহ্মণ আছে, তাদের খাইয়ে দেওয়া
হোক ।”

সন্তোষ দেখিল, এক ব্যক্তির পাশে
একখানি পাতা অনর্থক পড়িয়া রহিয়াছে ।
সেখানি যেমন কুড়াইয়া লইতে বাইবে, অমনি
তৎপার্ষ্ণ্য ব্যক্তি বলিল, “মশাই, ওখানি
“ক্রোড়পত্র”, ওখানি আর নিরে কাজ নেই ।”
ওদিকে লুচি আসিতে আরম্ভ হইল ।
প্রথমত একবার তাঁতবেগে বন্ধন-কার্য চলিতে
লাগিল । অনেকটী বলিল, “আমি লুচি
খাব না, অসুখ করেছে । কেবল ক্ষীর
আর সন্দেশ খাব ।” কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল,
প্রত্যেকেরই অসুখ বেশ আশ্চর্য্যকর
সারিয়া গিয়াছে ! এক একটি ছোট ছোট
ছেলে আনিয়াছে, তাহাদের “কড়তা” বাদ
যার না, প্রত্যেকেই এক একটি প্রকাণ্ড
“বাইরে” ।

সন্তোষদের কলেজে সুরেন নামে একটি
ছাত্র পড়িত, সে প্রায় বার-তেরখানি লুচি
খাইতে পারিত বলিয়া বন্ধ-মহলে খাইয়ে
বলিয়া তাহার বেশ একটু পশার-প্রতিপত্তি
ছিল । কিন্তু এখন সন্তোষ দেখিল, এই
সমাজের এক একটি বালকই সুরেনের
পুণ্যপাণ পিতামহ !

ভোক্তা-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে রাম
ভট্টাচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, “হা হে শব্দী
ভাষা ! এই সন্দেশটা তোমার কেমন
লাগলো ? বলতে পার এর দর
কত ?”

শব্দী বাঁড়ুয়ে বলিল, “আন্দাজ, সাদে
সাতাশ টাকা ।”

রান ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞতার চালে বলিল, “নাহে, ছাব্বিশ টাকা সাত আনা।”

সত্তোষ তাড়াতাড়ি বলিল, “থাক, আর আশ্রমে কাজ নেই, এখনি তো ফৌজদারী বাধবে? আপনারা একটা গল্প শুুন,—‘একজন লোহার মিস্ত্রীর কাছে এক ছাত্র কাজ শিখতে আসে। ছাত্রটি অতিরিক্ত বেধার গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কুর্তবৃত্ত চল, এমনকি গুড়কেও ছাড়িয়ে উঠল। মিস্ত্রীর কিন্তু তা নিতান্ত অলঙ্ঘ্য বোধ হতে লাগল। একদিন ছাত্রটি এক নতুন ধরণের কল তৈরি করে সেটা নিয়ে বাজারের সামনে দিবে বাচ্ছিল;—

সামনে গুরুজিকে দেখে প্রণাম করে বললে, “আমি, কেমন একটা নতুন কল তৈরি করেছি, দেখুন।”—কল দেখে মিস্ত্রীর মুখ শুকোল; তখন সে এক বুদ্ধি খাটিয়ে বললে, “দেখ ঐখানটা একটু বাকা হয়েছে, আচ্ছা, আমি দেবে দিচ্ছি।” এই বলে বাজার-করা গামছার ভিতর থেকে একটি “মুলা” বার করে লোহার গারে ছুটো বা দিবে বললে, “এইবার নাও।” ছাত্রটি হেসে বললে, “মুলাটার পান আচ্ছা শক্ত ত?” গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। তার পর বখালময়ে ভোজন শেষ হইল।

ঐতর্য্যাপদ সুখোপাধায়।

বর্তমান ভূগোলের দিগ্‌দর্শন

ভূগোল এখন আর উপেক্ষিত ইয়ুনের পাঠ্য বিষয়মাত্র নহে, আধুনিক জীবন-সমস্তার অনেক কথাই এখন ভূগোলের কেন্দ্রে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সভ্যতার বিকাশ ও পরিপুষ্টির অনেক তর ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহার গবেষণার ক্ষেত্র এখন বহু সমিতি ও বিভাগ সভ্যদেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইয়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সুদীপণ এ বিষয়ের আলোচনার ব্যাপৃত হইয়াছেন। জীবনযাত্রার সহিত যে বিভিন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহার আলোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এ প্রবন্ধে ভূগোলের সহিত

সভ্যতা-বিকাশের সম্বন্ধের বিক্ষিপ্ত আভাস দিব মাত্র।

বাণিজ্য-সর্বস্ব ইয়ুরোপীয় জাতির উন্নতির মূল কারণ অসুসন্ধান করিলে ভৌগোলিক সংস্থানই সর্বোপযোগী পৃষ্ঠপোষক পতিত হয়। সেই সুদূর অতীত কাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ভৌগোলিক আবেষ্টনই (Environment) ইয়ুরোপীয় জাতির উন্নতির পথনির্দেশ করিয়া আসিতেছে। ইয়ুরোপীয় উন্নতির প্রথম উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, ভূমধ্যসাগরের চতুর্দশ হইতেই প্রধানতঃ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার কারণ স্পষ্টকাল

চিত্রা = করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। যে সকল দেশ সাগরের উপকূলে বিস্তৃত ও সহজে সমুদ্রপথে অস্বাভাবিক দেশ-সকলের সহিত মিলিতে পারিত, সেই সকল দেশই সকল জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থা কি দেখিতে পাই! গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিবেষ্টিত, সমুদ্র আশ্রয় খণ্ড খণ্ড ভাবে উহার স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীসের স্তায় শতধা-বিভক্ত উপকূল ভূমধ্য-সাগরবর্তী আর কোন ভূখণ্ডেরই নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে যে অসুবিধা, তাহা একটা সর্ববাবী সন্মত সিদ্ধান্ত। এই অবস্থার বশবর্তী হইয়াই গ্রীকগণ একদিন ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আদি প্রস্রবণ ছুটাইতে পারিয়াছিলেন। এবং সেই কারণেই গ্রীস ভূমণ্ডলদ্বারা কিছুদিনের জন্য বাধীন চিত্রা, বাধীন বাণী, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক উন্নতির কেন্দ্র হইতে পারিয়াছিল। গ্রীসের পর ইয়ুরোপে ইটালীর অনুদয়। দেখিতে পাওয়া যায়, ইটালী ভূমধ্যসাগরের অপেক্ষাকৃত মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত, এবং সেই কারণে পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশসমূহের গমনাগমন-স্থল হওয়ার ভূমধ্যসাগরের অস্বাভাবিক জাতি সকলের মধ্যে সে একাধিপত্য করিতে পারিয়াছিল। কিলিসিয়ার বণিকগণের একান্ত অধাবণায় সবেও, উক্ত দেশের বাণিজ্য কিছুকালের জন্য বাধা ভুগিয়া দাঁড়াইলেও, পরিশেষে রোমের সহিত সমন্বয় করিতে পারে নাই। কার্বেল ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা

দইরা লাটিন জাতির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রতকার্য হইতে পারে নাই। অতএব দেখা, বাইতেছে, প্রাচীনকালের রোমকগণের শক্তির প্রাধান্য তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক তেজেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নাই, দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপরও যথেষ্ট নির্ভর করিয়াছিল।

পরবর্তী সময়ে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্যের মূলও প্রাকৃতিক অসুবিধা অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সও আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। স্পেন দেশও দুই সাগরের উপকূলবর্তী হওয়ার স্পেনিয়ার্ডগণ দুই সাগরে সহজে কার্যক্ষেত্রে বিস্তৃত করিতে পারিয়াছিল এবং বণিকজাতিগণের মধ্যে কিছুদিনের জন্য আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সাগরের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ হওয়ার স্পেনকে ইউরোপের অস্বাভাবিক অংশের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে হইয়াছিল, সুতরাং স্পেনের ভাগ্যে ফ্রান্সের মত অপেক্ষাকৃত মধ্যদেশবর্তিতার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই।

এইবার জার্মানীর কথা ধরা যাক। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সুবিধাবশতঃ জার্মানীর পক্ষে ইয়ুরোপীয় ভূখণ্ডের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পক্ষে সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জার্মানীর রাষ্ট্রনৈতিক অন্তর-বিরোধ উহার ভৌগোলিক সম্বন্ধিত সুবিধাগুলি বহুকাল পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। পরে যখন জার্মানী ধীরে ধীরে সুগতিত একটা মিলিত জাতিতে পরিণত হইল, তখন এই প্রাকৃতিক সুবিধাগুলি তাহার বিবিধ উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। বর্তমান

অগতে তাই আশ্চর্য্য একটা অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য।

এই সকল উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃতিক অবস্থা জাতিসমূহের উন্নতির প্রধান সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে। উল্লিখিত সাধারণ তথ্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া অবশ্য বিশেষ অতুসন্ধান-কার্য্যও চালিত হইতে পারে। বহু শতাব্দী ধরিয়া কোন কোন জাতি কি কারণে উপনিবেশ রক্ষা করিয়াছিল এবং কি কারণেই বা অপরা জাতিসমূহ উপনিবেশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, এ সকল প্রশ্নের সীমাংসা ভৌগোলিক জ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই হইতে পারে না। ঐক্যগণ যে কারণে উপনিবেশ স্থাপনার অভিমাত্র ব্যাপৃত হইতেন, তাহা ভূমধ্যসাগরের মানচিত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। যখন ইউরোপীয় জাতিসমূহের উপনিবেশ স্থাপনকার্য্য ভূমধ্যসাগর ছাড়াইয়া বহির্দেশে বিস্তৃত হইল, তখন ভূমধ্যসাগরের

তীরবাসী কোন শক্তিই মহাসাগরে উপনিবেশকার্য্যতৎপর জাতিসমূহের সহিত তুল্যমানরূপে দণ্ডারমান হইতে পারিল না। ইটালী অবশ্য কখনও উপনিবেশ রচনা-কার্য্যে যোগদান করে নাই। কিন্তু ক্রুজ ক্রুজ বেশ,—বধা, পোর্টুগাল, হল্যান্ড ও বেনমার্ক নৌবহরক সমৃদ্ধিতে বলশালী থাকার বহু ঔপনিবেশিক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিল। ঔপনিবেশিক রাজ্যবিত্ত্যের চরম দৃষ্টান্তস্বল অবশ্য ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি অবশ্য উপনিবেশে। চারিদিকে সাগর ও তীরে তীরে বড় বড় বাণিজ্যবন্দর থাকার অবশ্য ইয়ুরোপের মূল ভূখণ্ডের নিকটবর্তী হওয়ার ইংলণ্ডের সমৃদ্ধে দাবতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভৌগোলিক অগ্রকূল অবস্থার শালিতপালিত হইয়া ইংরাজগণ আজ নৌবিত্তা ও বাণিজ্যের সাহায্যে অগণ্য জুড়িয়া আত্মপ্রাধাত্য বিস্তার করিতেছেন।

ঐক্যাবনন্দে ভট্টাচার্য্য।

অভাব ও প্রতিকার

(ক্রেপটকিন হইতে)

অনেকে মনে করেন যে, প্রত্যেক সম্ভবের একটি করে' সাধারণ পাকশালা স্থাপন করা উচিত; প্রতি বাড়ীতে পৃথক রন্ধনের ব্যবহার করে তাতে খাদ্য, আলানি সামগ্রী ও পরিশ্রম কিছু কম হবে এবং

সময়ও কিছু বাঁচবে। এ ব্যবস্থা অনেক দেশে অনেকবার হয়েছে এবং সফলও যে ফলে নিতানয়; কিন্তু এটা আমাদের জনসাধারণের উপর চাপাতে চাই না, আমাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপরই এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে;

এ-সম্বন্ধে ভাল ব্যবস্থা বাই হোক, সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করে' নেবে,—কারণ কোন-রকমে তাদের স্বাধীনতার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না। পুরণের কাপড়, শরনের ঘর ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ সম্বন্ধে তারা ইচ্ছামুখ্যরী ব্যবস্থা করবে; অবশ্য, এটা যেন কেউ মনে না করেন যে, প্রত্যেকে নিজের ক্ষেত্রে ভালটি বেছে নেবে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় না, এবং এবার তাদের বোলাই যে ইতিহাস ভিন্ন পথে যাবে তাও আমরা বিশ্বাস করি না। বলাবাহুল্য, এটা মনে রাখা উচিত যে, অনভ্যন্ত পথে বাবার দক্ষণ যদি কান্ডর কিছু ভুলচুক হয় তবে সেন্সভ গেই-ই দায়ী—যদিও সে ভুল শুধরাতে সে ধেরি করবে না।

জনসাধারণের চিন্তার শরীয়া দ্বারা লক্ষ্য করেছেন তারা জানেন যে, বাসগৃহসম্বন্ধে তাদের ধারণা একটা নির্দিষ্ট মতে এসে পৌঁছেছে। এতদিন বাড়ীর মালিকই বাড়ীর স্বত্বাধিকারী বলে' রাজশক্তির কাছে সম্মান পেয়ে এসেছে, কিন্তু জনসাধারণ এখন সে-কথা আর মানতে চায় না। এ মতটা কেউ তাদের উপর জোর করে' চাপায়-নি—তাদের মন থেকেই এটা উঠেছে। কেউ তাদের বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, দ্বার সম্পত্তির স্বত্ব গৃহ-অধিকারকে বোঝায়। মালিক বাড়ী তৈরি করে-নি—ছুতারের বোকানে, ইটের ক্ষেতে, কারখানার সামান্য মজুরীতে পরিশ্রম করে' অসংখ্য লোক বড়ী গেঁথেছে, সাজিয়েছে, বাসযোগ্য করেছে। এর পিছনে যে যেটা টাকা খরচ হয়েছে সেটাও মালিকের

প্রমসজ্ঞাত নয়—কর্মী-সাধারণকে জায়া প্রাণ্য থেকে বধেই পরিমাণে বঞ্চিত করে' এই টাকা সঞ্চিত হয়েছে; কালেই মালিকের অধিকার যে কতটুকু তা সকলেই বুঝতে পেরেছে সে বাস করে বলেই বাড়ী তার, এ কথা গায়ের জোরে বলা যেতে পারে, কিন্তু সভা মানুষ গায়ের জোরে সব কাজ করে না, কারণ তাহলে তাকে আবার বর্ধরতার কিরে যেতে হবে।

গ্রাম ও সহরের পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি করতে কত লোকের বৈহিক পরিশ্রম ও মানসিক উৎসেগ খরচ হয়েছে, কিন্তু একজন বা একজন মাত্র লোক যে তার ফলভাগী হবে, এ কথাটা সভা মানুষের মুখে ভারি অদ্ভুত বলে মনে হয়; নিত্যন্ত অবিচার না করে' কেউ এর ছোট হানটুকু আত্মসাৎ করতে পারবে না। সহরের বড় বড় অট্টালিকা থাকতে কর্মী-সম্প্রদায় এতদিন চূর্ণক আবর্জনার কুটীরে বাস করেছে এবং তাদের সামান্য আয় থেকে অশনবসনহীনতার কষ্ট স্বীকার করে ও মালিককে কয় ঘুগিয়েছে; আমাদের ঈপ্সিত পরিবর্তনের কালে এ অবিচারের মূলোচ্ছেদন হবে, নিশ্চয়। কার্যকরী-সমিতি বা শিওরীবাজ দাবারি দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না-রেখে জন-সাধারণের কাছে এ-কথা প্রচার করতে হবে এবং যখন সকলের মনে ধারণাটা বেশ বহুমূল হয়ে উঠবে, তখন আমাদের কাজ বিনা-বাধার সম্পূর্ণ হবে। যারা মালিকদের ক্ষতিপূরণের বা তৎসম্পর্কীয় কথা নিয়ে চাৎকার করবে তাদের কথার কর্ণপাত করবার কোন ধরকার দেখি না—

ক্ষতি বা করবার তারা তা করেছে, এবার তার শেষ হবে।

এখন প্রশ্ন এট, 'কেমন করে' এই চিন্তাকে কাজে প্রকাশ করা যায়? আমরা বিশ্বাস করি জনসাধারণের মানসিক ও নৈতিক শক্তির সাহায্যে এটিকে সম্পূর্ণ বাস্তব করে' তোলা যায়, তাছাড়া অন্য কোন শক্তির উপর নির্ভর করলে ফল ত হবেই না বরং অপকারের সম্ভাবনাই যথেষ্ট। এবিষয়ে আমরা কোন বিশেষ বিধি নির্দেশ করব না বা কোন খুঁটিনাটির তর্ক তুলব না, কারণ কার্যক্ষেত্রে এর-চেরে সুন্দর ও সহজ নিয়মে অনেক বড় কাজ সাধিত হবে; আমরা কেবল একটা আভাস দিতে চাই।

যাঙ্গলংগ্রেহে স্বৈচ্ছাসেবক দল বা করবেন, গৃহ-অধিকারসম্বন্ধে সেই একই কথা। তাঁদের তালিকার সহরের সমস্ত বাড়ী ও প্রত্যেক বাড়ীর ঘরের সংখ্যা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের সংখ্যাও সংগৃহীত হবে। প্রতি পল্লীতে একটি করে' দল গঠিত হবে এবং প্রত্যেক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ থাকবে, তাহলে কাজটা সম্বর সম্পূর্ণ হবার যথেষ্ট সুবিধা হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেলে দেশের লোক নিজেদের দরকারমত ঘর দখল করবে—মারামারি না করে'ও শান্তি ও সম্ভাবে কাজটি চলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, তাহলে ত সবাই ভাল ঘর বা বেশী জায়গা চাইবে!—না, জনসাধারণের মনের খবর ধারা রাখেন তাঁরা জানেন, জায়া অধিকার ছাড়া তারা আর কিছু চায় না—বামন হয়ে টাঙে হাত

দেবার স্পর্ধা তারা কোনদিন করেনি—অসম্ভবের মোহে তারা কোনদিনই অন্ধ হয়-নি। তর্কবাপীশরা যাই বলুন, হঠাৎ যে ইতিহাসের ধারা বদলাবে, এমন অসম্ভব কল্পনা আমাদের মাথায় ত আসে না। হিংসা, ঘেব, পরজীকাতরতা, অহঙ্কার বা আত্মসম্বলতা যে নেই, এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু সে সবগুলো ফুটে উঠে—বখন সাধারণের মঙ্গলানন্দের কথা সভা-সমিতির বৈঠকে গিয়ে পড়ে। বখন একটা দল জনসাধারণের কাজের তার নের—দলের মধ্যে কে বড়, কার সম্মান বা ক্ষমতা বেশী এই নিয়ে তখন মারামারি চলে এবং এমন লোক কেউই নেই যে তখন আপনাকে ছোট করে' সবায় পিছনে রাখতে চায়। এইরকমে ছোট-বড়র প্রভেদ; এই অসাম্যের জন্যেই রেবারেবি ও পরস্পরের প্রতি দোষারোপ চলে—দলের মধ্যে এককে বড় করলে সাধারণের মধ্যেও বিবদ গোলাবোগ উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি জনসাধারণের হাতে সমান অধিকার থাকে তবে হাজার দলে ভাগ করলেও তাদের কাজ হুস্পন্ন হয়ে উঠবে অথচ তর্ক ও মারামারির মধ্যে পড়ে কোন কাজই পণ্ড হবে না। জনসাধারণকে খুব কমই দেশের কাজে আত্মন করা হয়েছে, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে তারা এসব বিষয়ে বিশেষভাবে অভ্যস্ত—ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে; এবং সেই প্রমাণে আত্মা রেখে বর্তমান বিষয়ে তাদের স্বার্থভাগ ও বীরত্বের উপর আমরা নির্ভর করছি।

এ কথা কেউ জোর করে' বলতে

পারেন না যে, আমাদের মধ্যে সামাজ্য অশায়া, অশস্ত্রাধী অবিচার ও ব্যবহার ক্রটি থাকবে না—কারণ, সমাজে এমন লোক বিরল নয় যারা দেশের সব চেয়ে মহৎ মুহূর্ত্তে স্বার্থপরতার বিষ ছড়িয়ে বেড়ায়—অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। আমাদের উচিত হচ্ছে, ক্রটি-পতন হবে কিনা তাবার এবং সেই ভয়ে জব্ব্বব হতে বসে থাকার চেয়ে কোমর বেঁধে যাতে সেই গুলো দূর করা যায় তার চেষ্টা করা। মানুষ নিজেই সম্পূর্ণ হবার অধিকার পায়-নি,—ভবে চেষ্টা করবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত নয়।

মানব-জাতির অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের শিক্ষা ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের উপদেশে আমরা বুঝছি যে, বাদের ভয়ে কিছু করতে হবে, বিশ্বাস করে তাদের হাতে কাজের ভার দেওয়াটাই সব-চেয়ে নিরাপন্ন পথ। পুঁথি-পত্রে হিসাব ব্যাখ্যা করে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হবারই কথা; কিন্তু জনসাধারণ নিজেরাই জানে, তাদের অভাব কোথায় এবং সেই অভাব মেটাবার উপায় কি? খাতার হিসাবে অনেক ক্রটি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা খুবই কম; বৈশ্বী ভাগ নিজেদের কাজ পরে, করে-দেওয়া ও নিজে-করার মধ্যে দ্বা প্রভেদ, সেটা ত সকলেরই জানা আছে।

সহরের সব বাড়ী যে সকলের মধ্যে সমান ভাগ কটে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই—তার কোন দরকারও দেখি না! প্রথম প্রথম নানারকম অন্তর্বিধা

ঘটবে কিন্তু অধিকাংশুত ব্যাধি প্রাথমিক করে এবং শান্তি ও স্বাধীনতা বাদের লক্ষ্য, সেই জনসাধারণের পক্ষে সেগুলো মোটেই গুরুতর হবে না। এতদিন ভুতায় রাজমিত্রী পদের দাসত্ব করেছে, এখন তারা স্বৈচ্ছার ও সান্নিধ্যে আমাদের সাহায্য করবে। এবং শিক্ষিত লোকের সাহায্যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পুরাণো সহরের জায়গার আমরা নতুন নতুন সহর গড়ে তুলব—আপেকার বাসগৃহের সমস্ত অসম্পূর্ণতা দূর করে' তাকে স্বাস্থ্যের ও জীবনের মন্দিরে পরিণত করব।

এই গৃহ-অধিকার এবং বিনা-করে বস-বাস, সম্ব-স্থাপনের পথে আমাদের আর-একটু আগ্রসর করে' দেবে—এর ফলে একক বা স্বতন্ত্র সম্পত্তির মূলে যে কুঠাভাব্যতা হবে, তাতে সেটা আর টিকবে না। ধনী বিলাসীরা গৃহের অধিকারচ্যুতির মধ্যে সামাজিক বিদ্রোহের সমস্ত বীজ নিহিত—এর ফলের উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছে—হয় আমরা সম্ব-স্থাপনের পথে সোজা-জুজি এগিয়ে যাব, নয়ত শক্তিশালী অবিচারী একের বা দলের পায়ের তলার পড়ে' দুঃসহ জীবনভার আরও দুঃসহ আরও অপমানজনক করে' তুলব।

এই বাসগৃহ-অধিকারের দিনেই জন-সাধারণ বুঝবে যে, দীক্ষিত নবযুগ এসেছে, শক্তিশালী, মহাজন বা মালিকের জোড়ালের তলার মাথা গলিয়ে তাদের আর পরিশ্রম করতে হবে না, সাম্যের মন্ত্র সত্য এবং আমাদের এই বিদ্রোহ অভিনয় মায় নয়।

আমাদের অধিকার-লাভের পথে বাধা

হচ্ছে মাঝারি দল, কারণ তারাই সমিতি গড়ে' এর বিপদ ও বাধার দীর্ঘ আলোচনা করবে এবং মানারকমে বিভ্রান্তা প্রকাশ করে' সকলের কাছে এই অধিকাংশটুকাকে তুলার জিনিষ করে' তুলবে। এই চোরা বাণির চরই আমাদের স্বাধীনতা-আহাজার পক্ষে ভরানক ও মারাত্মক, কিন্তু জন-সাধারণ যদি তাদের কথার কণপাত না করে, নিজেদের হাতে কাজের তার নেয়, তবে হাজার বিপদ আশ্রক—আমাদের ভাবনার কোন কারণই থাকবে না। অতাব-অহুবিধাকে আমরা ভয় করি না, যথার্থ বিপদের সম্ভাবনা সেমিকে নেই; আমরা ভয় করি কাপুরুষতাকে, সতীর্ণতাকে ও অন্ধসংস্কারপ্রিয়তাকে এবং এ-সবের পুরোহিত মাঝারি-দলকে;—কারণ, তারা অর্ধেক মন নিয়ে কাজে যোগ দেয় এবং শেষে কাজ পও না করে' ছাড়ে না। আমরা চাই সাহস—অস্ত্রায় ধমন করবার, লড়ব ভাঙ্গবার, যুগসঞ্চিত আবর্জনা; দূর করবার সাহসই আমাদের প্রধান অস্ত্র। জনসাধারণের চিন্তায় যখন সাহসের পরিচয় পেরেছি, তখন কাজেও সাহসের অভাব হবে না, এই আমাদের বিশ্বাস।

তর্ক করা ঘাঘের ব্যবসা, তারা গোড়া থেকেই বলবে, সহরের অস্ত্রে তোমরা হুবহোবস্ত করছ কিন্তু পল্লীর দুঃখধারিত্রা নিয়ে ত কিছু আলোচনা করছ না—সহরের লোকেরা বত প্রাসাদ-অট্টালিকা দখল করে' হুখে থাকবে আর কৃষক ও মজুর তাদের অন্ধকার কুঁড়ের মধ্যে দুঃখভোগ করবে—একি একটা কথা!

ভাঙ্কিকরা ভুলে যায় যে, পল্লীর চেয়ে সহরের ঘর-বাড়ীর অবস্থা বেশী শোচনীয়। এরা ভুলে যায় যে, সহরের লোকেরা এতদিন এই-সব অপরিষ্কার, দুর্গন্ধ এবং বন্ধ ঘরের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরায় সপরিবারে বাস করেছে এবং তাদেরই রক্তশোষক ধর্মীর হুখসাজ্জন্দ্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছে; এই সমস্ত অস্ত্রায় ও অবিচার দূর করাই আমাদের বিদ্রোহের প্রথম কর্তব্য। বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় সহর ও পল্লীর মধ্যে বা-কিছু আন্তর থাকবে, শ্রুই তা দূর হয়ে যাবে—বেদিন গ্রামের লোক বুঝবে তারা আর জমিদার, বণিক বা হুলধনী মহাজনের বা শাসন-তন্ত্রের ক্রোতবাস বা ভারবাহী পশুভায় নয়—তারা স্বাধীন, তারা মানুষ, সেদিন নিজেদের ঘর-বাড়ীর উন্নতি করতে তারা বিরত হবে না; এমন-কি, তর্কওজালাদের পত্রামর্শেও কোন আশঙ্কা না-করে' তারা কাজে লেগে যাবে।

আর-একটা তর্কও খুব মজা হয়ে উঠেছে। একজন হরত অনেক বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে' অর্থসঞ্চয় এবং সেই অর্থে মনের মত বাড়ী তৈরি করেছে—আমরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব কোন্ মুখে? এ-কথা শুনে অবস্ত্র আমাদেরই লজ্জা হয়, আমরা ধারা সবায়ের হুখস্বাধীনতার অস্ত্রে বিদ্রোহ করছি! আমরা বলি, যদি তার বাড়ী কেবল তার পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে সে সেখানেই থাকবে, কিন্তু যদি ঘর বেশী থাকে এবং যদি সে ভাড়া দেয় তবে আমরা ভাড়াটেকে

কর দিতে ব্যর্থ করব। যে যেখানেই থাক, বিনা-করে, বিনা-বাধা-বাধকতার থাকবে, আগিনবার, মহাজন বা করসংগ্রাহকের মুখ-চোরে থাকবার দিন গেছে। সামাজিক পরিবর্তন ও সম্ব্যাপনের ফলে অনেক অস্ত্রাণ ও অস্ত্রাচার জগতের বুক থেকে চিরন্তরে নির্মূলাসিত হবে।

আমাদের এই পরিবর্তন ও নূতন বন্দোবস্তের কথায় অনেক শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তাই তারা তাড়াতাড়ি একটা বন্দোবস্ত করতে চায়; তারা,—যারা এই নূতন ব্যবস্থার ঢাকলো আলজের তথা দাসত্বের আত্মনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তারা ভুলে গেছে যে, আগেকার কালে যখন অর্থলোভী, অস্ত্রাচারী গৃহস্থানী নিজের ইচ্ছামত সকলকে ঘর-ছাড়া করত, তখন ত কেউ কোন প্রতিবাদ করে-নি—সে উচ্চতর অবিচারে সে অপমানকে তারা কোন-দিন মনের কোণেও ঠাই দেয়-নি, অথচ 'আমি তাইয়ের মিলনের দিনে বিবাদের অনৈক্যের সম্মুখীন করে'—তরাই আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে' তুলছে। কোন-কিছুর পরিবর্তন হলেই প্রথম-প্রথম একটু গোলযোগ, সামান্য অসুবিধা হয়, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। অবশ্য শাসন-তন্ত্রের অধিকারে যখন গরীবের উপর অস্ত্রাচার চলে তখন ধনীভবের মাথার চুলটি পর্যন্ত নড়ে না, কিন্তু দাবের উপর এতদিন শ্রাবণের ধারার মত অস্ত্রাচার বর্ষিত হয়েছে, সভ্যতার পুরোহিত সেই কৰ্মী-সাধারণের উন্নতির দিনে আমরা কারও মুখ চোরে তাদের সামান্য মাত্রাও ক্ষতি করতে পারব না।

এককে বড় করে' দেশের উপর অস্ত্রাচার করানো, আমাদের বিধি নহ—আমরা চাই সার্বজনীন সন্তোষ; এবং সে কল্যাণ-সাধনের ভার সাধারণের হাতে।

আমাদের বিশ্বাস, ধনীজনের সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব না—দরকার মত ঘর রেখে বাড়লা-দ্বানটুকু ছেড়ে দিতে তারা কিছুমাত্র বিধা বোধ করবে না; কারণ, এখন থেকে নিজের হাতে সকলকে সব কাজ করতে হবে, সে হাজারজন দাসদাসী আর ত হুঁম তামিল করবার জেতে ছোড়হাতে অপেক্ষা করবে না! বড় বড় অট্টালিকা তারা একলা থাকবে কি করে? স্বাবলম্বী ও নিঃসঙ্গ জীবনে প্রতিবেশীর সঙ্গ নিশ্চয় তাদের কাছে মধুর লাগবে। দলের বা নিজের স্বার্থসাধন করতে মাহুত কিছু অঙ্ক হয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের বিশ্রোহ সফল হলে এবং নূতন বন্দোবস্তের ফলে সকলের মধ্যেই শান্তি ও মৈত্রী বিরাজ করবে।

ঘর-বাড়ী সহরবাসী সাধারণের অধিকার-ভুক্ত হলে, খাজ-বিতরণের স্ববন্দোবস্তের পর বসনসংগ্রহের দিকে আমরা মন দেব। জনসাধারণের নামে সহরের সমস্ত কাপড়ের দোকান ও গুদামঘর অধিকার করাই এর একমাত্র উপায় এবং সমস্তের সকলেই আবশ্যকমত দেখান থেকে বসন সংগ্রহ করবে। বেচ্ছাসেবকবল পূর্বের মত তালিকা তৈরি করবেন, বিতরণের ভার নেবেন এবং যাতে কারুর কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। খাজ বিতরণে আমরা যে নিয়মে আগ্রহ হরে

ছিগুন বদন-বিতরণেও আমরা সেই এক নিয়মে চলব অর্থাৎ যা দেশী থাকবে তা সবাইকে বিনাবাদ্যে ভোগ করিতে দেওয়া হবে; কিন্তু যা-কিছু কম বা কম হবার সম্ভাবনা, তাই শুধু ভাগ করে' দেওয়া হবে। যতক্ষণ তৈরি জামা-কাপড় মোকাদে পাওয়া যাবে ততক্ষণ সবাই তা নেবে, যদি অভাব হয় তবে দেশের স্বাধীন দরজি-বল শ্রমই সে অভাব পূরণ করবে—উন্নত বস্ত্র-পাতির সাহায্যে কম সময়ে ও কম পরি-শ্রমে সেটা বাস্তবিকই সম্ভব। আমরা কারও গা থেকে জামা-কাপড় কেড়ে নেবার বন্দোবস্ত করছি না; কিন্তু সহরের সমস্ত বস্ত্র এক আয়গার জমিরে লটারী করে বিতরণ করিতেও চাই না,—এ কথা মনে আসে শুধু তর্কগোলাদের। যার বা আছে তার তাই থাকবে, একটা কেন দশটা থাকলেও কেউ তা নিয়ে ঝগড়া করবে না—তা ছাড়া পরের অঙ্গশোভা নিয়ে নিঃশেষ অঙ্গ আবরণ করতে কেহই চাইবে না। দেশে জামা-কাপড়ের অভাব নেই; নতুন ছেড়ে পুরানো নিয়ে টানা-টানি করবে কিসের জন্তে!

যারা আমাদের কাজে গোড়া থেকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে তারা বলবে—তাহলে ত সবাই ককাদার তেলভেটের জামা আর রেশমী কাপড় চাইবে! আমরা এ-কথা বিশ্বাস করিনা—সকলেই কিছু রেশমী কাপড় আর মথমলের জামার ভক্ত নহ—বাবুয়ানি করবার সখও সকলের নেই। কাজের সুবিধামত সহজ অথচ সুন্দর পোষাকই অনেকের মনের মত। এখন যে

পোষাক সমাজে চলছে তখনও কে সেই পোষাক চলবে, এমন কোন কথা নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের স্বচিও বদলায়। রাষ্ট্রে ও সমাজে আমরা সহজ ও সরল বন্দোবস্তের জন্তে লড়ছি, অল্প বিধেও তেমনি সেইদিকে চেষ্টা করব এবং আশা করি, পরিবর্তনের ফলে জীবনকে সরল, সহজ ও সুন্দর করবার জন্তে সকলেই চেষ্টা করবে।

বর্তমানে সবাইকে মথমলের জামা বা রেশমী কাপড় না দিতে পারলেও সাধারণের মধ্যেও দেখলি বাছল্য বলেই বিবেচিত হবে। একদিন যা বিলাস-সামগ্রী বলে' বিবেচিত হয়েছে জন-সাধারণের চেষ্টার আর একদিন হয়ত তাইই সাধারণের ভোগের জিনিষ হয়ে উঠবে! প্রভেদ যখন কোথাও থাকবে না তখন একজন যা করবে, তা সাধারণের ভোগে লাগবে; কাজেই গোড়ার যা ক্রটি থাক্, ভবিষ্যতে তা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আমাদের কথার দ্ব-একজন শিল্পপ্রিয় লোক কিছু মনঃকুর হয়েছেন; তাঁরা বলছেন,—আমরা এই রকম করে' অগ্রসর হলে সব জিনিসই একরকম ও একরঙ্গ হয়ে উঠবে এবং জীবনে ও শিল্পে যা-কিছু সুন্দর, তা বাধ পড়বে এবং ক্রমেই লোপ পাবে। কিন্তু আমরা তার প্রতিবাদ করছি। কারণ, এ-রকম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই, আমরা পরে দেখাতে চেষ্টা করব, লক্ষণতি না-হয়েও কেমন করে' শিল্পকৃতির পরিতৃপ্তি সাধন করা যায়। অধিকন্ত, এতদিন যা দৃশ্যশব্দের অধিকারে ছিল তাকে আমরা

সর্বসাধারণের কাছে হাজির করব—শিল্প-কলার তাতে উন্নতি বৈ অবনতি হবেনা।

রোগী বা দুর্বল লোকদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ করে' আলোচনা করি-নি; তার কারণ সম্বন্ধে তাই নিয়ে যত্ন হতে হবে না—স্বস্তর লোকের চেষ্টায় তাদের ব্যবস্থা হবে। যে-সব দেশে আগে এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে, সেখানে এইরকমেই তাদের তত্ত্বাবধান করা হয়। অন্ত্রলোকের পক্ষে বা বিলাসিতার উপকরণ, রোগীর পক্ষে তা বিশেষ আবশ্যক হলে তাকে সেইটি সংগ্রহ করে' দিতে কেউ সঙ্কোচ বোধ করবে না এবং দুর্বলকে সাহায্য করতে কেউ যে পিছপাও হবেন, এমনও মনে করি না। ব্যক্তিগত কাপুরুষতা ও বীরত্বের মত সামাজিক কাপুরুষতা ও বীরত্বও দেখা যায়। আজ আমাদের সমাজে ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার প্রাচুর্য্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তনের পর এ-সব লোপ পাবে। তকমা-আটা আকিসের লোকের হাতে যে শক্তি কেবলমাত্র অভ্যাচার ও অবিচারের

মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, বিরোধের সময় মহাহতভব লোকের হাতে সে শক্তি মহত্বের ও কল্যাণসাধনের পথে আত্মপ্রকাশ করবে। মেদিনের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগে আত্মসমর্পণ মনে-কল্পণে, সেও লক্ষিত হবে এবং এই মহত্বের প্রশংসা করবে। আমাদের দলের মধ্যে এই ত্যাগের ও মহত্বের আদর্শ চিরজাগরু থাকবে, এমন আশা করি না; কিন্তু কাজের আরম্ভে এগুলি থাকলে ভিত্তিটা শক্ত হবে এবং কাজটাও সুন্দর হবে। ধ্বংসের অন্ত নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করি-নি,—প্রতিশোধও আমরা নিতে চাই না; আমরা শুধু অন্তঃকরে, কুংসিতকে নষ্ট করতে চাই; অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রী ও সহানুভূতিকে আমাদের দরকার। দৈনিক অভাব সহজে মিটলে কান্নার কোথাও বাধবে না এবং ত্যাগ না করেও পরস্পরে মৈত্রী রাখা কঠিন হবে না—বরং তাতে আমাদের উন্নতির সুবিধাই হবে।

ঐ প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

অরোরা

অরোরার সঙ্গেও যে অবিদের পরিচয় ছিল সেটা আমি জানতেন না। সে কবিতা করে সুতরাং চাঁদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে আমি স্বর্গকে দেখেছি, রামধনুকের সঙ্গেও তার আলাপ থাকা সম্ভব, কিন্তু

অরোরার বাসা—সেখানেও যে তার পত্তি-বিধি এটা একেবারেই আমি ভাবি-নি!

কমলালেবুর মতো পৃথিবীর সব গোল ঠিক যেখানটাকে চাপা এবং যে রান্ধাটা বেশ-একটু গভীর সেইখানেই চিরশীতল

শশিমন্ডিরে না-হিন না-রাত্রির দেশে
একাকিনো অরোরা আলো বিতরণ করেন।
লক্ষকোটি রামধনুকের শোভা এককোরে
কালর বানিয়ে হাওয়ার উড়িয়ে দিলে যে
বাহার, বিনা-বরের বাগরে অরোরার রূপ
কতকটা সেই ধরণের। নব-নব সৌন্দর্যের,
রঙের এবং আলোর সে বেন একটা ডরা
আরোর বা চৌনেতাধার থাকে বলে 'টাইফু'।

অরোরার সবচেয়ে এমনি একটা ধারণা
আমার দূরে থেকে। জলজীবের অরোরার
বাগার গিরে তার নিতুর্ল পরিচয় এ-পর্যন্ত
আমার তাগো ঘটে-নি; কেননা সেদিন
পর্যন্ত আমি সেই দলভুক্ত ছিলাম যে-
দলের কাছে রামের ধুক, অরোরার রঙ্গ-
মকের রং এমনি আরো। অনেকগুলো জিনিষ
হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ তিথিতে পটোল
ফিতে ইত্যাদির মতো একবারে বর্জনীয়
ছিল। আমি তখন কি জানি যে তলে তলে
আমার দলেও সব চলে? সেটা জানলে ও-দল
থেকে নামকটা সেকরের তো অবিনের
বদলে এসে ভণ্ডি হবার দরকার ছিল না।

বাই হোক, সেই অমাবস্তার রাতে
তারার জুইকুলে সাজানো নীল আকাশের
নীচে কলকাতার অন্ধকার গলিতে আমরা
ছই বন্ধু যে অরোরার বন্ধু ঝিড়িকি খোলা
না পেরে ঘুরে ঘুরে হরহান ও হতাপ হয়ে
রাত সাড়ে-চারটের আধিরাতীলার ঘাটের
রানার বসে পরলা এপ্রেলের সকালবেলার
প্রতীক্ষা করে রইলেন সেটা স্বীকার
করতে এখন আর লজ্জা নেই বা সে
লজ্জার কথাটা গোপন করতে দুটো মিথো
কথাও এখন আর আমার বলবার আবশ্যক

হয় না,—অবিনের দলে মিশে এটা একটা
সুবিধে আমি দেখছি।

অরোরার অভিসারে বেরিয়ে আর-কখনো
অবিন এমন নিরাশ হয়েছিল কিনা বলতে
পারিনে, তবে আমার সঙ্গ-মোবেই যে এরূপটা
ঘটলো পরলা এপ্রেলের ঠিক পূর্বরাতে
আমাকে সেটা জানাতে অবিন কিছুমাত্র
ইতস্তত করলে না এবং আমিও সেটা মেনে
নিলাম, কেননা দল ছাড়বার পূর্বে আমার
আগের দলের ধারা বৃদ্ধ তাঁরা বিশেষ
করে আমার উপরে দীর্ঘনিশান ও স্তম্ভ-
গুলো নিক্ষেপ করে, পিতৃপুরুষের সঙ্কটের
সঙ্গে নিজের উপার্জিত পরমা রূপ ওণ ও
বৌবন নিয়ে তাঁদের কবল থেকে নিজেকে
ছাড়িয়ে আনার। ইংরেজীতে এপ্রেলের
ওই সন্ধ্যাঘণ্টাই আমাকে দিরাছিলেন—
ঘণ্টাও মাসটা ছিল অন্য।

ধানিক-বসে থেকে অবিন মন্ত্রীকামুদ
হরিণের মতো অন্ধকারে আত্ম-একবার তাঁর
অরোরার সন্ধানে ঘুরে মরতে গেল অলিঙে-
গলিতে। আমি একা ঘাটে বেথানটিতে
সকালের একটি তারার আলো অনেকদূর
থেকে এসে অন্ধকার তীরের কাছে জলের
উপরে নেনে দাঁড়িয়েছে সেইখানটিতে চুপ করে
বসে রইলেন। ডোরের হাওয়ার তখনো
হিম মাখানো, নদীর মাঝে মরলা কুয়াসা
গতশীতের হেঁড়া-কাঁধার একটা কোণের
মতো এখনো স্থলে রয়েছে। ঘাটের ত্রধারে
বাধা সারি-সারি বোকাই নৌকো জলের
ধাক্কা ঘুম-ভেঙে এক-একবার একটু নড়ে
উঠে আবার কিম্বিরে পড়ছে। অন্ধকারের
মাধ্যে একটা চিতা কিছুদূরে শশানঘাটের

সমস্তটা এবং অঙ্ককারের অনেকখানি আলোতে ভরে দিয়ে অলু-মলু করে অগছে। চলে যাবার সময়—অলে ছাই হয়ে যাবার বেগার মাহু কতটা আলোই না দিয়ে যাচ্ছে! কি আলোর রথই না তাকে নিতে এসেছে—বে হয়তো জীবনের অঙ্ককারেই কাটিয়ে গেল রাত্রিদিন।

অঙ্ককারের মধ্যে এতখানি আগুনের একটা টান আছে। শিখাগুলো বেন হাত-নেড়ে আমার ডাকতে লাগলো। মন আমার প্রার্থীর চারিদিকে পড়নের মতো কতক্ষণ ধরে ঐ আগুনটার দিকে ঘুরছিল, হঠাৎ একসময় অঙ্ককারে একখানা হাত বেন বোধ হল আমার ছই চোখের উপর আস্তে আস্তে চেপে পড়ল। ঠাণ্ডা হাত,—চাঁপাফুল আর হেনার-গন্ধ-মাখানো আঙুলগুলি; পাতলা একখানি আঁচল, হালকা বাতাসের মতো উড়ে উড়ে আমার গালে পড়ছে, ঠোঁটের খুব কাছে চন্দনের গন্ধ-ভরা গরম একটা নিশ্বাস অহুতব করছি। আশ্চর্য্য এই যে, সে আমার চোখ টিপে থাকলেও আমি তার সুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একেবারে রাত্রির মতো কালো আর তারি মতো স্নিগ্ধ, স্নান্নর! আমি একবার তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির উপরে হাত বুলিয়ে চুপি চুপি বল্লম—“অরোরা”! শিহন থেকে অবিন গলা ছেড়ে হেসে

উঠলো। আমি চমকে উঠে বল্লম—“কিহে তুমি? অরোরা কোথা!” অবিন তার আঙুলটা দিয়ে স্নান্ননের চিতা বেধিয়ে বল্লম—“গোনো বলি—”

সকালের হাওয়ার কুয়াশার সাদা চাদর নাট্যশালার যবনিকার মতো আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। নদীর পশ্চিম পারে চিতার আগুন নিভে গেল। তারি শেখ-আজার মতো একটি সোনার রেখা নদীর পূর্ব-পারের আকাশে ফুটে উঠল! অবিন তার কথা স্মরণ করে এমন সময় রান্না বেহারী এসে খবর দিলে—“ডাক্তারবাবু আরা!”

এত দ্রুত এখানে ডাক্তারবাবু কেন বৃষ্টিতে আমার সময় লাগলো। ঘুম ভাঙলে যেমন আমি ডাক্তারকে বল্লম—“তুমি যে অসময়ে?” ডাক্তার হেসে বল্লম—“আপনি আবার গল্পের খাতা নিয়ে বসেছেন? এরকম করে আপনার অস্থখ কিছুতে সারবে না। লেখা রাখুন, বাবু আবারে একটু বেড়িয়ে আসুন।”

লেখবার টেবিল এবং তার উপরে দেয়ালে ঝোলানো পাজির প্রকাণ্ড একটা এক এবং তার শিরেরে বড় বড় অঙ্করে এগ্রেল-টার দিকে আমার তখন দৃষ্টি পড়লো। আমি একবার ডাক্তারের দিকে, একবার নিজের দিকে চেয়ে স্তবোধ ছেলের মতো গল্পের খাতা বন্ধ করলম। বড়িতে তখন বেলা দুটো উনপকান।

ঐ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীলপাখী

তিলতিল
মিতিল
আলো
হুহু
বিড়াল
হুটী

চিনি
মল
আঙুন
নীলপিঙগণ
সময়

তিলতিল। তারা কেপে উঠবে না
ত ?

আলো। না, সে ভয় নেই ; তারা
টেরই পাবে না, কি হচ্ছে।...তা ছাড়া,
হুপুর রাতে তাদের অনেকেরই বেকবো
অভ্যাস কি না ! কালেই এতে তাদের তখন
কোন অসুবিধা হবে না।

তিলতিল। এ কি ! হুটী আর চিনি
অমন ক্যাকাংসে ঘেরে গেল কেন ? মুখে
কথা নেই—

হুটী। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি
মনে করছি এবার বাড়ী ফিরে যাই।

আলো। (একান্তে তিলতিলের প্রতি)
ওমিকে মন দিয়ে না, ওরা মরা লোকের
নাম শুনে ভয় পেয়েছে।

আঙুন। আমি কিন্তু ভয় করি না !...
মাত্র ম'লে আমি ত তাদের পুড়িয়ে
থাকি।...এমন এক সময় ছিল যখন আমি
ওদের সকলকেই পোড়াতুম।...তখন কত
বেশী আমোদই না ছিল !

তিলতিল। টাইলো অবন কাঁপছে
কেন ! সেও ভয় পেয়েছে নাকি !

হুকুর। আমি ! কই না ! আমার
একটুও ভয় নেই ; তুমি যদি নিয়ে যাও,
তাহলে আমিও সঙ্গে যেতে রাজী।

তিলতিল। টাইলোটের কি কিছু বল-
বার নেই ?

বিড়াল। (উদ্বাসভাবে) আমি জানি,
শেষে একটা কাণ্ড ঘটবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বনিকায় সমুখ

তিলতিল, মিতিল, আলো, হুহু, বিড়াল, হুটী,
আঙুন, চিনি এবং মল প্রবেশ করিল।

আলো। পরী বেরীসূনের কাছে
খবর পেলুম, নীলপাখী খুব-সস্তব এইখানেই
আছে।

তিলতিল। কোথায় ?

আলো। এখানে, এই গোরস্থানে, ঐ
পাঁচিলের মধ্যে।...বে সব লোক মরে গেছে
তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাকে
গোরের ভিতর সুকিরে রেখেছে।...কোন্-
টার মধ্যে আছে, খুঁজে বার করতে
হবে।

তিলতিল। কি করে খুঁজবে ?

আলো। সে খুব সহজ কাজ। গোর-
স্থানে গিয়ে তুমি হীরেটা ঘুরিয়ে দেখে।
তাহলেই যারা বেরিয়ে আসবার, হড় হড়
করে তারা বেরিয়ে পড়বে ; আর যারা আসবে
না, তাদেরও আমরা মজির নীচে দেখতে
পাব।

ভিলতিল। (আলোর প্রতি) তুমিও আমাদের সঙ্গে আসবে ত ?

আলো। না, আমি জিনিস আর জানোয়ারদের সঙ্গে গোরস্থানের বাইরে থাকব।...কারণ, মরাতের দেখে এদের কেউ-কেউ ভরে আধ-মরা হয়ে থাকবে, আবার কেউ বা গুরি আঁতুর হয় উঠবে।... মিতিলকে সঙ্গে নিয়ে তুমি একাই যাও।

ভিলতিল। টাইলো কি আমাদের সঙ্গে থাকবে না !

কুহুর। হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি থাকব বৈকি ! আমার ক্ষুদ্রে শেখতাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকব !

আলো। তা হতে পারে না।...পরীও শুক্ম।...তা ছাড়া ভর করার কিছু নেই লেখানে।

কুহুর। আচ্ছা, আচ্ছা, না বেতে নাও কতি নেই।...তবে তারা যদি কোনরকম নষ্টানি করে, তাহলে কি করতে হবে শুনে রাখো ! এই এমনি করে একবার শিস্ দিও।...আমিও এমনি সেই দণ্ডে হাজির হব।...জঙ্গলের কথা মনে আছে ত ?

আলো। আচ্ছা, তবে এসো ; আমি খুব কাছেই থাকব।...আমার যে ভালবাসে, আমি তার খুব কাছে-কাছেই থাকি কিনা !

পরী ও অন্তান্ত সকলে নিজস্ব হইয়া গেল, ভিলতিল ও মিতিল ঝাঁড়াইয়া রহিল। অবশিষ্ট সরিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোরস্থান

কাল—রাতি। ব্রাহ্ম গোরস্থানের উপর টানের আলো আদিত্য গড়িয়াছিল। ছোট-বড় অলংকার

কবর—যাদের চিপি, পাথরের চাপ, কাঠের ক্রুন্, ইত্যাদি। ভিলতিল ও মিতিল একটা অন্তর-গৃহের নিকট হওয়ারমান।

মিতিল। আমার গুর করছে !

ভিলতিল। (তার গাটাও ছুঁ-ছুঁ করিতেছিল) আমার কিন্তু কখনো গুর করে না।

মিতিল। আচ্ছা, মাঝে মাঝে গেলে কি খুব পাখী হয় ?

ভিলতিল। না, পাখী কি করে হবে ? তারা ত বেঁচে নেই !

মিতিল। তুমি কখনো মরা লোক দেখেছ !

ভিলতিল। হ্যাঁ, একবার দেখেছি। সে অনেকদিন আগে ; তখন আমি খুব ছোট ছিলাম।

মিতিল। কি রকম তারা দেখতে ?

ভিলতিল। একেবারে শাণ্ড, একেবারে নিশ্চল আর ঠাণ্ডা, কোনরকম কথাবার্তা কর না। চোখের পলক অবধি কারো পড়ে না !

মিতিল। আচ্ছা, আমরা কি তাদের এখনি দেখতে পাব ?

ভিলতিল। পাব বৈকি ! আলো ত তাই বলে।

মিতিল। কোথায় তারা !

ভিলতিল। হয় ঐ ঘাসের নীচে, না-হয় ঐ সব বড় বড় পাথরের নীচে।

মিতিল। সারা বছর কি ওরা ওরই নীচে থাকে ? দিন-রাত ?

ভিলতিল। হ্যাঁ।

মিতিল। (পাথরের চাপ দেখাইয়া)

ওগুলো কি তাদের চোখের
দরজা ?

তিলতিল। হাঁ।

মিতিল। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কি
ওরা বাইরে বেরোয় ?

তিলতিল। ওরা কেবল রাত্রে বেরোয়।

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। বাঃ, ওরা যে ঘেরাটোপের
মধ্যে থাকে।

মিতিল। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বাইরে
আসে ?

তিলতিল। না, বৃষ্টির সময় ঘরে
থাকে।

মিতিল। তাহলে,

বেশ আশ্রয়ের ?

তিলতিল। হ্যাঁ, তুনেছি ডারি আটা-
সাঁটা।

মিতিল। ওদের ছেলে-মেয়ে আছে ?

তিলতিল। আছে বৈকি, ব্যাড়া সব
বয়ে যায়—

মিতিল। আচ্ছা, ওরা কি খায় ?

তিলতিল। পাছের শেকড় খায়।

মিতিল। আমরা ওদের দেখতে পাব ত ?

তিলতিল। নিশ্চয়; হীরেটা ঘুরিয়ে
দিলেই পাব।

মিতিল। আচ্ছা, ওরা কি বলবে !

তিলতিল। কিছুই বলবে না, ওরা
কথা কর না।

মিতিল। কেন কথা কর না ?

তিলতিল। ওদের কাকেও কিছু বলবার
নেই কিনা।

মিতিল। কেন, কিছু বলবার নেই ?

তিলতিল। বাঃ, তুই ডারি বোকা।
তোমার সঙ্গে আর কতের পারি না।

উভয়ে চুপ করিল

মিতিল। হীরেটা কখন ঘুরোবে ?

তিলতিল। আগে চুপুর রাত হোক, না-
হলে তাদের কষ্ট হবে যে।

মিতিল। কেন কষ্ট হবে ?

তিলতিল। কারণ চুপুর রাতই হল
ওদের হাওয়া খেতে বেকার সময় কি না ?

মিতিল। চুপুর হতে আর কত বেরা ?

তিলতিল। গির্জার ঘড়ি দেখতে
পাচ্ছ ?

মিতিল। হ্যাঁ, ওই যে ছোট কাঁটাটা—

তিলতিল। চুপুর বাজে-বাজে; ওই যে
ঐ বাজছে, তুনেছ ?

ঘড়িতে বায়োটা বাজিল

মিতিল। আমি পালাই।

তিলতিল। এখন না। এবার হীরেটা
ঘুরাই।

মিতিল। না, না; ঘুরিয়ে না। আমি
আগে পালিয়ে যাই। আমার ভয় করছে
...বজ্র ভয় করছে।

তিলতিল। কোন ভয় নেই।

মিতিল। না, না, আমি মরা-লোক
দেখতে পারব না। বজ্র ভয় করে, আমি
দেখতে পারব না।

তিলতিল। আচ্ছা, ওদের দেখতে হবে
না; চোখ বোজো।

মিতিল। (তিলতিলকে ঝড়াইয়া ধরিয়
তাহার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া) তিলতিল,
তাইটী আবার ! আমার বজ্র ভয় করছে।

...আমি থাকতে পারব না—কিছুতেই না।

‘ওই বোধ’ হয় ওরা সব বাইরে বেরুচ্ছে।

ভিগভিগ। অমন করে কেঁদে না।

ভয় কি ? এক মিনিটের বেশী ওরা
বাইরে থাকবে না।

মিছিল। তুমিও ত কাঁপছ!...ওরে
বাবারে!...না জানি, কি ভয়ঙ্কর ওদের
চেহারা।

তিলতিল । সময় হয়ে গেছে, এইবার
ঘরুই ।

ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁସ୍ଥାୟୀ ନିଳା । ଅନେକଙ୍କର ଶରୀର
 ଉନ୍ନତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହେଉ । ଉପରେ ଶରୀର ଶରୀର
 କାନ୍ଥର ଉପରେ ନିଜର ଉପରେ । ଶରୀର ଶରୀର
 କାନ୍ଥ ହେଉ । ଶରୀର, ଶରୀର ଶରୀର ଶରୀର
 ଶରୀର ।

মিছিল। (তিলতিলের আড়ালে
পাঁড়াইয়া) এবার সব বেকুঞ্জে, ওই দেখ,
বেকুঞ্জে।

তৎপরে কবরগুলির ধার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং স্তম্ভাভার হইতে বাশের দ্বার তরল, নির্ণ তত্ত্ব পুলায়ল বিকশিত হইয়া উঠিল। শ্মশানগুলি ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে লাগিল। অপরূপ সৌন্দর্যে পরি-
বৃত্ত আবেশিত করিয়া তুলিল। পোস্তদ্বারা পতী-
দ্বারের দ্বার সমোদয় এবং উদ্ভাবনোত্তিত হইয়া
উঠিল। হঠাৎ আকাশে উষ্ম উষ্ম হইল। নিশি-
বিশ্ব বসন্ত করিতে লাগিল, হুস হুসি।
সুদূর-বাসে বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত হইতে লাগিল।
পানীয় বন জাগিয়া গান ধরিল। বিল, মধুসন্ধিকর
বন ভগ্ন করিতে লাগিল। ভিলভিল ও মিলিল
বিস্তৃত চমকিত হইয়া শব্দবহুর হতে ধরাধরি করিয়া
কবর খেঁচিতে লাগিল।

মিতিশ। (ঘাসের দিকে চাহিয়া) মরা-
মামুষ সব কোথায় ?

ভিলভিল । যরা-যাহুয ত এখানে নেই ।

ਭੁੱਖੀ ਸੁਆਹ

উবিষ্যন্তেয় দেশ

নীলবর্ণ আসামের প্রবৃত্তি হালান্নে অনেকগুলি শিশু অপেক্ষা করিতেছিল। ইতার সন্দেশই প্রসঙ্গ গ্রহণ করিলে। হলের আসবাব ও লাঙ্গ-সম্বন্ধ সমস্ত নীলবর্ণের। হলের সর্বত্রই অসংখ্য শিশু ভ্রমারোহে হইয়াছিল। তাহাদের বর্ণ নীল এবং পরদের শোভাকণ্ড নীল। শিশুদের মধ্যে কেহ বেগা করিতেছিল, কেহ ছুটছুটি করিতেছিল, কেহ-বা বসিয়া গল্প করিতেছিল। অনেক খুসাইতেছিল এবং বসন্তও দেখিতেছিল। কেহ বা যত-তত লইয়া কাছে বাত, কেহ ভবিষ্যতে কোমল বিহার আবিষ্কার করিলে তাতা লইয়া তন্দুর ছিল। কেহ কল লইয়া, কেহ ফুল লইয়া তাহাদের ক্রমেোত্তর উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিল।

ভিলভিল, যিভিল এবং আলো। পাইয়ের দ্বারা
বিজ্ঞা ধীরে ধীরে চোবের দত গ্রহণ করিল। তাহাদের
আপদনে দীলহেলেলের বলে একটা সড়ি পড়িয়া
যেল। তাহারা দুটিটি আদিগা অস্তায়ানিত, বহাগত
এই অভিবিলের চারিধিকে ঘিরিয়া গড়ইল এবং
নিভতিগত বিন্ধের সহিত তাহাদের মুখপানে চাহিয়া
রহিল।

মিছিল। চিনি, বেয়াল আৰু কুচী
কোথায় ?

আলো। তাহের এখানে চোকবার বো
নেই ; কারণ তাহলেই তারা সবিধাত জানতে
পারবে তখন আর কাউকে মানবেও না।

ভিলভিল । আর কুকুরটা ?

আলো। তাকেও জানতে দেওয়া ঠিক নয়, ভবিষ্যতে কি আছে।.. আমি তাদের সকলকে গির্জার এক খিলানের মধ্যে পুরে তালি বন্ধ করে রেখে এসেছি।

তিলতিল। আমরা তাহলে এখন এ
কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

আলো। ভবিষ্যতের রাজ্যে!...ঐ যে
ছোট ছেলেগুলি দেখছ, ওরা এখনও
পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি।...যে সব তঁরা
মাহুষের অভ্যাস আছে, এই হীরের মৌলতে
সে সব আমরা আঁধা দেখব।...খুব
সম্ভব নীলপাখী এইখানেই আছে।

তিলতিল। এখানে যে পানী আছে
নিশ্চয়ই তা নীল, কারণ এখানকার সব
তিনিবই শু দেখছি নীল রঙের।... (চারি-
দিকে চাহিয়া) আহা, কি চমৎকার! কি
সুন্দর জায়গাটি!

আলো। ছেলেগুলি কেমন ছোটোছুটি
করছে, দেখ!

তিলতিল। ওরা চটেছে নাকি!

আলো। না, চটেবে কেন! দেখছ না,
ওরা হাসছে!...ওরা কিন্তু তারি অর্ধাক
হয়ে গেছে।

নীল শিশুগণ। (তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ
বাড়িতেছিল) দেখ দেখ, অ্যাস্ত ছেলেরা
এখানে এসেছে; ওই দেখ কেমন সব
অ্যাস্ত ছেলে!

তিলতিল। আমাদের ওরা অ্যাস্ত ছেলে
বলছে কেন!

আলো। তার মানে, ওরা নিজেরা এখন
বঁচে নেই কি না।

তিলতিল। ওরা তাহলে কি করছে!

আলো। ওদের জন্ম-সময়ের অপেক্ষা
করছে।

তিলতিল। জন্ম-সময়ের?

আলো। হ্যাঁ; আমাদের পৃথিবীতে যে
সব ছেলে জন্ম নেয়, তারা এই জায়গা
থেকেই যায়।...প্রত্যেককে তার নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে অপেক্ষা করতে হয়।...বাপ
মা যখন ছেলে চান, তখন এই যে ডান-
দিকের দরজা দেখছ, এটা খুলে যার, আর
ওখান দিয়ে ছোট্ট ছেলেরা অমনি পৃথিবীতে
নেমে পড়ে।

তিলতিল। ওরে বাসরে! কত ছেলে,
দেখ!

আলো। আরও অনেক আছে, আমরা
সকলকে ত দেখতে পাচ্ছি না। এই হলটার
মত এমন জিনিসহার হল আছে, তার
প্রত্যেকটীতে এই রকম ছেলে ভর্তি।...সৃষ্টির
শেষ পর্যন্ত কত দরকার, একবার বুঝে দেখ!
...কেউ তাদের গুণে শেষ করতে পারে না।

তিলতিল। আর ওই যে নীল লোক-
গুলো, ওরা কারা?

আলো। তা ঠিক বলতে পারি
না।...বোধ হয় ওরা রক্ষী।...তবুও
মাহুষের পর ওরাই পৃথিবীতে জন্ম নেবে।
...কিন্তু ওদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে
বারণ আছে।

তিলতিল। কখন?

আলো। কারণ এটা হল পৃথিবীর
গোপনীয় জিনিষ কি না!

তিলতিল। এই ছোট ছেলেদের সঙ্গে
কথা কইতে পারি ত?

আলো। নিশ্চয়; তুমি ওদের সঙ্গে
আলাপ কর।...ওই দেখ ওখানে একটা
ছেলে রয়েছে, সব চেয়ে ওটি চমৎকার;
তুমি ওরই সঙ্গে গিয়ে কথা কও।

তিলতিল। কি বলব?

আলো। যা তোমার খুসী; খেলার
সাথীর সঙ্গে যেমন কথা কও।

তিলতিল। আচ্ছা; চুখ খাব,
কোণাকুলি করব?

আলো। নিশ্চয়; ও ভারী খুশী হবে
তাহলে।...কিন্তু এ রকম মুখড়ে থেকে
না...আমি তোমার একলা ছেড়ে দিচ্ছি,
তাহলে বেশ মন খুলে কথাবার্তা কইতে
পারবে।...আমি ওই লম্বা লোকটার সঙ্গে
আলাপ করি গে।

তিলতিল। (শিঙীর কাছে গিয়া
তার হাত ধরিয়া) কি ভাই, কেমন আছ!
...(তাহার নীল পোষাক ধরিয়া) এটা
কি?

শিঙ। (গম্ভীরভাবে তিলতিলের
চুপিতে হাত দিয়া) আর এটা?

তিলতিল। এটা? এটা আমার চুপী...
তোমার চুপী নেই?

শিঙ। না, ওতে কি হয়?

তিলতিল। মাথার পরে...বুড়ির সময়,
ঠাণ্ডার সময় খুব কাজে লাগে!

শিঙ। 'ঠাণ্ডার সময়,'—এ কথার মানে
কি?

তিলতিল। তা জান না? এই বধন
কঁপতে থাক আর দাঁতে দাঁত লেগে
হি হি হি হি কর, আর বধন হাত ছুটো
বুকের উপর রেখে এমন করে চলতে থাক।

সে তার দুইটা হাত সম্বোধে বুকের উপর
কোণাকুলি ভাবে রাখিল।

শিঙ। পৃথিবীটা তাহলে ভারী ঠাণ্ডা
ভায়গা?

তিলতিল। তা ঠিক নয়। তবে ঠাণ্ডা
হয় মাঝে মাঝে; এই বধন শীতকাল আসে,
সে সময় আগুন পাওয়া যায় না।

শিঙ। আগুন পাওয়া যায় না কেন?

তিলতিল। পাওয়া যায়। তবে বড়
তাতে খরচ হয় তখন; কাঠ কিনতে পরসার
ধরকার যে।*

শিঙ। পরসার কি?

তিলতিল। যা দিলে জিনিষ পাওয়া
যায়।

শিঙ। ওঃ!

তিলতিল। পৃথিবীতে কারো অনেক
পরসার, কারো বা মোটেই নেই।

শিঙ। কেন নেই!

তিলতিল। যাদের নেই তারা বড়লোক
নয়।...আচ্ছা, তুমি কি খুব বড় লোক?
তোমার কত বয়স?

শিঙ। আমি শীগুণির জন্মাব।...
আর ঠিক বার বছর পরে।...জন্ম নেওয়া
কি খুব ভাল?

তিলতিল। নিশ্চয়ই; সে ভারী মজার!

শিঙ। কি করে তুমি জন্মেছিলে?

তিলতিল। সে আমার এখন মনে
নেই; সে অনেকদিন আগে জন্মেছিলুম
কি না!

শিঙ। শুনেছি, পৃথিবী আর অ্যাক্স-
মার্স, এসব ভারী সুন্দর, ভারী চমৎকার!

তিলতিল। হী, মন্দ নয়।...তার উপর
মেথানে পাখী আছে, যেঠাই আছে, নানা-
রকম খেলনা আছে।...কারো কারো এর
সবগুলিই আছে, যাদের নেই তারা কিছু
এ সব দেখতে পায়!

শিঙ। মাঝেরা নাকি ছেলের অশে-
কার ঘরজার দাঁড়িয়ে থাকে?...মাগুলি খুব
ভাল; না?

তিলতিল। নিশ্চয়ই; পৃথিবীর সমস্ত
জিনিসের চেয়ে তারা ভাল! টাকাকড়ি,
খাবার-পাওয়ার সকলের চেয়ে ভাল! ঠাকুয়ার
তছ...কিন্তু তারা বড় নীপগিরির মরে
যায়!

শিত। মরে যায়?...সে আবার কি?

তিলতিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা কোথায়
বে চলে যায়—আর ফেরে না।

শিত। কেন?

তিলতিল। কে জানে!...বোধ হয়
তারা হুঃখু পায়।

শিত। তোমার মরে গেছে?

তিলতিল। কে? ঠাকুমা?

শিত। ঠাকুমা কি মা, আমি জানি
না।

তিলতিল। এ দুজন কিন্তু এক লোক
নয়!...ঠাকুমারাই আগে মরে...বড় হুঃখু
হয় তাতে...আমার ঠাকুমা আমার বড়
ভাল বাসত।

শিত। তোমার গোথে কি চল! ও
কি? যুকো?

তিলতিল। না, যুকো কেন হবে!

শিত। তবে?

তিলতিল। আবার!...খুব নীল আর
চক্চকে, না?

শিত। হাঁ, ওকে কি বলে?

তিলতিল। কাকে!

শিত। ওই যে টস্ টস্ করে পড়ছে।

তিলতিল। ও কিছু নয়, একটু জল।

শিত। চোখ থেকে পড়ে বুঝি?

তিলতিল। হাঁ, কখনো কখনো; যখন
কান্না পায়।

শিত। কান্না কি?

তিলতিল। আমি কিন্তু কাঁদছি না;
কাঁদলে কিন্তু এই রকম জল পড়ে।

শিত। সর্বদাই সকলে কাঁদে নাকি?

তিলতিল। না, ছোট ছোলেরা কাঁদে না,
ছোট মেয়েরা কিন্তু কাঁদে!...এখানে
জোমরা কাঁদে না?

শিত। না, কান্না কি তা জানি না।

তিলতিল। নীপগিরিই শিখবে!...
আজ্ঞা, ঐ নীলরঙের বড় বড় দানা নিয়ে
ও কি সব খেলছে?

শিত। এগুলো!...আমি পৃথিবীতে গিয়ে
যা আবিষ্কার করব তা তারই জন্ত।

তিলতিল। কি আবিষ্কার?...তুমি কি
কিছু আবিষ্কার করেছ নাকি?

শিত। করেছি বৈ কি!...শোননি?
...পৃথিবীতে যখন জন্মাব, তখন এমন
কিছু আমার আবিষ্কার করতে হবে, যা
পেলে মানুষ স্থগী হয়।

তিলতিল। ও গুলো খেতে কি খুব
ভাল?

শিত। না; তুমি দেখছি, কিছুই জান
না!

তিলতিল। না।

শিত। হোজ এর জন্ত আমার বেহনত
করতে হয়...শেষ হয়ে এল আর কি!...
তুমি দেখতে চাও?

তিলতিল। হাঁ!...ঠিক, দেখাও!

শিত। ওই যে এখান থেকে দেখা
যাচ্ছে...দুটো ধানের মাক্ষানে।

অন্ত একটা শিত। (তিলতিলের কাছে
আসিয়া) আমারটা দেখবে?

তিলতিল। হাঁ দেখি।

২য় শিশু। জীবনকে বাড়াবার তেজিল
রকমের ওষুধ...এই যে নীল শিলিতে
রয়েছে।

৩য় শিশু। (ডিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া)
আমি তোমার এমন একটা আলো দেখাব,
যার খবর আজ পর্যন্ত কেউ জানে না!...
(সে নিজেকে আলোকিত করিয়া এক বিচিত্র
আলোক-রশ্মির সৃষ্টি করিল) কেমন, খুব
চমৎকার নয়?—কি বল?

৪র্থ শিশু। (তিলতিলের হাত ধরিয়া টানিয়া)
আমি একটা বস্তু তৈরী করেছি, দেখবে
এস—সেটা পাখীর মত আকাশে ওড়ে, অথচ
তার ডানা নেই।

৫ম শিশু। না, না, আমারটা আগে
দেখবে চল, আমি চক্কলোকে ওষুধনের
আবিষ্কার করেছি।

নীল শিশুগণ। (তিলতিল ও মিতিলের
চারিদিকে জড় হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া
ছিল) না, না। আমার আগে!...আমার সব
চেয়ে ভাল!...আমি বা আবিষ্কার করেছি, সে
ভারী চমৎকার!...আমারটা চিনির তৈরী!
...ওরটা কিছুই নয়...ও আমার কাছ থেকে
ভাব চুরি করেছে!

এই রকম খোলাখোলার মধ্যে নীল শিশুগণ
তিলতিল ও মিতিলকে কারখানার দিকে টানিয়া
লইয়া গেল। কারখানারও নীলবর্ণের। সেখানে দূতন
দূতন আবিষ্কারের লব্ধ দূতন দূতন বস্তু একত্রে
হইতেছিল। নীল মেয়েরা যে বাহার কাজে লাগিয়া
গেল। সেই দ্বারা এবং খই দুটিয়া তিলতিলকে
দেখাইতে বলিল। কেহ ব্রহ্মাকাশের মূল এবং
একাত্ত একাত্ত ফল আনিয়া হাঙ্গির করিল।

একটা শিশু। (একাত্ত আকাশের ফুলের

ভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল) আমার ফুলগুলি
দেখছ?

তিলতিল। কি ওগুলো?

শিশু। দেখচ না? এগুলো সব ফুল।

তিলতিল। অসম্ভব! এ যে এক একটা
টেবিলের মত বড়!

শিশু। কি চমৎকার গন্ধ!

তিলতিল। আশ্চর্য!

শিশু। আমি এখন পৃথিবীতে থাকব,
তখন এগুলো এত বড়ই হবে।

তিলতিল। কতদিন লাগবে?

শিশু। তিনশ্র বছর চার মাস নয় দিন।

আর একটা শিশু এক মোহা আঙুর হাতে
দইয়া উপস্থিত হইল। আঙুরগুলো নানাপাতির
মত বড়।

শিশু। আমার হাতে এ কি ফল বল
দেখি?

তিলতিল। এক খোবা নানপাতি!

শিশু। নানপাতি নয়, আঙুর!...আমি
যখন তিরিশ বছরে পড়ব, এগুলো তখন এমনি
ধাঃ হবে। আঙুরকে বড় করবার উপায়
আমি আবিষ্কার করেছি!...

আর একটা শিশু ওষুধনের মত বড় এক বুদ্ধি
আপেল দইয়া হাঙ্গির করিল।

শিশু। আমার এগুলি কি রকম
বল ত!

তিলতিল। ও ত ওষুধ...!

শিশু। না, না; এগুলো আপেল।
আমি এখন পৃথিবীতে থাকব এগুলো তখন
তখন এত বড়ই হবে। আমি তার উপায়
বার করেছি!...তিনটা ঘোষের বিনি রান্না,
আমি তার বাগানের মালী হব।

ভিলভিল। তিনটা গ্রহের রাস্তা আবার কে ?

শিশু। পরত্রিণ বছর ধরে তিনি পৃথিবী, মঙ্গল আর চন্দ্রগ্রহে সূর্যশক্তি দেবেন...এখান থেকে তুমি তাঁকে দেখতে পার।

ভিলভিল। কোথায় তিনি ?

শিশু। ধানের গোড়ায় ওই যে ঘুমুচ্ছে, ওই ছোট ছেলেটা।

ভিলভিল। বা মিকে ?

শিশু। না, ভাইনে। বা মিকের ছেলেটা পৃথিবীতে কেবলই আনন্দ নিয়ে ঘাবে।

ভিলভিল। কি করে ?

শিশু। এমন সব নতুন ভাব নিয়ে ঘাবে, যা পেরে মানুষ আনন্দে ভোর হয়ে থাকবে।

ভিলভিল। ওই যে মোটা-মোটা ছেলেটা নাকে আঙুল দিয়ে রয়েছে, ওটা কে ?

শিশু। হর্বোর তেজ বখন কমে আসবে তখন ও এক রকম আশুন আবিষ্কার করবে, যাতে পৃথিবী পরম থাকবে।

ভিলভিল। আর ওই যে ছুটি ছেলে হাত-ধরাধরি করে রয়েছে, ঘন ঘন এ ওর চুপু থাকছে, ওরা কারা ?...ওরা কি ভাই বোন ?

শিশু। না, ওরা ভারী মজার মানুষ !... ওরা হল প্রণরী আর প্রণরিনী।

ভিলভিল। সে আবার কি ?

শিশু। আমিও ঠিক জানি না !...বুড়ো 'কাল' তামাশা করে ওদের ওই নামে ডাকেন। ওরা ছুটিতে দিনরাত চোখোচোখি করে রয়েছে, ঘনঘন চুপু থাকছে আর বলছে, বিদ্যার ! বিদ্যার !

ভিলভিল। কেন ?

শিশু। বোধ হয় ওরা এক সঙ্গে বেশী দিন থাকতে পারে না।

ধানের গোড়ায়, বেকের উপর, সিঁড়ির পাশে বিস্তৃত রৈলে গায়াগাদি হইয়া দুমাইতেছিল।

ভিলভিল। ওই যে ওখানে ঘুমুচ্ছে, ওরা কারা ?...ওরা কি কিছুই করে না ?

শিশু। ওরা কিছু-না-কিছু ভাবছে।

ভিলভিল। কি ভাবছে ?

শিশু। তা এখন ওরা জানে না...কিন্তু পৃথিবীতে বাবার সময় কিছু না কিছু সঙ্গে নিয়ে বেতেই হবে। খালি হাতে সেখানে বাবার ঘো নেই।

ভিলভিল। কে বলে ?

শিশু। "কাল"। সে ঠিক দরকার উপরতীতে দাঁড়িয়ে থাকে।...সে যখন দরজা খুলবে তুমি তাকে দেখতে পাবে...ভারী ফ্যাসাদের লোক সে।

একটা রৈলে ভিড় ঠেলিয়া ঘোড়িয়া আসিল।

শিশু। কেমন আছ ভিলভিল ?

ভিলভিল। বা রে ! এ আমার নাম জানলে কি করে ?

ছেলেটা আসিয়া ভিলভিল ও মিভিলকে আনন্দ করে চুম্বন করিল।

শিশু। কেমন আছ ?...বেশ ভাল ত ?...আর একটা। চুপু দাঁও...মিভিল, তুমিও দাঁও।...তোমাদের নাম জানি, সে আর আশ্চর্য কি ? আমি শীগুগিরই তোমাদের ভাই হয়ে আসিব।...এইমাত্র সুনসুন, তোমরা এসেছ। আমার জন্মাতো হবে কি না, তাই নতুন নতুন ভাব সংগ্রহ করছিলাম।...যাকে বলো, আমি প্রস্তুত।

তিলতিল। কি? তুমি আমাদেরই বাড়ীতে আসবে না কি?

শিশু। নিশ্চয়, ঠিক এক বছর পরে।
...আমি যখন ছোট্ট থাকব, তখন যেন আমার ত্যক্ত করা না।...আগে থেকে তোমাদের চুমু খেতে পেলুম, এতে আমি ভারী খুশী।...মাকে বলো আমার জন্য দোলনা ঠিক করে রাখতে।...আমাদের বাড়ীটী বেশ আরামের, কি বল?

তিলতিল। মন্দ নয়!...আর না আমাদের বড় ভাল।

শিশু। আচ্ছা, খাবার আছে?

তিলতিল। খাবারও আছে।...আমরা মাঝে মাঝে মেঠাই খেতে পাই। কি বল মিতিল?

মিতিল। হ্যাঁ, তা চের পাই; না তৈরী করে দেন।

তিলতিল। তোমার এ খলির মধ্যে কি?...আমাদের জন্য কিছু নিয়ে যাচ্ছ কি?

শিশু। আমি তিন রকম রোগ নিয়ে যাচ্ছি—হাম, কাশি আর জ্বর।

তিলতিল। ও! এই কেবল! তার পর কি করবে?

শিশু। তারপর?...তারপর তোমাদের ছেড়ে চলে আসব।

তিলতিল। ও রকম করে চলে আসাটা কিন্তু বড় খারাপ হবে।

শিশু। কি করব, বল!...নিজের ইচ্ছামত ত কিছু হতে পারে না।

এই সময় ঘণ্টার গুড় ও বজ্রার শব্দ হইতে এক সতীর ঘর ভনিতে পাওয়া গেল এবং অনেকা-

কৃত উদ্ভল আলোকে হানটী আলোকিত হইয়া উঠিল।

তিলতিল। ও কি?

শিশু। “কাল”। “কাল” আসছে...সে এই বার দরজা খুলবে।

নীল শিশুদের মধ্যে ঘোর পরিবর্তন দেখা গেল; অনেকের হস্তের কেলিমা কাজকর্ম ছাড়িয়া দিল। বাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহাদের অনেক আগিয়া বসিয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

আলো। (সে আগিয়া তিলতিলের সঙ্গে যোগ দিল) আমরা খামের আড়ালে লুকুই, এস...তাহলে “কাল” আমাদের দেখতে পাবে না!

তিলতিল। ও আওয়াজ কোথেকে আসচে?

শিশু। ভোর হচ্ছে...যে সব ছেলে পৃথিবীতে জন্ম নেবে, তারা এইবার পৃথিবীতে নেমে যাবে।

তিলতিল। কি করে নেমে যাবে? সিঁড়ি আছে না কি?

শিশু। যেথতে পাবে।...“কাল” এবার দোরের হড়কো খুলচে।

তিলতিল। “কাল” কে?

শিশু। সে একজন বুড়ো...যে সব ছেলে যাবে, তাদের সে ডাকতে আসে।

তিলতিল। ভারী ছুটে, বুঝি?

শিশু। না; তবে সে কারো কোন ওজর-আপত্তি শোনে না।...যাদের বাবার পালা আসেনি, তারা যদি যেতে চায়, তবে সে তাদের থাকা দিবে সরিয়ে দেয়।

তিলতিল। পৃথিবীতে যেতে কি খুব
আনন্দ হয় ?

শিশু। যেতে না গেলে খুব দুঃখ হয়,
কিন্তু বাবার সময় হলেও আবার কষ্ট হয়।
...ঐ দেখ, ঐ দেখ, সে দরজা খুলচে।

যদিম্বর দার আছে আছে খুলিয়া সেল।
দুবর্জী সখীতের দ্বার পৃথিবীর কোলাহল শুনিতে
পাওয়া সেল। লাল এবং সবুজ আলোকে স্থানটী
উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "কাল" আসিয়া চৌকাঠের
উপর বসারমান হইল। সে শীর্ণ, দীর্ঘকায় এবং বৃদ্ধ।
তাঁহার যেত শরক বাতালে উড়িতেছিল। এক
হাতে দরবৎ কীটি, অপর হাতে এহর-বিতরণ
হয়। দরজার ভিতর দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট
জাহাজ বেগা বাইতেছিল। জাহাজগুলি সাদা এবং
সোনালি পাল ভূঙ্গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কাল। বাবের বাবার পালা তারা সব
একত ?

শিশুগণ। (ধাক্কাধাক্কি করিয়া অগ্রসর
হইল) এই যে আমরা, এই যে আমরা !

কাল। ধাম, এক একজন করে।
আবার ভিড় করছ ?...বাবের দরকার নেই
তারাও এসে হাজির হয়েছ ?...আমার
চোখে ধুলো দিতে পারছ না।... (একজনকে
ধাক্কা দিয়া সরাইয়া) তোমার পালা
হয়নি...এখন যাও !...তুমিও এখন না...
দশ বছর পরে এস।...উপস্থিত কেবল
বাবো জনের পালা...তার বেশী দরকার নেই।
...খ্যা, কি বলছ ?...ডাক্তার আরও বেশী
যেতে চাও ?...না, দরকার নেই...পৃথিবীতে
বিস্তর জমা হয়েছে।...শিরীর দল কোথায় ?
...কেবল একজনকে তারা চায়, সে খুব সাধু
হবে।...তোমাদের মধ্যে সাধু কে ?...তুমি ?
...তোমাকে কিন্তু বোকা-বোকা ঠেকেছে।

এই তুমি এখানে অমন তাড়াহুড়া করছ
কেন ?...আর তুমি সঙ্গে কি এনেছ ?
কিছুই না ! তবে কি করে বাবে ?...বাগি
হাতে যেতে পাবে না।...কিছু-না-কিছু
নিরে এস।...ভরানক পাণ কিছা ভরানক
অমুখ, বা হোক একটা...বা তোমার ইচ্ছা।
...আমার তাতে আপত্তি নেই !...কেবল
একটা-কিছু চাই। ওকে অমন করে ধাক্কা
দিচ্ছ কেন ?...ও বাবে না বলছে ? ওর
ত পালা এসেছে।...অবিচারের সঙ্গে ওকে
লড়াই করতে হবে বে ! ওকে যেতেই
হবে।

শিশু। না, না, আমি যাব না।...
আমার জন্মবার ইচ্ছা নেই।...আমি...
আমি এখানেই থাকব।

কাল। তা কি করে হতে পারে ?
যাবার পালা যখন এসেছে, তখন যেতেই
হবে।...নাও, শীগ্গির এস...সেরী করতে
পারি না।

অপর-একটা শিশু। যশাই আমার
যেতে দিন।...ও যেতে না চায়, আমি ওর
বদলে যাব।...শুনসুখ, আমার বাপ না
বুড়ো হয়েছেন...আমার জন্ম তাঁরা অনেক
দিন ধরে অপেক্ষা করছেন।

কাল। না, বদলাবদলি চলবে না।...
দার পালা, সে বাবে।...বাও, তোমরা সব
ভিতরে যাও।...দারা বাবে না, তাদের
বাইরে থাকবার কোন দরকার নেই।...
এখন সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখছি, কিন্তু
আবার বদল পালা আসবে, তখন তুমি গেয়ে
নানা রকম গল্পের দেখাবে।...ওই দেখ,
চারজন কেমন ধর-ধর করে কাঁপছে।

একজন হঠাৎ পিছনে হঠাৎ পড়িল।

ওকি!...তুমি স্বপ্ন করে পালাচ্ছ কেন?
...কি হয়েছে?

শিশু। আমি বান্ধটা মিতে তুলে গেছি,
তার ভিতর ছোটো পাখি আছে, পৃথিবীতে গিয়ে
ছুটোই আমার গড়তে হবে।

অপর একজন। আমার ছোট পুঁটিলাটা
কেলে এসেছি...তার ভিতর যে সব ভাব
আছে, তা দিয়ে মানুষকে সত্য করে তুলতে
হবে।

অন্য-একজন। আমি আমার নানপাতির
ঝুড়ি কেলে এসেছি।

কাল। বাও, বাও; দৌড়ে নিয়ে এস।
...জাহাজ ছাড়-ছাড়!...ওই বেথ, মাস্তুলের
ওপর পাল-ওটপট কেছে।...আর কেবল ৩১২
সেকেন্ড বাকী।

একটা শিশু তার গানের কঁাক বিয়া গলিয়া
পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সে তাহাকে ধরিয়া কেলিল।

খবরদার, বলছি।...তুমি এখন নর!...
এই তিনবার তুমি পালাবার চেষ্টা করলে।
...এবার যদি তোমার ধরি, আমার বিধি
অনন্তর হাতে তোমার সঁপে দেব। তা
হলে কস্মিন্‌কালে আর তোমার জন্ম হবে
না...তখন এক হবে।...তোমরা সব
গেলে কোথায়? সারথনী হয়ে দাঁড়াও—
সকলে ছালির হয়েছে ত?—আর এক
জনকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায়
গেল সে? ওই যে বেথছি...ভিড়ের মধ্যে
লুকিয়ে রয়েছে।...কে?—প্রণয়ী বুঝি?...
আর লুকোনো মিছে, এখন তোমার
প্রণয়িনীর কাছে বিবাহ নিয়ে শীগগির
বেরিয়ে পড়।

দুটি ছেলে—বাধাদিগকে ইতিপূর্বে প্রণয়ী ও
ও প্রণয়িনী বলা হইয়াছে—ভিড়ের মধ্যে চাইতে বাহির
হইয়া আসিয়া কালের পন্থানে জাহাজ পাতিয়া বসিল।
নিরাশর তাহাবের সুখ বিবণ হইয়া নিম্নাছিল।

প্রণয়ী। সময় মশাই, দয়া করুন;
আমাকে থাকতে দিন।

প্রণয়িনী। আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে
দিন।

কাল। অসম্ভব!...এখন কথা কবার
সময় নেই।...কেবল ৩১২ সেকেন্ড বাকী।

প্রণয়ী। আমার জন্মবার ইচ্ছা নেই।

কাল। তোমার ইচ্ছাতে ত হবে না।

প্রণয়িনী। (সাহুসরে) কাল মশাই,
কি হবে? আমার বেতে যে এখনও
অনেক দেবী!

প্রণয়ী। আমাকে তোমার আপেই
বেতে হচ্ছে।

প্রণয়িনী। হার, হার; আর কখনও যে
তোমার বেথতে পাব না!

কাল। বেথ, এ সবের সঙ্গে আমার
কোন সন্দ্বন্দ নেই। 'জীবনের' কাছে এ
সব কথা পেশ কর। আমার উপর
বেমন হুকুম আছে আমি সেই তাবেই মানুষের
মিলন বিচ্ছেদ ঘটাই।...(প্রণয়ীকে ধরিয়া)
এল তুমি।

প্রণয়ী। (স্বপ্নাধ্বনি করিতে করিতে)
না, না; ছেড়ে দাও...না হয় ওকেও
সঙ্গে দাও।

প্রণয়িনী। (প্রণয়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া)
একে ছেড়ে দাও,...আমার সঙ্গে থাকতে
দাও।

কাল। থাম; অত চেষ্টামেচি করো

না। এ ত আর মরতে যাচ্ছে না—
জন্মতে যাচ্ছে। (প্রণরীকে লইয়া গেল)
চল, আর দেখে করতে পারি না।

প্রণরী। (প্রণরীর বিকে হাত
বাড়াইয়া) চিহ্ন, একটা চিহ্ন দিয়ে যাও!
...বলে যাও কি করে তোমার খুঁজে পাব।

প্রণরী। আমি সর্বদা তোমাকে ভাল-
বাসব!

প্রণরী। আমি পৃথিবীতে গিয়ে চির-
বিবাহিনী হতে থাকব, তাই দেখে তুমি
আমার খুঁজে নেবে।

সে বাটীতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

কাল। বাস্, এইবার হয়েছে।...
এখন আর কেবল ৬০ সেকেন্ড বাকী।

দমনোদ্ভত শিশুগুলি অব্যাহত সকলের নিকট
বিদায় গ্রহণ করিল।

শিশুগণ। বিদায় পিতারী, বিদায় জিন্,
সব জিনিস নিয়েছ ত?...আমার কল্পনা-
গুলি পৃথিবীতে প্রচার করো...আমার
ভরস্বরের কথা মনে আছে ত?...কিছু
ভুলে যাওনি? আমার মাঝে মাঝে
মনে করো।...তোমার নিজের কল্পনাগুলি
যেন ভুলে যেও না; একটা জিনিষ নিয়ে
বৈশ্বজিন পড়ে থেকে না। আমার তোমার
ধবর পাঠিয়ে। ধবর পাঠাতে পারা
যায় না শুনেছি...তবু চেষ্টা করো।...তাণ
ধবর থাকলে আমাদের বলা।...আমিও
তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।—আমি
সব্বাট হয়ে জন্মাব।

কাল। (চাৰি উঠাইয়া চুপ করিতে

ইঙ্গিত করিল) বাস্; আর না...আমি
ছেড়ে দিয়েছি।

আমি চমকিত আরম্ভ করিল এবং ক্রমে
অবৃত্ত হইয়া গেল। আত্মার শিশুগণের কঠোর
দৃষ্টি হইতে ওনা ঘাইতে লাগিল।

ওই পৃথিবী! ওই পৃথিবী! ওই সেবা
যাচ্ছে!...আহা, কি সুন্দর! কত বড়!
কি চমৎকার!

ভারপর ব্যবস্থা অতি ক্ষীণ আনন্দ-কোলাহল
গনিতে পাওয়া গেল!

তিলতিল। (আলোর প্রতি) ও কিসের
গোলমাল? ও ত ছেলের গলা নর।

আলো। বাবের ঘরে এই শিশুরা
গিয়ে জন্ম নিলে মায়েরা সব গান
করছে।

ইত্যাকসরে কাল শেখার হলের বিকে দৃষ্টি সিন্ধপ
করিয়া তাহার মন্দির দ্বার বন্ধ করিত গেল।
এইবার হঠাৎ তিলতিল, তিলতিল এবং আলো
তাহার নগরে পড়িল।

কাল। এ কি?...তোমরা কারা? কি
করছ এখানে?...তোমরা ত নীল নও!
এখানে তোমরা ঢুকলে কি করে!

সে দা উঠাইয়া তাহাদের বিকে ছুটিল গেল।

আলো। (তিলতিলের প্রতি) কথা
করো না!...আমি নীলপাখী পেরেছি...
আমার বৃক্কের মধ্যে লুকোনো আছে।
পালাই চল! হীরেটা বুরিজে দাও, তাহলে
ও আর আমাদের ধরতে পারবে না।

গিছন বিকের দরজা বিরা তিলতিল, তিলতিল
এবং আলো পলাইয়া গেল।

ক্রমশ

ঐবাহিনীকান্ত লোম।

আলোর আলো

বাইশ

সরমার কথা

বমুনা-দ্বিমিকে নিয়ে আর ত পারিনা !
বাবারে বাবা, এমন ছুটু ত ভুতায়তে আর-
কখনো দেখি-নি।

আজ সারা সকালটা বসে-বসে কুলের
গরনা দিয়ে আমাকে তিনি সাজিয়েছেন।
স্বপ্ন কি সাজানো? সেই সঙ্গে তাঁর কষ্টি-
নল্লির জ্বালায় প্রাণ আমার পালাই-পালাই
ডাক ছাড়তে লাগল।

শেষটা তিনি বলেন কিনা, “চল ছুঁড়ি,
তোকে তোর বরের কাছে ধরে নিয়ে
বাই, তোর রূপ দেখিয়ে কিছু বখসীষ
আদায় করব।”

আমার ত চক্ষু স্থির! তাড়াতাড়ি বলে
উঠলুম, “ওমা, ওকি কথা দিদি! তাহলে
আমি কি আর বাঁচব!”

ভক্তিতরে আমার গাল টিপে দিয়ে
বমুনা-দ্বিমি বললেন, “ঈশ, ছুড়ির চং বেখে
আর বাঁচিনা! বর বর করে দার সুখ
দিয়ে লাল পড়ছে, তিনি বলেন কিনা
বরের কাছে গেলে মরে ঘাব! ওলো,
জানি গো জানি, আমাকে বোকা পুরুষ
পাসনে বে, আমার চোখে ধুলো দিবি!”

—“দিদি, তোমার ও ডাগর চোখে
আমি প্রাণ থাকতে-ধুলো দিতে পারব
না।”

—“উ, আমার কুটু করে কান্ধে—”

—“গর্ভের মধ্যে সঁধুতেও জানি,
দিদি!”

—“হু, তুমি একটি মিটমিটে ডাইনি,
তা আবার জাননা! দাদাকে কেগিয়েও
তোমার আশ মেটে-নি, আবার আমাকেও
মজাবার কিকির!”

—“অজ-ম্যাডিস্ট্রেট বাসী দার দোরে
দিন-রাত ভ্যা-ভ্যা করেও মন পান না,
তাঁকে আমি মজাব, আমার এমন কী
সাধি!”

—“সত্যি তাই সরমা, তুই যদি পুরুষ
হতিন্!—”

—“তাহলে তোমার দাদা আমাকে
বিয়ে করতে অত্যন্ত আপত্তি করতেন!”

—“আর আমার যদি বিয়ে না
হোত—”

—“আমি যদি পুরুষ হতুম আর
বমুনা-দ্বিমির যদি বিয়ে না হোত, তাহলে—”

—“তাহলে, বমুনাদ্বিমি তোর প্রেম-
সাগরে পড়ে দম্ভরমত হাবুডুবু খেতেন।”

—“এবে অসমাপ্ত উপভাস! তাহলে
তোমার দাদার অবস্থাটা কি হোত, কৈ,
উপসংহারে সে কথাটা ত বললে না?”

—“উপভাস এখন শেষই হোলই না,
তখন দাদার মস্তে আমার ভেবে মরবার
দরকার কিলা ছুঁড়ি! তবে, পুরুষ হোতে
পারি-নি বলে আমি যে আলিঙ্গন আর চুষন
করতেও পারি-নি, এ ভুল তোর এখনি ভেঙ্গে
দিচ্ছি!”—এই বলে বমুনাদ্বিমি আমাকে

জড়িয়ে ধরে আমার মুখে একটি চুমু দিলেন। মাকে আর মনে পড়ে না, মারের পেটের কোন বোনও আমার নেই, পৃথিবীতে নারীর প্রতি নারীর ঘেঁষ-ভালবাসার স্বোভাব আমি কখনো গেরেছি বলও স্বরণ হয় না; কিন্তু এই কোমলপ্রাণা করুণারূপিনী মহিলাটির অগাধ হৃদয় বেন মারের ঘেঁষে, বোনের ভালবাসার একেবারে পরিপূর্ণ; এঁর কাছে এলে আমি বেন সেই ঘেঁষ-প্রেমের বিভোর হয়ে গলে যাই! তাই আজ তিনি যখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আমারও প্রাণটি বেন জড়িয়ে গেল—সে অকপট আঘরে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠল, তাঁর কাঁধের উপরে মাথাটি এলিয়ে আমি চূপ করে' দাঁড়িয়ে রইলুম।

যত্নবাহিনী বললেন, "সরো, বেলা হোল, বাড়ী যা! তোর কচি মুখখানি রোদে রাগা হয়ে উঠেচে, তোকে কষ্ট দিচ্ছি দেখলে বোন, দাড়া আবার মুখভার করতে পারেন!" এই বলে তিনি হাসতে-হাসতে চলে গেলেন।

আমিও আন্তে-আন্তে বাড়ীতে ফিরে এলুম।...

ঘরে ঢুকেই স্তনসুম, সামনের বিয়ে-বাড়ীতে গায়ে-হলুদের শাঁখ বেজে উঠল।

আমারও জীবনে আবার অমনি দিন আসছে! সে কথা স্বরণ হবামাত্র আমার সর্বদা কেমন রোষাক্তিত হয়ে উঠল! বিবাহ, বিবাহ... .. ছাটি প্রাণের চির-মিলন!

আমার যে আগে কখনো বিবাহ হয়ে-

ছিল, সে কথা মনে পড়ে কি, পড়ে না—সে বেন স্বপ্নের মত, সে বেন গতজন্মের কথা! সেবার প্রেমের কোন সাদা পাই-নি, এবার প্রেম এসে আগে আগে জীবন-বন্ধুকে পথ-দেখিয়ে আমার ঘরে ডেকে আনছে! অতীতের স্মৃতি, অতীতের ব্যথা, অতীতের আধারকে বর্তমানের শান্তি, গান, আলো বীরে-বীরে হৃদয় থেকে মুছে দিচ্ছে! আমার প্রাণ এতদিন বুকের মাঝে সূঁজিত হয়ে পড়েছিল, আজ আবার সে ঝেগে উঠছে! হে বন্ধু, হে সখা, কাছে এস, তোমার বাগ্যাহারী হাত-হৃদ্যানির সুখ-স্পর্শে আমার নিরাশা জীবনের তত্রামোহ টুটে যাক; হে আমার নবপ্রভাতের প্রথম স্বর্বা, তোমার আকাশব্যানী কিরণের একটি কথা শেলেও আমার অন্তর পদ্মের মত আবার বিকসিত হয়ে উঠবে!

হঠাৎ সিঁড়িতে পরিচিত পদস্ব শব্দে আমি চমকে উঠলুম। কি করি, কোথা যাই—এখনো আমার গা-মর যে ফুলের গরনা!

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে' দিতে ছুটে গেলুম,—কিন্তু তার আগেই তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। দারুণ লজ্জার মরমে হয়ে আমি পিছন করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সোহনবাবু বানিকস্বপ্ন একটিও কথা কইলেন না,—বোধহয় আমার বেহায়া-পনার তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু তিনি-ই বা কি-রকমের মাহুষ গা! দেখেছেন, লজ্জার আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু নাছোড়বান্দা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ধনী লোক বাহোক।

মোহনবাবু ডাকলেন, “সরমা!”

কী অস্বাভাবিক, ভয়ানক স্বর! সে ভিত্ত—তীব্র স্বর আকস্মিক অতিশয়-বাহির মত আমার সর্কানকে বেন পাথরে পরিণত করে’ দিলে। এমন স্বর আমি জীবনে কখনো শুনি-নি!

মোহনবাবু আবার তেমনি স্বরে বললেন, “সরমা! তোমার স্বামী জীবিত!”

ভড়িতের মত তাঁর দিকে আমি কিরে পাড়ালুম। আমার কোথায় গেল লজ্জা, কোথায় গেল নীরবতা,—তীব্রস্বরে বলে উঠলুম, “কী, কি বললেন!”

—“তোমার স্বামী জীবিত!”

—“জ্যা!”

—“হ্যাঁ। সরমা, আমি বললুম!”

—“মোহনবাবু, মোহনবাবু!”

—“বিশ্বাস হচ্ছেনা তোমার? তুমি কি ভাবছ, নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে, নিজের সর্জনশ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কৌতুক করছি? তা নয় সরমা, তা নয়,—তোমার স্বামী জীবিত, কিন্তু আজ থেকে আমি মৃত। এই দেখ!”—বলেই তিনি ধ্বংস করে’ কাপড়ে-কাপড়ে আমার হাতে একখানা খবরের কাগজ দিলেন।

কাগজখানা পড়তে-পড়তে আমার বুকের রক্ত বেন বরফ হয়ে গেল! মুখ ফুলে যেখলুম, ঘরের মধ্যে মোহনবাবু নেই!

আরসিতে চোখ পড়ল। তার ভিতরে আমার ফুলের গহনাপরা সূঁটির ছায়া বেগে উঠেছে! কিন্তু আমার মুখ—আমার মুখ!

নিজের মুখ যে আমি নিজেই চিনতে পারছি না! আরসিতে আমার ও মুখ যে মড়ার মত সাদা! আমি কি মরেছি?

পাগলের মত আমার গায়ের ফুল-গুলিকে হৃদয়ে ধলে, পিষে, ছিঁড়ে কুচিকুচি করে’ ঘরমর ছুঁড়ে ছুঁড়িয়ে কেলে দিতে লাগলুম।

তেইশ

হরেন্দ্রের কথা

পাড়ারগারে এক আত্মীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম।

কলকাতার কিরে বেশি, মোহন আমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

চিঠিখানা এই।

“ভাই হরেন,

চিঠি পেয়ে বত-শীত পায়, আমার কাছে আসবে। ভয়ানক বিপদে পড়েছি, তোমার সঙ্গে অনেক পরামর্শের দরকার। লিখে সে কথা জানাবার নয়। ইতি
হতভাগ্য মোহন।”

ব্যাপার কি? সপ্তাহখানেক মোটে কলকাতায় ছিলুম না, এত্রি-মধ্যে এমন কি বিপদ হোল যে, মোহন একেবারে আপনার নামের আগে হতভাগ্য বিশেষণ বসিয়ে দিয়েছে? এ আর কিছু নয়, নিশ্চয় প্রেমের রগড়া! আমি ভাবতুম, জগতে যে প্রেমের খেলা চলেছে, সে খেলার সবটুকু চার পুরুষ, আর পুরুষ চার স্ত্রী একটু মজা! কিন্তু এই মজাতে হাতলে প্রেম যে এমন লোক-মজাতে পারে, এতটা ত জানতুম না!

বা-হোক, খাওয়া-খাওয়ার পর মোহনের বাড়ীতে গেলুম। মোহন তাহার ঘরের কোণে, দরবার উপরে উপড় হয়ে বালিশে মুখ ভাঁজে শুয়েছিল।

আমি বললুম, “কিহে মোহন, মদন-বেবতার সঙ্গে নারদ-ঠাকুরও তোমার উপরে কৃপাকটাক দান করেছেন নাকি?”

মোহন আন্তে-আন্তে মুখ তুলে আমার দিকে নিরন্তর হয়ে করুণ নয়নে চেয়ে রইল।

একি! তার চোখে জল—কৈবে কৈবে তার মুখ বে কুলে উঠেছে! আর তার চেহারা,—এই ক-দিনেই এ কী পরিবর্তন! মোহনের কৈদে-রাসা চোখদুটো ভিতরে বসে গেছে, তার নৃতি কি-রকম উল্লাস, তার চুলগুলো কক ও উষ্ম, তার বোঁটাও শীর্ণবিশীর্ণ। যেখানে মনে হয়, তার যেন সাংঘাতিক একটা-কিছু অস্থির হয়েছে!

আমিও তাই ভেবে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “হ্যাঁ মোহন, তোমার কি অস্থির হয়েছে?”

মোহন একটা বিস্তীর্ণ হাসি হেসে বললে, “অস্থির? হঁ, অস্থিরই বটে!... ..অস্থির!”

“মোহন, কি হয়েছে, বল ডাই!”

সে মুখে কিছু না-বলে আমার দিকে একশব্দ কাগজ এগিয়ে দিলে। দেখে মনে হোল, কোন ধরের কাগজ থেকে এটি কেটে নেওয়া। আমি কিছুই না বুঝে, ছাপার হরকে তাতে বেটুকু লেখা ছিল, নেটুকু পড়তে লাগলুম। পড়তে-পড়তে বুঝতে পারলুম, কেন মোহনের এমন দশা হয়েছে!

বানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এও কি সম্ভব? মর্যাদা হারানোর ফিরে এসেছে! অনেক ভেবেও কিছু ঠিক না করতে পেরে বললুম, “এটা পড়েও ত আমার সম্বন্ধ বাঁচ্ছে না ডাই!”

মোহন মুখ বিকৃত করে বললে, “সম্বন্ধ? কিসের সম্বন্ধ? এই চিঠিখানা পড়, তাহলেই বুঝবে আর সম্বন্ধ করার কিছু নেই। চিঠিখানা কাল মুরারিবারুর নামে এসেছে। আমি পেয়েছি সরমার কাছ থেকে।”

পত্রখানা পড়লুম,

“শ্রীচরণেযু,

বাবা, আপনি তনলে নিশ্চয় সুখী হবেন যে, আমি জীবিত আছি। ভগবানের দয়ায় ও আপনার আশীর্বাদে আমি প্রাণে বেঁচে আছি। আপনার শান্তিপুত্রের প্রতিবেশী নবীনবারুর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা পেয়ে এই পত্র লিখছি।

কালীধামে গঙ্গার ডুবে আমি মরছি,—এ সংবাদ মিথ্যা। একখানা নৌকার আমি আর আমার এক বন্ধু ছিলাম; নৌকাডুবি হয়ে আমার বন্ধু মারা যান বটে, কিন্তু আমি বেঁচে গিয়েছিলাম।

আপনার আমার সবতই জানেন, আপনাদের কাছে আর কিছু লুকোতে চাই না। তখন চারদিক থেকে পাণ্ডনারায়ণের তপাধার আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। খুচরো খুচরো বেনা ত ছিলই—তার জন্তে আমি তত ভাবতুম না, কিন্তু আমার হৃদয় বড় পাণ্ডনারায়ণের হাত এড়াবার জন্তেই আমি নিজেই নিজের দুঃসংবাদ ঘটনা

করেছিলুম। নৌকাডুবিতে এমন যত্ন তা হাসেনাই হয়; সুতরাং আমার যত্নাতে কারুর অবিশ্বাস করবার কোন কারণ ছিল না।

এ ক-বছর আমি পশ্চিমে নানা জায়গায় চাকরি করে' বেড়িয়েছি। কিছু অর্থসঞ্চয়ও করেছি। যে পাওনাদারদের স্তরে আমি বেশছাড়া হয়েছিলুম, এখন তারা বেঁচে নেই বলেই আমার বেশে ফিরেছি, নৈলে আরো-কতদিন যে আমাকে বিশেষে নাম-ধাম লুকিয়ে ঘুরে মরতে হোত, কে তা বলতে পারে?

কলকাতার যখন আছি, তখন আমি আমার ক্রীকে কাছে এনে রাখা উচিত মনে করি। আশা করি এতে আপনার অমত্ হবে না। আমি আসছে পরশুদিন আপনার বাড়ীতে যাব। আপনার কন্যাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলবেন।

আপনারা ভাল আছেন ত? আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

আপনার ভ্রাতা

সুরেন্দ্র।"

আমার পত্রাণ্ট শেষ হোলে মোহন বললে, "তোমার আর কোন সন্দেহ আছে?"

মোহনের হৃৎথে আমার প্রাণ বেন কেটে যাচ্ছিল। একি অভাবিত ব্যাপার! একটা মানুষের জীবন যে পলকের পরিবর্তনে এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে বেতে পারে, এ যে কল্পনার অতীত! এ দুর্ভাগ্যের কি সাক্ষ্য আছে? এ থাকা মোহন কি সামলাতে পারবে?

কোনরকমে "আত্মসংবরণ করে' বললুম, "এখন উপায়।"

মোহন হতাশভাবে বললে, "উপায় আর কি! সীতার না-কেনে যে গভীর জলে সাধ করে' তলিয়ে গেছে, তুবে মরা ছাড়া তার অস্ত গতি' নেই!"

—"মোহন, সুরেন কি সরমাকে চিঠি-পত্র কিছু দিয়েছে?"

—"না।"

—"হঁ, বেশ খোঁজা যাচ্ছে সরমাকে সে এখনও ভালবাসে না।"

—"কি-করে' বুধলে?"

—"সুরেন যখন ছদ্মনাম নিয়ে বিশেষে অজ্ঞাতবাল করছিল, তখনও সে সরমাকে কোন পত্রাদি দেয়-নি। সরমার প্রতি তার বিশ্বাস থাকলে সে এতবড় একটা কর্তব্য পালন করতে ভুলত না। তারপর বেশ, এতদিন পরে সে বেশে কিয়েরে, সরমার ঠিকানাও পেয়েছে। এ অবস্থার অস্ত কেউ হোলে কি করত? নিশ্চয়ই একেবারে ত্রীর সঙ্গে এসে দেখা করত! কিন্তু সুরেন তাও করেনি, উঠে ক্রীকে একখানা চিঠিও লেখে-নি,—এমন-কি, তার পিতাকে যে পত্র লিখেছে তাতে-পর্যন্ত সরমার নামগন্ধ নেই। মোহন, সরমাকে সুরেন ভালবাসে না, তার আর কোন গুঁড় উদ্বেগ আছে।"

—"উদ্বেগ? উদ্বেগ আবার কি?"

—"আমার বতদূর বিশ্বাস, তাতে মনে হয়, সুরেন জানতে পেয়েছে যে, সুরারি-বাবুর মৃত্যু হয়েছে আর তাঁর থাকিছু সম্পত্তি ছিল সরমাই তা পেয়েছে। সে এই টাকা হস্তগত করতে চায়।"

—"কিন্তু দেখছ ত, সে সুরারিবাবুর নামেই চিঠি লিখেছে!"

—“এটা ছল মাত্র। মুরারিবাবু বেঁচে থাকলে সুরেন কখনই তাঁকে চিঠি লিখতে সাহস করত না। কেননা সে তাঁরকন্মেই জানত যে, সে তাঁর মেয়ের উপরে অসং বাহ্যিক করতে তিনি তার প্রতি চটে আছেন। তার উপর এ পত্রে সে যে কত-বড় ক্ষুণ্ণচোর, সুরেন নিম্নমুখেই তা প্রকাশ করেছে। এ-অবস্থায় মুরারিবাবু মত প্রকৃতির লোক যে তার হাতে নিজের মেয়েকে আবার ছেড়ে দেবেন, এ-রকম আশা করাটাট অসম্ভার। আর-একটা কথা ভেবে দেখ। সুরেন যে তার ক্রীকে এখনো ভালবাসে না, এটা আমরা বুঝছি। এমন ক্ষেত্রে সরমার তার সে কেন সেধে নিতে চায়? নিশ্চয়ই কিছু প্রাপ্তির আশায়।”

—“সে যদি জানতই যে মুরারিবাবু বেঁচে নেই, তবে মুরারিবাবুর নামে মিছা-মিছা চিঠি লেখবার প্রকার কি?”

—“পাছে সরমা সন্দেহ করে যে, তার টাকার লোভেই সুরেন তাকে নিয়ে যেতে চায়। মুরারিবাবুর নামে চিঠি লেখাতে সরমা ভাববে, ‘স্বামী তাকে নিম্নার্থভাবেই প্রণয় করছে—পিতা জীবিত থাকতে সে ত আর তাঁর সম্পত্তি পাবে না! স্বামী বধন জানেন না যে তার পিতা মৃত, তখন সরমার হাতে অর্থ আছে এটাও তিনি জানেন না।’—সরমার পক্ষে কি এমন-ধারা চিন্তাই স্বাভাবিক নয়?”

—“হরেন, তাহলে সরমার কি উপায়?”

—“নিরুপায়। আমরা কিছুতেই তার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারব না। কিসে কি হয়, বলা যায় না—সরমা

হরত ভেবে বলবে, আমরা বুঝি কোন খারাপ মন্তলোবে তার স্বামীর নামে নিম্না রটাচ্ছি। স্বামীকে ভাল না বাসলেও, আমাদের সে নীচ ভাবতে পারে। হুতরাং আমাদের চূপ করে থাকাই ভাল। আর, আমি যা বললাম, সেটা আদ্যমাত্র—হরত মিথ্যা!”

—“হরেন, হরেন, আমিও পেলুম তাই, সরমাও গেল। ভগবান এ কী করলেন!”

—“শান্ত হও তাই, শান্ত হও! ভগবানের দোষ দিচ্ছ, কিন্তু কতবড় বিপদ থেকে তুমি পরিত্রাণ পেলে সেটা একবারও ভেবে দেখেছ কি? তুমি খালি হুঃখের তাপ পেয়েছ, হুঃখের আগুন তোমাকে ছুঁতে-না-ছুঁতে নিবে গেল,—এ কি কম দুঃখ? সরমার সঙ্গে তোমার বিবাহের পর যদি এই সুরেন আত্মপ্রকাশ করত, তাহলে কি হোত বল দেখি!”

—“হরত সেটা খুব ভয়ানকই হোত, হ্যাঁ,—হরত কেন—নিশ্চয়ই! কিন্তু, কিন্তু” ঘেমে, হ-হাতে মুখ ঢেকে মোহন অবরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বললে, “কিন্তু, আমার এ কি হোল তাই! হরেন, বন্ধু,—তুমি তখনকার কথা ভাবছ, কিন্তু আমার এখনকার কথাটা তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি? এর চেয়ে ভয়ানক অবস্থা আমি যে করনা করতেও পারছি না! যে অন্ধ, তার কাছে কিবা রাত কিবা দিন! আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত জীবন, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, করনা বাসনা যে অদৃষ্টের একটি সুৎকারে তাদের বাঁড়ীর মত ভেঙ্গে পড়ে গেল! এ প্রাণ নিয়ে আর কি

আমি সংসারে নতুন জীবন দেখতে পাব—আর কি আমি—আর কি আমি—না, না, এ অসহ্য, এ আঘাত আমাকে পাগল করে দেবে, আমার জীবনকে পশুর জীবন করে দেবে—আমাকে—দূর হোক, যাঁ হর ভা হবে, কেন আমি এত ভেবে মরছি!—দূর হোক, দূর হোক”—বলতে-বলতে মোহন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর বৃকে দ্ব-হাত বেঁধে হেঁটুখে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগল। খানিক পরে আমার সামনে এসে সে খমকে দাঁড়াল। তারপর আমার চোখের উপরে স্থিরদৃষ্টি রেখে গভীরভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে, “বলতে পার হরেন, আমার আত্ম-হত্যা করা উচিত কিনা?”

এতক্ষণ আমি দুঃখে নির্বাক হয়ে তার ভাব-গভীর নিরীক্ষণ করছিলাম। মোহনের চরিত্র আমি জানি; তার মত ভাবপ্রবণ লোক অতি অল্পেই ভেঙে পড়ে, মনের কোঁকে এমন-সব কার্য্য করে—যা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সংসারের হেরফেরে এরাই কষ্ট ভোগ করে, জীবন-বুদ্ধে এরাই পদে-পদে পরাজিত হয়,—এরা কল্পনায় সাম্রাজ্য গঠন করতে পারে, কিন্তু বাস্তবজগতে বার্থ সংসারী হোতে পারে না। মোহনের অবস্থা দেখে বাস্তবিকই আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হোল। আমি ভাড়াভাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কের বিধানার উপরে জোর করে শুইয়ে দিলাম। ভৎসনার স্বরে বললাম, “মোহন, তুমি না পুরুষ!”

মোহন স্তানহাসি হেসে বললে, “পুরুষ

হোলে প্রাণ কি পাখর দিয়ে গড়তে হয় তাই?”

—“পুরুষ যখন সংসারে প্রবৃত্ত হোতে চাখ, তখন তাকে সবল হোতে হবে, সহ্য করতে হবে।”

—“আমি যে সহ্য করতে পারছি না তাই! বার সর্বস্ত্র পেল, তার সহ্য করার অবলম্বন কোথায়?”—বলতে-বলতে সে আমার গলা-জড়িয়ে ধরে বালকের মত কাঁদতে লাগল!...

প্রেমের যখন মুহূর্ত হয়—তখন আর শবের সংকার হয় না—শব তখন বাড়ীর ভিতরেই মরে পড়ে থাকে! হস্তভাগ্য মোহনের এখন সেই অবস্থা হয়েছে,—তার জীবন এখন মরণেরই নামান্তর।

মোহনের অবস্থা দেখে আমার বারংবার মনে হোতে লাগল, না-মানি সরমা এখন কি করছে! কে তাকে সাহায্য দেবে, সে অচাঙ্গী যে একাকী!

মোহন আর আমি বাইরের ঘরে বসে সুরেনের জন্তে অপেক্ষা করছিলাম। মোহন ত কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে রাজি নয়,—বলে, তাকে ছেড়ে সরমা চলে যাবে, এটা সে কিছুতেই সইতে পারবে না। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে তাকে স্থির করেছি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “স্বামীর কাছে যাওয়া সবচেয়ে সরমার কি মত তা জানো?”

মোহন উদাসভাবে বললে, “সরমার সঙ্গে এ ক-দিন আমার দেখা হয়-নি, আমি

যেথা করতে পারি-নি! তবে যমুনার মুখে
গুনলুম, স্বামী কাকে সে যেতে চায়।”

আমি বললুম, “হ্যাঁ, এ ছাড়া আর
উপায়ও নেই। এ ব্যাপারের পর এখানে
থাকা তার লক্ষ্যে অসম্ভব।”

কিন্তু কি ভয়ানক অবস্থা তার!
স্বামীকে সে ভালবাসে না, তার স্বামীও
তাকে ভালবাসে না। সে তার স্বামীর
কাছে থাকে কর্তব্যের জন্য; আর তার
স্বামী তাকে গ্রহণ করছে—খুব সম্ভব—
অর্থের জন্য! এ মিলন ত স্বর্গের হবে
না! মোহনের চেয়ে সরসার অবস্থা ঢের-
বেশী শোচনীয়, এবে জীবন্তে সমাধি!
নিরন্তর এ কঠোর বিধান কি-করে’ সে
সহ করবে!

এমনসময় একথানা গাড়ী সরসার
বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। আমি তাড়া-
তাড়ি রাস্তার বেরিয়ে পড়লুম। মোহন
কিন্তু নড়ল না, যেমন বসেছিল, তেমনি
অটল হয়ে বসে রইল।

গাড়ীর ভিতর থেকে যে লোকটি বাইরে
এল, তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। মাথার
বাঘরি-কাটা চুলের বাহার, চোখে নীল
রঙের চশমা, হাতে ছড়ী, কাপড়-চোপড়ে
বেশ বাবুয়ানা আছে—চেহারাটি কালো
হলেও কৃত্রী নয়।

আমাকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে,
“মদাই, এইটেই কি সুরারিবাবুর বাড়ী?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কাকে
পূজছেন?”

—“সুরারিবাবুকে।”

—“তিনি ত মারা গেছেন!”

সুরারিবাবু মারা গেছেন শুনে লোকটি
কিছুমাত্র বিমিত বা হতবুদ্ধি হোল না, বেন
সে একথাটা শুনেই বলে আগে থাকতেই
প্রস্তুত ছিল। সে অধু বললে “মারা
গেছেন বুঝি?”

—“আপনার নান সুরেনবাবু?”

সে আশ্চর্য হয়ে একবার আমার
আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, “বাঃ!
আমার নাম কি-করে জানলেন আপনি?”

—“আম্বায়ে।”

—“এ ত ভারি গঠিক আন্দাজ!
আপনার নাম কি?”

আমি নাম বললুম।

—“সুরেনবাবু, সুরারিবাবুর বাড়ীতে
এখন কে আছেন?”

—“তার ঘরে।”

—“একলা?”

“হ্যাঁ, একলা বটে, কিন্তু আম্বাই
এখন তাকে দেখি-শুনি।”

—“আপনারা!”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা—অর্থাৎ আমি
আর আমার বন্ধু মোহন।”

“মোহন? ধীর সঙ্গে আমার দ্বায়
বিবাহের—” বলতে-বলতে সুরেন হঠাৎ থেমে
পড়ল।

—“সুরেনবাবু, আপনি ত দেখছি সমস্ত
খবরই রাখেন!”

সুরেন বাধে-বাধে গলায় বললে,
“আপনি নবীনবাবুকে চেনেন বোধ হয়?
তার মুখেই আমি একথাটা শুনেছি।”

“নবীন? সে কি” শান্তিপুরের সেই
জমিদার নবীন, বাধ সঙ্গে আমার—”

—“হ্যাঁ, ধীরে সঙ্গে আপনার কিছু গোলমাল হয়েছিল।”

—“আপনি তাকে চিনলেন কি-করে?”

—“আমার বিজ্ঞাপন দেখে তিনি দয়া করে আমাকে মুরারিবাবুর খোঁজ দিতে এসেছিলেন।”

—“বটে! এ বিবাহের কথা-পর্যন্ত যখন সে জানে, তখন নবীনচন্দ্র অসুস্থ হয়ে এখনো আমাদের যত্নগ্রহণের নেন দেখছি। আর সুরেনবাবু, এটাও বড় আশ্চর্যের কথা যে, আপনি ত এত খবর রাখেন, অথচ মুরারিবাবুর মৃত্যুসংবাদ জানেন না!”

সুরেনের পাণী মন,—তাই ধরা পড়ে গেছে বুকে সে চটেই লাল! চড়া গলায় বিরক্ত হয়ে সে বললে, “মশাই, আপনার কাছে জবাবদিহি করতে আমি আনি-নি, আমি এসেছি আমার স্ত্রীকে নিতে!”

—“চলুন, আপনাকে আমি বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।”

—“শাক করবেন মশাই, আপনার কোন সাহায্যে আপাতত আমার দরকার নেই”—এই বলে সুরেন নিজেই সরমার বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে গেল।

—“শাক করবেন মশাই, আপনিই যে স্বার্থ সুরেনবাবু, সেটার প্রমাণ না পেলে আপনাকে আমি বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছি না”—এই বলে আমি তার পথ জুড়ে দাঁড়ালাম।

—“কী, আপনি আমার বাধা দিতে সাহস করেন!”

—“আপনি অকারণে রাগ করবেন না।

মুরারিবাবু যখন তাঁর কস্তার তার আমাদের উপরে দিয়ে গেছেন, তখন বুকে দেখুন, এটা আমার কর্তব্য কি না!”

—“সকল, সকল বলছি!”

আমি অবহেলার হাসি হেসে অটল ভাবে বললাম, “শাক করুন।”

সুরেন সবলে আমাকে ধাক্কা দেবে বললে, “আমাকে বাধা দেবার কোন অধিকার তোমার নেই।”

আমি শান্ত স্বরেই বললাম, “আমাকে ধাক্কা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।”

সুরেন মহা চটে আমাকে ঘূষি মারবার জন্তে হাত তুললে—কিন্তু আমাকে স্পর্শ করার আগেই আমি চট করে তার হাত-খানা ধরে ফেললাম।

সুরেন হাত-ছাড়িয়ে নেবার জন্তে বারকতক চেষ্টা করলে; কিন্তু অনেক ধস্তাধস্তিতেও না-পেরে শেষটা কৃত্ত আক্রোশে ফুলতে-ফুলতে চোঁচিয়ে উঠল, “ছাড়ো হাত—নইলে—”

—“নইলে কি সুরেনবাবু? কীভাবে, না লোক ডাকবেন? দেখছেন ত, মুরারি-বাবু তাঁর কস্তার তার হুর্দল হাতে সমর্পণ করে যান-নি! স্ত্রীস্বামী এখানে বলপ্রকাশ বুধা,”—এই বলে আমি তার হাত ছেড়ে নিলাম।

—“তাহলে, আপনি আমাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না, কেমন?”

—“সুরেনবাবু, আপনি অবোধের মত কথা বলছেন কেন? আপনার স্ত্রীর কাছে আপনি যাবেন এতে আমার আপত্তি করার

কি শক্তি আছে? আমি কেবল কর্তব্য-
বোধেই আমার সম্বন্ধভঞ্জন করতে চাই।”

—“কিন্তু আমি থাকতে পরপুরুষের
সামনে আমার দ্রোহ—”

—“চূপ, চূপ, এমন কথা মুখে আনবেন
আপনার স্বাী আমার সহোদর ভ্রাতার

এমনসময় সরমার বা বাড়ীর ভিতর
থেকে বেরিয়ে এসে বললে, “দ্বিধামণি
বললেন, জামাইবাবুকে ভিতরে যেতে!”

হঠাৎ উপরদিকে আমার দৃষ্টি গেল।
যেখি, বারান্দার এককোণে অত্যন্ত বিবর্ণ
ভাবহীন মুখে মলিনবসনা সরমা কাতর
চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে
আছে!

আমি তখন মাথা হেঁট করে’ পথ
ছেড়ে সরে এলাম;—সুরেন পল্লিত হাসি
হাসতে-হাসতে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে, আমার
মুখের উপরে সম্মুখে সবার দরজাটা বন্ধ
করে’ দিলে।

সুরেন বুঝতে পেরেছে যে, আমি তার
কপটতা ও মিথ্যাকথা ধরে কেলেছি।
পাছে সরমার কাছে গিয়ে সমস্ত প্রকাশ
করে’ দি, সেই ভয়েই তার আগে আমাকে
বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দিতে তার অত
আপত্তি! সরমা যদি জানতে পারে, তার
অর্থের উপরেই সুরেনের দৃষ্টি, তাহলে
স্বামীর সঙ্গে যেতে সে নারাজ হোতে পারে,
সুরেনের এও একটা মত ভর।

কিন্তু সরমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমার
মনে আশঙ্কা হচ্ছে! সরমার সঙ্গে মোহনের
বিবাহের কথাটাও সুরেন টের পেরেছে।

একে সে সরমাকে প্রীতির চোখে দেখে
না, তার উপরে এই ব্যাপার! সরমা
কি অবস্থার পড়ে’ যে এই বিবাহে রাজ
হয়েছিল সুরেন ত তা ভেবে দেখবে না।
এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করে’ সরমাকে বাক্য-
ব্যগ্রণা ত সহ করতে হবেই,—তাছাড়া
আরো কত লাহুনাই যে তাকে সহ্যে
হবে, তা স্মৃতি ভগবানই জানেন। তার
কপালে অনেক দুঃখ আছে, এ দুঃখ আর
কেউ ঘুচাতে পারবে না। ঘটনা-চক্রের
এ কী পরিবর্তন,—দ্রুতি তরুণ প্রাণের সকল
পুলক-হাসির উপরে অশ্রু-সমাধি পড়ে
ভবিতব্যতা আজ যে স্মৃতিতে তার স্মৃতি
এসে দাঁড়িয়েছে, তা কি ভীষণ কি নির্ধন
কি কঠোর!...সরমা এ জীবনে আর কি
কখনো স্মৃতির সুখ দেখবে?

ভারাক্রান্ত মনে ঘরের এককোণে
বসে-বসে এই-সব কথা ভাবছি আর ভাবছি।
মোহন জানলার কাছে টেবিলের সামনে
মুক সৃষ্টির মত বেগন বসেছিল এখনো
ঠিক তেমনিই বসে আছে। কী যে ভাবছে,
গেই জানে!

হঠাৎ রাত্তির গাড়ীর শব্দ হোল।
মোহনও চমকে উঠে সুখ ভুলে রাত্তির
দিকে চাইলে, আমিও দাঁড়িয়ে উঠে
তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এগিয়ে গেলুম।

সরমার গাড়ী। মোহনের বাড়ী ছেড়ে
সে চলে যাচ্ছে—বুঝি জন্মের মত। মোহনের
তখনকার চোখের ভাব যে দেখেছে জীবনে
আর-কখনো তা ভুলতে পারবে না।

সরমা, গাড়ীর একটা খোলা জানলার
কাছে বসে আছে।

মোহনও তাকে দেখতে পেলে, সরমার করুণ নরনও মোচনকে দেখে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর, চমকনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল,—নিম্পলক নেত্রে, নিম্পন্দভাবে, নিস্তব্ধ হয়ে! তাদের ভিতরকার ঐশ্বর্য তখন যেন নরন দ্বিগুণে বোঝা করে' বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

গাড়ী ক্রমেই ধীরে, ধীরে—আরো ধীরে চলে যাচ্ছে।

মোহন আবেগভরে দাঁড়িয়ে উঠল।

তারপর, সামনের দিকে বতটা পায়ে হুঁক পড়ল!

গাড়ীখানা রাস্তার মোড়ের কাছে হঠাৎ থমক হয়ে গেল।

মোহন শূন্যপথের দিকে উদ্বাসচোখে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হঠাৎ টেবিলের উপর হুঁতে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি তার কাছে দিগে দেখলুম, সে অজান হয়ে গেছে! ক্রমশ

ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভারতবাসী ও ভারতীয় ইংরেজ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সম্ভাড়া)

যে সকল সাধারণ কারণে ভারতবাসী ও ইংরেজ—এই দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনে বাধা হয় সেই সকল সাধারণ কারণ ছাড়া আর কতকগুলি বিশেষ-কারণের উল্লেখ করা বাহিতে পারে।

ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার। ভারতবাসীর নিকট বিদেশী মাত্রই রেছে। যে সকল জিনিস বিদেশীরা স্পর্শ করে, তাহা কলুষিত হয়। উচ্চবর্ণের সিপাহীরা, ইংরেজ সেনানায়কের দ্বারা-শুট খাওয়া ধরে নিক্ষেপ করে। যে সকল যুরোপীয়, ভারতবাসীর অধিকার-সমর্থনে, ভারতবাসীর সাহায্যার্থে, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের সহিতও ভারতবাসীরা কখনই

খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করে না। মাত্রাতিরিক্ত হিন্দুরা স্ত্রাসনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা Hume সাহেবের সহিত একত্র আহার করিতে সম্মত হইবে,—ইহা একটা অসম্ভবতরূপ সাহসের দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; যদিও Hume একজন নিরামিষাশী, এার হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিলেও চলে। ইংরেজ মহিলাদিগকে তেমন স্বেচ্ছাপূর্বক অস্ত্র-পুর্বে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং “আমোয়া”র দ্বারা উচ্চবর্ণের ভারতবাসিনীরা, তাহাদিগের সহিত “বেম-লোকের” মতো ব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে ইংরেজের স্বভাব। প্রাচ্যেরা যেমন বাচাল, ইংরেজরা তেমনি নীরব; প্রাচ্যেরা যেমন হুন্মা ও ভদ্র, ইংরেজরা তেমনি ক্ষুদ্র; প্রাচ্যদিগের 'কমনবুতি' ও অলস বাগ্ধিতা বেরূপ প্রবল, ইংরেজের তেমনি খটখটে তথ্যপ্রবণ প্রকৃতি। Cotton সাহেব তাঁর "জাত-ভাই"দিগের চরিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"প্রগাঢ় আশ্বসত্যোঃ—ইহাই অ্যাংলো-সেক্সন চরিত্রের একটা বিশেষত্ব : ইংরেজ-চরিত্রের এই লক্ষণটা ইংলণ্ডে স্পষ্ট লক্ষিত হয়; কৃষিকা-প্রাণ যে সকল ইংরেজ যুরোপ-মহাদেশে ভ্রমণ করে তাহারা ইহারাই নিমিত্ত সেখানে অশ্রীতিভাজন হইয়া পড়ে, এবং এই আশ্বাসিতমান ভারতে গিয়া শ্রমই বিকট আকার ধারণ করে। যে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভারতে কাজ করে, তাহারাও এই মানবীর দুর্বলতা হইতে অব্যাহতি পায় না, তাহাদের এই দুর্বলতা অধীনলোকের তোষামোদ ও দাস্যে আরও বৃদ্ধি পায়। আমাদের প্রাচ্য প্রজাগণ তাহাদের এই দুর্বলতা বৃদ্ধিতে পারিয়া প্রাচ্য প্রথা-অনুসারে, উপর-ওড়াল প্রভৃতি প্রতি অতীব নীচ ধরনের ভ্রুতিবাদ করে। ইংরেজ কর্মচারীরা এইরূপ আচরণের প্রতি বাহুল্য অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও, ভিতরে ভিতরে চুট ছন, এবং ঐরূপ আচরণের একটু ব্যত্যয় দেখিলেই তাহাদের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

কোন সিপাই যুক্তিসঙ্গত কারণে কথার অব্যাহা হইলে, কোন ইংরেজ রাজপুরুষ তাহাকে দরজা চাবকাইয়া দিবে; কোন রাজপুরুষ পুলিশের লোককে প্রহার করিবে; আবার, মাতার কোন সেনার সম্মানার্থে অবাঞ্ছিত জমিদার উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দেখিয়া অব হইতে অবতরণ করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিলে সেই রাজপুরুষ তাহার প্রতি দার-পর-নাই অসং ব্যর্থতার করিবে (১)।

ভারতবাসীর শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াও ইংরেজ দ্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতা বঝায় রাখেন, এবং ভারতবাসীকে পোষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র করেন।

মালাবারী বলেন :—

"কি ইংলণ্ডে, কি ভারতবর্ষে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে কিরূপ সঘর্ষ থাকি উচিত, সেই বিষয়ের আমি উল্লেখ করিতেছি। এই সঘর্ষ যে বহুদূরের সঘর্ষ হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমরা সকলেই এক-মত। এই অবস্থাটা বাহ্যতে ঘটিয়া উঠে তজ্জন্ত ভারতবাসীর সহিত রেবারেবি করিয়া ইংরেজরা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া থাকেন। কি সরকারী কি বেসরকারী অধিকাংশ ইংরেজই দেশীর লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত যে সহায়ত্ব করেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সদায় বহুদূরের মধ্যে কতকগুলি লোক যে বহুদূরের একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেন (আমরা এমিগ্রাবাসী যে-বহুদূর অন্ততঃ

করি সেই প্রকৃত বস্তু তাঁহাদের নিকট আশা করাটা দুৰাশা) সে বিষয়েও আমি স্থনিশ্চিত। কেননা, আমার মনে হয়— যে-ইংরেজ সৰ্ব্বদাই আমাদের নিন্দা করেন, সেযাহুসন্ধান করেন, তিনি যেমন অনিষ্ট করেন; যে-ইংরেজ আমাদের উপর যুক্তি-যানা করেন, তিনিও তেমনি অনিষ্ট করেন। কথটা শুনিতে একটু অদ্ভুত হইলেও আমার মনে হয়, আমাদের হিত-চিন্তা কম করাও যেমন খারাপ, বেনী করাও আমাদের পক্ষে তেমনি খারাপ। আমরা যদি বাস্তবিকই যোগ্য হই, আমাদের সহিত ঠিক সমকক্ষভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমাদের বাহ্য প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা তোমরা আমাদের দিও না,— তা, সে কথাতেই হোক বা অন্য প্রকারেই হোক। ফুলে, কলেমে, সরকারি কার্যক্ষেত্রে, তোমাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিরা, যুক্তিযুক্তি করিরা, আমাদের অধিকার আমরা অর্জন করি। আমরা চাই সমান বিচার—তা-ছাড়া বেনী কিছু নয়।”

এক্ষেপে, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

হাজার হাজার বৎসর হইতে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, দরিদ্র, নিরীহ, উন্নয়ন ভারতের চাষা, যেমন অল্প সমস্ত বৈদেশিকদিগের শাসন সহ করিরা আসিয়াছে, ইংরেজের শাসন তেমনি সহ করিতেছে; বরং আরো সহজে সহ করিতেছে। চাষার অবস্থা পূৰ্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। সৰ্ব্বত্রই শৃঙ্খলা, শান্তি, জায়বিচার; কৈন ধর্ম্মবট উৎপীড়ন নাই। আইনের বলে তাহারাজী ভূমির স্বত্বাধিকারী

হইয়াছে এবং খাজনার চার পূৰ্ব্বাপেক্ষা কম। তা ছাড়া, অধিকাংশ রায় ইংরেজ-দিগকে কল্যাণে দেখিতে পার। ভারতের প্রায় ত্রিশকোটি লোকের মধ্যে, কেবল ১৬৮,০০০ যুরোপীয়; তন্মধ্যে ৬৪০০০ সৈনিক। একলক্ষ ও কয়েক সহস্র অ-সৈনিক যুরোপীয়দিগের মধ্যে তিন-চতুর্থ ভাগ সহরে বাস করে। অল্প যুরোপীয়গণ সরকারী কর্মচারী বা ভূম্যধিকারী। ইংরেজ কর্মচারী-গণ, বড় বড় পদ অধিকার করেন; অথবা তাহারাজী কতকগুলি বিশেষ কাৰ্যের ভার প্রাপ্ত হন,—যথা টেলিগ্রাফ, পূর্বকর্ম, ট্যাটিন্টিক্স ইত্যাদি। যুরোপীয়দের মধ্যে ভূম্যধিকারী খুবই কম; কাহারও কাহারও চার ক্ষেত আছে; তাহাদের কুলিরা হিমালয়ের অর্ধসভ্য জাতিদিগের অন্তর্ভুক্ত; কেহ কেহ নীলের, কেহ কেহ পাটের, কেহ কেহ আকিমের চাষ করেন। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে বাস করেন। এই একমাত্র এদেশে যেখানে ইংরেজ ও রায়তের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। মাজাজ প্রেসিডেন্সীতে ও গুজরাটে ইংরেজ ভূম্যধিকারীর সংখ্যা খুবই কম, ভারতের অবশিষ্ট স্থানে ইংরেজ ভূম্যধিকারী একেবারেই নাই। ইংরেজ ভূম্যধিকারী, অধিক লাভের আশায় দেশের লোকের প্রতি কঠোর, এমন-কি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিরা থাকেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ভারতীয় অমিদার আরো-বেনী মুক্ত, এবং তাহার বাহ্য ব্যবহার মিঠা হইলেও, নীচ জাতের প্রতি তাহার অবজ্ঞা অত্যন্ত বেশী, উৎপীড়নও খুব কঠোর।

খুব সাধারণভাবে এই কথা বলা হইতে পারে যে, ইংরেজের শাসন-সম্বন্ধে রায়ব্রা উদাসীন। এই শাসনের ফলে, ব্রিটিশ-রাজ্য ছাড়িয়া রায়ভোরা দলে-দলে দেশীয় রাজার রাজ্যে গমন করে না; দেশীয় রাজার রাজ্য হইতেও ব্রিটিশরাজ্যে আসে না!

ইহার বিপরীতে, বড় বড় সহরে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল।

ভারতের সাধারণ লেখক ইংরেজকে বৈরাগ্য ভর ও সম্মানের চক্ষে দেখে, বিশ্বর ও ভক্তির চক্ষে দেখে, Kipling তাহার বেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

বুড় ‘ইমান্-দ্দিন’ তাহার ছোট ছেলে মহম্মদ-দিনের জন্য একটা গোলা-গেলিয়ার গোলা ইংরেজ-হানির নিকট চাহিতেছে (২) :—

“ধর্ম্মাবতারের কি এই গোলায় আর কোন বদকার আছে? হুজুরের হুজুর হই তো এই গোলাটা আমার ছোট ছেলেকে দিই, গোলাটা যেবে তার বড় খেলতে ইচ্ছে হইবে।”

Kipling বলেন,—“তার পর দিন, নিত্যনিয়মিত আমি যে সময়ে আফিস হইতে ফিরি, তাহার আশবকী পূর্বে আমি আফিস হইতে ফিরিয়া, খানা-কামরার প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি ছোট শিশু—বেশ গোলগাল, একটা খাটো কামিজ পরিয়া আছে, তাহাতে

তাহার মোটা পেটের অর্ধেকটি বাহ্যে ঢাকিয়াছে—আমি প্রবেশ করিলাম, সে চোখ মেলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমি মুক্লাম সে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি পোখান হইতে পলাইলাম,—একটা কান্নার চীৎকার আমার অনুসরণ করিতে লাগিল দশ সেকেন্ডের মধ্যে ইমান্-দ্দিন, খানার কামরার আসিয়া উপস্থিত হইল। হুঁপাইয়া হুঁপাইয়া কান্না। আমি ফিরিয়া আসিলাম। ছেলোটো কামিজটাকে কমানোর মত ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া ইমান্-দ্দিন ছেলেকে বদকাইতে লাগিল :—“ছেলোটো বড় বদমাশ ও শেবে বেখুছি খেলে বাবে।”

“তোমার ছেলেকে বল, সাহেবের রাগ হয়-নি,—তাকে নিয়ে এসো।”

ইমান্ বলিল :—“ওর নাম মহম্মদ-দিন, ও বড় বদমাশ।”

আপনার বেকার অবস্থা অনুভব করিয়া ছেলোটো বাপের কোলে আবার ফিরিয়া আসিল এবং নির্ভীকভাবে বলিল : “মতি সাহেব, আমার নাম মহম্মদ দিন। কিন্তু আমি বদমাশ নই; আমি একজন মানুষ।”

‘গুজরাট ও গুজরাটী’ নামক গ্রন্থে একটা মজার দৃষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন সাহায়ে, আয়ারনওয়েস্টার এক সৈনিক, খাভাল হইয়া বোম্বারের এক ন্যাপিতকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে।

হিন্দু ন্যাপিত হনে হনে তাবিল,—
নালিস করব? নালিস্ করে’ কি হবে?

নাপিতকে মারবার অধিকার গোরা-সেনারের নিশ্চয়ই আছে।

সে তাহার স্বাক্ষর কাছে গিয়া সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল, আর তাহাকে এইরূপ অমুরোধ করিল :—“গোরা-সেনাই তোমার উপর মারশীঠ করেছে, এই বলে তার নামে তুমি নাশিল কর।” বৃদ্ধা সম্মত হইল : আমূলসংস্কারপন্থী অগ্ন্য উৎসাহী একজন উকীল, বিদেশী উৎপীড়কবর্গের রীতি-নীতি সৰ্ব্বদে খুব একচোট চুনাইয়া দিবার সুযোগ পাইল। আর তিনি বিচারক, তিনিও হিন্দু—তিনি তো জুয়েই সারা ; তিনি যদি একটুও কুলচুক করেন তাহা হইলে সমস্ত ইংরেজ সংবাদপত্র তাহাকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করিবে।

আদালতে এইরূপ বিচার চলিতেছে :—

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (নাপিতের স্বাক্ষর প্রতি) এখানে দাঁড়া, মাগি। সাহেব কি তোমার উপর মারশীঠ করেছিল ?

রমণী। (আমতা আমতা করিয়া) আপনি আমার মা-বাপ।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। বেত্ খাবি যদি আমার কথার সোজা জবাব না দিলে। সাহেব তোকে মেরেছিল ?

রমণী। আমি গরীব বিধবা ; আমার স্বামী আপনাদের ক্ষৌরী করিত, মা-বাপ !

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (রাগিয়া) পাহারীওহালা, ইথার আও। এখন আমার কথার জবাব দিবি কি না বল্। এই গোরা কি তোকে মেরেছিল ?

রমণী। মা-বাপ, আমার জানাইকে মারাও যা, আমাকে মারাও তা। একই

কথা। (উকীল মাথা হেঁট করিয়া রহিয়াছে ; নাপিত স্বাক্ষর দিকে কটমট্ করিয়া তাকাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাসিতেছে, গোরা-সৈনিকের মুখেও উৎসাহের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে) সমস্ত সহর একথা জানে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কোন্ কথা জানে ?

রমণী। আমি ভালো ভালোক এই কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কিন্তু ও কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

রমণী। আমার শ্রমীর বাবা হজুরের ক্ষৌরী করত—এই কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (তিতি-বিরক্ত হইয়া উকীলের দিকে ফিরিয়া) দেখুন মিষ্টার রাইম্যান, প্রতিবাদী আর কাউকে এহার করে থাক্বে।

উকীল। (এই কথার হৃদ ধরিয়া গোরার প্রতি) এই নাপিত ভত্রলোকটির উপর তুমি কি মারশীঠ করেছিলে ?

গোরা। তুমিই বলো-না বাহু !

উকীল। কথাসলো একটু ওজন করে বলো।

গোরা। আমি কথা ওজন করব কি-করে ?

উকীল। তুমি আমার সঙ্গে কথা-কাটা-কাটি করবার ক্ষমতা এখানে এসেছে ?

গোরা। তাই কি আপনি মনে করেন ?

উকীল। (খুব রাগিয়া) Hold out your tongue, sir—(“hold your tongue” না বলিয়া)।

এই সুযোগ পাইয়া, গোরা সৈনিক খুব গম্ভীরভাবে ধারণ করিয়া, তাহার জিব্ বাহির করিল—(একটা বড় লাল লড়-বড়

জিনি' সুখ হইতে কুলিরা পড়িল। দর্শকেরা খুব হাসিতে লাগিল। উকীল হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। নাপিত, রূপা ও অবজার ভাবে উকীলের দিকে তাকাইল। মাজিষ্ট্রেট হাসিয়া খুন। আপন সুখের ভিত্তর রেশমী ক্রমাল ও জিয়া দেওয়ার দম্ আটকাইবার যোগাড় হইল।

মোকদ্দামা ডিম্‌মিস্ হইল। (Malabari, "Gujarat and the Gujaratis"—Scenes in a Mofussil Magistrate's Court).

"Indian Mirror" নামক এক হিন্দু সংবাদপত্রে, ইংরেজের সম্বন্ধে লোকের মনোভাব বেশ বিবৃত হইয়াছে :-

"সাধারণতঃ শাসনিত্বভাতির উপর দেশীয় লোকের একটা বিষয় আছে বলিয়া দেশীয় লোকের প্রতি যে দোষারোপ করা হয়, তাহা সত্য ও স্তারসম্মত হইলেও, ইংরেজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দেশীয় ব্যক্তিবিশেষের আসক্তি ও অস্বরাগ দেশীয় চরিত্রের একটা লক্ষণ নহে। ভারতের যে-কোন অংশেই ভ্রমণ কর না কেন, এমন একটি স্থানও দেখিতে পাইবে না যেখানে, ভালোই হোক মন্দই হোক, ইংরেজের হাতের ছাপ স্পষ্ট না দেখা যায়। যেমন একদিকে খারাপ ও প্রজাপীড়ক ইংরেজের নাম লোকেরা প্রায় বিবৃত হইয়াছে, তেমনি আর এক দিকে ভালো ও উদারমুখ্য ইংরেজের নাম বংশপরম্পরক্রমে লোকের স্মৃতিপটে তাভাভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে;—ইহা দেশীয় লোকের চরিত্রগত ক্রমা ও কৃতজ্ঞতার

সাক্ষ্য দেয়। কাহারো প্রতি তীব্র বিষয় পোষণ করা দেশীয় লোকের স্বভাবই নহে! দেশীয় লোকের হৃদয় স্বভাবত দয়ালু; শাসনিত্বভাতিভূক্ত কোন লোক এই দয়ার পাত্র হইলে, এই দয়ার মাত্রাটা বরং আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের নিকট সব সময়ে যে আমরা প্রতিদানের প্রত্যাশা করি তাহা নহে, আমরা পতিত প্রজার জাতি, আমরা কত বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকট কণী, —এই মনোভাব হইতেই আমরা তাঁহাদের উপকার করিবার জন্য সর্বস্বত্বক হই। তাঁরা যদি আমাদের অমিত্র ভাল করিতেন, অর্থাৎ ভালোর সহিত কিছু কিছু মন্দ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে বসিতাম;—বাহার! আমাদের উপকার করিয়াছেন কিংবা উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের এমনই অল্প অস্বরাগ।

ইংরেজ বলিয়াই আমরা ইংরেজের বিষেবী, একথা নিতান্ত অস্বাভাবিক। একথা খুবই সত্য, যেসকল যুরোপীয়, দেশীয় লোকদিগকে অবজ্ঞা করিবার, গালি দিবার, অবনত করিবার কোন সুযোগই ছাড়ে না, তাহাদিগকে দেশীয় লোকেরা বিষয় করে। কিন্তু এ কথাও খুব ঠিক যে, পাল্‌স্তাত্‌ জাতির অন্তর্ভুক্ত যেসকল লোক দেশীয় লোকের ভাল করে কিংবা ভাল করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাদের প্রতি দেশীয় লোকের শ্রদ্ধা ও অস্বরাগ অপরিসীম।" (New India" এখে উদ্ধৃত)

শ্রীজ্যোতির্জনাথ ঠাকুর।

ঝড়

(পর)

আমার বেশ মনে পড়ে, সে-ও এমনি
ঝড়ের রাত—চারিধারে বাতাসের এমনি
গর্জন, আকাশে মেঘের এমনি ছুটোছুটি !
পনেরো বছরের কথা,—তবু মনে হয়, যেন
সে কালকের ঘটনা ! সেই রাতটিকে যদি
আজ আমার সর্বস্ব দিয়েও কেন্নাতে
পারতুম !

বাবা আমার মণ্ড জমিদার । মানসম্মত,
আদব-কায়দার যিকে পূরোমস্তর তাঁর টান
ছিল—স্মৃতি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে । সকলে
বলত, 'হাঁ, বাপুকা বেটী !' মা বলতেন,
বাবার অহঙ্কারটুকুও কি পূর্ণমাত্রায় পেতে
হয় ! মেয়েমানুষের পক্ষে ও জিনিষটা যে
ভারী সর্ব্বনেশে !

তখন বকিনি, আজ বুঝি, আমার
মেহমতী মার সে কথাটুকু কত খাটি !
মাগো, চিরদিন নিজেকে সবার আড়ালে
সবার পিছনে রেখে সকলকে তৃপ্তি দিয়ে
কেন অত তাড়াতাড়ি তুমি চলে গেলে !
কেন মা, তোমার এই হৃদয় মেয়েটিকে
তার সব অহঙ্কার সব গর্ব্ব চূর্ণ করার মত্ন-
টুকু ঘাবার বেলায় শিথিরে দিয়ে গেলে
না ? তাহলে তাকে যে আজ বুকের মধ্যে
এমন বেদনা নিয়ে—

সেই কথায় বলতে বসেছি । কোন-
খানে এতটুকু গোপনতা রাখব না !
মাছের কাছে আমি ত বিচার চাইতে
আসিনি—এ যে আমার নিজের সঙ্গে বোকা-

পড়া ! রাধা-চাকার কঁকি ত আর নিজের
মনের সঙ্গে চলে না ।

আমার বয়স তখন দশ বৎসর—আমার
লক্ষী মা হঠাৎ একদিন বাড়ীটার কান্নার
বোল ভুলে বিদায় নিলেন । বাবা
ছিলেন পুরুষ—তিনি সংসারী জীবের এই
মৃত্যুকে চিরন্তন সত্য মেনে বিধা শোকের
ধোঁয়ার নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন
না । তিনি তাঁর জমিদারীর কাণ্ড-কর্মে—
পথ-ঘাট তৈরী, খাজনা-আদায়, বাকী
বকেয়া উহুলের দরূণ বেয়াসব প্রজাকে
শায়েস্তা-করণ প্রভৃতি—বেশ যথানিয়মেই
করতে লাগলেন ।

যেথেকে সকলে বললে, মার মৃত্যুর পূর্বে
বেশন, পরেও তেমনি তাঁর কাজ-কর্ম্মের
ধারাটি বেশ অবিরামভাবেই বয়ে চলেছে ।
আচার-ব্যবহার বা ভাব-ভঙ্গীতে কোথাও
এমন একটু ফাঁক দেখা গেল না, বা থেকে
বাহিরের লোকে কোনরকম বিচ্ছেদ বা
অমঙ্গলের আভাস পেতে পারে ! বাড়ীর
গুরু-পুত্রোহিত শাস্ত্র আওড়ে মাথা নেড়ে
বলেছিলেন, 'এই ত হিরণী মূনির লক্ষণ !
আর একমল লোক আড়ালে বলাবলি
করেছিল, মানুষটাকে কি ভগবান এক
কোঁটা প্রাণও ধেন-নি ! এ কথাটা খুব
অক্ষুটে অশ্লষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও
আমার কাণে পৌঁছতে কিছুমাত্র বাধা পার
নি ।

এমন বাপের মেয়ে আমি—মা-মরা
সেই! বোধ হয়, নিজের সম্বন্ধে এর
বেশী আর কোন কথা না বললেও চলে!

লেখাপড়া পান-বাজনা—এই সব নিয়ে
বেশ একটা স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলছিলেন।
বাহিরে বিশ্বের পানে চেরে দেখবার অবসর
ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পাঁচজনে এই স্বপ্নের
রাজ্যে একটা খবর নিয়ে এল যে বরস
আম্মর পনেরো পার হতে চলেছে! বাড়ীতে
এক বিধবা পিসি ছিলেন; তিনি বাবাকে
ভালিয়ে বললেন, এ বরসে হিম্মুর ঘরের
মেয়েকে আইবুড়ে রাখা কিছুতেই চলে না!
ইহলোকে শোকলজ্জা ত আছেই তা ছাড়া
পরলোকেও নরকি বিত্তর লাঞ্ছনা এম
হচ্ছে।

বাবা হেসে বললেন, নীক এখনও
ছেলেনামুহ। ওর যখন জমিদারী চালাবার
মত বুদ্ধি হবে, তখন ওর বিয়ে দেব!

পিসি বললেন, শোনো কথা! মেয়ে
নামুহ আবার জমিদারী চালাবে কি রকম?
তার চেয়ে নয় তোমাদের ঐ লেখা-পড়া
জানা শাস্ত্র শিষ্ট হুম্মর একটি ছেলে দেখেই
বিয়ে দাও; সেও তোমার বশে তোমারই
ঘরে থাকবে—জমিদারীও বজায় রাখবে!

বাবা বললেন, বেশী-নিরীহ লোক নীকর
সঙ্গে থাপ খেয়ে চলতে পারবে না।

পিসি বললেন, তা ঠিক! যে খিদি
মেয়ে!

পিসির মুখ গম্ভীর হল—বাবা চুপ
করলেন, আমিও পাশের ঘরে বসে অস্তির
নিশাস ফেলে বীচলুম!

বিয়ে!

এক-পা পছন্দা পরে আধ হাত ঘোঁরা
টেনে মুখ ঢেকে মাটির পুতুলের মত জড়-
ভরুটটি হয়ে বহের কোণে বসে থাকত!।
পরের ইসারাধ নড়া-চড়া খাওয়া-বলা শোয়া-
দাঁড়ানো—মুখে হাসতে পাব না, ঘুমে বুক
ভেঙ্গে গেলেও এককোঁটা চোখের জল
কেলবার অবিকার নেই—এই ত বাঙালীর
বৌয়ের মুখের ছবি! কাজ নেই আমার
অমন সোনার টাট বরের আঘরে ঢুবে
মংলার কথা! যেমন আছি, আমি বেন
এমনিই থাকি—এই পান-পান, খেলা-খুলা,
হাসিখুসি মিছে! কোন নতুন লোকের নতুন
সঙ্গ-সুখের বাব আমি চাই না!

মনের যখন এমনি অবস্থা, তখন এক
দিন বাবা বললেন, চ' নীক একবার পশ্চিম
ঘুরে আসি।

আমি বললুম, চল।

দিল্লী, আদ্রা, লক্কো, প্রয়াগ, নান্দান
দেশ ঘুরে আমরা একদিন এসে কান্টিতে
আজানা পাতলুম। ভীর্ণ বলে যে কান্টির
উপর টান পড়ল, সে কথা বললে মিথ্যা
বলা হবে। জানিনা, বাবা কোনদিন
বিশ্বনাথ-ধর্মানে গেছিলেন কি না—তবে
আমি গেছলুম—কিন্তু সে একদিন। সেব-
তাকে প্রণাম করতে বাব বলে ঘাইনি—
এ কথা ম্পষ্টই স্বীকার করি। এতে যদি
কেউ নাস্তিক বলে ত্রুণার নাক সিটকে মুখ
ফেরান, তাহলে নিরুপায়। আমি কিন্তু সত্য
কথা বলছি। আর বলেছি ত, কারো
বিচারের প্রত্যক্ষী হয়ে আমি নিজের এ

কাহিনী আঁজ বলতে বসিনি। আমি পেছলুম, মন্দির দেখতে—গুপ্ত সেই প্রাচীনতার কথা শুনে, তা দেখবার ক্ষেত্ৰহীন নিঃশেষ।

এবং এই যে কানীতে আটকে পড়লুম—সে পরকালে স্বর্গ বা নিবন্ধ-প্রাপ্তির গোতে নয়। বাবার এক বন্ধু ছুটে গেলেন; ছেলে-বেগার কবে নাকি হুঁজনে একপলকে কল-কাতার কোন্ ফুলে পড়েছিলেন—তাব ছিল—আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে হুঁজনে এই কানীতে বেথা। তাঁরই বন্ধুদের খাতিরে পড়ে বাবা বললেন, নীক যা, এখানে আর, কিছুদিন থেকে ঘাই।

যুগে যুগে আমিও একটু ভ্রান্ত হয়েছিলাম, বললুম, বেশ!

বাবার সে বন্ধুটির নাম বিত্তবাবু। বিত্তবাবু লোকটি ভারী অকৃত ধরনের। আধ্যাতিক গর্বে এমনই তিনি আত্মহারা যে পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতকে কুতূহ-বিড়ালের সাদৃশ্য বলেই তিনি মনে করতেন। বাবার সঙ্গে তাঁর তর্ক চলত। বাবা যখন সাংসারিক স্বচ্ছলতা বা মানবিক আধিত্যিক স্বখ-স্বাস্থ্যের কথা পাড়তেন, তখন বিত্তবাবুর তর্কে আধ্যাতিক আশ্রয় এমন ভীত তেজে জ্বলে উঠত যে তার দিকে বেশী এগিয়ে যাওয়া যে-কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ভ্রমের ছিল না। কারণ বিত্তবাবুর তর্কে আশ্রয় বতখানি জ্বলত, পালাপালের ধোঁয়া তার চেয়ে চেয়ে বেশী উঠত। সে ধোঁয়ায় তাঁর প্রতিপক্ষের চোখে জল বার করে তবে তিনি স্থির হতেন। আমি এক আধদিন আড়াল

থেকে তাঁর তর্ক-বুদ্ধি গুনতুম—কিন্তু কোনদিন সে তর্কে আঘাত দিতে আমার প্রযুক্তি হয়নি। বিত্তবাবুর বুদ্ধির বিরুদ্ধে বুদ্ধি বাড়ানো করতে মন আমার অশক্ত হত উঠত।

এই তর্কে এক-আধদিন আমার বিত্তবাবুর ভাগে তিনকড়ি খুব বুদ্ধি-মন্ডল হয়ে মেলত। তবে তিনকড়ির বরস ছিল কাঁচা, কাজেই আত্মবিশ্বাসবশত এমন মাতুলের বুদ্ধি-ধারা সে বেচারার ভেতর পর্য্যায়ক্রমে পান করতে পারত না। কলে অনেক সময়ই ঘটত এই যে তর্কের গোড়ার মাতুলকে অহুসরণ করতে গিয়ে শেষ-বস্তাবর তিনকড়ি বাবার বুদ্ধির স্রোতে ভেঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এসেই থই নিঃশেষ! তার সে আচরণ দেখে মাতুলের অবস্থা মাতুলের মত হয়ে উঠত! আমি মেন্থো বলে এদের কাণ্ড দেখে যেহে সারা হতুম!

একদিন এই তর্কের মুখে তারের উপর চেটে মাতুল বিশ্বনাথ বলে উঠলেন, তোমার মাথায় যদি এমন সব রেজ্ঞ তাব ভাল পাকতে থাকে তাহলে তোমার আমার কাছে বাস করতে যেওয়া ত নিরাপদ নয়।

এই আকস্মিক রসতলে তিনকড়ি একেবারে অবাক হয়ে গেল। বাবা কোনমতে গোল খামিয়ে সেদিন মাতুল-ভাগিনেয়ের সম্পর্কের বাক্যটুকু অটুট রাখলেন।

এর পর কথার কথার বাবা একদিন বললেন, বুলি নীক, এই বিত্তটা পাখল। এদিকে ত আমায় চাল-চলন তার পছন্দ হয় না—তবু বলে কি, জামিল,—বলে, ঐ তিন-

কড়ির সঙ্গে বধি তোমার ঘেরটির বিয়ে বাও
তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই! তিনকড়িরও
একটা বিয়ে হয়—তাছাড়া!—

আমার কাণ দুটো গরম হয়ে উঠল।
কি আশ্চর্য্য আজওবি সাথ! স্পর্ধাও
কম নয়! চোখে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে বাবার
পানে চাইলুম।

বাবা আমার ভাব বুঝতে পেরে বাড়টা
নেড়ে বললেন, তা হয় না। তবে এটুকু বুঝছি,
তিনকড়িকে বাড়ীতে রাখতে বিত্তর আর
তৈমন ইচ্ছে নেই। ছেলেটির লেখাপড়ার
দিকে চাড়া আছে—বিত্ত বলে, বা-হোক
কোন উপায়ে রোজগার করতে লেগে
বা!

বাবা যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে
কথাগুলো বলে গেলেন; আমিও তাই
তাতে কোন রকম সার বা সাড়া দেওয়া
প্রয়োজন মনে করলুম না।

তিনকড়ির দোষ এমন-কিছু দেখি না।
লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়। বাহিরের চেহারা
প্রকৃতি ভদ্রসমাজে চলবার মত—কিন্তু
বড় গরিব সে! হাঙ্, কাম কি আমার
মিছে তিনকড়ির কথা ভেবে।

এর পর একদিন এক মহার ঘটনা
ঘটল।

চৈত্র মাস। আকাশে সেদিন হপুর
থেকেই মেঘের একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল।
আমি তা গ্রাহ্য না করে চিরপ্রথামত বিকেলে
বেড়াতে বেরলুম।

কানীতে গ্রীষ্মান্তির মত একটা স্বাধীনতা

আছে—এমত হে ভীর্ণ, তোমার নমো
নমো! তোমার কল্যাণে বাঙালীর মেয়ে
এখানে তবু গারে একটু হাওয়া লাগিয়ে
তাদের নারী-জগৎ কতকটা সার্থক করতে
পার!।

সেদিন বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে চলে
অনেকগুলো গলিঘুঁজি পার হয়ে বেষ্টমাথবের
ধরমার এসে উঠলুম। তখন জোর বাতাস
বইতে শুরু হয়েছে। ধরমার উপর থেকে
ওপারে রামনগরের পানে চেয়ে দেখলুম।
রামনগর থেকে অসি অবধি গঙ্গার উপর
দিয়ে এপার-ওপার ছুড়ে কে যেন মত্ত
একটা বহু বালির বেওয়াল তুলে দিয়েছে।
আমার হাতে একখানা কমাল ছিল—দৃষ্টি
বাতাসে সেখানা উড়ে চকিতে যে কোথায়
চলে গেল, বুঝতেও পারলুম না। হু-হু
করে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল।
তখন ভাবলুম, না, বাড়ী বাই। বেষ্টমাথব
থেকে নেমে আবার গলি ভেদে একেবারে
দশাশমেধের কাছে এসে পৌঁছলুম। যথার
উপর আকাশ তখন বেশ কালো হয়ে
উঠেছে। দ্বিঘটিক কাঁপিয়ে কি-রকম
একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠেছে।
ঠাণ্ডা হলো হাওয়ার ওপার থেকে
অস্বস্ত রকমের একটা বুনো গন্ধ ভেলে
আসছে। আমি বাড়ীর দিকে চলতে
লাগলুম। পথে না আছে একখানা একা,
না গাড়ী! খানিক আসতে বৃষ্টির বড় বড়
কোঁটা করতে শুরু হল! গারে যেন
হাজার তীর ছুটছিল! আমি আরো
জোরে চলতে লাগলুম। বৃষ্টির বেগও এদিকে
আরো বেড়ে উঠল। আমার গা ছন-ছন

করতে লাগল। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, এই বৃত্তিতে আপনি পথে বেরিয়েছেন ?

পা কেমন ধমকে থেমে পড়ল। এই সময় আবার বিদ্বাৎ চমকে গেল। পিছনে চেয়ে দেখি, তিনকড়ি ; মাথার তার ছাড়া।

কোন জবাব দিলুম না ; ঘরকার ছিল না। তিনকড়ি বললে, এই বৃত্তি-ঝড়ে আর এগুবেন না। ঐ টিনের ছাটটার নীচে দাঁড়াবেন, চলুন। জলের বেগ কমলে আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।

তবুও কোন কথা বললুম না। তিনকড়ি ছাতাটা এগিয়ে এনে আমার মাথার ধরলে। অমন জীবন বৃহর্ষেও আমার হাসি পেলে। কি নির্লজ্জ রূপ-বোবন-লোলুপ পুরুষের এই সেধে সেবা দেবার প্রয়াস ! অতঃ দাম্ভ-পনা ! কেউ ত তার এ সেবা চায় না ! হায়রে এই পুরুষই আবার শত্রু লিখে জীবাতির উপর প্রত্নত্ব খাটাতে চায় ! জেনো, তোমরা নিত্যন্ত দুর্জয় দয়ার পাত্র বলেই জীবাতি তোমাদের এই সব পুঁথির বুলির বিরুদ্ধে কোন দিন কোন কথাটি কহ না—বাড় পেতে সমস্ত সন্ত করে দায় ! একবার যদি তারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের চোখের একটা বক্স ইলিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তোমাদের ঐ বহুমূল্য শত্রু আর স্বার্থ-পঙ্কিল প্রাণ !

হঠাৎ একটা খেরাল হল। সামনেই দেখি, এক বড় গাছের নীচে খুঁটির উপর টিনের ছাদ-দেওয়া একটুখানি ছোট আন্তানা। বোধ হয়, কোন সন্তানসী কোন বোণের

দুযোগে ছাউনি ফেলেছিলেন—এখন তার সেই পরিত্যক্ত আন্তানাটুকু ভক্তের স্বর্গে যাবার সোপান হয়ে পড়ে আছে। আমি সেট টিনের জাদ-দেওয়া ছাউনিতে এসে দাঁড়ালাম। বতখানি পারে তিনকড়ি আমার বৃত্তির জল আর কড়ের দাপট থেকে রক্ষা করার চেষ্টার ছাতা বিরে আড়াল তুলে দাঁড়াল। কড়ের তখন কি সে অচণ্ড বেগ—বৃত্তিরও কি ধোর ! মাপার উপর টিনের ছাদ হঠাৎ এক সময় তার বৃত্তির মাঝা ত্যাগ করে ভূমিসাৎ হল। আমার রক্ষা করতে গিয়ে তিনকড়ি তার দুই হাত তুলে টিনখানা ধরে ফেললে। তার জামা ছিঁড়ে হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল—তিনকড়ি শেষ টিনের তার রাখতে না পেরে পিছলে পড়ে গেল।

তাৎ এহ ! তাড়াতাড়ি আমি টিনখানা সরিয়ে তিনকড়ির হাত ধরে তাকে ওঠালুম। হাতে তার বেশ জখম ! রক্ত পড়ছে ! আমি তাড়াতাড়ি আমার বৃত্তিতে-তেজা আঁচল ছিঁড়ে তার হাতে বেশ করে পটি জড়িয়ে দিলাম। তিনকড়ি ধুকছিল।

আমি বললুম, আর এখানে নয়। চলুন, আমাদের বাড়ী চলুন। পরে আরো চের বিপদ ঘটতে পারে ! দেখুন দেখি, আমার লজ্জা নিজেই একেবারে এতখানি ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন !

তিনকড়ি আমার পানে চাইলে—বড় করুণ সে বৃত্তি ! সে বৃত্তির অর্থ বে না বুঝলুম তা নয়। সে বৃত্তি আমার মনের মধ্যে এক দুর্দমনীর বিদ্রম-স্পৃহা আগিরে তুললে। একটু কৌতুক করার ইচ্ছা হল।

দৃষ্টিতে করুণা মাখিবে। তিনকড়ির পানে চেয়ে দেখলুম। একে যেথের এই চপল লীলা তার উপর এ কোঁকু! সে বে মারাত্মক ব্যাপার!

তিনকড়ি বোধ হয় আমার চোখে সে সময় এমন-কিছু দেখেছিল, যাতে তার সমস্ত সজোচ চট করে কেটে গেল। সে একেবারে বলে উঠল, আপনার বে গারে এতটুকু খাঁচ লাগেনি, এতেই আমি কৃতার্থ! এর জন্ত আমার প্রাণটা গেলেও—তিনকড়ির কথাটা আর শেষ হল না। আশ্বরের প্রভাশায় পোবা কুকুর যেমন আকুল চোখে প্রভুর পানে চায় তেমনি দৃষ্টিতে তিনকড়ি আমার মুখের পানে চেয়ে রইল।

আমি খুব উচ্চ হাস্য করে বললুম, বটে—কেন, বলুন দেখি!

তিনকড়ির হাতের পটিটা তখন আমি চেপে-চেপে আর-একবার ভাল করে জড়িয়ে বিজ্বিলুম। হঠাৎ সে আমার হাতখানা ধরে কেসে বললে, আমি আপনাকে ভালবাসি, বড় ভালবাসি। আমি, পাখার নয়, তবু আমার বনকে কিছুতে আমি ফেরাতে পারি না।

তাড়াতাড়ি আমি হাত টেনে নিয়ে সরে এসে বললুম, বৃষ্টি একটু নরম পড়েছে। চলুন, বাড়ী যাই।

বলেই তাকে আর আর দ্বিতীয় কথাটি কবার অবকাশমাত্র না দিয়ে রাস্তার নেমে চলতে ছুক করলুম। তিনকড়িও আমার পাছু পাছু আসতে লাগল।

বাড়ী ফিরে চা খেয়ে পরম কাপড়-চোপড়

পথে বিজ্ঞানার এসে বসলুম। ধুব-ধুব করছে নরম বিহ্বান! সামনের টেবিলে বাতি জলছিল; সেই বাতির আলোর হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, আজ আমার মত ছুখী কে! আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন! এমন ঐশ্বর্য আমার, এই বরষ, এমন রূপ! মাহুৰ এর বেশী কিছুই আর কামনা করতে পারে না। ইহলোকে মাহুৰের কামনা করবার মত বস্তুই বা আর কি থাকতে পারে? কিছু না। তিনকড়ির কথা মনে পড়ল। মাহুলের তিকা-অরে লালিত, নিতান্তই সে কুণার পাত! নিজের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই! আজ ঐ মায়া বিশ্বনাথ যদি তাকে পথে বার করে বেশ—আজ—এই রায়ে—এই বড়-বৃষ্টির পরে বাহিরের পথ-বাট বখন অভ্যস্ত করণ্য বিজ্বি করে আছে—তাহলে এই করণ্য পথে-বাটেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে!

সামনে প্রকাণ্ড আরনা ছিল—তার পানে চেয়ে দেখলুম। হেসে টেচিয়ে আপনাকে আপনি বলে উঠলুম, এ দৃষ্টি দেখে কে চুপ করে থাকতে পারে! যেচারা, যেচারা তিনকড়ি!

মন বখন এমনি গর্বে মাথা তুলে ধাড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় কে বেশ তার চুলের দৃষ্টি ধরে বলে উঠল,—এই ত রূপ আর তরুণ বয়স নিয়ে বলে আছিল—কে এলরে তোরা কুহ-বারে, কে তার জ্বতিগান পোনাতে এল! আর এই তিনকড়ি—এ মাহুৰ।

মন আমার চোখ হাতিয়ে উঠল, বললে, কি! আমি রাজার ঘরে, আর ঐ তিনকড়ি

পথের তিথিহী! সে আমার পুছো
করতে পারে, কিন্তু—

ভাবনার আর অন্ত রইল না। হু-হু
করে বা-ভা ভাবনা এসে মনটাকে
তোলপাড় করে দিলে!

কিসেরই যে ছাই-পাঁশ ভাবনা! হাসি
পেলে! আমি শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুমের
ঘোরে কিন্তু সেই এক সুর কানের কাছে
বাজতে লাগল, ভালবাসি, ভালবাসি,
ওগো বড় ভালবাসি!

সকালে উঠে মনটা প্রথম কেমন আচ্ছন্ন
বোধ হল! জোর করে চাবুক মেরে তাকে
শিখে করলুম। তাম্বুর কান্না ছ'ধলে মিলে
মনের মধ্যে এক বিধম লড়াই বাধিয়ে দিলে!
অস্থির হয়ে বললুম, না, না, না।

বাবাকে বললুম, কলকাতা ঘাই চল,
বাবা, এখানে আর ভাল লাগছে না।

বাবা বললেন, কিন্তু একটা কথা
আছে না—

আমি বাবার মুখের পানে চাইলুম।

বাবা বললেন, এই তিনকড়ি বেচারা।

ও আমার বড় ধরেছে। লেখাপড়া শিখে ও
হালুয় হতে চায়, কিন্তু অর্থশিক্ষা দানো তার
জন্ত আর একটা কাণাকড়িও খরচ করতে
রাখী নয়। সে বলে, কাশী-হেন স্থান,
খাজী ধরে পেট চালা। তিনকড়ি
তাতে রাখী নয়। সে বলে, তার মায় ঘা
গহনা-পজ ছিল, সেগুলো লাও, তা বিক্রী
করে সে লেখাপড়া শিখবে। মামা হাঁকিয়ে
থেকে, কল, গহনা আবার কি! তাই
বেচারা আমার এসে ধরেছে। কি বলিস্ না?

আমার সর্বাঙ্গ জলে উঠল! আবার
সেই তিনকড়ি! দার অন্ত মনের সঙ্গে অহরহ
এই যুদ্ধ চলেছে—বার কাছ থেকে ঘুরে বেতে
চাই, এমনি করে ভুতের মত সে লগ নেবে।
না, কখনো না। কে তিনকড়ি—সে
আমার কে যে তার জন্য এত মাথাব্যথা!
না, সে কেউ নয়, কেউ নয়। হতভাগা,
বেচারা, পথের এক সামান্ত পখিক সে!

বাবা আবার বললেন, তাহলে কি বলিস্
না?

আমি বললুম, তাকে তুমি সঙ্গে রাখতে
চাও না কি?

বাবা বললেন, ভুই বা বলিস, তাই
করি—

ইচ্ছা হল, বাবাকে বলি, আর ক্যানাস
জড়িয়ে না, বাবা! কিন্তু গলাটা কে যেন
চেপে ধরলে। একটা ঢোক গিলে বললুম,
বেশ, কিন্তু আন্দের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা
হবে না, তা বলে রাখছি। কোথাকার কে,
কেমন লোক—

বাবা বললেন, লোক বোধ হয় মন্দ
হবে না। ছেলে ভাল, তার মাঝার মত নয়।
তবে হ্যা, এক বাড়ীতে থাকা হয় না—
কেন না, আমি আজ কোথায় থাকি, কাল
কোথায় ঘাই, ঠিক নেই—তার চেয়ে ওকে
মাসে মাসে বরং কিছু করে দেব, ও
কলকাতার গিরে মেসে থেকে পড়ুক।
কেমন?

আমি বললুম, বেশ—তাহলে ওকে
কালই কলকাতায় পাঠাও, আমরা এদিকে
আরো ক'দিন মুন্সের-টুন্সের ঘুরে তারপর
কলকাতায় দাব'খন।

কোথায় বেন আমার বাধছিল। গা ছমছম করছিল। তিনকড়ির সঙ্গে আর না বেথা হয়! একটু ভরও হচ্ছিল। কিন্তু না, কিসের ভর! আমি রাজার মেয়ে—তার উপর এই রূপ, এই বহন! কোথাকার কে তিনকড়ি এসে কানের কাছে এক আবদারের মূর তুলবে, আর অমনি আমি—না, না, কখনো না!

তার পর সেই বছর মাঘ মাসেই আমার প্রাণে বসন্ত জেগে উঠল। আমার তখন কলকাতার বাড়ীতে। অজন্ম ফুলের গন্ধে পাখীর গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিবে অভ্যস্ত সমারোহ করে আমার চর-রাষ্ট্রোদ্ধর একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। মাগন্ধীর হার বাবুদের বংশ-তিলক এক তরুণ স্ত্রীর হাতে বাবা আনন্দাশ্র-চোখে আমার সমর্পণ করলেন। সে রাত্রির সেই আলো গান বাজনা আর ফুলের গন্ধে আমার প্রাণ-মন অদৃশ স্বপ্নের সম্ভাবনার বিভোর হয়ে উঠল। সেই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের উপর হাত রেখে আমার মনে হল, বস্তু একজন সহায় পেলুম, বস্তু পেলুম, স্বামী, স্বামী, স্বামী! মনে মনে আমার চিরজীবনের সুখতঃ এই হাতেই অসীম নির্ভরে সমর্পণ করে প্রাণ আমার কৃতার্থ হল। বিচিত্র আবেশ এক অপূর্ণ বায়-ক্ল আবার চোখের সাহসে ধরে দিলে, প্রাণের মাঝে বহুদিনকার সাধ-আশা ফুলের মত অজন্মভাবে অপক্লপ শোভার ফুটে উঠল।

কিন্তু হারিয়ে সে কতক্ষণের অন্ত!

ফুলশয্যার রাতে ফুলের গহনা পরে মনের মধ্যে প্রেমের মণিরাপ জেলে ফুলের বাগান শাঙ্গিরে বসেছিলাম—এইবার আমার প্রিয়তমকে প্রাণ ভরে একান্তে দেখবার সুযোগ পাব! অন্ধির পলকে ক্ষণে ক্ষণে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল—এমন সময় আমার স্বামিবেদ্য দেখা দিলেন। হার, ফুলের মুকুট মাথার দিবে নয়, শাস্তি, আশ্রয়, আশাস-ভরা প্রেমের ডালি হাতে নিয়ে নয়—চোখ তাঁর জবাহুলের মত লাল, পা টলমল করছে, মুখে বিস্ত্রী গন্ধ, মধু খেয়ে মাতাল! নিমেষে বেন কোথা থেকে এক ভীষণ ঝড় উঠল—তার দাপটে আমার প্রাণের মধ্যে সে দীপের আলো নিবে গেল—অত সাধের ফুলের রূপ ছিঁড়ে কোথায় ফুলের লুটরে পড়ল! স্বপ্নের দ্বারা-ক্ল চোখের পলকে অশ্রুনের মত বীভৎস হয়ে উঠল। অদৃশ জালা সারা দেহ-মনটাকে একেবারে তাড়িয়ে তুললে। স্ত্রীর আমি সে ফুলের গহনা ছিঁড়ে কেলসুম, মাথাটা ধপ্প-ধপ্প করে উঠল। একেবারে খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম। খড়খড়ি বন্ধ ছিল, জোরে খুলে কেলসুম। বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার কে বেন অনেকখানি জালা জুড়িয়ে দিলে! দূর হতে কার বাণীর সাহানার মূর ভেসে আসছিল, আকাশে একরাশ নক্ষত্র—মনে হল, সবাই হাসছে, সবাই মুখে তাঁর বিজ্ঞপ! ভাবলুম, আজ যদি আমার এই তপ্ত প্রাণের তীক্ষ্ণ জালায় সমস্ত আকাশ-বাতাস জালিয়ে দিতে পারতুম, পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হত!

বেবতা এসে হঠাৎ আমার আঁগেলটা চেনে জড়ানো গলার ডাকলেন, প্রাণেশ্বরী— এক কটাকার আঁচল চেনে নিয়ে সরে

দাঁড়াইলুম। মাতাল অবাধ হয়ে চেয়ে রইল—
খানিক পরে বললে, বেশ বাবা!

আমার স্বামী-সন্তাধন—এই প্রথম, এই
শেষ!

রাগে সর্কাক জলছিল। বাড়ী এসে
বাবাকে বললুম, আমি আর কোথাও যাব না
বাবা। যদি আর আমার সেখানে পাঠাও,
আমি আত্মহত্যা করব।

বাবা আমার মুখের পানে চাইলেন।
আমার মনের মধ্যে তখন এমনি আগুন
জলছিল যে তার স্বামী অবধি আমার চোখ-
মুখ দিয়ে বুটে বেরুচ্ছিল। আমি বললুম,
এক পাখিও মাতাল—

কঁড়ে ফেললুম। বাবারও চোখে জল
এল। তাত্তাত্তি আমাকে বুকের মধ্যে
তিনি টেনে নিলেন। বাবার মুখে একটিও
কথা ফুটল না।

তার পর আবার সেই পুরোনো জীবন-
ধারার গা ঢেলে দিলুম। বাপে-মেয়েতে নানান
দেশে লক্ষ্যহীন গতিতে আবার সেই ভেসে
বেড়ানো!

দেবতার কাছ থেকে এতলা এল,
পাঠাও।

বাবা জবাব দিলেন, না।

তারা চোখ রাঙালেন, ছেলের আবার
বিরে হবে।

বাবা লিখলেন, তোমাদের মর্জি হয়,
হাওগে।

তারা আবার শাসালেন, আবালভ
আছে।

বাবা লিখলেন, কেউ পারে কড়ি বেঁধে
রাখেনি, স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারো!
তারপর সব চূপচাপ।

কিন্তু এই নানান দেশে ঘুরে বেড়িয়ে,
নর-নারীর এই বিপুল মেলায়—তারের সুখের
চেউ মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ছুঁয়ে এক
বিষম বোল দিয়ে যেত! পাখীর গান, ফুলের
গন্ধ, এ সব তেমনি আছে—তবে আমার
প্রাণে তারা আর কোন লাড়া জাগায় না!
বসন্ত তেমনি আসে, ঠান্ড তেমনি আলোর
চেউ তুলে নেচে চলে যায়, কিন্তু সব
নির্জীব, সব জড়! কুয়াশার আগাগোড়া
কে যেন তাদের সে প্রাণটুকু ঢেকে
দিয়েছে। এক-একবার সেই কবেকার কড়ের
স্মৃতির কথা মনে পড়ত! সেই বেচারী
তিনকড়ি, আর তার সেই ব্যাকুল বেদনা-স্তরা
আবেদন! সে যেন একটা স্বপ্ন! মনকে
চাবকে বললুম, খবরদার! তোমার আপন
ভেঙ্গে তোকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে—
মাথা হেঁট করা কিছুতেই চলবে না তোমার!
ভেঙে বাসু যদি, বা—কিন্তু নচকে পড়িস নে!

এমনি বিপুল হৃদয়ে মনকে নিয়ে যখন
অস্থির, তখন কোথা থেকে বুকে বাজ পড়ল।
বাবা হঠাৎ একদিন কোন্ অদৃষ্ট লোকে
চলে গেলেন। এ বিপুল জগতে আমি আজ
একা!

জোর করে বললুম, না, কিসের ভয়!
আমার অগাধ ঐশ্বর্য—রাজার ঐশ্বর্য!

ছদ্দিন পরে আবার এক খবর এল,
আমার স্বামী-সেবতা এক গণিকার গৃহে
মজলিশ করছিলেন—শেষে এক সময়ে মন্ডের

নেশায় ভালবাসার সীমা বেধাতে গিয়ে ছাঁল থেকে পড়ে প্রাণ দিচ্ছেন! মত একখানা ভারী পাথর বুক থেকে সরে গেল। বাঃ! আশার সব বন্ধন আজ কেটে গেছে—আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত! চমৎকার!

স্রাস্ত্র মন নিয়ে বারো বৎসর নানা দেশ ঘুরে আবার একদিন বাড়ী ফিরলুম। রাজ্যেশ্বরী রাজ্য-পালনে মন দিলুম। খাতা-পত্র থেকে মহাল পর্য্যন্ত নিজে দেখে তদ্বির করতে লাগলুম। এক-এক সময় চোখের সামনে পড়ত, গরিবের সংসার, চাষার সংসার। স্বামী ক্ষেতে খেটে সারা হচ্ছে, মাথায় প্রচণ্ড সূর্য আশুন ছড়াচ্ছে, সেদিকে তার ক্রক্ষেপও নেই, শুধু খাটছে, খাটছে, খাটছে! তার স্ত্রী ছোট ছেলে-কাকালে করে খালার ভাত বেড়ে স্বামীকে খাওয়াতে এল। দুজনে গাছের ছায়ায় বসে ছোট ছেলেটিকে একটু নাড়া-চাড়া করলে—তারপর স্ত্রী হেসে ছেলে-কোলে বাড়ী চলে গেল, স্বামী ক্ষেতে খাটতে লাগল! কোথাও-বা স্বামী কাছে বেকছে, আর তার ওরফী স্ত্রী লোক-চক্ষু বাঁচিরে ছায়ে আড়ালে ধাঁড়িয়ে দ্রাণ হাসি হেসে তাকে বিদায় দিচ্ছে! অনাবি কালের সংসার তার সরল ধারাত্তেই ঘরে চলছে।

বেধে মন আবার হু-হু করে উঠত!

আবার এক চৈত্র মাস। আকাশে বৃষ্টি-বাতাসের জীষণ হুহু। ঘরের জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ছিলুম—মনের মধ্যে আলো-আঁধারের খেলা চলছিল।

বৃদ্ধ নারের মশার এসে বললেন, উকিল বাবু এসেছেন।

আমি বললুম, কেন?

তিনি বললেন, বাহারগাঁয়ের প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছিল—কাল তাদের নামে নাগিশ ব্রহ্ম না করলে সব তামাদি হয়ে থাকবে। তাই আজ্ঞী তৈরি করে আপনাকে তা বৃষ্টিয়ে আপনার সই নিতে নিজেই তিনি এসেছেন।

আমি বললুম, তাঁকে এখানে নিয়ে এলো।

নারের দিকক্তি না করে চলে গেলেন। উকিল আমাদের সেই তিনকড়ি। বাবার কৃপার সম্পূর্ণ সমাবহার সে করেছিল—আজ পাঁচ বৎসর উকিল হয়ে আমাদের এষ্টেটের সমস্ত কাজ-কর্ম সেই দেখছে।

উঠে একটা-ইলি চেয়ারে আমি বসলুম। উকিল তিনকড়ি ঘরে এসে গাঢ়াল। নিম্নলভার তাঁর ঘোষে মন আমার মুহুর্তের মত হল উঠল। তার পর হাসিমুখে সহজ স্বরেই বললুম, কি চাই?

অত্যন্ত বিনীত স্বরে তিনকড়ি বললে, এই আজ্ঞীগুলো এনেছি—পড়ে সই করতে হবে।

আমি বললুম, পড়—

তিনকড়ি পড়তে লাগল। আবার কাণে তার কিছু গেল না। শুধু আগছিল এক বিদ্রম বড়ের হু-হু মর্দন! আর তারি কঁকে কঁকে ভেসে আসছিল অত্যন্ত কোমল স্বরে এক করুণ আবেদন, ভালবাসি—আমি ভালবাসি, ওগো, বড় ভালবাসি।
কলের মতই কতকগুলো সই করলুম।

নৈসর্গিকী

নাথের মশার আঁকীগুলো হাতে নিয়ে
বললেন, আমি তাহলে তপসীলগুলো ঠিক
করে রাখিগে।

নাথের মশার চলে গেলেন।

তিনকড়িও চলে বাচ্ছিল; আমি বললুম,
দাঁড়াও।

তিনকড়ি দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ
নেই, শুধু তিনকড়ি আর আমি। বুক
আমার ছুঁ-ছুঁ করে উঠল। আমি বললুম,
আর কোন কথা নেই তোমার?

—না।

—নিজের—কোন কথা মর?

তিনকড়ি চুপ করে রইল।

আমি বললুম, এই রাত্রে নিজে তুমি কষ্ট
করে এসেছ! এই জল-ঝড়—কোন কথা
নেই? একটা নিখাস কিছুতেই চেপে রাখতে
পারলুম না।

তিনকড়ি তখনও দাঁড়িয়ে, নির্দ্বাক,—
মুখ তার মাটির পানে!

খুব সাবধানে ছোট একটা নিখাস চেপে
আমি বললুম, বাড়ীর সব খবর ভাল? বো
ভাল আছে?

—হ্যাঁ।

—বাও।

তিনকড়ি চলে গেল। এই সেই
তিনকড়ি! একটা করুণা মাংসপিণ্ড—বিয়ে
করে পরম স্নেহে নিশ্চিৎ মনে সংসার-বারা
নির্দাহ করছে!

আর আমিই শুধু সেই কবেকার এক
ঝড়কে বুকের মধ্যে গুণে রেখেছি!

হারে হতভাগিনী, আজ কোথায় তোর
সে তেজ, সে গর্জ! বাতিটা নিবিয়ে বালিশে
মুখ গুঁজে বিছানার ওপরে পড়লুম। চোখের জল
আর কোনমতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

বাড়ীর বোর-জানলাগুলোকে কাঁপিয়ে
বাধিরে উদ্‌ঘাস ঝড় হা-হা করে গর্জে
ফিরতে লাগল।

ঐসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নৈসর্গিকী

তোমারে হেরিছু ববে, বিহগের পানে
যে ভূষাশিখনক্ষণি শুনিতাম কানে,
যে আঁখিনীলিয়া আমি গগনে-গগনে
হেরিতাম সঁকে-তোরে হবির স্বপনে,
যে ঘন কুন্তল-জাল হেরিতাম আমি
বরষার গিরি-শৃঙ্গে-শৃঙ্গে দিব্য বামি,
বলন্ত কাননে আর সারাক-আকাশে
যে অধর রক্তিমার চুখন শরাসে

সুখিতাম অস্ত্রমনা। চালিত্র প্রবণে
যে ভাষা-মাদুরী আঁহা বীণা-বেগুননে,
তোমা আজি গৃহে আনি তোমা পানে চাই
ভায় একে একে সব কেবল মিলাই,
অবাক হইয়া শুধু ভাবি বসে ঘরে,
কেমনে মিলিছে সব অক্ষরে অক্ষরে।

ঐকালিদাস রায়।

অভিনয়ের কথা

জাতীয় জীবন হইতে অভিনয়-কলাকে কিছুতেই ছাঁটিয়া ফেলা চলে না;—সভ্যতার সঙ্গে অভিনয়-কলার সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ।

প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের যেকোনো-বেশী চর্চা হইত, সংস্কৃত নাট্য ও কাব্য প্রভৃতিতে তাহার অন্তর্ভুক্তি ঘৃণাত পাওয়া যায়। যে নটের নাম শুনিলেই অনেকে এখন নাক বাঁকাইয়া মুখ ফেরান, সেই নট তখন সমাজের এমন প্রিয়পাত্র ছিলেন, যে দেব-দেব মহাদেবকেও হিন্দুরা নটেশ্বর নাম দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। সেকালে ভদ্রমহিলাগণও যে অভিনয়ে যোগ দিতেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। পরম্পরে সামাজিক প্রথার অঙ্গ-বঙ্গ খণ্ডাতে ভদ্রমহিলারা নাট্যশালা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন; ফলে, গৃহলক্ষ্যীদের অন্তর্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রঙ্গালয় হইতেও লক্ষী-ঐ অতর্হিত হইল।

কিন্তু মহিলারা রঙ্গালয় ছাড়িলেও, দেশের লোকেরা অভিনয়ের নির্মল আনন্দ ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না। রাজ্য, কথকতা বতই ভাল হউক, তাহাদের ভিতরে অভিনয়ের সমস্ত মাধুর্যই ফুটিতে পারে না। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট ও শিক্ষিত পুরুষ অভিনয়-কলাকে উন্নত ও বর্তমান রূপের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার অভিনয় বতই নির্দোষ

হউক, রমণীর ভূমিকা পুরুষে নেওয়াতে তাহার ঠিক স্বাভাবিক ও সর্কাদম্বল হইতে পারিল না। এইজন্য অর্ধেন্দুশেখর মৃত্যু, গিরিশচন্দ্র বোম ও ঐয়ুজ্ঞ অমৃত-লাল বহু প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী উদ্রলোকের হস্তে ও পরিশ্রমে বাঙ্গলাদেশে নতুন যে রঙ্গালয় স্থাপিত হইল, তাহাতে উল্লোকের অভাব আর রছিল না। কিন্তু এই নতুন রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা সমাজের অস্বত্বিত নর বলিয়া, ইহার সহিত অনেকেই সংশ্রব রাখিতে চাহিতেন না।

গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল প্রভৃতি যে-সকল উদ্রলোক, নব-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম রূপে সমাজের দৃষ্টিভ্রুক উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক অভিনয়-অগ্রগণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহারা যে স্পষ্ট শিক্ষিত ও শক্তিশ্র ছিলেন, তাহা নহে;—অভিনয়কে তাহারা মনে-প্রাণে আঁট বলিয়া গ্রহণ করিতেন। সেইজন্য নব-রঙ্গালয়ের প্রথম অবস্থাতেই আমরা অনেকগুলি ক্ষমতাবান অভিনেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। এখন রঙ্গালয়ে দর্শকের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ভাল অভিনেতার সংখ্যা সেই তুলনার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এখন ঐয়ুজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বোম ও ঐয়ুজ্ঞ তারকনাথ পাণ্ডিত এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী তারাম্বরী ছাড়া এমন আর কাহাকেও দেখি না, আগেকার ভাল

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে বাঁহার নাম করিতে পারি। অবশ্য, এখনকার রঙ্গালয়ে জনকতক চলন-নৈট ও নটী আছেন, — তাঁহাদের অভিনয় তবু বসিয়া দেখা চলে; কিন্তু তা-ছাড়া অভিনেতার গোষ্ঠাকে আর যে লোকগুলিকে তর্জ্জনগর্জ্জন এবং বিনাইয়া-বিনাইয়া ক্রন্দন করিতে শুনি, সারারাত চোরেরের উপরে হাড়-গোড়-তাল দ'য়ের মত খাড়া বসিয়া-বসিয়া তাহাদের অভিনয় দেখার চেয়ে শূন্যানে-মশানে গিয়া হঠাৎ সাধন করা ঢের— ঢের বেশী সহজ। এতদিনে আমাদের

রঙ্গালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইবারই কথা। কিন্তু উন্নতি চুপস্বয় থাক, বাঙ্গলা রঙ্গালয় ক্রমেই অবনতির দিকে নামিতেছে। আমাদের মতে* ইহার একমাত্র কারণ,— অভিনয় যে একটা আর্ট, রঙ্গালয়ের আধুনিক অভিনেতার তা হয় তাহা জানেন না, নয়ত সে শক্ত আটকে দখল করিবার শক্তি তাঁহারা রাখেন না! কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে বরাটে, নিকর্যা ও অপমার্গ লোকগুলি আছে, রঙ্গমঞ্চের উপরে এখন তাহাদিগকে প্রায়ই ভূতের নাচ নাচিতে দেখা যায়। তাহাদের অনাচার-তক চেহারা



“দি মেরি ওয়াইভ্‌স্ অফ্‌ উইওসরে”

স্বত্ব হার্বার্ট টি, এলেন টেরি ও মিসেস কেণ্ডাল



ছান্দগেটের হুসিয়ার স্তর হেনার আর্ভিং

দেখিলেই আগ-পাশ-তলা দলিয়া উঠে,
নাটকের কপাটমিকেই সাধারা চক্ৰ ভাবে
উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদের
অভিনয় সহ করার মত বড় শাস্তি নরকেও
আছে কিনা, জানিনা।

• •

এ-বেশে, বাহাদের কোনদিকে কিছু হয়
না, তাহারাই অভিনেতার কাজ গ্রহণ

করে। বাঙ্গলার সখের থিয়েটার যে কত
আছে, ও নগা উঠা ভার,—কিছু
তাহাদের অধিকাংশের সঙ্গে শিক্ত সচ্চরিত্র
গোেকের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সে-সব
ভারগার সাধারণত নির্দোষ অভিনয়-কলার
উপযুক্ত চর্চা হয় না।

অভিনেতা হইতে হইলে কতটা অস্ত-বৃষ্টি,
নয়চরিত্রে কতটা অভিজ্ঞতা, কলাপাত্রে
কতটা জ্ঞান থাকা চাই। বঙ্গালয় ও

ছেপেংলার আখড়া নয়—সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙ্গীতে বাহার ভাল-করিয়া রসবোধ হয় নাই, তাহার বহি অভিনেতা হইবার সাধ হয়, তবে সে সাধের সঙ্গে অনায়াসে ‘কাঙ্গালের বোড়া-রোগে’র তুলনা চলিতে পারে। বিলাতের আরডিংএর সমকালিক বিখ্যাত হস্তরসের অভিনেতা পরলোকগত জে, এল, ট্রাম

বলিতেছেন : “I think an actor who loves his profession, sees more of the truly human side of the life than any other man, except in the case of painters like Wilkie, novelist such as Dickens ; because it is our business to go



“জোহান অফ্, আর্কে”র ভূমিকাধ
সারা বার্গড



“পকন হেনরি”র কৃৎসিকার

অন্ত এক, আর, বেনগন

into the streets, slums, চরি দেখাইয়াছেন, তাহার কোনটাই কপাল-
into markets and taverns, into করিত নহে; পরন্তু, নিত্যনুষ্ঠ সাংসারে
society for our models.”—টাল তিনি বাহা প্রত্যেক দেখিয়াছেন, রদমকের
আরও বলেন, রদমকের উপরে তিনি উপরে হবহ তাহারই প্রতিচ্ছবি দৃষ্টাইয়া
মাহুকের বে-সব বিলিষ্টতা, জীবনের বে-সব তুলিয়াছেন।

অভিনেতার কাজ যে কত শক্ত, টাল তাঁহার 'জীবনকৃতি'তে তাঁহার একটি গল্প বলিয়াছেন। রঙ্গালয়ে একদিন 'মহলা'র সময়ে একটি যুবক অভিনেতা তেমন ভাল ভাবে অভিনয় করিতে পারিল না। এই অল্প মানেজার তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। টাল কিন্তু তাঁহাকে বখাসায়া উৎসাহবান করিলেন। ফলে, সে রাত্রে যুবকের অভিনয় মন্দ হইল না।

পরদিন টাল বলিয়া আছেন, এমন সময়ে সেই যুবকটি তাঁহার কাছে আসিয়া খুব মুগ্ধভাবে বলিল, “বশাই, আমার কালকের অভিনয় বড় খারাপ হইয়াছিল। আশা করি, সেজন্তে আপনি কিছু মনে করবেন না।”

টাল যুবক তুলিয়া দেখিলেন, যুবকের ঘেঁষে শোকের পরিচ্ছদ !

তিনি বলিলেন, “হ্যাঁ, তুমি তোমার বখাসাদা করছ, তার বেশী আর কি করবে বল ?”

যুবকটি তাঁহার পাশে খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া, কেমন-বেন ইতস্তত করিতে লাগিল। তাঁহার পর ক্ষুণ্ণভাবে ছুঁচুপি তাঁহাকে বলিল, “আমার কি হয়েছে জানেন ? গেল-পরন্তু আমার মা মারা গেছেন।”

—“ওনে বড় দুঃখিত হনুম।”

—“তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন !”

—এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে, সত্যের সাধনা, ভিন্ন কেহ-কখনো ভাল অভিনেতা হইতে পারে না। অভিনেতাকে আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়,—

নিজের সুখের সময়ে তাঁহাকে পরের অল্প কাঁটিতে হয়, নিজের দুঃখের সময়ে তাঁহাকে পরের অল্প হাসিতে হয়।

বিখ্যাত অভিনেতা আরতিংএর জীবনে সাধনার যে দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা অপূর্ণ। তিনি যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইতেন, তখন একেবারে সেই ভূমিকার মধ্যে তন্ময় চটয়া চুবিয়া যাইতেন। আরতিং কখনো ধরা-বাঁধা স্রোতির কোন ধার ধারিতেন না; যে-সব ভূমিকার অস্তিত্ব অনেক অভিনেতা নাম কিনিয়াছেন, সেই-সব ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আরতিং বতদিন-না তাহাতে নূতন আলোকপাত করিতে পারিতেন, ততদিন প্রকান্ত রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন না। একজন একটি ভূমিকা কোন বিশেষ ভাবে অভিনয় করিয়াছে বলিয়া, আর-একজনকেও যে তাঁহারই নকল করিতে চেষ্টা—এ নিয়মের কোন মূল্য নাই; কারণ, একের পক্ষে বাহ্য স্বাভাবিক, অপরের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। বাঙ্গলা রঙ্গালয়ে পুরাতন ভূমিকায় যখন কোন নূতন অভিনেতাকে দেখা যায়, তখন যোঝা যায় অভিনেতার পক্ষে অগ্রকরণ কি সাংঘাতিক ! আরতিংএর অভিনয়ে এই দোষ ছিল না বলিয়া, তাঁহার দ্বারা অভিনীত ছোটবড় সকল ভূমিকাই পুরাতন হইলেও নূতন সৌন্দর্য্যে এবং অপ্রত্যাশিত বিষয়ে স্নান ও চমকদার হইয়া উঠিত। কোন নূতন ভূমিকার অবতীর্ণ হইতে হইলে, আপনাকে তাঁহার উপযুক্ত করিবার অল্প আরতিং অভিনয়গণের ‘ক্যালটন হিসে’ চলিয়া



হামলেটের ভূমিকায় মি: ফোর্স্‌ রবার্টসন

হইতে পারে। বিশেষ, 'ডাকঘরে'র অভিনয়ে একটি ঘরের ভিতরে এতটুকু আরগার যে স্বপ্নের মত মনোরম ও রূপকথার রাজ্যের মত সুন্দর রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল, আমাদের একান্ত রঙ্গালয়ের কর্তৃত্বা যদি তাহা দেখিতেন, তবে তাঁহাদের চোখও ফুটিত আর শিকলাতও হইত। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা, ক্ষমতা এবং কলাকুশলতা এখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ের পেশাদার অভিনেতাদের নিকট হইতে আশা করা যায় না; তথাপি, অভিনয় যে কত উঁচুয়ের আর্ট, তাহাতে যে কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টির ও রঙ্গাহুতির প্রয়োজন এবং অভিনেতারা যে সাহসের

প্রাণের ভিতরকার হৃদয় ভাবের তরীগুলিকে কেমন-করিয়া জাগাইয়া ফুলিতে পারেন, অন্তত এটুকু অহতব করিলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষরা অনেকটা উপকৃত হইতেন।

আমাদের রঙ্গালয়ের একটা মত খুঁৎ এই, তাহাতে একেবারেই কালোপযোগী নৃত্যনৃত্যর বৈচিত্র্য নাই। যুরোপে আশ্চর্য্যকর অভিনয় এতটা হৃদয় ভাব প্রকাশ করিতে পারে যে, মেটারলিঙ্কের 'হু-বার্ড', ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক' ও আন্তোঁনের 'দি ব্র্যাক মাক্সিম' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ও

সেখানে সন্তব হইয়া উঠিরাছে। অভিনয়ে এসব নাটকের রস টিকমত হুটাইয়া তোলা ভারি কঠিন; এমন-কি, ঐ-সকল নাটকের কোন-একখানি যদি অভিনয় করিতে হয়, তবে বাঙ্গালী অভিনেতার চোখে সর্বেশ্বর দেখিয়া, একেবারে মাথার হাত দিয়া বলিয়া পড়িবেন। টিনের ময়চে-খরা তরবারি ঘুরাইয়া লক্ষ্য ও আকাশভেদী চৌকাতের দ্বারা কুত্রস প্রকাশ করা, মুখ-ভ্যাংচাইয়া অট্টম্বরে হাসিয়া হাত্তরস প্রকাশ করা এবং মৃতবেহের পাশে বলিয়া নাকী সুরে কীদিয়া করুণরস প্রকাশ করা, বর্তমান যুগে আর চলিবে না। বিংশ-শতাব্দীর যুগধর্মে মানুষের জীবন ক্রমেই ঘটনাস্রু ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিতেছে; এখন আত্মার ভিতরে যে নানাতাবের অবিরাম দ্বাতপ্রতিদ্বাত চলিতেছে, বাহিরের জীবনে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আত্মীত তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Is action, in the accepted sense of movements and visible achievements on the stage, necessary to the theatre?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলিতেছেন, "না, ইহার কোন দরকার নাই।" যেহেতু, "Modern life itself in its most tragic aspects tends to withdraw farther and farther from external activities and deeper and deeper into the recesses of the soul, into the silence and outward calm that characterises mental life."

অভিনেতার প্রধান কর্তব্য যখন মানব-জীবনের প্রতিরূপ-সেখানো, তখন বর্তমানের যুগধর্মে মানব-জীবনে যে পরিবর্তন আসিরাছে, অভিনেতাও তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারে না। যুরোপের রঙ্গালয়ে তাই এখন মানুষের বাহিরের খোলস ছাড়িয়া ভিতরকার আশ্রয়ের গতি ও লীলা দেখানো হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'কান্তনু', 'রাজা' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতি, বর্তমান কালের উপযোগী নাটক। এ-শ্রেণীর নাটক লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা-ভাষার এক নূতন দ্বারা আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু এই নূতন দ্বারকে দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিবার সাধা বা সাহস বাঙ্গালার সাধারণ রঙ্গালয়ের নাই!

রঙ্গালয় জাতীয় জীবন-গঠনে সাহায্য করে। বেশীদিনের কথা নয়,—এই 'বনেশ্বর' যুগেও 'প্রতাপাদিত্য', 'সিদ্ধান্ত-উদ্ধোদা', 'বীরকান্দী', 'ছত্রপতি' ও 'চুর্ণদাস' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের দ্বারা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অভিনেতার দেশময় যে আশ্রয়ের সাড়া আগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আশ্রয় তাহা তুলি নাই। আমোদের সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজ রঙ্গালয়ে যতটা সম্ভবে সারা যায়, ততটা আর কোথাও নহে। রঙ্গালয়ে গেলে সাধারণ লোকের হৃদয় আপনা-আপনি উন্নত, ভাবুক ও রসগ্রাহী হইয়া উঠে। কবির কাব্য বাহারা পড়িয়া বৃদ্ধিতে পারে না, অনেক সময় অভিনয় দেখিয়া তাহারা সেটির ভিতরের কথাটি তলাইয়া বৃদ্ধিতে পারে,—এ-হিসাবে সাহিত্য-প্রচারণের পক্ষেও রঙ্গালয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের

অধিকাংশ সঙ্গীতের সঙ্গেই সর্বসাধারণের পরিচয় নাই; কিন্তু তাহার যে গানগুলি রঙ্গালয়ে গীত হইয়াছে, সেগুলি হাটে-ঘাটে-মাঠে, সব জায়গাতে, সব দৈর্ঘ্যে চলিয়া গিয়াছে। কোন জাতিকে ভাল করিয়া জানিতে-বুঝিতে হইলে রঙ্গালয়ে বাওয়ার মত সহজ উপায় আর নাই। যে জাতির যেমন মতিগতি, যেমন আচার-বাবহার, যেমন সুভাষ ও ধর্ম, যেমন ভাষা ও সাহিত্য, এক রঙ্গালয়ের মধ্যে তাহার সবগুলিই মণ্ড হইয়া ফুটিয়া উঠে। রঙ্গালয়ের এমনি যে কত গুণ আছে, বলিয়া তাহা কুরানো যায় না। কিন্তু এতবড় প্রমত্ত একটা ক্ষেত্র, —আধাণ করিলে বাহ্যতে সোনা ফলিত, তাহা যে অথহেলায়-অনাধরে

পতিত ভবিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা।

যতদিন অর্দ্ধেপুণ্যের, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল প্রভৃতি প্রতিভাবান ও ক্ষমতাবান পুরুষের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালার রঙ্গালয় চলিত, ততদিন অভিনয়ে তবু অনেকটা ঐ-চাঁদ ও পদার্থ পাওয়া গাইত। কিন্তু, এখন অর্দ্ধেপুণ্যের ও গিরিশচন্দ্র মৃত; অমৃতলাল ও রঙ্গালয় হইতে অপস্থত; ফলে, রঙ্গালয়ে যে সত্তের নাচ চলিতেছে, তাহার সহিত কোন সমত্বতারের সহায়ত্বিত থাকিতে পারে না। বাঙ্গালার এখন কি এমন শক্তিমান কেহ নাই, আমূল সংস্কার দ্বারা যিনি রঙ্গালয়কে বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন?

ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়।

লক্ষ্মীছাড়া

(গল্প)

বসন্তকাল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সম্মিলনের বাড়ীর কাছে নদীর ধারে এক গাছের তলার বলঘেইরা বসিয়াছিল। বলঘেইয়ার বয়স সত্তেরো বৎসর, মুখে গোঁফের রেখাটি যেখা ঘের নাই—সুন্দর মুখ। বলঘেইয়ার মন আজ অত্যন্ত অপ্রসন্ন। তিনটি দ্বারা বহিয়া এই অপ্রসন্নতার স্রোত ফুটিয়াছিল।

প্রথম দ্বারা,—কাল তাহার কুলের পরীকা। ছইবার সে প্রোদোশন পায় নাই,

এবার পাশ না হইলে কুল হইতে তাড়াইরা দিবে।

দ্বিতীয় দ্বারা,—সম্মিলনের বাড়ী এই ছুটি কাটাইতে আসিয়া তাহার মাথাটা যেন কাটা গিয়াছে। সম্মিলনরা বড় লোক—সে পরীবা বিধবার ছেলে। তাহার মনে হইত, সম্মিলনরা তাহার মাকে ও তাহাকে নিতান্ত রূপার চোখে দেখিয়া থাকে—আহা, পরীবা অনাথ, আশ্রিত! তাহার উপর মার আশ্রয়বি রক্তের বড়নাহুতির গম।

শুনিয়া, রাগে তাহার লক্ষ্য জলিতে থাকিত। একবার সে সমি কিনেবের বড় মেয়েরকে মার এই গমে মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিতেও দেখিয়াছিল। সেই দিনই রাতে মিছানার শুইয়া মাকে সে কত করিয়া সাধিয়াছিল, চল মা—আমরা চলে যাই, এখানে আমার এগুতামিনের পড়া হচ্ছে না। মা সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলে, ছ'মিন আপনাব-জনের কাছে একটু বিকতে এসেছি, তাও তোমার প্রাণে সহছে না। অভিমানে বল্লেইয়া সে রাতি কাঁদিয়া কাটাঁইয়াছিল—চোখে এক কোঁটা ঘুম আসে নাই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, একবার বাড়ী ফিরিলে হয়—জীবনে কখনো আর সে এই বড় লোক আত্মীয়দের চোকাঠ নাড়াইবে না।

তৃতীয় ধারা,—এইটার কথা মনে হইলেই বল্লেইয়ার মুখ-চোখ রঙা হইয়া উঠিত। বড় লজ্জার কথা এ! তাহার মনে হইত, সমি কিনেব তাইজী আনাকে সে ভালবাসে। আনার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর—তবুও কেমন হাসি-হাসি। তার মুখখানি, কেমন ডাগর চোখ, নিটোল গড়ন, আর রংটুকু—বেন পাকা আপেলের মত। নিখুঁত সুন্দরী! একসঙ্গে সব ভোজনে বসিলে বধন গল্পে পরিহাসে আনা মুহু হাসির কোয়ারা খুলিয়া দিত, তখন বল্লেইয়ার আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেও থাকিত না। সমস্ত নরন-মন দিয়া সে আনার রূপ-মাধুরী পান করিত। আনা বসি সহসা সে-মমর তাহার পানে চাহিত ত, বল্লেইয়া লজ্জার ঝড় নামাইত। আনা চলা-কোরা করিত, চারিধারের বাতাস

এসেলেবের গন্ধে ভরিয়া উঠিত—সে বাতাস সে গন্ধের স্পর্শে বল্লেইয়ার শরীরে রোমাঞ্চ হইত। একান্তে বই খুলিয়া বসিলে বইয়ের হয়ত কোণার উবিয়া বাইত—চোখের সমুখে ভাসিয়া ফিরিত, শুধু আনার অপরূপ লাবণ্য-ভরা সুন্দর মুষ্টি!

আনার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। যামী ইজিনিয়ার, বিদেশে কি-একটা মহরে কাজ করে—শনিবার রাতে এখানে আসে—রবিবার থাকিয়া আবার সোমবার চলিয়া যায়! আনাকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে এই ইজিনিয়ারের উপর দারুণ গুণার বল্লেইয়ার মন ভরিয়া উঠিত। ইজিনিয়ারটি কিন্তু কোনদিন বল্লেইয়ার সঙ্গে কোন বিবাহ করে নাই; একটি রুঢ় কথাও কোনদিন বলে নাই; বরং সে মাঝে পিঙ-পঙ, ছিপ প্রভৃতি আনিয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিল। বেগোলা ইজিনিয়ার!

আজ এই নিষ্ঠুরে গাছের তলার বসিয়া পরীক্ষার কথা ভাবিতে ভাবিতে আনাকে দেখিবার অদম্য স্পৃহা বল্লেইয়াকে মাতাইয়া তুলিল। বল্লেইয়া নভেল পড়িয়াছে বিস্তর। প্রেম ভিনিষটা কি, তাহার মর্মও যে সে একেবারে না বুঝিত, এমন নয়। এই যে আনাকে দেখিবার এত সাধ, আনাকে দেখিতে এত ভালো লাগে, না দেখিতে পাইলে মন ভাসিয়া পড়ে, অথচ দৈবাৎ আনা তাহার দিকে চাহিলে লজ্জার সে মাথা তুলিতে পারে না—এক আনাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যে নানা ভাব মনের মধ্যে তাল পাকাইতে থাকে—এ কেন? কেন হয়? এ কি প্রেম? কে জানে! কিন্তু আনার

বৎস বে তাহার চেয়ে অনেক বেশী—
তা-ছাড়া তার স্বামী আছে !

আজ এখন বসিরা সেই কবাই সে
ভাবিতেছিল, না, এ ত প্রেম নয়। সতেরো
বৎসর বয়সের ছেলে ত্রিণ বৎসরের মেয়ের
প্রেমে পড়ে—এমন কথা ত কোন দিন
কোন উপজাতিও কহে লেখে নাই ! বিশেষ
সে ঘরের আবার বহুদিন বিবাহ হইয়া
গেছে। এ তবে—এ—

হঠাৎ এমন সময় পাতার মধ্যে একটা
খণ্ড-খণ্ড শব্দ তাহার কানে পেল ; এবং
সঙ্গে সঙ্গে প্রের হইল, কে ?

ত্রিলোকের কণ্ঠস্বর।

বলদেইয়া সে স্বরে শিহরিয়া উঠিল ! এ
স্বর কাহার, সে জানে। এ স্বর বে
তাহার জন্ম-ভ্রূণে বুলবুলের গানের মত
অহনিশি বিরাজ করিতেছে ! কোন মতে
সন্ধ্যা কাটাইয়া বলদেইয়া মাথা তুলিয়া
চাহিল।

সে জানা।

জানা কহিল, এখানে বসে কি হচ্ছে
বলদেইয়া ? কি ভাবছ ! কখনা-রান্না উঠাও
হয়েছ না কি ? কবিতা লেখা ধরেছ !
তবু জবাব নেই ! আচ্ছা, দিন-রাত কি তুমি
তাবো, বল দেখি আমার।

বলদেইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সব তাহার
গোলবাগ হইয়া গেল। কোনমতে সে
জানার মুখের দিকে চাহিল। জানা সমস্ত
এই নবীতে স্থান সারিয়া আসিয়াছে।
তাহার কাঁধে তোয়ালে—পিঠের উপর
কোঁকড়া চেউ-তোলা চুলের রাশি থলো
থলো করিয়া পড়িয়াছে, ক্রাউসের উপরকার

বোতামটা খোলা—কাঁধ ও গলা পরিষ্কার
মেখা দাঁতিতেছে, রঙ অমনি ধবধব
করিতেছে—খোসু সাখানের গন্ধে চারিধার
মাতোরায়া। জানা বেন মোহিনী সূত্রি ধরিয়া
নিখিলরে বাহির হইয়াছে !

বলদেইয়ার মুখে কথা ফুটল না—সে
নির্ঝাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে শুধু আমার পানে
চাহিয়া রহিল।

জানা কহিল, মুখে কোন কথাই নেই
বে ! না হয় কবিতাই লিখছ, তবু একজন
ত্রিলোক সেধে কথা কছে, তা জবাব নেই !
এটুকু ভাবাতারও ধার থাকো না ? বলি, কি
হচ্ছে বসে-বসে ! কবিতা, না, ধর্মন ? এই
ত তোমার ধোঁহ ! কথা নেই, কিছু না—
খালি মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছ।
কি—কায়ো প্রেমে পড়েছ নাকি ?

বলদেইয়া আমার কাঁধে-কোলানে
তোয়ালেটার পানেই চাহিয়া রহিল।

জানা কহিল, তবে দাঁড়িয়েই থাকো
তুমি, কথা কয়ো না। একিছু প্রেমিকের
লক্ষণ আগাগোড়াই দেখছি। বলি, কার
প্রেমে পড়েছ, বল না বলদেইয়া—!

জানা একটু কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া
বলদেইয়ার হাত ধরিল ; বলিল, চুপি চুপি
বল না আমার। কাউকে বলব না আমি।

বলদেইয়ার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছুটিয়া
গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলদেইয়া
কহিল, তোমার ভালবাসি !

আমার ? জানা উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিল,
কহিল, তা বেশ ! আত্মার খুব পোতাণ্য
বলতে হবে, এখন—

বলদেইয়া হঠাৎ আমার হাতটা নিজের

দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সত্যি আমি তোমার ভালবাসি। বলদেহীর চোখের সমুখ হইতে সমস্ত জগৎ এক নিমেষে কোথায় অদৃষ্ট হইয়া গেল—তাহার মনে হইল, সমস্ত পৃথিবীকে কে বেন ঐ রক্তিন তোরালোটায় ঢাকিয়া দিয়াছে। সে বিহ্বল হইয়া পড়িল, তাহার চেতনাও লোপ পাইল।

যখন জ্ঞান হইল, তখনও সেই লাবানের গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া আছে। আনা নাই, শুধু একটা নিষ্ঠুর উচ্চ হাত্তরব ছুরির কলার মত তাহার নৃত্যকে বিঁধিয়া আছে।

সমস্ত ব্যাপারটাও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া উঠিল। ছি, ছি, এ সে কি করিয়াছে। এক মুহূর্তের দুর্ভাগ্যের মনের অত্যন্ত নিভৃত গোপন বেদনাটুকুকে নিষ্ঠুর জগতের চোখের সমুখে ধরিয়া তাহাকে লাজিত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সে ভাবিল, 'এ মুখ এখন বাড়ীতে সকলকে দেখাইব কি বলিয়া? আনা কি মনে করিল? নিশ্চয় সে ভাবিয়াছে, কি বর্জর পণ্ড এই বলদেহীরা। আনা হাসি-ভরা চোখে তাহার পানে দুই-একবার যা-ও একটু চাহিয়া দেখিত—এখন হইতে সে দৃষ্টির হাসিটুকু ত আর তাহার ভাগ্যে মিলিবে না। এই অপমানের পর আনা যে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিবে—বিব-দৃষ্টিতে দেখিবে।

সে ভাবিল, আর নহ—রাত্রি আটটার একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনেই চুপি চুপি সে বাড়ী পলাইবে।

লক্ষ্যার পর চোখের মত নিঃশব্দে বলদেহী আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। আসিয়া ঘরে অন্ধকারে হাতড়াইয়া জানা, বই প্রকৃতি নিজের ত্রযাণ্ডলা সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া লইয়া যেমন সে বাহির হইবে—আনার ঘর কাণে গেল। শেখবার তুলিয়া লই—ভাবিয়া সে ঘরে কাণ পাতিল। পাশের ঘরে আনা, সমিকিন-গৃহিণী, তাহার মা—প্রকৃতি সকলে গল্প করিতেছিল। আনা বলিতেছিল, ওর পাশের আশা তুমি ছেড়ে দাও, মাদিমা। ও বেশ প্রেমিক হয়ে উঠেছে। এই আজ আমার হাত ধরে দিয়া বললে কি না, আমার ভালবাসে! শুনে আমি ত আর হেসে বাঁচি না!

ঘরে অমনি হাসির ঝড় বহিয়া গেল। বলদেহীর কপাল ধামিরা উঠিল। কি এ বর্জরতা! না হয় এক দুর্ভাগ মুহূর্তে মনটাকে সে বেশে রাধিতে পারে নাই—বৈবাৎ তাহার গোপন বেদনাটুকু প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছে—তাহার মস্ত সহাস্রভূতি দূরে থাক, শুধু এই পরিহাস, —নিভাতই ক্রুর মর্দ্যাস্তিক পরিহাস। তাহার চোখ ফাটিয়া অল বাহির হইল। আর এ বাড়ীতে এক মুহূর্তও নয়! অত্যন্ত সাবধানে সে বাহির হইতে গেল। কিন্তু পাটা কেমন করিয়া চোকাঠে বাধিল; সমস্ত সে আছাড় খাইয়া পড়িল। মেয়েরা বলিয়া উঠিল, কি? তখনই শব্দব্যন্তে সব আসিয়া আলো আসিয়া সেখে—বলদেহীরা।

আনা কহিল, এই অন্ধকারে এমন

করে তুতের মত চলতে হয়! খুব
লেগেছে? আঁহা, দেখ দেখি!

মা বলিল, মাঝে বলি, ও ভূত!

সমিকিন-গৃহিণী বলিল, ও পুটলি
কিসের রে?

আনা স্বহস্তে পুটলি খুলিয়া দেখিয়া
কহিল, এ কি! নিজের বইটাই শুছিয়ে
বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল, এই অন্ধকারে?
কবিতা লিখতে সেই নদীর ধারে না কি?

আনার এ বিক্রমে বলদেইয়ার মনে
হইল, এই মধ্যে যদি তাহার মুকু হইত!
হায় নারী, তোমাকে ভালবাসিয়া সে এমন
কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহার এ
গভীর হঃখে খোঁচা দিয়া এমন রূঢ়
পরিতোষ কর!

মা বলিল, কোথায় যাচ্ছিলি তুমি, এই
রাত্রে?

বলদেইয়া কহিল, বাড়ী যাচ্ছিলুম।
কাল আবার এগ্জামিন।

মা বলিল, সে ত কাল ভোরের গাড়ীতে
গেলেও ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে—
তাই ত ঠিক আছে। হঠাৎ এই রাত্রেই কি
এমন তাড়া পড়ে গেল যে—

বলদেইয়া বলিল, না, এই রাত্রেই
গাড়ীতেই আমার যাওয়া চাই।

আনা কহিল, মাসিমাকে তাহলে কাল
সঙ্গে নিয়ে যাবে কে?

বলদেইয়ার রাগ হইল। আনা আবার
জ্বল ফুটাইতে আসিয়াছে! একটু হঃখও
হইল,—আর-কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে
সে বেশ কড়া জবাব দিত। কিন্তু আনার
প্রশ্নে কড়া জবাব দিতে পারিল না—একটু

কোমল স্বরে সে কহিল, তা আমি
জানি না।

মা কি ভাবিতেছিল—আনা তাহার
পারে হাত মিচা কহিল, বেশ ত মাসিমা,
তুমি তাঁহলে এখানেই থেকে যাও।
পরে বলদেইয়ার দিকে কিরিয়া বলিল,
তোমার এগ্জামিন হয়ে গেলে তুমিই
এসে মাসিমাকে নিয়ে যেরো, বলদেইয়া।
এসো মাসিমা, আমন্ত্রা খেলিগে।

বলদেইয়া নিমেষ দৃষ্টিপাতে দেখিয়া
শইল, আনার হাতে তাস। তাহার সর্কাক
কে বের কাঁটার চাবুক মারিল। মিখা
সে পলাইতে চার—ইহাদের প্রাণে একটুও
তাহাতে আঁচ লাগিবে না! ইহারা বেশ
নিশ্চিন্ত ভিত্তে আমোদ-আহ্লাদ শইয়াই মত
থাকিবে, আর সে—নিঠুর, নিঠুর জগৎ,
তার চেয়েও নিঠুর, দারের, এ জগতে নারীর
প্রাণ!

বলদেইয়া আর তিলমাত্র সেখানে
দাঁড়াইল না—সটান্ বাহির হইয়া পড়িল।

মা কহিল, ওরে কিছু খেয়ে যা—
না, তাহলে ট্রেন পাব না। ট্রেনেই
আমি কিছু খাব'ধন। পরলা সঙ্গে আছে।

বলদেইয়া চলিয়া গেল।

৩

গ্রামের পথ। দন্ধার পর এখানে
সহরের মত নর-নারীর ভিড় জমিয়া উঠে
না। লোকালর ছাড়িয়া বলদেইয়া ক্রমে
মাঠের ধারে রাস্তায় আসিল। ট্রেনে
হাটিয়া বাইতে হইলে এইটাই ছিল সোজা
রাস্তা। মাঠের, মাঝে-মাঝে বড় গাছ—
কোথাও-বা গরিবের ফুটী—তথা হইতে

আলোর কীণ রেখা দেখা যাইতেছে। দূরে থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ডাকিতেছে। বল-বেইয়ার প্রাণটা কেমন ছাৎ করিয়া উঠিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে ক্ষণে পলাইবার পক্ষে তাহার বতখানি উৎসাহ ছিল, পথে পা দিয়া সে উৎসাহ অদৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া আসিবার পর কিরিবার দিকেই মনটা বিঘম হুঁকিয়া পড়িল। তাহার উপর সকালে এগ্জামিন দিতে হইবে—এ কথাটা মনে পড়িতেই তাহার পায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল। আর আনা! আহা, দেখানে থাকিলে আনাকে সে তবু চোখে দেখিতে পাইত। আবার কবে আনার সঙ্গে দেখা হইবে? দেখা হইবে কি না, তাই বা কে বলিতে পারে! আনা নাই ভালবাসুক, তবু সে ত তাহাকে চোখে দেখিয়াই স্নেহী!

হাররে, সে যদি আরো বিশ বৎসর পূর্বে জন্মাইত! তাহা হইলে আনাকে বিবাহ করিয়া জীবনটাকে ধস্ত করিবার সম্ভাবনা মিলিত। কোথায় থাকিত তখন ঐ হতভাগা ইঞ্জিনিয়ার? আনাকে কেলিয়া কখনও সে বিদেশে চাকরি করিতে যাইত না। প্রতি সন্ধ্যার কাছ হইতে কিরিয়া আনার হাত ধরিয়া এই আলো-আঁধার-ভরা স্বপ্ন-বেশ্য গ্রামের পথে বেড়িয়া বেড়াইত, দুইজনে স্নেহ-দ্রুতের কত কথা কহিত—আর ঐ বেচারী ইঞ্জিনিয়ারটা হয়ত দূর হইতে তাহাদের এ দিলন বেধিয়া দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া সরিয়া যাইত। বেচারী ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি কল্পনা করিয়া বলদেইয়ার সত্যই হাসিয়া ফেলিল।

স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেল। হাররে, সবই শুধু জন্মনা এ। বেচারী সে এই রাজ্যে পথ হাঁটিয়া ঠেশনে চলিয়াছে, কাল এগজামিন; আর ইঞ্জিনিয়ার ওদিকে স্বপ্ন-নিদ্রায় বিভোর—আনাও হয়ত স্বপ্নে ঐ ইঞ্জিনিয়ারটারই হাত ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে!

সহসা সমুখে আলোর সারি তাহার চোখে পড়িল। এই ত ঠেশন! সহসা ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, বলদেইয়ার ভেতনি চমকাইয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঐ ঠেশনে টিকিট কিনিয়া একবার গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেই—বাস্, কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে! না, না, সে যাইবে না, আনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না! আবার সেই সমিকিনদের বাড়ীতেই ফিরিবে! সে-বাড়ী ছাড়িয়া আর কোথাও যাওয়া তাহার হইতেই পারে না।

ঠেশনের বাহিরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলদেইয়ার বসিয়া পড়িল; ঠেশনে ঢুকিল না। তারপর ওধারে কখন যে ঘণ্টা পড়িল এবং সন্ধ্যা ট্রেন আসিয়া পাড়াইল, আবার বাড়ী উঠাইয়া-নামাইয়া কীন্টি বাজাইয়া হস্ হস্ শব্দে চলিয়া গেল, এ সব তাহার খেয়ালই হইল না! ট্রেন চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে হঠাৎ যখন থড়িত চং চং করিয়া দশটা বাজিল, তখন হাঁস হইল। একটা কুলিকে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ট্রেন চলে গেছে?

কুলি কহিল, অনেকক্ষণ।

বলদেইয়ার মনে হইল, আঃ, খুব সে বাঁচিয়া গিয়াছে। বুকের উপর হইতে

একখানা ভারী পাথর সরিয়া গেল; বুকটা হাল্কা বোধ হইল। সে মহা-উল্লাসে উঠিয়া আবার সমীকিনদের গৃহে করিল।

আনা, মা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া তখনও তাস খেলিতেছে। হঠাৎ বলদেইয়াকে করিতে দেখিয়া মা কহিল, কি রে, কিরে এলি যে ?

—টুন ফেল হয়ে গেল।

আনা কহিল, বাক্ বাপু আপন গেছে। এই স্নাত্রে ছেলোটো বেরিয়ে গেল, মনটা কেমন ভর-ভর কচ্ছিল। আর এই স্নাত্রেই বাবার অন্ত কি ভাড়া পড়েছিল! নাও, এখন কিছু খাও—থেকে গুরে পড়বে। কাল আবার ভোরে বাবার হাদ্যাম আছে ত! হাসিমা, গুটো বাপু, আর খেলে না! ছেলোটো হাঁটাটাই করে সারা হয়েছে, ওকে কিছু খেতে নাওগে।

বলদেইয়ার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। এই পথ হাঁটার অন্ত কষ্ট আনার সুখের মিষ্ট কথার খুচিয়া গেল। কোন মতে সুখে কিছু খাবার শুঁঝিয়া একেবারে বিছানার চুকিয়া সে মনের রাস ছাড়িয়া দিল।

ভাবনার কি আর সীমা ছিল! আনার নানা মুক্তি কল্পনা করিয়া আনাকে নানা-ভাবে দেখিয়া তৃপ্তি বেন আর হয় না!

স্নাত্রে তখন আর তিনটা। বাহির হইতে মা ডাকিল, বলদেইয়া—বলদেইয়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, নদীর পারে পাছতলায় সে শুইয়া আছে—আর নদীতে আনা স্নান করিতে

নামিরাছে। বলদেইয়া অর্দ্ধমুদিত নেজে আনার পানে চাহিয়া—আনা হঠাৎ ডাকিল, বলদেইয়া। বলদেইয়া চাহিয়া দেখিল। আনা কহিল, তুমি যদি আমার ভাল না বাসো বলদেইয়া, তাহলে আমি এই জলে ডুবিয়া মরিব। বলদেইয়া সুখে কৌতুকের হাসি হাসিয়া চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। আনা কহিল, ভালবাসিবে না? বলদেইয়া তবু কোন কথা বলিল না। আনা কহিল, তবে এই দেখ, আমি ডুবিয়া মরি। বলিয়াই সে অগাধ জলে ডালিয়া গেল। বলদেইয়া সন্তরে ঠাড়াইয়া উঠিয়াছে, জলে ঝাঁপ দিতে যাইবে—ঠিক এমন সময়ে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে আবার কে ডাকিল, বলদেইয়া, ও বলদেইয়া তনতে পাচ্ছিস্ ?

মা ডাকিতেছিল।

বলদেইয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, শিলির বড় অশ্লথ করেছে। এ ঘরে একটা গুহ্ব আছে, তাই নিতে এসেছি আমি।

শিলি সমীকিনের ছোট ঘরে।

বলদেইয়া কহিল, কি অশ্লথ ?

ও সেই পুরোনো ব্যাপার। নে, তুই বুঝো—তোকে আবার কাল এগুহ্বানি দিতে যেতে হবে।

মা শেল্ফ হইতে একটা শিপি পাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। দুহুর্ন্ত পরেই আনার গলা শুনা গেলো বলদেইয়া শুইয়া পড়িল। বলদেইয়ার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—ঐ যে আনা। সে তবে নদীতে স্নান করিতে যায় নাই। আঃ! আনা তখনই

বলদেইয়ার ঘরে আসিয়া ডাকিল, বলদেইয়া
যুঝ্ছ নাকি ?

বলদেইয়ার মনে হইল, সে কি এখনো
অগ্নি দেখিতেছে ? সে চোখ মুলিল না।

আনা আবার ডাকিল, বলদেইয়া—

না, এ ত অগ্নি নয়। বলদেইয়া খড়মড়িয়া
বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পাড়াইল।

আনা কহিল, মাসিমা অন্ধকারে একটা
এসেন্সের শিশিই নিয়ে গেছে। তুমি উঠে
দেখত, ঐ সেল্কে মরকিন্ আচ্ছ।
সেইটে চাই—লিলির সেই পায়ের বয়লাটা
আবার বেড়েছে—কিছুতে যুঝতে পাচ্ছে
না, বাঁকীওক লোককে অস্থির করে
তুলেছে।

আনা বাড়ি লইয়া সেল্কের কাছে
আসিল। বলদেইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া
শিশি পাড়িল; আনা আরো কাছে
আসিয়া শিশির গারে আঁটা লেবেল লাগিল।
বলিল, এইটেই ত ? দেখ দেখি।

আনার নিখাস বলদেইয়ার গারে লাগিল।
তাহার বেহ রোমাকিত হইয়া উঠিল।
বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ থামিয়া গেল। সে
একটা দীর্ঘনিখাস ফেলিল।

তারপর আনা কহিল, আমি কাচের
গ্লাস আনছি, তুমি তাতে দু কোঁটা ঢেলে
দাও দেখি।

আনা গ্লাস লইয়া আসিল। বলদেইয়া
ঔষধ ঢালিল, অনেকগুলি কোঁটা পড়িল।
আনা হাসিয়া কহিল, আচ্ছা এ বাহোক !
দাও, আমার দাও।

আনা শিশি কাড়িয়া ঔষধ ঢালিতে বলিল
—বলদেইয়া যুঝ্ছ দৃষ্টিতে আনার পানে

চাহিয়া রহিল। তাহার মাথার মধ্যে রক্ত
চন্মন্ করিয়া উঠিল। সে ডাকিল,
আনা—

চমকিয়া আশ্মা বলদেইয়ার পানে
চাহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আনা
কহিল, ও কি ? অর্দ্ধফুট ভাষায় বলদেইয়া
আবার ডাকিল, আনা—চোখ তাহার
আচ্ছন্নের মত বুম্বিয়া আসিল। সে মুছিত
হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আনা তাড়াতাড়ি
তাহাকে ধরিত্তা ফেলিল—ঔষধের শিশি
রাখিয়া নিজের বুকে বলদেইয়ার মাথা
রাখিয়া মুখে ধীরে ধীরে আনা হাত
বুলাইয়া দিল; সম্মুখে গ্লাসে জল ছিল, চোখে-
মুখে জলের ছিটা নিতে বলদেইয়া চোখ
মেলিল। চোখ মেলিয়া আবার ডাকিল,
আনা—

কি বলদেইয়া ?

—তুমি বড় সুন্দর, আনা। তোমার আমি
ভালবাসি। আনা তীব্র দৃষ্টিতে বলদেইয়ার
পানে চাহিল। বলদেইয়া আর কোন কথা
কহিল না—পাগলের মত ক্যাল-ক্যাল করিয়া
গুধু আনার পানে চাহিয়া রহিল। আনা
তীব্রকণ্ঠে ডাকিল, মাসিমা—

মা আসিয়া কহিল, কেন ? কি হয়েছে ?
...এ কি ?

আনা কহিল, ছেলের পৌরাত্মমির
কল। ঐ স্বাস্থ্যে অত পথ না খেয়ে একলা
হেঁটে বাওয়ার কল ! গুধুটা পাড়তে গিয়ে
মাথা ঘুরে পেছল—বাক্, তবু নেই,
সামলেছে। তুমি ওকে একটু বাতাস কর
দেখি। আমি লিলিকে গুধুটা দিয়ে এখনই
আসছি।

সে রাতে বিদ্বান্নার পড়িয়া বল্বেইয়া অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। মানা চিত্তার ভায়ে সে জর্জরিত আকুল হইয়া উঠিল। নিম্নের উপর বিচারে মন তরিয়া গেল। আনা— একজনের স্ত্রী সে, তাহাকে ভালবাসার কথা বলিয়া কতখানি তাহাকে সে অপমান করিয়াছে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাতে এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সূর্য্যের অমল রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, লতায়-পাতায় সৌন্দর্য্য ছুটিয়াছে; পাখীর দল নানা ছন্দে গান গরিয়াছে, চারিধারে জীবনের বিভিন্ন কলরব ছুটিয়াছে। বল্বেইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া পাড়াইল। নূতন আলোর জগৎ আজ ভরিয়া গিয়াছে! কোন থানে এতদূরু কালিদা নাই, মানি নাই, সমস্তই সুন্দর! সে আলোর স্পর্শে তাহার মনের ভিত্তরকার ঘন অন্ধকার মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। সূর্য্যের এই হিঙ আলোর পাড়াইয়া তাহার মনে হইল, পৃথিবীতে এত আলো, কি এ নির্মল উজ্জল, মহিমান্বত! এমন সজীব, সুসুন্দর জীবন চারিধারে! গত রাত্রির কথা মনে পড়িলে অসহ্য অল্পভাপে মন তরিয়া গেল। এই নির্মল সূর্য্য-কিরণে কি বিভিন্ন মানুষী, কি অপূর্ণ মহিমা!

যা আসিয়া বলিল, এত ঘেরী করে ওঠে! শীপরিং খেয়ে নে। পাড়ী তৈরী। এখনি না বেরুলে ট্রেন ধরতে পারবি না।

খাওয়া শেষ করিয়া যা ও ছেলে

আসিয়া পাড়ীতে বলিল। আনা ও তাহার স্বামী বাহিরে আসিয়া পাড়াইল। ইন্ডিয়ান কাল রাতে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে কহিল, এগজামিন দিয়ে আবার এসো, বল্বেইয়া। আমি কিছুদিন ছুটি মিছি এবার, আনাকে নিয়ে এবার এক জায়গায় বেড়াতে যাব। ওর সাথ, তোমাকেও আমরা সঙ্গে নিই। সে বেশ হবে—ক'জনে খুব বেড়াব; আমরা দুজনে শিকার করতেও যাব'-খন।

আনা কহিল, বেশ মন খির করে এগজামিনটা দিয়ে বল্বেইয়া। এখন শরীর বেশ সুস্থ বোধ করছ ত?

বল্বেইয়া অবাক হইয়া গেল। কি সহজ স্বর, আশ্চর্য্য ভঙ্গিমা, এই আনার। কাল সে তাহাকে অমনভাবে অপমান করিয়াছে—সে কথা আনা একটুও আর মনে রাখে নাই! অমন হাসিমুখে স্নরে এতখানি মেহ ঢালিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছে। আনা, আনা, তুমি——? তাহার চোখে জল আসিল।

পাড়ীতে উঠিয়া মার পানে ঘূটি পড়িতেই কিন্তু রাগে সে একেবারে গর্জিয়া উঠিল। মার দিব্য সুসজ্জিত বেশ—বড়লোক আশ্রয়দের বাড়ী হইতে চাহিয়া-লওয়া একটা শাল সগর্ভের মা গায়ে লড়াইয়াছে।

বল্বেইয়া গর্জিয়া উঠিল, মা—

মা কহিল, কি?

—তোমার লজ্জা হচ্ছে না? এই রকম সাজ-সজ্জা করে পথে বেরতে? তুমি এই যে আগাগোড়া পোষাক পরেছ, এ তোমার নিজের নয়, ধার-করা ভিন্দে-মেপে-নেওয়া—ছি!

মা রাগিয়া কহিল, তোর যে বড় মুখ হয়েছে, দেখছি !

—চোখ রাঙাচ্ছ কি মা ? পুণ্য আমার আপাদ-মস্তক জলে বাচ্ছে। ফেলে দাও, ফেলে দাও তোমার ঐ ভিক্ষে-মাগা পঁচা শাল। ওষ চেরে তুমি গরীব, তোমার সে ছেঁড়া কাপড়ে তোমার রাগির মত দেখায় যে !

মা বলিল, সকল-তাতে তুই কথা কন্নে, বলছি। থাম্। মাকে অপমান !

—অপমান ! মান তোমার কিছু আছে, কিছু কি আর রেখেছ মা ? এই বড়লোক আত্মীয়দের কাছে মিথো বড়মাহুির গল্প করে তোমার মাথা ধারাপ হয়ে গেছে। মনের আগোচর পাপ নেই। তুমি তাব, তোমার ঐ গল্প তারা বিশ্বাস করত ! না। পুণ্য তারা মুখ টিপে হাসত।

মা বলিল, আবার !

—তুমি শাল খুবই না ? বেশ, তোমার শাল সুঁড়ি দিয়ে তুমিই থাকো। কিন্তু আমার এ সম্বন্ধ হচ্ছে না। আমি তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে তাহলে যেতে পারব না। আমি কোচবাস্কে উঠে বসিগে।

মা বলিল, দেখ, পাগলামি করিস্ নে। কোচম্যানটা কি মনে করবে ?

—কি আবার মনে করবে ! সে কি কিছু বোঝে না, তাহো ? সে ও শাল খুব চেনে—সে মুখ টিপে মুচক হাসছে, বুকছে, কান্দালী কুটুম এসেছিল, আশ ঐ পচা পপ-মোচা শালখানা! বিদেয় গেরে বাড়ী ফিরছে।

বলদেইয়া সজোরে চলন্ত গাড়ীর দ্বার

খুলিয়া পথে লাফাইয়া পড়িল। মা ইচ্ছাৎ ঘাইবার ভয়ে শিহরিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোনরূপ চীৎকার করিল না। ব্যাপার দেখিয়া কোচম্যান গাড়ী থামাইল—বলদেইয়া কোচ বাস্কে উঠিয়া বসিল। বাহিরে কি চমৎকার তাওড়া ! মার প্রাণও একটু আশ্বস্ত হইল—কোচম্যানটা কিছু বুঝিতে পারে নাই।

সহরে এক বড় বাড়ীর দুইটা ঘর ভাড়া লইয়া মা-ও ছেলে থাকিত। আর অন্ন। সে আরে কোনমতে ঘরের ভাড়া ও ছেলের জ্বলের মাহিনা দিয়া বাহা থাকিত তাহাতে এই দুইটা প্রাণের কোন রকমে চলিয়া বাইত। মার মনে মুখ ছিল না—কারণ, মা ছিল সৌখীন—বড়লোক আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখিয়া চলটাও তাহার বড়মাহুি রকমের বাড়াইয়াছিল। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে কোনদিন আর-বারের সামঞ্জস্য করিতে পারে নাই, প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে খুঁটিনাটি লইয়া বিবাদ বাধিত। স্বামী বোচার মনের সুখে চিরদিনই বঞ্চিত ছিল—মরিবার সময় তাই সে বেশ হাসিমুখেই মরিয়া ছিল।

বলদেইয়া বাড়ী ফিরিয়া ঘরে বসিয়া সেই সব কথা ভাবিতেছিল। ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার ! জীবনে এতটুকু স্ফুর্তি নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই। এ-সব বাহাদুর থাকে না, তাহার তবু ভবিষ্যতের একটা আশা লইয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার এমন একটু ক্ষীণ আশাও নাই

যার মুখ চাহিয়া এই নৌদল লক্ষ্যছাড়া দিনগুলো সে কাটাইয়া দিতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা দপ্-দপ্ করিয়া উঠিল। বলদেইয়া এগলামিন দিবার মন্ত বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু ফুলে গেল না। মাঠের ধারে ঘুরিয়া সে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর ধারে আসিয়া বসিল। সামনে নানা বনফুলের গাছে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া আছে, নানাবর্ণের প্রজাপতির দল উড়িয়া বেড়াইতেছে। কি বজ্রব, লম্বু গতিটুকু! দূরে পাঁচ-ছয়জন ছেলে-মেয়ে খেলা করিতেছিল। ওধারে এক বেকে বসিয়া তরুণ প্রণয়ী-প্রণয়িনী প্রাণের কথা কহিতেছে। সকলেরই মনে কত মৃগ, কত আনন্দ! বলদেইয়ার মনে-মধ্যকার অন্ধকারটুকু আরো নিবিড় হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর সে বাড়ী ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, মা বন্ধুদের লইয়া গল্পগজবে মত্ত; ছেলের পানে চাহিয়াও দেখিল না। মা বলিতেছিল, সন্মিকিনরা—ওঃ কত বড় মাহু! অগাধ ঢাকা! হানাম সন্মিকিন হল আবার সামাতো বোন—সে ব্যারপের ঘেরে—আমার কি ছাড়তে চায়? বলে, এত ঘর-দোর—এখানে থাকো। তোমার কি সে ঘরিত্রি পোষার! রত একেবারে কালি বেড়ে গেছে। এত দুঃখ-কষ্টে বাঁচবে কেন? তা ঐ লক্ষ্যছাড়া ছেলেটার মন্তই না শুধু—

বলদেইয়া হাঁকিল, মা—সে ঘরে মা চমকিয়া উঠিল।

মা বলিল, কি বলছিস রে?

—কেন ওসব আশুগুবি রূপকথা নিয়ে তুমি আমার লম্বাছ! তুমি ত জানো, যা বলছ ও সব মিথ্যে—

মা অলিয়া উঠিল। এত-বড় অপমান—এমন করিয়া অপ্রতিভ করা, তাঁও নিজের ছেলে হইয়া—! মা বলিল, কি মিথ্যে বলেছি—?

—ঐ সব ব্যারপ ফ্যারপ। তুমি যেমন অবস্থার লোক, তোমার তেমনি থাকাই ভাল। সেখানকার আদর-মত! লজ্জা করে না সে কথা বলতে! বাঁধীর মত মোলাহেবের মত তাদের মন জুগিয়ে থাকতে এত ভাল লাগে তোমার? তাহলে সেখানেই যাও। এখানে কেন! আমি তোমার আমার সঙ্গে আগতে বলিনি ত এখানে!

মা রাগে কাঁপিতে লাগিল। বন্ধুর দল অবাক—কেহ-বা মুখের কষ্টে হাসি চাপিল।

বলদেইয়া আর দুহুর্ন্ত সেখানে গাড়াইল না। বিব! বিব! চারিধারে শুধু বিব! ঘনের বিব, গর্কের বিব। পৃথিবীটা বিঘন বিঘে বিঘাইয়া উঠিয়াছে! কোথায় রে কোথায় সে ঠাই—বেথানকার নির্মল নিম্পাপ নিমলক জীবনের অমন প্রকাণ্ড হুচনা আধিকার প্রভাত-হৃদ্য, পানীর গান, কৰ্ম-কলরব বিচিত্র বর্ণে আগাইয়া তুলিয়াছিল?

পাশের একটা ঘরে আসিয়া টেবিলের সম্মুখে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলদেইয়া বসিয়া পড়িল। কি বিশ্রী করুণা এ জীবন—শুধুই এখানে গ্লান ও পঙ্কিলতার দূষিত বাষ্প উঠিতেছে! অসহ!

মাথা তুলিয়া সে দেখে, অন্ধরে দেয়ালের

মাথায় কি একটা পদার্থ মুখ বাড়াইয়া পড়িয়া আছে। কি ওটা? বলদেইয়া উঠিয়া সেটা হাতে লইল, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল—একটা পিণ্ডল। মুখে তাহার হাসি আসিল। সে পিণ্ডলের একটা বোড়া টানিল—আর একটা টানিল। শুধু আওয়াজ হইল, টুক-টুক! কি নিরীহ মিষ্ট স্বর! তারপর একদৃষ্টে সেটার পানে সে চাহিয়া রহিল। জীবনে ইহার পূর্বে আর কখনও সে রিতলতার হাতে করে নাই।

বাহিরে কে শিব দিতেছিল—সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন মুহুর্তে গান ধরিয়াছিল। শ্রমের গান! বাঃ, ইহার! ত বেশ মনের সুখে আছে এখানে।

অলঙ্কো বলদেইয়া রিতলতারের আর একটা টিগার টানিল—রিতলতারের মুখটা তাহার দিকেই ফেরানো ছিল। হঠাৎ সেটা চোখ রাঙাইয়া চাহিল, বলদেইয়ার মাথার পিছনে প্রকাণ্ড একটা খাঙ্কা লাগিল—চক্ষু মুদ্রিয়া টেবিলের নাচে সে সজোরে পড়িয়া গেল। মুহুর্তে সে দেখিল, তাহার চোখের সমুখে তাহার শিতা—মাথার সাদা টুপি, ছই হাত বাড়াইয়া তিনি বলদেইয়াকে কোলে ডাকিলেন। বলদেইয়া ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে পড়িল—তারপর ছইমনেই এক গভীর অন্ধকারময় গহ্বরে কোথায় তলাইয়া গেল। চারিধার সব কাপ্লা আঁধার! *

ঐন্দ্রোজ্জমোহন সুখোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

বুদ্ধিমানের কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর “কর্তার ইচ্ছার কর্তব্য” প্রবন্ধে যে আত্মকর্তৃত্ববাদ প্রচার করিয়াছেন, তার প্রতিবাদ হিসাবেই হোক বা অহুবাদ হিসাবেই হোক ঐযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁর “নারায়ণে” “বুদ্ধিমানের কর্তব্য” লিখিয়াছেন। তিনি ষত বড় মনোবাই হোন সমাজ বা ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতকে চূড়ান্ত মত মনে করিয়া বুদ্ধিমানের কর্তব্য, কেননা সকলেই জানেন যে এ সকল

বিষয়ে নাসো মুনির্ঘসা মত্তং ন ভিন্নং। অতএব রবীন্দ্রনাথ যদি ব্যক্তি-ব্যক্তিত্বের তরফে এক তরফা বিচার করিয়া থাকেন, তবে শাস্ত্র ও সমাজ-ভিত্তিক তরফে সে বিচারের বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। সেহেতু বিপিনবাবু “কর্তার ইচ্ছার কর্তব্য” সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন মোখরা আমরা অত্যন্ত আনন্ডিত হইরাছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই যেমত এক ঠাণ্ডা যে তাঁরা বাহ-প্রতি-

বাক্যে উল্লিখিত। কর্তার ইচ্ছার কৰ্ম করার সংস্কার যে আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গেছে, 'এটাও তার একটা উপায়'। তাঁরা বলেন, তর্কের দ্বারা কি কোন কিছুই বোঝা যায়? "তর্কে বহুদূর"। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তর্ক-ভৌতিকতার এই যে সংস্কার, এর কারণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের দেশে "তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল" ইত্যাকার নৈসর্গিক ঢেঁকির কচকচি হইয়া গেছে। বিজ্ঞানের চর্চা না থাকিলে বস্তুজ্ঞান একেবারে লোপ পায়, তখন অসমীকৃত (inference) সত্তা উপযুক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন থাকে না। সে অবস্থায় তর্ক ভিনিসটা কুটতর্ক হইয়া বিঘ্ন উৎপাদ উপস্থিত করে। কিন্তু যে তর্ক-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত, তাকে আশ্রয় না করিলে তত্ত্ব-বিচার হইবে কি উপায়ে? সেই প্রশ্নটিকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-বিজ্ঞান রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক মানব-বিজ্ঞানগুলির উৎপত্তি হইয়াছে।

বিপিনবাবুর প্রবন্ধকে ত্রিক্ প্রতিবাদ বলা যায় না, কারণ "কর্তার ইচ্ছার কৰ্মের" আসল বক্তব্য সম্বন্ধে বিপিনবাবুর মতবৈধ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ-প্রচলিত ধর্মের ও আচার বহু সমাজের যে সকল ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তার অনেক কথাই সত্য। গতানুগতিক ধর্ম বেতাবে শাস্ত্র মানিয়া চলে, তাহাতে ধর্মচারণ সম্ভব হইলেও, ধর্মসাধন সম্ভব নয়; এ কথা শতমুখে পীকার করি।" সুতরাং বিপিনবাবুর লেখাটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ না

বলিয়া অসুবাদ বা অসুস্থিতি বলিলেই ত্রিক্ হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ঘোটা কথাটা ছিল এই যে, 'কর্তার-ইচ্ছার-কৰ্ম' এই মীতি যে সমাজের চরম মীতি, সে সমাজে প্রতি ব্যক্তির আত্মকর্তৃত্বের কোন স্থান থাকে না। সামাজিক ব্যাপারে যারা আত্ম-কর্তৃত্ব চাপনা করিবার অধিকার পায় নাই, সহসা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্বের চর্চার সফল হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যদি আত্মকর্তৃত্বের অধিকার আমরা সত্যসত্যই চাই, তবে সামাজিক ব্যাপারে সে অধিকারকে সন্নিবেশিত করিলে চলিবে না।

এই শেষ কথাটুকু মানিতে বোধ হয় বিপিনবাবুর আপত্তি আছে। শুধু বিপিনবাবু কেন, অনেকেই আপত্তি আছে। ইউরোপে, যে সকল জাতি রাষ্ট্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তারা যে ধর্মে ও সমাজে সকল রকম অর্থহীন আত্মগত্যা ও আচার-বস্ত্রতাকে অস্বীকার করিয়া তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইয়াছিল, ইতিহাসে এমন নজির যেমনো। ধর্মে শাস্ত্র ও চর্চামূল্যতা ইউরোপে এখনও ঘণ্টে পরিমাণে বিদ্যমান। সমাজেও আচারবস্ত্র জাতি ইউরোপে এখনো বিহীন নয়। বস্তুত রাষ্ট্র-ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করার ধরুণই ইউরোপে ধীরে ধীরে সামাজিক ব্যাপারেও স্বাধীনতার নাগপাশবন্ধনগুলি খুলিয়া দিয়াছে—মাহুকের অধিকারকে যে কোথাও সন্নিবেশিত করা চলিবে না, এ বোধ ইউরোপীয় জাতিদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গেছে। প্রটেষ্ট্যান্ট ইংলণ্ডে,

এমন কি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের নানা বিষয়ে অধিকার ছিল না—অবশেষে Catholic Emancipation Bill যে পার্লামেন্টে পাস করা হয়, তাহা ধর্মসংক্রমে কোন উন্নয়ন ভাবের প্ররোচনাও হয় নাই। অধিকারকে সর্বত্র প্রসারিত করা দরকার, সেই বোধের বশবর্তী হইয়াই ইংরেজেরা বিল পাস করেন। স্পেনের আরমাতা যে ইংরেজের কাছে হার মানিয়াছিল, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করিয়াছেন এট যে, স্পেনের দাসে বুড়ী বসিয়াছিল। কিন্তু তারও আবার কারণ এই যে, স্পেনে তখনও প্রমাতন্ত্র কোন আকারেই প্রবর্তিত হয় নাই। যে জাতি রাষ্ট্র-ব্যাপারে একবার আত্মকর্তৃত্ব-চালনার সুযোগ পাইয়াছে, সে ক্রমশ তার সমাজেও সে অধিকারের পথকে প্রশস্ত করিয়া তোলে, ইউরোপের ইতিহাস হইতে এই শিক্ষাই আমরা পাই।

কিন্তু এও যে একতরফা কথা। ইউরোপে রেনেসাঁসের নবযৌবনের দক্ষিণে বাতসলী ঘনি এক সময়ে না বহিত, তবে তার মধ্যযুগীয় চর্চা এবং সমাজের জরাজীর্ণ নানাবন্ধন-দ্বন্দ্বের মাধ্যম মাধ্যম প্রাণের প্রবাহ আর কোন কালেই থেথা দিত না। ব্যক্তির সর্ববিধের স্বাধীনতাই ছিল মধ্যযুগের আদর্শ; অর্থাৎ পুরাতন্ত্রের ‘কর্তার-ইচ্ছার-কর্ম’। সেই আদর্শের জায়গার ব্যক্তির সর্ববিধের অধিকার ও কর্তৃত্ব-শাভের সুযোগকে প্রশস্ত করিবার আদর্শকে দাঁড় করা হইবার জন্য শুধু রেনেসাঁসের মত অন্ততঃ একটা আন্দোলনেই কুলায় নাই

—রেকরমেশন Reformation ও ফ্রেন্স রেভোলুশনের (French Revolution) মত প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিপ্লবেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। রেনেসাঁসে জ্ঞান বিজ্ঞানের উদয়ে; রেকরমেশনে ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ; ফ্রেন্স রেভোলুশনে গণতন্ত্রতার প্রতিষ্ঠা। এই তিন আন্দোলনের কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়—তিনের যোগেই ইউরোপ তার মধ্যযুগীয় বন্ধন-কাঠার শেষ প্রাচীর-টাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ‘কর্তার ইচ্ছার কর্মের’ মূল কথাটা এই যে, ইউরোপ তার মধ্যযুগের বন্ধন-বশার গণ্ডা কাটাইয়া বর্তমান যুগের স্বাধীনতার উন্মুক্ত রাসপথে বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমরা এখনো, এই বিংশ শতাব্দীতেও, সেই মধ্যযুগীয় গভীর আবরণের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া আছি। অর্থাৎ আমরা এখনো স্বাধন কি জ্ঞানোন্মত্ত শতাব্দীরই লোক।

বিপিনবাবু লিখিয়াছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের দেশের জনসাধারণে যে ভাবেই শাস্ত্রগ্রহণত হইয়া চলুক না কেন, সাধকেরা কোনও দিন, তিনি যে শাস্ত্রগ্রহণতোর অনিষ্টকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন, সেভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলেন নাই। ঈশ্বরা এবেশে ধর্মসাধন করেন, কেবল ধর্মোচরণ করিয়াই নিভিত থাকেন না, তাঁরা সর্বদাই সত্য বস্তুকে ও তথ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন কেবল শাস্ত্র বা গুরুসুখে তার কথা শুনিয়া কোনও দিন তৃপ্ত রহেন নাই। • •

‘সত্যের আঠার শত বৎসর ধরিয়া

খৃষ্টিয়ানধর্মের মধ্যে সেই একই বাইবেল একমাত্র অদ্বিতীয় শাস্ত্র হইয়া আছে। এই বাইবেলের অনেক টীকা-টীপনি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তার এক পংক্তিও প্রামাণ্য-মর্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। আর আমাদের দেশে যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদের অন্তরের প্রত্যক্ষ অহু-ভবের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ও সেই আত্ম-প্রত্যক্ষের অভিধানের সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্ভার মধ্যে পূর্বতন শাস্ত্রের সমান মর্যাদা ও অধিকার পাইয়াছে।

• • •

“কলত রবীন্দ্রনাথ আমাদের শাস্ত্রকে যেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও অন্তাচারী রাজার বেশে সাজাইয়া সেদিন আসরে নামাইয়াছিলেন, একত পক্ষে ভারতের শাস্ত্র কোন দিন সেরূপ ছিল না, কখনও সেরূপ নাই।

সাধকেরা কি ভাবে শাস্ত্র মানেন কিম্বা শাস্ত্র কি ভাবে মানা উচিত, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর “কর্তার ইচ্ছার কণ্ঠে” কোন আলোচনাই করেন নাই। বুদ্ধিকে পশু করিয়া, বুদ্ধি বিচারকে বিসর্জন দিয়া যে শাস্ত্রাঙ্গুণতা বা আচারবস্ততা ভারতের অগণিত জনগণের মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবল তাহারি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বিগিনবাবু বেতাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে মানিবার কথা বলিয়াছেন, আধুনিক যুগশুক রাজা রামমোহন রায় সেই ভাবেই সকল দেশের ধর্ম শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। “চুহকাফুল মোহাম্মদীন”

—এরূপেই রামমোহন এবং “বেদান্ত গ্রন্থ” প্রকাশক রামমোহন একই রামমোহন নন। ফরাসী বিপ্লবের যুগে রামমোহনের জন্ম; ফরাসী বিপ্লবের মত্রে তাঁর দীক্ষা; শাস্ত্র শুধু পুরোহিত প্রভৃতি সকল শাসনকে অস্বীকার করিবার ভিত্তর দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা অসাধারণ মনোবীক্রেও এক সময়ে বাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তিনি অহুত্তব করিলেন যে, শুধু যুক্তিতেই (Reason) মানুষের যুক্তি নাই; যুগ যুগের মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চিত সাধকের আধীন বুদ্ধির সামঞ্জস্য না ঘটিলে মানুষের যুক্তি বর্ধার্য যুক্তি হইবে না। মানুষের ধর্ম ও সমাজের সকল অহুতান প্রতিষ্ঠান সর্বভোক্তাবেই যে মানুষের বক্তৃতির কারণ একথা সত্য নয়; কারণ তাদের মধ্যেও কোথাও না কোথাও যুক্তির ইচ্ছিত আছেই; সেই ইচ্ছিতভাবেই যুক্তির সাহায্যে উদ্ধার করিলে তবেই আবার তাদের নূতন যুগধর্মোপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা যায়। “বেদান্ত গ্রন্থের” “অহুতানে” রামমোহন তাই লিখিয়াছিলেন, “আমাদের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্ভারিত পথের সন্ধান চেষ্টা করি।”

রামমোহন রায় যে শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানিয়াও শাস্ত্রকে বুদ্ধির কলি পাথরেই করিয়া দেখিতেন তার প্রমাণ ঐ ভূমিকাতেই পাই। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মকে গ্রহণ করিতে লোকের আগ্রহি এই যে, “পিতা পিতামহ এবং স্বর্গের্তা যে নতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্তর্ভাবকরণ অতি অবোধ্য হয়।” রামমোহন রায় ইহার উত্তরে লেখেন

“ইহার সাধারণ উত্তর এই যে, কেবল ‘স্ববর্ণের’ মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পণ্ডিতাত্ম্যের ধর্ম হয় যে সর্বদা স্ববর্ণের ক্রিয়ানুসারে কার্য করে। মহুবা বাহার সং অসং বিবেচনার বুদ্ধি আছে সে কিল্পে ক্রিয়ার দোষ-গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্ণে কার্যন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য নির্বাহ করিতে পারে।”

রামমোহন রায় আচার্যকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়াছিলেন; তিনি আচার্যকে লোকস্থিতির একটা উপায় বলিয়া মনে করিতেন হায়। “ধর্মাদর্শ এ সকল অন্তঃ-করণ-বৃত্তি হইলে—স্বতরাং আচার্য্যাদির পরমার্থ-সাধনের সহিত সঘন্য নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধর্মকে তার আচার হইতে মুক্ত করিয়া তবে তার বিশ্বভৌমিক স্বরূপটিকে উন্মোচিত করা হইতে পারে, ইহাই রামমোহন রায় মনে করিতেন।

রামমোহন রায়ের ভাবে শাস্ত্রকে রবীন্দ্র-নাথ interpret করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র বিচারহীন শাস্ত্রাঙ্গগতা বা আচার পালনকে শিক্ষা করিয়াছেন। রামমোহন রায় তাঁর চেহেও ভীতভর ভাষায় এ সকলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত তাঁর বাক্যই তার প্রমাণ।

অতএব যিগিনবাবু রবীন্দ্রনাথ যে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই, তাহা-দিগকে আগরে নামাইয়া আনিয়া যে বাহা-হুবাধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র নাথের প্রবন্ধের বিশেষ কোন যোগ নাই।

যিগিনবাবুর “বহুদিনকার মন-গড়া কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে; সেগুলি বস্তুতঃ

“বস্তুতঃ” কিনা তার খোজ তিনি লইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রগুরু সব বাদ দিয়া নিজের “স্বাভিমত”কেই ধর্মের প্রামাণ্য মনে করিয়াছিলেন—এ একটা তাঁর মন-গড়া সিদ্ধান্ত। তাঁর আর একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র “মহর্ষির প্রভুত্বের প্রতিফুলে আপনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন” বলিয়াই মহর্ষি ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর দলের “স্বাধীনতার মর্যাদা” রক্ষা করিতে পারিলেন না। সংশ্লিষ্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিতে বিপিন বাবুর এই সকল সিদ্ধান্তের খণ্ডন আছে। মহর্ষি “আত্মপ্রত্যাহারসিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিমল কুমারের” প্রত্যক্ষ অহুভূতির সাগাথো যে সকল সত্যের সাক্ষ্যকার করিয়াছিলেন, উপনিষদে তাহাদের অহুভূত বাক্য যেখানে যেখানে বাহা বাহা পাইয়াছেন তাহাদিগকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রকে অস্বীকার করা হয় না। কেশব চন্দ্র প্রভূতি নবীন দল প্রাচীনদের “স্বাধীনতার মর্যাদা” রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত পড়িলে এ কথাটা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ রূপেই অবাস্তব প্রসঙ্গে—অতএব এখানেই এটাকে বন্ধ করা দরকার।

বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা

“নারায়ণে” প্রীতুক্ত মলিনীকান্ত গুপ্ত
বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভাবিবার অনেক কথা আছে।

তিনি লিখিয়াছেন, “লিঙ্গিত ভাষা বাগ্ম্য আমরা যে স্বয়ং বাগ্ম্য দিতেছি, তাহার মধ্যেই কি বাংলার সব ভবিষ্যৎ? আমরা ত মনে করি, এইরূপে বাংলার ভবিষ্যৎকে আমরা ধরা করিয়া আনিতেছি, তাহার কতকগুলি possibilitiesকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছি। • •

“এই নব যুগের পূর্বে বাংলা কি ছিল, তার ধ্বংস প্রতিষ্ঠা পাই চতুর্দশে, আর কি হইতে পারে তাম ও চরম অভিব্যক্তি ঐ চতুর্দশে। তার ভাব তার ভাষা অভিমাত্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর প্রাণের বা বিশেষ, যে নিছক বাতচ্যটুকু প্রাহারই পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে কেমন এক প্রাদেশিকতা, একটা সর্বাঙ্গতা, একটা ‘বরমুখো’ প্রকৃতির ছায়া, বিশ্বজীবনের উষ্ম বহুতরঙ্গারিত বৈচিত্র্যের সহিত একটা সাক্ষাৎ সঘর্ষের অস্তাব।

“কিন্তু ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী যেদিন বাঙ্গলার প্রাণ ছাড়িয়া বিশ্ব-প্রাণের ব্যাধি পাইল, শুধু নিজের ঘরের যে অকৃতৃতি, যে অভিজ্ঞতা, তাহা ছাড়াইয়া যে দিন সবতরঙ্গের বিপুল বিচিত্র রঙ্গের সন্ধান পাইল, সেদিন তাহার সে পূর্বতন চিরপরিচিত ভাষা ও ভঙ্গিমা ও নৃতন জীবনের স্পন্দন আর ধারণ করিতে পারিল না। সে চাহিল নূতন আধার, জীবন-সঙ্গীতের নূতন সুন্দরীর অক্লরণ তাহার ভাষার নূতন স্বর—নূতন ছন্দ। আর তারই হল বিভালাপন—যদুৎখন।... হইতে

পারে, এই প্রথম আচারণ, তাহার যে সব নূতন আনিরাংলেন, তাহা সব টিকিবার নয়, টিকা উচিতও নয়। কিন্তু তাহার বাংলা ভাষার যে গুরুত্ব, যে একটা লাভিল প্রতিভা অহুপ্রবর্ত করিয়া দিয়া-ছিলেন, তাহা বাংলার চিরসম্পদ, তাহা শুধু অতীতের এক কণিক বিকৃতি নহে; পরন্তু মহোচ্চল ভাব্যতেরই পূর্ণাঙ্গতা।

“ইংরাজী ভাষাতেও সোয় ছিলেন খাঁটি ইংরাজ—“The wells of English undefiled”—তাহার ভঙ্গিমা ছিল ইংরাজের অতি আপনায়, গৃহস্থালী ভাবেরই প্রতিমা। কিন্তু এলিজাবেথের যুগে ইংরাজ জাতির দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের সীমাটি অতিক্রম করিল, আপন গণ্ডীটি ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানে নূতন প্রেরণায় তাহার অন্তরাঙ্গা ভরপুর হইয়া উঠিল, তাহার কর্ণবীরগণ যখন অসীম সাগরের পারে ছুটিয়া চলিলেন, তখন সে জাতির সাহিত্য-ভাষাও ধরিল এক নূতন আকার। আদর্শ কর্ণবীর রোম-কের ভাষা সে সহজেই আপন করিয়া লইল। আর তারই হল সেক্সপীয়র দিল্পন। শুধু লাভিল কেন, বৈদেশিক সব ভাষা হইতেই—ইংরাজ যেমন সহজে ও অক্লান্তি চিতে উপকরণসাজি সংগ্রহ করিয়াছে, বৈদেশিক ভঙ্গিমায় আপনাকে যথেষ্টা ঢালিয়া দিয়াছে, এমন কোন জাতি তাহা পারে নাই।”

সুতরাং লেখকের মতে ‘বঙ্গভাষার’ও যেমন স্থান আছে, ‘বাংলা ভাষার’ও তেমনি স্থান আছে। লেখকের শেষ কথা এই যে, “বাংলার ছন্দে এতখানি

উদারতা বোধ হয় আছে—বাহ্যতে দুইটিট সেখানে স্থান পায়।”

আমার মনে হয় লেখক চলিত ভাষা ও সাধুভাষার মধ্যে যে ভেদ-রেখা টানিতেছেন, সে ভেদ-রেখা যথ্যত বর্তমান নীতি। প্রাচীন বাংলার ঠাট্টা আছে বটে, কিন্তু চলিত ভাষা এবং তখনকার বাংলার চলিত ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মাঝে বিদ্যাসাগর—মধুসূদনের যুগে সংস্কৃত সাধুভাষার যে পালাটা চলিয়াছিল, তার দক্ষণ, এখনকার চলিত ভাষাতেও সংস্কৃতের একটা স্থান নির্দিষ্ট হইয়া গেছে। লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন, “খিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিত-পন্থীদের মধ্যে বর্তাই মতভেদ থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া ঠাড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্জনামগুলি ও আর দুই চারিটি কথা লইয়া।” কিন্তু সে প্রভেদটাকে তিনি যতখানি তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তাকে ততটা তুচ্ছ করিবার হেতু নাই। যে ভাষাকে চলিতে হইবে, তাকে অনাবশ্যক ভারমুক্ত হইতেই হইবে। বাংলার ক্রিয়াপদের মত এমন যবযজ্ঞ জিনিস বাংলা ভাষার আর কিছুই নাই। কবিতা ভাষার সেইজন্ত স্বভাবের নিম্নে তার ভারগুলি আপনিই লাগব হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক কবিতাতেও কবিতা ভাষার ব্যবহৃত ক্রিয়াপদেরই ব্যবহার দেখিতে পাই। শুধু গদ্যে তার প্রচলন নাই—প্রচলন যদি হয়, তবে তাহাতে ভাষাটা হাফা স্বরূপে হয় ইহাতে আর সন্দেহ কি?

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের আরও সুবিধা

আছে। বাংলা ভাষার accent নাই—একজ বাংলা গল্পই পড়ি বা পড়ই পড়ি, সমস্তই কেমন sing song গানের গুরুর মত করিয়া পড়িতে চর। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ চমকবহুল বলিয়া তবু ভাষাটাকে একটু স্বস্ত্রাস্বক করিয়া তোলে। ভাষার মধ্যে ছন্দোন্নয়ন এক ঐ রকম ক্রিয়াপদের প্রচলন আধুনিক কবি ও লেখকগণ বিশেষ ভাবেই অনুমত করিয়া থাকেন।

তারপর লেখক ভাষা ও ভঙ্গিমা এই দুইটা জিনিসকে যেন কতকটা এক করিয়া মিশাইয়া দেখিতেছেন। ভঙ্গিমা বা style কোন ভাষার ঠাট্টার অপেক্ষা রাখে না বলিয়াই বোধ হয়। Style এর নির্ভর প্রতিভার উপর; প্রতিভাই ঠাইল সৃষ্টি করে। নতুন ঠাইল যখন কোন ভাষার যেথা দেয় তখন সে ভাষাও অপূর্ণতর হইয়া উঠে। তখন সে যে কোথা হইতে তার উপকরণ সংগ্রহ করে সে হিসাব রাখা শক্ত হয়। কিন্তু এট সকল বিচিত্র ভঙ্গিমার ব্যতী ভাষার স্বরূপের নির্ণয় হয় না। শেক্সপীয়ার হিল্টন যেমন চণারী ভাষাকে ছাড়াইয়া গেছেন, আধুনিক ঠংরেজি তেমন শেক্সপীয়ারী ইংরাজীকে ছাড়াইয়া গেছে। অথচ তা বলিয়া শেক্সপীয়ারের ঠাইলের বিশেষত্ব ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। তাহা আপনার প্রয়োজনে আপনি কালে কালে পরিণত হইতে থাকে—তার প্রয়োজন যখন সমস্ত জাতীর মনের বিচিত্র প্রকাশের প্রয়োজন। শেক্সপীয়ারী ভাষার এখনকার কালের ইংরেজ-মন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে

না বলিয়াই সে ভাবায় এখন কোন লেখকই রচনা করিতে প্রস্তুত নন।

বাংলা ভাষাও তেমনি বাঙালীর মনের বিচিত্র প্রকাশের অল্পরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সেজন্য এ ভাবকেও racy হইতে হইবে, ইহার বাহ্যিকগুলি ক্রমশঃ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ইহাকে বেগমালী করিতে হইবে। ইহার চলিত ভাষার পক্ষপাতী, তাঁরা ভাবকে কোন একটি বিশেষ ভঙ্গিমা বা style এ আবদ্ধ রাখিতে চান না। তাঁরা সংস্কৃত

কেন, ইংরাজীও বাদ দিতে চান না। তাঁরা চান ভাষাটাকে ভারমুক্ত করিতে, হৃদয়ময় করিতে, শক্তিশালী করিতে। বীরবলের style ও ঘরে-বাইরের style এক নয়। খেজার style ও কণিকার style এক নয়; তেমনি খেজার style ও বলাকার style ও এক নয়। Style বস্তু ইচ্ছা বিচিত্র হোক, তাতে চলিত ভাষার পক্ষপাতীদের কোন আপত্তি নাট।

ঐন্দ্রজিৎকুমার চক্রবর্তী।

সমালোচনা

হিতবাণী। শ্রীমুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সর্কাধিকারী এম্বিত। 'দৈনিক চন্দ্রিকা' কাগালের হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা শীলা ক্রিষ্টি: সত্যকসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা বাত্র। 'নানা পুস্তক' ও 'নানা মুখ' হইতে লেখক যে সকল হিতবাণী 'আহরণ করিতে' পারিয়াছেন—তাহাই "হিতবাণী" রূপে প্রকাশিত হইল।

মধুপূর্ব। শ্রীমুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এম্বিত। কলিকাতা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রিষ্টিয়ানি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এ বাণি ছোট গল্পের বই; শুদ্ধমাত্র লাইব্রেরীর আট আনা-সত্তরশ-প্রথমালার একবিংশ অংশ। প্রকাশক মহাশয় প্রসঙ্গে সংগ্রহ-প্রকাশের এই যে অনুষ্ঠান

করিয়াছেন, তজ্জন্ত বঙ্গবাসীমাত্রেই তিনি বক্তব্য-ভাজন। এ গ্রন্থ পাঁচটি গল্প সংবৃত্ত হইয়াছে—সবগুলিই সুন্দর। তবে "উদার" "কৃষ্ণ" ও "অশ্রু" এ তিনটি গল্প বঙ্গমাহিত্যে দণ্ডদ্বন্দ্ব—ছোট গল্পের আট এগুলিতে পূর্ণবাত্রায় ছুটিয়াছে। "ভাষাত" হস্তরসে পরিপূর্ণ। "নিয়তিতে" লেখক বামব-জীবনের করণ বৈশিষ্ট্য হৃদয় ছুটিয়া ফুলিয়াছেন। লেখকের ভাষায় হৃদ্য আছে, হর আছে; রচনা-ভঙ্গীতে ধোণ আছে এবং তাহা সংযত। বালক লেখকের গতি বেশ। রোমান্টিক হৃদয় তাঁহার হাতে খোলে ভাল। ছোট-গল্প-রচনার যেমন বাবু যে ব্যক্তি অর্জন করিয়াছেন, 'মধুপূর্ব' সে ব্যক্তি সমধিক ঘর্ষিত করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমতী রত্না।

কলিকাতা—২২, হাফিজ স্ট্রিট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ বাত্রা কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, হাফিজ স্ট্রিট হইতে শ্রীকালীদাস হালদাস কর্তৃক প্রকাশিত।



वासुकी

$\frac{4}{8}$ bitter

1931. March

not-y?

ভারতী

৪১শ বর্ষ]

মার্চ, ১৩২৪

[১০ম সংখ্যা

ছাইভস্ম

সবাই বলছে সেটা ছাওর, কিন্তু আমি বলছি না, না, না! বালি-উত্তরপাড়ার ঠিক মাকানারি জায়গায় জেলেনের জালে এই যে জিনিষটা ধরা পড়েছে তা আমাদের জাহাজের লেট-গুগক-সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাহন, জীবন-মৃত্ত গুগকের বালি বোঝাক বই আর-কিছু হতেই পারে না। মৃতরাং আমাদের উচিত ছিল ভূতপূর্ব সব সভা মিলে খুব ঘটী-কোরে লেট-সভার স্নান করা। পলার তখন তপসী মাছ যথেষ্ট পাওয়া গাছিল, এবং আমাদের মুখ্যো-দশার আমার খাতির ও গুগকের প্রেতাখ্যার ক্রীত্যার্থে জোজের দিনে বালি-উত্তরপাড়ার বতরকম পটোল বাজারে আসে ও ক্ষেতে জন্মায় সব তুলে নেবার জন্যে কোমর-বঁধে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু আমার সে-প্রস্তাবটা কেউ গ্রাহ্যই করেন না। আমাদের লেট-সভার সকলি হল

না;—উৎপাত হুক হল—জলে স্থলে সভার সভ্যদের উপরে, বেশে বিশেষে আমাদের কখনের উপরে উৎপাত হুক হল। জীবীকেশে হুকন সাহেব, কোথাও কিছু নেই, খামকা দুটো কই কাংলা ছিপে ঘরে মত্তহিংসা করে' বসলো। এতে গুগক-সভার সমস্ত হিঁহুসতা বিষম ব্যথা পেলেন। এদিকে আবার আমাদের বাঁড়ুযো-দশার কুটিবাটা থেকে উত্তরপাড়া পর্যন্ত বেড়া-জাল কেলেও আর তপসী মাছ গ্রেফতার করতে পারেন না। সহজ ছেড়ে গরুর খালে তপসী করতে আসাটা যে মূর্খের মতো কাজ হয়েছে এটা তাদের কে যে বলে দিলে তা জানা পেল না।

তারপর, উত্তরপাড়ার বালিনীকে আমাদের মুখ্যো অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়েও তাঁর জন্যে নিত্য পটোল তুলতে রাজি করতে পারলেন না। নিমতলার অবিশ্বাসবানু আমার ছেলৈ-

বেলায় বহু হরেও আমার নামে মানদানির মকদ্দমা আনবার কন্দি আঁটতে লাগলেন। অক্লান্ত যে আমি 'ভারতী'তে ইদানিং বে-গলগলো অবিন নাম দিয়ে লিখছি সেগুলো তাঁকেই উদ্দেশ্য করে' গালাগালি দেবার মতলোবে ছাপানো। অবিন যে 'অবনী'রই হৃদয়রোর, আর মুখে ছাড়া লিখে গালাগালি ও লিখে ছাড়া হাতে মারামারি যে আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব নয় এটা আমি কিছুতেই অবিনাশবাবুকে বোঝাতে পাচ্ছিলাম।

শেষে, এই মাসে ষোড়শলাত আমার কুঠিতে পঠ-করে' লেখা রয়েছে। আমাদের লীলানন্দ স্বামিজীও বলেন এবারের ডাবিতে জুয়াখেলার টাকাটা কাগজের দুখানা ডানা মেলে পক্ষীরাজের মতো। আমারি দিকে আসছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার অস্বমেধ পণ্ড করে ষোড়শাটা পণ-ভুলে অন্তের আত্মবলে গিরে ঢুকলো!

এই সব উৎপাত দেখে আমার মন একেবারে উদ্ভাস হয়ে গেল। আমি অবিনকে কিছু না বলে-করে জাহাজ ছেড়ে একেবারে নৈনিহারণ্যের দিকে বেরিয়ে পড়লেম—“বিফল জনম, বিফল জীবন!”—একতারাতে এই গান গাইতে গাইতে। ষোড়শোড়ের ষোড়শাটা কিদা তার ডানার একটুকুরা কাগজও বহি তখন—বাক্ সে হুঃখের কথার আর কাক নেই।

কান্টর দশাশমেঘের ঘাটে সব জুড়ি দিয়ে উঠছি এমন সময় এক দস্যোসী এসে হাত ধরে বলেন—“বাস্ করো

বেটা, চলো হর-ধোরারমে কুন্তকা অদ্বান্ করো!” কি আমি সন্ন্যাসীঠাকুরের কি শক্তি ছিল আমি জড়ভরতের মতো জল থেকে উঠে তাঁকে প্রণাম করে পারের ধূলো নিতে গিঁথে বেধি পারে ধূলো নেই! আমি তখন বুঝলেম ঠিক লোক পেরেছি। একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বসে—“ছলনা করছ ঠাকুর? এখান থেকে হরিদ্বার একদিন এক-রাতিতের পথ, আর পাঁজিতে লিখেছে আজ একটা-উন-পকাশে হল কুন্তু!” সন্ন্যাসী হেসে বলেন—“বেটা, কুন্তুকা অর্থ ক্যা আগে তো সম্বল লেও!”

ঘাট থেকে সন্ন্যাসীর আত্মনা—মণিকর্ণিকার স্মরণ—যেখন্দ্র হবে না; কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে ঘটাকাশ যে অর্থে ভরা—পূর্ণকুন্তুর বড়ার মতো শুধু গজা-জলে ভরা নয়—সেটা ঠাকুর যেন চোখে আঁতুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যিনি ঘটাকাশ এক-নিমেষে অর্থে ভরিখে দিতে পারেন, আকাশকুন্তুর মতো দেখালেও ডাবি' খেলার বড়ান্তরা অর্ধলাভের সহপায় যে তাঁরি দ্বারা হতে পারবে—আর কাক দ্বারা নয়—এটা আমার বিশ্বাস হলো। আমি ভক্তি-ভরে গমগমভাবে বাবার ঠিক পিছনে-পিছনে চললাম। কাগজের অর্থ নয়, রূপেরা ভরা কুন্তুও নয়, চক্কে আকবরি মোহরের চাকাই-জালা তখন আমার যেন চোখের সামনে উদয় হয়েছেন এমনি বোধ হতে লাগলো। আমি বাবাকে নির্ভরনে আপনার মনের হুঃখ জানাবার জন্তে ব্যাকুল হয়েছি, বাবা বোধ হয় এটা আগে থাকতেই

জানতে পেরেছিলেন, তাই আজ আমার ঐর্ষ্য পরীক্ষা করবার জন্তেই যেন তিনি আর বায়োটা পর্য্যন্ত কান্ট্রি বাড়ালি-টোনার অনিতে-পলিতে খিউ আর আটা ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু আমি জেনেছিলাম যে এবার ষ্টিক লোকের নাগাল পেরেছি। দোনা করবার ভয়, গাছগালাবার ভয়—এমনি একটা-কিছু এবার আর না হরে বার না। কাজেই ক্রমেতে তেঁরাতে ভিতরটা আমার গুকিরে উঠলেও আমার চোখকে আমি একটুও শুকোতে দিলাম না ;—গ্রেমাক্রতে বেশ করে ভিজিরে রেখে দিলাম।

যখন আশ্রমের দরজার, তখন বাবা একবার আমার দিকে কটাক করে বলেন—“আউর ক্যা? কুছু আউর উন্কা অর্ধ তো বিলু গিয়া। আভি বর বাও।” এখনো পরীক্ষা! ভাঁড়ারঘরের দরজার কাছে এনে বলা হচ্ছে যারে গিরে ভাত খাওগে! আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্লম—“বাবা, জমন অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এইখানে পড়ে রইলুম, কৃপা করতাই হবে। বাবার কাছে থেকে কিছু চীজ না নিয়ে আমি নড়ছি নে। গ্রাণ বার সেও বীকার।” বাবা আমার কথার আর-কোনো জবাব না দিয়ে আটা আর শি মেখে রুটি সেকতে বসে গেলেন। আমার দিকে আর দৃষ্টিপাতও করেন না।

হৃপূরের রোবে আমি একলা মুখ-গুকিরে এক গাছের তলায় বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলেন—“বাবা, তোমার কাছে কিছু

টাকা-কড়ি আছে?” কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাংলা কথা, টান-টোন সব বাঙালির মতো, কিচ্ছু বোঝার ঘো নেই যে তিনি পশ্চিমের খোঁটা! “পরলু থাকলে কি আমার এমন দশা হয় বাবা!”—বলেই আমি চোখ মুছতে থাকলাম। বাবাজী তখন আমাকে কাছে বসিয়ে শিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন—“তাতে আর ছঃখু কি! আমি বুঝছি, তোমাকে এই কুছুমেলায় দিনে একলা দশাষমেথে ভুব দিতে দেখেই আমি বুঝছি—থার্ডক্লাসের তাড়াটা পর্য্যন্ত তোমার অভাব। তা কেঁধোনা বাবা, আমি এখন তোমাকে কুছুখুলে পাঠাব। এই ঘটিটার ইঁদার থেকে একটু জল আনো তো।”

আমার তখনো মোহ কাটেনি। হরিদ্বারে কুছুমান আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয়, যখন কান্ট্রিতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি হিন্দু ইউনিভারসিটির বাড়ির কাঁটা একটা-উনপকাশে পৌঁছেছে প্রায়! যেমন এইকথা মনে করা অমনি বাবা তাঁর খী-হাতের কড়ে আঙুলটি আমার কপালে ঠেকিয়ে দিলেন। বাস একেবারে হরিদ্বারে উপস্থিত! সেই পিতলের মোটাটি পর্য্যন্ত আমার হাতে হাতে হরিদ্বারে এসে হামির! অবশ্য হরিদ্বার আমি এর পূর্বে দেখিনি, কিন্তু বাবাকে দেখে যেমন বুঝে-ছিলাম ষ্টিক লোকটি পেরেছি, এবারেও তেমনি বুঝলাম ষ্টিক আরপাটিতে এসে পৌঁছেছি। শুধু তাই নয় মনে হ'ল যেন এইখানে আমি অনেকদিনই এসেছি; আর-পাঁচজনের মতো আমিও আজ এক-কোমর বরফ-জলে গাড়িয়ে গভীর স্তব আঙড়াক্ছি

আর থেকে-থেকে ডুব দিচ্ছি। চারিদিকের লোকজন পাছাপাছ করে মন্দির-ঘাট সত্যির চেয়ে বেশি সত্যি হয়ে যেন আমার চোখে পড়তে লাগলো। এক রাজা হাতি-ঘোড়া লোক-লব্ধ আর বদ্ধ হুঁতিন খানা পাড়িগুচ্ছ আমার পাশে বসে নাহলেন। পবিত্র জলের পরশ পেয়ে কাঠের পাড়িগুলো বৃষ্টি সোনার পাড়ি হয়ে বার, আর হাতি-ঘোড়াগুলো বৃষ্টি বা রাজা-মাজোড়া হয়ে দেখা দেয়—এই ভেবে আমি সেইদিকে চেয়ে আছি এমন সময় একটা মোটা-পেট পুলিশম্যান পিছন থেকে আমাকে ধমক দিয়ে বলে—“এ বাবু, ক্যা দেখতা? ভাগো হিঁদাসে।”

আমি পুলিশের ভয়ে তড়াতাড়ি একটা কুলুচি করে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি চারিদিক থেকে বেদানকার বত পাগা “হাঁ—হাঁ কল্লো কি! পল্লার কুলুচি করে। সব্বার দ্বান মাটি হল!”—বলে তারের নানাবলীর পাগড়িতে আমার পিছুমোড়া করে বেঁধে কিল-চাপড় ঘেরে আমার আধমরা করে একটা অঙ্ককার ঘরে টেনে কেলে দিলে। তারপর কি হলো জানিনে, কতক্ষণই বা অজ্ঞান ছিলাম বলা যায় না, কিন্তু খানিক পরে চোখ-চেরে গারের দুলো ঝড়তে গিয়ে দেখি আমি কান্নিতে। বলে বিশ্বাস যাবেনা, আমার গা কিন্তু তখনো ভিজে ছিল, যেন সেইমাত্র দ্বান করে উঠেছি! কান্নির হিম্ম-কালেজের ঝড়তে তখন চং চং করে ছুটো বাজলো। একটা উন-পুকাশ থেকে ছুটো এরি মধ্যে হরিদ্বারে দ্বির কুলুদ্বান, রাজদর্শন, কুলুচি, দার-

খাওয়া এবং পুনরায় কান্নিতে ফিরে-আসা, সমস্তটা অগ্রে দেখতে গেলেও এর চেয়ে চের সময় লাগতো যে! বাবা আমার গারে হাত বুলায়ে বলেন—“বেটা, কুছ চোট লাগা?” আমি একেবারে গরগর করে বলি—“চোট লাগবে বাবা। আপনায় কুপায় একটি আঁচড়, কি একটি দাগ পড়াত নেই দেখুন।”

এবারে আমি খুব শক্ত করে বাবার পা ধরে রইলেম। এত শক্ত যে আমাকে ছাড়িয়ে বাবার আর এক পাও নড়বার সাধ্য রইল না। তাঁর কাছে কিছু আদায় করে নেবো এই প্রতীক্ষা! আমার লবলের মধ্যে তখন বাঙালিটোলার বাসা-বাড়িখানি। আমি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও ভাড়াটেনের সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে বাবাকে এনে সেইখানে বসালেম। তেতালার একখানা ছোট ঘর, তারি নামুনে একটু ছায়া। সেইখানে শুকদেবের উপদেশ-মতো আমি ঘোপালন, প্রাণারাম উৎসাহের সঙ্গে স্বক করে দিলেম। কোলের জবাদার, হাবেলদার, কাপ্তান, কর্মাং—সবার বেদন রকম-রকম শোবাক, ইউনিভারসিটির নানা ডিগ্রীর বেদন রং-বেরঙের বাঘরা, তেমনি সন্ন্যাসীদের দলেও সিঁদুর তারতম্য হিসেবে রকম-রকম পেরুয়া আর রকম-রকম ক্যাপনের কোপিন, পাগড়ি, জটা, তিলকের সাজসজ্জা আছে। আমি তখন বোগ-সাধনের ইন্সপেক্ট ক্লাসে বা ইন্সপেক্ট, দলে সবে ভর্তি হয়েছি। কাছেই আমার উদ্ভিটা হল সাধা লুকা, সাধা পুজাবি কোর্ডা, মাথার সাধা পাগ্ লুকা লোজ আর সেই

লোন্ডনের গোড়াতে একটুখানি গেরুয়া পাড় ; হাতে বাঁশের ছড়ি, পারে খড়ম, গলার ঠেঁকুল-বিচির মালা, কপালে ছাই। সারা পাগড়ি-কোর্তী-সুন্নী গেরুয়া হয়ে শেবে খালি পাঠের চামড়ার গিরে পৌছোতে আমার অনেক বাকি। আমার যিনি গুরু তিনিও অতদূর এখনো অগ্রণর হতে পারেন-নি। কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না। বাবার উপদেশ মতো খুব উৎসাহের সঙ্গে সবটা গেরুয়া উদ্দি বত শীত্র পারি লাভ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ওদিকে বাবার সেবা করতে, সম্যাসী খাওয়াতে, তীর্থ স্নানতে আমার জেবের সব গিনি-সোনা এক বোড়ক হরিভাল-ভয়ের ক্রমে পরিণত হয়েছে। আমার হাতে সেই ভদ্রটুকু দিয়ে বাবা বলেন—“বাও বাবা, এখন সংসারে কিরে বাও, সেখানে তোমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।” আকিসের কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, অনেক কাজই বাকি রেখে চলে এসেছি। কিন্তু সে যে হল অনেকদিন। কাজগুলো আমার জন্তে এখনো বসে আছে কিনা জানিনে। তাছাড়া হাতে আমার বাকি রয়েছে যাত্রা সেই হরিভাল-ভয়ের বোড়ক। সেটাও সত্যি তখন কিনা তারও পরীক্ষা করতে সাহস হচ্ছে না। অবিনকে তখন একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানাবার ইচ্ছে হ’ল। আমি হরিভাল-ভয়ের বোড়ক বাবার কাছে বঁধা রেখে ডাক-টিকিটের জন্তে ছুটো পরমা চাইতে গেলুম। তিনি খুব গভীর হয়ে বলেন—“বাবা, আমরা বুদ্ধিই মন সাধন করি, কোন-কিছু বঁধা রাখাতে। আমাদের দ্বারা

হতে পারে না। সম্যাসী কি কখনো মহাজন হব বাবা?”

বাবার মধ্যে মহাজনো যে এতটুকু নেই তাই বেধে ক্ষান্তিতে আমার বাক্যরোধ হয়ে গেল। আমি ‘বিকল জনম, বিকল জীবন’ আর-একবার মনে মনে গাইতে গাইতে বাঙালিটোলার গলি পেরিগেছি, এমন সময় অনেকদিনের পরে অবিনের সঙ্গে দেখা।

সে ঠিক তেমনি আছে—কোনো বদল হয়নি। কথার-কথার আনলুম সে গহ্বর চলেছে। আমাদের জাহাজের সেই লেট সন্টার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বস্ত্রকর্ম সত্তা আছে ও নেই ব্রাহ্মণশূত্র-নির্বির্দেশে সব ক’টার পিণ্ডান করতে। আমরা তখন পিণ্ডি দেবার জন্তে হাত নিসপিস্ করছিল কিন্তু তার সেটা আর বলে কাজ দেই।

গাড়িতে উঠে আমি অবিনকে বল্লম—“ওহে গহ্বর সাধুসন্ন্যাসীদের খুসি করবার মতো কিছু পকেটে এনেছো তো?” অবিন হাতের মোটা লাঠি-গাছা দেখিয়ে বল্লম—“যথেষ্ট।”

কান্না থেকে গহা কত দুই বা ? কিন্তু সময় তো লাগছে অনেকটা।—এই ভাবতে ভাবতে চলেছি এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা ট্রেননে গাড়ি থামতেই অবিন চট্ করে আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একটা ঝড় হ’য়ে প্লাটফর্মের সব আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে একটা! সাদা মোটর গাড়িয়ে গাড়িয়ে তেঁপু হিঁজিল। অবিন আমায় নিয়ে তাতে উঠে বসলো।

মোটরখানা কোনে হোটেলের ভেবে আমি
অবিনকে বল্লম—“ওহে আমার এ বেশে তো
হোটলে গঠা সম্ভব হবে না। কোনো ধর্ম-
শালায় গিয়ে থাকলে হয়-না?” অবিন
আমার পিঠ-চাপড়ে বল্লম—“ধর্মশালা থেকে
অনেকদূরে এসে পড়েছি যে! এখনো বুঝি
গুটার মাথা কাটাতে পার-নি?” বলতে
বলতে পাড়ি একটা ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ-হাতে
মোড় নিয়ে ঝাঁড়ালো। অবিন পাড়ি খুলে
লাকিয়ে পড়লো। আমিও নাম্বো এমন সময়
আমার পাগড়ীর লোজটা গেল মোটরের
একটা চাবিতে বেধে! লোজের পেক্ষা
অংশ তার সঙ্গে অনেকটা সাধা কালিও
ভাড়ার উপর বধশিণ-হিসেবে সাড়োয়ানকে
দিয়ে আমরা ছই বহুতে নদীর ঘাটে শ্রাদ্ধ
আর শিওধান করতে বসে গেলুম।
অনেকগুলো সত্য, পিণ্ডি তো কম দিতে
হলোনা? সব সারতে ভোর হল। শ্রাদ্ধ সেবে
হর্ব্যের প্রণাম করতে গিয়ে দেখি আমাদের
বড়বালায়ের শ্রাদ্ধ-ঘাটে বসে আছি। সেই
সিঁড়ি, সেই মার্কেল-পাথর-মোড়া ঘরে
তেমনি মিন্টান্ টালির বাহার! আমি তো
অবাক্। সম্বোধ হলো যে হরিবারে রাজাটার
মতো এ রাজাটাও বুঝি অতিশয় সত্যি।

অবিনের দিকে চাইলেম, তারও
চেহারাটা কেমন কাপসা বোধ হুল,—
যেন কুহাশার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখছি!
কুহাশাটা আমার মাথার স্তিতরে কি বাইরে
অমা হয়েছে সেটা বুঝতে না পেরে আমি
কাপড় ছেড়ে ব্রহ্মভেলোর হাত বোলাছি
এমন সময় আমাদের আহাভের বাবাজী
এসে আমার সামনে “অহ সত্যানারায়ণ!”
বলে হাত পাতলেন। আমি তাঁকে সত্যিই
বোলআনার একআনা দেব বলে ভেবে
হাত বিতেই আমার হাতে ট্রেকল সত্যি-
নারায়ণের কোন কাণেই খেঁচা লাগবে
না হরিতাল-ভন্ডের সেই স্লোড়ক—খেঁচা
অবিনের চেয়ে, হরিবারের চেয়ে, কাশী গয়া,
কলকাতার মোটরপাড়ি, শ্রাদ্ধের মন্তর,
বাবাজী, এমন কি আমার নিজের চেয়েও
সত্যি, সত্যি, সত্যি,—সত্যি ছাড়া মিথো নহ।

আটটা-উনপকাশের জাহাজ বাশি বাজিয়ে
পল্টুনে লাগল। অবিন, আমি, বাবাজী
এবং আরো প্রায় জন-পকাশ গিয়ে
আহাভের কেউ প্রথম, কেউ দ্বিতীয়, কেউ
তৃতীয় শ্রেণী, কেউ-বা কোনো শ্রেণীই নয়
বলল কল্লম।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্তমান সাহিত্যে যুগ-ধর্মের রূপ

জোখের সামনে এই যে জল-বাটী-
আকাশ-বাতাস-আগুনে ভরা ছনিয়াখানা
দেখা যাচ্ছে, এটার আপায়মন্তক যে পাঁচ-
কুন্ডের কণ্ঠিকলাশে বোকাই করা, তদ্বিধে

আমরা সকলেই একরকম নিঃশেষ হয়ে
এসেছি; এখন যদি কিছু সন্দেহ থাকে
তবে সে-সন্দেহ শুধু এক-বিধের, আর সে
বিধটা হচ্ছে এই—“ভূতেশ্বর কোনো বাবা

আছেন কি না ?' বস্তুতঃ, আমরা মানি আর নাই মানি, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নেরই চারিদিকে আমাদের সংশয় ও বিশ্বাস দিন-রাত্রির মজ্জা পালায় পালায় ঘুরে চলেছে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্তি-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনি একটা ধারণার ধারা অন্তঃসলিলা বইছে, যে ও-ধরণের কোনো বাবা অতীতকালে হরতো বা ছিলেন, কিন্তু এতকালে নিশ্চয়ই সম্প্রতি লাভ করেছেন। ভগবান মরে ছুত হয়েছেন কি নশটকে পড়ে ছুত হয়েছেন, এ অবশ্য মহাসমজার কথা, তবে এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই; তা ছাড়া দাদা কাগজে কালির ঝাঁড় পাড়তে বসেই ভগবানের নামে দোহাই পাড়াটা আজ-কালকার দিনে ঠিক সম্ভবমাত্রিক নয়, এমন-কি দৌর্যলয়েই পরিচায়ক।

ও-পরিচর অবশ্যই আমি দিতে চাইনে; কিন্তু যে পত্তনটীর উপর মনোবিজ্ঞান তার অজস্র শাখা বিস্তার করে' দিয়ে যাওয়া তুলে ধাড়িয়েছে সেই 'অহং'টিকে তুতদের পিতৃহানীর করে' দিলে আশা করি কেউ আপত্তি করবেন না। এই 'অহং'টা আমাদের অনেকের কাছেই 'অণুদার্থ'-রূপে গণ্য হয়ে থাকে, কেননা পদার্থ-বিজ্ঞান যাকে 'পদার্থ' বলা হয়, ও-অনিবিকে তার সংজ্ঞা-ভুক্ত করা চলে না। তবে, স্পষ্টই যখন দেখা যাচ্ছে যে ঐ অহংএর ঠেলার এই বিশ্বজোড়া তুতের রাজ্য চকল হয়ে উঠছে, তখন ও-বস্তুকে 'কিছু না' বলে' উড়িয়ে দেওয়াও তো যায় না।

কিন্তু সে বাই হোক, এ-দেশের বড়দর্শন বাহুবের কল্যাণ-কামনার যে-সমস্ত যত্ন আউড়ে আগলিলেন, তাকে প্রাচীরের মত বললেই যদি ধরা যায় তবে সে-প্রাচীর ছিল তুতের; অপর পক্ষে, একালের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা যে নব-মস্ত্রে বীজিত হয়ে বেরছি তা' তুতের প্রাচীরে নিশ্চয়ই নয়, তাদের বাপেরই প্রাচীরে। অহংপুঙ্খের পৌরুষ কারুর মাত্রখান দিয়ে একাশ পেতে দেখলেই আমরা যে সর্বত্রই তার গলা টিপে ধরবার জন্তে দলবদ্ধ না হয়ে থাকতে পারিনে, এ-সত্য কাগজে কাগজে এতই প্রত্যক্ষ যে তার প্রমাণ অনাবৃত্তক।

কবির। কিন্তু ঐ নবশিক্তি-সম্প্রদায়ের মহা-সমারোহময় প্রাচীর নিমন্ত্রণে বোগদান কর্তে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছেন, কেননা তাঁদের মতে তুতের বাবা তাঁর গুণধর পুত্রদের উৎপাতে আত্মহত্যা করেন নি, চাপা পড়েছেন মাত্র।

প্রাচী-সভার সভাসদরা বলছেন—'প্রমাণ কি তা'র ?'

কবির উত্তর—'প্রমাণ আমি প্রাপের মধ্যে পেরেছি। নিরমস্তকটা শ্রী শ্রী সেমে মনের গলা থেকে কাছা খুলে কেল, তোমরাও অবিলম্বে সে প্রমাণ পাবে।'

বিজ্ঞ সভাসদবর্গ বলছেন—'খবদাঁর, নিরমস্তক করে না; কবির কথা অবিশ্বাস্য, অক্ষএব প্রাচীরে কাল ধত পাবো দীর্ঘ কর।'

২

কথাটা উঠেছে 'ব্যক্তি' আর 'সমাজ' নিয়ে। ব্যক্তিগত অধিকারকে সাম্মুখে ধরে

বহুসাহিত্যের একধিক থেকে যে নবমত প্রচারিত হচ্ছে, আমাদের নব-শিক্ষিত সন্তানদের সাহিত্য-কৌণ্ডি তার শুভকল-সম্বন্ধে সন্নিহিত হচ্ছে, এবং Socialism-ভক্তেরা ঐ প্রচারের রূপটিকে Individualism নাম দিয়ে নানাপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

সমাজ-তত্ত্বে আর ব্যক্তিত্বে যেখানে বিবাহ বাধে সেখানে ধর্মতত্ত্বের সালিশি অপরিহার্য হয়ে পড়ে, কেননা ধর্ম-জিনিষটী যে কি, তাই নিরৈষি যে মানুষে মানুষে মতভেদ ও বুদ্ধিভেদ অনন্তসামান্য। সামাজিকরা বলেন, যা মানুষকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাই ধর্ম; আর অসামাজিকরা বলেন, মানুষকে সমাজ থেকে বা' যুক্ত করে তাই ধর্ম।

মনে পড়ে, বহুকাল আগে আমাদের এই গ্রামে একবার নিরন্তরীণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিবদ রকম দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল,—সে-দাঙ্গার উপলক্ষ্য ছিল 'গরু'। মুসলমান-ধর্মতত্ত্বে ও-জীবটীর হত্যার ব্যবস্থা আছে এবং হিন্দু-ধর্মতত্ত্বে তার রক্ষার বিধান আছে—এই বিবাদকেই বড় করে' তুলে হিন্দু-ধর্মিক ও মুসলমান-ধর্মিক পরস্পরের মাথা লক্ষ্য করে' লাঠি উত্তিরিয়েছিলেন। ছুটি প্রবল সন্তানদের ধর্মবুদ্ধি ধ্বন গরুর উপর ভর করে' দাঁড়ায়, ওখন তা' যে গো-বুদ্ধিতেই পরিণত হয়, ঐ উচ্ছলিত দৃষ্টান্তটাই তার প্রমাণ।

এখন, যে-বুদ্ধির কথা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে পাড়া হয়েছে তা' ঠিক গরুর না হলেও সমাজকে আশ্রয় করে' দাঁড়িয়েছে, এবং

আমাদের নব-ধর্মিকদের ধর্মবুদ্ধি ঐ জিনিষটিরই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আশা-আশঙ্কার পরিচয় দিচ্ছে।

আমরা নিজেদের Socialism বা Individualism এই উত্তরবিধ ism এর কোনোটিরই বিশেষ পক্ষপাতী নই—কেননা ও-ছটীরই প্রতিষ্ঠাতৃত্বিতে যা আছে তার নাম স্বার্থপরতা। এই স্বার্থবুদ্ধির উপর যতক্ষণ মানুষ বাস করে, ততক্ষণ তার ভবিষ্যৎ স্বত্বকারাচ্ছন্নই থেকে যার; সকলের স্বার্থ এক নয়, এবং স্বার্থ কন্ঠিনকালেও দুনিয়া-শুধু লোকের এক হতেও পারে না—অন্তএব স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের ভিতর দিয়ে ঐ সকল ism-বাদীর ভবিষ্যৎ রক্তেরধাক্কিত হতে বাধ্য।

'সমাজ' হচ্ছে সেই জিনিস, যেখানে আমরা পরস্পরের পারিবারিক স্বার্থকে যথাসম্ভব সুবিধাজনক করবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে একটা আপোষ-সীমাংসা বা রফাছাড়ের বন্দোবস্ত করে' পাশাপাশি বাস করি, এবং Socialism হচ্ছে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে ঐ জাতীয় ব্যবস্থা বন্দোবস্তের নানারকম আইন-কানুন।

Individualism এর অর্থ অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বার্থবাদ, অর্থাৎ পরস্পরের স্বার্থ-গত আদানপ্রদানের যাকখানে নিজে স্বার্থটাই বড় করে' দেখা—অপর কথায় "চাচা আপন বাচা"—এই মতবাদ।

কোন লেখক-বন্ধুর পক্ষে প্রকাশ— "সমাজের বর্তমান অবস্থায় Individualism জিনিষটা পেটের অস্থি Castor oil এরই মত"।

উক্ত উক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে যে আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থাটা একেবারেই আশাশ্রয় নহ, কেননা তার চতুর্দিকেই স্বার্থ-বুদ্ধির পেটের অস্থখ দেখা দিয়েছে। বন্ধুর ঐ রোগ নির্ণয়টুকু নিতুল—কিন্তু তিনি চান ও-রোগ তাকনার অন্তে Socialism-এর জরঢাক-শব্দে সাহিত্য-ক্ষেত্র শরায়মান করে' তুলতে এবং সেটি একটি প্রকাণ্ড তুল।

যে স্বার্থ-সন্ধান-চেটে। জনে জনে সর্জনশয়ের কারণ, তা দলে দলে স্বীকৃত হলে যে, মানব-জগতে পৌষমাবের আরাম দেখা দেবে, এমন কথা এক পাগল ছাড়া অস্ত্র কেউ মনে করতে পারে না। হুতরাং সমাজের বর্তমান অবস্থার Individualism-এর প্রসার যদি Castor oil হয়, তবে Socialism-এর প্রচারও বেলের মোরকা হবে না।

তবে কি Individualism-এর প্রচার চলতেই থাকবে ?

উত্তর—Individualism-এর প্রচার কেউ কর্ছেনই না। ব্যক্তির স্বার্থ-স্বাতন্ত্র্য নহ, কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্যই আধুনিক সাহিত্যের সর্বোচ্চ শিখর থেকে প্রচারিত হচ্ছে, এবং বলা বাহুল্য যে 'আত্মা' বলতে যা বোঝায়, তা সর্বস্বার্থপর্যেরই বন্ধ। এ প্রচারকে যদি কোনো ইংরাজী নামেই চিহ্নিত করতে হয়, তা হলে সম্ভবত Microcosm নামটা নিতান্ত অস্থপযোগী হবে না।

৩

কিন্তু প্রচারের লক্ষ্যটা যে Individualism-ই, এ ধারণা এক-আধজনদের নয়

—আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ মাষ্টার-মহাপণ্ডেরাই এ বিষয়ে একমত, কারণ তাঁরা সকলেই Ibsen পড়েছেন। 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য' নাম কোনোখানে যেথল্লেই যে তাকে Ibsenism মনে করতে হবে, এমন ধারণা নিশ্চয়ই আমাদের পেয়ে বসতো না, যদি 'স্বার্থ' ও 'আত্ম' এই দুটা শব্দের স্পষ্ট ভাব-চিহ্ন আমাদের মানস-চক্ষের সম্মুখে থাকত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা-সাগরটা সঁাতরে পায় হয়ে এলেও স্বার্থের হুঁলি আমাদের অনেকেরই চোখ থেকে বসে পড়ে না, বরং কাকুর কাকুর চোখে বরং বেশী করে'ই এটে বসে। ফলে আমাদের মাষ্টার-মহাপণ্ডেরাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে-ভাবে বলা-কওয়া করতে থাকেন, তাতে দুনিয়ার হাঁড়ির খবর এত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় যে নাড়ীর খবরটার আর সন্ধানই পাওয়া যায় না।

এর কারণ স্পষ্ট। বর্তমানে আমরা কলেজে বাই ভবিষ্যতের ভাত-কাপড়ের ভাবনায়, কিন্তু হৃদয়-মনের অস্থশীলনের অন্তে তর্কিত। ফলে, শিক্ষক সেজে যখন শেখা-বুলিকে লেখার পরিণত করতে বসি তখন ঐ এক স্বার্থ-বুদ্ধির স্বাভ-রোগকেই মাহুব থেকে সমাজে এবং বিধি থেকে বিধানান্তরে সঞ্চালিত করা ছাড়া অস্ত্র কোনোক্রমে কর্তব্যের কল্পনাও করতে পারিনে !

বিষয়ের সঙ্গে পীতের যোগ দেহ-রক্ষার অন্তে যে অত্যাবশ্যক তাতে অবশ্যই সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাভের যোগটাই যে গোলযোগ

এমন কথাও ঠিক নয়। প্রথমোক্ত যোগটি রক্ষা কববার ক্ষেত্রে যে দৃশ্য দরকার, তার চাবের পক্ষে মাঠের মাটাই যথেষ্ট; এ উদ্দেশ্যে মনকেও মাটি 'করে' সাহিত্য-ক্ষেত্রে লাগণ চালানো সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। কিন্তু এ সভা মানা ঘূষে থাকে, রস-সাহিত্যের দরটা পর্যায় সম্প্রতি আমরা দাঁতের কষ্ট-পাথরেই ঘাটাই করতে ব্যস্ত হয়েছি এবং বস্ত্র-ফুট হচ্ছে না বেধে রসিক-সম্প্রদায়কে 'বস্ত্রতান্ত্রিক নয়' বলে নিষেধ করছি।

দাঁত ওঠবার আগেও যে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের আঁতের যোগ থাকে, তার প্রমাণ শিশুদের হাসি-কান্নার ব্যয়ে ধরেই পাওয়া যায়; অপর পক্ষে, দাঁত পড়ে গেলেও যে ও-যোগ নষ্ট হয় না তার উজ্জল দৃষ্টান্ত 'বুড়ো-ডিকির চুন্নানাতে মনের নিলে জুখে থাকায়'। চোখের উপর এ-সব নিত্য দেখেও কেন যে আমরা মানুষানের ঐ দস্ত-যোগটাকে এ-বিষয়ের স্বাক্ষরসনে বসাতে চাই তা' বলা শক্ত। কিন্তু বসাজি যে, এ-অপবাদ অর্থাৎ 'করে' লাভ নেই; আমাদের ঐ শিক্করনের পৃষ্টপোষকতার আমরা বেশভূষা লোক আজ আন্ত-চর্চার ঋণিকত্বকে পাল কাটির ত-মাঝির ভূতের বোকার কুস্পৃষ্ট ও শ্বাসদেহ হতে চলেছি।

বিবহিঙ্গালয়ের পিঠের বোকা স্বজাতির পেটের মধ্যে সন্ধ্যার প্রবেশ করিয়ে দিলে তারা যে হাঁপকাঁস করুতে করুতে 'সমাজের' খাটির চিং হয়ে পড়বে, এতে অবশ্য বিম্বিত হবার কারণ নেই। সেই ক্ষেত্রেই সাহিত্যের বেনামীতে আজ আমরা

চামিটিকে 'হা' দেখছি তা' আগে ঐ সমাজেরই সেবারে, আর ধর্মের নামে 'হা' পাচ্ছি তা' ও-বস্তুর গোচর-পুঙ্খ ছাড়া অস্ত্র কিছুই নয়।

সাহিত্যিক বলে' সাধারণতঃ আপনাকে চাণিয়ে দেবার ক্ষেত্রে, অথবা ধার্মিক বলে' লোকারণ্যে গণ্য হবার পক্ষে ও-পন্থার অহুসরণ যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তাতে আর সন্দেহ কি! সমাজবদ্ধ হয়ে পরম্পরের মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা করা যায়, তার মত সুবিধাটা এই যে তাতে লজ্জার ভয় থাকে না; কেননা, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাভ"।

কিন্তু লজ্জাটাকে কোনমতে পাল কাটিয়ে চলাই যে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, এমন কথা শুধু লজ্জার মাথা খেয়েই বলা চলে। তা' ছাড়া, ধর্ম বা সাহিত্যের অর্থ-নির্গর করতে হলে সমাজের ভোটেই যে দরকার, এমন কথা তাঁরাই বলতে পারেন যাঁদের আস্থা :মাথার চেয়ে ধর্মের উপরই বেশী। দেশের ধর্ম দেশের ঐতিহ্য-শালীদের মধ্যে নেই—ওজন-ভারী জন-সংখ্যার আছে এ-কথা মানা সম্ভব হ'ত, যদি দেখতুম যে কুড়িজন শিশুর হৃদে একত্র করলে একজন প্রাণবন্তের অভিজ্ঞতার সমান হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ থেকে ঐতিহ্যবানদের তফাত করে' ধরলে শাসনে সে একাঙ দেহটা পাওয়া যায়, তা' কবন্ধ বই আর কি? এ হেন "সমাজ-কবন্ধের" ভণ-বর্ণনা করে' প্রবন্ধ লিখলে হাততালি দেবার লোক বুইই মেলে বটে, কিন্তু ও-অঙ্গের হাড়ে দশদুঃ একগাফ

হয়ে উঠলে যে সৃষ্টিটা গড়ে ওঠে, তা' নিতান্তই 'দশানন'। এট রাক্ষস-রাজের কুড়িহাতে ধর্মের নামে যে ঘট-হাপনা করা যায়, সে-বটে ধর্মের দর্শনলাভ স্বভাবতঃই ছুঁট হয়ে ওঠে, কেননা ও-কার্য্য আসলে ধর্মের বিরুদ্ধেই ধর্মঘট ছাড়া অপর-কিছু নয়।

৪

ধর্মের বথার্থ আরম্ভ হচ্ছে একের 'অহং'এ, অনেকের 'গোলে-হরিবোলে' নয়। ও-বস্তু সামাজিকতাও নয়, লোক-লৌকিকতাও নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা। ধর্মের অপর একটি নাম হচ্ছে আত্মবোধ বা আপনাকে চেনা, কিন্তু সমাজের জন্যে জানে আমরা আত্মবিরোধই দেখতে পাই। লোক-শিছু চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে পরম্পরের সুখচেনাচেনি নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু আপনাকে চেনা অবস্তাই তাতে হয় না। আত্ম-পরিচর নিতে গেলে নিজের মনের মধ্যে বিজনবাস করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, কেননা 'অহং'এর চরম বিকাশটা মনের অতিরিক্ত, অন্তর্ভুক্ত নয়; আর ঐ মনের বিদ্যাবুদ্ধিকে আত্মাধীন করেই আমরা আত্মপ্রবুদ্ধ হতে পারি। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অহংএর বেদীতেই ঐ অমি-মতের সর্বপ্রথম শিখা দেখা দেয়, এবং মনের ভূতপ্রভু দিকটাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিবেই বিরাট অহংএর অঞ্চল ঐক্যব্রহ্মে আত্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠাত্বমিতি স্বচ্ছ করে' তোলে।

জীবন-ধর্মে আর সাহিত্য-ধর্মে যদি কিছু তফাৎ থাকে, তবে সে শুধু 'বিকাশের'

আর 'প্রকাশের'। প্রথমটি যদি আত্ম-বিকাশ হয়, তবে দ্বিতীয়টি হবে আত্মপ্রকাশ। এ-কার্য্যে পরতত্ত্বতা হচ্ছে প্রতিপক্ষক এবং স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য আশ্রয়।

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত আত্ম-বিকাশ ও আত্মপ্রকাশ-ধর্মকে বোঝা করাট হচ্ছে বর্তমান-সাহিত্যের যুগধর্ম। কঠিন-মুক্তিকাপূর্ত পৃথিবীর গভীর তলদেশে যে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কুণই যেমন তাকে সর্বাঙ্গে স্পর্শ করতে পারে, তেমনি এই মানব-জগতের বিচিত্র চিত্ত-স্তরের গভীর তলদেশে যে অঞ্চল প্রাণের ধারা প্রবাহিত রয়েছে ব্যক্তিগত চিত্ত-বিদ্রোহ-ফলেই তা' লভ্য হয়ে থাকে। সরোবর বা দৌর্য্যিকা থেকে যেমন কূপের জল সংগৃহীত হয় না—পরন্তু খনিত সরোবর প্রভৃতিতেও কূপের উৎস-মুখেই বারিরাশি ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ব্যক্তির প্রাণ-শক্তিও সমাজ থেকে সংগৃহীত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিরই প্রাণের বেগ সমাজকে সজীব ও সবল করে' তোলে। সমাজ হত-বড় ভারী জিনিষই হোক না কেন, ধার যদি কাকুর থাকে তবে সে ব্যক্তিরই আছে। অতএব, আধুনিক মানব-সমাজের কর্তব্যক্ষেত্রে ধারা ঐ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগধর্মটি নির্দেশ করতে বাঁড়িয়েছেন, সমাজ-ভাষ্যের-সম্প্রদায়ের তিরস্কারে অবস্তাই তাঁরা বিচলিত হবেন না। বথার্থ মানব-কল্যাণের উপায়সম্বন্ধে ধারা বুদ্ধিমান হয়েও অবোধ, তাঁদের অপরাধকে মার্জনা ও তিরস্কারকে শিরোধার্য্য না করলে এ-জগতের মধ্যে মানুষ পড়ে' তোলবার চেষ্টা পেছিয়েই পড়বে।

সর্বপ্রকার স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পরিণতি-মানের চেষ্টা নিশ্চয়ই Ibsenism নয়; যদি হয়, তবে এ-দেশের সব-চেয়ে দুর্দান্ত Ibsen ছিলেন বৈদিক ঋষিরা।

‘হোক সত্য যত বড়, মিথ্যা তাহা মোর কাছে
বুঝি নাই বারে

খুঁজে লব প্রাণ হ’তে তারে’—এই মন্ত্রই হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূলমন্ত্র, এবং তাঁরাই ও-সম্বন্ধকে দোষের বলতে পারেন দ্বারা পড়া-বুলিকে গড়া-বুলিতে পরিণত করে’ ভোলবার উপযুক্ত পাকবস্ত্রের অভাবে নিম্নোষের ঐ অভাবটাকেই সম্পন্ন বলে গণ্য করেন।

‘আত্মা-জিনিষটা যে নিলিখ, স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বাধীন—এ-কথা আমরা কেতাবে পড়ি ও বক্তৃতায় হুড়াই। কিন্তু মানুষের আত্মপ্রকাশে স্বাধীনতা ও সৃষ্টির মস্তলীলা দেখলেই আমরা শিউরে উঠে বলাবলি করি—“সর্বনাশ হল, উচ্ছৃঙ্খলতার দেশ ভাসলো।” সৃষ্টিলের অর্থাৎ শিকলির উর্দ্ধে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, এই ক্ষুদ্র আশঙ্কার চিরন্তন সৃষ্টিলাকে জ্বর আমরা তকাৎ করে’ রাখবো না—কেননা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, মানুষের বরগড়া সৃষ্টিলা এই চমৎকার বিশ্ব-সৃষ্টিলাকে কাছে কিছুই নয়। গড়ন পর গড়ন, জয়ের পরে মৃত্যু, রাত্রির পরে দিন আমাদের হাতে-গড়া জীর্ণ-নীতির প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে’ পরমানন্দে আবর্তিত হয়ে চলেছে এবং আমাদের ক্ষুদ্র গর ও তুচ্ছ বিধাকে বাদ করে’ involuntary বেহ-বস্ত্রগুলিরও

আড়াল থেকে প্রাণ তার আপন নিয়মকে প্রকাশ করছে।

প্রাণের এই সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাভূমিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ-বর্জন করাতেই প্রত্যেক ক্ষুদ্র অহংএর স্বার্থ আত্মপ্রতিষ্ঠা, কেননা স্বার্থ-স্বাতন্ত্র্য-বর্জন আর আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-অর্জন একই কথা। গোবিন্দকে যদি মনস্তার করতে হয় তবে সে এইখানে—এই স্বাতন্ত্র্যের অর্জন-ক্ষেত্রে। ‘উড়ো খই গোবিন্দ্যার নমঃ’ করলে সামাজিক বহনানের চোখে খুলো দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মৃতের তর্জনী-সন্ধেতে মোহপ্রাপ্ত হলে প্রাণের শব্দধ্বনি শোনবার কানটাও নিশ্চয় বধির হয়ে উঠবে।

আমাদের শিক্ষার প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে extreme negativeকে অনায়াসেই আমরা extreme positive বলে ভুল করে’ ফেলি, এবং তা’ এট কারণে যে, ও-দ্বয়ের চেহারা প্রায় একই রকম। আলোকের কম্পন যখন সূচুতম, তখন আমরা চোখে অন্ধকার দেখি,—যখন সূচুতম, তখনও কাণা হয়ে থাকি। শব্দ-সম্বন্ধেও অবস্থা ঠিক ঐ একই রকম; অর্থাৎ ও-বস্তু যখন অতি-কীর্ণ তখনও আমরা শুনে পাইনে—আমি যখন অতি-উচ্চ তখনও কাণা হয়ে থাকি।

আধুনিক শব্দ-শ্রীমদের মধ্যে যে ছ’একটা প্রবলকর্তা দেশের লোকের মনের কান কাশা করে’ দিচ্ছে তা’ এই শ্রেণীভুক্ত কারণে। তবু, ভরসার কথা এই যে ও-শব্দ অবিলম্বেই বেশ শুনে

পাবে,—এমন-কি, অনেকে ইতিমধ্যে
গেয়েছেনও।

কিছুকাল আগে আমাদের ধারণা ছিল
যে বিশ্বের জঞ্জালের দিকে মনকে বিক্ষিপ্ত
করে' দিতে পারাই ভগবানের নিকটতর
হবার উপায়—তাই কেন্দ্রটিকে নিজের
বাইরে ধরে' এগুতে চাইছিলুম। আজ
একটা দৃষ্টি-ভাঙার বিশরীত ধাক্কার
অকস্মাৎ সে দিকটা ঘুরে গিয়েছে—তাই যুগ-
ধর্মের মুখে নতুন এক মন্ত্রশক্তি বাস্তব
হয়ে বলছে—“রোগটা ঠিক ঐ বটে, তবে
চিকিৎসার পথটা হচ্ছিল ভুল; মনকে
বিশে বিক্ষিপ্ত না করে' বিধকে মনে
সংক্ষিপ্ত করতে থাক,—ভগবানের নিকটতর
হবার চেষ্টা ছেড়ে ভগবানকে নিকটতর
কর্মেবার সাধনার লেগে বাও, কেননা
তাতেই বাস্তবী অস্ত্রমনস্কতা আত্মমনস্কতার
পরিণত হবে।

জীবনের পরিপূর্ণতা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো
সুদূর-পারের কেন্দ্র থেকে আমাদের ডাক
পাড়ছে না—আমাদেরই অভ্যন্তর থেকে
বাইরের পরিধিটাকে সে কাঁপাচ্ছে। সৃষ্টি ও
স্রষ্টা দুটী আদি-অন্তহারা সমান্তরাল সরল
রেখারই মতন বৃত্তাকার।

বিশ্ববন্ধকে মানস-লোকে আকর্ষণ এবং
মনের ছাপ লাগিয়ে লাগিয়ে অভিনব রস-
সৃষ্টিতে বিশ্বপথে বিকর্ষণ—এরই নাম হচ্ছে
ব্যক্তিগত সাহিত্য-সাধনা এবং এই জাতীয়
আত্মপ্রকাশ থেকেই সাহিত্য-সাধকদের
জীবন-পন্থা ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলেতে
পারবে; কিন্তু পূরের মুখে বাল খেয়ে কাগজের
পাতার 'গোটা নাল' ভেঙে চলাতে নয়।

সকলেই যদি পরম্পরের মনের কথা
বলতে আরম্ভ করি, তা' হলেই আমাদের-
প্রদানে উক্ত থেকে উচ্চতর ছাঁচে মনকে
ঢালা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে—অন্তঃ-
ব্যক্তিগত ভাবে স্ব-তত্ত্ব ও স্বাধীন বিচার-
চিন্তা অত্যাশঙ্কক। ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও চিন্তার
যাত-প্রতিযাতে আন্দোলিত-জীবনের এই
সত্য-পরীক্ষা-প্রাণ-ব্যাপারকে ধারা ঠেকিয়ে
রাধতে চান, তাঁরা মানব-কল্যাণের সহায়
নয়। একমাত্র বিচারের সর্বে-পড়া
প্রয়োগেই অহংএর ঘাড়ের ভূত তার
পদানত হতে পারে, অস্ত্র কোন উপায়েই
নয়।

কিন্তু আমাদের Ibsen-ভিত্তিগ্রস্ত
অনেক ব্রহ্মসার-লেশকের একটী উক্তি
উদ্ধৃত করে' একজাতীয় চিন্তা-রোগের বীজটা
বেঁধে দিচ্ছি—

“তবে কি বেদান্তের ‘অন্তরের কথা’
আমার চরমতম চিরন্তন সত্য? কে জানে!
হয়তো বাহ্য জ্ঞানের’ অনবিশ্রাম তাহাকে
‘ভক্তি’তে লাভ করা যায়।”

‘জ্ঞান’ আর ‘ভক্তি’ যে দুটী পরম্পর-
বিযুক্ত জিনিস, এ-ধারণা অনেকেরই আছে।
কিন্তু আসলে ভক্তিবোগ, জ্ঞানবোগ বা
কর্মবোগের মধ্যে একেবারেই গোলযোগ
নেই, কেননা ও-তিনটীই পরম্পরসাপেক্ষ,
এবং মনেরই তিনটী বিভিন্ন অবস্থা ছাড়া
অস্ত্র কিছুই নয়। ‘ভক্তি’ বলতে বা'
বোঝায় তা' কোনো-কিছু লাভের উপায়
নয়—পরন্তু ঐ জিনিষই হচ্ছে লভ্য ফল।

‘মন’ বলতে আমরা যে চকল ও তরল
পদার্থটাকে বুঝ, ‘ভক্তি’ বলতে সেই

একই পদার্থের স্থির ও প্রগাঢ় অবস্থাকে বোঝায়। 'বুদ্ধি' বা বিবেক বলতে যে জিনিষটী বুদ্ধি তা ঐ মনকে আল দেবার অগ্নি ছাড়া আর কিছুই নয়—আর 'ক্রিয়া' হচ্ছে সেই জিনিষ যা' ঐ বুদ্ধির উত্তাপে মন-পদার্থে দেখা দেয়। 'মন'-জিনিষটির প্রাথমিক ধর্ম হচ্ছে তারল্য—আমাদের জন্মের বিভিন্ন বৃত্তি সত্যসত্যই পৃথক পৃথক বিভাগ নয়, আমাদের স্বরূপ না হওয়া পর্যন্ত ও-জিনিষ তারল্যপদার্থের ধর্মাত্মসারে বহন বা সামান্য পার ভরই আকার ধারণা করে বলেই তা বিভিন্ন দেখার মত—বিচারের উত্তাপে ক্রিয়ামূল হ'তে হ'তে 'মন' বহন চরম-স্পন্দনে উপনীত হয়ে অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ হয় তখনই তা ভক্তের ভাব ও ভক্তি-পরিণাম লাভ করে।

মনোবৃত্তি হচ্ছে instinctive, এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি দ্বাৰায় প্রাণীতেই এ-জিনিষ আছে। Argument হচ্ছে ঐ instinctএর দ্বিতীয় অবস্থা, এবং পশুপক্ষীদ্বয়ী দ্বারায়ের মধ্যেই তা দেখা দেয়। Inspiration হচ্ছে ঐ বিচার-সমুদ্রগারের আত্মপ্রতিষ্ঠা অবস্থা আর এই inspiration দ্বারের মতো একশাল পেয়েছে তাঁরই ভক্ত। বর্ণ্য কবিই হচ্ছেন একমাত্র ভক্তিবাদী, 'বর্ণন' তাঁদের দৃষ্টির ভিত্তিতে তো আছেই, তা' ছাড়া আরও এমন-কিছু আছে যা' দার্শনিকের দৃষ্টিতে নেই; ভক্তিই হচ্ছে ঐ অতিরিক্ত কিছু। এই বস্তই সর্ববিচারের উপর লঙ্ঘন নিত্যরূপ, অপরকথার আশ্রয়।

ভক্তি চর্মলের ছল নয়, বিচার-বুদ্ধি-হীনের অকতা নয়—ঐ বস্তই দিবা-চন্দ্র এবং ঐ বস্তই আপন নির্ভীক ও সন্তোজ, নিঃসংশয় ও অপরহত-পরাক্রম প্রেরণ-শক্তি বলে সেই সমস্ত চর্মলের অজ্ঞেয় বিরুদ্ধতা অবোধেই অতিক্রম করে' চলে যেতে পারে, ধারা নাকি 'অভয়ের কথা'র দোহাইটাও 'সত্যে' না পেড়ে থাকতে পারেন না।

তুধু 'অভয়ের কথা' কেন, এ-দুনিয়ার কোনো কথাই সত্য নয়; সত্য বা তা' ঐ 'অভয়'; সত্য বা, তা' সেই শক্তি ও দীপ্তি, অক্ষ ও হাত, নির্ভীকতা ও দৃঢ়বিশ্বাস, আনন্দ ও সরসতা—এক কথায় সেই প্রচণ্ডবেগ প্রেরণশক্তি বা কথার আড়ালটিকে আলোকিত করে' তোলে।

বর্তমানের যুগধর্ম ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই প্রেরণ-শক্তির উদ্বোধন-গান সহস্রকণ্ঠে গারিতে গাড়িয়েছে। এ-সঙ্গীতে সমাজধর্ম বা দেশধর্ম, মানবধর্ম বা বিশ্বধর্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু গঠিত হবে। ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই সমাজ, অতএব ব্যক্তিগত আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভই বিন্ধিত ও বিচ্ছিন্ন সমাজ-ধর্মকে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা করবে—ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই দেশ, সুতরাং ব্যক্তিগত আত্মবোধই দেশাত্মবোধে সত্য-প্রতিষ্ঠা পাবে—ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই মানবজগৎ, অতএব ব্যক্তিগত ধর্মজীবন লাভই বিশ্বমানবধর্মে জরাজীবন অর্জন করবে।

শ্রীবিদ্যারূপক বোধ।

আলোর আলো

স্বাক্ষর

মোহনের কথা

হায় যে জীবন-স্রাব তক্তরস! ঐ যে তোমার বিরাট পাত্রে মত বিশাল গগন এই বিচিত্র জগতের উপরে অনন্ত কাল ধরে উপুড় হয়ে আছে, ঐ দিগন্তব্যাপী স্রাবপাত থেকে যে বিবাক্ত রসের বিবাদ ধারা বিশ্বের মুখে দিবারাত্র ধরে পড়ছে আর পড়ছে,—কেন আমরা তৃপ্ত কঠে উন্মূখ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি—কেন আমরা বুঝি না যে, ঐ ক্ষণিক, তরল গরল-ধারার মততা ক্ষণপ্রভার মতই ক্ষণস্থায়ী? দীন, ক্ষুদ্র মানব আমরা,—আমরা হুঁ অঙ্ক নই,—আমাদের অহুতুটিও নেই, আমাদের এই বাহিরের জীবন, ভিতরের প্রচ্ছন্ন অসাড় জড়তার গুচ্ছ আবরণ-যাত্র।

জানিনা, এ জীবনটা কি? এর একমিকে স্রবের রাগিনী, হাসির কোমর, আনন্দের নন্দন; আর-একমিকে হুঃখের হাহাকার, কান্নার অঞ্জলি, হুঁতাপ্যের দাবদাহ; এরই মাঝে এই যে ভঙ্গুর মানব-জীবন অসহায় হয়ে পড়ে আছে, কী এর সার্থকতা? মাহুব নিয়ে এই যে গড়া আর ভাঙার, ভালো আর গড়ার চিরকাল-ব্যাপী অকারণ খেলা, স্রাবের কোন্ মহৎ, বিরাট, হুঁকোষ উদ্দেশ্য এর-মাঝে প্রচ্ছন্ন আছে?

এ বিশ্বখেলার বিনি নিঃস্রব জীড়ক, তাঁর অদৃষ্ট হস্ত জীবনের পিছনে মরণকে, বোবনের পিছনে স্রবকে, স্রবের পিছনে হুঃখকে কখন পাঠিয়ে দেয় কেউ টের পায় না, তারা স্তম্ভভাতকের মত হুঁপিহুঁপি এসে স্রবপ্যার চিত্তাভ্য ছড়িয়ে দিয়ে যায়—আর, স্রবহার মালিক হয়ে তিনি বলে বলে অটলভাবে তাই দেখেন। তিনি ত কীদেন না—তিনি ত কীদেন না। ‘জীবন যা করেন মঙ্গলের অঞ্জলি’,—এ-কথা বলেছে কোন্ অবেোধ? আশার আলোর বেধিয়ে যিনি হুঁজল, নাচারকে নিরাশার কূপে ডুবিয়ে মারেন, তাঁকে আমি ধস্তবাস দেব না!

একে, একে, একে ছয়মাস কেটে গেল,—নিরানন্দ, অন্ধকার, বিবাদবিবাদ দীর্ঘ ছয়মাস! খাই আর বিছানার গিরে শুই,—কখনো ঘুমিয়ে হুঃখ দেখি, কখনো জেগে হুঁতাবনা ভাবি। বাড়ার বাইরে পা বাড়তে সাধ যায় না—পৃথিবীর কোকজন, টেচামেচি, হাসি আর গান, এ-নব আশার প্রাণকে যেন ছবরের মাঝে হুঁজিত করে দেয়।

সরমার কথা মনে হচ্ছে। স্বাবীকে সে কিরিরে পেয়েছে—কিন্তু সে’ স্বাবী তাকে ভালবাসে না। তার হুঃখের কথা তাবলে আশার হুঃখ কত ছোট হয়ে যায়। সরমার মন ত আমি জানি! সে আমাকে

এই মনের জালা মনে চেপে রেখে,

অভাচারী, প্রেমহীন, কুচরিত্র পতির সংসারে তাকে দিনরাত দীর্ঘখাস ফেলতে হচ্ছে। শুক সাগরের তাতল বাগুগর্ভে একটি কুটিল কুহনের মত সরমা এখন নিজেই হয়ে পড়ে আছে। সরমা, সরমা, হৃৎকের উপরে হৃৎক সইতে কেন তুমি আমার পথে এসে দাঁড়িয়েছিলে? তোমার এ দুর্ভাগ্যের জন্তে হৃৎক আমিই দায়ী, আমিই দায়ী!

ধনুনার হাত ধরে সরমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম; এখানি তার বাবার দিনে লেখা।

আজ সন্ধ্যাবেলায় চিঠিখানি বার করে' আবার পড়লুম। সরমার আপন হাতে লেখা এই ক-টি লাইন ছাড়া তার আর-কোন স্মৃতিচিহ্ন ত' আমার কাছে নেই! লিখতে লিখতে সরমা যে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে, এ পত্রের ছত্রে ছত্রে—অম্পট লেখার তারই স্পষ্ট ছাপ রয়েছে! তার অক্ষরলে অভিবিক্ত এই লিপি আজ আমার মর্মের অন্তরে যেন তারই হারিয়ে-বাওয়া স্পর্শটুকু আবার কিরিয়ে আনছে!

সরমা লিখেছে :—

“বোহনবাবু,

অভাগিকে ভুলে যান। আমার ক্ষুদ্র জীবন আপনার যোগ্য নয়,—ভগবান তাই আমাকে আপনার পথ থেকে সরিয়ে দিলেন। এতদিন আপনার আশ্রয়ে ছিলাম, আপনার সহৃদয়ের রূপ আমি কখনো শুধতে পারব না—আপনি আমার সকল ক্রটি দীর্জনা করবেন।

আশীর্বাদ করুন, স্বামীর সংসারে গিয়ে আমি যেন আপনাকে ভুলতে পারি। এখন এর-চেরে বড় আশীর্বাদ আমার কাছে আর ত কিছুই নেই! ✓

সরমা।”

সরমা আমাকে ভুলতে চায়! কিন্তু আমি? আমি কখনো তাকে ভুলতে পারব কি? জানি, তার কথা ভাবাও আমার পাপ—কিন্তু এ পাপ সমস্ত নিবেদন ঠেলে আমার সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে' থাকবে যে। এ পাপই যে এখন আমার একমাত্র আনন্দ!

সরমা হৃৎক এতদিনে আমাকে ভুলতে পেরেছে! নইলে আজ-পর্যন্ত তার কোন খবর পেলাম না কেন?

আচ্ছা, সে ভাল আছে ত? বাবার সমগ্র ভাবের বাড়ী যেমন ভালাবদ্ধ করে' গিয়েছিল, এখেনা ঠিক তেমনি আছে! সে বাড়ীতে তার জিনিসপত্তর পড়ে রয়েছে—ঠেক, সে-সব নিতেও ত কেউ আসে-নি! তাই ত, সরমার অসুখ করে-নি?

সেদিন সরমার জন্তে ঘনটা কেমন উতলা হয়ে উঠল! খালি মনে হোতে লাগল, সরমা ভাল নেই—সরমা ভাল নেই! হয় তার অসুখ করেছে, নয় স্বামীর সঙ্গে সে কলকাতা ছেড়ে গেছে।

আচ্ছা, তার ঠিকানা আমি ত জানি, একবার খোঁজ নিয়ে এলেই ত হয়। আমার খবর নেয়-নি বলে সরমাকে আমি চুপছি—কিন্তু সে যে প্রীলোক, তার পরাধীন। বরং এতদিনে তার কোন

ধবস না-নেওয়া আমার পকেই অহুচিৎ
হয়েছে !

তখন কাপড়-জামা পরে বাড়ী থেকে
বেরিয়ে পড়লুম ! তারপর জামাবাজারের
দিকে অগ্রসর হলুম ।

খুন্ডে-খুন্ডে যখন জামবাজার ষ্ট্রীটের
—না বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম,
তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে ।

বাড়ীথানা ছোটখাট,—দরজাটা ভিতর
থেকে বন্ধ ।

সরমার স্বামীর নাম ধরে ডাকব, কি
ডাকব না—তাই ভাবছি, এমনসময়
পিছন থেকে অড়িতহরে কে বললে,
“ভরদ্বার বাড়ীর সামনে এ কোন্ যোগী
ভিখারীর দ্বিষ্টি বাবা !”

কিরে দেখলুম, একটা লোক রাস্তার
উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে; নিশ্চয়
মাতাল ।

আমার মুখের কাছে হাত নেড়ে
নেড়ে সে বলতে লাগল, “কি বাবা, তুমি
কি স্বেদধির-বিভালয় থেকে আসছে ?
কথাও জাননা, তনতেও পাও-না ?”

কোথাকার কে এক মাতাল ! বিরক্ত
হয়ে বললুম, “বান মশাই বান, ভাল
আপদ !”

—“এবে বেজার বেতর বেতাল
বেহুরো আওয়ার দিচ্ছ বাবা । আমার
বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই গরম-
গরম বুলি শোনান্ন, এবে দেখছি তরতর
মিলিটারি-মেজাজ !”

আমি সচক্ষু বললুম, “এটা কি
আপনার বাড়ী ?”

—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, পথে এস ! সব খেয়েচি
বলে যে নিজের বাড়ীর ঠিকানা তুলে দাও,
আমাকে এমন বেহুঁস মাতাল পাওনি যে !”

—“বাক . করবেন মশাই, আমি
ভেবেছিলাম এটা সরেনবাবুর বাড়ী !”

—“অধীনের দণ্ডব্য নাও মালিক !
বাড়ী চিনেছ আর বাড়ীর মালিককে চেন
না, এতে যে নেশা চটে যাচ্ছে বাছা !
বোতল ভরে ঢলঢলারমান সুখ নিয়ে
সরেনবাবু যে তোমার সামনেই টলটলারমান
বাবা !”

—“জ্যা, আপনি । আপনিই সরেন-
বাবু !”

—“নাম শুনেই আঁতকে ওঠ কেন হে ।
বিখাল হচ্ছে না—আমাকে সনাক্ত করার
অন্তে আবার লোক ডাকতে হবে নাকি ?”
তস্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম । এই
সরমার স্বামী ?

—“চুপ করলে চলবে না সোনার
চাঁদ ! আমার নাম ত শুনলে, এখন
তোমার নামটি কি চটপট বলে কলে
দিকিন ?”

তখন সেখান থেকে চলে আসতে
ইচ্ছা হোল, এ দুর্দান্ত মাতালের সঙ্গে কি
কথা কব ! কিন্তু তারপরে ভাবলুম,
এতটা যখন এসেছি, তখন সরমার খবরটাও
অস্তিত্ব নিয়ে যাওয়া উচিত । এই ভেবে
বললুম, “আমার নাম মোহনলাল রায় ।”

সুধেন আমার নাম শুনেই চমকে
উঠল । তারপরে বললে, “মো-হ-ন-লা-ল ।
হঁ, ও নাম যে চিনি । এখানে কি দরকার
হে তোমার ?”

—“আপনার ত্রী কেমন আছেন, তাই জানতে এসেছি।”

—“কী! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাগা! আমি অলম্ব্যস্ত বর্তমান থাকতেই আমাকে মর্তমান দেখিয়ে আমার ত্রীকে বিরে করতে গিয়েছিলে বাবা, তাতেও তোমার সাধ যেটেনি? আবার এখানে এসেছ আমার ভিটের ঘুচু চরাতে। তাগো হিঁরাসে, দলুদি তাসো!”

—“মশাই—”

—“চোপ্‌রাও পাশিঠ, চোপ্‌রাও! দেখবি মজাটা!” এই বলে সে কাপড়ের ভিতর থেকে একটা মদের বোতল বার করে’ সেটা উঠিয়ে আবারে মারতে এল।

ভাবলুম, পণ্ডটাকে ঘরে দি থাকতক বলিয়ে! কিন্তু তখনি চোখের উপরে জেগে উঠল, সরমার কাতর মুখ। মনের রাগ মনেই চেপে আন্তে-আন্তে সেখান থেকে চলে এলুম।

• • • • •

এ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! এমন স্বামীর হাতে পড়ে সরমা কি আর বাঁচবে? এর-চোরে যে বৈধব্য ভালো! এতদিন আপন দুঃখেই ভেঙ্গে পড়েছিলুম, আজ কিন্তু সরমার দুঃখের কথা ভেবে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। ওঃ, সেই ফুলের মত বিমল, শিঙুর মত সরল, দেবীর মত সুন্দরী সরমা, তার কপালে এই ছিল।

বাইরে, করলার চেয়ে কালো, নিবিড় ঘেঘের বুক চিরেচিরে ক্ষণেক্ষণে বিছাতের তাঁত অরিশোত বয়ে যাচ্ছে,—ঘনঘন বাজ

ডাকছে, আর মনে হচ্ছে যেন বিরাট আকাশের বুকের উপর দিগে একটা বিশাল অদৃষ্ট গোলা গড়গড় পড়ে এ-কোণ-থেকে-ও-কোণ পর্যন্ত গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে।

এই হুঁখোংগে সরমা কি করছে? ঘরে তার মাতাল স্বামী, প্রাণে তার অলস আগুন, সে কি এখন ঘরের কোণে বসে শুধু-শুধু করে’ মরছে? সুমনের আঁজ যে-অবস্থা দেখে এসেছি, আজ কি সে সরমাকে ঘুঁতে দেবে?

খোলা জানলা দিগে হঠাৎ সরমাদের খালিবাড়ীর দিকে চোখ পড়ল। সরমা যে ঘরে থাকত, সেই ঘরের জানলার উপরে আমার ঘরের আলোটা গিয়ে পড়েছে; সচকিতে দেখলুম, সরমার ঘরের জানলাটা খোলা! সে গিরে-পর্বত জানলাটা বরাবরই বন্ধ দেখে আসছি—আজ কিন্তু এ কি ব্যাপার। জানলাটা কি স্বভেদে বাপটে আপনি খুলে গেল?

আশ্চর্য্য হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় দপ্‌দপ্‌ করে’ দু-তিনবার বিজ্ঞাৎ স্বলকে উঠল। সরমার অন্ধকার-ঘরের একদিক থেকে নয়—দুদিক থেকে বিজ্ঞাতের দীপ্তি-রেখা এসে পড়েছে! তাহলে হুঁখু ঐ জানলাটা নয়,—ও-ঘরের অন্তরিকের জানলা বা দরজাও খোলা আছে!

নিশ্চয় চোর এসেছে। ঘরের মধ্যে এখনো সরমার জিনিষপত্তর আছে, যদি চুরি করে? তাইত, * দেখতে হোল একবার!

ছাতি ও লঠন নিয়ে বাগানের পথে
সরমার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

কেউ কোথাও নেই। কিন্তু উঠান
পেরিয়ে সিঁড়িতে উঠতে দেখি, সরম
দরজায় ভিতর থেকে খিল সেওয়া। না,
আর কোন সন্দেহ নেই—বাগিবাড়ী পেরে
নিচের কেউ বদ মত্‌লোবে ভিতরে ঢুকেছে!

চারিদিকে চাইতে-চাইতে উপরে
উঠলুম। সরমা যে ঘরে থাকত, সেই
ঘরের স্রুখে গিয়ে দেখলুম, দরজাটা সত্যিই
খোলা।

খুব সাবধানে ঘরের ভিতরে গেলাম।
লঠনের আলোতে ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
তারপর—ঘরের মধ্যে চোখ পড়তেই দেখলুম,
মেকের উপরে উপুড় হয়ে একটি স্ত্রীমূর্তি
নিথর ভাবে পড়ে রয়েছে। সে মূর্তিকে
চিনতে একটুও বিলম্ব হোল না—সরমা,
সরমা—সে সরমা!

সরমা! ... এই নিশ্চিন্তি রাত্রে, এই কড়-
বুড়িতে এই মৃত্ত অককার বাড়িতে, সরমা!
আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম—নিজের
চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না! কেন
এসেছে সে,—কেন অমন-করে' ওখানে
পড়ে আছে, সরমার কি হয়েছে?

ভাল করে' দেখবার জন্যে লঠনটা
উপরে তুলে ধরলুম। ঠ্যাঁ,—ও কি ও!
সরমার কাপড়ে কালো কাপো ও কিসের
দাগ? রক্ত! ... ঠ্যাঁ, রক্ত, রক্ত!
তার হাতে, কাঁখেও রক্ত বে জমাট বেঁধে
আছে। তবে কি সরমা... ..

ভয়ে আমার বুক উর্ড়ে গেল—নিখাস বন্ধ
হয়ে এল! চোঁচিরে উঠলুম, “সরমা, সরমা!”

সরমা আন্তেআন্তে ছু-হাতে ভর দিয়ে
উঠে বসল। আমার দিকে না-চেরেই
কীণস্বরে বললে, “মরিনি গো, মরিনি!
কপাল যার পোড়া, বদ তাকে পায়ে
ঠেলে গো!”

আঃ, রক্তে পাই! সরমা যে বেঁচে
আছে সেটা বুকে আমি আশ্চর্যের নিখাস
ফেলে বাঁচলুম!

অনেকক্ষণ আমরা তাক করে রইলুম।
আমি ভাবছিলাম, সরমার এমন হোল কি
করে? সরমা কি ভাবছিল, তা সে-ই
জানে!

বাইরে তেমনি স্বদমন জল হচ্ছিল,
হড়-মুড়-বান্ পড়ছিল, বাগানের নড়-পোড়ে
গাছপালাগুলো টলমল করে' টলছিল—
অগতে আর জনপ্রাণীর সাড়াসব্দ নেই।
ঘরের ভিতরে আমি তখনো স্তম্ভিতভাবে
দাঁড়িয়ে,—আর, স্রুখে আমার প্রাণের
প্রতিমা রক্তে রাঙ্গা হয়ে লুটিয়ে আছে!
কী মৃত্ত! জীবনের সে মুহূর্ত, অনন্ত
মুহূর্ত,—আমার মর্মেয় মধ্যে তা চিরস্থির
হয়ে আছে!

হঠাৎ আমার হ'ল হোল। এমন
দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না—সরমা যে
নারী পড়বে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে
বললুম, “সরমা, এ তোমার কি হয়েছে,
তোমার পায়ে এত রক্ত!”

সরমার মুখের উপরে একরাশ এলো
ভিজে চুল এসে পড়েছিল—ছু-হাতে সেগুলো
সরিয়ে সে আমার দিকে মুখ তুলে উদ্ভ্রান্ত
দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে! এই ক-মাসে স্ত্রীর

চেহারা কি ভয়ানক বললে গেছে—এ যে মরা-মাছুবের মুখ! তেমনি সাদা—তেমনি ভাবহীন। আমার গা-হাত-পা শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল।

সরমা বললে, “এত রক্ত কেন, এত রক্ত কেন? এ আমার অঙ্গুষ্ঠের ধান—আমার স্বামীসেবার পুরস্কার!”—যে স্বরে সরমা কথা কইলে, তেমন স্বর তার কণ্ঠে এই প্রথম শুনলুম।

হু-হাত মুষ্টিবদ্ধ করে’ বললুম, “কী! জ্বরেন তোমার এ দশা করেছে? সে তোমার গায়ে হাত তুলেছে?—দেখে নেব, আমি দেখে নেব তাকে।”

—“মোহনবাবু, নারীর বা পাবার আমি তা পেয়েছি। আমরা যে দুর্বল, আমরা যে পুরুষের দাসী।”

—“সরমা, তোমার কি হয়েছে আমাকে বল।”

—“সে দুঃখের কথা কি হবে শুনে?”

—“না, বল, বল।”

সরমা ধানিকঙ্কণ নীরবে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে, অক্লান্ত স্বরে তার হতভাগ্য জীবনের যে কাহিনী আমাকে সে শোনালে, তা যেমন করুণ, তেমনি ভীষণ। শুনতে-শুনতে মনে হোতে লাগল, আমার বুকের হাড়গুলো যেন এক-একখানা করে’ ধসেধসে পড়ছে।

সংক্ষেপে তার কথা বলে সরমা চুপ করলে—আমিও যৌন হয়ে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

আবার মনে পড়ল, সরমা আহত। তাড়াতাড়ি বললুম,—“সরমা, আমি কি

নির্দয়! তোমার এই অবস্থা দেখেও হাত-ভটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! তোমার বড় ধরনা হচ্ছে,—না? দেখি তোমার কোঁধার লেগেছে!”

—“এ দেহের বাতনার চেয়ে যে মনের বাতনা অনেক বেশী! আমার কি হবে মোহনবাবু, আমি কি করব!”

—“কেন সরমা, তুমি এখানে যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে।”

—“তা হয় না। যে দিন যার, আর কেহে না।”

—“কেন ফিরবে না সরমা! সেই তুমি, সেই আমি, সেই সবই ত তেমনি রয়েছে।”

—“না মোহনবাবু, আমার আর সে জীবন নেই—আমি এখন নতুন মানুষ হয়েছি।”

—“কিন্তু আমার চোখে ত তুমি নতুন মানুষ নও—তুমি যে আমার সেই পুরাণো সরমা।”

—“সে মরেছে। মোহনবাবু, তুল করবেন না—ও তুলকেই আমি সব-চেয়ে ভর করি, ঐ তুলের মতোই এখানে আমার থাকা অসম্ভব।”

—“তবে তুমি কোথায় যাবে?”

—“আমি না। হয়ত স্বামীর কাছে ফিরে যাব। হয়ত পৃথিবীর বাইরে একটু ঠাই খুঁজে নেব। সে সাহস যদি না-হয় তবে আর-কোন উপায় আছে কিনা, দেখব।”

—“একি বলছ সরমা।”

—“হ্যাঁ, ছব্বয়কে বিশ্বাস করি না।”

—“তোমার ছদ্ম অধিনায়ী হবে না সরমা,—আমি তোমাকে জানি।”

—“কিন্তু সমাজ তা বিশ্বাস করবে না, সমাজের অত্যাচার, আমিও আর সহ্যে পারব না। তখন যে তরসার লোকের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছি, সে তরসা আজ কোথায়! মনের সঙ্গে আমি আর ত একলা যুঝতে পারব না!”

—“তবে এলে কেন? এসে যদি চলেই যাবে, তবে—”

—“চুপ করুন মোহনবাবু, চুপ করুন! এ উচ্ছ্বাসের সময় নয়! আর আমাকে মজাবেন না, আপনি কাতর হলে আমার সর্বনাশ হবে। আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।”

—“বল।”

—“মোহনবাবু, আমি আমার কর্তব্য স্থির করেছি! জানবেন, এই কথার উপরে আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।”—

আমি কোন উত্তর দিলাম না। সরমা ধীরে ধীরে উঠে গাড়াল। তার মুখ-চোখের এমন অশ্রুভাষিক ভাব, এর-আপে আমি আর-কখনো লক্ষ্য করিনি!

আমার চোখের উপরে তার সেই স্থির-বিচ্যুতের মত অলস্ত দৃষ্টি রেখে, সরমা দৃঢ়ভাবে বললে, “মোহনবাবু, বলুন আমাকে কুলবেন, বলুন আপনি বিবাহ করবেন!”

—“বিবাহ করব, বিবাহ?”

—“হ্যাঁ, বিবাহ!”

—“সরমা, সরমা!”

—“আপনি যদি বিবাহ করেন তাহলে আমি এখানে থাকতে পারি। আমার অস্ত্র

কেন আপনার জীবন নষ্ট করবেন? আপনার প্রেমে আর-একটি জীবন সফল হবে, তার প্রেমে আপনার সকল অভাব পূর্ণ হবে।”

—“সরমা, আমার কথা কর!”

—“মোহনবাবু, আমার কথা রাখুন!”

সরমার নির্দিষ্ট কথা শুনে আমার চোখে জল এল। সত্যতঃ বললুম, “তুমি আমার কথা ভেবে দেখ, আমার মনটা বোঝ, আমার উপর দয়া কর!”

সরমার চোখ আবার জলে উঠল। ভীতভাবে সে বললে, “দয়া করব,—আপনার উপরে দয়া করব! আমার কি সে অধিকার আছে মোহনবাবু! এখন বুঝছি, ভুল করে আমি এখানে এসেছি! চূষক যেমন লোহাকে টানে, আপনার এই বাড়ী তেমনি করে আমাকে টেনে এনেছে—আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে এসেছি, কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারি-নি—আপনাকে সামলাতে পারি-নি! যে বাড়ীর এত মোহ, সেখানে থাকলে আমি মরব—আমি মরব! তখন মনের কোঁকে যা যুক্তিনি, এখন তা ভাল করেই বুঝতে পারছি! মোহনবাবু, আপনি যখন আমাকে কুলতে পারবেন না, তখন আর-কি আমার এখানে থাকা উচিত? বলুন, আপনিই বলুন।”

—“সরমা—”

—“মোহনবাবু, কথা রাখুন—আমাকে বাচান।”

—“সরমা, এর-চেরে তুমি আমাকে প্রাণদণ্ড দাও—সেও আমার হৃদয়ের হবে!—

কিছু, এই প্রাণ নিয়ে আবার বিবাহ-করা—বঁচে যাবে থাকা? ও, সে হরনা সরমা, সে হয় না।”

সরমা আমার দিকে দু পা এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি তাহলে আমার কথা রাখবেন না?”

—“তোমার আর সব কথা রাখতে পারি, কিন্তু ও-কথা রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব!”

—“অসম্ভব?”

—“হ্যাঁ, অসম্ভব—অসম্ভব!”—এই বলে আমি সত্যতরে হৃদাতে মুখ ঢেকে ফেললুম,—সরমার সে কঠিন দৃষ্টির সামনে আমি আর মুখ তুলতে পারছিলাম না।

সরমা একেবারে চুপ হয়ে গেল।

এমনি ভাবে কয়েক মিনিটের মত একটা দৃশ্যে নিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। তারপর আমি বললুম, “সরমা, আমার উপরে তুমি রাগ কোরো না। বিবাহ করতে বলছ,—কিন্তু বিবাহ করলেই আমি কি তোমাকে তুলতে পারব? তা যখন পারব না, তখন আমার দ্বয়ের সঙ্গে জড়িয়ে মিছামিছি আর-একটা জীবনকে নষ্ট করে লাভ কি বল?”

সরমা সাঁড়া দিলে না।

আন্তে-আন্তে মুখ তুললুম। ঘরের ভিতরে সরমা নেই!

বাইরে আকাশে তখনো অন্ধকার, বাক তখনো গঙ্গা-রাছে, বিছাৎ তখনো অরিবাণ হানছে, দৃষ্টি তখনো স্রুটি ভাঙ্গিয়ে বিচ্ছেদ।

সরমা কোথায়? তাড়াতাড়ি আলোটা

তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে পাড়ালুম। ব্যাকুল চোখে দেখলুম, সদর দরজাটা খোলা!

সরমা কি আমার দু'উপর রাগ করে' আবার বারান্দার কাছে কিরে গেল? আমার মন যেন বলে উঠল না, না, না।

তবে? তবে কি ...

সে কথা মনে হঠাৎ-মাত্র আমি তীরের মত ঝুপিয়ে থেকে নেমে রাতার গিরে পড়লুম!

পথ দিয়ে কলকল করে' অলস্রোত ছুটে চলেছে—মতদূর দেখা যায়, কোথাও জনপ্রাণী নেই।

তাইত, কি করি—কোথা বাই, সরমা কোন্‌দিকে গেছে? এর-মধ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেল? আমার গ্রাস থেকে সুক্তি পাবার অন্তেই কি প্রাণপণে সে ছুটে পালিয়েছে?

এ-পথের এমিকটা গেছে সোজা গঙ্গামুখে। পাগলের মত ছুটেতে লাগলুম। কিন্তু অনেক ছুটেও অনেকদূর গিরেও সরমাকে দেখতে পেলুম না। তবুও ছুটছি আর ছুটছি।

এই ত গঙ্গার ধার! কৈ, কোথায় সরমা? স্বক্‌মকে বিছাতের লক্‌লকে শিখার গঙ্গার মেঘবর্ণ জল যেন অলে-জলে টগ-বগিরে হুটে উঠছে,—ভরজের পর ভরজ অঙ্গগরের মত কথা তুলে পাকিয়ে পাকিয়ে কোণকোণিগিরে ছুটে চলেছে—ও অলস্রোত, না মৃত্যুস্রোত?

বিরীর্ণবরে' ডাকলুম, “সরমা। সরমা। সরমা।”

ও-পার থেকে প্রতিধ্বনি টিটুকির
দিয়ে উঠল।

গঙ্গার তীর ধরে আবার উদ্ভতের
মত দৌড়তে লাগলুম—কানের পাশ
দিয়ে বৃষ্টিধ্বজল উদ্ভাস খোড়োহাওয়া হুঁ
হুঁ করে' ক্রমাগত দীর্ঘবাস ফেলতে লাগল
—গঙ্গার পিছল মাটির উপরে কতবার
পড়লুম, কতবার উঠলুম—কিন্তু তবু এ
ছোটোর বিয়াম নেই।

এই ভীষণ নিশ্চিৎ তার তিমির-পক্ষ
বিস্তার করে' জল-দুল-আকাশকে আবৃত
করে' ফেলেছে—এর মধ্যে আমার সরমা
আজ একেবারেই বৃষ্টি হারিয়ে গেল!
এমন যে হবে, কে তা জানত! জানলে
যে তখনি বলতুম, সরমা, আমি বিরে
করব—তুমি বেওনা, তুমি বেওনা, তুমি
বেওনা!

সে কি আমাকে বেথে কাছেই কোথাও
লুকিয়ে আছে? গঙ্গার তরঙ্গ-ধ্বনি, কড়ের
হাহাকার, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝর্ঝরানি ভূমিরে
চৌকিরে বলে উঠলুম, “সরমা, সরমা!
কিরে এস—আমি বিবাহ করব—তুমি
কিরে এস, কিরে এস!”

কিন্তু সে এগরোৎসবের মধ্যে কোথায়
সরমা? উত্তরে বজ্রনামে আমি বেন
নিরতির ঘন-ঘন অটহাস শুনেতে পেলুম।
আমার সরমাকে ছুরি করে' রজনীর
অন্ধকার গঙ্গার বিকৃত বন্ধের উপর থেকে
ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আকাশের নিবিড়
বেধ ভেদ করে' ধীরে-ধীরে প্রাতঃ-
সন্ধ্যায় ঘান আলোর কীণ আভাস ফুটে
উঠছে।

ঘুরে—নিমন্তলার শ্মশানে সহসা একটা
নতুন চিতা অগ্নি উঠল—আগো-আধারের
মধ্যে তার লেলিহান জিহ্বা যেন আমার
বৃকের রক্ত রাগা হয়ে কৈপে কৈপে ক্রমেই
উর্দ্ধপানে উঠতে লাগল। সেইনিকে
পাখাৎ-নেত্রে চেয়ে হাঁটুভোর জলে,—সব-
হারা কাপাল আমি, মাথার হাত দিয়ে বসে
পড়লুম।

• • • •

হঠাৎ মনে হোল, সরমা হয়ত তার
স্বামীর কাছেই কিরে গেছে! তখনি সেই
খোঁজে চললুম। বেতে-বেতে ভোর হয়ে
গেল।

কিছুমাত্র ক্রক্ষেপ না-করে' একেবারে
স্বরেনের বাড়ীর ভিতরে গিরে ঢুকলুম।

—স্বরেন একটা ঘরে বসে ছিল;
আমার সেই জলে-ভেজা ধুলোকাদামাখা
চেহারা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে বললে, “কে
তুমি?”

—“আমি বোহনলাল। সরমা এখানে
এসেছে?”

—“কী! তুই বোহনলাল! আবার
আমার বাড়ীতে—”

—“হু! বেশী কথা না! বল সরমা
কোথায়?”

—“বল না। বেরো এখান থেকে।”
বাথের মত তার উপরে লাফিরে
পড়লুম! হুহাতে তার গলা টিপে ধরে বললুম,
“এখন বলবি?”

—“ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আনি না।
সে এখানে নেই।”

—“তুই মিথ্যা বলছিস! তুই আমার

সরমাকে খুন করেছিল! বন্ বন্‌ছি, নইলে আমিও তোকে খুন করব!”

—“ওঃ! গেলুম—গেলুম, ছেড়ে দাও—
যবে গেলুম!”

—“বন্—বন্—”

—“সত্যি জানি না! সে চলে গেছে—
কাল, কাল রাতে!”

—“আর আসে নি? ঠিক?”

—“না, আসে নি, আসে নি! আমাকে
ছাড়, আমার খুন কোরো না!”

সে হতভাগা পণ্ডটাকে ঘরের এককোণে
ছুঁড়ে কেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলুম।
সরমা!—তুমি বেঁচে আছ কি, বেঁচে নেই?
কিরে এস প্রিয়তমে, কিরে এস,—তোমার
বুধ-চেরে আমি বিবাহ করব—আমি,
আমি—...

•

•

খুঁজছি, খুঁজছি আর খুঁজছি,—কিন্তু
সরমার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল
না। যেমন হঠাৎ তাকে পথে হুড়িয়ে
পেরেছিলুম, তেমনি হঠাৎ আবার তাকে
পথেই হারিয়ে ফেলেছি,—আমার সে
প্রান-জড়ানো হারামনি আজ কোথায়?
আশার ছলনার ভুলে আমি গিরেছিলুম
আলোর আলো ধরতে; কিন্তু ছুঁতে-না-
ছুঁতে সে আলো নিবে গেছে, নিবে গেছে
গো,—মনের মাঝে জেগে আছে শুধু তার
অক্ষয়ী স্মৃতিটুকু!

লোকে বলে আমার মাথা ধারণ হয়ে
গেছে! সংসারের ধরা-বাধা ধারার ভিতরে
ধাকতে পারি না বলেই কি সকলে
জামাকে ক্যাপা ঠাউরে নিয়েছে? মনের

কারা মনেই শূকিরে আমি তাদের নাচ-
গান-হাসিতে যোগ দিতে পারি না বলেই
কি তারা আমাকে এই অপবাদ দিয়েছে।
কিন্তু আমি ত পাগল নই,—পাগল যে
তারা! এই অশানের ধোঁয়া-ভরা জগতে,
হৃৎ-শোকের তুহানল যেখানে বিহারাজ
জ্বলে, সেখানে যারা নাচতে-গাইতে-হাসতে
পারে, তারাই কি উন্মাদ নয়? অশানে
এসে নাচ, গান, হাসি! এ যে নিষ্ঠুরতা!
এখানে বলে কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ,—তোমাদের
অশ্রুজলে বিখের তপ্ত চিতাত্ম-দীপ্ত হয়ে
উঠুক!...

ঘনঘোর বায়ল-রাতে ঘরের বাইরে
বায় ঘন আকাশ তোলাড় করে
তোলে, কমন্ডম্ বর্ষাঝলে নিশিধিনী ঘন
আজ্র' হয়ে ওঠে, জ্বালার-জ্বালার উত্তলা
বাতাস যখন ধাক্কা মেরে চৌচিরে মরে,
তখন ঘুমতে-ঘুমতে এখনো আমি চমকে
থড়থড় করে উঠে বসি! তখন মনে হয়
সভাই আমি পাগল হয়ে গেছি!

কোন-কোনদিন আমি স্তনতে পাই,
সরমাদের পোড়ো-বাড়ীর সদর-দরজার দাঁড়িয়ে
কে-যেন জমাগত কড়া নাড়ছে নাড়ছে
নাড়ছে, কে-যেন দূর—বহুবূয়ের অজ্ঞাত-
লোক থেকে স্রাস্ত্রাণে ক্রান্তচরণে কিরে
এসেছে, কে-যেন আর্ত কাতর স্বরে হাঁপিয়ে
হাঁপিয়ে বায়ংবার ডাকছে—‘দরজা খোলো,
দরজা খোলো, দরজা খোলো গো!’

কোনদিন নিজের ঘরে বসেই মেথতে
পাই, সরমার পাণিঘরের দরজা-জানলা-
গুলো হুম্‌হুম্‌ করে গুলে গেল, কে-যেন
একরাশ এগুনো তিজে ছল ছলিয়ে,

শোণিতাক্ত দেহে, রক্তরাশি কাপড়ে ভিতরে
হুকে মেঝের উপরে দড়ান করে' আছড়ে
পড়ল—তারপর সেই বড়-বৃষ্টি-বজ্র-নাগের
মধ্যে অন্ধকারকে তুলিত করে' ডুকরে
ডুকরে হুঁগিয়ে হুঁগিয়ে বৃষ্টিকাটা কান্না
কান্নাতে লাগল!

ওঃ! সে কান্না অঃহ! ছুটে গিয়ে
আমি ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে'
দিতে বেতুন—অমনি বিছাতের তীক্ষ্ণধারে
মেঘভরা আকাশ ঢর্কাঁক হয়ে যেত—
আর সেই কাঁকে পরলোক থেকে
ইহলোকে হু-হাত বাড়িয়ে সুসারিবাবু বেন
বজ্রনাগে বলে উঠতেন,—‘ওরে আমার
মেয়ে দে, আমার মেয়ে দে—তোরা
তরই সে পালিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে
—ওরে দে দে, দে দে, আমার মেয়েকে
এনে দে!... ..

এ কী জীবন! সরমা, তোমাকে
হারিয়ে আমি সর্ব্বত্র হারিয়েছি, এখন
নিজের বুড়িও হারাব নাকি?

• • • • •

অনেকে আমাকে উপদেশ দিতে আসে
—হারলে কপাল। কেউ বলেন, বির কর,

কেউ বলেন, বিদেশ ঘুরে এস, কেউ-
বা বলেন, কাজ-কর্মে মন দাও।

উপদেশ দেয় না খালি করেন।
সরমার কথা উঠলে সে আমার দিকে
মোনমুখে ক্লেশ চোখে চেয়ে থাকে
—সে যে আমার মরমের মরমী! আমি
আপন মনে সরমার শত কথা বলে
বাই, সে আমাকে বাধা দেয় না, বিরক্ত
হয়ে উঠেও যায় না। বলতে-বলতে কোন-
দিন আমি কেঁদে ফেলি, আর তারও
চোখটুকি মরমে ভিজে ওঠে।

তার বুক মুখ রেখে আমি ডাকি,—
“বহু!”

আমাকে হু-হাতে গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে
সেও সজল চোখে বলে, “বহু!”

—“আমার সরমা কোথা গেল ভাই?”

—“বেখানে শোক-তাপ নেই।

ইহলোকে বাকে হারিয়েছে ভাই, পরলোকে
হরত তাকে খুঁজে পাবে।”

... ..সেই পরলোকের আশার দিনের
পর দিন ওনছি। কতদিন—আর কতদিন?

শেষ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

যুগান্ত কাব্য নাট্য

কাব্যের দেবদেবীগণ।

শিব, শিবানী, নন্দী, তুলি, ইন্দ্র, যম,
লক্ষী, সরস্বতী, স্তার, প্রেম ও
ভৎপত্নী শান্তি ও ককণা।

প্রথম দৃশ্য

কৈলাসধাম

দুখাগ্রাস্ত সন্ত পর্কত-বৃক্ষের নিরে মাঝে মাঝে
ক্লেশ প্রবাহিত। উপত্যকা-ভূমিতেও তরলতার মধ্যে
শিবস্মির। ইব্রহিমুল তরু-বারপথে বায়ামিন্দারী

ধানর মহাধেবের মূর্তি অশ্রুতভাবে বর্ণকবিশেষে নেজে
পড়িতেছে। দ্বারদেশে এক পার্শ্বে বৃষ—মন্ত্র পার্শ্বে
সিদ্ধেশ্বরী। সমুখের বিস্তৃত মন্ডে ত্রিমূলধারী নন্দী ও
ভূমি কখনো দ্বিরভাষে—কখনো পমচারণা পূর্বক,
তখনো গাহিতেছে। ভূমি মাকে মাত্রে বীরবে অঙ্গ-
ভঙ্গী করিতেছে।

গান

জর হর শব্দর গ্রন্থ পণ্ডপতি,
জর তার শব্দরা প্রকৃতি পার্শ্বতী,
লয়ঙ্কর মহাশিব, শিবাপী রক্ষেন দিব
বহেধর মহামায়—কারণ শক্তি !
মহাকল্প, বরাভক্তা, পৌহে এক সর্বজ্ঞ
অগম্য বুদ্ধি বিজ্ঞানে, ভক্ত-নেজে জ্যোতি ।
ছত্র ধরে মহা বোয়াম নমে ইন্দ্র বায়ু বন,—
কালাকাল ছন্দে করে প্রগতি আরতি !
নন্দো তারা শব্দরা কল্প পণ্ডপতি ।

শিবানীর প্রবেশ

নন্দী ভূমি । নমস্কে ভবানী মাতা ;
শি । শুন বৎসগণ,
নন্দী । বলিতে হউক আজ্ঞা ;
ভূমি । আনিব কি ধরি—

ধরা হতে ব্রূকাহর কোন ? বল মাতা !
থাকিত বাঁচিয়া যদি মহিব দানাতা
কি হইত মজাখানা ! আনিভান ধরি
শিঃ ধরি হড় হড়ি, আর একবার
করিতে দলন তারে, মহিবমর্দিনি ।

শি । ধাম বৎস, সে কথার এ নহে সময় ।
নন্দি । ধাম্ ভূমি—
ভূ । ধাম্ তুই রাধ, বাঁধাগিরি !
কেমনে তুলি মা বল অধের সেদিন !
ধাও আজ্ঞা—

নন্দী । চূপ চূপ বচনবাগীশ ।

ভূমি । ঐব্ ঐব্ চূপ সব তোমার কথার !
তুমি আজ নন্দী থাক, জাননা কে আমি ?
মাগের আগ্রহে ছেলে খিদি ভূমিবর !
নন্দী । বক' মা একটু, করে বড় বাড়াবাড়ি ।
ভূ । মার প্রতি আজ্ঞাধারি ! বেথ স্পর্ধাখানা !
কর্তাধাম হন্ যেন উনি আমাধের !
শি । দ্বির হও বৎসগণ কোরোনা বিবাহ ।
ভূ । ওই ত ঝগড়া করে—কেন কথা কর ?
বা বলি তা বলি আমি, বলেছি মাগেরে,
ওর কি ভাহাতে, কেন মিছে গালি পাড়ে ?
বল মাগো নাও আজ্ঞা, লুটি ধরা বন ;
যদি ভাগ্যে মিলে যায় তেমনি ভৌষণ—
লবিত শ্রুতি শুদ্ধ মহিব একটা !—
উঃ উঃ—হো হো—হা হা—!

ন । মেথ মা জননি,
ভূমি তব হইরাছে বড়ই বেধাড়া !
একটু শাসন যদি না কর উহারে
চড়িবে মাথার কিত্ত দুই দিন পরে,
এই আমি বলে ক্ষান্ত— ;
শি । (সহাস্তে) দুর্দান্ত ছেলেটী
একটু সংযত হও, শুন বাহা বলি ;
ভূ । হইহু নির্দাক্ আমি,—আজি হতে বুক !
তোর বাক্যে নহে, ইহা মাতার আদেশ ।
ন । ফের যদি কথা ক'ন, আমি কিত্ত ভবে—
ভূ । কিত্তটা কি শুনি দাণা । বেথ মাগো শুন
নন্দীটারে যদি তুমি সাক্ষা নাহি দাও—
আমি কিত্ত অশ্রুধলে ভাসাব নয়ন ।
শি । তুমি ত হুবোধ নন্দি, ছোট তাইটেরে
কহিও না রক্ত কথা । মিষ্ট ব্যবহারে—
মিষ্ট করি লও ওরে । ঠাণ্ডিও না বাছা
মন দিরা দুইজনে, শোন কাহা বলি ।
ন । (স্বগত) হুশাস্ত ছেলেটি কিনা মোরামতা দিরা

ভূগায়ে রাখিব ! ধোষ নন্দীটারই বত ।
 (প্রকাশ্যে) যে আত্মা ।
 তু । “ (নন্দীর কাণের কাছে) কেমন জন্ম !
 শি । চলছি ধরায়,—
 তোমরা দুজনে বেথো দেব মহেশ্বরে ;
 ধ্যান ভাগ্যোনা বেন কলহ বিবাহে ।
 নন্দী । নহেত শরণ মাগো, প্রতিমা রচিতা
 ডাকেনা ত নরনারী তোমারে সাধরে—
 অধিক্ত হতে তাহে, এ যে অসময় !
 জানিনা ত কি কারণে বাবে লেখা এবে !
 সঙ্গে তবে লও হাস অহুচরণে ।
 তু । একটু খেলিব রঙ্গে, লও মাগো সাথে ।
 পরম দান্তিক হের ঐ মানীজন
 চলেনা চরণ গর্জে—ধরা বেধে সত্তা !
 পিছে হতে আচমিতে পদতলে গুহ—
 চালি দিব ঘটন্তরা গোমর সলিল ;
 পড়িবে খপাস করি—পিচ্ছল মাটিতে !
 হা হা কি কৌতুক সুখ ! ভাব নন্দীভারা !
 শি । না বৎস—
 তু । লও মা সাথে দুটি পায়ে পড়ি ;
 বরক কিয়ারে দিও ছই বণ্ড পরে ।
 ঐ যে প্রতাপশালী নৌকার আরোহী—
 কাড়িয়া অন্তের ধন ছলে অভ্যাচারে
 ভরাধানা ভরি লয়ে স্বার্থের বোঝা—
 নিতরঙ্গ নদী-বুকে স্নেহে বেয়ে যায়—
 দেখো মাগো চাও—
 শি । দৃষ্টি সব-দিকে তৌর !
 তু । ভয় নাই ডর নাই, নাহি অহুতাপ
 মনে জানে বিনা বিয়ে হয়ে বাবে পার—
 মহান প্রতাপী—
 ন । (উকি মারিয়া) ঠিক বলিছে ত তুঙ্গি ।
 তু । একবার গাড়াইয়া হালের উপর—

ধোলাব তরণী তার ভীষণ ধোলায় !
 ন । বাজাব ডনক আনি খোর বজ্র রবে ।
 তু । বেশ তাই বেশ কথা ! তখন দেখিব—
 কোথা থাকে প্রতাপীর দুর্দ্দমা প্রতাপ !
 রক্ত মুখ পাণ্ড হরে বার কি না বার !
 ন । একবার মা মা বলিডাকে কি না ডাকে !
 তু । হা হা হো হোঃ ; দাও আত্মা চলি
 মাগো সাথে ।
 শি । বেলায় এ কাল নয় ধ্যানমগ্ন দেব—
 সে কথা ভুলো না । আমি মর্ত্যে চলিলাম,
 স্মরিছেন লক্ষ্মীবাণী আমারে কাতরে ।
 একা রহিলেন হেথা দেব ভোলানাথ
 দেখিও দুজনে, আমি কিরিব সত্তর ।
 ন । বখাবেশ, নমি মাতা, শ্রাপ কিস্ত কাঁধে !
 শি । আশীর্বাদ, তাহে তাহে রহ সন্ধ্যাবে ।
 (প্রস্থান)
 তু । নন্দী-দাশা ! হি হি ! হা হা !
 ন । তাইটি আহার ।
 তু । কোলাকুলি করি এস দাশা—
 ন । এস তাই ।
 তু । ক্ষুধি একি মনে আগে ! তরল অম্বর
 মেঘরাশি যেন ঐ, আমি পদতলে
 ঠেলিছে আহারে, নাহি খামিতে শক্তি ।
 হাসিয়াশি বর বর উথলে কৌতুকে ।
 থেকোনা পঙ্কীর হয়ে এ সময় তুমি—
 দুটি পায়ে ধরি দাশা !
 ন । হাসিব কেমনে !
 তুমার অমাট ঐ গিরিখানা বেন—
 চাপারে মাথার পরে, মা গেলেন চলি ।
 তু । থোকা তুমি ছুড়পোষা ! একটি মুহূর্ত
 মা ছাড়া থাকিতে নার ! বড় রাগ ধরে !
 হাস দাশা হাস তাই, এস বোহে নাচি ! •

ন। চলে না চরণ তুহি, হাসি নাহি আসে ;
হৃদয় উদ্বাস মুক্ত এ বসন্তে নব,—
স্বারস আকাশ সম মন করে হব !

তু। বনে না ত তাই ! কিন্তু অহং সোহং
খোলা যদি পাই তারা মুহুর্তেরো ওরে ।
এক টানে টানি তুবি মুক্ত বায়ুতালি
উবাও হইয়া উড়ি ঝড়ের দোলায় ।

ন। আমার কে জানি আছি মনে পড়ে শুধু
দক্ষবজ্র কথা সেই, এলয় বিপ্লব—
জননীর বেহত্যাগ—

তু। নৃত্য মহেশ্বর ?—
ওঃ কি সে মহোজ্জ্বল উদ্ভাস উল্লাস !
পুনঃ কোন লয়-বস্ত্র আছে কি ধরায় ?
তাই কি গেলেন মাতা বিনা নিমন্ত্রণে ?
বল দাদা জান যদি, কোর না গোপন
এ হেন সংবাদ শুভ । কুহুম-পরাগে
আর হলুদ চন্দনে, কালো মুখধানা
তব স্নানাইয়া তুলি ।

ন। কি মিথ্যা বকিস !
তু। সত্যি কথা বলি তবে, খুলে গেছে মন—
চাপিরা রাখিতে নারি, বেধে নন্দী তাই—
পিতার উপর বড় বেশী রকমের
প্রভুত্ব করেন যেন মাতা আজ কাল ।
সঝা তাঁরে রাখি বন্দী অকলের ছায়ে
জড় ভোলা করি তুলি, সমস্ত ক্ষমতা
নিরেছেন নিজ করে । ভাল নাহি লাগে !

ন। করিস মায়ের নিন্দা, এত বড় মুখ !
তু। এ কি নিন্দা ! মিথ্যাবাদী ! আমি শুধু বলি
পিতা হতে মাতা বড় এ কেমনতর !
ন। বড় ছোট নাহি জানি—মায়ের মিলনে
পিতা শিবরূপ, কল্প সত্যি বিনা তিনি ।
তু। আমি ত তাহাই চাই, হাসি রঙ্গ খেলা

একটু নাহিক পেলে বাঁচিব কেমনে !
ন। তুমি চাও সুখী হতে বিশ্বের অন্তর্বে
হতভাগ্য প্রেতাধম !

তু। কেন পালাগালি !
এক টানে দস্তপাতি কেলিব উপাধি—
তখন হইবে শিক্ষা,—

ন। বড় দস্ত দেখি ।
তু। তোর না আমার । দাঁড়া—করি চুরমার—
ন। বটে বটে আর—দেখি বীরত্ব কেমন ।

(উভয়ের মারামারি)

তু। (নন্দীর নিকট হইতে পলাইয়া)
মাগো বেধ গ্রাণ বার ছেলের তোমার ।
(নেপথ্যে হুঃহুঃ ঘণ্টার শব্দ)
(তুহি চমকিয়া)

মা এলেন বুঝি ! মোরে কমা কর দাড়া ;
বলিও না কিছু তাঁরে রব চির দাস ।
নঃ (হাসিয়া) নিজ ঘরে আসিবেন
মাতা বুঝি ভূত—
ঘণ্টা বাজাইয়া ?

তু। বেধ কে এসেছে তবে ;
একটু আশ্রমে আমি পা ছড়ারে বসি ।
(আঃ)

(পুনরায় ঘণ্টার শব্দ ও গান)
জর জর শব্দো,—মহাধেব মহাধেব
ভোলা ভূতপতি পরম শরণ—
জর জর শব্দো ।

(গমনপরাগ নন্দী পশ্চাত্তাপ হইবামাত্র)
তু। ন ভূত ভবিষ্য ওটা, অসংখ্য প্রটার ।
মহাধেব । নন্দীতুহি—!

ন। (কিহিরা দাঁড়াইয়া)
ধান ভঙ্গ হোল মহেশ্বর ।
হার হার । মা আসিলে কি বলিব তাঁরে ?

(সন্ডের উঠিয়া পাড়াইয়া)

ভোর ঘোষে ঘটিল এইট !

হ। নন্দী তুঙ্গি !

নন্দীতুঙ্গি। ভগবন্ !

(উভয়ের নিকটে আগমন)

ম। শুনিছ না ঘণ্টার নিনাদ ?

তু। আজ্ঞে, আসি নাই কাছে, খানভন্ন ভরে।

ম। কলহের বিদ্রামত ঘটে নাই তাহে।

চুটামিতে ভরা সব অলসের সেয়া !

তু। (নন্দীর কানে) যথা পিতা তথা পুত্র—

নন্দী। চূপ ছঃসাহসী।

শিব*। ঘত ঘোষ ভবানীর, ভাঁহার আদরে,

এক মুখে শত জিহ্বা। যা চুটে ভুতেরা

নিরে আর আত্মানি ধেরেরে !

নন্দী। যথাদেশ।

(প্রস্থান)

নেপথ্যে গান

অর অর শস্তো, মহাধেব মহাধেব—

ভোলা ভূতপতি পরম শরণ—

অর অর শস্তো।

পরাগতি, প্রলয়বান, জিনহান,—

মহাকাল, অগ্নিতাল—

তুমি হর শঙ্কট সংহর—

অর অর শস্তো !

বিত্তীয় দৃশ্য

শিবশিবের সম্পূর্ণভাবে উদ্ভূত হইয়া গেল। রজনাক
অবিসৃত হইয়া পড়িল। ভাষারাজের সহিত নন্দী
তুঙ্গি রজনাক প্রবেশ পূর্বক অকুণ্ঠিতভাবে ভাঁহাকে
মহাধেবের হান বোখাইয়া দিল। ভাষারাজ মহাধেবের
নিকটে গমন করিলেন। তুঙ্গি ভক্তলতা যথো দাঁড়িয়া
যাকে যাকে অলঙ্কারি সহকারে উঁকি দাড়াইয়া

দর্শকবিশেষের কোতুক উল্লিখিত করিতে লাগিল। নন্দী
পুঙ্ক্তভাবে অন্তর-বুদ্ধির দ্বারা তরুণাত্রে নির্ভর
করিয়া পাড়াইয়া রহিল।

ভাষা। (মহাধেবের নিকটে আসিয়া)

অর অর মহেশ্বর প্রণতি চরণে।

ম। শুভমন্ত মর্ত্যেশ্বর, অদ্বিত অজিনে—

ধর্মরাজ-প্রতিনিধি ! কিন্তু কোথা তব

স্বর্গোচ্ছল রাজদণ্ড, মহিম-মুকুট !

ব্রহ্মার সে মহাবান ?

ভা। নাই—কিছু নাই।

পরাজিত পরাহত পীড়িত লালিত

ধেবারি দানব করে 'ভাষ' তোমানের !

ম। কি বিপদ ওহো ! তবু ভাষরাজ ইথে

হয়োনো অধীর তুমি। তুচ্ছ বেৎজালে,

জ্যোতির্মণী হল বনো, দীপ্ত মহিমার

পুনঃ প্রকাশের তরে ;—মনে রেখো ইহা।

এ শুধু কলির খেলা, ছদ্মগের অর।

ভা। ক্ষণ শুধু তুচ্ছ ক্ষণ—ওহে মহাকাল

অগ্নিমেরি মাঝখানে। ছদ্মগের রক্তে

ওলট-পালট বিশ্ব ; মৃত্যু সেত ধেব

ক্ষপিকেরি ক্ষমতা মহান্। 'ভাষ' আজ

অরজর মরমর অস্তার আঘাতে ;

দাসনিতে ধরা-রাগা একান্ত অক্ষয় ;—

যথা প্রজাপতি তারে করিলা স্থাপন।

ম। ধরা ধাক রসাতলে—ভাষরাজ তবে,

স্বর্গে চলে এস তুমি স্বর্গের দেবতা।

ভা। ত্রিদিব প্রবেশে নাহি অধিকার মোর

অস্তারের দাস এবং পূণা-শক্তিহীন।

ম। এ বড় অস্তার নীতি ত্রিদিব-রাজের।

যাও তবে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা-সখা তুমি,

অধিষ্ঠিত ধরাতলে বাহার কর্তৃক।

ভা। আসিতেছি তথা হতে ;

ম। কি বলেন তিনি ?

জা। স্রষ্টা তিনি বিনাশের সাধা নাহি তাঁর।

বসি দয়া করি—

(প্রেমরাজকে সঙ্গে লইয়া নন্দী ভূমির
দ্বারে আগমন এবং পূর্বের জারি অসুলি-
সঙ্কেতে তাঁহাকে মহামেঘের নিকটস্থ হইতে
বলিয়া তরুলতার মধ্যে দণ্ডায়মান)

প্রেম। (মহামেঘের নিকটে আসিয়া)

নন্দার মহাপ্রভো !

ম। এস এস বিকুশা, ত্রিবিব-দুর্ভেদ,
ধরার আনন্দ ওহে ! পুঙ্খিত প্রাণ—

তব ধরশন লাভে ;—শত বস্ত্রের

প্রহর হিম্মোল ভূমি ! কিন্তু কেন হায়—

পরিমলহীন আজি ! কোথা কুল ধ্বজা—

পুশিত কুহুম তব পঙ্ক ভরপুর !

আনন্দ-মুগ্ধতি কেন মলিন এমন ?

প্রে। কিছু নাই ! সর্বস্বাত ; নিপীড়িত প্রেম
কলিরাজ সেনাপতি অগ্রসের করে।

ম। এমন প্রতাববানু হইরাছে কলি !

এ শুধু মৃত্যুর আগ্নেয় কপিক চমক !

বাও সখে বিকুলোকে জানাও বিপদ !

প্রে। আসিতেছি তথা হতে,

ম। কি বলেন তিনি ?

প্রে। স্থিতিপতি তিনি নাহি বিনাশ-ক্ষমতা !

ম। বাও তবে ইন্দ্রলোকে। মর্ত্যে যবে তব

হেন অনাদর প্রেম, খেকোনা তথায়।

নন্দন নন্দিত করি—বিরাজ ত্রিবিবে।

প্রে। নিরানন্দ মূর্ত্তিমান, প্রেমানন্দ আজি ;

অভাগা-জনায় এই চরণ-পরশে

ত্রিবিবের মুকুতার কন্ড হয়ে বাবে,—

কেমনে পশিব তথা !

ম। বড় অবিচার।

অর্গের প্রসাধ ভূমি করুণা-জীবন !

প্রেম। বসিনো করুণা মোর অগ্রসের গৃহে ;

রাধাহীন রাণীহীন আমি অভাজন !

জা। অপান্তি-নিগরে দানী শান্তিও আদার,—

কুণা কর বিত্তি-ভঞ্জন !

ম। নন্দী ভূমি।

(উভয়ের প্রবেশ)

যথায় করুণা শান্তি আছেন বসিনো

বাও তথা,—মুকৌশলে বকন পুলিনা

আন তাঁহাদের হেথা।

উভয়ে। বধাসেন প্রভো।

(প্রণামপূর্ব্বক গমন)

ম। (কণ্ঠবিলম্বিত শিঙ্গার হাত দিয়া)

বাধাই প্রলয় শিঙ্গা ; যাক্ খেমে যাক্

বিশ্বের এ হাহাকার—প্রাণাত সংগ্রাম।

কিন্তু কেন তব হেন ব্রজা নারায়ণ,

আছে কি কারণ কোন ? পূর্ব্বে নহে কাল।

কোথা যেবি ভগবতি ভূমি ?

জা। মর্ত্যে তিনি।

প্রে। এসেছি কৈলাসধামে তাঁহার আদেশে।

ম। তত্তত্তলা বত তাঁর কাণ্ডজান-হীন,

শক্ত শিঙ্গা বিতে হবে। যখন তখন

মা মা করি ডাকে ; শূত্র আদার ভবন।

(নন্দী ভূমির প্রবেশ ও

নন্দারপূর্ব্বক)

ম। যেখানে-আনিরাছি—

ভূ। আমি মুক্ত করি

যেবী দুই জনে—

ম। কোথা তাঁরা নিয়ে আর ;

দ্বারে রেখেছিল বৃদ্ধ পাড় করাইরা ?

বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে হয়েছে নিঃশেষ !

(উভয়ের গমন)

জ্ঞা। আসিছেন দেবীগণ, আজ্ঞা হোক এতো
একটু আড়ালে থাকি—

প্রো। দেখিলে মোদের
ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন তাঁরা—

ম। তথা অস্ত !
(দ্রুতনের উষ্ণিরা তরুলতা পার্শ্বে
বস্তারমান ও নেপথ্যের দিকে
দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক)

জ্ঞা। একি ! শাস্তি ! একি ভূমি ! হায় ভগবন্
কেন না করিলে মোরে দৃষ্টিহীন আগে—
নাহি রাগনও হায় ! বাহ শক্তিহীন
কেমনে লইব শোধ দিব প্রতিকূল !
এস বস্ত্র ভীমবল হও আবির্ভাব—
তোমার অলস্ত তেজে কর বনীরান—
ভস্মীভূত করে দিই পাণ্ডায়া দানবে ।

প্রো। হা করুণাগ্রাণি—হেরি একি বশ্য তব !
ভেদী মর্শ্মস্থল হায় সমুদ্র আকারে
অশ্রু উখলিয়া ওঠে—কেমনে সমরি !
(শাস্তি ও করুণার প্রবেশ)

উভয়ে। নমস্কার দেবদেব পরমশরণ ।

ম। এস কঁতা এস শাস্তি এস মা করুণা—
ধরা কর সুশাসন ধরার ঈশ্বরী
করি আশীর্বাদ । সুখ-ঝারি নাহি হাতে
কেন শাস্তি-রাণি তব ?

শাস্তি। অশাস্তি-দানবী
কলিরাগ-অমৃতচরী, সুখ-ভাণ্ড হরি
সমুদ্রে করেছে ক্ষেপ—হস্তহীনা আমি ।

ম। মা করুণা রাণী—ভূমি, কেন সে সমর
যুদ্ধ না করিলে তব নরনের ভেজে
নিষ্ঠুর দানব-সৈন্তগণে ?

করু। দেবদেব,
উৎপাটিত চক্ষু মোর, আমি দৃষ্টিহীনা ।

ম। অসহ অসহ ওহো ! যুগান্তের কাল
উপস্থিত হুনিচ্ছয় ।

(লক্ষ্মী সত্ত্ববতীর সহিত ভগবতীর প্রবেশ)

ম। হেরি ভগবতি ?
কেমনে রয়েছ স্থির এত অত্যাচারে ?
কে উহার দীনা নারী ?

পা। লক্ষ্মী-বাণী তব ।

ম। ইন্দ্রিয়ার ভারতী মোর এমন শ্রীহীনা !

কোথা লক্ষ্মীদেবী তব মোহন কুন্তল ?
কে দুরাত্মা স্পর্ধা করি করেছে হরণ ?
রতন-মুকুট কোথা—মণি-আভরণ ?
শোভাময় বর্ণভাণ্ড ধনধাত্ত স্তরা ?

ল। নাহি মোর নাহি কিছু । ঐশম্পদ সব
সঁপিয়া বিরাছি দেব—অজ্ঞারের করে ।
শোভাহীনা লক্ষ্মীহীনা আমি লক্ষ্মী তব ।

ম। মাতা-বাণী, জ্ঞানবাণী উচ্চাধিগা হেরি
অজ্ঞানের কর্ণে, কেন না রক্ষিলে ভূমি
ভগিনী লক্ষ্মীরে ! একি বাণী কোথা তব ?
পদ্মাসন কোথা ?

ক। নহি দেবী পিতঃ আর,
শক্তিহীনা বাণীহীনা সামাজ্য রমণী !
মোর শুদ্ধ জ্ঞানবাণী নিখিয়া লইয়া
দুর্বারী রচিয়া তাহে ভরি দীর্ঘানল—
আমারি উপর ভার করেছে পরীক্ষা—
হের অজ্ঞানাত !

(বক্ষঃ প্রদর্শন)

ম। ধান কঁতা আর নহে ।

কোথা নন্দী ভূমি—কোথা ভূত-শ্রেতগণ ?
বাল্যায় গ্রন্থ-শিলা ঘোর বস্ত্ররবে
সংহার-সুহৃতি ধরি—হও অগ্রসর ।
শিব আমি মহাক্রয় যুগান্ত তাণ্ডবে ।

(বহাশ্বেত তাণ্ডব-মূর্ত্তিতে বস্তারমান হইবামাত্র দেব-

দেবীগণের অগ্রদূত এবং সূত-শ্রুতগণের শিবকে
খিরসা নৃত্য করিতে করিতে গান।)

চলরে চল সবে, হর হর শিব বম।

পেয়েছি আত্মা—করি অবজ্ঞা ইন্দ্র বরুণ বম।

আর দানব বন্ধ—ডাকিনী রক্ষ—

আজিকে মহোৎসব!

শব্দে বশ্বে, মহান বস্ত্রে—

বিশে লাগাব ত্রাস!

মোরা পেয়েছি আত্মা—না আমি প্রজ্ঞা,

না জানি শব্দ বম,

আজি প্রলয় কাণ্ডে—নাশি ব্রহ্মাণ্ডে

বশাব স্বর্ষা সোম!

চলরে চল চল—বলরে বল বল

হর হর শিব বম—!

পটক্ষেপ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ-চন্দ্র-নক্ষত্র পরিবৃত্ত হবিষ্যত ঘোষে তিনখানি
আলোক-সিংহাসন ভাসমান। পার্শ্বের দুইখানি
আসন সূত্র, মধ্যগনে ত্রুক্ষা আসীন; নিকটে সূত্র
দুই দীপাসনে বম ও ইন্দ্র উপবিষ্ট।

ইন্দ্র। (করবোধে)

মহেশে করুন দ্বন্দ্ব দেব স্তম্ভবন!

মহাত্মা পুণ্যাত্মা কেহ না আসে জিহবে,—

ইন্দ্রের করিব আমি কায়ে গারে আর!

সূত্র মোর ধাম—

বম। পূর্ণ বসের ভবন।

অকাল-মরণ যদি পৃথিবী-বাসীর

না কর বারণ ত্রুক্ষা, হইবে প্রমাধ।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

সকলে (উপানপূর্বক)

নমো দেব নারায়ণ স্থিতির কারণ।

বিষ্ণু। নমস্তে ত্রুক্ষু সখে, নমো ইন্দ্র বম।

(বিষ্ণুকে হস্তধারণে পার্শ্ব উপবেশন করাইয়া)

ত্রুক্ষা। আসন গ্রহণ কর বম ইন্দ্ররাজ।

বিষ্ণু। কেন অস্বস্তি সখে?

ত্র। এ দুদিনে হরি—

যদি না অস্বস্তি তোমা কায়ে আর অস্বস্তি?

বিশ্রুত বিকল্পিত স্রষ্ট হর শোণ;

তুমি বিনা হস্তবদ্ধ কে বাতে তাঁহার?

বি। ত্রুক্ষার অসাধা কার্য সাধিব কেমনে

আমি স্থিতিপতি বিষ্ণু? আমার পরনে

স্থিতিশীল হর পাছে মহেশ্বরের গতি

এ আশঙ্কা রাখে।

ইন্দ্র। বাক্ তবে স্বর্গ মর্ত্য

রসাতলে বাক্, দেখে নীরবে বসিয়া।

বম। প্রেতভূমি হোক বিশ্ব—আমি ধর্মরাজ

নিজাশ্রমে ছই বন্দী। হেন রাজ্যপথে

নাহি প্রয়োজন মোর। লও বমবশত,

মুক্তি বাও ত্রুক্ষা বিষ্ণু—করি অহম্বর।

ত্র। স্থির হও ইন্দ্র বম।

বি। হেয়োনা নিরাশ।

শক্তিরে স্বরণ করি—এস সবে মিলি,

অবস্ত্র উদ্ধার পাব তাঁহার সহায়ে।

ত্র। এমন সহজ সত্য ছিলাম ভুলিয়া!

ধস্ত তুমি! আপনারে মহাধস্ত মানি—

সধাক্ষেপে চবিকেশ, সন্তিয়া তোমায়ে।

ইন্দ্র বম। সার্বক তোমার দেব বীনবন্ধ-নাম।

(সকলের গুণ)

ংজগ-জননী ভবানী

শুনাতো অন্তর-স্রবণী

দুর্নীতি-ভায়ে অতি ভুবন কম্পমান!

স্বরনরকিররে, কাতরে তোমায়ে স্তরে

অকূলে তরী দান করি—

করণো পরিচাপ।

(ভবানীর প্রবেশ)

সকলে । (উঠিয়া)

নমস্তে বিশ্ববন্দিতে ;

ভ ! লরন্ত—সুখতি ।

ত্র । এসন্ন হইয়া কর আসন গ্রহণ ।

ভ । এসন্ন হউন সবে ;—

সকলে । যথাদেশ বেধি ।

(সকলের উপবেশন)

ত্র । বিশ্ব গায় আঁহি আঁহি লরণ-সদ্বীত,
কেমনে নিশ্চিত আছে বিপত্তারিণি ?ভ । তুমি ব্রহ্ম স্বরূপ, তুমি হিতিপতি
ত্রিলোক-ঈশ্বর গোঁহে, তোমরা থাকিতে
আমি কি করিব দেব, সামান্য শক্তি ।

বি । বিনয়ের নহে কাল দেবি শক্তিরূপা ।

ত্র । স্বজন পালন কহু হোত কি সত্ত্ব
অভ্যাসিত তুমি যদি না থাকিতে মূলে ?

ই । অগতির গতি তুমি,—

ধ । কৃপা কর দেবি ।

ত্র । শান্ত কর হরে । যদি কিছুক্ষণ আর
চলে হেন নৃত্য তাঁর, সৃষ্টি হবে নাশ ।ভ । ক্ষতি কিবা ? দূর হোক আসন্ন তোমার,
ঘুচুক অড়তা । কোন্ আদিহুগে সেই
সৃষ্টি করি একবার—রয়েছ বসিয়া
চোঁটাইন নির্ঝিকার, সেত নহে ভাল ;
ক্ষুষ্টি আনন্দের কাল ইহা ত তোমার !

বি । বান্ধষণা সৃষ্টি দেখি মনে পাই ভয় !

ভ । এ বিষয়গণ লয়ে একা তোমরাই
হাসিবে করিবে রজ ? অন্তের তাহাতে
অধিকার নাই কোন ? বেশ তাই হোক ।লর প্রাক্ত শিব হবে নৃত্য-অবলানে
হইবেন ধ্যানমগ্ন,—লীলাচ্ছলে পুন
এসন্ন-প্ৰমোদি-মূলে, ব্রহ্মার স্বজিত

পদ্মলোপরি বিষ্ণু—হরো ভাসমান ।

অপেক্ষা করিতে কিন্তু হবে ক্ষণকাল !

ত্র । একবার লরকাণ্ড হইবে গেলে শেব,
ধ্বংসেত্তে গঠিতে পুন ব্রহ্মাও অক্ষয় ।
নিজের নিয়ম-পাশে নীতি-স্বচ্ছলার
অড়িত পীড়িত হেন নিজে সৃষ্টিধর ।ভ । শক্তিরও নাহিক শক্তি, যে স্বজনগতি,
কিরাইতে কালগতি, কহিছ নিশ্চয় ।
যে দুহর্ষে ধর্ম হবে কলির প্রভাব,
উচ্চ হতে নিরে হবে পাপের পতন,
দেবের চরণ-স্পর্শে হবে অধিকারী,
ধামাব তাঁহার নৃত্য রাধিব সংসার ।

ত্র । কিছু না রহিবে আর ত্রিকিতে তর্কন ।

ভ । বেশত সে মজ কিবা ! নূতন প্রধার
পড়িবে ভুবন নব । যেথা প্রজাপতি
স্বর্গে মর্ত্যে ভেদ যেন রেখোনা এবার ;
নিমেন্দা তোমারে যেন ধরাবাসী আর ।
পুরাতন কালগর্ভে হউক বিলীন ।বি । ইচ্ছা তব পূর্ণ হোক—হের গো পান্যনি
বিশ্বের প্রলয়রূপ কিবা মনোহর ।ভ । একি দৃষ্ট ! খলি পড়ে চক্ষু স্বর্বা তারা
রোহিণী ভরদ্বীপ;মণা রাশিগণ বত,
কক্ষাত সূর্য্যমান সপ্তর্ষি দেবর্ষি,
মহাকাল মহাপুত্র যোর অঙ্ককার !
আমারেও কি মারা এ বেধাও রমেশ ?

বি । তাও নিয়ে ধরাতলে, কি দেখিছ দেবি ?

ভ । অসীম সমুদ্র গর্ভে জীবন নিনাদে ।

কোথা স্থল-গিরি-নদী-তরু-লতাবন ?
জীবজন্তু-নরনারী ? কি করিছ দেব ?
ভক্ত যে উহার যোর প্রাণের সম্মান—
মা মা করি ডাকি সবে পড়িয়া ঘুরিয়া
তলাইয়া বার নীচে ! সহিব না ইহা !

ধরিয়া তোমার হাত ভীমানুষ্ঠি ধরি—

রক্ষিব সন্তান মম,—বিহু সাবধান !

বি। কি করিব আমি দেবি—তোমারি ইচ্ছায়
প্রলয়-পরোধি-জলে মগ চরাচর !

শূন্ত মহাকালে তুমি শক্তি শূন্তরূপা

বিরাজিছ—একা শুধু ; হের গো কালিকা ।

ভ। আমার ভারতী লক্ষ্মী, গণেশ কার্তিক
তুবে যে মহান শূন্তে—আর না আর না—
সংহর প্রলয়-মূর্ত্তি—সম্বর সম্বর ।

বি। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবেই ভবানি
এ প্রলয় হবে লর বৃহর্ষে এখনি

নিবার-হরের নৃত্য ।

ভ। তথাস্ত্ব দ্বিতীশ,
সহায় হও হে তবে ব্রহ্মা নারায়ণ ।

ত্র। বল কি আদেশ ?
বি। সাধি সর্গশক্তি দানে ।

ভ। অকালে এ মোহ নৃত্য ভাঙ্গালে দেবের
ঘটিবে প্রমাণ বড়, বাড়িবে দ্বিগুণ
কলির প্রভাব ।

বিহু। কহ কি তবে উপায় ?

ভ। নব যুগ হে ব্রহ্মন্ কর প্রবর্ত্তন ।
বিহু তুমি হরি তাহে মহা অবতার
বন্দী কর কলিরাজে । বত দেবগণ
হও সৈন্ত অমূচর । আমি শক্তিরূপা—
গণ দেখাইয়া চলি, আগাই নিবেয়ে ।

ব্রহ্মা বিহু। তথাস্ত্ব ভবানি ।

ঐশ্বর্য বর্ম। অয় অয় বল অয় ।

গান

অয় অয় বল অয়

দূর অরুর মাগব ধানব সব ।

দিশদিশে জনিত করি অননিমন্ত্রিত রূবে—

* অয় অয় সত্য লনাতন

অয় অয় ব্রহ্মা নারায়ণ

অয় অয় শিব-শক্তি—

গাধি, গুণ্য বনল আধবে ।

হিমান শাপজপ

শক্তির বয়ে ক্ষতহি চেতনী

হয়েছি প্রসাদ-মুক্ত ।

এবে, আবরা এবেল দেব ।

বুড়িত মেঘের জ্বাতি জ্বাতি

মিলেছি পাণ্ড পৈব ।

দুর্জয় ঐক্য-ময় উজাগরি—

নবীন করে আনিব ভবে ।

অয় অয় বল সবে ।

পটক্ষেপ ।

চতুর্থ দৃশ্য

এখন দুস্তের জায় শিব তরলভাস্কর মন্দিরে
ধামরয় ; লক্ষ্মীর রসমকে তুলি নৃত্যগায়ণ, নন্দী স্থির
ভাবে তরুণকে নির্ভর করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া
বসিয়াবান ।

ভূ। (নাচিতে নাচিতে)

এ কি জালা পা ছুটা যে না মানে বারণ !

কে বেন চালায়ে মোরে গ্রহের মন্তন—

করিছে অস্থির ?

ন। নাচ তবে আরো নাচ ।

ভূ। ঠৈব, ভারী আভাজাগরি ! আমি নেচে য়ি

তামাগা দেখুন উনি । সেটি হইবে না,—

তুমি নাচ আমি বসি তুড়ি মিই কহি ।

(উপবেশন ও পায়ে হাত দিয়া)

বেদনা করিছে বড় টিপে দাও দাগ ।

ছোট ভাইটিরে কর দয়া একটুহু ।

এ হেন শক্তির দিনে কর শান্তি দান ।

ন। নীরবে থাকিস যদি—*

ভূ। রাজি খুব রাজি ;

টেপো দাদা ভাল ক'রে ।

(নন্দার পা টিপন)

তু। আঃ কি আরাম !

ন। কের কথা—কের !

তু। এই ক্ষান্ত হহু—শুধু—

ছটি ছোট্ট কথা দাদা বেশী কিছু নয়—

ন। সর্ব্ব ভদ্র হয়ে গেছে, উঠিহু আর না !

(পা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া)

তু। বেশ ব'ল, গল্প কর, বল দাদা বল—

ভূত প্রেত ষেতা দাদা পত্ত নয় হবে

মেতে উঠেছিল সবে, তুমি কি তখনো

এমনি গভীর হির ছিলে দাঁড়াইয়া

নৃত্যশিল প্রভুর পারশে !

ন। মনে নাই ।

তু। মনে নাই ! বল তবু যাঁহা মনে আছে,—

বলিতেই হবে—

ন। বড় আবদার এ ত !

শোন তবে ; শুভরূপে বিতারিয়া মুণ্ড

ভবিয়া সাগরখানা করিলাম গ্রাস

সিংহি হয়ে জ্বলি কারা ।

তু। ধাম' দাদা থাক্ !

তোর সনে গল্প করা পত্ত পরিভ্রম,

হুথ নাই এতটুকু ! মনে কি করিস—

পূজা দিব তোরে মোরা ভোলা-চোলা বলে ।

ন। পূজাটা তোরেই দেব ছেড়েমে আমারে ।

তু। তা হবেনা দাদাভাই, তুমিতেই হবে,—

পেয়েছি তোমারে হাতে অমনি কি ছাড়ি !

যুগাধুবি দাদাধারি করি কথাগলা

পেটের ভিতর, মোরে করিছে জ্বর—

বাহির করিয়া পাই আশ—,

ন। বল তবে ।

তু। তোর ত আরাম দিয়া—কিছু মনে নাই ।

আমার বে মনে পড়ে প্রতি-পদক্ষেপ !

হুথ ভরজিত প্রতি বেহ-সকালনা—

রণবান্ধ তালে তালে ;—

ন। সৌভাগ্য তোমার !

তু। চূপ কর বলিতে দে, তুমি সব কথা

ভবন করিস পরে—ভাগ্য-আলোচনা—

এমন অস্থির পক্ষ !

ন। তুমিতেছি বল !

তু। তুমিতে হবেনা আর বুঝিয়েছে কথা ।

ন। এত শীঘ্র ! বাঁচিলাম । হর হর বম ।

তু। তুমিত বাঁচিলে কিন্তু মরিলাম আমি !

উল্লাস বিধোরে হবে—দিশু উল্লস্ফন

ধোজন উপরে—কাটি গেল ভাল লয়— !

ন। সত্যি নাকি তারপর ?

তু। হোল সর্ব্বনাশ !

হারাহু সকল শক্তি, ইন্দ্రిয় বিকল !

ছুটিয়ে চলিল নীচে জড় বেহগনা ;

পড়িয়া পাখান-লোহ-কঠিন মাটিতে

এখনি হইবে চূর্ণ, চক্ষু মুদ্রিলাম !

ন। আচ্ছা মরি তারপর ?

তু। ঠেকিল চরণে

হুকোমল তৃণশয্যা ; চাহিয়া দেখিহু—

শিবের দুয়ার পরে আছি দাঁড়াইয়া !

ন। বেশ বেশ বড় সুখী। ভূবিদ্যারা হ'লে

আমারও খটিত মৃত্যু !

তু। কিন্তু বল দাদা

এ কেমন স্বপ্ন ! হেন মহা-লয়কাণ্ড

মিথ্যা কি সকলি বন্দী,—শুধাই তোমারে ?

ন। সত্য কিবা মিথ্যা বেধ নয়ন মেলিয়া ;

ঐ বিরাজেন বিষ্ণু নবদুগ-বেশে,—

বন্দী করি কলিরানে দেবগণ সাথে !

সর্ব্ব অগ্রে—শক্তিরূপা অগজমননী !

(উভয়ের নেপথ্যে দৃষ্টিপাত)

তু। একি দৃষ্ট স্বহান্ কান্ পুণ্যকলে

লভিহু এ দিব্য দৃষ্টি—পুলিশ নরন !

প্রাণ ভরি গাহি সবে অরুণর গান ।

উভয়ে। সর্গে বিশ্ব ইক্যানাধে গাও অরুণর ।

(মহাশি আলোকজটীর মধ্যে যেন যেন বর্ণিত
দৃষ্টিতে প্রকাশ । ব্রহ্ম ও মহাবেশ উভয়ে আলোক-
সিংহাসনে আসীন । সম্মুখে দ্রুতচলিত ভগবতী নবদুগ-
বেনী বিহু এবং বন্দী কনিরাম, ইন্দ্র, বন, ন্যায় প্রেত,
লক্ষী, সরস্বতী ও শান্তি, কল্পনা এবং বিদ্যালা একত্রে
যেন যেন বর্ণিত হইয়া বসিয়াছেন ।)

নন্দী তুহি ও বিদ্যালাগণের গান ।

গান

হের ঐ নবদুগ উদীয়মান !

ঐতিহ্যোত্তম দিব্য আলোকে

ঐশ্বর্য-ভিম্বিত অরুণর ।

সুন্দর গাহে অরুণর ।

সমীরণ পুলকে ভরা

শান্তি কান্তি রূপে আসিছে বরা ;

ত্রিলোক-ধেবতার পুণ্য আশীষ-ধার

ছালোকে ভুলোকে ভাগমান,

বিশ্বব্রহ্মে বাজে মঙ্গল-তান ।

পটক্ষেপ ।

সমাপ্ত

ঐশ্বর্যভারী দেবী ।

শিল্পচর্চা

(রূপটকিন হইতে)

প্রাণধারণ বা কেবলমাত্র দিনবাগনের
উপযোগী অরু, পানীর ও আশ্রয় সংগ্রহই
মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে—তাতে তার
সমস্ত শক্তিও ব্যয়িত হয় না। সাধারণ
অভাব-পূরণের সঙ্গে সঙ্গে অল্প নানাবিধ
অভাব মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে জেগে
ওঠে—আবাদের অন্তরনিহিত সৌন্দর্য্যকুচির
প্রেরণার। আনন্দ প্রত্যাহাই দেখি প্রত্যেক
নর-নারী আবশ্যিকের জিনিষের অভাব সবেও
এমন ছ-একটা জিনিষ কেনেন, যাতে দৈহিক
বা মানসিক আনন্দ পাওয়া যায়। কোন
নীতিবাসী বা সম্মানীয় চোখে এই বিলাস-
বাসনার পরিতৃপ্তি অসম্ভবের কারণ হতে
পারে—এ-স্তম্ভিক তাঁরা পাপের প্রবেশ-

দ্বার মনে করতেও পারেন ; কিন্তু
বাস্তবিক এই-সব ছোটখাট খেলার
জিনিষই জীবনের একঘেরে জীবকে নষ্ট
করে, তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনে দেয়।
সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনার পর নিজের
হুচি-পরিতৃপ্তির ও অবকাশবাগনের কোন
উপায় যদি না থাকত, তবে অবশ্যম্ভাবী
দুঃখের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে কোন
মাছুষ বাঁচতে চাইত কিনা, সম্ভেহ। প্রতি
লোকের জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন এবং সমাজ
যতই সভ্য হবে, ততই মাছুষের স্বাভাব্য
বাড়বে এবং তার ফলে প্রত্যেকের আশা-
আকাঙ্ক্ষা, হুচি ও পরিতৃপ্তি ভিন্ন হবে।
নীতির পুঁথি বা নীতিবাসীনের উপদেশের

উপর মানুষের উন্নতি নির্ভর করছে না এবং কখনও যে করবে এমনতর তর আমাদের নেই, কাগেই আশা করতে পারি যে আমাদের সমাজে শিল্পচর্চার কোনো ক্রটি হবে না।

সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে অবশ্য প্রথমে সবার মূখে অন্ন যোগাতে হবে। বর্তমানের সমাজ-ব্যবস্থার সক্ষম কর্মী কর্ম-প্রত্যাশার দ্বারে দ্বারে কঁদে ফিরছে, আশ্রয়হীন নারী অসহায় শিশু মনের বেথনা জানিয়ে পথে পথে ঘুরছে—অর্দ্ধাশন ও কর্মী-পরিবারের চিরসাথী। আবালবৃদ্ধবিনিতা যন্ত্র-সহায়ত্ব ত দুয়ের কথা, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত—পণ-জীবনের চেয়েও দুর্ভিক্ষ তাদের জীবন। এই সমস্ত অত্যাচার ও অজ্ঞার বহন করতেই আমরা বিদ্রোহ করছি। কিন্তু বিদ্রোহ এখানেই থামবে না, তাহলে আমাদের কাজ অসমাপ্ত থেকে যাবে। আমরা দেখছি যে মজুরের দল মানুষের জ্বলের অস্ত্র সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু মানুষের উদ্ভাবিত সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের সংবাদ তাদের জানা নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারজাত আনন্দের পথ তাদের সামনে রুদ্ধ, শিল্প ও শিল্পজগতির আনন্দ ও অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। এই-সব আনন্দের অধিকার আজ জনকয়েকের হাতে, কিন্তু আমরা এটিকে সাধারণের অধিকারভূক্ত করতে চাই। এই আনন্দ উপলব্ধির জন্তে মনের ও বুদ্ধির সম্যক পরিচালনা বিশেষ আবশ্যক। এগুলি অবকাশসাপেক্ষ—

অথচ, অশন-বপন-আশ্রয়ের অভাবের সঙ্গে লড়াই করে অবকাশ মেলাই দায়। এই বাধা দূর করবার জন্তে আমরা প্রথমে সাধারণ অভ্যাস মেটাবার চেষ্টা করব, —যাতে সবাই শিল্পচর্চার উপযোগী যথেষ্ট অবকাশ পায়।

বর্তমানে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক অশন, বপন ও আশ্রয়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, সেখানে শিল্পচর্চাকে বিলাসিতা বলা চলে সন্দেহ নেই। অভাবের মাঝখানে বিলাসিতা মহা দোষের, কিন্তু বহন সমাজে অন্ন প্রচুর, তখন শিল্প-চর্চা কোম অংশে নিশ্চিনী নহ। সব মানুষ একরকম হতে পারে না, কাগেই আমরা আশা করতে পারি যে, সব সন্মুখেই আমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকবেন যাদের কৃতি ও প্রবৃত্তি সাধারণের থেকে ভিন্ন হবে। সকলেই যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে খসে যাবে এমন কোন কথা নেই, যদিও এমন লোকের অভাব হবে না দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে চর্চা করতে যে ভালবাসে। সাধারণ শিক্ষা একরকমের হলেও বিশেষ শিক্ষার পথও প্রস্তুত থাকবে। অধিকন্তু, কৃতির মূল এক হলেও নানা লোকের নানা কৃতি হওয়াই সম্ভব—কারও-বা মর্দর-মূর্তি কারও-বা ছাঁচ ভাল লাগে, কেউ-বা একটা পোতার আর কেউ-বা একটা পিরানো পেলে আর কিছু চায় না।

বর্তমানে মহাজনী বন্দোবস্তের কলে অগাধ অর্থ না থাকলে সৌন্দর্য-কৃতির পরিতৃপ্তিসাধন দ্রুত; এ অর্থ উপাঞ্জন

করতে হলে কঠোর দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম করতে হবে এবং সে অর্থদক্ষ সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। সকলের মনে কোন-না-কোন রকমের 'বিশ্বাস-বাসনা' আছে; সেটার পরিতৃপ্তি না হলে মনে অসন্তোষ জাগে এবং সমাজে গোল-যোগ বাড়ে। শিক্ষিত লোকই হোক, আর অশিক্ষিত কৃষকই হোক, হৃদয়ের প্রতি টান সকলেরই আছে, যদি জোর করে সেটিকে দমন করবার চেষ্টা করি তাতে উণ্টা ফল ফলবে। অধিকন্তু, শিক্ষিত জনের স্বাভাব্য নষ্ট করতে হলে শিক্ষা বন্ধ করতে হবে—অর্থাৎ সত্যের পথে না-এগিয়ে আমরা পিছিয়েই যাব। ইতিহাসের শিক্ষা যদি আমরা কাজে লাগাতে চাই, তবে সবেমাত্র বিকল্পে সাধন হতে হবে। আমরা মহাব্যবসার দাবীতে বিদ্রোহ আরম্ভ করছি; মানুষের দৈহিক ও মানসিক সর্বাদ্বার উন্নতিতে আমাদের কাজের পরিসমাপ্তি।

অবশ্য স্বীকার করি যে, যখন চারিদিকে অভাব-অনশন, মর্ধ্যস্তর বাতনা ও ব্যর্থ জীবনের হুগতীর নৈরাশ্রের কথা ভাবি, তখন এ প্রশ্ন মনে আনতে লজ্জা পাই—আমাদের সমাজে প্রাচুর্যের দিনে কেমন করে লোকের নানারকমের সখ ও খেয়াল চরিতার্থ করব? আমরা আগে-ভাগে উত্তর দিই—আগে ত সকলের অঙ্গের বন্দোবস্ত হোক পরে খেয়ালের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে এটা ভুলে চলে যে না যে, মানুষ শুধু অঙ্গের কাঙাল

নয়—দেহের ক্ষুধা ছাড়া তার মনের ক্ষুধাও আছে এবং তার দাবীও কম নয়—কাজেই আমরা তার আশোচনা করতে বাধ্য।

দৈনিক পরিশ্রমের ঘণ্টার দ্বার নিয়ে অনেক তর্ক-বিচার বহুকাল থেকে হয়ে আসছে এবং অনেকের মতে পাঁচ ঘণ্টাই নির্ধারিত হয়েছে। পরতালিশ বা পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম সমাজ-রক্ষার উপযোগী বিনিয়-উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। পাঁচ ঘণ্টা আমাদের সীমা হলেও সাধারণ মানুষ বছরে তিনশো দিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রমে অভ্যস্ত। বাধ্য হয়ে পরের অন্তে বাটতে গিয়ে মানুষ শেষে কল হয়ে ওঠে, তার বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হতে হয়, বেকীরতাগ তার মহাব্যবসার জন্ম হয়; কিন্তু কাজের মধ্যে যদি যথেষ্ট স্বাধীনতা ও আনন্দ থাকে, তবে দশ-বারো ঘণ্টা পরিশ্রমে সে কাতর হয় না। সমাজের কল্যাণে সে তার নিরনিত সময়টুকু হার্টে বা কারখানার বা অন্ত কোন-রকমের কাজে ব্যয় করবে, কারণ তার উপর কেবলমাত্র সমাজের অভাবমোচন নয়, সাধারণের উন্নতি ও শান্তি নির্ভর করেছে। যাকি সময়টুকু তার হাতে, এ-বিষয়ে সে পূরান্যায় স্বাধীন।

শিরশ্চিহ্ন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অন্তে বহু সমিতি গঠিত হবে, এবং এ-সব বিষয়ে যাদের কৌতূহল কম তারা নানারকম খেলা ও খেয়াল-সমিতি স্থাপন করবে—অবসর-টুকু হৃদয়ভাবে ব্যয় করবার অন্তে। পরম্পরের মধ্যে নিঃশিচর মেলা-মেশার, ভাবের আদান-প্রদানে ও

সহায়ত্বভূতিতে এটি সম্পূর্ণ সম্ভব। জ্ঞান এবং রস সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে; গ্রন্থকার, ছাপাখানার কম্পোজিটর, প্রিন্টার, চিত্রকলাবিদ ও খোলাইকার একত্র মিলবদ্ধ হয়ে কোন বিশেষ চিন্তা প্রচারের চেষ্টা করবে। বর্তমানে গ্রন্থকারের সঙ্গে ছাপাখানার কোন সাক্ষাৎ-যোগ নেই বললেই হয়, সামান্য বা আছে তা অর্থের এবং তাও আবার কর্মী-জনের সঙ্গে নয়; ছাপাখানার কার্যাব্যাহক বা সত্বাধিকারীর সঙ্গেই তার কারবার। কর্মীবীচনের সঙ্গে গ্রন্থকারের কোন সহায়ত্বভূতি নেই বললেও অত্যাশ্চর্য্য হবে না; অবিরাম সীসা-ব্যবহারে যদি কম্পোজিটর সীসা-বিষে কষ্ট পায় বা কল-পরিষ্কারক বালক যদি রক্তশূন্যতা রোগে মারা যায়, তবে তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না—পৃথিবীতে তাদের স্থান পূরণ করবার মত হতভাগ্যের অভাব ত কোনদিন হয়নি! কিন্তু যেদিন দেশে অনশন-অভাবের দায় থাকবে না, যেদিন কেবলমাত্র জীবন-রক্ষার ক্ষেত্রে কেউ দেহ-মন বেচবে না, যেদিন জনসাধারণ যথেষ্ট শিক্ষা ও অবকাশ লাভ করবে এবং মনোভাব প্রকাশ করবার মত শক্তিশালী হবে, সেদিন বর্তমানের গ্রন্থকারকে তাদের পরগণায় হতে হবেই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-বার্তাই হোক আর রসরচনাই হোক, জনসাধারণের সমবার্ত্তি দে-সব প্রকাশ ও প্রচারের আর কোন উপায় থাকবে না।

যতদিন বস্ত্রধরন, ঘরনির্মাণ প্রভৃতি নানারকম হাতের কাজ ইতরজনাচিত

বলে বিবোচিত হবে, ততদিন কেবলমাত্র আনন্দের ক্ষেত্রে নিজের হাতে বই-ছাপান লোকের চোখে অদ্ভুত লাগতে পারে, কারণ আনন্দলাভের অল্প পথ অনেক আছে। যেদিন সমাজে সকলের দাবী সমান হবে, সেদিন কিন্তু আর হাতের কাজের নিম্না থাকবে না, কারণ কোন-কিছুর বিনিময়ে কেউ কারও দাসত্ব করবে না—প্রত্যেকের কাজ প্রত্যেককে নিজের হাতে করতে হবে। গ্রন্থকার ও তাঁর ভক্তের মিল সাগরে ছাপাখানার কাজ করবে এবং সৃষ্টি করবার সুখ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে। কয়েকখণ্ড মুদ্রার ক্ষেত্রে যে বালক-মজুর ছাপাখানার পরিভ্রম করে, তাঁর কাছে এটি মরণের যন্ত্র মনে হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু যে-সব লোক তাদের প্রিয় কবির বা লেখকের মহৎ চিন্তা-প্রচারে ত্রুটি, তাদের কাছে এটি হৃদয় বলে মনে হবে—যন্ত্রের প্রতি স্পন্দন, প্রতি শব্দ আনন্দের ব্যঞ্জনা পূর্ণ বলে মনে হবে।

এতে সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হবেনা। গৃহকোণের আরাম-শয্যা ছেড়ে দেশের সঙ্গে নিজের ও সমাজের কাজ করলে কবি কিছু অকবি হবেন না—কল-চালাতে, খনি খুঁড়তে বা রাস্তা তৈরি করতে নানারকম লোকের সঙ্গে যোগাযোগের উপকরণ হিসেবে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা বাড়বে বৈ কমবে না। স্বীকার করি, কয়েকখানা বই পূর্ণের চেয়ে আরও অনেক ছোট হবে, কিন্তু তাতে কমকথার বেন্দী বলা হবে। বালক কথ্য কমই ছাপা চবে এবং বা ছাপা হবে তা সবাই পড়বে ও বুঝবে। দেশে

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমাদর বেড়ে যাবে, কারণ মার্জিত ও শিক্ষিত লোকরাই তখন সাহিত্য-চর্চা করবে। এতদিন ছাপাখানার সঙ্গে সাক্ষাৎ-যোগ না থাকায় যন্ত্রের উন্নতি বিশেষ-কিছু হয়নি; এবার থেকে তার উন্নতির হুচনা হবে।

বর্তমানে প্রতি সভ্যদেশে হাজার হাজার বিশ্বজনসভা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যসমিতি আছে। সভ্যদের বেজা-মিলনের ফলে সেগুলি জন্মলাভ করেছে এবং শিক্ষিত জনপদবর্গের সহায়ত্বভিত্তিতে সেগুলি পুষ্টলাভ করেছে। এক-একটি বিশেষ শাখা বা বিভাগ অবলম্বন করে জ্ঞান-বিস্তার ও আনন্দ-বিস্তরণের জন্তে তারা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করেন। সেখানে অর্থের কোন সম্বন্ধই নেই—পরম্পরের মধ্যে বিতরণ ও বিনিময়ে কাজ চলে, লেখকও নিজের আগ্রহে লেখেন, অর্থের বিনিময়ে নয়। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তক-পত্রিকা অর্থের বিনিময়ে ছাপাখানার ছাপবার জন্তে খেঁজা হয়, কারণ হাতের কাজের উপর শিক্ষিতজনের কিছু ঘৃণা আছে। তাঁদেরই সহায়ত্বভিত্তি ও চেষ্টার অভাবে ব্রহ্মপুত্রের অবস্থা শোচনীয়। দেশে উদার ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে এগুলি সূচালিত হবে এবং বিশ্বজন-সভা সাধারণের কাজে যোগ দিতে ইতস্তত করবেন না, এমনতর আশা আমরা রাখি। একক বা স্বতন্ত্র চেষ্টার চেয়ে সমবেত শক্তির প্রাণান্ত কারকে বুঝিয়ে দেবার দরকার হবে না। বর্তমানে নানাধেশে সমবারে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চলেছে, তাতে

ভবিষ্যতে সে যে একটা মণ্ডল-শক্তিতে পরিণত হবে, তা সুনিশ্চিত।

বর্তমানে লেখককে সংবাদপত্র-সম্পাদক, ছাপাখানার সচাধিকারী বা পুস্তক-প্রকাশকের অহুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়, ভবিষ্যতে লেখকের স্বাধীনতা বিশেষ বাড়বে, কারণ ধীর নতুন-কিছু বলবার থাকবে তিনি সমাজদার লোকের সাহায্যে সে-সব নিজেই প্রকাশ করতে পারবেন। এখন কতকগুলি লোক জ্ঞানের চর্চা ও বিস্তারে মনোযোগ দেবার শিক্ষা ও অর্থব্যয় পার, আমাদের কাম্য-সমাজে সকলেই সে সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে—তাতে বর্তমানের চেয়ে সমাজদার লোকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে।

সাহিত্যের ও সংবাদপত্রের চারদিকে যে ব্যবসার আবহাওয়া আছে, সেটা সম্বর নষ্ট হবে বাবে এবং তাতে তার ঐশ্বর্য্যের সম্ভাবনাই বেশী। অর্থশালী লোকের বা দলের খেয়াল বা লাভের জন্তে লোকে কুদৃষ্টিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে না এবং জনসাধারণ সে-সব সভার হাত থেকে পরিদ্রাণ পাবে। ধীরে দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ও ধর্মের কাগজের ভিতরের ধরন জ্ঞানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের মতে দায় দেবেন। এতদিন তাঁরা অন্তর্য্যকে নির্জীব্যে সহ্য করেছেন, শক্তির অভাবে তাকে দমন করতে সাহস করেন নি, ভবিষ্যতে তাঁদের মনোমতনা পূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বা শিল্পের সাহায্যে কেবলমাত্র ভক্ত ও ঐশিকের জন্তে আবিষ্কার ও সৃষ্টি করবেন—পরের মুখেরে

ভবন ভর পাবার কোন কারণ থাকবে না। সকলসাধনাকৃত হইবে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিপোষক হবে।

শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা তাঁরাই স্বল্পর ভাবে এবং নিঃশকতিতে করতে পারেন, যারা কার্যমনোবাক্যে স্বাধীন। যতদিন-না যাহুয শাসন-তন্ত্রের, ধনধানি মহাজন বা অর্ধশিক্ষিত মাঝারিদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, ততদিন তার কোন মঙ্গল নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে পরিত্ত ব্যক্তিমাধেরই জানাশুনা আছে যে, শাসন-তন্ত্রের সাহায্য কোন কাজেরই নয়। ভাতে উপকারের বরলে বরং সমুহ ক্ষতি হয়। একে ত শাসন-তন্ত্র শতের মধ্যে হ্রত একজনকে সাহায্য করতে পারে; তাও এই কড়ারে যে, পুণ্যো দস্তরের বাধা পথে তাকে চলতে হবে—নতুন কথা বলবার অধিকার তার থাকবে না—স্বাধীনতার বদলে এ সাহায্য কেউ কি চাইতে পারে? বিশ্ববিজ্ঞানের বা শাসন-তন্ত্র গতিত সমিতির অধিকারের বাইরেই অগতির বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে। সারাজীবন অনশন ও নানা অভাব-অনটনের সঙ্গে অবিরাহ লড়াই করে যারা মানুষের উন্নতিসাধন করেছেন শাসন-তন্ত্র তাঁদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে একটা অঙ্গুল পর্যন্ত তেলে নি। শাসনতন্ত্রের সাহায্যে বোধপ্রবৃত্ত হইবে আমেরিকার ও যুরোপে নানা সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং পরম্পরের ঘেচ্ছাপ্রদোষিত সাহায্যে ও চেষ্টার কাজের যথেষ্ট সুবিধা হইছে। এর-মধ্যে বা-কিছু গলদ আছে বিজ্ঞানের পর স্বাধীন

সমাধে মৈত্রী ও সহায়ত্বভূতির প্রসাদে শেগুনি দূরীভূত হবে।

যন্ত্রাদির উদ্ভাবনের পথে শাসনতন্ত্রের ও মহাজনো ব্যবহার বাধা বিস্তার; বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবও এ পথে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। নিজের লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে কোন উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক কাজে হাত দেন না—বেশের উপকার ও আনন্দের ক্ষেত্রেই তাঁর সাধনা তাঁর কৃচ্ছসাধন। মনের স্বাধীনতা যেখানে, চিন্তার অবাধ গতি যেখানে, সেখানেই শিল্পী ও উদ্ভাবকের স্বর্ণ এবং সামাজিক পরিবর্তন সেই স্বর্ণকে মর্মে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা করছে। শিল্পী ও উদ্ভাবকের চেষ্টার নানা ব্যাগার স্থাপিত হবে এবং অবসর-সময়টুকু তাঁরা নিজেদের চিন্তাকে আকার দেবার চেষ্টা করবেন—সকল হোন বা বিকল হোন, কারও কাছে সেদিক্ত অনাবস্তক জবাবদিহি করতে হবে না এবং বারবার চেষ্টার অধিকার থেকেও তাঁদের কেউ বঞ্চিত করবে না। অভাব ও বাধার সঙ্গে লড়াই করে যে-সাধনা, তার হাত থেকে তাঁরা পরিজ্ঞাপাওন, এটি নিত্যন্ত আত্মপ-কুহম বা অলৌক স্বপ্ন নয়। যুরোপের অনেক রাজধানীতে এমনতর ব্যাগার স্থাপিত হয়েছে এবং তার কাজ পূরণমেই চলছে। তার মধ্যে ক্রটি অবশ্যই আছে, কারণ শাসনতন্ত্র, সমাজ-ব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থা মোটেই অক্ষুণ্ণ নয়, তার উপর পরম্পরের সহায়ত্বভূতিও যথেষ্ট অভাব। এই সমস্ত বাধা দূর করে মানুষের চেষ্টাকে সকল

করাই আমাদের বিরোধের প্রধান কর্তব্য।

চিত্র প্রকৃতি চাকশিল্পের অবনতি হয়েছে বলে অনেকে অনেক ছুঃখ করেন, 'সুরোপীয় নবযুগে' যে বিরাট শিল্পের উদ্ভব ও উন্নতি হয়েছিল বর্তমানে তার আদর্শ থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ইদানীং শিল্পকৌশলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং হাজার হাজার মাঝারী শক্তিশালী লোক শিল্পের নানা বিভাগে ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু বর্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে শিল্প যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কারণ কলাকৌশলের বতই উন্নতি হোক, শিল্পী সৃষ্টিতে প্রাণের প্রেরণার অভাব আমরা কদাচিৎ পাই। প্রাণের প্রেরণা আসবে কোথা থেকে, আমরা নিজের হাতেই সে পথ বে রুদ্ধ করেছি! জীবনে যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু বিরাট তার মধ্যেই আর্টের প্রেরণা আছে,— কিন্তু আমরা আজ সর্কৌণ্ডতার ও বড়তার অন্ধ উপাসক। আর্ট, সৃষ্টিরই নামান্তর এবং সৃষ্টিমাত্রই নূতন। কিন্তু হাজার হাজার কোশলী শিল্পীর মধ্যে কচিৎ দু-একজন হরত চিরনবীন, চির-স্থল্লর প্রাণের অভাব জীবনে একবার মাত্র উপলব্ধি করেন, বাকী সকলেই নিভীত গতাহুগতিক এবং পুরাতনের মোহে অন্ধ। প্রয়োজনের বাধা-পথে বা পুঁথির বাধা গতে এ প্রেরণা পাওয়া যায় না, জীবনের অকারণ পূলকের উৎস-সুখেই এর সন্ধান মেলে। কিন্তু সাধারণের এ সন্ধানে বাত্ম করবার মত আগ্রহও নেই সাহসও নেই।

স্বার্থসাধনের পাবাণ চাশিরে মাঝারি দল তার শ্রোত বদ্ধ করে দিয়েছে—স্বাধীন জীবন লাভের চেষ্টাই তাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

ঐক শিল্পী বা নবযুগের শিল্পীর দল বা সৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে দেশের নাজীর টান ছিল, প্রাণের সাঙ্ঘাত-যোগ ছিল। দেশের আগম পুরাণ, স্থবহান চিত্রা-ধারা ও তার অন্তরনিহিত আণটিকে তাঁরা রেখায় ও রংয়ে বা পাষাণে সৃষ্টিরে তুলেছেন এবং প্রাণের সঙ্গে সাঙ্ঘাত-যোগ ছিল বলেই দেশবাসীর কাছে তাঁদের হাতে-গড়া শিল্প মত্ত-স্থল্লরের প্রতিধা বলে পূজা পেয়েছে। শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা এইখানেই। ঐক শিল্প বা নব-যুগের শিল্প এখন সভ্যদেশের বাহুঘরে স্থান পেয়েছে। সহরের বৃক্কের উপর যাদের আসন ছিল, শত শত জনপদের বার্ষা আনন্দের ও পুজার সামগ্রী ছিল, আজ তারা স্তরের লড় কতালমাশির মধ্যে শুশীকৃত। তখনকার কালে দেশবাসীর মধ্যে মেলাদেশার যথেষ্ট স্থবিধা ছিল, তার কলে নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা একতা ছিল, কিন্তু বর্তমান সমাজে সে মিলন-ক্ষেত্রটি লোপ পেয়েছে। এখনকার সহর যেন লোকের মেলা, এখানে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ই নেই, মনের বিনিময় ও স্বপ্ন-কথা; সহর এখন অর্ধ-উপার্জনের স্থান; পরকে দাবিরে, পরের সুখের ঐশ কেড়ে আত্মপ্রোধান আত্মপ্রোষণ যাদের স্লামস্ত্র, জীবনের লক্ষ্য, তাদের মধ্যে সহায়তৃষ্টি, মনের মিল থাকবে কেমন করে? অর্থশালী মহাজন ও কলের মজুর হচ্ছে নেকড়ে

বাঘ ও ঘেণাবাক; এই বিপর্যায় বিরোধী অবস্থার উত্তরের মধ্যে সম্ভাব থাকা অসম্ভব। উত্তরের এক মাতৃভূমি থাকতেই পারে না, আর চির-দাসের মাতৃভূমিও নেই, সব জায়গাই তার পক্ষে সমান—মাতৃভূমি তার, যে স্বাধীন, যে আত্ম-বিদ্যাপী।

আমাদের শিল্প বায়ুমানার শিল্প, আমাদের সাহিত্য বিলাসীর সাহিত্য। এ সাহিত্যে, এ চিত্রে কর্মজীবনের কাব্য ভেদন ঘটে না, কর্মজীবনের সৃষ্টি ভেদন কোটে না। তার কারণ, শিল্পী কর্মজীবনের ব্যতীত ও চাকলা থেকে আপনাকে যথাসম্ভব দূরে রাখবার চেষ্টা করেন—তার এ শুচি-বায়ুয় ফলে তাঁর নিজের ত ক্ষতি হয়েছেই, বৈশ্ব ভাগ, শিল্পের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য নয়। কারক্রেমে প্রাণধারণের জন্তে যেহেতু রক্ত ও মনের স্বাধীনতা—বিক্রয় করে কল-কারখানায়, মাঠে, খনিতে বাধ্য হয়ে পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দ নেই স্বীকার করি, কিন্তু স্বাধীনভাবে মনের উপকারে কাজ-করাই যে যথেষ্ট আনন্দ আছে এবং এই আনন্দের প্রকাশই যে বথার্থ

কাব্য ও চিত্র, এ-কথা না-মানা চল না। কর্মক্ষেত্রে নরনারীর মিলন-সদৌ কাব্যে গান করবেন, চিত্রে রেখা-সম্পাতে ছুটিয়ে তুলবেন তাঁরা,—যাঁরা কর্মজীবনের দুঃখের সংঘাত ও দুঃখের আত্মদ প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন, নিজের হাতে সামাজিক জীবনের নুতন সৃষ্টি গড়ে তুলেছেন। এতদিন যে-সব চিত্র অঙ্কিত ও সৃষ্টি খোদিত হয়েছে, তাদের মধ্যে ভাবাবেগের প্রাচুর্য্যই বেশী, বলিষ্ঠ প্রাণের ছাপ পূর্য কম। পটের ছবি বা পাষাণের সৃষ্টি যদি পটকে, পাষাণকে অতিক্রম না করে, যদি প্রাণের আনন্দ ব্যক্ত না করে, তবে যে বার্থ পরিশ্রমে লাভ কি?

এ-সব কেবলমাত্র সেই সমাজে সম্ভব, যেখানে জীবন-যাত্রা সহজ সরল ও সুন্দর,—শিল্প যেখানে মাঝারি দলের বিলাসের বস্তু নয়, জন-সাধারণের আনন্দের সামগ্রী। এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরাগো ব্যবস্থা দূর করতে হবে এবং আমাদের কাম্য সামাজিক পরিবর্তন ঠিক সেই কাজটিই করতে চায়।

ঐপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম

হা-হাতাশের অঙ্ককারে নেইক আমার কেউ সাথী,
প্রেমের সাধন করছি কেবল কঁদে কঁদে দিনরাতি !
কাম-কামনার উর্জলোকে পুণ্য প্রেমের বাসভূমি,
সেখার আজো বাইনি আমি, মিছাই ফুলের গাল চুমি।

মিছাই কেবল গভীর রাতে আঁকড়ে বসি জ্যোৎস্নাকে,
জানিনে সে পাশার কিসে আলিঙ্গনের কোন্ ফাঁকে ।
এমন করে কত নিঃশব্দ কঁপে বেড়াইত মধ্যরাত্রে,
জানি গাছের সাতের ছায়া, জানি আশার মন জানে ।

জ্যোৎস্না রাতে গাছের নীচে পাড়িয়ে থাকে একলাটি,
আশার আশার রাত কাটানো, শেষে বোকা সব মাটি !—
এইটি আমার চিরদিনের জেনে শুনে ভুল করা,
এত যে ভুল করছি তবু প্রেমের আশার বুক ভরা ।
প্রেমের পরিচয়টি নিভি পাই গো প্রতি নিখালে,
তাইতো তাকে পাবার আশার আতুল গভীর বিশ্বাসে ।
কাম-কামনার ধাপে ধাপে উঠছি ধীরে প্রেম-লোকে,
ভয়-ভাবনার ধার ধারিনে, ভয় করিনে দুঃশোকে !

কাল আছে গো কাল আছে এই কালের ধূপ ও গুগুন্সে,
কোকিল কেবল পরাগ মাতার, মাতার নাকি বুলবুলে ।
দেহের রূপের সূধা যদি প্রেমের সূধা নাপি করে,
চাইনে তেমন মিলন আমি, জলবে অশ্রুতন অস্তরে ।
কিসের পিছে ছুটছি মিছে, পাইনি তো প্রেম এক ছিটে !
পাবার আশাই বাচ্ছে বেড়ে, জীবন কোথা হয় মিটে ।
প্রেমের পূজা চলবে তবু প্রাণের কুসুম-চন্দনে,
ভোগ-লালসার এই জীবনের কাটবে না দিন ক্রন্দনে ।

কালের শুধু নই পিরাসী ও প্রকৃতি হুমসরী !
আপন-ভোলা প্রেমের লোভে গান গাহি শো গুঞ্জরি !
বধন তোমার রূপের মাঝে প্লবক লভি এক কণা,
তখন ওগো তখন আমি এক নিমেষে উদ্ভব ।
এক পলকের সুখের সাক্ষার চন্দর-সারস্-বৃত্ত,
সেই কণিকের স্মৃতি কবে হবে জীবন-ব্যাপ্ত ।
হালুকা সুখে প্রাণ বাঁচে না, এই পাণ্ডুরা তো কাল-ভণে ;
তাই তো প্রেমের পাগল আমি যৌবনের এই কালন্দে ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কুকী

পার্বত্য ত্রিপুরায় ৭৪৪৭ জন কুকী আছে। তন্মধ্যে ৩৭৭৭ জন পুরুষ, অবশিষ্ট ৩৬৭০ স্ত্রী। ‘কুকী’ ইহাদিগের, জাতীয় ভাষার শব্দ নহে। স্বভাষার কুকীগণের জাতীয় নাম ‘ত্রিমেম’। বর্তমান সময়ে এক শ্রেণীর কুকী আপনাদিগকে সুছাই নামক এক পৃথক্ সম্ভারভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, উত্তরে প্রাচীন কাছাড় ও মেইতেই ভূমি, এবং দক্ষিণে আরাবান—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী পার্বত্য ভূমি কুকিজাতির আবাস-স্থান। ইহারা প্রধানতঃ ২৪ ভাগে বিভক্ত; যথা—

- ১। পাওতু বা পাইতু (পরটু)।
- ২। বংছের।
- ৩। বেলঠুট্।
- ৪। থাংলুয়া।
- ৫। লাইকং।
- ৬। বংখই।
- ৭। মিঝেল।
- ৮। নামতে।
- ৯। ছালা।
- ১০। অমড়ই।

১১। চোটলাং (চোটলাং ও কাটলেই। ত্রিপুররাজ্যের কুকিদিগের সহিত ইহাদিগের খুব কমই সম্পর্ক হইয়া থাকে। ‘কাটলেই’ শ্রেণী ত্রিপুরা ছেড়িয়া বাস করে।)

- ১২। থংয়ে।

১৩। বাইকেই।

১৪। চন্শেল।

১৫। বলতে।

১৬। বিয়েতে।

১৭। বালতে।

১৮। হ্রাং চস্।

১৯। রাংচিয়ে।

২০। ছাইলই।

২১। জংতে।

২২। পাটলেই।

২৩। বেতজু।

২৪। পাইতে।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ৫ সম্ভারদের কুকী ত্রিপুররাজ্যে বাস করিতেছে। কৈলাসহর বিভাগেই প্রধানতঃ এই রাজ্যের কুকীগণের বাস।

এই ২৪ শ্রেণীর ভাষা মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন নয়। প্রাথমিক ভাষান্তরিত মধ্যে যে পার্বত্য ইহাদের মধ্যেও তাহাই। কুকিদিগের আচার ব্যবহার ত্রিপুরাদিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোন কোন অংশে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদের শ্রেণী-সমূহের মধ্যে পরস্পর আচারব্যবহার সম্বন্ধে কোনরূপ পার্বত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা প্রায় বাবড়ীর পশুপক্ষীর মাংস খাইয়া থাকে এবং জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। ইহারা জীবনের অতিথি অস্বীকার করে, তবে পরকাল বা পুনর্জন্ম মানে না। কুকিদিগের সকল রকম ধর্ম্মাভিমানই

রোগশাস্তি প্রভৃতি ঐহিক কলের
প্রত্যাশার হইয়া থাকে। ইহারা মনে করে
যে গবর, ছাগী, কুকুট, প্রভৃতি বলিদান
করিয়া পূজা করিলে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ
বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।
ইহাদের কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট স্থান
নাই। দুই তিন শ্রেণী এক পর্শতে কিংবা
একশ্রেণী দুই তিন পর্শতে বাস করিয়া
থাকে।

শিক্ষা। কুকিগণ প্রায়শঃই অশিক্ষিত,
তবে ত্রিপুররাজ্যের কুকিগণ ক্রমশঃ শিক্ষা
লাভ করিতেছে। কুকি বালকগণের
শিক্ষার মন্ত্র সম্প্রতি এ রাজ্যে কয়েকটি
পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

রাজ্য। তিন জন কুকি সর্দার
ত্রিপুররাজ্যদ্বারা হইতে রাজ্য উপাধি
লাভ করিয়াছে। কুকি-রাজ্যের বসভাষার
আলাপ করিতে সমর্থ।

ধর্ম—পাথিয়েন নামক এক ব্যক্তি
সর্বপ্রথম কুকিদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচার
করে। পাথিয়েন প্রচার করিল—“একজন
এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভিন্ন অস্ত্র
অনেক আরাধ্য দেবতা আছেন”। পাথিয়েন
সামাজিক নিয়মেরও প্রবর্তন করে।

পরে তার্পা নামক আর এক ব্যক্তি
প্রথম ধর্মপ্রচারকের ধর্মমত, কার্য-
প্রণালী স্বেচ্ছানীতি বঙ্গার রাধারা পাথিয়েনের
ধর্মের কিছু সংস্কার সাধন করে, সঙ্গে
সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক নূতন নূতন
নিয়মেরও প্রবর্তন করে।

কুকিদিগের ধর্ম তার্পা দ্বারা সংস্কৃত
হইলেও ব্রাহ্মণ একতাব্যবহি চলিতেছে।

কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে দ্বাংরা একটু আধটু
বাদালা ভাষা শিখিয়াছে তাহাদের মধ্যে
নিম্ন নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারে কিকিং
পরিবর্তন ঘটতেছে। হিন্দুগণ যেমন ‘হরি’
‘নারায়ণ’ প্রভৃতি বলিয়া ‘ভগবান্কে ডাকিয়া
থাকে, ইহারাও সেইরূপ তাহাকে ‘লাটা’
বলিয়া সম্বোধন করে।

কুকিগণ যখন তাহাদের আদি জন্মভূমি
পরিভ্রমণ করিয়া ‘মায়লঙ’ পর্শতে বাস
করিতে আরম্ভ করে সেই সময় পাথিয়েন
তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম প্রচার করে। সে
সাহসী বোজা বলশালী ও পরোপকারী
ছিল। পাথিয়েন নিজে না খাইয়া বাড়ীর
সকলকে আহার করাইত। কাহারও পীড়া
হইলে আহার নিষেধ ত্যাগ করিয়া তাহার
পরিচর্যা নিরন্তর থাকিত। কাহারও কোন
খাওয়ার অভাব হইলে যে কোন উপায়ে
আহার্য সংগ্রহ করিয়া দিত। কুকিরা
কাজেই তাহাকে পরমেশ্বরের জায় ভক্তি
প্রদা করিত। পাথিয়েন প্রথম ধর্ম প্রবর্তন
করিয়াছিল বলিয়া কুকিরা তাহাদের দেব-
দেবীর নামের পরে পাথিয়েনের নাম যোগ
করিয়া দিত।

আরাধ্য দেবতা

১। কুকিদিগের আরাধ্য দেবতাদিগের
মধ্যে ‘লোচরী পাথিয়েন’ একটি। ‘লোচরী
দেবতার’ সপ্তসুত বলিয়া কুকিদের বিশ্বাস।
ঐ দেবতার অস্ত্র কোন পরিচর পাওয়া
যায় না। ইহার পূজা বাড়ীতেই হইয়া
থাকে। অবস্থাচলসারে লোক এই পূজার
হংস, মোরগ, বরাহ, মহিষ, গভীর ও গবর

বলি দিয়া থাকে। এই পূজার কোনরূপ ঐতিমূর্ত্তি নির্দিষ্ট হয় না, কেবল কাঁচা বাঁশ দিয়া দুইটা নিশান উচ্চমুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

২। ‘তুই পাখিরেন’—এই পূজা মলের নিকট কোন নির্দিষ্ট স্থানে অস্থাপিত হয়। চাউল, সাধা রঙের মুরগি, সাধা রঙের ‘পার্সা’ হংস এমন কি পারাবত পর্যন্ত এই পূজার বলি দেওয়া হয়। কুকি ভাষায় ‘তুই’ শব্দে মল বুঝায়। এই পূজাপদ্ধতিতে আমাদের গঙ্গাপূজার সামান্ত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। ‘ধাপিতে পাখিরেন’—এই পূজারও কোন ঐতিমূর্ত্তি পঠিত হয় না তবে অবহাঙ্গুসারে বলিধানের বিধি আছে—‘ধাপিতে’ শব্দের অর্থ লক্ষ্মী বা লক্ষ্মী। এই দেবী লক্ষ্মীব্রতপা। ইনি কৃষিকার্যের সৃষ্টিকর্তা, পালারিত্রী, গৃহকর্তা ও গৃহলক্ষ্মী। কুকিরা ‘জুন্’ করঃর পূর্বে ও পরে ধাপিতে পাখিরেনের পূজা করিয়া থাকে।

৪। ‘থুথ পাখিরেন’—বাড়ীর সমস্ত লোক একত্র হইয়া এই পূজার অস্থাপন করিয়া থাকে। বাড়ীর ভিতর একটা নির্দিষ্ট স্থানে এই পূজা হয় এবং কুকিরা ছাগ, বরাহ, হংস, পারাবত, মহিষ, গণ্ডার ও গবয় বলি দিয়া থাকে। কুকিদের নিকট এই পূজাটা বড়ই আনোদয়নক। ইহারা জীপুস্ব পূজাস্থলে একত্র হইয়া মত্ত মাংসাদি ভোজন এবং নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে। থুথ পাখিরেন পূজার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। বৎসরের মধ্যে যে কোন এক সময়ে এই পূজার অস্থাপন হইলেই হইল।

কুকিদের নিকট এই পূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন সহজর পাওয়া যায় না। দুই একজন কুঁকা ইহাকে ‘কেত পূজা’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত ‘কেত’ পূজার কোনই সংশ্রব দেখা যায় না। পূজার কার্যপ্রণালী কতকটা কাগী পূজার অনুরূপ। এই পূজার কোন ঐতিমূর্ত্তি থাকে না। কাঁচা বাঁশের নিশানে মল ইত্যাদি তুলাইয়া কাঁচা বাঁশ সংযোগে উচ্চ মুখে উড়াইয়া দেয়। দুইদিন পর্যন্ত ‘থুথ পাখিরেনের’ পূজা হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় দিবসে এই পূজা শেষ হয়। পূজার দুই দিনের মধ্যে জ্রীলোকদিগের কেশরচনা (চুল আঁচড়ান) নিষিদ্ধ। পরিধানের কিংবা ব্যবহারের বস্ত্রাদি এবং ধাত্যাদি ক্রিয়াক্রান্ত দ্রব্য যৌত্রে দেওয়া নিষিদ্ধ। এই সময় কেহ সূতা কাটিতে কিংবা বস্ত্র বধন করিতে পারিবে না। অস্ত্র বাড়ীর লোক পূজা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে পূজাবাড়ীর লোকও অস্ত্র বাড়ীতে বাইতে পারে না। যদি কোন অনিবার্য কারণে পূজাবাড়ীর লোক অস্ত্র বাড়ীতে আসে তাহা হইলে তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হয়। অবহাঙ্গুসারে টাকা পরস্যা, আহাৰ্য্য দ্রব্য এমন কি মত্ত পর্যন্তও জরিমানা স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির উপর পূজার ভার প্রাপ্ত থাকে, তাহার নিকটেই জরিমানা দাখিল করিতে হয়। সাধারণতঃ উজীর বা মোক্তারই এই ভার পাইয়া থাকে।

৫। ‘শিবপূজা’—কুকিদিগের মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার পূজাকে ইহারা ‘শিব

পূজা—এই আখ্যা প্রধান করিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুগণের শিবপূজার সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। এই পূজা কুকিদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত করিয়াছে। ইহাতে খারও বধেই হইয়া থাকে।

জন্ম কাটার পূর্বে পল্লীবাসী জন সাধারণ মিলিত হইয়া এই পূজার আয়োজন করিয়া থাকে। গরুর বলি এই পূজার প্রধান উপকরণ।

এই বলির গরুটাকে অতি নির্দয়ভাবে বিনষ্ট করা হয়।

বধা গবরের সন্ধ্যাকে চুপের কোঁটা দিয়া পূজার সমবেত কুকিগণ এক একটা চুপের কোঁটাকে নিজ নিজ লক্ষ্য বলিয়া মনোনীত করে। পরে পূজান্তে কিয়দূর হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহার গবরের ঘেঁষে নিজ নিজ বস্ত্র নিক্ষেপ করে। বাহার বস্ত্র লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হয় সে ভাগ্যবান ও বাহার বস্ত্র লক্ষ্যভেদে কঠিতে পারে না সে দুর্ভাগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। লক্ষ্যভেদে কার্য শেষ হইলে অতি নির্দয়ভাবে গরুটাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার মাংস সঞ্চিত ব্যক্তিগণ ভোজন করিয়া থাকে।

এতদ্বিধ কুকিদের অনেক ছোট ছোট পূজা আছে। এতোক পূজার কুকিরা নিজ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন মন্তোচ্চারণ করিয়া থাকে। এই মন্তোচ্চারণ তাহার কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। কুকিদিগের একটা বাস্তব্য এই— তাহার ঈর্ষা হইলে কোন ঔষধ ব্যবহার করে না, রোগ-মুক্তির জন্য নানাবিধ পূজা

করে এবং যোগ, ছাগ, বরাহ, পাখীসহ প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। ইহাতেই তাহার রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

এক শ্রেণীর কুকি কোন নির্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজা করে না।

জন্মোৎসবাদি

সন্তান জন্ম হইলে কুকিদিগের অশৌচ গ্রহণের বিধি নাই। ইহার জাত-সন্তানের কল্যাণের জন্য কোন মাহুলিক ক্রিয়ার আয়োজন করে না।

অবস্থান্তেবে দশ দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের পরামর্শ মতে সন্তানের নাম-করণ হইয়া থাকে। কুকিগণ সেইদিন আত্মীয়-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এবং সকলে সমবেত হইয়া একসঙ্গে শিকারে গমন করে, প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ত্রী পুরুষ একত্র মস্ত মাংস ভোজন করিয়া থাকে।

রাহা, উল্লীর, মোক্তার, প্রভৃতি অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সন্তান হইলে রণবাহ ও নৃত্য-গীতাদি হইয়া থাকে।

বিবাহ

কুকিদের বিবাহ দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বিবাহ অতিভাবক ও পিতা মাতার নির্ধারনে ও উদ্ভোগে হইয়া থাকে। অপর প্রকার বিবাহে পাত্র পাত্রী উভয়ের গোপনে আলোচনা করিয়া পরস্পরের মনোনয়ন স্থির হইলে তাহার প্রকৃতিস্বরে তাহা আপন আপন অতিভাবকের গোচর করে; অতঃপর অতিভাবকগণ একত্র হইয়া বিবাহ স্থির

করেন। বিবাহ কস্তার পিতালগ্নেই হইয়া থাকে। কুর্কিদের বিবাহ মাঝে বর-পক্ষ হইতে পূর্ণ দিবস প্রথা প্রচলিত আছে। রাজকস্তার বিবাহ কালেও পূর্ণগ্রহণ করা হইয়া থাকে, পরন্তু এক্ষেত্রে পণের টাকা অধিক পরিমাণেই দিতে হয়। বিবাহের পূর্ণ ২০ হইতে ১০০ পর্যন্ত দেওয়ার নিয়ম আছে। পাঠের পক্ষ হইতে যদি বিবাহের দিন কোন কারণে পণের টাকা দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে পাড়-পক্ষ ৫১৭ বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিলেও বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের পর বেদীন বর-কস্তা এক পথায় শয়ন করিবে সেইদিন বরপক্ষ হইতে কস্তাকে নগদ টাকা অলঙ্কার প্রভৃতি যুগ্মান্ব জব্য যৌতুক দিতেই হইবে। বরপক্ষকে ইহা হইতে কোনওরূপে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। কস্তা বিবাহের পর যখন শওরবাড়ী যায়, তখন স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত ঘাইতে পারে না। শওরবাড়ী ঘাইবার সময় কস্তার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে স্বকীয় অবস্থানস্থানে (কস্তার সহিত) বস্ত্র-শয্যানি দিতে হয়। যে পিতামাতা যত বেশীদিন কস্তার বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের হইতে যোগাযোগে পারিবে, বৈবাহিকজীবনের নিকট তাহার তত বেশী সম্মান হইবে। বৈবাহিক সম্বন্ধে কুর্কিদের পক্ষে ইহা অতি সম্মানের বিষয়।

কুর্কিদের মধ্যে কোন ক্রমেই ১০ বৎসরের পূর্বে কিংবা ২৫.৩০ বৎসর বয়সের পর কস্তার বিবাহ হয় না। সচরাচর

কস্তা প্রাপ্তবয়স্ক এবং কুমকার্য করিতে সমর্থ হইলেই বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পর কোন কারণবশতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক ইচ্ছার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে তাহাকে অস্বাভাবিক স্বরূপে অপর পক্ষকে নগদ ১৬ টাকা দিয়া বিবাহ-সুস্থল হইতে মুক্তি লইতে হইবে। এইরূপে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে পর কস্তার স্থানান্তরে বিবাহ হইলে তাহাতে সমান প্রতিবন্ধক হয় না।

কুর্কিদের বিবাহের কোন বিশেষ দিন, মাস, বায় প্রভৃতি কিছুই নাই। কস্তার বয়স অধিক হইলেও উভয়ের মনোমরম-প্রণয় বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাঙ্গিদের বিবাহে কোনরূপ যন্ত্রপাতি করিতে হয় না। কস্তার বাড়ীতে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন মিলিত হইয়া বর ও কস্তাকে সভাস্থলে আনয়ন করে, অতঃপর বর কস্তাকে মুখোমুখী করিয়া বসাইয়া উভয়ের মধ্যস্থলে একটি মসের কলসী রাখিয়া দেয়। ইহার পর যখন বর-কস্তা দুইটি মসের সাহায্যে মস্তপান করিতে আরম্ভ করে তখন কস্তার পিতালগ্নের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্সাপেক্ষা প্রাচীন সে সেখানে উপস্থিত হইয়া বর-কস্তার দুই গুচ্ছ কেশ একত্র বাঁধিয়া দেয় এবং সম্পত্তির মস্তপান শেষ হইবার পূর্বেই বর বা কস্তার সমবয়সকে কেহ আশিয়া ঐ বন্ধন মোচন করে এবং তাহাঙ্গিদের সঙ্গে বসিয়া মস্ত মাংস খাইয়া থাকে। আহাঙ্গিদের

ঐ দিনই জাহাঙ্গিরের বাসরশালা হয়। যদি কোন কারণে বৌদ্ধাদির অভাব হয় তাহা হইলে ২১ দিন পরেও বাসরশালা হইতে পারে।

সমাজ

কুকিদিগের মধ্যে যে কয়েকটি শ্রেণী আছে তাহাদের মধ্যে জাহাঙ্গিরি বিধায় কোনও বাধা নাই; সকলেই একত্র ও একপায়ে পান ভোজন করিতে পারে। বিবাহ বিবরে শ্রেণী বিশেষের আপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ এক শ্রেণীর নাম 'ঠানু' (১)। ইহারা রাজার জাতি। আর এক শ্রেণীর নাম 'চেঙাই', ইহারা কুকিদের পূৰ্বতন রাজবংশীর ছিল। ইহাদের সহিত ঠানুদের বিবাহাদি হইতে পারে। বৰ্তমান কালে এই বংশের অধস্তন পুরুষের নাম লালবুঙ, চোমা বাহাদুর। তৃতীয় শ্রেণীর নাম 'পালিয়েন'। ইহারাও কুকিদিগের মধ্যে সম্মানিত বটে তবে রাজারা প্রাচাই ইহাদিগের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে হুম্মরী কত্ৰা থাকিলে রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। চতুর্থ শ্রেণীর নাম রিভুঙ,—এই বংশের পূৰ্বতন পুরুষ (পিতা) রাজা ছিলেন। কিন্তু মাতা সাধারণ ব্যক্তির ঘর হইতে গৃহীত। পঞ্চমশ্রেণী জায়েঙ নামে পরিচিত। ষষ্ঠশ্রেণীর নাম চেইহাঙ, ইহাদের সম্মান রিভুঙদিগের অপেক্ষা কিছু কম।

সপ্তমশ্রেণী সাধারণ কুকী। ইহারা সকলেই এক ধর্মাবলম্বী; ধর্ম ও রীতি-

নীতিতে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

কুকিদের প্রত্যেক বাড়ীতে একজন উজীর কি মোক্তার থাকে; ইহারা প্রধান-স্বরূপ হইয়া উক্ত বাড়ীর বিচার প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। ইহাদের বিচারাদীন থাকিয়া ইহাদের পরামর্শমতেই বাড়ীর সকলে কাজ কর্তব্য করিয়া থাকে। একজন রাজার দশ বাহজন মোক্তার থাকে। একজনের অধিক উজীর থাকিতেও বাধা নাই।

এক রাজার জিন্দার দশ বাহ থানা বাড়ী থাকে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন রাজার বংশ লোপ পায়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীই রাজা পাইয়া থাকে।

কুকি রাজাদের পুত্রই সাধারণতঃ উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতা, ভগদাবে ভ্রাতৃপুত্র, তাহাও না থাকিলে ভাগিনের উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য পায়। কুকিদের মধ্যে গোমাপুত্র গ্রহণের পদ্ধতি অভ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই।

অধুনা কৈলাসহরের এলাকার তিন জন কুকি রাজা এবং একজন কুকি সর্দার আছে। রাজাদের নাম 'মুরচুলা রাজা' 'লালচুখামা রাজা বাহাদুর' ও 'বানকাম্পুই' রাজার পুত্র 'গুরচাইলিএন'। সর্দারের নাম 'লালবুঙচোমা' বাহাদুর। এই চারিজনই অধীনে প্রায় ৪০০ ঘর অধিবাসী। এক এক ঘরে ১২ হইতে ৩০ জন বাস করে।

রাজাদিগের মধ্যে 'মুরচুলা রাজা' অধীনে জন-সংখ্যা অধিক, কিন্তু লালনাই

ও.রচাইলিএনের আরও অধিক। সুবচুলা রাজার অধীনে ১৭৫ হইতে ২০০ বর অধিবাসী লালচুকমার অধীনে ১৩০ বর এবং বানকাম্পুইএর অধীনে ১৭৫ বর।

রাজা ও সর্দারগণের কোন নির্দিষ্ট আয় নাই। সাধারণ কুকীদের বিবাহে ইহার পনের টাকা অংশ পায়। বাহারা কোন কারণবশতঃ রাজাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে তাহাদের বিবাহের পনের টাকাও পাইয়া থাকে। কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে ইহার তাহার মালিক হয়। কুকীদের মধ্যে বিধবার কত্তা সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। যতদিন ঐ কত্তা বিবাহিত না হয় ততদিন রাজা তাহাকে প্রতিপালন করে। সম্পত্তি বাহা থাকে তাহা রাজাই গ্রহণ করে।

সাধারণতঃ কুকী বালিকার বিবাহে পনের টাকা বাহা পাওয়া যায় তাহা পিতা মাতা ছোঠা, বুড়া, মাতুল ও রাজা এই ছয়জনের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। স্ত্রীতা কখনও পনের টাকার অধিকারী হইতে পারে না।

কত্তা বিধবা হইলে তাহার পুনরীকর বিবাহ হইতে পারে। প্রথম স্বামীর সম্পত্তি থাকিলে (পুনরীকর বিবাহ হইলেও) সে তাহার অধিকারিণী হইবে। যদি প্রথম বিবাহের পুত্র থাকে, তাহা হইলে সেই পুত্রই সম্পত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু কত্তা থাকিলে সম্পত্তি পায় না। বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে কোনই অধিকারী থাকে না।

কুকীদের মধ্যে চোর, বদমায়ের ও মিথ্যাবাদীর সংখ্যা নিতান্ত কম। রাজাই সাধারণতঃ কুকীদের অপরাধাধার বিচার করিয়া থাকে। রাজার বাড়ী ঘুরবর্তী হইলে স্যামাত্র সামাত্র বিচার বাড়ীর মোক্তার অথবা উজার সম্পন্ন করে, এবং ঘটনাক্রমে রাজার নিকট দাখিল করে।

পুঞ্জের প্রথা ছিল যে, কোন বিবাহিত রমণী অত্যন্ত হইলে স্ত্রী নারী ও লম্পট পুরুষকে বিচারার্থ সভার আনয়ন করা হইত, পরে উভয়কে একত্র বণ্ডায়মান করা হইত। স্ত্রী রমণীর স্বামীকে বিদ্যা তাহার কর্ণমূল ছেদন করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে ছেত্, নামক অস্ত্রদ্বারা লম্পট পুরুষটিকে বধ করা হইত। বর্তমান লালচুক্‌খামা রাজা বাহাদুর এই লোমহর্ষণ প্রথা বন্ধ করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, হঠ পুরুষ তাহার পুরুষাত্মকমে রাজার গোলান হইয়া থাকিবে। তবে ছুটা জীর এক কর্ণ কাটিয়া ফেলা হইবে। ইহার স্বামী ইচ্ছা করিলে জীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। তদন্ত স্বামীকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। কুকীদের মধ্যে স্ত্রী রমণী অত্যন্ত নিম্নর পাত। পরম রূপবতী হইলেও ইহাকে কেহ গ্রহণ করে না। ছুটা পুরুষকেও কেহ গ্রহণ করে না; সেও সাধারণের ব্রূণাত্মন হইয়া থাকে।

কেহ কোন অবিবাহিত কত্তার সহিত কত্তার সম্বন্ধক্রমে সম্বন্ধ হইলে উভয়কে

পরিণয়স্থলে আবদ্ধ হইতে হয়। একপ স্থলে কত্ৰা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে পুরুষের কর্ণমূল ছেদন করাইয়া তাহাকে রাজার দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়। আর কত্ৰা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে দ্বিষ্ট পুরুষের অরহাঙ্গস্বারে ১০ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত অরিমানা হয় এবং তাহাকে মস্ত মাংসাধি উপচারে ভোজন করাইয়া পঞ্চাইতের সন্তোষ বিধান করিতে হয়।

বারবনিতা

কুকিদিগের মধ্যে ব্যাঘ্রনা আছে, কিন্তু ব্যাঘ্রনাগণ পরীক্ষণে স্থান পায় না; পক্ষীর বহির্ভাগে তাহাদিগের মস্ত পৃথক বাসস্থান নিরূপিত হয়।

অবিবাহিত বা বিপত্নীক যুবক কিংবা শ্রৌত ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ কিংবা বিবাহিত যুবক) বেস্ত্রাণে গমন করিলে সে সমাজে নিম্ননীর ও দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

মোক্তার বা উজীর

কুকি-সমাজে জাতিহিসাবে মোক্তার বা উজীর নিযুক্ত হয় না। বাড়ীর মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজা মোক্তার বা উজীর নিযুক্ত করিয়া থাকে। তবে এই নির্কাচনে বাড়ীর লোকদিগের সম্মতিও গ্রহণ করিতে হয়।

রাজস্ব নিবন্ধন যে অর্থ বাড়ী হইতে মোক্তারগণ গ্রহণ করে, তাহা তাহার রাজার নিকট পাঠাইয়া থাকে। রাজা নিজের ইচ্ছাঙ্গুসারে ইহার কিয়দংশ মোক্তার-দিগকে প্রদান করে।

পুত্রোহিত—কুকিদিগের মধ্যে কোন জাতি পুত্রোহিত (পুত্রক) হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই; যিনি পুত্রার কার্য শিক্ষা করেন তিনিই পুত্রা করিতে পারেন। বিশেষতঃ নিজের কর্তব্য পুত্রা মিলে করিতে পারিলে তাহাতেও ক্ষতি নাই। অনেক বাড়ীতে মোক্তারের প্রতিই পুত্রার ভার স্তম্ভ হয় এবং মোক্তারই পৌরোহিত্য ইত্যাদি করিয়া থাকে।

পর্কদিন—কুকিদিগের কোন পর্ক নাই। স্মৃত্তাং নৃত্য গীতাদিরও কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। বাড়ীর মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি বস্ত্র মস্ত অর্থাৎ বস্ত্রাহ, শশক, গব্ব, গুণ্ডার, মহিব, হস্তী, হরিণ ইত্যাদি শিকার করিয়া আনে, তবে সে বাড়ী প্রবেশ করিবা মাত্রই বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ একত্রে হইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকে; ‘স্তম্ভ’ ‘রশেম’ ‘চোল’ ‘পারভেস্ত’ ‘হারবু’ প্রভৃতি বাজ বাদ্যহিঁতে থাকে এবং সকলে একত্রে সমবেত হইয়া মস্ত মাংস প্রভৃতি ভোজন করে। বৃদ্ধ অস্বাস্তে কেহ গৃহপ্রত্যাপ্ত হইলেও ইহার এইরূপ নৃত্যগীতাদি করিয়া মস্ত মাংস ভোজন করে।

আমোদ-প্রমোদ

ইহাদের আমোদ প্রমোদের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। অবসর পাইলেই বিশেষতঃ ভোজ উপলক্ষে ইহার নৃত্যগীত বাজাদির দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। নৃত্য করিবার উপযোগী ইহাদের কোন স্বতন্ত্র পৌরোহিত্য নাই।

সম্প্রদায়িক নৃত্য গীতাদি করিতে হইলে পোষাক সামান্তরূপে পরিবর্তন করিয়া লয়। গান করিবার সময় কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহার তাহারও গুণগ্রাম গাইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত কুকিদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

বাস্তবমূল্য

৮খানি বীশ ও বেত সংযোগে ইহার লাউ দিয়া এক প্রকার বাস্তবমূল্য প্রস্তুত করে। ইহার নাম 'রশেম'। কুকিদিগের যত প্রকার বাস্তবমূল্য আছে তন্মধ্যে ইহার শব্দই অতি মধুর।

বড় ঠাঁসরের মত বাস্তবমূল্যকে ইহার 'পঙ', 'গঙ' বা 'দারপুঙঙ' বলে। এই বস্তু ইহাদের নিজেদের তৈয়ারী, কোন স্থান হইতে কিনিয়া আনে না। ইহার দৈর্ঘ্য ১২/২ মাইল পর্যন্ত যায়। 'দারভেঙঙ' বাঙ্গালী কাঁসীর মত।

'দাররিজু'—গঙের মত কিন্তু আকারে ছোট।

যুদ্ধ-সামগ্রী

কুকিদিগের আর সকলেরই বন্দুক আছে, কুকিদের অপর যুদ্ধাস্ত্র চেম, টাকুয়াল বা, চাকলা (চেম) ভীর (কুই বীশ দ্বারা তৈয়ারী)। ভীর একটা লোহার কলক। এতদ্বির আরও কয়েকটা অস্ত্র আছে, সেগুলির নাম—চিলাই (বন্দুক), আদাং আবই চেমতে, চেমতে লুজুম, হ্রেই (কুড়াল), ছাইজিরকুওই ('অল্প) ইত্যাদি।

কুকিগণ সাহসী, পরিশ্রমী ও দৃঢ়লব্ধ।

ইহার এক প্রকার সর্বভুক্ত। আর সমস্ত পশুপক্ষীর মাংসই ইহাদের ভক্ষ্য, শরীর-প-আতিও কুকিদিগের প্রিয় খাদ্য। ত্রিপুরা-রাজ্যের কুকিদের এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে। একটা কুকুরকে দারিয়া তাহার উদর মধ্যে কিছু চাল প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেই কুকুরের দেহে অগ্নিতে পড় করে, সেই পড় কুকুরের উদর-মধ্যস্থ অগ্নি তাহার পিষ্টক রূপে খাইয়া থাকে। কুকিগণ অতিশয় মত্তপায়ী। পল্লীর স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া ইহার মত্তপান করে। জুই কাটার পরে ইহার প্রায় দুই মাসকাল মত্তপানাদি করিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া থাকে।

সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বর্ণের ভাষ্যতম ব্যতীত চক্ষু নালিকা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'ভিন্নকটি হৈ শোকঃ।' বেশ কাল পায় ভেঙ্গে রক্তিরও পরিবর্তন ঘটে। স্ত্রীলোকের কোমর মোটা অথচ প্রশস্ত ও কর্ণের ছিন্ন বড় হইলে কুকিরা তাহাকে স্নান্যবী বলিয়া থাকে। বাহার কর্ণের ছিন্ন বড় বড় সে তত স্নান্যবী। এই কারণে বাঁশের চোকা দিয়া কুকি-রমণী কাণের ছিন্ন বড় করিয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্বে কুকিরা গৃহমধ্যে স্ত্রী পুরুষ উলঙ্গাবস্থায় থাকিত, উলঙ্গ হইয়া স্নানাহার করিত। ইহাতে তাহাদের কোন রূপ নিন্দা বা লজ্জার কারণ নাই। রাজ্যও অনেক সময়ে গৃহভ্রাত্তরে নগ্নাবস্থায়ই থাকিত। অবসর মত অথবা কোন অন্ত জাতীয় লোক গৃহে প্রবেশ করিলে স্ত্রী-

লোকেরা এক হাত প্রহু একথানা বস্ত্র পরিধান করিত। পুরুষেরা একটা মোটা চাধর গারে দিত। এই কারণে না জানাইরা ঘরে প্রবেশ করিলে কুকিয়াতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত।

মৃত্যু

কুকিদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা অমাত্রদিক্‌ভাবে তাহার ঔর্ধ্বেমুখিক কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অশোচ-প্রহণের প্রথা ইহাধিগের মধ্যে নাই। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির স্বর্গ-লাভার্থ ইহারা আত্মীয় স্বজন সহ মিলিত হইয়া সমস্ত লোক মস্তপান ও মাংসাদি-ভোজন করে। মৃত দেহ ঘরে রাখিয়াই ভোজনব্যাপারের অহুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতঃপর বেহানে মৃত-ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে তরিকটবর্তী কোন এক-স্থানে একটা মাচা তৈয়ারী করিয়া রাখে এবং মৃত ব্যক্তি আহায করিবে এই বিশ্বাসে মাচার উপর মৃতদেহের নিকট মস্ত মাংসাদি নিত্যই রাখিয়া দেয়। কুকিরা মৃতদেহ ৫ দিন হইতে ২০ দিন পর্যন্ত ঘরে রাখে এবং প্রত্যহ খাড় সামগ্রী দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বত অধিক দিন মৃতদেহ ঘরে রাখিয়া এইরূপে আহায্য দিতে পারিবে, কুকি সমাজে তাহার সম্মান ভূত অধিক। সামর্থ্যহীনারে লোকে অন্নদিন বা অধিক-দিন মৃতদেহ বাড়ীতে রাখিয়া থাকে। অবস্থারূপে এইরূপে ঘরে রাখিবার পর তাহার মৃতদেহ কবরে সমাহিত করিয়া থাকে। কবরের স্থান পরিকৃত ও পরিচ্ছন্ন

এবং অত্যন্ত গভীর হওয়া আবশ্যক এক-জন পূর্ণাবয়ব মনুষ্য কবরের ভিত্তি খনিত কর্তে প্রবেশ করিয়া হস্ত উল্টে উত্তোলন করিলে বাহ্যতে উপর হইতে দেখা না যায় এইরূপ গভীর করিয়া কবর খননের ব্যবস্থা ইহারা পছন্দ করে।

মৃতদেহ কবরস্থ করিবার পর মৃতের ভ্রাতৃ আর আহায্য প্রদানের নিয়ম নাই। ইহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি নাই। কবর দিবারও কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। কোন মস্তস্ত্রেরও ইহারা ধার ধারে না। কোন পুণ্যবান বা পাপীয় অপমৃত্যু হইলে উহারা তাহার উর্দ্ধগতির ভ্রাতৃ মাত্র পানভোজন করিয়া থাকে। হিংস্র ভক্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অথবা অগ্নিদগ্ধ হইয়া কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরের যে অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ঘরে আনিয়া পুরোঁক্সিধিত নিয়ম বজায় রাখিয়া কবর দেয়। মৃত ব্যক্তিকে কবর দিবার আরও এক প্রকার প্রথা আছে। রাজা, উজীর, মোক্তার অথবা ভ্রাতৃ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ কাঠ নির্মিত বাস্তব্য ভিত্তর নদাবস্থার প্রবেশ করাইয়া ঘরের কোন স্থানে মাচা পাতিয়া তাহার উপর মাটির বিছানা করিয়া সবিশেষ যত্নে অগ্নি জ্বালাইয়া বাসন্তী এমন ভাবে কুলাইয়া রাখে যে তাহাতে অগ্নিদ্বারা বাসন্তীও নষ্ট হয় না এবং মৃতশরীর হইতে দুর্গন্ধও বাহির হয় না। এইরূপে তিনমাস অর্থাৎ ২০ দিন পর্যন্ত রাখিয়া থাকে এবং পুরোঁক্স নিয়মে আত্মীয় স্বজন সমস্তব্যাহারে ভোজনাদি করিয়া শেষে মহা সমারোহের সহিত মৃত-

বেহীতকে কবরস্থ করে। মৃতদেহ ঘরে
থাকিতেও ঐ ঘরে বিবাহাদি সামলিক
কাৰ্য্য হইতে কোন বাধা নাই।

মৃতদেহ সম্বন্ধিত করিবার সময়
সামর্থ্যাভুসারে তৎসঙ্গে বন্ধুক, ধা, কলা,
নুতন বস্ত্র, ভাত-তরকারী, মস্ত্র, মাংস
ঐভূতি নিত্য ব্যবহারের জিনিষ ও কঙক-
গুলি টাকা অথবা কয়েকটা পরশা পর্য্যন্তও
কবরের মধ্যে দিয়া থাকে।

দ্রোলোকের মৃত্যু হইলেও ঐরূপ করিয়া
তাঁহাদের সঙ্গে মৃত্যু-কাটার চরকা, সর্সনা
ব্যবহারের জিনিষ, কাপড়, বেঘ, (অর্থাৎ
পইছা) মস্ত্র, মাংস ইত্যাদি সঙ্গে দিয়া
কবর দিয়া থাকে। এই প্রথা মাত্র রাজা-
দিগের ক্ষত। অপরে এই নিয়ম প্রতিপালন
করিতে না পারিলেও তাঁহাদের কোন

অপমান নাই। রাজা কিংবা অন্ত
অবস্থাপন্ন লোকের অর্থাভাব, লোকভাব,
স্থান পরিবর্তন, ঐভূতি কোন আকস্মিক
ঘটনা উপস্থিত হইলে মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ
বাক্সে পুরিয়া মৃতদেহকে কবর বেওয়া
হয়। তাহাতেও তাঁহাদের সম্মানের কোন-
রূপ হ্রাস বা পাতিত্যের কারণ নাই।

মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থান

যত প্রকার পণ্ড পক্ষীর কন্ডাল রাখা
যায় ততই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন
হয়। পূর্বেকালে কোনও কুস্তিরাজা বা
সর্দারের মৃত্যু হইলে বিদেশীর লোকগণ
জন্মে ঐ রাজা বা সর্দারের সমাধির নিকটবর্তী
স্থানেও গমন করিত না।

ঐকমূল্যচরণ বিভাভূষণ।

কুশিয়ার কবিতা

ভোরের বেলা

(কং)

একটুকু উৎখল,

একটা কি কিস্কাশ,

কার মুদ্র নিখাস।

কার নিম্ন ছুটল।

হিম-হাওয়া বিলুপ্ত

হুঁছিল নিউরে

উঠল সে নিউরে

নিউলির স্পর্শে;

ভেদ করে আব্দুস

বুটবুটে হামির

শান-মেওরা শাত তীর

নিঃগাড় ছুটল।

বোল্ বলে বুলবুল,

আর পাবী ম্যার শিস্,

চন্মনে চৌমিশ

ভরপুর হর্ষে।

সঙ্গিনী সাজির

সুকতারি রিম্‌রিম্

জাগ্রত রক্তিস

দীপ্তির সঙ্গে

শুশ্রূষাধের ছোপ

শাল মেঘে লাগল,

খুঁজিরা আগল—

বর্ষের রবি,

মোর প্রেম-পাঞ্জীর

জার চুম্বা চক্ষে

চক্ষেরি পক্ষে

অপ্তির ভঙ্গে ।

মোর মানিনীর কোপ

অস্ত্রেতে ভাসল

চুখনে ফাঁসল

দশ দিক কর্সা ।

তুষার-নদীর জাগরণ

(বোরিস্ পেট্রোভ্‌স্কি)

গাংচিলেরা নদীর প্রেমে পাগল,—

ঝোম্‌টা তুলে নদী ধৈর্য হাঙ্গে ;

ঘুম্‌ঘুম্‌বার গড়া নরন-হুগল—

তার পাখীদের অমল বিষ ভাসে ।

জড়োরা-জরির জালিম্ 'পরে নদী

গা'টি গড়ার, হুগি জড়ার তাগে,

জাতিয়ে তোলে মাতিয়ে নিরবধি

চান্কে তোলে চুখনেরি হারে ।

ফুটে উঠে চুম্বি এলোকেশে,

গঠে নদী ঘূমের ঘোরে হেসে ।

খুব হ' শিয়ার ঘুম-ভাঙা হুন্দরী !

মেথো মেথো সাম্‌লে থেকো—

জাগুন না বার ধরি* !

সিদ্ধ-শকুন নদীর প্রেমে পাগল

উন্নাসে ঘূর্ণাক্‌ দে' লাগায় চমক,

বুক পেতে সব সকল ঢেউয়ের ধকল

সুকারে তার অকুল জলের গমক ।

“জাগো নদী । মেল আঁধির পাতা,

আমরা তোমার প্রাণের স্বপন-ছবি ;

আমরা তোমার মন-কাষনার গাথা,

জাগো ! জাগো ! ডাকছে তোমার রবি,

পাখীনা তুমি পাবে গো বার বরে,

সেই রবি ঝই পাড়িরেছে শিরে ।

পাখার ভরে সাগর-দরশনে

চলবে তুমি প্রেমে-পাগল

গাংচিলেক্তর সঙ্গে ।”

নিবেদন

(লাম'উত্)

তকাত্ হরে বাই যদি-বা তবু মনের মন্দিরে
 দেবী তোমার ওই প্রতিমা থাকবে এমনো থাকবে গো,
 শ্রুতদিনে স্তব্ধের স্তুতি—হার সে তোলা যায় কি রে ?
 এই গীরিত্তি হিমার নিতি আগ্বে সে যে আগ্বে গো ।

অন্ত দিনে অন্ত আঁধি করলে দ্বারী এই হিমা
 ভাব ছু তুমি ভুলতে এ প্রেম পারব ? প্রাণে সইবে নে ?
 বিগ্রহ আর মণিকোঠায় তকাত্ যদিই হয় প্রিয়া,
 দেবী দেবীই, মণিকোঠা—মণিকোঠাই রইবে সে ।

তবু

(নেক্রাসভ)

স্বার্থ মোদের হবে অনেক আশা,
 অনেক সাথে পড়বে যে ছাই, জানি,
 মাহুব পুঁঠ,—কন্দী জানে খাসা,
 ভাঙলে বেড়ী গড়বে নুতন, মানি ;
 একশো-রকম গড়িয়ে শিকল, ধীরে,
 ফিকির করে লড়িয়ে মেবে ফিরে ।

তথাক্, ভাই, মানছি সব, তবু	এ বিশ্বাসে বেঁধে গেতারটির
এ কথাটাও স্পষ্ট আমার কাছে,	উবার আলোর ধরেছি আজ কুলে,
খুব বেশী দিন সইবেনা তাও কত,	অব্যাহতির আব-হাওরাতে ফিরে
ভাঙার শক্তি—তাও মাহবের আছে ;	সকল শিকল পড়ছে খুলে খুলে !
গড়লে বেড়ী ভাঙবে বারেকার	এব আশায় হে চিত্ত আমার
এ বিশ্বাসে বুক বাধা আমার ।	নবীন উবার কর নমস্কার ।

আপ্ত

(পুশ্কিন)

ক্রান্তি-কাতর শরীর নিয়ে কঠে নিয়ে তুষা
 হারিয়ে নিশা বৃহতেছিলাম গহন অন্ধকারে,
 কল্মলিয়ে ছ'বান ডানা ভেদ ক'রে যোর নিশা
 দূত এল সো স্বর্ণ হ'তে সেজে কিরণ-হারে !—
 বুলিয়ে দিল চোখের পাতার মম
 আন্ত লজ্জা স্বপ্ন-সোহাগ সম ।

সেই পরশে স্বর্ণ শ্রেন-পাখীর আঁধি হেন
 দিব্য আঁধি ফুটল আমার—ফুটল আচম্বিতে,
 সেই পরশে দিব্য-শ্রবণ পেলাম আমি, যেন
 কর্ণ-কূহর উঠ'ল ভ'রে স্বর্ণারকের গীতে ।
 গগন-ভরা গোপন আনা-গোনা—
 সাগর-চাহীর সঞ্চারও দার শোনা !

পাহাড়-ভলীর কোণে-কাড়ে বাড়ছে বে-সব পাখা
 শুনি তাবের বেড়ে-ওঠার ব্যত কোলাহল,
 ডিঘ-মাঝে বাড়ছে রূপ ফুল, ছুটি পাখা—
 শুনি তাবের পিউরে-ওঠা—আনন্দে চঞ্চল ।
 হঠাৎ হয়ে দূত সে স্বর্ণচাহী
 চোখে আমার রাখ'ল হ'চোখ তারি ।

ওঠাধরে নির্বিঘ্নে দৃষ্টি দিয়ে হেসে
 হঠাৎ সে যোর পাপ-রসনা উপড়ে নিল ঘোরে,—
 উপড়ে নিল মল্ল মারিক মন থেকে নিঃশেষে
 স্বর্ণবৃন্তের ছ'হাত ব'রে রক্ত পড়ে স্ব'রে ।
 ছিন্ন! এ যোর ঠোঁট শেষে স্বাক ক'রে
 তব্বকেরি বিহ্বা দিল ভ'রে ।

ভালোমানে বুক ভেদ ক'রে ছুঁপিও নিল ছিঁড়ে,
তার বদলে বসিয়ে দিল অলস অঙ্গার ;
রইল প'ড়ে মকতূমে তপ্ত বাতুর নীড়ে
মড়ার আকার স্নানহারা কেবল সংজ্ঞা-সার ।
এমনি—কতকাল গেল না জানি
শুনে শেষে পেলাম অলঙ্ঘ্যবান্ধী ।

“আপ্ত ! ওঠো, ঝট্টা পোনো প্রান্তি-পরম-ক্ষেপে
আজকে হ'তে আমার ইচ্ছা আগল তোমার মাথে ।”
হর্ষে, ভয়ে, কী বিষয়ে শুনি শুদ্ধ মনে
কর্ণে আমার বিশ্ব-ধাতার বান্ধী গভীর বাজে
আলো শুনি—“মশাল আমার নিদ্রা—
বাও—ছনিয়ার আগাও বত হিয়া !”

সাঁচ্চা সল্লা

(ক্রাইলক্)

“নেকড়ে বাঘের অত্যাচারে
ছাগল ভেড়া বাঁচবে না রে,
দায়োগারে জানাই গিরে চল ।”
বাড়ি নেড়ে বুলে রামছাগল ।
তাই না শুনে তাড়াতাড়ি
ছাগলগুলো চলল কাঁড়ি
সঙ্গে সঙ্গে তুড়-তুড়া-তুড়
চলল ভেড়ার দল ।

ধানার গিরে ধরা দিয়ে
বেলাস্ত সব রং পিড়িয়ে,
ছুঁড়র শেষে এলেন সঙ্কোবেলা ;
কমলে তখন রামছাগল এস্তেলা ।

সব শুনে কন্‌ রুচ বরে
“কি হবে ছাই ডাইরী ক'রে ?—
লেখালিখি—কাজ কি ক্যানাম ?—
কাজ কি ক্যাচাং মেলা ?

তার চেয়ে পোনু বুদ্ধি আমার—
ভাবনা কি ভর থাকবে না আর—
বুঝি ?—তোমের বোকাব বল কত,—
মুখ বেড়া বোকা ছাগল বত,—
শোনু তবে,—কের নেকড়ে বাঘে
করলে জুলুম—ধরবি তাকে—
টুট টিপে আন্‌বি ধানার
ইছর-ছানার মত ।”

কালো শাল

(পুশ্কিন)

হ'ল হারিয়ে, তাকিরে থাকি, আঁধারে চোখ ছাঃ,—
 কালোরন্তের শাল সহসা দেখলে কারো গায় !
 শিঠিরে ওঠে শুকনো হৃদয় রক্ত সেঁদুর হিম,
 হতাশ-হাওয়ার আমলে পড়ে দুনিয়াটা নিঃসীম !
 জীবনটা নিঃসঙ্গ আমার—নেই স্রীতি দেহ,—
 আমিও ভালোবেসেছিলাম,—মানবে কি কেহ ?
 সারা প্রাণের আবেগ দিয়ে—বেসেছি ভালো
 আবেগ রাতে হঠাৎ আমার নিবেছে, আলো !

• • • • •
 মনে পড়ে বরেন-কালের সহজ সে বিশ্বাস,—
 মনে পড়ে গ্রীক-ভরতীর ভালোবাসার ভাষ।
 আমিও ভালোবেসেছিলাম—হৃদয় প্রাণ দিয়ে,
 হৃদয়ের সে ছিল আমার সকল নমিয়ে।
 বইল না সে সোনার স্বপন, সইল না সে অর্থ,
 কাল ইহরী বুড়ো আমার মমিরে দিল বুক।

• • • • •
 পাঁচ ইয়ারে অটুলা ক'রে কাটছিল বেলা,
 কাল ইহরী হঠাৎ দিলে দুয়ারে ঢেলা,
 জনান্তিকে বসে ডেকে “থুব দেখি স্রুষ্টি
 (তোমার) গ্রীক-রূপসী খেলছে হোথা প্রেম নিরে স্রুষ্টি।”
 ধম্কে তারে হাঁকিয়ে দিলাম—লাগল কি ধান্দা।
 বেরিয়ে 'পলান সঙ্গে নিরে বিশ্বাসী বান্দা।
 বেরিয়ে পলান তীরের বেগে আরব-খোড়াতে
 মারা মরা তল গেল সব ঈর্ষা-সংঘাতে।

• • • • •
 গ্রীক-সেয়েটার চেমা বাড়ী চিন্তে কী ঘেরী।
 মনের ঝড়ে হাত-পা বিকল, সব ধোঁরা হেরি।
 আব্জানো ষার—ক'ক দে' দেখি—চোখের উপর ঠিক
 অথরে তার অধর মিলায় আর্থানী সৈনিক।

চোখে ছঠাৎ দেখলাম আঁধার—অলোয়ারসেতে হাত—
 চোরাই-চুমু শেষ না হ'তে চোরের মুণ্ডপাত ।
 লাধি মেয়ে পেঁংলে ছুঁড়ে মুণ্ড-কাটা ধড়
 পড়ল দৃষ্টি পাঙাস-পায়া গ্রীক-মেয়েটার 'পূর' ।
 মনে পড়ে তার কাকূতি—তার পে ঝাঁকুনি—
 সকল অঙ্গ রক্তে ভাসে—বাঁচতে তবু সাধ !
 কে হাতিয়ার রক্তবে হাতে ? সুড়িরে প'ল বেহ,
 নদে ম'ল অপঘাতে আমার প্রাণের বেহ ।

চট্কা ভেঙে কট্কা দিয়ে মোর-দেওয়া সেই শাল
 খুলে নিলাম ধড় থেকে তার—থেকে নিমেষ কাল—
 শালে মুছে অস্ত্র চ'লে এলাম তুরন্ত,
 বান্ধা দিলে ভাসিয়ে ছটোর ঘোতে ছুরন্ত ।
 সেই থেকে আর মাতানো-চোখ মাতায় না মোরে,
 সেই থেকে সব কুর্জি গেছে, মন গেছে ক্ষ'রে ।
 সেই অবধি দেখলে পরে কালো রঙের শাল
 হ'ল হারিয়ে তাকিরে থাকি, চোখে আঁধার জাল ।
 ঐশতোস্ত্রনাথ বসু ।

মাসকাবারি

কংগ্রেস

এবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতার
 কংগ্রেসের বৈঠক হইয়াছিল, হুতরাং বাংলা
 দেশের সকল লোকেরই মনে সেই প্রসঙ্গ লইয়া
 চঞ্চল হইয়া আছে ।

যদিচ এটা সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত
 সাধারণের সম্মিলন-সভা, তবু মনে হয় যে,
 গোটাকতক প্রুস্তাব উপাধন ও সর্বধন
 উপলক্ষ্যে সভাসম্মেলনে দাঁড়াইয়া পাঁচ দশ মিনিট

কাল ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার দ্বারা
 ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের
 পরস্পরের পরিচয় লাভ অথবা চিন্তার আদান
 প্রদানের বাস্তবিক কতটুকু সুযোগ থাকে ?
 কংগ্রেস-সম্মেলনে চক্ষুকাটা সভ্যদের মত
 বোম্বাই, মাদ্রাজ, বেহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি
 প্রদেশের প্রাদেশিক সভ্যদের বসিবার স্থান
 ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীর দ্বারা চিহ্নিত—তাদের
 একত্র পাশাপাশি বসিবারও বন্দোবস্ত
 হওয়ার উপায় নাই । কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে

বিস্তর কনক্যারেশনও বসিল, কিন্তু সবগুলির ধরণ-ধারণ ঐ একই রকমের। সেইজন্যই ব্যর্থতার এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, বাংলাদেশে যে ভারতের এতগুলি লোক অতিথি হইয়া আসিল, তারা বাংলাদেশের ছব্বরের কতটুকু পরিচয় লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল!

অবশ্য বলা হইবে যে, রাষ্ট্রীয় সভার চেহারা সব দেশেই এই রকম—কংগ্রেস নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-সভা, এখানে বাংলার বিশেষ পরিচয়ের অস্ত সমস্ত ভারত উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বারা বাস্তবিক হৃৎ-দ্বংখে, সামাজিক সম্বন্ধে, আচারে বিচারে এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে, তাদের সভাসমিতির যে ধরণ আমাদের সভাসমিতিতেও কি সেই ধরণটাই চলিবে? বাঙালী বেহারীকে কতটুকু জানে—বেহারীই বা বাঙালীর ব্যর্থ পরিচয় কতটুকু পাইয়াছে? সব দেশেই রাষ্ট্রবহনের গোড়ার আছে মানস বন্ধন—মনের সঙ্গে মনের যোগ। বাঙালীর মনটা কি, তাহা আজ আমরা কতকটা জানি—কারণ সাহিত্য, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, নানা ক্ষেত্রে অল্পটানে, সে মন আপনার পরিচয় আপনি দিতেছে। কিন্তু নিখিল ভারতের মনটা কি, তার পরিচয় ভেতন প্রত্যক্ষ ত হয় নাই, সে যে এখনো অস্পষ্ট কুরাণার লোকে বঙ্গচরী হইয়া আছে। তাকে বাস্তব করিতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অহুতান প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল প্রদেশের লোকেরই বসিষ্ঠ যোগ থাকা দরকার এবং মধ্যে মধ্যে এই রকমের বড় বড় শব্দীতি, বড় বড় ‘মেলা’ হওয়া চাই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে যে, বহুবর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বঙ্গীয় সমাজ’ প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন যে, দেশের অর্গণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে যদি আমাদের কংগ্রেস কনক্যারেশনাদির যোগ লাভন করা দরকার মনে করি, তবে ঐরূপ বিশেষ ধাঁচার সভার আয়োজন না করিয়া, বঙ্গীয় ধাঁচার মেলার আয়োজন করা চাই। কথাটা আমাদের বিশেষভাবে স্মারিত্রা দেখা দরকার। এইতো ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের ‘কুস্তম্বেলা’ অচিরেই বসিতেছে—সেখানে যত জনসমাগম হয় এত কংগ্রেসে হয় না। বীরভূমে ‘অরবিন্দের মেলা’ উপলক্ষ্যে যত লোক জমে, এত কোন বৈদেশিক সভা-সমিতিতে জমেনা। যদি সেইরূপ একটা কংগ্রেস-মেলা বসিত, কংগ্রেসের রবী-মহারথীদের বড় বড় তাঁবু সেখানে পড়িয়া বাইত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসমূহকে প্রাদেশিক ভাষার বাহা বলা দরকার তাহা বলা হইত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প-প্রদর্শনী প্রভৃতি নানাপ্রকারের চিত্তবিনোদন ও লোকশিক্ষা হুরের উপযোগী অহুতানের ব্যবস্থা হইত, তবে তখন কেবল যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত স্ত্রীজনের মিলন ঘনিষ্ঠতর হইত তা নয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মিলনও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইত।

ভারতবর্ষের যে সকল লোকেরা ইংমাজী জানে না, তারা কি ভাবে বড় বড় ‘মেলা’র আয়োজন করে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণের সেটা দেখাও উচিত এবং সেই জিনিষটাকে নিজেদের কার্যোপযোগী করিয়া পড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করাও উচিত।

শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতা

কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়া শ্রীমতী বেসান্ত বে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তার মত এমন সারালো ও ধারালো বক্তৃতা ইতিপূর্বে কংগ্রেসে কখনও পড়া হইয়াছে কিনা জানি না—অন্ততঃ গত দুই তিন বছরের কংগ্রেসে হয় নাই এটা সূনিশ্চিত।

বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ড যখন বেলজিয়মের স্বাধীনতার অস্ত্র যুদ্ধে নামিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষের আশা হইয়াছিল যে এযুদ্ধে সে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া গড়িবার সুযোগ পাইবে। ইংলণ্ড তার ধন চাহিল, কিন্তু সৈন্ত গড়িল না। অথচ ১৮৫২ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্ৰ ৩৭টি যুদ্ধে ভারতবর্ষীর সিপাহিরা প্রেরিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয়ভার ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যে সৈন্ত-বিভাগের এই ব্যয়ভার ক্রমশ বাড়িয়াছে বই কমে নাই—যুদ্ধের পূর্বে ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্তসংক্রান্ত ব্যয়ের অনুপাতে ভারতের ব্যয়ের অনুপাত কুড়িগুণেরও বেশি ছিল। এসম্বন্ধে ভূতপূর্ব কংগ্রেস হইতে ক্রমাগত প্রতিবাদ হইয়াছে—ইহা দেখানো হইয়াছে যে, সৈন্তসংক্রান্ত ব্যয়াদিকোর অস্ত্র ভারতবর্ষে লোকশিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা যে পরিমাণে হওয়া উচিত তাহা হইতে পারিতেছে না,—তবু এ সকল প্রতিবাদে বিশেষ কোন কসাই হয় নাই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে ভারতবর্ষ সৈন্তবিভাগে এত অর্থ ভোগাইয়াছে, সেই ভারতবর্ষকেই

অস্ত্র-আইন প্রভৃতি নিবেদক বিধিপ্রচারের দ্বারা নির্বীণ্য করিবার অস্ত্র বিধিমতেই চেষ্টা হইয়াছে। বাঙালী বা মাদ্রাসী পাঞ্জাবীর চেয়ে যে সৈনিক হিসাবে নিতুট, একথা বলার এখন আর উপায় নাই;—কিন্তু এই বাঙালীকেই এককাল ধরিয়া বীণ্য প্রকাশের কিছুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

সভানেত্রী একটি কথা তাই জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন এই যে, “ভারতবর্ষে ও ইউরোপে একপ্রভুত্ব (autocracy) ও আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) যে পর্যন্ত না সমূলে বিনষ্ট হইবে সে পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হইবে না।”

তারপরে তিনি ভারতে নূতন প্রাণের আবির্ভাবের কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ :—

(১) এশিয়ার আগরণ।

(২) বৈদেশিক শাসন সম্বন্ধে এবং সাম্রাজ্যের নূতন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদেশে আলোচনা।

(৩) শ্রেতকার জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন।

(৪) বণিকদিগের অত্যাচার।

(৫) নারীজাতির আগরণ।

(৬) জনসমূহের আগরণ।

এবং এই প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধেই তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেসান্ত লিখিয়াছেন যে, শ্রেতকার জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ভাঃ-ত-বর্ষী লোকদের ধারণার যে ক্রমশ বদল হইয়াছে, তার কারণ খিওলকিয়াল সোসাইটি ও আর্গাসমাজ ভারতের লোকদের

নিজ সভ্যতার বিশিষ্টতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সমর্থ করিয়াছে এবং পশ্চিমকে সকল বিষয়ে অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেও নিবৃত্ত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও নাম করিয়াছেন। অথচ খিওসকিক্যাল সোসাইটি, আর্ঘ্যসমাজ ও বিবেকানন্দ-মিশনের অভ্যাসের অনেক পূর্বে, রামমোহন রায় হইতে আদর্শ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু স্ফুটি এবং তার পরে আর্ঘ্য সমাজ ও খিওসকিক্যাল সোসাইটির সমসম কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি, ভারতের সভ্যতার বিশিষ্টতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে ভারতবাসীকে যেভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তার উল্লেখ থাকা নিতান্তই উচিত ছিল। আর কারও নাম উল্লেখ না করিলেও রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বপ্রায়ে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা কর্তব্য, কেননা তিনিই আমাদের স্বাধীনতা-বোধের জনক। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ বলি, সমাজ-সংস্কারের আদর্শ বলি, ভারতবর্ষের সভ্যতার আদর্শ বলি—সকল আদর্শেরই প্রেরণা তাঁহা হইতেই প্রসূত। বিশ্বসভ্যতার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় আসন তিনিই সকলের আগে নির্দেশ করিয়া গেছেন। তারপরে যখন ঐশ্বর্য বেসান্ত স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিলেন, তখন তাঁর উচিত ছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরও নাম করা। কেননা বিবেকানন্দের চেয়ে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার ব্যাপারে ইঁহাদের কৃতিত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এসকল ক্রটি সত্ত্বেও ঐশ্বর্য বেসান্তের

বক্তৃতার দেশ সম্বন্ধে আনিবার ও ভাবিবার বিস্তর কথা আছে।

অনুন্নত জাতিদের হুর্দশা নিবারণের প্রস্তাব।

এবারকার কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিশেষভাবে আলোচিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় কংগ্রেস-কর্তারা মনে করিয়া-ছিলেন যে, ইংরাজ প্রকুরা স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রধান অন্তরায়রূপে যে জিনিষটাকে নির্দেশ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে এবারকার কংগ্রেসের নীরব থাকটা মুক্তিযুক্ত হইবে না। ভারতবর্ষে ৬ কোটি অস্পৃক্ত ও অনুন্নত জাতি থাকিতে আমরা স্বায়ত্তশাসনের দাবী করি কোন্ হিসাবে— এই কথাই আমাদের প্রকুরা আশাবিগ্নকে সর্বদাই স্মরণ করাইয়া দেন। অবশ্য আমাদের সমাজে ভেদ বিভিন্ন দৃষ্টে থাকুক না কেন, তবু যে আমাদের স্বায়ত্তশাসন দরকার এটা আমাদের জানানোই চাই। কেননা স্বাধীনতা না থাকিলে দারিদ্র-বোধ্যও জাগেনা এবং দারিদ্র-বোধ্য ও কর্তৃত্ব-বোধ্য না জাগিলে সামাজিক হুর্দশা ও হুর্দশা নিবারণের চেষ্টাও পুরাপুরি দেখা দেয় না, এটা একবারে স্বতঃসিদ্ধ কথা এবং পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসই এ কথায় সাক্ষ্য দিবে। সে যাহাই হউক, স্বায়ত্তশাসন পাইলে তবেই আমরা সমাজের উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হইব, একথা কোন কাজের - কথাই নয়। বরং বাস্তব স্বায়ত্তশাসন বঞ্চার্থই নিম্নায়ত্ত হয় ও অগম

হয়, সে অল্প অল্প বিধেও সচেষ্ট হওয়া এখন হইতেই সরকার।

এবার কংগ্রেসে তাই একটু নতুন ধরণের প্রস্তাব ছিল এই যে, প্রবোধন ও জোরধর্ম সকল দিক হইতেই ভাবিয়া দেখিলে অসুস্থত জাতিদের দুর্দশা মোচন করা আমাদের কর্তব্য। এই প্রস্তাব দ্বারা উত্থাপন ও সমর্থন করিলেন তাঁরা সকলেই ভিন্ন প্রদেশীয় লোক—কোন বাঙালীকে এ প্রস্তাবের সমর্থক রূপে দেখিলাম না। দ্বারা বক্তৃতা করিলেন তাঁরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই দাবীজনাথ “কর্তার ইচ্ছার কর্তব্য”—এবং যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই ভাবের কথাই বলিলেন। একজন বলিলেন যে, আমরা রাষ্ট্রব্যাপারে ‘ব্যারোক্রেনি’ বা আমরা শাসনতন্ত্র দূর করিতে চাই, অথচ সামাজিক ব্যাপারে সামাজিক আদর্শতাকে প্রব্রুত বিতে ইচ্ছা করি, ইহার মত অসঙ্গত কাণ্ড আর কিছুই হইতে পারে না। রাষ্ট্র-ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে দ্বারা স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইতেছে না, তাহাদিগকে সেই সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া ত সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন থাকি কেন?

কিন্তু দেখিলাম এই যে, ইংরাজ-সরকারের অস্ত্রের বিরুদ্ধে সামান্য কথাও যেমন উদ্ভাদনা ও উত্তেজনার সঞ্চার করে, এ বিষয়ে তাহা করিল না। অত বড় সত্য হইতে কোন সাধুবাদ বা সম্মতিসূচক

করতালি পড়িল না। সমাজ সম্বন্ধীয় কথাগুলো যে আমাদের সুধোচক নয়, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল।

মোস্তাফিজ কন্কারেসে ডাক্তার রায়ের অভিভাষণ

কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে করেক বছর হইতে সামাজিক কন্কারেস বসিতেছে। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে এ সভাতেও কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবগুলি সভার দ্বারা গৃহীত হয় বটে, তবে দ্বারা সমর্থন করিবার অল্প হাত তোলেন, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের যে আগ্রহ আছে তার কোন মানে নাই। সুতরাং সে হিসাবে দেখিতে গেলে এ ধরণের একটা কন্কারেসে খাড়া করার বিশেষ সার্থকতা নাই—তার চেয়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সমাজের উন্নতি বিধান উদ্যোগী একটা দল গাঁড় করা হইতে পারিলে ভাল হইত।

এ বৎসর ডাক্তার প্রমুখের দ্বারা সভাপতি ছিলেন—তাঁর সভাপতির অভিভাষণ তাঁরই উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি তাঁর অভিভাষণের গোড়াতাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন এই যে, “বখন স্বরাজ বা হোমরুলের কথা দেশের এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতীধ্বনিত হইতেছে, বখন ভারতীয় জনগণের সকল শ্রেণীর লোকেরাই রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে বড় বড় কথা প্রস্তাব করিতে ব্যস্ত, এবং বখন সম্মিলিত ভারতের বহু আমাদের কলনকে সম্মোহিত করিয়াছে, তখন কেন আমাদের মধ্যে নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়

হঠতে প্রতিবাদ ঘোষিত হইতেছে? এমন একটা বিষয়েও আমাদের মধ্যে মতবৈধ হয় কেন?”

এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি পরিষ্কার করিয়াই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :— “আমরা জাতীয় সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে বড়ই ভাগ করিয়া স্বতন্ত্র করিতে যাই না কেন, তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে; আমরা ইচ্ছামত তাদের এক অংশকে অস্ত্র অংশের চেয়ে বড় করিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত সমাজ-সংস্কারকে আমরা যেমনি অবহেলা করিয়া আসিয়াছি, তেমনি এট সময়ে সেই অবহেলার ফল আমাদের কাছে ভোগ করিতে হইতেছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় রথের চাকা-গুলিকে হুড় তাহা অবরুদ্ধ করিতে বসিয়াছে।”

গত দুই মাসের ‘ভারতী’তে ‘বুদ্ধিমানের কণ্ঠ’ নামক প্রবন্ধের প্রসঙ্গে আমরাও এই কথাটাষ্ট অস্ত্রান্ত পাঁচ কথার মধ্যে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইলেই যে সমাজের সব সমস্যার মীমাংসা আপনাই হইয়া যাইবে, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কেননা আমাদের সমাজে উচ্চ ও নীচ জাতিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান আছে, সে ব্যবধানজনিত সংস্কারের প্রতিক্রিয়াটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে বাধ্য। যেমন ইংরাজ ত আপন দেশে স্বাধীনতার মর্যাদা খুবই বোকে; কিন্তু এমেনে আসিলেই তার সে বোধটা লোপ পায় কেন? তার কারণ কি এই নয় যে, ইংলণ্ডের ডিমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের

আবহাওয়ার বর্জিত ইংরাজের স্বাধীনতার সংস্কার এখানকার ব্যুরোক্রেসির বা আমলা-তন্ত্রের আবহাওয়ার পড়িয়া ক্রমশ একেবারেই দুইয়া মুছিয়া যায়? তখন এখানকার এই নূতন অজ্ঞিত সংস্কারটাই পুরোদস্তুর চলিতে থাকে। ঠিক ভেমনিভর, আমাদের সমাজে জাতিভেদের যে সংস্কারটা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা স্বরাজ বা হোমরুলের সঙ্গে কোন মতেই খাপ খায় না। সুতরাং সে সংস্কারটা ঘূর করিবার জন্ত আমরা যদি সচেষ্ট না হই, তবে স্বরাজই পাই আর যাই পাই, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এ সংস্কারের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইতে বাধ্য।

অথচ এ সময়ে লোকের মন হোম-রুলের কল্পনার এমনি মাতিয়া আছে যে, এ সকল কথা কাহারও কুচি-বোচন হইবে না জানি। বরং উণ্টা দিকে এই বিপদের সম্ভাবনা আছে যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ আমাদের স্বায়ত্ত শাসন লাভের বিরুদ্ধে এ সকল কথাকে নজির স্বরূপে ব্যবহার করিতে থাকিবে। এরি মধ্যে ট্রেট্‌সম্যান কাগজ ডাক্তার রায়ের বক্তৃতা হইতে এই ধরনের নজির উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু তাদের ঐহুই দুঃবৃদ্ধের অযোগ্য দেওয়া হইবে তাবিয়া এ সর্বক্ষেপে দেশের লোকের মূখ বন্ধ করা উচিত নয়। কেননা সময় আসিয়াছে যখন সভ্যকে নির্ভীক তাহেই স্বীকার করা দরকার।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইতে গেলে সামাজিক স্বাধীনতাও চাই, এ কথা বলার দায়।

এমন বুঝার না যে, তবে বুদ্ধি বতদিন পর্যন্ত সামাজিক ব্যাপারে আমাদের সমস্ত ভেদ বিভেদ দূর হইয়া না বাইতেছে এবং সকলের অধিকার প্রশস্ততার না চাইতেছে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইবার দাবী আমাদের নাই। আমরা বরং এই কথাই বলি যে, স্বাধীনতা এখানে চাই, ওখানে চাই না—বাইরে চাই, ঘরে চাই না,—এতটুকু চাই, অত দূর পর্যন্ত চাই না, অনেক পরে চাই, এখন চাই না—এভাবে স্বাধীনতা পাওয়ার কোন অর্থই নাই। কিন্তু আমরা ঘরের মধ্যে অনেক পরাধীনতার লক্ষ্য আছে অনেক রকমের বন্ধন আছে; সেইজন্য কি বাহিরে পথ চলিবার স্বাধীনতাও আমি দাবী করিব না? তখন কি প্রতিপদেই আমাকে বাধা দিয়া বলা হইবে যে, আগে ঘরের বন্ধন মোচন কর, পরে পথে বাহির হইও। কিংবা যে ব্যক্তি ঘরে এত বন্ধনে আবদ্ধ, সে পথে বাহির হইলে পদে পদেই হোঁচট খাইতে পারে, অতএব তার আর বাতির হইয়া কাজ নাই? বরং এই কথাই কি বলা উচিত নয় যে, উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রশস্ত রাজপথে নানা বাজীদশের সঙ্গে যে একবার জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সে আর ঘরে ফিরিয়া আনিয়া ধোপের পর ধোপ পিঞ্জরের পর পিঞ্জর তৈরি করিতে উৎসাহিত হয় না—সে সব সর্কারীতাকে একেঘেয়ে বুড়াইয়া না দিয়া থাকিতে পারে না? স্বাধীনতাগ্রীর ইংরাজ এই কথা যদি আল বসিত, তবে সেই কথাই তার মুখে শোভা পাইত। অতএব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের চাই, কেননা

সেই স্বাধীনতার অভাবেই আমাদের সামাজিক জীবন ও অস্ত্রাজ জীবন সংকুচিত ও নিরুদ্ধ হইয়া আছে; পক্ষান্তরে সামাজিক স্বাধীনতাও আমাদের চাই, কেননা সেই স্বাধীনতার অভাবেই “আবার আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন ও অস্ত্রাজ বৃহত্তর জীবন আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উত্তিবার সুযোগ পাইতেছেন। তার মানে দুই দিক্কার স্বাধীনতাই পরস্পরের অপেক্ষী—একের আবির্ভাবে অস্ত্রেরও আবির্ভাব, একের বিরোভাবে অস্ত্রেরও প্রায় বিরোভাব ঘটয়া পড়ে।

ডাক্তার রায়ের অভিভাষণে তিনি বাংলাদেশের জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া তার অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশ সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, সেই সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল কিংবা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল বলা যায়। তিনি রিঞ্জু সাহেব ও রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রভৃতির নৃতর ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যের বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। আশা করি যে তাঁর অভিতাবণ বাংলা ভাষায় অনুলব্ধিত হইবে; তখন সকলেই ইহা পড়িবার সুযোগ পাইবেন।

ডাক্তার রায় লিখিয়াছেন যে, আমরা যখন তখন আপানের উদাহরণ দেখাইয়া বলি যে, দেখ দেখি, ঐশ্বর কোন জাতির পক্ষে উন্নতি লাভ করা কি এখনই অসম্ভব?

কিন্তু সামাজিক উন্নতি সাধনে জাপান বাহ্য করিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। জাপানেও অস্পষ্ট জাতি ছিল এবং সেখানেও সামুরাইগণ ব্রাহ্মণেরই মত সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সামুরাইগণ আপনা হইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান বিদর্জন দিয়া জাপান-বাসী সকলকেই সমান অধিকার দিয়া এক করিয়া লইলেন—জাপানের জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলেন। অথচ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জাপানে বাহ্য সম্ভব হইয়াছিল, আজ বিশ শতাব্দীতে ভাষ্যতবধি তাহা সম্ভব হয় না, ইহাই আশ্চর্য।

ডাক্তার রায় বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার সম্বন্ধে অনেকবার লিখিয়াছেন—এবারেও সে বিষয়ে তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েন নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে যে সময়ে গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানের সিংহদ্বার উদঘাটন করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপের নৈরায়িকেরা উত্তর পশ্চিম কোণে বিশেষ মুহূর্ত্তে কাক ডাকিয়া উঠিলে সেটা শুত কি অন্তত এবং তাঁর কলঙ্কল কি হইতে পারে, তাহারই নির্ণয়ে বহা ব্যস্ত—বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের এর চেয়ে আর কি দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

অবশ্য ডাক্তার রায়ের অভিভাষণের সমালোচনার বোধ করি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাহ্য বলিয়াছেন সমস্ত কথাই অত্যন্ত সত্য ইহাতে সন্দেহ নাই—তবু তিনি সমাজের সকল প্রথা ও নীতি নীতিকে কেবলমাত্র সংস্কার-

কের চোখে দিয়াই দেখিয়াছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক নজির সংগ্রহ করিলেও সামাজিক প্রথাগুলিকে যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে অথবা সমাজতত্ত্ব-বিদের চোখে তিনি দেখেন নাই। আমাদের দেশে জাতিভেদ-প্রথা কোন সত্য ভিত্তির উপরে বহন প্রতিষ্ঠিত নয়, তখন তাহা এই বর্তমান আকারে টিকিবে না, এটা শীঘ্র হোক্‌ বিলম্বে হোক্‌ আমাদের দেশের লোককে বলিতেই হইবে। কিন্তু এ প্রথার উৎপত্তির সম্বন্ধে কোন আদর্শ ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা জানা উচিত। অর্থাৎ, সমাজ গঠনের আদর্শে গুণকর্মবিভাগের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহা জাবিরা দেখা উচিত। আমরা সমাজের দীর্ঘ ইউরোপীয় সমাজের ধনকুলীন চাই, না ত্যাগী ও জ্ঞানতপস্বী ব্রাহ্মণ চাই—এ একটা মত প্রশ্ন। সুতরাং এ সকল আদর্শের কথা বাদ দিলে হিন্দুসমাজের কোন প্রথা কোন আচার সম্বন্ধেই স্থিতির করা হয় না। তার পর, আমাদের গ্রীলোকেরা যে শিক্ষার অভাবে নানা রকমের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, এটা যেমন সত্য কথা, এটাও ভেদনি সত্য যে আমাদের গ্রীলোকেরা সমাজের ভিতর দিয়া নানা স্বাভাবিক উপারে, ব্রত দান দ্বান ক্রিয়াকর্ম বাত্যা কথকতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে সকল অমূল্য শিক্ষা অর্জন করে, যে দ্বী দী ও শ্রী লাভ করে, সহস্র কেতাবী শিক্ষার সে সকল সম্পদের অধিকারিণী তারা হইতেই পারিত না। এই যে নৈসর্গিক ‘কালচার’, ইহাকে ‘একচোখো’ সংস্কার অগ্রাহ

করিলেও ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে; একথা অস্বীকার করিতে পারি না। এই পুণ্যভ্রমের বনিয়াদের উপরেই নূতন বাড়ীর পত্তন হইবে—আমাদের সম্পদ বেগানে বাধা আছে তাঁকে আহরণ করিয়া তবেই তাকে কালের উপযোগী করিয়া গড়িয়া পিঠিয়া লওয়া সম্ভব।

কিন্তু ডাক্তার মার যে স্পষ্ট কথা বুঝ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, এ ক্ষত্র তিনি কৃতজ্ঞতায পাত্র। সমাজের তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টার অনেক সদয় তথ্যগুলো চাপা পড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে সেই তথ্যগুলোকেও উচু করিয়া ধরা দরকার। কেননা, তাহা হইলেই তত্ত্ব নিরূপণের বেলায় sophistry'র চেষ্টাটা দূর হইয়া পড়ে। তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভের মধ্যে একজন তত্ত্ববিদ করিয়া থাকেন, তিনি স্বল্প—কিন্তু তর্ক—কৃতকর্মে—sophistry'র অভ্যাস—বাকী আমরা ধার্মা ভোগ করি তাদের উদ্ধারের ক্ষত্র তত্ত্ব চাই, অত্যন্ত নীরস-কঠিন তত্ত্ব চাই—আর কিছুই না।

ভারতবর্ষে এক ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব

ভারতবর্ষে এক ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও এবার কলিকাতার এক কনফারেন্স বসিয়াছিল। কর্মবীর শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি মহোদয় মনে করেন যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের পরস্পরের কথাবার্তা কহিবার ভাষা ইংরাজী না হইয়া হিন্দী হওয়া উচিত। কেননা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই

হিন্দী ভাষা বুঝিতে পারে, মুসলমান আমলেও এই ভাষাই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। ইংরাজ ভাষাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা আলাপ করেন বলিয়া বর্জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের আর যোগ থাকিতেছে না। বাস্তবিক ইংরাজী কখনো লোকে বোঝে? তা ছাড়া ইংরাজীতে ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া আমরা ক্রমশ বিকাতীয় হইয়া পড়িতেছি, আমাদের মন অলক্ষ্যে ইংরাজী সভ্যতার দ্বারা অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কারণে গান্ধি মনে করেন যে হিন্দীভাষা শিক্ষা ঐ ভাষাতেই ভারতের সকল প্রদেশের লোকদিগের পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলা উচিত।

হিন্দী ভাষা উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকেই বোঝে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তেলুগু-তামিল-কান্নড়ী-ভাষা দক্ষিণ ভারতের লোকেরা এ ভাষা বোঝে না। বাঙালী ও ওড়িয়ায়ও যে হিন্দী বোঝে তা বলা যায় না—হিন্দীর সঙ্গে বাংলার কতক সাপুত্র আছে বলিয়াই সহজ দুটো চারটে হিন্দী কথা বাঙালী বুঝিতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষটাকে গোটা ধরিলে এমন কোন ভাষাই নাই বাহা সমস্ত ভারতের লোকদের অধিগম্য বলা যায়।

ইংরাজী ভাষা যে আমরা শিখি, তাহা কেবল ইংরাজ আমাদের রাঙ্গা—অতএব ঐ ভাষা রামভাষা—বলিয়া নয়। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদের মন বিশ্বাসন-ব-মনের মাঝে প্রবেশ করিবার পরওয়ানা

পাইয়াছে। স্মৃতরাং মনের ক্রিয়াটাকে যদি সৎ সার্থকতা আমাদের অভিপ্রায় হয়, 'কালচার' মিনিষ্টার প্রতি যদি আমাদের মনের অনুভূতি থাকে, তবে ইংরাজী না শিখিলে আর কোন 'ভাষা' শিক্ষার দ্বারা ইংরাজীর মনের স্বর্ণ পুরোপুরি বজায় থাকবে না। কেননা, বিশ্বের জ্ঞানকে ইংরাজী ভাষা নিজের ভাষার মতো মজুত করিয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই আমরা কথাবার্তার ইংরাজী এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিতে বাধ্য হই—কেননা ইংরাজী ভাষার ধাতু-তন্ত্রে আমাদের মন যে পুঁট। বাংলা ভাষা যে এই কর বছরের মধ্যে এমন অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, বাংলা সাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যে আসন পাইয়াছে, তারও কারণ এই যে, ইংরাজীর ভাষা সম্পর্কে বাংলাভাষাই সব চেয়ে বেশি আদর ও আনন্দসাৎ করিয়াছে। এই আধুনিক বাংলাভাষাকে ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে 'কোরক'-ভাষা ও 'কোরক'-সাহিত্য বলিয়া যিনি বতই বিজ্ঞ কল্প, গলাকে যেমন গগোতীতে হটাইয়া লইয়া বাওয়া যায় না, তেমনি এ ভাষা ও সাহিত্যের গতিকে এখন বাংলার মধ্যস্থলে ফিরাইয়া লইয়া বাওয়া অসম্ভব। এই ভাষা পুরোহিত হইয়া বিশ্ব-মনের সঙ্গে বাঙালীর মনের যে পরিণত সাধন করিয়াছে, তাকে অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সেইজন্য বক্তাবের নিয়মে আপনিই ভারতীয় প্রাথমিক ভাষাগুলি ও সাহিত্য-গুলি ইংরাজীর তাবৈষম্যে সম্প্রদায়ী

হইয়া উঠিতেছে, অথচ তাদের নিজেদের বিশেষত্বও বিলুপ্ত হইতেছে না। কেননা যেমতে পাই যে, ইংরাজীর ভাষাকে তারা আনন্দসাৎ করিয়া লইতেছে, নিজেদের দেশীয় সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইতেছে। সেইজন্য আধুনিক বাংলাসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এ কথাও যেমন সত্য, তাহা ইংরাজী সাহিত্য হইতে বিশিষ্ট ইহাও তেমনি সত্য। এই যে দেওয়া-নেওয়া, ইহাইত স্বাভাবিক। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার মধ্যে এই আদান-প্রদানের সম্বন্ধটা সমীচ না হইলে, তারা-ত এতটাকেই পরস্পর হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতিবাদী হইয়া পড়িয়াইবে। ভারতবর্ষের সভ্যতার যদি কোন বিশিষ্টতা থাকে তবে তাহা এই যে, নানা জাতির নানা ধর্ম ঐতিহাসিক আচার অনুষ্ঠানকে ভারতবর্ষ আনন্দসাৎ করিয়া এক বিরাট সমষ্টি-রূপে বাধিয়া দিতে পারিয়াছে। আর কোন সভ্যতাই এত বিচ্ছিন্নতাকে হ্রাস করিতে পারে নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিকল্পনায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার স্থান আছে, তেমনি ইংরাজজাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতারও স্থান আছে। "পূর্ব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাথা"—এইটাই ভারতের বিশেষ পৌরবের কথা।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলির সঙ্গে সাহিত্যের সঙ্গে যেমন ইংরাজীর একটা ঐক্য সম্বন্ধ পড়িয়াছে, তেমনি ভারত-

বর্ষে যদি কোন ভাষার সার্বভৌমিক ভাষা হইবার অধিকার থাকে, তবে সে অধিকার ইংরাজীই আছে। কেননা এই ভাষার আশ্রয়ে আমরা যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরাই পরস্পরের ভাবের ও চিন্তার বিনিময় করিতে পারি তাহা নয়, আমরা—এই ভাষার সূত্রে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বকে সামনে রাখিলে আমাদের বাণীর মধ্যে যে মহৎ উদারতা যে সার্বভৌমিক সত্য, যে উচ্চল আনন্দ দীপ্যমান হইয়া উঠে, শুধু ভারত-বর্ষকে সামনে রাখিলে তাহা হয় না। তখন অলঙ্কিতে আমাদের চিন্তার মধ্যে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করে। এগুণে জগতের কাছে ভারতের বাণী বীরা বহন করিয়া গিয়া পেছেন, সেই রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—কোন

ভাষার সেই বাণীকে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন? ইংরাজী ভাষার নহে কি?

অস্ত্রের জীবন যথেষ্টপরিমাণে আত্মসাৎ করিলে কোন সত্যতারই নিজের বৈশিষ্ট্য কোনকালেই নষ্ট হয় না, নিজের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় না। রামমোহন রায়ই সকলের আগে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বস্তব করিয়াছিলেন, অথচ তাঁর মত ভারতের অতীত গৌরব, ভারতের সত্যতার বৈশিষ্ট্য আর কেহই আমাদের কল্প উদ্ধার করিয়া বান্ নাহি। ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্যে ইংরাজও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে— ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ের মধ্যে ইংরাজেরও স্থান আছে—এই কথাটি যদি স্বীকার করি তবে ইংরাজীভাষাকে বাদ দিয়া মানসিক অড়ত্বলাভের জন্য আত্মবিগণকে বাস্তব হইতে হইবে না।

শ্রীঅম্বিকুমার চক্রবর্তী।

নব-হিন্দুদের সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ

(সমনামনিক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

(ফরাসী হইতে)

যাহারা নব্যভারত গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহারা একদিন ভারতের শাসন-কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিবে তাহারা ঠিক সেই সব লোক যাহারা উচ্চপদাঙ্কাজী, অদম্য, বাহাদিরগণকে অনেকে মনে করে—“৪১৭ বর্ষ” ও শ্রেণী-বহির্ভূত।

ইংরেজের সহিত ইহাদের ক্রতপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, পৃথকরূপে উভয়ের মনো-ভাব পর্যালোচনা করা আবশ্যিক।

প্রথমতঃ ভারতবাসীর মনোভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যাহা-কিছু ইংরেজী তাহাই ভাল এইরূপ মনোবৃত্তি

নব-হিন্দুদের একটা বাতিকেয় মধ্যে ছিল :— ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী ধরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা, ইংরেজী ভাষায় কথা কওয়া, ইংরেজী ভাষায় লেখা। উহাদের সংখ্যা খুবই কম এবং উহারা নিত্য সামান্য শ্রেণীর লোক। পক্ষান্তরে কোম্পানীর শাসন আমলের ভিত্তি তেমন স্থিতিশীল ছিল না; আমীর-ওমরা ও ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে মুখিয়ার অস্ত্র কোম্পানী, ইংরেজীভূত ভারতবাসীদিগের উপর নির্ভর করিল; তাহার পর, উহার মতামতের একটা “কামান” আসিয়া পড়িল, তখন উহারা ভারতকে সত্য করিয়া তুলিতে উচ্ছৃঙ্খল হইল; এই সমস্ত কারণ, ইংরেজ ও নব-হিন্দুর মধ্যে সঙ্ঘর্ষটাকে সহজ করিয়া তুলিল।

কিন্তু ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরেজদের বিশ্বাস নষ্ট হইল; দিল্লী ও কানপুরের দাঙ্গা কান্ডে উহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিল; তরাকুল হইয়া, উহারা বিদ্রোহী ও রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতে চাহিল না। উহাদের সংবাদপত্রাদি, সে সময়ের সমস্ত অত্যাচার ভারতবাসীদের দ্বারা চাপাইল, স্বকীয় সমাজ হইতে উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার পর বিদ্রোহের উন্নততা। কোম্পানীর আমল হইতেই ইংরেজরা বিপদের আশঙ্কা করিত; ইংলণ্ডাধিপতি রাজার শাসন-আমলে উহারা বেশ অহুস্তব করিল, ভারতবাসী নিষেধিত হইয়াছে, চিরকালের মতো নিষেধিত হইয়াছে।

এথাপি শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মের ফল

ফলিতে আরম্ভ করিল। প্রতিবৎসর ইংরেজি-ধরণে শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; সরকারের অধীনে নিয়-পদ সকল অধিকার করিয়া উহারা আপনাদের শক্তিসামর্থ্য অহুস্তব করিতে আরম্ভ করিল। দরিদ্র, বিলাতী বিলাস-সামগ্রীর দ্বারা উত্তেজিত, শিক্ষা-প্রসূত নতুন নতুন অভাবের তাড়নায় বিভলিত,—উহারা যে সকল বেতনের পদ ইংরেজের অস্ত্র বন্ধিত ছিল, সেই সকল বেতনের পদ পাইবার জন্য দাবী করিতে লাগিল। যে দেশে ত্রিশকোটি অধিবাসীর মধ্যে কেবল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের ৮০০ ক্র্যাফ (ক্র্যাফ = ৪০ আনা—এখন আরও বেশী) মাত্র বার্ষিক আয় সেই দেশে ২০, ৪০, ১০০, ১০০০ বেতনের পদ আছে।

সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত যুবকরূপ সরকারী স্থলে শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না; বাহারা কাজে নিযুক্ত হইল তাহাদের মধ্যে অনেকে, এক্ষেত্রে জীবন-যাত্রা-পদ্ধতিতে ও বয়সবেতনে বিরক্ত হইয়া কর্মে ইচ্ছুক ছিল। উক্ত উদ্যোগলই সাহিত্যের দিকে মুখ ফিরাইল, কিংবা সংবাদপত্র-সম্পাদক, সভা-সমিতি-পরিচালক, ও পুস্তিকা-প্রচারক হইয়া ধাড়াইল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক খুব ব্যাতি লাভ করিল। অধিকাংশ লেখক বিফল-মনোরথ হইল; অনেক স্থলে নিয়তির বর্ণ হইতে উদ্ধৃত হইয়া, আত্মীয়দের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ভারত-বাসীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, ইংরেজদের

কর্ষক প্রভাখ্যাত হইয়া এই সকল বসিয়া তাহার্য্য অগ্নেও ভাবে না।" (Hindu Civilization r. p. 4 XII.)

শিক্ষাদান, দুর্দশাপন্ন, টোকা, মেলাজের লোক, রাষ্ট্রনৈতিক বাহাদুরবাদের মধ্যে প্রচণ্ড উগ্রতা, কট্ট-কাটবা, দুর্গকচিতা, অজ্ঞাঘাতা আনিয়া কেলিল, অন্তরে অপরিণীত বিবেচ্য পোষণ করিয়া উহার্য্য জনসাধারণকে বিস্তোষে উত্তেজিত করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে উহার্য্যের এই প্রচণ্ড উগ্রতা, অকপটতার প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইল। অনেকে সময়ে উহার্য্য সেইসব সমাজ-সংস্কারকে আপনাদের মনে টানিয়া আনিয়া যাহার্য্য স্বকীয় চরিত্র ও ক্ষমতার গুণে, আশ্চর্য্যকণ্ঠে সমর্থ নিত্যন্ত অজ্ঞ জনসাধারণের প্রকৃত রক্ষক হইবার উপযুক্ত।

• •

প্রথমে ভারতবাসীদের দোষ, তাহার্য্য পূর্ব ইংরেজের দোষ।

স্বকীয় গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশে, প্রীযুক্ত প্রমথ বসু উহা সম্বন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ভারতে, ইংরেজরা বাস করে না। ভারতকে উহার্য্য এমন-একটি দেশ মনে করে যেখানে, কি বলিক, কি কারখানা-ওদালা, কি সরকারী কর্মচারী সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য—অর্থোপার্জন করা। বিশেষত আঙ্গিকার দিনে বাস্পোত্তের চলাচলের উন্নতি হওয়ায় এইরূপ অবস্থা পাড়াইয়াছে; কেননা, দিনবাসের ছুটিতেও তাহার্য্য এক-দৌড়ে বাড়ী বাইতে পারে। তাছাড়া, তাহার্য্যের মধ্যে অল্প লোকই হিন্দুজাতিকে সভ্যজাতির মধ্যে গণ্য করে, এবং ভারত-বাসীর সহিত সমানভাবে মেলামেশা করিবে

বলিয়া তাহার্য্য অগ্নেও ভাবে না।" (Hindu Civilization r. p. 4 XII.)

এই দোষারোপগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক। ইচ্ছা নিশ্চিত, ইংরেজ আগন্তকের মধ্যে অধিকাংশ লোকই টাকা করিবার জন্যই কিংবা শুধু জীবিকা নির্বাহ করিবার জন্যই ভারতে আসিয়া আজ্ঞা গাড়িয়াছে, ভারতের কিংবা ভারতবাসীর ইষ্টানিতে তাহার্য্যের কোন 'পা' নাই। ইহাও নিশ্চিত, এই দোষটা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেকালে, উহার্য্য বিশ জিহ্ন বৎসর ভারতই থাকিত, বেশে ফিরিয়া বাইত না। এবং যেহেতু বড় বড় নগরে খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজ বাস করিত, কাজেই তাহার্য্য দেশীয় লোকের সহিত মেলামেশা করিতে বাধ্য হইত। আঙ্গিকার দিনে, বলিক ও রাজকর্মচারীদের মনে সর্ব্বদাই ইংলণ্ডই জাগিতেছে, উহার্য্যের মধ্যে কেহ কেহ প্রতি বৎসরেই, অনেকে তিন বৎসর কিংবা চারি বৎসরান্তে ইংলণ্ডে যাত্রা করে। শ্রীতকালে পর্য্যটক ও রাজনৈতিকদিগের আমদানী হয়। সমস্ত বড় বড় নগরে ইংরেজরা আপনাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে। ইংরেজের এক পৃথক্ অঞ্চলই আছে—Cantonment। ইংরেজের ক্লব, ইংরেজের দোকান, ইংরেজের সংবাদপত্র, ইংরেজী কথাবার্তা, ইংরেজদের একটা বিশেষ মতামত,—দেশীয় মতামতের সহিত তাহার্য্য কোন সম্পর্ক নাই। খাতিয়ানা হিন্দুধর্ম গৃহে বাতায়িত করা, কৃষিকার নিরর্থন বলিয়া বিবেচিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজকর্মচারীরা এই উত্তর দেশের মধ্যে মগ্নমুগ্ধ

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অবধি কলিকাতার সর্বপ্রধান ক্রব্ কোন রাজ-কৰ্মচারীকে কখন গ্রহণ করে নাই। আজিকার দিনে, বাহারা ত্রিশকোটি ভারতবাসীর শাসনকর্তা হইবেন, সেই সব যুবকের মধ্যে অনেকে ভারতকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় ও ভারতবাসীর দিকে পিঠ ফিরাইয়া বলে।

এই ছই জাতির মধ্যে বৈরতার আর এক কারণ :—হিন্দুদের অভ্যুদয়। এখন সর্বত্রই চোখের সামনে দেখিতে পাওয়া যায় :—ভারতবাসীরা পরীক্ষা দিতেছে, সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছে, কারখানা, ব্যাঙ্ক ও সওদাগরের কুঠী স্থাপন করিতেছে। যে সকল উদার-চিত্ত পুরাতন "আক্সো-ইন্ডিয়ান," বেন্দীয় লোকদিগের দুর্ভিক্ষ হইতে ভালবাসেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা, তাঁহাদের ভৃত্যপূর্ব আশ্রিত জনেরা তাঁহাদের ঘোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের কাজের বিচার-মালাচনা করিলে, অথবা জলের আসনে বসিয়া কিংবা রাজ-কৰ্মচারীর উচ্চপদে অবস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগের প্রতি হুকুমজারী করিলে বরদাশ করিতে পারেন ? যে আইনের দ্বারা ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট যুরোপীয়কে প্রেষণার কিংবা বিচার করিবার অধিকার পাইয়াছিল, সেই আইন ভারতীয় ইংরেজদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। এই আইনের প্রবর্তক

লর্ড রিপন, ইংরেজদের চক্ষুশূল হইলেন। কিন্তু লর্ড রিপনের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন-কালে, কলিকাতা, এলাহাবাদ ও বোম্বাইয়ের রাজ্যপথে শতসহস্র হিন্দু উচ্চকণ্ঠে বেক্রপ অভিবাদন করিয়াছিল। ভারতে কোন নৃপতি সেক্রপ অভিবাদন প্রত্যাশ্য হইতে কখনো প্রাপ্ত হয় নাই। (১)

ভারতীয় ইংরেজ-মণ্ডলী অনেক সময়ে খুব তীব্রকটু অথচ ভ্রাতোচিত ভাবার স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে; তবু কখন কখন বিশেষবশতঃ বেন্দীয়দিগের প্রতি অবমাননাও করিয়া বলে। এই প্রবন্ধে তাহা অনেক বার উদ্ধৃত হইয়াছে।

"Deft fordএর ৪০০ নির্দোষক, কোন ন্য-নষ্ট এলাকার উদারনৈতিক উদ্দেশ্য রূপে লাগানোহন ঘোষকে বরণ করিতে ইচ্ছা করায়, তিনি তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসম্মত হন। এই ৪০০ ক্রোড়াক্ষ নগণ্য লোক পাঙ্গা-গারদের বাসিন্দা হইবার উপযুক্ত, আশাযের দেশের ভাগ্য ভাবাবধান করা তাহাদের কৰ্ম নহে। যদি একজন বাঙ্গালী বাবু পালেমেন্টে প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে শীঘ্রই "আর্বাণিগের" ইহা একটা আকাঙ্ক্ষিত স্থান হইয়া উঠিবে। ইংরেজ জনসাধারণ এই নৃচ নৃতনতার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া কোথায় গিয়া থাকিবে ? একটা বনমাহুকে কাপড় পরাইয়া বাড়ী করিয়া দাও, দেখিবে,

(১) একথা সত্য, (১৮৩৩) Ilbert Bill সংশোধিত হইয়াছিল : কৌন্সিলারী নোংরায়া ইংরেজ জুরী ডির ইংরেজের বিচার হইতে পারে না। কেবল এখন বেন্দীয় পোষীর বেন্টিফ্রেটু ইংরেজকে প্রেষণার করিতে পারে, কেবল এখন বেন্দীয় দেশীয় জজ ইংরেজের বিচার করিতে পারে। যেদগলী "ত কৌন্সিলারী নোংরায়া হাইকোর্ট" পর্যন্ত আপিল চলিতে পারে। হাইকোর্টে ইংরেজ-জনের সংখ্যাই অধিক।

কোন কোটির এলাকার তাহার নির্কাচনের অনেক সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া এই ঘোষকবু অপেক্ষা বনমাল্যের চের বৃদ্ধমান। এই ঘোষকবু ঢাকার যে সব মনোভাব প্রকাশভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অন্তর্ভুক্ত তাহার ডাক-নাম হইয়াছিল Pole-cat। ঈশ্বরকে সম্মান, এই ৪০০ নির্কাচকে লইয়াই একটা নির্কাচনের এলাকা নহে, শেষমুহুর্তে যখন ইংরেজের বেশামুদ্রাঙ্গ আগিয়া উঠিবে, তখন ঘোষকবু তাহার স্রম স্মৃতিতে পারিবেন। তখন রাতার মুটেমজুর আগাছ হইয়া তাহার খুঁটার অন্তর্ভুক্ত তাহার বিলম্ব নাকাল করিবে। যে-সব ইতর বাঙ্গালী ইংরেজ-মহিলার পাণি গ্রহণ করিতে সাহসী হয়, তাহাদের সন্ধে আমরা স্ত্রীবিচার করিব, কিন্তু যে ইংরেজ-মহিলা একজন এ দেশী লোককে বিবাহ করিয়াছে তাহাকে বারাননার স্ত্রী প্রকাশভাবে খিত্য করা উচিত,—সে রমণীর লজ্জা-শরম

নাই; সে স্ত্রীজাতির কলক, সে ইংরেজ-কুলের কুলাঙ্গার।” (Bengal Times. June, 1885)।

এই দুই জাতির মধ্যে, সামাজিক-সম্বন্ধে বিবেচ্য সব কতদূর যাইতে পারে তা তেঁা সেখানে যাইতেছে। এ রোগের কি ঔষধ নাই? কতকগুলি ইংরেজ বা ভারতবাসী সেরূপ মনে করেন না। M. Cotton, Sir William Hunter, M. Digby, Sir William Wedderburn—ইহাদের প্রণীত উদ্যোগ তাবের প্রচাতি হইতে এবং Bright ও Gladstone প্রভৃতির বক্তৃতা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, এমন কতকগুলি ইংরেজ আছেন যাহারা ভারতবাসীদের মানসিক ও নৈতিক মূল্য বুঝিতে সমর্থ, পক্ষান্তরে মালাবারী, M. Ghose, M. Dutt প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, ইংলণ্ড ও ইংরেজ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাহা করিয়াছে তৎসমস্ত ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ড ও ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ত্রিভোক্তারিস্ত্রনাথ ঠাকুর।

অভাগী

(আত্ম-পেথভের গর হইতে)

বালাবাড়ীর একটি ঘরে বসিয়া টিফেন ক্লসকোভ্ ‘অ্যানাটমি’র পড়া মুখস্থ করিতেছিল।

জানলার ধারে একটি খুবতী—দেখিতে রোগা, বরষ বৃদ্ধর পটিন, নাম অনীতা। হেঁটভাবে বসিয়া সে একটি গিরাণের গলা

লেগাই করিতেছিল। ক্লসকোভ্ ডাক্তারী পড়ে, অনীতা তাহারই সঙ্গে থাকে।

সকাল হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এখনো ঘর-দুয়ার গুছাইয়া পরিষ্কার করা হয় নাই। বিছানাটা লণ্ডভণ্ড—তাহার উপরে বাশিশ, কাপড়-আমা, বই প্রভৃতি

হরেক-রকম জিনিষ এলমেলো ভাবে ছড়ানো
রহিয়াছে।

রুসকোভ্‌ নরদেহের পার্শ্বস্থি সবচে পৃষ্ঠ
মুগ্ধ করিতেছিল। পড়িতে পড়িতে বই
হইতে মুগ্ধ তুলিয়া সে একবার কড়িকাঠের
বিকে তাকাইল। তারপর আপন মনে বলিল,
—“পাল্‌রায় এই হাড়গুলো হচ্ছে পিন্নানোর
চাবির মত। এগুলো ভাল করে বুঝতে
হলে হয় মড়ার কঙ্কাল নয় জীবন্ত
মানুষের দেহ নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার
—নৈলে সব গুলিয়ে যেতে পারে।...হঁ,
অনীতা—এদিকে এস ত!”

অনীতা সেলাই রাখিয়া উঠিয়া আসিল।
রুসকোভ্‌ তাহার সামনে বসিয়া তার
পাল্‌রায় হাড়গুলো হাত দিয়া একে একে
গণিতে লাগিল।

—“তাইত, প্রথম হাড়খানা হাতে ঠেকে
না কেন!—এই যে, এখানা নিশ্চয় দ্বিতীয়
হাড়! হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তৃতীয়, আর
এটা চতুর্থ! ঠিক! অনীতা, তুমি এমন
নিউরে নিউরে উঠে কেন?”

—“উঃ! তোমার আঙুলগুলো ভারি
কনকনে যে!”

—“তাতে হয়েছে কি, এতে ত আর
তুমি মরে যাবে না! এস—হ্যাঁ, এই
হচ্ছে তৃতীয় হাড়, এই হচ্ছে চতুর্থ!
... ..অনীতা, তুমি এত রোগা, তবুও
তোমার পায়ের হাড়গুলো ভাল করে হাতে
ঠেকে না! এটা দ্বিতীয়—এটা তৃতীয়
... ..আরে ছাৎ, সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে!
অনীতা, আমার পেন্সিলটা নিয়ে এস ত।”

রুসকোভ্‌ পেন্সিল দিয়া অনীতার

আহুড় বুকের উপরে সারি সারি কতকগুলো
সরল রেখা টানিল।

“এতক্ষণে ঠিক হোল। এইবার আমি
তোমাকে সহজেই পরীক্ষা করতে পারব।
উঠে পাড়াও!”

অনীতা উঠিয়া পাড়াইল—রুসকোভ্‌
একমনে তাহার পাল্‌রায় হাড়গুলো পরখ
করিতে লাগিল। এদিকে বেচারী অনীতার
নাক, ঠোঁট ও হাতের আঙুলগুলো হাড়-
তারা দ্বিতে ক্রমেই যে শিঠাইয়া নীল
হইয়া উঠিতেছে—পরীক্ষার তত্ত্ব রুসকোভ্‌
তাহা মোটেই খেয়ালে আনিল না। অনীতাও
ভয়ে কিছু বলিতে ভয়সা করিল না—বাধা
দিলে পাছে তাহার পড়াশুনার কোন
ক্ষতি হয়!

রুসকোভ্‌ বলিল—“এতক্ষণে সব বোঝা
গেল। অনীতা, তুমি চূপচাপ বসে থাকো
—দেখো, পেন্সিলের দাগ বেন উঠে না
যায়! ততক্ষণে আমি পড়াটা আরেকটু
এগিয়ে নি!”

রুসকোভ্‌ আবার পাইচারি করিতে
করিতে বই পড়িতে লাগিল।

অনীতা দ্বিতে-কাপিতে-কাপিতে আড়ষ্ট
হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুকময়
পেন্সিলের লাইন—ঠিক বেন উদ্ধির দাগ।
সম্ভাব্যতাই সে মৌনবতী—এখনো সে কোন
কথা কহিল না, বসিয়া-বসিয়া আপন মনে
কি যে ভাবিতে লাগিল, তা সেই জানে।...

আর ছ-সাত বছর সে এমন করিয়া
নানান ছাত্রের সঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে।
সে-সব ছাত্র এখন পড়াশুনা সাধ করিয়া
যে ঘর নিজের গাম্‌মার চলিয়া গিয়াছে।

অভাগিনী অনীতার কথা এখন জুলিয়াও কেহ ভাবে না বোধ হয়। তারা যে এখন ন্যূনতম লোক—কেহ ডাক্তার, কেহ চিকিৎসক, কেহ প্রক্টর!... রুস্কোভ ও একদিন তাহাকে একলা ফেলিয়া আর-সকলেরই মত চলিয়া যাইবে! কালে সেও হৃৎক একজন মন্ত বড়লোক হইবে।

কিন্তু, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে—বর্তমানে রুস্কোভের ত হৃৎকার সীমা নাই। পরসার অভাবে এখন তাহার চা ও চুকট পর্যন্ত ঘোটে না। অনীতা সেলাইয়ের কাজ করিয়া যদি কিছু পরগা আনিতে পারে, তবেই রুস্কোভের তামাক ও চা কিনিবার উপায় হইবে।

বাহির হইতে কে ডাকিল—“ওহে, আমি ভিতরে যেতে পারি কি?”

অনীতা তাড়াতাড়ি একখানি পশুখাল টানিয়া আপনার খোলা বুকের উপর ফেলিয়া দিল। কেটিলভ ঘরের ভিতরে ঢুকিল। সে চিকিৎসক।

তার মাথার লম্বালম্বা চুল মুখ অবধি জুলিয়া পড়িয়াছে, তাহারই মধ্য হইতে বস্ত্র স্বর মত চাহিয়া কেটিলভ বলিল, “ওহে, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। তোমার অনীতাকে একবার বস্টা-হুয়ের সঙ্গে ছেড়ে দিতে পারবে? আমি একখানা ছবি আঁকছি—কিন্তু ‘মডেলের’ অভাবে কাজ এগোচ্ছে না।”

রুস্কোভ বলিল, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অনীতা, তুমি এখনি যাও!”

অনীতা গৃহস্থের বলিল, “কিন্তু আমার

শেলাই এখনো শেষ হয়নি যে!”

“চুলোর যাক শেলাই। আমার বন্ধু হচ্ছেন আন্টি—আন্টের সঙ্গে উনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এত আর বেশে কাজ নয়?”

অনীতা নীরবে জামা-কাপড় পরিতে শুরু করিল।

রুস্কোভ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি আঁকছ?”

—“একটি দ্বন্দ্ববৃত্তা স্তম্ভরী! বিষয়টা চমৎকার! কিন্তু বন্ধু, তুমি এমন নোংরা হয়ে থাক কেনন করে?”

—“কি করব বল, বাড়ী থেকে আমি মাসে মাসে মোটে উনিশ-তুড়ি টাকা পাই, তাতে কি আর তদারকোর দিন চলে?”

—“হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তা বটে! কিন্তু, তবু তুমি ইচ্ছে করলে আরেকটু মাহবের মত থাকতে পার ত! শিকিত লোকের কচি থাকা উচিত, তা না হলে চলবে কেন? এই ভাখনা, তোমার বিছানা এখনো বাসি রয়েছে, আর ঘরের চারিদিকে এমনি ময়লা আর অশ্রাব্য গন্ধেছে যে, পা পাতবার জো নেই,—আরে ছোঃ ছোঃ!”

রুস্কোভ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, কিন্তু অনীতা আজ এত ব্যস্ত ছিল যে, ঘর-ছরোর শুছোবার একটুও সময় পায় নি।”

বন্ধুর সঙ্গে অনীতা চলিয়া গেলে, রুস্কোভ সোকার উপরে শুইয়া পড়িল এবং সেই অবস্থায় পড়া মুখ করিতে

করিতে ঘুমের ঘোরে তাহার চক্ষু আচ্ছন্ন
হইয়া আসিল।

বট্টাখানেক পরে তাহার ঘুম ভাঙিয়া
গেল। অনীতা তখনো কিরে নাই।

রুস্কোভ্ উঠিয়া বসিয়া আকাশ-
পাতাল নানান কথা ভাবিতে লাগিল।

তাহার বহুর কথা মনে হইল—‘শিক্ষিত
লোকের কচি থাকা উচিত।’—বাস্তবিক,
সে কি পুত্র মতই আছে! আজ এই
ঘরখানা তাহার চোখে ঠিক নরকের মত
দেখাইতে লাগিল।

রুস্কোভের সামনে আশাভরা
কবিত্বের অলঙ্কারে ছবি আঁগিয়া উঠিল।
তখন সে একজন গণ্যমান্য ডাক্তার,—
রোগীরা তাহার প্রকাণ্ড ডাক্তারখানার
বসিয়া আছে,—এক ধর্মীর মেরেকে সে
বিবাহ করিয়াছে,—সামান্য-গুছানো ঘরে
জীব সঙ্গে বসিয়া পরম আরামে সে চা পান
করিতেছে!

এই উজ্জল দিব্যবস্ত্রের পাশে, অনীতার
সাধাসিধা, এলনেল, মরলা পোষাক-পরা,
সকলপ সৃষ্টি কি বেমানান!.... রুস্কোভের
মনে হইতে লাগিল, অনীতাকে আজই
বিদায় করা দরকার।

এমনসবর অনীতা কিরিয়া আসিল।

সে বাহিরের কাপড় ছাড়িতেছে,—
—রুস্কোভ্ গভীরভাবে বলিল, “বেশ
অনীতা, একটা কথা আছে শোন, তোমার
আর আমার একসঙ্গে থাকা চলবে না,—
অর্থাৎ, তোমাকে আর আমার কোন দরকার
নাই।”

‘আর্টিষ্টের ঘরে ছবির মডেল হইয়া ঠায়

গাড়াইয়া থাকিয়া অনীতা কেমন ক্রান্তাইয়া
পড়িয়াছিল—তাহার শীর্ণ মুখখানি এখন
যেন আরো-বেশী রোগা দেখাইতেছিল।
... .. রুস্কোভের কথাই সে কোন অব্যব-
ধিল না—যুধু তার টোটুখানি একটু
কাঁপিয়া উঠিল।

রুস্কোভ্ বলিল, “আজই হোক আর
হুদিন পরেই হোক, আমার কাছে তোমার
চিরদিন থাকা-বসন আর চলবে না, তখন এ
নিরে আর ভাবনা-চিন্তে মিছে। আর, তুমি ত
বোকাও নও—সুতরাং, আমার কথা তুমি
বুঝতেই পারছ।”

অনীতা আবার পোষাক পরিতে
লাগিল। তারপর মৌনমুখে তাহার
সেলাইয়ের টুকটাকি জিনিসগুলি গুছাইয়া
লইল। তার টেবিলের পাশে কাগজের
মোড়কে খানিকটা চিনি ছিল; সেটুকু
একখানা বইয়ের মলাটের উপরে রাখিয়া
অনীতা কোমল স্বরে বলিল, “এই
—এই—তোমার চিনি রইল”—বলিয়াই সে
চোখের জল ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি
অস্ত্রদিকে মুখ ফিরাইল।

রুস্কোভ্ বলিল, “কি বিপদ, তুমি
কাঁবছ যে।”

অনীতা মাটির দিকে চাহিয়া শুষ্ক
মুষ্টির মত গাড়াইয়া রহিল—তাহার অশ্রু-
ভরা কণ্ঠে একটিও কথা বাহির হইল না।

রুস্কোভ্ ঘরের ভিতরে পাইচারি
করিতে-করিতে বলিল, “তুমি আশ্চর্য
করলে যেখাতি! জানই ত, সমস্ত আমাদের
ছাড়াছাড়ি হবেই,—চিরকালটা ত আর
আমাদের একসঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না।”

অনীতার বিনিম-পত্নর গুছানো শেখ
হইল। রুস্কোভের দিকে ফিরিয়া সে
বিদায় লইতে গেল—“আমি তবে আমি?”

এই কথাটাতে যেন রুস্কোভের
চটকা ভাঙিল;— তবিশ্বতের স্বপ্নটা যেন
ভাগ্যপন্থের মধ্যেও পক্ষবিত্তার করিয়া
উড়িতেছিল। সে মনে মনে বলিল,
“অনীতা না হয় আরো কিছুদিন এখানে
থেকেই থাক। তারপরে তাকে সমর-মত
যেতে বললেই হবে!”—তারপর নিজের এই
দুর্জলতার নিজের উপরেই হঠাৎ চটকা গিয়া
রুস্কোভ রুস্কোভে বলিয়া উঠিল, “এস,
এস, তুমি ওখানে দাঁড়িয়া রইলে কেন

অনীতা? যেতে চাও—খাও; থাকতে
চাও—থাকো! মাও, জামা খোলে, তুমি
থাকতে পার!”

অনীতা তৎহার বাহিরের পোষাক
পুলিতে লাগিল, নীরবে—চুপেচুপে। তারপর
সুকাইয়া চোখের জল মুছিয়া, একটি অক্ষুট
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, জানলার ধারে আপনার
স্বায়গাটিতে গিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

রুস্কোভ আবার তাহার ডাক্তারী
বইখানা লইয়া পড়া শুরু করিয়া দিল—
“দক্ষিণস্থ হৃদহৃদ্ব ত্রিতাপে বিভক্ত, যথা—”

স্বাত্ম্য একটা ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া
উঠিল,—“খাবার চাই, খাবার!”

শ্রীরেণু রায়।

শীতের সকালবেলা

শীতের সকালবেলা,—আলো আঁধ

হয়েছে তপন,

খোলে নাই দানছত্র তার;

উপাসী নয়ন তাই করে প্রাপণ,

একবার চেরে, কিরে চার আর-বার।

গেছে দিন,—নাই আর বুলি হরে’

সুতো ভরে দান।

কাঙাল তো যোকে না সে কথা;

অভাব প্রবল বার তারি অপমান,

গুণু চার, জুলে গিরে মানের মমতা!

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী।

সমালোচনা

আলোয়া। শ্রমতী-নিরুপমা দেবী প্রবীত।
প্রকাশক, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণ-
ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এম্বেরড প্রিন্টিং
ওয়ার্কসে মুদ্রিত। * মূল্য আট আনা। এখানি
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের প্রকাশিত ‘আট-

আনা-সংস্করণ-প্রথমবার বোদ্ধ সংখ্যক প্রব।
এ প্রহে লেখিকার রচিত ‘আলোয়া’, ‘প্রত্যাখ্যান’,
‘নৃতন পূজা’ ও ‘দ্বীপ’ শিরীষ চারটি ‘বড় পত্র’
সংস্কৃত হইয়াছে। পরগণিকের টিক ছোট পত্র
বলা চলে না; অথচ এগুলি উপভাসও নয়।

‘নৃত্যনৃত্য’ গল্পের মতে ছোটগল্পের : কিন্তু রচনা
 বাহ্যিকভাবে গ্রন্থ, ভাষা, ক্ষমতা, কবিতা—সবাই
 কলে ভারতীয় হইয়া ছোটগল্পের আঁট সুর হইয়াছে।
 ‘আলোচনা’ গল্পের ভাষা কটকট, মটমট বিশেষবহন।
 ‘আরম্ভিতের’ মতে উপভাষার উপাধান পছন্দ, কিন্তু
 সেটিও লেখিকা ‘পাঠে’ সারিয়াছেন। শেষটুকু
 টানিয়া বুনিয়া বেওয়ার কল্প রস আগে কোথাও
 একটু ভাগ রাখিতে পারে না। ‘বিধি’ ও ‘অনুপূর্ণ’
 ‘কবিতা’-রচয়িত্রীর হাতে রচনাগুলি আরও উজ্জ্বল
 হবে। সুতরাং বলিয়া আনা হিল, কিন্তু আবার
 ‘আলোচনা’ পাঠে বিরাগ হইয়াছি।

অষ্টক। শ্রীমুক্ত বিদ্যুত্বেষণ ভট্ট ও শ্রীমতী বিক্রমা দেবী অষ্টক। প্রকাশক, শ্রীমুক্ত ভবনাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কলকাতা। এনারেবল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত হুলা দেড় টাকা। এই গ্রন্থে শ্রীমুক্ত বিদ্যুত্বেষণ ভট্ট রচিত চারটি গল্প "পক্ষীরাজ", "বোম্বার ভায়েরি" "অরিশি" ও "স্নেহের সার্থারী" এবং শ্রীমতী বিক্রমা দেবী-রচিত চারটি গল্প "ব্রতভঙ্গ", "চাঁদের আলোর প্রাণী", "প্রত্যর্পণ" ও "অশ্রুমান না অভিমান",—সর্বসম্মত এই আটটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। "বোম্বার ভায়েরি" এবং "অশ্রুমান না অভিমান" এই দুইটি গল্প অশ্রুমানের ভাল লাগিয়াছে—গল্প দুটিতে বনভ্রমের নিপুণ বিবেচনা এবং অভিনবতা আছে। "অরিশি" গল্পের প্রারম্ভের চমৎকার; বেশ একটি সামাজিক সমস্যা লেখক খাড়া করিয়াছিলেন, এবং ভ্রমের দিক দিয়াই তাহার সমাধান দিলিবে তাহািরাহিয়ায়; কিন্তু হল্লা শেদের দিকে পৌঁছানির চাপে পড়িয়া গল্পটি মাঠি হইয়া গিয়াছে। লেখকের পৌঁছানির গ্রাণ অপরভুক্ত হইয়া এখনি বেকগেবায়া টান দিয়াছে যে শেখকটায় সে বেচারা একেবারে হোলালির অন্ধকূপে হুটত পাইয়া দরিয়াছে। "স্নেহের সার্থারী"র রচনা-ভঙ্গী প্রাঞ্জল, সরল, কিন্তু রাটে

বিবেচন্য নাই। নবীন ও মাধুরীর বিশলটুকু একেবারে
 বিশেষত্বের বস্তু। "পদমান বা অজিতমান ?"
 পদটি চমৎকার লাগিয়াছে। "এবের ছাপা" কাগজ
 বাঁধাই সুন্দর।

প্রেমাবতার শ্রীগোবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ বিশিষ্ট
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নিম্নলিখিত 'বহিঃ' বাহ্য
উৎসর্গ' হইতে শ্রীকৃষ্ণ বচনসমূহ ভট্টাচার্য্য ও
শ্রীকৃষ্ণ সচোপনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।
কলিকাতা, মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা।
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর এই পুস্তক জীবনীখানি
প্রস্তুত। সেবা ভাল, কোথাও বদল বা ত্রুটি
নাই। ভাষা সরল, আভ্যন্তরীণ।

‘নারীরক্ত’। একাশক শ্রুত হৃদয়হৃদয়
যে, ৪২ সাতকাণ্ড বহন দ্বিত কলিকতা। ইন্দোরাঙ্গ
স্নেহে মুগ্ধিত। মূল্য হয় আনা যায়। এখানি
জীবক হিন্দু-মন্দির জীবন-কালীন। পাঠ করিয়া
ভূত হইয়াছি। এক পুত্র রজনী অন্নপ্রাণের
পতীর মধ্যে থাকিয়া সংসারের ও সমাজের কত
কাজ করিতে পারেন—সমাজের উপর তাঁহার নীরব
আড়চরণীয় জীবন-ব্যয় কতখানি প্রত্যক্ষ বিস্তার
করিতে পারে—এ সমস্ত বিষয় অন্যত্র ‘বয়োরা’
রূপে সহজ ভাষায় এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।
এ গ্রন্থ-পাঠ্য আবর্ষা শিক্ষা হয়। প্রত্যেক
মানিক-বিদ্যাগরে এ গ্রন্থখানি পাঠ্য তালিকাভুক্ত
হইতে যেখানে আমন্ত্রণ হওয়া হইবে। গ্রন্থের
অথবা শুণ, বাঁহাং কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাঁহা
নামইহু শুণু জানিতে পারা যায় তাঁহাঙ্কি। অপর
কোন পরিচিত নাই—চক্রবর্ত্ত করিয়া আবর্ষা
খড়া করিবার চেষ্টা। আরো নাই—প্রকাশকের গকে
এ সংঘ আফিলিকার দিনে অল্প প্রণয়ন
কথা নয়। গ্রন্থের স্থাপন কাগজ ভাল।

ସିମ୍ଭାସନ ବର୍ଣ୍ଣା :

কলিকাতা—২২, বকিরা ষ্ট্রিট, কার্ণিক এসোসিয়েশনসের মাধ্যমে কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, বকিরা ষ্ট্রিট হইতে
ইকালিটার দ্বারা প্রকাশিত।



મનદિ આપી